"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম

(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর [illegible] মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। মৌলিক রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনা সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্য গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩০.০০	টাকা ৪০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১৪ বর্ষ

অমৃত

৩৮ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 31st January, 1975. শুক্রবার, ১৭ মাঘ, ১৩৮১

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাস

সম্পাদকীয়

হিন্দী ও অন্যান্য ভাষা প্রসঙ্গে

নাগপুরে সম্প্রতি খুব ঘটা করে বিশ্ব হিন্দী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিশ্ব ইংরেজি বা বিশ্ব রুশ সম্মেলন কোনোদিন অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে শোনা যায় নি। হিন্দীভাষা বিশ্বভাষার মর্যাদা চাইছে বলেই তার প্রস্তুতি হিসেবে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভারতের বাইরে কয়েকটি ছোটখাটো দেশে—যেমন মরিশাস, গিয়ানা, ফিজি প্রভৃতি জায়গায়, ভারতীয় বংশজদের মধ্যে ভাঙা হিন্দী প্রচলিত আছে। তাদের প্রতিনিধিদেরও সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘে হিন্দীর স্বীকৃতি দাবি জানিয়ে। বলা যায়, এইটেই ছিল সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। হিন্দীকে ভারতের সরকারী ভাষা করা হয়েছে। কিন্তু বহুভাষী ভারতে হিন্দী একক সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হলেও সারা দেশে তা বোধগম্য নয়। ভাষার সমৃদ্ধি ও ঐতিহ্যের দিক থেকেও হিন্দী একক গরিমা দাবি করতে পারে না। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা ভারতের ভাষা সমস্যার দিকে নজর না দিয়ে কেবলমাত্র হিন্দী হিন্দী করে আসর উত্তপ্ত করে রেখেছিলেন। হিন্দীভাষীদের মধ্যেই লেখক বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ সম্মেলনের বিরোধিতা করে নাগপুরেই একটা পাল্টা সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অজুহাতে বিক্ষুব্ধ লেখক অধ্যাপকদের অনেককে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছিল। দেখা গেল, এ নিয়েও দলাদলি যথেষ্ট ছিল এবং সম্মেলনের আয়োজন ও উদ্দেশ্য নিয়েই ছিল মতবিরোধ।

হিন্দীভাষার গুণপনা নিয়ে মতান্তর প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হিন্দী এবং তারই রকমফের খাড়িবোলি, মৈথিলী, ভোজপুরী, রাজস্থানী ইত্যাদি ভাষা প্রচলিত এবং সহজবোধ্য। উর্দু এবং হিন্দীর মধ্যেও সাদৃশ্য অনেক। সহজ হিন্দুস্তানীকে ভারতের লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা করার কথা বলেছিলেন গান্ধীজী। স্বাধীনতার পর অবশ্য গোঁড়া হিন্দীবাদীরা উর্দু জবান সম্পূর্ণ বর্জন করে শুদ্ধ হিন্দীর প্রচলন করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। হিন্দীকে প্রাধান্য দিয়ে অপরাপর সকল ভারতীয় ভাষাকে অবহেলা ও অবজ্ঞার চোখে দেখার একটা চেষ্টা এই অত্যুৎসাহী হিন্দীপ্রেমিকদের আছে। তার ফলে গত ২৮ বছরে হিন্দীর জন্য সরকারী কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হলেও অহিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দীর প্রসার হয়েছে সামান্যই। তবে হিন্দী লেখক ও হিন্দী সেবা সংস্থাসমূহ এতে লাভবান হয়েছে। সরকারী দাক্ষিণ্যের অপচয়ও কম হয় নি। কিন্তু ভারতের ভাষাগত সংহতি রয়ে গেছে দূরে মরীচিকার মতো। বরং ভাষা বিরোধ বেড়েছে। সম্মেলনে একজন বিদেশী হিন্দী বিশেষজ্ঞ কিন্তু এ কথাটাই উদ্যোক্তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সবিনয়ে। হিন্দীর বিশ্বযাত্রার আগে নিজের দেশে তার স্বীকৃতি নিশ্চিত ও সহজ হওয়া উচিত। বহুভাষী সোভিয়েট ইউনিয়নে রুশ ভাষার প্রাধান্য ও প্রচলন প্রশ্নাতীত। রুশ সাহিত্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে গণনীয়। শুধু সরকারী ফতোয়ায় সে-ভাষা সারা সোভিয়েট দেশে গ্রহণযোগ্য হয় নি। ভারতবর্ষে অবশ্যই একটা লিংক ল্যাংগুয়েজ আমাদের চাই। সে ভাষা কী হবে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন উক্ত সম্মেলনের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। জোর করে কোনো ভাষা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। দক্ষিণে তো এ নিয়ে দক্ষযজ্ঞ হবার আশংকা। সুতরাং তিন ভাষার সূত্র আপাতত গ্রাহ্য, সুন্দর এবং শ্রেয়। সবার আগে মাতৃভাষা। পড়াশোনা কাজকর্ম সবেতেই মাতৃভাষাকে দিতে হবে অগ্রাধিকার। তারপরে আসবে রাজ্যে রাজ্যে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ইংরেজি এবং তার পরে হিন্দী। সুতরাং হিন্দীকে জবরদস্তি ছেড়ে স্বাভাবিক সত্যে করতে হবে আত্মপ্রতিষ্ঠা। ভাষাগত জবরদস্তিকে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা নামেই চিহ্নিত করা যায়। ভারতবর্ষে সরকারী দুধের সর ননী অর্থাৎ ভাল ভাল চাকরিতে ঢোকার জন্য হিন্দীতে পরীক্ষা গ্রহণ যদি চালু করা হয় এবং ইংরেজি থাকে তার বিকল্প তাহলে তো হিন্দীভাষীরা অনেকটা এগিয়েই থাকবেন। তাতে অহিন্দীভাষীদের মনে দানা বেঁধে উঠবে বিক্ষোভ। তামিলনাড়ু তো স্পষ্টই বলে দিয়েছে ইংরেজি হঠিয়ে হিন্দী চাপাতে চাইলে তারা তা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। এ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য ভাষার মধ্যেও পারস্পরিক বিরোধ রয়েছে। মারাঠী-মাড়োয়াড়ী, বাংলা-অসমীয়া কিংবা উর্দু-হিন্দী প্রভৃতি ভাষার বিরোধ মাঝে মাঝেই দেখা দেয়। এমন কি একই তেলুগুভাষাভাষীদের মধ্যেও কী প্রচণ্ড বিরোধ ঘটে গেল অন্ধ্র-তেলেঙ্গানার প্রশ্নে।

অথচ অবনীশ খারাপ ছিল না

আশাপূর্ণা দেবী

বইখানা অবনীশের হাতে তুলে দিয়ে ডকটর বাগচী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কুন্ঠিত হাসি হেসে বললেন 'বইটাতে আমার কিছু কিছু 'নোটস' আছে তোমার কাজের সুবিধে হতে পারে। কিন্তু—আরো কুন্ঠিত হাসি হেসে কথা শেষ করলেন একটু ইয়ে করে রেখো। মানে—'

বেশী কথা বলার মানুষ নন জোর দিয়েও কিছু বলতে পারেন না 'সাবধানে রেখো' বলার বদলে বললেন 'ইয়ে করে রেখো' আর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতেই কথা অসমাপ্ত রেখে থেমে গেলেন।

বইটা হাতে নিয়ে অবনীশ কয়েক মুহূর্ত অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বইটা ডকটর বাগচী নিজে থেকে অবনীশকে ব্যবহার করতে দিলেন!

এই দেওয়ার মধ্যেই অবনীশের প্রতি ডকটর বাগচীর যে গভীর স্নেহের পরিচয় প্রকাশ পেলো তা অভিভূত করে দেবার মতই।

অবশ্য কথাটা শুনলে অতিশয্য মনে হতে পারে। অধ্যাপক তাঁর নিজেরই অধীনে গবেষণারত ছাত্রকে নিজের একটা বই সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে দিচ্ছেন এ আর এমন কি আশ্চর্য্য?

কিন্তু ডকটর চন্দ্রনাথ বাগচীকে যারা জানে তারাই বুঝতে পারবে অবনীশের অভিভূত হওয়ার কারণ আছে কিনা।

অকৃতদার ডকটর বাগচী তাঁর এই দীর্ঘ জীবনের সমস্ত উপার্জনের প্রায় সাড়ে তিন ভাগ অংশই কেবলমাত্র গ্রন্থ সংগ্রহেই ব্যয় করেছেন এবং বলতে গেলে বিরাট একটা লাইব্রেরীই গড়ে তুলেছেন তবু তার প্রতিটি গ্রন্থই ডকটর বাগচির কাছে পুত্রতুল্য।

আবার তার মধ্যেও প্রাণতুল্য যে কখানি বই সর্বদা ওঁর হাতের কাছেই থাকে এই প্লেটোর ডায়ালগস খানা তাদের মধ্যে অন্যতম।

ডকটর বাগচীর পরম নেশা যত দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য ক্লাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ। এর জন্য তিনি শুধু অর্থই নয় কত শ্রম কত সময় ব্যয় করেছেন কত ক্লেশ স্বীকার করেছেন সে ইতিহাস শোনবার মত।

সংগ্রহশালার পরিধি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিধিকে সংকুচিত করতে হয়েছে অতএব এখন এই দাঁড়িয়েছে— প্রাসাদোপম পৈতৃক ভিটের একমাত্র উত্তরাধিকারী চন্দ্রনাথ বাগচী আশ্রয় নিয়েছেন সিঁড়ির পাশের একটি সরু ঘরে।

এটা দোতলায় এই ঘরটির নীচে এক তলার ঘরটি আছে চন্দ্রনাথের সখের

নীলমণি জগন্নাথের দখলে। জগন্নাথই চন্দ্রনাথের একাধারে স্ত্রী পুত্র ভৃত্য মিত্র সব।

জগন্নাথের পরম গুণ সে তার বাবুর এই বইগুলোকে 'জঞ্জাল' মনে করে না অথবা শিশিবোতলওলার থলিতে নিক্ষেপ করাই সঙ্গত মনে করে না। বাবু আর বাবুর বই তার কাছে তুল্যমূল্য। বাবুর গ্রন্থশালাকে সে বাঘের মত আগলায় এবং তার জন্য ভূতের মত খাটে।

কদাচ কখনো কেউ একখানা বই (চন্দ্রনাথের হুকুমের উপর জুলুম করে) চেয়ে নিয়ে গেলে জগন্নাথের জেরার মুখে পড়া তার অবধারিত।

অবনীশের ঠিক এই মুহূর্তে সে কথাও মনে পড়ে না।

অবনীশ কৃতার্থমন্য গলায় বললো 'বইটা দিচ্ছেন আপনার যদি হঠাৎ—'

ডকটর বাগচী হাত নেড়ে কুণ্ঠিত হাসির সঙ্গে বললেন 'না না সে কিছু না। আমার এখন ততটা—'

একটু থামলেন বললেন 'নোটগুলো তোমার কাজে লাগবে ভেবেই—থীসিসটা এবার তাড়াতাড়ি শেষ কর—অবনীশ!'

ছাত্রদের একটু অধিক পরিমাণেই খাটিয়ে নেন ডকটর বাগচী। বিশেষ করে গবেষণার ছাত্রদের। ফাঁকি দিয়ে গোঁজামিল দিয়ে যেন-তেন করে ডিগ্রীটা আহরণ করে ফেলা। এটা চন্দ্রনাথ ভাবতেই পারেন না।

অবনীশ লজ্জা বোধ করে বইটা হাতে পাওয়া মাত্রই নিয়ে চলে যেতে পারে না। অবনীশ তাই টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আস্তে পাতা ওল্টাতে থাকে তার।

বাস্তবিকই পরম মূল্যবান গ্রন্থ।

পাতে পাতে ছত্রে ছত্রে ডকটর বাগচীর হাতের ক্ষুদে ক্ষুদে অথচ পরিষ্কার অক্ষরের 'নোটস'।

অবনীশ ভাবলো বইটা পাওয়া তো একটা মস্ত পাওয়া তার থেকেও পরম পাওয়া হচ্ছে ডকটর বাগচীর স্নেহের সুজনটি পেয়ে যাওয়া। আরো ছাত্র আছে ডকটর বাগচীর প্রিয় ছাত্রই আছে কিন্তু ডকটর বাগচী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাউকে তাঁর প্রাণতুল্য একখানা বই হাতে তুলে দিচ্ছেন এ তো দেখেছে বলে মনে পড়ে না। স্যারের বাড়িতে এসে যতক্ষণ ইচ্ছে বসে থেকে পড়ো পড়ে নোট করে নাও বুঝতে অসুবিধে হলে স্যারের কাছে বুঝে নাও কিন্তু বই নিয়ে চলে যাওয়া? ওইটি চলবে না।

'ভাল স্যার।' অবনীশ বললো বইটা দু' হাতে নিয়ে 'যতো শিগগির পারি ফেরৎ দেবো।'

বাগচী চমকে উঠলেন ব্যাকুল হয়ে বললেন 'না না তাড়া কিছু নেই তাড়া কিছু নেই। শুধু এদিক ওদিক না হয় একটু সতর্ক থাকো। মানে দরকারি তো—অন্য কাউকে যেন—'

'না না সে কী বলছেন? আর কাউকে? অসম্ভব।

অবনীশ চলে এলো।

কিন্তু অবনীশ সতর্ক হতে পারলো না।

অবনীশ মোহের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসলো।

ক'দিন পরেই রুবি এলো আর এসেই অবনীশের টেবিলে বইটা দেখে চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে নিলো। খুব কড়া গলা করে বললো 'বাঃ বাঃ। ডকটর বাগচীর কাছ থেকে এটিকে বাগিয়েছো। তুমি? খুব চালাক ছেলে তো? জানো আমি একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে খাঁ করে চেয়েই বসেছিলাম বইটা ওনার কাছে। বাগাতে পারি নি। সাধে বলি তুমি হচ্ছো একটি তুমি হচ্ছো একটি—আচ্ছা থাক আজ আর বললাম না। বইটা নিয়ে কেটে পড়ছি—'

অবনীশ প্রমাদ গনে।

দারুণ অস্বস্তির গলায় বলে 'এই এই প্লীজ। আমি স্যারের কাছে বাক্যদত্ত আছি অন্য কাউকে দেব না।'

রুবি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দুই চোখে বিদ্যুৎ হেনে বলে 'কী বললে? অন্য কাউকে?'

'আঃ বাবা। দোষ হয়েছে কথাটা—কী বলে—প্রত্যা-প্রত্যাহার করে নিচ্ছি কিন্তু বইটা নিও না সত্যি।'

রুবি এবার চোখে মদির কটাক্ষ হেনে বলে 'কেন? বইয়ের মধ্যে কারো প্রেম পত্রটত্র গোঁজা আছে বুঝি?'

অবনীশ বললো 'আহা হা! ধরে ফেললে। আছেই তো।'

রুবি নিজের টাকার ব্যাগের মধ্যে বইটা ইতিমধ্যে পুরে ফেলেছে।

অবনীশ তবু বললো 'আচ্ছা অমন নিষ্ঠুরতা কোরো না। আমি একটু দেখে নিই তারপরে না হয় তুমি স্যারের কাছ থেকে—'

'চমৎকার! কানে বাদুড়ের মত চাকরি চেপে আছে বুঝি? বললাম না, চেয়েছিলাম বাগাতে পারিনি। বলেছিলেন 'এসব বই আমি বাড়ির ছাড়া করি না, বুঝলে? হাতে না, এখানে যতক্ষণ ইচ্ছে থেকে পড়ো। উনিশ বরং একটু চেষ্টা করে দেখো।'

রুবি লাফের মতো টেবিলে ঠুকরে ঠুকরে বলে, 'বাকো আবার! যেন মেয়েদের পক্ষে যতক্ষণ ইচ্ছে থাকা যায়। যেন যতক্ষণ ইচ্ছে বাইরে থাকা মেয়েদের পক্ষে একেবারে জলের মতন সোজা। বইটার জন্যে তো এই নয় 'পেলেটোর ডায়ালগস' আমি ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকেও নিতে পারি, ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকেও দেখে নিতে পারি, স্যারের নোটসগুলোই যে দুর্লভ। দেখছো তো ইহসংসারে মেয়ে আর ছেলেদের মধ্যে দামের তারতম্য। তুমি আমি দুজনেই ওঁর আন্ডারে রিসার্চ করছি, বইটা দুজনেরই কাজে লাগবে, অথচ আমি চেয়ে পেলাম না, আর তোমায় সেধে দিলেন—'

অবনীশ মৃদু হেসে বলে, 'ওই তারতম্যটা মেয়ে বা ছেলে বলে নয়।'

'তবে কী শুনি?'

'আমি ও'র সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র বলে!'

দুষ্টুমীর ছলে হলেও বেশ একটু গৌরবের হাসিই হাসলো অবনীশ।

কিন্তু রুবি কি হারবার মেয়ে? রুবিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'সব থেকে প্রিয় বলে? তাহলে তো হয়েই গেল। তোমার কাছ থেকে তাহলে এখন এটা আমারই প্রাপ্য।'

'ইস! তাই নাকি? নিজেই নিজের ঢাক পেটাচ্ছো।'

'উপায় কি। এ-যুগের ওই নীতি।'

অবনীশ তবু বললো, 'একেবারে আজই না নিলে হয় না? আমি আর একটু দেখে নিতাম।'

'আমিই না হয় আগে দেখে নিলাম।'

'এই, খুব সাবধানে রেখো কিন্তু। জানোই তো ডকটর বাগচীর—'

'থাক, তোমার আর আমাকে জ্ঞান দিতে আসতে হবে না। আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে।'

অবনীশ তার সহপাঠিনী-প্রণয়িনীকে আর বেশী কিছু বলতে সাহস করলো না। যা মেজাজ মেয়ের, হয়তো আর বেশী কিছু বলতে গেলে বইটা ছুঁড়ে মেরে দিয়ে চলে যাবে।

হ্যাঁ, ওই ভয়ই শুধু করলো অবনীশ।

কারণ, মেজাজী মেয়েরা আর কী করতে পারে না পারে জানা ছিল না অবনীশের।

পরে জানলো।

কিন্তু ক'দিনই বা পরে?

বড়জোর দিন পনেরো।

হ্যাঁ তাই হবে।

তিন-চারদিন আসেনি রুবি তারপর আর ওপর দিন আটেক-দশ অবনীশ ওদের বাড়ি গিয়ে রুবির দেখা পায়নি। রুবির দাদার সঙ্গে দেখা হলে, দাদা ভুরু কুঁচকে বলেছে 'কোথায় গেছে কি করে বলবো? কখন কোথায় যায় না যায়, আমায় বলে যায়?'

আর রুবির বাবার সঙ্গে দেখা হলে তিনি ভুরু ঝাঁকিয়ে বলেন, 'কোথায় যাচ্ছে, দু'দিন পরেই জানতে পারবে।'

তা জানতে পারলো।

জানতে পারলো রুবি আকস্মিক এক মোহের শিকার হয়ে পড়ে এক অবাঙালী রাজ-পরিবারের ছেলেকে বিয়ে করছে। বিয়ের পরই আমেরিকায় চলে যাবে।

রিসার্চ?

চুলোয় যাক।

আশ্চর্য। এতো বড়ো একটা দুঃসংবাদ শোনার মুহূর্তে অবনীশের যা মনে হলো তা হচ্ছে ডকটর বাগচীর বইটা উদ্ধার করতে হবে।

এক পরিচিত ছেলের হাতে একটা স্লিপ লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিল। 'রুবি পত্রবাহকের হাতে ডকটর বাগচীর বইখানা দিয়ে দিও। আশা করি বইটার কথাও ভুলে যাওনি।'

শ্লেষবাক্য।

কিন্তু এই শ্লেষবাক্যে কিছু হল না।

রুবি সে-বই ফেরৎ দিতে পারলো না। রুবি সেই ছেলেটার হাতেই লিখে পাঠালো 'এখন তাড়াতাড়িতে খুঁজে পাচ্ছি না, পরে খুঁজে পাঠিয়ে দেবো।'

অথচ সেই 'পর'টা আর এলো না।

রুবি বিয়ের ব্যাপারে উন্মত্ত হয়ে মার্কেটিং করে বেড়ানো ভাবী বরের সঙ্গে দামী গাড়ি চড়ে-চড়ে, তারপর বিয়ে হয়ে চলে গেলো সাত-সমুদ্দুরে পারে।

কিন্তু এই ভয়ংকর দুঃসময়েও অবনীশ সেই বইটার জন্যেই অস্থির হয়েছে। সেই অবধি ডকটর বাগচীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারছে না সে, অথচ না গেলেও নয়। থীসিসটা দেখাতে যাওয়া দরকার।

অতএব একটা গল্প বানিয়ে ফেলতে হলো অবনীশকে। কারণ, এছাড়া আর গতি ছিল না।

অবনীশকে বলতেই হলো, 'আপনার বইটা সেই অবধি আমার কাছে রয়ে গেছে সার, খুবই কাজে দিয়েছে, কিন্তু আজ যা একখানা কান্ড করলাম। 'আনবো' বলে নিয়ে টেবিলে রেখে ঠিক আসার সময়ই ভুলে গেলাম।'

বলেই অবনীশ অন্য দিকে তাকালো।

অবনীশ ওই মুখটা ঠিক এই মুহূর্তে দেখতে পারবে না।

অবনীশ তাই শুধু একটা আতংকিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো, 'বাসে হারিয়ে যায়নি তো অবনীশ?'

অবনীশকে বরাভয়ের স্বরে বলতে হলো 'না না! সে-ভয় নেই। বাড়িতেই টেবিলে পড়ে আছে। একেবারে কোণের দিকে —ইস এমন ভুলে গেলাম!'

ডকটর বাগচীর বাড়ি বালিগঞ্জে, অবনীশের বেলেঘাটায়। অথচ ওই ভুলটার সংশোধন আর সম্ভব হলো না। কোনো-দিনই না।

অথচ আবারও যেতে হবে।

কাজটার জন্যেই আবার যাওয়া দরকার।

জীবনের একটা ছক তো ভেস্তে গেছে, আর একটাও কি যাবে?

থীসিস সাবমিট করার আগে একদা একদিনের কড়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বহু-কাল পরে আবার রুবিদের বাড়িতে এসে হাজির হলো অবনীশ।

ভয়ংকর একটা দুঃখের, গ্লানির, আর অপমানের ক্ষণের প্রতিজ্ঞা যেন আজকের দুঃখের আর গ্লানির কাছে ছোট হয়ে গেল।

রুবির দাদা অনুপম আগে অবনীশকে সসম্মানে বসাতো, আজ আর বসালো না, শুধু বললো, 'কী ব্যাপার হে?'

অবনীশ বিনা ভূমিকায় বললো, 'রুবি আমার কাছ থেকে ডকটর বাগচীর একটা বই এনেছিল, সেটা খুঁজে ফেরৎ দিয়ে যেতে পারেনি, বইটার জন্যে আমি ওঁর কাছে লজ্জায় পড়ে রয়েছি, একটু খুঁজে দেখুন।'

অনুপম আকাশ থেকে পড়লো।

বললো, 'সেই তামাদি ব্যাপার নিয়ে এখন এসেছো তুমি? রুবি কোথায় কি রেখে গেছে, ফেলে গেছে, আমি জানি?'

অবনীশ নরম গলায় বললো 'জানেন তা তো বলছি না। কাইন্ডলি যদি একটু খুঁজে দেখেন।'

অনুপম রেগে উঠে বললো 'আমি কোথা থেকে খুঁজতে যাবো, কত কীই তো নিয়ে গেছে সে।'

এখন অবনীশ রেগে উঠলো।

উত্তেজিত গলায় বললো, 'রুবি তার বইয়ের র‍্যাকট্যাক সমেত গোটা পড়ার ঘরটাই নিয়ে চলে গেছে এটা তো বিশ্বাস করা সম্ভব নয়, দেখুন না একটু খুঁজে। ডিটেকটিভ নভেল নয় যে তার বান্ধবীরা পড়তে নিয়ে গেছে।'

এখন অনুপম জিগ্যেস করলো, 'বইটা কী?' এবং নাম শুনে মাথা নেড়ে বললো, 'না, এ-বই কেউ নিয়ে গেছে, এমন মনে হয় না। আমার দ্বারা খোঁজা অসম্ভব। তুমি নিজে চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

বহুদিন পরে রুবির পড়ার ঘরে এসে ঢুকলো অবনীশ।

আর এতোদিনে যেটা এমন করে অনুভব করেনি সেটা অনুভব করলো। বুকটা ভয়ানক খালি খালি ঠেকলো। তবুও বসে না থেকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজতেই লাগলো বইটা। ...যদিও অনেক পরিবর্তন হয়েছে ঘরটার। এখন যে এটা অনুপমের ছেলের পড়ার 'ঘর হয়েছে তা বোঝা গেল টেবিলে 'নিজে পড়ো', 'কথা শেখো', 'ছড়া ছবি', 'ছবি ও ছড়া'র ছড়াছড়িতে।

তা সত্ত্বেও খুঁজলো অবনীশ।

মায় খাটের তলায় ঠেলে-রাখা বাসি খবরের কাগজের বস্তাটা পর্যন্ত উলটে।

নাঃ, পাওয়া গেলো না।

বইটা হারিয়ে গেলো।

হয়তো চাকর-বাকর পুরনো কাগজের সঙ্গে বেচে দিয়েছে।

অবনীশ উদভ্রান্তের মতো পুরনো বইয়ের স্টলে স্টলে, কলেজ স্ট্রীটের রেলিং-এর ধারে, গড়িয়াহাটের ফুটপাথে-ফুটপাথে চোখ ফেলে ঘুরে বেড়ায়, যদি পাওয়া যায়।

অভিমান ব্যর্থ হবার পর অবনীশ ঠিক করলো একখানা নতুন বই-ই কিনে দেবে। যা থাকে কপালে। নিয়ে তো যাবে, তারপর একটা কোনো গল্প বানিয়ে—'

হ্যাঁ, চক্ষুলজ্জার পরম মুহূর্তে বানানো গল্পই তো ত্রাণকর্তা।'

কিন্তু কিনে দেবো বললেই কি দেওয়া যায়? এ তো আর বাংলা গল্প-উপন্যাসের মতো দোকানে গিয়েই কিনে ফেলা সম্ভব হয় না।

[illegible] এক [illegible] অবনীশকে আশ্বাস দিয়ে রেখেছে, আনিয়ে দেবে বইটা।

[illegible] দেবে।

কিন্তু শুধু কি দিলেই হবে?

সে তো শুধু একটা ঝকঝকে বই মাত্র।

ছাপা ঝকঝকে অক্ষরে লেখা, অমূল্য নেই [illegible]।

শুধু বছরের সেই আশ্বাসদাতার [illegible] মন দিলো অবনীশ আর [illegible] নিয়ে ফিরে এলো।

ঠিক এই সময়ই ওই বইটা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে।

অথচ এদিকে দিন সন্নিকট।

অবশেষে আবার গল্প বানালো। অথবা এবার আর গল্প নয়, নাটক। কারণ, একটা বড় [illegible] প্রয়োজন, যাতে অতীতের কথা তৎমুহূর্তে আর উঁকি মারবার সুযোগ না পায়।

ডকটর বাগচী মিষ্টি আদৌ খান না জেনেও প্রকাণ্ড একটা সন্দেশের বাকস হাতে নিয়ে স্যারের বাড়ি এসে হাজির হলো অবনীশ।

নতশির ভঙ্গীতে প্রণাম করে স্যারের পায়ের কাছে রাখলো বাকসটা।

ডকটর বাগচী তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'এ কী! এসব কেন? তুমি তো জানো আমি—'

'মিষ্টি খাই না—'

এ কথাটা অবশ্য উচ্চারিত হল না, তবু অবনীশের বুঝতে দেরী হয় না। অবনীশকে আর আবার গল্প বানাতে হয়। [illegible] 'আমি জানি মিষ্টি খান না, তবু মা বললেন, আজ তোর [illegible] মিষ্টি হাতে নিয়ে [illegible] প্রণাম করবো।'

[illegible] অবনীশ ভাবলো [illegible] চাদর চাপা দিয়ে [illegible] প্রসঙ্গটা ঢেকে ফেলা গেল।

[illegible] অবনীশের যে মিথ্যে পাপ [illegible] কথাই বানাতে হয় [illegible]। অবনীশ এখন ছাত্র [illegible] না।

[illegible] বাগচী হয়তো অবনীশের [illegible] খুশী হলেন [illegible] করছে [illegible] কিন্তু ডকটর বাগচীর মুখটা মলিন-মলিন [illegible]।

অবনীশ অবশ্য [illegible] পারে না। অবনীশ [illegible] পরামর্শ চাইবে, [illegible] যে ডকটর বাগচীর [illegible] জানাবে এবং কথা বলতে বলতেই [illegible] যাবে।

তবু [illegible] ডকটর বাগচী বললেন, 'তোমার আনা সন্দেশ, [illegible] তুমিই খাও একটা। জগন্নাথ এক গেলাস জল আনো তো।'

অবনীশ সন্দেশ [illegible], জল খেলো, [illegible] ডকটর বাগচীর মুখের দিকে না [illegible] কালো ওঁর সমস্ত শিরায়, শিরাগুলো পর্যন্তও যেন কী একটা 'বলি বলি' করছে।

কিন্তু অবনীশ তো বলতে দিতে পারে না। অবনীশ তাই জল খেয়েই আর একটা প্রণাম করে কেটে পড়লো।

অবনীশ অনুভব করলো একখানা মলিন বেদনার্ত মুখ অবনীশের পিছু পিছু এগিয়ে আসছে।

সব রংই ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসে, তীব্র ব্যাকুলতা স্তিমিত হয়ে যায়, নিজেকে সরিয়ে আনতে আনতে অতীত আরো দূরবর্তী হয়।

অবনীশ উচ্চপ্রশংসাধন্য ডিগ্রী লাভ করে।

অবনীশ একটা নামী কলেজে অধ্যাপনার কাজ পায়, কাজে কর্মে ডুবে যায়, আস্তে আস্তে তারও এক ছাত্রদল গড়ে ওঠে। 'স্যারের পড়ানোর ভঙ্গীতে তারা মুগ্ধ।

অকারণেই তো অবনীশ ডকটর বাগচীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছাত্র ছিল না!

কিন্তু অবনীশের আর গুরুগৃহে যাওয়া হয় নি। অবনীশ যেন ওই রাস্তাটা ভুলে গেছে। অবনীশ যেখানে ডকটর বাগচীর আসার সম্ভাবনা থাকতে পারে তেমন তেমন জায়গায় যাওয়াটা ছুতো করে এড়ায়।

আর বাগচীরও তো ক্রমশঃ বয়েস হয়ে আসছে, গতিবিধি ক্রমশঃই সীমিত হয়ে আসছে।

বুকের মধ্যে যে একখানা পাথর বসানো ছিলো, সেটা যেন আর সব সময় অনুভূত হচ্ছে না।

তবু হঠাৎ বিনামেঘে বাজ পড়লো।

অবনীশের এক ছাত্রের পাড়ায় ছাত্রের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাদের 'সবুজ সংঘে'র বার্ষিক অধিবেশনে প্রধান অতিথি হয়ে গিয়ে দেখলো অবনীশ মঞ্চে ডকটর বাগচী!

অপ্রত্যাশিত!

একেই তো উনি কোনোদিনই এসবে যেতে চান না। বলেন 'আয়ুতো গোনা দিনের ওই সব করতে হলেই তার থেকে একটা দিন কম যাওয়া। বড় লোকসান মনে হয়। জীবনে কতটুকুই বা কী করতে পেলাম কত বই এখনো পড়তে বাকি অথচ।—

অথচ আজ ডকটর বাগচী একটা 'নিতান্ত বাজে' (খেলাঘরের বললেই হয়) সভাতে এসেছেন।

পাশাপাশি আসন, কথা না কয়ে উপায় নেই। অতএব অবনীশকে বেশীরকম সপ্রতিভ হতে হয়।

অবনীশকে বলে উঠতে হয়, 'আপনাকে ধরে এনেছে এরা? ব্যাপার কি স্যার? বাহাদুরী আছে এদের বলতেই হয়।'

ডকটর বাগচীর চোখ বোধহয় আরো খারাপ হয়ে গেছে, তাই তিনি ঝাপসা ঝাপসা গলায় বলেন, 'কে অবনীশ? ওঃ! ধরে আনা মানে—ইয়ে এঁদের একজন আমার নাতি! মানে ভাগ্নীর ছেলে—গিয়ে বললো। কার্ডে নাম দিতে বারণ করেছিলাম, যদি না পারি, মানে বয়েস হয়েছে তো—

এরপর আর কথা হলো না সভাপতি আর প্রধান অতিথিকে মাল্যদান পর্ব এসে গেল, তারপর ভাষণ পর্ব।

অবশেষে সে পর্বও মিটলো। মঞ্চ থেকে নেমে এলেন গুরু শিষ্য দুজনেই।

ডকটর বাগচী আর বসতে পাচ্ছেন না, শরীর খারাপ। গাড়ি মজুতই ছিল, অবনীশ একটু পিছিয়ে পড়লে কিছুই হতো না, কিন্তু উদ্যোক্তারা অবনীশকেই প্রায় ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে দিলো গাড়িতে উঠিয়ে দেওয়ার সৌজন্যকর্মে।

আর সেই সময়ই বাজটা পড়লো।

পড়লো অবশ্য খুবই মৃদু ভঙ্গীতে, প্রায় নিঃশব্দে! বাতাসে পাতা নড়ার মত মৃদু স্বরের সেই বাজটা অবনীশের কানে এসে আছড়ে পড়লো, 'আচ্ছা অবনীশ, সেই বইটা বোধহয় হারিয়েই গেছে, তাই না?'

পুরো আস্ত একটা কথা বললেন ডক্টর বাগচী। কথাটা কি উনি মুখস্থ করে রেখেছিলেন? অনেক অনেক দিন ধরে?

মৃদু হলেও বাজটা বাজের কাজই করলো।

যে পাথরখানা বুকের মাঝখান থেকে গড়িয়ে পাশে পড়ে গিয়েছিল সেটা আবার ঠেলে একেবারে হৃৎপিণ্ডের ওপর চেপে বসলো, আর সেই চাপে নিঃশ্বাস আটকে যাওয়া অবনীশ একটা নামকরা কলেজের লেকচারার ডকটর অবনীশ ঘোষ বলে বসলো। 'সে কি স্যার! বইটা তো আমি আপনার বাড়িতে দিয়ে এসেছিলাম। অনেক দিনই অবশ্য পড়ে ছিল, মানে আপনার নোট্‌সগুলো দারুণ তো...ইয়ে—।'

বলতে হলো!

দর্শনশাস্ত্রে গবেষণা করে ডিগ্রীপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিত অবনীশকে তার গুরুর সামনে এই নির্জলা মিথ্যা কথাটা বলতেই হলো। কারণ ভয়ানক একটা লজ্জা অবনীশের সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে বসেছে।

ডকটর বাগচী ওর শেষের কথাগুলো শুনতে পেলেন বলে মনে হলো না, তিনি অদ্ভুত অসহায় একটা বিহ্বল দৃষ্টি মেলে বললেন, 'দিয়ে এসেছিলে?'

অবনীশ জোর দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ স্যার! আপনি তখন বাড়ি ছিলেন না। জগন্নাথের হাতে দিয়ে এসেছিলাম।'

ডকটর বাগচী আরো আচ্ছন্ন গলায় বললেন, 'দিয়ে এসেছিলে! জগন্নাথের হাতে!'

অবনীশ তার বক্তব্যে আরো বাস্তবতা আরোপ করলো। আরো জোর দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ স্যার! একটা ব্রাউন পেপারে মুড়ে, একটা সবুজ মত দড়ি দিয়ে বেঁধে—আপনি দিয়ে জিগ্যেস করবেন ওকে। হয়তো আপনাকে বলতে ভুলে গেছে। তুলে রেখেছে কোথাও।'

ডকটর বাগচীর বুকেও কি একটা পাথর আটকেছে, তাই তাঁরও নিশ্বাস ফেলতে

কষ্ট হচ্ছে? তাই সেই দমবন্ধ গলাতেই প্রশ্ন করছেন, 'গিয়ে জিগ্যেস করবো? জগন্নাথকে? কতদিন আগে দিয়ে এসেছিলে?

'কতদিন আগে? তা প্রায়—'

অবনীশ অনুমানকে বিস্তৃত করবার ভান করে, অতঃপর সঠিক হয়, মাসতিনেক আগে। হ্যাঁ তিন মাসই হবে আমাদের সেদিন জেনারেল মিটিং ছিল।

ডকটর বাগচী চোখ থেকে তার সেই অস্বাভাবিক পুরু কাচের চশমাটা খোলেন, রুমাল দিয়ে মোছেন, আবার চোখে লাগান, তারপর সেই পরিষ্কার কাঁচের মধ্যে থেকে পরিস্কার চোখে তাকিয়ে বলেন, 'সাত মাস হলো জগন্নাথ মারা গেছে অবনীশ!' তারপর আস্তে গাড়িতে গিয়ে ওঠেন।

গাড়িটা চলে যায়, অবনীশ দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ অবনীশ নামের ওই হতভাগ্য জীবটার বুকের মধ্যে ওই পরিষ্কার কাঁচের ওপার থেকে চাওয়া পরিষ্কার দৃষ্টিটা একেবারে পেরেকের মত পোঁতা আছে।

হয়তো চিরদিনই থাকবে, কারণ কবে যেন রেডিওর সেই খবরটা শোনার পরও যখন রয়েই গেল। বরং যেন পেরেকটা গভীরে পুঁতে যেতে লাগলো কোনো একটা জায়গা কেটে কেটে—যখন আকাশবাণীর ঘোষকের গলা আকাশ বাতাস উচ্চকিত করছে, 'গতকাল রাত্রি তিনটার সময় বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ডকটর চন্দ্রনাথ বাগচী হৃদরোগে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হয়েছিলো আটাত্তর বছর, তিনি—'

এই বাংলার খবর

বন্দর ধর্মঘট

দেশের আর সব বন্দরের মতো কলকাতাও ১৬ জানুয়ারী থেকে চার দিন অচল হয়ে ছিল। আর সব বন্দরের মতো কলকাতারও অধিকাংশ বন্দর ও ডক শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯ তারিখ প্রায় মাঝরাতে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে শ্রমিক প্রতিনিধিদের মীমাংসার ফলে চার দিনের মধ্যেই মিটে গেল এই ধর্মঘট। কলকাতা পোর্ট কমিশনার্সের চেয়ারম্যান শ্রীপি সি মিত্র জানান যে, দু-একটি ছাড়া সব কটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা এই ধর্মঘটে সমর্থন জানিয়েছিল। যে-সব সংস্থা ধর্মঘট সমর্থন করেনি তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো কর্মী কাজে যোগ দিতে এলে তাদের বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে মোটের ওপর এই ধর্মঘট শান্তিপূর্ণই ছিল। কোনো বড় রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

ধর্মঘট শুরু হওয়ার পরই পোর্ট কমিশনার্স আর রাজ্য সরকারের সবচেয়ে বড় ভাবনা হয়ে দাঁড়ায় কী করে আটকে-থাকা জাহাজ থেকে মাল খালাস করা যায়, বিশেষত যে-সব জাহাজে এসেছে খাদ্যশস্য, সার আর অশোধিত তেল। ধর্মঘট যখন শুরু হয় তখন নেতাজী সুভাষ আর খিদিরপুর ডকে ছিল ৪১টি বাণিজ্য জাহাজ। তার মধ্যে ছ'টিতে ছিল খাদ্যশস্য আর দু'টিতে সার। তাছাড়া সাগর দ্বীপ আর স্যান্ডহেডসেও ছিল কয়েকটি। ধর্মঘটের তৃতীয় দিনে সাগর দ্বীপে খাদ্যশস্যবাহী জাহাজের সংখ্যা দাঁড়ায় সাত। ঐ সব জাহাজে এসেছে ৪২ হাজার টন খাদ্যশস্য। আর ডকে যে-সব জাহাজ আটকে ছিল তাতে এসেছে ১৬ হাজার টন খাদ্যশস্য। বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজ্য সরকারের আলোচনার পর ঠিক হয়, জাহাজ খালাস করার কাজে আঞ্চলিক বাহিনীর সেনাদের কাজে লাগানো হবে। তৃতীয় দিনে এই সেনারা জাহাজ থেকে গম নামানোর কাজ শুরু করে দেন। তাছাড়া নৌ-বাহিনীর লোকেরাও বন্দর সচল করার কাজে হাত লাগান। চতুর্থ দিনে আসরে নামেন জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কর্মীরা।

চার দিনের এই ধর্মঘটের ফলে কলকাতা বন্দরে গুদাম ও জাহাজে যে-সব মাল আটকে পড়ে আছে তার দাম প্রায় ৯০ কোটি টাকা হবে বলে জানানো হয়েছে। পোর্ট কমিশনার্সের দৈনিক লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় দশ লাখ টাকা। তাছাড়া আটক প্রতিটি জাহাজের দৈনিক ক্ষতি হয় ২২ হাজার টাকা। বন্দরের ডক, সাগর দ্বীপ আর স্যান্ডহেডসে আটক জাহাজের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় ৬৯টি। অর্থাৎ তাদের দৈনিক ক্ষতির মোট পরিমাণ ১৪ লাখ টাকার বেশি।

বিরোধীদের আন্দোলন

এই বাংলার বিরোধী দলগুলো আবার নড়েচড়ে বসছে। ন'টি বামপন্থী দল কলকাতা ময়দানে সভা করে সক্রিয় ও ব্যাপকতর আন্দোলনে নামার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। যে-সব দাবির ভিত্তিতে এই আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বামপন্থী নেতারা বলেছেন তার মধ্যে কয়েকটি হলো : গ্রাম ও শহরের মানুষকে ন্যায্য দামে—রেশন দোকান থেকে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য যোগাতে হবে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাতে হবে ১৯৬৯ সালের দরে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যাতে না-বাড়ে তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে, বেকারদের কাজ এবং কাজ না-পাওয়া পর্যন্ত ভাতা দিতে হবে, দুর্নীতির অবসান ঘটাতে হবে। তার সঙ্গে রয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি।

এদিকে পৃথক এক আন্দোলনে নামছে এই রাজ্যের নবনির্মাণ সমিতি, আর পিছনে প্রধান অনুপ্রেরণা জয়প্রকাশ নারায়ণ। এই নবনির্মাণ সমিতি তৈরি হয়েছে সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ, সোস্যালিস্ট পার্টি, প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি, লোকদল, সর্বসেবা সঙ্ঘের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য নির্দল ব্যক্তিদের নিয়ে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন এই সমিতির সভাপতি। এই দু'টি আন্দোলন পৃথক ধারায় চলবে, তবে একটা যোগসূত্র তৈরি করার চেষ্টা চলছে। সেই উদ্দেশ্যেই সি পি এমের জ্যোতি বসু, আর এস পি'র মাখন পাল, ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ এবং সোস্যালিস্ট পার্টির বিমান মিত্র প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে দেখা করেন তাঁর বাড়িতে গিয়ে। তাঁদের এই আলোচনাকে রাজ্যের রাজনীতিতে একটা নতুন দিকচিহ্ন বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ অতীতে প্রফুল্লবাবু আর এইসব বামপন্থী নেতা ছিলেন বিপরীত শিবিরের লোক। তাঁদের দেখাও হলো অনেক দিন পরে। অবাধ নির্বাচন আর গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে সব বিরোধী দল মিলে আন্দোলনে নামার প্রস্তাব নিয়ে বামপন্থী নেতারা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের কাছে গিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে আরো আলাপ-আলোচনা হবে। তবে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি এই ধরনের যুক্ত আন্দোলন শুরু হতে পারে বলে প্রকাশ।

শিক্ষায় হেরফের

১৯৭৬ সাল থেকে এই বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় হেরফের হচ্ছে। ঐ বছরই নতুন দশ ক্লাসের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী প্রথম স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা হবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্থির হয়েছে ঐ বছর থেকেই চালু হবে দু বছরের নতুন উচ্চতর মাধ্যমিক পাঠ্যসূচী। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রি পাওয়ার আগে পড়তে হবে পনের বছর—দশ বছরে স্কুল ফাইনাল, দু বছরে উচ্চ মাধ্যমিক এবং আর তিন বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি। কেন্দ্রীয় শিক্ষা কমিশন গোটা দেশে এই ধরনের ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ করেন বেশ কয়েক বছর আগে।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার তদারকি ও পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরিষদের হাতে। এই পরিষদ গঠনের জন্যে অল্পদিনের মধ্যে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। এই দু বছরের পাঠ্যসূচী হবে মাধ্যমিক শিক্ষারই অঙ্গ। কলেজী শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে এর কোনো যোগ থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয় বা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক থাকবে না। যে-সব স্কুল বা কলেজ এই পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পঠন-পাঠনের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে সেখানেই এই পাঠ্যসূচী পড়াবার ব্যবস্থা হবে। তবে রাজ্যের শিক্ষকমহলে এই নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে। ঠিক কী ভাবে দু বছরের নতুন পাঠ্যসূচী পড়ানো হবে তা এখনও তাঁদের অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয়। তাছাড়া আসছে বছরের মধ্যে প্রস্তাবিত উচ্চ মাধ্যমিক পরিষদ গঠনের

যথেষ্ট সময় নেই বলেও অনেকের ধারণা। স্কুল এবং কলেজ, দু জায়গাতেই এই নতুন কোর্স পড়াবার ব্যবস্থা হলে কলেজেই ভিড় বেশি হতে পারে আর তা হলে নতুন সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

মহনগরীর অপরাধ

কলকাতায় অপরাধের সাম্প্রতিক ধরণধারণে পুলিশ কর্তৃপক্ষ খুব বেশি উদ্বিগ্ন নন। পুলিশ কমিশনার ১৯৭৩ আর '৭৪ সালের তুলনামূলক হিসেব দিয়ে বলেছেন, গত বছরের রাজনৈতিক ডামাডোল, জিনিসপত্রের চড়া দাম, রেশনে খাদ্যশস্যের পরিমাণ হ্রাস ইত্যাদির কথা মনে রাখলে অপরাধের হার সামান্য বলেই মনে হবে। তাছাড়া বোম্বাইয়ের সঙ্গে তুলনা করেও তিনি দেখান যে, ঐ মহানগরীর তুলনায় কলকাতায় খুন জখম রাহাজানির সংখ্যা বেশ কম। ১৯৭৪ সালে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সংখ্যা ছিল এই রকম (বন্ধনীর মধ্যে '৭৩ সালের সংখ্যা) : খুন ৬৯ (৬১), ডাকাতি ১২ (৯), রাহাজানি ৬৩ (৬৪), ছিনতাই ৪৫৮ (৪৩৫) দিনে চুরি ১০৪ (১৮৯), রাতে চুরি ৫৬৭ (৫৩৮)। ৬৯টি খুনের মধ্যে ৫২টির কিনারা করা গেছে।

আগের বছরের তুলনায় '৭৪ সালে কলকাতায় পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল কম। '৭৩ সালে পথ দুর্ঘটনায় নিহত হন ৪৬৮ জন এবং আহত হন ৩২৯৮ জন। গত বছর এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৮২ এবং ২৯৪৯ জন। সংঘর্ষের সংখ্যাও কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৮৮৪৫ থেকে ৬৯৬১টি। কলকাতায় যানবাহন বেড়েছে, তবু যে দুর্ঘটনা বাড়ে নি এতে পুলিশ কর্তৃপক্ষ খুশী।

ভূগর্ভ রেল

কলকাতার 'নিজস্ব রেল' ভূগর্ভ রেলের জন্যে রাস্তা খোঁড়ার কাজ শেষ পর্যন্ত শুরু হলো। শুরু হলো উত্তর কলকাতাতেই। বেলগাছিয়া মিল্ক কলোনির মোড় থেকে ভেটেরিনারি কলেজ পর্যন্ত প্রথম দফায় মাটি খোঁড়ার কাজ চলবে। 'কাট এণ্ড কভার' পদ্ধতি অনুযায়ী ওপর থেকে মাটি খুঁড়ে কংক্রিকেটের কাজ সেরে তা আবার বুজিয়ে দেওয়া হবে। এরই জন্যে ঐ রাস্তার যানবাহন অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এত দিন পর্যন্ত ভূগর্ভ রেলের যা কাজ হয়েছে সবই মাটির ওপরে। দমদম স্টেশন থেকে বেলগাছিয়া পর্যন্ত ঐ রেল আসবে মাটির ওপর দিয়েই। তাই দমদমের কাছে যা কাজ হয়েছে তা মাটির ওপরেই হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় দু দফায় যানবাহন চলাচলের মহড়া হয়েছে থিয়েটার রোড থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত। ঐ মহড়া দেখে মনে হয়েছিল প্রথম মাটি খোঁড়ার কাজ দক্ষিণ কলকাতা অথবা ময়দান এলাকাতেই শুরু হবে। উত্তর কলকাতায় কোনো মহড়া না-করে সরাসরিই মাটি খোঁড়ার কাজে হাত দেওয়া হলো। এই খোঁড়াখুঁড়ির কাজের ফলে জনসাধারণের সাময়িক অসুবিধে হবে হয়ত, কিন্তু ভূগর্ভ রেলের কাজ যে সত্যি-সত্যিই শুরু হলো তা দেখে কলকাতার মানুষ খুশীও হবেন নিশ্চয়ই।

২০।১।৭৫ —দেবদত্ত

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু এ-সুন্দর মহনীয় সত্যকে আমি আমার মতন জেনেছিলাম শুধু শ্রীঅরবিন্দকে ভালোবেসে নয়, উমাকে (ও পরে ইন্দিরাকে) ভালোবেসেও বটে। বলতে কি, সময়ে সময়ে আমার এমনও মনে হত যে যে কথাটা ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের বাণীর : যে, দীক্ষাপ্রার্থী দীক্ষাদাতার সমান সাধক হয় নিজের গ্রাহকতার (receptivity) অনুপাতেই। এ-পরম আনন্দময় সত্যটি আমি আরো পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলাম যখন ইন্দিরা আমার শিষ্যা হয়ে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নেয়। কিন্তু তার কথা যথাস্থানে—আগে উমার সম্বন্ধে বলি যা বলতে চাই—বিশেষ করে তার সঙ্গে আমার আত্মিক আদানপ্রদানের কথা। এ-কথার অর্থ—তার সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও ছিল—মেলামেশার হাসিখুশির দেওয়া-নেওয়ার—কিন্তু এ সব সম্বন্ধেরই শিরোমণি ছিল—গুরুশিষ্যার সম্বন্ধ। আমি চেয়ে তাকে নিতে চাইতাম ধর্মের দিকে, সে কিছুটা ঝুঁকেও ছিল, কিন্তু ভগবানের লীলা কে বুঝবে!—সে ১৯৩৮ সালে পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে আসা সত্ত্বেও তাঁর দর্শন পেল না—হঠাৎ পড়ে গিয়ে তার উরুভঙ্গ হওয়ার দরুন। শ্রীঅরবিন্দকে সে গুরুবরণ করতে আসেনি, এসেছিল আমার [illegible] তাগাদায়, তার হৃদয়েও শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ভক্তি জেগেছিল বলে।

তারপরেই ঘটল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা যার ফলে তার মন বেঁকে বসল। এ দৈবের কাহিনী আমি আমার স্মৃতিচারণে ফলিয়েই লিখেছি। তবু এখানে সংক্ষেপে বলব যদিও যা ঘটেছিল দুঃখের তার ভাষায় বলা সুকঠিন।

এক দিক, আমরা আসামে শ্রীহট্ট থেকে শিলচর যাচ্ছিলাম সদলবলে। শিলচরে আমার ও উমার নিমন্ত্রণ ছিল এক সংগীত-সভায় আমি সভাপতি। যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করেছিলেন উমার স্নেহময় উদার পিতা ধরণীধর বসু। এক মস্ত বাস নেওয়া হল—সঙ্গী আমরা তেরোজন—উমা, ধরণীদা, উমার মা, মাসিমা, দুই মামা, বোন, ভাই, পাহাড়ী সান্যাল, উজ্জ্বলা, মীরা, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, আমার এক আত্মীয় নাটু ও আমি।

বর্ষাকাল। সারাদিন বৃষ্টি। মাঝপথে বাস উল্টে গিয়ে পড়ল এক জলভরা খাতে। আমরা সকলেই কমবেশি আহত হয়েছিলাম, কিন্তু ধরণীদার বুকের অনেকগুলি পাঁজর ভেঙে গেল। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যু।

এখানে সংক্ষেপে আমার একটি আশ্চর্য উপলব্ধির কথা বলি—তার বিবৃতি দিয়েছি আমার ভ্রমণচয়নে। কেবল আগে বলে রাখি—আমি বাসে সারথির পাশে বসে কৃষ্ণমন্ত্র জপ করছিলাম আর দেখছিলাম সামনের স্পিডোমিটারে বাস ছুটেছে ঘন্টায় ৮০—৮৫ মাইল। পরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বলেছিলেন এই জপের ফলেই আমি রক্ষা পেয়েছিলাম। যাক, এবার উপলব্ধির পালা সুরু করি। দুর্ঘটনাটি ঘটে তেরো জানুয়ারি ১৯৩৯ সালে :

বাস চলল হু হুশ শব্দে—সুর্মা নদীর পাশ দিয়ে। বর্ষাকালের উচ্ছল জলদল-কলরব।...হঠাৎ একটা বেঁক...বাস টলল—ঐ ঐ ঐ ঐ—টাল সামলাতে না পেরে পড়ল একটা ডোবার বাঁ কাতে। আমি খোর বেগে ছিটকে পড়লাম আমার বাঁ কাঁধের উপর।... বুকে চোট লাগল বটেও এক জায়গায় মাথা কেটে গেল—আঘাত সাংঘাতিক না হলেও রক্তে মুখ ভেসে গেছে।...

কিন্তু সব ভুলে গেলাম মেয়েদের কান্না শুনে। ঝটিতি উঠে পিছল কাদায় ডোবায় নামবার চেষ্টা করছি আগে ছোটদের ওঠাতে—কিন্তু এত কাদা, পা দাঁড়ায় না। যাহোক, আমাকে ডোবায় নামতে হল না—দেখতে দেখতে প্রায় দশ পনেরো জন গ্রামবাসী লাফিয়ে পড়ল জলের মধ্যে, একে একে টেনে তুলল সবাইকে।...

সবাই মিলে ধরণীদাকে তুললাম কাছের একটা ডিস্পেন্সারিতে—পাড়াগেঁয়ে ডিস্পেন্সারি, নেটে ঘর।..

আন্দাজ সকাল আটটার সময় মোটর-দুর্ঘটনা ঘটে—ধরণীদা মারা গেলেন বেলা দুটোর কাছাকাছি। দুবার বলেছিলেন 'শ্রীঅরবিন্দ'।...

মঙ্গলময়ের সৃষ্টিতে অমঙ্গল কেন? সত্যেশ্বরের সৃষ্টিতে মিথ্যা কেন? আনন্দ-বিধাতার সৃষ্টিতে নিরানন্দ কেন? অরণ অম্লানের অপাপবিদ্ধের সৃষ্টিতে শোক তাপ কেন? মন কি পায় কোন শেষ প্রশ্নের চরম জবাব?

তবু একটা কথা বলব—যদিও ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন সে-বিচিত্র অনুভূতি...

যখন আমাদের বাসটি পড়ে যায় তখন আমার চেতনার প্রতিটি তন্তু ছিল এক তীক্ষ্ণ সজাগ সুরে বাঁধা। স্পষ্ট মনে আছে—একটুও ভয় আসে নি, যদিও মৃত্যুকে খুবই কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলাম।... পরিষ্কার মনে আছে—একটা অপূর্ব নির্ভয়ের ভাব মনে বিছিয়ে গেছে। সে-দুর্দিনে আমার উদ্বেজিত হওয়ারই কথা—দৈহিক যন্ত্রণা আমি আদৌ সইতে পারি না, কিন্তু তবু মনের অতলে এক আশ্চর্য স্থৈর্য ছিল নিটোল হয়ে...আরো আশ্চর্য এই যে, আমার স্নায়ু একটুও চঞ্চল হয় নি। কারণ পতনের মুহূর্তে যদিও আমি বোধ করেছিলাম যে, আমি এক অলক্ষ্য মারণশক্তির কবলে, পড়ছি পাতালে, তবু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও অনুভব করেছিলাম যে, কে যেন আমাকে ধারণ করে আছে স্বর্গের মতই আগলে। আমার নিজের কোনো যোগ্যতায় যে এ-অঘটন ঘটে নি এ-চেতনাও আমার ছিল—অযোগ্য না হলে করুণার অবকাশ কোথায়?...তাই প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুযন্ত্রণায় গভীর বেদনা পেলেও ভগবানের কাছে কোনো অনুযোগ করবার কথা মনে হয় নি শুধু এই প্রার্থনাই জেগেছিল :

অকূলপাথারে মনকে আমার দাও ফিরিয়ে,
হে কাণ্ডারী!
মেলতে শেখাও উদাস প্রাণের পালগুলি
সব তোমার মুখে।
তরী আমার আজ তোমাকে বরণ করে,
হে দিশারি,
ছুটুক উধাও শ্রীচরণে আলোয় ছায়ায়
দুঃখে সুখে।...
তুমি যদি হাত না ধরো—
একলা পথে কোথায় সাথী?
তোমার মলয় বিনা প্রেমল,
বাসন্তী প্রশান্তি কোথা?
শুধু তোমার প্রসন্নতার ঊষায় কাটে
অশ্রুরাতি,
শুধু তোমার প্রেমের প্রভায় যায়
মিলিয়ে আঁধার-ব্যথা।
আড়াল সরে আজ গেছে,
তাই উঠলে ফুটে স্মরণীয়!
করালী আজ কিরণমালী—
মরণে জয়শঙ্খ বাজে।
আঘাত দিয়ে দেখালে—
'কে ব্যথার মাঝে বরণীয়,
শূন্যতারো একাকারে
সার্থকতা আছেই আছে'।

(ক্রমশঃ)

দেশে বিদেশে

কাশ্মীরে মীমাংসা

কাশ্মীর সংক্রান্ত আলোচনা এখন একটা মীমাংসার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। শেখ আবদুল্লার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরাসরি ও ব্যক্তিগত প্রতিনিধির মারফৎ বেশ কিছুকাল যাবৎ এই আলোচনা চলছিল।

গত ১৭ জানুয়ারি দিল্লিতে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে শেখ আবদুল্লার আলোচনার পরই সংবাদ পাওয়া যায় যে, খুব শীগগির, সম্ভবত আগামী মাসে শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসছেন এবং সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী মীরকাশিমকে দিল্লিতে মন্ত্রী করে নিয়ে আসা হচ্ছে।

শেখ আবদুল্লার সঙ্গে আলোচনায় কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে কাশ্মীরের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে আসছিলেন। শেখ আবদুল্লার বয়স হয়ে গেছে। তাঁর জীবৎকালে তিনি যদি কাশ্মীর সমস্যার একটা গতি করে দিয়ে না যান তাহলে অন্য কোন নেতার পক্ষে এই সমস্যার সমাধান করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। শেখের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নয়াদিল্লি তাঁর সহযোগিতা চাইছিল।

শেখ যদি এখন সেই সহযোগিতা দিতে রাজি হয়ে থাকেন তাহলে কি সর্তে রাজি হয়েছেন সেটা এখনও জানান হয় নি। শেখ নিজে বলেছেন, তিনি ক্ষমতায় ফিরে আসছেন, এটা নিছক কল্পনা। আলোচনা অবশ্য এখনও কিছু বাকি আছে। কেননা, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শেখের আর এক দফা বৈঠকের কথা আছে। কিন্তু আলোচনা যে আশাব্যঞ্জক শেখ নিজেই সেকথা স্বীকার করেছেন।

কাশ্মীরের শাসনদায়িত্ব নেওয়ার জন্য এতদিন যাবৎ শেখ আবদুল্লা প্রধান যে সর্তটি দিয়ে আসছিলেন সেটি হল, ১৯৫৩ সালের পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ কাশ্মীরের পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। ভারত সরকার প্রথমাবধিই এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন। তা সত্ত্বেও শেখ আবদুল্লা যদি কোন মীমাংসায় পৌঁছে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর ঐ দাবি নিয়ে শেষ অবধি পীড়াপীড়ি করেন নি।

অন্য যেসব প্রশ্ন নিয়ে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে কেন্দ্রের আলোচনা চলছিল সেগুলির মধ্যে একটি হল, নতুন ব্যবস্থায় কাশ্মীরে কংগ্রেস, গণভোট ফ্রন্ট ও শেখ আবদুল্লার জাতীয় সম্মেলনের কি হবে। শেখ চেয়েছেন, কংগ্রেস ভেঙে দেওয়া হোক এবং তাঁকে জাতীয় সম্মেলন সংস্থাটি পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে দেওয়া হোক। কেন্দ্র জাতীয় সম্মেলনের পুনরুজ্জীবনে আপত্তি না করলেও কংগ্রেস ভাঙতে রাজি নয়। অপরপক্ষে কেন্দ্র গণভোট ফ্রন্টের বিলুপ্তি চায়। কারণ যে সংস্থা কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে বিশ্বাস করে না, তাকে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে না। এই প্রশ্নের মীমাংসা শেষ পর্যন্ত কি সর্তে হবে তা জানা নেই।

মিজোরামে বিদ্রোহী তৎপরতা

গত ১৩ জানুয়ারি মিজোরামের রাজধানী আইজল শহরে পুলিশের ইনস্পেকটর জেনারেলের সুরক্ষিত কার্যালয়ে হানা দিয়ে ও সেখানকার তিনজন পদস্থ পুলিশ অফিসারকে হত্যা করে বিদ্রোহী মিজোরা নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছে।

ঐদিন বিকালে আই জি পুলিশের দপ্তরের কাছে রাস্তার উপর একটি জিপ গাড়ি এসে দাঁড়ায়। জিপ গাড়িটি থেকে পুলিশের পোশাক পরা কয়েকজন চটপট করে নামলেন। লন পেরিয়ে প্রায় একশ গজ দূরে অফিসের মধ্যে তাঁরা ঢুকে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা বেরিয়ে এসে ঐ গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। আরও কিছুক্ষণ বাদে টের পাওয়া গেল, পুলিশের ইন্সপেকটর জেনারেলের যে ঘরটিতে একটা বৈঠক চলছিল সেখানে তিনটি গুলিবিদ্ধ প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ে আছে। মৃতদেহ তিনটি হচ্ছে ইনস্পেকটর জেনারেল জি আর্য ডি-আই জি সি বি সেওয়া ও আইজলের পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইউ এস পি কে পঞ্চপাকেশনের।

নয় বছর আগে মিজোরামে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার পর থেকে এতবড় একটা ঘটনা আর ঘটে নি। ফলে মিজোরামে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অপরাধীর সন্ধান চলছে। নিরাপত্তার ব্যবস্থা দৃঢ়তর করা হচ্ছে। আইন ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত পরিস্থিতি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি আইজলে আসছেন।

দশ মাস আগে গত বছর মার্চ মাসে লেঃ গবর্নর শান্তিপ্রিয় মুখার্জির উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করার যে চেষ্টা হয়েছিল তার পর এটাই হল বিদ্রোহী মিজোদের তৎপরতার বৃহত্তম ঘটনা।

অধিকতর জনসমর্থন লাভের আশায় বিদ্রোহী মিজোরা সম্প্রতি মিজোরাম থেকে মিজো ছাড়া অন্যান্য সকলকে তাড়িয়ে দেওয়ার আওয়াজ তুলেছে। তারা ইস্তাহার ছড়িয়ে দিয়ে কয়েক সপ্তাহ আগে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, যারা মিজো নয় তারা যদি ১ জানুয়ারি তারিখের পরও মিজোরামে থাকে তাহলে তাদের শাস্তি পেতে হবে। তিনজন পুলিশ অফিসারকে হত্যা করে তারা হয়ত তাদের সেই হুঁশিয়ারিকেই কার্যে পরিণত করল। নিহত এই তিনজন পুলিশ অফিসারের কেউই মিজোরামের অধিবাসী নন। শ্রীআর্য ছিলেন উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী, শ্রীসেওয়া দার্জিলিং-এর ও শ্রীপঞ্চপাকেশন কর্ণাটকের অধিবাসী ছিলেন।

পরের সংখ্যায় রমেন গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প

রুশ-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি

১৯৭২ সালের রুশ-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করে সোভিয়েট রাশিয়া জেনে-বুঝেই একটা ঝুঁকি নিয়েছে। ঝুঁকিটা হচ্ছে এই যে, উত্তেজনা প্রশমন করে এই দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের যে চেষ্টা বেশ কিছুকাল যাবৎ দুই দেশের সরকার চালিয়ে আসছিলেন তাতে এবার হয়ত বড় রকমের একটা আঘাত লাগবে।

ঘটনার এই পরিণামের মুখ্য দায়িত্ব অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়ার ততটা নয় যতটা মার্কিন কংগ্রেসের। মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যরা দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাবের উপর সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে গ্রহণের অযোগ্য সর্ত চাপিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা করেছিলেন তারই প্রতিবাদে সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৭২ সালের চুক্তি বাতিল করেছে। জ্যাকসন সংশোধনী নামে পরিচিত ঐ সর্তে বলা হয়েছে যে, সোভিয়েট রাশিয়া যদি তার অধিবাসীদের, বিশেষ করে ইহুদীদের, অবাধে দেশত্যাগ করে যাওয়ার অনুমতি দেয় তাহলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ সুবিধাজনক সর্তে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করবে এবং তাকে দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্যিক ঋণ দেবে। এটা রাশিয়ার ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে মস্কো ঐ সর্ত মেনে নিতে অস্বীকার করে।

এর আগে শোনা গিয়েছিল যে, রাশিয়া ইহুদীদের দেশত্যাগ সম্পর্কে কড়াকড়ি শিথিল করতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্যে এমন কোন সর্তে সম্মতি দেওয়া রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, তাহলে পশ্চিম এশিয়ায় সোভিয়েট কূটনীতির ক্ষতি হবে, এবং দ্বিতীয়ত দেশের ভিতরে ক্রেমলিনের নেতৃত্বে টান পড়তে পারে। মার্কিন সিনেটর জ্যাকসন যখন ইহুদীদের দেশত্যাগের অধিকার সংক্রান্ত সর্ত আরোপ করার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন তখন মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডঃ হেনরি কিসিঞ্জার একটি পত্র দিয়ে তাঁকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া প্রতিবাদ করে জানায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথামত রাশিয়া তার দেশের ইহুদীদের দেশত্যাগ করতে দেবে বলে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় নি।

রাশিয়ার এই প্রকাশ্য অস্বীকৃতি সত্ত্বেও মার্কিন কংগ্রেস 'ট্রেড রিফরম বিলের' সঙ্গে জ্যাকসন সংশোধনটি যুক্ত করে দেওয়ায় শুধু যে রাশিয়াই ক্ষুব্ধ হয়েছে তা নয় মার্কিন সরকারও অসুবিধায় পড়েছেন। এই কারণেই প্রেসিডেন্ট ফোর্ড সম্প্রতি দাবি করেছেন যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে মার্কিন আইনসভা যেন তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেন।

২৯।১।৭৫

—পুণ্ডরীক

ফাদার দ্যতিয়েন

রোজনামচা

মুন্সী সেখ মহম্মদ জাকির মিয়ার চৌকাঠ পেরোতে না পেরোতেই বুঝলাম, বিস্মিল্লায় গলদ ...আমার গাফিলতি আসলে দ্বিবিধ : এক, আমি—চিরন্তনী প্রথা অনুযায়ী—চটি রেখেছি দরজায়, যা নাকি ইসলামীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী; দুই, যুক্ত-করে জানিয়েছি 'নমস্কার', যার মধ্যে—ভেবেছেন কি?—শিরকের [অর্থাৎ বহু-দেববাদের] আমেজ আছে : একমাত্র নমস্য তিনিই, যাবতীয় মখলুকাত যিনি পয়দা করেছেন, আসমানে জমীনে যাঁর শরিক নেই।

জাকির মিয়ার মতে ইসলামীয় অভি-বাদনের নিয়মটা এইরূপে : চলমান মুমিন উপবিষ্ট মুমিনকে, সওয়ারী মুমিন পদরজী মুমিনকে, গৃহস্বামী মুমিন নবাগন্তুক মুমিনকে, প্রস্থানোদ্যত মুমিন গৃহস্বামী মুমিনকে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় জানাবে : 'শান্তি তোমার উপর বিরাজ করুক!' সম্ভাষণটা মোস্তাহাব—তার উচ্চারণে সোয়াব আছে : উত্তরটা ওয়াজিব—অনুচ্চারণে গুনাহ্ হয় : তোমারও উপর শান্তি বিরাজ করুক!' ব্যতিক্রম আছে : এই ধরুন আপনি খেতে বসেছেন, আপনার পক্ষে কারও শান্তি কামনা গ্রহণ করা দুরস্ত নয়। আর দেখবেন, কোনোমতেই মাথা নত করবেন না, হস্তো-ত্তোলনও করবেন না। [অভিনন্দনীয় ব্যক্তি বধির হলে অবশ্য সালামের ইঙ্গিতেই হস্তোত্তোলন অনুমোদিত]।

আরবী ভাষার আলিফ-বা-তা না শিখলেও আর-পাঁচজন শিক্ষিত বাঙালীর মতো আমিও জানি 'আসসালামু আলায়কুম' অভিবাদনটা অবিসম্বাদিতভাবে বহুবচন। পরম বিনয় সহকারে জাকির মিয়াকে জানালাম : 'ফরাসিরা একবচনে বলে 'সালামালেক' আর ফরাসিরা যা বলে, তা 'ঠিক'! ভদ্রলোকও সবিনয়ে উত্তর দিলেন : ফরাসিরা মাথামুণ্ডু কিসসু জানে না! মানুষ-মাত্রেরই আছে কিরামান-কাতিবীন নামক দুজন দেবদূত, যাঁরা নাকি মানুষের যাবতীয় নেক ও বদ কাজের হিসাবকর্তা!...আরবী ভদ্রতা দেখুন : শুধু মর্ত্য মানুষকে নয় ওর সেই দুই গায়েবী (অদৃশ্য) সহচরকেও ওরা অভিবাদন জানায়। সদৃশ কারণে [বেহেস্তবাগে ফেরেস্তাবাহিনী দ্বারা তিনি পরিবৃত বলে] আল্লাতালা কোরান মজীদের বহুলাংশে বহুবচনেই তাঁর কলাম শরীফ নাজিল (অবতীর্ণ) করেছেন।

আমি বেদীন (বিধর্মী) : সালাম আমার প্রাপ্য নয়। যে-মজলিসে মিশ্রধর্মের সমাবেশ, অভিবাদনকারী মুমিনের পক্ষে সেখানে যথার্থ ফর্মুলা এই : 'যে-সৎপথের অনুসরণ করে তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক!' দোয়াটা বোধ হয় সেই দেশে ও সেই সময়ে উৎপন্ন হয়েছে যেখানে যখন অমুমিনদের ঘোড়া চড়তে দেওয়া হত না, রাস্তাঘাটে মুমিনদের সামনে ওদের পথ ছাড়তে হত, খৃীষ্টানদের ও ইহুদীদের যথাক্রমে নীল ও হলদে নির্দেশক চিহ্ন পরতে হত।

আমার 'আদাব আরজ' অভিবাদনের উত্তরে জাকির মিয়া বলেন, 'আল্লাতালা আপনাকে সুমতি দিন!...' অর্থাৎ কিনা : আল্লাতালার অসীম মেহেরবাণী লাভ করে আমি (ফাদার দ্যতিয়েন) যেন অনতিবিলম্বে মিয়ার কাছে 'ঈমান আনি'।... আমার অস্বীকৃতিসূচক স্মিত হাসি দেখে তিনি বলেন : 'আপনার দিলের মধ্যে পাথর ভরা আছে!'

জাকির মিয়া লোকটা খাঁটি। না, মোল্লানা মৌলবী টাইপের তিনি কেউ নন, তবে কিনা কালো ঝুঁটি সেই লাল গোল টুপিটা পরে [ঐ তুর্কী ফেজটা পৈত্রিক সম্পত্তি—মুমূর্ষু আব্বার কাছে অন্তিম উপহাররূপে প্রাপ্ত, জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে সমর্পণীয়]। তিনি যে-মধুর কণ্ঠস্বরে তেলাওয়াত (কোরান পাঠ) করেন, হাফিজ-কারীরাও—কোরান-পাকের প্রতিটি অক্ষর যাঁদের কণ্ঠস্থ—এত সুন্দরভাবে তা করতে পারেন কি না, সন্দেহ।

না, গান তিনি করেন না, তাঁর পোলা-পোতাদেরও করতে দেন না; গান গাওয়া ও শ্রবণ করা কবিরা গুনাহ্, গুরুপাপ : বে-তোবা অবস্থায় মরলে দোজখে যেতে হয়! আলেম লোকেরা ও-সব পাপের অনেক তফশীল করেছেন : ঘুষ দেওয়া, সুদ নেওয়া, জুয়ো খেলা দাড়ি কামানো কাফিরের সঙ্গে দোস্তি রাখা!...শেষোক্ত পাপের ভয়ে বোধহয় জাকির মিয়া আমাকে ফাদার না বলে বলেন সাহেব, কিংবা বড়জোর 'পাদ্রি সাহেব' : 'নবীত্ব-প্রাপ্তির আগে হজরত মহম্মদ মোস্তফা আহমদ মজতবার [তাঁর উপর আল্লাতালার আশীর্বাদ ও শান্তি বর্ষিত হোক] এমন [illegible] ঘনিষ্ঠ পরিচয় [illegible]

সেই পাপের ভয়ে বোধহয় সুন্দরবন-স্থিত সেই সুদূর বাসন্তীতে আমার ক্লাস থ্রি-র ছাত্র ওলিউল এবং তার চাচাজাদ ভাই আতোয়ারও [যাদের জলজ্যান্ত চার চারটি নানীজান ছিল] আমাকে শুধু 'সার' বলত। মুমিন, ইহুদী, নাসারা (নাসারেথনিবাসী যীশু প্রচারিত ধর্মাবলম্বী), সাবেয়ীন, আতশপরস্ত (অগ্নিপূজারী পার্শী) মুশরেক (বহুদেবপূজক) ও মুনাফিকদের (বিশ্বাসভ্রষ্টদের) জন্য নির্দিষ্ট জাহান্নাম প্রমুখ সাতটা দোজখের নাম ওদের মুখস্থ ছিল : নৈশ মাদ্রাসায় ওরা শিখেছিল। আর দুঃখ প্রকাশ করে বলত। : ওদের পাপের পরিমাণ গোর-আজাব (মৃত্যুপরবর্তী শাস্তি ভোগ করে ওরা—আর মুমিন মাত্রই—পাতাল থেকে নিস্তার লাভ করবে: আমি কিন্তু মুশরেক না হলেও কাফির তো বটে, আর সেইজন্যই নরকবাস আমার চিরস্থায়ী!

মোলানাকে মোল্লানা বলতে, স্বামীজিকে স্বামীজি বলতে আমার এতটুকু না বাধলেও, ধর্মের কারণে, ঈশ্বরের পিতৃত্ব তাতে ক্ষুণ্ণ হতে পারে বলে আমাকে ফাদার বলতে যারা অস্বীকার করে, ওদের প্রতি আমার সম্মানও আছে, শ্রদ্ধাও আছে।

জাকির মিয়ার ছেলেমেয়েরা আমাকে আংকল বলে সম্বোধন করে। তাই ভালো, তাই সমীচীন : পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনে আন্তরিকতার প্রকাশ; বিদেশী ভাষার ব্যবহারে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের ইঙ্গিত। মিয়ার আত্মজ-সংখ্যা—সাহেবী গণনায়—আধ-ডজন, আরবী শুমারিতে সাড়ে পাঁচ। ইসলামীয় সংস্কৃতিতে—মিয়ার জবানীতে বলি—মেয়েরা হাফ-মানুষ : এক ছেলের সাক্ষ্য দুই মেয়ের সাক্ষ্যের সমান, কন্যার উত্তরাধিকার পুত্রের দায়ভাগের অর্ধাংশ, আকিকা-অনুষ্ঠানে নবজাত মেয়ের বেলায় মুমিনেরা দুটি নয়, একটিমাত্র খাসি জবাই করে...।

ভদ্রলোকটি তাঁর প্রতিটি পুত্রের নাম রেখেছেন কোরান-পাকে প্রশংসিত হজরতের স্মরণে; তাতে আশ্চর্য কি? আমাদের পাড়ার উপেনবাবুর অপত্যপঞ্চকের নাম কি যুধিষ্ঠির ভীম প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডবের নাম নয়? আর আমার নিজের সহোদরেরাও কি যীশুর সাক্ষাৎ শিষ্যের নামেই দীক্ষিত হন নি?

(ক্রমশঃ)

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

[সোনাখড়ি গ্রামের ভবনাথ ঘোষ আর দেবনাথ ঘোষ দু ভাই। ভবনাথ বড়। অল্পবয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর ভবনাথ সংসারের হাল টেনেছেন, ভাইকে মানুষ করেছেন। কলকাতার ছোট আদালতে ওকালতী পরীক্ষা দেওয়া দেবনাথের হল না। পরে বিদেশে জমিদারী সেরেস্তার ম্যানেজার হয়েছিলেন। সেই কৃতী ভাই দেবনাথ আট বেহারার পালকিতে সোনাখড়ি ফিরেছেন।

পুজোর আনন্দে গ্রাম গুলজার। সব বাড়িতেই আত্মীয় পরিজনের ভিড়। এর মধ্যেই খুচরো পরব এক ধরনের পুজোই—ধান বনকে সাধ খাওয়ানো। আর এক পরব গারসিও এই সময়েই। সধবা-বিধবা ছেলে-বুড়ো সবাই মেতে উঠলো। ওদিকে ভোর হতেই আহ্লাদ বৈরাগীর গলায় আগমনী সুর বেজে উঠল।

কিন্তু অর্ধাঙ্গিণীর মন বড় চঞ্চল। বুকের মধ্যে তার টনটন করে ওঠে—ষষ্ঠী গেল—মহাসপ্তমীও এসে গেল—কিন্তু তার মেয়ে এখনও এলো না।

আর কবে আসবে?

ক্রমে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পেরিয়ে দশমীও এসে গেল। ভোরে উঠেই সবাই দেখে ভিজে চোখ মা-দুর্গার। শেষ রাত থেকে সানাই বাজছে। তারও কান্নার সুর গিরিকন্যা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুড়বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন।

তাই সেই সকাল থেকেই সবার মন খারাপ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঢোল-কাঁসি বাজছে, সানাই বাজছে। সধবা-কুমারীরাই শুধু এর মধ্যে, বিধবারা বাদ। হয়ে গেলে বড়গিন্নি উমাসুন্দরী একটা রেকাবিতে সন্দেশ নিয়ে এলেন, ভেঙে একটু একটু দুর্গা ও তাঁর ছেলে-মেয়েদের মুখে দিলেন। পানের খিলি এনেছেন মুখে ছুঁইয়ে মুখশুদ্ধি করলেন তাঁদের। বলেন, সম্বৎসর ভাল রেখো মা সকলকে, অসুখ অঘটন কারো যেন না হয়। সামনের বছর আবার এসো কিন্তু—আসবে তো?

প্রতিমার মুখে তাকিয়ে রইলেন একটু-খানি, হাঁ-না কি জবাব পেলেন তিনিই জানেন। সিঁদুর কৌটা এনেছে মেয়েরা—মা-দুর্গার কপালে সিঁদুর পরিয়ে সেই সিঁদুর একটু নিজের কৌটায় তুলে নিয়ে তারপর এ ওকে সিঁদুর পরাচ্ছে। মনের কথা চেঁচিয়ে তো বলা যায় না, মা-দুর্গার কানের উপর মুখ এনে ফিস-ফিসিয়ে বলছে। আরও বেশী গোপন কথা মুখে বের করতেই লজ্জা—এক মেয়ে গোটা গোটা কাঁচা অক্ষরে কাগজে লিখে এনেছে, পাকিয়ে দলা করে কাগজটুকু দুর্গার আঁচলে বেঁধে দিল। কানে কানে বলে, লেখা রইল সব, এক সময় দেখো। ডামাডোলের ভিতর এখন হবে না, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ধীরে-সুস্থে ঠান্ডা মাথায় পড়ে দেখবেন, এই অভিপ্রায়।

এরই মধ্যে উত্তরের বাড়ীর খুনখুনে যজ্ঞেশ্বরের মা বাচ্চা কোলে নিয়ে উপস্থিত। [illegible] মতন ঝাঁকড়া, কিন্তু কী আশ্চর্য বাচ্চা কাঁধে তুললেই লাঠির মতন টনটনে খাড়া হয়ে যায়। বুড়ো মানুষ দেখে সকলে পথ করে দিল। বলে, নিজে চলতে পারে না বুড়ি, আবার এক বাচ্চা ঘাড়ে করে এসেছে। পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে নি সে-ই ঢের। যারা দিয়েছে তাদেরও বলিহারি আক্কেল।

মন্তব্য শুনে এক ঝলক তাকিয়ে বুড়ি কোটরগত চোখ দুটো দিয়ে আগুন ছড়াল। সোজা প্রতিমার কাছে গিয়ে বলছে, হ্যাঁ মা আমাদের অক্ষয়ের খোকা হয়েছে। যাচ্ছিস চলে, তাই একটু দেখাতে নিয়ে এলাম। চার মাস উতরে পাঁচে পা দিয়েছে—তা কী রকম বজ্জাত হয়েছে, সে যদি দেখিস মা। আশীর্বাদ করে যা আমাদের খোকাকে।

নতুন পুকুরে বিসর্জন হবে, একবার কথা হয়েছিল। ভবনাথের কাছে ছোঁড়ারা আড় হয়ে পড়ল : গাঁয়ে কতকাল পরে দুর্গা উঠলেন আমোদ-আহ্লাদেরও কোন অঙ্গে কসুর পড়ে নি, বাড়ীর পুকুরে চুপি-সাড়ে ডোবাতে যাবো কেন? বাঁওড়ে নিয়ে যাবে সব—আমরাই বা কম হলাম কিসে? আমরাও যাবো।

ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তল্লাট জুড়ে জানান দিয়ে যাওয়া—ভবনাথও চান তাই। পাশা-পাশি দুটি ডিঙিতে বাঁশ ফেলে তার উপরে প্রতিমা তুলতে হয় কিন্তু বিলের ভিতর ধানবনের শয়াল ধরে সে বস্তু নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কাটাখালি পড়তে পারলে তখন টানা খাল—তারপরে আর অসুবিধা নেই। কিন্তু অত দূরে নিয়ে যায় কে?

আমরা, আমরা—

তেজী ঘোড়ার মতো ছোঁড়াগুলো টগবগ করে লাফাচ্ছে। বুকে থাবা মেরে বলে, গতর বাগিয়েছি কুমড়ো কচু আর্জে খাবার জন্য নয়। প্রতিমা ঘাড়ে নিয়ে আমরা কাটাখালির ঘাটে পৌঁছে দেবো।

সেই বন্দোবস্ত পাকা। কাটাখালির ঘাটে জোড়া ডিঙি তৈরী হয়ে আছে, প্রতিমা বয়ে নিয়ে ডিঙিতে তুলে দেবার অপেক্ষা। হাঁকডাক হৈ-হুল্লোড়ে ভবনাথেরই পুলক বেশী, কিন্তু সময়কালে তাঁর পাত্তা পাওয়া যায় না। লোকজন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে দক্ষিণের দালানে ঝিম হয়ে তিনি বসে আছেন।

দেবনাথ এসে বললেন, তুমি এখানে? রওনা হচ্ছে এবার, তোমার খোঁজাখুঁজি করছে।

ভবনাথ ক্লান্তস্বরে বললেন শরীর বেজুত লাগছে। কি বলে, তুমি গিয়ে শোন গে।

শরীর নয়, মন—দেবনাথ বোঝেন সেটা। বাইরে দাদা কড়ামানুষ, ভিতরে ভিতরে অতিশয় নরম। প্রতিমা বিদায় হয়ে গিয়ে শূন্য মণ্ডপ খাঁ-খাঁ করবে এ জিনিস চোখের উপর দেখতে পারবেন না, সেই জন্যে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

ভবনাথ আবার বললেন, করবার কিছু নেই। গিয়ে দাঁড়াওগে একটু, তাতেই হবে।

দাঁড়ালেই হবে না দাদা। জেদ ধরেছে, প্রতিমার সঙ্গে যেতে হবে। তুমি নয়তো আমি। হাঁটতে না চাও, ডোঙায় বিল পাড়ি দিয়ে কাটাখালি গিয়ে উঠবে। সেখান থেকে ওরা ডিঙিতে তুলে নেবে।

ভবনাথকে কিছুতে রাজি করানো গেল না : তুমিই যাও তবে। আমি পারব না।

বাঁশে বেঁধে প্রতিমা কাঁধে তুলে নিল। মুখ বাড়ীর দিকে—যতক্ষণ দৃষ্টিগোচর থাকবে, মুখ কদাপি না ঘোরে, খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিমার মাথার কাছে প্রকাণ্ড ছাতা তুলে ধরে একজনে আগে আগে চলেছে। ঢাক-ঢোলের তুমুল বাজনা।

গ্রাম ছেড়ে দলটা ফাঁকা মাঠে এসে পড়ল। তেল-চকচকে মুখগুলির উপর পড়েছে সূর্যের আলো। এ ওকে দেখায় : বাপের বাড়ী ছেড়ে যেতে কি কান্নাটা কাঁদছেন দেখ, ঠিক তাই, যারা দেখছে

তাদের চোখ ভরে জল আসে। কাঠখালির ঘাটে ভোঙা-ডিঙি — কয়েকটা মোটা বাঁশ আড়াআড়ি ফেলে শক্ত করে বাঁধা বাঁশের উপর প্রতিমা। বয়ে বয়ে নিয়ে এসেছে দু-পাশের দুই ডিঙিতে ভাগাভাগি হয়ে উঠল। বাজনদারেরাও উঠেছে। পিছনে আরও কত নৌকো, ভাসান দেখতে বন্দরে লোক যাচ্ছে, আনন্দ-জনা করে আচ্ছা রকম জমিয়ে যাচ্ছে সব।

বাঁওড়ে এ-দিগরের সাতখানা ঠাকুর এসে গেছেন, কিনারা ধরে আছেন আপাতত। সোনাখড়ি দিয়ে পড়ে আটে দাঁড়াল। ভাসানের মেলা—কালো মাথার সমুদ্র অনেক আগে থেকে নজরে পড়ে কলরব কানে আসে। নৌকা বাইচ এই উপলক্ষে বিস্তর কাল থেকে হয়ে আসছে। লম্বা ছিপছিপে ছিপনৌকো বাইচের জন্য বিশেষ-ভাবে তৈরী। পিতলের মোড়া গলুই রোদ পড়ে ঝিকমিক করছে। এদিকে ওদিকে দুই সারি দাঁড়ীরা বসেছে, পাছনৌকোয় মাঝি। মালকোঁচা-আঁটা সকলে মাঝি তার উপর মাথায় রঙিন গামছার পাগড়ী বেঁধে নিয়েছে, আর একজন মাঝির দিকে মুখ করে পাটার উপর হাঁটু গেড়ে বসেছে, আসল মানুষ সেই মোড়ল। বাইচের নৌকো তার হুকুমে ছাড়বে, হাত তুলে সেই নৌকো থামিয়ে দেবে। পাশাপাশি ছিপগুলো—জোড়জোড় সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ঝপাস করে সব নৌকোর সবগুলো দাঁড় এক সঙ্গে জলে পড়ল। ছুটেছে নৌকো। মোড়ল সামনে পিছনে দোলাচ্ছে নিজ দেহ, সেই তালে তালে দাঁড় পড়ছে। নৌকো বাইচে সব চাইতে বেশী মেহনত বুঝি মোড়লের, দর দর করে ঘাম পড়ছে।

নাম পড়ে গেছে বাঁওড়ের এই ভাসান ও নৌকো বাইচের। জনারণ্য। তল্লাটের কোন বাড়ীতে বুঝি আধখানা মানুষও নেই। ভাল দেখতে পাবে বলে বাচ্চাগুলো কাঁধে তুলে নিয়েছে। পাড়ের গাছগাছালির ডালে ডালে মানুষ। দশমীর জ্যোৎস্না উঠেছে জ্যোৎস্না ডালপালার উপর পড়েছে। ডালে ডালে কত মানুষ-ফল ধরে আছে দেখ তাকিয়ে জয়কার উঠছে আকাশ ফেটে যাবার গতিক। তীরের বেগে নৌকো পাল্লা দিয়ে ছুটেছে।

কদমতলার ঘাটে গিয়ে দৌড়ের শেষ। বালুচর খানিকটা—ছিপগুলো চরের পাশে লাগবে। কর্মকর্তারা চরের উপরে দুটো বেঞ্চি পেতে দিয়েছে তার উপরে বসে দূরের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন। কানায় দড়ি বেঁধে প্রকাণ্ড এক পিতলের কলসি কদমের ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছে। আর দাঁড়ি মাঝি সকলকে সারবন্দি দাঁড় করিয়ে চাদর জড়িয়ে দেবে গলায়।

ফচকে ছোঁড়া কতকগুলো আছে, তিন-চার কাঁদি কাঁচকলা এনে কদম গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে। যারা হারবে কাঁচকলা উপহার দেবে তাঁদের নাকি। আসছে পরা-জিতেরা হাত পেতে তোমাদের কাছ থেকে কাঁচকলা নিতে!

নৌকোয় নৌকোয় মশাল মানুষের হাতে হাতে মশাল। হাউই দিয়েছে, মশালের আলো জলের উপর কাঁপছে। রাত্রিকাল কে বলবে আলোয় আলোয় দিনমান! বাঁশের উপর থেকে প্রতিমা এইবার জলে নামিয়ে দিচ্ছে। হরি-হরিবোল রোল উঠছে চতু-র্দিকে, প্রতিমার সঙ্গে মানুষও অনেক ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঠেসে ধরে প্রতিমা জলতলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। জায়গার নিরিখ রইল-আমাদের থানা বাঁশবনের কাছ বরাবর ওপারটা বাবলা গাছের পুবে। থাকুন ঠাকরুনেরা জলতলে এখন কিছুকাল পরে এক সময়ে পাট কাঠামো তুলে নিয়ে বাড়ী রেখে দেবে সামনের বছরের জন্য। হরি-হরিবোল, হরি-হরিবোল! এ ওর গায়ে জল ছিটোচ্ছে সাঁতার কাটছে ডুব দিয়ে প্রতিমার গায়ের রংতো কুড়োচ্ছে। হুড়োহুড়ি এ-ওকে জড়িয়ে ধরছে—ভিজে কাপড়ে আলিঙ্গন শত্রু-মিত্র বিচার নেই।

তারপরে বাড়ী ফেরা। ডোঙা-ডিঙি যে যেমন সামনে মাথায় পেলো উঠে পড়েছে। না পেলো তো হাঁটা না। আড়ঙের মেলা শেষ, বাঁওড় নির্জন। বছর ঘুরে ভাসানের দিন এলো আবার তখন মেলামোচ্ছব নৌকো বাইচ অগণ্য মনুষের আনাগোনা।

নিরঞ্জন-অন্তে সকলে ঘরে ফিরে এসেছে। পায়ে গড় করছে, বুকে জড়িয়ে কোলাকুলি করছে, যার সঙ্গে যে রকম সম্পর্ক। উমাসুন্দরী আশীর্বাদের ধান-দূর্বা নিয়ে দক্ষিণের দাওয়ায় বসেছেন। অলকা নিমি পটি ছুটোছুটি করে রেকাবিতে মিষ্টি এনে দিচ্ছে—মিষ্টিমুখ না করে ছাড়াছাড়ি নেই। হিমচাঁদের বাড়ীতে পাথরের খোরায় সিদ্ধি ঘুঁটছে—এয়ার-বন্ধুদের দিচ্ছে খেতেই হবে আজকের দিনে।

অলকা গলায় আঁচল বেড় দিয়ে শাশুড়ির পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করল। উমাসুন্দরী বললেন জন্মএয়োস্ত্রী হও মা, পাকা চুলে সিঁদুর পরো।

দেবনাথ এসে পায়ের ধুলো নিলেন। উমাসুন্দরী বললেন, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হও।

বাপের পিছু পিছু এসে কমলও ঢিপ করে প্রণাম করল। উমাসুন্দরী বললেন, সোনার দোয়াত-কলম হোক। মাথার যত চুল, তত পরমায়ু হোক।

বউঠান তো হলেন, দাদা কোথায়?

প্রণাম করবেন বলে দেবনাথ জ্যেষ্ঠের খোঁজাখুঁজি করছেন। বাড়ীর মধ্যে এই দুই প্রণম্য তাঁর। দিদি মুক্তোঠাকরুন এলে আর একজন হতেন। তিনি এলেন না আসতে দিল না গ্রামসম্পর্কীয় ভাসুরপোরা উঠানে দাঁড়িয়ে ভূপতি মেজাজ দেখাতে লাগল: পাজো বন্ধ এবারে। কেমন করে হবে—এক হাতে যিনি গোছগাছ করে আসছেন, নিজের পাজো ছেড়ে তাঁর এখন ভাইয়ের বাড়ী যাওয়া লাগল। ফটিক সর্দার যথারীতি আনতে গিয়েছিল। মুক্তোঠাকরুন অসহায় কণ্ঠে বললেন, রাগারাগি করছে ওরা সব গাড়ীতে উঠলে পিছন থেকে টেনে ধরে রাখবে। চোখে দেখে যাচ্ছিস, দাদাকে বলিস সব।

দাদা দাদা করে দেবনাথ ভিতর বাড়ী বাইরে বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কে-একজন বলে দিল মণ্ডপের মধ্যে আছেন দেখুন গে যান।

শূন্য মণ্ডপ—আলো নেই, বাজনা নেই, একটা মানুষের চিহ্ন দেখা যায় না কোন দিকে। এ কয়দিনের সমারোহের পর অন্ধ-কার বড় উৎকট ... । একলা বসে দাদা কি করছেন এখানে।

দেবনাথ পায়ে হাত দিতেই ভবনাথ তাঁকে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন: সর্বনাশ হয়ে গেছে, বড়মা নেই। ষষ্ঠীর দিন এসে পড়বে,—যাবার সময় জনে জনের কাছে বলেছিল। ডুমুরতলা অবধি গিয়েও পাল্কি থেকে মুখ বাড়িয়ে হাসি মুখখানা মা একবার দেখিয়ে গেল। আর সে আসবে না। সকালবেলা কুসুমপুরের লোক এসে খবর দিল: সোনার প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেছে। সেই থেকে আড়ালে-আবডালে বেড়াচ্ছি।

জ্বর হয়েছে বউয়ের—অন্নপথ্য করেই সুরেশের সঙ্গে চলে যাবে—ঠিক ষষ্ঠীর দিনে হয় কি না-হয় তবে যাবে নিশ্চয় পূজোর ভিতর—এই রকম খবর ছিল, সেই জ্বর সান্নিপাতিক বিকারে দাঁড়াল। বাপের বড় আহ্লাদী মেয়ে শ্বশুরবাড়ীর সোহাগিনী বউ বারো দিনের দিন সকলকে কাঁদিয়ে চোখ বুঁজেছে।

(ক্রমশঃ)

গোয়েন্দা ধাঁধা

গোয়েন্দা যখন আনাড়ি হয় ।।
গোয়েন্দা এবং লেখক ঃ
এলারি কুঈন ।

বাপ বেটা দুজনেই চৌকস গোয়েন্দা। ইন্সপেকটর কুঈন সরকারী নুন খেয়ে গোয়েন্দাগিরি করেন। এলারি কুঈন কারও নুন খান না—অ্যামেচার বললেও চলে। অ্যামেচার বলেই নামডাক অত বেশী। দেখতেও চমৎকার। লম্বা ছিপছিপে চোখ দুটো রুপোলী।

এলারি কুঈনের নাম এত বেশী ছড়িয়েছে যে এখন তাঁকে গোয়েন্দাগিরির ক্লাশ নিতে হয়। ইউনিভার্সিটির ক্লাশ—পাঠশালা নয়।

ফেনউইক হোটেলে একজন খুন হয়েছে শুনে হাতে কলমে তালিম দেওয়ার জন্যে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে হোটেলে এলেন এলারি কুঈন। ইন্সপেকটর কুঈন আগেই রুটিন তদন্ত সেরে ছেলের পথ চেয়ে বসেছিলেন। ছেলের মত তিনিও চটপটে, দেখেন বেশী, বলেন কম।

ভদ্রলোকের অন্যান্য গুণের মধ্যে একটি মহৎ গুণ হল নারী শিকার। মনে করলে যে কোনো মেয়েছেলেকে চক্ষের নিমেষে পটিয়ে ফেলতে তাঁর জুড়ি নেই। বিয়ে করা বউ রেখেই এই কারবার করতেন। উপপত্নীও ছিল। শেষকালে বউয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। সেই বউটিও আজ সকালে এসেছিল লম্পট লোকটার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। কাগজে জাহাজ আসার খবর পড়েই এসেছিল। কিন্তু দরজা বন্ধ দেখে ফিরে যায়।

মৃতদেহ প্রথম দেখে একজন নিগ্রো ঝি।

ছাত্রছাত্রীরা এই প্রথম মৃতদেহ দেখছে। ভাবসাব দেখে মনে হল বমি করে ভাসিয়ে না দেয়। বীভৎস দৃশ্য। এক বালতি লাল রক্ত যেন উপুড় করে দেওয়া হয়েছে নিহত ব্যক্তির মাথার ওপর। বাদামী চুল রক্তে মাখামাখি।

হত্যার হাতিয়ার একটা আফ্রিকান হাতুড়ি। ছিল নিহত ব্যক্তির ব্যাগের মধ্যে। হত্যাকারী তাই দিয়েই কাজ সেরেছে সুচারুভাবে।

পরিষ্কার কাজ। দেখে হৃষ্টচিত্তে চুকচুক আওয়াজ করে উঠলেন এলারি কুঈন।

ইন্সপেকটর কুঈন তখন বললেন—এ ঘরে সব চাইতে আশ্চর্য যে জিনিসটা পাওয়া গেছে তা হল আগুনের চুল্লীতে আটটা মুক্তোর বোতাম আর সার্টপিন। দেখবে নাকি?'।

এলারি কুঈন দেখলেন, ফায়ার প্লেসে একরাশ ছাই। ছাইয়ের মধ্যে আগুনে পোড়া বোতাম আর সার্টপিন। কিন্তু ছাইটা কিসের? ফায়ার প্লেসে এ-ধরনের ছাই তো থাকে না?

বোতামগুলো হাতের তালুতে নাচাতে নাচাতে স্বপ্নালু চোখে চেয়ে রইলেন এলারি কুঈন। চ্যালাদের বললেন সরেজমিন তদন্ত শুরু করতে।

এক নম্বর ছাত্র বলে উঠল—"স্যার, মৃত ব্যক্তির এক হাতের রক্ত মুছে গেছে কেন? কি যেন ধরতে গিয়েছিল—তালুর রক্ত তাতে লেগে গেছে। কিন্তু সে জিনিসটা কোথায়?"

ইন্সপেকটর কুঈন মাথা নেড়ে বললেন, সেরকম কোনো জিনিস ঘরে পাওয়া যায় নি। একটা সার্ট আর বো-টাই অবশ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু—

এক নম্বর ছাত্র তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। হাতের রিস্টওয়াচের ওপর। ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে ১০-২০ মিনিটে। কাঁচ চিড় খেয়েছে। চামড়ার ব্যান্ডে দুটো দাগ। তার মানে, ঘড়িটা যদিও পুরুষালী ঘড়ি—তাহলে যে পরত, তার কব্জি সরু। নিশ্চয় মেয়েছেলে। খুন করার পর হাত থেকে খুলে নিহত ব্যক্তির হাতে পরিয়ে দিয়েছে। কাঁটাটা সরিয়ে রেখেছে ১০-২০ মিনিটের ঘরে হত্যার সময় পাল্টে দেওয়ার জন্যে। তাছাড়া ঘড়ির ডালার মধ্যে একটা গোল মত কাগজ আঠা দিয়ে লাগানো ছিল। সে কাগজটাই বা গেল কোথায়? হত্যাকারী কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে গেল কেন?

"সাবাস," তারিফ করলেন এলারি কুঈন। 'ড্যাডি, ডাক্তার কি বলছে?'

"এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে হাতুড়ি পড়েছে মাথায়।" বললেন ইন্সপেকটর কুঈন।

দু'নম্বর ছাত্র লাফিয়ে উঠল ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে। ঘড়ির ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখে ভুরু-টুরু কুঁচকে বললে—"আমি কেমিস্ট। এ ঘড়িটাকে নিয়ে টেস্ট করতে চাই। নিয়ে যাবো?"

'স্বাচ্ছন্দে বললেন ইন্সপেকটর।' কিন্তু বাপু ফিরিয়ে দিও।'

এবার ফ্যাকাশে মুখে পাউডার বুলোতে বুলোতে উঠে দাঁড়াল ছাত্রীটি। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বললে—"দেখা হয়ে গেছে। বলব?"

"এখন নয়, বললেন এলারি কুঈন। 'দু'ঘণ্টা সময় দিলাম। দেখি কার এলেম কতখানি।'

সদলবলে নীচে নেমে এলেন এলারি কুঈন। প্রবেশ পথে সাদা সার্ট গায়ে কালো বোটাই এঁটে তম্বিতম্বা করছে হোটেল ম্যানেজার উইলিয়ামস।

ছাত্রছাত্রীদের বিদেয় দিয়ে বাবাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে কানে ফুসমন্তর দিয়ে দিলেন এলারি কুঈন।

•

দু'ঘণ্টা পর চ্যালারা এসে গম্ভীর মুখে পেশ করল তাদের তদন্তের ফলাফল। তিনজনেই হত্যাকারী সনাক্ত করে ফেলেছে।

প্রথম ছাত্র বলল—ঘড়ির মধ্যে গোল কাগজটা নিশ্চয় একটা ফটো—এই সন্দেহ নিয়ে আমি নিহত ব্যক্তির পূর্ব স্ত্রীর কাছে এতক্ষণ আড্ডা মেরে এলাম। তার একখানা অ্যালবাম নিয়ে দেখলাম একটা ছবির মুখের জায়গাটা গোল করে কাটা। সুতরাং স্রেফ-গায়ের জ্বালায় পূর্ব স্বামীকে এসে খুন করে গেছে সে।' দ্বিতীয় ছাত্র বললে—তোমার মাথা আর মুণ্ডু! খুন করেছে নিগ্রো ঝি-টা। ঘড়ির মধ্যে কেমিক্যাল টেস্ট করে কি পেয়েছি জানো? নিগ্রো-ব্রাউন রঙের পাউডার। মেয়েদের পাউডার। নিশ্চয় ঐ ঝিয়ের পাউডার। যদিও কিছুতেই স্বীকার করতে চাইছে না। কিন্তু একাজ তারই। আফ্রিকায় নিগ্রো মেয়ে আর পুরুষদের ওপর কম অত্যাচার করে নি তো লোকটা—তাই শোধ তুলেছে একা পেয়ে। ছাত্রীটি তাই শুনে মুখ বেঁকিয়ে বললে—আহারে! বুদ্ধির দৌড় দেখে আর বাঁচি না। ঘড়িটা মোটেই অন্য কারো নয়—ভদ্র-লোকেরই। শোনো আমার যুক্তি। চিকাগোর সঙ্গে এখানকার সময়ের ফারাক কত? এক ঘণ্টা তো? প্লেন থেকে নেমে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে নেবার কথা খেয়াল ছিল না ভদ্রলোকের। দশটা কুড়ি মানে এগারোটা কুড়িতেই তিনি হাতুড়ি খেয়েছেন। কিন্তু কার হাতে? আমি বলব তাঁর সেই উপ-পত্নীর হাতে। কি করে বুঝলাম জানো? বাথরুমে গিয়ে দেখে এসো পাউডার পাফ নেই। অথচ দেখেছো নিশ্চয় দাড়ি কামানোর পর ভদ্রলোক খুব পরিপাটি করে পাউডার মেখেছিলেন। ব্যাটাছেলেরা পাফ দিয়ে পাউডার লাগায় না—আঙুলে করে লাগায়। তাই জাবড়াভাবে লেগে থাকে—আমার গাল দেখো—সেরকম নয় মোটেই। ভদ্র-লোককে তাহলে কেউ না কেউ আদর করে পাউডার বুলিয়ে—'

'তারপর মাথায় হাতুড়ি হাঁকড়েছিল—' হো-হো করে হেসে উঠলেন এলারি কুঈন। সাংঘাতিক বিশ্লেষণ তোমার! শুধু একটু ভুল করেছো। দাড়ি কামানোর বুরুশটা উল্টো করে দেখলেই তলায় ছোট্ট পাউডার পাফ দেখতে পেতে। যাক, তোমরা তিন-জনেই পরীক্ষায় ফেল করেছো। হত্যাকারী মেয়েছেলে নয় এবং এই হোটেলেরই লোক।"

'কে? কে? কে?'

"হোটেল ম্যানেজার উইলিয়ামস।"

কি হল? আপনিও চমকে উঠলেন নাকি? সমাধান সূত্রগুলো কিন্তু গল্পের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। আর একবার পড়ে দেখবেন?

—[illegible] বর্মণ

(গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান ৬০ পৃষ্ঠায়)

দুটি বিদেশী উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথ

উজ্জ্বল মজুমদার

গত শতাব্দীর শেষ দশকে 'সাধনা' পত্রিকার প্রকাশ (১২৯৮) শুরু হলে তাতে সব্যসাচীর ভূমিকা নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতপক্ষে সাধনার সূচনাতেই এই বিংশ শতাব্দীর মনন-চিন্তনের সূচনা। সাহিত্যের শতাব্দী-বদল সন-তারিখ ধরে হয় না।

সৃষ্টি ও সমালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নতুন পথ ধরেছিলেন সাধনায়। সাহিত্যে জীবন-মননের ফসল ফলে। বাইরের কোনো ধরা-বাঁধা নীতি-শাসনের উপায় হিসেবে সাহিত্যকে ব্যবহার করা অন্যায়। বঙ্কিম সেইভাবে সাহিত্যকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তা চাইলেন না। তিনি বললেন, সাহিত্যের সাধনা কর্ম-চিন্তা-আনন্দের মিলনে সর্বাঙ্গীণ সাধনা। শাস্ত্রের নির্ভর ছেড়ে বুদ্ধি ও স্বাধীন অনুভবের পথে সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্য-চিন্তা এই প্রথম পা বাড়ালো।

এই 'সাধনা'র যুগে সাহিত্যকর্মের দুটি দিকের ওপর রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন। এক, সাহিত্যে জাতীয় জীবনের মনোময় ও প্রাণময় ধারার অকৃত্রিম প্রবাহ এখনো তেমন ছাপ ফেলে নি আমাদের দেশে। কাজেই মন-প্রাণের প্রকাশ সাহিত্যে চাই। দুই, সাহিত্যে মানুষের তত্ত্বকথা চাই না, কাটা-ছেঁড়া মানুষ চাই না। সম্পূর্ণ মানব-প্রকাশ চাই। যে-মানব স্বদেশের বিচিত্র কর্মধারায় আলোড়িত হয়েও আন্তর্জাতিক মানব সেই বৃহৎ ব্যাপক মানব-চেতনার প্রকাশ চাই।

পরেও গোরা উপন্যাস-রচনার মাস-পাঁচেক আগে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্বসাহিত্য প্রবন্ধে এই ব্যাপক মানব-চেতনাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'বিশ্বমানব'।

এইভাবে সাধনাপর্বে জাতীয় চেতনার ব্যাপক প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্রনাথ যখন খুঁজে চলেছেন, ভাবছেন একটা উচ্চ দর্শন-শিখর আছে যেখান থেকে মানবপ্রকৃতির সর্বাপেক্ষা ব্যাপক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়, যখন শেক্সপীয়রে এই ব্যাপক পরিদৃশ্য পেয়েছেন কিন্তু গ্যেতিয়ের উপন্যাসে পান নি, জোলার উপন্যাসেও পান নি (সাহিত্যে প্রাণ, মানবপ্রকাশ ইত্যাদি প্রবন্ধ স্মরণীয়) যখন জাতীয় চেতনা, চরিত্রবল ও জীবনের অনুরাগ স্বদেশীয় সাহিত্যে পান নি বলে বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন, ঠিক সেই সময় দুটি কন্টিনেন্টাল লেখকের উপন্যাস তাঁর হাতে এসে পড়লো। একজন হাঙ্গেরীয়ান। নাম মোরিস য়োকাই। আর একজন পোলিশ, নাম জোসেফ ইগনেশিয়াস ক্রাসজিউস্কি। দুই ঔপন্যাসিকেরই আলোচ্য দুটি উপন্যাস ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে তখন। আর এই দুই সাহিত্যিকেরই রচনারম্ভের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার দু-দেশের উজ্জ্বল জাতীয় উৎসবের কথা কাগজে বেরিয়েছে। কৌতূহলী রবীন্দ্রনাথ এই দুজন লেখকের দুখানি উপন্যাস পড়ে সাধনায় সমালোচনা করলেন সাহিত্যের গৌরব নামে। প্রবন্ধটি ঠিক উপন্যাস-সমালোচনা নয়। বিদেশী উপন্যাস ও ঔপন্যাসিককে অবলম্বন করে আত্ম-সমালোচনা, স্ব-জাতির সমালোচনা।

(২)

মূল বক্তব্যে পৌঁছোনোর আগে য়োকাই ও ক্রাসজিউস্কির উপন্যাস দুটির কাহিনী সম্পর্কে কিছুটা আভাস দেওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের গৌরব প্রবন্ধটিতে য়োকাই-এর আইজ লাইক দ্য সী (১৮৯০) উপন্যাসের সামান্য গল্পাভাস দিয়েছেন এবং বিশেষ করে একটি নারী-চরিত্রের কথাই বেশি করে বলেছেন যিনি উপন্যাসের মূল চরিত্র। ক্রাসজিউস্কির দি জ্যু (১৮৬৫) উপন্যাসের কাহিনীর বিন্দুমাত্র আভাস দেন নি। শুধু, কাহিনীটি যে জাতীয় চেতনার আন্দোলনের সংগে গভীরভাবে যুক্ত সে কথাই বলেছেন।

আইজ লাইক দ্য সী-র কাহিনী বেসি নামে একটি বিচিত্র প্রাণময়ী মেয়ের জীবন-কাহিনী। এই মেয়েটির কথাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনায় উল্লেখ করেছেন। মেয়েটির বাবা-মা অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী দম্পতি। কিন্তু বেসি মেয়েটি দুঃসাহসী এবং বিকারগ্রস্ত। পাঁচবার সে বিয়ে করেছে। শেষ স্বামীটিকে সে হত্যাও করেছে। বেসির এই পাঁচটি স্বামী হাঙ্গেরীর জাতীয় জীবনে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। চাষী পরিবারের মানুষ থেকে অভিজাত শ্রেণীর মানুষ পর্যন্ত—সব রকম মানুষের সংগেই বেসির দাম্পত্য-জীবন এক-এক করে কেটেছে। পাঁচটি স্বামী যেন পাঁচটি শ্রেণী-সমাজের প্রতিনিধি। আর সমস্ত উপন্যাসটির মধ্যে বেসিই একাধারে নায়ক ও নায়িকা। তার দীপ্ত পৌরুষ ও প্রাণশক্তি দেখে মনে হয় তার মধ্যে নারী ও পুরুষের মনোবৃত্তির সূক্ষ্ম মিশ্রণ ঘটেছে।

বেসির মধ্যে যদি নায়কোচিত পৌরুষের গুরুত্বকে অস্বীকার না করি তাহলে স্বয়ং লেখককে এই উপন্যাসের সহনায়ক বলতে হয়। উপন্যাসের কাহিনীতে লেখকের আত্মজৈবনিক ছায়া পড়েছে মনে হয়। যৌবনে বেসিকে লেখক খুবই ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু বেসি সে ভালোবাসাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। পরে তার বিচিত্র রোমাঞ্চকর উচ্ছৃঙ্খল জীবনে লেখকের প্রতি তার আকর্ষণকে সে অনুভব করেছে এবং সেই আকর্ষণকে সে ফেলে-আসা আদর্শ ভালোবাসার মতো লালন করেছে। মাঝে মাঝে সেই স্মৃতি—সেই আশ্চর্য ভালোবাসার মানুষটি বেসির উচ্ছৃঙ্খল জীবনে তার রক্তে গভীর দুঃসহ টান দিয়েছে। হয়তো এও এক ধরনের বিকার। আদর্শকে ঠেলে দিয়ে অসম্পূর্ণতার পেছনে, ক্ষণিক মত্ততার পেছনে ধাওয়া করা। লেখকও নিরুপায় হয়ে বেসিকে ছেড়ে সৃষ্টির ক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়েছেন সেই একটি স্মৃতির অমিত পাগলামি বুকে নিয়ে। পরে দেশের জাতীয় আন্দোলনে ও বিপ্লবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। তারপর বিপ্লবের কোনো এক উত্তপ্ত মুহূর্তে এক অভিনেত্রীকে ভালোবেসে বিয়ে করেছেন তিনি। ভাগ্য ভালো যে বিবাহিত জীবনে অভিনেত্রীকে খুবই অনুরক্ত স্ত্রীরূপে পেয়েছেন তিনি। ওদিকে রোমাঞ্চরসিক বেসি বিচিত্র প্রেমবন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে মাঝে মাঝে এবং লেখকের কাছে পরামর্শ চেয়েছে, আশ্রয়ও চেয়েছে। সমুদ্রের মতো নীল চোখের সেই মেয়েটিকে লেখক কোনোদিনই দূরে ঠেলে দিতে পারেন নি। লেখকের কাছেও সেই দুর্মর স্মৃতি নীলচোখের ছলনা নিয়ে বার বার ডাক দিয়ে গেছে। সে মায়ার জট-ছাড়ানো লেখকের পক্ষে অসম্ভব।

বেসির জীবনকে কেন্দ্র করে পাঁচটি স্বামীর সংগে তার সহবাসের মধ্যে দিয়ে হাঙ্গেরীর সমাজজীবনকে তীক্ষ্ণ প্রত্যক্ষতার সংগে এঁকেছেন লেখক। আর সেই সমাজ-জীবনের রূঢ়বাস্তবতার মধ্য দিয়ে এই প্রেমানুভবের প্রাণময় উত্তাপ কার্পেথীয়ানসের পাহাড়ী হাওয়ার মতোই

সজীব প্রেরণাময় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে দিয়েছে উপন্যাসটির পাতায় পাতায়।

দ্য জু উপন্যাসটির মধ্যে লেখক ক্রাসজিউস্কি (উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পোলিশ লেখক) পোল্যান্ডের জাতীয় জীবনেরই কাহিনী লিখেছেন। স্টোরি অব দা সয়েল বলতে যা বোঝায় দ্য জু হচ্ছে তাই। তিন হুবা নামে এক-জন নির্বাসিত পোলিশ ব্যক্তি একটি পান্থশালায় ঢুকে অন্যান্য অতিথিদের সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। পান্থ-শালার মালিক সিনর ফিরপো সঙ্গে সঙ্গে তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। মালিক ভাবলেন, হুবা বোধহয় মারা যাবে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে বেঁচে গেল। জ্ঞান ফিরে এলে সে দেখলো, একটি ছোট টেবিলের চারধারে নানা জাতের মানুষ বসে পানাহারে মেতে আছে। তার মধ্যে রুশ, ইটালিয়ান, পোলিশ, ইহুদী, ড্যানিশ, জিপসি—সবাই রয়েছে। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে একটি লোকের সঙ্গে তার আলাপ জমে উঠলো। লোকটির নাম জ্যাকব হারমন। জাতে ইহুদী। হুবা ও হারমনের কথাবার্তায় ইহুদী সমাজের নানা সমস্যা ও চরিত্র-বৈচিত্র্য সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে যাবে পাঠকের। জ্যাকব হারমান হুবা-কে রাজনীতি, দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি আলোচনায় টেনে এনে ইহুদী-ধর্মে দীক্ষিত করে নিতে চায়। দুজনে ঠিক করে পোল্যান্ডে তারা ফিরে যাবে।

পোল্যান্ডে ফিরে ইহুদীদের শিক্ষা-বিস্তার ও বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণ ঘটিয়ে ইহুদীদের সাংস্কৃতিক আবহাওয়াকে গড়ে তোলাই তাদের উদ্দেশ্য হলো। কিন্তু পোল্যান্ডে এসে দুজনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়লো। শেষপর্যন্ত দেশত্যাগী হতে বাধ্য হলো তারা। দেশের রুদ্ধশ্বাস আব-হাওয়ায় ও জীবনের জটিল চক্রান্তের মধ্যেও 'প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে'। কয়েকটি রোম্যান্টিক অনুভবের মুহূর্ত এই দুই আদর্শবাদীর জীবনে রঙীন ছোঁয়া লাগিয়ে যায়। সেই স্পর্শটুকুই। এই দুই দেশত্যাগীর স্মৃতি হয়ে থাকে।

শুধু গল্পরসিকের জন্য দ্য জু লেখা হয়। এ উপন্যাসের মধ্যে মানুষের নৈতিক ও জাতি-তাত্ত্বিক সমস্যাও জড়িয়ে আছে। এই দুটি উপন্যাসই যে শিল্প হিসাবে মহৎসৃষ্টি একথা হয়তো বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথও তা বলেন নি। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের সমালোচনায় উল্লেখ না থাকলেও প্রথম উপন্যাসটি—'আইজ লাইক দ্য সী' ১৮৯০ সালের হাঙ্গেরীয়ান অ্যাকাডেমির বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে ঘোষিত হয়েছিল। আর 'দ্য জু' উপন্যাসটি উপ-স্থাপনার বলিষ্ঠতা ও সারল্যের জন্য তৎকালীন সমালোচকদের প্রশংসা পেয়ে-ছিল। আসলে শিল্প-বিচারের উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের ছিল না। এই দুই ঔপ-ন্যাসিক তাঁদের স্বদেশে যে সম্মান পেয়ে-ছিলেন তাঁদের রচনারম্ভের স্মরণোৎসব উপলক্ষ্যে—তাতে তাঁরা বীরের মতোই পূজ্য বলে গণ্য হয়েছিলেন। তুলনায় হতভাগ্য বঙ্গদেশের অবহেলিত ঔপ-ন্যাসিকদের দুরবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করেছেন।

(৩)

সাহিত্যিক যে কারণে স্বদেশে বীরের সম্মান পান সেই কারণ-বিশ্লেষণের সূত্রেই এই দুই কন্টিনেন্টাল ঔপন্যাসিক রবীন্দ্র-নাথের কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়ে-ছিল। সেই আকর্ষণের দুটি সূত্র আছে। প্রথমতঃ এই দুই ঔপন্যাসিকের রচনা-রম্ভের পঞ্চাশ বছর-পূর্তি উপলক্ষে যে উৎসব হয়েছে তা জাতীয় উৎসব। তার কারণ হাঙ্গেরী ও পোল্যান্ড—দুটি দেশেই সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য যোগ। স্বাধীনতা-বিপ্লবে দুই লেখকই প্রাণমন সমর্পণ করেছেন। দেশীয় ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি করে তাঁরা দেশীয় ভাষার মর্যাদা এনেছেন। এঁদের রচনার মধ্যে দিয়েই হাঙ্গেরী ও পোল্যান্ডের সাধারণ মানুষ মাতৃভাষাকে ভালোবেসেছে, শোকে সান্ত্বনা পেয়েছে, বিপদে আশা পেয়েছে, লজ্জায় ধিক্কার দিয়েছে গৌরবে জয়ধ্বনি করেছে। সমস্ত জাতির হৃদয়ই তাঁদের কণ্ঠস্বর। দেশের মাতৃভাষাকে এঁরাই মুক্তি দিয়েছেন বিদেশী ভাষার আধিপত্য থেকে। লেখক ও পাঠকের এই একজাতি-একপ্রাণ বোধ বাংলাদেশে ও বাংলাসাহিত্যে নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্তি আমাদের জাতীয় উৎসবের প্রেরণা হয়নি কোনো দিনই। ফ্রান্সে উগোর মৃত্যুশোক ও বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুশোক পাশাপাশি তুলনার যোগ্য নয় ('সাহিত্যের গৌরব' প্রবন্ধ লেখার মাস-চারেক আগে বঙ্কিমচন্দ্র মারা গেছেন।)। কাজেই সাহিত্যে প্রাণমনের প্রকাশ ইত্যাদি সাধনা-পর্বের প্রবন্ধগুলি লেখার সময় সাহিত্যে জাতীয়চেতনাবোধের যে অভাব তাঁকে পীড়িত করছিল তা তীব্রতর হলো এই য়োকাই আর ক্রাসজিউস্কির মাতৃভাষায় উপন্যাসচর্চার দুরন্ত আবেগ ও তাঁদের রচনাকীর্তির স্মরণোৎসবের কথা পড়ে।

দ্বিতীয় সূত্রটি প্রথম সূত্রেরই অনি-বার্য পরিণতি। হাঙ্গেরীর য়োকাই এবং পোল্যান্ডের ক্রাসজিউস্কির উপন্যাসে লেখকের সঙ্গে স্বদেশের যে গভীর বন্ধন তা আমাদের দেশে এক বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া তখন আর কারুরই ছিল না। তাও বঙ্কিমের নৈতিক আদর্শ তাঁর মহৎ মানব-প্রকাশ-চেষ্টাকে ব্যাহত করেছে বলেই বাঙালী পাঠক তাঁর মানব-চরিত্রকে নৈতিক মানে বিচার করে কোন চরিত্রের মহত্ত্ব, উদারতা আত্মত্যাগ বা ভালোবাসার পরিমাণ বেশি তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। অথচ কে ঠিক মানুষের মতো, কার হৃদয়ে মানব-স্পন্দন বেশি শোনা যায় সে সম্পর্কে কেউ বিচার করে নি। আইজ লাইক দ্য সী কিংবা দ্য জু উপন্যাসে জীবনের বিচিত্র প্রবাহ যেখানে ঘাতপ্রতিঘাতে স্ফীত ও ফেনিল সেইখানেই এই দুই লেখক কল্পনায় জাল বিস্তার করে সজীব চরিত্রগুলিকে টেনে এনেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'আমাদের সাহিত্যে কোথায় সেই ভালো-মন্দের সংঘাত, কোথায় সে হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রবলতা, কোথায় সে ঘটনাস্রোতের দ্রুত-বেগ, কোথায় সে মনুষ্যত্বের প্রত্যক্ষ জীবন্ত স্বরূপ। য়োকাই ও ক্রাসজিউস্কি যেমন সমকালের রাষ্ট্রবিপ্লবের তরঙ্গ থেকে জীবন্ত মানব-প্রকাশ ঘটিয়েছেন, বঙ্কিম তেমনভাবে সমকালকে তাঁর উপন্যাসে মর্যাদা দেন নি। উনিশ শতকের জাতীয় চেতনা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাঁর রচনাপর্বের সূচনায় তেমন জোরালো নয় বলেই ঐতি-হাসিক কাহিনীর আশ্রয় নিয়ে সেই জাতীয়তাবোধ ও সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সম্ভাব্য মানব-কল্পনা ও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বচর্চার পথ তাঁকে দেখাতে হয়েছে। বাস্তবের অভাব কল্পনায় পূরণ করতে হয়েছে। সেইজন্য য়োকাই-এর আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছে : হাঙ্গেরীয় উপন্যাসখানি খুলিয়া দেখো, মানুষ কত রকমের, কত ভালো, কত মন্দ, কত মিশ্রিত এবং সবসুদ্ধ কেমন সম্ভব, কেমন সত্য। উহাদের মধ্যে কোনটিই নৈতিক গুণ নহে, সবগুলিই রক্তমাংসের প্রাণী।' দ্য জু উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : 'তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন, লেখকের প্রতিভা জাতীয় হৃদয়ের আন্দোলন-দোলায় কেমন করিয়া লালিত হইয়াছে।'

(৪)

সাধনায় যখন এই সমালোচনা রবীন্দ্র-নাথ লিখেছেন তখন, মনে রাখা উচিত, উপন্যাসরচনায় নতুন কোনো রীতির প্রয়োগ তিনি করেননি। অসমাপ্ত 'করুণা' বৌঠাকুরাণীর হাট, মুকুট, রাজর্ষি—এই চারটি উপন্যাস তখন লেখা হয়েছে। করুণা রোমান্টিক বিষন্ন প্রণয় আখ্যান সগোত্র। অন্য তিনটির বিষয় ঐতিহাসিক, স্বাধীন বাংলায় ইতিহাস—যশোর ও ত্রিপুরার ইতিহাস। কাজেই তখন পর্যন্ত ঐতিহ্যই ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। আর সেই ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে আইডিয়াকে ব্যক্তিরূপে দিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে। স্বার্থ ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ব্যাপক প্রেমানুভবের সংঘর্ষ। এই উপন্যাসরীতি চলেছে ১২৯৩ সাল পর্যন্ত। তারপর সাধনাপর্বে (১২৯৮ থেকে) রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা-বোধ ও আত্মসমুত্থ মানবিক দৃষ্টি গড়ে উঠেছে, এবং মনে হয়, অন্যান্য আরও কয়েকটি ঔপন্যাসিকের মতো হাঙ্গেরীয়ান ও পোলিশ এই দুই ঔপন্যাসিকের জাতীয় চেতনা ও সমাজ শাসনমুক্ত চরিত্র-বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মানসিকতা জোরালো সমর্থন পেয়েছে। তাই সাধনা-পর্ব শেষ হতেই রবীন্দ্র-উপন্যাসে রচনার

রূপবৈচিত্র্য দেখা গেল। 'চোখের বালি'তে তার প্রকাশ। এই উপন্যাসে জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য ও সমকালের আন্দোলনের সঙ্গে যোগ নেই বটে, কিন্তু উল্লিখিত দ্বিতীয় সূত্রটির সমর্থন অবশ্যই পাই। সেই সূত্রটি হলো, সমাজ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-হৃদয়ের সংঘাত। প্রথম বাংলা আধুনিক উপন্যাসে বিনোদিনী প্রথম আধুনিক নারী। আইজ লাইক দ্য সী উপন্যাসের নায়িকা বেসি-র সম্পর্কে যা বলেছিলেন: 'তাহার নারীপ্রকৃতি পরিপূর্ণ প্রাণশক্তিতে নিয়ত স্পন্দমান; সে সমাজের কলে পিষ্ট এবং লেখকের গড়ানির্মিত নৈতিক চালুনিতে ছাঁকা গৃহস্থের ঘরে ব্যবহার্য পয়লা নম্বরের পণ্যদ্রব্য নহে, সুবোধ গোপাল এবং সুমতি সুশীলার ন্যায় সে বাংলাদেশের শিশু-শিক্ষার দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।' বেসিকে বাংলা-সাহিত্যের পটে কল্পনা করে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন মিউজিয়ামের সিংহী যদি হঠাৎ জীবন পায় তবে রক্ষক মহলে যেমন হুলুস্থুল পড়ে যায় বেসির মতো নায়িকা সহসা বাংলাসাহিত্যে দেখা দিলে সমালোচকমহলে সেই রকম বিভ্রাট বেধে যাবে, তাঁদের সূক্ষ্ম বিচার ও নীতিতত্ত্ব বিপর্যস্ত হয়ে একটি দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। ১৩০১ সালের এই মন্তব্য চোখের বালির 'বিনোদিনী'তে রূপ-বিভ্রাট ঘটালো ১৩০৮ সালে। মিউজিয়ামের সিংহী হঠাৎ জীবন পেল। পরে চতুরঙ্গের দামিনী ও ঘরে-বাইরের বিমলার মধ্যে এই রকম সজীবতা দেখা গেছে।

নৌকাডুবিতে ব্যক্তির আত্মবিকাশ কম। বরং সামাজিক আচারবিচারে ব্যক্তির বিকাশ কতখানি অবরুদ্ধ হয় তাই দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ ওই নৈতিক চালুনিতে ছাঁকার যন্ত্রণাটুকুই শুধু আছে। নৈতিকতার ঊর্ধ্বে চরিত্র-বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু গোরা-তে রবীন্দ্রনাথ ওই দুটি সূত্রকেই যেন পেয়ে গেলেন। য়োকাই ও ক্রাসজিউস্কি যুক্ত হলেন তাঁর ঔপন্যাসিক ব্যক্তিত্বে। 'সাহিত্যের গৌরব' প্রবন্ধ ছাড়াও 'গোরা' রচনার চার-পাঁচ মাস আগে পর্যন্ত বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে স্বদেশ ও সংস্কৃতি চেতনা এবং উদার মানবিকতার কথা বলে এসেছেন তিনি। গোরায় ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের ব্যক্তির সঙ্গে ধর্মের, ধর্মের সঙ্গে সত্যের বিরোধ ও সমন্বয়ের ছবি দেখি। সমকালীন দেশীয় প্রবল সমস্যা হিন্দু সমাজ ও ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্বর্তনের সমস্যা—'গোরার' ব্যাপক পরিদৃশ্য রচনা করেছে। 'আইজ লাইক দ্য সী'তে নায়ক-নায়িকার জীবনে জড়িয়েছে যেমন হাঙ্গেরীয় সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লব, 'দ্য জু' উপন্যাসে দুই বন্ধু হুবা আর হারমনের জীবনে যেমন জড়িয়ে গেছে ইহুদীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নতির চেষ্টা ও পোলিশ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, 'গোরা'র মধ্যে তেমনি জড়িয়েছে একদিকে ভারতীয় সংস্কৃতির উদার মহত্ব, ব্রাহ্মণ্য গৌরব, সার্বভৌম করুণা ও সত্যনিষ্ঠা, অন্যদিকে সামাজিক বৈষম্য, আচার-বিচারের বাধা, জাতিভেদ সমস্যা, দারিদ্র্য ও মূঢ়তা। 'দ্য জু' উপন্যাসের মতো জাতিগত সমস্যা ও নৈতিক সমস্যা-জনিত তর্ক-বিতর্ক এই উপন্যাসেরও বিষয়। কিন্তু 'দ্য জু'-তে যেমন ব্যর্থতায় দেশত্যাগী হতে হয়েছে নায়ককে, 'গোরা'য় তেমনি স্বদেশপ্রেমিক উগ্র বিদ্রোহী নায়ক এক 'বিশ্বমানব-সত্য'কে পেয়েছে দেশ-জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে—যে কথা তিনি আগে সাধনাপর্বের সাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনায় বলতে চাইছিলেন।

কিন্তু চতুরঙ্গের প্রেক্ষাপট এমন ব্যাপক নয়। তবে শুধু ব্যক্তি-সম্পর্ক নিয়েই এর কাহিনী এগোয় নি। জাতীয় জীবনের সাধনা-ঐতিহ্যের একটি দিক এখানেও উদ্‌ঘাটিত। সেটি হলো আধ্যাত্ম সাধনার কথা। বাউল-বৈষ্ণব রস-সাধনার বিপজ্জনক রসালো দিকের কথা। রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকির কথা। তাছাড়াও আছে মানবসেবার কথা। মানব-সেবার নিষ্কাম আদর্শ ও সকাম স্বার্থপর নিষ্ঠুর লোক-দেখানো ফাঁকি দুটি দিকই চতুরঙ্গে পরিস্ফুটিত। গুরুবাদের এমন তীব্র সমালোচনা ওই যুগে আর কে করেছেন? 'ঘরে বাইরে'-র মধ্যে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে জাতীয়তার নামে যে উন্মাদনা স্থির বিচারবুদ্ধিকে বিচলিত করেছিল তারই বিশ্লেষণ আছে। বাংলাদেশের স্বদেশী বিপ্লবচেষ্টার ভাষ্য এবং আগামী অসহযোগ আন্দোলনের মুখবন্ধ এই ঘরে বাইরে। সন্দীপের মধ্যে স্বদেশী-আন্দোলনের আদর্শ ও মত্ততা দুই-ই উদ্‌ঘাটিত।

অনেকটা চতুরঙ্গের মতোই যোগাযোগ, শেষের কবিতা, দুই বোন ও মালঞ্চে সামাজিক সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে। নারী-ব্যক্তিত্বের বিকাশের সমস্যা এবং দাম্পত্যজীবনে সে সমস্যার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা যোগাযোগে আছে যদিও উইমেন্স লিব-এর পরিসমাপ্তি বড়ই আকস্মিক ও করুণ। 'শেষের কবিতায় সংস্কার ও সংস্কার মুক্তির চেষ্টা প্রেমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে স্বকীয় ও পরকীয় প্রেমের যুগপৎ বিকাশ দেখিয়ে। বিশেষ করে, এই যুগপৎ বিকাশের দ্বিধাকেই দেখানো হয়েছে। সামাজিক কৃত্রিম ফ্যাশনের অতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও 'শেষের কবিতা'র ঔজ্জ্বল্যের আর একটি কারণ। 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চে' শেষের কবিতার প্রেমকেই পুরুষের দিক থেকে বিচার করা হয়েছে।

কিন্তু সামাজিক সমস্যাকে ছেড়ে জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা আবার দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়ে।' অসহযোগ আন্দোলনের পর যে হিংসাত্মক আন্দোলন দেখা দিল তার মূল্য নির্ধারণের চেষ্টাই চার অধ্যায়ের বিষয়। স্বদেশী আন্দোলনে আত্মত্যাগ মহত্ত্বের প্রমাণ ঠিকই কিন্তু মহৎ আদর্শের উন্মাদনায় যদি ব্যক্তির মর্যাদা ও বিকাশ ব্যাহত হয় তবে সব মহৎ উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়। এলার সংস্পর্শে অতীন্দ্রের মনে দান্তে-বিয়াত্রিচে জন্ম নিয়েছিল। দান্তের মতোই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মধ্যে অতীন ঝাঁপ দিয়েছিল। হত্যার উন্মাদনায় মেতে নিজের স্বভাবকেই সে হত্যা করেছিল। একই উন্মাদনায় এলা নষ্ট করেছিল তার নিজের আদর্শকে। আর ইন্দ্রনাথ সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে ব্যক্তি বিকাশকে অবরুদ্ধ দেখেই দেশের মানুষকে ডেকে নেমে পড়েছিল সংস্কারের সাধনায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, সাধনা-পর্বে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে জাতীয় চেতনার যে আলোড়নের সঙ্গে নিজের শিল্পী-চেতনাকে একাত্ম করে দেবার জোরালো সমর্থন রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন য়োকাই ও ক্রাসজিউস্কির উপন্যাসে তাকে নানাভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন পরবর্তী ঔপন্যাসিক সাধনায়। হয়তো টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' তাঁকে বৃহৎ জাতীয় [illegible] প্রেক্ষাপট দেখিয়েছিল, জর্জ এলিয়টের 'ফেলিক্স হোল্ট' তাঁর কোনো কোনো চরিত্রের রেখায়নে প্রেরণা দিয়ে থাকবে, স্টিভেনসনের 'প্রিন্স অটো' হয়তো কাহিনীর কাঠামোর আভাসও দিয়ে থাকবে। কিন্তু য়োকাই ও ক্রাসজিউস্কির উপন্যাস যে জাতীয় শক্তির প্রাণকেন্দ্র থেকে উঠে আসছে, সাহিত্য তার সজীবতা রক্ষায় যে সেই প্রাণকেন্দ্রকেই কেন্দ্রবিন্দু করে থাকে—এমন কথা 'সাহিত্যের গৌরব' ছাড়া আর কোনো প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ এতখানি জোর দিয়ে বলেননি। তাই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক সাধনায় জাতীয় চেতনার প্রেক্ষাপটকে প্রসারিত করবার স্পষ্ট প্রেরণা-উৎস য়োকাই ও ক্রাসজিউস্কি।
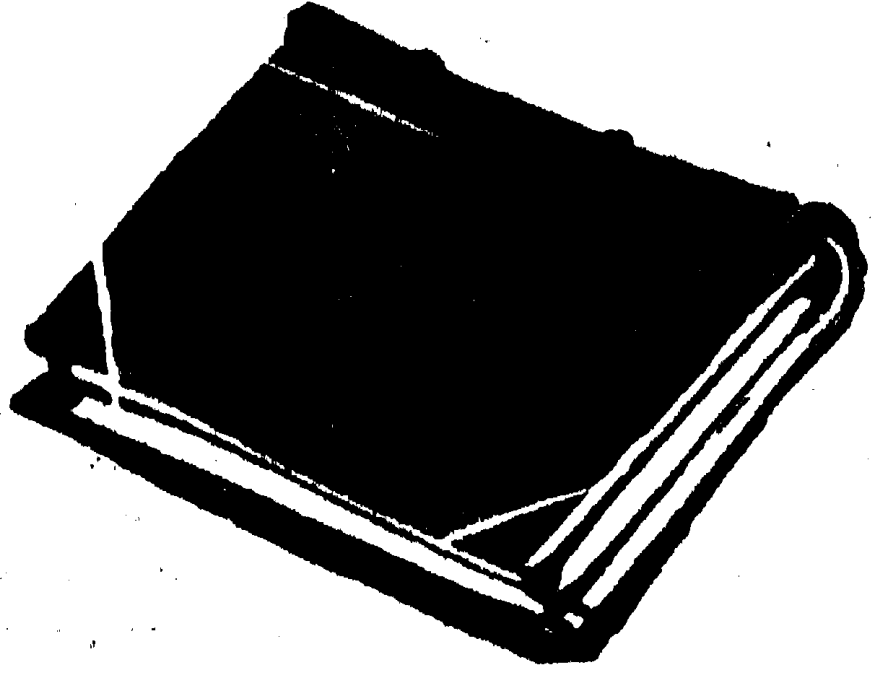
সাহিত্য ও সংস্কৃতি

চারজন রবীন্দ্রমনীষী সম্মানিত :

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সমাবর্তন উৎসবে সম্প্রতি চারজন রবীন্দ্র-মনীষীকে রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্যের সম্মান দেওয়া হোল। এঁরা হোলেন উমাশঙ্কর যোশী কৃষ্ণ কৃপালনী আবু সয়ীদ আয়ুব ও পঙ্কজকুমার মল্লিক। দুবছরের রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠান্তে দশজন ছাত্রছাত্রীকে রবীন্দ্রজ্ঞানতীর্থ উপাধি দেওয়া হয়।

প্রধান অতিথির ভাষণে মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রসাহিত্য পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গভীরতর আলোকপাত করেন। তিনি এই ইনসটিটিউট সম্পর্কে বলেন এই প্রতিষ্ঠান আমার যেন বহুদিনের স্বপ্নের একটা রূপ। যা আমি চেয়েছিলাম পারিনি এঁরা তা পেরেছেন।'

সভাপতি প্রমথনাথ বিশী চারজন প্রবীণ রবীন্দ্র-মনীষীর প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক সোমেন্দ্রনাথ বসুর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে তাঁরা 'রবীন্দ্র চর্চা' নামে একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশ করতে ব্রতী হয়েছেন।

সারা বাংলা সাহিত্য সম্মেলন :

মাসিক সাহিত্য পত্রিকা নীলিমার পরিচালনায় সম্প্রতি সোদপুরে সারা বাংলা সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের লেখক লেখিকারা এই সম্মেলনে অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কবি যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শান্তশীল দাস বিমল বসু ও প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্মেলনের আহবায়ক 'নীলিমা'র সম্পাদক শেখ সদরুদ্দিন বিশেষভাবে এই সাহিত্য সম্মেলন আহবানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন উদ্দেশ্য একটিই নবীন স্রষ্টারা যাতে তাঁদের প্রয়াসকে অব্যাহত রাখতে পারেন।

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণ-সভা :

বরানগর ময়রাডাঙ্গা স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দ ও আমরা' সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি বক্তার আলোচনা থেকে যে কথাটি স্পষ্ট হয় তা হোল যে শ্রীঅরবিন্দ দেশের যুবশক্তির জন্য কল্যাণমূলক কর্মে আত্মনিয়োগের এক প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন দেশের এই দুঃসময়ে আজকের যুবগোষ্ঠীকে এই দৃষ্টান্তকেই পাথেয় করে এগিয়ে যাওয়া উচিত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক পরেশনাথ ভট্টাচার্য।

বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি :

অনুশীলন ভবনে সম্প্রতি একটি শুচি-স্নিগ্ধ সভায় বিশিষ্ট বিপ্লবী ও সাংবাদিক ও কবি জগদানন্দ বাজপেয়ী খুশীময় সেন ও হেম দাশগুপ্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বিপ্লবীদের কর্মজীবন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা শ্রীবিনোদ দাস ও শ্রীদীনেশচন্দ্র ঘটক। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন।

প্রতিযোগিতা :

ভবানীপুর পাঠাগারের পরিচালনায় নিখিল বঙ্গ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবারও অনুষ্ঠিত হোতে চলেছে। প্রতিযোগিতার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে গল্প কবিতা প্রবন্ধ একাংক নাটক রচনা আবৃত্তি চিত্রাঙ্কন রবীন্দ্রসংগীত এবং একাংক নাটক অভিনয়। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৩১শে জানুয়ারী। যোগাযোগের ঠিকানা সম্পাদক ভবানীপুর পাঠাগার ২৪ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ রোড কলকাতা ২৫।

ঔপন্যাসিকের লোকান্তর :

সর্বাধিক বিক্রীত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ক্রাইস্ট স্টপড্ এ্যাট এবোলির এর লেখক সম্প্রতি কারলো লেভি রোমের এক হাসপাতালে সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বই পড়ুয়ার সংখ্যা :

নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাত্যহিক যে সংগ্রাম তা থেকে বেশ কিছু মুহূর্ত ছিনিয়ে নিয়ে মনকে আমরা অন্য আর এক অনুভূতিতে ভরিয়ে তুলতে চেষ্টা করি। উদ্দেশ্য গতানুগতিকতায় পরিশ্রান্ত না হয়ে আমরা যেন নতুন কোন এক ছন্দে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারি। এ কথা গভীরভাবে স্বীকৃত যে বইয়ের পাতায় ডুব দিলেই এই অনুভূতি সব থেকে গভীরতর হয়। ইউনেস্কোর তথ্যে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকেরা যত বই পড়ে তত বই বোধকরি আর অন্য কোন দেশের লোক পড়ে না। শিশু থেকে বৃদ্ধ প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিকের কাছে বই হোল প্রতি মুহূর্তের আনন্দ-বেদনার সঙ্গী। কিছুদিন আগে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে সোভিয়েত নাগরিকদের ৭০ শতাংশই অবসর বিনোদনের জন্য বই পড়াকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে সংগৃহীত নানা তথ্য থেকে জানা যায় যে একজন সোভিয়েত নাগরিক একদিনে বই পড়ার জন্য নিয়োজিত করেন গড়পড়তা ৩১ মিনিট অন্যদিকে একজন মার্কিন নাগরিক দৈনিক বই পড়ায় সময় খরচ করেন ৬ মিনিটেরও কম।

শুধু শহরের অধিবাসীদেরই বই প্রীতি নেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পল্লীঅঞ্চলেও বই পড়ুয়ার সংখ্যা অনেক বেশী। সোভিয়েত পাঠকদের জন্য আছে ৩৬০০০০টি লাইব্রেরী ও মোট বই সংখ্যা ৩৩০ কোটি। তা ছাড়া সমাজবিজ্ঞানীদের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় ৯৫ শতাংশ পরিবারের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী আছে। বই পড়ার ব্যাপারটি সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন একটি নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাক-বিপ্লব যুগে সে দেশে প্রতি চারজনের মধ্যে প্রায় তিনজনই লিখতে বা পড়তে জানতেন না।

অল্প মূল্যে বই প্রকাশ করলে দেশের সাধারণ লোক তা সংগ্রহ করতে পারে। এ ব্যাপারে সোভিয়েত বই প্রকাশকরা অনুকরণ করার মতো নজীর সৃষ্টি করেছেন। প্রচুর বই সেখানে প্রকাশিত হোচ্ছে লেখক তালিকায় রয়েছেন স্বদেশী এবং বিদেশী সবাই। প্রতি মিনিটে সেখানে প্রায় ৩ হাজার এবং প্রতিদিন গড়ে ৪০ লক্ষেরও বেশি বই-এর কপি প্রকাশিত হোচ্ছে। বিদেশী লেখকদের নানা রচনার অনুবাদ প্রকাশের ব্যাপারেও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম স্থান দাবী করতে পারে। একটি তথ্য থেকে জানা যায় সেখানে প্রতি বছর বিদেশী লেখকদের লেখা ৪ হাজার পর্যন্ত নতুন বই প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়।

পর্যালোচনা করে দেখা গেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে সোভিয়েত ও রুশ এবং বিদেশী ধ্রুপদী সাহিত্যের জনপ্রিয়তা খুবই বেশী। আধুনিক সাহিত্যেরও সেখানে চাহিদা রয়েছে। সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন অবলম্বনে নানা স্বচ্ছন্দ রচনা বিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞান ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ক নানা তথ্যসমৃদ্ধ বইয়ের প্রতিও সেখানকার পাঠক-মহলের রয়েছে সীমাহীন আসক্তি। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল শিশু ও কিশোরদের জন্য প্রাণবন্ত সাহিত্য সৃষ্টি। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত প্রতি ছখানা বইয়ের মধ্যে একটি অন্ততঃ শিশু ও কিশোর সাহিত্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বই পড়ুয়ার সংখ্যা ক্রমাগতঃ এতই বেড়ে চলেছে যে দেশের প্রায় ৫০ হাজার বইয়ের দোকানও মাঝে মাঝে তাদের প্রত্যাশিত পরিতৃপ্তি দিতে পারছে না। কিন্তু যে বইটি চাই সেই বইটি তো পেতেই হবে এই ধারণাই যেখানে প্রবল সেখানে এ ব্যাপারে অন্য আরো তৎপরতা দেখা দিয়েছে। গ্রন্থ-অনুরাগীদের একটি স্বেচ্ছা সমিতি সেখানে গঠিত হয়েছে। এই সমিতি চেষ্টা করবে কি করে জনসাধারণের বই পড়ার আসক্তিকে পরিপূর্ণতায় নিটোল করে তোলা যায়। সোভিয়েত সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই সমিতি গঠন নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

নতুন বই

বাঁধর বৃত্ত—ধীরেন হোম। প্রকাশক: প্রাইমা পাবলিকেশনস ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা—৭। মূল্য : সাড়ে সাত টাকা।

হঠাৎ হঠাৎ এমন অনেক বই হাতে এসে পড়ে যা পাঠ করে রীতিমত রোমাঞ্চ অনুভব করতে হয়। তবে বলাই বাহুল্য সে অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে খুব কমই আসে।

সেদিক থেকে বলতে বাধা নেই ধীরেন হোম রচিত বাঁধর বৃত্ত আমাদের চমকিত করেছে। সবচেয়ে বিস্মিত করেছে এর পরিবেশনের ভংগী ভাষা চয়ন এবং পরিবেশ রচনার দক্ষতা। চরিত্রকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে কাব্যমন্ডিত ভাষা ও ভাষার অলংকরণ যে কোন দক্ষ লেখকের সমকক্ষ।

এ উপন্যাসের অনেকটাই রাজনৈতিক চেতনার চিহ্নিত হলেও ফল্গুধারার মত এমন একটি বিষণ্ণতা সমস্ত উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে যা সহজেই মনকে আক্রমণ এবং আবেগে সিক্ত করে।

তাই মঞ্জু ভাবের পরিবর্তনে তার হৃদয়ের আর্তি রাণীর পরিণতি এবং ভাস্কর বসুর সংযত আবেগ আমাদের মনের গভীরে সূক্ষ্ম বেদনার মত আবেগপ্লুত করে।

কিন্তু এ উপন্যাসের সবচেয়ে বড় সম্পদ লেখকের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার দক্ষতা।

বৃটিশ আমলের রাজনৈতিক অস্থিরতা জনগণের স্বাধীনতা লিপ্সা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বস্তরের স্বাধীনতাকামী মানুষের ভূমিকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেসের আন্দোলন প্রতিজ্ঞা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন মতবাদ ও স্বাধীনতার পটভূমিতে তার ভূমিকা অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট মহাযুদ্ধ বিশ্ব-জনতার সঙ্গে ভারতীয় মুক্তিকামী মানুষদের একাত্ম হবার প্রচেষ্টা—অন্যদিকে 'ভারতে নব-গণ-জাগরণের ভিত্তি জাতীয়তাবাদের' সঙ্গে সঙ্গে 'বন্দেমাতরম' এবং 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'-এর ধর্মীয় বিচার-বিশ্লেষণ এবং তা নিয়ে মতভেদ পরে নেতাদের স্বার্থে দেশকে দ্বিখন্ডিত করে স্বাধীনতা প্রাপ্তি (অবশ্যই যার সুযোগ নেওয়া হয় দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করে। যার বলি হয় লক্ষ লক্ষ নিরীহ হিন্দু মুসলমান) দেশ ভাগের পর জনগণের সন্ত্রস্ত জীবন যাপন এবং তার পরবর্তী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন লেখক যেন নিষ্ঠা সহকারে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে তার উপন্যাসের মাধ্যমে।

লেখক যে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে কত সচেতন এবং ঘটনাবলী তাঁর নখদর্পণে তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। মনে হয় লেখক যেন নিজের রাজনৈতিক জীবনের আত্ম-কাহিনীই বলছেন।

ওরা সত্তরের যীশু (কাব্য সংকলন)—সম্পাদক : পান্নালাল মল্লিক। শুকসারী প্রকাশক ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড কলকাতা—১৪। দু'টাকা।

বারোজন কবি এবং সকলেই তরুণ। এঁদের প্রত্যেকের কমপক্ষে দুই থেকে পাঁচটি পর্যন্ত কবিতা আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বয়সে তরুণ কবিতাগুলির কাব্য দেহে ও গভীর গোপন প্রাণভূমিতেও সেই ভয়ংকর তারুণ্য। এই তারুণ্য কোন কবির লেখনীতে সংযত কোন কবির কাছে তা আগামী দিনের প্রত্যাশায় আলোময়। অলক্ষ্য পংকের গর্ভে পদ্মের প্রত্যাশায় মুঠো হাত উৎক্ষেপিত। অর্ধমৃত সংশয়ের কীটই—একজন কবির এই সাচ্চার চিন্তার পাশাপাশি আর একজনের বিনম্র কণ্ঠের কাছে প্রেমের অকুন্ঠ কথন—'আমার হৃদয়ের জ্বালাটুকু দিয়ে। প্রতিকারে নতজানু হবো! নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে এই সংকলনের সমস্ত কবিই আন্তরিকতা বজায় রাখতে পেরেছেন এটাই পাঠক হিসেবে আমাদের প্রধান আশার বিষয়।

সংকলন ও পত্র পত্রিকা

কৃশাণু : সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র সিংহ। শারদীয় গল্প সংখ্যা। ৩০।১এ কলেজ রো কলকাতা ... দাম : দু টাকা।

ত্রৈমাসিক কৃশাণুর সপ্তম বর্ষে পদার্পণ হোল এ সংখ্যা থেকেই। অন্যান্য বছরের মতো এবারেও ইতিকাটি যে বৈশিষ্ট্যদীপ্ত হোতে পেয়েছে তা স্বতন্ত্র স্বাদের কয়েকটি গল্প পড়লেই বোঝা যায়। যে কজনের গল্প মন ও মননকে ছুঁয়ে যায় তারা হোলেন রত্নেশ্বর বর্মন প্রভাসকান্তি ভদ্র কিরণ মৈত্র সরসী সরকার দীনেশচন্দ্র সিংহ।

আবর্ত : সম্পাদক : দীপাঞ্জন দত্ত। ২।৪৩ নাকতলা। কলকাতা-৪৭। দাম : এক টাকা।

পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও সূক্ষ্ম শিল্পবোধ এই সংখ্যাকে উজ্জীবিত করেছে। প্রবন্ধ গল্প কবিতা নাটকে এর প্রমাণ আছে। গল্প লিখেছেন অমলেন্দু সুর অসীম চক্রবর্তী কমলকুমার মজুমদার। মণীন্দ্র রায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবিতা সিংহ রত্নেশ্বর হাজরা প্রতিমা সেনগুপ্ত উজ্জ্বল ভট্টাচার্য প্রভৃতির কবিতা [illegible]

কবিতা

দুটি কবিতা॥

বনফুল

অবিস্মৃত

এসেছিল সম্মুখে আমার, চেয়েছিল
কি যেন বলিতে। অন্তরের মঞ্জুষায়
কি যেন গোপন মণি এনেছিল হায়
দেখাবে বলিয়া। কিন্তু তারে আবরিল
সহসা কি গাঢ় লজ্জা, কিছু বলিল না।
অবনত শিরে শুধু চিত্রার্পিত প্রায়
দ্বিধা-স্নিগ্ধ অপরূপা সে অনির্বচনা
দাঁড়ায়ে রহিল শুধু মৌন মহিমায়।

তারপর কত বর্ষ যুগ-যুগান্তর
কাটিল জীবনে মোর। কিন্তু সে ছবি
আজও দেখি। হয় নাই কিছু রূপান্তর।
নীরবে সে যেন আজও গাহিছে পূরবী।
সংকোচে দাঁড়ায়ে আছে, নয়ন সন্নত
শ্রাবণের মেঘে ঢাকা পূর্ণিমার মতো।

সে

যে জন আমার মাঝে গুণী-গুণ-গ্রাহী,
যে জন পূর্ণিমা রাতে জ্যোৎস্না অবগাহি'
চরিতার্থ হয়, অন্ত-হারা সীমাহীন
অশান্ত জলধি যার বুকে কাব্য-বীণ
ঝঙ্কারিয়া তোলে, অভ্রভেদী হিমালয়
যার কাছে সমুন্নত পরম বিস্ময়,
সন্ধ্যা-ঊষা-ঝঞ্ঝা-মেঘ যাহার বুকেতে
বিচিত্রার বার্তা আনে, সুখেতে দুখেতে
যে খুঁজিছে চিরকাল কোথা অন্তর্যামী,
আমি? সে কি আমি, সে কি আমি, সে কি আমি?

জানি শুধু জানি না তো তার পরিচয়
জানি শুধু তুচ্ছ আমি সেই কবি নয়।
সে খেয়ালী অমরাবতীর। পুষ্প সম
অনবদ্য গন্ধ-বর্ণ-ছন্দে অনুপম
ফুটে ওঠে মাঝে মাঝে মোর আঙিনায়
ক্ষণিকের মহোৎসবে। ফের চলে' যায়।
সে অধরা মাঝে মাঝে ধরা দেয় যবে
সব শূন্য পূর্ণ করে বিস্ময়ে বৈভবে!

যুবক যুবতী

ক্রিকেট

শীতকাল—চারদিকে খেলাধুলো পিকনিক হৈ-হুল্লোড় লেগেই আছে। শীত পড়তে না পড়তেই ক্রিকেট খেলার ধুম পড়ে যায় সর্বত্র। এবারের বিরাট আকর্ষণ ছিল কলকাতার ইডেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারতের টেস্ট ম্যাচ। ট্রামে বাসে অফিস কাছারীতে সে কদিন সবারই আলোচ্যবস্তু ঐ এক টেস্ট ক্রিকেট। গত ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত মহাসমারোহে কলকাতার টেস্ট শেষ হয়েছে। টেস্ট ক্রিকেটের দৌলতে স্কুল কলেজের অনেক ছেলেমেয়েরা টেলিভিসন সেট দেখেছে টেলিভিসনে খেলা দেখেছে। গ্রাম গ্রামান্তরে মফঃস্বলে শহরতলীতে সর্বত্র রেডিও ঘিরে প্রচণ্ড ভীড়—খেলার ধারাবিবরণী—কত রান হল জানার কত আগ্রহ। ক্রিকেট টিকিট নিয়ে প্রাণান্ত। মারামারি করে লাইন দিয়ে কুপন কেনা কুপনে টিকিট উঠলো কিনা জানার কত আগ্রহ। কালোবাজারে অনেকে বেশী দামে টিকিট কিনে খেলা দেখতে গিয়ে পুলিশের শিকার হয়েছে—ওটা নাকি জাল টিকিট! আজকার ছেলেমেয়েদের খেলা নিয়ে কত আগ্রহ। ছোট বড় সবার মুখেই ক্রিকেট। টেস্ট ম্যাচের পরেই মহিলা ক্রিকেট আসর জমিয়ে তুলেছে। বাংলা মহিলা দল জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে আবার প্রমাণ করল বাংলার মেয়েদের ক্রিকেট-প্রীতি কত গভীর!

স্কটিশ চার্চ কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী শিখা দাসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল এই ক্রিকেট নিয়ে। হাসিখুশি মিষ্টি স্বভাব বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডল। খেলাধুলোয় প্রচণ্ড আগ্রহী। ইডেনের টেস্ট ম্যাচ সম্বন্ধে তিনি জানালেন—ভারতের খেলা এখনো ততো উঁচুমানের হয় নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কাছ থেকে এখনো আমাদের অনেক শেখবার আছে।

—আপনি কোন্ বিষয়ে আলোকপাত করছেন?

শিখা দাস

—ওদের দলের ফিল্ডিং অদ্ভুত। খেলায় পার্টি ক্রিকেটারের কি সিন্সিয়ারিটি। এমন না খেললে কি আর খেলা হলো। আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে বোধহয় সিন্সিয়ারিটির কিছুটা অভাব আছে। তাছাড়া রয়েছে অনিশ্চিত ঝুঁকি নিয়ে রান করার প্রবণতা। যেসব ত্রুটি আছে সেসব ওদের মধ্যে নেই।

—ভারতীয় দলের কার খেলা আপনার সবচেয়ে ভালো লেগেছে?

—বিশ্বনাথের। পর পর দুটি টেস্টে ভারতের অসম্মানিত বিজয় বীর বিশ্বনাথের প্রচেষ্টায় ইডেনে উদিত হয়েছে নতুন করে।

সিদ্ধার্থ হাজরা

তার ধৈর্যের সঙ্গে খেলা—অনেকদিন মনে থাকবে।

—ওদের খেলা কেমন লাগলো?

—সেটা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে। লয়েডস রবার্টস কালিচরণ প্রত্যেকের খেলাই ভালো লেগেছে। তবে ইডেনের মাঠে কালিচরণের তেমন খেলা আর দেখতে পেলাম কই?

—দলে বাংলার কেউ ছিল না এবিষয়ে আপনার ক্ষোভ নেই? —জিজ্ঞাসা করি।

—নিশ্চয়ই আছে। গোপাল বসুকে অবশ্যই নিতে পারতো। সব ক্রিকবাজী। ক্রিকেট বোর্ড বাঙালীকে সুযোগ দিতে চায় না।

—ক্রিকেট টিকিট নিয়ে এতো কেলেঙ্কারি হল—এবিষয়ে আপনার ধারণা কি?

—এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই জড়িত। তদন্ত একটা সস্তা চাল। বেশী দামে কালোবাজারে টিকিট পেয়েছে অনেকে অথচ যারা সত্যিকার ক্রিকেটপ্রেমী তারা টিকিট পায় নি।

—ভবিষ্যতে এ[illegible]র দুর্নীতি বন্ধ করতে পারা যায় কি করে বলতে পারেন?

—জনসাধারণের সামনে লটারীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাছাড়া কাউন্টারে বেশী টিকিট বিক্রীর ব্যবস্থা করা উচিত।

—এতে কি সমস্যার সুরাহা হবে? তখন তো লাইন নিয়ে মারামারি হবে।

—পুলিশ কর্তৃপক্ষ সতর্ক এবং সৎ হলে কোন সমস্যা হবে না। ইডেনে তো কোন অশান্তিই হয় নি।

—আচ্ছা তরুণ ছাত্রছাত্রী যারা নাকি ক্রিকেট চর্চা করে ক্রিকেটকে ভালবাসে তাদের জন্য কি করা যায়?

—স্কুল কলেজের খেলোয়াড় অনুসারে কোটা নির্দিষ্ট করে টিকিট দিতে হবে। ছাত্রদের টিকিটের দাম হবে অপেক্ষাকৃত কম।

এতক্ষণ আমাদের আলোচনা শুনছিলেন অনেকেই। এবার আলোচনায় যোগ দিলেন বেহালার তরুণ ছাত্র অশোককুমার সরকার। মনে তার নানা বিক্ষোভ। স্কুলে ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা নেই। পাড়ার ছেলেরা চাঁদা তুলে ব্যা[illegible]

বল কিনল কিন্তু খেলার জায়গা নেই। অগত্যা গলিতে রাস্তার ওপরেই ক্রিকেট চর্চা। অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইডেনের টেস্ট দেখার সৌভাগ্য তার হয় নি—আরো কত কি!

—তোমার সব কথাই বুঝতে পারলাম। এমন একটা রাস্তা বাতলে দেও না যাতে আমরা আরো বেশী সংখ্যায় খেলা দেখতে পারি?

—কেন সরকার আরো বড় স্টেডিয়াম করতে পারেন। সেখানে আরো বেশী সিটের ব্যবস্থা হতে পারে।

—বেশী টি ভি সেটের ব্যবস্থা করলে ক্ষতি কি?

—দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? তাছাড়া এবার টি ভি-তেও ভালো খেলা দেখা যায় নি। ইংরাজীতে ভাষ্য থাকায় আমরা তেমন বুঝতে পারিনি। বাংলায় ভাষ্য প্রচারে অসুবিধা কি হতো?

ছিন্ন আলোচনার সূত্র ধরে শিখা দেবী বলে উঠলেন—নিশ্চয়ই এটা কর্তৃপক্ষের অন্যায় হয়েছে।

এবার শিখা দেবীকে মহিলা ক্রিকেট সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। শিখা দেবী স্মিতহাসি হেসে জবাব দিলেন—মেয়ে বলে নাক সিঁটকোবার দিন চলে গিয়েছে। মহিলা ক্রিকেট সমিতি গঠিত হয়েছে। বাংলার মেয়েরা চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

—মহিলা ক্রিকেটের সমস্যা সম্বন্ধে কিছু বলুন না অনুরোধ করি।

—ছেলেদের মতো ক্রিকেট অনুশীলনের সমান সুযোগ মেয়েদের নেই। বিশেষ করে বেশীর ভাগ স্কুল কলেজে মেয়েদের ক্রিকেট চর্চার কোন ব্যবস্থা নেই। যেসব জায়গায় মেয়েদের সংস্থা রয়েছে সেখানে কিংবা মেয়েদের কলেজগুলোতে অবশ্যই ক্রিকেটের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রয়োজন হলে সরকারকে এবিষয়ে অর্থ সাহায্য করতে হবে।

আর এক ক্রিকেটপ্রেমিক বঙ্গবাসী কলেজের সিদ্ধার্থ হাজরা জানালেন—আমাদের খেলাধুলার নানা সমস্যা! সরকারের উচিত এবিষয়ে আরো মনোযোগ দেওয়া। মাঠের অভাব কোচের অভাব টাকা পয়সার অভাব।

আমি প্রশ্ন করি এতো সব অভাব কাটিয়ে কি করে ওপরে ওঠা যায় বলুন তো?

—আমাদের নিজেদের উদ্যোগের সংগে সংগে সরকারী তৎপরতাকে যুক্ত করে দিতে হবে। সারাক্ষণের জন্য অনুশীলন বজায় রাখতে হবে। হুজুগে মেতে দুচারদিন ক্রিকেট ক্রিকেট করলাম তারপর সব শেষ এমনটি হলে ভালো খেলোয়াড় তৈরী হবে না। যারা খেলতে পারে তাদের শেখাতে হবে সুযোগ দিতে হবে।

—আচ্ছা খেলোয়াড় নির্বাচন বিষয়ে যে অনেকের বিক্ষোভ রয়েছে। এবিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

—বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের মাধ্যমে ক্রিকেটার নির্বাচন হতে পারে। সেই নির্বাচিত খেলোয়াড়দের প্রদর্শিত খেলা থেকে জাতীয় দল নির্বাচন অনেক সহজ হবে।

—সত্যিকার ক্রিকেটার হওয়ার পেছনে অর্থনৈতিক সমস্যাও তো রয়েছে, কি বলেন?

—নিশ্চয়ই। সারা বছর যাতে খেলোয়াড়রা হেসেখেলে অনুশীলন চালাতে পারে সেজন্য সরকারকে তাদের আর্থিক দায়িত্ব নিতে হবে। একবার তারা তৈরী হয়ে গেলে অন্যদেরও তারাই খেলা শেখাতে পারবে।

—আচ্ছা সিদ্ধার্থবাবু সবাই তো বলে ক্রিকেট বড়লোকের খেলা। আমাদের গরীব দেশে ক্রিকেটের চর্চা কি সঙ্গত?

—আমরা গরীব নিশ্চয়ই। তবে বড়-লোকদের দেশের যুবক-যুবতীদের মতো হাত-পা-বুদ্ধি সবই আমাদের আছে। সুতরাং যথাসাধ্য চেষ্টা করতে আপত্তি কি ক্রিকেট বাদ দিয়ে ভাবাই যায় না।

আজকের তরুণ-তরুণীদের খেলাধুলোর আগ্রহ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গিয়েছে। তারা সুযোগ চায়—তারুণ্যের সদ্ব্যবহার আশা করে। আমাদের কর্তৃপক্ষ এদিকে আরো নজর দেবেন এই তাদের কামনা।

—অমর দাশ

রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর বয়স

গত ২০ ডিসেম্বরের সাপ্তাহিক অমৃতে শ্রীপ্রবীর ঘোষের চিঠির (২৭।৯।৭৪) পরিপ্রেক্ষিতে 'রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর বয়স' প্রসঙ্গে বিয়ের পর কাদম্বরী দেবী পনেরো বছর ন' মাসের মতো বেঁচে ছিলেন বলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র জীবনী' গ্রন্থ থেকে যে তথ্য তুলে দিয়েছিলাম, সেই প্রামাণিক তথ্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে শ্রীকার্তিক দত্ত গত ১০ই জানুয়ারির অমৃতে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে এই অংশটি তুলে ধরেছেন তাঁর চিঠিতে : 'আমাকে কত প্রভাতে কত দ্বিপ্রহরে কত সন্ধ্যাবেলায় সে দেখিয়াছে। কত বসন্তে কত বর্ষায় কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম! সে আমাকে কত স্নেহ করিয়াছে, আমার সঙ্গে কত খেলা করিয়াছে আমাকে কত শত-সহস্র বিশেষ ঘটনার মধ্যে খুব কাছে থাকিয়া দেখিয়াছে। যে আমাকে সে জানিত সে সেই সতেরো বৎসরের সুখ-দুঃখ, সতেরো বৎসরের বসন্ত বর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই আমার এই সতেরো বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধুলো লইয়া তাহাকে সাড়া দিত। ইহাকে সে ছাড়া আর কেহ জানিত না জানে না।......' এই সূত্রে পত্রলেখক শ্রীদত্ত প্রশ্ন রেখেছেন যে, কাদম্বরী দেবী পনেরো বছর ন' মাসের মতো বেঁচে থাকলে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সতেরো বছর মেলামেশা করেছেন কেমন করে? বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত কাব্যিক সুষমামণ্ডিত বিবৃতি একান্তভাবেই আবেগ-প্রধান। উদ্ধৃত রচনাংশের ক্ষেত্রে কবি নিখুঁত সাল-তারিখের কচকচি মনে না রেখে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে লিখতে গিয়ে অচেতনভাবে 'সতেরো বৎসর' লিখেছেন বলে আমার মনে হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর বিয়ে হয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাইয়ে এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হেমলতা ঠাকুরের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিলে কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন। কাদম্বরী দেবীর বিয়ের তারিখ থেকে তাঁর মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত হিসেব করলে দেখা যায় যে, তিনি বিয়ের পর পনেরো বছর ন' মাসের মতো বেঁচে ছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই তথ্যটিকে সকলেই স্বীকার করেন। অতএব, এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবেগময় কাব্যিক জবানবন্দীকে মেনে নেওয়া অপেক্ষা সাল-তারিখের নিখুঁত এবং সর্বজনস্বীকৃত ও ইতিহাসসম্মত তথ্যকে মেনে নিলে কার্তিকবাবুকে অনর্থক এভাবে চিঠি লিখতে হত না বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস।

কাজী মুরশিদুল আরেফিন,
সাগরদ্বীপ, চব্বিশ পরগণা।

চিঠিপত্র

নেশা ও মাদকতা

গত ১৩ ডিসেম্বরের অমৃতে যুবক-যুবতী বিভাগে 'নেশা ও মাদকতা' সম্বন্ধে পড়লাম। অমর দাশ মহাশয়ের সমীক্ষা-ভিত্তিক রচনাটি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল আমিও যেন অনিল হাজরা কি শ্রীমান ঘোষের সমগোত্রীয়। ও'দের মত আমিও যেন নেশা মাদকতার শিকার হয়ে পড়ছি। প্রেমে আঘাত পেয়ে কিংবা চাকরীর চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ হলে যখন মনে আসে হতাশা তখন নেশার আশ্রয় নিতে মন ভীষণ উতলা হয়ে উঠে। মা বাবা কি দাদার নিষেধ সত্ত্বেও লুকিয়ে-চুরিয়ে সিগারেট খাওয়া কি মেনড্রেকস এল এস ডি গ্রহণে মজা লাগে যেমন তেমন নেশাও হয়। বাবা কড়া প্রকৃতির মানুষ। তাই বাবার কাছ ঘেঁষি না। যত আবদার মার কাছে। সিনেমা যাবার নাম করে মার কাছ থেকে টাকা নিই, আবার কখনো বাজারের পয়সা থেকে পয়সা সরিয়ে নেশা করি। তাছাড়া আছে বন্ধুবান্ধব। তাদের পাল্লায় পড়ে ড্রিংক-সও বাদ যায় না।

মাঝে মধ্যে নেশাপ্রবণতার বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মনে হয় আমি তো ঠিক পথে চলছি না। ভ্রান্ত পথে চলার কুপ্রভাব আমার জীবনে প্রতিফলিত হবে। আমি হয়ে পড়ব নেশার দাস। আজ না হয় বেকার, বাপের অন্ন ধ্বংস করছি আর মন যা চায় তাই করছি। কুসংসর্গে মিশে নেশা-ভাঙ করে বাবার টাকা ওড়াচ্ছি। কিন্তু এমন দায়িত্বহীন ভাবে তো সারা জীবন কাটতে পারে না। আজ না হয় দু'দিন পরেও তো চাকরী পেতে পারি, তখন সংসারের দায়িত্ব আপনা থেকে কাঁধে এসে চাপবে। তারপর আছে নিজের সংসার। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে বাঁচতে হলে তখন নেশা করা যাবে না অর্থের অভাবে। তাছাড়া পুত্র কন্যা বড় হয়ে যদি দেখে তাদের বাবা নেশা করে তাহলে তাদের মনের অবস্থা কেমন হবে! হয়ত তারা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিপথে পা বাড়াতে অনুপ্রাণিত হতে পারে। তখন স্বখাত সলিলে ডুবে মরা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

আমার মনে হয় আপন মনের অনুরণন আমার মত অনেক তরুণ-তরুণীর মধ্যে জাগে। কিন্তু হতাশা, ব্যর্থতা, অন্ধকার ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তার জন্য তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না তাদের মনে। দুর্বল মন স্বভাবতই জীবন থেকেই পালানোর জন্যে নেশার খপ্পরে গিয়ে পড়ে। ভাবে নেশার মধ্যেই বুঝি সব দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় না উপরন্তু দুঃখই বেড়ে চলে। এ যেন আলেয়ার হাতছানি, মরু পথ-যাত্রীদের সামনে মরীচিকার মত তাদের ঘুরিয়েই মারে দুঃখ কষ্ট বেকারত্ব ভুলিয়ে দেবার পরিবর্তে।

নেশারূপ আলেয়ার হাতছানি, মরীচিকা মায়ার খপ্পর থেকে আধুনিক যুগের যুবক-যুবতীদের উদ্ধার করার পথ কে বাতলাবে? আমার তো মনে হয় নীতিকথা, উপদেশ বর্ষণ করে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের নেশা ছাড়ানো যাবে না। স্কুল কলেজ লেখাপড়ার সুযোগ দিয়ে যেমন তাদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে ঠিক তেমনি শিক্ষার আলোক-প্রাপ্ত যুবক-যুবতীদের আত্মনির্ভরশীলতার সুযোগ করে দিতে পারলে তাদের অবাঞ্ছিত বদনেশার খপ্পর থেকে উদ্ধার করা দুঃসাধ্য হবে না বলে মনে হয় নাকি!

বিশ্বন মিত্র,
আমলাদাহি, চিত্তরঞ্জন।

গ্যালারী থেকে –
(তৃতীয় টেস্ট প্রসঙ্গে)

ইডেনে ১৯৭৪ শেষ থেকে ১৯৭৫ শুরুতে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচকে ঘিরে যা ঘটে গেল তা এখন স্মৃতি মাত্র। তৃতীয় টেস্টকে ঘিরে আমাদের অনেকের অনেক হিসাব বা কল্পনা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে—আর সেটাই ক্রিকেটের আসল চরিত্র। ক্রিকেটে খেলার শেষ বল পর্যন্ত গুরুত্ব থাকে, তাই পূর্বাভাস দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয় সর্বদা। ইংল্যান্ডের ভরাডুবি এবং পর পর দু-দুটো টেস্টে শোচনীয় পরাজয়ের পর ক্রিকেট জগতে আমাদের হাওয়া উল্টোদিকে বইতে আরম্ভ করেছিল। আমরা প্রত্যেক ক্রীড়ানুরাগী একটা পরিবর্তন [illegible] ছিলাম ঐকান্তিক ভাবে—কিন্তু পরিবর্তন যে আসবেই এবং এত দ্রুত তা অনেকেরই কল্পনায় ছিল না। জয় আমাদের হয়েছে এবং সে জয় নিঃসন্দেহে অর্জিত।

তৃতীয় টেস্টের প্রথম থেকেই চমক ছিল। তবে তখনই খেলার গতি-প্রকৃতি আঁচ করে নেওয়া বোধহয় সম্ভব ছিল না। দল বিন্যাসের পর টসে জয়লাভ করে ভারত প্রথম ব্যাট নেয়। রবার্টসের দিনের প্রথম বলেই নায়েক আউট। প্রথম বলেই আউট হবার নজীর নতুন নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে নায়েকের আউট কি নায়কোচিত হয়েছে? তারপর থেকেই আমাদের মাঝারি ব্যাটস-ম্যানদের নড়বড়ে চিত্রটি ফুটে উঠতে শুরু হোল। শর্মা টেস্ট ম্যাচ আবির্ভাবে রীতিমত সাড়া জাগানো খেলা খেলেছিলেন—ইডেনে এসে তিনি যেন থমকে দাঁড়ালেন—ভরসা ছিল তখন ঐ বিশ্বনাথকে ঘিরে। বিশ্বনাথ প্রথম থেকেই ভাল খেলছিলেন—তাঁর প্রথম ইনিংসটিতে উচ্ছ্বাস ছিল না, কদাচও বাজে বল মারতে কার্পণ্য করেননি। অপরদিকে

মদনলালের খেলায় চটক ছিল। প্রতিটিক্ষণ তিনি আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন। রান পেয়েছেন, মার যে সব সময় কেতাব-দুরস্ত হয়েছে তাও নয়, তবে কাজের কাজ হয়েছে। প্রথম দিনের খেলা শেষ হবার কিছু আগে ভারত প্রথম দফায় আউট হবার পর গত টেস্ট ম্যাচের ছবি আমাদের মনে আসতে শুরু করে।

কিন্তু ক্রিকেট খেলার গতি-প্রকৃতি বদলের জন্যে অধিনায়কের দল পরিচালনা ফিল্ডিং ও পিচ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। তাই দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় বোলারগণ যে অমন উজ্জীবিত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবেন তা কজন ভাবতে পেরেছেন? কালিচরণ শূন্য, আর রিচার্ড ও লয়েড বড় রান করার আগেই তাঁবুতে ফিরে আসবেন এমনটি আমরা কজনে আন্দাজ করেছিলাম? প্রথম দিনের মত দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যখন মাত্র ২৪০ রানে আউট হোল তখন স্বাভাবিক-ভাবেই নানান কল্পনা শুরু হয়ে যায়। এরই মধ্যে ফ্রেডারিকস শতরান করার গৌরব অর্জন করেন এবং ইডেনে তাঁর ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় রেখে যান।

বহুদিন পর আমরা ইঞ্জিনীয়ারকে অন্য ভূমিকায় দেখলাম। তাঁর স্বাভাবিক খেলা খেলতে গিয়ে দ্বিতীয় দিনেই সুযোগ দিয়েছিলেন, তবে সুযোগ দেওয়া ও সুযোগ গ্রহণে অক্ষমতা—এ সবই বোধহয় ক্রিকেটের অন্যতম অঙ্গ। নায়েক আবার ব্যর্থ হলেন। শর্মা আবার রান আউট হলেন—ঠিক যেভাবে দিল্লী টেস্টে আউট হয়েছিলেন। শর্মা ফিরে যেতেই বিশ্বনাথের উপর সমস্ত দায়িত্ব বর্তাল। আর বিশ্বনাথ ও ইঞ্জিনীয়ারের প্রচেষ্টায় দলের অবস্থার পরিবর্তন হয়। ইঞ্জিনীয়ার নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে খেলেছেন দলীয় স্বার্থে বিসর্জন না দিয়ে। তাঁর খেলা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী করে। আর বিশ্বনাথ—তাঁর কথা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত। বিশ্বনাথ যে শুধু ব্যাটিংয়ে তাঁর নামের সুবিচার করেছেন তা নয়—শিলপ অঞ্চলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে চেষ্টা করলে তিনি যে তা পুষিয়ে দিতে পারেন—তার প্রমাণও ইডেনে রেখে গেলেন। চতুর্থ দিনের শুরুতে নানান প্রশ্ন মনে আসতে থাকে—বিশ্বনাথ কি শতরান করতে পারবেন? ঘাবরি কি উইকেট আগলে রাখতে পারবেন—ভারত কি আশানুরূপ রানের ব্যবধান রচনা করতে পারবে...? এসব প্রশ্ন ও কৌতূহল মিটাতে বিশ্বনাথ ও ঘাবরি বিশেষ সময় নেননি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঘাবরি সংকট মুহূর্তে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে এসে যেভাবে খেলেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। বস্তুত ঘাবরি অতক্ষণ উইকেটে না থাকলে বিশ্বনাথের শতরাণ পূর্ণ হোত কিনা সন্দেহের বিষয়।

ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তিতে ভারতীয় বোলারগণ ও অধিনায়ক দায়িত্ব বুঝে নিলেন। স্পিন বোলিং যে এখনও উচ্চমানেরই আছে—আবার তা প্রমাণিত হোল। পঞ্চম দিনের মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগেই লয়েড ও কালিচরণ সমেত সাত সাতটি উইকেটের পতন। চন্দ্রশেখরের উপযোগী মাঠে তিনি যে স্বমহিমায় বল করতে পারেন—আবার সে কথা জানিয়ে দিলেন ইডেনের পঞ্চম তথা শেষ দিনে। অধিনায়ক হিসাবে মনসুর আলী খান ব্যাটিংয়ে সাফল্য লাভ করতে পারেননি। প্রথম ইনিংসে ক্ষণিকের জন্য তিনি নিজেকে ফিরে পেয়েছিলেন—কিন্তু বোলার বদল ও দল পরিচালনায় অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় রেখেছেন।

পঞ্চম দিনে লয়েড ও কালিচরণ যখন ব্যাট হাতে উপস্থিত এবং রানের ব্যবধানও যথেষ্ট নয়—এহেন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে মনসুর আলী খান বিশ্বাস হারাননি। চন্দ্রশেখর প্রথম দিকে রান দিলেও তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে লয়েড ও কালিচরণের মত শক্ত খুঁটি সরাতে একমাত্র চন্দ্রশেখরকেই প্রয়োজন। বিশ্বাস ও আস্থা অগাধ থাকলেও অধিনায়ক হিসাবে তিনি যে বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলেন সেটা সহজেই অনুমেয়। চন্দ্রশেখরকে ধন্যবাদ যে তিনি দেশের তথা অধিনায়কের বিশ্বাস ও আস্থার মর্যাদা রেখেছেন। পাঁচ ওভারের মধ্যে লয়েডকে ফিরিয়ে দিয়ে এবং তারপর কালিচরণ ও জুলিয়ানকে। অপরদিকে বেদী ও প্রসন্ন নিখুঁত নিশানায় বল করেছেন। বেদী অবশ্য উইকেট পেয়েছেন, প্রসন্নকে এ যাত্রায় শূন্য হাতেই ফিরতে হয়েছে।

ভারতের জয় সামগ্রিক প্রচেষ্টার ফল। তৃতীয় টেস্টে জয়লাভের ফলে স্বাভাবিক-ভাবেই আমাদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে ফিল্ডিং আরো ভাল হওয়ার প্রয়োজন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গ্রাউণ্ড ফিল্ডিং তুলনা করলে একথা বারবারই মনে হবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হেরেছে তার কারণ অনেক। যেমন ব্যাটিং আশানুরূপ মানের হয়নি, কয়েকটা সম্ভাব্য ক্যাচ পড়েছে এবং প্রথম ইনিংসে মদনলালের বিরুদ্ধে রবার্টসকে দিয়ে বল করালে হয়ত বা কিছু সুফল হোত।

আর সব শেষ কথা হচ্ছে ইডেনে আমরা বহুদিন বাদে দুজন সত্যিকার সুইং বোলার দেখলাম। আমরা দলে দুজন ফাস্ট বোলার দেখিনি, আশার কথা ভারতীয় দলে মদন-লাল ও ঘাবড়ি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বোলিং বৈচিত্র্যই আনেনি, শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অসিতকুমার গাঙ্গুলী,
বরাহনগর, কলকাতা—৫০।

অমানুষ প্রসঙ্গে

বরাহনগর থেকে শ্রীমতী মিতালী ভট্টাচার্যের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০-১-৭৫ সংখ্যায় প্রকাশিত চিত্রদূতের লেখা 'অমানুষ প্রসঙ্গে' শীর্ষক চিঠিতে পত্র-লেখক 'অঘোর দারোগার' ভূমিকাভিনেতা অনিল চ্যাটার্জির নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অমানুষ ছবিতে 'অঘোর দারোগা' বলে আদৌ কোন চরিত্র নেই। অনিল চ্যাটার্জি যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন তার নাম 'ভুবন দারোগা'।

বাংলা ছবির সংকটের কথা উল্লেখ করে পত্রলেখক বলেছেন, 'সংকটের দিনে বাংলা ছবিকে উৎসাহ দান করাই 'অমৃত'র একমাত্র উদ্দেশ্য।' আমাদের মনে হয়, বাংলা ছবির এই সংকটের মুহূর্তে অমৃতের মত সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা পত্র-পত্রিকার এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। তাহলে বাংলা ছবিকে সহজেই আরও জনপ্রিয় করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

স্বপন শৈল ও কার্তিক দত্ত,
খোলাপোতা, ২৪ পরগণা।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি

'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত (১০ জানুয়ারী, ১৯৭৫) 'সোনার কেল্লা' চিত্রের সমালোচনায় বলা হয়েছে, 'সত্যজিৎ রায় ইতিপূর্বে নিজের লেখা কাহিনী নিয়ে কোনো ছবি পরিচালনা করেননি।' তথ্যটি ভুল। ইতিপূর্বে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'নায়ক' চিত্র দুটির কাহিনীকার ছিলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

তপতী সেনগুপ্তা
মুর্শিদাবাদ।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প

গত ১৭ই জানুঃ (৩রা মাঘ) ৩৬ সংখ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বকাসুর' গল্পটি নিঃসন্দেহে একটি সার্থক ছোটগল্প। বহুদিন পর এরকম নামী একটি সাহিত্য সাপ্তাহিকের পাতায় উক্ত গল্পলেখকের ছোটগল্পটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আশা করবো 'অমৃত' সম্পাদক মহাশয় এরকম সার্থক ছোটগল্প আরো উপহার দেবেন। এই প্রসঙ্গের অবতারণার পরে আর একটি বিষয়ের প্রতি সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—তা হোল সর্বাঙ্গ-সুন্দর 'অমৃতে'র প্রতি সংখ্যায় একটি স্বতন্ত্র বিভাগে যদি নতুন লেখক-লেখিকাদের চিত্রসহ পরিচিতি ছাপানো যায়। তাঁদের নিজস্ব বক্তব্যকে হাজির করতে পারলে পরবর্তী লেখকরা (যাঁরা সবেমাত্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে পা দিয়েছেন) তাঁদের বিভিন্ন ভুলত্রুটি খুব সহজেই শুধরে নিতে পারবেন।

সমীরণ মুখোপাধ্যায়,
চন্দননগর, হুগলী।

সেকালের সঙ্গীতগুণী

আপনার পত্রিকায় 'সেকালের সঙ্গীত-গুণী' পর্যায়ে ধারাবাহিক প্রকাশিত বিভিন্ন সঙ্গীতগুণীর জীবন এবং সঙ্গীত সাধনার অনবদ্য কাহিনী অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়ছি। দিলীপবাবুর কাছে একান্ত অনুরোধ তিনি যেন আরও ব্যাপক এবং বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করে উপেক্ষিত গুণীদের কথাও এই পত্রিকার মাধ্যমে পরিবেশন করেন। অবশ্য একথা বলতে বাধা নেই যে দিলীপবাবু ইতিমধ্যেই যতটুকু পরিবেশন করেছেন তার মূল্যও অপরিসীম। তবু সঙ্গীতরসিক হিসেবে আমি আরও কিছু বেশী আশা করবো দিলীপবাবুর কাছে।

এতদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র সেকালের কণ্ঠ আর যন্ত্রসঙ্গীত গুণীদের কথাই এই পত্রিকার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু

"সঙ্গীত" অর্থ যদি নৃত্য-গীত-বাদ্যের সম্মিলিত রূপকেই বোঝায় তবে সংগীত আর সংগীতগুণীদের কথা লিখতে গেলে অন্যান্য ধারার গুণী শিল্পীদের কথাও উল্লেখের দাবী রাখে। নৃত্যের ক্ষেত্রে ভারতের গৌরব সুপ্রাচীন। আমাদের শতাব্দীতে এবং তার আগে শিল্পের এই বিশেষ ধারা উৎকর্ষের চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। সে ধারা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। আমি মূলত 'কথক' নৃত্যের কথাই বলছি আর এই বিশেষ নৃত্যরীতিতে যেসব অসাধারণ গুণী শিল্পী ছন্দের, লয়ের আর তালের বিচিত্র স্বর্গ রচনা করেছেন, সে কথা তো ইতিহাসের বাইরে নয়। তাই আমার অনুরোধ সংগীতগুণীদের সংগে নৃত্যগুণীদের কথাও যেন দিলীপবাবু আমাদের শোনান। সংগীতের এই ধারায় যাঁদের গুণপনা এবং অনুপম নৃত্যশৈলী চিরকালীন শিল্পের সুষমায় মণ্ডিত হয়ে ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে তাঁরা হলেন ঠাকুর প্রসাদ, ভৈরব প্রসাদ, কালকা প্রসাদ, অচ্ছন মহারাজ, লচ্ছু মহারাজ, সুখদেব মহারাজ, শম্ভু মহারাজ, জয়লাল, [illegible] মোহনলাল ইত্যাদি নৃত্যশিল্পীবৃন্দ। ইতিপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে [illegible] কলাবন্ত পর্যায়ে দিলীপবাবু এ বিষয়ে কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন, তবে আমার ইচ্ছে আরও বিস্তৃতভাবে দিলীপবাবু এঁদের কথা আমাদের শোনান।

সেকালের বাদ্য এবং যন্ত্রসংগীতগুণীদের [illegible] দিলীপবাবু ইতিমধ্যেই [illegible] করেছেন। এই [illegible] অন্যান্য [illegible] গুণীদের মধ্যে যাঁদের কথা [illegible] ইচ্ছে করে [illegible] [illegible] কণ্ঠ মহারাজ আর [illegible] ঐতিহাসিক ব্যক্তি। চতুর্দশ [illegible] সম্বন্ধে ইতিহাস খুব মুখর নয়। তাই এঁদের কথাও লিখতে অনুরোধ করি।

যন্ত্রীদের মধ্যে সেতারের যাদুকর এনায়েৎ খাঁর কথা শুনতে ইচ্ছে করে আরও বিশদভাবে, কারণ ইনিও দীর্ঘকাল কোলকাতা এবং বাংলায় বসবাস করেছিলেন। এনায়েৎ খাঁর পিতা, সেতার বাদনে বিশিষ্ট রীতির (ইমদাদখানি বাজ) প্রবর্তক, ইমদাদ খাঁর কথা 'সংগীতের আসরে' দিলীপবাবু বিস্তৃতভাবে বলেছেন, কিন্তু সেই তুলনায় এনায়েৎ খাঁর শুধু মাত্র উল্লেখ আছে। অথচ পিতা পুত্র দুজনেই নিজ নিজ নৈপুণ্যে ঐতিহাসিক খ্যাতির অধিকারী। তাছাড়া সেকালের সঙ্গীতগুণীদের মধ্যে এনায়েৎ খাঁ একটি অবিস্মরণীয় নাম। তিরিশের দশকে মুস্তাক আলী খাঁ সংগীত সমাজে অত্যন্ত গুণী সেতারশিল্পী হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং শুনেছি সে যুগে প্রায় সমস্ত সঙ্গীত সম্মেলনেই তাঁর উপস্থিতি এবং অনুষ্ঠান অপরিহার্য ছিল। বর্তমানে মুস্তাক আলী প্রত্যক্ষ সংগীত জগৎ থেকে অবসর নিয়ে স্থায়ীভাবে উত্তর কোলকাতায় বাস করেছেন। অবশ্য কোলকাতায় স্থায়ীভাবে উনি অনেক আগে থেকেই আছেন। প্রাচীন রীতির এক সার্থক সেতারশিল্পী মুস্তাক আলীর কাহিনী শোনালে বাধিত হবো। বাংলার এক সেতার গুণী প্বারবংগ ঘরানার (আসগর খাঁ) একক বাঙালী প্রতিনিধি লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য এবং তাঁর পিতামহ বামাচরণ ভট্টাচার্যের কথাও বিস্তৃতভাবে শোনাতে অনুরোধ করছি। শোনা যায় লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য এক অতি গুণী এবং অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন সেতারী ছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত উচ্ছৃংখল এবং অসংযত জীবনযাপনের জন্য তাঁর মৃত্যু ঘটে অতি অল্পবয়সে। এই প্রসংগে আমি দিলীপবাবুকে ঐকান্তিক অনুরোধ জানাই আর এক মহান শিল্পীর কথা শোনাতে, তিনি আজও একক এবং অনন্য তাঁর নিজস্ব শিল্পক্ষেত্রে। এই অবিস্মরণীয় শিল্পীর নাম পান্নালাল ঘোষ। বংশীবাদক হিসেবে পান্নালাল সম্ভবত সর্বকালেই একক শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন আর সর্বভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে সর্বযুগেই এক বিশিষ্ট এবং শীর্ষস্থানীয় শিল্পী হিসেবে স্মরণীয় থাকবেন। বাঁশীকে সর্বভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের পর্যায়ে উন্নীত এবং চিরপ্রতিষ্ঠিত করার একক কৃতিত্বও সম্ভবত পান্নালালেরই প্রাপ্য। এই দিক থেকেও নবীন সংগীতসাধকদের তাঁর কথা জানা উচিৎ আর এই দায়িত্ব দিলীপবাবু তাঁর অনুপম রচনানৈপুণ্যের মাধ্যমে পালন করবেন এমন আশা রাখি। এই সংগে পান্নালাল ঘোষ বিভিন্ন সংগীতাসরে সুরের যে বিচিত্র রূপের আর রসের অনবদ্য ফুল ফুটিয়েছেন তার বিস্তৃত আলোচনা আশা করবো।

কণ্ঠসংগীতের ক্ষেত্রে যাঁদের কথা শোনাতে অনুরোধ করবো তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভারতবিখ্যাত সংগীতসাধক সুরলক্ষ্মীর বরপুত্র আবদুল করিম খাঁ। আমাদের কালে অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দীতে আবদুল করিমের কণ্ঠে সুর সরস্বতী যেভাবে ধরা দিয়েছিলেন এমন নাকি আর কারও কাছে দেন নি। গুণীজন সমাজে এমনই একটা কথা প্রচলিত আছে। উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সম্ভাবনা নিয়ে আবদুল করিম খাঁই বোধহয় প্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এবং এ বিষয়ে তাঁর কিছু মৌলিক অবদানও আছে বলে জানি। তাছাড়া ঠুংরী সম্রাট মৌজুদ্দিনের প্রায় সমসাময়িক আবদুল করিমের ঠুংরীও আজ ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত। তাই আবদুল করিম খাঁর জীবন এবং সংগীতসাধনার কথা বিস্তৃতভাবে শোনার বিশেষ আগ্রহ রাখি। আর একজন কনিষ্ঠ শিল্পীর কথা শোনাতে অনুরোধ করি যিনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জীবনের সংক্ষিপ্ততর পরিসরে সংগীত রসিকদের হৃদয়ে নিজের আসন করে নিতে পেরেছিলেন, আর সে আসন আজও অটুট আছে। এই গুণী সংগীতশিল্পীর নাম দত্তাত্রেয় বিনায়ক পালুসকর, যিনি ডি ভি পালুসকর নামে সমধিক পরিচিত। এই সংগে আবদুল করিম খাঁর কন্যা হীরাবাঈ এবং আল্লাদিয়া খাঁর শিষ্যা কেশরবাঈয়ের কথাও উল্লেখনীয়। যদিও উভয়েই জীবিতা, তবু বহুদিন পূর্বেই তাঁরা সংগীত জগৎ থেকে অবসর নিয়েছেন।

বাংলার শিল্পীদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ধ্রুপদ শিল্পী হিসেবে স্বীকৃত। একই সংগে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কথাও স্মরণীয়। তারপর গিরিজাশংকর, অঘোরনাথ, নুলো-কটে গোপাল, মুরারী ও মোহিনী মিশ্র রাণাঘাটের নগেন দত্ত আর নগেন ভট্টাচার্য। সংগীত রত্নাকর ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর কথাও শোনাতে অনুরোধ করি। যদিও উভয়েই জীবিত তবু এঁরা দুজনেই জীবন্ত প্রবাদস্বরূপ এবং উভয়েরই সংগীতনৈপুণ্য ঐতিহাসিক। তাছাড়া সংগীতগুণী হিসেবে এঁরা যতটা একালের ঠিক প্রায় ততটা সেকালেরও। তাই এঁদের কথা শোনাতে অনুরোধ করবো। অঘোরনাথ আর নুলো গোপালের কাহিনী 'সংগীতের আসরে' দিলীপবাবু বলেছেন, তবু এই পর্যায়ের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এঁদের কথা লিখতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

পরিশেষে, আজও পর্যন্ত এমন কোন সংগীত গুণীর কথা লেখা হয়নি যিনি সেকালে 'তারানা বা 'তেলেনা' শিল্পী হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। সেকালে কি 'তারানা' রীতির প্রচলন ছিল না। সে যুগের সংগীতগুণীরা কি 'তারানা' গাইতেন না? তাই যদি হয় তবে আজ এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিশেষ রীতি এত জনপ্রিয় হলো কি করে। অথচ শোনা যায় 'তারানা' রীতির প্রচলন তানসেনের বা তানসেন পূর্ব যুগ থেকে শুরু হয়। আমাদের শতাব্দীতে নিসার হোসেন, বিনায়ক রাও পট্টবর্ধন, সুনন্দা পট্টনায়ক প্রভৃতি শিল্পীরা সার্থক 'তারানা' শিল্পী হিসেবে সুপরিচিত। গোলাম আলি খাঁ, আমীর খাঁ প্রভৃতিরাও 'তারানা' গাইতেন। কিন্তু 'সেকালের সঙ্গীত গুণীদের' মধ্যে এমন কোন গুণী কি ছিলেন না যিনি সার্থক তারানাও পরিবেশন করেছেন? যদি ছিলেন তবে তাঁর কথাও আমাদের দিলীপবাবু শোনান। এই প্রসংগে 'তারানা' রীতির প্রচলন-উৎপত্তি-বৈশিষ্ট্য জানানোর জন্য লেখককে আন্তরিক অনুরোধ জানাই। শুনেছি মরহুম ওস্তাদ আমীর খাঁ 'তারানা' সম্বন্ধে কিছু মৌলিক গবেষণা করেছিলেন। তাই 'তারানা' সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করুন। দিলীপবাবুর কাছে এই অনুরোধ।

প্রাণ সেন,
জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ।

উপন্যাস

শেষ বিচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[বৃদ্ধ বঙ্কিম দত্ত অমিয়কে নিজের হাতে করে মনের মত গড়েছেন। কিন্তু এক এক সময় তাঁর মনে হয় সেই অমিয়ও যেন কেমন পাল্টে যাচ্ছে। তার কথার প্রতিবাদ করে নিজের মতকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করে। যেন মনে হয় অমিয় তাকেই অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে ইদানীং। অমিয়, তার স্ত্রী নীহার সবাই যেন কেমন এড়িয়ে চলতে চাইছে। সংসারের ওপর কর্তৃত্ব হারাচ্ছেন যেন তিনি। তবু একসময় নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে অমিয় বা তার স্ত্রী নীহার নয়, তাদের বংশধরদের আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চান বঙ্কিম দত্ত।

নাতি রঞ্জুকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেন। তাকে নিজের মত করে গড়তে চান।

কিন্তু সেই রঞ্জুই দাদুর ব্যবহারে বিস্মিত। বাবা অমিয়র এক গরীব পুরনো বন্ধু তাদের বাড়িতে আসায় দাদুর অবহেলা এবং উষ্মা প্রকাশ দেখে তার খুব খারাপ লাগল। না হয় দাদু সারা জীবন জজিয়তি করেছে আর তার বাবা বার-এ্যাট-ল। আর ঐ লোকটা ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষ। রঞ্জুর এটা ভালো লাগে নি।

বাবার বন্ধু রুদ্রেন্দুকে যত দেখছে, ততই ভাল লাগছে রঞ্জুর। স্বদেশী যুগের কত কথা কত গল্প করছেন। না কি তার দাদুকেই ব্যঙ্গ করছে লোকটা ?

অথচ ঐ মানুষটাই তাকে বিপ্লবীদের কত গল্প শুনিয়েছে। শুনতে শুনতে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরতে তার দেরী হয়ে গিয়েছিল।

আর সে-জন্যে দাদুর কি বকুনি। সেই রাগে রাত্রে রঞ্জু খায় নি। মেজাজ তার খুব গরম হয়ে আছে বুড়োর ওপর।

(চৌদ্দ)

শেষ পর্যন্ত খাবার টেবিলে এসে সকলের সঙ্গে ভাত খেতেও তাকে বসতে হয়।

মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, ঐ চা খাওয়াই খাওয়া। চা, দুখানা সরভাজা। বাস, আর কিছু সারাদিন খাবে না। প্রতিজ্ঞা টিকল না।

সকাল থেকে বাড়ির আবহাওয়াটাই বদলে দিয়েছে এই মানুষটা। বুই। তার অবশ্য বুইদি। দিদি নেরবার ননদ। দিদির ননদকে দিদি ডাকতে হয়।

রঞ্জুর ইচ্ছে করে না দিদি ডাকতে। সেই প্রথম দিন থেকে ইচ্ছে করছিল না। এইটুকুন মানুষটা। ছোটখাটো শরীর।

কিন্তু চোখ দুটো সাংঘাতিক। এত বড়। কালো টলটল করছে। যেন দুটো বিশাল লেক।

টেবিলে তার উল্টোদিকে বসেছে। পাশে টুটুল। এ-পাশে সে আর বাবা।

মা পরিবেশন করছে।

কিন্তু যত না খাচ্ছে, টলটলে চোখ দিয়ে বুইদি তাকে দেখছে বেশি। দেখা যেন শেষ হয় না।

জানত সে এটা।

খেতে বসে বুইদি তার দিকে ভীষণ তাকাবে। পাল্টা সে তেমন তাকাতে পারছে না। বাবা আছে, মা সব সময় সামনে দাঁড়িয়ে। পরিবেশন করতে গিয়ে যা করতে হয়।

—ও কি বুই, এ কি হচ্ছে! মা আর একবার চেঁচিয়ে উঠল।

—ইস এত খাওয়া যায় না মাঐমা!

মা-র চোখে এবারও বুইদি ধরা পড়ে যায়। নিজের ডিশ থেকে একটা ফিস ফ্রাই তুলে এইমাত্র রঞ্জুর পাতে ঠেলে দিয়েছিল। তখন মা চেঁচামেচি করেছিল। এখন আবার। নিজের মাংসের বাটি থেকে বড় বড় দু টুকরো মাংস তুলে রঞ্জুর পাতে ছেড়ে দিয়েছে বুই।

রঞ্জু শব্দ করছে না, আপত্তি করছে না।

মা-ই তো বলছে। যা বলার মা বলুক। সে বলতে গেলে তার মুখের ভাবটা কেমন হবে সেই সম্পর্কে সে নিশ্চিত হতে পারছে না। তাকে ভীষণ গম্ভীর হয়ে থাকতে হবে। এখনও তার রাগ যায়নি জেদ যায়নি —এমন চেহারাই সে করে রাখতে চায়। বিরক্ত বিষণ্ণ ক্রুদ্ধ। দাদু এবং দাদুর সঙ্গে বাড়ির সবাই কাল তার প্রতি যে অবিচার করেছে তার পর এই সংসারের ওপর তার কোনো আকর্ষণ নাই এটাই সে বোঝাতে চায়। প্রমাণ করতে চায়। না খেয়ে কাল রাত্রে প্রমাণ করেছিল।

আজও বোঝাত। গোলমাল করে দিল এই মানুষটা।

দুম করে বুইদি আজ সাড়ে নটার ট্রেনে কেষ্টনগর থেকে হাজির।

এর আগেরবার এসেছিল দুপুরে নিজেদের গাড়ি নিয়ে। তার আগেও দুবার গাড়ি নিয়ে এসেছে। একদিন যেন খুব সকালে একদিন এসেছিল রাত্রে। কিন্তু যখনই আসবে হাঁড়ি ভরতি সরভাজা সঙ্গে নিয়ে আসবে। কেষ্টনগরের বিখ্যাত সরভাজা। মাঐমার জন্য এনেছি, বলবে, তালুইমশার জন্য এনেছি, দাদু সরভাজা খুব ভালবাসে টুটুল ভালবাসে ইত্যাদি ইত্যাদি। ভুলেও রঞ্জুর নাম উল্লেখ করবে না কিন্তু। মেয়েরা এত চালাক!

অথচ বুই জানে রঞ্জু ডাকাতের মতন সরভাজা ভালবাসে। এবং হাঁড়ির অর্ধেকই তার পেটে যাবে। যায়। রঞ্জুর জনাই এতদূর থেকে কষ্ট করে হাঁড়িটা বয়ে আনা। মুখ ফুটে বুইদি বলেছে কোনোদিন? আজ অবশ্য অন্যরকম।

ধরা পড়বে অর্থ কি।

আজ সকলের চোখের সামনে—সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে বুইদি তাকে আদর করছে, হঠাৎ একটা মস্ত সুযোগ পেয়েছে। বেলা নটা দশটা পর্যন্ত রঞ্জু লেপে খিল এঁটে শুয়ে আছে, রাগ করে বেরোচ্ছে না। বাড়িতে পা দিয়ে দিদির ননদ দুঃসংবাদটা জেনে গেছে। কারণটা অবশ্য জানেনি।

নিশ্চয় বাবা বা মা বা টুটুল এখনও বলেনি। বলবে না। আর যার ওপর রঞ্জুর এই রাগ জেদ, বাড়ির ডিক্টেটর বঙ্কিম দত্ত যে চুপ করে থাকবে জানা কথা। নাতির এমনতর একটা জঘন্য অপরাধের কথা একটা বাজে লোকের সঙ্গে কাল বেলা একটা দেড়টা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল—যেখানে শ্বশুরবাড়ির মানুষের কাছে কোনোদিনই

বড়ো তা প্রকাশ করবে না। অম্বুজা নিলয়ের প্রেস্টিজ নষ্ট হবে।

যাই হোক, যূঁইদি আজ একেবারে ফ্রি।

টুটুলের ডাকে রঞ্জু দরজা খোলেনি। রতনকে গালাগাল করে ফিরিয়ে দিয়েছে।

দরজা খুলল শেষটায় যূঁইদির ডাকে।

অবশ্য মা-ও যূঁইদির সঙ্গে দরজার ওপিঠে এসে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন থেকে নেমে যূঁইদির শাড়ি-জামাও বদলান হয় নি। সবাইকে দেখছে। একটি মুখ দেখছে না, এ কি কথা! কেন, কি নিয়ে রঞ্জুর রাগ! এখনও শুয়ে আছে! বেলা দশটা বাজে যে। ফরসা কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখেছিল আর রঞ্জুর পড়ার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল যূঁইদি—এই রঞ্জু, দ্যাখো কে এসেছি আমি। গলার বিখ্যাত স্বরটা শুনেই রঞ্জুর হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দুবদুব শব্দ হচ্ছিল।

প্রথম ডাকে রঞ্জু সাড়া দেয়নি।

একটা চমক নিয়ে আর হৃৎপিণ্ডের দুবদুব নিয়ে চুপ করে ফ্যালফ্যাল চোখে বন্ধ পাল্লা দুটো দেখছিল।

শীতের পর বসন্তের প্রথম হাওয়ার স্পর্শে মানুষ এভাবে চমকে ওঠে, আর স্তব্ধ হয়ে থাকে।

—এই রঞ্জু, এবার মা ডাকছিল; যূঁই এসেছে। দরজা খোল।

—দরজা খোলো রঞ্জু লক্ষ্মীটি—দ্যাখো আমি তোমার জন্য কী এনেছি।

তার মানে সরভাজা। কোনোদিন যূঁই এভাবে বলে না, আজ বলল। আজ মা-র চোখের সামনে রঞ্জুর জন্য যূঁইয়ের আদর উছলে উঠল। মস্ত সুযোগ।

রঞ্জু দরজা খুলে চৌকাঠে দাঁড়াতেই যূঁইদি তার হাত ধরল।

—মুখটা শুকনো দেখছি কেন মাসীমা!

—রাত্তিরে খায়নি। মা বলল।

—কেন, কী হয়েছিল এত রাগ করার কারণ কি। যেন যূঁইদির চোখে উদ্বেগের শেষ ছিল না।

—দাদু বকেছিল। চুলটা কাটছে না। মা ঘুরিয়ে কথাটা বলল। তাই ছেলের অভিমান হয়েছে—রাগ।

মা-র চালাকি দেখে রঞ্জুর ঠোঁট টিপে হাসতে ইচ্ছে করছিল। হাসল না। মুখটা হাঁড়ির মতন করে রাখল।

—দাদুর বড্ড বাড়াবাড়ি। রঞ্জুর চুলের ভিতর যূঁইদি আঙুল ডুবিয়ে দিল। এমন কিছু বড় হয়নি। আজকাল সব ছেলে—

—আস্তে! মা ঠোঁটে আঙুল রেখে যূঁইকে সাবধান করে দিল। দাদুর গলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ওপরে আসছিল।

—যাক গে, এসো তো, মুখটা ধুয়ে নাও। যেন পাঁচ বছরের খোকা সে। রঞ্জুর হাত ধরে যূঁইদি সটাং করে বাথরুমে ঢুকে পড়ল। দরজা আটকে দিল।

—অদ্ভুত ছেলে যা-হোক তুমি। নির্জনতা পেয়ে যূঁইদির শাসন তর্জন গর্জন আরম্ভ হল। অবশ্য চাপা হিসহিস গলায়। জোয়ান ছেলে। আশী বছরের বুড়োটা কি বলেছে না বলেছে অমনি খাওয়া বন্ধ। তাতে ক্ষতিটা কার হচ্ছে শুনি! কদিন না খেয়ে থাকতে! দেখি, ঐ গালটা। ট্যাপ খুলে আঁজলা করে জল নিয়ে বার বার রঞ্জুর চোখেমুখে ঝাপটা দিচ্ছিল আর শাসন করার ফাঁকে ফাঁকে যূঁইদি যূঁইফুলের মতন শাদা দাঁতের সারি ছড়িয়ে বাথরুম আলো করে হাসছিল।

রঞ্জু কিছু বলছিল না।

—এখন? আমি এসে ডাকলাম আর বাবুর রাগ ভেঙে গেল, তাই না! আমি যতক্ষণ এ-বাড়ি আছি, দোর বন্ধ করে চুপ করে পড়ার ঘরে বসে থাকার বা শুয়ে থাকার মতন বেকুবি আর কিছু হয় না। তাই না? আমি যতক্ষণ এ বাড়িতে ততক্ষণ আমার আঁচল ঘেঁষে থাকার মতন সুখ পৃথিবীতে আর কিছু নেই—কেমন?

এসব কথার জবাব ছিল না। এসব কথার জবাব কেউ দেয় না।

রঞ্জুর মুখ থেকে কোনো জবাব বেরোবে না জেনেই যূঁইদি অকাতরে ফিসফিসিয়ে বলে যাচ্ছিল আর শাদা দাঁতের পাটির নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে প্রায়ান্ধকার বাথরুমটাকে পরীর দেশের মতন রহস্যময় করে তুলছিল।

কাজেই শেষ পর্যন্ত একটা মুচকি হাসি না হেসে রঞ্জু থাকতে পারেনি। না হলে বেজায় রকম নিষ্ঠুরতা দেখান হবে যূঁইদির ওপর। ভাবছিল সে।

—দেখি ওই গালটা। যূঁইদি দেওয়ালে ঝুলান তোয়ালেটা ছুঁয়েও দেখল না। নিজের আঁচল দিয়ে রঞ্জুর মুখ মুছিয়ে দেয়। আর তখন তার নিশ্বাসের গরম ঝাপটা ঝড়ের মতন এলোপাথাড়ি হয়ে রঞ্জুর গালে গলায় ঠোঁটে এসে লাগে।

এমন আর একদিন হয়েছিল। এতটা না হলেও। রঞ্জুর পড়ার ঘরে সন্ধ্যের পর তিনজন গল্প করছিল। টেবিলের কাছে চেয়ারে রঞ্জু বসা, আর টেবিলের লাগোয়া তার খাটে যূঁইদি ও টুটুল তার দিকে মুখ করে পাশাপাশি হয়ে বসে। ইলেকট্রিসিটি ফেল করে ঘরটা হঠাৎ এক সময় অন্ধকার হয়ে যায়। আর সেই মুহূর্তে চিলের মতন ছোঁ মেরে যূঁইদি রঞ্জুর হাতটাকে নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে পাগলের মতন কচলাতে থাকে। টুটুল টের পেয়েছিল কি। রঞ্জুর যেন মনে হল টুটুল টের পেয়েছিল।

কিন্তু সেটা ছোটখাট ব্যাপার ছিল।

আজ যা করছিল না তার তুলনা ছিল না। সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করছিল যূঁইদি। এবং এমন একটা সুযোগের জন্য যূঁইদি কিছুদিন ধরেই ছটফট করছিল রঞ্জু টের পাচ্ছিল। হ্রদের মতন কালো টলটলে চোখ দুটোর মধ্যে রঞ্জু আজকাল অনেক কিছু দেখছে। কেষ্টনগর থেকে সরভাজার হাঁড়ি নিয়ে ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনে ছুটে আসা যূঁইদির বেড়ে গেছে। বিয়ের পর কোনো কোনো মেয়ে ভীষণ 'সেকসি' হয়ে ওঠে। তাদের ক্লাসের শোভেন বলছিল। কার কাছে নাকি সে শুনেছে। এক বছর আগে যূঁইদির বিয়ে হয়েছে আর, আশ্চর্য, এই একটা বছরের মধ্যে রঞ্জু ও তার বন্ধুরা—

না না দিদির ননদ এই যূঁইদি সম্পর্কে ঘুণাক্ষরেও আজ পর্যন্ত সে তার বন্ধুদের কাছে কিছু বলেনি। মাথা খারাপ! তার পেটের কথা পেটে আছে। তা ছাড়া তার নিজের আরও দু একটা ব্যাপারে সে ভয়ানক চাপা। টুবলির চিঠিটা নিয়ে পার্থ যেমন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিটিং ডেকে আলোচনা করতে চাইছে রঞ্জু তা পারত না। পারে না।

হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল—এক বছর যূঁইয়ের বিয়ে হয়েছে, আর এই একটা বছরের মধ্যে রঞ্জু ও তার বন্ধুরা 'সেকস' 'প্যাশন' ইত্যাদি নিয়ে এত বেশি আলোচনা করেছে এবং এত সব জেনে গেছে, ভাবতে তার নিজেরই অবাক লাগে। বিলেতে বা আমেরিকায় ছেলেমেয়েরা ডেট করা কাকে বলে সে জানে এখন বা 'মেটিং' বলতে কি বোঝায়। দু একটি কথার সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ ডিকশনারী ঘেঁটে ঘেঁটে সে বার করেছে। সে এবং তার বন্ধুরা। অমিত সেদিন তার মামার নোট বই থেকে একটা ইংরেজী কথা টুকে এনে তাদের দেখিয়েছিল। তার মামা খুব ইংরেজী বইটই পড়ে। যখন যেখানটা ভাল লাগে টুকে রাখে কথাটা ছিল :

> "Sex is not the best thing in the world, or the worst thing in the world, but there is nothing else quite like it".

খুব সহজ মানে। রঞ্জুদের বুঝতে একটু কষ্ট হয়নি। নিজের একটা খাতায় রঞ্জু লিখে রেখেছে। দেখাদেখি পার্থ এবং শোভেনও। বাড়িতে লুকিয়ে পার্থ শোভেন ও অমিতের সঙ্গে রঞ্জু কদিন আগে সেন্ট্রালে একটা ইটালিয়ান ছবি দেখে এসেছে। মাথা খারাপ করে দেবার মতন ছবি। মেয়েটা

গুণে গুণে চোদ্দবার ছেলেটাকে চুমু খেল। একটা খড়ের গাদার পেছনে। দিনদুপুরে। ধারে কাছে মানুষজন ছিল না যদিও। একটু দূরে শুয়োর চরছিল, এক ঝাঁক মুরগি ছুটোছুটি করছিল, ডাইনে বাঁয়ে কটা রাজহাঁস হাওয়ায় গাছের পাতা নড়ছিল আকাশে চাকা চাকা সাদা মেঘ—ভারি সুন্দর দৃশ্য। এমন একটা নিরিবিলি সুন্দর জায়গায় ছেলেটাকে পাগলের মতন জড়িয়ে ধরে—ওফ কী মূর্তি 'এখন মেয়েটার আলুথালু চুল গায়ের পোশাক ঠিক নেই, চোখ দুটো থেকে নীল আগুনের শিখা ঝরছে।

আজ অম্বুজা নিলয়ের বাথরুমে নীল আগুনের বদলে কালো আগুনের শিখা দুটো চোখের ভিতর ঝিকিয়ে উঠতে দেখল রঞ্জু। দুবার। আঁচল দিয়ে তার মুখ মোছা শেষ করে চিরুনি বুলিয়ে মাথাটা ঠিক করে দিচ্ছিল যূঁইদি। আর ফিসফিসে গলা। ঠিক যেন প্রলাপ বকছিল। ডাকাতের মতন দিন দিন সুন্দর হচ্ছে। দস্যু! কত মেয়ের যে মাথা খারাপ করবে এই চেহারা দেখিয়ে। টাটুঘোড়ার মতন শরীরটাও কেমন টনকো শক্ত হয়ে উঠছে দিন দিন। এখন থেকেই আমার ভয় করছে।

—তোমার মাথা খারাপ না হলেই হল। রঞ্জু ফিক করে হাসল। সঙ্গে সঙ্গে যূঁইদি আঙুল বেঁকিয়ে তার গালে জোরে ঠোনা মারল।

—আহা, মাথা খারাপ করার যেন কিছু বাকি রেখেছে। রঞ্জু অবশ্য আর কিছু বলেনি। তখনি গম্ভীর হয়ে গেছে ও যূঁইদির সঙ্গে বাথরুম থেকে বেরিয়ে চা দিয়ে যূঁইদির আদর করে দেওয়া একজোড়া সরভাজা খেয়েছে।

এখন ভাত খেতে বসে যূঁইদি প্রকাশ্যে এই কাণ্ড করছিল। তার পাতে ফিস-ফ্রাই তুলে দেয়, মাংস তুলে দেয়। মা চেঁচামেচি করছে। বাবা অল্প অল্প হাসছে এবং ধীরে সুস্থে খাচ্ছে। টুটুল মাথা গুঁজে। খাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবে মোটেই কথা বলছিল না। মানে যূঁইদিকে যে ও পুরোপুরি চিনে গিয়েছিল বুঝে গিয়েছিল ধরে ফেলতে রঞ্জুর আর কষ্ট হয় না। আজই জিনিসটা পরিষ্কার সে বুঝতে পারল। এই নিয়ে সে মাথা ঘামাতে পারত—মেয়েরা কত অল্প বয়সে পেকে যায়। অবশ্য দাদু যেমন হিসাব করে টুটুলের বয়স তেরো আর রঞ্জুর ষোল বলে লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছে আসলে কিন্তু তা নয়। টুটুলের কবেই তেরো পার হয়ে গেছে—এই পৌষে ও চোদ্দয় পা দেবে আর এই কার্তিক থেকেই রঞ্জুর সতেরো আরম্ভ হচ্ছে। অম্বুজা নিলয়ের ছেলেমেয়েদের বয়স কমিয়ে বলা বুড়োর একটা বাতিকের মধ্যে। তা নিজের ছেলেমেয়েদের বয়সের যে-হিসাবই করুক বুড়ো তাদের দু ভাই-বোনের আসল বয়সটা তো রঞ্জুর মার কাছে। মা-র হিসাবটাই কারেক্ট হিসাব। তা হলেও রঞ্জু বলবে টুটুলটা একটু সকালেই পেকেছে। এমন এমন জিনিস এত চট করে ও বুঝে ফেলে—তিন বছরের বড় হয়েও রঞ্জুর হয়তো সেটা বুঝতে ছ' মাস বেশি সময় লাগে। এখনও। পৌষে চোদ্দয় পা দাও বা দাও মনে মনে সে টুটুলকে উদ্দেশ্য করে বলল যূঁইদির বিয়ে হয়ে গেছে একটু বেশি স্বাধীনতা ভোগ করার কি এদিকে সেদিকে একটু খোকার ইচ্ছেটা তার এখন হবেই—এই নিয়ে টুটুমণি তোমার মন খারাপ করার বা হিংসে করার কিছু নেই। নিজের স্বামীকেই যূঁইদি যেখানে কাঁচকলা দেখিয়ে যেদিন খুশি যখন খুশি কেষ্টনগর থেকে উড়াল দিয়ে ম্যান্ডেভিল গার্ডেনস-এ চলে আসছে, সেখানে তোমার ছটফট করার বা যন্ত্রণা পাবার কোনো মানে হয় না।

যাক, এই নিয়ে এর বেশি কিছু রঞ্জু ভাবতে চাইছিল না। তার মন মেজাজ কাল থেকে খারাপ। যূঁইদি যেমন তার পাতে এটা ওটা ঠেলে দিচ্ছিল, সে-ও কিছু আপত্তি করছিল না। যেন এটাও তার একটা জেদ—মা চেঁচামেচি করে করুক, যূঁইদির দেওয়া ফ্রাই ও মাংস টপাটপ সে মুখে তুলছিল—দেরি করছিল না, কোনোদিকে না তাকিয়ে মেজাজ নিয়ে খেয়ে যাচ্ছিল, যেন মা-র দুঃখ পাওয়া সত্ত্বেও আর একজনের ভাগেরটা খেয়ে সাংঘাতিক তৃপ্তি লাগছিল তার—উল্টে যূঁইদিই যে বেশি তৃপ্তি পাচ্ছিল মা আর তা বুঝত কেমন করে।

হুঁ, রাত্রে উপোস থেকেছে, এভাবে অন্তত দুপুরবেলার খাওয়াটা আনন্দের সঙ্গে সে শেষ করত। এমন চড়াং করে তার রক্ত মাথায় চড়ল। পিছনে ডিকটেটরের গলা। নিয়মমাফিক সকলের আগে কর্তার খাওয়া হয়ে যায়। স্বাস্থ্যের দিকে কড়া নজর, একশ বছর বেঁচে থাকবার ইচ্ছে, তাই কাঁটায় কাঁটায় বেলা এগারোটায় ভাত চাই। ভাত খেয়ে এখন একটু গড়িয়ে নেবার কথা—ঘুমোয় না যদিও, ঘুমোলে শকুনের মতন জেগে থেকে বাড়ির ছেলেমেয়েদের পাহারা দেয় কে কিন্তু গড়ন হল? চটির চটাস চটাস আওয়াজ তুলে খাবার টেবিলের কাছে ছুটে এল।

—তুমি বলছ বৌমা, যূঁই কিছু খাচ্ছে না, রঞ্জুর পাতে সব দিয়ে দিচ্ছে—তা তো দেখেই, সুন্দরী মেয়েরা যে ভাতটাত খায় কম, অনেক সময় খায়ই না, তুমি বুঝি জান না।

দাঁতে দাঁত চেপে রঞ্জু চুপ করে রইল। একটা ভাত আর তার গলা দিয়ে গলছিল না। মা আর কিছু বলছে না। মা-র চেঁচামেচি শুনেই যে শ্বশুর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে মা যেন একটু থমকে গেছে, ঘাড় গুঁজে আছে। কিন্তু নাতনী সম্পর্কীয়া সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে ঠাট্টা মস্করা করার মস্ত সুযোগ পেয়ে আশী বছরের বঙ্কিম দত্ত মাড়ি ছড়িয়ে খিকখিক শব্দ করে হাসছিল। তা-ও আবার যূঁইদির চেয়ারের মাথাটা ধরে দাঁড়িয়ে। রাগে রঞ্জুর গা ফেটে যাচ্ছিল।

—তা হলে সুন্দরী মেয়েরা কী খেয়ে বাঁচে? রঞ্জুর বাবা নিজের বাপকে প্রশ্ন করল।

—হাওয়া খেয়ে বাঁচে, চাঁদের আলো ফুলের সুবাস খেয়ে বাঁচে। কথা শেষ করে বঙ্কিম দত্ত আবার খিকখিক হাসে। কী সস্তা রসিকতা! রঞ্জুর বাবাও হাসে। রঞ্জু লক্ষ্য করছিল বাবা অনেকক্ষণ থেকে এমন একটা আলাপের সুযোগ খুঁজছে। একলা সুবিধে করতে পারছে না,

অবশ্য এটা আজ নতুন নয়।

রঞ্জু বরাবর দেখছে, যূঁইদি যখন এ-বাড়ি আসে বঙ্কিম দত্ত অতিমাত্রায় রসিক হয়ে ওঠে। ঠাট্টা-মস্করার ফোয়ারা ছুটিয়ে

দেয়। মেয়ের ননদ—মেয়ের সম্পর্কীয়া। যে জন্য বাবা সরাসরি ঠাট্টা-মস্করা করতে পারে না। কিন্তু বুড়োর কথায় হুঁ হাঁ করে রঙ্গ-রসে যোগ দিতে এক ফোঁটা দেরি করে না। রঞ্জুর মা অনেক সময় বিরক্ত হয়। মা-র বিরক্ত হওয়া বাবা বড় গায়ে মাখে কিনা! যূঁইদি এলে বঙ্কিম দত্তর মতন বাবার উৎসাহ উদ্যমও বেড়ে যায়। এমনিতে বুড়ো হাতের মুঠো খুলতে চায় না। আজ মাছ মাংস দুটোর জন্য মানিব্যাগ খুলে টাকা বের করে বাবার হাতে দিয়েছে। বাবা বাজার করে এনেছে। সাতজন্মে কিন্তু বাবা বাজারে যায় না। বাজার-সওদা করা বাবার ঘোর অপছন্দ। কিন্তু আজ যে যূঁইদি খাবে।

সুন্দরকে সুন্দর বললে খুশী হওয়া স্বাভাবিক। যূঁইদি খুশী হয়। এতক্ষণ রঞ্জুর খাওয়া দেখা নিয়ে ও নিজের পাত থেকে রঞ্জুর পাতে এটা-ওটা তুলে দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এখন দাদুর কথা শুনে টেবিল থেকে চোখ তুলল। নাকের ডগাটা কুঁচকোল, পলকা হেসে ঠোঁটের কোণায় ডালিম-দানার মতন একটা ছোট্ট টোল তুলল অর্থাৎ আরও একটু সুন্দর দেখাবার জন্য যূঁইদি যা করার করল, বাঁ-ভুরুটা পাখির ডানার মতন বেঁকিয়ে দিল, তারপর বাবার দিকে না, দাদুর দিকে তাকিয়ে বলল, বুড়ো বয়সে আমার মতন একটা পেঁচী-খেঁদিকে দাদুর বিয়ে করতে বাসনা হয়েছে।

এ-ধরনের ঠাট্টা দাদু-নাতনীর মধ্যে চলে। খুব একটা দোষের না, রঞ্জু চিন্তা করল।

—আহা-হাহা, যা বলেছ না দিদি! গলা দিয়ে আফসোসের সাত বার করল বুড়ো সাদা সজ্জো শিরাবহুল শুকনো ডান হাতটা বাড়িয়ে যূঁইদির চিবুকের নিচে রাখল। দু-ফোঁটা মাংসের ঝোল লেগে আছে সেখানটায়, বুড়ো খেয়াল করে না। চিবুকটা ধরে আস্তে আস্তে চাপ দেয় আর পাকা মাথা নেড়ে খাশীর গলায় বলে হুঁ পেঁচী খেঁদি বটে, পদ্মপাপড়ির মতন চোখ, তিল-ফুলের মতন নাক মোমের মতন চুল, এমন একটা পেঁচীকে যদি পেতাম, আবার বাইশ বছরের জোয়ান ছেলে হয়ে যেতাম আমি, হি-হি।

—ইস ইস দাদুর হাতে সকড়ি লাগছে, নাকের ডগাটা আরও কুঁচকোয় যূঁইদি, ভুরু দুটো আর একটু বেঁকিয়ে দেয়। বুড়োমি চেপে ধরার দরুন শ্বাস-নালীতে লাগছে যূঁইদির, শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে রঞ্জু টের পায়। কিন্তু যূঁইদি বিরক্ত হয় না। হাসে।—এমন করলে আমি কক্ষনো আর এ-বাড়ি আসব না। আমাকে পেলেই দাদু যেমন করে না! আদুরে গলায় যূঁইদি কাকাতে আরম্ভ করে।

—আসবে আসবে, আসতে হবে। বঙ্কিম দত্ত আমার দিকে ঝুঁকে যূঁইদির চোখের ভিতর তাকায়, মিটমিটি হাসে। এই বুড়োর টানেই দিদিকে বার বার ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেন্স ছুটে আসতে হবে। না এসে উপায় নেই হি-হি।

এবার যূঁইদির চিবুক ছেড়ে দিয়ে তার চকচকে মসৃণ গলার ওপর বুড়ো মরা আমপাতা রঙের শুকনো খসখসে হাতটা রাখল।

কাতুকুতু লাগার মতন একটা অস্বস্তিকর সুখ নিয়ে যূঁইদি চোখ বুজে ফিক-ফিক হাসে।

দাদুর মতন বাবা সেসব কিছু করতে পারে না, ইঁদুরের গর্তের মতন মুখের হাঁ-টা গোল করে রেখে লোলুপ চোখে যূঁইদির দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসে।

রঞ্জু কি কিছু বোঝে না! সব বোঝে। এই যে যূঁইদিকে নিয়ে কাণ্ডটা করছে বুড়ো এখানে সেকস ছাড়া আর কিছু নেই। ঠাট্টা-মস্করার আড়ালে একটা অল্প বয়সের মেয়ের নরম শরীর ছানাছানি করার লোভ সামলাতে পারছে না। বুড়োর ঠোঁটের কোণায় লালা জমেছে। কপালের রগটা লাফাচ্ছে। বাবার কপালের রগও লাফাচ্ছে। রঞ্জু লক্ষ্য করে।

তার দু' কান গরম হয়ে ওঠে। অন্য-দিকে চোখ দুটো ফিরিয়ে নেয়। পার্থর কথাটা তার মনে পড়ে যায়। যত বয়স বাড়ে, লোকের এসব দোষ বাড়ে—শোভেন বলে, সবক'টা বুড়ো এই রোগে ভোগে।

আজ অম্বুজা-নিলয়ে চোখের ওপর তাই দেখল রঞ্জু। এ-বাড়ির শিক্ষা-দীক্ষা রুচি কালচার। কত গর্ব বুড়ো বঙ্কিম দত্তর। আর বুদ্ধেন্দু একটা উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলে ছিল, বখাটে ছেলে ছিল।

—বাঃ, বেশ বললে বাবা, বুড়ো বাপকে রঞ্জুর বাবা সংশোধন করে দেয়। তোমার উপমাটা ঠিক হল না। যূঁইয়ের চোখ দুটো পদ্ম-পাপড়ি না এত কালো এত গভীর মনে হয় দুটো হ্রদ টলটল করছে।

—বেশ তো, তাই আমি মেনে নিচ্ছি—এই হ্রদের জলে আমি সাঁতার কাটব, কি বলো দিদি। এখানে রাজহাঁস ভেসে বেড়ায় পদ্ম ফোটে। বুড়ো আহ্লাদে ডগমগ হয়ে যূঁইদির গলা থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে তার দুটো নরম হালকা কাঁধ ধরে আস্তে ঝাঁকুনি দেয়।

মা আর দাঁড়িয়ে থাকে না। যেন রান্নাঘরে বেড়াল ঢুকে কিছু ফেলে দিচ্ছে। এমন একটা তাড়া নিয়ে ওদিকে ছুটে গেল।

যেন গলায় মাংসের হাড় না কি মাছের কাঁটা ঠেকেছে, খকখক কেশে চট করে উঠে টুটুল বেসিনের দিকে চলে গেল।

একটি মেয়ের রূপের প্রশংসা অন্য মেয়েরা সহ্য করতে পারে না। কথাটা অমিত বলেছিল। মা ও টুটুলের সরে যাওয়া দেখে রঞ্জুর এখন মনে পড়ল।

কিন্তু খাওয়া শেষ হলে রঞ্জু টেবিল ছেড়ে উঠতে পারে না, বাবার মতন বসে থাকে।

বুড়োর সাদর খেয়ে আদুরে চোখে যূঁইদি দাদুকে দেখছিল 'এইবেলা শুয়ে পড়ো গে নাহলে শরীর খারাপ করবে ইত্যাদি বলে সহাস্য করে একটা ধমকটমকও দিচ্ছিল। কিন্তু আসলে যূঁইদি বে-কাজে ব্যস্ত ছিল, টেবিলের নিচে পা-টা বাড়িয়ে রঞ্জুর পায়ের সঙ্গে বার বার ঠেকা লাগাচ্ছিল।

এই জিনিস, এই গোপন ইসারা ইঙ্গিত পৃথিবীর কারো জানার কথা ছিল না। টেবিলের তলার দিকে কারো চোখ নেই। আশী বছরের বুড়ো বঙ্কিম দত্তর মতন তার পঞ্চান্ন বছরের ছেলে তন্ময়ও দেখছে যূঁই নামের ছিপছিপে ফরসা সুন্দর মেয়েটির হ্রদের মতন কালো ডাগর চোখে রাশি রাশি পদ্ম ফুটছে, রাজহাঁস খেলা করছে।

রঞ্জু মজা পায়। সে দেখছে যূঁইদির চোখে বড় বড় হাঙ্গর কুমীর ভেসে বেড়োচ্ছে। ফুলটুলের নামগন্ধও নেই। রাজহাঁস নেই।

প্যাশন। গেলোবে সেই ইটালিয়ান ছবির মেয়েটার কাণ্ডকারখানা দেখে রঞ্জুদের সামনের সীটে-বসা এক ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে দু'বার শব্দটা উচ্চারণ করেছিল না! প্যাশন প্যাশন।

ভাবতে গিয়ে রঞ্জুর বুক ধবক করে উঠল। শিরদাঁড়ায় বিদ্যুৎ-শিহরণ অনুভব করল সে।

তার মনে পড়ল কাল বাবার ছেলে-বেলার বন্ধু বুদ্ধেন্দুর মুখ দিয়েও ঠিক ঐ শব্দটা বেরিয়েছিল। প্যাশন। পাহাড়-তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবের অ্যাকশন শেষ করে প্রীতিলতা ওয়াদ্দার পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়েছিল, ইংরেজ সৈন্যের হাতে ধরা দেয়নি। বড্ড বেশি দেশ—দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখত মেয়ে। সেই অদম্য প্যাশন তাকে ঘরছাড়া করে, বাপের স্নেহ, মায়ের আদর ধরে রাখতে পারেনি।

বা-রে! খামকা রঞ্জু মন খারাপ করছে।

সেই প্রীতিলতাকে পায়নি সে, এই প্রীতিলতাকে পাচ্ছে। সেই উনিশ কুড়ি বছর বয়স। প্যাশনের আগ্নেয়গিরি হয়ে যূঁইদি খাবার টেবিলে বসে আছে। টেবিলের তলা দিয়ে পা বাড়িয়ে রঞ্জুর পা চেপে ধরছে। পা-টা গুঁড়ে যাচ্ছে রঞ্জুর।

এই ভাল, এই ভাল। মনে মনে বলল সে।

বুদ্ধেন্দুর সঙ্গে কথা বলেছিল বলে কাল সারাটা বিকেল তাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হয়নি।

তাই জেদ করে নিজেকে পুড়তে দিচ্ছে সে। এবং আর একটু পুড়বে বলে যূঁইদির শায়ার সঙ্গে পা-টা ঠেকিয়ে গরম সীসার মতন পায়ের ডিমটা চেপে ধরে রাখল। জেদ করে আজ সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থেকে ভেন্টিলেটারের কাছে চড়ুই দুটোর ব্যস্ততা দেখছিল।

সব মিলিয়ে ভিতরে একটা উল্লাসবোধ করছে সে এখন। মনের ভার কেটে গেছে।

(ক্রমশঃ)

বাঘেলখণ্ডের জঙ্গলে

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়

জানি না কেন, সিংরৌলি নামটি প্রথম শুনেই কেমন ভাল লেগে গেছিল। চেনা জানা গণ্ডীর বাইরে কোন সুদূরের পরশ যেন নামটির মধ্যে পেয়ে গেলাম। ভাগ্নে ন্যাশন্যাল কোল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন বা জাতীয় কয়লা উন্নয়ন নিগম-এর ডাক্তার, মধ্যপ্রদেশের সিংরৌলিতে বদলী হয়ে চিঠিতে সেখানকার বন আর পাহাড়ের যা বর্ণনা দিল তাতে আকর্ষণ আরও বেড়ে গেল। তাই সেবার ছুটিতে ঠিক করলাম হিল্লী দিল্লী না ঘুরে এবার বনবাসে যাব সিংরৌলি।

সিংরৌলি পৌঁছানোর উপায় নির্ধারণ করতে গিয়ে ফাঁপরে পড়ে গেলাম। ভাগ্নের চিঠিতে জায়গাটি যে অতীব দুর্গম, যেতে একাধিকবার বাস বদলাতে হয়, তা জানলাম। আরও জানলাম যে ঐ পথের শেষ কয়েক মাইল হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ছুটির মেয়াদ বড় অল্প, তাই চিঠি লিখে পথের নির্দেশ আনিয়ে নেবার আর সময় ছিল না। কলকাতায় অনেক চেষ্টা করে ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে ভাল ম্যাপ যা যোগাড় করতে পারলাম তাতে মনে হল জায়গাটি মির্জাপুরের ঠিক দক্ষিণে। তবে নতুন কোলিয়ারী বলে সিংরৌলি বা তার কাছাকাছি কোন রাস্তা ম্যাপে দেখান নেই। হ-য-ব-র-ল এর কথা মনে পড়ে গেল 'গরম লাগলে তিব্বত গেলেই হয়' তবে 'বলা ভারি সহজ, কিন্তু বললেই তো আর যাওয়া যায় না।' এলাহাবাদ পৌঁছে হয়ত পথের হদিস পাওয়া যাবে, এই ভরসায় রওনা হলাম।

এলাহাবাদেও সিংরৌলি যাবার সঠিক উপায় কিছু জানতে পারলাম না। স্থানীয় পরিচিতদের মধ্যে কেউই ঐ জায়গার নাম শোনেন নি। ইউ-পি রোডওয়েজ-এর 'পুছ তাছ' (অনুসন্ধান) এর ভদ্রলোক অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে জানালেন যে প্রথমে মির্জাপুর যেতে হবে, সেখানে হনুমানার বাস পাওয়া যাবে। হনুমানা থেকে সিংরৌলির দিকে প্রাইভেট বাস যায় বলে তাঁর ধারণা, তবে সে বাস কখন ছাড়ে, যেতে কতক্ষণ লাগে এবং বাস রাস্তা থেকে সিংরৌলি পৌঁছতে কতদূর হাঁটতে হয় তাঁর জানা নেই। 'হনুমানা ত পৌঁছ যাইয়ে, উধারসে পাত্তা জরুর মিল যায়েগী' বলে আমাকে আশ্বাস দিলেন। এতে অবশ্য পুরোপুরি আশ্বস্ত হওয়া যায় না কারণ আমার হাতের ম্যাপে দেখি হনুমানা থেকে সিংরৌলি প্রায় শ'খানেক মাইল হবে। কিন্তু কি আর করব? এলাহাবাদ থেকে মির্জাপুরের প্রথম বাস ছাড়ে সকাল সাড়ে ছটায়। ঠিক করলাম ঐ বাসেই যাব, এলাহাবাদের হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডাকে ভয় করলে চলবে না। সময়টা ছিল ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাস।

রাত থাকতে উঠে চা খেয়ে বিছানা বেঁধে সাইকেল রিকসায় চড়ে যখন এলাহাবাদ বাস স্টেশনের দিকে রওনা হলাম তখন পূব আকাশে সবে আলোর রেখা ফুটেছে। অত তাড়াতাড়ি হয়ত না করলেও চলত কারণ আমাদের বাস 'পিপরি মেল' ছাড়ল নির্ধারিত সময়ের মিনিট কুড়ি পরে। যমুনার পোল পার হয়ে ফাঁকা রাস্তায় বাস তীরবেগে ছুটে চলল। গায়ে ওভারকোট, মাথায় মাফলার জড়িয়েছি, বাসে কাঁচের জানালা সব বন্ধ—তবু ঠাণ্ডার হাত থেকে নিস্কৃতি নেই। রেল লাইনের পাশ দিয়ে রাস্তা। দৃশ্য মনোরম। দিগন্তব্যাপী গম, যব, অড়হর আর সরষের ক্ষেত, ফসলে ভরে রয়েছে। নানান পাখির ঝাঁক মনের আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে এক ক্ষেত থেকে আর এক ক্ষেতে। প্রভাতী সূর্যের আলোয় তাদের ডানায় রঙ ঝলমল করছে। রাস্তা ভাল, দুধারে বড় বড় গাছ—মহুয়া, আম, বাবলা নিম বাদাম বট আর অশ্বত্থই বেশি। মাঝে মাঝে বাঁশঝাড় আর কুলগাছও আছে। ছোট বড় গ্রাম অনেক পেরোলাম।

এলাহাবাদ থেকে মির্জাপুরে বাসে ৫৬ মাইল। ঠিক আড়াই ঘণ্টা লাগল। সামনেই দেখি হনুমানার বাস ছাড়ছে—তাড়াতাড়ি সেটাতে গিয়ে উঠলাম। রেল লাইন পিছনে ফেলে রাস্তা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চলে গেছে। চওড়া বাঁধান রাস্তা। ন্যাশনাল হাইওয়ে—রেওয়া, জব্বলপুর হয়ে সোজা নাগপুর চলে গেছে। মাইল পাঁচেক যেতেই পটভূমির পরিবর্তন হতে শুরু করল। ট্রেনে মুঘলসরাই থেকে এলাহাবাদ যেতে বাঁদিকে যে চ্যাপ্টা-মাথা বিন্ধ্যপর্বতের শ্রেণী দেখা যায় রাস্তা তার গা বেয়ে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। উপরে উঠে দেখি, পাহাড় কোথায়? এ ত ঠিক ছোটনাগপুর বা সাঁওতাল পরগণার মত উঁচু নীচু ঢেউখেলানো জমি—লাল মাটি আর পাথর—দূরে নীচের সমতলভূমি দেখা যাচ্ছে বলেই বোঝা যায় উপরে উঠেছি। এটা তা হলে বিন্ধ্যের অধিত্যকা। আরও দক্ষিণে দূরে উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী চোখে পড়ে। রাস্তা এঁকে বেঁকে সেই দিকেই গেছে। লোকবসতি বিরল—মাঝে মাঝে বন। অপেক্ষাকৃত সমতলভূমিতে ছোট ছোট গ্রাম। গ্রামগুলি ঘিরে শ্যামল শস্যে ভরা চাষের ক্ষেত। এ অঞ্চলে গমের চাষ কম—তিসি, সরষে আর অড়হরের

ক্ষেতই বেশি। দূরে থেকে পুষ্পিত তিসি আর সরষের ক্ষেত দেখলে মনে হয় কে যেন বেগনী আর হলদে রঙের শাড়ী পাশাপাশি মেলে দিয়েছে। তমসার উপনদী বেলান পার হলাম। পোলনেই নদীর বুকের উপর দিয়ে বাঁধান রাস্তা চলে গেছে—'কজওয়ে'। বর্ষাকালে অগম্য। এটা ইউ·পি রোডওয়েজ-এর বাস হলেও মেল বাস নয়—সব জায়গায় দাঁড়াতে দাঁড়াতে যায়। ভিড় বেশি, বাসের অবস্থাও 'পিপার মেল' এর তুলনায় জীর্ণ। তবু দৃশ্যের অভিনবত্বে বাসের ঝাঁকুনি, ভিড় বা ধুলো কোনটাতেই কষ্টবোধ হচ্ছিল না। হনুমানা পোঁছতে যখন মাইল দশেক বাকি তখন ফের পাহাড়ে চড়া শুরু হল। এ পাহাড়ের উচ্চতা অনেক বেশি, বনও গভীর। পাহাড়ের মাথাটা কিন্তু সেইরকম সমতল, শৃঙ্গ বলতে কিছু নেই। অগস্ত্যের আদেশ দেখি সবাই শিরোধার্য করেছে! পাহাড়ের ঠিক শীর্ষদেশ দিয়ে রাস্তা নিয়ে গেছে। বেশ কিছুদূরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় গিয়ে অপর পারে নামতেই পোঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্যস্থল—হনুমানায়। বেলা তখন বারোটা, মির্জাপুর থেকে ৪৪ মাইল আসতে আড়াই ঘণ্টা লাগল।

হনুমানায় খবর পেলাম সিংরৌলি এখান থেকে ৯০ মাইল দূরে। সিংরৌলির মাইল তিনেক এধারে মেডোলি পর্যন্ত বাস যায়, সে বাস ছাড়তে ঘণ্টা দুই দেরি আছে। বাস অফিসে মাল জমা রেখে খাবারের সন্ধানে বেরোলাম। ছোট শহর, আগে রেওয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন মধ্যপ্রদেশে পড়েছে। শহরের কেন্দ্রস্থল বলতে বাস স্টেশন, তার পাশেই বাজার। কয়েকটা খাবারের দোকান রয়েছে পরিষ্কার দেখে তারই একটা বেছে নিলাম। ভালই খাওয়া হল—গরম রুটি, ডাল আর নিরামিষ তরকারী।

মেডোলির বাস ছাড়ল বেলা আড়াইটেয়। রেওয়া অভিমুখে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যে বড় রাস্তা (ন্যাশনাল হাইওয়ে) ধরে সকালে এসেছি তা ছেড়ে বাঁদিকে বেঁকে আমাদের বাস চলল সোজা দক্ষিণ মুখে কাঁচা রাস্তা দিয়ে। বাসের পিছনে ছুটে চলল লাল ধুলোর মেঘ। বেসরকারী প্রাইভেট বাস, তাই সময়ে চলার চেয়ে যাত্রী উঠানোর দিকে নজর বেশি। যেখানে থামে ড্রাইভার আর কণ্ডাকটার দুজনেই বাস থেকে নেমে যাত্রী ডাকতে লেগে যায়। খুব দ্রুতই সব সীট ভর্তি হয়ে গেল—দাঁড়িয়েও রইল অনেকে। যাত্রীদের মধ্যে স্থানীয় কুলকামিনই বেশি। আমার পাশে বসেছিলেন বালিয়া জিলার এক ব্রাহ্মণ। বয়স হয়েছে, দেশে ক্ষেতী আছে। উপস্থিত যাচ্ছেন ওয়াইধানে, যজমান গৃহে। অনেকদিন আগে একবার কলকাতা গিয়েছিলেন। আমায় পেয়ে কলকাতার হালচাল জিজ্ঞেস করলেন। কলকাতার তাঁকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছিল হাওড়ার পোল আর কালীঘাটের মন্দির। ভদ্রলোক বেশ গুছিয়ে গল্প বলতে পারেন। তাঁর মুখে আজব শহর কলকাতার গল্প শোনার জন্য আমাদের সীটের কাছে ভিড় বেড়ে গেল। আমার মন অবশ্য ছিল জানালার বাইরে। কি সুন্দর দুধারের দৃশ্য! বিন্ধ্যপর্বতমালার কৈমুর শ্রেণীর পাহাড় একের পর এক ডিঙ্গিয়েই চলেছি। পাহাড়ের উপর গভীর বন, নীচের সংকীর্ণ উপত্যকায় ছোট বড় কোন পার্বত্য নদী গহন অরণ্যের বুক চিরে কুলকুল রবে বয়ে চলেছে। নদীর ধারে কোথাও বা দুচার ঘর লোকের বাস। বড় নদী বলতে শোন আর গোপদ বলে তার এক উপনদী—কোনটাতেই পোল নেই, পাথরের বাঁধান 'কজওয়ে' দিয়ে পার হলাম। মধ্যপ্রদেশে বাস চলাচলের একটা নিয়ম চোখে পড়ল। রাস্তায় যে কটা পুলিস ফাঁড়ি পড়ে সবগুলিতেই বাস থামিয়ে গাড়ীর নম্বর আর সময় ডায়েরী করাতে হয়। জানি না ডাকাতির ভয়ে এই নিয়ম চালু করেছিল কিনা।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। চারিদিক লাল আলোয় রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য অস্ত গেলেন। গাঢ় অন্ধকার নেমে এল। ড্রাইভার বলল, এ হল বাঘেলখণ্ডের জঙ্গল, এই রাস্তায় সন্ধ্যার পর প্রায়ই চিতা বা বড় বাঘ দেখা যায়। একদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলাম—হেডলাইটের আলোয় কিছু চোখে পড়ে কি না। ভাগ্য বিরূপ, খরগোশ ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। দিনের আলোয় অবশ্য হনুমানের পাল, ময়ূর আর ছোট বড় অজস্র পাখি দেখেছিলাম। বাঘ দেখতে না পাওয়ায় মনে ক্ষোভ হলেও যা দেখেছি তারই বা তুলনা কোথায়। যেখানেই বাস একটু বেশিক্ষণ থামছে নেমে দু পা বেড়িয়ে নিচ্ছি। গোটা দুই চা আর মিঠাই-এর দোকানে কেরোসিনের আলো টিমটিম করে জ্বলছে। আর কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নেই। খালি পশ্চিম আকাশে শুক্লা পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর এক চিলতে চাঁদ দেখা যাচ্ছে, আর সারা আকাশ ভরে তারা ঝলমল করছে। শহরে ত এত তারা চোখে পড়ে না। কনকনে ঠাণ্ডা, অন্ধকারের ভিতর একলা দাঁড়িয়ে ঝিঁঝিঁর ডাক শুনতে বেশ লাগে। ড্রাইভারের হর্ন শুনে আবার বাসে এসে উঠি।

ওয়াইধানে পোঁছুলাম রাত আটটা। বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করে রিহান্দ বাঁধের জলরাশি ওয়াইধানের প্রান্ত পর্যন্ত এসেছে। তবে অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলাম না। বাসের গন্তব্যস্থল মেডোলি পোঁছুলাম নটায়। এখান থেকে সিংরৌলি তিন মাইল—সাধারণত হেঁটেই যেতে হয়, কিন্তু সেদিন সিংরৌলি ছাড়িয়ে মড়োয়া গ্রামের একদল যাত্রী থাকায় ড্রাইভার বাস সিংরৌলি পর্যন্ত নিয়ে যেতে রাজি হয়। সামনে আর কোথাও খাবার পাওয়া যাবে না বলে ড্রাইভার আর কণ্ডাকটর এখানেই খেয়ে নিল, তাদের সঙ্গে আমিও যোগ দিলাম। মামুলি নিরামিষ রান্না তবে সঙ্গে ছোট এক বাটি ভর্তি দেশী ঘি দিল, অতটা ঘি জীবনে কখনও খাই নি। খাওয়া সেরে ফেলে ভালই করেছিলাম কারণ সিংরৌলিতে বাস থেকে নেমে মালপত্র ঘাড়ে করে অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে যখন ডাক্তার সাহেবের কোয়ার্টারে পোঁছুলাম তখন দশটা বেজে গেছে। আওয়াজ পেয়ে ঘুম ভেঙে উঠে আমায় দেখে সবাই অবাক।

সিংরৌলি কোলিয়ারীর নির্মাণকার্য তখনও শেষ হয় নি। কয়লা উঠান শুরু হতে দেরি আছে তবে নিতান্ত এক ছোট্ট গ্রামকে রাতারাতি রাণীগঞ্জ বা ঝরিয়ায় রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা। কাশ্মীর থেকে কেরালা, বম্বে থেকে বাংলা সারা ভারতের লোক এসে জড়ো হয়েছে। আনুষঙ্গিক কাজ জোর চলছে। পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি হচ্ছে, বন কেটে বসত। রেললাইন পাতার কাজও অনেকটা এগিয়েছে। তবে সব জায়গায় কেমন অগোছাল, ছড়ানো ভাব। কলোনীর ভিতরের জঙ্গলই সব কেটে উঠতে পারে নি। ডাক্তারের কোয়ার্টারটি সুন্দর। বাসিন্দা বলতে দুজন—ভাগ্নে আর আমার দিদি। স্থানীয় আদিবাসী চাকরটি ছিল খুব কাজের। রোজ ভোরবেলা এসে উনান ধরিয়ে গরম জল দিয়ে যেত মুখ ধোয়ার জন্য। এত ভোরে সে আসত যে ঠাণ্ডায় উঠে দরজা খুলে দিতে হবে এই ভয়ে ডাক্তার কোয়ার্টারের দরজা বন্ধ করতেন না, শুধু ভেজিয়ে রাখতেন। চুরির ভয় ছিল না, তবে আমার থাকাকালীন যেদিন সামনের নতুন এক কোয়ার্টারে—সেটা তখনও খালি পড়ে ছিল—ভরসন্ধ্যাবেলায় তিন তিনটে বাঘ দেখা গেল সেদিন থেকে রাত্রে দরজা বন্ধ করা শুরু হল। বলা যায় না কোন দিন হয়ত ঘুম থেকে উঠে দেখব বিছানার পাশে বাঘ শুয়ে আছে!

বিভূতিভূষণের বই পড়ে আমার বহুদিনের সাধ ছিল জঙ্গল দেখব। ট্রেনে বা

গাড়িতে চড়ে দূরে থেকে নয়, বনের ভিতর পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে বনকে দেখব, চিনব। সিংরৌলি এসে সে আশা মিটেছে। যে কদিন ছিলাম মনের সুখে বনে বনে ঘুরেছি। প্রাতরাশ সেরে ডাক্তার হাসপাতালে যেতেন সেই সংগে দিদিকে নিয়ে আমি বেড়াতে বেরোতাম। দুপুরে ফিরে স্নানাহার করে ফের ঘুরতে বেরুনো সন্ধ্যা পর্যন্ত। শীতকাল বলে রোদের মধ্যে হাঁটতে কষ্ট ছিল না। সাপের ভয়ও নয়। তা ছাড়া এদিকের বনে ছোট ঝোপঝাড় কম, যথেচ্ছ ঘুরতে কোন অসুবিধা হয় না। সিংরৌলির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২০০ ফুট হবে। চারিদিক ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা। সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টির উচ্চতা হাজার দুয়েক ফুট। নাম টিপাঝারিয়া। তার ওপারেই রিহান্দ বাঁধের জলাশয়।

কলোনী ছাড়ালেই বন শুরু হয়ে যায়। প্রধানত শালবন—সেই সঙ্গে আছে পিয়াল বা চিরঞ্জী, পিয়াশাল বা আসন, পীতশাল বা বিজাশাল, বহেড়া আর মহুয়া। সবগুলোই বিরাট—আকারে বনস্পতি বিশেষ। মাঝারি ও ছোট গাছের মধ্যে হরিতকী, আমলকী, খয়ের, শিউলি আর টেন বেশি। টেন বা কেঁদ গাছে গাবের মত ফল হয়। টেন যদিও আবলুশের স্বজাতি তবু কাঠের চেয়ে পাতার জন্য এর কদর, শুকনো পাতায় বিড়ি বাঁধা হয়। আমলকী আর হরিতকী গাছ ফলে ভরে থাকত—রোজ রুমাল ভর্তি করে আনতাম। নর্মদার তীরে শুনেছি একশ' ফুট পর্যন্ত উঁচু হরিতকী গাছ দেখা যায় —এ অঞ্চলের গাছগুলি অত বড় নয়। আম, বাঁশ ও শিমুল গাছ লোকালয়ের কাছে অনেক দেখেছি। গভীর বনের ভিতর চোখে পড়ে নি। অচেনা গাছ প্রচুর। গাছগুলির স্থানীয় নাম জানবার চেষ্টা করতাম—তবে অধিকাংশ লোকেরই এ বিষয়ে গভীর অনীহা। নাম জিজ্ঞাসা করলে আশ্চর্য হত। আম নয়, জাম নয়, কোথাকার জংলী গাছ—ওর আবার নামকরণের কি প্রয়োজন? বুনো গাছ বললেই ত হয়—এই ধরনের মনোভাব। বনস্পতিগুলির গা বেয়ে উঠেছে নানা জাতের ব্রততী আর তাদের শাখায় আশ্রয় নিয়েছে অর্কিড শ্রেণীর পরগাছা। মনোহর তাদের ফুলের বাহার। অধিকাংশ গাছের এই হল পাতা ঝরানোর সময়। পাতার চিকন সবুজ কোথাও ফিকে হয়ে গেছে, কোথাও ধরেছে উজ্জ্বল তামার রঙ। বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ। এ যেন রিক্ত হবার আগে বনানীর শেষ প্রসাধনের প্রয়াস। দেখে অবাক লাগে। আবার মনে হয় এই ত প্রকৃতির নিয়ম। যৌবনের শেষ প্রান্তে এসেই না রূপসীরা অঙ্গসজ্জার প্রতি সম্যক সচেতন হন। শীতপ্রধান দেশের বনভূমির হেমন্তকালীন 'ফল কালারস্'-এর কথা মনে হয়। ঠাণ্ডা অনেক বেশি বলে সেদেশে সব গাছের পাতাই প্রায় একসংগে রঙ বদলায়—তাই আরও মোহন রূপও ধরে।

আর পাখি? মামুলি কাক, শালিখ ও চড়াই বাদ দিলে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ত গাং শালিখ, লালচে-চোখ ব্রাহ্মণী শালিখ টিয়া, ঘুঘু আর ফিঙে। তা ছাড়া প্রায়ই দেখতাম গাছতলায় একদল ছাতারে বা সাতভাই কচকচ করছে, নীলকণ্ঠ তার নীল পাখা মেলে সুনীল আকাশে অকারণে উড়ে বেড়াচ্ছে, ছোট্ট সবুজ বাঁশপাতি ঘুরে ঘুরে উড়ছে আর পোকা ধরে খাচ্ছে। কোথাও বা ঝোপের ভিতর বুলবুলির ঝাঁক আপন মনে কোরাস গেয়ে চলেছে—তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একনাগাড়ে ডেকে যাচ্ছে ছোট্ট টুনটুনি পাখি। গাছের নিচু ডালে চুপটি করে বসে আছে শ্রাইক, যার কাজলপরা চোখ দেখে বনফুল নাম রেখেছেন কাজলা পাখি, দেখতে ভালমানুষটি কিন্তু নজর নিচের দিকে—পোকা মাকড় কিছু দেখলেই ঝাঁপ দিয়ে তুলে নিচ্ছে। খঞ্জন আর থিরথিরার লেজ নাচানো দেখতে বেশ লাগে। কালচুরি ত নির্ভয়ে আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশের শালিখের মত। শস্যক্ষেতে যেখানে ফসল কাটা হয়ে গেছে সেখানে পড়ে থাকা ফসলের দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে টিট্টিভ আর মুনিয়ার ঝাঁক। তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে জেব্রা রঙের পালকের জামা পরে হুপো বা হুদহুদ পাখি। সুদৃশ্য তার মাথার ঝুঁটি, ছোট্ট জাপানী হাতপাখার মত কখনও ছড়িয়ে দিচ্ছে আবার ইচ্ছামত গুটিয়ে রাখছে—বনফুলের মোহনচূড়া নামকরণ সার্থক হয়েছে। কলকাতাতেও এদের দেখেছি, তবে কদাচিৎ। এ বিষয়ে একটা নতুন জিনিস শিখলাম—তা হল, গভীর বনের ভিতর পাখি দেখা সহজসাধ্য নয়। লোকালয়ের কাছে যে সব পাখি আসে তারা মানুষকে তত ভয় করে না কিন্তু যে পাখিরা গভীর জঙ্গলে থাকে তারা ত মানুষ দেখতে অভ্যস্ত নয়—দেখলেই পালায়। সেইজন্য বনে অনেক অচেনা পাখির গান ও শিস শুনেছি, দূর থেকে আবছা দেখেওছি। কিন্তু তারা কেউই কাছে গিয়ে দূরবীন দিয়ে ভাল করে দেখবার সুযোগ দেয় নি। বনের কিনারায় দেখেছি চন্দনা-টিয়ার মত দেখতে তবে মাথাটা লাল, আর সন্ন্যাসী বা মিনিভেট। লম্বা ঠোঁট দিয়ে কাঠঠোকরাদের একমনে গাছের ডাল ঠুকরে যেতে দেখলাম, তবে তারা বাংলার লাল ঝুঁটি কাঠঠোকরা নয়, শাদায় কালোয় মেশানো মারাঠা জাতীয়। ময়ূর অনেক আছে, দূরে থেকে ভেসে আসা তাদের ডাক শুনতে বেশ লাগত।

সিংরৌলিতে একদিনের বেড়ানোর কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। ওখান থেকে মাইল চারেক দূরে ঝিঙ্গুরদা মাইনিং ক্যাম্প। সেখানে নাকি মাটির নিচে ভারতবর্ষের সবচেয়ে পুরু কয়লার স্তর পাওয়া গেছে। কয়লা উঠানোর কিছু সরঞ্জাম সেখানে রাখা ছিল আর যন্ত্রপাতির তদারক করতে কয়েকজন লোক তাঁবুতে থাকত। জায়গাটি টিপাঝারিয়া পাহাড়ের কোলে—গভীর বনের ভিতর মনোরম ও নির্জন। সিংরৌলি প্রোজেকটের ম্যানেজার কাপুর সাহেব বললেন, 'একদিন ঝিঙ্গুরদা ঘুরে আসুন। আরও মাইল দুয়েক এগিয়ে গেলে টিপাঝারিয়ার উপরে এক হনুমান মন্দির আছে। সেখান থেকে রিহান্দ লেকের দৃশ্য বড় সুন্দর। তবে হেঁটে যাবার চেষ্টা করবেন না, কষ্ট হবে। আমাদের জীপ ত হরদম যাচ্ছে, কোন অসুবিধা নেই।' শুনে জেদ চেপে গেল—হেঁটেই যেতে হবে। একটা জীপও পাওয়া গেল—স্থির হল তাতে দিদি ও স্থানীয় কয়েকজন মহিলারা যাবেন।

সেদিন রবিবার। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে বেলা একটায় রওনা হলাম। আমাদের হেঁটে চলার দলের চারজনের কেউই আগে হনুমান মন্দির যাননি, তবে ভরসা ছিল ঝিঙ্গুরদা গেলে পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ঝিঙ্গুরদা যাবার রাস্তা দুটি। একটি নতুন তৈরি গাড়ি যাবার রাস্তা—আধুনিক যন্ত্রদানব (বুলডোজার) দিয়ে

মাটি, পাহাড়, বন কেটে শ'খানেক ফুট চওড়া রাস্তা তৈরি করা হয়েছে যন্ত্রপাতি নিয়ে যাবার জন্য। এ-পথে হরদম ভারি গাড়ি যাওয়ার ফলে প্রায় এক হাঁটু ধুলো। তাই স্থির করলাম বনের ভেতর দিয়ে দেহাতীদের পায়ে-চলা অপর রাস্তা ধরেই যাব। গাড়ির রাস্তার চেয়ে বনের ভিতর দিয়ে যাওয়া অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হল।

প্রথম খানিকটা পথ যেতে হল চাষের জমির আল দিয়ে আর গৃহস্থদের মেটে-ঘরের পাশ দিয়ে। ক্ষেতে অড়হর সরষে তিসি যব আর ছোলার চাষ। বাড়ির উঠোন-গুলিও মুলো টমাটো মটরশুঁটিতে ভরে রয়েছে। ছোট ছোট পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। ঢেউ খেলানো উঁচু-নীচু জমি। নীল আকাশ, রোদ্দুরের তেজ আছে। কিছুদূরে গিয়ে বনের ঠিক কিনারায় একটি ছোট ঝরণা পেলাম। জল নেই বললেই হয়—শুধু বালি আর মাঝে মাঝে বড় পাথর ছড়ান রয়েছে। দুধারে দশ-বারো ফুট উঁচু খাড়া পাড় উঠে গেছে—গিরিখাত-এর পকেট সংস্করণ। রোদ্দুর পড়ে না বলে নদীর বুকটা বেশ ঠান্ডা। এত স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ যে একবার মনে হল কি হবে হনুমান মন্দিরে গিয়ে—এখানে বসেই ত সারাদিন দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যায়। ভাল লাগলেও গন্তব্যস্থলের দূরত্বের কথা মনে করে বেশিক্ষণ বসতে পারলাম না। নদী পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকলাম।

শালবনের ভিতর দিয়ে সরু পায়ে-চলা রাস্তা। যত এগোই বনের গভীরতা তত বেড়ে চলে। কিছুদূরে গিয়ে একজন প্রস্তাব করলেন যে পায়ে-হাঁটা পথ ত এঁকে-বেঁকে গেছে, জঙ্গল ভেঙে সোজা গেলে সর্টকাট হবে। সকলে সোৎসাহে রাজী হয়ে গেলাম। ছোট কাঁটাগাছে, বিশেষ করে খয়ের গাছের কাঁটায় একটু অসুবিধে হচ্ছিল। বন কোন কোন জায়গায় খুব নিবিড়, কোথাও বা পাতলা—মনে হয় গত কয়েক বছরের মধ্যে কিছু গাছ কেটেছে। জনসমাজের শেষচিহ্ন যে সরু পথ তাও ছেড়ে এসেছি। বিশাল শাল-পিয়াল থেকে শুরু করে ছোট আকারের শিউলি ও খয়ের পর্যন্ত কত বিচিত্র গাছের সমাবেশ। সেই সঙ্গে আছে ঝোপঝাড় আর লতার বাহার ও বহু অজানা পাখির ডাক। আমার কাছে ত সবই 'অপূর্ব এক স্বপ্নসম' লাগছিল—সে-অভিজ্ঞতা ভোলবার নয়। সমতলভূমি অল্প—অধিকাংশ পথই হয় চড়াই, না-হয় উৎরাই। একটি ছোট পাহাড়ের মত টিলার উপর গোরুর হাড় পড়ে আছে দেখলাম—বোধহয় বাঘে খেয়েছিল, স্বাভাবিক কারণে মরলে কি আর ঠিক পাহাড়ের মাথায় পড়ে থাকত।

কিছুদূর গিয়ে ঘন্টার টুং-টুং শব্দ পাওয়া গেল। বনে হারিয়ে যাবার ভয়ে এখানকার সব গোরুর গলায় ঘন্টী বেঁধে রাখে। একপাল গোরু নিয়ে রাখাল তার গ্রামের দিকে ফিরছিল। এদিকের জঙ্গল অনেকটা ফাঁকা হয়ে এসেছে। সঙ্গীদের একজন বললেন, 'পথ ছেড়ে দিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। অত বাবা ভাল নয়। রাখালের পিছু পিছু রাস্তায় ফিরে যাওয়াই ভাল।' বুঝলাম একঘণ্টা বনবাসের পর গোরুর সঙ্গও তাঁর লোভনীয় ঠেকছে। আমার এতে সায় ছিল না। কিন্তু ডেমোক্র্যাসির যুগ—ভোটে হার হল। গো-পালের অনুগমন করে সকলে বড় রাস্তায় এসে উঠলাম। এক হাঁটু ধুলোয় আর প্রখর রোদ্দুরের তাপে বনপথের কাব্য মুহূর্তমধ্যে উবে গেল।

ঝিঙ্গুরদা ক্যাম্পে পৌঁছে জানলাম যে দিদিদের নিয়ে জীপ তখনও আসেনি। পথের নির্দেশ পাওয়া গেল। একটু বিশ্রাম করে জল খেয়ে ফের রওনা হলাম। বলে এলাম যে, জীপ এলে আমরা এগিয়ে গেছি এ-খবর জানিয়ে দিতে।

গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চওড়া রাস্তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। স্বচ্ছন্দে গাড়ি যেতে পারে। বোঝা যায় যে, রাস্তা হালে তৈরি হয়নি—বরং বর্তমানে ব্যবহার হয় না বলে এখানে-সেখানে ছোট ছোট গাছ গজিয়েছে। এখানে এ-রাস্তা কে করল? শুনলাম কয়েক বছর আগে জিও-লজিক্যাল সার্ভের লোকেরা যখন কয়লার সন্ধানে প্রথম এ-অঞ্চলে আসে, তখন এই রাস্তা তৈরি হয়। সেই থেকে এগুলি জি-এস-আই রোড নামে পরিচিত।

ঝিঙ্গুরদার কাছেই একটা নদীর ধারে বেশ বড় আকারের একটি গাছের ফসিল চোখে পড়ল। রাস্তা ক্রমে টিপাঝারিয়া পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠেছে। এদিক-কার গাছগুলি আরও উঁচু, আরও ঘন বলে বোধ হল। বেলা তিনটে, কিন্তু মনে হয় যেন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পাশের বন থেকে হঠাৎ একটা হরিণ বেরিয়ে এল। আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখল কিন্তু ভয় পেয়েছে বলে মনে হল না। একটা কুকুর ঝিঙ্গুরদা থেকে আমাদের পিছু নিয়েছিল। হরিণটাকে দেখে তেড়ে গেল, কিন্তু পারবে কেন? একটু বাদে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল। মাইল দুয়েক যাবার পর দেখি পাহাড়ের গায়ে একটা সরু পাকদণ্ডী উঠে গেছে—কুকুরটা সেই পথ ধরল। আমরাও কি করব স্থির করতে না পেরে তার পিছু নিলাম। খাড়া চড়াই। একটু উঠেই একটা নারকেল পড়ে থাকতে দেখে বুঝলাম মাভৈঃ, ঠিক পথে চলেছি—কারণ দেবস্থানে নারকেল দেবার রীতি এ-অঞ্চলে আছে। পাহাড়ের ঠিক মাথায় মন্দির। বাঁধান চাতালের সামনে একটি ছোট ঘর। দরজা ভেজান ছিল—ঠেলতেই খুলে গেল। চোখে পড়ল সিঁদুর মাখানো হনুমানজীর মূর্তি। সামনেই কয়েকটি গাঁদা ফুল আর একটু জলের চিহ্ন দেখে বোঝা গেল সেদিন সকালেই কেউ পূজো করে গেছেন। কাছাকাছি কোন গ্রাম নেই। শুনলাম একটি সাধু এখানে বাস করেন। দিনের বেলা কাছাকাছি জঙ্গলের ভিতর আত্মগোপন করে থাকেন—সন্ধ্যায় এসে ধুনি জ্বালিয়ে সাধনে বসেন। চাতালের উপর স্থানে স্থানে ধুনির চিহ্ন, আধপোড়া কাঠ আর ছাই, পড়ে আছে। মন্দিরে প্রণাম করলাম। সেই সাধুর উদ্দেশ্যেও মনে মনে শ্রদ্ধা জানালাম। সাধনায় তিনি কি পেয়েছেন জানি না, তবে ভয় যে জয় করেছেন তা নিশ্চয় করে বলা যায়। বছরে একবার এখানে মেলা হয়, তখন নাকি অনেক যাত্রী আসে।

মন্দিরের সামনে এক [illegible]ট পাথরের উপর গিয়ে বসলাম। সাম[illegible] গভীর খাদ। শ' পাঁচেক ফুট নীচে একটি ছোট নদী বয়ে যাচ্ছে। তারপরে একটি ছোট পাহাড়। পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে বহুদূরে বিস্তৃত রিহান্দ বাঁধের নীল জলরাশি দেখা যায়। জলের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একাধিক পাহাড়ের চূড়া। ভাবি বছর দশেক আগে, যখন রিহান্দ নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়নি, এখানকার দৃশ্য কি রকম ছিল। ঘন বনের মাঝে, নীল পাহাড়ের নীচে সর্পিল রিহান্দের বুকে সোনালী বালি আর রূপালি জল হয়ত রোদ্দুরে ঝিকমিক করত। কালিদাসে যেমনটি পাই, নভোচারী মেঘ দেখছেন উপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতি-মঙ্গে গজস্য'—বিন্ধ্যগিরির প্রস্তরাকীর্ণ পাদদেশে হস্তীর অঙ্গে বিচিত্র ভঙ্গীতে আঁকা শৃঙ্গারলেখার ন্যায় ক্ষীণতোয়া নদী

বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন যা দেখছি—গহন অরণ্য, সুনীল জলরাশি আর তার মাঝ থেকে মাথা তুলে থাকা সবুজ টোপরের মত পাহাড়ের চূড়াগুলির একত্র সমাবেশ—এর তুলনা কোথায়? সঙ্গীদের একজন বললেন, 'বাঁধের ওপারটা দেখছেন ত? ঐ হল প্রসিদ্ধ সরগুজার জঙ্গল। সরগুজায় এর আগে যে মহারাজা ছিলেন বাঘ শিকারে তাঁর নাকি রেকর্ড আছে, এখনও সে রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেননি।' মনে পড়ে যায় কোথায় যেন পড়েছিলাম সরগুজার মহারাজা একলা বারোশ' বাঘ মেরেছিলেন। তা সত্ত্বেও যে ব্যাঘ্র বংশে বাতি দেবার কেউ আছে সেইটাই আশ্চর্য! সঙ্গী বলে চলেন 'সিংরৌলির বনকে কিন্তু তা বলে তাচ্ছিল্য করবেন না। সিংরৌলি কেন, ওয়াইধানের নাম শুনলেই বছর দশেক আগেও রেওয়ার লোকেরা শিউরে উঠত। এ-অঞ্চলটা ছিল যাকে বলে পাণ্ডববর্জিত দেশ। শুনেছি আগেকার দিনে রেওয়ার লোকেরা বাচ্চাদের ধমকে বলতেন—কেয়া ওয়াইধান যা রহে হো—মানে গোল্লায় যাচ্ছ! যতদূর দেখছেন সবই বাঘেলখণ্ডের মঙ্গল খোদ বাঘের দেশ।'

বাঘ থেকে বাঘেলখণ্ড নামের উৎপত্তি বলে অনেকের ধারণা। ইতিহাস কিন্তু তা বলে না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি উলুঘ খাঁ গুজরাট জয় করলে সেখানকার রাজপুত রাজারা পালিয়ে গিয়ে মধ্যভারতের দুর্গম পাহাড়ের অভ্যন্তরে স্বাধীন রেওয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রেওয়ায় এঁদের বলা হত বাঘেলা রাজপুত। সেই থেকে প্রায় সাতশ বছর রেওয়ার রাজাসনে শোলাংক বাঘেলা রাজবংশ রাজত্ব করে গেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর অন্যান্য করদ রাজ্যগুলির সঙ্গে রেওয়াও ভারত সরকারের শাসনাধীন হয়। ইতিহাসে পাই রেওয়ার রাজা রামচন্দ্রের কাছ থেকে মিঞা তানসেন দিল্লীর রাজসভায় যান। মুঘল বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করলেও রেওয়া রাজ্যের পৃথক অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। রাজা রামচন্দ্রকে দিল্লীর দরবারে আনতে আকবরকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সম্রাট রাজা বীরবলকে পাঠান। রাজসম্মান কবুল করে তবে বীরবল তাঁকে দিল্লীতে আনতে সক্ষম হন। বাঘের হিন্দী প্রতিশব্দ শের হলেও সংস্কৃতে ব্যাঘ্র বলে, সুতরাং ব্যাঘ্র তথা বাঘ থেকে যে বাঘেলখণ্ডের নামকরণ হয়নি এটা জোর করে বলা যায় না।

ঘড়ির কাঁটা আর পড়ন্ত রোদ্রের দিকে তাকিয়ে বেশীক্ষণ বসতে সাহস হল না। ঝিঙ্গুরদা ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি দিদিরা বসে আছেন, জীপের ড্রাইভার পাওয়া যায়নি বলে হেঁটে আসতে হয়েছে। ক্যাম্পের লোকেরা খাতির করে খাটিয়া পেতে দিল, চা করে আনল। বড় ভাল লাগছিল—সবে সূর্যাস্ত হয়েছে, পশ্চিম আকাশের লালিমা ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। খোলা মাঠের মধ্যে বসে আমরা গরম চা খাচ্ছি। সবাই নির্বাক, খালি দিদি আপন মনে একের পর এক গান গেয়ে যাচ্ছেন। সেই অপরূপ পরিবেশে 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে' গানের বেদনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল, চোখ অকারণ জলে ভরে আসছিল।

এবার ফেরার পালা। অন্ধকারে ভোজার রোড ছাড়া আর কোনো রাস্তা নিরাপদ নয়। দল বেঁধে একসঙ্গে চললাম। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর দেখি একটা জীপ আসছে। আমাদের ফিরিয়ে আনবার জন্য অনেক কষ্টে ড্রাইভার যোগাড় করে পাঠিয়েছে। মহিলাদের বসবার পর যা জায়গা রইল তাতে যতজন পারল উঠে পড়ল। আমাদের তিনজনের স্থান হল না, তাতে অবশ্য কোনো ক্ষোভ ছিল না। কারণ হাঁটব বলেই ত বেরিয়েছি। চওড়া রাস্তা, সিধে নাক-বরাবর চলে গেছে। দুই ধারে ঘন বন। জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। মাঝে একদল কুলির সঙ্গে দেখা। সকলের হাতে লাঠি, চেঁচিয়ে কথা বলতে বলতে পথ চলেছে। আমাদের খালি হাতে পথ চলতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল 'সামালকে যাইয়ে বাবুজী'। আমরা বললাম 'কেঁয়া হুয়া? সামালনেকো কেয়া হ্যায়?' উত্তরে খালি 'যো হোতা হায়—ওই হ্যায়, বাবুজী' বলে আর অপেক্ষা না করে দ্রুত এগিয়ে গেল। গা ছমছম করে উঠল, এদের বোধহয় রাত্রে বাঘের নাম করতে নেই—আমাদের পাড়াগাঁয়ে সাপকে 'লতা' বলার মত। সুন্দরবন অঞ্চলেও ত লোকে বাঘকে 'শেয়াল' বা 'বড়মেঞা' বলে উল্লেখ করে। সঙ্গীরা বললেন, রাত্রে এ-রাস্তায় জীপে যেতে অনেকেই বাঘ দেখেছেন। প্রাণে ভয় থাকলেও মনে হচ্ছিল একটা বাঘ বেরোলে মন্দ হয় না। পায়ে হেঁটে গভীর বনে নিরস্ত্র অবস্থায় বাঘের সামনে পড়া—সে এক গল্প করার মত অভিজ্ঞতা। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, বাঘ দেখা হল না।

বাঘ যে সত্যই অনেক আছে তার পরিচয় সেদিন সন্ধ্যাতেই পেলাম। সিংরৌলি পৌঁছতে প্রায় রাত্র সাড়ে আটটা বাজল, রাত্রের আহার সেরে শুতে যাব এমন সময় একজন দৌড়ে এসে খবর দিল কলোনীর ভিতরেই বাঘ বেরিয়েছে। যে অবস্থায় ছিলাম তার উপর ওভারকোট চাপিয়ে দৌড়লাম। ডাক্তার সাহেবের কোয়ার্টারের একশ' গজের মধ্যে জঙ্গলের ঠিক গায় কয়েকটি নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল—তখনও লোক আসেনি। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় সেই খালি কোয়ার্টারের ভিতর থেকে বাঘের ডাক শুনে সকলে দল বেঁধে গিয়ে টর্চের আলো ফেলে দেখে তিনটে বাঘ ঝগড়া করছে। আমরা গিয়ে পৌঁছবার ঠিক আগে বাঘ তিনটি সকলের চোখের সামনে দিয়ে দৌড়ে বনের ভিতর চলে গেল। শিকারী হিসাবে কোলিয়ারীর ইঞ্জিনীয়ার সিংসাহেবের নাম আছে। পায়ের ছাপ দেখে বললেন, 'বাঘ নয় চিতা'। বন্দুক নিয়ে কিছুদূর গেলেন। কিছু দেখতে পেলেন না।

পরদিন বিকালে কোয়ার্টারটির সামনে একটি ছাগল বাঁধা হল। সন্ধ্যার আগেই সিংসাহেব বন্দুক হাতে তার ছাদে গিয়ে বসলেন। শিকারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ না থাকলেও, আমি তাঁর সঙ্গী হলাম খালি বাঘ দেখার লোভে। হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস আর মশার কামড় সহ্য করে ঘণ্টা তিনেক ঠায় বসে রইলাম। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় সারা বনভূমি ঝলমল করছে। কানে আসছে একটানা ঝিল্লীর শব্দ। মাঝে মাঝে ছাগলটি ডেকে উঠছে, কখনও বা হাওয়ায় তার পাশের ঝোপটি দুলে উঠছে। আমাদের উৎকণ্ঠাও সেইসঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে। বাঘ কিন্তু এল না। তবে জ্যোৎস্নাপ্লুত অরণ্যের যে মায়াময় রূপ সেদিন দেখেছিলাম স্মৃতির ভাণ্ডারে তা বহুদিন উজ্জ্বল থাকবে।

সেদিন এও বুঝলাম যে বাঘেলখণ্ডে বাঘ প্রচুর আছে, মানুষে দেখেও থাকে, কিন্তু বাঘ দেখা সব মানুষের ভাগ্যে থাকে না।
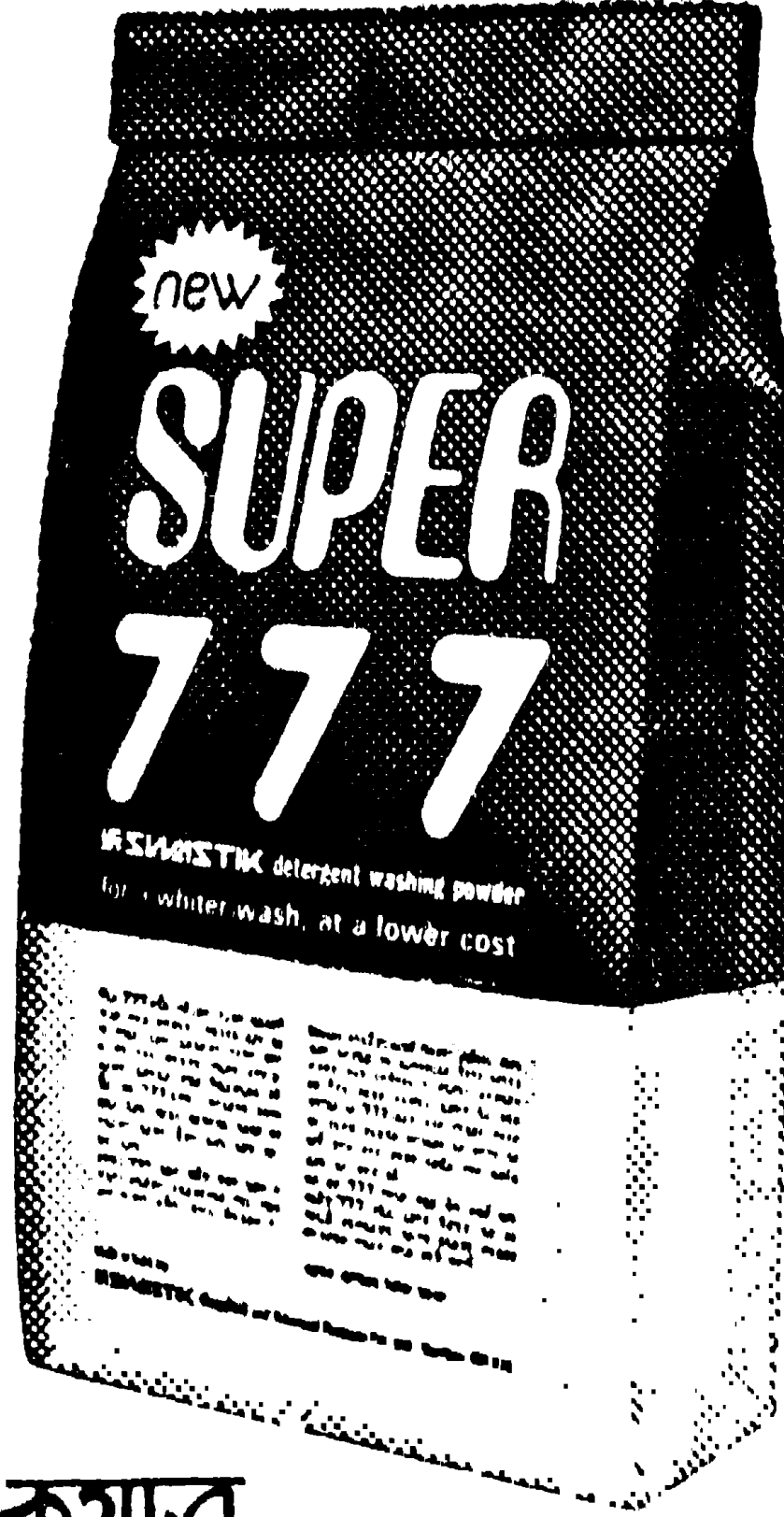
অঙ্গনা

ট্রেনের লেডিস কামরায় হঠাৎ একটু আলোড়ন উঠলো। নিত্যযাত্রীরা এসব দেখতে অভ্যস্ত। আমার মাঝেমধ্যে শখের যাত্রায় সেটা বেশ আকর্ষণীয় লাগলো।

টি টি ই শ্রীমতী অনিমা বসু

ট্রেনটা সবে চুঁচুড়া স্টেশন ছেড়েছে, এমন সময় ট্রেনের নজন যাত্রী তাদের হাতের বোনা, মুখের গল্প সব থামিয়ে দিয়ে নিয়মমাফিক পোশাক পরতে শুরু করলেন। তাই দেখে ট্রেনে গুঞ্জন উঠলো টি টি ই উঠেছে। টি টি ই অর্থাৎ ট্রাভেলিং টিকিট এগজ্যামিনার দেখে অনেকের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, কারো কারো বা মুখের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বুঝতে বাকি নেই কেউ বা নিয়মমাফিক ডবলিউ টি-তে যাচ্ছেন, কেউ বা তাড়াতাড়িতে টিকিট কেটে উঠতে পারেননি। অভ্যস্ত বিনা টিকিটের মহিলাদের ভাবান্তর কিছু নেই কিন্তু যাঁরা কোন কারণবশতঃ টিকিট কাটতে পারেননি, তাঁদের মুখে দুর্ভাবনা ফুটে উঠেছে, যদিও সকলেই স্বাভাবিক থাকতে চেষ্টা করছেন।

টি টি ই-রা অভিজ্ঞ চোখ একবার ট্রেনের কামরায় বুলিয়ে নিয়ে টিকিট চেক করতে শুরু করলেন। অসুবিধায় যাঁরা টিকিট কাটতে পারেননি, তাঁরা নানাভাবে সেসব অসুবিধার কথা জানিয়ে সে-যাত্রা ফাইন মঞ্জুর করতে বললেন। ফাইনসমেত অনেকেও টিকিট কাটলেন। আর যারা স্বেচ্ছায় নিয়মিত টিকিট ফাঁক দেন, তাদের একটা চ্যালেঞ্জিং মুড। নানা অজুহাতে বিশেষ করে 'মান্থলি' কথাটা বলে এড়িয়ে যাবার ছলছুতো। কিন্তু টি টি ই এরাও অভিজ্ঞ। আইনে জড়ানো সুতরাং টিকিট ছাড়া যাত্রীদের জোর করে পরের স্টেশন ব্যাণ্ডেলে নামালেন। বিনে টিকিটের যাত্রীদের মধ্যে প্রৌঢ়া থেকে স্কুল-কলেজের সুবেশা তরুণীরাও রয়েছেন। আমিও ওদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলাম, যদিও আমার ব্যাগে হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল-এর টিকিটটা ছিল। ওদের সঙ্গলাভের উদ্দেশ্য ছিল টি টি ই-দের সঙ্গে আলাপ করার বাসনা।

ওদের অনুসরণ করার ফলে আলাপ হলো টি টি ই শ্রীমতী অনিমা বসুর সঙ্গে দীর্ঘ একুশ বছর তিনি রেলওয়েতে চাকরী করছেন। প্রথমে তিনি টি সি হিসেবে তাঁর কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেন। বর্তমানে পদোন্নতি হওয়াতে তিনি ট্রাভেলিং টিকেট এগজ্যামিনার হয়েছেন। তাঁকে আমি সরাসরি প্রশ্ন করলাম 'আপনার ডিউটি সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইছি।' আমার প্রশ্ন শুনে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, 'আমাদের ডিউটির একটা প্রাথমিক ধারণা তো আপনার নিশ্চয়ই হয়েছে ট্রেনের কামরায় বসে। আপনার এটা প্রাথমিক ধারণা হলেও, আমাদের ডিউটিটাই হচ্ছে বিনে টিকিটের যাত্রীদের বার করা। আর বলতে কি, অভিজ্ঞতায় এত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছি যে, একবার চোখ বোলালেই বুঝতে পারি কামরায় কে কে বিনে টিকিটের যাত্রী আছেন। জানেন আমার চাকরী জীবনে ঠিক লোক নির্বাচন করতে খুব বেশী একটা ভুল হয়নি। ধরা পড়লে যাঁরা ফাইন দিয়ে টিকিট কাটেন, তাঁদের নিয়ে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। এটা তো স্বাভাবিক অনেকেই তাড়াহুড়োতে টিকিট কেটে ট্রেনে উঠতে পারেন না। কিন্তু সবচেয়ে বেশী বিপদ তাঁদের নিয়ে যাঁরা নিয়মমত টিকিট ছাড়া ট্রেনে চড়ার প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন।'

বিনে টিকিটের মহিলা যাত্রীদের মধ্যে কিছু কিছু শিক্ষিতাও রয়েছে দেখলাম। এঁরা নিয়মিত টিকিট ফাঁকি দেবার মতলবে থাকেন?'

এবারও শ্রীমতী বসু খানিক কি ভাবলেন, তারপর বললেন, 'জানেন বলতে লজ্জা হয় যাঁরা দিনমজুর খাটেন বা তরি তরকারী বিক্রী করতে ট্রেনে চড়ে এখান-ওখান যাতায়াত করেন তাদের বাদ দিয়ে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে লেডি টিচার, নার্স ছাত্রীরাও নেহাত মন্দ ধরা পড়েন না। এমনও অনেক সময় দেখেছি টিচার বা নার্সদের দু'-একজনকে ধরা পড়তে দেখে অন্যেরা ভীষণভাবে লজ্জিত হয়েছেন অথচ যারা ধরা পড়েছেন তাদের কোন সংকোচ নেই। মান্থলি শেষ হলে নতুন মান্থলি কাটতে অনেকে দিন সাত-আটদিনও কাটিয়ে দেন আর ধরা পড়লে পুরনো মান্থলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকেন। আর ছাত্রীরা অনেক সময় দলবদ্ধ হয়ে খানিক মজা করার উচ্ছ্বাসে টিকিট ছাড়াই ট্রেনে চেপে বসে। তাছাড়া রয়েছে দলবদ্ধ বাড়ীর গৃহকর্ত্রীরা যারা কাজের অবসরে দুপুরে সিনেমা দেখতে বিনে টিকিটেই ট্রেনে উঠে বসেন। এঁরা কিন্তু ধরা পড়লে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ট্রেনে যে টিকিট কেটে উঠতে হয় সে-কথা না-জানার ভান করেন। বুঝতেই পারছেন সেসব মহিলাদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়।

চাকরী হিসেবে এ-কাজ কেমন লাগছে?

বেশ ভালই লাগছে। আমার মুখের কথা টেনে নিয়ে বললেন। প্রথম প্রথম বাড়ী থেকে বেরিয়ে স্টেশনের হৈ-হট্টগোল খুব খারাপ লাগতো। এখন তো অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে, অফিসে বসে কাজ করতে তেমন আরাম খুঁজে আর পাই না। আমরা দুজন একসঙ্গে কাজে বেরোই, একই কামরায় থাকি দরকার হলে ফোর্সের সাহায্য পাই তাছাড়া অই টি অর্থাৎ ইন্সপেক্টর অব টিকেটস সব সময়ই আমাদের নজরে রাখেন যাতে আমরা কোন বিপদে না পড়ি। তিনি অত্যন্ত ভাল লোক। পরস্পরের সহযোগিতায় আমি কিন্তু আমার এ-কাজটাকে বেশ ভালবেসে ফেলেছি। কাজকে আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ না করলে কেন ভাল লাগবে?

আপনার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটু কিছু বলুন—এই যেমন ধরুন যাঁরা ধরা পড়লেন তাঁদের ব্যবহারটা আপনাদের প্রতি কেমন?

শ্রীমতী বসু একবার একটু শব্দ করে হাসলেন পরে বললেন দেখতেই তো পাচ্ছেন আমার এই ছোটখাটো চেহারা: একবার একদল কলেজের মেয়েদের যেই ধরেছি অমনি ওদের দাদারা পরের স্টেশনে আমাকে ঘেরাও করে ভয় দেখাতে লাগলো একেবারে তুলে ফেলে দেবো। সেদিন আমি শুধু বলেছিলাম, আমার এই ছোট্ট চেহারাটাকে তুলতে কোন কষ্ট নেই। সে-যাত্রায় আমার এই অসহায় অবস্থা থেকে ফোর্স আমাকে উদ্ধার করেছিল সে সঙ্গে বিনে টিকিটের মহিলাবাহিনীও ধরা পড়েছিল। পরে জেনেছিলাম সেদিন টিকিট না কেটে সে-পয়সায় একটু আমোদ করা ওদের উদ্দেশ্য ছিল।

একবার তো চোরাই মদ চালানকারিণীকে ধরে ফেলেছিলাম। কেন যে সে টিকিট ছাড়া ট্রেনে ওঠার রিসক নিয়েছিল জানি না। আর একবার এক মধ্যবিত্ত পরিবারের বৃদ্ধা আমাকে বললেন ষাট বছর বয়স আমার। জীবনে কোনদিন টিকিট কেটে ট্রেনে উঠিনি —একমাত্র কর্তা থাকলে কাটতো। আর তুমি বাছা আমায় টিকিট কাটার পরামর্শ দিচ্ছ। বলিহারি যাই আজকালকার মেয়েদের।' আমিও তাঁর পাল্টা জবাবে বললাম 'ষাট বছরে বিনে টিকিটে অনেক চড়েছেন। একালের মেয়েদের পাল্লায় পড়ে এবার একটা টিকিট কেটে জীবন সার্থক করুন।' এরকম নানা ঘটনা অহরহ ঘটছে। আসলে চাকরীটার সবচেয়ে আকর্ষণ বা নেশাই বলুন, বিস্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। শাস্তির মধ্যে কারো কারো দু'-এক রাত্রি হাজতবাস হয়।

আপনাদের প্রমোশন কেমন করে হচ্ছে?

লেডি টি সি হয়ে কাজে প্রথমে যোগ দিয়েছিলাম। সেখান থেকে দশ বছর অ্যানাউন্সার হিসেবে কাজ করেছি। তার জন্য অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে আমাদের ভয়েস টেস্ট হয়েছে। তারপর ক্ষোভের সঙ্গে বললেন জানেন এখন হাওড়াতে আর লেডি অ্যানাউন্সার নেই। যে-কাজটা মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে সুটেবল, সেখানে এখন পুরুষদের

বসানো হয়েছে। অ্যানাউন্সারের পোস্ট থেকে ট্র্যাভেলিং টিকেট এগজ্যামিনার হয়েছি।

পারিবারিক জীবন আলোচনা করতে তিনি বললেন, 'আমার এক ছেলে আর এক মেয়ে। এরা যখন ছোট ছিল, তখন আমার চাকরী করতে খুব কষ্ট হয়েছে। কারণ, এ-কাজে পরিশ্রম অত্যন্ত বেশী। অবশ্য আমার স্বামী আমাকে সব সময়ে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন, মিস্টার বসুও একজন রেলওয়ের কর্মী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন চিত্রশিল্পী।

শ্রীমতী বসুর কর্মক্ষেত্রের কোন ক্লান্তির ছাপ পারিবারিক জীবনে নেই। ছোটবেলা থেকেই ক্যারিকেচার করে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি সাগির-দিনের ছাত্রী, তাই ক্যারিকেচার থেকে অবসর নিয়েছেন। সংগীত আমার বর্তমান জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। মানুষ যেমন নিয়মিত পুজো করে, আমিও তেমনি ঘণ্টা দুয়েক সংগীত-সাধনা করে উপাসনা করি' বলে-ছিলেন অনিমা বসু। ইউনাইটেড কালচা-রেল অ্যাসোসিয়েসন-এ তিনি সংগীত পরি-বেশন করেছেন। তাছাড়া অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে তিনি তাঁর কর্মজীবন সম্বন্ধে বারকয়েক বলেছেন। শ্রীমতী বসু সহজ সরল ও আমুদে। মুহূর্তের মধ্যে পরকে আপন করার অপূর্ব দক্ষতা তাঁর আছে। তিনি পরিশ্রমের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেন ছোটখাটো টুর করে।

—অঞ্জলি চৌধুরী

রান্না করে দেখুন

পালং শাকও ফেলনা নয়

কোন শাকই ফেলনা নয়। শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন আছে তাই প্রতিদিন অল্প একটু শাক খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। মাছের রাজা রুই শাকের রাজা পালং। পালং শাকের ঘণ্ট পালং শাক ভাজা পালং শাকের চচ্চড়ির কথা সকলেরই জানা আছে। আজ এমন কতগুলি পদের কথা বলব যেগুলি সচরাচর বাঙালী বাড়ীতে রান্না করা হয় না। এখন বাজারে প্রচুর পালং শাক উঠেছে—দামও বেশী নয়—কাজেই মাঝে মাঝে এই পদগুলি রান্না করে দেখা যেতে পারে।

পালং শাকের রায়তা :

উপকরণ : ৩ কাপ দই ১ চামচ গুঁড়ান জিরে ভাজা ২৫০ গ্রাম পালং শাক ৩টি কাঁচা লংকা আধ চামচ গুঁড়ান রাই সরষে বা মাস্টার্ড সামান্য গোলমরিচ নুন আন্দাজ মতো।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। কাঁচা লংকা কুচিয়ে নিন পালং শাক ভাল করে ধুয়ে কুটে নিন, ২। একটুও জল না দিয়ে আন্দাজ মতো নুন দিয়ে পাঁচ মিনিট আঁচে রাখুন ও ঠাণ্ডা হতে দিন। ৩। দই গোল-মরিচ ও রাই সরষে দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন এবং পালং শাকের সঙ্গে মেশান। ওপর থেকে জিরে ভাজার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। রুটির সঙ্গে খেতে ভাল লাগবে।

পালং উরুদ-চানা ডাল :

উপকরণ : ১৫০ গ্রাম খোসা ছাড়ানো কলাইয়ের ডাল, ২৫০ গ্রাম ছোলার ডাল, পালং শাক ৩০০ গ্রাম, নুন ও হলুদ আন্দাজ মতো, সামান্য হিং, দুটি শুকনো লংকা, ১ চা চামচ আস্ত জিরে, ১ টেবিল চামচ ঘি।

উরুদ অর্থাৎ কলাই চানা অর্থাৎ ছোলা—এই দুটি ডালের সংমিশ্রণে রান্না করা হয় বলে এই পদটিকে হিন্দিতে উরুদ-চানা ডাল বলা হয়।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। পালং শাক টুকরো টুকরো করে কেটে ধুয়ে রাখুন। ২। ছোলা ও কলাইয়ের ডাল ভাল করে ধুয়ে আন্দাজ মতো নুন হলুদ দিয়ে সেদ্ধ হতে দিন। ৩। ডাল যখন ফুটতে থাকবে তাতে পালং শাক ছেড়ে দিন। ৪। ডাল সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। ৫। ঘি গরম করে তাতে শুকনো লংকা, হিং ও জিরে ফোড়ন দিন এবং ডালে এই ফোড়ন ঢেলে দিয়ে ভাল করে সাঁতলে নিন। পরিবেশনের সময় প্রত্যেক বাটিতে ডালের ওপর ১ চা চামচ গরম ঘি বা মাখন ঢেলে দিন। রুটির সঙ্গে খেতে ভাল লাগবে।

পালং পনীর :

উপকরণ : পালং শাক ১ কেজি, ৩টি কাঁচা লংকা, এক টুকরো আদা, ½ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, ১ চা চামচ গুঁড়োনো গরম মশলা, পেঁয়াজ ২৫০ গ্রাম, ½ চা চামচ লংকার গুঁড়ো, ½ চা চামচ জিরে, ২ টেবিল চামচ ঘি, ১ কেজি দুধের ছানা এবং নুন আন্দাজ মতো।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। ছানা জল ঝরিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ভেজে নিন। ২। পালং শাক টুকরো টুকরো করে কেটে আদা বাটা, কাঁচা লংকা কুচোনো ও নুন হলুদ দিয়ে আঁচে বসান। নরম হলে নামিয়ে চটকে নিন। ৩। পেঁয়াজ কুচিয়ে নিন এবং কড়াইয়ে ঘি দিয়ে পেঁয়াজ ভাজুন। জিরে বাটা ও লংকার গুঁড়ো দিন। ৪। মশলা ভাজা হয়ে গেলে ছানার টুকরো ও সামান্য জল দিন এবং চটকানো পালং শাক দিন। নামিয়ে নিয়ে ওপর থেকে গরম মশলা ছড়িয়ে দিন। এটি একটি বিখ্যাত পাঞ্জাবী রান্না।

ক্রীম অফ স্পিন্যাচ স্যুপ :

উপকরণ : পালং শাক ৫০০ গ্রাম, দু টেবিল চামচ সেদ্ধ করা মটরশুঁটি এক কাপ দুধ, গোল মরিচ, অর্ধ চামচ চিনি অর্ধ কাপ টাটকা ক্রীম নুন আন্দাজ মতো।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। প্রথমে পালং শাক ভাল করে ধুয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ঢাকা দিয়ে আঁচে বসান। ২। নরম হলে নামিয়ে চেপে চেপে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে রসটা বার করে নিন। এই রসের পরি-মাণ এক কাপ হওয়া চাই। ৩। চার কাপ জল গরম করুন। জল গরম হলে পালং শাকের নির্যাস সেদ্ধ করা মটরশুঁটি নুন ও গোলমরিচের গুঁড়ো দিন। ৪। পাঁচ দশ মিনিট পর নামিয়ে নিয়ে এক কাপ দুধ গরম করে মেশান। ৫। ক্রীম ভাল করে ফেটিয়ে নিয়ে স্যুপের ওপর ঢেলে দিয়ে সাজিয়ে দিন। ক্রীম খুব বেশী ফেটালে কিন্তু মাখন বেরিয়ে আসবে—কাজেই সাব-ধানে ফেটাতে হবে।

মীট পালং :

উপকরণ : পালং শাক ৫০০ গ্রাম মাংস ৫০০ গ্রাম পেঁয়াজ দুটি আদা এক টুকরো রসুন দু কোয়া অর্ধ কাপ দই গরম মশলার গুঁড়ো এক চা চামচ লংকার গুঁড়ো এক চা চামচ হলুদ আন্দাজ মতো ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। পালং শাক টুকরো টুকরো করে কেটে ও ভাল করে ধুয়ে নিয়ে নুন দিয়ে চাকা দিয়ে সেদ্ধ করে নিন এবং জল শুকিয়ে গেলে শিলে বেটে নিন। ২। গরম ঘিয়ে পেঁয়াজ কুচি আদা রসুন বাটা লংকার গুঁড়ো নুন ও হলুদ দিয়ে মাংস ভাল করে কষে নিন। ৩। আন্দাজ মতো জল দিন যাতে সেদ্ধ হয়ে যায়। ৪। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে পালং পাতা বাটা মিশিয়ে দিন। ৫। জল মরে মাখা মাখা হলে মাংস নামিয়ে নিয়ে গরম মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন।

পালকী :

উপকরণ : পালং শাকের গোটা পাতা দশটি বেসন দুশো গ্রাম লংকার গুঁড়ো এক চা চামচ নুন আন্দাজ মতো ভাজবার জন্যে সর্ষের তেল টক দই এক কাপ তেঁতুলের চাটনি এক কাপ জিরে ভাজা গুঁড়ো

প্রস্তুত প্রণালী : ১। বেসন একটু তেলের ময়ান দিয়ে নুন ও লংকার গুঁড়ো দিয়ে গুলে নিন। ২। কড়াইয়ে তেল গরম করুন ও পালং শাকের পাতা একটি একটি করে বেসনের গোলায় ডুবিয়ে লাল করে ভেজে নিন। দশটা পাতাই ভাজা হয়ে গেলে ডিশে ডিশে আলাদা আলাদা করে সাজিয়ে ওপর থেকে ফেটানো দই তেঁতুলের চাটনি জিরে ভাজা সহযোগে চায়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

—সাধনা মুখোপাধ্যায়

রূপসীর খেয়াল

মুখ পরিষ্কার কি করে করতে হবে ও তারপর কি করতে হবে সে বিষয় ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এবারে মুখের ত্বকের টনিক ও বিভিন্ন ত্বকের এই শীতকালের জন্য ক্রীম সম্বন্ধে আলোচনা করব। তবে মনে রাখবেন এ সবই ঘরে তৈরী জিনিস দিয়ে হবে।

মুখের ক্রীম খসখসে শুকনো ত্বকের জন্য : (১) বড় চামচের দুই চামচ অলিভ তেল গরম করে তাতে দুই চামচ দুধের সর, ছোট চামচের এক চামচ মধু ও যদি সম্ভব হয় অর্ধেক আপেল (পাতলা পাতলা করে কেটে সেটা আগে আলাদা করে সেদ্ধ করে সেই জলে গলিয়ে ঘেঁটে নিতে হবে) দিয়ে সব এক সঙ্গে ঘেঁটে গলিয়ে ফেলতে হবে তারপর তাতে নিজের পছন্দ মতন কোন পারফিউমের দশ ফোঁটা মিশিয়ে নিতে হবে। সেই পদার্থটি পরে ঠান্ডা করে মুখে মেখে রাখা যাবে। এই ক্রীম মুখের ত্বকের পক্ষে খুবই ভাল। এটি বানিয়ে ৩।৪ দিন অন্ততঃ ব্যবহার করতে পারা যাবে, যদি ঠান্ডা মেশিনে থাকে।

(২) ডিমের কুসুম ১টি, বড় চামচের এক চামচ অলিভ তেল, দুই চামচ পাতি-লেবুর রস ও বড় চামচের এক চামচ ভাল পরিষ্কার ময়দা। এইসব এক সঙ্গে খুব ভাল করে ফেটিয়ে মিশিয়ে ফেলতে হবে। তারপর ক্রীমের মতন মুখে মাখতে হবে।

এবারে বলবো, তেলতেলে ত্বকের সম্বন্ধে।

(১) জই (ইংরাজীতে ওটমিল) বড় চামচের চার চামচ তার সঙ্গে একটি ডিমের সাদা অংশ বেশ ভাল করে সামান্য গরম জলে মিশিয়ে ব্লেন্ডার মেশিনে দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর চোখের অংশটি বাদ দিয়ে মুখের সব জায়গায় মেখে নিতে হবে। মিনিট কুড়ি ওই রকম রাখার পর গরম কাল হলে ঠান্ডাজলে আর শীতকাল হলে সামান্য গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। ইচ্ছা করলে এরপরই মেক আপ ব্যবহার করা যায়। এটা মাখার সময় ভুরুতেও যেন না লাগে সেটা দেখে নিতে হবে। এছাড়া মুখ ধোয়ার সময় সাবান ব্যবহার করা উচিত না।

তবে এসবের ব্যবহারের সময় সর্বদা কতকগুলি বিষয়ে নজর রেখে চলতে হবে বা উচিত। তোয়ালে দিয়ে বা কাপড় দিয়ে চুল কপালের ওপর থেকে উঠিয়ে বেঁধে রাখতে হবে। চোখের ওপর সব রকমের জিনিস ব্যবহার হয় না, তাই সেই সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। তৃতীয় নিয়ম মুখে ও গলায় যে কোন জিনিস মাখার আগে নীচ থেকে ওপরের দিকে টেনে টেনে লাগাতে হবে ও মুখের স্বাভাবিক ভাঁজগুলির সঙ্গে মিল রেখে সেই মতন টানতে হবে। এবং শেষ কথা মনে রাখতে হবে যে, মুখ মোছার জন্য সর্বদা নরম কাপড়, তুলো বা নরম তোয়ালে ব্যবহার করতে হবে। খসখসে কড়া কিছু দিয়ে মুখ মুছলে তা ত্বকের ক্ষতি করে।

ত্বকের টনিক বা ত্বকের উজ্জ্বলতা ও স্বাস্থ্যের জন্য : (১) বাঁধা কপির পাতা বা লেটুস পাতা কিংবা তাজা সবুজ বিন খুব ছোট ছোট করে কুঁচিয়ে রাখতে হবে। তার-পর জল ফুটিয়ে পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে রাখতে হবে। তারপর সেগুলি ওই জলে আবার ফোটাতে হবে। ফুটে যখন পাতা-গুলি বা সব্জি গলে যাবে প্রায়; তখন ঠান্ডা করে ছেঁকে নিতে হবে। এবারে মুখ পরিষ্কার করে তুলো দিয়ে ওই জল থুপে-থুপে মুখে লাগিয়ে রাখলে ত্বকের পুষ্টি হয় ও সতেজ হয়। এরকম করে মুখে দিলে অন্ততঃ দুইবার মাখলে ত্বকের খুব উপকার হয়। এটি বানিয়ে বোতলে রেখে দেওয়া যায়। ইচ্ছা করলে কিছু ফোঁটা পারফিউম দিয়ে নিতে পারা যায়।

(২) আর এক রকমের টনিক হচ্ছে পাতিলেবুর রস, গোলাপ জল ও এক ফোঁটা মধু। পরিমাণটা জানাচ্ছি। একটা পাতি-লেবুর রসে, আধ কাপ গোলাপ জল ও এক ফোঁটা মধু। এই অনুপাতে যতটা খুশী বানিয়ে রাখা যায়। এই তিন রকম মিলিয়ে বোতলে ভরে রাখতে হবে। তারপর তা তুলোতে ভিজিয়ে মুখে মাখতে হবে। দিনে দুইবার। এতে চেহারার ওপরের ক্লান্তির রেখা চলে যায় আর ত্বক খুব উজ্জ্বল সুন্দর দেখায়।

(৩) ব্রান্ডি বড় চামচের দুই চামচ—এক চামচ দুধ ও এক চামচ কমলালেবু অথবা পাতিলেবুর রস মিশিয়ে তাই দিয়ে মুখে থুপে থুপে দিলে মুখের ত্বক স্বচ্ছ সুন্দর ও টান হয়। বয়সের দাগ পড়ে না।

(৪) ত্বককে তাজা ও টান রাখার জন্য আর এক রকমের ব্যবস্থা আছে। খোসা শুদ্ধু শশা চাক চাক করে কেটে তার সঙ্গে ১ চামচ মধু আধ কাপ দুধ ও ৩।৪ ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়ে তৈরী করতে হবে। প্রথমে শশার টুকরোগুলি মেশিনে দিয়ে একেবারে গলিয়ে নিতে হবে। তারপর তার সঙ্গে মধু দুধ ও গ্লিসারিন মিশিয়ে নিতে হবে। পরে সেই জিনিসটা তুলোয় করে থুপে থুপে মুখে মেখে রাখতে হবে অন্ততঃ ২০ মিনিট। পরে সামান্য গরম জলে মুখ ধুয়ে আবার ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে ত্বকের ওপরের রোমকূপগুলি খুলে যায় ও আবার বন্ধ হয়ে টান হয়ে যায়। এতে মুখের ওপরে কোন ভাঁজ পড়ে না ও ক্লান্তির রেখা থাকে না।

এবারে এমন একটা মুখের আচ্ছাদনের সম্বন্ধে জানাবো যা বিভিন্ন ত্বকের ওপর শুধু সময়ের ব্যবধানে ব্যবহার করা যাবে। যেমন এই উপকরণটি ১০ মিনিট থাকবে যাদের ত্বক শুকনো ও খসখসে। ১৫ মিনিট থাকবে যাদের ত্বক সাধারণ, ২০ মিনিট থাকবে যাদের ত্বক তেলতেলে। তাহলে দেখুন ব্যাপারটা কতো সহজ।

একটি ডিমের সাদা অংশ ও তাতে দু চামচ কমলার রস ও ১টি চামচ মধু বেশ করে দিয়ে সেটা মুখে মাখবেন। এতে উপ-কার অনেক। তারপর নির্দিষ্ট সময়ের পর মুখ ঠান্ডা জলে ধুয়ে শীতকাল হলে বোরোলীন কিম্বা কোনো ভালো ক্রীম (ঘরে তৈরীও চলে) মেখে নেবেন। গরমকাল হলে কিছু না মাখাই সবচেয়ে শ্রেয়।

এর সঙ্গে একটা কথা মনে রাখবেন মুশুরীর ডাল বাটা, কমলালেবুর খোসা বাটা কাঁচা হলুদ বাটা, পাতিলেবুর রস, দুধের সর ইত্যাদি যা প্রতিদিন প্রতিঘরে সহজে পাওয়া যায় তার মতন উপকারী ও ভাল জিনিস আর হয় না। এগুলি দিয়ে মুখ ও শরীরের যত্ন করলে শরীরের চামড়া মসৃণ সুন্দর তো হয়ই, এছাড়া যৌবনের উজ্জ্বলতা ও ত্বকের টান ভাব থেকে যায় চিরকাল। আপনারা করে দেখুন, ভাল ফল পাবেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

—বরবর্ণিনী

রূপসজ্জা

মেঘবরণ চুল নিয়ে কুঁচবরণ কন্যা তার কেশবতী ছায়া ফেলে চলেছে মনের মধ্যে। দেখব না দেখব না করেও আপনি দেখলেন এমন একটা ভাবপ্রবণতা আপনার মধ্যে। মন তো লজ্জাবতী লতা হবেই। 'কে বলেছে?' চুল বাঁধতে বাঁধতে লেডিজ বিউটি কর্ণারের কর্ণধার অসিতকুমার দাশ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন। এবং আপনি যা বলছেন এখন ঠিক তার উল্টোটা হয়। মেঘবরণ ঢল-নামা চুল নিয়ে ছেলেরা রীতিমত কেশবান হয়ে মেয়েদের মনে ছায়া ফেলছে। আর মেয়েরা লজ্জার মাথা খেয়ে মাথায় হিমালয় কিম্বা কাঞ্চনজংঘা বসিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ জানবেন কেশটি নিঃসন্দেহে একটি শিল্প। এদেশে এই শিল্পচর্চায় মা-ঠাকুমারাই এতদিন অভিভাবক ছিলেন। ইদানীং একদম প্রফেশনাল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগেকার দিনে কনেকে দেখার আগের দিন মুসুর ডাল মিহি করে বাটা, সরষের খৈল, জবা ফুলের কুঁড়ি চটকে তার রস টক দৈ দিয়ে মাথা ঘষে ঘষে ধুয়ে দেওয়া হোত। মাথা পরিষ্কারের জন্য বেশী ব্যবহার হোত রিটা-ফল। আগের দিন রাতে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সেই জল ছেঁকে তাই দিয়ে মাথা ঘষলে চুল নরম, কালো এবং উজ্জ্বল হয়। আজকের দিনে এইসব বললে আপনি হাস্যাস্পদ হবেন মহিলাদের কাছে। বাজারে একগাদা শ্যাম্পু তা না হলে কম্নে খাবে কি করে।

: এ তো আপনাদের পক্ষেও প্রযোজ্য?

তা তো বটেই। তা না হলে আমরা করে খাচ্ছি কি করে। আজ এই চুল বাঁধা

প্রফেশন হিসাবে চালু হয়েছে বলেই তো...। তাই বলে এটা ভাববেন না যে, আমাদের কাছে চুল বাঁধতে আসার কি দরকার। সবকিছু ঘরে হয় না। নিত্যনতুন ফ্যাশন। বদলাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বদলে দিচ্ছি। ভাল হলে গ্রহণ করা হচ্ছে, খারাপ হলে বর্জন করা হচ্ছে।

ঃ বিশ্বের প্রথম কোথায় কিভাবে কেশসজ্জা প্রফেশন হিসেবে গ্রহণ করা হয়?

আমার যতদূর জানা আছে সেটা হচ্ছে—ফরাসী দেশে। এখানেই বিখ্যাত ভাস্কর আঁতোয়ান পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন একটি মাত্র পথ—কেশসজ্জা। ভাস্কর আঁতোয়ানের রূপান্তর ঘটেছিল কবরী-শিল্পী আঁতোয়ানে।

ঃ আপনি কতদিন হোল এই পেশা গ্রহণ করেছেন?

তা প্রায় ন' বছর হবে।

ঃ এই পেশায় বাঙালীরা কতদূর উন্নতি করেছে?

বিশেষ কিছু উল্লেখ করার মত নয়। কলকাতায় বেশীর ভাগ চাইনীজ মেয়ে এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত। ওরা ভয়ানক সিনসিয়ার এবং পরিশ্রমী। কাজ অত্যন্ত ক্ষিপ্র-গতিতে করে। তাই ওরা এত উন্নতি করেছে। বাঙালীরা এত খাটতে পারে না। তাই আমরা কোলকাতায় সাকুল্যে মাত্র তিনজন।

ঃ হঠাৎ কিভাবে এলেন এই পেশায়?

কোলকাতায় এই কাজ শেখার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। কিছু কিছু প্রাইভেট ট্রেনিং সেন্টার আছে। সেগুলি চালান চাইনীজরা। আমি একজন চাই-নীজের কাছে শিখেছি। বলতে পারেন হঠাৎই চলে এলাম। এক বন্ধুর সাথে থিয়েটার রোডের উক্ত ট্রেনিং সেন্টারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে কাজ দেখে কি জানি কেন ব্যাপারটা মাথায় ঢুকে গেল। কি করি কি করি তখন এরকম ভাবনার মধ্যে ছিলাম, তাই হয়তো সহজেই এই কাজের মধ্যে আসতে পারলাম।

ঃ এই বিউটি কর্ণার কেমন চলছে?

ভালোই।

ঃ প্রত্যহ কাস্টমার অ্যাভারেজ কত-জন?

দশ থেকে পনেরোজনের মত। বিয়ের সময় এক-একদিন পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ-জন পর্যন্ত হয়।

ঃ বাইরেও আপনি কাজ করেন?

হ্যাঁ। ফিল্মের নায়িকাদের আমি চুল বাঁধি। সুচিত্রা সেন থেকে শুরু করে অপর্ণা সেন, সুমিত্রা মুখার্জি, মিঠু মুখার্জির চুল নিয়মিত বাঁধি। এবং এপর্যন্ত অনেকগুলি ছবিতেও কাজ করেছি।

ঃ আচ্ছা আপনাদের এখানে খোঁপা বাঁধার মিনিমাম এবং ম্যাকসিমাম রেট কত?

মিনিমাম ছ'টাকা। ম্যাকসিমাম পঞ্চাশ টাকা।

[এখানে মডেল সবিতা দাশ ও অনুরাধা রায়। এ'রা যথাক্রমে কিস কার্ল এবং রোল বান খোঁপা বাঁধছেন। শ্রীদাশ কর্মরত। তাঁকে সাহায্য করছেন একজন চাইনীজ মহিলা।]

—নিরুপমা

মাঠের নায়ক

প্রণব রায়

বাপকা বেটা, সিপাহী কি ঘোড়া অথবা ইংরেজীর সেই 'লাইক ফাদার লাইক সন' প্রবাদ বাক্যটি যে মিথ্যে নয়, তার বেশ কিছু প্রমাণ দুনিয়ার এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে চিত্রকলায় অভিনয়ে রাজনীতিতে কিংবা খেলাধুলোর রাজ্যে এমন নজীর অতীতে মিলেছে। ভারতে আমাদের দেশে পাতৌদির ছেলে মনসুর, ভিনু মানকাদের ছেলে অশোক মানকাদ, অমরনাথের ছেলে মহিন্দর এবং সুরিন্দর, গাইকোয়াড় তনয় অংশুমান, মন্টু ব্যানার্জি এবং পঙ্কজ রায়ের ছেলে যথাক্রমে রবি এবং প্রণবের নাম অবশ্যই এই নজীরের স্বপক্ষে রায় দেয়।

প্রণব রায় ভারতের প্রখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড় এবং ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্বাচকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য পংকজ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। প্রণব কৈশোরের গণ্ডী পেরিয়ে এখনও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন নি বটে কিন্তু স্বকীয় ক্রীড়াকৃতির সূত্রে, নিজের ব্যাটিং বৈশিষ্ট্যে ইতিমধ্যেই সারা ভারতের ক্রিকেটরসিকদের নজর টানতে পেরেছেন। প্রণবের ক্রিকেটের আসর এখনও তেমন বিরাট হয়ে ওঠেনি বটে কিন্তু এ পর্যন্ত স্বল্প-পরিসর ক্রিকেট-জীবনে স্কটিশচার্চ স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীটি (বাণিজ্য) রীতিমত প্রতিষ্ঠিত।

প্রণব পংকজ রায় এবং বিজয়া রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম ১৯৫৮ সালে কলকাতার কুমারটুলি অঞ্চলে ভাগ্যকুলের রাজবাড়ীতে। ভাগ্যকুলের রায়েরা অবিভক্ত বাংলার এবং খণ্ডিত বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যেই শুধু নয় খেলাধুলোর জন্য বিপুল অবদান জুগিয়েছেন। এককালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মূল আড্ডাই ছিল কুমারটুলীর ঐ রাজবাড়ীতে। ক্রিকেট প্রণবের রক্তে, ক্রিকেট প্রণবের বংশে। পিতা পংকজ। এছাড়া বৃহৎ পরিবারেই অম্বর রায়, নিমাই রায় এবং গোবিন্দ রায়েরও জন্ম।

ছোটবেলায় ক্রিকেটে হাতেখড়ি হয়েছে প্রণবের কুমারটুলি পার্কে বাবা, দাদা, কাকাদের [illegible]। একটু বড় হওয়ার পর অর্থাৎ ১৯৭১ সালে প্রণবকে প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় কার্তিক বসুর কাছে পৌঁছে দেন পিতা পংকজ রায়। ১৯৭২ সালে বাংলা স্কুল দলের প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচিত হলেও চূড়ান্ত বারোজনের মধ্যে স্থান পান নি। পরের বছরও না। কিন্তু সে জন্য প্রণব কিন্তু হতাশ হন নি নিরাশ হন নি। কারণ ঐ অবসরে তিনি ক্রিকেটের ব্যাকরণটি ভাল করে চর্চার অবকাশ পেয়েছেন। লেট কাট, কভার ড্রাইভ, পুল, সুইপ এবং হুক সব রকমের মার শিখেছেন পরম শ্রম ও অধ্যবসায়ের বিনিময়ে। স্পিন বোলিংয়েও প্রণবের হাতটি ভাল। ফিল্ডিংও উপেক্ষণীয় নয়।

এই অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও তিতিক্ষার পুরস্কার মিলেছিল ১৯৭৩-৭৪ সালের ক্রিকেট মরশুমেই। কোচবিহার ট্রফির পূর্বাঞ্চলীয় খেলায় বাংলার দলভুক্ত হলেন প্রণব।

প্রথম খেলায় আসামের বিরুদ্ধে ৩২ রান অবশ্য তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। খেলায় বাংলা ইনিংসে জিতেছিল। পরের খেলায় বিহারের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে করেছিলেন ৩২ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে একশো অপরাজিত। হায়দরাবাদে আয়োজিত আন্তঃআঞ্চলিক কোয়ার্টার ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৫৮ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ১০১। পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে প্রণব প্রথম ইনিংসে আবার ১০১ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৮ (রান আউট)। ফাইনালে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে ইনিংস ওপেন করতে গিয়েই ১ রানে আউট। পরের ইনিংসে কিন্তু যোগ্য বদলা নিলেন প্রণব। আর অমরনাথ জাদেয়া এবং বেঙ্কামনের (সর্বভারতীয় স্কুল দলের প্রতিনিধি) মত বোলারকে হিমসিম খাইয়ে দিলেন তিনি। আউট হলেন ৬৯ রান করে। পরের বছরটি প্রণবের আরো উজ্জ্বল, আরও আলোকিত, আরও সার্থক। কোচবিহার ট্রফির প্রাথমিক পর্বে অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলীয় খেলায় জামশেদপুরে আসামের বিরুদ্ধে করেছিলেন গোটা একটি দিন উইকেটে থেকে প্রথম ইনিংসে ১৯৮ রাণ। বাংলার জয় হয়েছিল ইনিংসে। বিহারের বিরুদ্ধে আরও ভাল। ২৫১ অপরাজিত। এই খেলায়ও বাংলা জিতেছিল ইনিংসে। আন্তঃ আঞ্চলিক আসরে অবশ্য কোয়ার্টার ফাইনালে (নাগপুর) পরাজয় ঘটেছিল বাংলার। এর কারণ অবশ্য প্রণবের তথা পূর্বাঞ্চলের দুর্বল ব্যাটিং। প্রথম ইনিংসে প্রণব শূন্য রানেই আউট হয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় দফায় প্রণবের সংগ্রহ ছিল ৪৩। সি কে নাইডু ট্রফির আসরে প্রণব এবার নিয়ে খেলছেন দ্বিতীয়বার। গতবছর খেলা সম্ভব হয়নি পড়াশুনোর চাপে। তার আগের বছর কানপুরে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

ঘরোয়া ক্রিকেটের আসরে প্রণব খেলেন টাউন ক্লাবে। গতবছর খেলেছিলেন স্পোর্টিং ইউনিয়নে অর্থাৎ বাবার ক্লাবে। প্রণব একটু একটু ফুটবলও খেলতে পারেন। দাদার সংগে (প্রদীপ রায়) মাঝে মাঝে বল নিয়ে এখনও নেমে পড়েন কুমারটুলি পার্কে। প্রণবের কিন্তু খুব দুঃখ দাদা ক্রিকেটকে সিরিয়াসলি নেন নি বলে। অথচ প্রদীপের ব্যাটিংয়ের ধরণটি ছিল রীতিমত পরিপাটি। লেগে থাকলে প্রণবের বিশ্বাস—এক দিন না এক দিন দু ভাই মিলে বাংলার ইনিংস ওপেন করতে পারতেন।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশবিদেশের খেলা

নতুন প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল

আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিকসে সোভিয়েত রাশিয়ার একাধিপত্য সুপ্রাচীন। ইতিহাসের ধূসর জীর্ণ পাতাগুলোতে এখনও জ্বল জ্বল করছে রুশ জিমন্যাস্টদের অভূতপূর্ব জিমনাসিয়ামের ছন্দময় কারুকৃতি।

পুরুষ বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি অনায়াসে অব্যাহত থাকলেও মহিলাদের বিভাগে রুশ শীর্ষাসনটি হারিয়ে যায় চেক তরুণী ভেরা কাসালাভাসকার আবির্ভাবে। বিগত কয়েকটি অলিম্পিক ও ইউরোপীয় জিমন্যাস্টিকের আসরের রানী ভেরা কাসালাভাসকার নিপুণ নিখুঁত জিমন্যাস্টিক-সৌষ্ঠবের কাছে গত এক যুগের ওপর পূর্ব জার্মানী জাপান রাশিয়া প্রমুখ জিমন্যাস্টিকসে অগ্রগণ্য দেশগুলো মাথা তুলতে পারে নি।

একটির পর এক একটি প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতার মর্মান্তিক গ্লানিকে ভোলবার অভিপ্রায়ে—সোভিয়েট বিশেষজ্ঞরা সম্ভাবনাময় প্রতিভার সন্ধানে সচেষ্ট হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকের খনন কার্যের মত এই প্রচেষ্টার যে কটি উজ্জ্বল প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে তার মধ্যে লুডমিলা তুরিশেচভা ও ওলগা করবুটের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তুরিশেচভার সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি বলে এখানে সে প্রসঙ্গে আর বিস্তৃত আলোচনায় যাচ্ছি না। তবুও নিঃসন্দেহে একটা কথা স্বীকার না করলে কীর্তিময়ী তুরিশেচভা সম্পর্কে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একাধিক অলিম্পিকে রুশ মেয়ে লারিসা লাতিনিনা যে স্বর্ণযুগের পত্তন করেছিলেন পরবর্তীকালে লুডমিলা তুরিশেচভা যেন তারই ঐতিহ্যবাহী। আর ওলগা করবুট বিশ্ব জিমন্যাস্টিকসের রঙ্গমঞ্চে রুশ তরুণীদের পুরনো সম্মানকে সোনালী সফলতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছেন তুরিশেচভার দৃঢ় পদক্ষেপের তালে তালে অবিচল নিষ্ঠায় অকপট তপস্যায়। ওলগা নতুন প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল। আরও সম্ভাবনায় দীপ্তিময়ী।

মিউনিখ অলিম্পিকে তুরিশেচভা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি অর্জন করলেও রুশ মহিলা জিমনাস্ট দলের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের অন্তরালে ওলগা করবুটের অমূল্য অবদান অনস্বীকার্য। হর্সভল্টে ১৯·১৭৫ পয়েন্টে পঞ্চম স্থান আনইভেন বারে ১৯-৪৫০ পয়েন্টে দ্বিতীয়, বীম ব্যালেন্সে ১৯-৪০০ পয়েন্টে প্রথম ও ফ্লোর এক্সারসাইজে ১৯-৫৭৫ পয়েন্ট লাভ করে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম হন। অন্যান্যদের মধ্যে লাসাকোভিচ, বুরদা, সাদী প্রভৃতি সতীর্থদের দানও কিছু কম নয়। রুশ তরুণ-ভাগ্যবানদের সাফল্য বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মত কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। রীতিমত জিমন্যাস্টিকসের রেওয়াজ সেখানে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে রাশিয়ায় জিমনাস্টের সংখ্যা ৬,৪৭,০০০ জন। কেবল শিশু জিমনাস্ট প্রশিক্ষণ স্কুল রয়েছে ১২০০। প্রশিক্ষকের সংখ্যা ৫০০০।

মিউনিখ অলিম্পিকে একনিষ্ঠ সাধনার বিচিত্র পসরা সাজিয়ে এসেছিলেন জার্মানীর কারিন জানজ (ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়) ও এরিকা-র মত আরও অনেক দেশের অনেক প্রতিযোগী। কিন্তু উপস্থিত সমালোচক ও বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে 'অলিম্পিক ম্যাজিসিয়ানের' আখ্যা ওলগা করবুট ছাড়া আর কেউ পান নি। ওলগার বিভিন্ন ইভেন্টে ছন্দমধুর লীলায়িত মুহূর্তগুলি নয়নাভিরাম। সহজ স্বচ্ছন্দ অংগসঞ্চালনের কলা-কৌশল দেখে মনেই হয় না যে সে কোন রক্ত-মাংসের মানবী। যেন প্লাস্টিকের তৈরী যন্ত্রচালিত কোন শরীর। অতীতে অনেক খ্যাতির অধিকারিণী উনিশ বছরের মেয়ে ওলগা যেন যাদুকরের মত তার স্বকীয় ঘনিষ্ঠ সাধনার আশ্চর্য যাদুমন্ত্রে দর্শকদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। বস্তুতঃ ওলগা করবুট 'অলিম্পিক ম্যাজিসিয়ান'।

বাইলোরাশিয়ার গ্রোডনো কলেজের সদা-হাস্যময়ী ওলগাকে মিউনিখের আসরের শেষ ভাগে দেখা যায় অন্যরূপে। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপের প্রতিযোগিতায় প্যারালাল-বারের খেলায় অল্পের জন্যে দেহের ভারসাম্যের ছন্দপতন ঘটলে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের কাঁটা ৭·৫০ পয়েন্টে আটকে গেলে লাস্যময়ী ওলগার দু চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। সেদিন ওলগার বাঁধভাঙা চোখের জলের সঙ্গে অনেকেরই চোখের জল মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

স্নেহপ্রবণ চরিত্রমাধুর্যে ওলগা সবার প্রিয়। খুব সহজে ভেতরের মানুষকে আপন করে নিতে জানেন। অলিম্পিক গ্রামে সহাস্যে হাজারখানেক অটোগ্রাফ দিয়েছেন। আর অত ব্যস্ততার মধ্যেও অজস্র চিঠির উত্তর লিখেছেন। আনন্দ বেদনা জড়ানো সহজাত কোমল নারী মনটির উপস্থিতি ওলগার মধ্যে বড় বেশী সুস্পষ্ট।

জিমনাস্টিকে আত্মমগ্ন ওলগা স্বপ্নরঙীন। ভবিষ্যতে নিজেকে আরও গভীর স্বীকৃতি ও অধিক প্রশস্তির ব্যাপ্তিতে বিস্তৃত করে দিতে চান। হয়ত বা অনাগত ভবিষ্যতে তাই হবে। এই উজ্জ্বল নক্ষত্রটি বিশ্ব জিমনাস্টিকে আগামী দিনে আরও বড় আসন অধিকার করে বসবে। তিন অলিম্পিকে সেরা জাতীয় দলের প্রশিক্ষক লারিসা লাতিনিনাও ওলগা করবুট সম্পর্কে সংশয়াতীতভাবে একই ধারণা পোষণ করেন। আমরা কীর্তির আলোকে দীপ্তিময়ী সেই ওলগাকে দেখার অপেক্ষায়।

—প্রশান্ত দাঁ

ওলগা করবুট

খেলার জগতে মেয়ে
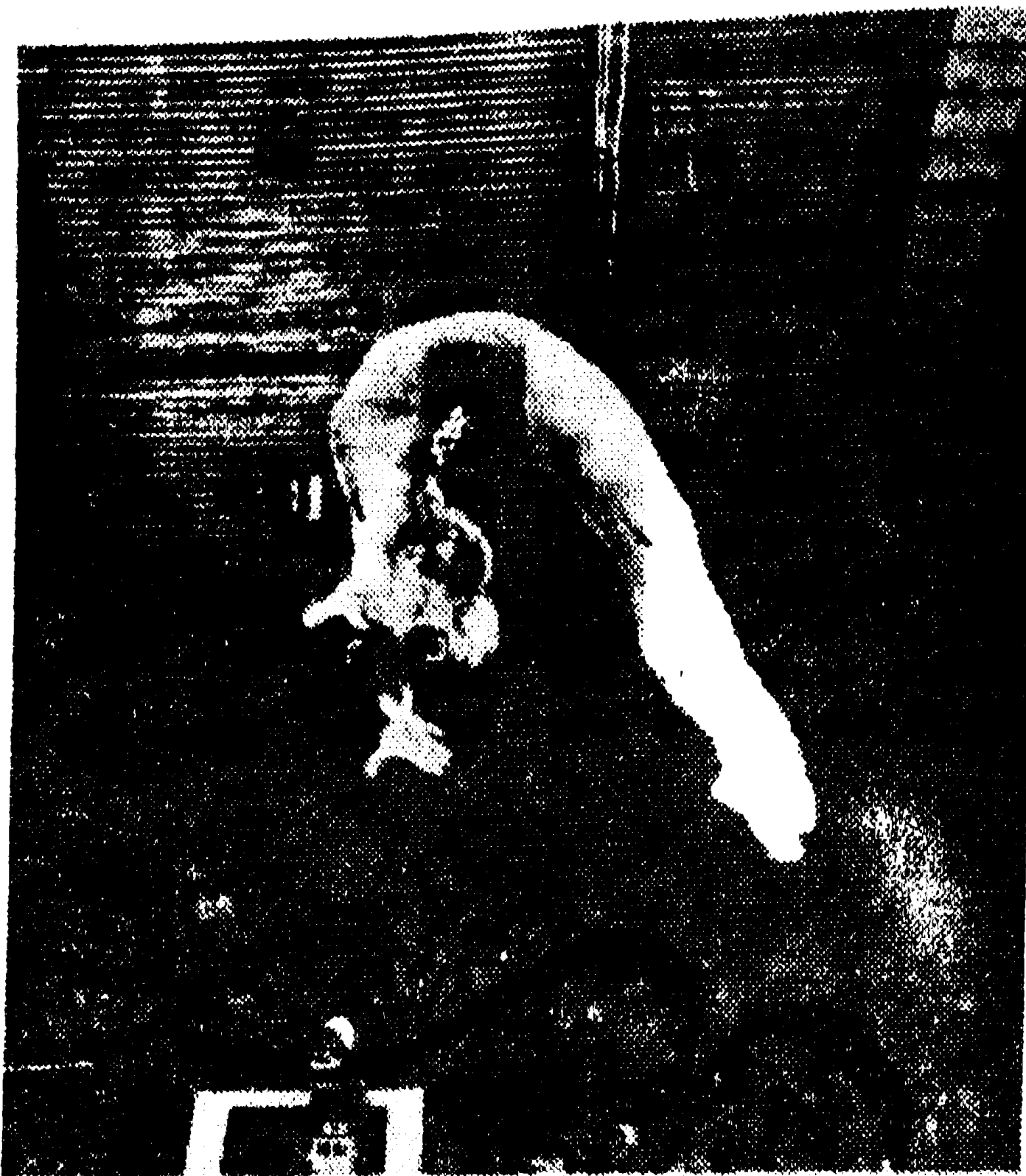
রাজ্য বাস্কেটবলে জোনাকী শেঠ

—মহিলাদের বাস্কেটবলে পশ্চিমবাংলা ভারতে শীর্ষস্থানীয় দল, আমরা অনেকবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ রাজ্যে মেয়েদের মধ্যে বাস্কেটবল খেলা প্রচার বা প্রসারের কোন ব্যবস্থাই করা হয় না। মুষ্টিমেয় এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও পার্শী মেয়েদের মধ্যেই খেলাটি সীমাবদ্ধ রয়েছে।

[illegible] জোনাকী শেঠ [illegible] জোনাকী ১৯৭৭-এ জাতীয় [illegible] একমাত্র বাঙালী খেলোয়াড়। বাস্কেটবল খেলোয়াড় হিসেবে জোনাকীর মূল্যায়নের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

সেদিন সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম ৭/১ ন উডম স্ট্রীটে এবারের পশ্চিমবাংলা বাস্কেটবল দলের এই একমাত্র বাঙালী খেলোয়াড়ের সঙ্গে দেখা করতে। স্বল্পবাক প্রচারবিমুখী অথচ সপ্রতিভ জোনাকী বাস্কেটবল খেলছে [illegible] থেকে। ১৯৬৬—৬৭ থেকেই মহর্ষি [illegible] মিহির [illegible] প্রশিক্ষণাধীনে জোনাকী বাস্কেটবল খেলার তালিম নেয়। এরপর একে একে স্কুল টীমের সর্বভারতীয় আসরে, পরে কলেজে থাকাকালে আন্তঃ কলেজ বাস্কেটবলে লোরেটোর পক্ষ হয়ে নিয়মিত খেলেছে। শুধু তাই নয়, কলকাতার মহিলা বাস্কেটবল লীগ ও নক আউটে প্রথমে লোরেটো ক্লাব ও পরে সাকি ক্লাব দলের নিয়মিত সদস্য এই জোনাকী। প্রাক এশীয় (১৯৭০) এবং জাতীয় দলে কয়েক বছর দলভুক্ত হয়েছে। '৭১-এ কোচিনে পশ্চিমবাংলা দল চ্যাম্পিয়ান হয়, জোনাকী ঐ দলে ছিল। '৭০-এ প্রাক এশীয় বাছাই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বাংলা দলে জোনাকী খেলেছে, '৭২-এ দিল্লীতে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় (ছাত্রী) বাস্কেটবলে কলকাতা দলের অধিনেত্রী ছিল জোনাকীই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনুশীলন করার সময়ে পায়ে আঘাত লাগায় ও প্রতিযোগিতার খেলায় নামতে পারেনি। স্কুলে থাকতে থাকতেই জোনাকী তার ক্রীড়াকুশলতার স্বাক্ষর রাখে। ১৯৬৮তে,

প্রথমে হায়দরাবাদে এবং পরে রায়পুরে নিখিল ভারত স্কুল ক্রীড়ায় জোনাকী বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করে। শেষোক্ত আসরে বাংলা বাস্কেটবল দলের নেত্রী ছিল জোনাকী ১৯৬৯-এ লোরেটো কলেজ দলে নিয়মিত খেলেছে। ১৯৭০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বাস্কেটবলে দল না পাঠানোর ফলে জোনাকী আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় আসরে খেলতে পারেনি। তবে ঐ বছর ও জাতীয় এবং প্রাক-এশীয় বাস্কেটবলে বাংলা দলে স্থান পায়। আগ্রায় জাতীয় আসরে বাংলা মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে বিজয়ী হয়। বাস্কেটবল দলের হয়ে জোনাকী বিদেশের আসরেও খেলে এসেছে। ১৯৭১-এ লোরেটো ক্লাবের হংকং এবং ব্যাংকক সফরকারী দলে জোনাকী স্থান পেয়েছিল। হংকং-এ দলটি কতকগুলি স্থানীয় দলের সংগে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ছাড়াও হংকংয়ের জাতীয় দলকেও হারিয়ে দেয়। এছাড়া বাংলা দল সেবার শ্রীলংকা সফরে পাঁচটি স্থানীয় দল এবং জাতীয় দলের বিরুদ্ধে খেলে জয়ী হয়।

গত বছর অর্থাৎ ১৯৭৪-এ দিল্লীতে জাতীয় মহিলা হকির রজত জয়ন্তী বর্ষের প্রতিযোগিতায় বাংলা ফাইনালে কর্ণাটককে হারিয়ে আবার চ্যাম্পিয়ান হয়। জোনাকী বলে আমাদের দলের খেলার মান অন্য সব রাজ্যের তুলনায় বেশ উঁচু। তবে, কেরল কর্ণাটক এবং দিল্লী খুব দ্রুত উন্নতি করছে। মহারাষ্ট্রও ক্রীড়ামান উন্নত করার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছে।

—ও সব রাজ্যের মেয়েরা ক্রমেই অধিক সংখ্যায় এই খেলার চর্চা করতে এগিয়ে আসছে। আর আমাদের এখানে খেলোয়াড়ের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। প্রথম ডিভিসনে মাত্র পাঁচটি দল!

—বাঙালী মেয়েরা বাস্কেটবল খেলায় আসছে না কেন?

—কারণ স্কুলজীবন থেকে এদের খেলবার কোন ব্যবস্থা নেই বলে। দেখুন বাস্কেটবল খেলাটা একটি খুব সূক্ষ্ম কলাকৌশলের খেলা। এর আইন-কানুনও খুব বেশী। কিন্তু এ খেলার জন্য ছোটখাট মাঠ বা কোর্ট হলেই চলে। অন্যান্য সাজসরঞ্জামও খুব একটা বেশী লাগে না। কিন্তু অধিকাংশ বাংলা মেয়ে স্কুলে বাস্কেটবল খেলা শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ বাঙালী মেয়েরা এই খেলা শিখলে তাদের শরীর স্বাস্থ্য এবং পটুত্ব বৃদ্ধি পাবে। আর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাংলার মেয়েদের ক্রীড়াচাতুর্যও প্রকাশ পাবে।

—এখানে এংগলো ও পার্শী মেয়েরা এ খেলার সুযোগ পায় কি করে?

—কারণ, ওদের ছেলেদের ক্লাবের সঙ্গে সংগে মেয়েদের ক্লাবও সংযুক্ত আছে। সেখানে ওরা বাস্কেটবল, হকি এবং টেনিস প্রভৃতি খেলার সুযোগ পায়। আমাদের নামী কম নামী কোন ফুটবল—ক্রিকেট ক্লাবের মেয়েদের শাখা নেই। তাই আমাদের মেয়েরা বাস্কেটবল বা হকি খেলা শিখতে পারে না। এথলেটিকসে কিছু কিছু সাহায্য পায় বলে মেয়েরা ছেলেদের ক্লাবের হয়ে এথলেটিক চর্চা করে প্রতিযোগিতায় নামে ক্লাবের হয়ে।

—বাস্কেটবল এসোসিয়েশন তো এ খেলা প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারে।

—সে ক্ষেত্রেও অসুবিধা আছে। রাজ্য বাস্কেটবল সংস্থার আর্থিক অবস্থা মোটেই অনুকূল নয়। অন্য অনেকরকম খেলায় বহু পৃষ্ঠপোষক আছেন। নানাভাবে তাদের অর্থাগমের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার বাস্কেটবল সংস্থার এমনি অবস্থা যে ছেলেদের খেলা প্রশিক্ষণ-অনুশীলনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে ওঠা হয় না। ভালভাবে অনুশীলনের মাঠ নেই। মেয়েদের জন্যে তো নেই-ই। প্রশিক্ষক আনার ব্যয়ই বা কে দেবে?

—বাঙালী মেয়েদের মধ্যে এ খেলা প্রসার করতে হলে কি কি করা উচিত বলে তুমি মনে কর?

—প্রথমতঃ প্রত্যেক মেয়ে স্কুলে এবং কলেজে নিয়মিত বাস্কেটবল খেলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। [illegible] রাজ্য সংস্থার আর্থিক স্থিতি [illegible]

উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে বিচার বিবেচনা করতে পারেন। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অফিসে মহিলাকর্মী দ্বারা যাতে বাস্কেটবল দল গঠন করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

—খুবই সুচিন্তিত অভিমত। তুমি যে এ সব ভাবো তার জন্য ধন্যবাদ। এখন বল তো তুমি কলেজে কি ভাবে খেলা চালাতে ?

—আমাদের কলেজে ভারতের প্রখ্যাত প্রাক্তন বাস্কেটবল খেলোয়াড় রামনাথ মজগেল ছিলেন প্রশিক্ষক। উনি এখন ভারতীয় দলেরও প্রশিক্ষক। ওঁর কাছেই আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি। এছাড়া সাফি ক্লাবের শ্রীপি ভৌমিক বর্তমানে আমাদের প্রশিক্ষক। স্কুলে খেলা সুরু করি—তাই কলেজে আমার সুবিধাই হয়েছে। জোনাকী কেবল বাস্কেটবল নয়, হকিতেও রাজ্য পর্যায়ের খেলোয়াড়, ১৯৭১-এ চণ্ডীগড়ে এবং ১৯৭৩-এ ভুপালে নিখিল ভারত মহিলা হকিতে জোনাকী বাংলা দলে খেলেছে। পরে হকির তুলনায় বাস্কেটবলই ওর কাছে বেশী ভাল, বেশী সুক্ষ্ম খেলা বলে মনে হওয়ায় বাস্কেটবলেই মনোনিবেশ করে। এ ছাড়া টেবল টেনিসে স্কুল ক্রীড়ায় বাংলা দলে স্থান পেত। পরে এ খেলাও ছেড়ে দেয়, ঐ বাস্কেটবলেরই জন্য।

—তুমি কি ভবিষ্যতে বাস্কেটবল প্রশিক্ষণ দেবে ?

—বাস্কেটবলে প্রশিক্ষিকা হওয়া খুব দুরূহ ব্যাপার বলে আমার মনে হয়। আনকোরাদের হয়ত প্রশিক্ষণ দিতে পারি। কিন্তু তৈরী খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দিতে অনেক কলাকৌশল জানতে হয়— শিখতে হয়, ততখানি দায়িত্ব নেওয়া কঠিন হবে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব খুবই গুরুতর। তবে জোনাকী রেফারীং করে থাকে এবং নিয়মকানুন খুব ভালরকম রপ্ত করেছে।

জোনাকী বললো, 'আমার বাবা আমাদের খেলাধুলায় খুব উৎসাহ দেন।' ওরা পাঁচ বোন, দুই ভাই। ওর পরের দুই বোনও বাস্কেটবল খেলায় কুশলী। মীনাক্ষী সাফি ক্লাবেই খেলে। ছোট বোন পিনাকী স্কুল পর্যায়ে বাস্কেটবলে রাজ্য দলে স্থান পেয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার জন্য যোগ দিতে পারে নি। জোনাকী মীনাক্ষীদের সাফি ক্লাব কলকাতা লীগে খুব শক্তিশালী দল। মীনাক্ষী ভাই-বোনেদের জয় করা কাপ, পদক আর ট্রফিতে ঠাসা আলমারী দেখিয়ে বলল, এই দেখুন আমাদের সাফল্যের সাক্ষী।

জোনাকী অবশ্য কাপ, পদকের চেয়ে খেলার বিষয়েই আলোচনা করতে আগ্রহী। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানালো, কলকাতায় কোন হার্ডকোর্ট নেই, কাঠের তৈরী আধুনিক কোর্টও নেই, আর ইণ্ডোর বা আচ্ছাদিত কোর্টও না। সংগঠনের আর্থিক সামর্থ্য নেই, এসব করবে কে? ছেলেদের জন্যই কিছু হচ্ছে না, তা মেয়েদের! জোনাকী বলে এইবার আস্তে আস্তে খেলা ছাড়তে হবে। তবে সুযোগ পেলে মেয়েদের বাস্কেটবল প্রশিক্ষণ দেবার ভার নেবে। তাছাড়া ভবিষ্যতে টেনিস খেলার ইচ্ছাও আছে।

জোনাকী বর্তমানে এস এফ (আই) লিমিটেডে চাকরি করে। ওর মুখ্য 'হবি' বই পড়া—আর গান।

অময়

খেলাধূলা

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট

মাদ্রাজে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারত ১০০ রানে জিতে বর্তমানে খেলার ফলাফল সমান (২—২) করেছে। ১৯৭৪—৭৫ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টে এবং ভারত তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্টে জিতেছে। বোম্বাইয়ের শেষ পঞ্চম টেস্টের ওপর সিরিজের ফলাফল নির্ভর করছে।

প্রথম দিনেই ভারতের প্রথম ইনিংস ১৯০ রানের মাথায় শেষ হয় এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের তিনটে উইকেট খুইয়ে ৩৬ রান সংগ্রহ করেছিল। প্রথম দিনের খেলায় ১৩টি উইকেট পড়ে যাওয়ায় মনে পিচের বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না। বেশীর ভাগ খেলোয়াড় ভুল খেলে আউট হয়েছিলেন। প্রথম দিনের খেলায় ভারতের বিশ্বনাথ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রবার্টস আমার পক্ষে। জানেন তো, বাস্কেটবলে সেন—বিশ্বনাথ ৯৭ রান করে শেষ পর্যন্ত নটআউট থেকে যান এবং রবার্টস ৬৪ রানে ৭টা উইকেট পেয়েছিলেন।

ভারতের প্রথম ইনিংসের ২৪ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট পড়ার পর বিশ্বনাথ খেলতে নামেন। তিনি ২২৭ মিনিট খেলে তাঁর নটআউট ৯৭ রানে ১৮টা বাউণ্ডারী করেছিলেন। তাঁর দুর্ভাগ্য জুটির অভাবে শত রান পূর্ণ করতে পারেন নি। বেদী এবং চন্দ্রশেখরের সহযোগিতায় বিশ্বনাথ দলকে শোচনীয় সংকট থেকে উদ্ধার করেছিলেন নবম উইকেটের জুটিতে বেদী (১৪ রাণ) এবং বিশ্বনাথ দলের অতি মূল্যবান ৫২ রান তুলে দেন। ভারতের ১৯০ রানের মাথায় প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হলে তাদের যে সংকট দেখা দেয় তা অনেকটা কেটে যায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৩৬ রানে ৩ উইকেট পড়াতে। ভারত প্রথম ইনিংসে কম রান করেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ১৯২ রানের মাথায় শেষ হয় এবং ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের চারটে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৮৫ রান সংগ্রহ করেছিল। প্রথম ইনিংসের খেলায় ভারতের থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাত্র দু রান বেশী তুলেছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ১৯২ রানে আউট করতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন এরাপল্লী প্রসন্ন। দ্বিতীয় দিনের খেলার এক সময় প্রসন্নর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল ৩১টি বলে ৫ রান দিয়ে ৫ উইকেট।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রিচার্ডস (৫০ রান) এবং লয়েড (৩৯ রান) যা কিছুটা খেলেছিলেন। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে লয়েড এবং রিচার্ডস আক্রমণাত্মক ব্যাট করে ৬৮ মিনিটে দলের অতি মূল্যবান ৬৮ রান তুলেছিলেন।

তৃতীয় দিনে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৬ রানের মাথায় শেষ হয় এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ৩৮ রান সংগ্রহ করেছিল। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ২০০ রান সংগ্রহ নিয়ে এক সময় দারুণ সংশয় দেখা দিয়েছিল। বিশ্বনাথ (৪৬ রান) গায়কোয়াড় (৮০ রান) এবং ঘাবড়ির (নটআউট ৩৫ রান) দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণই ভারত শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫৬ রান সংগ্রহ করে। লাঞ্চের সময় ভারতের রান ছিল ৫ উইকেটে ১৪৭। বিশ্বনাথ ৩৮ এবং গাইকোয়াড় ৩৩ রান করে অপরাজিত ছিলেন। ভারতের ১৭৮ রানের মাথায় বিশ্বনাথ নিজস্ব ৪৬ রান করে মারের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন। ষষ্ঠ উইকেটের জুটিতে বিশ্বনাথ এবং গাইকোয়াড় অতি মূল্যবান ৯৩ রান তুলেছিলেন। চা-পানের বিরতির সময় ভারতের রান দাঁড়ায় ৭ উইকেটে ২৩৯। খেলায় গাইকোয়াড় ৭১ রান এবং ঘাবড়ি ২৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

ভারতের ২৫৬ রানের মাথায় ভুল বোঝা-বুঝির ফলে গাইকোয়াড় রান আউট হন। অষ্টম উইকেটের জুটিতে গাইকোয়াড় (৮০ রান) এবং ঘাবড়ি ৬৮ রান সংগ্রহ করে দেন। গাইকোয়াড় ২৫৮ মিনিট খেলে তাঁর ৮০ রানে দশটা বাউন্ডারী করেছিলেন। ভারতের ২৫৬ রানের মাথায় তিনটে উইকেট পড়ে যায়—অষ্টম নবম এবং দশম উইকেট। ঘাবড়ি শেষ পর্যন্ত ৩৫ রান করে অপরাজিত থেকে যান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অ্যান্ডি রবার্টস দুই ইনিংসের খেলায় মোট ১২টা উইকেট পান—ভারতের বিপক্ষে একটি টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে সর্বাধিক উইকে পাওয়ার নতুন নজির।

তৃতীয় দিনের শেষে খেলার অবস্থা দাঁড়ায়—ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়লাভের জন্যে

এরাপল্লী প্রসন্ন
১১১ রানে ৯ উইকেট
(১ম ইনিংসে ৭০ রানে ৫ ও ২য় ইনিংসে ৪১ রানে ৪ উইকেট)

জি আর বিশ্বনাথ—৪র্থ টেস্টের 'ম্যান অব দি ম্যাচ'—
১ম ইনিংসে নট-আউট ৯৭ রান এবং ২য় ইনিংসে ৪৬ রান

আরও ২১৭ রানের প্রয়োজন। এদিকে তাদের হাতে জমা ৯টা উইকেট এবং পুরো দু দিনের খেলার সময়। খেলার এই অবস্থায় ভারত এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই দলেরই পক্ষে জয়লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল সমান সমান।

চতুর্থ দিনে দুটো বেজে পাঁচ মিনিটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৪ রানের মাথায় শেষ হলে ভারত ১০০ রানে জিতে যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৪ রানে ফেলে দিতে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিলেন তিন স্পিন বোলার—প্রসন্ন বেদী এবং চন্দ্রশেখর। প্রসন্ন ৪১ রানে ৪টে বেদী ২৯ রানে ৩টে এবং চন্দ্রশেখর ৫১ রানে ২টো উইকেট পেয়ে-ছিলেন। কলকাতার তৃতীয় টেস্ট খেলার মতই মাদ্রাজের এই চতুর্থ টেস্ট খেলায় অল্প রান উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত বোলার জয়লাভের পক্ষে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলে

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত : ১৯০ রান (বিশ্বনাথ ৯ নটআউট এবং মানকাদ ১৯ রান। এ্যা রবার্টস ৬৪ রানে ৭ এবং জুলিয়েন ২ রানে ২ উইকেট)।

ও ২৫৬ রান (বিশ্বনাথ ৪৬, অংশুম গাইকোয়াড় ৮০ এবং ঘাবড়ি ৩৫ নট আউ রবার্টস ৫৭ রানে ৫ এবং বয়েস ৬১ রা ২ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ১৯২ রান (রিচার্ড ৫০ এবং লয়েড ৩৯ রান। প্রসন্ন ৭০ রা ৫ এবং বেদী ৪০ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৫৪ রান (কালীচরণ ৫১ রান প্রসন্ন ৪১ রানে ৪ বেদী ২৯ রানে ৩ এব চন্দ্রশেখর ৫১ রানে ২ উইকেট)।
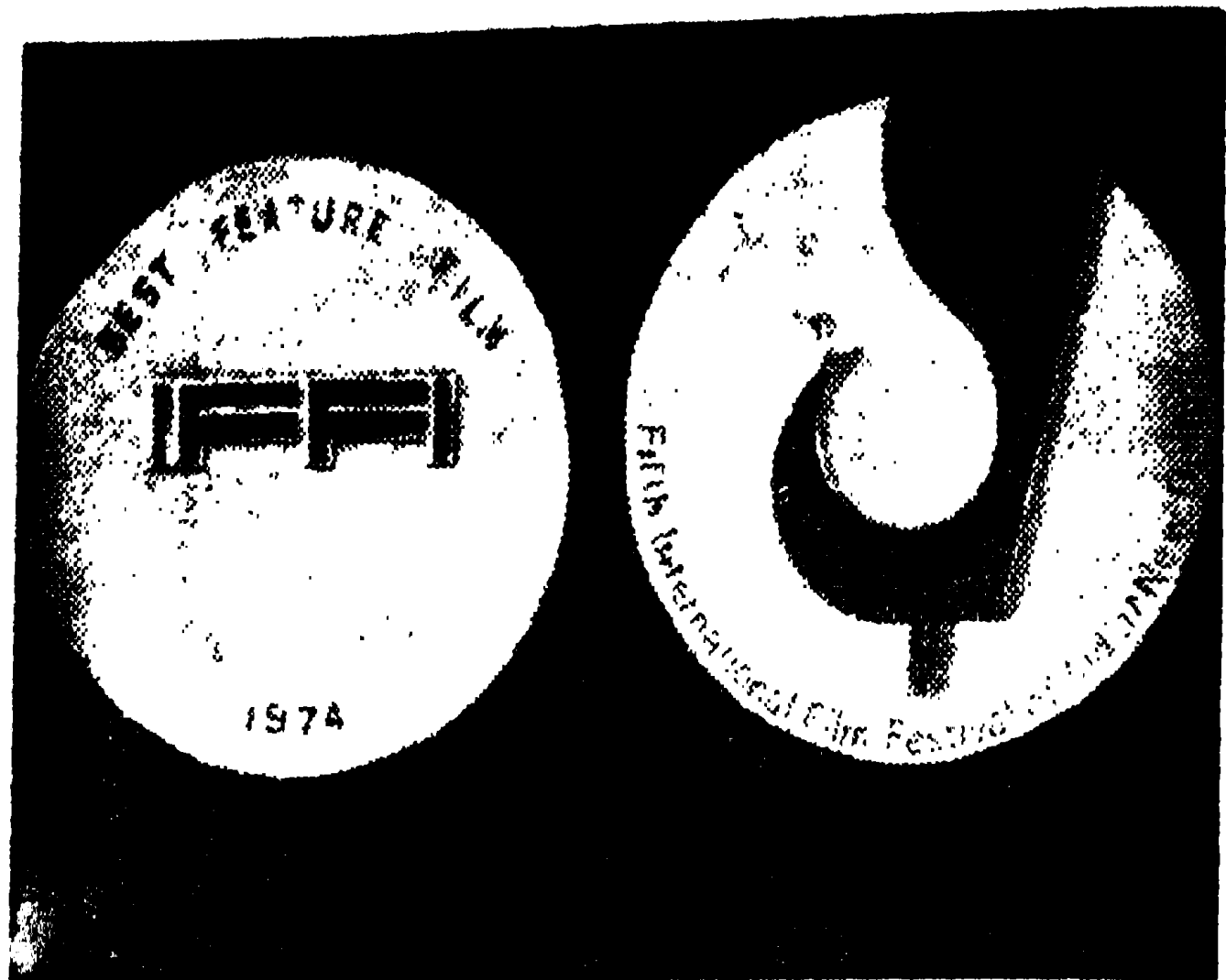
দিল্লীর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে

নির্মল ধর

সেরা অভিনেতা ইরানের
আহমদ্‌রেজা গোনি

সেরা পরিচালক ব্রেজিলের
জোলিনটী ভিজারি ([illegible])

সেরা ছবি হাঙ্গেরীর
ড্রিমিং ইয়ুথ

স্টারডাস্ট (ব্রিটেন)

প্রতিযোগিতা বিভাগের সব ছবি দেখা শেষ। চব্বিশটা দেশের পঁচিশখানা ছবি ছিল এই বিভাগে। ইরানের 'টাঙ্গাসি'র ইংরেজী সাব-টাইটেল না থাকার অজুহাতে বাদ গিয়েছিল প্রতিযোগিতা থেকে। এ ছবিতে ইরানের সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে টাঙ্গাসির নামে একজন বিদ্রোহীর বক্তব্য কাহিনী বলা হয়েছে। পরিচালক জীবনের রুক্ষতা হতাশাকে পর্দায় তুলে ধরেছেন বেশ সুন্দরভাবে। তার চাইতেও এ ছবির সব চাইতে বড় আকর্ষণ ছিল প্রধান ভূমিকায় বেহরুজ ভোসাঘর প্রাণময় অভিনয়। সর্বশেষ সংবাদ ঃ ছবিখানি প্রতিযোগিতা বিভাগে ফিরে আসছে, সুতরাং শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারটি কে পান দেখা যাক।

সেরা নায়ক হবার দাবী নিয়ে অবশ্য আরও দুজন শিল্পী আছেন। দুজনের কাজেই আন্তরিকতার ছাপ পাওয়া যায়। প্রথমজন হচ্ছেন পশ্চিম জার্মানীর ছবি 'দি ব্রুটালাইজেশন অফ ফ্রানজ ব্লুম' (বাইন হার্ড হফ)-এর নায়ক জুর্গেন প্রোকলার্ড। ব্যাঙ্ক ডাকাতির অপরাধে জেলে গিয়ে ফ্রানজ ব্লুম সহবন্দীদের মাঝে একজন হাসি-খুশী প্রাণখোলা প্রিয় মানুষ হিসাবে স্থান পায়। সহবন্দীদের মন থেকে জীবনের দুঃখ-কষ্টগুলোকে সরিয়ে সবাইকে জীবন্ত করে তোলে সে। পারস্পরিক হানাহানির জায়গায় ফ্রানজ ব্লুম সকলের মধ্যে এনে দেয় বন্ধুত্ব প্রেম প্রীতি। সৎ চরিত্রের মানুষ ছিল বলে সে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মুক্তি পেয়ে যায়। তারই আদর্শে তখন অন্যান্যরা এগিয়ে চলে। পরিচালক হফ্ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন বন্দীজীবনকে। (জনান্তিকে শুনেছি এ ছবি নাকি সেরা ছবির পুরস্কারও পেতে পারে)। ফ্রানজ ব্লুমের ভূমিকায় শিল্পীর অভিনয় চমৎকার।

স্পেনের ছবি 'আই স হার ফার্স্ট' (ফারনান্দো ফারনান গোমেজ)। কৌতুক চরিত্রের হলেও নায়ক শিল্পী ম্যানুয়েল সার্মাস দারুন কাজ করেছেন। ছোটবেলার খেলার সাথীকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে না পেয়ে নায়ক মর্মাহত। তার আচার-আচরণ শিশুসুলভ ছোটদের খেলনা ইত্যাদি দিয়ে সবাই তাকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু ভোলে না সে প্রায় প্রতি রাত্রেই সে চলে যায় সঙ্গিনীর শোবার ঘরে। স্বামী স্বভাবতই রেগে যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাকে অ্যাসাইলামে পাঠাতে হয়। কিন্তু অন্যদিকে তখন নায়িকা আবার নায়ককে দেখতে না পেয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। দুজনেই শেষ পর্যন্ত অ্যাসাইলামে যায়। শ্রীগোমেজ সারা ছবিতেই কৌতুকের মেজাজটা জমিয়ে রেখেছেন। হাবাগোবা নায়ক রিকার্দোর চরিত্রে সার্মাসের অভিনয় দারুণ।

সেরা ছবি হিসাবে কোনটি পুরস্কার পাবে তা সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। কারণ চব্বিশখানা ছবির মধ্যে ভালো ছবি বোধহয় বলা যাবে মাত্র ব্রাজিলের 'আলমা' (জেলিটো ভিয়ানা) বেলজিয়ামের 'উইল ও দি উইসপ' (ফ্রানস বায়েন্স) ফ্রান্সের 'এম্পটি চেয়ার' ইউ-কের 'স্টারডাস্ট' (মাইকেল অ্যাপটেড), ভারতের 'কাড়ভু' (গিরিশ কারনাড), পোল্যান্ডের 'কিউরিও লেক' (জান বাতোরি) ইউ এস এর রাইভ্যালস (কৃষ্ণ শাহ) ও দি ওয়ে উই ওয়্যার (সিডনী পোলক) ছবি কখানিকে।

ব্যক্তিগত মতে 'রাইভ্যালস' ছবিখানি খুব মনযোগ দিয়ে দেখার মত। দশ বারো বছরের কিশোর জেমি স্বাভাবিক ছেলেদের তুলনায় একটু বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন। বাবার মৃত্যুর পর মা ক্যাথরিনের ওপর তার আকর্ষণ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডেভিড সস্নেহ চুম্বনে স্বাগত জানাচ্ছেন সাবানা আজমিকে

ইদিপাস কমপ্লেকসের মত। বিধবা মা যখন পিটার নামে একজন ভদ্রলোকের প্রতি আসক্ত হন তখনই মানসিক বিরোধ বাধে পিটার আর জেমির। মাকে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে দেখতে সে নারাজ। স্ত্রী পুরুষ সম্পর্কের জৈবিক ও মানসিক দিকগুলো সম্পর্কে তার চিন্তা বয়স্ক লোকদের মতই। একদিন তার বৌদি সিটার যখন তাকে প্রথম যৌবনের স্বাদ এনে দেয় তখনই সে যেন পুরোপুরি মানুষ হয়ে ওঠে। পিটারের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তখন মুখোমুখি হয়। জেমিকে হস্টেলে পাঠিয়ে দেবার পরিকল্পনা বানচাল করে পিটার ও মাকেই সে পুড়িয়ে হত্যা করে। পরিচালনার গুণে ছবিখানি আকর্ষণীয়। চরিত্রগুলির মানসিক জটিলতা ফ্রাসট্রেশন—বিশ্লেষণ সুন্দরভাবে করেছেন তিনি। রংয়ের ব্যবহারও তাঁর চিন্তার পরিচয় দেয়। সারা ছবি জুড়ে এক ধরণের কাব্যিক সুষমা ছড়িয়ে আছে যেন।

ব্রাজিলের 'আলমা' একজন বেশ্যার জীবনের প্রেম ও হীনতা নিয়ে তৈরী। নীরবে যে লোকটি সারাটা জীবন তাকে ভাল-বেসে ছিল তার কাছে না গিয়ে আলমা কষ্ট পেল নিজেকে নষ্ট করল—প্রেমিক জোয়া দা কোস্তাও আত্মহত্যা ছাড়া কিছু করতে পারল না। প্রকাশভঙ্গির উৎকর্ষে ও বক্তব্যের গভীরতায় ছবিখানি মনে রাখার মত। নায়িকা চরিত্রে ইসাবেল রিবেরোর মরমী অভিনয় ছবির অন্যতম আকর্ষণও বটে। ইংল্যান্ডের ছবি 'স্টারডাস্ট'র গল্প একজন পপ গায়কের উত্থান-পতন ভালবাসা-বন্ধুত্ব এবং সর্বোপরি অতীতের বিবাহিত জীবন ও যন্ত্রণা নিয়ে। পাঁচ বন্ধু মিলে 'স্ট্রে ক্যাটস' নামে পপ গানের একটি দল গড়েছিল জিম। গান গেয়ে পৃথিবী মাতিয়ে দেবে এটাই তার উচ্চাশা: এজন্য সে স্ত্রী ও শিশু সন্তানকে ছেড়ে দেয়। নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার জন্য সত্যিই একদিন তার দল এবং সে নিজে জনপ্রিয়তা পেল কোটি টাকার মালিক হলো বটে কিন্তু মানসিক শান্তি পেল না। স্পেনের এক পোড়ো বাড়িতে গিয়ে স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করতে হলো তাকে। জীবনের শেষ টি-ভি সাক্ষাৎকারে সে তাই আর স্থির থাকতে পারে নি। অত্যধিক মাদক দ্রব্য গ্রহণ এবং মানসিক কষ্টের দরুণ জিম জনপ্রিয়তার শিরোনাম মাথায় নিয়ে মরে গেল। বিদেশী ছবির কারিগরি কুশলতা সম্পর্কে প্রশংসাবাক্য বলার কোনো প্রয়োজন হয় না। পরিচালক মাইকেল অ্যাপটেড অত্যন্ত আন্তরিকতার সংগে জিমের জীবনকে তুলে ধরেছেন পর্দায়। কোনো অতিরিক্ত দৃশ্য নেই সহজ সরল গল্প বলেছেন তিনি। প্রধান ভূমিকায় ডেভিড এসেকসের কাজ জুরীদের চোখ না এড়াতে পারে।

ভারতের 'কান্ডু' সম্পর্কে আশা যত-খানি ছিল সন্তুষ্টি ততখানি আসেনি। পারস্পরিক বিদ্বেষ ও স্বার্থ কিভাবে দুটো গ্রামকে নষ্ট করল সেটাই দেখাতে চেয়েছেন পরিচালক। সুদূর গ্রামগুলোর এটাও একটা সমস্যা বটে। শহুরে সভ্যতার অনু-প্রবেশ কিভাবে ঘটছে গ্রামগুলোয় এ ছবি তারই একটা প্রামাণিক চিত্র বলা যেতে পারে। দু-গ্রামের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের জন্য শহরের পুলিশ এসে গ্রামে ঢুকল—এ দৃশ্যের মাধ্যমেই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন শহুরে সভ্যতার। পরিচালনার ব্যাপারে গিরিশ কার-নাড নিঃসন্দেহে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বাচ্চা ছেলে কিট্টির (এই ভূমিকায় শিশু শিল্পীর অভিনয় দারুণ) চোখে গ্রামের বিভিন্ন ঘটনাগুলো তিনি দেখিয়েছেন। শেষ দৃশ্যে রক্তচোষা পাখীর ডাক এবং ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা কিট্টির মুখখানা অনেক কথা বলেছে।

ফ্রান্সের 'এম্পটি চেয়ার' ছবিখানিতে পরিচালকের নীরব ভাষা কাজ করেছে বেশী—বেশ পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে গদ্যকবিতার মত পরিচালক ছবিটিকে আদ্যন্ত সাজিয়েছেন। প্রধান ভূমিকায় মার্টিন শিভ্যালির অভিনয় চরিত্রটিকে অতিরিক্ত আকর্ষণীয় করেছে। অ্যানি অন্তঃসত্বা একথা জানবার আগেই প্রেমিককে চলে যেতে হয় আফ্রিকায়। সাত আট বছর কোনো খবর নেই। কিশোর সন্তানকে নিয়ে অ্যানি ভুলে থাকে প্রেমিকের কথা। সারাদিন পরিশ্রম করে নিজের চিন্তাকে সে অন্যদিক থেকে সরিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু একদিন অ্যানির সামনে এসে হাজির হয় ম্যাক্সিম নামে এক যুবক প্রেমের ডালি নিয়ে। তার প্রেমকে সে গ্রহণ করবে কি করবে না এই দোলায় দুলতে দুলতে অ্যানি একদিন তাকে চিঠিতে জানায় 'সময় চাই কিছুদিন আমাকে ভাবতে দাও' ছবির সমাপ্তি এখানেই এবং পরিচালকও অ্যানির মানসিক স্পন্দনকে একবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে

শশীকাপুর, লোলো ব্রিজিদা, সিমি

এনে ছেড়ে দিয়েছেন। দর্শকের দায়িত্ব উপসংহার টানার।

পোল্যান্ডের ছবি 'কিউরিও লেক'ও বিষয়বস্তুর অন্তর্লীন দিক থেকে প্রায় একই ধরনের। সৎ বাবা-মার সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্ক যেন আজকাল সারা ইউরোপ জুড়ে এক সংকটের মুখোমুখি। বাবা বা মার একাধিক বিবাহে সন্তানদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে এবারের উৎসবে ছবির সংখ্যা বড় বেশী। পোল্যান্ডের মত সমাজতান্ত্রিক দেশেও এ সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। অন্ততঃ এ ছবিখানি সেই কথা বলে। মার্তা ভালবাসে এক যুবককে। চিন্তায় ও চরিত্রে একটু বেশী ভাবপ্রবণ সে। তাই যখন মার্তার মা বিয়ে করে তার প্রেমিকের বাবাকেই তখন সে নিজের প্রেম নিয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে। এবং শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা তাকে জীবনের অন্তিম পর্যায়ে নিয়ে যায়। পরিচালক জানুশ্‌ বাতোরির প্রকাশভঙ্গীতে অভিনবত্ব তেমন কিছু নেই বটে কিন্তু ছবির গতি ও সুষম দৃশ্য বিন্যাসের জন্য ছবিটিকে ভালো লাগে।

উৎসবের অন্যান্য ছবিগুলোর মধ্যে মজা পাওয়া যায় মিশরের 'গ্র্যান্ড সন' (আতেফ সালেম) ব্রাজিলের 'হাউ টেস্টি ওয়াজ মাই লিটল ফ্রেঞ্চম্যান' নেলসন পেরিয়েরা দাস সান্তোস) বুলগেরিয়ার 'দি কাইন্ডেস্ট ম্যান আই নো' (লুডমির সারলানঝিয়েভ) জি ডি আর'এর 'হাউ ওয়ান নারিশেস এ ডাক্‌' (রোনাল্ড ওহেম) ছবিগুলো দেখে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার 'হোয়ার আর ইউ মাদার' (হাস মানান) শ্রীলঙ্কার 'তিলেক তিলকা' (অমরনাথ জয়তিলক) জাপানের 'কোকোরো' (কানেতো সিন্দো) চেকোশ্লোভিকায়ার 'দি গ্রেট ডে এন্ড গ্রেট নাইট (জারোস্লাভ বালিক যুগোশ্লাভিয়ার 'পার্টিজান' মেকসিকোর 'এনকাউন্টার অফ এ লোনলিম্যান' (সার্জিও ওলহিনচ) রুমানিয়া প্রোডিগ্যাল ফাদার' (আন্দ্রেই পেত্রিশিনউ) ছবিগুলো কাউকে কোনভাবে আকর্ষণ করেছে কিনা বলা শক্ত! কারিগরি দক্ষতার কথা ছেড়ে দিলে বক্তব্য বা উপস্থাপন বৈচিত্র্য কোনোটাই যেন চোখে পড়তে চায় না।

উৎসবে ভালো ছবি না আসার অন্যতম কারণ হলো উৎসবের সময়কাল। বছরের শেষ দিকে উৎসব হলে স্বাভাবিক কারণে কোনো দেশের সেরা ছবি আসার সম্ভাবনা কম থাকে। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে বিদেশে এখনও তেমন কোনো নামডাক নেই। এই উৎসবকে যদি নিয়মিত (বাৎসরিক বা দ্বি-বাৎসরিক যাই হোক না কেন) করান যায় তাহলে কোনোদিনই এখানে ভালো ছবির আসার সম্ভাবনা কম।

সোভ (পোল্যান্ড)

আগেও বলেছি প্রতিযোগিতার চাইতে ইনফরমেশন বিভাগের ছবিগুলো অনেক বেশী আকর্ষণীয়। বিদেশের অনেক ভালো ভালো ছবি ছিল এই বিভাগে। উৎসব কর্তৃপক্ষের অযোগ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বহু ছবি আমরা দেখতে পাই নি। এমন কি এখানকার সাংবাদিকরাও দেখতে পারেন নি। সকাল বিকেল উত্যক্ত করার পর যেন দয়া করে কর্তৃপক্ষ কিছু ছবি দেখার বন্দোবস্ত করেছিলেন। তাও আবার মূল উৎসবকেন্দ্র থেকে সাত আট মাইল দূরে। যাই হোক ইনফরমেশন বিভাগের ছবিগুলো নিয়ে কলকাতায় ফিরে আলোচনার ইচ্ছে রইল। যে ছবিগুলো দেখেছি। তার মধ্যে আছে 'গড ফাদার' (ফ্রান্সিস ফোর্ড কোপালা) 'ক্লকওয়াক অরেঞ্জ' (স্ট্যানলি কুব্রিক) 'রেড সাম' (মিক-লোস জাঁকসো) 'অ্যামারকর্ড' (ফেলিনি) 'মার্ডার ইন দি ওরিয়েন্ট একসপ্রেস' (সিডনী লুমেট) 'এপ এন্ড সুপার এপ (বার্ট হান্সট্রা) 'ডায়েরী অফ এ সিনজুকু থিফ' 'দি বয়' 'ডেথ বাই হ্যাঙিং' (সব কটি নাগিশা ওশিমার) 'ওয়ার্কিং ক্লাশ গোজ টু প্যারাডাইস' (এলিও পেত্রি জেনিস (জোসেফ স্টাক) 'সিদ্ধার্থ' ও ছাপ্পাকুয়া (দুটিই কনরাড রুকসের) হায়ারলিং (অ্যালান ব্রিজেস) অ্যালো ফানশান (পাওলো ও ভিট্টোরিও টাভিয়ানি) চ্যাপলিনের 'মর্ডান টাইমস' সার্কাস মসিয়ে ভার্দু ক্রান্সের সিজার এন্ড রোসালি 'বো ওয়াডার বার্জের' এলভিরা মেডিগান বার্নাড উইকির ফলস ওয়েট রয় এন্ডারসনের সুইডিশ লাভ স্টোরি এবং আরও কিছু। এসব ছবির আলোচনা পরের লেখায়।

এনকাউন্টার অফ এ লোনলিম্যান (মেক্সিকো

উৎসবের টুকিটাকি

সাংবাদিক সম্মেলনে জিনা লোলোব্রিজিদাকে 'ভারতীয় পুরুষদের কেমন লাগছে?' প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দেন—'মন্দ কি, দেশে ফেরার সময় আমি কার একজনকে নিয়ে যেতে পারব।'

●

'প্যারালাল সিনেমা'র আলোচনা-চক্রের দ্বিতীয় দিনে বি আর চোপরার একটি মন্তব্যের প্রতিবাদে কুমার সাহানি, মণি কাউল, দিলীপ পদগাঁওকার ও আরও কয়েকজন নবীন পরিচালক-সাংবাদিক হল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এবং ঋত্বিক ঘটককে সভাপতি ক'রে বাইরের মাঠে তারা প্যারালাল সিনেমা সম্পর্কে প্যারালাল আলোচনা শুরু করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করা হয়, মন্ত্রী সাহ কে গুজরাল সেগুলো নিয়ে আলোচনার প্রতিশ্রুতি দেন।

●

মূল উৎসবকেন্দ্র বিজ্ঞান ভবন। সেখানের অনুষ্ঠান সকাল নটা ও এগারটায়। তারপর একটায় বা দেড়টায় নিয়মিত সাংবাদিক সম্মেলন। কখনও বিজ্ঞান ভবনে, কখনও মাইলখানেক দূরে শাস্ত্রী ভবনে। পরের অনুষ্ঠান মহারাণী রংগায়নে বেলা তিনটেয়। দূরত্ব বিজ্ঞান ভবন থেকে মাইল পাঁচ-ছয়। ওখানে পর পর তিনটে শো। কখনও কখনও আবার এরই মাঝে সাংবাদিক সম্মেলন বিজ্ঞান ভবনে। অথচ সাংবাদিকদের যাতায়াতের বন্দোবস্ত করেন নি উৎসব কর্তৃপক্ষ।

●

সাংবাদিক সম্মেলনে চেকোস্লোভাকিয়ান অভিনেত্রী নেভানা কোকোনোভাকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন 'আপনাদের ছবিগুলো কি প্রচারধর্মী নয়?' উত্তরে কোকোনোভার জবাব ছিল—'সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে তুলে ধরাটাকে আমরা প্রচার বলে মনে করি না। কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবন তো ঐ আদর্শেই গড়া।'

●

'ব্লক ওয়ার্ক অরেঞ্জ' ও 'চাইনিজ পেন্ট' দুখানা ছবিই ইউ-এস-এ পাঠিয়েছিল ইনফরমেশন বিভাগে। কিন্তু স্ক্রীনিং কমিটি দুটো ছবিকেই বাতিল করতে চেয়েছিলেন। কারণ উত্তেজক দৃশ্যাবলী। শেষ পর্যন্ত আই কে গুজরালের হস্তক্ষেপে 'ক্লক ওয়ার্ক অরেঞ্জ' প্রদর্শিত হলেও 'চাইনিজ পেন্ট' দেখানো হয় নি।

●

যৌন শিক্ষামূলক ছবি ইউকেএর 'দি ন্যাচ' ছবিখানি শরীরের বিভিন্ন যান্ত্রিক কারিকুরিকে বীভৎস ও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। ছবিখানি ব্রিটিশ সেন্সার বোর্ডের সার্টিফিকেট পেয়েছে 'এক্স' ক্যাটিগরিতে। (অর্থাৎ এ ছবি শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কের জন্য)। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের যৌন বিজ্ঞানের সব কিছুই তো জানা। তার জন্য আর এই 'বর্ণপরিচয়' কেন?

●

সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক কনরাড রুকস বলেছিলেন—'সিদ্ধার্থ' আমি করেছি বিদেশী দর্শকদের জন্য।' একটু বাদে উৎসব পরিচালক শ্রীমরোরীকে একজন সাংবাদিক পাল্টা প্রশ্ন করেন—'তাহলে এ ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নির্বাচিত হলো কেন?' কিন্তু সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় নি তাঁর কাছ থেকে।

গ্রান্ড সন (মিশর)

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

নিহত ব্যক্তি মরবার আগে রক্তমাখা হাতে হত্যাকারীর জামা খামচে ধরেছিল—তাই হাতের রক্ত জামায় লেগে যায়। হত্যাকারী তখন নিহত ব্যক্তিরই একটি সার্ট টেনে নিয়ে পরে নিল—পুড়িয়ে দিল নিজের রক্তমাখা জামাটা। নিহত ব্যক্তির সার্টের বোতামগুলিও ফেলে দিল ফায়ার প্লেসে।

কিন্তু কে সেই ব্যক্তি যে নিহত ব্যক্তি হোটেলে আসার সংগে সংগে সবার চোখের আড়ালে গিয়েই অথচ সকলেরই অজান্তে (!) ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, চুপিসারে খুন করে সার্ট আর বো-টাই এঁটে পালিয়ে যায় ঘর থেকে? সার্ট আর বো-টাই না হলে কি তার একেবারেই চলত না? বিশেষ করে বো-টাই ছাড়াও তো পথচলা যায়। কিন্তু বো-টাই পরতে গেল কেন? যাতে কারো সন্দেহ না হয়, সেই জন্যেই কী? হোটেলের মধ্যে বো-টাই গলায় থাকলে কারো সন্দেহ তো হবেই না—বরং খুব স্বাভাবিক মনে হবে বলেই কী?

হোটেল ম্যানেজার উইলিয়ামসের গায়েতেও সাদা সার্ট, গলায় কালো বো-টাই। ম্যানেজারের রোজকার পোশাক—এ হোটেলে এই পোশাকই পরতে হয় ম্যানেজারকে।

বাবার কানে সেই ফুসমন্তরই দিয়ে এসেছিলেন এলার্রি কুইন। ফলে, গা থেকে সার্ট খুলে নিয়ে পরীক্ষা করতেই পাওয়া গেল আমেরিকান দরজির লেবেল। তারপর তিন মিনিটও গেল না, গুঁতোর চোটে স্বীকার করল উইলিয়ামস তার কুকীর্তি। তারই প্রাণাধিকা বউকে এককালে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে পালিয়েছিল পাষণ্ড লোকটা। তাই প্রথম সুযোগেই—।

মিঠু মুখোপাধ্যায় । ফটো : অমৃত

ফ্রেম থেকে বলছি

রঞ্জন, ব্যারিস্টার আর এন মজুমদারের অগাধ পয়সার একমাত্র উত্তরাধিকারী। ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছে। বাবা আর বিধবা পিসিমার স্নেহ ভালবাসায় গড়ে উঠেছে তার জীবন। স্ফূর্তি আর আনন্দই তার জীবন। জীবন অর্থে সে এই বোঝে। অভাববোধের অনুভূতিহীন। সে ব্যস্ত, ভীষণ ব্যস্ত। কবিতা, বুলো শম্পা আরো অনেককে নিয়ে কাটে সকাল, দুপুর বিকেল সন্ধ্যে। আর আছে মনীষা। ওর প্রতিটি রাতের সঙ্গী। অনেকগুলো সুন্দর মুহূর্তের একমাত্র সাথী।

সি এ ফার্মে আর্টিকেল হিসেবে কাজ করে রঞ্জন। বাবার বন্ধুর ফার্ম। কাজ করার আগ্রহ কিম্বা উৎসাহ কোনটাই নেই। কাজ করতে হয় বাবার রক্তচক্ষুর কথা মনে করে। যোগ্যতা থাকলেও পরীক্ষা দিতে, পাশ করতে ওর ভয়। কারণ বাবা একটা ফার্ম খুলে বসিয়ে দেবে। একটা ফার্ম সামলানো কি আর চাট্টিখানি ব্যাপার। ফার্মের কাজে সময় চলে গেলে ওদের কি হবে। কবিতা, বুলো, শম্পা—ওদের কি হবে। অসম্ভব, একদম অসম্ভব।

মেয়েদের নিয়ে শুধু খেলা নয়, এখন রঞ্জনের মন যেন আরো কিছু চায়। অচেনা, অজানা মেয়ের ডাককেও সে উপেক্ষা করে না। টেলিফোনে কোনো নারী কণ্ঠস্বর ভেসে এলে রঞ্জনের কাছ থেকে তার ছাড়া নেই। সেদিন থেকেই সে ওর পরিচিতা হয়ে যায়। কারণ রঞ্জনের আকর্ষণীয় কথা বলার ভঙ্গী। সব মেয়েই ওর কাছে প্রিয়। শুধু মনীষা অনেক বেশী কিছু—সবার চাইতে বেশী।

হঠাৎ অপর্ণা আসে ওর কাছে। কাছাকাছি। এই অপর্ণাকে ঘিরে যখন রঞ্জনের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে অকস্মাৎ তরুণদার আবির্ভাব। তরুণদা, অপর্ণার কাছ থেকে ফিরে এসেছে। অনেক ব্যথা আর হতাশা নিয়ে। তাই বোধহয় তরুণদা, রঞ্জনকে সাবধান বাণী শোনায়। সে নাকি অপর্ণার কাছে ওয়ান ডাউন। অতঃপর রঞ্জন সেভেন ডাউন পর্যন্ত বিফল প্রেমিকদের দেখা পায়। রঞ্জনও পাকা খেলোয়াড়। সেও সরে আসবার পাত্র নয়। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।

খেলা শুরু হয়। বড় ব্যবসায়ী মিঃ দত্তর বাড়ি থেকে যে খেলোয়াড়ের দেখা পেয়েছে অপর্ণা—সে এখন তার টারগেট। অর্থকরী দিক থেকে দত্তর চেয়ে রঞ্জন বড়। এবং এজন্য অপর্ণা ছুটে এসেছে। রঞ্জন সেটা আগেভাগেই টের পেয়েছিল। মনে মনে সে হাসে। অপর্ণার সঙ্গে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে, প্রেমের গল্প করতে করতে সারাটা দিন কেটে যায়। বেশ ভালই লাগে। এই নতুন খেলায় অপর্ণা এবং রঞ্জন—উভয়েই যেন বড় বেশী একাত্ম হয়ে পড়েছে। অপর্ণা বুঝতে পারছে রঞ্জনকে নিয়ে ঠিক সেইভাবে খেলা চলে না। রঞ্জনও ভাবছে একই রকম। একদিন উন্মুক্ত আকাশের নীচে ওদের পুতুলাকারে মন দেয়া নেয়া হয়। অপর্ণা তার মনকে উজাড়

সুপ্রিয়া দেবী। ফটো : অমৃত

অন্তে শেষ গানে গানে : এখন এমন, বৃষ্টি আমার মত, যখন তখন—

তোমার মনকে ছুঁয়ে যেতে পারে—
যা কিছু আমার আছে
তার চেয়ে বেশী আমি
তোমাকে দিয়ে যেতে পারি
শুধু আকাশ হতে তুমি বোলো না
আমায়।।

রঞ্জনের মতো পাকা খেলোয়াড় চ্যালেঞ্জের কথা ভুলে যায়। মনের মধ্যে অপর্ণার জন্য একটা জায়গা করে দিতে হয়। কিন্তু মনীষা? তার জন্য একটা জায়গা নিশ্চয়ই আছে। রঞ্জন আর সবাইকে সরিয়ে দিতে পারলেও মনীষাকে পারে না। এদিকে তরংগদার দৃষ্টি অপর্ণার পিছু পিছু রয়েছে ছায়ার মত। সে একদা হাজির হয় রঞ্জনের বাড়িতে। ধিক্কার দেয়। রঞ্জন ধিক্কার সহ্য করতে পারে না। নিজেকে অপমানিত বোধ করে। তার সারা শরীর যেন জ্বলতে থাকে। প্রতিশোধ-পরিকর হয়— অপর্ণার মতো একটা মেয়েকে সে ঠকাতে পারবে না? পারতেই হবে।

অপর্ণা দরজা খুলে চমকে ওঠে। বিধ্বস্ত রঞ্জন ওর সামনে দাঁড়িয়ে। বলে, এতবড় পৃথিবীতে আমি একা। বাবা, পিসিমা এরা কেউ আমার আপন নন। মানুষ করেছেন শুধু। আমি আজ পরিচয়হীন কপর্দকশূন্য। যার এ পৃথিবীতে কোনো ঠাঁই নেই অথচ মরণেও কোনো অধিকার নেই—

অপর্ণার হাত রঞ্জনের বাকা ঠোঁট রুদ্ধ করে। গভীরতর ভালবাসায় যেন এই সপথ। অপর্ণা তার সারা জীবনের সঞ্চয় বিরাট এক গহনার বাক্স এনে তুলে দেয় রঞ্জনের হাতে। বলে তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে বড় হতে হবে। আবার আগের মতো......

বাড়ি ফিরে এসে খাটের ওপর সমস্ত গহনা ছড়িয়ে দিয়ে রঞ্জন পাগলের মতো হাসতে থাকে। আর কিছু নয় সে অপর্ণাকে হারিয়ে দিয়েছে। রঞ্জনের হাসি চার দেওয়ালে প্রতিধ্বনি করে। বলা বাহুল্য স্টুডিও স্লোব —শিল্পনির্দেশক সূর্য চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে নিখুঁত নির্মিত একটি সেট। ক্যামেরা তখন ক্রেন-এ। ধীরে ধীরে নেমে আসে।

ক্যামেরাম্যান দীপক দাশ অসীম ধৈর্যের সঙ্গে দৃশ্যটি ধরে রাখেন। শটটি শেষ হলেও সমিত ভঞ্জ অর্থাৎ রঞ্জন—দৃশ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। রঞ্জন যে ভাবে ভারসাম্য হারিয়েছে ঠিক সেই ভাবে সমিত। বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হলে কাহিনীকার-পরিচালক অমল রায় ঘটক এই ছবির 'রং নাম্বার'-এর পরবর্তী শটের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন।

অঞ্জন মুখোপাধ্যায় কৃত চিত্রনাট্যে এ ছবির অপর্ণা চরিত্র রূপায়িত করছেন নন্দিতা বসু। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে আছেন—তরুণকুমার হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মা দেবী মলিনা দেবী এবং নবাগত নমী চৌধুরী। গান হবে এ ছবির অন্যতম সম্পদ। নবাগত সঙ্গীতপরিচালক : দিলীপ ভট্টাচার্য। গীতিকার : দিলীপ গুহ। নেপথ্য কণ্ঠদান করেছেন : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মান্না দে ও আরতি মুখোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় আছেন প্রশান্ত পাত্রাদার।

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে মানিক গোষ্ঠীর পরিচালনায় 'ফো ফকস ক্যাবারে' ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কৌটিল্য গুপ্তের কাহিনী ও পার্থপ্রতিম চৌধুরীর চিত্রনাট্যে উত্তমকুমার এ ছবির নায়ক কুকেন্দু কালে [illegible] এক মহারাষ্ট্রীয় যুবক। সবাই তাকে সংক্ষেপে ডাকেন কে কে। এই চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে উত্তমকুমার কতকগুলি বিশেষত্ব আরোপ করেছেন। মহারাষ্ট্রের এক যুবককে রীতিমত স্টাডি করেছেন। চরিত্রসৃষ্টিতে উত্তমকুমার অদ্বিতীয়। বর্তমানে তিনি রোমান্টিক নায়ক হবার চেয়ে দুরূহ জটিল চরিত্র পছন্দ করছেন। যে চরিত্রে অভিনয় করতে মজা আছে। চরিত্রের উত্থান পতন না থাকলে সেটা কখনই সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য দু' তিনটি চরিত্র। 'সেই চোখ' ছবিতে উত্তমকুমার রূপায়িত করছেন মোটামুটি একটি কমেডি চরিত্র। 'বাঘবন্দী' ছবিতে আসলে ভিলেন। 'সন্ন্যাসী রাজা' ছবিতে নায়ক হলেও চরিত্রের মধ্যে অনেক জটিল ব্যাপার। চরিত্রটি আগাগোড়া রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা। একটু একটু করে উন্মোচিত হবে।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

দর্পণ দর্পণ
নন্দিতা বসু/কৌশিক বসু

আয়না/রাজেশ খান্না/মুমতাজ

স্টুডিও সংবাদ

এ মাসেই পরিচালক স্বদেশ সরকার সদলবলে বিহারের শিমুলতলা অভিমুখে রওনা হচ্ছেন। ছবি : 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ'। একটানা পনেরোদিন ধরে বহির্দৃশ্য গ্রহণ চলবে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী। ছবির তিন প্রধান চরিত্রের শিল্পী : দীপঙ্কর দে, সন্ধ্যা রায় এবং আরতি ভট্টাচার্য। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে আছেন : অনুপকুমার, রবি ঘোষ এবং চিন্ময় রায়। চিত্রগ্রাহক : কৃষ্ণ চক্রবর্তী। শিল্পনির্দেশনায় আছেন : সূর্য চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালক : মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবীণ পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু করেছেন। ও ছবিতে রোহিনীর ভূমিকায় রূপদান করেছেন মিঠু মুখোপাধ্যায়। বিপরীতে খুব সম্ভবত দীপঙ্কর দে।

এক মাসেরও বেশী একটানা সুটিং হল 'সংসার সীমান্তে' ছবির। নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওর প্রাঙ্গণ জুড়ে সেট ফেলা হয়েছিল। মোটামুটি একই সেটে কাজ হয়েছে। পরিচালক তরুণ মজুমদার। প্রধান দুটি চরিত্র রূপায়িত করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যা রায়। অন্যান্য চরিত্রগুলি রূপায়িত করেছেন শমিতা বিশ্বাস পলিন চ্যাটার্জি সুলতা চৌধুরী শেলী পাল, অনামিকা সাহা, গীতা কর্মকার সুলেখা রায় সীতা মুখোপাধ্যায়, তপতী সেন, শিউলি মুখোপাধ্যায়, শিবানী বসু রত্না ঘোষাল প্রভৃতি। চিত্রগ্রহণ করেছেন : কে এ রেজা। শিল্পনির্দেশক : রবি চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক : রমেশ যোশী। এই পর্যায়ের শুটিং-এর সঙ্গে সঙ্গে ছবির শুটিং শেষ হয়ে এসেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলা নিয়ে একটি ছবির কাজ শুরু হয়েছে এবং অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। ছবির নাম, 'বালক শরৎচন্দ্র'। রাজকুমার রায়চৌধুরীর চিত্রনাট্যে ছবিখানি পরিচালনা করছেন জয়ন্ত সাহা। বিভিন্ন চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই নতুন মুখ। প্রযোজক : ক্যাপ্টেন ঘোষ।

পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর আগামী ছবি 'অজস্র ধন্যবাদ'-এর শুটিং শুরু করতে চলেছেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে কুণাল মুখোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্যে এ-ছবি নির্মিত হচ্ছে। নায়ক : শৈলেন্দ্র সিং, 'ববি' ছবিতে গান গেয়ে যিনি বিখ্যাত হয়েছেন, আসলে পুণা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের অ্যাকটিং কোর্সেরই ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। নায়িকা : মহুয়া রায়চৌধুরী। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে থাকছেন : উৎপল দত্ত, বম্বের জালাল আগা এবং অলকা। প্রযোজক : ও পি সিং। এ-ছবিতে শৈলেন্দ্র শুধু অভিনয়ই করবেন না, গানও গাইবেন সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্রের সুরে।

পরিচালক দীনেন গুপ্ত পর পর কয়েকটি নতুন ছবির পরিকল্পনা করছেন। তার মধ্যে একটি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'নিশিমৃগয়া'। এ-ছবির প্রধান নারী-চরিত্রের শিল্পী কে? শোনা যাচ্ছে সুচিত্রা সেন। নায়ক : রঞ্জিত মল্লিক। এছাড়া বিশিষ্ট কয়েকটি চরিত্রে : অনিল চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত এবং বসন্ত চৌধুরী। চিত্রগ্রহণ করবেন পরিচালক স্বয়ং। শিল্পনির্দেশক : সূর্য চট্টোপাধ্যায়। চিত্রনাট্যকার : কুণাল মুখোপাধ্যায়।
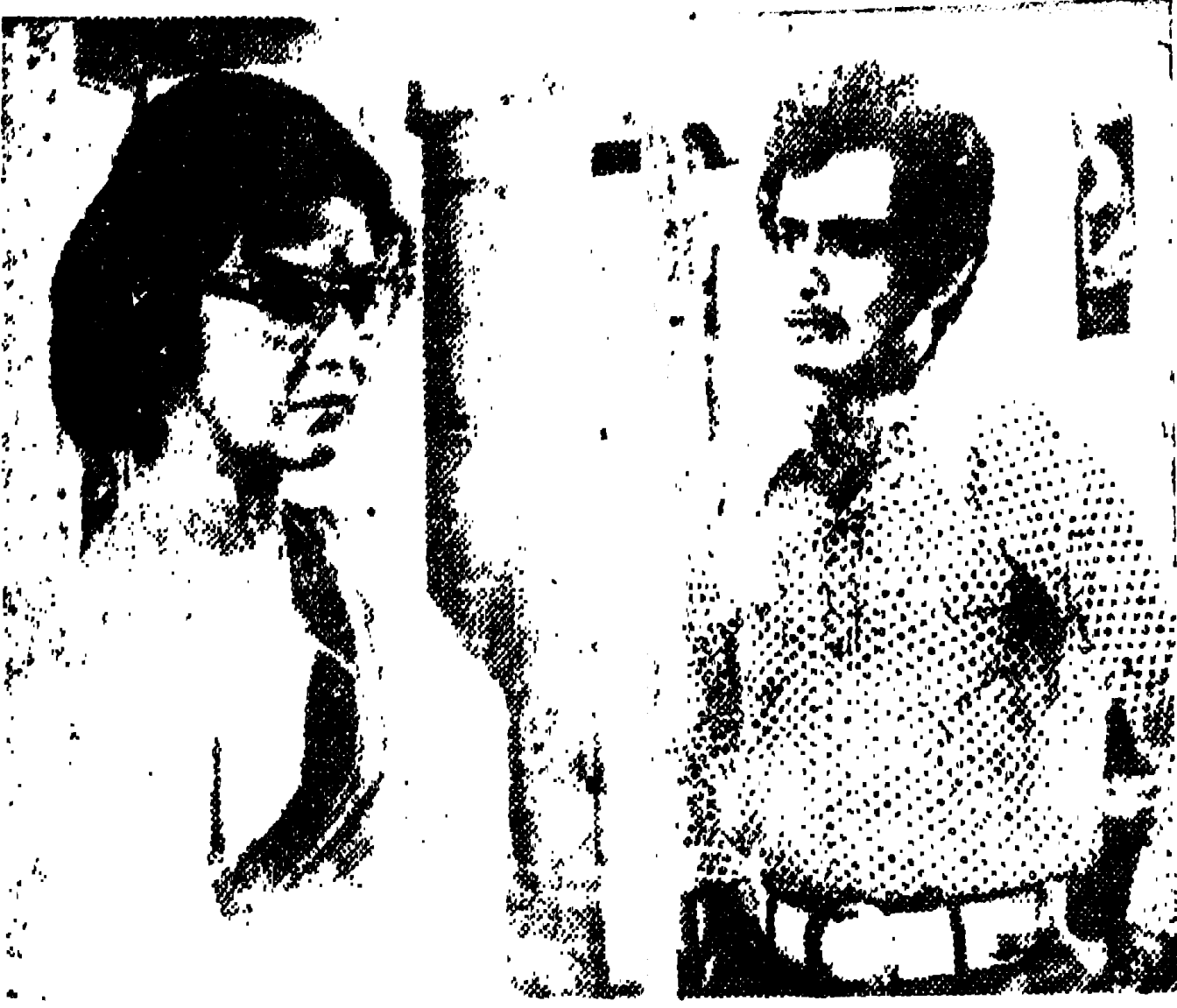
মাধবদী/সুপ্রিয়া দেবী/পার্থ

সাধনা সরকার পরিচালিত ফুলু ঠাকুমা
বঙ্কিম ঘোষ/চিন্ময় রায়/জয়শ্রী রায়

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

গুপ্তজ্ঞানের পর বম্বেতে এখন বেশ কয়েকটি 'সেক্স এডুকেশান ফিল্ম' নামে নতুন ছবি তৈরি হচ্ছে। যাতে সেক্স এডুকেশান তো হবেই না হবে এক ধরনের ভেজালপুরী। সেখানে গল্প থাকবে, প্রেম থাকবে আর থাকবে রীতিমত সুড়সুড়ি। প্রযোজক আই এম কুমু তাঁর নতুন ছবি 'কামশাস্ত্র'-তে এই ধরনের মালমশলা দেবার ব্যবস্থা করেছেন। চিত্রনাট্য তৈরি। শিল্পী নির্বাচনের বেলায় গোল বেঁধেছে। ছবির নায়ক মনোনীত হলেন রমেশ অরোরা। রমেশ পুরো চিত্রনাট্য পড়ে সই করতে চাইলেন না। কারণ 'সেক্স এডুকেশান' কোথায়? এখানে তো সস্তা দরের কিছু করার চেষ্টা হচ্ছে। [illegible] যদি 'সেক্স এডুকেশনাল' ছবি করতে হয়, তাহলে রমেশ অভিনয় করতে পারেন। শুনে তো প্রযোজকের চক্ষুস্থির। প্রযোজকের ধারণা ছিল টাকা দিলে নতুন ছেলেমেয়েরা যা করতে বলাবেন তাই করে দেবে। কিন্তু না, রমেশ অরোরা তাঁর সেই ভুল ভেঙে দিলেন। ফলে চিত্রনাট্য আমূল পরিবর্তিত হল। রমেশ পেলেন এক ডাক্তারের চরিত্র। এই ডাক্তারের লেকচারের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা ভিসুয়ালাইজ করতে পারবেন।

ধর্মেন্দ্র আর হেমা মালিনীর প্রেম এখন বম্বের প্রায় সকলেরই আলোচনার বিষয়বস্তু। রামানন্দ সাগরের 'চরস' ছবির জন্য বিদেশে আউটডোরে গিয়ে ওরা প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছে। বম্বে এসেও তার রেশ কাটেনি। বিদেশী কাগজপত্রেও ধর্মেন্দ্র আর হেমা নিয়ে বেশ রসাল নিবন্ধ লেখা হয়েছে। শোনা যায়, সারাদিনের শুটিং শেষ হলেই ধর্মেন্দ্র আর হেমা বেরিয়ে পড়ত শহর দেখতে। ওখানে ওদের বিশেষ কেউ চেনে না। ফলে সুবিধেই হয়েছিল। ওরা এদিক-সেদিক ঘুরে অনেকদিন এমনও হয়েছে ক্যাম্পে ফেরেনি। পরদিন শুটিং করতে অনেক দেরী হয়েছে। তার জন্য ধর্মেন্দ্র এবং হেমা দুজনেই খুব লজ্জা প্রকাশ করেছে। রামানন্দ সাগর শুটিং সিডিউল কমপ্লিট করার কথা ভেবে হয়তো সবকিছু বেশ হেসে হেসে ম্যানেজ করে নিয়েছেন। বম্বেতে ফিরে তিনি তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ঘনিষ্ঠ মহলে জানাতে ধর্মেন্দ্র হেমা দুজনেই ভীষন ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এবং এখন প্রায় প্রকাশ্যেই প্রেম করা শুরু করে দিয়েছেন। ধর্মেন্দ্র এই ব্যাপারে সাংবাদিকদের কিছুই বলছেন না। কিছু জিগ্যেস করলে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছেন। হেমা তো সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাই বলছেন না। সম্প্রতি গুলজারের 'খুশবু' ছবির আউটডোরে একদল সাংবাদিক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে নায়ক : জীতেন্দ্র। নায়িকা : হেমা মালিনী। হেমা তো জীবণপণ করেছেন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন না। অনেক কষ্টে জীতেন্দ্র রাজী করালে হেমা সুন্দর হেসে একটা কথাই বলেছেন : 'আপনারা সব বানিয়ে লেখা বন্ধ করুন' প্রত্যুত্তরে একজন সাংবাদিক বলেন : 'ধর্মেন্দ্র-র সঙ্গে রোমান্স একটু কম করুন ম্যাডাম।' রাগে লাল হয়ে হেমা শুটিং স্পট ত্যাগ করলে প্রযোজক প্রসেন কাপুর এবং পরিচালক গুলজার ভয়ান অসন্তুষ্ট হন। সেদিনের মত শুটিং বন্ধ করে দেন। হেমা পরের দিন অবশ্য নিজে দোষ স্বীকার করেন এবং শুটিং-এ যোগদান করেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে হাসি গল্পে জমে যান। উপস্থিত সাংবাদিক একের পর এক সব আকাশ থেকে পড়া শুরু করেন। বলেন : একি কান্ড! স[illegible] কি পশ্চিম থেকে উঠল নাকি!

—অভিজিৎ

মৌচাক

প্রযোজনা : পিয়ালী পিকচার্স
সকলের জন্যে একটি আনন্দদায়ক
হাসির ছবি !!

মৌচাক : উত্তমকুমার

নীতিশ ও সীতেশ দুই ভাই, ভাই ভাইয়ে এত মিল আজকাল দেখা যায় না। সীতেশের বৌদি ছোটবেলা থেকে, ওকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করেছেন। ঘটনাচক্রে ওকে কলকাতা থেকে সত্তর মাইল দূরের এক জুট ফ্যাক্টরীতে এক ওভারসিয়ারের চাকুরী নিতে হয়। চাকুরীস্থলে থাকবার কোন ব্যবস্থা নেই, কলকাতা থেকেও ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে চাকুরীস্থলে সময় মতো পৌঁছান সম্ভব নয়। নীতিশের বাল্যবন্ধু মিস্টার চৌধুরীর উপরেই সব ভরসা। উনি সীতেশের পরিচয় পেয়ে, সাগ্রহে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করলেন ওকে এবং বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে একমাত্র কন্যারত্ন এবং স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সীতেশ প্রথম দিনই বুঝতে পারলেন, চাকুরীর সুবিধা নিয়ে মিস্টার চৌধুরী ওকে জামাই হিসাবে পেতে চান। ফ্যাক্টরীর বড়বাবু থেকে শুরু করে অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ নিজেদের মধ্যে বিবাদ শুরু করে দেয় সীতেশকে জামাই করবার জন্যে।

এদিকে সীতেশ যে বাড়ীতে ভাড়া থাকে, তার পাশের বাড়ীর এক মাস্টার মশায়ের মেয়েকে ভালবাসে, নীপাও সুন্দর তরুণ সীতেশের প্রেমে পড়েছে। চৌধুরীর মেয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে নীতিশকে অনেক চাল চালতে হয়। আর এর ফলে নীপা ও সীতেশের মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হলেও, দাদা ও বৌদির চেষ্টায় নীপার সঙ্গে সীতেশের বিবাহ হয় অর্থাৎ মধুরেণ সমাপয়েৎ।

অভিনয়ে নীতিশের ভূমিকায়—উত্তমকুমার একাই একশো। সীতেশের ভূমিকায় রণজিৎ মল্লিক এবং বৌদির ভূমিকায় সাবিত্রী চ্যাটার্জী সুন্দর অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায়—নীপা—মিঠু মুখার্জি, মিস্টার চৌধুরী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, চৌধুরীর আদরিণী কন্যার ভূমিকায় সুলতা চৌধুরী এবং অনুপকুমার, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্না ঘোষাল, চিন্ময় রায়, রবি ঘোষ, তরুণকুমার তপতী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গীতা দে, অমরনাথ-এর অভিনয় যথাযথ। সংগীত পরিচালনায় নচিকেতা ঘোষ তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আলোকচিত্র গ্রহণ এবং কলাকৌশলের কাজ পরিচ্ছন্ন, কিন্তু সম্পাদনা দুর্বল। পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জি ছবিটিকে বকস অফিসে সাফল্য লাভ করবার জন্য জনপ্রিয় লেখকের (সমরেশ বসু) রমণীয় ছবি করেছেন। হাসির ছবি হলেও নিজের মন থেকে আসেনি, কাতুকুতু দিয়ে জোর করে হাসানো হয়।

—চিত্রদূত

শ্রেষ্ঠ পরিচালক
সত্যজিৎ রায়

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা
উত্তমকুমার

শ্রেষ্ঠ সংগীতপরিচালক
পূর্ণেন্দু পত্রী

এবারের রাজ্য সরকারী পুরস্কার

গত বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবিগুলির মধ্য থেকে রাজ্য পুরস্কার কমিটি সত্যজিৎ রায়ের সোনার কেল্লা ছবিটিকে বছরের সেরা ছবি হিসাবে পুরস্কৃত করেছেন। শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে ছেঁড়া তমসুক ও যদুবংশ। সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন সত্যজিৎ রায়। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন উত্তমকুমার (অমানুষ) ও অপর্ণা সেন (সুজাতা)। সেরা সঙ্গীত-পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রী (ছেঁড়া তমসুক), সেরা চিত্রগ্রাহক (সাদা কালো) — শক্তি ব্যানার্জি (ছেঁড়া তমসুক)। সেরা চিত্র-গ্রাহক (রঙ্গীন) সৌমেন্দু রায় (সোনার কেল্লা)। সেরা সহ-অভিনেতা — ধৃতিমান চ্যাটার্জি (যদুবংশ), সেরা সহ-অভিনেত্রী— সুমিত্রা মুখার্জি (সুজাতা), সেরা কৌতুক অভিনেতা—রবি ঘোষ (সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা), সেরা শিল্পনির্দেশক—কুশল চক্রবর্তী (সোনার কেল্লা)।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী
অপর্ণা সেন

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী
সুমিত্রা মুখার্জি

নাট্যমঞ্চ
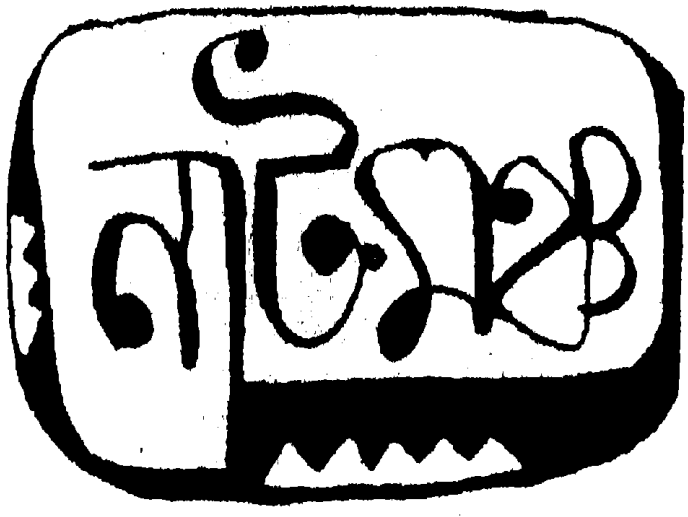
ভোলা ময়রা

নাটক : কবি কঙ্কন। প্রযোজনা : শান্তি ব্যানার্জি। পরিচালনা : মহেন্দ্র গুপ্ত। অভিনয়ে : ভোলা ময়রা—তারা ভট্টাচার্য। এন্টনী — পঙ্কজ চ্যাটার্জি। মৃত্যুঞ্জয়—অজয় গাঙ্গুলী। জটিরাম—কালীপদ চক্রবর্তী। পালিত পুত্র—মাঃ জমিদার। মনমোহিনী — গীতশ্রী দেবী। শ্যামমোহিনী—লতিকা দাশগুপ্তা। গুণবতী—জ্যোৎস্না বিশ্বাস। তাছাড়া আলপনা রায়, ছন্দা ব্যানার্জি, জি মালাকার বাসুদেব পাল রাখাল চক্রবর্তী প্রভৃতি আরো অনেকে। সঙ্গীত—চণ্ডী বসু।

রামমোহন রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে। বিগত ১২ জানুয়ারী ১৯৭৫ ওটার প্রদর্শনীতে নাটকটি আমরা দেখে এসেছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের পলি মাটিতে যে সব ক্ষণজন্মা কবিয়ালদের আবির্ভাব হয়েছিল ভোলা ময়রা তাদের মধ্যে অন্যতম। ভোলা ময়রার সমসাময়িক কবিয়ালদের মধ্যে হরু ঠাকুর রাম বসু এন্টনী ফিরিঙ্গী ঠাকুর সিংহ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি বা হরু ঠাকুর ছিলেন ভোলা ময়রার গুরু। ১৭৩৮ খৃস্টাব্দে হরু ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন আর মারা যান ১৮১৩ খৃস্টাব্দে। হরু ঠাকুরের গুরু ছিলেন রঘুনাথ দাস। হরু ঠাকুর প্রথমে অপেশাদার কবিয়াল ছিলেন। সেই সূত্রে মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রাসাদে গান গাইতে এসে মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় দল গঠন করেন। এই দলের পরিচালনা ভার অর্পণ করেন শিষ্য ভোলানাথ বা ভোলা ময়রার ওপর। ভোলানাথ ভনিতায় নিজেকে ভোলানাথ বলে পরিচয় দিতেন—তাতে তার প্রতিপক্ষ নিজের নামের সঙ্গে শিবত্ব আরোপের জন্য ব্যঙ্গ করতেন। ভোলা ময়রা তাঁদের উত্তরে বলেছিলেন :

আমি সে ভোলানাথ নই—
আমি সে ভোলানাথ নই।
আমি ভোলা ময়রা, হরুর চেলা,
শ্যামবাজারে রই।
আমি যদি সে ভোলানাথ হই,
তোরা সবাই বিল্বদলে .
আমায় পূজা দিলি কই।

ভোলা ময়রা তার অন্যতম প্রতিপক্ষ হিসেবে রাম বসুকে পেয়েছিলেন। রাম বসুও একজন শক্তিমান কবিয়াল ছিলেন। কথিত আছে মাত্র ৫ বছর বয়সে রাম বসু পাঠশালায় কলার পাতায় কবিত্ব লিখতে শুরু করেন। ১২ বছর বয়সে তার কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে ভবানী বেনে নিজ দলে গ্রহণ করেন। নীলু ঠাকুর মোহন সরকারের দলেও ছিলেন রাম বসু। পরে নিজে দল গঠন করেন। ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে মাত্র ৪২ বছর বয়সে ১৮২৮ খৃস্টাব্দে রাম বসু পরলোকগমন করেন। রাম বসু ঠাকুর সিংহ প্রভৃতিরা ভোলা ময়রা এন্টনী ফিরিঙ্গী প্রভৃতির প্রতিপক্ষ হিসেবে গান করতেন।

আলোচ্য নাটকে ভোলা ময়রার প্রতিপক্ষ হিসেবে মনমোহিনী দেবী ও রাম বসুকে এবং শিষ্য হিসেবে এন্টনী ফিরিঙ্গীকে দেখান হয়েছে। মনমোহিনী দেবী ভোলা ময়রার কাছে পরাজিতা হয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে পতিত্বে বরণ করেন। কিন্তু তাদের কোন সন্তানাদি না হওয়াতে পিতৃমাতৃহীন একটি অনাথ বালককে পুত্রস্নেহে লালন-পালন করেন। ভোলা ময়রা শ্যামবাজারে থাকতেন। তার মিষ্টির দোকান ছিল। এখানে গুণবতী নামে একজন অসহায়া বিধবা মেয়েকে স্থান দেওয়াতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। নাটকের জন্যই এই ঘটনা আনা হয়েছে। ভোলা ময়রার ব্যক্তি-জীবন সুখের ছিল না। ভোলা ময়রার শিল্পী-জীবনের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনকেও তুলে ধরেছেন নাট্যকার। তাঁর মুন্সীয়ানার প্রশংসা করতে হয়। গানে গানে গানের মধ্য দিয়ে কবিয়াল ভোলা ময়রার জীবননাট্য বাংলা রঙ্গমঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্য-প্রতিভা মহেন্দ্র গুপ্ত এমন অপূর্বভাবে রসময় করে তুলে ধরেছেন যে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। অভিনয়ে গানে নাটকীয় সংঘাতে ভোলা ময়রা যে কোন নাট্যামোদীদের অভিভূত করবে। নাম-ভূমিকায় তারা ভট্টাচার্যের উদাত্ত কণ্ঠের মিষ্টি-মধুর সংগীতে অতি সহজেই দর্শক-মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। এন্টনী ফিরিঙ্গী চরিত্রে পঙ্কজ চ্যাটার্জি এবং রাম বসুর চরিত্রের অভিনেতাকেও প্রশংসা করব। তবে সামগ্রিক অভিনয়ের প্রশংসা পঙ্কজ চ্যাটার্জিরই বেশী প্রাপ্য। মনমোহিনীর চরিত্রে গীতশ্রী দেবী নাচে গানে অভিনয়ে সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। লতিকা দাশগুপ্তার সুমিষ্ট কণ্ঠও ভাল লাগবে। গুণবতী চরিত্রে নবাগতা জ্যোৎস্না বিশ্বাস প্রশংসনীয়। মাঃ জমিদার অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। কালীপদ চক্রবর্তীর জটিরাম তার স্যাকরেতের চরিত্রাভিনেতা এবং নবকৃষ্ণ চরিত্রে শান্তি ভট্টাচার্য ও মৃত্যুঞ্জয় চরিত্রে অজয় গাঙ্গুলী প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন

কিছু কিছু শিল্পীর এবং দৃশ্য-পটাদির পরিবর্তন করে ভোলা ময়রা যদি একটু বড় নাট্যগৃহে মঞ্চস্থ করা যায় নিঃসন্দেহে নতুন বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যসম্ভাররূপে কীর্তিত হবে। প্রজাপতির পর ভোলা ময়রার মধ্য দিয়ে নট ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত নতুন করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন।

—শীলভদ্র

সুরীনার 'জনঅরণ্য'

প্রখ্যাত লেখক শঙ্কর-এর 'জন অরণ্য' বহুল পঠিত উপন্যাস। এর চরিত্র অনেক। তাই একে নাট্যরূপ দেওয়া যেমন কঠিন তেমনি এর চরিত্রচিত্রণও দুরূহ সন্দেহ নেই।

শঙ্করের লেখার মধ্যে সব সময়ই আমরা এমন কিছু পাই যা পাঠককে যুগপৎ ভাবায় এবং মনের গভীরে গিয়ে আঘাত করে। তাঁর প্রত্যেকটা চরিত্রই যেমন আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ, তেমনি তাদের প্রত্যেকের সমস্যাই আমাদের আজকের সমস্যা।

সোমনাথ লেখাপড়া শিখেও বেকার। কিন্তু সে আদর্শবাদী। সে সেই অবকাশ কৈ আমাদের জীবনে? বেকারত্ব যখন তার জীবনে তীব্র আকার ধারণ করেছে তখনও সে সৎ থাকতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারেনি। চাকরীর ব্যাপারে সে নিরাশ হয়ে অন্যের প্ররোচনায় ব্যবসা করতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে দেখেছে আর একটা জগৎকে। যেখানে ভদ্রলোকেরাই ব্যবসার নাম করে অন্যকে নির্বিকারভাবে প্রতারণা করছে। মেয়েমানুষের দালালী করছে।

অন্যদিকে সুকুমারের মত সতেজ ছেলে বাবা রিটায়ার করার পরে চাকরী জোগাড় করতে না পেরে পাগল হয়ে যাচ্ছে।

বিপরীতে আবার দেখা যায় মাতাল স্বার্থপর স্বামীর হাতে পড়ে স্ত্রীকে দেহদান করতে হচ্ছে টাকার বিনিময়ে পরপুরুষের কাছে।

এরা সব এক একটি চরিত্র যেন আজকের ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরেরই প্রতিচ্ছায়া।

আমরা কোথায় যাচ্ছি। কোন সর্বনাশের হাতছানিতে আমাদের বাঙালী জাতি রসাতলের পথে দ্রুত নেমে যাচ্ছে, শঙ্কর যেন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের। আমরা, আমাদের সমাজ যেন চারিদিকে ক্রমশ পাশবিক চিন্তার দৈন্য দিয়ে ক্রমশ চারিদিকে আদিমতার অরণ্যের প্রাচীর গড়ে তুলছে। স্রোতের মুখে

অর্থাৎ জীবনযুদ্ধের জটিল আবর্তে পড়ে আমরা যেন দ্রুত অবক্ষয়ের শিকার হয়ে পড়ছি প্রতিটি পর্যায়ে।

শংকরের এই চিন্তা আমাদের ভাবায়, বিভ্রান্ত করে। তাঁর বাঙালীর প্রতি এই মমত্ববোধ এবং তার সমাজ সচেতনতাকে মনে রেখেই নাট্যকার যে এমন দুরূহ কাজে হাত দিয়েছেন এজন্য নাট্যরূপদাতা সমীর ঘোষ আমাদের ধন্যবাদার্হ।

তাঁর নাট্যরূপ সর্বত্র না উৎরালেও এই প্রচেষ্টা বাঙালীকে, তার সমাজকে ভালবাসারই নামান্তর তাতে সন্দেহ নেই।

তবে এ প্রসঙ্গে দু একটি কথা পূর্বাহ্ণেই বলে নেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি। তা হোল, নাটকে এমন অনেক সংলাপ বা দৃশ্যাংশ সংযুক্ত করা হয়েছে যার খুব একটা প্রয়োজন বোধহয় ছিল না। তাতে নাটকও ভারাক্রান্ত হোত না এবং 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' লেখারও প্রয়োজন ছিল না।

দ্বিতীয়ত এরকম নাটকের ক্ষেত্রে যেটা সর্বপ্রথম প্রয়োজন সেটা হোল বক্তব্য প্রকাশের জন্য সুষ্ঠু সংলাপ। সেটা নাটকে উপস্থিত থেকেও কুশলীদের দুর্বল অভিনয়ের জন্য দর্শকদের মনকে স্পর্শ করতে পারেনি।

অভিনয়ে একদিকে যেমন অ্যামেচারি ঢং রয়ে গেছে, অন্যদিকে তেমনি কোন কোন চরিত্রাভিনেতার অভিনয়ে অতিশয়োক্তি লক্ষ্য করা গেছে। এই দিকই এমন মেজাজের নাটকের পক্ষে ক্ষতিকর।

অভিনয়ে সোমনাথের চরিত্রে পরিচালক সুভাষ দে আগাগোড়া একটা সংযত এবং মর্যাদার ভাব বজায় রেখেছেন। ভবতোষ ব্যানার্জীর সুকুমার প্রথম দিকে বেশ সপ্রতিভ ভাবে অভিনয় করেছেন। কমলা বৌদি রূপী দীপ্তি ভট্টাচার্যকে বড় ভাল লেগেছে। আর বিচ্ছিন্ন ভাবে ভাল লেগেছে সেনাপতিরূপী পিনাকী মুখার্জীকে। জাঁদরেল মনে হলেও তিনি শক্তিমান অভিনেতা সন্দেহ নেই।

অন্যান্য ভূমিকায় অসিত ব্যানার্জী স্বপন চ্যাটার্জী, কুন্তল রায়, অজিত দত্ত কল্যাণ ঘটক, সত্য কর, স্বপন সেন অশিস ঘোষ, অশোক মুখার্জী স্ব-স্ব চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলায় সচেষ্ট ছিলেন অবশ্যই।

মেয়েদের মধ্যে বুলবুলরূপী কল্পনা মিত্রর চঞ্চল হাসি খুশী ভাব এবং তৃপ্তীর চরিত্রাভিনেত্রী বীণা দেকে আমার সুন্দর লেগেছে। গীতশ্রী ব্যানার্জী ও চম্পা চক্রবর্তী চরিত্রানুগ।

আবহ সংগীত মাঝে মাঝে অবাক করেছে দৃশ্য অনুযায়ী তার প্রয়োগের গুণে। নাটকের খামতি অনেকটাই ঢেকে দিয়েছে আবহ সঙ্গীত (দেবকী ব্যানার্জী কৃত)।

মঞ্চ (অমর ঘোষ) পরিকল্পনা ভাল। তবে তার উপস্থাপনায় আর একটু লক্ষ্য রাখলে আরও ইমপ্রেসিভ হোত।

সব শেষে একটি কথা। নাটকের গতি অনেকাংশেই শ্লথ হওয়ার দরুণ নাটকীয়তাও যেমন দানা বেঁধে উঠতে পারে নি তেমনিই তা দর্শককে নিবিষ্ট করে দিতে পারে নি। যেটা নাটকের পক্ষে অপরিহার্য অর্থাৎ টিম ওয়ার্ক, যার ওপর নির্ভর করছে টোটাল এফেক্ট। এ সম্পর্কে পরিচালককে আরো কিছুটা সচেতন হতে অনুরোধ জানাই। কারণ পাত্র-পাত্রীর সুষ্ঠু অভিনয়ের ওপরেই নাটকের সাফল্য নির্ভর করে।

—নাট্য সমালোচক

বাঙলা দেশের ছবি

বিশ্বাস করুন আমার ভীষণ দুঃখ হয় আপনাদের জন্য। আপনারা অমৃতের অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকা যাদের জন্য আমি এ লেখা তৈরী করি তাদের অনেকেই বাংলাদেশের ছবি দেখার সুযোগ আজও পান নি ও এখনও পাচ্ছেন না। আর তাই আমি যে সব ছবির কথা বলি এবং যে সব শিল্পীর কথা বলি আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা এখনও তাদেরকে চোখে বা পর্দায় দেখেন নি এবং আরো কতদিন পর তাদের দেখতে পাবেন তাও আমার ঠিক ঠিক জানা নেই।

অথচ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আমরা এবং আপনারা নিশ্চয় আশা করেছিলাম ভীষণভাবেই আশা করেছিলাম যে এ অন্ধকার এবার কেটে যাবে আর আমরা উত্তম সুচিত্রা অপর্ণাকে এবং আপনারা রাজ্জাক শাবানা ববিতাকে পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই দিব্যি ঘরে বসে (মানে স্থানীয় ছবিঘরে) হরদম দেখতে পাব।

কিন্তু বাস্তবে? দিল্লী দূর অস্ত—

জানি না দু দেশের সরকার আমাদের ও আপনাদের কথা ভেবে কবে দু দেশের মধ্যে ছবি বিনিময়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করবেন।

তবে স্বীকার করতেই হবে এদিক দিয়ে আপনাদের চেয়ে আমরা বাংলাদেশের দর্শক মাত্রই যথেষ্ট ভাগ্যবান। তার কারণ একদা ভারত থেকে আমদানীকৃত কয়েক শত ছবি এ দেশের দর্শক একদা এক ও একাধিকবার দেখেছেন এবং এখনও বাংলাদেশ সরকারের ইচ্ছায় মাঝে মধ্যেই দেখতে পান ও পাচ্ছেন।

শুধু দুঃখ এ-সবই পুরাতন ছবি। এক ও একাধিকবার দেখা ছবি। নতুন ছবি যা গত ৫ বছরে ভারতে তৈরী হয়েছে তার দু-পাঁচটা মাত্র এদেশের দর্শক হঠাৎ দেখতে পেয়েছেন। যেমন কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত উৎসবকালে এবং সম্প্রতি সত্যজিৎ রায়ের তৈরী 'গোপী গায়েন বাঘা বাইন'।

গোপী গায়েন এখানে কি করে হঠাৎ মুক্তি পেল তা অবশ্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু যেভাবেই এ ছবি এখানে মুক্তি পাক না কেন স্বীকার করতেই হবে এখানকার দর্শকরা এ ছবিটা দেখে ভীষণ খুশী হয়েছেন। অনেক দিন পর একটা ভালো ছবির দেখার আনন্দ পেয়েছেন।

অবশ্য আপনারাও এদেশের হাতে গোনা কয়েকটা ছবি ইতিমধ্যে দেখেছেন। যেমন স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কোলকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত জহির রায়হান পরিচালিত ছবি 'জীবন থেকে নেয়া' এবং কিছুদিন পরে মোমতাজ আলী পরিচালিত ছবি 'নতুন ফুলের গন্ধ'।

অতঃপর ভারতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে যে কটা ছবি প্রদর্শিত হয়েছে, সে সব ছবিও আপনাদের কেউ কেউ দেখেছেন।

তবুও বলতে হবে, দই-এর স্বাদ কি আর ঘোলে মেটে। তাই সেই সুদিনের

অপেক্ষায় থাকা, যেদিন দু'দেশের ছবি দু'দেশে বিনিময়সূত্রে আসবে, যাবে এবং প্রদর্শিত হবে।

ভূমিকা দীর্ঘ করতে চাই না। এবার আসল আলোচনায় আসা যাক। কিন্তু কোন বিষয়ে লিখি? আচ্ছা, প্রশ্ন-উত্তরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কে আপনাদেরকে একটা মোটামুটি ধারণা দেবার চেষ্টা করি।

(ক) বাংলাদেশে বর্তমানে নির্মীয়মাণ ছবির সংখ্যা কত জানেন?

—দু'শতাধিক।

(খ) বাংলাদেশে গড়ে বছরে ক'টি ছবি মুক্তি পায়?

—মাত্র ৩০।৩২টি।

(গ) বাংলাদেশে এখানে ছবির পরিচালক কতজন?

—শতাধিক।

(ঘ) ছবি নির্মাণে মোট কত টাকা ব্যয় হয়?

—আগে হত এক থেকে চার লাখ টাকা। কিন্তু এখন লাগে পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকা।

(ঙ) নায়ক নায়িকার সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক কত?

—এক লাখ ও পঁচাত্তর হাজার।

(চ) ক'জন নায়ক বাংলাদেশের চিত্রজগতে আছেন?

—বেশী নয়। ডজনখানেক। নাম শুনবেন? শুনুন—রাজ্জাক ওয়াসীম উজ্জ্বল জাফর ইকবাল প্রবীর আলমগীর বুলবুল ইসলাম জাভেদ কাসেম সোহেল রানা আজিম খসরু প্রমুখ।

(ছ) নায়িকার সংখ্যা কত?

—খুবই অল্প। যেমন শাবানা ববিতা কবরী কবিতা সুজাতা অলিভিয়া মঞ্জু দত্ত সুচরিতা নতুন ও সুচন্দা প্রমুখ।

(জ) অন্যান্য পুরুষ শিল্পী?

—অনেক। যেমন আনোয়ার হোসেন মোস্তফা খলীল নারায়ণ চক্রবর্তী হাসান ইমাম দারাশিকো জসীম খান জয়নুল সাইফুদ্দীন ফতেহ্ লোহানী শওকত আকবর দীন মোহাম্মদ হাসমেত জাভেদ রহীম বেবী জামান রানু আনিস টেলি সামাদ মেসবাহ্ রবিউল রাজ্জ আলতাফ লালু বাবর মোহসেন আলী মনসুর আলী কাওসার তুলিপ প্রমুখ।

(ঝ) এবং মহিলা শিল্পী?

—অনেক। যেমন সুমিতা দেবী রোজী সামাদ রাণী সরকার রহিমা আনোয়ারা কাবেরী চন্দনা মিনু রহমান সুবিতা সুলতানা নার্গিস বেবী রীতা শর্বরী ওয়াহিদা রওশন জামিল মায়া হাজারিকা রীনা আকবান নাজনীন শাকিলা সুপ্রিয়া রীতা প্রমুখ।

(ঞ) বাংলাদেশে ছবিঘরের সংখ্যা কত?

—প্রায় দু'শত।

(ট) ছবিঘরের টিকিটের হার কত?

—ডি সি সাড়ে সাত টাকা, রিয়ার স্টল সাড়ে চার টাকা, মিডল স্টল তিন টাকা।

যাক এবার বাংলাদেশে নির্মীয়মাণ ছবির কিছু সংক্ষিপ্ত খবর শুনুন।

কালিদাস পরিচালিত ছবি 'জানোয়ার'-এর কাজও এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গেছে। ছবির নায়ক নায়িকা ওয়াসীম ও মিনু রহমান।

এদিকে 'দস্যু বনহুর'এর শুভ মহরৎ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

—আনওয়ার আহমদ

পাত্থর অউর পায়েল

প্রযোজনা : কে পি এস ফিল্মস

বক্স অফিসের জন্যে নির্মিত একটি অ্যাকসানধর্মী ছবি!!

অজিত ও রণজিৎ দুই ভাই বিখ্যাত ডাকাত হিসাবে পুলিশের ডায়েরীতে পরিচিত। ওদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। অথচ ওরা ডাকাত ছিল না, বরং ভদ্রভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু বিজয়নারায়ণ সিং নামে অসৎ ব্যক্তির দ্বারা ওদের বাবা ও মা নিহত হন। ছোটবেলা থেকেই ওরা প্রতিজ্ঞা করেছিল—একদিন ওদের বাবা ও মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে, এ জন্যেই ওরা আজ বিখ্যাত ডাকাত হয়েছে। একবার ডাকাতদলের সরযু গ্রামে অর্থ লুন্ঠন করার বদলে সুন্দরী তরুণীর ইজ্জতের উপর হামলা করে, রণজিৎই সেবার সরযুকে বাধা দিয়ে সেই সুন্দরী তরুণীর ইজ্জত বাঁচায়। একাধিকবার 'সরযু'র চক্রান্তের হাত থেকে ধনীর দুলালী আশাকে রক্ষা করে। আশাকে শহরে পৌঁছে দিতে এসে, ওর বাবার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং নবযৌবনার ছদ্মবেশে শহরেই বাস করতে থাকে। বিজয়নারায়ণ সিং-এর চক্রান্তে রণজিৎ-এর আসল পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করতে আসে। সরযুর আগ্রহে অজিত শহরে আসে রণজিৎকে ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু ওকে পায় না। অবশেষে আশাকে নিয়ে সরযু আপন ডেরায় ফিরে গিয়ে, নিজেই সর্দার হয় এবং অজিতকে বন্দী করে রাখে। রণজিৎকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে পুলিশকে বুঝিয়ে ডাকাতদের ডেরায় নিয়ে গিয়ে আশাকে উদ্ধার করে। কিন্তু বিজয়নারায়ণের গুলিতে অজিত নিহত হন। এবার সানন্দেই পুলিশে ধরা দেন রণজিৎ।

এ ছবির অন্যতম সম্পদ অভিনয়—রণজিৎ—ধর্মেন্দ্র, অজিত—অজিত, সরযু—বিনোদ খান্না এবং আশার ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন হেমা মালিনী। অন্যান্য ভূমিকায়—সাইকেলে ভূপর্যটক—রাজেন্দ্রনাথ, আশার বাবা—সপ্রু, পুলিশ অফিসার—ইফতিকার বিজয়নারায়ণ—রাজেন হাসকর এবং যোগীন্দার, এস বে প্রেম, রাধামোহন, রাজেন্দ্রনাথ ও জয়শ্রী টি চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। ছবিতে গানের প্রয়োজন ছিল না তবুও চারখানি গানের সুরে নতুন কিছু দেবার চেষ্টা করেছেন কল্যাণজী আনন্দজী। শিল্প নির্দেশনায় গণেশ নায়ক, আলোকচিত্র গ্রহণে ভি দুর্গা প্রসাদ-এর কাজ উল্লেখযোগ্য। এবং সম্পাদকের কাঁচি (ভাস্কর রাও) মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর হতে পারতো। পরিশেষে পরিচালক ধর্মেশ দারুহোতা ওঁর পূর্ববর্তী ছবি 'গদ্দার'তেও বিদেশী ছবির প্রভাবকে এড়াতে পারেন নি, এবারে সেটা বেশী প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

—চিত্রদূত

শতবর্ষের স্মরণীয়

নাট্যরথী অমর দত্ত—২

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী, পূর্ণচন্দ্র অভিনয়েও ক্লাসিকের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু তারাসুন্দরীর সংগে হঠাৎ মনোমালিন্য হয় অমর দত্তের। ফলে তারাসুন্দরী ক্লাসিক থিয়েটার পরিত্যাগ করেন। সংগে সংগে অঘোর পাঠক ও ক্লাসিক থিয়েটার ধাক্কা খেলেন। এমনি বহু ধাক্কাই অমরেন্দ্রনাথকে খেতে হয়েছে তার নাট্যজীবনে। কোন সময়ই তিনি দমে পড়েন নি। অমিততেজে সমস্ত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন। থিয়েটারকে জনপ্রিয় করে তুলতে অমরেন্দ্রনাথ গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা করলেন। এমারেল্ড থিয়েটারে ইতিপূর্বে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ফুলশয্যা গীতিনাট্য মঞ্চস্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় গীতিনাট্য হিসেবে ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখেছিলেন আলিবাবা। 'আলিবাবা' রচনা করে স্টার থিয়েটারের অমৃতলাল বসুকে মঞ্চস্থ করবার জন্য পড়তে দেন। অমৃতলাল 'আলিবাবা' অভিনয়োপযোগী নয় বলে পান্ডুলিপি ফেরত দেন। তখন ক্ষীরোদপ্রসাদ অমরবাবুকে পড়তে দেন আলিবাবা। অমরবাবু এবার গিরিশচন্দ্রকে পান্ডুলিপি সংশোধন করতে অনুরোধ করেন। গিরিশচন্দ্র আলিবাবা সংশোধন করে প্রস্তাবনার গানটি রচনা করে দেন।

শনিবার ২০ নভেম্বর, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাসিক থিয়েটারে মঞ্চস্থ হলো আলিবাবা। অভিনয়ে রইলেন আলিবাবা—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। হুসেন—অমরেন্দ্রনাথ। আবদাল্লা—নৃপেন্দ্রনাথ বসু আর মর্জিনারূপে আত্মপ্রকাশ করলেন কুসুমকুমারী।

প্রথম রজনীর বিক্রয় ভালই ছিল কিন্তু ২৭ নভেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারেও আলিবাবা মঞ্চস্থ করায় বিক্রয় হ্রাস পায়। শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় ক্লাসিক জয়লাভ করে' আলিবাবার বিক্রী প্রায় আড়াই হাজার টাকায় বৃদ্ধি পায়।

ক্লাসিক থিয়েটার তথা অমর দত্তকে আলিবাবা নতুন জয়মুকুটে ভূষিত করেছিল। অমর দত্ত এবার মঞ্চস্থ করলেন তার 'কাজের খতম' নাটক। ২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কাজের খতম মঞ্চস্থ হলো।

শনিবার ৮ জানুয়ারী ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ক্লাসিকে মঞ্চস্থ হলো গিরিশচন্দ্রের 'পান্ডবের অজ্ঞাতবাস'। ২০ জানুয়ারী অমরেন্দ্রনাথের বেনিফিট নাইট অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক অমরেন্দ্রনাথকে 'বেনিফিট নাইটের প্রবর্তক বলে অভিহিত করেছেন—এ সত্য নয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ থেকে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে চুনীলাল দেব নিখিলকৃষ্ণ দেব এবং তাঁদের অপর পাঁচ ভ্রাতা ক্লাসিকে যোগদান করেন। এঁরা সবাই অমরেন্দ্রনাথের পুরোন বন্ধু। স্বভাবতঃই অমরেন্দ্রনাথ কিছুটা উৎসাহিত হন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৮ মার্চ গিরিশচন্দ্রের দোললীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও গোপী চরিত্রে অভিনয় করেন কুসুমকুমারী। নৃপেন্দ্রনাথ বসু—গোপ। শ্রীরাধা—ভূষণকুমারী। সখীদের মধ্যে সুশীলাবালা। বিনোদিনী (হাঁসি) ও নীরদাসুন্দরী ছিলেন। 'রেল রং দিলি এ ঢং করে' সঙ্গীতে সমস্ত নাট্যগৃহ অপূর্ব উন্মাদনায় মেতে উঠতো। এই সময় কলকাতায় প্লেগের প্রকোপ ভীষণরূপে দেখা দেয়। দলে দলে লোকজন কলকাতা ছেড়ে যান। অনেক থিয়েটার সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। কিন্তু অমর দত্ত তাঁর ক্লাসিক থিয়েটার নিয়ে নির্বিকারভাবে অভিনয় করে চলেন।

স্টার থিয়েটারের সংগে গিরিশচন্দ্রের আবার মনোমালিন্য দেখা দেয়। তিনি স্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করেন। রাজসাহীতে একটি নতুন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা। [illegible] পরিবর্তন করার পর জুলাই মাসে গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করেন। স্টার থিয়েটার এই সময় প্রায় দেড় মাস বন্ধ থাকে।

দানীবাবুও গিরিশচন্দ্রের সংগে ক্লাসিকে যোগদান করেন।

প্লেগ মহামারীজনিত কলকাতার সেই ভয়াল ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও অমরেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে এমন একটা ঘটনা ঘটলো যা জাতীয় জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা হিসেবেই কীর্তিত হবে।

চলচ্চিত্র ইতিমধ্যেই তার বিস্ময়কর আকর্ষণ নিয়ে দেখা দিয়েছে। স্টার থিয়েটারে মিঃ স্টিফেনস নিয়মিত ছবি দেখিয়ে বাজীমাৎ করছিলেন। রয়াল বায়স্কোপের মধ্য দিয়ে হীরালাল সেন আর মতিলাল সেন নিয়মিতভাবে ছবি দেখাতে শুরু করেছেন। হীরালাল সেন অমর দত্তের আহবানে ক্লাসিক থিয়েটারেই নিয়মিত ছবি দেখানো শুরু করলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল আলিবাবার সংগে যে বায়স্কোপ দেখানো হয় সে সম্পর্কে ৫ এপ্রিল ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের অমৃতবাজার পত্রিকায় বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিলেন (অনুবাদ) 'সিনেমাটোগ্রাফ। গত রবিবার ক্লাসিক থিয়েট্রিক্যাল কম্পানী কর্তৃক অদ্ভুত সিনেমাটোগ্রাফ প্রদর্শনী দেখানো হয়। প্রদর্শনী শেষে দর্শকসাধারণকে 'আলিবাবা' নাটক দেখানো হয়।' গিরিশচন্দ্র ক্লাসিকে যোগদান করার পর মেঘনাদ বধ মুকুল মুঞ্জরা প্রভৃতি অভিনীত হলো। গিরিশচন্দ্র—রাম; মহেন্দ্র বসু—লক্ষ্মণ; অমর দত্ত—মেঘনাদ চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করলেন মেঘনাদ বধ নাটকে। কিন্তু মহেন্দ্রলাল বসু মিনার্ভায় গিয়ে যোগদান করলেন। তখন লক্ষ্মণ চরিত্রে অভিনয় করতে লাগলেন দানীবাবু।

৩০ জুলাই মুকুল মুঞ্জরা ২৭ আগস্ট প্রফুল্ল মঞ্চস্থ হলো। গিরিশচন্দ্র যোগেশ দানীবাবু সুরেশ আর ভজহরি চরিত্রে অমরেন্দ্রনাথ অভিনয় করলেন। অমরেন্দ্রনাথ ভজহরি চরিত্রে অদ্ভুত শক্তিমত্তার পরিচয় দিলেন। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইন্দিরায় অমরেন্দ্রনাথ উপেন্দ্র, কুসুমকুমারী ইন্দিরা চরিত্রে অভিনয় করেন। ইন্দিরা জনপ্রিয়তার্জনে ব্যর্থ হয়।

২৫ ডিসেম্বর 'নির্মালা' গীতিনাট্য দর্শকদের মাতিয়ে দিল।

মহেন্দ্রলাল বসু আর অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী মিনার্ভায় ছিলেন কিন্তু তাঁদের পক্ষে মিনার্ভাকে সচল রাখা কঠিন হয়ে উঠলো—তখন এইচ এল মল্লিক নামে এক ভদ্রলোক কিছুদিনের জন্য মিনার্ভার লেসী হন এবং তিনি গিরিশচন্দ্রকে মিনার্ভায় নিয়ে যান। স্বভাবতই গিরিশচন্দ্র আর অমর দত্তের মাঝে কিছুটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

১১ মার্চ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের অধিনায়কত্বে মঞ্চস্থ হলো প্রফুল্ল। 'যোগেশ চরিত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ (অধীন)' বলে বিজ্ঞাপিত হলো। অমরেন্দ্রনাথও ১৮ মার্চ ক্লাসিকে প্রফুল্ল নাটক মঞ্চস্থ করলেন। মিনার্ভার মত তিনিও বিজ্ঞাপিত দিয়েছিলেন যোগেশ চরিত্রে মাই আম্বল সেলফ্' বলে।

তখনকার থিয়েটারে থিয়েটারে বেশ মজাদার লড়াই হতো। এবারকার লড়াই ছিল গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে। কিন্তু মিনার্ভা গিরিশচন্দ্রকে নিয়েও লড়াইতে জয়লাভ করতে পারলো না। অমর দত্ত আবার গিরিশচন্দ্রকে মিনার্ভায় ফিরিয়ে আনলেন।

২৯ এপ্রিল ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দেই গিরিশ-

চন্দ্রের 'জনা' মঞ্চস্থ হয়। প্রবীর এবং মদন মঞ্জরীরূপে অমরেন্দ্রনাথ আর কুসুমকুমারী অপূর্ব অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্র বিদূষক চরিত্রে অভিনয় করেন।

১০ জুন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে গিরিশ-চন্দ্রের দেলদার নাটকের বিভিন্নাংশে ছিলেন অমর দত্ত গহন। নৃপেন্দ্রনাথ বসু—দেলদার। দানুবাবু—সরল। কুসুমকুমারী—পিয়ারা।

২৬ আগস্ট মঞ্চস্থ হলো অমরেন্দ্রনাথের নতুন নাটক শ্রীকৃষ্ণ। নামভূমিকায় অভিনয় করেন কুসুমকুমারী। শ্রীকৃষ্ণ গীতিনাট্যও অন্যান্য গীতিনাট্যের মতই জনপ্রিয়তার্জন করে।

১৬ সেপ্টেম্বর ভ্রমর মঞ্চস্থ হলো। কথিত আছে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইল-এর নাম নাটকাকারে ভ্রমর রাখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অভিনয়ে মহেন্দ্রলাল বসু—কৃষ্ণকান্ত অমরেন্দ্রনাথ— গোবিন্দলাল নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু—হরে দানীবাবু—নিশাকর কুসুমকুমারী—ভ্রমর প্রমদাসুন্দরী— রোহিণী চরিত্রে অভিনয় করেন। কুসুমকুমারী প্রমদা-সুন্দরী অমরেন্দ্রনাথ এবং বৃদ্ধবয়সে মহেন্দ্রলালের অভিনয় উচ্ছ্বসিতভাবে অভি-নন্দিত হয়।

ভ্রমর-এর অভিনয় দেখে কবি নবীনচন্দ্র সেন অমর দত্তকে অভিনন্দিত করে এক পত্র লেখেন। ভ্রমরের অকল্পিত জনপ্রিয়তার কথা তখন নাট্যামোদীদের মুখে মুখে গল্প-কাহিনীর মত উচ্চারিত হতো। প্রতিদিন বহু দর্শক টিকেট না পেয়ে ফিরে যেতেন। ভ্রমরের জনপ্রিয়তার পর থেকেই অমরেন্দ্রনাথ বিডনকেশরীরূপে খ্যাত হয়ে ওঠেন।

(ক্রমশঃ)

জলসা

আরঙেত্রম-এ পূর্ণিমা : ১২ জানুয়ারী বিদ্যামন্দির মঞ্চে নৃত্যম নিবেদিত শ্রীমতী পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়ের ভারতনাট্যম (আরঙেত্রম) উদ্বোধন করেন শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ। শ্রীঘোষ শিল্পীকে আশীর্বাদ জানান এবং শিল্পী ভগ্নীত্রয় (সুনন্দা, অপর্ণা, পূর্ণিমা) আপনাপন ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের সহায়ক হয়ে দাঁড়াবার জন্য এঁদের পিতা ও মাতা শ্রীপুলিনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী প্রীতি চট্টোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন এই শিল্পী পরিবার যেন নৃত্য গীত ও অন্যান্য সঙ্গীতের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছেন। আমি এঁদের সর্বাঙ্গীন সার্থকতা কামনা করি।

শ্রীমতী পূর্ণিমাকে এর আগে দেখেছি রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের নায়িকারূপে। সেখানে নাটকের কাহিনী, ভাব ও অন্যান্য সহ-শিল্পীদের নৃত্যাভিনয় শিল্পীর আত্মবিকাশে অনেকখানিই সাহায্য করে। তাছাড়া সেখানে কোনো দৃঢ়নিবদ্ধ নৃত্যরীতি না থাকায় শিল্পী অনেকটা স্বাধীন।

প্রায় দু-ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে পূর্ণিমা দেখালেন আলারিপু, জাতিস্বরম, শব্দম বর্ণম, পদম, তিল্লানা নটনাম আডিনার কৃষ্ণানী বেগম।

ভারতনাট্যমের শিল্পীর পক্ষে যা যা দরকার (আয়তনেত্র, সুঠাম দেহ, সৌন্দর্য-সমৃদ্ধ মুখশ্রী) সব চাহিদাই পূর্ণিমা পূর্ণ করেছেন। এর সঙ্গে মিশেছিলো তাঁর শিক্ষা ও অনুশীলন। তাই প্রতিটি মুহূর্তই হয়ে উঠেছিলো ভরাট, উপভোগ্য।

যতিস্বরম ও তিল্লানার রূপক ও তিস্রম তালের ছন্দে পদক্ষেপ, মুদ্রা ও মুখ-ভাবের অভিব্যক্তিতে তাঁর প্রকাশব্যাকুল শিল্পীচিত্তটির প্রতিফলন ঘটেছিলো পদম অঙ্গে 'ইন্দেন্দু', 'কৃষ্ণাণী বেগম' ও 'মথুরা নগরিলো'—নৃত্যগুলিতে শিল্পীর অভিনয় ও নৃত্যকুশলতার সমন্বয়মুগ্ধকারী।

দক্ষিণ ভারতীয় নানা রাগে (পানথু-বড়ালী, কাম্বোজী, আনন্দভৈরবী কানাড়া সুরুটি, যামিনী কল্যাণী, বসন্ত)

শ্রীমতী অপর্ণা চট্টোপাধ্যায় গুরু জ্ঞান-প্রকাশের সঙ্গে কুশলী দক্ষতায় কণ্ঠদান করেছেন। জায়গা বিশেষে তাঁর একক সঙ্গীতও শ্রুতিমধুর।

মৃদঙ্গমে সঙ্কীরনম, রূপকম, মিশ্রম আদি ও তিস্রম তালের সঙ্গতে ক্ল্যাসিক্যাল পরিবেশ সৃষ্টি করেন নাগরাজম শ্রীএস আর

সাধন। বীণা, বেহালা, তানপুরা ও বেহালা সঙ্গতে ছিলেন সর্বশ্রী বীরভদ্র রাও, পি-এ কাবেরী, অজিত নন্দী। আলোয় আশুতোষ বড়ুয়া, সজ্জায় রূপসজ্জায়। ভাষ্য পাঠ করেছেন সুনন্দা মুখোপাধ্যায়।

নটরাজ প্রযোজিত 'চিত্রাঙ্গদা' : নটরাজ প্রযোজিত চিত্রাঙ্গদা রবীন্দ্রসদনে সম্প্রতি মঞ্চস্থ এক উল্লেখযোগ্য নৃত্যনাট্য। বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদার নারীচিত্তের জাগরণ ও তাঁর অন্তরের যুগ্ম সত্তার সমন্বয়সাধন এ দুটি দিকের যথাযথ রূপায়ণ ঘটিয়েছেন নৃত্যে যথাক্রমে অলকানন্দা রায় ও মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রেমিক ও বীর অর্জুনের এই দুটি দিকের মধ্যে প্রথমটি নিখুঁত ছবি হয়ে ওঠেন নৃত্যকুশলী কুণাল দত্ত। মদনপুরী সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মদনের কৌতুকরূপে বাস্তব হয়ে উঠেছিলেন। সহচরীদের নৃত্যে ছিলেন রূপা, সম্পা, দেবযানী অদিতি অরুন্ধতী, সুস্মিতা, কুমকুম তম্পা শুভ্রা।

এ অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ গান। কুরূপা চিত্রাঙ্গদার অন্তরালে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র ও সিন্ধা। তাঁর গানের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সুন্দরী চিত্রাঙ্গদার ললিতমধুর গানগুলি সুন্দর গেয়েছেন স্নিগ্ধা ঘোষ।

অর্জুনের গানে ধীরেন বসুর অংশগ্রহণ এই প্রথম। স্বভাবানুগ দক্ষতা ও ভাববিন্যাসে ইনি অর্জুনের বক্তব্য গানের ভাষায় রসিকচিত্তে পৌঁছে দিয়েছেন। মদনের গানে সুশীল মল্লিক মানানসই।

সমবেত গানে ছিলেন সীমা, পৃথিবী, রীণা মণিকা, ভাস্বতী দীপিকা, বন্যা ও অনুরাধা। নৃত্য ও সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন মিনতি ঘোষ ও স্নিগ্ধা ঘোষ। ভাষ্যপাঠ করেছেন মিনতি গুহ ও অরিজিৎ গুহ।

গড্ডালিকা প্রবাহে যে জীবন নিত্য প্রবাহিত সেখানে তার বেদনা, যন্ত্রণা, দৈনন্দিন টুকরো স্মৃতি প্রায়শই আমাদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে যায়। আমরা আমাদের

সুকমলকান্তি ঘোষের সঙ্গে পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়, প্রীতি চট্টোপাধ্যায় এবং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

অবস্থাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারি না। তাই নিজেকে চিনতেও ভুল হয়ে যায়, বিস্মরণ ঘটে।

কিন্তু সেই সূক্ষ্ম তন্ত্রীতেও হঠাৎ কখনও নাড়া পড়ে। আমরা আমাদেরই দেখে সন্ত্রস্ত হই, অবাক মানি।

সেই অবাক হবার আয়নার কাজ করছে আজকের গ্রুপ থিয়েটার পরিবেশিত নাটকগুলি।

অথচ এই গ্রুপ থিয়েটারগুলিরই, তারা যতই দর্শক, সমালোচকের প্রশংসা কুড়োক না কেন, তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাটা এখনও রীতিমত কষ্টসাপেক্ষ।

এই খেদ এবং আশঙ্কা প্রায় সব নাট্যগোষ্ঠীর মুখেই শুনেছি।

হিন্দী, বাঙলা সিনেমা এবং পাবলিক থিয়েটারে যেমন আগ্রহ করে দর্শকরা অংশ গ্রহণ করতে যান, এঁদের নাটক দেখার প্রতিও যদি আমাদের দেশের সুকুমার দর্শকরা সহানুভূতিশীল মন নিয়ে এগিয়ে যান, তাহলে মনে হয় এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাগুলি বেঁচে ওঠে, তেমনি দর্শকরাও নতুন কিছু ভাবনার অংশীদার হয়ে লাভবান হন।

আজকে নাটক দেখা আর শুধুমাত্রই বিনোদনের ব্যাপার নয়, অন্তত একালের বিশিষ্ট নাট্যগোষ্ঠীর নাটক তো নয়ই। প্রায় নাটকেই এমন একটা ভাবনার প্রাধান্য থাকে, যার ওপর হালআমলের ব্যক্তিচরিত্র, এবং গতিপ্রকৃতি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থার ছাপ স্পষ্ট।

একথা আমার ইদানিংকার নাটকগুলি দেখতে দেখতে বার বারই মনে হয়েছে।

সব যেমন ধ্রুব সত্য হয় না, তেমনি সব মতের সঙ্গে একাত্ম হওয়াও সবার পক্ষে সম্ভব না হলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা আমাদের ভালো লাগে বইকি।

তাই এইসব অ-ব্যবসায়িক নাট্যসংস্থাসমূহের বাস্তবধর্মী নাটক দেখার প্রতি সাধারণ দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হলে এই প্রচেষ্টাগুলি যেমন বাঁচবার আশ্বাস পাবে, তেমনি আমাদের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধও বৃদ্ধি পাবে।

ডানকুনিতে মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান : প্রতি বছরের মত এবারেও পৌষ সংক্রান্তির দিনে ডানকুনি দশম দ্যা আশ্রমে বাকসিদ্ধ সাধক সর্বানন্দ দেবের শুভ সিদ্ধি দিবস প্রতিপালিত হয় আশ্রমাচার্য শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সর্ববিদ্যার তত্ত্বাবধানে। এই উপলক্ষে উদয়াস্ত কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় এবং পরের দিন এক মনোরম সঙ্গীতানুষ্ঠান দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন স্থানীয় ও বাইরের বহু শিল্পী যেমন : নিখিল বসু আরতি মুখার্জি সম্প্রদায় গীতা চক্রবর্তী গায়ত্রী সান্যাল সুকুমার গুড়ে জগন্নাথ দত্ত বিশ্বনাথ সর্ববিদ্যা প্রমুখ শিল্পীরা। তবে এদের মধ্যে তরুণ কণ্ঠশিল্পী নিখিল বসুর শ্যামাসঙ্গীত উপস্থিত শ্রোতাদের মনে বিশেষ রেখাপাত করে। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসমরেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

—চিত্রাঙ্গদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১৪ বর্ষ

অমৃত

৪০ সংখ্যা

ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য

Friday, 14th February, 1975. শুক্রবার, ১ ফাল্গুন, ১৩৮১

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মনি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীঅমলানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

দুর্নীতির দায়

ওয়াংচু কমিশনের রায় মেনে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে দুজন মন্ত্রীকে বিদায় করেছেন। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ নিয়ে টালবাহানা করেননি কিংবা কাউকে আড়াল দেবার চেষ্টা করেননি। এর আগে ভুষি কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী কাশীকান্ত মৈত্র পদত্যাগ করে গণতন্ত্রের সুস্থ নজীর স্থাপন করেছিলেন। এবারে সন্তোষ রায় এবং সুনীতি চট্টরাজও গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে স্বেচ্ছায় মন্ত্রিসভা থেকে চলে গেলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে দুর্নীতির অভিযোগ আজ নতুন নয়। এমন কি কোনো কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সংসদে উঠেছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কালবিলম্ব না করে তদন্ত কমিশন বসিয়েছিলেন অন্যত্র তা করা হলে সম্ভবত গুজরাটে বা বিহারে মন্ত্রিসভা ভাঙবার জন্য আন্দোলনের প্রয়োজনই হত না।

এ কথা ঠিক অনেক সময় রাজনীতিকদের চরিত্রহনন ও অপদস্থ করার জন্য নানারকম আজগুবি ও মিথ্যা অভিযোগও শত্রুপক্ষ করে থাকে। কিন্তু তা বলে সত্যিকারের সন্দেহ দেখা দিলে সে বিষয়ে চুপ করে থাকা কিংবা বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তা এড়িয়ে যাওয়া গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ভোটের জোরে তাকে হটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কোনো কোনো মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যখন উঠেছিল তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নজির দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চাপা দিতে চাননি। তাঁর এই সৎসাহস অতি বড় সমালোচকও স্বীকার না করে পারবেন না। বিদায়ী মন্ত্রীরা কোনোরকম নৈতিক ভ্রষ্টাচারে অভিযুক্ত না হলেও তাঁদের প্রভাব পরোক্ষভাবে স্বজনপোষণে সহায়তা করেছে কমিশনের সাক্ষ্যে তা প্রতীয়মান হয়েছে। গণতন্ত্রে মন্ত্রীদের সবরকম সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে হয়। সামান্য সন্দেহ হলেই চলে যেতে হয় তাঁদের। এত বড় শক্তিমান মার্কিন প্রেসিডেন্টকেও বেআইনী কার্যকলাপের নৈতিক দায়িত্ব মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছে। ইংলণ্ডের প্রফিউমো নামে এক মন্ত্রীকে পার্লামেণ্টে সত্য গোপন করে মিথ্যা ভাষণ দেবার জন্য শুধু মন্ত্রিসভা থেকেই নয়, রাজনীতি থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল বছর দশেক আগে। দুঃখের কথা এই যে, আমাদের দেশে মন্ত্রীরা আত্মসমালোচনা জানেন না, দোষ স্বীকার করে নিতে অভ্যস্ত নন। পদত্যাগ তো করতেই জানেন না। পশ্চিমবাংলার দুই বিদায়ী মন্ত্রী অবশ্য কমিশন বসার পরেই পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের অপেক্ষা করতে বলেছিলেন কমিশনের রায় বের হওয়া পর্যন্ত।

জনসাধারণের সামনে একটি সুস্থ নজীরই তাঁরা স্থাপন করলেন অন্য যেসব মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং জনসাধারণ এটাও বুঝতে পারল কোন কোন অভিযোগের সারবত্তা ছিল না। সিদ্ধার্থশংকর রায় বহুবার এই কথা জনসাধারণের সামনে বলেছেন, আমাদের ভুল হতে পারে। কিন্তু আন্তরিকতার অভাব নেই এবং ভুল স্বীকার করতেও আমাদের লজ্জা নেই। কংগ্রেসের ভিতরে যে উপদলীয় কলহ আছে অনেকে এই অভিযোগগুলোকে তারই একটা বহিঃপ্রকাশ বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তা মনে করে দলকে বাঁচাতে চাননি। কমিশনে নানারকম অভিযোগ উঠেছিল এবং তাতে সত্যমিথ্যা অনেক কথাই বলা হয়েছিল। কংগ্রেসের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাবে, এই ভয়ে মুখ্যমন্ত্রী কমিশন বসানো থেকে পিছিয়ে আসেননি। এর দ্বারা বিরোধীদের মুখও তিনি বন্ধ করে দিলেন। দুর্নীতি বলে শুধু না চেঁচিয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগ দিলে যে তার তদন্ত হয় এবং প্রতিকার হয় ওয়াংচু কমিশন তার প্রমাণ।

অবশ্য একথা বলা যাবে না যে দুজন মন্ত্রী বিদায় নিয়েছেন বলেই সমস্ত দুর্নীতির অবসান ঘটে গেল। দুর্নীতির চেহারা সব সময় একরকম থাকে না এবং শুধু মন্ত্রীদের স্তরেই তা সীমাবদ্ধ নয়। আমলাতন্ত্রকেও সব সময় কড়া নজরে রাখা প্রয়োজন। দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার ভারতের জনজীবনকে কলুষিত করে তুলছে। জনসাধারণের প্রধান ক্ষোভ তারই বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা জানে যে, প্রতি পদে উৎকোচ না দিলে কোনো কাজই হাসিল হয় না এদেশে। ওপরমহলের সঙ্গে চেনাজানা না থাকলে ন্যায্য কর্মও সমাধা করা যায় না। দুর্নীতির বিরোধিতা করেও নানারকম দুর্নীতিকে পরোক্ষে প্রশ্রয় দিই আমরা। কারণ এ না করে কোনো উপায় থাকে না। একেবারে নিচুতলা থেকে ঊর্ধ্বতন মহল পর্যন্ত এর প্রসার। একে সমূলে উৎপাটিত করতে না পারলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ সাফল্যমণ্ডিত করতে পারবে না তা বলাই বাহুল্য।

খুড়ের টুকরা

বনফুল

তিনুবাবু অবশেষে হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে ছোট ভাই বিনুর কাছেই তাঁহাকে এই-বার যাইতে হইবে। গত্যন্তর নাই। ক্রিকেট খেলিতে গিয়া একটি পা আগেই খোঁড়া হইয়াছিল। যে চাকরিটি করিতেন সেটি হইতেও অবসর লইয়াছেন কিছু দিন পূর্বে। এখন মাসে একশত টাকা করিয়া পেন্সন পাইতেছেন। তাহাতে তাঁহার কোনক্রমে চলিয়া যাইতেছিল। তিনু মূর্খ নন। তিনি সেকালের বি-এ পাশ। তাঁহার মা-ই তাঁহাকে স্কুল কলেজে পড়াইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে কিছু জমিজমাও বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। নিজের গহনাগুলিও তিনি বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল ছেলেও বাবার মতো পণ্ডিত হোক। তিনু ও বিনুকে লইয়া তিনি যৌবনেই বিধবা হন। মায়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া তিনু বি-এ পাশ করিলেন কিন্তু বিনুর লেখা-পড়া বিশেষ কিছু হইল না। সে [illegible] স্কুল হইতে ম্যাট্রিকের পরীক্ষাটাও পাশ করিতে পারে নাই। তিনু লক্ষ্ণৌ শহরে [illegible] করিতে লাগিলেন, বিনু গ্রামেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

তিনু বিবাহ করেন নাই। একটু শৌখীন গোছের লোক ছিলেন তিনি। গিলা-করা আদ্দির পাঞ্জাবী পরিতেন, গোঁফে আতর লাগাইতেন, বাহারে নাগরা জুতা পায়ে দিতেন, ব্যবহার করিতেন নানা রকম শৌখীন ছড়ি। মা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তাঁহাকে মাসে মাসে পঁচিশ টাকা করিয়া নিয়মমত পাঠাইতেন তিনি। মায়ের মৃত্যুর পর আর নিয়মিত পাঠাইতেন না, মাঝে মাঝে বিনুকে কিছু পাঠাইতেন। এ দশ বছর তিনি দেশেও যান নাই। মাঝে মাঝে বিনুর সহিত পত্রালাপ অবশ্য হইয়াছে। চাকুরি হইতে অবসর লওয়ার পরও তিনি দেশে ফিরিয়া যাইবার কল্পনা করেন নাই। আর কমিয়া যাওয়াতে বিনুকেও আর তিনি টাকা পাঠাইতে পারিতেন না। বিনু বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ছেলেমেয়ে হয় নাই। বউটি বন্ধ্যা। বিনুর আর একটি বিবাহ দেবার ইচ্ছা ছিল তিনুর। কিন্তু সেজন্য টাকার দরকার। সেই টাকাটা সংগ্রহ করিবার জন্য তিনু একটি টিউশনি জোগাড় করিয়াছিলেন। এই টিউশনিটাই তাঁহার কাল হইল। যে বাড়িতে টিউশনি লইয়াছিলেন সেখানে যাইবার একটি শর্টকাট রাস্তা ছিল রেল লাইন পার হইয়া। সেই রেল-লাইন পার হইতে গিয়া তিনি একদিন রেলে চাপা পড়িলেন।

প্রাণ গেল না, হাত দুইটি গেল। দুই হাতেরই কনুই পর্যন্ত কাটিয়া ফেলিতে হইল।

হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া তিনি বিনুকে খবর দিলেন—আমি বড় বিপন্ন আমাকে আসিয়া লইয়া যাও। হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে যতদিন বাঁচিতে হইবে সে কয়দিন বিনুরই গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে তাঁহাকে। তাঁহার হৃৎপিণ্ডটা যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। এতদিন যে স্বাধীন নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করিয়াছেন তাহা সহসা মরীচিকার মতো মিলাইয়া গেল। লক্ষ্ণৌ শহরে এতদিন বাস করিয়াছেন বাংলাদেশের সেই স্যাঁতসেঁতে পাড়াগাঁয়ে কি আর বাস করিতে পারিবেন? বাড়িতে মা নাই। মা-ই ছিল বাড়ির প্রধান আকর্ষণ। বিনুর কাছে যাওয়ার উৎসাহ কিসের কারণ সে

বিনুরে আবার বিবাহ দিতে চাহিয়াছে। বিনু তো সমস্ত দিন মাঠে থাকে। সেখানে তাহার সেবা করিবে কে? সেখানে কি লছমনের মতো চাকর জুটিবে? লছমনকে সেখানে লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। সেখানে সংগীই বা কে হইবে তাহার? এইরূপ নানা চিন্তায় মনটা তাঁহার আচ্ছন্ন হইয়া গেল। একটা অন্ধকার ভবিষ্যৎ তাঁহার চোখের সামনে ঘনাইয়া উঠিল। অসহায়ভাবে মায়ের মুখটাই তিনি বার বার স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে কোন আলো তিনি দেখিতে পাইলেন না। তখন পাইলেন মা কিন্তু পরে পাইয়াছিলেন। তাহা লইয়াই এই গল্প।

স্টেশন হইতে গরুর গাড়ি বাহিত হইয়া তিনু যখন তাঁহার গ্রামের বাড়িতে পৌঁছিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। তিনু দেখিয়া বিস্মিত হইলেন বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো জ্বলিতেছে। 'এদিকে ইলেকট্রিক এসেছে নাকি?'

বিনু সহাস্যে বলিল, 'এসেছে। আমি নিয়েছি।' গাড়োয়ানের সাহায্যে বিনু তিনুকে লইয়া গিয়া ঘরে একটি চৌকির উপর বসাইল। সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার।

'যাঃ লোড শেডিং হয়ে গেল। ইদানীং বড্ড বেশী হচ্ছে। ওগো কোথা গেলে। দাদা এসেছে একটা আলো আন—'

বিনুর স্থূলকায়া পত্নী বেশ কিছুক্ষণ পরে একটি কেরোসিনের আলো লইয়া প্রবেশ করিল এবং তিনুর পায়ের কাছে আসিয়া ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিল। মুখে ঘোমটা দেওয়া ছিল তিনু তাহার মুখটা ভালো করিয়া দেখিতে পাইলেন না। প্রণাম করিয়া বিনুর বউ চলিয়া গেল। বিনু আবার উচ্চকণ্ঠে বলিল,—'শুনছ — দাদাকে একটু মোহন ভোগ করে দিও। আমি ছিরু জেলের বাড়ি যাচ্ছি। তাকে কিছু মাছ রাখতে বলেছিলাম। দাদা তুমি বিশ্রাম কর আমি মাছটা নিয়ে আসি—'

বিনু বাহির হইয়া গেল। লণ্ঠনে বোধহয় তেল ছিল না কয়েক মিনিট পরে সেটাও নিবিয়া গেল।

একা অন্ধকার ঘরে বসিয়া রহিলেন তিনু। তাঁহার মনে হইল যে অন্ধকার ভবিষ্যতে তাঁহাকে বাস করিতে হইবে তাহাই যেন মূর্ত হইয়াছে চোখের সামনে। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন তিনি। বিনু বা বিনুর বউ কাহারও দেখা নাই। খানিকক্ষণ পরে পদশব্দ শোনা গেল। বিনুর বউ একটি ছোট মাটির প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিল। সেটা ঘরের কোণে রাখিয়া দিয়া আবার চলিয়া গেল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা হাওয়া ঢুকিল। নিবিয়া গেল প্রদীপটা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় তিনু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। হতাশার সমুদ্রে একেবারে তলাইয়া গেলেন যেন। এমন সময় আশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটিল। সহসা আতরের গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরিয়া উঠিল। যে আতর তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে মাখিতেন সেই গোলাপী আতর। তাহার পর তিনি অনুভব করিলেন কে যেন তাঁহার পাশে আসিয়া বসিয়াছে। তাঁহার খুতনিতে হাত দিতেছে, কাহার বাহু যেন তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে। তিনুর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই ইলেকট্রিক আলোটা জ্বলিয়া উঠিল আবার। দেখিলেন ঘরে কেহ নাই। সহসা দেখিতে পাইলেন সামনের দেওয়ালে ময়ের একটা ফটো টাঙানো রহিয়াছে। সমস্ত মুখ যেন উদ্ভাসিত চোখের দৃষ্টি জীবন্ত। তিনুর বুকটা ভরিয়া উঠিল।

অলৌকিক? অসম্ভব?

হোক তবু তাঁহার মনে হইল আর ভয় নাই। এই অলীক খড়ের টুকরাটাকে ধরিয়া মজ্জমান তিনু মনে যেন অনেকটা বল পাইলেন। বার বার বলিতে লাগিলেন—আ আছেন, মা আছেন, মা আছেন

দেশে বিদেশে

শেখের প্রত্যাবর্তন

শেখ আব্দুল্লা ঠিক কবে থেকে ক্ষমতার আসনে বসবেন এবং বসলে পরে তাঁকে কাশ্মীরের "মুখ্যমন্ত্রী" বলে অভিহিত করা হবে অথবা "প্রধানমন্ত্রী," শুধু এটুকু বাদ দিলে, ২১ বছর পরে শের-ই-কাশ্মীরের ক্ষমতায় ফিরে আসার ব্যাপারে এখন অন্য কোন অনিশ্চয়তা নেই।

কেন্দ্রের সঙ্গে শেখ আব্দুল্লার যে রাজনৈতিক সমঝোতা হয়েছে তার রূপ দিতে এখন শুধু খুঁটিনাটি কতকগুলি বিষয়ে আলোচনা বাকি। এইসব আলোচনা শেষ হয়ে গেলেই কাশ্মীর বিধানসভার কংগ্রেস দলের সভা ডেকে শেখ আব্দুল্লাকে দলের নেতা নির্বাচিত করা হবে এবং তখন রাজ্যপাল তাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানাবেন।

শেখের সঙ্গে এই বোঝাপড়াকে স্বাগত জানিয়ে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী সৈয়দ মীর কাশিম বলেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শেখের সঙ্গে এই সংলাপ চালান হয়েছিল এবং "পুরান তিক্ততা যখন সবাই ভুলে যাবেন তখন সেটাই হবে কংগ্রেসের পক্ষে সবচেয়ে গৌরবময় মুহূর্ত।"

কিন্তু শেখ আব্দুল্লা ক্ষমতায় ফিরে আসার পর কাশ্মীরে কংগ্রেসের কি হবে? মুখ্যমন্ত্রী মীর কাশিম বলেছেন, কাশ্মীরে কংগ্রেস দল তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলবে, যদিও শেখ আব্দুল্লা তাঁর জাতীয় সম্মেলন দলটিকে জীইয়ে তোলার পক্ষপাতী।

শেখ আব্দুল্লাকে ডেকে এনে কাশ্মীরে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তোলায় সেখানকার কংগ্রেস মহলের সকলের যে সায় ছিল না, সেটা গোপন থাকে নি। এবিষয়ে যাঁদের মনে সংশয় ছিল তাঁদের একজন হলেন কাশ্মীরের ভূতপূর্ব রাজা ও রাজপ্রমুখ এবং বর্তমানে কাশ্মীর থেকে নির্বাচিত এম পি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ করণ সিং। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মহলের সবাই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

শেখকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কিছু সংশয় প্রকাশ করেছেন জম্মু ও লাদাখের প্রতিনিধিরাও। ভারতীয় লোকদল বলেছে, জম্মু ও লাদাখের মানুষ শেখকে কখনই তাঁদের প্রতিনিধি বলে মেনে নেন নি। সুতরাং তাদের মতে, কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন চুক্তি করার অধিকার শেখ আব্দুল্লার নেই এবং এরকম চুক্তি করে শেখকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার "গুরুতর পরিণাম" দেখা দেবে। কাশ্মীরের জনসঙ্ঘ নেতা ঋষিকুমার কৌশল বলেছেন, কাশ্মীরের বর্তমান তিনটি অঞ্চলের সীমানা অপরিবর্তিত রেখে শেখ আব্দুল্লা যদি জম্মু ও লাদাখের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অবসান করতে পারেন তাহলে জনসঙ্ঘ তাতে স্বাগত জানাবে।

কেন্দ্রের সঙ্গে শেখ আব্দুল্লার এই সমঝোতার ফলে কাশ্মীরে একটা রাজনৈতিক স্থায়িত্ব আসার সম্ভাবনাকে পাকিস্তান যে ভাল চোখে দেখছে না প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো তার জানান দিতে দেরি করেন নি। এই সমঝোতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য ভুট্টো কাশ্মীরবাসীদের হরতাল করতে আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবন এই আহ্বানকে কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ও সিমলা চুক্তির খেলাপ বলে অভিহিত করেছেন। শেখ আব্দুল্লা এই হরতাল রোখার জন্য তাঁর অনুরাগীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

কিন্তু পাকিস্তান-ঘেঁষা কোন কোন শক্তি কাশ্মীরে শেখ আব্দুল্লার কাজ কঠিন করে তোলার জন্য যে চেষ্টার কসুর করবে না তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ভুট্টোর হরতালের ডাক সম্পর্কে আওয়ামী অ্যাকশন কমিটির নেতা মৌলানা ফারুকীর নীরবতার মধ্যে। মৌলানা ফারুকী এখনও বলে চলেছেন, কাশ্মীরের জনগণ ও ভারতের মত পাকিস্তানও কাশ্মীর প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত এবং এই প্রশ্নের কোন কার্যকর সমাধান করতে হলে পাকিস্তানকেও তার শরিক করতে হবে।

শেখ আব্দুল্লা কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর মৌলানা ফারুকীর মত নেতাদের সম্পর্কে কি মনোভাব অবলম্বন করেন সেটা দেখার বিষয় হবে।

•

খোয়া-যাওয়া নটরাজ

১৯৫১ সালে তামিলনাড়ুর শিবপুরম মন্দিরের কাছে মাটি খুঁড়ে যেসব পুরান মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল সেগুলির মধ্যে একটি ছিল নটরাজের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি। গত বছর ডিসেম্বর মাসে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা পুলিশ লন্ডনের একটি গ্যারেজে ঐ মূর্তি খুঁজে পায়। আনুমানিক দশ লক্ষ ডলার মূল্যের সেই মূর্তি এখন লন্ডনের আদালতের নির্দেশে সেখানকার একটি ব্যাঙ্কের ভল্টে রয়েছে এবং ভারত সরকার, তামিলনাড়ু সরকার ও শিবপুরম মন্দিরের ট্রাস্টীরা ঐ মূর্তি উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য লন্ডন, [illegible] ও [illegible]
[illegible]

কোল যুগের প্রথম দিককার এই মূর্তিটি যে শিবপুরম মন্দির থেকে খোয়া গিয়েছে এবং ঐ মন্দিরে এখন যে নটরাজ মূর্তি রয়েছে সেটি যে মূল মূর্তির আধুনিক নকল এটা প্রথম ধরা পড়ে ১৯৬৫ সালে একজন বৃটিশ বিশেষজ্ঞের লেখা বই থেকে। আসল মূর্তিটি বিদেশে একজন ব্যক্তিগত সংগ্রাহকের কাছে রয়েছে, বৃটিশ বিশেষজ্ঞের লেখা বই থেকে সেই খবর পেয়ে মাদ্রাজ মিউজিয়মের শ্রীপি আর শ্রীনিবাসন কথাটা তামিলনাড়ু সরকারকে জানান। তখনই খোঁজ খোঁজ পড়ে যায়। অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, নটরাজ ও অন্যান্য কয়েকটি মূর্তি মেরামত করতে নিয়ে গিয়ে এক ব্যক্তি আসল মূর্তিগুলি রেখে দিয়ে মন্দিরে নকল মূর্তিগুলি গছিয়ে দিয়েছিলেন। সেই শিল্পী এমন দক্ষতার সঙ্গে এই বদলের কাজটা করেছিলেন যে, সেই সময়ে আসল-নকল চিনে নেওয়া যায় নি। ঐ মূর্তিগুলি প্রথমে কিনেছিলেন একটি বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের একজন বৃটিশ কর্মচারী। বার চারেক হাত ফেরতা হয়ে নটরাজ মূর্তিটি দিল্লিতে আসে। প্রতিবার হাত বদলের সময়েই বেশ কিছু টাকার লেনদেন হয়। একবারই ৫ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছিল বলে জানা গেছে। ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে নিউইয়র্কের একটি ভূয়া ঠিকানায় মূর্তিটি বিমানযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যে নামে মূর্তিটি পাঠান হয়েছিল তার তরফ থেকে এক ব্যক্তি এসে নিউইয়র্ক থেকে মূর্তিটি ছাড়িয়ে নিয়ে যান। শুল্ক কর্তৃপক্ষ তাঁকে কোনরকম প্রমাণপত্র ছাড়াই মূর্তিটি ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে দিলেন কেন সেটা একটা রহস্য।

১৯৭৩ সালে আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় যে, ১৯৭২ সালে নর্টন সাইমন নামে একজন কোটিপতি আমেরিকান ঐ মূর্তিটি বেন হেলার নামে আর একজনের কাছ থেকে কিনেছেন দশ লক্ষ ডলার দিয়ে। এই সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই ভারত সরকার চুরি-করা মূর্তিটি দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য তৎপর হয়েছেন।

•

"পিংপং কূটনীতির" আসর

বছর দুয়েক আগে পিকিং-এ আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা উপলক্ষ করে চীন বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ভাবসাব করার একটা নতুন অধ্যায় শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে এই ঘটনা চীনের "পিংপং কূটনীতি" বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। কলকাতায় আসন্ন আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আসরেও যে সেই "পিংপং কূটনীতি"র জের চলবে, বিশেষ করে ভারত-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার কিছু কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

একটি লক্ষণ হল এই যে, কলকাতায় চীন টেবিল টেনিস প্রতিনিধি দলকে যে [illegible] তাঁরা বিলক্ষণ

খুশি হয়েছেন। কলকাতা থেকে সরকারি চীনা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'সিনহুয়া'র প্রতিনিধির পাঠান বিস্তারিত রিপোর্টেই সেই খুশির ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে। দমদম বিমানবন্দরে চীনা প্রতিনিধিদলকে যে হিন্দী-চীনী ভাই ভাই স্লোগানের দ্বারা সম্বর্ধিত করা হয়েছিল, সেকথা উল্লেখ করতে গিয়ে সিনহুয়া এক যুগের মধ্যে এই প্রথম ঐ পুরান বিস্মৃতপ্রায় স্লোগানটির পুনরাবৃত্তি করল। চীনা প্রতিনিধিদলের নেতা চাও চেং-হুং দমদম বিমানবন্দরে দুই দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বের ঐতিহ্যের উল্লেখ করে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটি পিকিং বেতার কেন্দ্র থেকে বহু ভাষায় প্রচার করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষকরা লক্ষ্য করেছেন, মিঃ চাও-এর এই বিবৃতির খসড়া পিকিং-এ তৈরি হয়েছিল এবং সেখানকার সরকারও পার্টির পদাধিকারীরা এই খসড়া অনুমোদন করেছেন। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেছেন, চীনা প্রতিনিধিদলে এমন কিছু সদস্য আছেন যাঁরা সরকারিভাবে আলোচনা করার অধিকারী না হলেও দেশে ফিরে রাজনৈতিক রিপোর্ট দাখিল করতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে একই সময়ে প্রকাশিত চারটি রিপোর্ট লক্ষ্য করার মত:—(১) চীন নকশালপন্থীদের থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছে। (২) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি রিপোর্টে প্রকাশ যে, নকশালপন্থীদের যে গোষ্ঠীটি এখনও চরমপন্থী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তারা লিন পিয়াও-য়ের অনুগামী (৩) ডানিয়েল লাতিফ (ইনি সম্পর্কে একটি বেসরকারি ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে চীন সফর করে এসেছেন) লিখেছেন, পিকিং অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে ইয়ে চিয়েন-ইং-এর প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ ভারত-চীন সম্পর্কের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, লিন পিয়াও-য়ের সমর্থকরা এতদিন পর্যন্ত চৌ-এন-লাইকে ভারতের প্রতি "অতিরিক্ত বন্ধুত্ব" দেখাবার জন্য যে সমালোচনা করছিলেন সেই সমালোচনা এখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। (৪) এদিকে, সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান এ-পি-এন-এর একটি সংবাদভাষ্যে চীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সে ভারত, বাংলাদেশ, বর্মা ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সরকার-বিরোধী শক্তিগুলিকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিচ্ছে। এই প্রসঙ্গে এ-পি-এন নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের প্রতি চীনের সমর্থনের উল্লেখ করেছে।

জব্বলপুর থেকে বিপদসংকেত

ইতিমধ্যে লোকসভার জব্বলপুর আসনে উপ-নির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেস নেতাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। গত অর্ধ শতাব্দীকাল যাঁরা আসনটি কংগ্রেসের হাতে রেখে দিয়েছিলেন শেঠ গোবিন্দ দাস। লোকসভার এই প্রবীণতম সদস্যের মৃত্যুর পর আসনটি শূন্য হয়েছিল। উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন শেঠ গোবিন্দ দাসের পৌত্র রবি মোহন। জনতা পক্ষ-এর প্রার্থী শারদ যাদব তাঁকে প্রায় ৮৮ হাজার ভোটে হারিয়ে দিয়ে কংগ্রেসের এই পুরান আসন ছিনিয়ে নিয়েছেন। শ্রীযাদব সমাজতন্ত্রী দলের লোক। কিন্তু দলের নামে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। জয়প্রকাশের প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন কোন দলের ছাপ না নিয়ে জনতার প্রার্থী হিসাবে। কংগ্রেস প্রার্থী সি পি আই-এর সমর্থন পেয়েছিলেন। অন্য দিকে শ্রীযাদবের পক্ষে ছিল অন্য সব বিরোধী দলের সমর্থন।

শ্রীযাদবের বয়স মাত্র ২৯ বছর। লোকসভায় তিনিই হবেন সর্বকনিষ্ঠ সদস্য।

যে সব কারণে এই উপনির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেসের পক্ষে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেগুলি হল: (১) ৫০ বছরের পুরান একটি সুনিশ্চিত আসন এই প্রথম কংগ্রেসের হাত-ছাড়া হয়ে গেল। এই লোকসভা আসনের অন্তর্ভুক্ত আটটি বিধানসভা কেন্দ্রের সব কটিই ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের দখলে এসেছিল। আর এবার লোকসভার নির্বাচনে ঐ আটটি কেন্দ্রের সব কটিতেই কংগ্রেস প্রার্থী নির্দলীয় 'জনতা পক্ষ' প্রার্থীর চেয়ে কম ভোট পেয়েছেন। (২) এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত আটটি নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে অন্তত পাঁচটিই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। এইসব কেন্দ্রেই কংগ্রেসের পরাজয় ঘটার প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, শহরে কিছু বিক্ষোভ হলেও গ্রামে এখন পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রভাব অক্ষুণ্ণ আছে বলে এতদিন যে দাবী করে আসা হয়েছে সেটা কি অতঃপর মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল? (৩) মাত্র মাসখানেক আগে মধ্যপ্রদেশে আর একটি উপনির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। ভূপালের শহরতলীর গোবিন্দপুর বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের ঐ উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর যে পরাজয় হয়েছে এবং দিল্লী মেট্রোপলিটান কাউন্সিলের সাম্প্রতিক নির্বাচনে জনসঙ্ঘ যে কংগ্রেসের হাত থেকে দুটি আসন ছিনিয়ে নিয়েছে এ-সব ঘটনা মিলিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা পাল্টা স্রোতের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কিনা? (৪) জব্বলপুরে এবং তার আগে গোবিন্দপুরেও জয়প্রকাশের পরামর্শমত নির্দলীয় 'জনতা পক্ষ' প্রার্থী দাঁড় করিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করা হয়েছে। এই দুজন 'জনতা' পক্ষ প্রার্থীর জয় ইন্দিরা তরঙ্গে ভাঁটার টানও জয়প্রকাশের রাজনীতির অনুকূলে নতুন স্রোত সূচিত করছে কিনা?

মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস মহল অবশ্য এখনও এই পরাজয়কে ইন্দিরা-বিরোধী নতুন তরঙ্গের সূচনা বলে স্বীকার করতে রাজি নন। ব্যর্থতার দায়িত্ব নিজের উপর আরোপ করে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশচন্দ্র শেঠী বলেছেন এই উপনির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নীতি প্রত্যাখ্যাত হয় নি তিনি নিজে নির্বাচনের সংগঠন ঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারেন নি। এই ব্যর্থতার জন্য দলের হাই-কম্যান্ডের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যেতে প্রস্তুত আছেন। শ্রীশেঠী বলেছেন এটা যদি জয়প্রকাশেরই জয় হবে তাহলে নির্বাচনী অভিযানের সময় জয়প্রকাশ একদিনও এই নির্বাচন কেন্দ্রে আসেন নি কেন?

কংগ্রেসের এই পরাজয়ের যে সব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে আছে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীরা দলের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে কাজ করেছেন, (মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বলেছেন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের সঙ্গে সি আই এ-র যোগসাজস ছিল) গ্রামের লোকরা লেভির বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন (মুখ্যমন্ত্রী শেঠী যাতে হেলিকপ্টারে যাতায়াত করে নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা করতে পারেন সে জন্য এই নির্বাচন কেন্দ্রের ভিতর আটটি হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু গ্রামের মানুষদের বাধা দানের ফলে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার সব জায়গায় নামতে পায় নি।) পিতামহের শূন্য আসনে পৌত্রকে মনোনয়ন দিয়ে একটা বংশানুক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে কংগ্রেস ঠিক করে নি, কংগ্রেসের পক্ষে এই ধরনের একটি নির্বাচন কেন্দ্রে সি পি আই-এর সমর্থন নেওয়া ঠিক হয় নি ইত্যাদি।

জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছেন জব্বলপুরে শারদ যাদবের জয় 'বিহারের সংগ্রামের প্রতি জনগণের সুনিশ্চিত সমর্থন' সূচিত করছে। বিরোধী দলগুলিকে তিনি এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, উপনির্বাচনের এই ফলাফলকে তাঁরা যেন যুক্তফ্রন্টের রাজনীতির জয় বলে গ্রহণ না করেন। কেননা 'এই দেশের সংগ্রাথিত জনগণ যুক্তফ্রন্ট ও মহাজোটের রাজনীতিকে পিছনে ফেলে এসেছে।...সারা দেশে জনগণের জাগরণ না হলে এবং গুজরাট ও বিহারে জনগণ ও যুব সম্প্রদায়ের সংগ্রাম না হলে গোবিন্দপুরে ও জব্বলপুরের মত এমন বিরাট জয় হতে পারত না।'

জব্বলপুরের উপনির্বাচনের তাৎপর্য বিচার করার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকা হতে পারে বলে প্রকাশ। পর্যবেক্ষকদের অনুমান এই উপনির্বাচনের ফলাফল দেখে কংগ্রেস নেতারা এখন লোকসভার আচমকা নির্বাচনের কল্পনা বাতিল করে দিতে পারেন।

—পুণ্ডরীক

৩-২-৭৫

পটভূমি

সি পি আইর নয়া কৌশল

সি পি আই-র বেজোয়াদা কংগ্রেসে অনুসৃত রাজনৈতিক রণকৌশলের একটু ছাটকাট করতে হয়েছে। কেরল-ধাঁচের সরকার যেখানে সম্ভব শুধু সেই রাজ্যেই সি পি আই সচেষ্ট হবে। কিন্তু কেন্দ্র সম্পর্কে এখন পার্টি নীরব। পার্টির সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে যেখানে কংগ্রেসে বামপন্থী শক্তি শক্তিশালী সেখানেই কেরল-ধাঁচের সরকার সম্ভব। —এটা কোথায় সম্ভব তার জবাবে তিনি বলেছেন যে, দক্ষিণ ভারতে এর সম্ভাবনা।

কেরলের পর এরা অন্ধ্র রাজ্যের কথা এখন ভাবছে। কিন্তু কেরলের ভবিষ্যৎ কি? তা অবশ্য শ্রীরাজেশ্বর রাও তার জবাব দেননি।

পার্টি এখন বামপন্থী ঐক্য সম্প্রসারিত করার জন্য একদিকে সি পি এম অপরদিকে কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের তোয়াজ করছে। এবার স পি আই কংগ্রেসের ভেতরকার মধ্যপন্থীদের সঙ্গে আন্তরিকতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ তারা বেশ শক্তিশালী।

সি পি আই-র অবস্থা এখন ত্রিশংকু। একমুখেই এরা কংগ্রেস সরকারের বিরোধী সমালোচক এবং স্তাবক। পার্টির এই চরিত্র বা চেহারা অনেক কর্মীই পছন্দ করে না। তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য পার্টি এবার বৃহত্তর বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের নামে সি পি এম-কে মিত্র হিসাবে পাওয়ার প্রস্তাব পাশ করেছে। কিন্তু সি প এম এই আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না।

কংগ্রেস একটা বিরাট প্ল্যাটফর্ম। এটা একটা রাজনৈতিক দল নয়। কাজেই কংগ্রেসের ভেতরে বহু বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর স্থান আছে।

কংগ্রেসের এক বড় অংশ মনে করছে সি পি আই-র সঙ্গে কংগ্রেসের মধুরে সম্পর্কের দিন ফুরিয়ে আসছে। কারণ কংগ্রেসের অভিভাবকের ভূমিকায় সি পি আই-কে কেউ পেতে চায় না। সি পি আই কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংঘাতকে পার্টির শক্তিবৃদ্ধির কাজে লাগাক এটাও কেউ পছন্দ করে না। কংগ্রেস সি পি আই-র সহযোগিতা নিশ্চয়ই নিতে রাজী। কিন্তু আদর্শের বিনিময়ে নয়। তাই সি পি আই নেতৃত্ব বিচলিত। এখন কংগ্রেসের ভেতরে সি পি আই-র সমর্থক ও বিরোধীদের ঝগড়া বৃদ্ধির কৌশল সি পি আই জোরকদমে চালু করায় কংগ্রেসী মহল উদ্বিগ্ন নয় এমন বলা চলে না।

কংগ্রেস নেতৃত্বের এক বড় অংশ কংগ্রেসের ভেতরে সি পি আই পন্থীদের অনুপ্রবেশের বিরোধী। এ-বিষয়ে ভিন্ন মতও দলে আছে। নারোরা কংগ্রেস শিবিরে নাকি ওড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী শতপথী ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজেল সিং এই ভিন্ন মতাবলম্বীর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মন্ত্রিসভায় কম্যুনিস্টদের নেওয়ার বিরোধী নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় সম্পূর্ণ বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই-র সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশনের সম্ভাবনা নেই। আঁতাতও ভেঙে গেছে। সি পি আই উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসবিরোদী আন্দোলন চালাচ্ছিল। উদ্দেশ্য বহুগুণা সরকারকে হাতে রাখা। কারণ কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুব স্বল্প। কিন্তু কিছু নির্দলীয় ও বি কে ডি সদস্য কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় আর শ্রীবহুগুণাকে সি পি আই-র উপর সরকার চালাবার জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে না। সি পি আই কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাতের কথা যেমন বলেন, তেমনি বিরোধিতার কথা বলেন। সি পি আই গুজরাটে গণ-সংগ্রাম সমর্থন করেছে অন্ধ্রে মহারাষ্ট্রে সরকারের বিরোধিতায় রয়েছে কিন্তু মাদ্রাজে কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতার পথ নিয়েছে। সি পি আই বিহারে সরকার ও কংগ্রেসবিরোধী ও পান্ডে মন্ত্রিসভার বিরোধী মনোভাব নিয়ে ছিল, এখন কংগ্রেসের গফুর মন্ত্রিসভার সমর্থক ও কংগ্রেসের সাথী। অর্থাৎ সি পি আই নির্বাচনী সাফল্য ও প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ কাজে লাগাবার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে থাকতে চায়। কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক বজায় রেখেও সি পি আই নিজস্ব বিরোধী ভূমিকা নিয়েও চলতে চায়। এখানেই সি পি আই-র ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যায়নের অসুবিধা।

জয়প্রকাশ পরিচালিত বিহার ও অন্যান্য রাজ্যের গণ-আন্দোলনের মোকাবিলায় কংগ্রেসের সাথী হিসাবে সি পি আই-র উপস্থিতি বিভিন্ন মহলকে বিচলিত করেছে।

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণকান্ত বলেছেন যে জয়প্রকাশজী নয় সি পি আই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে হটাতে চায়। তাঁর অভিযোগ : সি পি আই আবার কংগ্রেসকে দু টুকরো করতে চায়।

সি পি আই কংগ্রেসের রায় হল জয়প্রকাশই পয়লা নম্বর শত্রু।

এই সুরেই কয়েকদিন আগে কংগ্রেসের শ্রীশশিভূষণ কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছেন কংগ্রেসের ভেতরেও কিছু জয়প্রকাশ সমর্থক আছেন। এঁদের কংগ্রেস থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার।

তিনি কংগ্রেস ও কমুনিস্ট পার্টির মধ্যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সমঝওতা চান।

সি পি আই ও তার কৌশল সম্পর্কে কংগ্রেসের ভেতরে যেমন দুটো মত গেছে, তেমনি সি পি আই-র ভেতরেও দ্বন্দ্ব স্পষ্ট।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই সম্মেলনের পর্যালোচনায় ধরা পড়েছে যে অনেকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক আর চায় না। কিন্তু তবুও সরকারী প্রস্তাবে একসঙ্গে কংগ্রেস ও সি পি এম-এর বন্ধুত্ব লাভের কৌশল সি পি আই নিয়েছে।

—চাণক্য

এই বাংলার খবর

দুই মন্ত্রীর বিদায়

বিচারপতি কৈলাসনাথ ওয়াঞ্চু পশ্চিমবাংলার পাঁচজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তাঁর তদন্তের রিপোর্ট পেশ করার পরেই রাজ্যের রাজনীতিতে আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। তদন্ত কমিশনের সচিব এন ডি গর্গ রিপোর্টটি দিল্লি থেকে নিয়ে এসে রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিবের কাছে পেশ করেন ২৭ জানুয়ারী। রিপোর্টটি সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঐদিনই সন্ধ্যায় দিল্লি চলে যান। ২৯ তারিখে রাতে কলকাতায় তাঁর বাসভবনে মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠকের ব্যবস্থা করার জন্যে দিল্লি থেকে তিনি তাঁর দপ্তরে নির্দেশ পাঠান। ঐ বৈঠকের পরে সিদ্ধার্থবাবু ঘোষণা করেন যে, ওয়াঞ্চু কমিশনের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী সন্তোষ রায় এবং সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের উপমন্ত্রী সুনীতি চট্টরাজ পদত্যাগ করেছেন। অভিযুক্ত অপর তিনজন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা, বনমন্ত্রী সীতারাম মাহাতো এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ নস্করের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ হয়নি বলে কমিশন রায় দিয়েছেন।

সিদ্ধার্থবাবু দিল্লীতে গিয়ে ওয়াঞ্চু কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁরা দুজনেই এই পরামর্শ দেন যে, তদন্ত কমিশন যে দুই মন্ত্রীর কাজের নিন্দে করেছেন, তাঁদের ইস্তফা দেওয়া উচিত। সন্তোষবাবু ও সুনীতিবাবুর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে সিদ্ধার্থবাবু বলেন, তাঁরা দুজনে গণতন্ত্রের মহৎ ঐতিহ্য অনুযায়ীই মন্ত্রিপদে ইস্তফা দিয়েছেন। ওয়াঞ্চু কমিশনের রিপোর্টে এক জায়গায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনো মন্ত্রীর সততা সম্পর্কে অণুমাত্র সন্দেহ থাকা উচিত নয়, সীজারের পত্নীর মতো তাঁকে থাকতে হবে সব সন্দেহের উর্ধ্বে। সন্তোষবাবুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে বিচারপতি ওয়াঞ্চু বলেছেন তিনি যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ পেয়েছেন তা থেকে তাঁর এই সিদ্ধান্তে আসতে কোনো অসুবিধেই হয়নি যে, সন্তোষবাবু সমাজ-কল্যাণ পর্ষদে তাঁর বোন গায়ত্রীকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার জন্যে নিজের প্রভাব খাটিয়েছেন। সুনীতিবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে বিচারপতির মন্তব্য: যে-কোম্পানীর সঙ্গে সুনীতিবাবুর স্ত্রী-সহ তাঁর পরিবারের বেশ কয়েকজন জড়িত, সেই কোম্পানীকে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার জন্যে সুনীতিবাবুর প্রভাব অবশ্যই খাটানো হয়েছিল বলে মনে হয়।

দপ্তর বদল

ওয়াঞ্চু কমিশনের রায়ের পরিণামে পশ্চিমবাংলা মন্ত্রিসভায় দপ্তর পুনর্বণ্টন অনিবার্য হয়ে ওঠে। অবশ্য সিদ্ধার্থবাবু এই সুযোগে মন্ত্রিসভায় এখনও পর্যন্ত কোনো বড় রকমের পরিবর্তন ঘটাননি। নতুন মুখ দেখা গেছে একটি, তাঁর নাম ডঃ আতাহার রহমান। তিনি বীরভূমের লোক: সুনীতিবাবুও তাই। তিনি হলেন স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) এবং ওয়াকফ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। এতদিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরে রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন ডঃ ফজলে হক। তিনি গেলেন পূর্ত বিভাগে, সেখানে সি এম ডি-এ এবং দ্বিতীয় হুগলি সেতুর কাজ তদারক করবেন রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবেই। সন্তোষবাবুর হাতে যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের ভার ছিল সেটি পেলেন বন ও আবগারি মন্ত্রী সীতারাম মাহাতো। আর সন্তোষবাবুর মৎস্য বিভাগটি চলে এলো ডঃ জয়নাল আবেদিনের হাতে। কিন্তু সীতারামবাবুকে ছাড়তে হলো পশুপালন। শ্রম দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য স্বাধীনভাবে পশুপালন ও ডেয়ারি দপ্তর দেখবেন। কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন ও আইন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আনন্দমোহন বিশ্বাসও তফশীলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তর স্বাধীনভাবে দেখাশোনা করার দায়িত্ব পেলেন। ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন বিভাগটি ডঃ আবেদিনের কাছে থেকে চলে গেল স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজার হাতে। রাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ নস্কর স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে গেলেন শিক্ষা দপ্তরে। পদোন্নতি ঘটলো শুধু শিল্প ও পর্যটন দপ্তরের উপমন্ত্রী গজেন্দ্র গুরুংয়ের তিনি রাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন, সেই সঙ্গে পেলেন সেচ দপ্তরের আংশিক দায়িত্ব।

এই দপ্তর পুনর্বণ্টনকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো মহলে জল্পনা শুরু হয়ে যায় যে, সিদ্ধার্থবাবু পশ্চিম বাংলার রাজনীতি ছেড়ে দিল্লি পাড়ি দিচ্ছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এখন পশ্চিম বাংলা ছেড়ে তাঁর যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এদিকে সন্তোষবাবু ঘোষণা করেছেন, তিনি ওয়াঞ্চু কমিশনের রায়ের সঙ্গে একমত নন। তিনি বিধানসভার সদস্য পদে ইস্তফা দিয়ে আবার নির্বাচনে দাঁড়াতে চান।

ভয়াবহ দুর্ঘটনা

উল্টোডাঙা স্টেশনে ২৯ জানুয়ারি যে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে গেল অত বড় দুর্ঘটনা পূর্ব রেলের ইতিহাসে খুব বেশি [illegible] ঘটে নি। একটি হাবড়াগামী লোকাল ট্রেনের পিছনে এসে ধাক্কা মারে দার্জিলিং মেলের কানাডিয়ান এঞ্জিন। লোকাল ট্রেনের শেষ কামরাটির মধ্যে এঞ্জিনটি পুরোপুরি ঢুকে পড়ে। তার পরের কামরাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন সন্ধ্যের মুখ, অফিস-ফেরত যাত্রীর ভিড়। প্রতিটি কামরাই উপচে পড়ছে। সেই সময়েই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

কেমন করে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটলো সে-সম্পর্কে শুরু হয়েছে জোড়া তদন্ত। একটি করছেন রেলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিশনার, দ্বিতীয়টি করছেন গোয়েন্দা পুলিশ। দার্জিলিং মেলের চালক গ্রেপ্তার হয়েছেন। যাত্রীদের কাছ থেকে যে-বিবরণ পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায়, হাবড়া লোকালটিতে শিয়ালদহ থেকে ছাড়ার আগেই গণ্ডগোল ধরা পড়ে। তবু ট্রেনটি ছাড়ে। কিন্তু উল্টোডাঙায় এসে গাড়িটি আবার বিগড়োয়। তখন ঐ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই গাড়িটি আগুপিছু করতে থাকে। সেই সময়েই দার্জিলিং মেলটি এসে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। উল্টোডাঙায় রেলের যন্ত্রপাতি চুরি যাওয়ায় সিগন্যালিংয়ের কাজ ঠিকমতো করা যাচ্ছে না বলে রেল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছেন। এর পিছনে নাশকতার কোনো চেষ্টা আছে কিনা, গোয়েন্দা পুলিশ তদন্ত করবে সে বিষয়েই।

—দেবদত্ত

ফাদার দ্যতিয়েন
রোজনামচা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙল মুয়াজ্জিনের আজানের প্রতিধ্বনিতে। সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। আমাদের এই উত্তর কলকাতায় —তেলিপাড়ার এই নিবিড় পল্লীতে—মর্ত-বাসীর জাগরণপর্ব মৃদু-মন্থর ও ক্রমবর্ধমান। বিশ্লেষণ করে দেখবেন, আপনার স্বপ্নমালার রঙিন সূত্র ছিঁড়ে যায় শৈবালদের পুচ্ছশীর্ষবাসী কুক্কুড়ার আত্মঘোষণায়, আড়মোড়ার পালা চুকে যায় পার্শ্ববর্তী খাটালের গরু-মোষের ঐকতানে...তারপর, গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকায় বর্ণিত রীতি অনুযায়ী দক্ষিণ চরণ মাটিতে ফেলে দেওয়ালে-টাঙানো মাতৃদেবীর, পিতৃদেবের, তথা তাবৎ তাবৎ পূজ্য-নমস্যদের প্রতিকৃতির দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ বোলালেন নীচের তলায় স্বর্গস্থ গোপালের মন্দিরে-কর্মরতা পার্থিব গোপালের মায়ের ধোয়া-মোছার তালে তালে: অবশেষে, প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদনার্থে স্নানাগার অভিমুখে আপনি যেই পা বাড়াবেন, বুঝবেন হরিসভায় গায়েন-বায়েনের সম্মিলিত 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' কীর্তন মন্দিরের চত্বর কাঁপিয়ে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জাগিয়ে তুলেছে।

বাংলাদেশের রাজধানীতে এমনতর নয়: মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর, আকাশ বিদীর্ণ করে জাতিধর্মনির্বিশেষে মুমিন-বেদীন সবাইকে পালঙ্ক থেকে উদ্‌গীরণ করে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় প্রচার করে : 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ (দেবতা) নাই: নমাজের জন্য দ্রুত আইস নিদ্রা হইতে নমাজ উত্তম!' নমাজ কথাটা অবশ্য ঐ ভদ্রলোক ব্যবহার করেন না, বলেন 'সালাত'; একমাত্র তুরস্ক দেশেই মাতৃভাষায় আজান (তথা জুমার আর ঈদের খুতবা) উচ্চারণ করা দুরস্ত।

নমাজ মুমিনের এবাদতের (ভজনার) পঞ্চভিত্তির প্রধান বেনা (বেনা মানেই ভিত্তি!)। হ্যাঁ, ভারতীয় সংস্কৃতিতে যেমন আছে পঞ্চভূত ও পঞ্চপাণ্ডব, পঞ্চশস্য ও পঞ্চগব্য, ইসলামীয় সংস্কৃতিতেও আছে পাঞ্জতন (হজরত মহম্মদ, তাঁর কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রদ্বয়) আর পঞ্চভিত্তি : কলেমা (বিশ্বাসোক্তি), নমাজ, রোজা, জাকাত, হজ; কারও কারও মতে কিন্তু কলেমার স্থলে জিহাদ। দৈনিক নমাজ আবার পাঁচ বেলায় সম্পাদনীয়—ইহুদীদের যেমন তিন, ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের যেমন সাত।

জাকির মিয়ার মতে আরবী ভাষা খোদারই জবান; সেই জবানেই আল্লাতালা হজরত মহম্মদের কর্ণকুহরে তাঁর কালাম-পাক নাজিল করেছিলেন, আর সেই সময় থেকে তামাম দুনিয়ার হর মুমিন আরবী ভাষায়ই নমাজ পড়ে এসেছে। আসলে ওরা কিছু 'পড়ে' না (প্রকৃত পাঠ করলে নমাজ দুরস্ত হয় না!), বরং কোরান শরীফের মুখস্থ-করা কয়েক আয়াত আবৃত্তি করে নমাজ 'আদা' করে।

মিয়ার মতে নমাজ ততটা প্রার্থনা নয়, যতটা আল্লাতালার স্বার্থহীন সেবা। বাক্যগুলোর বোধগম্যতা বড় কথা নয়, বড় কথা হল খোদার দরগায় মুমিনের স্বাধীন ইচ্ছার সমর্পণ। এই ধরুন 'রুকু'...রুকুতে যাবেন যখন, এমনভাবে ধড় ঝুঁকিয়ে রাখবেন যেন, পিঠে পানি-ভরা পেয়ালা রাখলে, এক ফোঁটাও ছলকে না পড়ে; উভয় হাত দিয়ে দুই হাঁটু কার্সে ধরবেন—আঙুল খোলা রেখে, পাঁজর থেকে বাহু পৃথক করে...। কিংবা ধরুন 'সেজদা'...সেজদায় যাবেন যখন প্রথমে হাঁটু, তারপর হাত, তারপর নাক, তারপর কপাল মাটিতে লাগাবেন, পা খাড়া রেখে পদাঙ্গুলি কিবলামুখী করে (অর্থাৎ মক্কাভিমুখী করে)!...ঈশ্বরের নিষ্কাম ভক্তির প্রতীক হিসেবে নমাজের এই সুনির্দিষ্ট পুণ্যকর্ম জাকির মিয়ার চোখে অতি মূল্যবান।

আজান আর খুতবা কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নয়, মানুষেরই উদ্দেশ্যে : আজান দিয়ে মুয়াজ্জিন মানুষকেই আহ্বান জানান প্রার্থনায়, খুতবার উচ্চারণে ইমাম মানুষকেই উপদেশ দেন সৎপথে চলতে। এই হল জাকির মিয়ার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত।

আমার মতো কাফিরের পক্ষে ঐ ধরনের ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার নেই, তবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি প্রশ্ন টিঁকে গিয়েছে : পারসিকেরা যখন মুমিনদের হাতে পরাজিত হয়ে নবপ্রচারিত ধর্ম অবলম্বন করতে শুরু করল, ওরা কিন্তু আরবী শব্দকোষ নির্বিচারে গ্রহণ করল না, এমন কি ধর্মীয় ব্যাপারেও নিজস্ব ভাষাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করল না; ওদের চিরাচরিত প্রথা মতো ওরা বেহেস্ত ও দোজখ, ফেরেস্তা, গুণাহার ও খোদা প্রভৃতি বলতে থাকল। পারসিকদের অনুসরণ করতে হলে আমরা পরের (ফার্সি) শব্দ নয়, বরং নিজের (বাংলা) শব্দ ব্যবহার করব : স্বর্গ ও নরক, স্বর্গদূত, পাপী, ঈশ্বর...।

লোকে বলে : জল হলেই হল, জল-কে পানি বললে কিছু এসে যায় না, আর ঈশ্বরকেও যে-কোনো নামে ডাকলেই হল, তাতে কিছু এসে যায় না। আমি বলি : এসে যায়, খুবই এসে যায়...জল আমাদের

জাতির প্রাণ; একই দেশের একই ভাষার মানুষে যখন একই পুকুরের একই জল পান করে, সেই জলের সম্প্রদায়গত বিভিন্ন নাম রাখলে অবশ্যই ক্ষতি হয় : অনাবশ্যক বিভেদের প্রকৃত সৃষ্টি হয়, কিংবা প্রকৃত বিভেদের অনাবশ্যক প্রকাশ ঘটে। ঈশ্বরের বেলাতেও তা-ই : তিনি আমাদের অস্তিত্বের প্রাণ; কোরানের, উপনিষদের ও বাইবেলের ঈশ্বর যখন এক, তাঁকে একই নামে ডাকার সমষ্টিগত আনন্দ থেকে আমরা নিজেদের বঞ্চিত করি কেন?

জাকির মিয়া স্বয়ম্ভূকে যে ঈশ্বর কিংবা ভগবান বলেন না, তার কারণ এই যে, এক, উভয় কথার এক স্ত্রীলিঙ্গ রূপ আছে (ঈশ্বরী, ভগবতী) আর দুই, উভয় শব্দই মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় (প্রাণেশ্বর, ভারতেশ্বর, যোগীশ্বর, ভগবান বুদ্ধ, ভগবান শ্রীচৈতন্য...)।

আপত্তিকারীর প্রতি আমার সহানুভূতি আছে খুব, আপত্তির প্রতি আছে অল্প। বাইবেলে চরম সত্তার দুটি নাম আছে : মানবজাতির স্রষ্টা হিসেবে ব্যবহৃত হিব্রু নাম এলোয়াহ্, যার আরবী রূপ এলাহ্ (এলাহাবাদ মানে ঈশ্বরপুরী) কিংবা—নির্দেশক উপদেশের সঙ্গে—আল্লাহ্: এবং ইস্রায়েলীয় জাতির কাছে প্রকাশিত তাঁর ব্যক্তিগত নাম ইয়াওয়ে। বাইবেলের অনুবাদে আমরা এলোয়াহ্-কে নিঃসংকোচে বলেছি ঈশ্বর, ইয়াওয়ে-কে লিখেছি ভগবান।

...হোসনে আরা বেগম জাকির মিয়ার স্ত্রী; কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি স্মরণ করেন কলকাতার লোরেটো স্কুলে যাপিত তাঁর ছাত্রী-জীবনের কথা তুলনামূলক ধর্মাধ্যয়ন তাঁর শখ। কোণে বসে তিনি শুনছিলেন নীরবে। হঠাৎ মৌন ভেঙে তিনি বলে ওঠেন,

'খৃস্টধর্ম ও ইসলামের মধ্যে এক মস্ত ব্যবধান এই যে, খৃস্টধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম হলে কি হবে, তার কোনো বিশ্বজনীন সংস্কৃতি নেই : আমেরিকার খৃস্টানেরা ইংরেজি গান করে বীট্‌ ম্যাজিকের তালে তালে, কলকাতার কাথলিকেরা রবীন্দ্রসংগীত গান করে তবলার সঙ্গতে; ওরা আবার ওদের আনুষ্ঠানিক প্রার্থনায় খোদাকে 'সত্যশিব-সুন্দর সচ্চিদানন্দ' বলে সম্বোধন করে, হিন্দুদের পরমেশ্বরের প্রতীক হিসেবে প্রণব ব্যবহার করে, খৃস্টজননীর মূর্তিকে সাড়ি, শাঁখা ও সিঁদুর পরাতে দ্বিধা বোধ করে না ...ওদের আচার-ব্যবহারে বাঙালী হিন্দুদের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই, বরং ওদের আর বিদেশী খৃস্টানদের মধ্যে আসমান জমীন ফারাক'...একজনকে আমি বলতে শুনেছি : ধর্মে আমি খৃস্টান, সংস্কৃতিতে আমি ভারতীয়, অর্থাৎ কিনা হিন্দু...ভারতীয় সংস্কৃতি যেহেতু মূলত হিন্দু—যদিও উত্তর ভারতের উচ্চসংগীতে, পরিচ্ছদে ও স্থাপত্যে ইসলামীয় দান নগণ্য নয়...

'ইসলামের কথা এবার ভেবে দেখুন : আমাদের বিশ্বজনীন ধর্মের এক বিশেষ অঙ্গ হল আমাদের এক বিশ্বজনীন সংস্কৃতি : আদর্শ মুমিনকে মিশরে য়ুরোপে-বাংলাদেশে কোথাও চেনা যাবে না : একই সময়ে একই ভাষায় একই ভঙ্গি সহকারে ওরা প্রার্থনা করে, একইভাবে পরস্পরকে অভিবাদন জানায়; ওদের সামাজিক জীবন-যাত্রা একই সুনির্দিষ্ট নিয়মে নিয়ন্ত্রিত...

'খৃস্টানদের যীশু স্থানে কালে সীমা-বদ্ধ ছিলেন; প্রকৃত মানুষ হতে হলে তাঁকে তখনকার দিনের, সেখানকার দেশের ইহুদী সাজতে হয়েছিল। তাঁকে কিন্তু হতে হবে সর্বকালের সর্বদেশের মানুষ; কাজেই তিনি তাঁর শিষ্যদের আদেশ দিয়েছেন ইস্রায়েল দেশে দু হাজার বছর আগে আরব্ধ তাঁর কার্যকে ধরণীর চতুঃসীমান্ত পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত সমাপন করতে। তাই তারা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে বাইবেলের বাণী ভাষায় উপভাষায় অনুবাদ করে যায়, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি অবলম্বন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে : পাকিস্তানে ওদের যাজক টুপি পরেই উপাসনা চালান...আদিবাসী অঞ্চলে ওদের অর্ধোলঙ্গ মেয়েরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আদিম নৃত্য নাচে...

'আমরা কিন্তু নিজস্ব সংস্কৃতি রাখতে দৃঢ়সংকল্প। আমরা মনে-প্রাণে বাঙালী বটে, স্বাধীন বাংলার জন্য আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত; সংস্কৃতিতে কিন্তু অমরা পুরোপুরি বাঙালী নই... আমার আম্মা সাড়ি পরতেন, তবে অমুমিন প্রথামতো নয়, আমার আব্বা ধুতি পরতেন, তাও অমুমিন প্রথামতো নয়...আমাদের বাড়ির উপাধি চৌধুরী, তবে আমার ভাই-এর নাম দেখুন : চৌধুরী রেজা শাহারিফ... হ্যাঁ, উপাধিটাকে নামের আগেই আমরা লিখি! পশ্চিম দিকে ঘুরে আমরা যে নমাজ পড়ি, তার অবশ্য এক ভৌগোলিক কারণ আছে (কাবা শেরীফ যে পশ্চিমে!) কিন্তু কলাপাতা উল্টিয়ে যে আহার করি, সেটা প্রকৃতপক্ষে অমুমিন কায়দার বিপরীত আচরণের মানসে।

'যীশু কি-ব্যঞ্জন আহার করতেন, কি-বস্ত্র পরিধান করতেন, কি-ভাষায় উপদেশ দিতেন, কথাটা খৃস্টানদের কাছে চূড়ান্ত প্রশ্ন নয়। তিনি ইস্রায়েল দেশের ব্যঞ্জন খেতেন, ইহুদীসুলভ পোশাক পরতেন, পালেস্টাইনের ভাষা বলতেন; তবু খৃস্টানেরা ও-সবের কিছু না করে বাংলাদেশের ব্যঞ্জন খায় বাংলাদেশের পোশাক পরে বাংলাদেশের ভাষা বলেন। আদর্শ মুমিন কিন্তু বিশ্বনবির অবিকল্প অনুকরণে, [illegible]কালের স্বাতন্ত্র্যের কথা না ভেবে, দাড়ি [illegible], আতর ও মেহ্‌দী ব্যবহার করে, আরবী নাম নেয়, আরবী ভাষায় পরস্পরকে সালাম জানায়...

'ঐ আরবী সংস্কৃতিটাকে আমরা পুরোপুরি রাখতে পারিনি : মুমিন বাঙালীর সংস্কৃতি আসলে ত্রিবেণী সংস্কৃতি। আমাদের মূলত আরবী সংস্কৃতির সঙ্গে মিশেছে কিছুটা হিন্দু প্রভাব—বিশেষভাবে সাদির সামাজিক অনুষ্ঠানে—এবং বেশ কিছু বিদেশিয়ানাও বটে : জাতীয় দিবসে দেখবেন, অমুমিনেরা ধুতি-পাঞ্জাবি যেখানে পরে আসে, আমাদের শিক্ষিত সমাজের মাতব্বরেরা কুর্তা-পাজামা পরেন না, পরেন স্যুট...'

কাউকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে হোসনে আরা বেগম উঠে বললেন, 'একটু বসুন, চাটা নিয়ে আসি।'

চা ছিল পরিবেশিকার মতোই মিষ্টি; টা ছিল নিজের হাতে তৈরি হালুয়া।

(ক্রমশঃ)

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

পুজোর আনন্দে গ্রাম গুলজার। সব বাড়িতেই আত্মীয় পরিজনের ভিড়। এর মধ্যেই খুচরো পরব এক ধরনের পুজোই—ধান বনকে সাধ খাওয়ানো। আর এক পরব পারসিও এই সময়েই। সধবা-বিধবা ছেলে-বুড়ো সবাই মেতে উঠলো। ওদিকে ভোর হতেই আহ্লাদ বৈরাগীর গলায় আগমনী সুর বেজে উঠল।

কিন্তু তরঙ্গিণীর মন বড় চঞ্চল। বুকের মধ্যে তার টনটন করে ওঠে—ষষ্ঠী গেল—মহাসপ্তমীও এসে গেল—কিন্তু তার মেয়ে এখনও এলো না।

আর কবে আসবে?

ক্রমে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পেরিয়ে দশমীও এসে গেল। ভোরে উঠেই সবাই দেখে ভিজে চোখ মা-দুর্গার। শেষ রাত থেকে সানাই বাজছে। তারও কান্নার সুর গিরিকন্যা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাচ্ছেন বলে।

দুপুরের পরই মা দুর্গার কপালে সিঁদুর পরিয়ে সেই সিঁদুর মেয়েদের মধ্যে এ ওকে পরিয়ে দেবার ধুম পড়ে গেল।

কিন্তু ভবনাথের মন খারাপ। মন্ডপ খালি করে মা চলে যাবেন, এ তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

ধুমধাম করে বাঁওড়ে নিয়ে গিয়ে প্রতিমা বিসর্জনও হোলো। কিন্তু ভবনাথ কোন কিছুতেই অংশগ্রহণ করেন নি।

ভবনাথের আরেক ভয় মা দুর্গাকে আনতে গিয়ে বুড়ি মাকে হারিয়েছেন। ধর্মকর্ম এ বংশে সয় না।

এদিকে দেবনাথও আসেন নি। তিনিও পুজোর সময় বাড়ি আসা সেই থেকে ছেড়েছেন।

পুঁটি আর কমল ভাই-বোনে বাইরে বাড়ি ছুটে এসে হুড়কো ধরে দাঁড়িয়েছে। আহ্লাদী বৈরাগী গাইছেন : অভিরামের দ্বীপান্তর মা ক্ষুদিরামের ফাঁসি, বিদায় দাও মা ঘুরে আসি—

ভবনাথ আশশাওড়ার দাঁতন ভেঙে নিয়ে ফিরছেন। পুঁটি শুধায় : অভিরাম-ক্ষুদিরাম কারা জেঠামশায়?

সাহেবদের উপর ক্ষুদিরাম বোমা মেরেছিল ভবনাথের জানা আছে। সাহেবরাও ছাড়ন পাত্র নয়—চারিদিকে ধুন্দুমার লাগিয়েছে। এমন হয়েছে, তরঙ্গিনী কিম্বা অলকা-বউয়ের উদ্দেশে বউমা বলে ডাকতে অনেক সময় ভবনাথের ভয় লাগে—হতে পারে ঘর-কানাচে টিকটিকি অলক্ষ্যে ওত পেতে আছে, 'বউমা' শুনতে সে 'বোমা' শুনে ফেলল, আর দেখতে হবে না—হাতকড়া এঁটে টানতে টানতে নিয়ে চলল। হুবহু এই নাকি হয়েছে কোথায় ভবনাথের একজন অন্তরঙ্গ বলেছে। বিপদ হয়েছে দেবনাথ এই সবে আস্কারা দেয়। অথচ মুখ ফুটে কিছু বলবার জো নেই। যার কাছে বলতে যাবেন—আঁ আপনার মুখে এই কথা? এর চেয়ে নোংরা অসভ্য কথা যেন হয় না। অগত্যা নির্বাক থাকেন তিনি—মনে মনে ঘোরতর বিরক্ত।

দিদির দেখাদেখি একফোঁটা কমলও বলল জেঠামশায় ক্ষুদিরাম কে?

দেবনাথকে জিজ্ঞাসা করগে যা বলবার সে বলবে—। বলে মুখ বেজার করে ভবনাথ রোয়াকে উঠে গেলেন।

এই ভবনাথের ভিতর বাড়ীতেই বন্দেমাতরম ধ্বনি। দিব্যি একটা দল বেরিয়ে আসে—দেবনাথ অগ্রবর্তী। টুকরো টুকরো হলদে সুতো, যার নাম রাখী পুরানো হিতবাদী কাগজে জড়ানো। রাখীর প্যাকেট দেবনাথ নিজে নিয়ে আসছেন। পিছু পিছু আসে হিরু অটল শিশুবর আর ঐ শরিকবাদের সিধু ও তাদের ভৃত্য নন্দ প্রধান। বংশীধর ঘোষের ছেলে সিধু অর্থাৎ সিদ্ধিনাথ এদের সঙ্গে এক দল হয়ে বেরুচ্ছে সদরের আদালতে যে বংশীধর ও ভবনাথে ফৌজদারী-দেওয়ানী দুই-এক নম্বর লেগেই আছে সর্বদা। জন পাঁচ-সাত নিয়ে মন্টুও এসে গেছে নতুন পুকুরের ঘাটে। ভুচুত-ভুচুত করে ডুব দিয়ে সব শুচি হয়ে উঠল। হিমচাঁদ হারু সরকারের দল, পশ্চিম বাড়ীর বলাই-অশ্বিনীর দল, উত্তর বাড়ীর যজ্ঞেশ্বর-অক্ষয় জল্লাদ-পদীর দলও এসে পড়ল বাড়ী থেকে চানটান সেরে এসেছে তারা। জল্লাদের উপর নিশানের দায়িত্ব—সরু সরু কঞ্চির মাথায় রঙিন কাগজের ত্রিকোণাকার নিশান বড় বড় অক্ষরে 'বন্দে-মাতরম' লেখা। এ-ওর হাতে রাখী বেঁধে দিচ্ছে : বঙ্গভঙ্গ হলে কি হয় — মানুষ আমরা আরও বেশী করে ঐক্যবন্ধনে বাঁধা পড়ে যাচ্ছি দেখ। তুমুল বন্দেমাতরম ধ্বনি—আকাশ ফেটে যায় বুঝি বা! কোনো বাড়ী বুঝি আর মানুষ রইল না—পূবে বাড়ীর পুকুর ঘাটে সব ছুটেছে। শশধর দত্ত লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে এসে বললেন, হয়ে গেল নাকি তোমাদের? আমার হাতে দাও একটা পরিয়ে।

সকলে মিলে-মিশে এখন একটা দল। হাতে হাতে নিশান তুলে ধরেছে, বাতাসে নিশান পত-পত করছে রং-বেরংয়ের পাখির পাখনা উড্ডয়নের মতো। গ্রামপথ ধরে চলেছে। কোন রান্নাঘরে আজ উনুন জ্বলবে না দুঃখের দিন বঙ্গদেশ ভেঙে দিয়েছে এই দিনে। বন্দেমাতরম আর স্বদেশী গান—গানের পর গান। অশ্বিনী খোল বাজাচ্ছে, পাথরঘাটার গাইয়ে মতিলাল এসে পড়েছেন ধরতা দিচ্ছেন তিনি। জয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে মাতঙ্গী মেতেছেন আজ সমররঙ্গে। মায়ের-দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই। ভেঙে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী...। বিলাতি শাড়ি-ধুতি মেয়েরা সব বোঁচকা বেঁধে রেখেছে—বিকালের সভায় পোড়ানোর জন্য পাঠাবে। কাঁচের চুড়ি সব ভেঙে চুরমার—হাতে রয়েছে শাঁখা। বাড়ী ঢোকবার মুখে দেখে-শুনে পা ফেলো হে—চুড়ির টুকরো পায়ে না বেঁধে!

সভা হাটখোলায়। কমল বায়না ধরল সে-ও যাবে। পুঁটি বাগড়া দিচ্ছে যেহেতু সে যেতে পারবে না মেয়েলোক কেউ যায় না। তরঙ্গিণীর কানে তুলে দিল—ভালমানুষ হয়ে বলল, মা খোকন নাকি সভায় যাবে? তরঙ্গিণী এক কথায় কেটে দিলেন : যাবে না আরো-কিছু! ছেলেপুলেরা যায় না। আমি আজ একলবোর গল্প বলব। সেদিন বলতে বলতে হল না অতিথ এসে পড়ল, রান্নাঘরে ঢুকে গেলাম। গল্পটা আজ শেষ করব।

গল্পের উপর যত টানই থাকুক সে জিনিস আজ নয়। সভায় যাওয়ার ঝোঁক চেপেছে। গুম হয়ে আছে কমল হিরুর গলা পেয়ে তার কাছে ছুটে গেল। তাকে সুপারিশ ধরবে।

হিরুও যে একেবারে বসিয়ে দিল। বলে, সভায় গিয়ে কি করবি তুই? বক্তৃতা হবে—উঠে দাঁড়িয়ে এক নাগাড়ে বক বক করবে। একজন থামলে আর একজনে। একটা দুটো স্বদেশী গান—সকালে তো দেদার শুনেছিস।

হেনকালে দেবনাথ এসে পড়লেন : কি বলছেন কমলবাবু?

হিরু বলে সভায় যেতে চাচ্ছে—

দেবনাথ একেবারে গদগদ : যাবে। তার জন্যে কি—

হিরু বলছে গিয়ে শুধু বসে থাকা। কিছু তো বুঝবে না।

বড় হয়ে বুঝবে। অন্তত এটুকু বুঝবে একরত্তি বয়সেও দেশের ডাকে গিয়েছিলাম। সে-ই তো অনেক।

হিরু মিন-মিন করে তবু একটু বলে, হাটখোলা অবধি পারবে যেতে?

দেবনাথ বললেন হেঁটে যেতে পারবে না। দরকার কি? অটল যাবে শিশুবর যাবে—ওরা কেউ নিয়ে যাবে কাঁধে করে। বলে দিচ্ছি—

মানুষজন ভালই আসছে। আগের হাটে ঢেঁড়ি দিয়েছিল। ঢোল আর কে আনতে যাচ্ছে—দোকান থেকে কেরোসিনের এক খালি কেনেস্তারা চেয়ে নিল হারু সরকার। এদিক-ওদিক তাকাতে কেতু খাঁর নজরে পড়ে গেল। কেতুর হাতে কেনেস্তারা দিয়ে হারু বলল, ঢেঁড়ি দাও। অর্থাৎ টিন বাজাও। হাটের ভিতর দিয়ে কেতু টিন বাজাতে বাজাতে চলল। লোকে জিজ্ঞাসা করে : কি ব্যাপার? হারু পিছন থেকে বলে যাচ্ছে, পরশু দিন তিরিশ তারিখে ঐ বটতলায় স্বদেশী সভা—সভার শেষে বিলাতী নূন কাপড় নষ্ট করা হবে, আসবেন সকলে।

পাইতক্কের যাবতীয় গাঁ-গ্রামে খবর গিয়ে পৌঁচেছে দূর থেকে লোক আসতে লেগেছে।

কমল অটলের কাঁধে। বাড়ী থেকে বেরুনোর সময় একটি কথা বলে নি সে—প্রথম ভাগের গোপাল নামক বালকটির মতন। শুনে অনেক তো বাড়ীতে—কথা বলতে গেলে খাওয়াটাই বা পণ্ড হয়ে যায়! বেশ খানিকটা চলে আসার পর কমল গোঁ ধরল কাঁধে চড়ে সে যাবে না—হাটখোলার কাছাকাছি তখন। দলে দলে মানুষ সভায় যাচ্ছে। পায়ে হেঁটে যাচ্ছে সবাই—শুধুমাত্র কমল কাঁধের উপর। আকুলি-বিকুলি করছে নেমে পড়বার জন্য। দেরী করলে লাফিয়ে পড়বে ঠিক সেই রকম। বেটাছেলে হয়ে কাঁধে চেপেছে রাস্তার লোক সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে—ছিঃ!

ছেলে এক ফোঁটা জেদ পাহাড় প্রমাণ। নামাতে হল কাঁধ থেকে। গুটি-গুটি হাঁটছে কমল অটল একখানা হাত ধরেছে পাড়ে-টাড়ে না যায়। তা-ও হবে না—হাত ছাড়ানোর জন্য ঝুলোঝুলি করছে। রেগেমেগে অটল বলল, ভারী পা হয়েছে তোমার? অমন করো তো জোর করে কাঁধে তুলব, কাঁধে করে বাড়ী ফেরত নিয়ে যাব।

ধমক খেয়ে কমল চুপ। সভায় ভিড় খুব—ফুলবেড়ে কোনাখোলা পাথরঘাটা গড়ভাঙা থেকেও এসেছে। একখানা মাত্র চেয়ার সভাপতির জন্য—হাতেম আলি ফকিরকে সেখানে বসান হয়েছে। অন্য সকলে ঘাসের উপর। চেয়ারের পাশে গাদা-করা নুন ও কাপড়। সভা অন্তে বিলাতী কাপড়ে আগুন দেবে, বিলাতী নুন অদূরবর্তী পুকুরের জলে ফেলবে। বক্তৃতার জন্য ঠিক করা হয়েছে সোনাখাড়ি থেকে দেবনাথ ও সজল মাটের গুরুমশায় হারু সরকারকে। মাদার ঘোষ আসতে পারেন নি—সদরেও এই মচ্ছব, সেখানে আটকে ফেলেছে। থাকলে তিনিও নিশ্চয় বলতেন। ফুলবেড়ে ইত্যাদি গ্রাম থেকে একজন করে বাছাই হয়েছে। তাই তো অনেক হয়ে গেল।

হিমচাঁদ কী কাজে গড়ভাঙায় গিয়ে পড়েছিল। ছুটতে ছুটতে এলো, সভার কাজ তখন আধাআধি সারা। এসে অক্ষয়কে চুপ চুপি বলল গঞ্জ থেকে ছোট দারোগা রমজান খাঁর বাড়ীর চুরির তদারকে এসেছে। অক্ষয়ের কানে ফিসফিসিয়ে বলা আর হাটে-বাজারে জয়ঢাক পিটিয়ে বলা—উভয়ের ফল একই প্রকার। ঐ জনারণ্যের মধ্যে খবর জানতে কারো বাকী রইল না। চুরি হয়ে গেছে চারদিন আগে থানার টনক এদ্দিনে নড়ল। বেছে বেছে আজকেই বা কেন হাটখোলায় স্বদেশী সভা যে তারিখটায়?

এমনি সন্দেহ হিমচাঁদের মনেও উঠেছিল। নিজের কাজ সেরে সে রমজানের বাড়ী চলে গেল যদি কোন পাকা হদিশ মেলে যায়। সেখানে এক আচ্ছা মজা জমে উঠল, ছেড়ে আসা সহজ নয়, সভায় পৌঁছতে সেই জন্য দেরী।

তদারক সারা করে দারোগা এবার রওনা দেবেন। গঞ্জ থেকে পালকী করে এসেছেন। বললেন, চলে যাব এবারে মিঞাসাব পালকি ভাড়ার ব্যবস্থা করো।

রমজান রগচটা মানুষ দেশসুদ্ধ মানুষে জানে। তার উপরে সর্বস্ব চুরি হয়ে গিয়ে মেজাজ সর্বক্ষণ তিরিক্ষি। জমবে এইবারে—হিমচাঁদ নড়েচড়ে খাড়া হয়ে বসল। রমজান কিন্তু অতিশয় শিষ্ট। সবিনয়ে বলল, হচ্ছে ব্যবস্থা। একটুখানি সবুর করতে হবে হুজুর।

দক্ষিণ ঘরের দাওয়ায় সকলে জমিয়ে বসেছে। ভুড়ুক-ভুড়ুক করে দারোগা হুঁকো টানছেন চপর-চপর করে পান চিবাচ্ছেন। গোয়াল থেকে গরু খুলে নিয়ে রমজান চলল।

কোথায় চললে হে? দারোগা বললেন এ দিককার মিটিয়ে-মাটিয়ে তারপরে যেও।

রমজান বলল গরু নিয়ে সেই জন্যে তো যাচ্ছি। দুধাল একটা গরু কিনবেন, আখেজ-ভাই বলছিলেন—

এমন গরুটা বেচে দেবে? —হিমচাঁদ জিজ্ঞাসা করল।

না বেচে উপায় কি? চোরে সর্বস্ব নিয়ে গেছে, ভাঙা থালাখানা ফুটো ঘটিটা অবধি রেখে যায়নি। কলার পাতা কেটে ভাত খাচ্ছি। চুরির পর দিন ভোরবেলা থানায় এজাহার দিয়ে এসেছি। এদ্দিনের পরে তো এলেন—এসে পালকী-ভাড়ার দাবী। গরু না বেচে দাবী কেমন করে মেটাই।

হিমচাঁদ বলল, এর পরে কি হল সঠিক বলতে পারব না। হাসি সামলাতে পারছিনে—আর দেরী করলে ফটাস করে দম ফেটে ওখানেই পড়ে যেতাম। রাস্তায় এসে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে হেসে নিলাম। তার পরে ছুটতে ছুটতে এসেছি।

খবর এলো, গড়ভাঙা থেকে দারোগা বেরিয়ে পড়েছেন। পালকী এই হাটখোলার দিকেই আসছে। দক্ষযজ্ঞ অত [illegible] আসন্ন। সরছে মানুষ পাঁচটা দশটা করে ভিড় পাতলা হচ্ছে। পালকি সত্যি সত্যি দেখা গেল, পালকির এপাশে-ওপাশে বন্দুক হাতে কনস্টেবল। সভার অদূরে থেমে গেল পালকি ভুঁয়ে নামে নি—বেহারাদের কাঁধের উপরে আছে। লোকে দুড়দাড় পালাচ্ছে। দরজার ফাঁকে ঘাড় লম্বা করে দারোগা তাকিয়ে দেখলেন। গণ্ডগোল কিছু নয়—আবার চলল পালকি।

রাত না পোহাতেই যেন বান ডেকেছিল। ঢেউয়ের পরে ঢেউ। সন্ধ্যার সব শান্ত—প্রবল জোয়ার শেষ হয়ে গিয়ে ঝিরঝিরে ভাটা নেমে যাবার মতন। ক্লান্ত দেবনাথ দক্ষিণের দাওয়ায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে গড়াচ্ছেন। কমলকে ডাকলেন, সে এসে বসল। বললেন আমার বক্তৃতার সময় একনজরে কমলবাবু মুখের দিকে চেয়েছিলে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। কতই তো বললাম—বুঝেছ কিছু? বুঝেছে কমল ঘোড়ার ডিম—ভারী ভারী কথা বোঝার বয়স কি এখন? সপ্রতিভভাবে তবু ঘাড় নেড়ে দেয়—

হার-মানার বান্দা নয় সে, বিশেষ করে বাপের কাছে। ঘাড় নেড়ে টানা সুরে বলে দিল হ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—। দেবনাথও নাছোড়বান্দা : কী বুঝেছ বলো একটু শুনি। একটু-আধটু তখনও কমলের মনে ছিল—বিশেষ করে ক্ষুদিরামের কথাগুলো। মুখস্তর মত গড়-গড় করে সে বলে গেল।

ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে দেবনাথ উঠে বসলেন। গল্পে পেয়ে বসল তাঁকে—ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকী কানাই-সত্যেন—যত স্বদেশী ছেলের গল্প। 'আমায় বেত মেরে কি মা ভোলাবি'—সভায় যে গান হয়েছিল তারও মানে বোঝালেন। ইংরেজ বেত মারছে 'বন্দেমাতরম' উচ্চারণ করলে—যে কথার মানে হল, মাকে বন্দনা করি। মা বলতে বঙ্গমাতা--যাকে খণ্ড খণ্ড করেছে ওরা। কিন্তু ডর মানে না আমাদের ছেলেরা—হাসতে হাসতে তারা জেলে যাচ্ছে ফাঁসে যাচ্ছে...

কারা ইংরেজ কমল সঠিক জানে না : কে যেন বলেছিল ধবধবে ফর্শা তারা—দেখতে ভারী সুন্দর। তা চেহারা মত সুন্দরই হোক মানুষ তারা ভাল নয়। কাজকর্ম শুনে কমলের ঘেন্না হয়ে গেল। হঠাৎ কমলকে টেনে দেবনাথ বুকের ভিতর নিলেন। কণ্ঠ-স্বর আর এক রকম। বললেন, ঐ ছেলেদের মতন হয়ে তুমিও জেলে যেও কমল, দরকারে ফাঁসিতেও যেও। আমি যদি বেঁচে না থাকি যেখানেই থাকি তোমায় আশীর্বাদ করব।

(ক্রমশঃ)

কবিতা

কোনো কবির মৃত্যুতে ॥ কৃষ্ণ ধর

সেও বুঝি অভিমানী বালকের মতো
চৈত্রের বিকেলে
অনিচ্ছায় দাঁড়ায় উঠোনে এসে একা?
তার দিকে হঠাৎ তাকাতে গিয়ে
কেন বার বার যৌবনের কথা মনে পড়ে?
নাটকের শেষ দৃশ্যে সে এসেছে
নিঃশব্দে ঘরের কোণে মৃত্যুর রাখাল।

তখনো শব্দের উজ্জ্বল দৃশ্য
চারধারে সযত্ন খচিত কবিতার কথাশিল্প
মায়াবী দালানে ইতস্তত পড়ে আছে
টুকরো টুকরো ধ্বনি আর কথা।
পাশাপাশি ছিলো এরা আযৌবন
অস্তিত্বের মাঝে
রাঙাজল দিয়ে মোছা মৃত্যুর চাতালে তারা
বড় সুখে শুয়ে আছে
একই শিথানে মাথা রেখে।

মৃত্যুও তার প্রিয়তম উপমায় রূপবান
প্রথম প্রেমিক
নির্লিপ্ত ঠোঁটের ওপর এঁকে দেয়
আকাঙ্ক্ষার প্রণয় চুম্বন।
নিঃস্পন্দ শরীর তার চিত্রকল্পের সমান
গভীর অর্থের দিকে
নিয়ে যায় আজন্মের বিদ্রোহী চেতনা
শব্দ আর ব্যঞ্জনায় ঘিরে।
ভাষার অধ্যায় শেষ, এখন তাহার কাছে
শুধু মৃত্যু একান্ত আপন নীরবতা
তারপর সমর্পণ নির্মম আগুনে
নশ্বর দেহের উপাসনা।
নশ্বরতা তবু তার শেষ কথা নয়
যেন তার অলৌকিক অমরতা
এইখানে খুঁজে পায় আগুনের হাঁড়ে
নতুন উপমা, চিত্র, অলংকার, সুরের পূর্ণতা
কিছুই পোড়ে না তার,
থাকে শুধু চিরন্তন কবিতা।।

তারা যায় ॥ হাবীবুল্লাহ সিরাজী

তারা যায়। মাস্তুলের শীর্ষভাগে বসে শাদা পাখি,
কিশোরী যুবতী হয়, ফুলে ওঠে শুভ্র জল-বুক।
বাতাসে সমুদ্র-ঘ্রাণ, অফুরান রাত্রিদিন ভেদ
তাদের তুলে নেয় জীবনের দুরন্ত পাখায়।

তারা যায়। মেঘে মেঘে ঢেকে যায় চাঁদের পেয়ালা,
নীচে চোখ—অন্ধ ছবি, হিশেবের পূর্ববর্তী ফল ঃ
'প্রাণের অস্তিত্ব নাসে জল-চল হাঙ্গর শিকার।'
সম্মুখে বিস্তৃত পথ—কতদূরে, আর কতদূর
কতদূরে বাতিঘর, নোঙর-নিবাস?

তারা যায়। গভীর আহ্বান আসে তলদেশ থেকে,
অচেল জলের তলে মৃত্তিকার ফেনিল শরীর
বৃদ্ধি পায় দিনে দিনে গুল্ম-তরু, সাগর সম্ভোগে।
এভাবেই যাত্রাকালে মাটি ও জলের দীর্ঘশ্বাস
খুলে ফেলে গাত্রবস্ত্র লুক্কায়িত কালো অন্তর্বাস;
ধুধু নীল কোন সীমা কার হাতে দিকের কম্পাস?

নাটকের মুহূর্ত একটি ॥

সুপ্রীতি পাল

যাদু করে একবার না হয় ভুলিয়েছ
কিন্তু চোখের ইন্দ্রজাল কতক্ষণই বা থাকে?
ওর চেয়ে আরো শক্তিশালী ঐ শস্যের প্রান্তর
কিংবা তার গ্রামীণ মৃন্ময় পটখানা
যার গা' থেকে ভিজে মাটির গন্ধটা এখনো যায়নি।
যাদু করে একবারই ভোলান যায় যাদুকর হে—
বার বার নয়!
আর চোখের চোখের ইন্দ্রজাল দূরে থেকেই ভালো
কাছে এলে শব্দের শক্তিশেল বুকের ওপর কিম্ভূত কিমাকার!
তখন মত্ত বাইসনের জোটাজুটি
একমাত্র প্রকৃতির নির্যাস ছাড়া সেদিন
সমস্ত বিশল্যকরণীই ব্যর্থ হয়।
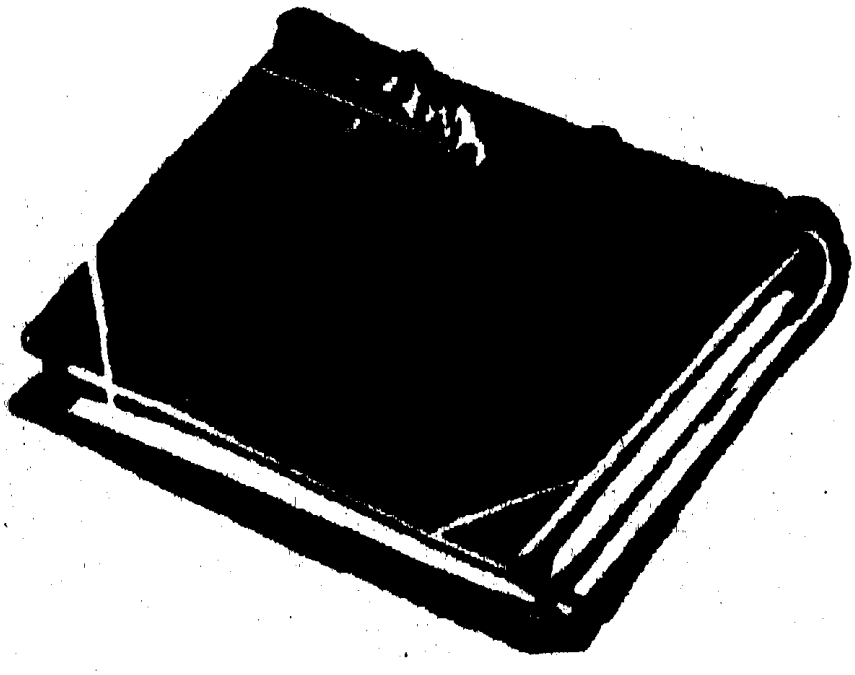
সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পাণিত্রাসের শরৎ মেলা

গত ২৫, ২৬, ২৭ জানুয়ারী — এই তিনটি দিন ধরে হাওড়া জেলার পাণিত্রাস গ্রামের পাণিত্রাস হাইস্কুল মাঠে 'শরৎ মেলা'র অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে এই শীতের সামান্য মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যে, বাকী দু দিনের কনকনে শীতের আবহাওয়ায় প্রায় হাজার দশেক জনসমাগম ঘটেছিল কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র স্মৃতিধন্য পাণিত্রাস গ্রামের বিরাট মেলা প্রাঙ্গণে। শরৎ-স্মৃতি গ্রন্থাগার শরৎ-মেলা পরিচালন সমিতি ও শরৎচন্দ্র জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব সমিতির সমবেত উদ্যোগে এই মেলা উপলক্ষে তিন দিন ধরে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রথম দিন শরৎ মেলার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও ত্বরিত পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তারা তিনটি স্বতন্ত্র মঞ্চ নির্মাণ করেন—ভুবনমোহিনী মঞ্চ হিমন্ময়ী মঞ্চ ও মতিলাল মঞ্চ। ২৫ তারিখের বিকেলে ভুবনমোহিনী মঞ্চে ডঃ অজিতকুমার ঘোষের নেতৃত্বে নাট্যশাখার অধিবেশন বসে। নাটকের বিভিন্ন দিক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন সর্বশ্রী দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নক্ষত্র নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক শ্যামল ঘোষ ডঃ প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত ও ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় দিনের সকালে একই মঞ্চে ডঃ সরোজমোহন মিত্রের সভাপতিত্বে শরৎ সাহিত্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, অনুনয় চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা কথাসাহিত্য ও কাব্য শাখার অধিবেশন সম্ভবত ওই দিনের সবচেয়ে উল্লেখ্য সাহিত্য অধিবেশন ছিল। কথাসাহিত্য শাখায় সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শাখায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী রবিউদ্দিন আহমেদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার প্রমুখ। শ্রীবিভূতি দাস শরৎচন্দ্র ব্যবহৃত একটি গড়গড়া এই সভায় শরৎচন্দ্রের ভাগিনেয় শ্রীনন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে অর্পণ করেন।

কাব্যশাখায় সভাপতিত্ব করেন মণীন্দ্র রায়। সভাপতির সরস অথচ অতি মূল্যবান সংক্ষিপ্ত ভাষণ ছাড়া কবিতা পাঠ করেন সর্বশ্রী সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত শিবশম্ভু পাল সুতপা মিত্র, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, শান্তনু দাস, রাণা বসু, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শক্তিব্রত ঘোষ ইত্যাদি। এই শাখার সবচেয়ে উল্লেখ্য হল কবিদের মধ্যে দুজন একক রবীন্দ্রসঙ্গীত যেমন পরিবেশন করেন তেমনি সমবেতভাবেও শ্রোতাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়ে তৃপ্ত করেন।

মেলার শেষ দিনের অনুষ্ঠানে দুপুরের শিশুসাহিত্য শাখায় সভাপতিত্ব করেন বীরেন্দ্র দত্ত। শিশুসাহিত্য সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ ও দীর্ঘ ভাষণ দেন শ্রীবিদ্যুত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তি করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখেন একটানা। অন্যান্য আলোচকদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপিকা স্বপ্না মজুমদার শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষাল। শ্রোতাদের থেকেও ছোট ছোট মেয়েরা আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করে।

তিন দিন ধরে বিভিন্ন নাট্য সংস্থার সুনাটক অভিনয়, প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী নীলিমা সেনের গান, শিল্পী দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের একক সঙ্গীত পরিবেশন, পঃ বঃ লোকরঞ্জন শাখার 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যানুষ্ঠান পূর্ণচন্দ্র দাস ও সম্প্রদায়ের লোকগীতি, অধ্যাপিকা স্বপ্না মজুমদারের একক গান 'শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি' চলচ্চিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সমবেত হাজার হাজার দর্শক শ্রোতাকে বিস্ময়-নিবিষ্ট করে রাখে। শরৎ স্মৃতিধন্য পাণিত্রাস গ্রামের মেলা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে এমন জনসমাগম ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদে প্রকাশিত 'শরৎ মেলা স্মারক গ্রন্থ'টি এবং 'মিলন মেলা' নামে সাহিত্য সংকলনটি উৎসবের অন্যতম অলংকার বিশেষ।

মায়াকোভস্কি সাহিত্য ক্লাবের উদ্বোধন: বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েত বিপ্লবী কবি ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কির নামানুসারে এক নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সংস্থা 'মায়াকোভস্কি ক্লাবে'র উদ্বোধন সম্প্রতি গোর্কি সদনে করেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। এই নবগঠিত সংস্থা ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির (পঃ বঙ্গ) সঙ্গে যুক্ত। মায়াকোভস্কি ক্লাবের কর্মপরিষদের সভাপতি হয়েছেন শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীসন্ধ্যেশ্বর সেন। সংস্থার উদ্দেশ্য বিবৃত করে তাঁরা ভাষণ দেন। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র এই আশা প্রকাশ করেন যে, এই সদ্য-গঠিত সংস্থাটি ভারত-সোভিয়েত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে ও শিল্প-সাহিত্যের এক সুস্থ মানবতাবাদী ধারার পরিপোষণে যথার্থ ভূমিকা গ্রহণ করবে। শ্রীমণীন্দ্র রায় ও ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি-সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীতরুণ সান্যাল সংস্থাকে শুভেচ্ছা জানান। কলকাতাস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধান শ্রী এস পারামোনোভ মায়াকোভস্কির কাব্য সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে রেকর্ডে মূল রুশ ভাষায় মায়াকোভস্কির কবিতার আবৃত্তি হয়। বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন শ্রীসতীন্দ্রনাথ মৈত্র। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সর্বশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র কৃষ্ণ ধর রাম বসু, চিত্ত ঘোষ ধনঞ্জয় দাশ অমিতাভ দাশগুপ্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, নবারুণ ভট্টাচার্য, দেবী রায়, অমরেশ পট্টনায়ক দীপেন রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শ্রীমনোজ বসু, শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী প্রমুখ কবি সাহিত্যিকরা উপস্থিত ছিলেন। মায়াকোভস্কি ক্লাবের ঠিকানা ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির রাজ্য দপ্তর, ৭৭ লেনিন সরণী কলকাতা-১৩য় যোগাযোগের আবেদন করা হয়েছে।

নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান

নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের পশ্চিমবঙ্গ শাখা ও অভিনব অগ্রণী পত্রিকার উদ্যোগে নেতাজীর ৭৯তম জন্মদিবসে শিশু ও কিশোর সাহিত্য সম্মেলন হয়ে গেল বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব হলে। প্রাতঃকালীন অধিবেশনে হাওড়া বার্তা সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ পাল ও কবি-সাংবাদিক সুধীর বেরা নেতাজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষণ দেন। 'রামধনু' সম্পাদক অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 'সাহিত্যিক আড্ডা' সম্পর্কে একটি রচনা পাঠ করেন এবং প্রবীণ শিশুসাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক কয়েকটি হাস্যরসাত্মক কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। বৈকালিক অধিবেশনে সাংবাদিক প্রফুল্ল দাশগুপ্ত ও

শিক্ষাব্রতী চিররঞ্জন সিংহরায় যথাক্রমে ছোট ছোট পত্র-পত্রিকার সমস্যা এবং শিশুমনে রূপকথার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় শিশির সাঁতরার পরিচালনায় সাহিত্য পাঠের আসরে অংশ গ্রহণ করেন দিলীপকুমার বাগ, অজিতকুমার দাস, আশিসকুমার ঘোষ ধূর্জটি দত্ত কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর বসু এবং শিশির মজুমদার।

অধ্যাপিকা কৃষ্ণা ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ভুবনেশ্বর থেকে আগত কেন্দ্রীয় ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রের বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীগণ নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই সম্মেলন উপলক্ষে পত্র-পত্রিকা ও শিশু চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

কবি মধুসূদনের জন্মোৎসব

নবীন লেখকদের উদ্যোগে সম্প্রতি সরোজ সাহিত্য পরিষদ ভবনে কবি মধুসূদনের জন্মোৎসব উদযাপিত হয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের বৈশিষ্ট্যদীপ্ত অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন জ্যোতির্ময় ঘোষ, হরপ্রসাদ মিত্র, মালা বসু, তুষারাভ রায়চৌধুরী শিবাজী গুপ্ত রাণীব্রত চক্রবর্তী। সরোজ সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে জীবন সরকার সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

অমৃত সাহিত্য চক্র

আসামের লামডিং-এ 'অমৃত সাহিত্য চক্র' নামে একটি সাহিত্য সংস্থা গঠিত হয়েছে। সেখানকার সাহিত্যানুরাগীদের উদ্দীপনাতেই এই সংস্থার উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণারঞ্জন বসু। শ্রীবসু বর্তমান সাহিত্যিকদের জীবনাদর্শ এবং আজকের মানুষের সঙ্গে সাহিত্যের নিবিড় যোগাযোগের ওপর দীর্ঘ আলোচনা করেন।

'অমৃত সাহিত্য চক্রে'র একটি কার্যকরী সমিতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছে :—অধ্যক্ষ সুখময় মজুমদার (সভাপতি), অধ্যাপক মনোমোহন নাথ (সহ-সভাপতি), খগেন্দ্র মজুমদার (সম্পাদক) সুজিত সেনগুপ্ত (সহ-সম্পাদক)। সদস্য—অজিতকুমার রায়, ভীমরবরণ নাথ, হরেন্দ্রকুমার ধর, কাজলকুমার চক্রবর্তী, নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অজিতকুমার সেন।

নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন

আগামী মার্চ মাসে মহীশূরের ভারতীয় ভাষা গবেষণা কেন্দ্রে নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে সারা ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনে শিশু সাহিত্যের উপর রচিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা—শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৫।২৫ সেবক বৈদ্য স্ট্রীট, কলকাতা-২৯।

নতুন বই
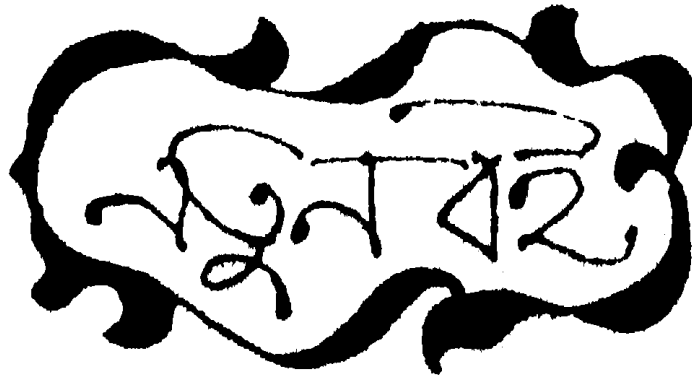
লালন স্মারকগ্রন্থ—আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। ৬৭-এ পুরানা পল্টন। ঢাকা-২। বাংলাদেশ। আট টাকা।

বাংলার নিজস্ব সংগীত বাউল গানের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ লালন শাহের দ্বিশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে বর্তমান স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন ঢাকার জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র। লালন সম্পর্কে এই জাতীয় গ্রন্থ সম্ভবত এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হল।

বাউল সম্রাট লালনের যুগান্তকারী প্রতিভার প্রতি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি অবশ্য লালনের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন নানাভাবে। যদিও তাঁর আগে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে লালন সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছিল। লালনের প্রথম জীবনী লেখেন শ্রীবসন্তকুমার পাল। পরবর্তীকালে আরো অনেক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে লালন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে ব্যাপকভাবে গান সংগৃহীত হয়েছে অনেক।

বর্তমান স্মারকগ্রন্থে লালনের জীবন, সংগীত ও সাধনা সম্পর্কে পাওয়া যাবে একটি অন্তরঙ্গ পরিচয়। লালন চর্চার একটি ধারাবাহিক প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থে আরও পাওয়া যাবে বেশ কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য রচনার সন্ধান। লালন সম্পর্কে 'হিতকরী' পত্রিকায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ৩১ অকটোবর যে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল সেটি স্থান পেয়েছে বর্তমান গ্রন্থে।

সংকলনে যাঁদের রচনা স্থান পেয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন, বসন্তকুমার পাল সরলা দেবী মতিলাল দাশ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কাজী মোতাহার হোসেন, চিত্তরঞ্জন দেব শচীন্দ্রনাথ অধিকারী মুহম্মদ আবদুল হাই আহমদ শরীফ বিশ্বনাথ মজুমদার, এ এইচ এম ইমামউদ্দীন আবদুল আহসান চৌধুরী এবং মুহম্মদ সমসুরউদ্দীন। গ্রন্থ শেষে লালন সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের মন্তব্য, লালন গীতির স্বরলিপি এবং বসন্তকুমার পালের আশীর্বাণী স্থান পেয়েছে।

স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন তরুণ গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী। তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। লালন শাহ সম্পর্কেই মাত্র নয়, সামগ্রিক বাউল সাহিত্য আলোচনায় বর্তমান গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

ভাগ্যফল জানুন (১৯৭৫-৭৬)। শ্রীভৃগু। বসু পুস্তকালয়, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-১২। সাড়ে তিন টাকা।

গত বছরের মত এ বছরেও শ্রীভৃগু রচিত 'ভাগ্যফল জানুন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীভৃগু প্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষী। তাঁর দীর্ঘদিনের জ্যোতিষচর্চার অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর আছে এ গ্রন্থে। গত বছরের থেকে এ বছরের গ্রন্থে নূতন সংযোজন হল—পৃথক মাসফল রাশি অনুযায়ী হিসাব তান্ত্রিক মতে বিচার লগ্নফল নক্ষত্রফল ইত্যাদি। ইনি ১৯৭৬-এর সম্ভাব্য রাশিফলও এতে দিয়েছেন। ফলে অনুসন্ধিৎসু ও উৎসাহী সাধারণ মানুষ নিজের ভাগ্য সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করতে পারবেন। গ্রন্থটির বিচার যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও যথাযথ। আলোচ্য পর্যায়ের অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে এটিও একটা উল্লেখ্য সংযোজন।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রসঙ্গে। সুর দাস। লিপিকা, ৩০।১এ কলেজ রো কলকাতা-৯। আট টাকা।

দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার, সমাজ বিকাশ ও সুষ্ঠু রূপায়ণের ওপরেই একটা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ়সম্বদ্ধ হয়ে ওঠে। দেশের বেকার সমস্যার সমাধান একটা অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত কর্ণধারদের সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কিত ভাবনার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগই দেশের সমস্ত সম্পদকে একটি সংযম কেন্দ্রে আনতে পারে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি আজ একাধিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিভাবে সক্রিয় ও আশানুরূপ ফলদানে সক্ষম শ্রীসুর দাস রচিত 'রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রসঙ্গে' গ্রন্থটি তার চমৎকার ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করেছেন। 'পরিশিষ্ট' বাদে মোট ছয়টি স্বতন্ত্র অথচ দীর্ঘ এবং যুক্তিনিষ্ঠ সুচিন্তিত প্রবন্ধে লেখক শ্রীসুর দাস রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যোগে প্রত্যাশার ব্যর্থতা থেকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিধির আলোচনা করেছেন। 'পরিশিষ্ট' অংশটি প্রমাণ করে লেখকের প্রবন্ধগুলি লেখার সময়ের শ্রম নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ আন্তরিকতা ও চিন্তাশীলতা। বাস্তবিকই আলোচ্য গ্রন্থের নিপুণ পর্যালোচনা 'রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ সম্পর্কিত প্রকাশন সমূহের সঙ্গে মূল্যবান সংযোজনরূপে পরিগণিত হবে।'

একটি খুনের কাহিনী (উপন্যাস)। নিশাচর। জ্যোতি প্রকাশন, ২-এ নবীন কুণ্ডু লেন কলকাতা-৯। ছ টাকা।

নিশাচর গোয়েন্দা গল্প লেখক হিসেবে ইতিমধ্যে কিছু খ্যাতি অর্জন করেছেন। আলোচ্য 'একটি খুনের কাহিনী' উপন্যাসে সেই রহস্যময় খুনের কিনারায় যে রুদ্ধশ্বাস কাহিনী রচিত হয়েছে তা না পড়লে এর রহস্যরস আস্বাদ করা যাবে না। গোয়েন্দা গৌতম সেন রজতবাবুর পিছনে ঘুরছে রজতের ভাবী শ্বশুরের অনুরোধেই রজত-

বাবুর দেখা এক মৃতদেহের খুনের কিনারা করতে। এরই জটিল সূত্রে আসে রজতের প্রেমিকা সুপ্রিয়া দেবী, সুপ্রিয়া দেবীর বান্ধবী কনক, আসে বিমলেন্দু সরকার রহিম শেখ ইত্যাদি চরিত্র। উপন্যাসটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় কাহিনীর কারণেই রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। গোয়েন্দা গল্পের যে স্বাভাবিক পরিণতি তা এখানেও বর্তমান। লেখক নিশাচর গোয়েন্দা গল্প যে সহজ সরলভাবে অথচ চমৎকার জটিল জটে জড়িয়ে বলতে জানেন এই গ্রন্থ পাঠে বোঝা গেল।

সর্বৌষধি শিবাম্বু। শান্তিলাল ভট্টাচার্য। ৩১ শিবনারায়ণ দাস লেন কলিকাতা-৬ : তিন টাকা।

শান্তিলাল ভট্টাচার্য প্রণীত 'সর্বৌষধি শিবাম্বু' নামক গ্রন্থটি চিকিৎসা বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ। এতে লেখক 'মানবমূত্র হৃদরোগের এক মহৌষধি' এই সম্পর্কে আলোচনা বিশ্লেষণ ও নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন। যোগাসনের উপযোগিতা সম্পর্কেও উদ্ধৃত করেছেন। খেলাধুলা ও ব্যায়াম সম্পর্কেও লেখকের সুচিন্তিত মতামত এ গ্রন্থে ব্যক্ত। তবে লেখক এই গ্রন্থে 'মানবমূত্র' সম্পর্কেই প্রধান আলোচনায় নিজ বক্তব্যকে নিবদ্ধ রেখেছেন। রুচি পরিবর্তনের যুগে স্বমূত্র পানে দ্বিধা থাকবেই। তবু লেখক নানাভাবে স্বমূত্রের উপকারিতা ও রোগনির্ণয়ে তার প্রয়োগের যৌক্তিকতাকে যেভাবে আলোচনা করেছেন সর্বশ্রেণীর পাঠকদের পক্ষে তা যথেষ্ট উপকারে লাগবে।

লিঞ্চিং (নাটক)। শুভংকর চক্রবর্তী। জনতার মুখ প্রকাশন শান্তিপুর নদীয়া : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ছোটবড় মিলিয়ে মোট বাহান্নটির মত চরিত্র নিয়ে শুভংকর চক্রবর্তীর লেখা নাটক 'লিঞ্চিং'। নাটকটির বক্তব্য সর্বকালের মানবতার কথায় স্থিত। একদিকে বর্ণবিদ্বেষের পটভূমিকায় আমেরিকার নিগ্রো সম্প্রদায়, আর একদিকে ভারতবর্ষের হরিজন তুকারামের রক্তে ভেজা মহারাষ্ট্রের মাটির ইতিহাস—এই দুই ভয়ঙ্কর মানবতাবিরোধী বক্তব্যকে এক মহত্বে মানবতার জয়গানের উচ্চগ্রামে বেঁধে নাট্যকার 'লিঞ্চিং' নাটকটি আমাদের উপহার দিয়েছেন। নাটকে অভিনয়-উপযোগী নাট্য কৌশল অবলম্বন প্রশংসনীয়। ব্যঙ্গের কশাঘাত নাটকটির বক্তব্যকে নিপুণভাবে দর্শকমনে আবেদন জাগাতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম।

মামা মন্ত্রী হবেন (নাটক)। ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। নির্মল পুস্তকালয়, ১৮-বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২। তিন টাকা।

মামা মন্ত্রী হবেন ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রচিত এই নাটকের নামকরণেই প্রমাণিত হয়—নাটকটি হাসির। রঙ্গ তামাশা থেকে সুরু করে ব্যঙ্গ পর্যন্ত এ নাটকে উপস্থিত। হাসির নাটক অভিনয়ে খোলে। আলোচ্য প্রহসনটি মঞ্চে ভালই হাসির রস যোগাবে বলে বিশ্বাস। মহিম মহাপাত্র থেকে সুরু করে পটলা ন্যাপলার দলকে অতিপরিচিত বলতে দ্বিধা নেই। লেখকের সিচুয়েশান সৃষ্টির দক্ষতা সংলাপে গতি সৃষ্টির ক্ষমতা চরিত্রকে আদ্যন্ত একটি নাট্য-ন্যায়ে ধরে রাখার নিপুণতা চমৎকৃত করে। ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একাধিক নাটক পড়েছি, মঞ্চস্থও হয়েছে একাধিক। আলোচ্য নাটকটি সেই সমস্ত নাটকের সুনামের যোগ্য পরিচয়পত্র বিশেষ।

সংকলন ও পত্র পত্রিকা

অধুনা সাহিত্য : সম্পাদক : সুধাংশুকুমার মুখোপাধ্যায়। হালিশহর চব্বিশ পরগণা। দাম : এক টাকা।

অল্প কয়েকটি পাতার পত্রিকা। কিন্তু তবু তার মধ্যে ছড়িয়ে আছে অনেক সিরিয়াস চিন্তার খোরাক। সমীরকান্তি বিশ্বাস-এর ফ্রানজ কাফকা: হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের খণ্ড অখণ্ডতা প্রতিকৃতি: দুই—এ দুটি লেখাতে ভাবনার অনেক কিছুই আছে।

সাহিত্য কল্প : সম্পাদক : অসিত হালদার। সাইপালা বসিরহাট। দাম : দু টাকা।

লেখক তালিকায় উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের মধ্যে রয়েছেন মণীন্দ্র রায় জীবন সরকার স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় শান্তনু দাস রফিকুল হোসেন খান।

মহুয়া : সম্পাদক : সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৩বি।৭ গোয়ালাপাড়া রোড বেহালা। দাম : দু টাকা।

মোটামুটি সাবলীল ভঙ্গিমায় নতুন ধরনের কয়েকটি প্রবন্ধ কবিতা ও গল্প লিখেছেন উজ্জ্বল সিংহ শুদ্ধসত্ত্ব বসু গোপাল ভৌমিক পবিত্র মুখোপাধ্যায় সুনীল বসু নির্মলেন্দু রক্ষিত হামিদুল ইসলাম।

অভিথি : সম্পাদক : অসিতকৃষ্ণ দে। ৩৫।১বি বাগবাজার স্ট্রীট কলকাতা-৩। দাম : দেড় টাকা।

ত্রিমাসিক এই সাহিত্যপত্রিকাটির এই সংখ্যাটি মোটামুটি মনোগ্রাহী হয়েছে। কয়েকটি রসোত্তীর্ণ লেখার জন্য পত্রিকাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তার লেখকরা হলেন বিমল কর বুদ্ধদেব গুহ দিব্যেন্দু পালিত অমিতাভ দাশগুপ্ত আইভি রাহা গোপাল ভৌমিক শেফালী নন্দী।

নবাংকুর : সম্পাদক : বিকাশচন্দ্র দাস। ৩০ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড ব্লক ডি কলকাতা-৫৪। দাম : দেড় টাকা।

বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন বনফুল কুমারেশ ঘোষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ দেবল দেববর্মা জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণধর নচিকেতা ভরদ্বাজ শান্তশীল দাস।

তরুণতীর্থ : সম্পাদনা : অজিত সেন। ৩৭ রিপন স্ট্রীট কলকাতা-১৬। দাম : দু টাকা।

কিশোরদের পত্রিকা। গল্প কবিতা নাটকে তাই তারুণ্যের উচ্ছলতা। আসর সাথীদের পাতা একটি সুন্দর সংযোজন।

বর্ণালী : সম্পাদক : প্রবীর ঘোষ। কবি জঙ্গধর রোড বসিরহাট। দাম : দু টাকা।

এ সংখ্যায় লিখেছেন বনফুল প্রেমেন্দ্র মিত্র অন্নদাশঙ্কর রায় হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণারঞ্জন বসু স্বপনবুড়ো অজয় বসু মনকুমার সেন নচিকেতা ভরদ্বাজ বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বীণা : ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা। সম্পাদনা : হীরেন্দ্রনাথ ঘোষ অমিয়কুমার দাস। দাম : এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

সাহিত্য বিচিত্রা : সম্পাদক : কমল চট্টোপাধ্যায়। আদ্রা পুরুলিয়া।

জাগরী : সম্পাদনা : অপূর্বকুমার সাহা। ৭৪।৫এ বাগবাজার স্ট্রীট কলকাতা-৩। দাম : দেড় টাকা।

এই সংখ্যায় কয়েকটি সার্থক রচনার লেখক হলেন গোপাল ভৌমিক শক্তি চট্টোপাধ্যায় নলিনীকান্ত গুহ অন্না রায়।

ঝংকার : সম্পাদক কল্লোল সরকার। খোলাপোতা। ২৪-পরগণা। দাম : এক টাকা।

পবিত্র জানা রায় এবং শ্যামল সরকারের প্রবন্ধ এবং কল্লোল সরকারের গল্প এই সংখ্যার বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।

ঘোড়সওয়ার

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

সত্য আর কবিতা এই দুয়ের কোনো বিশেষণ হয় না। 'খানিক খানিক সত্য' মানে মিথ্যা; 'বেশি বেশি সত্য' মানেও তাই। কবিতার বেলাতেও তেমনি বলা যায়—একটু একটু কবিতা কোনো কবিতা নয়। বেশি বেশি কবিতাও তেমনি কবিতাকে ছাড়িয়ে গিয়ে কিছু একটা হতে চায়। কবিতা-পাঠকদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কথা উচ্চারণ করি। কেউ কেউ কবিতা বোঝে। কেউ কেউ বোঝে না। খানিক খানিক কবিতা বোঝা খানিক খানিক পাঠা কাটতে পারার মতোই হাস্যকর। এবং যে কবিতা বোঝে তার কাছে শক্ত কবিতা সোজা কবিতা বলে কিছু নেই—আছে একমাত্র কবিতা। আর কবিতার দিক থেকেও বলতে পারি, সে শুধু রসিকের কাছেই ভোগ্য ও ভেদ্য। অন্যের কাছে সে চিরকাল আবৃত। সে কারণে কবিতার মানে ঠিক করে দেওয়াও খুব দুরূহ ব্যাপার। একটি কবিতার অংশ-বিশেষের অর্থ এক একজনের কাছে এক-এক রকম হতে পারে। এই সব অর্থের একটি রেখে অন্য একটি ফেলে দেওয়াও তাই ভুল। হয়তো কোনো একটি অর্থকে আমরা কেউ গ্রহণ করতে পারি। অপর কেউ নিতে পারেন অন্য একটি অর্থকে। কিন্তু দুজনের কেউই বলতে পারেন না, অন্য অর্থটা বাতিল। তুলনা চলে না, তবু তুলনা দিতে ইচ্ছে করে একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের সামনে বিস্ময়ে সমবেত কয়েকজনের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার পার্থক্যের সঙ্গে। সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের মূল বিষয় (কবিতার ক্ষেত্রে টোটাল মিনিং) কীভাবে ধারণ করে রেখেছে নদীর বাঁক আকাশের আলো তটের রেখা জলের রঙ ইত্যাদিকে—তা এক একজনের কাছে এক একভাবে বিভাসিত হবে। কবিতার ক্ষেত্রে এই সব ব্যক্তিগত উপভোগ এমন ভাবেই প্রতীক, পুরাপ্রসঙ্গ, অ্যাটিচুড ও টোনের সমন্বয়ে ও বৈশিষ্ট্যে ছন্দোস্পন্দে নানা ভিন্ন তাৎপর্যের সন্ধান দেয়। মনে রাখা দরকার এতে কবিতাটির বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের কোনো পুনঃসৃষ্টি হয় না, তারা যেখানে যাকার সেখানেই থাকে। তারা যা তার অতিরিক্ত কিছু না, অন্যূনে কিছু নয়। মাঝখান থেকে আমরা লাভবান হই পরস্পরের আস্বাদনের অভিজ্ঞতা-বিনিময়ে।

॥ দুই ॥

'চোরাবালি'র 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি না পড়ে আধুনিক বাংলা কবিতার অঙ্গনে পদার্পণ করেন এমন বোধ হয় কেউ নেই। আধুনিক বাংলা কবিতার আকাশে সাতটি তারার মতো যে-সাতটি বিভিন্ন কবির কবিতা দিকনির্দেশক হয়ে দীপ্তি দিয়ে চলেছে তাদের কথা আমরা থেকে থেকে মনে করি নানা অন্ধকারে। এই সাতটি তারা হল প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'আমি কবি যত কামারের', অমিয় চক্রবর্তীর 'সংগতি', বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উটপাখি', জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন', বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রথম দিনের সূর্য'। এর মধ্যে আজকে আমাদের আলোচ্য 'ঘোড়সওয়ার'। কবিতাটি সম্বন্ধে আজও প্রধান ব্যাখ্যা—অবশ্যমান্য রসভাষ্য, হয়ে রয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'চোরাবালি'-আলোচনা। এই আলোকসম্পাতী কবিতাটির অন্যতম রসগ্রাহী ছিলেন ঐ মনস্বী কবি। ঐ ঠাসা জমাট, বৈদগ্ধ্যে ও উপলব্ধিতে অভিন্ন, প্রবন্ধটি পড়ার পরে 'ঘোড়সওয়ারে'র নিহিত অর্থ সম্বন্ধে আর প্রশ্ন না জাগাই বিধেয়। তবু কাব্য-পাঠ, কাব্য-রচনার মতোই আটপৌরে উদ্দেশ্য-বিধেয়ের স্মারবর্তী হয়ে থাকে না। তাই কবিতাটি—যাকে কবি মুক্তি দিয়েছেন সেই ১৯৩৫-এর জানুয়ারি মাসের এক প্রবল জ্বরোত্তপ্ত রাত্রির অন্তে—কিসের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে? কেন সে শুধু দাঁড়িয়েই থাকল না, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলছে—আজও চলছে—কবিতাটির মধ্যে সেই পরমায়ুর উৎসটি কোথায়—তা জানা বোধ হয় এ আলোচনায় আমাদের মতো সাধারণের এক প্রধান লাভ। এবং সে আলোচনার প্রারম্ভে যদি মনে রাখি কী বলেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ কবিতাটি সম্বন্ধে এবং সে কথা পড়ে রবীন্দ্রনাথ কী লিখেছিলেন অমিয় চক্রবর্তীকে, তাহলে কী আমরা খুঁজছি তাও স্পষ্ট হবে। সুধীন্দ্রনাথ 'ঘোড়সওয়ারে'র কবির 'চর্যা ও চর্চা'র একাগ্রতাকে, 'বোধি ও বাক্‌পতি'র ঐকান্তিকতাকে এবং 'অন্তর ও বাহিরে'র অভিন্নতাকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছিলেন—'এই ইন্দ্রজালের সর্বপ্রধান নিদর্শন 'চোরাবালি' কবিতা; এবং যাঁদের কাছে যুং-প্রমুখ পুরাণবিদেরা নামমাত্র, তাঁরাও বুঝবেন যে চোরাবালি আর ঘোড়সওয়ার শুধু রিরংসার রূপক নয়, তাদের উপরে প্রকৃতি-পুরুষ বা ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ সহজ ও শোভন।' রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথের এই আলোচনাটি পড়েন—অবশ্য তার আগেই পড়েছিলেন কবিতাটি। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'ঐ বইটি এবং ঐ নামের কবিতাটি পড়েছি; বোঝবার এবং ভালো লাগবার একান্ত ইচ্ছা করেছি। বুঝতে পারিনি।' আমরা হাসিমুখেই গ্রহণ করি 'কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট'-এর লেখকের ভালো লাগা এবং মানে বুঝতে চাওয়াকে এক করতে চাওয়ার চেষ্টাকে। সুধীন্দ্রনাথের আলোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য আরেকটুকু উদ্ধৃত করি—'তার নির্দেশমতো বোঝবার চেষ্টা করলুম। একটা সংশয় তাঁর আশ্বাস সত্ত্বেও রয়ে গেল। তিনি বলেছেন এই কবিতাটির অবলম্বন রিরংসা নয়। প্রথম পড়বার সময় সে-সংশয় স্বভাবতই আমার মনে ছিল না, তাই অর্থ বুঝতে অত্যন্ত গোল ঠেকেছিল। সুধীন্দ্র সংশয়কে নিরস্ত করতে গিয়েই তাকে জাগিয়ে দিলেন। কাব্য হিসাবে এর গুণাপনা আছে, কিন্তু শ্রাব্য হিসাবে এটা আমার কাছে বহুদূরে বর্জনীয়।'[1] আমাদেরও কিন্তু দুটি ব্যাপারে গোল ঠেকছে—এক, অর্থ তাহলে যাহোক একটা তিনি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন, যা একটু আগেই তিনি বলেছেন 'বুঝতে পারিনি'। দুই, এ-কাব্যের 'গুণপনায়' তাঁর সন্দেহ নেই, শুধু, সম্ভবত 'রিরংসা'র কারণেই 'শ্রাব্য' হিসাবে তিনি এটাকে দূরে ঠেলতে চান; ব্যাপারটা তো হলে আর তাঁর কাছে কাব্যের নয়, এথিকসের?

॥ তিন ॥

একজন অতিসাধারণ পাঠক মফস্বল থেকে শেয়ালদাগামী ট্রেনে বসে ১৯৩৫-এর এক গ্রীষ্মদুপুরে কবিতাটি তার জীবনে প্রথম পড়েছিল। তখন তার বয়স হবে সতেরো-আঠারো। কবিতাটির দ্বারা সে বিপুলভাবে অধিকৃত হয়েছিল। কিন্তু সেই পাঠকের একথা তিলেকের জন্যও মনে হয়নি, একটি রিরংসার রূপক কবিতাটিতে সক্রিয়। সেই অনভিজ্ঞ পাঠক ও আজকের প্রৌঢ় ম্লান পাঠকের মধ্যে বহু অমিল—একটাই মিল। প্রথম ভালবাসাগুলো খুব কমক্ষেত্রে পাল্টিয়েছে। আজও দাঁড়িয়ে আছে কবিতাটি তার কাছে রূপক-নিরপেক্ষভাবে। রিরংসার রূপক এর মধ্যে থাকতে পারে জেনেও তার কাছে কবিতাটি নতুন কোনো অর্থ পরিগ্রহ করেনি—শুধু কবিতাটির টীকাগত ডাইমেনশন বাড়ল। 'অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার' —এই আকুল আহ্বান ও প্রতীক্ষা হয়তো আর একটা স্তর পায় এই মাত্র। কিন্তু সে-স্তর তো সত্যিই, যেমন সুধীন্দ্রনাথ

[1] চিঠিপত্র—একাদশ খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—২৬৫ পৃষ্ঠা

বলেছেন ভক্ত-ভগবান বা পুরুষ-প্রকৃতির রূপক থেকেও নিষ্কাশিত হয়—হতে পারে। প্রতীকী কবিতার ধর্মই এই। তা বহুভাবে স্পর্শ করে। এক এক ক্ষেত্রে তা এক এক রকমের অর্থ-বিচ্ছুরণে সক্ষম। প্রসঙ্গত একটা তথ্য নিবেদন করি। ১৯৪২ সালে মার্টিন কার্কম্যান নামে এক ইংরেজ সৈনিক যুবক এ-দেশে আসেন। স্টেটসম্যান ইংরাজী দৈনিকের তখনকার সোলজার্স কর্ণারে তিনি লিখতেন। বাংলা সাহিত্যে অনুরাগী এই যুবক বাংলা ভাষা থেকে 'ঘোড়-সওয়ার' কবিতাটি ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। সেই বামপন্থী যুবকের এতাদৃশ উৎসাহের কারণ—'ওটা নাকি একমাত্র জনগণের কবিতা।' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এ মন্তব্য শুনে বলেছিলেন—'তা হতেই পারে। একটা প্রতীকী কবিতার বহু অর্থ ধারণের ক্ষমতা থাকে'।২

তাহলে নয়-নয় করে এতক্ষণে আমাদের হাতে চারটে ব্যাখ্যা জমে গেল—এক রিরংসার রূপক, সুধীন্দ্রনাথ যাকে প্রশ্রয় দিতে চাননি। দুই এবং তিন পুরুষ-প্রকৃতি এবং ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যা সঙ্গত নয়, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের মতে যা শোভন এবং সঙ্গত। চার, মার্টিন কার্কম্যানের ব্যাখ্যা, এটা একটা পিপলস পোয়েট্রি। আমাদের বক্তব্য এই যে, চারটি ব্যাখ্যার সঙ্গে কোনো বিবাদ আমাদের নেই। কিন্তু কবিতাটির ব্যাখ্যা করতে হবে মূলতঃ কবির দিক থেকে। তখন আমরা দেখেছি যে, ঐ চারটি ব্যাখ্যার কেউই হারিয়ে যায়নি, এবং সেটাই আসল কথা, সব ব্যাখ্যাগুলির সহযোগে সংযোগে গড়ে ওঠে পঞ্চম অর্থ। তা আমাদের অনেকের কাছে ধানিয়ে এসেছে অনেকদিন ধরে।

॥ চার ॥

কবিতাটি লিখিত হয়েছিল বড় অদ্ভুত অবস্থায়। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসের চার কি পাঁচ তারিখ। কবি রিউম্যাটিক ফিভারে শয্যাগত। আগের রাত্রি কেটেছে প্রবল জ্বরে, ডিলিরিয়মে। ভোরের দিকে তিনি কতকটা আচ্ছন্ন অবস্থাতেই কাগজ-কলম চাইলেন। কাগজ-কলম পেয়ে এক ঝোঁকে তিনি 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটির প্রথমার্ধ লেখেন। তার পরে ঘুমিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ বাদে ঘুম থেকে জেগে বাকি অর্ধ শেষ করেন। অনুমান '+ — +' এই চিহ্নভাগ বোধ সেই রচনাভাগের স্মৃতিকে বহন করছে আজও। পারিবারিক বন্ধু জীবনময় রায়, বিষ্ণু দে কেমন আছেন দেখতে এসে কবিতাটির প্রথমার্ধ পড়েন। তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে যিনি এই তথ্য জানিয়েছেন তিনি স্পষ্টতই বলেছেন যে, কবিতাটির বিচারে এসব তথ্য হয়তো 'অনাবশ্যক'। হয়তো—হয়তো অনাবশ্যক নয়।

এটা বিশিষ্টভাবে 'অনাবশ্যক' হতে পারে। কিন্তু কবিতাটি সংক্রান্ত নানা অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে দেখলে তথ্যটি আর অনাবশ্যক থাকে না। আমি এই অনুচ্ছেদের শুরুতেই বলেছি, কবিতাটি লিখিত হয়েছে এক অদ্ভুত অবস্থায়—কিন্তু নিশ্চয় কবিতাটির মৌল শক্তিগুলি সঞ্চিত হয়েছে লিখিত হবার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই কবির অবচেতনে। কারণ অবচেতনের চাপ অত প্রবল ছিল বলেই কবিতাটি অমন অনর্গল উৎসারিত হতে পেরেছিল। অবচেতনের বিস্তৃত অঞ্চল ওখানে অবারিত হতে পেরেছে বলেই কবিতাটি প্রায় একটি ড্রিম পোয়েমের সগোত্র—কোলরিজের কুবলাখানের সৃষ্টিরহস্য মনে পড়াও বিচিত্র নয়।

শুধু 'ঘোড়সওয়ারে'র ক্ষেত্রেই নয়, একটা ভালো কবিতার সৃষ্টিরহস্যের বিষয়টিও আমাদের কাছে মেলে ধরে ঘোড়সওয়ারের সৃষ্টিকথা। বাইরের ঘটনা জনশ্রুতি অধীত অভিজ্ঞতা, সাহিত্যপাঠ সব এসে যুক্ত হয়েছে তৎকালীন বিষ্ণু দে-র ব্যক্তি-জীবনের মুক্তিবাসনার সঙ্গে। এই সকল কিছুর অভিঘাতে একটি স্বতঃসম্ভূত ফ্রাটেলিটি-কাল্টের প্রতিমা গড়ে উঠেছে কবিতাটিতে। এগুলি যে জানে না, তার কাছেও যে কবিতাটি ব্যর্থ হয় না তার কারণ কবিতাটি কবিতাই হয়েছে, তার বেশি কিছু সে হয়নি, কমও কিছু না। এবং কবিতাটির সেই স্বয়ংসিদ্ধি ঘটেছে কবিতার নিয়মেই। এ কবিতাতেও বহু অসম্ভবের সমাবেশ আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে মেনে নিই। যেমন নিয়েছি আমরা 'সোনার তরী' কবিতায়—শ্রাবণ মাসে ধানকাটা, পালতুলে ভরাবাতাসে নৌকা বাওয়া সূর্যহীন দিনে ছায়া তেমনি 'ঘোড়-সওয়ার' কবিতাতেও আমরা পাই, মেরু এবং বালুচর, নদী এবং হিমশিলাপাত, বরফ এবং মৃগতৃষ্ণিকা একই সঙ্গে উপস্থিত। এই অর্থবান অসঙ্গতিও কবিতাটিকে করে তুলেছে স্বভাব-নির্ভর।

কবিতাটি ভিতরে ভিতরে উদ্যত হয়েছে কিছুকাল ধরে। 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র দিনগুলি থেকেই বিষ্ণু দের চেতনাকে অধিগত করেছে এটা নিঃসঙ্গবোধ এবং কেউ একজন এসে, কিছু একটা ঘটে সে নিঃসঙ্গ থেকে তাঁকে উত্তীর্ণ করুক এই কল্পনা। —'আদিম ও স্তব্ধ সেই সঙ্গীহীনতায় এলে তুমি শুভ্র স্মিত রজনীগন্ধার মত একা' অথবা 'পৃথিবীকে চূর্ণ-চূর্ণ করে / আকাশ ছড়িয়ে এসো অন্ধকারে হৃদয়ে আমার' অথবা 'শ্রান্তি বয়ে বসে আছি বাতাসের স্নিগ্ধ প্রতীক্ষায় / মরুভূমি আকাশের চোখে স্নিগ্ধ ছায়ার আশায়' অথবা 'সমুৎকর্ণ অরণ্যানী ঊর্ধ্বগ্রীব পর্বতের মালা' প্রভৃতি উক্তি বোধ হয় তার তৎকালীন মুক্তি প্রতীক্ষাকেই সংকেত করে। 'কর্মহীন অবকাশ কর্কশ ও কঠিন গুমোটে / কাটে রৌদ্রতাপে' বা, 'দিন কাটে নিত্য ক্লান্তিহীন / রাত্রিও প্রশান্তিহীন—ত্রিশঙ্কু এ আমার হৃদয়', অথবা 'মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক' ইত্যাদি উক্তিতে ধ্বনিত হয় বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণা। সময়ের বিচারেও বলা যায় এই তো সেই সময়—যখন উত্তর-সাময়িক বিবর্ণতা নিরুদ্দাম নিস্তেজ বিষণ্ণতা চারিদিকের আকাশ বাতাস মন্থর ও ভারি করে ফেলেছিল। সেই বিচ্ছিন্নতা যেমন ছিল সেদিনের বাস্তবতার একদিক। আবার তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব, তা থেকে উদ্ধারের প্রয়াসও ছিল সচেতন অগ্রণী মানসের আর এক বাস্তবতা। তাই লেখা হয়, 'জলে স্থলে কম্পমান সৃজনের দৃঢ় প্রেমাবেগ, / আমার নিঃশ্বাস স্তব্ধ, কী বিস্ময় দুই চোখে জাগা'। লেখা হয়, 'পরিপক্ব ফল আজ পড়তে তো পারে না মাটিতে / গরমে যে নিরেট সাহস'। এই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিই এক অনিবার্য আবেগের জন্ম দিয়েছে কবি-মানসে। সেই 'সংহত' পেশিয়ার সহসা নদীরূপ ধারণ করেছে 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায়—কেন ভয়? কেন বীরের ভরসা ভোলো।

ভিতরে বাহিরের অভিন্নতা কবিতাটির ঐন্দ্রজালিক সিদ্ধির মূলে একথা আমরা শুনেছি। এখন দেখা যাক বহিরাধার কী ভাবে কবির ঐ অভিজ্ঞতাকে সাহায্য করল পাগ্রন্থ হতে। যে-মূল অভিঘাত থেকে কবিতাটির জন্ম, বাইরের কতকগুলি ঘটনা ও অভিজ্ঞতার উত্তেজনায় তা এবার নিষ্ক্রান্ত হল তার গোপনবাস ছেড়ে। এই উত্তেজক সূত্রগুলির একটি হল ময়মনসিংহের রাজা শশীকান্তের হাতির চোরাবালিতে ডোবার ঘটনা। আর একটি হল সমুদ্রতীরে ঘোড়া ডুবে যাওয়ার একটি বিদেশী গল্প। বলা বাহুল্য কবির কাছে কোনো দানই, কোন ঘটনার রূপক-ব্যঞ্জনা বা প্রতীকী আকর্ষণ একক ভাবে গ্রহণীয় নয়—কেউই একক ভাবে বর্জনীয় নয়। হাতী বা ঘোড়া দুয়ের গল্পেরই আদ্যন্ত রূপান্তর ঘটেছে কবিমনে—শুধু দুই কাহিনীর নির্বস্তুক সার বা সত্তাটি ব্যবহৃত হয়েছে কবিতায়। অ-৩

এই তথ্যগুলির জন্য এর পরে ব্যবহৃত জীবনীতথ্যগুলির জন্য আমি কবি-পত্নী শ্রীমতী প্রণতি দে-র কাছে ঋণী। আমাদের ব্যাখ্যায় যদি ভুল ঘটে তবে সে দায়িত্ব অবশ্যই আমাদের।

উন্নীত হল অন্যার্থে। গল্পদুটিতে যা বিপন্নের ব্যাকুলতা উদ্ধারের জন্য, কবিতাটিতে তার বদলে পেলাম বিচ্ছিন্নের ব্যাকুলতা চরিতার্থতার জন্য।

ইয়ুঙের ব্যাখ্যাসমেত একটি চীনা গূঢ় মনস্তত্ত্বের বই কবি এ সময়েই পড়েন। সুধীন্দ্রনাথও সেটি পড়েন। Richard Wilhelm-এর চীনা থেকে অনূদিত সেই গ্রন্থ ইয়ুঙের টীকাযোগে প্রকাশিত।৩ সুধীন্দ্রনাথ এটি তাঁর পিতাকে 'পরিচয়ে' আলোচনার জন্য দিয়েছিলেন। 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার সঙ্গে এরও কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। পরোক্ষে তা হয়তো উদাত্ত করে তুলেছে কবির অভিব্যক্তির প্রাক্মুহূর্তকে। স্বপ্ন যেমন একটা ব্যক্তিরই স্বপ্ন, জ্বরের ঘোরও তদ্রূপ একজন ব্যক্তির চেতন অবচেতনের পূর্ণ লীলা। ১৯৩০এর ৫ই জানুয়ারীর পূর্ববর্তী সমস্ত টেনশন ঐ জ্বরের অবকাশে সংক্ষেপে মুক্ত সংহত হল।

।। পাঁচ ।।

ওয়াটসান্ডিস আদিম উপজাতিরা একটা বিশ্বাসের দ্বারা তাড়িত হত বসন্তকালে। মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে ঝোপে ঝাড়ে তাকে আবৃত করতো তারা। এটা হত স্ত্রী-যোনির অনুকৃতি। এটাকে ঘিরে উদ্যত বর্শা হাতে তারা নাচত। উদ্যত বর্শাটি হত সমুত্থিত পুরুষাঙ্গের উপমান। এটা ছিল তাদের মাটিকে বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্তি দেবার বিশ্বাসগত পদ্ধতি এবং ক্রিয়া। এই উর্বরতা-বিধায়ক ক্রিয়ার সঙ্গে সাধারণ যৌন উত্তেজনার কোনো যোগ থাকত না। সে সময়টা তারা নারীসংসর্গ থেকে দূরে থাকত। এই সংস্কার-ভিত্তিক প্রক্রিয়াটির সাহায্যে তারা তাদের কামশক্তিকে রূপান্তরিত করত শস্য-সৃজনী আবেগে। প্রতীকটি ধরিত্রী-নারীর প্রতীক। কোনো যৌনচিহ্ন নয়। এই সঙ্গে চিহ্ন আর প্রতীকের পার্থক্যটিও আমাদের মনে থাকে। চিহ্ন শুধু অভিজ্ঞান, বস্তুরূপেই সে আবদ্ধ রাখে আমাদের। প্রতীকেরই আছে বিষয়কে রূপান্তরে উন্নীত করার ক্ষমতা।

'চোরাবালি', 'বহুদূর উঁচু' দীপ্ত ঘোড়সওয়ার', 'হঠকারিতায় ভেঙেগ দাও ভীরু দ্বার' 'অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার' ইত্যাদি প্রসঙ্গে-প্রতীকে প্রশ্রয় পেয়েছে বোধ হয় 'রিরংসার রূপকের' জনশ্রুতি। সে-জনশ্রুতির যদি কোনো ন্যূনতম ভিত্তি থেকেও থাকে তবে তাও প্রতীকের জোরেই রূপান্তরিত হয়েছে তামা থেকে সোনায়। প্রসঙ্গত 'দি সিক্রেট অফ দি গোল্ডেন ফ্লাওয়ার' গ্রন্থে চীনতাত্ত্বিক যা বলেন সেটাই বরঞ্চ আরো অনুধাবনীয় —যদি বাইরে থেকে একান্তই কোনো মানের সন্ধান করতে হয়। প্রাচীন ভারতীয় তন্ত্রের সঙ্গে চীনের এই প্রাচীন তন্ত্রের মিলটুকুও লক্ষণীয়—যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। বিশ্বের যে-শক্তি ক্রিয়াশীল যে-ঘটনা ঘটে চলেছে, মানুষ অন্তরে বাইরে তারই অংশীদার। আলো

এবং অন্ধকারের বৈপরীত্যকে মেলাতে চাওয়া সেই দুরূহ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যাওয়াই হচ্ছে মুক্তিবাসনা। যে-নদী ঘোলাটে শৈবাল-জুম্ম জটিলতায় এতদিন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল, সে যখন সহসা খুঁজে পায় নিজের গতিপথ পাথরচাপা বীজভূমির আবরণটা যখন সরে যায়, শুরু হয় বিকশিত হবার পালা তারই সঙ্গে উপমা দেওয়া চলে নিরাময়প্রাপ্ত, মুক্ত রূপান্তরিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অর্জনের তীব্র মুহূর্তের। 'কোথায় পুরুষকার / হে প্রিয় আমার প্রিয়তম মোর!/ আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর, অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার'— ব্যক্তির পূর্ণায়নের জন্য ব্যক্তিত্বের আকুলতা। এবং তখনই বোঝা যায় কবিতাটিতে স্বরারোপের বৈচিত্র্যটি। তখনই বুঝি যে, এই অঙ্গীকার শব্দটির সম্পূর্ণ নূতনার্থে প্রয়োগ সেই বিশিষ্ট স্বর-গ্রহণেরই দান। প্রত্যেক মানুষই তার অন্তর-সত্তায় আপনি পুরুষ আপনি নারী। প্রত্যেক পুরুষের মানসে নিজ্ঞান স্তরে আছে নারী, নারীর পুরুষ। 'ঘোড়সওয়ার' কবিতায় আহ্বানকারিণী আসলে আহূতেরই ব্যক্তিসত্তার অংশ। ঐ নারীরূপিণী ব্যক্তি অংশই ডাক দিচ্ছে সমগ্রকে সৃষ্টির পথে। ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্ত এই ব্যাকস্পন্দকে দিয়েছে এক ছন্দ-প্রতীক। তা শুধু ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যই নয়—স্বরান্ত এবং ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনির সন্নিবেশকে তরঙ্গের মতো বা বলা যায় অশ্বারোহীর ওঠাপড়ার মতো বা মিলনচঞ্চলতার স্পন্দের মতোই সক্রিয় করে তুলেছে। তৃতীয় স্তবকেই প্রধানত মূর্ত হয়েছে বিচ্ছিন্নতা-জনিত বন্ধ্যা অবস্থার যন্ত্রণা। 'চাঁদের আলোর চাঁচর বালির চড়া'—বালুকাময় ব্যর্থতার অনুভূতি হচ্ছে ব্যঞ্জনের পুনরাবৃত্তিতে ধ্বনিত। 'চ'-ধ্বনি এখানে একটা চটচটে মাদকতাকে ফুটিয়ে তুলছে—যা অচিরে পরিহৃত হোক, এই হল উক্তিটির উদ্দেশ্য। 'মৃগতৃষ্ণিকা' শব্দটি চিহ্নিত করে অভিযানকে। একদিকে স্বরবিশিষ্ট শব্দটি একটি বিচিত্র আলো-ছড়ায় শেষ পর্যন্ত। সে রূপে ওঠে আমাদের চারদিকের আপাতলোভন মরীচিকা অস্তিত্বের প্রতীক। কারো যেন কোনো [illegible] যার নেই, কারো [illegible] যোগ্যতা যার নেই তারই প্রশ্ন 'আমার ক্ষতি কি চিরকাল থাকে বাকি?'

'অঙ্গে বাঁধ না কারোই অঙ্গীকার' থেকে 'অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার' পর্যন্ত পংক্তি-সম্পূর্ণ উক্তিগুলি নাটকীয়তা এবং গীতলতার সমন্বয়ে সংযোজক বাক্যাংশ বর্জনে আশ্চর্য গতিশীলতা পেয়েছে। 'সাগরের শিরে উদ্বেল লোনাজল, / হৃদয়ে আধির চড়া'—এইরকম বিপরীত সমাবেশে হয়ে ওঠে দ্বিতীয়ার্থবাচক। আবার কবিতার চরিত্রটির মানসিকতার বন্ধ্যাত্বের বিশেষণগত রূপক হলেও আলগোছে 'অধীর' শব্দের ধ্বনিকে ধরিয়ে দেয়। একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো। কবিতাটির প্রথম রচনাভাগে '+ — +' চিহ্ন পর্যন্ত পংক্তিগুলি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। এক একটি পংক্তি এক একটা ছবি। চলচ্চিত্রের রীতিতে বা চেতনাপ্রবাহের ঢেউয়ে ছবিগুলি ফুটেছে, মিলিয়ে যাচ্ছে নতুন ছবি ফুটেছে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা হয়ে উঠছে বিস্ময়কর গতিময়। কিন্তু দ্বিতীয় রচনাভাগে পংক্তির এই চলন আর নেই। থাকার প্রয়োজনও আর নেই। প্রথম রচনাভাগে প্রাধান্য পেয়েছে অচরিতার্থতার তাড়না—'এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া?' দ্বিতীয় রচনাভাগে অসহনীয় বর্তমান যেন অতিক্রান্ত—সমাসন্ন মিলনকে ত্বরান্বিত করার জন্যই যে কথা বলছে কবিতাটিতে, সে সহযোগী হয়ে উঠতে চাইছে—মাত্র সম্পূরক নয়। তাই 'হালকা হাওয়ায় হৃদয় দুহাতে ভরো / হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার' ইত্যাদি পরামর্শ, আবেদন বা আহ্বান। সুধীন্দ্রনাথ মন্দ বলেন নি। এসব দরজা ভাঙাটাঙার ব্যাপারে যদি রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়তে পারে —তাহলে আর 'ভক্ত-ভগবানের' সম্বন্ধারোপই বা দূরে থাকে কেন।

কিন্তু তা তো নয়, কবিতাটি শেষ পর্যন্ত পৃথিবী এবং মানুষেরই রূপক। মানুষ ক্ষুদ্রাকারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। একের রীতি এবং বিধিবিধান অন্যের মধ্যেও সন্ধেয়। চাঁদ-সূর্য জোয়ার-চড়া পাহাড়-নদী বালু-বরফ সব কিছুর মধ্য দিয়ে যেমন বিশ্ব-জীবন চলেছে চরিতার্থতা এবং অচরিতার্থতার একূলে ওকূলে মানুষকেও তেমনি সার্থকতার নিরাময়ের পূর্ণতার পথে যেতে হয় সেই সূত্র ধরেই। 'হালকা হাওয়া' কথাটি তিনবার কবিতাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যক্তি-অর্থে তা মুক্তির সূচক। বিশ্বার্থে তা ঝড়ের আসন্নতার ইঙ্গিতবহ। 'ছায়া' শব্দটি দুবার এসেছে। বিশ্বগত অর্থে তা আলোছায়ার অংশ। তাকে বাদ দিয়ে অপূর্ণ বিশ্বের প্রবহমানতা। আবার ব্যক্তি-অর্থেও তাই। ছায়া আমাদেরই কামনাময় নিজ্ঞানলোক। একে বাদ দিয়ে কল্পনা করা যায় না মানবিক সমগ্রতা। অন্য হিসাবে সেই আমাদের ভূতলোকের পারম্পর্যানুক্রমে প্রাপ্ত ভাঁড়ারের প্রতীক। তাকে অধিগত করা একটা নৈতিক দৃঢ়সংকল্পের ব্যাপার। কবিতার মানে বলা খুবই কঠিন। বেশি টানাটানি করলে কবিতা [illegible] মাঝে ভুল মানে ধরিয়ে দেয় হয়তো। এ-রকম ক্ষেত্রে 'তুরঙ্গ তব বৈতরণীর পার' অথবা আমাদের পুরো প্রসঙ্গ খোঁজায়। সোজা মানেটাই এখানে চমৎকার আলো ছড়াতে পারে। ঐ কষ্টের নদীটি পেরোলে তবে দেখা যাবে ঈপ্সিতকে। উল্লেখ করা সঙ্গত হবে না, রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের চূড়ান্ত অধ্যায়ের আগে বৈতরণী নাম্নী পার্থিব নদীর তীরে পিতৃতর্পণ করেছিলেন।

এ সবের চেয়ে কবিতাটি পড়ে যা পাওয়া যায় তাই বোধ হয় সর্বোত্তম প্রসাদ। জনহীন মেরুচূড়া থেকে সৃষ্টিশীল কৃতার্থতার পথে আমরা যখনই নেমে যেতে চাইব—যখনই বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করতে চাইব আত্মদানে —এটা হয়ে থাকল আমাদের জীবনের সেই মুহূর্তের কবিতা—চিরকালের জন্য।

---

৩ দি সিক্রেট অফ দি গোল্ডেন ফ্লাওয়ার। লন্ডন—১৯৩১

গোয়েন্দা ধাঁধা

।। উড়ন্ত মাছের গান ।।

।। ফাদার ঘনশ্যাম ।।

সোনার মাছ। চুনীর চোখ। ভেনিসিয়ান কাচের ফানুস। টলটলে জল। সব মিলিয়ে আশ্চর্য সুন্দর। রক্তাভ ভেনিসিয়ান কাচের ফিনফিনে পাতলা বর্তুলের মধ্যে দিয়ে দেখলে মনে হবে, সত্যিই যেন সোনার মাছেরা হেলে-দুলে লাল চোখের দ্যুতি ছড়াচ্ছে গোলাপী জলের মধ্যে।

মহীশূরের একটা কিউরিও শপ থেকে স্বর্ণমৎস্যদের সংগ্রহ করেছিলেন সারদাচরণ। বাড়ীতে ছোট-খাট একটা মিউজিয়াম বানিয়ে ফেলেছিলেন দেশ-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য বস্তু জোগাড় করে। সবার সেরা ছিল এই সোনার মীনবাহিনী।

যে আসত তাকেই সোনার মাছ দেখাতেন সারদাচরণ। কিন্তু এ-রকম একটা দামী জিনিসকে তালাচাবী দিয়ে রাখতেন না। তালাচাবী তো দূরের কথা সদর দরজায় হুড়কো পর্যন্ত দেওয়া দরকার মনে করতেন না। দোতলার বারান্দায় সামনের ঘরগুলোয় রাখতেন অন্যান্য দামী দামী জিনিস—সোনার মাছেদের রাখতেন ভেতরের ঘরে। সে ঘরে জানলা নেই—ঘুলঘুলি নেই। আর একটি ঘরের মধ্যে দিয়ে বারান্দায় আসতে হয়।

বুড়ি পিসি গিরিবালা নিত্য গজগজ করত হুড়কো না দেওয়ার জন্যে। হেসেই উড়িয়ে দিতেন সারদাচরণ। কিন্তু সেটা মুখে। বাইরে কাছা-খোলা অপবাদ থাকলেও ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত হুঁশিয়ার। সোনার মাছেদের তাই রেখেছিলেন ভেতরের ঘরে।

তা সত্ত্বেও মাছেরা উড়ে গেল লাল কাচের ফানুস থেকে এক নিশীথ রাতে অলৌকিক ফকিরের আহ্বানে।

সারদাচরণের বাড়ীর সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী দুজন। একদিকে ব্যাংক-ম্যানেজার গিরিশবাবু থাকেন। অপর দিকে থাকেন কর্ণেল সিংহ। রোজ এঁদের নিয়ে আড্ডা মারেন সারদাচরণ। আড্ডায় হাজির থাকেন পদার্থবিজ্ঞানী অশোক মিত্র, কুমারবাহাদুর জয় সিং জয়সওয়াল এবং আরো অনেকে।

সেদিন আড্ডার আসরে উপস্থিত হলেন জুড়া বলে এক ইহুদি। এসেছেন বোম্বাই থেকে চড়া দামে সোনার মাছ কিনতে। কিন্তু সারদাচরণ তো হেসেই খুন। আসল কথায় না গিয়ে শুরু করলেন অন্য কথা। হাসতে হাসতে বললেন—'লোকে বলে নাকি আমার উচিত দরজায় খিল এঁটে ঘুমোনো। দূর, দূর! বাড়ীটা তো তাহলে [illegible] এই তো বাড়ীর [illegible] আমলের ভিটে। দরজায় খিল লাগালেই বা কি না লাগালেই বা কি। কি বল হে গৌরাঙ্গ?

কাঠের পুতুলের মত পাশে দাঁড়িয়ে কাষ্ঠহাসি হাসল গৌরাঙ্গ—সারদাচরণের প্রাইভেট সেক্রেটারী। প্রতিদিনই পই পই করে হুঁশিয়ার করে সারদাচরণকে দরজায় খিল না লাগানোর জন্যে।

চুরুট খেতে খেতে বলে উঠলেন কুমারবাহাদুর জয়সিং জয়সওয়াল—পৃথিবীর সেরা হুড়কো দিয়েও সব সময়ে চোরকে আটকে রাখা যায় না। শুনেছি, মোগল আমলে এক সাধু তিন-তিনটে সৈন্যব্যূহ ভেদ করে সুলতানের উষ্ণীষ থেকে গজমোতি নিয়ে চলে এসেছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁকে দেখতে পায় নি।

পদার্থবিজ্ঞানী অশোক মিত্র বললেন—'সম্মোহনে সব সম্ভব।'

'কিন্তু একশটা একই রকম দেখতে তাঁবুর মধ্যে থেকে সুলতানের তাঁবুটা সাধু চিনলেন কি করে?'

'টেলিপ্যাথির জোরে—অবৈজ্ঞানিক কিছু নয়।'

'কায়রোয় ইংলিশ ব্যারাকেও কয়েক বছর আগে এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল। রেলিংয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা দরকারী দলিল পাহারা দিচ্ছিল পাহারাদার। এমন সময়ে দেখল একটা লোক বাইরে দাঁড়িয়ে হাসছে। হুংকার দিয়ে পাহারাদার বললে খবরদার ভেতরে এস না। লোকটা হেসে হেসে বললে—ভেতর কাকে বলে? বাইরে কাকে বলে? বলার সঙ্গে সঙ্গে পাহারাদার দেখলে, সে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের বাইরে—লোকটা ভেতরে। আবার হেসে হেসে লোকটা বললে—ভেতর কাকে বলে? বাইরে কাকে বলে? পাহারাদের তখন দেখলে সে রেলিংয়ের ভেতরেই দাঁড়িয়ে—লোকটা সেই দরকারী দলিলটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে।'

পদার্থবিজ্ঞানীর মুখে এবার আর জবাব জুটল না।

তখন সবে বিকেল পাঁচটা। সারদাচরণ গিরিশবাবুকে নিয়ে শহরের বাইরে গেলেন বিশেষ কাজে। গৌরাঙ্গকে বলে গেলেন মাছের ঘরের সামনেই শুতে। ওদিককার ঘরে শোবে নিতাইচরণ—সারদাচরণের বৃদ্ধ চাকর। যাবার সময়ে গিরিশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে দেখে গেলেন সোনার মাছেদের। আশ্চর্যসুন্দর সেই দৃশ্য দেখে দু'চোখ জুড়িয়ে উঠল গিরিশবাবুর।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল নিতাইচরণের। কে যেন অলৌকিক সুরে গান গাইছে। অপার্থিব গানের রোমাঞ্চ কাঁপিয়ে তুলছে দেহের প্রতিটি লোমকূপকে।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল নিতাইচরণ। ছুটে গিয়ে দেখল, বারান্দায় হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে গৌরাঙ্গ। সে-ও গান শুনেছে। কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

নিতাইকে দেখেই ভয়েভয়ে বলে উঠল—'তুমি দাঁড়াও, আমি খিল তুলে আসি।'

দুড় দুড় করে নেমে গেল গৌরাঙ্গ। ঘড়াং করে আওয়াজ হল খিল তুলে দেওয়ার।

অশরীরীর মত অপার্থিব সেই মূর্তিকে দেখা গেল তারপরেই। রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটছে কি ভাসছে বোঝা যাচ্ছে না। মাথা ঘিরে নীলাভ পাগড়ি। মুখের জায়গাটা অন্ধকার। সাদা আলখাল্লায় আবৃত দেহ। খালি পা। হাতে মিশরীয় তারের বাজনা। চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে, রুপোর চিরুনি দিয়ে তারে ঘা দিচ্ছে ভয়াবহ সেই ফকির। আর গানের সুরে ডাকছে সোনার মাছদের—'ওরে আয়...আয়...আয়...আমি ডাকছি...উড়ে আয়।'

পরমুহূর্তেই ঝনঝন করে ভেঙে গেল কাচের ফানুস। বেগে ঘরে ঢুকল নিতাইচরণ। দেখল, কাচের ফানুস চুরমার। মাছেরা উধাও।

ছুটতে ছুটতে উঠে এল গৌরাঙ্গ। কিন্তু ততক্ষণে ফকিরও মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়। শুধু একটা আলো জ্বলছে জয়সওয়ালের বাড়ির দিকে।

সব শুনে পদার্থবিজ্ঞানী বললেন—'বোগাস! দূর থেকে বেহালার ছড় টেনে কাচের ফানুস ভেঙে দেওয়া যায়! গান দিয়ে সব সম্ভব।'

শুনে শিউরে উঠলেন গিরিশবাবু। এঁদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বেহালা বাজান।

কুমারবাহাদুর বললেন—'নিরেট সোনার মাছগুলোও কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? বিজ্ঞান কি বলে?'

বোবা হয়ে গেলেন অশোক মিত্র।

কিন্তু সমাধান বাতলে দিলেন সেই বোকা-বোকা চেহারার চালকুমড়োর মত বেঁটে বেঢপ পাদরীটা—নাম যার ফাদার ঘনশ্যাম। নিতাইচরণের সঙ্গে বাড়ির সামনে এক চক্কর ঘুরে এসে বললেন—'প্রতিবেশীরা রাস্তা দিয়ে কেউ আসেনি—এলে ভিজে মাটিতে পায়ের ছাপ পড়ত। কাঁটাঝোপ মাড়িয়ে পেছন দিক থেকেও কেউ আসেনি—এলে রক্তাক্ত পায়ের ছাপ দেখা যেত। অথচ ভুতুড়ে ফকিরের পায়ে জুতো ছিল না। তাহলে সে কাছের লোক। কাছের মানুষকেই তো আমরা চোখ মেলে দেখি না। আমাদের বদরোগ তো সেইটাই। নিজেকেই চিনি না—অপরকে চিনতে চেষ্টা করি।'

এই বলে দুটি জিনিসের দিকে নিতাইচরণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ফাদার ঘনশ্যাম। একটা হল, দরজার নীল পর্দা। আরেকটা হল, সদর দরজার খিল খুললে জোরে আওয়াজ হয়—কিন্তু খিল দিলে একদম আওয়াজ হয় না।

বলুন দিকি সোনার মাছ কে নিয়েছে?

[সমাধান ৫৫ পৃষ্ঠায়]

—অদ্রীশ বর্ধন

যুবক যুবতী

বিবাহ বিচ্ছেদ

আজকের যুবকযুবতীদের মধ্যে লাভ-ম্যারেজ প্রচণ্ডভাবে চলছে। সত্যি কথা বলতে কি এ বয়সটাই তো একটু ভাল-লাগার, ভালবাসার বয়স! খুব কম তরুণ-তরুণীই আছেন যাঁরা এই বয়সে একটু প্রেমে পড়তে না ভালবাসেন॥ কেউ আমাকে ভালবাসে কিম্বা আমি কাউকে ভালবাসি—এই দুই ভালবাসাবাসির মধ্যে যে রোমান্স আছে তা আমাদের জীবনে আর কখনো এতো সুন্দরভাবে ধরা পড়ে না। ভালবাসা গভীরতা লাভ করলে এক সময়ে দুজনে এক হয়ে যাওয়ার প্রবণতায় চার চক্ষুর মিলন হয়ে যায়। কিন্তু এই দারুণ প্রেমে পড়া ও প্রেম করে বিয়ে করার একটা কুফলও আমরা বেশ লক্ষ্য করছি। জোড়া লাগার সঙ্গে সঙ্গে ছাড়াছাড়িটা যেন বেশ বেড়ে চলেছে। রোজকার সংবাদপত্রে আইন আদালত কলামে বিবাহ বিচ্ছেদের নানা ঘটনার কথা আমাদের চোখে পড়ে। অগ্নিসাক্ষী করা বিয়েতে তো এতসব ঝামেলা ছিল না। এখন তাহলে এসব উৎপাত আসছে কেন? দাদা-দিদিদের মুখ থেকেই জানা যাক ছাড়া-ছাড়িটা হচ্ছে কেন?

কলকাতা লবণহ্রদের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কর্মী শ্রীনীলকৃষ্ণ কুণ্ডুর সঙ্গে কথা হল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—কুণ্ডুদা, বিবাহ বিচ্ছেদের প্রবণতা আমাদের মধ্যে কেন বেড়েছে বলতে পারেন? বড়ো রগুড়ে মানুষ এই কুণ্ডুদা। হেসে বললেন—কত বসন্ত পেরিয়ে গেল এখনো দু'হাত জোড়া লাগাতে পারলাম না তা আবার ছাড়াছাড়ি! আমার এক বন্ধু রিসেন্টলি ডিভোর্স করেছে। স্রেফ দুজনের মধ্যে মিস আন্ডার-স্ট্যান্ডিং-এর জন্যই ঘটনাটা ঘটলো।

—ভুল বোঝাবুঝি বলতে আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন?

—নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ প্রবণতা অর্থাৎ কিনা অ্যাডজাস্টমেন্টের অভাব। আজকালকার বৌয়েরা স্বামীদের তাঁবে থাকতে চায় না—তারা অনেকেই প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়। এভাবে নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়। সেই অশান্তি চরমে পৌঁছে লিগাল সেপারেশন—তারপর ডিভোর্স। তবে...

—তবে কি কুণ্ডুদা, জিজ্ঞেস করি।

—ডিভোর্স করে অনেকেই পস্তায়। আমার বন্ধুরটিও পস্তাচ্ছে। সাধারণ ঘরে ডিভোর্সের কেস কম। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চাকরী করেন—উভয়েই উচ্চশিক্ষিত—অতি আধুনিকতা, তথা প্রগতিতে বিশ্বাসী। সেসব ক্ষেত্রেই এসব বেশী হচ্ছে।

—কেন বলতে পারেন?

—আরে বুঝতে পারছেন না, উৎকট ব্যক্তিস্বাধীনতার লিপ্সাই ঝামেলার মূল কারণ। অনেকে আবার বিয়ের পরও স্বামী-স্ত্রীতে সুখী হতে পারেন না! আরো কত কি!

টিটাগড়ের শ্রীমতী এলা দাস সরকারের বক্তব্য কিন্তু তা নয়। তিনি জানালেন আরো অনেক কারণেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। দেখুন না, আমার এক বন্ধু শ্রীমতী মজুমদারকে শেষ পর্যন্ত ডিভোর্সের পথ বেছে নিতে হল।

—কেন বলুন তো?

—স্বামীর দৈহিক অক্ষমতা—মা হওয়ার বাসনাকে চরিতার্থ না করতে পেরে হতাশ বন্ধুটি শেষ পর্যন্ত এমনতরো কাজ করলো।
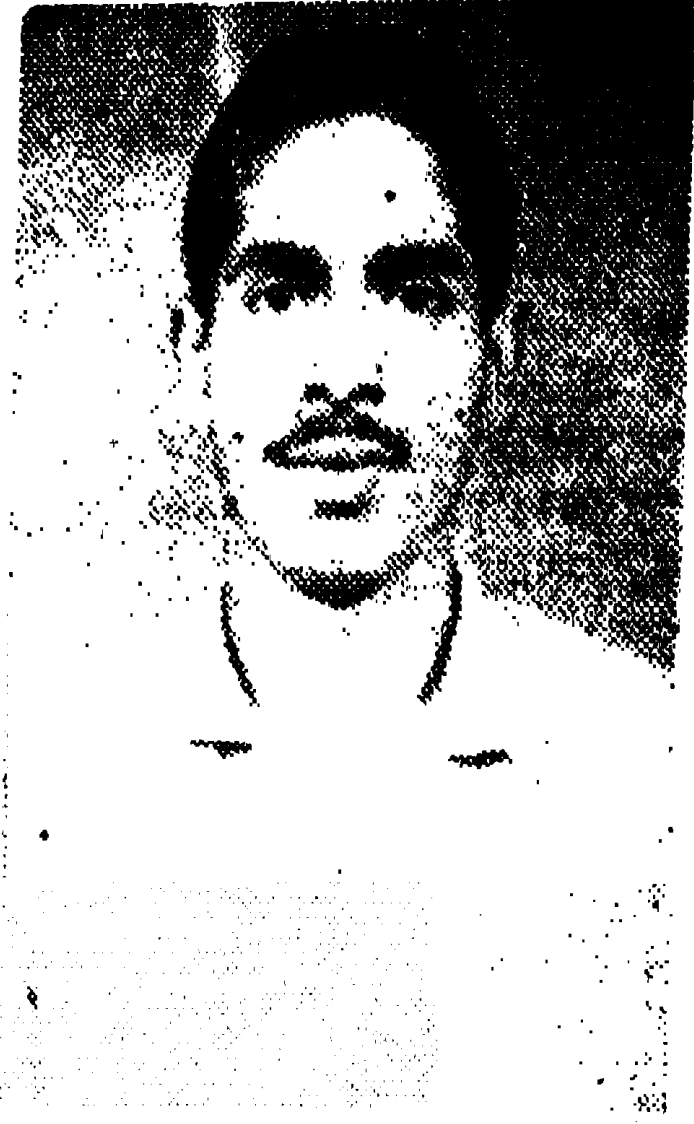
এবার আমি জিজ্ঞাসা করি, আর কি কারণ থাকতে পারে আপনার মনে হয়?

—স্বামীদের যথেচ্ছাচারিতা। অনেকেই স্ত্রীকে শুধু ভোগ করতে চান। এদিনে বছর বছর সন্তান উপহার দেওয়া কি অসহ্য বলুন তো। বাধা পেলে অন্যত্র গমন—মদ্যপান শুরু। স্ত্রীর পক্ষে স্বাভাবিক জীবনযাপন তখন কষ্টকর হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে বিচ্ছেদ এলে স্ত্রী নিশ্চয়ই সেজন্যে দায়ী নয়।

—স্ত্রী পক্ষের কি কোন দোষ থাকে না?

—কোন কোন ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই থাকে। এক হাতে তো আর তালি বাজে না। কিন্তু দোষ পুরুষেরই বেশি। নিজেরা যা খুশী তাই করবেন কিন্তু বৌয়ের বেলায় একটু এদিক ওদিক হলেই নানা সন্দেহ—ভুল বোঝাবুঝি। আমাদের নিজেদের [illegible] বলে কি কিছু নেই? মেয়ে হয়েছি [illegible] কি পরা-ধীনতার যূপকাষ্ঠে নিজের সত্ত্বাকে বিসর্জন দেব?

—এসব প্রশ্ন তো অনেক বিতর্কমূলক। তবে সবকিছু মানিয়ে চলাই তো উচিত।

—আপনি ছেলেদের সাপোর্ট করছেন। ওরা পাষাণ, যা খুশী তাই করতে পারে—আমাদের মন নরম, কষ্টটা তাই আমাদেরই বেশী।

শ্রীমতী শুক্লা দত্তগুপ্ত আধুনিকতায় বিশ্বাসী। তাঁর কাছে ওসব সেন্টিমেন্টের ব্যাপার নেই। তিনি বললেন, আগেকার দিনে পতিদেবতাকে পুজো করে সারাজীবন শত-কষ্ট হলেও মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হতো। কিন্তু আজ ওসব চলছে না বাবা! আমাদের চোখ খুলে গিয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদ আইন হয়ে স্ত্রী জাতির একটা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

—একথা কেন বলছেন আপনি? পশ্চিমী ঢঙে আপনি কি সহজে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নতুন ঘর বাঁধতে পারবেন?

—কেন নয়? মন যদি না চায় তবে

নীলকৃষ্ণ কুণ্ডু

এলা দাস

সেখানে আজীবন পড়ে পড়ে মার খাওয়ার কি আছে? তার থেকে যার কাছে ভালবাসা পাব, যে আবার আপন করে নেবে, সেখানে যাওয়াই শ্রেয়। জীবনকে ভোগ করার অধিকার সবার আছে।

স্মৃতিরেখা হাজরা কিন্তু এই উগ্র আধুনিকতার বিরোধী। 'আইন করে বিয়ে অস্বীকার করা ও ভাই আমাদের দিয়ে হবে না। অত সহজে ভাঙাগড়া চললে সবার সংসার মাটি হয়ে যাবে।'

—তিনি জবাব দেন।

তরুণ যুবক কার্তিক সাহা বিবাহ বিচ্ছেদের নাম করতে হেসে উঠলেন। জানালেন আমি বিচ্ছেদে বিশ্বাসী নই। বিরহে প্রেম গভীর হয়—পার্মানেন্ট বিচ্ছেদে নয়। প্রেমের আগে দুজনের মধ্যে যেমন গভীর বিশ্বাস থাকে সেটা অব্যাহত রাখলেই ল্যাটা চুকে যাবে। তুমি কি বলো?' পাশে সম্ভবত তার প্রেমিক বসেছিলেন। তিনি হেসে জবাব দিলেন—সত্যিকার ভালবাসায় বিচ্ছেদ আসে না। মোহে পড়ে করলে মোহের ঘোর কেটে গেলেই এটা হয়। ভাল যদি বাসলাম আর বিয়েই যদি করলাম তখন ছাড়ার কথা কেন? আমি কিন্তু তোমায় ছাড়ছি না।'

দুজনের হাসাহাসির অবসরে আমিও বিদায় নিলাম।

—অমর দাশ

অমৃত প্রসঙ্গে

দীর্ঘদিন 'অমৃত' পাঠ করে আসছি। অমৃতের মাধ্যমে অনেক কিছু জেনেছি বুঝেছি ও শিখেছি আমি। এখন কাগজের সমস্যা দেখা দিয়েছে দেশে। প্রচুর দাম বেড়েছে কাগজের। এই অবস্থায় 'অমৃত' পত্রিকার যা মূল্য রাখা হয়েছে নিশ্চয়ই তা প্রশংসার যোগ্য।

সুন্দর সুন্দর বিষয়বস্তুর ফলে পত্রিকাটি এখন আরো ভালো হয়েছে। আশা করি 'অমৃত' কর্তৃপক্ষ বরাবরই পত্রিকার মান ও গুণ এই রকমই রাখবেন এবং সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে এইভাবেই অমৃতকে পাঠকের নিকট উপস্থিত করবেন।

মনোহর দে
তিলাটাড়
(ধানবাদ)।

(২)

সাপ্তাহিক অমৃতের প্রথম সংখ্যাটি থেকেই আমি তার পাঠক। চতুর্দশ বৎসর অতিক্রান্ত এই পত্রিকাটি নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আমাকে আরও আকর্ষিত করে চলেছে। মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের প্রথম সংখ্যাটি একদিন যে সম্ভাবনা নিয়ে মূর্ত হয়েছিল—আজ তার পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি।

বাইরের প্রচ্ছদ আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের নানান বৈচিত্র্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। নানা শ্রেণীর পাঠকের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ধারার ফিচার সরবরাহের এই দৃষ্টান্ত অনন্য বলে মনে হয়। সময়োপযোগী ও বস্তুধর্মী চিত্রের আলোকপাত এই পত্রিকার আকর্ষণ আরও বাড়িয়েছে।

পাঠকদের মধ্যে শ্রেণীভেদ থাকবেই। তবু সব দিকে লক্ষ্য রেখে পত্রিকাকে যেভাবে পরিবেশিত করা হয়েছে তার দৃষ্টান্ত বিরল। একেবারে প্রথম থেকেই মনে পড়ছে। মানুষ গড়ার ইতিকথা সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ সেই লেকটি শাদা চোখে নিকটেই আছে প্রভৃতি ফিচারগুলি সুস্থ ও প্রগতিশীল চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। এখনো রূপসীর খাতা অঙ্গনা আর্থিক প্রসঙ্গ যুবক-যুবতী প্রভৃতি ফিচারগুলি নির্ভেজাল আনন্দ ও শিক্ষার কাজে এসেছে।

সমকালীন পত্র-পত্রিকার দিকে তাকালেই চোখে পড়ে আধুনিকতার দোহাই দিয়ে রাশি রাশি পচা আবর্জনায় ঘা লা পত্রিকাগুলোকে বোঝাই করে তোলার অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ব্যাপকভাবে চলছে। সাহিত্য জগতে এরূপ স্থূল আক্রমণের সামনে 'অমৃত' প্রগতিশীল সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলুক মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের কাছে এই অনুরোধ জানাই।

কবিকঙ্কন গুপ্ত
এ, পি এইচ এস স্কুল, ধানবাদ।

গ্রামের যুবক-যুবতীদের কথা

অমৃতের বিগত কয়েকটি সংখ্যায় শহর গ্রাম ও মফঃস্বলের যুবক-যুবতীদের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হোচ্ছে। এই মনোগ্রাহী সাক্ষাৎকারের জন্য প্রথমেই অমৃত পরিচালকগোষ্ঠীকে ধন্যবাদ জানাই। আজকের সমাজে অধিকাংশ যুবক-যুবতীরাই কেবল ছেঁড়া হালভাঙা নৌকোর মত উদ্‌ভ্রান্ত হতাশার দাপটে তাদের আশার আলোক নির্বাপিত প্রায়। পাশ্চাত্য দেশের যুবক যুবতীরা যেখানে উচ্ছল, প্রাণচঞ্চল সেখানে আমাদের দেশে অনেকেই দুবেলা দু মুঠো ভাত কাপড় ও সামান্য একটু বাসস্থান যোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছে (বিশেষতঃ গ্রামে)। তাই অনেকের ভিতরে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিভা থাকলেও পারিপার্শ্বিক চাপে পড়ে তা বিসর্জন দিতে হোচ্ছে। শিক্ষা কর্মজীবন সমাজজীবন সাংস্কৃতিক জীবন—সর্বত্রই হতাশার করাল ছায়া তাদের গ্রাস করেছে এবং তার পরিণতি হিসেবে দেখা দিয়েছে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধভাব—যেন হাল ছাড়া জীবন—যে দিকে যায় যাক। সব কিছুতে একটা অনীহাভাব। বর্তমান যুগের পরি-

চিঠিপত্র
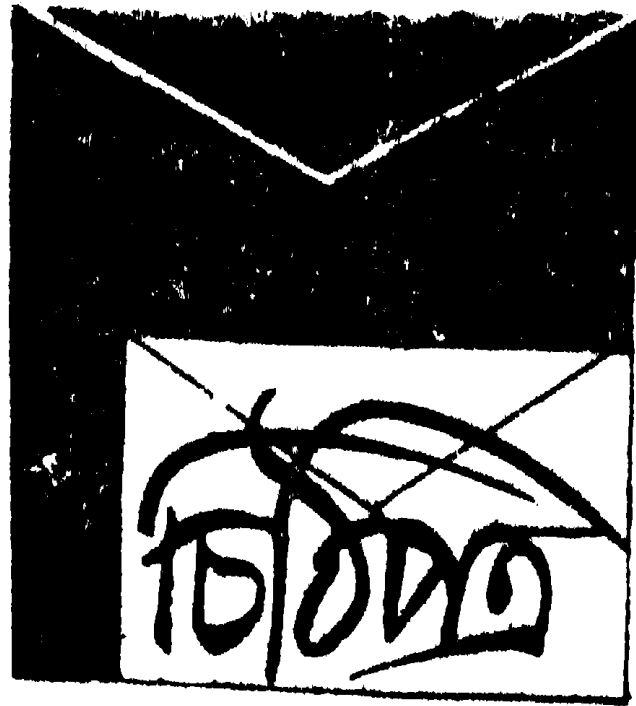
প্রেক্ষিতে যুবমানসের যে অস্থিরতা এবং তার সুষ্ঠু প্রতিফলন হোল অমৃতের যুবক যুবতী ফিচারটি। অমৃত এই সমস্ত হতাশাগ্রস্ত যুবক-যুবতীদের আশার আলো দেখাবে এমন আশা কি করে করি? বলা যায় এর দায়িত্ব বরং আমাদের সরকারের আর আমাদের সমাজের। তবুও অমৃত এদের মানসিক অস্থিরতা তথা হতাশা ও সেই সঙ্গে যুবমানসের বিভিন্ন সমস্যা সমাজের সামনে তুলে ধরছে, এটাই বলিষ্ঠ সাংবাদিকের পক্ষে যথেষ্ট কাজ—একথা গুণগ্রাহী পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে শ্রীদাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁকে অনুরোধ করি তিনি সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশের গ্রামের আরও কিছু সমস্যা জনচক্ষুর সামনে তুলে ধরুন। যেমন গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের অর্থনৈতিক সঙ্কট তাদের শিক্ষার সমস্যা বাসস্থানের সমস্যা ও এ বিষয়ে সরকারী সহযোগিতা। মফঃস্বল অঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে স্বনির্ভর প্রকল্পে সরকারী সাহায্য কতদূর প্রসারিত হোচ্ছে বা যাঁরা স্বনির্ভর প্রকল্পে সাহায্য পেয়েছেন তাঁরা নিজেরা সেই প্রকল্পে কতদূর এগিয়েছেন। সরকারী মহল ও উঠতি ডাক্তার মহল থেকে পরস্পর বিপরীত মতামত প্রায়ই পাওয়া যায়। বেকার ডাক্তাররা চান চাকরী—সে যেখানেই হোক না কেন। আর সরকারী মহল থেকে বলা হোচ্ছে, গ্রামে ডাক্তাররা যেতে অনিচ্ছুক। এই সকল বিষয়ে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আলোকপাত করলে হয়ত আমরা আরও বিশেষ কিছু জানতে পারব।

পরিশেষে অমৃতের বহুল প্রচার কামনা করি ও শ্রীদাসকে যুবক-যুবতী ফিচারের সাক্ষাৎকারগুলির জন্য ধন্যবাদ জানাই।

ধনপতি দত্ত
খড়দহ
২৪-পরগণা

লিব আন্দোলন

গত ২৫ অক্টোবর শ্রীমতী কণিকা রায় নারী প্রগতির প্রতি কটাক্ষপাতের অভিযোগ এনেছেন আমার বিরুদ্ধে। পুরুষত্বে গর্বিত পুরুষ 'লিব' আন্দোলনের বিপক্ষে, এ ধারণা লেখিকার ঠিক নয়। আমার বক্তব্যে লিব-বিরুদ্ধ ইঙ্গিত ছিল বলে স্মরণ হচ্ছে না।

নারী স্নেহশীলা। প্রেম-প্রীতির জীবন্ত প্রতিমা। শারীরিক গঠন ও দৈহিক শক্তির প্রভেদ নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা ভেদ রেখা বজায় রেখে এসেছে। ঐতিহাসিক স্বীকার করেন—

> 'Physical prowess, bodily vigour and muscular strength th[illegible] naturally established man's [illegible]manent superiority over womar

এই কারণেই পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্র পৃথক এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ।

বিশ বছর আগে নারীর যে স্বভাব ও প্রকৃতি ছিল আজও তাই আছে। অভিব্যক্তিবাদের ফলে হয়তো কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হতে পারে। তা ধর্তব্যের বাইরে, কিন্তু এই বিশ বছরে আমূল পরিবর্তন এসেছে অর্থনৈতিক কাঠামোয়। অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য বাধ্য হয়ে নারীদের কর্মগ্রহণের প্রশ্ন এসেছে। কিন্তু জীবন এতবেশী প্র্যাকটিক্যাল যে থিওরির দিক অনেক সময় তার ব্যাখ্যা অসম্ভব। দশটা-পাঁচটা অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রমের পর জীবনের প্রতি ক্লান্তি আসে না একথা কোন নারী হলপ করে বলতে পারে না। এর জন্য দায়ী কিন্তু নারী জাতি নয়। শারীরিক কারণই এখানে মুখ্য।

'কর্মক্লান্ত দিনের শেষে পুরুষের হাতের ধূমায়িত চায়ের জন্য' আপশোষ করেছেন শ্রীমতী রায়। এ ধরনের স্থলে আন্তরিকতার [illegible]

হাস্যকর। আমি এমন পুরুষের খবরও জানি যে স্ত্রীর প্রতি অন্তঃস্থ আন্তরিকতায় গৃহস্থের কাজে সহযোগী হয়। তাছাড়া পুরুষেরা নারীদের প্রতি স্বভাবজ সশ্রদ্ধ। কারণ পরিপূর্ণ ভোগসুখের জন্য কেবলমাত্র নারী অংগ নয়, নারীর মনকে আয়ত্ত্ব করা প্রয়োজন। নারীর হৃদয় জয়—নারী-অংগ ভোগরীতির সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সুতরাং নারীর হৃদয় জয়ের গৌরব অর্জনই নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বোধের উৎস।

নারীর উপর পুরুষের অধিকার স্থাপনের অহমিকার কথা উল্লেখ করে পরোক্ষভাবে শাশ্বত সংসারধর্ম অস্বীকারের আভাস দিয়েছেন শ্রীমতী রায়। এটা পুরুষেরা স্বপ্নেও অহমিকা বলে ভাবে না। ঘনিষ্ঠতার দাবীতেই পুরুষেরা যা কিছু আব্দার করে থাকে। আপনজনের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করাই পুরুষের উদ্দেশ্য। এটা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে ভাবলে জীবনে শুধু অসন্তোষই বাড়বে। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।' নারীরা স্বামীগৃহে জীবন-যাপনকে যদি পুরুষের অধিকার স্থাপনের শঠ প্রয়াস বলে মনে করে এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে যদি নারীরা স্বামী-গৃহে আসতে নারাজ হয় তাহলে আর সংসার করা হয় না। টেস্ট টিউব শিশু দিয়েই বংশবৃদ্ধির পথ নিতে হয়।

তবুও লিব আন্দোলনের উপযোগিতা মানি। এবং তা দেশ কাল পাত্র ভেদে গড়ে উঠুক। বিশ্বে কোন উন্নত দেশের নারী ভারতীয় নারীদের মতো সোনার-গয়না ব্যবহার করে না। ভারতবর্ষে বহু সহস্র কোটি টাকা মূল্যের সোনার গয়না বাক্স-বন্দী থাকায় জাতীয় প্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে নারীরা ব্যাপক লিব আন্দোলন গড়ে তোলে নি কেন? আজও নারীরা উৎসব-উপলক্ষ্যে জড়োয়া না হোক নতুন মডেলের নতুন গয়নার জন্য আবদার করে এ নজির বিরল নয়।

বর্তমানে নারীদের লিব আন্দোলনের চেয়ে লিব ফ্যাশানের প্রতি প্রবণতা বেশী লক্ষণীয়। এ বিষয়ে নারীদের সচেতন হওয়া উচিত। নচেৎ মহৎ লিব আন্দোলন সার্থক হওয়া সুদূরপরাহত।

বাল্মীকি ঘোষ
কলিকাতা-৩৭।

বাংলা নাটক ও সাহিত্য প্রসংগে

গত ১৭ জানুয়ারী 'অমৃতে' যুবক যুবতী বিভাগে 'বাংলা নাটক ও সাহিত্য প্রসংগে' যুবক যুবতীদের আলোচনা দেখে স্বভাবতই গ্রামবাংলা থেকে কিছু বলার লোভ সামলাতে পারলাম না। কারণ একমাত্র অমৃত পত্রিকাই পাঠকদের বক্তব্যকে তুলে ধরছে। এ জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

অর্থাৎ সাহিত্যে যৌন আচরণ নিয়েই আলোচিত। বহুকাল ধরে অশ্লীলতা নিয়ে আলোচিত হল, বিচারের কাঠগড়াতেও উঠল কিন্তু অশ্লীলতার কোন সংজ্ঞা নিরূপিত হল না। কারণ শ্লীল অশ্লীল নিরূপণ করা খুবই কঠিন। আমাদের আলোচনা প্রসংগে দেখা যাবে প্রত্যেকেই প্রায় অশ্লীলতা বিরোধী, আমিও তাই। বিদেশী সাহিত্য আলোচনা না টেনে বলা চলে সাহিত্য ও নাটকে অশ্লীলতাকে দু' ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। (এক) যে বই বা নাটক যৌন লালসাকে জাগ্রত করবার চেষ্টায় মত্ত। অর্থাৎ যেখানে সমাজের প্রতিফলন ঘটে না যা সাহিত্যের নামে অল্পায়াসে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে: সেটাকে বলি পর্ণগ্রাফি। আর (দুই) যে বই বা নাটকে লেখকের অশ্লীলতা কাম্য নয়, কিন্তু সমাজের হুবহু ছবিকে তুলে ধরতে অশ্লীলতা এসে যায়। সেটাকে লেখক আনতে বাধ্য হয় শিল্প ও সমাজের স্বার্থে। প্রকৃত সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই প্রথম নম্বর শ্রেণীর বইগুলিকে পরিত্যাগ করবে। জীজা দেবী ঠিকই বলেছেন 'সেকসকে শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করতে হবে' যাতে যুবমানসে ক্ষতিকারক প্রতি-ক্রিয়া না সৃষ্টি করে। সমাজের প্রত্যেকটি দিকই শিল্পনিপুণতায় সাহিত্যে প্রতিফলন চাই, সেখানে অশ্লীলতা থাকলেও অন্যায় হবে না। সাধনা বোস বলেছেন 'সাহিত্য হবে যুগোপযোগী, তাই সাহিত্যে অশ্লীলতা চলবে না এটা অন্যায়। কারণ এটাই বিপ্লবাত্মক। এতে যুবসমাজ সজাগ হবে, জীবনকে ঠিক পথে চালিত করবে' বক্তব্যটি যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ ও সঠিক। কিন্তু ঠিক পথে চালিত না হয়ে সাহিত্য যদি অপরাধ-প্রবণতা বৃদ্ধি করে যা ক্রমে ক্রমে দেখা যাচ্ছে সেটা কি ভালো হবে। সাহিত্যে যৌনাতিশয্য অপরাধপ্রবণতা ও অসুস্থ মানসিকতার প্রসার ঘটাতে পারে। কেননা সাহিত্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে জনৈক শ্রদ্ধেয়া বাঙালী লেখিকার উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে 'লেখক যদি অশ্লীলতার পাঁকের ওপারে পরিচ্ছন্ন জমির সম্ভাবনা দেখাতে সমর্থ হন তাহলে তথাকথিত অশ্লীলতাও সাহিত্যের অনুপান হয়ে উঠতে পারে।'

চঞ্চল সিংহরায়
রোহিয়া (গুড়াপ)।

পেশা ও মাদকতা

গত ১৭ জানুয়ারী চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীঅমর দাশ-এর লেখা 'নেশা ও মাদকতা' সম্বন্ধে শ্রীকল্লোল সরকার ঝংকার সম্পাদকের মতামতটি পড়লাম, যদিও তাঁর মতের সংগে নিজের মতের সম্পূর্ণ সমতা

সমাজকে পুরোপুরিভাবে প্রতিফলিত করেছে?

জানি না শ্রদ্ধেয় অমর দাশ যাঁদের মতামতের ওপর নির্ভর করে ঐ আলোচনাটি প্রকাশ করেছেন তাঁরা সত্যিকারের কোন্ তলার মানুষ, আর তাঁদের দৃষ্টি কোন দিকে নিবদ্ধ? যে দেশের মানুষ জীবন-যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হয়ে জীবনযাত্রার পথকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে নিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে ফিরছে, যে দেশের ভবিষ্যত উত্তরঅধিকারী যুবক যুবতিরা তাদের ভবিষ্যতকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করে নিয়ে যেতে পারলে মংগল হয় সেখানে ড্রাগ ড্রিংক মেনড্রেকস এল এস ডি প্রভৃতি ব্যবহার করে নেশায় মাতিয়ে রেখে নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছেন এমন যুবক যুবতির সংখ্যা আমাদের দেশে ক'জন?

যদিও জানি পৃথিবীর চারিদিক আজ হতাশায় পূর্ণ। আর আমরা এই হতাশার বলি হয়ে নিজেদের নেশার চরম আনন্দে মাতিয়ে রেখে আনন্দ করছি। তবুও এইভাবে আমরা নাকি সবকিছু ভুলবো। কিন্তু আমাদের দেশে অবহেলিত ও দারিদ্র্য নিপীড়িত যুবকেরা দিনের শেষে দু' মুঠো ভাতের সংস্থান করতে পারলে ধন্য হয়ে যায়। সেই সব দরিদ্র মানুষ নিজেদের দৈন্যকে ভোলবার জন্য মেনড্রেকস এল এস ডির মত রাজকীয় নেশার খরচ যোগাড় করছে, একথা ভাবতে বা মানতে পারছি না।

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঁশবেড়িয়া
হুগলী।

বাংলা ছবির নূতন দিক কিছু বক্তব্য

২৪ জানুয়ারীর 'অমৃতে'তে 'বাংলা ছবির নতুন দিক শীর্ষক লেখাটি পড়লাম। এতে ক'জন তরুণ চলচ্চিত্রকারের কিছু বক্তব্য জানা গেল। কিন্তু পূর্ণেন্দু পত্রীর কিছু কথা আমায় বাধ্য করেছে এ-চিঠিটি লিখতে। ওঁর বক্তব্য 'হঠাৎ শুধু চলচ্চিত্রের ওপরেই এত দায় কেন, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানোর জন্য? আর কোন শিল্প মাধ্যমের কি এ-সব দায় নেই।' অর্থাৎ পূর্ণেন্দু পত্রীর মতে চলচ্চিত্র রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারে, কিন্তু শুধু চলচ্চিত্র নয় এ-ব্যাপারে অন্যান্য শিল্প-মাধ্যমেরও দায় থাকা উচিত।

নাটক একটি শিল্প মাধ্যম এবং যাত্রাও। নাটক এবং যাত্রা রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে চেষ্টা করে চলেছে এটা অনস্বীকার্য। বর্তমান যাত্রা লেনিন পেরিয়ে

নাটক কি রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে নি? এছাড়া থিয়েটার ওয়ার্কশপ থিয়েটার ইউনিট ইত্যাদি নাট্য-গোষ্ঠীগুলি তো রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানোর দায় নিজেরাই নিজেদের কাঁধে নিয়েছেন। অথচ চলচ্চিত্র যথেষ্ট জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও কয়টি চলচ্চিত্রে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করা যায়? ক'জন চলচ্চিত্র পরিচালক এ সাহস রাখেন? অবশ্য যাঁরা পৃথিবী জোড়া নির্মীয়মান শিল্পসৌধে নিজের হাতে গড়া একখানা নকসা কাটা ইঁটের যোগান দেবার স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না তাঁদের কাছে এমন সাহস প্রত্যাশা করাটা উচিত নয় হয়তো।

শুধুমাত্র চলচ্চিত্র অবশ্যই অতটা শক্তিমান নয় যে শুধু সেইই রাজনৈতিক চেতনাকে দানা বাঁধবার জন্য আলাদীনের প্রদীপ নিয়ে হাজির হবে। এ-ব্যাপারে সমস্ত প্রকৃত শিল্পীদেরই এগিয়ে আসা উচিত তাঁদের বিভিন্ন শিল্পমাধ্যম নিয়ে। কারণ '...সকল শিল্পকে হতে হবে জীবন-অনুগামী।' এ দায়িত্ব কারো এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়, কখখোনো নয়।

নবেন্দুকিশোর গুহ
দেশবন্ধুপাড়া শিলিগুড়ি।

সম্পাদক সমীপেষু

গত ১০ জানুয়ারীর 'অমৃতে' পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয়েছে 'আগামী সংখ্যা থেকে একটি করে প্রথম শ্রেণীর গল্প পাঠকদের উপহার দেওয়া হবে।' এতে প্রত্যেক পাঠক-বর্গ খুশী। তারপর সর্বপ্রথম 'বকাসুর' গল্প উপহার দেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র এবং পরে 'ভোরের প্রাণের শব্দ' শ্রীবুদ্ধদেব গুহ, 'অথচ অবনীশ খারাপ ছিল না' শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী পরের সংখ্যায় শ্রীবরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প বিজ্ঞাপিত।

লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের সবগুলিই গল্পই নিঃসন্দেহে সার্থক। সুসাহিত্যিকের হাতে সাহিত্য যে কত সুন্দর গভীরতাপূর্ণ ও অর্থবহ হয় তা বলবার দরকার নেই। এ ধরনের পরিকল্পনার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

'অমৃত' আজ জনপ্রিয়তার শীর্ষে বহু ব্যক্তি এই প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করেছেন। বিপুলভাবে সর্বস্তরের মানুষেই সাড়া জাগিয়েছে আজ আশ্চর্যভাবে। এ রকম নামী একটি সাহিত্য সাপ্তাহিকের পাতায় এই প্রসঙ্গের অবতারণার পরে আমার মনে নামী লেখক-দের রচনা ছাড়াও লেখার মান হিসেবে নতুন লেখকদের আরও কিছু রচনা বাড়ানো দরকার।। বর্তমানে প্রতিশ্রুতিমান কবি সাহিত্যিকেরা বড় বিবল্পতার মধ্যে আছেন। নিজেদের প্রতিভা বিকশিত করার কোন উপযুক্ত সুযোগ আজকে খোঁজা আছে বলে জানা নেই। তাই এই মুহূর্তে 'অমৃত'ই একমাত্র সম্ভবনাপূর্ণ লেখক-লেখিকার অনুপ্রেরণা দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক : "অন্তরাগ"
বেগাই (হুগলী)

সেকালের সংগীতগুণী

অমৃতের 'সেকালের সংগীতগুণী' আমার কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। লেখক শ্রীমুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭৪ এর অমৃতে সেকালের সংগীতগুণী হিসাবে অনাথনাথ বসুর কথা আছে। রচনাটি মূল্যবান, প্রতিটি ঘটনার মধ্য দিয়ে শিল্পীকে প্রকাশ করার চেষ্টার মধ্যেই লেখকের কৃতিত্ব নিহিত আছে। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ এর অমৃতে 'সেকালের সংগীত গুণী'র মোজদ্দিনের উত্তরসূরী প্রসঙ্গে অনাথনাথ বসু সম্বন্ধে যা আলোচিত হয়েছে তা আবার এখানে থাকলে ভাল হত। কেননা একটি রচনার মধ্যে একজন সম্পর্কে যত বেশি কথা জানা যায় ততই ভাল। তাছাড়া এ রচনায় অনাথবাবুর গুরু, শিষ্য, গ্রামোফোন রেকর্ড বা শিল্পী হিসাবে কলকাতা জীবন প্রসঙ্গ প্রায় অনুপস্থিত। রচনার শেষে আছে '...তাঁর গৌরবের নানা কথা আছে।' অনাথবাবুর সেইসব গৌরবের কথা, গুরু, শিষ্য কলকাতা জীবন প্রসঙ্গ নিয়ে আরও কয়েকটি রচনা অমৃতে দেখতে পাব আশা রাখি। পৃঃ ৪৭ (২০।১২।৭৪ অমৃতে) শেষের দিকে 'তবলচী তেমনি...। ইনি ঠুংরী জানেন না।' ৪৮ পৃঃ প্রথমদিকে 'তিনি শুধু ঠুংরীর তারিফই করে গেলেন। আসরের পর আসর।' মনে হতে পারে একজন অজ্ঞ লোকের কাছ থেকে এ তারিফ পেলেন অনাথনাথ বসু। কিন্তু তা তো নয়। সুতরাং এ জায়গাটা একটু বিস্তৃত ও পরিষ্কার হলে ভাল হত।

সুধা সরকার,
কলকাতা—৯।

হিন্দী ও অন্যান্য ভাষা প্রসঙ্গে

৩৮ সংখ্যক অমৃতে উক্ত শিরোনামাঙ্কিত সম্পাদকীয় নিবন্ধটির জন্যে সম্পাদক মহোদয়কে অশেষ ধন্যবাদ।

নাগপুরের সাম্প্রতিক বিশ্বহিন্দী সম্মেলন হিন্দীপ্রেমবিলাসিতারই এক উৎকট নমুনা। আজ একথা সর্বজনবিদিত যে ভাষা কমিশনের বিশিষ্ট সদস্যদের মতামত মাড়িয়ে, এমন কি মহাত্মা গান্ধীর স্বগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে রোলার চালিয়েও সরকার-পুষ্ট ব্যক্তিরা একমাত্র হিন্দীকেই ভারতীয় সরকারী ভাষা করেছে। হিন্দী কি ভারতের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষা? অথবা সমৃদ্ধি ও ঐতিহ্যে একক গরীয়সী? কোনোটাই নয়। ভারতে যে ১৪ কোটি হিন্দীভাষীর সংখ্যা পাই তার মধ্যে খাঁটি হিন্দীভাষীর সংখ্যা হোল মাত্র ১ কোটি ৬০ লাখ; ২ কোটি ৫০ লাখ লোক ব্রজভাষী ও কনোজী-ভাষী; ৪ কোটি ৮৮ লাখ লোকের ভাষা পাঞ্জাবী, মারবাড়ী, মাগধী, গাড়োয়ালী, অবধী, ছত্রিশগড়ী এবং বাদবাকি রাজস্থানী, মৈথিলী, উর্দু, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি। অন্যদিকে বাংলা ভারতের এক ষষ্ঠাংশ লোকের প্রায় ১০ কোটি মুখের ভাষা তথা মাতৃভাষা। অন্তর ঐশ্বর্যেও বাংলা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মধ্যে গরিষ্ঠ, বিশ্বে যার স্থান সপ্তম। তবু বাংলা বিশ্বসম্মেলন হয় না; হয় না ইংরেজী, কিংবা চীনা বা রুশ ভাষার বিশ্বসম্মেলন। তাহলে দেখা যাচ্ছে হিন্দী মানে বত্রিশভাজা; এর মধ্যে খাড়িবুলি, পাড়িবুলি, মৈথিলী, ভোজপুরী, রাজস্থানী, উর্দু—সবই আছে। আর এই জগাখিচুরি ভাষার জন্যে ভারত সরকার জলের মতো টাকা খরচ করছেন। এক তরফা এই সরকারী তদারকের দরুণ একশ্রেণীর সুবিধাবাদী দলের হয়েছে পোয়াবারো; তারা হিন্দীর দৌলতে দুপকেট ভারী করেছে; চাকরী-বাকরী, খেতাব, মানসম্মান কুড়িয়েছে, আত্তা হ্যায়-যাতা হ্যায় শিখে সরকারী বাহবা কুড়িয়েছে এবং এ-হেন হিন্দীর তক্কাটে তাদের বেলায় হয়েছে সাত খুন মাপ। হিন্দীপনার এই অবাঞ্ছিত প্রতিপত্তি ও পক্ষপাতিত্বের জন্যেই দক্ষিণ ভারতে লঙ্কা-কাণ্ড হয়ে গেল। এবং আজো যেখানে ভারতীয় ভাষা সমস্যা মৌরসী পাট্টায় বিরাজমান আজো। যেখানে মারাঠী-কানাড়ী, বাংলা-অসমীয়া, হিন্দী-উর্দু ভাষার পারস্পরিক বিরোধের বিষবাষ্প পুঞ্জিত রয়েছে সেখানে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নির্লজ্জের মতো হিন্দীর বিশ্বজনীনত্ব দাবি ও প্রচার সত্যি নাক্কারজনক। ইন্দিরা গান্ধী হিন্দীকে জোর করে কারো গলায় ঢোকানো হবে না বলেছেন। কথাটা তো তা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতীয় সমস্ত ভাষা ছেড়ে হিন্দীর বিশেষ সুযোগসুবিধা কেন?

সমস্ত ভাষার প্রতি সমান শ্রদ্ধা রেখে আমরা ভারত সরকারের কাছে সবিনয় নিবেদন করতে চাই—ভারতের ভাষা সমস্যার প্রকৃত সমাধান না করে এক একটা মওকা নিয়ে হিন্দীপ্রচার অভিযান চালালে এবং কেবল-হিন্দীর পক্ষে প্রচার করে বেড়ালে কোনোদিনই ভারতের জাতীয় ঐক্য আসবে না। যেসব আমলারা মুখোস পরে ভাষার আগুন নিয়ে খেলা করেন তাঁরাই ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের রক্তবীজ। এই রক্তবীজের বংশধরদের গতিরোধ না করলে ভারতীয় জাতীয় ঐক্য সুদূরপরাহত।

জীবন নাথ
নওদা [illegible]

শেষ বিকেল

উপন্যাস

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[বৃদ্ধ বঙ্কিম দত্ত অমিয়কে নিজের হাতে করে মনের মত গড়েছেন। কিন্তু এক এক সময় তাঁর মনে হয় সেই অমিয়ও যেন কেমন পাল্টে যাচ্ছে। তাঁর কথায় প্রতিবাদ করে নিজের মতকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করে। যেন মনে হয় অমিয় তাঁকেই অস্বীকার করবার চেষ্টা করছে ইদানীং।

তাই নাতি রঞ্জুকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেন। তাকে নিজের মত করে গড়তে চান।

কিন্তু সেই রঞ্জুই দাদুর ব্যবহারে বিস্মিত। বাবা অমিয়র এক গরীব পুরনো বন্ধু তাদের বাড়িতে আসায় দাদুর অবহেলা এবং উষ্মা প্রকাশ দেখে তার খুব খারাপ লাগল। না হয় দাদু সারা জীবন জমিয়াত করেছে আর তার বাবা বার-এ্যাট-ল। আর ঐ লোকটা ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষ। রঞ্জুর এটা ভালো লাগে নি।

অথচ ঐ মানুষটাই তাকে বিপ্লবীদের কত গল্প শুনিয়েছে। শুনতে শুনতে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরতে তার দেরী হয়ে গিয়েছিল।
আর সে-জন্যে দাদুর কি বকুনি। সেই রাগে রাত্রে রঞ্জু খায় নি।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা টিঁকল না রঞ্জুর। খেতেই হোল। তার কারণ যূঁইদি। কেষ্টনগর থেকে এ বাড়িতে পৌঁছেই সে এসে আদর-টাদর করে দরজা খুলিয়ে কলঘরে নিয়ে গিয়ে মুখ ধুইয়ে আনলো। ভাত খেতে বসেও যূঁইদি তাকে নিয়ে ব্যস্ত রইল। তার কারণও অবশ্য রঞ্জুর অজানা নয়।

বস্তুত তার ওপর যূঁইদির যে বিশেষ একটা আকর্ষণ আছে, সেটা রঞ্জু বোঝে। তার আরো একটা প্রমাণ দিল যূঁইদি কেষ্টনগরে ফিরে যাবার আগে। রঞ্জুকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য দাদুর অনুমতি চাইল।
আর আশ্চর্য, অনায়াসেই অনুমতি পেয়েও গেল।

(ষোল)

—এই রঞ্জু!

চমকে উঠল সে। এক সঙ্গে তিন-চারটে গলা। কাগজের ব্যাগ দুটো সে বগলে রাখতে যাচ্ছিল। রাখা হল না। হাতে ঝুলাতে লাগল। অজন্তা স্টোর্সের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক ঘাড় ফেরায় সে। কাউকে দেখছে না তো।

—এদিকে এদিকে! আবার তিন-চারটে গলা চেঁচিয়ে ওঠে।

এবার রঞ্জু দেখতে পায়। ফুটপাথের উল্টো দিকে বাঁ কোণাকুণি তার চোখটা ঘুরে গেছে। 'মিলনী'র দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা। অমিত শোভেন পার্থ। সোমেনকেও দেখা যাচ্ছে। সোমেন তা হলে দার্জিলিং থেকে ফিরেছে। ওরা বাড়ীসুদ্ধ দার্জিলিং ঘুরতে গিয়েছিল।

'অজন্তা'র সিঁড়ি থেকে নেমে লম্বা লম্বা পা ফেলে রঞ্জু রাস্তাটা ক্রশ করল। [illegible] বাসটা প্রায় [illegible] চলে গেল।

আর একটু হলে চাপা পড়ছিল আর কি! অন্যদিন এই অবস্থায় হৃৎপিন্ড লাফিয়ে মুখে উঠে আসত। ভয় পেয়ে ঘেমে উঠত।

আজ যেন সে এটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। রোদ ফুরফুর করছে। সেই সকাল থেকে। হাওয়ায় পাখা মেলে দেওয়া প্রজাপতির মতন সে উড়ছে ঘুরছে। যূঁই-দির জন্য পাঁচটা স্টেশনারী দোকানেই তাকে ঢুঁ মারতে হয়েছে। এখন অজান্তায় এসে যূঁইদির মনের মতন মাথার তেলটা পাওয়া গেল যা-হোক। বনস—কী নাক, এই হেয়ার অয়েলে চলবে না। ওই হেয়ার-অয়েল বাজে বস্তির মেয়েরা মাখে। যেন কত বস্তি ঘুরে এসেছেন যূঁইরানী। রঞ্জু মনে মনে হাসছিল। অঢেল পয়সা কিনা। তাই এটা নিয়ে ওটা নিয়ে খুঁতখুঁতানির আর শেষ নেই। সামান্য একটা পাউডার পাফ-এর জন্য তিনবার রঞ্জুকে দোকানে ছুটে আসতে হয়েছে। অবশ্য কাল যূঁইদি নিজেও রঞ্জুকে নিয়ে মার্কেটিং করতে বেরিয়েছিল। বাকী কটা জিনিস আজ রঞ্জু কিনছে। তবে এ-পাড়ার কিছু যেন পছন্দই হয় না যূঁইদির।

এবং রঞ্জু জানে আজ যা যা কিনে নিয়ে যাচ্ছে পনেরো দিন পরে সব যূঁইদি ফেলে দেবে। আর ব্যবহার করতে ভাল লাগবে না। অর্থাৎ পুরোনো হয়ে গেল। হেয়ার-অয়েল সাবান ক্রিম সেন্ট লিপস্টিক রুজ—নিত্যনতুন ব্র্যান্ড চাই। আর টাটকা টাটকা বাকস থেকে শিশি থেকে ঢালা হবে খোলা হবে—তবে না মেজাজ ঠিক থাকবে। কথাগুলি বলে খিল খিল করে হাসে যূঁইদি। তাই রঞ্জু ভাবে পয়সা থাকলেই মেজাজ ফলান যায়। রঞ্জুরা ফলাতে পারছে? কি দিয়ে মেজাজ ফলাবে! একটা হেয়ার-অয়েল কিনলে মা-কে পাক্কা দেড় মাস টেনে নিয়ে যেতে হয়। ওই থেকে টুটুনও মাঝে মাঝে ভাগ বসাচ্ছে। দামী সাবান তো বাড়ীতে আসেই না। মাসের বরাদ্দ দু পীস লাইফ-বয় ওই দিয়ে বাথরুমের কাজ ও গায়ে মাথার কাজ সারতে হয়। টুটুন একটা স্যাম্পু পায় স্কুলে যায় বলে। আর এক ডিবে পাউডার। ব্যস। কসমেটিক বলতে বঙ্কিম দত্তর বাজেটে আর কিছু রাখা হয় না। স্বামীদের রোজগার-পত্র না থাকলে মেয়েদের যা দশা হয়। রঞ্জুর মা অনেক দিন আগে ঠোঁট মুখ নখ রঙ করা ছেড়ে দিয়েছে। বয়স? মা-র চেয়ে ডবল বয়সের গিন্নীরাও আজকাল যেমন সেজেগুজে রাস্তায় বেরোয় না, দেখলে তাক লাগে। তবে যূঁইয়ের কথা আলাদা। রানীর চেয়েও সুখে আছে ওই মানুষ। পরশু সারাটা দিন রঞ্জুকে নিয়ে শাড়ির দোকানে ঘুরেছে। ওপর থেকে দেখতে গেলে শাড়ি আর কসমেটিক কিনতেই ওর ঘন ঘন কলকাতা আসা। তবে রঞ্জুর জন্য আসছে রঞ্জুকে দেখতে আসছে এটা খুবই চাপা ব্যাপার। রঞ্জু নিজে আর যূঁইদি ছাড়া এ জিনিস পৃথিবীতে কারো টের পাবার কথা নয়। চাপা বলেই তো জিনিসটার মানে এত সুখ।

কিন্তু আজ ওরা এই রেস্তোরাঁয় কেন? 'মিলনী'তে কেন! রঞ্জু মনে মনে অবাক হয় শোভেনদের এখানে দেখে। ওদের ফেবারিট চায়ের দোকান ছিল। ট্রাইয়াঙ্গুলার পার্কের কাছের 'পিকনিক'। নতুন খুলেছে। লোকটাও [illegible]

চা বা কফি নিয়ে অনেকক্ষণ বসে আড্ডা দিলেও বিশেষ কিছু বলে না। মানে এখনও বলছে না। দোকান পুরোনো হয়ে গেলে খদ্দেরের ভিড় বাড়লে কি হবে বলা অবশ্য শক্ত। যেমন এই 'মিলনী'। মাস ছ-সাত আগে যখন নতুন খোলা হয় একটা খদ্দেরের মুখ দেখত না। সারা দিন খোলা মাঠের মতন খু-খু করত ভিতরটা। আর তখন রঞ্জুদেরও সবে একজামিন শেষ হয়েছে। ওরা চার-পাঁচজন বন্ধু ছাড়া যেন ওই চায়ের দোকানের আর খদ্দেরই ছিল না। খুব আড্ডা দিত রঞ্জুরা সকাল থেকে বেলা দশটা-এগারোটা। কোনদিন বিকেলে। তখন বাড়ীতেও কিছু বলার ছিল না। কারো গার্জেন কাউকে কিছু বলত না। পরীক্ষা শেষ হয়েছে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে ছেলেরা এখন একটু বেড়াবে-টেড়াবে আড্ডা দেবে খুব স্বাভাবিক। বাড়ীর লোক জিনিসটা ভাল চোখেই দেখত। এতদিন দেখছিল।

ব্যাস পরীক্ষা দিয়েছে তো দিয়েছে—রেজাল্ট বেরোতে যে ছ মাস লেগে যাবে কে জানত। যত দিন যাচ্ছে গার্জেনরাও অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। সবার। কাউকে বাড়ীতে ভাল চোখে আর দেখতে পারছে না যেন।

যেন রেজাল্ট বেরোচ্ছে না, দোষটা ছেলেদের।

কাজেই এলেবেলে আড্ডা মারা ও বাইরে ঘোরাঘুরি বাড়ীর লোক আর মোটেই পছন্দ করছে না। সহ্য করছে না।

তা না করলেও রঞ্জু তো চোখের ওপর দেখে তার দাদুর মতন একটি গার্ডিয়ানও না। শোভেন অমিত পার্থ সোমেন যেমন বলে—বাড়ীতে তাদেরও এখন কড়াকড়ি চলছে। তা বলে বাড়ী থেকে বেরোলেই ঘাড় ধরে ঘরে ফিরতে হবে। সন্ধ্যার পর বেরোন চলবে না। দুপুরে বেরোন নিষেধ সিনেমা দেখা বন্ধ, দোকানে বসে চা খাওয়া বন্ধ—এতটা পাগলামি তাদের কাকা জেঠা দাদু কি বাবারা করে না। তারা ক্লাস ফোর-ফাইভে পড়ে না এখন। বেশী আড্ডা-টাড্ডা না দিতে দু-একবার বলে, এই পর্যন্ত। তা বলে বাড়ী থেকে বেরোলেই রঞ্জুর মতন তাদের পিছনে চাকর দারোয়ান পাঠিয়ে বাড়ীর লোক গোয়েন্দাগিরি ফলাবে, এ স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

অম্বুজা-নিলয়ের ঐ খচ্চর বুড়োকে যে রঞ্জু শেষ পর্যন্ত কি করবে ভেবে ঠিক করতে পারছে না। ওফ্—

—কি রে খুব যেন একটা ফিলসফারের মতন ভাবছিস আর হাঁটছিস!

—না তো! ফিক করে হেসে রঞ্জু চায়ের দোকানের দরজায় দাঁড়াল। শোভেনের কাঁধের ওপর বাঁ-হাতটা তুলে দিল সে।

—না বলছিস কি অমিত মাথা ঝাঁকাল, সবাই মিলে বার বার তোকে গলা ফাটিয়ে ডেকেছি। দেখছিলাম তোর যেন হুঁশ নেই। আকাশের দিকে চোখ রেখে ভাবছিলি।

—মাইরি! ট্রাম বাসের যা শব্দ! অমিতের চোখে চোখ রেখে রঞ্জু অল্প হাসল। শুনি নি। একদম শুনতে পাই নি রে।

—ভেতরে আয়, শোভেন বলল হাতে এসব কি!

—কসমেটিক।

—কার?

—দিদির ননদের।

—ওই যে কেষ্টনগর থেকে আসেন মহিলা?

রঞ্জু ঘাড় নাড়ল।

—মহিলা খুব ঘন ঘন তোদের বাড়ী আসছে, ব্যাপার কি? অমিত চট করে বলে ফেলল।

—ঘন ঘন! ভুরু কুঁচকে রঞ্জু অমিতের মুখটা দেখল। তারপর মাথা নাড়ল। না তো ঘন ঘন তুই দেখলি কবে?

—আমি তোর সবচেয়ে কাছের নেভার। ম্যান্ডেভিল গার্ডেন্স দিয়ে একবার-দুবার...আমাকে যেতেই হবে। তোদের দোতলার ব্যালকনিতে কি জানালায় বা দরজায় মহিলার মুখটা আমি প্রায়ই দেখি বলে বলছি। আমি কি বানিয়ে কিছু বলছি। কি দরকার বানিয়ে বলার। কি বলিস শোভেন?

—থাক এই নিয়ে এখন তর্ক করে লাভ নেই। সকলের আগে শোভেন, তারপর রঞ্জু এবং তাদের দুজনের পিছনে অমিত ও সোমেন দোকানের ভিতরে ঢুকে পড়ল। একটা টেবিল নিয়ে যেন তারা আগেই বসেছিল। রঞ্জু দেখল এখন চারটে চেয়ার খালি পড়ে আছে। একটা চেয়ারে পার্থ একা বসে আছে। পার্থকে দারুণ গম্ভীর দেখাচ্ছে। টেবিলে চারটে চায়ের কাপ। একটা যেন খালি সিগারেটের প্যাকেটও পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। শোভেন আঙুল দিয়ে দেখাতে রঞ্জু একটা চেয়ারে বসল। শোভেন অমিত ও সোমেন বাকী তিনটা চেয়ার দখল করল।

—অ, তোরা তালে অনেকক্ষণ এখানে আছিস। কাগজের ব্যাগ দুটো রঞ্জু টেবিলে নামিয়ে না রেখে নিজের কোলের ওপর রাখল। রেখে অল্প হেসে শোভেনকে প্রশ্ন করল।

—আমরা সেই সকাল ন'টা থেকে এখানে বসে গেঁজাচ্ছি। শোভেন বলল হঠাৎ দেখলাম তুই অজান্তায় ঢুকছিস। তাই তো সকলে মিলে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালাম।

—এত সময় কী কেনাকাটা করছিলি অজান্তায়? অমিত প্রশ্ন করল।

ঐ যে মেয়েদের সব ছাইভস্ম জিনিস—রুজ ক্রিম পাউডার লিপস্টিক। কেমন যেন একটা তাচ্ছিল্য দেখাতে রঞ্জু ঠোঁট বাঁকাল।

সোমেন ও শোভেন এক সঙ্গে হাসল।

—ছাইভস্ম বলছিস কিরে। সোমেন শেষ পর্যন্ত আর হাসল না, গম্ভীর হয়ে বলল, ভাত না খেয়ে ওরা থাকতে পারে—রুজ ক্রিম লিপস্টিক ছাড়া ওদের এক দণ্ড চলে না।

—কেন কেষ্টনগরে এসব পাওয়া যায় না বুঝি? টিপ্পনি কাটার মতন করে অমিত বলল।

রঞ্জু ক্রমশ তার ওপর চটে যায়। যদিও সেটা প্রকাশ করতে পারে না। অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে গিয়ে চুপ করে থাকে।

শোভেন ব্যাপারটা বোঝে। যেন রঞ্জুর হয়ে এই মুহূর্তে কিছু বলার দরকার। অমিতের দিকে চোখ রেখে সে ভুরু কুঁচকাল। —কেষ্টনগরে সব কিছু পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও তেমন ফ্রেশ জিনিস যে পাওয়া যাবে না এটা ঠিক, ছোট জায়গা। হয়তো পুরোনো মালটাল রাখে। কাজেই কলকাতায় যখন উনি আসেন দরকার মতন সব কিনেকেটে নিয়ে যান।

সোমেন বলল,—তা ছাড়া কেষ্টনগরে হয়তো একটা ক্রিমের জন্য কি একটা নেল-পালিসের জন্য ওরা গলাকাটা দাম হাঁকে যে জন্য রঞ্জুর দিদির ননদ এখান থেকে নিয়ে যান। —কেমন, আমি ঠিক বলিনি রঞ্জু?

রঞ্জু অস্পষ্ট করে ঘাড়টা কাত করল।

—হ্যাঁ অমিত মাথা ঝাঁকাল। সেই হিসেবে কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে যাওয়া ঢের ভাল। অনেক পয়সা বাঁচে। আর ফ্রেশ জিনিসটা পাওয়া যায়।

—তুই থাম তো অমিত খুব বেশী বক বক করিস। শোভেন ধমক লাগায়। রঞ্জু চা খাবি?

—খেতে পারি।

—এই! শোভেন হাত তুলে দোকানের ছেলেটাকে ডাকল। এখানে এক কাপ চা।

ঘাড় নেড়ে ছেলেটা চা আনতে ছুটল।

—রঞ্জু তোর কাছে সিগারেট আছে?

—আছে। নেই বলতে পারল না রঞ্জু। পাঁচটা গোল্ড উইলস আজ কিনেছে সে। অজন্তায় ঢোকার সময় একটা ধরিয়েছিল। নিশ্চয় শোভেনরা দেখতে পেয়েছে। কাজেই এখন আর এদের কাছে লুকোন চলে না জিনিসটা। আস্তে আস্তে পকেট থেকে প্যাকেটটা সে বের করল।

—গুড! প্রায় ছোঁ মেরে শোভেন প্যাকেটটা তুলে নিয়ে চারটে সিগারেটই বের করল। একটা নিজের ঠোঁটে গুঁজল, একটা সোমেনকে দিল। একটা পার্থকে একটা অমিতকে। —তোর কিন্তু আর একটাও থাকছে না রঞ্জু।

—থাক, আমি এই মাত্তর খেয়েছি।

—তবু যা হোক রঞ্জু আজ আমাদের সবাইকে উইলস খাওয়াচ্ছে।

শোভেনের হাত থেকে লাইটারটা নিয়ে অমিত সিগারেট ধরায়, তারপর সোমেনের দিকে লাইটারটা ঠেলে দেয়।

অমিতের কথাটার মধ্যে একটা খোঁচা আছে। যদিও সত্য কথা। রঞ্জুকে ওরা কদিনই সিগারেট খাইয়েছে। রঞ্জু আজ প্রথম ওদের খাওয়াচ্ছে। তা হলেও মুখের ওপর অমিত কথাটা বলবে রঞ্জু আশা করে নি। মুখটা ঘুরিয়ে সে রাস্তার দিকে তাকায়। প্রথম থেকেই অমিতকে আজ তার খারাপ লাগছে।

—চা এসে গেছে। রঞ্জু চা খা।

শোভেনের কথায় রঞ্জু আবার টেবিলের দিকে ঘুরে বসল।

সঙ্গে সঙ্গে অমিত কেমন করে যেন কাশল। যেন গলায় ধোঁয়াটা হঠাৎ আটকে গেছে।

—কি হল! সোমেন ভুরু কুঁচকাল। তার ঠোঁটে একটা চাপা হাসি।

—কিছু না। অমিত মাথা ঝাঁকায়। তারপর সোজা হয়ে বসে। তারপর আড়-চোখে রঞ্জুকে দেখে। রঞ্জু তার দিকে মোটেই তাকাচ্ছে না। —রঞ্জু আমার ওপর রাগ করছিস? গলার স্বরটা নরম করে অমিত জিজ্ঞেস করল।

—কেন রাগ করব কেন। চায়ের কাপ থেকে রঞ্জু ঝপ করে মুখটা তুলল।

—না ঐ যে বললাম তোর দিদির ননদ ঘন ঘন তোদের বাড়ী আসে—বলতে তুই এমন চোখ মুখের চেহারা করলি না—

—ঘন ঘন উনি আসেন না বলেই এমন চেহারা করেছিলাম। মুখটা লাল করে রঞ্জু উত্তর করল। তার কপালের একটা শিরা ফুলে উঠল।

—অকটোবর পড়তে উনি আবার এলেন কিনা, সেপ্টেম্বরেও দুবার এসেছিলেন। অমিত বলল।

—না। রঞ্জুর উত্তেজনা বাড়ছিল। জোরে মাথা ঝাঁকাল সে। সেপ্টেম্বরে উনি মোটে একবার এসেছিলেন।

—কি মুস্কিল, স্পষ্ট দেখলাম তাদের ব্যালকনিতে ওঁকে দু দিন দাঁড়ান। তবে কি আমার চোখের ভুল!

—হয়তো। চা শেষ করে রঞ্জু ঠকাস শব্দ করে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল।

—ইস, কী বাজে জিনিস নিয়ে তোদের ঝগড়া! যেন এই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করবি দুজনে! অমিত—শোভেন ডাকল।

—আমি চললাম। রঞ্জু উঠে দাঁড়ায়।

—উঁহু, তোর সঙ্গে কথা আছে। সিরিয়াস টক। রঞ্জুর হাত ধরে শোভেন টেনে বসায়। অমিত! শোভেন অমিতের দিকে কড়া চোখে তাকায়।

অমিত তার দিকে তাকায় না। সিগা-রেটটা জোরে জোরে টানে আর কটমট করে রঞ্জুকে দেখে।

—তোর কিন্তু সাড়ে দশটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ার কথা ছিল অমিত। শোভেন হাতঘড়ি দেখল। এখন এগারোটা বাজে।

—হুঁ যাচ্ছি, যাব কথা দিয়েছি [illegible] জোরে আর একটা টান দিয়ে অমিত হাতের সিগারেটটা শেষ করল। তারপর আঙুলের টোকা দিয়ে রাস্তার দিকে গুঁড়িটা ছুঁড়ে দিল।

—এই করিস কি? সোমেন প্রায় আঁতকে ওঠে। কারো গায়েটায়ে পড়ত।

অমিত শব্দ করে না। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। যেন রঞ্জুর ওপর রাগটা কমছে না। পকেট থেকে চিরুনি বের করে ত্রস্ত হাতে মাথা আঁচড়ায়। অমিতের মাথার চুলই সবচেয়ে বড়। এবং চুলের গোছাও ভাল। দু পাশে কানের কাছে আঙুরের ছড়ার মতন থোকা থোকা চুল ঝুলছে। আড়চোখে এক-বার সেদিকে তাকিয়ে রঞ্জু তখনি আবার মুখটা ঘুরিয়ে নেয় ও একটা চোরা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে। কাল সে চুল কেটেছে। যুঁই-দির কথায় কাটতে হয়েছিল। চুল ছোট বড়তে কি এসে যায় অবিশ্যি আজকাল ছেলেরা বড় চুল রাখছে ফ্যাশান। মার্কেটিং করতে বেরিয়ে যুঁই কাল রঞ্জুকে বুঝিয়ে-ছিল, তা হলেও তোমার বাড়ীর লোক বিশেষ করে বুড়োটা যখন চাইছে চুলটা কেটে ফেল তবু যদি ওরা সবাই ঠান্ডা থাকে খুশী থাকে তোমার চুল চলে যাচ্ছে, কিন্তু তার বদলে অনেক বড় জিনিস ভাল জিনিস তুমি পেয়ে যাচ্ছ মনে রাখবে।—বলে যুঁই ট্যাকসিতে বসে রঞ্জুর কাঁধে হাত রেখে দুষ্টু মেয়ের মত মিটিমিটি হাসছিল। যুঁইয়ের হাসির অর্থ রঞ্জু বুঝেছিল। চৌরঙ্গীর একটা বড় চুল কাটার সেলুনে যুঁই তাকে নিয়ে যায় এবং নিজে বসে থেকে রঞ্জুর চুল ছাঁটিয়ে আনে।

তুচ্ছ চুলের বদলে অনেক ভাল জিনিস বড় জিনিস পাচ্ছে সে। যুঁইদির সঙ্গে কেষ্টনগরে বেড়াতে যাওয়া যে কী জিনিস! কথাটা যত সে ভাবছিল খুশীতে ডগমগ হচ্ছিল। সেলুন থেকে বেরিয়ে আসার পর চুলের শোক তার একদম ছিল না।

আজ হঠাৎ অমিতের মাথাটা দেখে তার বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগল। যেন চুলের জন্য শোকটা উথলে উঠল। অবশ্য এক সেকেন্ডের জন্য। পরক্ষণে শোকটা আর রইল না। যুঁইদির মুখ মনে পড়ল।

রঞ্জু দেখল প্যান্টের পকেটে চিরুনিটা রাখতে অমিত উঠে দাঁড়িয়েছে। অথবা এমনিও যেন সে উঠে দাঁড়াত।

—চললাম। শোভেনের দিকে অমিত আর তাকাল না। রঞ্জুর দিকেও না। সোমেন—চ। সোমেনের কাঁধে আঙুলের টোকা মারল অমিত।

—হুঁ, চ। সোমেন তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। সোমেনের সঙ্গে অমিতের বন্ধুত্বটা বেশি। এখানে পাঁচজনের সবাই সবায়ের বন্ধু। তাহলেও এর মধ্যে যেন ডিগ্রীর বেশকম আছে। যেমন পার্থর সঙ্গে শোভেনের বন্ধুত্বটা অন্য সকলের চেয়ে বেশি। চোখে পড়ার মতন। আবার রঞ্জুর সঙ্গেও শোভেনের মাখামাখিটা খুবই গাঢ়। যেটা অমিত বা সোমেনের সঙ্গে নেই।

—পাঁচটা টিকিট মনে থাকে যেন। থুতনি তুলে অমিতের মুখের দিকে তাকাল শোভেন।

—পাঁচটা জোগাড় করা যাবে কিনা বলতে পারি না। তবে চারটে সিওর। পল্টুমামার বন্ধুকে আমি চারখানা টিকিটের কথাই কাল বলে এসেছিলাম।

—কিন্তু আবার পাঁচজন হয়ে গেলাম যে আমরা। শোভেন ধড়ফড়িয়ে উঠল।

—সে আমি করব কি। চ সোমেন! সোমেনের কাঁধ ধরে অমিত দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

শোভেন দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল।

—খেলার টিকিট! রঞ্জুর গলার স্বর এবার অনেক সহজ শোনায়। শোভেনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সে।

—হুঁ, শোভেন মাথা ঝাঁকাল। নাকটুন।

পরের সংখ্যায়
সুশীল রায়ের গল্প

তো শেষ পর্যন্ত টিকিট দিলেন না। হাঁটাহাঁটি সার হল।

—অমিতের পল্টুমামার সঙ্গে মোহনবাগানের কারো জানাশোনা আছে বুঝি?

—তাই তো বলছে ও। তবে অমিতের কথার মধ্যে পার্সেন্টেজ থাকে তোরা জানিস। রঞ্জুর চোখে চোখ রেখে শোভেন সামান্য হাসল। পার্থর দিকেও একবার তাকাল সে। পার্থ সেই যে চুপ করে বসে আছে, এখনও এক অবস্থা। এর মধ্যে একটা কথাও বলেনি সে। রঞ্জু লক্ষ্য করল পার্থর দু' আঙুলের ফাঁকে উইলস ফ্লেকটা তেমনি গোঁজা আছে। ধরায়নি। পার্থকে এত গম্ভীর একটু অনামনস্ক দেখে রঞ্জুর কেমন খটকা লাগল। তবে তার দিকে খুব একটা মন দিতে পারছে না সে। শোভেনের কথা শুনছিল।

—বুঝলি শোভেন বলল পরশু নাকি অমিতের পল্টুমামা বলেছে তার এক বন্ধু কালীঘাট থাকে। সেই বন্ধুর বাবা এককালে মোহনবাগান ক্লাবের নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন। মোহনবাগান ক্লাবের ওপর এখানে নাকি খুব ইনফ্লুয়েন্স রাখেন। চাইলেই বড় বড় ম্যাচ খেলার টিকিট পান, যখন খুশি। আশীর ওপর বয়স হয়েছে। বছর দু'-তিন আগে কি একটা সাপ্তাহিক কাগজে লাইফস্কেচ বেরিয়েছিল বুড়োর। সঙ্গে ফটো ছাপা হয়েছিল।

—তারপর? শোভেনের দিকে চোখ রেখে রঞ্জু বড় করে একটা ঢোক গিলল। টিকিট দেবেন ভদ্রলোক?

—অমিত তো বলছে দেবেন। কাল সকালে কালীঘাট গিয়েছিল সে। আজ নাকি সকাল দশটায় দেখা করতে বলেছেন।

একটু চুপ থেকে রঞ্জু মাথা দোলাল।

কোল থেকে তুলে কাগজের ব্যাগদুটো টেবিলে রাখল।

—আমার মনে হয় না শেষ পর্যন্ত অমিত টিকিট আদায় করতে পারবে। আদৌ তার পল্টুমামার এমন কোনো বন্ধু আছে কিনা, আর সেই বন্ধুর বাবা কোনোদিন মোহনবাগানের প্লেয়ার ছিলেন কিনা সেই সম্পর্কে আমার ডাউট আছে। অমিতের কথার মধ্যে ভীষণ নড়চড় থাকে।

—হুঁ, তাই তো। দেখা যাক। শোভেন আস্তে বলল। অমিতকে তো আমরা নতুন দেখছি না।

একটু চুপ থেকে রঞ্জু বলল, মোট চারখানা টিকিট দেবেন ভদ্রলোক?

—পাঁচখানার কথাই আজ বলে দিলাম। কাল সকালে অবিশ্যি চারটে টিকিটের কথাই বলে এসেছিল অমিত। হঠাৎ কাল বিকালে ট্রেনে সোমে দার্জিলিং থেকে চলে এসে সব গোলমাল করে দিলে।

—ওদের তো ফিফটিনথ পর্যন্ত দার্জিলিং থাকার কথা ছিল, তাই না? রঞ্জু ভুরু কোঁচকাল।

—হুঁ, তাই জানতাম। একটু আগে সোমেন বলছিল ওর মা-র শরীর একদম ভাল যাচ্ছিল না দার্জিলিং-এর ঠাণ্ডা একেবারে সহ্য হচ্ছিল না।

আবার চুপ থেকে কি একটু ভেবে রঞ্জু মাথা ঝাঁকাল।—যাকগে যদি চারখানা টিকিট পায় অমিত তাতেও কিছু অসুবিধে হচ্ছে না তোদের। আমি লীগের খেলা দেখতে যাব না।

—কেন মুখের গর্তটা গোল করে ফেলল শোভেন। না যাবার কারণ কি?

—অমিতের আনা টিকিট দিয়ে আমি খেলা দেখব না, মরে গেলেও না।

—হোপলেস। শোভেন হিসহিস করে উঠল। চটে গেলে শোভেন এমন একটা আওয়াজ বের করে মুখ দিয়ে। হাতের মুঠ দুটো শক্ত করে এক সেকেন্ড রঞ্জুর মুখটা দেখল সে। তারপর আস্তে বলল একটা সাধারণ জিনিস নিয়ে কথা কাটাকাটি হল আর অমনি তুই রেগেমেগে খেলা দেখতে যাওয়া বন্ধ করে দিবি! টিকিট কি অমিত তার বাড়িতে তৈরি করছে না টাকা দিয়ে কিনছে? আর একজন দয়া করে দিচ্ছে—

কিন্তু রঞ্জু নীরব। আসলে সে যে কেষ্টনগর চলে যাচ্ছে। হয়তো লীগের ফাইনাল খেলার দিন সে কলকাতায় ফিরবে না। যূঁইদি তাকে এত সকাল সকাল ছাড়বে না। কথাটা সে এখনো এদের কাছে বলতে পারছে না। বিশেষ করে যূঁইদিকে নিয়ে এইমাত্র অমিতের সঙ্গে তার একচোট হয়ে গেল। কাজেই চুপ থেকে এমন একটা ভান দেখাল সে এখন, যেন অমিতের ওপর রাগ করে তার খেলা দেখার ইচ্ছে চলে গেছে।

—থাক খেলার প্রসঙ্গ এখন ছাড়, দিকিনি শোভেন। আগুনটা দে। পার্থ কথা বলল। পার্থ এই প্রথম কথা বলছে। লাইটারটা শোভেনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

রঞ্জু দেখল সিগারেট ধরাতে গিয়ে পার্থর হাতটা কাঁপছে। ঘনঘন শ্বাস ফেলছে সে। যেন চুপচাপ এতক্ষণ বসে থাকলেও তার ভিতরে একটা চাপা উত্তেজনা লুকিয়ে ছিল। এখন সেটা প্রকাশ পাচ্ছে। সিগারেট ধরাবার পর শোভেনের হাতে লাইটারটা ফিরিয়ে দিল সে জোরে সিগারেটে কয়েকটা টান দিল তারপর নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে এতটা ধোঁয়া বের করে রঞ্জুর দিকে তাকাল।

—টিকিট আনতে পারুক না পারুক ও যে এখান থেকে কেটেছে এটাই বড় কথা।

—হ্যাঁ, তা-ও বটে। শোভেন ঘাড় নাড়ল। যেদিনই আমরা একটা জরুরী আলোচনা করতে চাইছি—ও যে কি করে এসে জোটে। আজ একেবারে সোমেনকে নিয়ে এখানে হাজির।

—ও কি জানত তোরা 'মিলনী'-তে ঢুকবি?

—না তো। রঞ্জুর দিকে চোখ রেখে শোভেন মাথা নাড়ল। পার্থ ও আমি সেই সকাল আটটায় এখানে এসে ঢুকেছিলাম।

—ও গন্ধে গন্ধে টের পায়। চোখ দুটো বড় করে পার্থ রঞ্জুর দিকে তাকাল।

—বুঝলি ওর বোনটা যে এমন সাংঘাতিক কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে—নিশ্চয় হাওয়ায় গন্ধ শুঁকে কিছুটা টের পাচ্ছে অমিত।

রঞ্জু কথা বলছিল না।

শোভেন বলল কাল টুবুলি আর একটা লম্বা চিঠি ছেড়েছে পার্থকে।

—সত্যি! রঞ্জু চোখ বড় করল।

—হ্যাঁ লিখেছে, 'পার্থ' যদি ওর কথায় রাজী না হয়তো সুইসাইড করবে ও।

—ইস্ কী বিচ্ছিরি। রঞ্জু ঠোঁট বেঁকাল। নাকের ডগা কোঁচকাল। তারপর?

—এই জন্য আজ ওকে আমি এখানে ডাকিয়েছি পার্থ বলল, সরাসরি ওকে জিজ্ঞেস করব ও কি সত্যি সিরিয়াস না ফাজলামো করে আমাকে এসব লিখছে।

—কোথায় ও! রঞ্জু চমকে উঠল।

—ওখানে। শোভেন আঙুল দিয়ে পাশের পর্দা-খাটান খুপরিটা দেখাল।

—কতক্ষণ এসেছে?

—অনেকক্ষণ। শোভেন বলল সোমেনকে নিয়ে অমিতটা এসে হুট করে ঢুকল তাই কিছু করা যাচ্ছিল না এতক্ষণ। অবিশ্যি বয়কে দিয়ে কেক পুডিং ডবল ডিমের অমলেট চা অনেক কিছু পার্থ পাঠিয়ে দিয়েছে ওই কামরায়; ছ' টাকার মতন বিল উঠেছে একলা টুবুলির জন্য।

ফ্যালফ্যাল করে রঞ্জু যূঁইদির কসমেটিকে ঠাসা কাগজের প্যাকেট দুটো দেখতে লাগল।

শোভেন বলল, অমিত চলে গেছে এখন পার্থ ওখানে ঢুকে টুবুলিকে কথাটা জিজ্ঞেস করবে। আমি ও তুই এখানে অপেক্ষা করব। দরকার হলে পার্থ আমাদের দুজনকে ভিতরে ডেকে নিয়ে যাবে। বুঝলি?

রঞ্জু অল্প করে ঘাড় নাড়ল।

(ক্রমশ)

মনশ্চক্ষুতে দর্শনের পরীক্ষায় য়ুরি গেলার। বিজ্ঞানীরা এক-একটি ছবি এঁকে খামে পুরেছে, য়ুরি গেলার বৈদ্যুতিক আড়াল তোলা ঘরের মধ্যে থেকে এঁকে দেখিয়েছে খামের ভিতরের ছবিটি কী। এখানে বিজ্ঞানীদের আঁকা ছবি (টার্গেট) ও য়ুরি গেলারের দেখা প্রতিচ্ছবি (রেসপনস) উপস্থিত করা হয়েছে। এ, বি, সি, ডি— এই চারটি ছবি হাতে আঁকা ও খামে পুরে রাখা। ই, এফ— এই দুটি ছবি কম্পিউটারে ফুটিয়ে তোলা।

য়ুরি গেলার-এর কাহিনী

কিছুকাল আগে য়ুরি গেলার নামে একজন তরুণ ইজরাইলীর অভাবনীয় কাণ্ডকারখানা দেখে খোদ আমেরিকায় সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। যেহেতু এইসব কাণ্ডকারখানার সঙ্গে গোড়া থেকেই কিছু বিজ্ঞানী জড়িত ছিলেন, অতএব তার ধাক্কা গিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছিল গবেষণা-মূলক বিজ্ঞানের সুবিখ্যাত পত্রিকা 'নেচার' পত্রিকায় এবং তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে অবশেষে 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকায়। শেষোক্ত পত্রিকার জনকয়েক বিজ্ঞানী বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক তদন্ত করেন ও বিস্তৃত রিপোর্ট উপস্থিত করেন। সম্প্রতি আমাদের দেশের 'সায়েন্স টুডে' পত্রিকার একটি সংখ্যাতেও য়ুরি গেলারের কাহিনী 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার রিপোর্টের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। বাংলায় এখনো পর্যন্ত কোথাও লেখা হয়েছে চোখে পড়ে নি। তাই আরো সংক্ষেপে য়ুরি গেলারের কাহিনী উপস্থিত করছি। আমাদের এই তুকতাকের দেশে য়ুরি গেলারের চেয়ে অনেক কম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিও আরো অনেক সামান্য কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে পূজিত হয়ে থাকেন অতএব এই কাহিনী জানা দরকার।
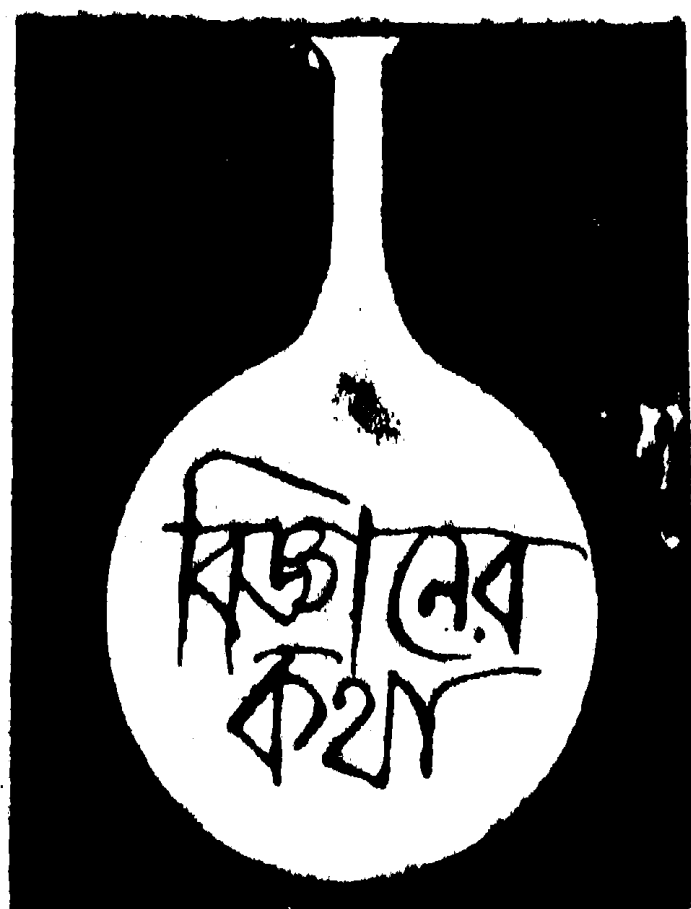
বিজ্ঞানের কথা

য়ুরি গেলারকে ইজরাইল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে এসেছিলেন একজন বিত্তবান বিজ্ঞানী—ডঃ আন্দ্রিয়া হেনরি পুহারিখ। সেখানে তিনি গেলারকে উপস্থিত করলেন যাদুকর হিসেবে নয়; অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন মনশ্চক্ষুর অধিকারী সিদ্ধ পুরুষ হিসেবে। গেলার দাবি করে: বন্ধ খামে রাখা ছবি সে এঁকে দিতে পারে, কাঁটা চামচকে স্পর্শ না করেও বেঁকাতে পারে বহু দূরের ঘটনার বিবরণ দিতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছু কিছু করেও দেখাল সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার টেলিভিশনে ও রেস্তোরাঁ-বারে তাকে নিয়ে সোরগোল পড়ে গেল। লক্ষ্য করবার বিষয়, না দেখে ছবি আঁকা বা না ছুঁয়ে লোহা বাঁকানো বা এ ধরনের কাণ্ডকারখানা (বা তার চেয়েও রোমহর্ষক কাণ্ড—যেমন করাত দিয়ে মানুষ কাটা) যাদুকরেরাও ঘটাতে পারে, কিন্তু তারা কখনো দাবি করে না যে তারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। গেলার সেই দাবি করল—সে নাকি 'সিদ্ধ' পুরুষ: ইন্দ্রিয় দিয়ে নয়, মনশ্চক্ষুর সাহায্যে সে অবলোকন করতে পারে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'সাইকিক' অর্থাৎ মনঃক্ষমতাসম্পন্ন—সে তাই (আমাদের দেশে 'সিদ্ধ' পুরুষ)।

বিজ্ঞানীদের সামনে পরীক্ষায় বসতেও গেলার অরাজী নয়। আমেরিকার বিজ্ঞানী-দের কৌতূহলও প্রচণ্ড। ফলে দেখা গেল ক্যালিফর্নিয়ার বিখ্যাত বিজ্ঞান-সংস্থা স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এস-আর-আই) গেলারের ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একদল বিজ্ঞানীর ওপরে ভার দিয়েছে। এই বিজ্ঞানী দলের প্রধান দুজন হচ্ছেন ডঃ হাল পুটহফ ও রাসেল টার্গ, দুজনেই লেসার-বিজ্ঞানী তবে সাইকিক ব্যাপারের সঙ্গেও জড়িত।

তাঁদের পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রকাশিত হল সুবিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায়। প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হল, য়ুরি গেলারের ওপরে তিনটি পরীক্ষা কার্য চালাবার পরে পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাস হয়েছে, এমন একটা

কিছু ব্যাপার আছে যার সাহায্যে দূরের অবস্থান সম্পর্কে খবর পাওয়া যায় তবে অন্তর্দর্শনের এই ক্ষমতার কোনো ব্যাখ্যা এখনো পর্যন্ত সম্ভব নয়।

প্রথম পরীক্ষায় গেলারকে রাখা হয়েছিল বিদ্যুতের আড়াল তোলা একটি কামরার ভিতরে। পরীক্ষাকার্যের কর্তারা দূরের কোনো জায়গায় বসে ছবি আঁকতেন গেলার তা এঁকে দেখাত। বিদ্যুতের আড়াল তোলা কামরায় বাইরে থেকে সংকেত পাঠানো একেবারেই অসম্ভব ছিল। অর্থাৎ গেলার ছিল দর্শন ও শ্রবণ ও বৈদ্যুতিক সংকেত গ্রহণে সম্পূর্ণ অপারগ অবস্থায়। তাছাড়া গেলারকে জানানো হত না ছবি কে আঁকছেন। ছবি আঁকা হত এইভাবে : (১) একটি অভিধান যে-কোনো পৃষ্ঠায় খোলা। তারপরে সেই পৃষ্ঠার প্রথম যে শব্দটি ছবিতে প্রকাশ করা সম্ভব সেই ছবি আঁকা। (২) একজন বাইরের লোকের আঁকা ছবি নেওয়া। (৩) জমানো ছবি থেকে একটি তুলে নেওয়া। (৪) বাইরের বিজ্ঞানীদের দ্বারা চালিত কাম্পউটারে ফুটে ওঠা ছবি নেওয়া।

এই চার পদ্ধতিতে নেওয়া মোট তেরোটি ছবি নিয়ে পরীক্ষাকার্য চলে। দুটি পরীক্ষাকার্যে গেলারকে নিয়ে আসা হয় বাইরে আর পর্যবেক্ষকরা বসেন বিদ্যুতের আড়াল তোলা কামরার মধ্যে। এই তেরোটি ছবির মধ্যে দুটি ছবির বেলায় (যে দুটি বাইরের লোকের আঁকা) কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি।

অতঃপর এই দু সেট ছবি (এক সেট পর্যবেক্ষকদের আঁকা ও অপর সেট গেলারের আঁকা) অন্য একদল বিজ্ঞানীর সামনে উপস্থিত করা হয়। দেখা গেল, তাঁরা যে-ভাবে দুই সেটের মধ্যে জোড় মেলালেন (অর্থাৎ প্রথম সেটের কোন্ ছবি থেকে দ্বিতীয় সেটের কোন ছবিটি আঁকা) তা নির্ভুল হল।

দ্বিতীয় পরীক্ষা কার্যের বিষয় ছিল অলোক দৃষ্টি বা মনশ্চক্ষুতে অবলোকন। ব্যাপারটি এই রকম : প্রাত্যহিক জীবন থেকে একগোটি ছবি একজন শিল্পী এঁকে দেন এবং অপর একজন ব্যক্তি কার্ডবোর্ডে মোড়া কালো খামের মধ্যে একটি একটি করে সেগুলো পোরেন। তারপরে যেমন-তেমনভাবে সেগুলো কুড়িটির ভাগে করা হয়। তিনদিন ধরে পরীক্ষাকার্য চলে। পৃথক একটি খামে কী ছবি আছে গেলার তা ধরতে পারে নি, কিন্তু প্রতিদিনই সে এমন গোটা বারো ছবি এঁকে দেখিয়েছে যার মধ্যে থেকে গোটা দুয়েকের সঙ্গে ভাগের ছবির কিছুটা মিল ছিল। পুটহফ ও টার্গ বলছেন, ঘটনাচক্রে যা হতে পারত পরীক্ষা কার্যের সময়ে আঁকা ছবিগুলো তার চেয়ে বেশি দূর যেতে পারে নি।

দ্বিতীয় পরীক্ষা কার্যে একটি ডাই রাখা হয় একটি ইস্পাতের বাকসের মধ্যে। বাকসটি ঝাঁকানো হয়। এবারে গেলারকে বলতে বলা হয় ডাই-এর কোন দিকটি ওপরে আর কোন দিকটি নীচে। গেলার দুবার ভুল বলে, আর আটবার সঠিক।

ধাতু বাঁকানো সম্পর্কে 'নেচার' পত্রিকার রিপোর্টে কোনো উল্লেখ ছিল না। পুটহফ ও টার্গ বললেন, গেলার এ কাজটিও করেছে (অর্থাৎ ধাতু বেঁকিয়েছে—সাইকোকাইনেসিস)। তবে পরীক্ষাকার্যটি ঠিক মতো পরিচালিত হয় নি বলে ধর্তব্য নয়।

*

'নেচার'-এর মতো বিজ্ঞানের ডাক-সাইটে পত্রিকায় এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পরেই একেবারে হুলুস্থুল বেধে গেল। একদলের তো মহা ফূর্তি—এতদিনের অবজ্ঞেয় একটি বিদ্যাকে বিজ্ঞান বলে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে তাই। আর সমালোচকরা ক্রুদ্ধ হয়ে মন্তব্য করলেন যে এই রিপোর্টটি প্রকাশ করে 'নেচার' পত্রিকা জাত খুইয়েছে।

আত্মপক্ষ সমর্থনে 'নেচার' পত্রিকায় শুধু লেখা হল যে দুজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর দ্বারা রচিত এবং একটি বিখ্যাত বিজ্ঞান-সংস্থা কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত এই রিপোর্ট প্রকাশ করাটা অযৌক্তিক বিবেচিত হতে পারে না। তাছাড়া বিষয়টিও বিবেচনার যোগ্য, যদিও পরীক্ষা কার্য যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে তাকে কোনোক্রমেই নিখুঁত বলা চলে না!

তারপরে ১৯৭৩ সালের ২৩ নভেম্বর তারিখে বি বি সি-র টেলিভিশনে য়ুরি গেলারকে উপস্থিত করার পরে ইংলন্ডেও য়ুরি গেলার অতিখ্যাত একটি নাম হয়ে ওঠে। টেলিভিশনের প্রোগ্রামে গেলারের সঙ্গে ছিলেন দুজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী—প্রফেসর জন টেলর ও ডঃ লায়ল ওয়াটসন। দুজনেই গেলারের কাণ্ডকারখানা দেখে বিভ্রান্ত হলেন এবং স্পষ্টতই ধারণা দিলেন যে ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটা কিছু 'বিজ্ঞান' থেকে গিয়েছে মনে হয়।

তখন ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখার জন্য 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হল। ১৯৭৩ সালের ২৩ নভেম্বর তারিখে এই উদ্দেশ্যে গঠিত হল গবেষকদের একটি প্যানেল—তার সদস্য হলেন সাইকিক্যাল গবেষণা সমিতির একজন সদস্য, একজন গবেষক মনোবিজ্ঞানী 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার সম্পাদক ও অপর একজন প্রতিনিধি বৃহৎ সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত একজন স্বাধীন সাংবাদিক এবং একজন পেশাদার যাদুকর। তাঁরা য়ুরি গেলারকে পরীক্ষা কার্যে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। য়ুরি গেলারের কাছ থেকে চটপট সম্মতিসূচক জবাব পাওয়া গেল।

কিন্তু গেলারের আগমন আর ঘটে না। পরীক্ষাকার্য বার বার স্থগিত রাখতে হয়। শেষ পর্যন্ত গেলার 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকাকে জানিয়ে দেয় যে সে তার মত বদলে ফেলেছে।

এই পরীক্ষা কার্যের জন্য ব্যাপক এক প্রস্তুতি করে রাখা হয়েছিল—মুখ্যত করেছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ যোসেফ হ্যানলন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে গোড়ার দিকে তিনিও ছিলেন গেলারের ভক্ত। সেই তিনিই এবারে গিয়ে হাজির হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং গেলার সম্পর্কিত গবেষণার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বললেন এবং প্রত্যেকটি বিষয় খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করলেন।

এবং অতঃপর সমস্ত বিষয়টি প্রকাশ করে দিলেন (নিউ সায়েন্টিস্ট, ১৭ অক্টোবর ১৯৭৪)। এককালে যিনি ছিলেন গেলারের ভক্ত তিনি যখন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে দেখলেন তখন গেলার সম্পর্কে উৎসাহব্যঞ্জক কিছু বলতে পারলেন না।

•

ডঃ হ্যানলন বললেন য়ুরি গেলার একজন সুদক্ষ যাদুকর মাত্র তার বেশি কিছু নয়। তার জারিজুরি ও কলাকৌশল এতই পরিশীলিত যে বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীদের পর্যন্ত বিভ্রান্ত ও বিহ্বল করে। তার মধ্যে এমন একটা সরলতা ও শিশুসুলভ পবিত্রতা আছে যে মানুষে তাকে পছন্দ করে ও বিশ্বাস করতে চায়।

গেলার সাধারণত তার 'অলৌকিক' কার্যকলাপ দেখিয়ে থাকে ছোট ছোট মুগ্ধ সমাবেশের মধ্যে—খবরের কাগজের লোকজন বা বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি। এক কাজ করতে করতে অন্য কাজের মধ্যে আচমকা সরে যায় তখন আগের কাজের মালমশলাগুলো যে অরক্ষিত পড়ে থাকে সেদিকে আর কারও নজর থাকে না। এমনিভাবে অরক্ষিত পড়ে থাকার সময়েই চাবি বা চামচ বেঁকিয়ে রাখা হয়েছে এবং পরে আবার যখন সে আগের কাজে ফিরে এসেছে তখন এই বাঁকানো চাবি বা চামচ দেখিয়েই মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। বন্ধ খামের ভিতরে কী আছে তা গেলার প্রথম বারে সাধারণত বলতে পারে না, দ্বিতীয়বারে অন্য কাজ থেকে ফিরে এসে পারে। মাঝখানের এই সময়ে খামগুলো থাকে অরক্ষিত।

কখনো কখনো গেলার একটা পেরেক অন্য মানুষের হাতের মুঠোয় রেখে দূর থেকে বেঁকিয়ে দিয়েছে। এই অত্যাশ্চর্য কাণ্ড সম্পর্কে পরে ভাবতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মাঝখানের খানিকটা সময় সকলের অন্যমনস্কতার সুযোগ গেলার

নিতে পেরেছিল। কখনো কখনো এমনও মনে হয় আগে থেকে বাঁকানো পেয়েকই সে ব্যবহার করেছিল কৃতিত্ব দেখাবার সময়ে নতুন করে বাঁকায় নি।

যাদুকররা বলে তারাও ঠিক এইভাবেই খেলা দেখিয়ে থাকে। তবে তারা কখনো বলে না যে অলৌকিক ক্ষমতাবলে তারা এ-সব কাজ করছে, তাদেরটা নিতান্তই ভোজবাজী। হাতের কেরামতি বা যন্ত্রপাতির কলাকৌশল বা মানুষের অনামনস্কতার সুযোগ নিয়ে তারা তাক লাগাবার মতো কান্ডকারখানা করে!

তাছাড়া গেলারকে সাহায্য করেছেন ডঃ পুহারিখের মতো বিজ্ঞানী যিনি ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক এবং যিনি তার আগেই ৫৬টি আবিষ্কারের পেটেন্ট নিয়েছিলেন। তাঁর অধিকাংশ আবিষ্কারই মেডিকেল ইলেকট্রনিকস সংক্রান্ত অন্যতম আবিষ্কার হচ্ছে দাঁতের মধ্যে লুক্কায়িত অতি ক্ষুদ্র এক বেতারগ্রাহক যন্ত্র। এমনও হতে পারে এমনি এক অতিক্ষুদ্র বেতারগ্রাহকযন্ত্র গেলারের দাঁতের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল এবং খামের ভিতরে ছবি বন্ধ করার সময়েই সে নির্দেশ পেয়ে যাচ্ছিল ছবিটি কী?

যাদুকররাও এমনি কোনো উপায় অবলম্বন করেই চোখ বাঁধা অবস্থায় আঁক কষে বা লেখা পড়ে।

এ-সব কথা শুনে গেলার বলেছে, 'আমি যা করেছি যাদুকররাও তা করতে পারে একথা ঠিক, কিন্তু তার মানে এই নয় যে যাদুকররা যেভাবে করে আমিও সে-ভাবেই করি।'

তার ভক্তরা বলেছে, 'অবিশ্বাসীদের দূরে থাকাই ভালো। গেলারের কাছে আসতে চাও তো বিশ্বাস নিয়ে এসো।'

লক্ষ্য করবার বিষয় আমাদের দেশেও যাঁরা নিজেদের 'সিদ্ধ' পুরুষ বলে দাবি করেন তাঁদের ভক্তরাও শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাসের কথাই তোলেন।

কথা উঠতে পারে বন্ধ খামের মধ্যে কী ছবি আছে তা গেলার যখন এঁকেছিল তখন তাকে রাখা হয়েছিল বিদ্যুতের আড়াল তোলা ঘরের মধ্যে—তাহলে?

ডঃ হ্যানলন বলছেন, বিদ্যুতের আড়ালটি কি ধরনের ছিল তার কোনো বর্ণনা রিপোর্টে নেই। বাতানুকূল করার যন্ত্র বসানো একটি কামরায় প্রতিরোধ-ব্যবস্থা কখনো এমন সর্বাঙ্গীণ হতে পারে না যে মাইক্রোওয়েভ পর্যন্ত ঠেকানো যেতে পারে। একজন বিজ্ঞানী যদি সহায় থাকে তাহলে আর ভাবনা কি!

যদি গেলারের এই কাহিনী আমাদের দেশের পাঠকদের সামনে উপস্থিত করলাম এই আশায় যে তারা এ-থেকে শিক্ষা নিতে পারবেন, 'সিদ্ধ' পুরুষদের কবলে পড়ে প্রবঞ্চিত হবেন না।

গোর্কিসদনে সোভিয়েত যুব প্রদর্শনী

১৩ জানুয়ারী থেকে কলকাতার গোর্কি সদনে 'সোভিয়েত যুব' নামে যে প্রদর্শনীটি চলছে সেখানে বিজ্ঞান-বিষয়ক বেশ কিছু দ্রষ্টব্য বিষয় আছে। প্রদর্শনীটি দেখে যে-কেউ উপকৃত হবেন, অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা তো বটেই।

প্রদর্শনীর সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ হুবহু মানুষের চেহারাধারী একটি রোবোট, মানুষের মতো কথা বলে (বাংলায় ও ইংরাজীতে) মানুষের মতো হাত-পা নাড়ে এবং এমন কি চলাফেরাও করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৩ থেকে ১৬ বছর (ইয়ুথ রিভিউ পত্রিকার বিবরণ অনুসারে ১৩ থেকে ১৬ বছর আর প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রচারিত স্থানীয় বিবরণ অনুসারে দশ থেকে বারো বছর) বয়সের স্কুলের ছেলেমেয়েরা এই রোবোট মানুষ তৈরি করেছে।

তাছাড়া আছে সোভিয়েত চন্দ্রযান লুনোখোদ-এর একটি মডেল বিদ্যুতচালিত। এটিও সোভিয়েত ছেলেমেয়েদের হাতে তৈরী।

আছে আরো অনেকগুলো মডেল—টেলিভিশনের ট্রাকটরের আরো অনেক যন্ত্রের। আছে দূর মহাকাশের অন্য কোনো গ্রহের কল্পিত চিত্র।

সর্বোপরি সোভিয়েত ছেলেমেয়েদের উচ্ছ্বসিত প্রাণবন্ত জীবনের আশ্চর্য সব ছবির সঙ্গে এই প্রদর্শনীর দর্শক অবশ্যই পরিচিত হবেন।

হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ

এই পরিষদ 'লোকবিজ্ঞান' নামে যে মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করছেন তার ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যায় দুটি সুপাঠ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে—'হাওড়া জেলায় রজনী-গন্ধার চাষ' ও 'নারিকেল প্রসঙ্গ'। পরিষদের উদ্যোগে ২৩ জানুয়ারী থেকে একটি মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনের সায়েন্স ফোরাম আয়োজিত বিজ্ঞান মেলা ১৯৭৫

'সায়েন্স ফোরাম' দক্ষিণ কলকাতার তীর্থপতি স্কুলের ছেলেদের একটি সংস্থা ১৯৭৪ সালের ১০ অকটোবর গঠিত। তারপরে অল্প সময়ের মধ্যেই এই সংস্থার ছেলেরা 'বিজ্ঞান' নামে একটি দেওয়াল-পত্রিকার তিনটি সংখ্যা প্রকাশ করেছে একটি লাইব্রেরি গড়ে তুলছে এবং একটি সুন্দর বিজ্ঞান-মেলার আয়োজন করেছে।

বিজ্ঞান মেলাটি দেখার মতো বিশেষ করে এই মেলার কয়েকটি যান্ত্রিক মডেল। দশম শ্রেণীর ছাত্র বুদ্ধদেব লাহিড়ী যে এপিডিয়াস্কোপ তৈরি করেছে (একটি বাকস ফোকাস করার দুটি জোরালো আলো ও একটি উত্তল লেন্সের সাহায্যে) কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ অতি নিখুঁত। ছাদের ট্যাংক জলে ভর্তি হয়ে যাওয়া ঘরে আগুন লাগা ইত্যাদি নানা জরুরি সংবাদ জ্ঞাপনের সতর্কীকরণ মডেলেও অল্পবয়সী ছেলেরা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছে। মেলার প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ছেলেদের হাতের তৈরী ইগুয়ানোডন ও ব্রন্টোসরাসের মডেল দুটি চমৎকার। অন্যান্য বিভাগের মধ্যে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক বিভাগ হচ্ছে গণিতের ও ভূগোলের। বিভাগ দুটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে-কোনো দর্শক আগ্রহী হয়ে উঠবেন।

—অয়স্কান্ত

অঙ্গনা

আইনের চোখে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার

সুপ্রাচীন কাল থেকেই সমাজে মেয়েদের অধিকার নিয়ে পুরুষদের চিন্তা ও মতবাদ পুরুষতন্ত্রসমাজকে বাতিব্যস্ত করে তুলেছে। স্ত্রীলোকের অধিকারকে একেবারে খারিজ করার পক্ষে কেউ অবশ্য মত দেন নি। তবে অনেকেই স্ত্রীগণকে স্বল্প অধিকার দিয়ে বেঁচে থাকার পক্ষে সুপারিশ করেছেন। আবার কোন কোন পন্ডিত সমাজে নারীর স্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে নারীকে দেবতার চেয়েও উচ্চস্থানে স্থাপন করেছেন কিন্তু তার অধিকারকে স্পষ্টভাবে সুরক্ষিত করার কোন চেষ্টাই করেন নি। ঋগ্বেদের সময় থেকে শুরু করে মহাকাব্যের রচনাকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সমাজসংস্কারক স্মৃতি-শাস্ত্রের ভাষ্যকার প্রভৃতি আদর্শ নারীর আদর্শকেই জোরে প্রচার করেছেন। নারীর সতীত্ব ও আদর্শকে সবসময় গুরুত্ব দিয়ে দেখানো হয়েছে। আমাদের জানা উচিত যে যখন আমরা কাউকে কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করি সঙ্গে সঙ্গে তার অধিকার সম্পর্কেও নিজের এবং অপরের তৎপর হওয়া দরকার। অধিকার ও কর্তব্য অংগাঙ্গিভাবে জড়িত। যুগ যুগ ধরে স্ত্রীর অধিকার সম্বন্ধে অনেক সমাজসংস্কারক সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে এসেছেন কিন্তু সেই অধিকারের বাস্তবরূপ তারা দিতে পারেন নি। তৎকালীন সমাজব্যবস্থা স্ত্রী-অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার অনুকূলেও ছিল না তাই বিভিন্ন সময়ে কন্যার জন্মকে পিতা ও মাতা দুঃখের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। শিশুকন্যাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিক্ষা-দান না করে বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। স্বামীর অকাল-মৃত্যুতে বিধবা স্ত্রীর দায়িত্ব ও অধিকারকে সমাজের অধিকাংশ মানুষ এড়িয়ে চলেছেন এবং এই এড়াবার দুর্নীতিসন্ধি বারবার সতী-দাহের মধ্য দিয়ে সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মকে প্রতিফলিত করেছে।

উনিশ শতকের শেষ দিক দিয়ে পৃথিবীর সুশিক্ষিত দেশগুলিতে যখন স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয় ভারতবর্ষেও তার ঢেউ এসে পৌঁছায়। অধিকাংশ আইনজ্ঞ ও আইন-প্রণয়নকারীরা সমস্যার বাস্তবতা উপলব্ধি করেন। আইনবিদরা উপলব্ধি করেন যে শুধুমাত্র আদর্শের দোহাই দিলে স্ত্রীর স্বাধীনতাকে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন স্ত্রীর সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করা। সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকৃত হলে নারীস্বাধীনতা অনেকাংশে সার্থক রূপ লাভ করবে। এই নারী স্বাধীনতার চিন্তাকে মাথায় রেখে দায়ভাগ এবং মিতাক্ষরা মতবাদে আইন-বিদরা স্ত্রী সম্পত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ আইন লিপিবদ্ধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজ বোম্বাই এবং অন্যান্য স্থানের আইনবিদরা হিন্দু আইনের স্ত্রীর সম্পত্তি ও সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন আইন লিপিবদ্ধ করেন। এই আইন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন-ভাবে প্রযুক্ত হলেও মোটামুটিভাবে এর উদ্দেশ্য এবং সুর এক। এই আইনগুলি প্রযোজ্য হবার পরেও আইনে কিছু কিছু গলদ ও দোষত্রুটি থেকে যায় এবং এই দোষগুলি সংশোধিত হয় ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে। এই আইন পূর্ববর্তী দায়ভাগ মিতাক্ষরা এবং অন্যান্য আঞ্চলিক আইনের প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি রেখে ঐ আইনের কিছুটা সংশোধন করেন যেই সংশোধনগুলি স্ত্রীলোকের অধিকারকে পরিপূর্ণভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

দায়ভাগ মিতাক্ষরা প্রমুখ আইনপ্রণেতারা 'স্ত্রীধন' শব্দটির ওপর বিশেষ জোর আরোপ করেন। তাঁদের মতে স্ত্রীধন হচ্ছে স্ত্রীলোকের সেই সম্পত্তি যার ওপর স্ত্রীলোকের পূর্ণ অধিকার। এমনকি অসীমিত হস্তান্তর ও বিলিবণ্টনের পরিপূর্ণ সুযোগও এ আইনে সম্পত্তির অধিকারিণীর রয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্র-মতে বিয়ের অগ্নির সামনে কন্যাকে দেওয়া পিতৃদত্ত সম্পত্তি স্বামীর গৃহে লব্ধ সম্পত্তি কন্যার শ্বশুরালয়ে স্বামীছাড়া নববধূকে অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রদত্ত সম্পত্তি (স্থাবর অস্থাবর) এবং বিয়ের সময় প্রদত্ত শুল্ক বা পণ প্রভৃতি স্ত্রীধনের অন্তর্ভুক্ত।

স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন আইনবিদদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মত পার্থক্য থাকলেও সকলের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রায় একই। যেমন—স্ত্রীধনের অধিকারিণী স্ত্রীর অবর্তমানে এর অধিকারী হবেন অগ্রাধিকার বলে স্ত্রীর সহোদর ভ্রাতা মাতা পিতা এবং পিতার অবর্তমানে পিতার সপিণ্ডরা।

হিন্দু উত্তরাধিকারের এই আইনেও আইনবিদরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না তারা মনে করলেন কোথায় যেন স্ত্রী উত্তরাধিকার আইনে কিছুটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে তাই তাঁরা স্থির করলেন এই আইন সংশোধনের। ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে স্ত্রীধন সম্পর্কে যে সংশোধন করা হল তার ফলে দেখা যায় স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির সর্বপ্রথম অংশী-দার হবেন তাঁর পুত্রকন্যারা (মৃত পুত্রকন্যার সন্তানেরা) এবং তাঁর স্বামী। এঁদের অবর্তমানে স্বামীর উত্তরাধিকারীরা অর্থাৎ সপিণ্ডরা। এঁদের অভাবে সম্পত্তির অধি-কারী হবেন স্ত্রীর পিতামাতা অথবা পিতার বংশধরেরা এবং তাঁদের অবর্তমানে মায়ের বংশধরেরা।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ১৯৫৬ (অনুচ্ছেদ ১৫) বলে দেখা যায় কোন নারী বিবাহিত এবং বিধবা হলে তাঁর সম্পত্তির সর্বপ্রথম সন্তানদের এবং সন্তানদের সন্তান-সন্ততির অভাবে পিতা-মাতা এবং তার অভাবে পিতা ও মাতার উত্তরাধিকারের ওপর বর্তাবে এক্ষেত্রে অবিবাহিত কন্যার পক্ষে তার সম্পত্তির অধিকারী হবেন মাতা পিতা এবং তাঁদের অভাবে পিতার বংশ-ধররা এবং তাঁদের অভাবে মাতার বংশ-ধরেরা।

আলোচ্য আইনে স্ত্রীর সম্পত্তিতে কিভাবে অধিকার জন্মায় তারও বিশদভাবে উল্লেখ আছে। (১) উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা কিংবা মাতার নিকট হতে লব্ধ সম্পত্তি নতুন আইন অথবা পুরানো আইন বলে। (২) পিতা কিংবা মাতার লিখিত উইলের ফলে। (৩) সম্পত্তি বিভাগের ফলে স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীরূপে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বস্বরূপ। (৪) দানস্বরূপ প্রাপ্ত সম্পত্তি। (৫) নিজের বুদ্ধিবলে প্রাপ্ত অথবা অধিকৃত সম্পত্তি। (৬) নতুন সম্পত্তি ক্রয় কিংবা স্বামীর সম্পত্তির বেনাম-দার হিসেবে কেনা সম্পত্তি। এই উভয় সম্পত্তির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নেই।

এই আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে যদি স্বামীর কোন সম্পত্তির কোন অংশমাত্র স্ত্রী পেয়ে থাকেন তবে ভবিষ্যতে স্বামীর মৃত্যুর পর উক্ত সম্পত্তির তিনি পুরো অংশীদার হবেন।

স্ত্রীধন সম্পর্কিত ১৯৫৬ সালের উত্তরাধিকার আইন বলবৎ হওয়ার পর থেকে আইনের চোখে নিঃসন্দেহে স্ত্রীর সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এখন আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে আমাদের সমাজে স্ত্রী বা নারীদের কর্তব্য ও অধিকার দুটি সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ আইনের আশ্রয় স্ত্রীসম্পত্তির ক্ষেত্রে কদ্দূর পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে। লিপিবদ্ধ আইনই যথেষ্ট নয় যদি সে আইন যথাযথভাবে প্রযুক্ত ও কার্যকরী না হয়। আমাদের সমাজে অধিকাংশ লোকই দরিদ্র আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার অর্থনৈতিক ক্ষমতা অনেকেরই নেই। অনেকে আবার এভাবে আদালতের আশ্রয় নেওয়ায় সংকোচ বোধ করেন। অনেকে আবার আদালতের দরজা এড়িয়ে পরস্পর বোঝা-পড়ার মাধ্যমে অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও সমাধানের পথ খুঁজতে চেষ্টা করেন।

যে আন্দোলনের ফলে পৃথিবীতে স্ত্রী-স্বাধীনতা গড়ে উঠেছে (তার মধ্যে সম্পত্তির এই আইনকে বাদ দেওয়া যায় না) ভারতবর্ষ তা থেকে মুক্ত হতে পারে নি তাই হাজার হাজার বছর পরেও স্বাধীন দেশের নারীরা আইন ও সংবিধানের চোখে নিজেদেরকে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

—অঞ্জলি চৌধুরী

রান্না করে দেখুন

লেবু, অঢেল লেবু

বাজারে এখন অঢেল কমলা লেবু—দামও সস্তা। সারা বছর কমলা লেবু খাওয়া তো বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। কাজেই এমন একটা মধ্য পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে যাতে এই অঢেল কমলা লেবুর ছিটে-ফোঁটাও প্রতিদিন খাওয়া চলে। কমলা লেবুর স্কোয়াশ, কমলা লেবুর জেলি ও কমলা লেবুর মার্মালেড তৈরী করে রাখা যেতে পারে। বাজারের তৈরী কৃত্রিম জেলির চেয়ে বাড়ীতে খাঁটি উপাদানে তৈরী এই জেলি খেতে অনেক ভাল হবে এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও উপকারী হবে। পাতিলেবু দিয়েও কমলালেবুর মতোই স্কোয়াশ, জেলি ও মার্মালেড তৈরী করা যায় এবং কমলালেবু ও পাতিলেবুর মিক্সড মার্মালেড তৈরী করা যায়। পাতিলেবুরও এখন দাম কম। পাতিলেবু ও কমলালেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' আছে। হাড় মজবুত রাখতে প্রতিদিনের খাদ্যে ভিটামিন 'সি' একান্ত দরকার। ভিটামিন 'সি'র অভাবে স্কার্ভি রোগ হয় এবং শিশুরা রিকেটস-এ আক্রান্ত হয়। জেলি ও স্কোয়াশ ছাড়াও কমলালেবু দিয়ে পায়েস, পুডিং ও স্যালাড ইত্যাদি তৈরী করা যায়। পাতিলেবুর নানা রকমের আচারের কথা তো সুবিদিত।

কমলালেবুর স্কোয়াশ :

উপকরণ : কমলালেবুর রস ৫ কাপ, চিনি ১০ কাপ, জল পাঁচ কাপ, সাইট্রিক অ্যাসিড ৬ থেকে ৮ চামচ, অরেঞ্জ এসেন্স ৪ চা চামচ। অরেঞ্জ রঙ একটুখানি, পোট্যাসিয়াম মেটাবাইসাল্ফেট ৩ গ্রাম।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। ভাল কমলালেবু বা মুসম্বী আধখানা করে কেটে রস বার করে ছেঁকে নিন। ২। চিনি ও জল দিয়ে রস তৈরী করুন। ফুটতে থাকলে সাইট্রিক অ্যাসিড দিন। ৩। রস তৈরী হলে কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিন এবং ঠাণ্ডা করে নিন। রস ঠাণ্ডা হলে তাতে ফলের রস, রঙ ও এসেন্স মিশিয়ে দিন। ৫। একটুখানি গরম জলে পোট্যাসিয়াম মেটাবাইসালফেট গুলে নিয়ে কমলালেবুর রসের মধ্যে ভাল করে মিশিয়ে দিন। এই স্কোয়াশ পরিষ্কার শুকনো বোতলে মোম দিয়ে ভাল করে সীল করে ছিপি এঁটে রেখে দিলে অনেক দিন ভাল থাকে। জলের সঙ্গে গুলে বরফ মিশিয়ে এই স্কোয়াশ গরমের দিনে পরিবেশন করতে হয়। এই রকমভাবেই আনারস ও পাকা আমের স্কোয়াশও তৈরী করা যায়।

কমলালেবুর জেলি :

উপকরণ : কমলালেবুর রস পাঁচ কাপ, চিনি পাঁচ কাপ (উঁচু করে ভরা), পেক্টিন ১০ গ্রাম, সাইট্রিক অ্যাসিড ৮ থেকে ১০ গ্রাম, অরেঞ্জ রঙ একটুখানি, অরেঞ্জ এসেন্স ½ চা চামচ।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। ভাল কমলালেবু আধখানা করে কেটে রস বার করে ছেঁকে নিন। ২। একটা শুকনো কাপে একটু চিনিতে পেক্টিন মিশিয়ে রাখুন। ৩। কমলা-লেবুর রস একটা অ্যালুমিনিয়াম বা স্টেনলেস স্টীলের পাত্রে ঢেলে উনুনে বসান। ৪। খুব গরম হয়ে গেলে পেক্টিন মিশ্রিত চিনি আস্তে আস্তে ওই রসের ওপর ছড়িয়ে দিতে থাকুন ও রসটা ভাল করে নাড়তে থাকুন। সমস্ত পেক্টিনটা ভাল করে রসের সঙ্গে গুলে যাবে। ৫। এইবার আস্তে আস্তে বাকী চিনিটা রসের মধ্যে দিয়ে দিন। ৬। সমস্ত চিনিটা গলে গেলে ও রস ফুটতে আরম্ভ করলে সাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে দিন ও নাড়তে থাকুন। ৭। রঙ মেশান। ৮। কাচের ডিশে ফোঁটা ফেলে দেখুন জমে যাচ্ছে কিনা। যদি জমে যায় নামিয়ে নিয়ে এসেন্স মিশিয়ে ঘেঁটে নিন ও গরম অবস্থাতেই কাঠের পিঁড়ির ওপর শুকনো পরিষ্কার শিশি রেখে জেলি ভরে ফেলুন। ৯। যতক্ষণ না ঠাণ্ডা হয় ঢাকা খুলে রাখবেন। ১০। একদিন পরে শিশির মুখ মোম দিয়ে সীল করে নেবেন। এই জেলি বহুদিন ভাল থাকবে।

কমলালেবুর মার্মালেড :

কমলালেবুর মার্মালেড ঠিক কমলালেবুর জেলির মতো করেই তৈরী করতে হয়। এর **কমলাগন্ধী** তেতো মিষ্টি স্বাদ পাঁউরুটিতে মাখিয়ে খেতে ভারী চমৎকার। কমলালেবুর জেলির সঙ্গে এর তফাৎ হল এই যে মার্মালেডে কমলালেবুর খোসাও দিতে হয়। পাঁচ কাপ কমলালেবুর রসে এক কাপ কমলালেবুর খোসাই যথেষ্ট। ১। কমলা-লেবুর খোসার সাদা অংশটা সম্পূর্ণভাবে ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলুন। খোসা সরু সরু ফালি করে কেটে নিন। ২। এই খোসা দু'তিনবার জল বদলে বদলে জলে সেদ্ধ করুন। সম্পূর্ণভাবে জল ঝরিয়ে নিন এবং কাপড় দিয়ে মুছে শুকনো করে নিন। কমলালেবুর রসে চিনি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লেবুর খোসা দিন এবং জেলি যেমনভাবে তৈরী করেছিলেন ঠিক তেমনই-ভাবে তৈরী করুন। তাহলেই কমলালেবুর মার্মালেড তৈরী হয়ে যাবে। পাতিলেবুর জেলি, স্কোয়াশ ও মার্মালেড ঠিক এই-ভাবেই তৈরী করা যায়—তফাতের মধ্যে শুধু এই যে পাতিলেবুতে সাইট্রিক অ্যাসিড দিতে হয় না।

কমলালেবুর স্যালাড :

উপকরণ : দুধ ১ কেজি, চিনি ২৫০ গ্রাম, কমলালেবু ৪টি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। কমলালেবুর কোয়া ছাড়িয়ে নিয়ে ভেতরের শাঁস বার করে নিন। ২। দুধ ঘন করে নিন—চিনি দিয়ে জ্বাল দিন। ৩। ঘন হয়ে এলে নামিয়ে ঠাণ্ডা করে নিন। কমলালেবুর শাঁস দুধের মধ্যে মিশিয়ে দিন।

পাতিলেবুর খোসার আচার :

স্কোয়াশ বা জেলি ও মার্মালেডের জন্য পাতিলেবুর রস বার করে নিলে লেবুর খোসা আর কোন কাজে লাগে না। এখানে এমন একটি আচারের কথা বলছি যাতে এই খোসাগুলিও সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যায়। উপকরণ : চার কেজি পাতিলেবু, ½ কেজি নুন ৫০ গ্রাম সর্ষে গুঁড়ো ৫ গ্রাম শুকনো শিলে পেষা রসুন, একটু গুঁড়ো হিং, ১ বড় চামচ আস্ত সর্ষে, ১০০ গ্রাম লঙ্কার গুঁড়ো, ½ কেজি সর্ষের তেল।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। লেবু চার টুকরো করে কেটে তার থেকে ১½ লিটার রস স্কোয়াশ ইত্যাদি তৈরী করার জন্য বার করে নিন। ২। খোসাগুলো এক ডেকচি জলের ওপর কোন বাসনে বা ডিবেতে ঢাকা দিয়ে এবং নুন রসুন দিয়ে ভাপিয়ে নিন এবং কাঁচের জারে পাতলা কাপড় দিয়ে মুখ বেঁধে চারদিন রেখে দিন। ৩। তেল গরম করুন। সর্ষে ফোড়ন দিন, হিং দিন, লঙ্কা ও সর্ষের গুঁড়ো দিন। ৪। লেবুর খোসাগুলো একটা এনামেলের বাসনে বার করে নিন এবং তার ওপর ওই তেল ঢেলে দিন। খোসার সঙ্গে তেল ভালভাবে মাখিয়ে নিন। ৫। ঠাণ্ডা হলে জারে ভরে রাখুন।

—সাধনা মুখোপাধ্যায়

রূপসীর কথা
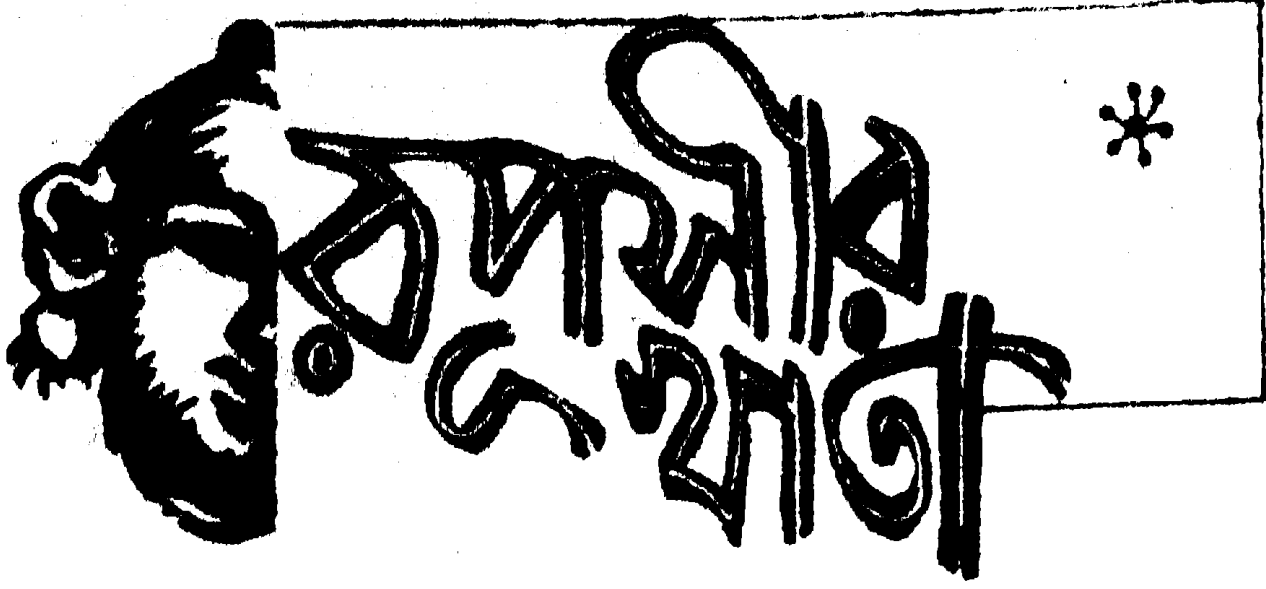
বাড়ীর তৈরী নানান প্রসাধন সামগ্রী সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল—আজও চলবে। প্রত্যেক জিনিসের দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে এছাড়া আর উপায়ই বা কি? তবে এটাও ঠিক, দায়ে পড়ে আমাদের উপকারই হয়েছে। বাড়ীর তৈরী নিজেদের হাতে তৈরী জিনিস যে অনেক ভাল ও ভেজাল মুক্ত এ বিষয়ে সন্দেহ নিশ্চয়ই নেই।

ভেসলিন আমাদের ঘরে প্রায় সকলেরই আছে। এই ভেসলিন শীতকালে খুবই কাজে লাগে। লিপস্টিক লাগিয়ে তার ওপর একটু ভেসলিন লাগিয়ে রাখলে ঠোঁট চকচকে হয়, তাছাড়া ঠোঁটের ভেতরে ময়লা প্রবেশ করতে পারে না। এই ভেসলিন চোখের পাতার ওপরে মেখে নিলে সূর্যের কড়া রোদ থেকে নরম ত্বককে রক্ষা করে। বিশেষ করে শীতকালের রোদে বাইরে বেরুবার সময় একটু মেখে নেওয়া ভাল। চোখের ওপরে কোন রকম রং বা লাইনার ব্যবহার করলে তা ধুয়ে একেবারে মুছে তোলার সময় অলিভ তেল বা গ্লিসারীন ও গোলাপ জল মিশিয়ে নিয়ে মোছা উচিত—তাহলে ওই সব নরম জায়গার কোন ক্ষতি হয় না।

আপনারা হয়ত শুনলে আশ্চর্য হবেন যে, অলিভ তেল কতোভাবে উপকারে আসে। খুব ব্যস্ত দিনে যখন ঘরে বাইরে ভীষণ কাজ থাকে, এমন কি খাওয়ারও সময় পাওয়া যায় না—সেই সময় এক চামচ (চায়ের) অলিভ তেল খেয়ে নিলে খুব ভাল হয়। এতে পেটে অনিয়ম ও অযত্নের জন্য কোন অসুখ হয় না এবং চেহারার জেল্লুস ঠিক রাখে। এর সংগে এক চামচ (চায়ের) ভাল মধু খেয়ে নিলে অলিভ তেলের খারাপ স্বাদ নষ্ট হয় ও কাজের স্ফূর্তি বাড়ে। মধুও শরীরের পক্ষে খুব ভাল।

অলিভ তেল বা বাদাম তেল চোখের পাতার ওপর ও নীচের অংশে আস্তে আস্তে ঘসে নিলে ওসব জায়গার ত্বক নরম হয় ও চোখের পাতাও ভালভাবে বেড়ে ওঠে। সুতরাং দেখুন অলিভ তেল কতোভাবে আমাদের উপকারে আসে।

এবার একটা জিনিস শেখাই। অনেক পুরোনো লিপস্টিক অনেকের ঘরে পড়ে থাকে—সেগুলিও চমৎকার কাজে আসে। সব লিপস্টিকগুলি থেকে পড়ে থাকা অংশগুলি বার করে একটা হাওয়া ঢোকে না এমন বাক্সে রাখতে হবে, সেটা কোন মেটাল বাক্স হলেও ভাল হয়। তারপর সেটা গরম করতে হবে। গরম করার ফলে রংগুলি গলে ক্রীমের মতন হয়ে যাবে। তাতে ২।৩ ফোটা গ্লিসারীন দিয়ে দিলে একরকমের ক্রীম জাতীয় রুজ হয়ে যাবে। সেটা গালে বেশ করে ঘসে ঘসে মাখলে গাল নরম ও উজ্জ্বল লাগবে ও রুজের কাজ করবে। শুধু তাই নয়, চোখের পাতার ওপর হাল্কাভাবে লাগালে চোখের পাতার ওপরের রং-এরও কাজ করবে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, খুব বেশী রকমের রং-এর লিপস্টিক না দিয়ে ৩।৪টি রং-এর নিলেই ভাল হয়।

আগেও একবার আলোচনা করেছি আবার লিখছি যে, শ্যাম্পু করার পর চুল ধুয়ে তারপর চা ভেজান লিকার দিয়ে তা ধুয়ে ফেলতে চুলের ভাব চকচকে নরম ও সুন্দর বাগ মানান যায়। এটা করে অনেকে প্রচুর উপকার পেয়েছেন। তবে চায়ের লিকার দিয়ে মাথা ঘষবেন না। এবং সেই লিকার কিন্তু মিনিট ৫।৭ পরে আবার ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেলবেন। এইভাবে বাড়ীর তৈরী জিনিস দিয়ে কত উপায়ে এবং কত সুন্দর সব প্রসাধন হয় ও সেই সংগে সৌন্দর্য ও অটুট থাকে।

এটা প্রায় সবাই জানেন যে পেটের অবস্থা ঠিক রাখতে ও সেই সঙ্গে ত্বক ঠিক রাখতে গরম জলে লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে খেলে খুব উপকার পাওয়া যায়। এতে পেট পরিষ্কার হয়, আর পেট পরিষ্কার থাকলে ত্বক ভাল থাকে ও গোটা ব্রণ ইত্যাদি হয় না। এক কাপ গরম জলে একটি পাতি লেবুর রস ও এক চামচ মধু এক সঙ্গে মিশিয়ে খেলে উপকার নিশ্চিত। এছাড়াও আর একটি খাদ্য আছে যা খেলে মুখের ত্বক ভাল থাকে এবং গোটা হয় না—তা হোল কিসমিস। চায়ের চামচের এক চামচ কিসমিস রাত্রে এককাপ জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে সকালে কিসমিসগুলি বেশ করে চটকে নিয়ে চেপে জল রেখে খোসাগুলি ফেলে দিয়ে সেই জলটা খেয়ে ফেলতে হবে—এর ফল খুব ভাল হয়।

মুখের ত্বকের জন্য আর একটা বিশেষ উপায় আছে। ছোলা… শুকনো আটা এক চামচ, আধ চামচ হলুদ ও এক চাম… সবুজ গোটা মুগের পেষা পাউডার এগুলি বেশ করে জলে মিশিয়ে তাকে থকথকে পেস্ট মতন করে সেটা মুখে মেখে নিতে হবে এবং পরে বেশী জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে ত্বক খুব চকচকে ও মসৃণ থাকে। এছাড়া এর আগে আরও বহু রকমের মুখের ওপরে মাখার জিনিসের কথা জানিয়েছি। একটু পরিশ্রম ও ধৈর্য নিয়ে করে দেখুন, ফল ভাল হতে বাধ্য। ডিমের কুসুমের তো নানা ব্যবহার জানিয়েছি। আবার বলছি, ডিমের কুসুম বাদ দিয়ে ডিমের সাদা অংশ ফেটিয়ে তাতে লেবুর রস বা শশা কিম্বা টমেটোর রস দিয়ে সেটা মুখে মাখলে ত্বকের উজ্জ্বলতা দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। তবে ধোবার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে অন্ততঃ বেশ কিছুক্ষণ জলের ঝাপটা দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেল বাঞ্ছনীয়।

সুন্দর হোন, সৌন্দর্যই সত্য সৌন্দর্যই জীবনীশক্তি এনে দেয়।

—বরবর্ণিনী

পুনশ্চ

প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে আমাদের অগণিত পাঠকের আগ্রহাতিশয্যে আমরা নানা স্থান থেকে আজ কয়েক সপ্তাহ কলিকাতার বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশ করে চলেছি। বর্তমান সময়ের তুলনায় অতীতের বহু বিষয় এমনই কৌতূহলোদ্দীপক ছিল যে, অনেক সময় অবিশ্বাস্য বলেও মনে প্রতীতি জন্মে। কলিকাতার ক্রিশ্চান লিটেরেচার সোসাইটি ফর ইন্ডিয়া' নামক ১৯১০ সালে প্রকাশিত 'সচিত্র ভারত ভ্রমণ' নামক গ্রন্থ থেকে তৎকালীন শহরের লোকসংখ্যা রাস্তাঘাট দেখবার মত জায়গা যান-বাহন বাণিজ্য শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ে কিছু কিছু যে সকল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, এ স্থলে আমরা তা যথাসম্ভব উদ্ধৃত করে দিলাম।

লোকসংখ্যা

'১৯০১ সালে কলিকাতা নগর ও সহরতলিতে ১১২১, ৬৬৪ জন লোকের বাস ছিল। কলিকাতার পশ্চিম দিকে ভাগীরথীর অপর তীরে হাবড়া এখানকার লোকসংখ্যা ৮৫২,৩০৮। বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষ্যে অনেক লোক আশপাশের নগর ও গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রতিদিন রাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করে। এই জন্য রাত্রি অপেক্ষা দিবাভাগে কলিকাতার লোকসংখ্যা অনেক অধিক।

দেখিবার যোগ্য বিষয়

কলিকাতা সহরে বা উপনগরে যে সকল দর্শনযোগ্য বিষয় আছে, সেরূপ কতকগুলির সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। নগরের দক্ষিণ প্রান্তে অযোধ্যার মৃত নবাবের অট্টালিকা-সমূহ, দেখিতে পরম সুন্দর। মুচিখোলা হইতে উত্তর দিকে যাত্রা করিলে একটি মাঠ পাওয়া যায় এটাকে গড়ের মাঠ বলে। গড়ের মাঠের এক পাশে একটি সুন্দর বাগান আছে এটিকে ইডেন বাগান বলে। ইডেন বাগান গঙ্গার তীরেই। গড়ের মাঠের পশ্চিমাংশের মধ্যস্থলে দুর্গ, মাঠের পূর্ব্ব প্রান্তে চৌরঙ্গী রোড। এই রাস্তার ধারে অতি চমৎকার বড় বড় বাড়ী আছে। দক্ষিণ প্রান্তে লাট পাদ্রীর বড় গির্জা, বিশপ উইলসনের যত্নে এই সুন্দর ও প্রকাণ্ড ভজনালয় নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। চৌরঙ্গীর মধ্যস্থলে যাদুঘর ইংরেজীতে এটিকে মিউজিয়ম বলে। এই বৃহৎ বাটীতে নানা দেশীয় নানাপ্রকার মৃত প্রাণী বহু যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত আরও এত প্রকার দেখিবার যোগ্য জিনিস আছে যে বলিয়া শেষ করা যায় না। গড়ের মাঠের উত্তর দিকে বড়লাটের বাড়ী ইংরেজীতে এই বাটীকে গভর্ণমেন্ট হাউস বলে। লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে এই চমৎকার বাটী নির্ম্মিত হয়। এ বাটীর পশ্চিম দিকে বড়লাটের সেক্রেটারিগণের আফিস ও ছাপাখানার বাড়ী। এই সকল তেতলা বাড়ী বড় সুন্দর ও কলিকাতা নগরের শোভা সাতিশয় বৃদ্ধি করিয়াছে। আফিস বাড়ীর পরেই টাউন হল ও হাইকোর্ট।

গড়ের মাঠের উত্তরে ভাগীরথীর তীর দিয়া একটি প্রশস্ত পথ বরাবর উত্তর মুখে গিয়াছে। এই রাস্তার পশ্চিম দিকে জেটি ও মাল নামাইবার জন্য টিনের বড় বড় ঘর। পূর্ব্ব দিকে সওদাগরদিগের বড় বড় আফিস বাড়ী। লাট সাহেবের পূর্ব্ব দিক দিয়া এক প্রশস্ত রাস্তা উত্তর মুখে গিয়াছে। এই রাস্তার পশ্চিম দিকে জেটি ও মাল নাবাইবার জন্য টিনের বড় বড় ঘর। পূর্ব্বদিকে সওদাগরদিগের বড় বড় আফিস বাড়ী। লাট সাহেবের বাড়ীর পূর্ব্বদিক দিয়া এক প্রশস্ত রাস্তা উত্তর মুখে লালদীঘি পর্য্যন্ত গিয়াছে। লালদীঘির পশ্চিম দিকে বড় ডাকঘর একটি অতি সুন্দর বাটী। পূর্ব্বোক্ত রাস্তার দুই ধারে সুন্দর সুন্দর দোকান। গড়ের মাঠ হইতে উত্তর মুখে আর একটা রাস্তা গিয়াছে এ রাস্তার কতকটা বেণ্টিক স্ট্রীট বাকি অংশের নাম চিৎপুর রোড। এই রাস্তা অতি অপ্রশস্ত, কিন্তু ইহার দুই পার্শ্বে অগণ্য দোকান ও লোকের বাস। এই রাস্তা দিয়া এত লোক ও গাড়ী চলে যে তত আর কোন রাস্তায় চলে কিনা সন্দেহ। ইহার আশেপাশে কেবল দেশীয় লোকের বাস।

এই রাস্তার পশ্চিমে আর একটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ প্রশস্ত রাস্তা আছে ইহার দক্ষিণাংশের নাম কলেজ স্ট্রীট, ও উত্তরাংশের নাম কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট [বর্ত্তমান বিধান সরণি]। এই রাস্তার ধারে মেডিকেল কলেজ সিনেট হোল প্রেসিডেন্সি কলেজ হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্ট্রীট খৃষ্টীয় যুবক সমিতির বাটী ও আরও অনেক বিদ্যালয় আছে। রাস্তার দুই ধারের বাটীর নিম্নতলে দোকান অধিকাংশই পুস্তকের ও কাগজের; উপরে লোকের বাস। এই অঞ্চলে অনেক ভদ্রলোকের ও ছাত্রগণের বাস। এই রাস্তার পার্শ্বে দুই-একটি পুষ্করিণী আছে। ইহারও পূর্ব্ব-দিকে আর এক বহুদূরব্যাপী রাস্তাকে স্যারকুলার রোড কহে। গড়ের মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে জিরেটের পুল। এই স্থানে রাস্তার আরম্ভ; এই রাস্তার শেষ বাগবাজারে খাল; রাস্তার আরম্ভেই পাগলা গারদ জেনারেল হাঁসপাতাল, হরিণবাড়ীর জেলখানা। আরও উত্তরদিকে খানিক দূরে গেলে লামার্টিন কলেজ (অতি সুন্দর বাড়ী) বিশপ কলেজ। আরও উত্তরে ক্যাম্বেল হাসপাতাল [বর্ত্তমান নীলরতন সরকার হাঁসপাতাল], শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশন। এইখানে নূতন হ্যারিসন রোড [বর্ত্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড]।

কলিকাতা সহরের দক্ষিণাংশকেই চৌরঙ্গী বলা যাইতে পারে; এই অংশে ইংরাজদিগের বাস (এখন বাঙ্গালী ভদ্রলোকও এ অংশে বাস করেন) এ অঞ্চলের রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও সরল। নগরের উত্তরাংশে দেশীয় লোকের বাস এ অংশের অধিকাংশ রাস্তা সংকীর্ণ ও বক্র। কলিকাতা সহরের প্রায় সকল অঞ্চলেই মধ্যে মধ্যে বসতি আছে। যেখানে গরিব লোকেরা খোলার ঘর বাঁধিয়া বহুলোক এক জায়গায় বাস করে তাহাকে বস্তি বলে। বস্তি বড় জঘন্য। এই জন্য অনেকে বলে, কলিকাতা সহরের সম্মুখ দিকে বড় বড় অট্টালিকা কিন্তু ভিতরের দিকে শূকরের কুড়িয়া ঘর।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা নগরের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার যেখানে পুষ্করিণী ভরাট করিয়া জল ধরিয়া রাখা হইয়াছে এখানে আগে ডোবা ছিল। ক্রিক রো নামই এ কথার প্রমাণ। ক্রিক মানে খাল। ১৬৮৬ সালে কালীঘাটের মন্দির ও কলিকাতার মধ্যস্থলে জঙ্গল, জলাভূমি ছিল এবং তাহাতে বন্য পশু ও চোর ডাকাইত থাকিত। সেই জঙ্গলের দিকে চৌরঙ্গী ও থিয়েটার রোড হইয়াছে। এক্ষণে যেখানে লাট পাদ্রীর কেথিড্রাল নামক বড় গির্জা আছে সেইখানে ওয়ারেণ হেষ্টিং বাঘ শিকার করিতেন। এক্ষণে গড়ের মাঠ অতি রমণীয় কিন্তু সেকালে বর্ষায় তিন মাস ডুবিয়া থাকিত। জলের কলের দ্বারা নগরের বড় উপকার হইয়াছে। মাটির নীচে দিয়া ড্রেন বা নর্দ্দামা হওয়াতে রাস্তা দিয়া চলিতে গেলে আর নাকে কাপড় দিতে হয় না। এক্ষণে হারিসন রোড ও অন্যান্য নূতন রাস্তা ও বস্তিতে নর্দ্দমা হওয়াতে নগরের উপকার ও শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রতি বৎসরেই নগরে উত্তম উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে।

—ক্ষপণক

দ্বিতীয় পর্ব

রেখা বড়ুয়া
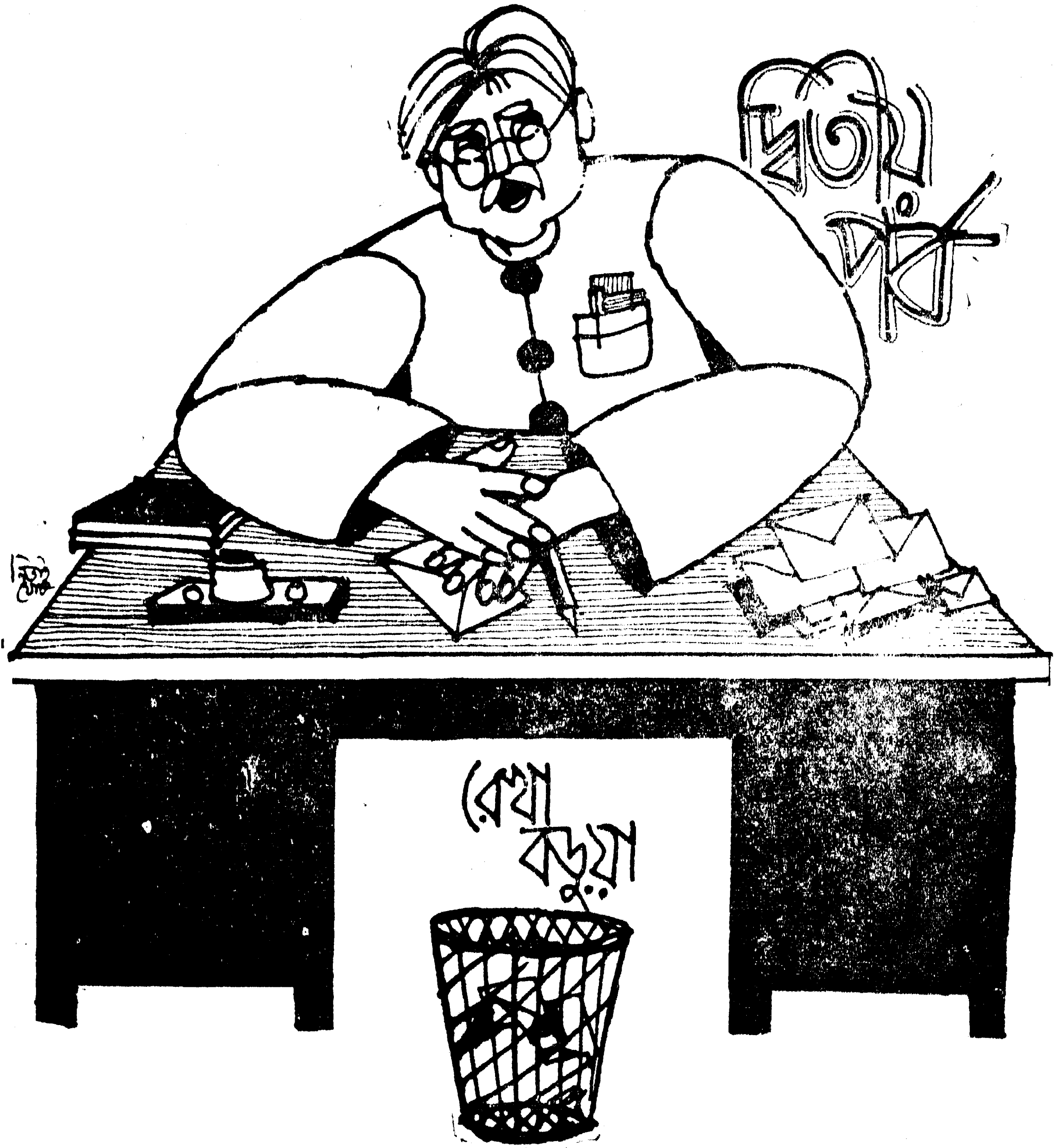
রাগে বিড়বিড় করতে থাকেন পরমেশ-বাবু। ঘুম থেকে উঠেই আজকাল মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এটা কিন্তু তা বলে ওঁর স্বভাব নয়। এমনিতে সকালের দিকে মেজাজ বরাবরই প্রসন্ন থাকে। স্ত্রী উঠে যাওয়ার পরও ঘুমের আমেজটা কাটে না : বেশ ভালো লাগে সকালটা। রাতটা ভালো কাটে বলেই ঘুম ভেঙে সকালটাকেও ভালো লাগে। এ স্ত্রীটি সবদিক দিয়ে মনের মত হয়েছে পরমেশবাবুর। দ্বিতীয়-বার বিয়ে করেছেন দশ বছর আগে। সন্তানাদি হয়নি, চায়ও নি তারা। ঐ [illegible] পক্ষেরই একটি ছেলে আর একটি মেয়ে আছে তাদের। ছেলেটি ছোট, তারই বয়েস সাতাশ। সে অবশ্য বিশেষ ঝামেলা করে না। বিয়ে করেছে চাকরী করে ধানবাদে। কালেভদ্রে কলকাতায় এলেও থাকে না এক আধদিনের বেশী তা, না আসুকগে না থাকুক গে। তার জন্যে দুঃখু নেই পরমেশ-বাবুর। বড় করে দিয়েছেন এবার নিজে চরেবরে খাক। বয়েসকালে একটু শান্তি সবাই চায়। 'বুড়ো বয়েসে' একথা বলতে চান না তিনি। কি আর এমন বয়েস হয়েছে [illegible] ..

সে যাই হোক। হচ্ছিল শান্তির কথা। তা সেদিক দিয়ে সাবি একাই 'একশ'। দু'ভাইবোনের মধ্যে ওই বড়। এই অঘ্রাণে তিরিশ পুরবে. তবু যদি একটু আক্কেল থাকে মেয়ের। বয়েসে প্রায় সৎমারই সমান। ভাবসাব হলে বেশ হতে পারত। ভালো-মানুষ শৈলবালার সঙ্গে। কিন্তু তা হয়ে উঠে নি। সারাক্ষণ খালি ট্যাঁক ট্যাঁক করে কথা আর সৎমায়ের খুঁৎ কাটা, এই হল ওর কাজ। খারাপ লাগলেও সয়ে যাচ্ছিলেন পরমেশবাবু। নিজের মেয়ে বলে কথা। কিন্তু বড় ঝাপটাটাই যে ইদানীং তাঁর ওপর

দিয়ে যাচ্ছে। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে সাবির। তার একটি দুটিকেও কি শাশুড়ী ঠাকরুণের কাছে রেখে আসা যেত না। মেয়ে আসবে বাপের বাড়ী ভাল কথা কিন্তু এলে আর নড়বেই না এই বা কেমন। জামাই টুরে গেছে আড়াই মাসের ওপর। সেই থেকে সপুষ্ঠি বাপের বাড়িতে বসে। সেই আশ্বিনের প্রথমে এসেছে আর এ ত অঘ্রাণের মাঝামাঝি হয়ে গেল তবু নড়ার নাম নেই।

একটু খেতেটেতে ভালোবাসেন পরমেশবাবু। সকালবেলা উঠে নিজেই বাজারে যান। ফেরেন যখন তখন বাঁহাতে থাকে বাজারের থলি ডান হাতে শালপাতার ঠোঙা। গোনা ছখানা জিলিপি আর দুখানা জিবেগজা তাতে। মিষ্টি খেতে বড় ভালো-বাসেন তাই ওই দিয়েই চা খান সকালে। অবশ্য ওর মধ্যে দুখানা জিলিপি শৈল-বালাকে প্রায়ই খাওয়ান জোরজার করে। শৈলবালা আবার মিষ্টি খেতে চায় না তেমন। একমুঠি তেলমাখা মুড়ি আর একটা কাঁচালঙ্কা হলেই ও খুশী। তবু ওকে জোর করেন পরমেশবাবু। একটু ভালোমন্দ না খেলে শরীর থাকবে কেন। জিলিপিগুলো বেশ বড়ো দেখে আনেন রোজ। বেশ চলছিল, এর মধ্যে ছেলেমেয়ে নিয়ে এল সাবি।

প্রথমদিকে অবশ্য ওদের জন্যেও মুড়ির সঙ্গে দুখানা দুখানা জিলিপি আনতেন পরমেশবাবু। কিন্তু ছোট বড় নিয়ে অনেক-গুলি। আড়াই মাস ধরে কি একই চাল বজায় রাখা সম্ভব না আশাই করা উচিত? শেষের এ মাসটা জল-খাবারে রুটি আর গুড়ের ঢালাও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নতুন খেজুরের গুড়, তাই বা আজকালকার দিনে কটা লোক খেতে পায়। তা সাবির মনই ওঠে না। ওর শ্বশুরবাড়ীতে নাকি লুচি পরোটা ছাড়া কেউ মুখেই তোলে না। অশান্তির ভয়ে মুখ খোলেন না পরমেশ-বাবু। নইলে কে কত বড় কাপ্তেন জানতে আর বাকী নেই কিছু।

এই অশান্তির ভয়েই শৈলবালাকে বিয়ে করে আনবার দু' মাস আগেই সাবিকে পার করেছেন তিনি। অতবড় মেয়ে বুকের ওপর নিয়ে পরের মেয়েকে ঘরে আনা মানুষের কাজ হত না। যে আসছে তারও ত' সাধ আহ্লাদ আছে।

শৈলবালার ছেলেপিলে হয়নি, ডাক্তারের রায় নাকি হবেও না। প্রথমদিকে অবশ্য ও দুঃখ করত। কিন্তু পরমেশবাবু খুশীই হয়েছেন। ছেলেমেয়ে যথেষ্ট ভোগ করেছেন আর সাধ নেই। প্রথম আট বছরেই পাঁচটি হয়েছিল। সে বউ ছিল ভীষণ রোগা। নিয়মিতই ভুগত অসুখে। প্রথম দুটিই আছে আর শেষ তিনটি—তার মধ্যে দুটি যমজ—আঁতুড়েই মারা গেছে। তারপর ত' শয্যা নিল বউ। একটুও কি শান্তি পেয়েছেন পরমেশবাবু। তারচেয়ে এই ভালো। শৈলবালাকে বলেছেন বুঝলে

নতুন বউ এই ভালো বেশ নিশ্চিন্ত থাকলেই সর্বদা ভয়ে কাঁটা হয়ে—'

তা সেই সাবির ছেলেমেয়েদের কথা—একেবারে জ্বালাতন করে মারে। আর সাবি হল তাদের ওপর এককাঠি। সারা জীবন ত' গেল এখনও যে পরমেশবাবু একটু আয়েস করবেন তার কি উপায় আছে। আজ ক'দিন ধরে চলছে অত্যাচারের চরম। এই বয়সে তিনি তা বলে ত' আর নতুন করে রুটি গড় অভ্যেস করতে পারেন না। তাই চারখানা জিলিপি আর দুখানা জিবে গজা দিয়েই জল খাচ্ছিলেন সকালে। তা সাবির জন্যে কি তা হবার উপায় আছে। ঠোঙা হাতে বাপকে বাড়ী ঢুকতে দেখলেই হাঁক পাড়ে, নন্টু ফুলি, বিনি দাদু মিষ্টি এনেছে তোদের। অমনি চিলের মত ছোঁ দিতে এসে পড়ে তিনটেতে। এতেও আশ মেটে না ছোট খোকাটাকেও ধাক্কা দিয়ে সামনে এগিয়ে দেয়। খুব ভাগ্য থাকলে তবে শেষ পর্যন্ত একখানা জিবে গজা হয়ত জোটে পরমেশবাবুর কপালে। এমন করে আর কদিন চলে! অসহ্য হয়ে শেষে ওদের জন্যেও আবার দুখানা করে জিলিপি আনতে শুরু করেছেন। কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে?

—নন্টু মন্টু আমার জিবে গজা বলে পাগল; আহ্লাদে গলে গিয়ে বলে সাবি। জ্বালাতন হয়ে গেছেন পরমেশবাবু। ওদিকে সংমাকে টাঁক টাঁক করে কথা শোনাতে কিন্তু ছাড়ে না।

—আমার জন্যে চারটে রসমুণ্ডি এনো ত বাবা বেশ লাগে। অথবা, গরম বোঁদে পাও ত' এনো ত' বাবা ওই মোড়ের দোকান থেকে। বোঁদেটা বেশ করে ময়রা মুখ-পোড়াটা—এমনি সব হাজারো আবদারও শুনতে হয় পরমেশবাবুকে।

এমনি ভাবেই দিন চলছে তাঁর। মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারেন না সইতেও পারেন না। রাগ করে ইদানীং দুখানা করে লেড়ো বিস্কুট আনছেন কিন্তু তা যেন আর গলা দিয়ে নামতেই চায় না। ওদের জব্দ করতে গিয়ে নিজেই জব্দ হয়ে যাচ্ছেন পরমেশবাবু।

দুদিন হল আবার এক নতুন উৎপাত। মেজো ছেলেটাকে পার করে দিয়েছে এ ঘরে। খাট নইলে তার নাকি ঘুম হচ্ছে না। ও আমার রাতে একবার ঘুমোলে একেবারে কাদার তাল। এমনি বলে বাপকে বেহায়া পরোক্ষে সান্ত্বনা দিয়ে সাবি।

ভাত খেতে বসেও আজকাল মাথা গরম হয়ে যায়। একটু ডাল দুখানা মাছের ঝোল আর একটু ভাতে পোড়া হলেই চলে যায়। সকাল নটার মধ্যে ওর বেশী হয়েও ওঠে না। যা ভালমন্দ রাঁধে শৈলবালা সেই রাত্রে খাওয়া হয়। এখন এই পঞ্চভূতের নৈবেদ্যের যোগাড় করতে গিয়ে ঝালটুকুও আর হয়ে উঠছে না। ভাজা মাছ দুখানা খুন্তি করে পাতে দিয়ে যায় শৈলবালা।

রাগে পুড়তে পুড়তে বেরিয়ে যান পরমেশবাবু। অফিসে পৌঁছে চেয়ারে পাঁচ মিনিট চুপ করে বসে থাকেন তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে কাজে হাত দেন।

এই পোস্টঅফিসে এসে খুব সুবিধা হয়েছে। ছোট্ট অফিস, বেশী লোকজনের ঝামেলা নেই। তাছাড়া বাড়ীর কাছে হয়ে বাস ভাড়াটা বেঁচে যাচ্ছে। তাই একটু মন খুলে টিফিনটা করতে পারছেন। শৈলবালা অবশ্য বলেছিল দুখানা পরোটা করে দিই আলুর ছেঁচকী দিয়ে হ্যাগো?

—নাঃ কি দরকার হাঙ্গামে ব্যাগ করেছেন পরমেশবাবু। তার চেয়ে বরং মিষ্টিফিষ্টি খেয়ে নেবো তুষ্টুরামের দোকান থেকে। কিন্তু সেই কি প্রাণ খুলে একটু টিফিন করতে পারছেন। দোকানের সব রসালো মিষ্টির দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন তিনি তারপর বেয়ারাকে হাঁক পাড়েন, চার আনার বোঁদে একটা ক্ষীরের চপ আর দুটো দানাদার নিয়ে এসো তো—

এতেই বেরিয়ে যায় অনেক পয়সা। আজকাল নাতিনাতনীর কল্যাণে পকেটে টান ধরেছে তাই হিসেব করে খেতে হয়। তবে কপাল ভালো থাকলে এক একদিন বেশ মন খুশী করা খাওয়া হয়ে যায়, পরমেশবাবুর গুপ্তবিদ্যার জোরে। ভালো চান তিনি। রাবড়ীটা বড় সরেস করে তুষ্টুরাম আর ক্ষীরমোহনও।

কিন্তু এক একদিন কপাল খারাপ থাকে। যেমন আজ। তিনচারখানা চিঠি রাগে টেনে খুললেন, কিন্তু সব ভোঁ-ভাঁ। একখানা স্ট্যাম্পও কি থাকতে নেই। কতদিন চিঠির ভেতর পেয়েছেন দু টাকার নোট। এক টাকার নোট ত' হামেশাই থাকে। টাকা অবশ্য বেশী থাকে মেয়েদের কাছে লেখা চিঠিতে। দেখেশুনে হাড়শুদ্ধ জানা হয়ে গেছে এখন। ক্লাব বা পত্রিকার নামের চিঠিতে সাধারণত থাকে স্ট্যাম্প। চিঠি খোলার কথা গল্পেপটল্পে অনেক পড়েছেন আগে। কেউ খোলে মেয়েদের লেখা চিঠি পড়ার জন্য কেউ খোলে ফটোর আশায়। ছোঃ, যত্তোসব ছেলেমানুষী। শুকনো চিঠি পড়ে কি লাভ হয় কে জানে। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো আর কি। শৈলবালাকে বিয়ে করবার পর ওসব খেয়ালের আর দরকার পড়ে নি পরমেশবাবুর।

বিরক্তভাবে বেছে চতুর্থ খামখানা তুলে নেন পরমেশবাবু। হাতের আন্দাজ ঠিক। খাম খুলতেই বেরিয়ে পড়ল দুখানা দু' টাকার নোট। মনটা জল হয়ে যায়। নোট দুখানা সস্নেহে ভাঁজ করে বুক পকেটে রাখেন তিনি। ছোট চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়তে গিয়ে হঠাৎ কি মনে হওয়ায় একটু কৌতূহলবশেই পড়তে থাকেন।

ছোট চিঠি। কোন এক লাবণ্যকে লিখেছে তার স্বামী নরেন। এবারে টুর থেকে ফিরেই আবার অর্ডার আছে টুরে যাবার। কি নাকি গোলমাল বেধেছে অফিসে। মাঝে চারটি দিন সময়। এ চিঠি পাওয়ামাত্র লাবণ্য যেন জানায়, ওকে নিয়ে আসবে কিনা টুরে বেরোবার আগে। সামনে পৌষ মাস পড়ছে, তখন তো আবার তাকে যাবে। লাবণ্যর উত্তর পেলে তবেই ওদের আনতে যাবে নরেন, না হলে যা মেজাজ ওর, হঠাৎ আনতে গেলে ত আবার মহা অপরাধ হয়ে যাবে।

মার শরীর ভালো নয়। ধীরুর পরীক্ষা সামনে। এসময় ও চলে এলেই ভালো হয়। যা হয় তাড়াতাড়ি জানায় যেন। চারটি টাকা পাঠাচ্ছে চিঠির ভেতর। মাসের শেষ, এখন হাত খালি তাই বেশী পাঠানো গেল না।

চারটি টাকা বুকপকেটে, তবু তুষ্টুরামের রাবড়ির কথা মনে থাকে না পরমেশবাবুর। চার টাকায় কতটা রাবড়ী আর কটা ক্ষীর-মোহন হয় সে হিসেব করতেও ভুলে যান তিনি। শুধু চা খেতে হবে, রাত্রে সন্তর্পণে নাকের কাছে হাত নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে ছোঁড়াটা সত্যিই ঘুমিয়েছে কিনা।

নিজের গালে চড় খেতে ইচ্ছে করে পরমেশবাবুর। শাশুড়ীর নাম সাবিত্রী বলে, বিয়ের পর ওরা যে সাবির নাম বদলে লাবণ্য করে দিয়েছিল, তা কি একবারও মনে পড়তে নেই, একবারও কি ঠিকানাটা পড়ে দেখার কথা মনে আসতে নেই...

সেকালের সঙ্গীতগুণী
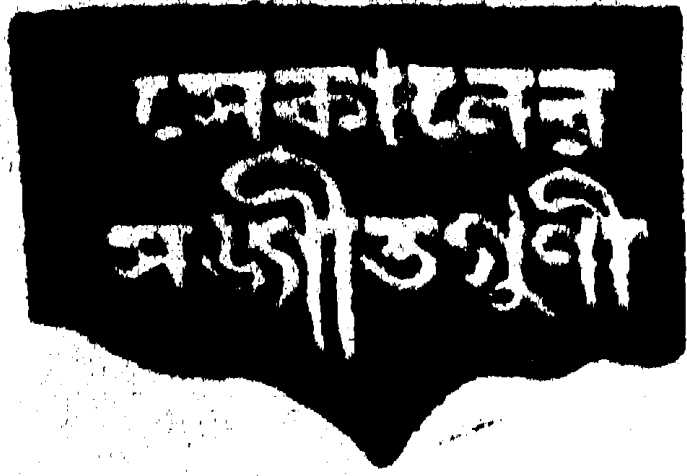
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেবারেই ত বোম্বাইতে পেলেন আল্লাদিয়া খাঁর ছেলে মঞ্জে খাঁর আশ্চর্য তারিফ। অনাথের ঠুংরি শোনবার জন্যে পর পর সাতটি আসরে মঞ্জে খাঁ হাজির হয়ে গেলেন।

বোম্বাইয়ের সেই সব আসরের পরে এলাহাবাদ সম্মেলন। নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন সেই যে তাঁর যাত্রা আরম্ভ হল বছরের পর বছরব্যাপী সুদীর্ঘ তার তালিকা। পশ্চিমের কোন সংগীত কেন্দ্র বাদ পড়েনি তাঁর। এত জায়গায় এত আসরে সেই দৈবতকণ্ঠে গান শুনিয়েছেন যে নিজেরই আর মনে পড়ে না সব। বছরের মধ্যে ছ মাস তখন বাংলার বাইরেই থাকতে হত। বাংলার অন্য কোন শিল্পীরই এত মুজরো আসত না পশ্চিমাঞ্চল থেকে।

সাফল্যের গৌরবে ঝলমল করত আসর। স্বীকৃতি সম্মান সচ্ছলতায় কি পরিপূর্ণ ছিল সেসব। অতি দীর্ঘ সেই সংগীত-জীবনের বৃত্তান্ত। পেশাদারী পর্বই ত ৬০ বছর অতিক্রান্ত।...

সংগীতের একনিষ্ঠ সাধক অনাথবাবু এখন ৭৮ বছর বয়সী। কিন্তু এখনো তাঁর সংগীত শক্তি অন্তর্ধান করেনি। নারী কণ্ঠে গান বন্ধ করেছেন শুধু। ঠুংরিও এখন গেয়ে থাকেন খেয়ালের মতন তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠে।

তবে আসরের সংখ্যা সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। বদল হয়ে গেছে সেদিনের নানা মূল্যবোধের। কত পরিবর্তন এর মধ্যে ঘটে গেছে তাঁর পরিচিত সংগীতজগতে। সে পরিবেশ আর নেই। কোথায় গেল সেকালের সেই হৃদ্যতা অন্তরঙ্গতার সুর! কোথায় গেলেন সেদিনের সব শিল্পী দরদী সংগীত-প্রেমী আর আসরপতিরা !...

প্রবীণ অনাথনাথ স্মৃতিচারণে অবসর যাপন করেন। কত গুণী এসেছেন বিদায় নিয়েছেন সংগীতের আসর থেকে। ইহলোক থেকেও।

মধ্যে সরকারী সম্মান রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন কেউ কেউ। নিজে সংগীতের শিল্পীরূপে তাতে তিনি আনন্দ বোধ করেছেন। উদার নির্বিরোধ জাত-শিল্পী অনাথনাথ। সরকারী স্বীকৃতি পাননি বলে মনে কোন ক্ষোভ নেই তাঁর। আসরে আসরে শ্রোতাদের বোদ্ধাদের যে স্বতঃস্ফূর্ত সমাদর পেয়েছেন তাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার জ্ঞান করেন। কিন্তু সংগীত-সমাজ থেকেও যে আসর থেকে সাদর আহ্বান আগের মতন আসে না এ বড় মর্মান্তিক দুঃখ। অবরুদ্ধ যেন শিল্পীসত্তা!

চিরদিন আত্মপ্রচারবিমুখ তিনি। আধুনিক প্রচারঢক্কানিনাদের যুগে তাঁকে এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা ঘিরে থাকে।...

মনের আকাশপটে কখনো ঝলমল করে ওঠে সেযুগের কত নক্ষত্র: লছমী ওস্তাদ মোজুদ্দিন ছোটে খাঁ আমীর খাঁ লক্ষণ খাঁ গৌরীশংকর মিশ্র হরিদাস মিশ্র গহর জান আগ্রাওয়ালী মালকা জান মহম্মদ শফি রজব আলী মঞ্জে খাঁ মহম্মদ খাঁ জয়লাল আচ্ছন মহারাজ ফৈয়াজ খাঁ শ্বেতাঙ্গিণী কৃষ্ণভামিনী জগদীপ মিশ্র সতীশ ঘোষ...... আরো কত হারিয়ে যাওয়া নাম!...

বাগবাজারের নবীন সরকার গলিতে বসে মন এক-একদিন উদাস হয়ে ওঠে।

স্বপ্নের মতন মনে পড়ে কপোতাক্ষর তীর। খেসড়ায় মামারবাড়ির জীবন। মেজ-মামা অবিনাশ দত্তের কীর্তনের সঙ্গে খোল বাজানো। হেমাঙ্গিণীর কত কীর্তনাসর। বাঁকা গ্রামের সতীশ রায়ের বেহালা। আর তাঁর সেই সব কথা: 'তোর দ্বারা লেখা-পড়া হবে না। গানই হবে তোর। কলকাতায় চলে যা। ভাল করে শেখ। ভয় পাসনি গ্রাম ছেড়ে যেতে। ভগবান একটা কিছু উপায় করে দেবেন..'

মনে ভেসে ওঠে স্টীমারে সেই চলে আসা। কলকাতায় থাকা। মধুপুর, কাশীতে ছোটে রামদাসের তালিম। শিবপুরে নিকুঞ্জ বসুর শেখানো। লছমী ওস্তাদের তালিম। মোজুদ্দিন ছোটে খাঁ গৌরীশংকর আমীর খাঁ গহর জান ফৈয়াজ খাঁর কাছে কতদিনের কত বিচিত্র সংগ্রহ......

সেকালের সঙ্গে একালের সেতু হয়ে সংগীতজগতের একটি ঐতিহাসিক অধ্যায় হয়ে বিরাজ করছেন অনাথনাথ বসু।

সকলের। ছেলেমানুষ হলে কি হয়, সুরবোধ তার জন্মগত।

বাঁশি আর বেহালা বাজিয়েই তার সারাদিন কেটে যায়। রাণাঘাটের সবাই চেনে জিতেনকে। পুরো নাম জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বয়স তখন কত? হয়ত ১১।১২ বছর হবে। তার বাবার অন্যেও সকলে জানে তাকে। রামাচরণ ভট্টাচার্যির ছেলে জিতেন। সমস্ত রাণাঘাট অঞ্চল জুড়ে কি নাম রামাচরণের কত বড় সেতার বাজিয়ে তিনি। পৈতৃক বৃত্তিতে শাস্ত্রজ্ঞ। সেই সূত্রে ময়ূরভঞ্জ রাজদরবারের সভাপণ্ডিত। আবার সেতারও বাজান সেখানে। আর অন্য কটি দরবারে, আসরেও। নাড়াজোল রাজার আসরে বাজাতে যান। পঞ্চেৎগড়ের জমিদার বাড়ির যাদবেন্দ্র-নন্দন মহাপাত্র ত সেতার শেখেন রামাচরণের কাছে। এইসব দরবারেই বছরের বেশিরভাগ থাকতে হয় তাঁকে। আর রাণাঘাটে এলেই পালচৌধুরীদের দরবারে তাঁর আসর বসে। তেমনি গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় ভবনে।

সেতার বাজান রামাচরণ। আবার পণ্ডিত বংশের ধারায় শাস্ত্র চর্চাও করেন। রাণাঘাটে যখন মাঝে মাঝে আসেন, ছোটখাটো টোল বসে যায় তাঁর সেই মাটির ঘরের দাওয়ায়। সংস্কৃত পড়ুয়ারা তাঁর কাছে ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ নিতে আসে। শুধু রাণাঘাট বা কাছাকাছি অঞ্চলের নয়। বাংলার বাইরে থেকেও এসে থাকে বিদ্যার্থীরা। রামাচরণের পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই এ বংশে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। তাঁর পিতা হলেন রামকমল শিরোমণি। বিশেষ করে দর্শনের শাস্ত্রজ্ঞ তিনি। তাঁর কাছেই রামাচরণ দর্শন ও ব্যাকরণের শিক্ষা প্রথমে পান। তারপর কাশী যান বেদ পাঠ করতে। ন্যায় দর্শনের চর্চাও সেখানে করেছিলেন। তারপর ফিরে আসেন রাণাঘাটে। কিন্তু শাস্ত্র চর্চার চেয়ে সংগীতই তাঁর জীবনে প্রধান হয়ে ওঠে। তবে বজায় রেখেছিলেন বংশের ধারা। সংগীতের সঙ্গে বিদ্যাচর্চাও। তাই রাণাঘাটে

সেতারে তিন পুরুষ

'জিতেন, আজ শশী অধিকারীর দল এসেছে রাণাঘাটে।' মামাত ভাই কুমার বললে, 'খুব ভাল যাত্রা হবে। চল শুনতে যাই।'

'না, আমি যাত্রা শুনব না। তুই যা।'

'অন্য যাত্রার মতন নয় রে। শশী অধিকারী নিজে বায়লা বাজাবে। শুনলে বুঝবি সে কি বাজনা।'

কুমারের এই কথায় কাজ হল। ভাল বাজনা পেলে আর কিছু চায় না জিতেন। বিশেষ বেহালা। কারণ এ যন্ত্র সে নিজে বাজায়। সবই শুনে শুনে বাজানো। যে গানের সুর ভাল লাগে, সেটি বেহালায় তোলে। কারুর বেহালা শুনলেও বাজাতে পারে তেমনি। শুধু বেহালা কেন, বাঁশিও। অমনি নিজে নিজেই বাঁশি বাজানো শিখেছে। তার বাঁশির মিষ্টি সুর শুনেও ভাল লাগে

তিনি এলেই শিক্ষার্থীদেরও আনাগোনা আরম্ভ হয়ে যেত। সকালে বিকালে বসতেন তাদের নিয়ে। আর সন্ধ্যার পর যোগ দিতে যেতেন সংগীতের আসরে। পালচৌধুরীদের দরবারে। গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় পরিবারের সভায়। আরো নানা আসরে।

তবে রাণাঘাটে আর কদিন থাকেন রামাচরণ। তাঁর বাইরে বাইরেই দিন চলে যায়। আর জিতেন্দ্রনাথের বাল্যজীবন কাটে প্রায়শই পিতার দৃষ্টি শিক্ষা আর তত্ত্বাবধানের বাইরে। রামাচরণের একমাত্র সন্তান। তবু আর কিছু ব্যবস্থা তার জন্যে হতে পারে নি। ঘরে শুধু জননী। আর দেখবার দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই সংসারে। সুতরাং নিজের মনের প্রবণতাতেই বড় হতে থাকে সে। বাঁশি বাজিয়ে, বেহালা বাজিয়ে। পণ্ডিত বংশের ছেলে। কিন্তু বিদ্যাচর্চার

সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নেই। মন শুধু গান বাজনায়।

এমনি সময় শশী অধিকারীর যাত্রার দল এল রাণাঘাটে। রামাচরণ তখন ময়ূরভঞ্জে। এখানে অধিকারী মশাইয়ের যাত্রার জন্যে তিন দিনের বায়না হয়েছে।

সেদিন তার প্রথম আসর। মামাত দাদা কুমারের সঙ্গে যাত্রা শুনতে হাজির হল জিতেন। যাত্রার চেয়ে বরং বেহালার টানেই বেশি বলা যায়।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেক আগে। দূর গ্রামাঞ্চল থেকেও শশী অধিকারীর যাত্রার আসরে লোক এসেছে। তখনো আসছে দলে দলে। জিতেন কুমারকে নিয়ে অতি কষ্টে আসরের মাঝখানের কাছাকাছি জায়গা করে নিলে। কারণ তার বড়ই ইচ্ছে, শশী অধিকারীর খুব কাছে বসে তাঁর বেহালা শোনা।

কিন্তু কোথায় তিনি? আসর ভর্তি হয়ে তখন মহা হৈচৈ আরম্ভ হয়ে গেছে। যাত্রা আরম্ভ করবার জন্যে চীৎকার করছে দশ জন। অধৈর্য হয়ে সোরগোল তুলেছে। অধিকারী মশাইয়ের এখনো দেখা নেই। তিনি এসে আগে বেহালা বাজাবেন, তারপর আরম্ভ হবে যাত্রা।

আরো খানিক পরে আসরের মাঝখানে একজনকে আসতে দেখা গেল। অতি সাধারণ চেহারা। পরনে খাটো কাপড়। গলায় একটি উড়ানি জড়ানো। আদুর গা। সঙ্গে একটি ছোকরা, তার হাতে বেহালার বাক্স।

সেদিকে দেখিয়ে কুমার বললে, 'ওই শশী অধিকারী।'

আসরে তখনো হট্টগোল চলেছে। অধিকারী মশায় বেহালাটি বার করলেন বাক্স থেকে। তাঁর এক পাশে বাঁয়া তবলা নিয়ে তবলচী বসল। আর একদিকে একজন হারমোনিয়ম নিয়ে।

বেহালার ছড়টিতে রজন ঘষে শশী অধিকারী চারটি তারের সুর বেঁধে নিলেন। তারপর ছড়ের একটি লম্বা টান দিয়ে আরম্ভ করলেন বাজনা। রাগের আদল একটু দেখিয়েই ধরে নিলেন গৎ। তবলায় ঠেকার বোল উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গে আসরের এত গোলমাল স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন যাদু কাঠির স্পর্শ।

কি মিষ্টি সুর তাঁর হাতের টিপে। কি সুরেলা সেই ছড়ের টান। একটু আগেও যারা হৈ হৈ করছিল এখন তারা যেন মন্ত্রমুগ্ধ। তন্ময় হয়ে গেছে জিতেন্দ্রনাথ। এমন বেহালা, এমন সুর আগে সে কোনদিন শোনে নি।

তার জানা ছিল না, জয়জয়ন্তী রাগে সিদ্ধ শশী অধিকারী। কিন্তু অনেকেই জানত—আসরে যত হট্টগোল হোক, জয়জয়ন্তী শুনিয়ে তিনি সব শান্ত করে দিতে পারেন। এখানেও হল তাই।

এক মনে শুনতে শুনতে গতের বন্দেশটি জিতেনের মনের পটে যেন আঁকা হয়ে গেল। গৎখানি মনের মধ্যে ভরে নিয়ে সে চলে এল আসর থেকে। বাজনার পর যাত্রা শোনবার জন্যে সেদিন আর রইল না।

পরের দিন সেই জয়জয়ন্তী মক্স করতে লাগল নিজের বেহালায়। অধিকারী মশায়ের বাজনার সেই করুণ রেশ তার সমস্ত মন ছেয়েছিল। এ সুর বাজাতে না পারলে যেন স্বস্তি নেই নিজেরই। কাজেই মতন বাজনা হাতে তুলতেই হবে। সেই শোনা সুর আর গৎ যতক্ষণ না মনের মতন হল, সে সেধে গেল যন্ত্রে।

তারপর সেদিন সন্ধেবেলা আবার গেল যাত্রার আসরে। আর কুমারকে যাবার কথা বলতে হল না। সেদিনও শুনে এল শশী অধিকারীর বেহালা। আজও আসরে তেমনি হট্টগোল। আর সে সমস্তই স্তব্ধ হয়ে গেল অধিকারী মশায়ের আবার সেই জয়জয়ন্তীতে।

পর পর দুদিন শুনে বন্দিশটি মনে তার গাঁথা হয়ে গেল। তবে আজ জিতেন শুধু শশিভূষণের সুরের দিকেই মন দিলে না। এক দৃষ্টে লক্ষ্য করতে লাগল তাঁর হাতের টিপ, বেহালা ধরা আর ছড় টানবার কায়দা। তারপর বাজনা শেষ হতেই আসর থেকে বাড়ি ফিরে এল। অধিকারী মশায়ের বেহালা শোনবার জন্যেই এখানে আসা। তাই যাত্রায় আর বসে রইল না। কি বেহালাই বাজালেন শশী অধিকারী। ভাগ্যে কুমারের কথায় এসেছিল—জিতেন ভাবলে। এ বাজনা না শুনলে তার ধারণাই হত না, কত মিষ্টি হতে পারে বেহালার সুর।

তিন দিনের দিনও জিতেন যথারীতি আসরে হাজির হল। আজ সে এসেছে অনেক আগে। আসরের মাঝখানে বসে বাজাবেন শশী অধিকারী। এখানে আজকেই তাঁর শেষ বাজনা হবে। তাঁর বেহালার বাক্স আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। জিতেন বসেছে তার পাশেই। তাঁর বাজনা একেবারে সামনে থেকে শুনবে। কুমারও এসেছে সঙ্গে।

এই যাত্রার তিন দিনের বায়না হয়েছিল রাণাঘাটে। আজ তার শেষদিন। আসরে তাই ভিড় হয়েছে খুব।

কিন্তু এদিকে এক মুস্কিলের ব্যাপার। খবর এসেছে, অধিকারী মশায়ের কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসে গেছে। এত জ্বর নিয়ে এসে বাজাবেন কি করে? তবে ম্যালেরিয়া জ্বর। ছেড়ে যেতে পারে খানিক পরেই। তাই দেরি হলেও আসরে আসতে পারেন এক সময়। এসব অভ্যাস আছে তাঁদের। এমন অভিজ্ঞতা মাঝে মাঝে হয়ে থাকে বটে।

তবে আসর সামলানো দায় ততক্ষণ। লোকদের হৈচৈ আরম্ভ হয়ে গেছে। চীৎকারও করছে কেউ কেউ—বায়লা শুনব। বায়লা শুনব। কোথায় শশী অধিকারী?

উদ্যোক্তাদের অনেক চেষ্টাতেও তাঁদের শান্ত করতে পারলেন না। ক্রমেই বাড়তে লাগল গোলমাল।

অধিকারী মশায়ের কাছে বার কয়েক লোক গেল। কিন্তু এখনো তাঁর উঠে যাবার মতনই অবস্থা নয়। আসরে বাজাতে আসা দূরের কথা।

কুমার জিতেনের চেয়ে কিছু বড়। সেও ব্যাপারটা শুনেছিল। আর জিতেনের হাত নিসপিস করছিল বেহালার বাক্সটার দিকে লক্ষ্য করে। বেশিক্ষণই আর সে ধৈর্য ধরতে পারলে না। কুমারকে কানে কানে জানালে মনের ইচ্ছা।

'হ্যাঁ রে, বাজাব নাকি আমি? একবার জিজ্ঞেস করে দেখ!'

কুমারেরও মহা উৎসাহ। সে তখনি কথাটা উদ্যোক্তাদের কাছে পেশ করলে।

তাঁরা প্রথমে রাজি হলেন না প্রস্তাব শুনে। কিন্তু কুমার বললে, 'আচ্ছা দেখুন না পারে কিনা। আর না হলে হট্টগোল ত থামাতেও পারবেন না। জিতেন বাজালে ত ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হবে না।'

শশী অধিকারীর বেহালা বার করে হারমোনিয়মের সঙ্গে সুর বাঁধলে জিতেন। দুচার বার ছড় টেনে টিপের আন্দাজ করে নিলে। তারপরই আরম্ভ হয়ে গেল তার বাজনা।

খানিকটা কৌতুহলে, খানিকটা নতুনত্বের আশায়, আর রাণাঘাটের যারা জিতেনকে জানে তাদের জন্যে গোলমাল থেমে এল। আসরের অনেকেই মন দিলে এদিকে। এইটুকু ছেলে আসরে বসে বেহালা বাজাচ্ছে! বাঃ এতো বেশ।

কিছুক্ষণ শুনতেই বাজনাটা অনেকের ভালোও লেগে গেল। সেই জয়জয়ন্তীর গৎটিই ধরেছে জিতেন। কাল সারাদিন বাজিয়ে এ গৎ দুরস্তও হয়েছিল। তা ছাড়া নিজের সুরবোধ আর বেহালায় একটু হাত ত ছিলই। আর সুরটাও বড় পছন্দ হয়েছিল তার নিজেরই।

সুতরাং বাজনা অনেকের বেশ ভালই লাগছিল। আসরও জমে উঠল দেখতে দেখতে। ওই বয়সের পক্ষে যতটা জমানো সম্ভব।

কতক্ষণ যে কেটে গেল, সেদিকে কারুর খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখা গেল, জিতেনের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন শশী অধিকারী। গায়ে মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে একজনের কাঁধে হাত রেখে তিনিও বাজনা শুনছেন।

আশ্চর্য হয়ে গেছেন অধিকারী মশায়। ছেলেটি তারই যন্ত্র নিয়ে বাজাচ্ছে। সেজন্যে রাগ করতেও ভুলে গেলেন যেন। তাঁর নিজেরই জয়জয়ন্তী গৎ বাজিয়ে চলেছে—কে এ? একটু এদিক ওদিক তুচ্ছ বটে। তান টানও মাঝে মাঝে হয়ে যাচ্ছে অন্য ধরনের। কিন্তু হাত ত মন্দ নয়। যা-ই বাজাক, টিপ সুরেলা!

বাজনা শেষ হতেই কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে বাবা? কোথায় থাকো? কার ছেলে তুমি?'

জিতেনের হয়ে অন্যরাই তার পিতৃ পরিচয় দিলে 'সেতারী বামাচরণবাবুর ছেলে, জিতেন।' আর তাকে বললে, 'এঁকে প্রণাম করো। ইনিই অধিকারী মশাই।'

'বামাচরণবাবু তোমার বাবা? শুনে বড়ই আনন্দ হল। বেশ, বেশ।' প্রণত জিতেনকে শশিভূষণ বললেন, 'অত বড় গুণীর ছেলে তুমি। আর কি বলব। আশীর্বাদ করছি, তোমার হবে। তুমি বাজাও, যেমন বাজাচ্ছিলে।'

তারপর আসরের লোকদের জানালেন, 'আপনারা আজ আমায় ক্ষমা করুন। শরীর বড়ই খারাপ। আজ বাজাতে পারছি না। তবে বামাচরণবাবুর এই ছেলে আসর ঠিক রেখে দেবে।'

এমনি করে সেই বালকের সঙ্গীত জীবনের উদ্বোধন হল সেদিন। শশী অধিকারীর আশীর্বাদে। রাণাঘাটের যাত্রার আসরে। আর অন্য এক যন্ত্রে।

তবে সে জিতেন্দ্রনাথের অঙ্কুর মাত্র। তার সহজাত প্রতিভার একটি আভাস। তবু সেকালের এক গুণীজনের তা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আর সে প্রতিশ্রুতিকে তিনি জানিয়েছিলেন শিল্পীর স্বীকৃতি।

কিন্তু সে কিশোর প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল অন্য মাধ্যমে। অর্থাৎ আর এক যন্ত্রে। বেহালায় না। বেহালার মতন বাঁশিও ও বাজাত তখন। শুনে শুনে বাজানো শুধু নয়। পিতার অজান্তে, তিনি যখন রাণাঘাটে থাকতেন না, তখনই তার দিন কাটত বাঁশি আর বেহালা নিয়ে। অন্তরের সুর এক একটা অবলম্বন চাইত বলেই কখনো ধরত বেহালা, কখনো বাঁশি।

'বাঁশি বাজাবি তুই? আর আমার সেতারের কি হবে? কত কষ্ট করে শিখেছি। কত ওস্তাদের কাছে [illegible] সেতার অন্য লোককে। আর আমার ছেলে হয়ে তুই বাঁশি নিয়ে থাকবি?'

তিরস্কার করতে গিয়েই হয়ত বামাচরণের মনে হল—দোষ ত জিতেনের নয়! তিনিও ত শেখানো আরম্ভ করেন নি। বাইরে বাইরেই থাকেন। দিন যায় জমিদার-দের দরবারে, আসরে। রাণাঘাটে যে কদিন আসেন, তাও পালচৌধুরীদের সভায় নিত্য আসর বসে। তা ছাড়াও কাছাকাছি গোবর-ডাঙায় মুখুজ্যেবাড়ির আসর। শেখাতে যান পঞ্চকোটগড়ে যাদবেন্দ্র মহাপাত্রকে। সঙ্গদর্শী অম্বিকাচরণও (কুমারের পিতা) ত শেখেন। কিন্তু জিতেনকে শেখাবার কথা মনেই হয় নি কোনদিন। দোষ ত তাঁর নিজেরই। হয়ত মনে হত, জিতেন এখনো তেমন বড় হয় নি।

কিন্তু না। আর সময় নষ্ট নয়। হিসেব করে দেখলেন, জিতেনের এখন ১২ বছর বয়স। লেখাপড়াও ত বিশেষ হচ্ছে না। এবার আরম্ভ করুক সেতার। সংস্কৃতের চেয়ে এই বোধহয় শিখবে ভাল।

বামাচরণ ছেলেকে তখন থেকেই রীতিমত শেখাতে আরম্ভ করলেন।

বামাচরণ তখন পঞ্চাশোর্ধ। সেই পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা ও সাধনলব্ধ বিদ্যা সবই পুত্রকে দিতে লাগলেন। তিনি নিজে শিখেছিলেন অনেক কষ্টে, বহু যত্নে। নানা ওস্তাদের কাছে, বিভিন্ন সূত্রে। পণ্ডিত বংশের বলে অনেক জমিদার বাড়িতে ক্রিয়াকর্মে যেতেন। নিযুক্ত সভাপণ্ডিত ছিলেন ময়ূরভঞ্জ রাজদরবারে। গোবরডাঙার বিখ্যাত মুখোপাধ্যায়ের পরিবারেও শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম করতেন। অথচ সঙ্গীতের প্রতিভাও ছিল তাঁর স্বভাব দত্ত। রাণাঘাটের পালচৌধুরী প্রভৃতিদের দরবারী গুণীদের কাছ থেকে তাই সংগ্রহ করতেন রাগবিদ্যা। সেকালের অনেক ধনীদের এই এক গুণ-গ্রাহীতা ছিল। শুধু শিল্পীদেরই আনুকূল্য করতেন না তাঁরা। প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদেরও দিকপাল কলাবতদের কাছে শিক্ষার সুযোগ করে দিতেন। এমনিভাবেই কজন ভারত প্রসিদ্ধ গুণীর শিক্ষা পেয়েছিলেন বামাচরণ। যেমন সুর বাহার ও সেতারের ওস্তাদ মহম্মদ খাঁ, খেয়ালী আহম্মদ খাঁ, বড়ে ছাম্মি খাঁ, ওস্তাদ রামৎ খাঁ, ধ্রুপদী যদু ভট্ট, বীণকার কাসিম আলী খাঁ প্রমুখ। রাণাঘাটের পালচৌধুরী পরিবারের নগেন্দ্র-নাথ প্রভৃতির দাক্ষিণ্যেই এইসব কলাবতের কাছে শিক্ষা বা সংগ্রহ তিনি করতেন। এমন কি পালচৌধুরী দরবারের দুই কলাবতী তওয়ায়েফ হিপনজান ও দিলজানের কাছেও নিয়েছেন বামাচরণ। তবে বিশেষভাবে শেখেন তিনি মহম্মদ খাঁর কাছে। সুর-কারের একজন আদি ঘরানাদার মহম্মদ খাঁ। লক্ষ্ণৌ থেকে তাঁর ওস্তাদ সাজ্জাদ মহম্মদের সঙ্গে তিনি বাংলায় আসেন। প্রথম সুর-বাহারী গোলাম মহম্মদের (তানসেনের কন্যা-বংশীয় ওমরাও খাঁর শিষ্য) একমাত্র পুত্র ও তালিমপ্রাপ্ত সাজ্জাদ মহম্মদ।

বামাচরণই একমাত্র দরিদ্র শিষ্য ছিলেন মহম্মদ খাঁর। অর্থাৎ রাণাঘাটের পাল-চৌধুরী, গোবরডাঙার মুখোপাধ্যায় পরিবার ইত্যাদির আনুকূল্যে তিনি মহম্মদ খাঁর তালিম পান। মহম্মদ খাঁর অন্যান্য শিষ্য এবং সাধকদের মধ্যে ছিলেন গোবরডাঙার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (মনুবাবু—বাংলার এক গুণী সুরবাহারী), নাটোরের মহারাজা গোবিন্দনাথ রায় (জগদিন্দ্রনাথের পিতা), গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর মাতুল উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী (ঢাকা)।

আর মহম্মদ খাঁর ওস্তাদ সাজ্জাদ মহম্মদের বাজনাও অনেক শুনেছিলেন বামাচরণ। কারণ পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর দরবারেও তাঁর যাতায়াত ছিল। আর প্রিয়পাত্র ছিলেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের। এইসবের ফলে গড়ে উঠেছিল ভট্টাচার্য মশায়ের সঙ্গীতজীবন। রাগবিদ্যা লাভ করেছিলেন। বাংলার এক দিকপাল কলাকার হয়েছিলেন সেতার সুরবাহারে। তবে মহম্মদ খাঁই ছিলেন তাঁর প্রকৃত ওস্তাদ। তাঁকেই তিনি জানতেন শিক্ষাদাতা বলে। আর নিজের হাতে যে সেতার যন্ত্রটি তৈরি করেছিলেন, তাতে ওস্তাদ বলে মহম্মদ খাঁর প্রতিকৃতি খোদাই করে রাখেন। সেই যন্ত্রই তিনি বাজাতেন সব আসরে।

(ক্রমশঃ)

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

মারাঠী আধুনিক নাটক

—দিলীপকুমার মিত্র

অতীতে ঐতিহ্যের পথ ধরেই আধুনিক মারাঠী নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠেছে। ১৮৪৩ খৃস্টাব্দের ৫ নভেম্বর প্রথম মারাঠী নাটকের প্রথম অভিনয় হয় এবং বিষ্ণুদাস ভাবের সেই অসামান্য নাট্যকৃতিকে স্মরণ করে ১৯৪৩এ মহাসমারোহে উদযাপিত হয় মারাঠী নাটকের শতাব্দী উৎসব। বিশিষ্ট নাট্যবিদ, মুম্বাই মারাঠী সাহিত্য সংঘের সম্পাদক ডঃ এ এন ভালেরাও-এর আন্তরিক প্রয়াসে মহাসমারোহে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। অতীতের প্রথিতযশা নাট্যকার জি বি দেবলের 'শারদা' নাটকের অভিনয় উৎসবের স্মরণীয় অঙ্গ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উৎসব পালিত হয়, খ্যাতনামা শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন, অভিনেতা নাটক ও নাট্যকারদের সম্বন্ধে জনগণ বিশেষ উৎসাহ দেখান। নতুন যুগের তরুণ সমাজ মারাঠী থিয়েটারের অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ অবহিত হয়ে আপন সৃষ্টির ক্ষেত্রকে আরও ঋদ্ধ এবং ঐশ্বর্যবান করে তুলতে প্রয়াসী হন। নতুন উন্নত-মানের রঙ্গমঞ্চও স্থাপিত হয়। অতীতের স্মরণীয় স্রষ্টাদের নাটকসমূহ গৌরবের সঙ্গে অভিনীত হতে থাকে; কির্লোস্কার দেবল, কোলহাটকর গাদকারি কেলকর এম এন যোশী এস পি যোশী বি ভি ওয়ারেরকর এস ভি ওয়রতক প্রমুখের নাটক দর্শকের বিপুল অভিনন্দন লাভ করে। পাশ্চাত্য দেশের নাটকসমূহও অভি-নীত হল সুন্দর অনুবাদের মাধ্যমে। নব-নাটকের বিপুল বৈচিত্র্যে, আঙ্গিকের আশ্চর্য পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল নাট্যক্ষেত্র। ৫ নভেম্বর মারাঠী নাট্যপ্রেমীদের কাছে স্মরণীয় রঙ্গভূমি দিন হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে মারাঠী নাটকের আধুনিক কাল আরম্ভ হল এই সময় থেকে।

নট নাট্যকার পি এল দেশপান্ডের 'তুঝে আহে তুঝাপাসি' (বা তার পাশে তুমি আছ) নাটকই আধুনিক কালের প্রথম নাটক। এতে আঙ্গিকের বৈচিত্র্যই নেই, আধুনিক কালের মূল্যবোধের দ্বন্দ্বও রূপায়িত। ভোগবাদী কাকাজী তথা-কথিত সংযমী গান্ধীবাদী আচার্য ও যুবক-যুবতীদের চিত্রণে নাট্যকার দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের নিখুঁত চিত্র হিউ-মার স্যাটায়ার ও সেন্টিমেন্টের সাহায্যে তুলে ধরেছেন। দেশপান্ডের পরের নাটক 'সুন্দর মী হোনার' (আমি সুন্দর হব) অনুবাদ রচনা। অজস্র একাংক নাটকেরও তিনি রচয়িতা। দেশপান্ডে অভিনেতা হিসাবেও স্মরণীয়ঃ তাঁর একক অভিনয়-গুলি দর্শকদের বিশেষ আনন্দ দেয়। 'বটাট্যাচি চওল, ওয়ার্‍্যাবরচি বরাত (গ্রাম্য ও শহরের জীবনের অসঙ্গতির কৌতুককর চিত্র), 'আসা মী আসা মী' (আমি এ-রকম মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যঙ্গ ছবি) এ প্রসঙ্গেই বিশেষ স্মরণীয়। দেশপান্ডের প্রথম কালের নাটক 'তুকা ম্হানে আত্তা' আধুনিক ভাবনায় সাধক কবি তুকারামের জীবনী রচনার প্রয়াস।

বর্তমানে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন বসন্ত কানেটকর। তাঁর প্রথম নাটক 'ভেড্যাচা ঘর উনহ্যাট' (বদমাইসের বাসা) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে এর বক্তব্য ও সংলাপের জন্য। প্রগ্রেসিভ ড্রামাটিক এসোসিয়েশন (পুণা) শ্রীরাম লাগুর পরিচালনায় এই নাটকের সফল মঞ্চ রূপায়ণ করে। পরবর্তী নাটক 'দেভাঞ্চে মনোরাজ্য' (দেবতার মনোরাজ্য) ও 'দল ধ্রুবের দোখে আপন' বিশেষ মঞ্চ-সাফল্য অর্জন করে না। ফ্যানটাসী জাতীয় প্রথম নাটকে মানব জীবনে অসংগঠিত দূরীকরণার্থে দেবতাদের হস্তক্ষেপ ও দ্বিতীয় নাটকে একটি শিশুর সহায়তায় দাম্পত্য কলহের অবসান। প্রেম তুঝা রঙ্গ কাসা (প্রেম তোমার রঙ কি প্রকার) লঘু কমেডি। রায়গড়ালা জেভা জাগ এতে (রায়-গড় যখন জেগে ওঠে) নাটকে শিবাজীর জীবনের শেষ কয়েক বৎসর চিত্রিত—রহস্য-ময়তায় শিবাজীকে না আবৃত করে তাঁকে পিতা ও মানুষ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। মৎস্যগন্ধা পৌরাণিক কাহিনীর সার্থক রূপায়ণ। অন্যান্য উল্লেখ্য নাটক—মেঘিনী, অশ্রু ও ঝালি ফুলে, হিমালয়াচি ঝাবলি, লেকুড়ে উদণ্ড ঝালে, ইথে ওশালা মৃত্যু (মৃত্যু এখানে লজ্জা পায়)। প্রখ্যাত হাস্যরসিক লেখক এম জি ঝাঠের ঝোয়া-পিপেচে হি ধন ঝাঝা আনি কান্ত প্রভৃতি নাটক তাঁকে অগ্রণী নাট্যকারের সম্মান দিয়েছে।

মারাঠী নাট্যসাহিত্যে বহুখ্যাত ও সর্বাধিক বিতর্কিত নাম বিজয় তেন্ডুলকর। সেন্সর প্রথাকে পদাহত করে দর্শকদের বিমূঢ় করে সমালোচকের ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে তাঁর নাটক সগৌরবে অভিনীত হয়ে চলেছে বিভিন্ন ভাষায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। বিজয় তেন্ডুলকর তীব্র মাত্রায় সমাজ সচেতন, বর্তমান জরাজীর্ণ ঘুণ-ধরা সমাজ ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্য স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তিনি—এক সর্ববিধ্বংসী সর্বনাশা ঝটিকা উদ্দাম প্রবাহিত হয়ে ন্যায়-নীতি নিয়মের প্রচলিত বোধকে আমূল উৎপাটিত করে সমাজভাবনার ভিত্তিমূলকে প্রকম্পিত করে দিচ্ছে তাঁর নাটকে। এবং ক্রোধে ক্ষোভে তিনি ফেটে পড়ছেন, ঘৃণার আগুনে ঝলসে দিতে চাইছেন এই সমাজ ব্যবস্থাকে, পুরাতন মূল্যবোধকে ছিন্নভিন্ন করতে চাইছেন তীব্র জ্বালায়। এইভাবে সমসাময়িক নাট্যকারদের তুলনায় এই ক্ষুব্ধ তরুণের নাটক এক বিশেষ পার্থক্য কৌণিকতা সূচিত করেছে। প্রথম সার্থক নাটক শ্রীমন্ত থেকেই সার্থকতার বিজয়-পতাকা উড়িয়ে চলেছেন তেন্ডুলকর মানুষ নাভাচে বেট মী জিনকালো মী হারালো সারি গ সারি এবং একাঙ্কসমূহে কেশবপ্রধান বা চোর পুলিশ চার দিবাস ব্যাল ভেট প্রভৃতিতে। উত্তরকালীন নাটকে তিনি আরও প্রচন্ড হয়ে উঠেছেন।

প্রায় পনেরো বছর আগে লেখা গিধাড়ে (শকুন) নাটকে এক আধুনিক ভারতীয় জীবন তার বর্বরতা লোভ ঘৃণা বিদ্বেষ নিয়ে অঙ্কিত : বৃদ্ধ পিতা তার বিতাড়িত ভ্রাতা সখারাম, তার পুত্রদ্বয় রমাকান্ত ও উমাকান্ত—প্রত্যেকেই প্রতারক ঘৃণ্য ভয়ংকর অপরিমিত মদ্যপায়ী বৃদ্ধের যুবতী কন্যা মানিকও একই ধরনের—সে এক রাজাকে গাঁথতে গিয়ে নিজেই গর্ভবতী হয়। বৃদ্ধ পিতার অবৈধ কবি পুত্র রজনীনাথের ভাষায় এই পাঁচ শকুনের পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষ অমঙ্গল প্রয়াস ধ্বংসবাসনা এক ভয়াল শ্বাসরোধকারী পরিবেশ সৃজন করে যা স্নায়ুকে অসহ্য পীড়ন করে ও এক নৈরাশ্য-ক্ষুব্ধ সান্ত্বনাক্লিষ্ট মরুভূমির ধু-ধু করা জ্বালাময় প্রতিবেশ সৃষ্টি করে। রমাকান্তের শান্ত স্বচ্ছ সন্তানহীনা স্ত্রী রমা যেন সমগ্র বিষ নিজদেহে ধারণ করে : তার তাও অন্যের সন্তান। সখারাম বাইন্ডার নাটকের এই নামীয় প্রধান চরিত্র এক অতি-সাধারণ মানুষ যে তীব্র মদ্যাশক্তি ও প্রবল যৌন-কামনা নিয়ে সমাজের ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। বহু বিতর্কিত এই নাটকটি বক্তব্য বা আঙ্গিক বিচারে অবশ্য অকিঞ্চিৎকরই মনে হয়। 'শান্ততা কোর্ট চালু আহে' নাটকে কোর্ট কোর্ট খেলার ছলে একটি নারীর (লীলা বেনারে) জীবনের ঘৃণ্য লজ্জা, গোপন বেদনা, চরম কলঙ্ক উদ্ঘাটিত হয় সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে একটি নারীর শুভ্র হৃদয় পবিত্র বাসনাকে ধর্ষিত করে তাকে চূড়ান্ত অবমাননার দিকে ঠেলে দেয় এই নাটকে তাই চিত্রিত। গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও উঁচু স্তরের রাজনীতিবিদদের প্রবল আক্রমণ করেছেন নাট্যকার 'ঘাশিরাম কোটওয়াল' নাটক—সম্পর্ক নারী সঙ্গকামী নানা ফড়নবীস পুণার গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় কর্তৃক অবহেলিত ঘাশিরামের কন্যা ললিত-গৌরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঘাশিরামকে কোটওয়াল করে দেয় যে তার প্রতিশোধ নিতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত নানাই তার পতন ঘটায়।

রত্নাকর মাতকারির উপর তেন্ডুলকরের প্রভাব বিশেষ রকম। মূলতঃ একাংক রচয়িতা হলেও বর্‍্যাবরচা মুসাফির (পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এক যুবকের কথা) 'রতুলাচে দুমরে টক্ক' (চরিত্রের আত্মা অন্বেষার আকর্ষণী কাহিনী) 'আশ্টাই (এক মধ্যবিত্ত মেয়ের জীবন বোধ) প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ নাটক সাফল্য পেয়েছে। পুরুষোত্তম দরভেকর (যিনি সার্থক পরিচালকও) জীবনবোধ ও মঞ্চের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিয়ে নাটক রচনা করেছেন জনপ্রিয়রূপে। কামরে ক্যালিগুলা অবলম্বনে চন্দ্র নভিচ ধালাল কালি মাতি খারে পানি ও বরহাদি মনমে তাঁর উল্লেখ্য নাটক ঠিক তেন্ডুলকার প্রমুখের ধারানুযায়ী না হলেও ব্যবহারিক বিচারে সমালোচক ডি নাদকার্নি তাঁকে আধুনিক মনে করেন। পি এস রেগের রঙ্গপাঞ্চালিক ও চল্লায়াঅন নতুন দৃষ্টিতে পুরাতনের বিচার। জি গ্যাড়গিলের বেদ্যান চৌকস (প্রেরণন) ও জ্যোৎস্না আমি জ্যোতি (দেহ মনের সম্পর্কের দ্বন্দ্ব মনস্তত্ত্ব ও প্রতীক সমন্বয়ে বর্ণিত) মঞ্চ সফল হয়। এস এন নাভরে (দি জু মেটরীর অনুবাদক) তারা ওয়াল্লারসে (কাকসা) এম পাড়কি (উদ্ধব) সরিতা পাড়কি (বাধা) বসুন্ধরা পটওয়রধন (এহরকানি) নাটক রচনায় দক্ষতা দেখাচ্ছেন। প্রখ্যাত উপন্যাসিক পেন্ডসের মহাপুর (লঘু কমেডি), রাজে মাষ্টার যশোদা গরমবিচা বাপু (যুবক সম্প্রদায়ের হতাশা ক্লান্তির চিত্র) শম্ভু সাচ্যা চালি (বস্তির চিত্র) রসিকমনকে তৃপ্ত করে। বেশ কিছুদিন আগে নাটক নিয়ে প্রভূত যশ অর্জন করেছেন এম জি রঙ্গনেকর তাঁর আশীর্বাদ কুলবধু মাঝে ঘর (আমার ঘর) এক হোতা মাতার (একটা বুড়ো ছিল) প্রভৃতি দ্বারা। ভি ভি শিরওয়াড়কর (কবি কুসুমাগ্রজ) তাঁর কাব্যকরায় ট্র্যাজিক চেতনায় ও গভীর জীবন অনুধ্যানে স্বতন্ত্র মহিমায় বিদ্যমান—যযাতি আনি দেবযানী কৌন্তেয় নট সম্রাট বৈজয়ন্তী বিদূষক প্রভৃতি নাটক এ প্রসঙ্গেই মনে পড়ে। প্রবীণ সাংবাদিক পি কে আত্রে দীর্ঘদিন ধরেই নাটক লিখে চলেছেন—সাসটাঙ্গ নমস্কার পাণিগ্রহণ তো মী নভেচ (মে আমি নই) মী মন্ত্রী ঝালো (আমি মন্ত্রী ছিলাম) ব্রহ্ম-চারী বয়া তেথে বায়া (বাবা আর বউ) প্রভৃতি। জনপ্রিয় নাট্যকার বিদ্যাধর গোখলের নাটক সহজবোধ্য অনায়াস গ্রহণযোগ্য ও সঙ্গীতময় এবং হাস্যরসপূর্ণও। তাঁর পন্ডিতরাজ জগন্নাথ মন্দারমালা স্বর সম্রাজ্ঞী মেঘ মল্লার প্রভৃতি দর্শকদের বিশেষ আনন্দ বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজের পতন ও দুর্নীতির চিত্র এঁকেছেন সুরেশ খারে মলা উত্তর হাবরে (উত্তর আমার চাই) পাপা সাঙ্গা কুনাচে (কাকে বাবা বলব) কাচ্চো চন্দ্র কাচের চাঁদ) প্রভৃতি নাটকে। আদ্য রঙ্গাচরয়ার বিভিন্ন নাটকও সগৌরবে অভিনীত হয়ে চলেছে।

নবীন নাট্যকার সি টি খানোলকর এক বিশেষ সম্ভাবনা নিয়ে মারাঠী মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রচলিত রীতির অনুবর্তন না করে তিনি ভাব ও রূপের এক অভিনব প্রত্যয় সঞ্চার করতে চান। বিভিন্ন প্রবৃত্তির লীলায় সমাকীর্ণ জীবন তার বিপুল বৈচিত্র্য নিয়ে খানোলকরের রচনায় প্রতিভাত। প্রকৃতপক্ষে এক এ্যাবসার্ড দর্শন অক অধিবাস্তবের চেতনা তার নাটককে সমাচ্ছন্ন করে আছে যদিও শূন্যতার অস্তিবাচক প্রত্যয়কেই তিনি গ্রহণ করতে প্রয়াসী : ভারতীয় দর্শনের সেটাই শিক্ষা। তাছাড়া খানোলকরের নাটকসমূহে লোকনাট্যের ঐতিহ্য ও স্মৃতি আশ্চর্য সুন্দর যুক্ত হয়েছে। তাঁর অজস্র নাটকের মধ্যে দুটি নাটক সমালোচকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে—এক শূন্য বাজিরাও এবং অবধ্য। প্রথম নাটকে লেখক আপ্পারাও গৌরী ও বাজীরাও চরিত্রের মধ্য দিয়ে জীবন সমুদ্রের সীমাহীন গভীরতা ও নিঃসীম ব্যাপ্তির চিত্র অংকন করেছেন। তাদের কামনা বাসনার দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বিচিত্র লীলা প্রেম প্রীতি বিদ্বেষ ঘৃণার আলিম্পন এক বিস্ময়ের আশ্চর্য রূপ-লোক নির্মাণ করে। বিচিত্র চরিত্র বাজীরাও : নিঃসঙ্গ নির্জন বিদূষক চরিত্রটি শূন্যতার মধ্যে পেয়েছে পূর্ণতাকে ব্যর্থতায় অন্বেষণ করেছে সার্থকতাকে আর হাসির মধ্যে ধৃত হয়েছে গভীরতম কান্না। অবধ্য নাটক মানুষের দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্ব অথবা জীবনের দুই প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব যে অগ্নিদহনে জীবন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় আবার অন্যদিকে তা শুদ্ধ পূর্ণ হেমপ্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। হোমলে এসেছে ঔপন্যাসিক গঙ্গাধর—তার

উপন্যাসিক গঙ্গাধর—তার দুই সত্তার দ্বন্দ্ব তাকে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করছে। এক সত্তা জীবনের শান্ত আশাবাদ ও মানবতা-বাদকে প্রকাশ করে, অন্য সত্তা মৃত্যু দুঃখ-চেতনা সিনিসিজমকে প্রকট করে তোলে। একদিকে সে প্রেমিকা নারীকে পবিত্রতায় গ্রহণ করতে চায়, অন্যদিকে কলংক ঘৃণায় তাকে পরিত্যাগ করে। শেষ পর্যন্ত গঙ্গাধর আত্ম-হত্যা করে কিন্তু তার অন্যায় প্রবৃত্তি কয়েক-জনের মধ্যে বেঁচে থাকে। কিন্তু তার মৃত্যু হলেও তার শুভচেতনা প্রভাবিত করে হোটেল ভৃত্য পান্ধারিকে যে সরল মন সৎ বিবেক আর ঋজু দেহ নিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। এই কল্যাণচেতনা খানোলকরের নাটকে গভীর নিঃসংশয় প্রত্যয়ে ধ্রুবনক্ষত্রের দীপ্তিতে সমাসীন।

তিনটি ধারা মারাঠী নাট্যপ্রবাহকে বিশেষ পুষ্ট করছে—সঙ্গীত নাটক, তামাশা ও আধুনিক পাশ্চাত্য নাটকের অভিনব ভাব রূপ। সংগীত নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ এবং সার্থক সংগীতের প্রয়োগ নাটকের ডাই-মেনশনকে বাড়িয়ে দেয়। আজও মারাঠী দর্শক নাট্যসঙ্গীতের ভাবে আচ্ছন্ন হয়, উদয় গড়ওয়ালে বি দেশপান্ডে ভার্গব জয়মালা প্রমুখের সঙ্গীত তাকে অপরিসীম আনন্দ দেয়। ব্যঙ্গবিদ্রূপ কৌতুকের প্রয়োগ, রাজ-নৈতিক সামাজিক মন্তব্য সমালোচনা, সাধারণ মঞ্চে সহজ সাজপোশাকে অনায়াসে অভিনয়-রীতিতে তামাশা আধুনিক মঞ্চেও সগৌরবেই সমাদৃত—দেশপান্ডে, দাদা কোন্ডকে দাদু ইন্দুরিকর প্রমুখের নাম এখানে স্মরণীয়। জীবনের দুর্ভেদ্য জটিলতা, প্রাণের গ্রহণ গভীরের বিচিত্র অভিব্যক্তি, শূন্যতা অবক্ষয় উদ্দেশ্যহীনতার প্রকাশের জন্য যে এ্যাবসার্ড তত্ত্ব ও দর্শন প্রযুক্ত অতি আধুনিক মারাঠী নাট্যকারদের রচনায় তারও প্রয়োগ আছে। এইভাবে বিচিত্র ভাবনার সমন্বয়ে আজকের মারাঠী নাটক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সম্যক সচেতনতায় জীবন অনুধ্যানে ও রূপ সৃজনের চমৎকারিত্বে আধুনিক মারাঠী নাটক আপনার সগৌরব অস্তিত্বকে নিঃসংশয়রূপে অধিষ্ঠিত করেছে।

১৯৭৩ সালের বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মেয়েদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হন ইউ লান প্র(জাতন্ত্রী চীন) ইডেন উদ্যানের ক্ষুদিরাম হলে ৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার প্রাক্‌কালে অনুশীলন করছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

পঞ্চম টেস্ট খেলা

বোম্বাইয়ের নবনির্মিত ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারতের শেষ পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০১ রানে জিতে ভারতের বিপক্ষে ১৯৭৪-৭৫ সালের টেস্ট সিরিজে ৩—২ খেলায় 'রাবার' জয়ী হয়েছে। এ নিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে যে ৭টি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলা হল তার ফলাফল ঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজের 'রাবার' জয় ৬ বার এবং ভারতের রাবার জয় একবার। এই সাতটি টেস্ট সিরিজের ৩৩টি টেস্ট খেলার ফলাফল ঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ১৫, ভারতের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ১৫। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ১৯৭১ সালে ১—০ খেলায় (ড্র ৪)। ভারত 'রাবার' জয় করেছিল।

প্রথম দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ৩০৯ রান সংগ্রহ করেছিল। ফ্রেডেরিকস ১০৪ এবং কালিচরণ ৯৮ রান করে আউট হন। অধিনায়ক লয়েড ৬৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। ২য় উইকেটের জুটিতে ফ্রেডেরিকস (১০৪ রান) এবং কালিচরণ দলের ১১৩ রান তুলে দিয়েছিলেন। এর পর ৩য় উইকেটের জুটিতে কালিচরণ (৯৮ রান) এবং লয়েড দলের ১০৪ রান তুলে দেন।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১ম ইনিংসের খেলায় রান দাঁড়ায় ৫২৮ (৫ উইকেটে)। চা-পানের সময় দর্শক এবং পুলিশের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে ঐ দিনের মত খেলা বন্ধ হয়ে যায়। লয়েড ২০১ রান এবং ডেরেক মারে ৬৭ রান করে খেলায় অপরাজিত থেকে যান। অসমাপ্ত ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে লয়েড এবং মারে ১৮৭ রান তুলে ভারতের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে রেকর্ড রান তুলেন। পূর্বের রেকর্ড ১৬৩ রান (সোবার্স এবং সলোমন কানপুর, ১৯৫৮-৫৯)।

অধিনায়ক লয়েড ভারতীয় বোলারদের নির্মমভাবে পিটিয়ে খেলে ডাবল সেঞ্চুরী (২০১ রান) করে অপরাজিত থাকেন। তিনি ১৬০ মিনিটে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী করেন। তাঁর প্রথম সেঞ্চুরীতে ১৩টা বাউন্ডারী এবং ২টো ওভার-বাউন্ডারী ছিল। তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরী করতে ১৮৯ মিনিট সময় লাগে। এই দ্বিতীয় সেঞ্চুরীতে ছিল মাত্র তিনটে বাউন্ডারী এবং একটা ওভার-বাউন্ডারী।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের প্রথম ইনিংসের ৬০৪ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ডেরেক মারে ৯১ রান করে আউট হন এবং লয়েড ২৪২ রান করে নটআউট থেকে যান। তাঁর এই নটআউট ২৪২ রানে ছিল ১৯টা বাউন্ডারী এবং ৪টে ওভার-বাউন্ডারী।

৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ডেরেক মারে এবং লয়েড ২৫০ রান তুলেছিলেন। তৃতীয় দিনে ভারত প্রথম ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ১৭১ রান তুলেছিল। এইদিন গাভাস্কার ৮৬ রান করে আউট হন এবং সোলকার ৭৬ রান করে নটআউট থাকেন। খেলার এই অবস্থায় 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি পেতে ভারতের আরও ২৩৪ রানের প্রয়োজন ছিল।

চতুর্থ দিনে ভারতের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৭৩ (৬ উইকেটে)। 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও তাদের ৩২ রানের প্রয়োজন ছিল; এদিকে হাতে জমা ছিল প্রথম ইনিংসের ৪টে উইকেট। চতুর্থ দিনে ভারত আরও চারটে উইকেট খুইয়ে পূর্বদিনের ১৭১ রানের (২ উইকেটে) সংগে ২০২ রান যোগ করেছিল। সোলকার সেঞ্চুরী (১০২ রান) করেন। সোলকার ২৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলে এই প্রথম সেঞ্চুরী করলেন। এইদিন সোলকার তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে হাজার রান পূর্ণ করেন। বিশ্বনাথের দুর্ভাগ্য, তিনি সেঞ্চুরীর দোরগড়ায় এসে ৯৫ রানের মাথায় আউট হন। গায়কোয়াড় ৫১ রান করে অপরাজিত থেকে যান। ৫ম উইকেটের জুটিতে বিশ্বনাথ (৯৫ রান) এবং গায়কোয়াড় ১৭৫ মিনিট খেলে দলের অতি মূল্যবান ১২১ রান তুলে দেন।

পঞ্চম দিনে ভারতের ১ম ইনিংস ৪০৬ রানের মাথায় শেষ হয়। প্রবীণ খেলোয়াড় ল্যান্স গিবস ৯৮ রানে ৭টা উইকেট নিয়ে ৪১ বছর বয়সে অসাধারণ বোলিংয়ে সাফল্যের পরিচয় দেন। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ চা-পানের সময় ৩ উইকেটে ২০৫ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪০৪ রান তুলতে ভারত ২য় ইনিংস খেলতে নেমে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ৭৩ রান সংগ্রহ করে।

খেলার শেষ ৬ষ্ঠ দিনে মধ্যাহ্নভোজের ৭২ মিনিট পর ভারতের ২য় ইনিংস ২০২ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০১ রানে জিতে যায়। ৭ম উইকেটের জুটিতে গায়কোয়াড় (৪২ রান) এবং প্যাটেল (নটআউট ৭৩ রান) ৬২ মিনিট খেলে দলের অতি মূল্যবান ৭২ রান তুলে দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ১—০ খেলায় (ড্র ৪) যে 'রাবার' জয় করেছিল তা ক্লাইভ লয়েডের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পুনরুদ্ধার করলো।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৬০৪ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ফ্রেডেরিকস ১০৪ কালিচরণ ৯৮, লয়েড নটআউট ২৪২ এবং ডেরেক মারে ৯১ রান। ঘাবড়ি ১৪০ রানে ৪ চন্দ্রশেখর ১৩৫ রানে ১ এবং বেদী ৯৮ রানে ১ উইকেট)

ও ২০৫ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গ্রিনিজ ৫৪ রান। ঘাবড়ি ৯২ রানে ২ উইকেট)

ভারত : ৪০৬ রান (গাভাস্কার ৮৬ সোলকার ১০২, বিশ্বনাথ ৯৫ এবং গায়কোয়াড় ৫১ রান। গিবস ৯৮ রানে ৭ উইকেট)

ও ২০২ রান (গায়কোয়াড় ৪২ এবং প্যাটেল ৭৩ নটআউট। হোল্ডার ৩৯ রানে ৬ এবং গিবস ৪৫ রানে ২ উইকেট)

ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের গড়

সদ্য সমাপ্ত ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ১৯৭৪-৭৫ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড় তালিকার প্রথম স্থান লাভ করেছেন—খেলা ৫, ইনিংস ৯, নটআউট ১ বার, মোট রান ৬৩৬ এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৪২ নটআউট এবং গড় ৭৯-৫। এই ব্যাটিং তালিকায় উভয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন ভারতের জি বিশ্বনাথ—খেলা ৫, ইনিংস ১০, নটআউট ১ বার, মোট রান ৫৬৮ এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৩৯ এবং গড় ৬৩-১১। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান (৬৩৬ রান) এবং এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান (২৪২ নটআউট) করেছেন ক্লাইভ লয়েড। ভারতের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান (৫৬৮ রান) এবং এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান (১৩৯ রান) করেছেন বিশ্বনাথ।

বোলিংয়ের গড় তালিকায় উভয় দলের পক্ষে শীর্ষস্থান এবং সর্বাধিক মোট উইকেট পেয়েছেন অ্যান্ডি রবার্টস—মোট উইকেট ৩২ এবং গড় ১৮-২৮।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ল্যান্স গিবস ২১টি উইকেট (গড় ২১-৬১) এবং হোল্ডার ১৭টি উইকেট (গড় ১৮-৫৩) পেয়েছেন। ভারতের পক্ষে বোলিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন বেদী—১৫টি উইকেট এবং গড় ৩২-২৬। প্রসন্ন পেয়েছেন ১৫টি উইকেট (গড় ৪০-০৬) এবং চন্দ্রশেখর ১৪টি উইকেট (গড় ৪১-৩৫)।

উইকেট-কিপিং

ডেরেক মারে (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) :
ক্যাচ ১৫ এবং স্টাম্পিং ১

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার (ভারত) :
ক্যাচ ৯ এবং স্টাম্প ১

ফিল্ডিং

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ক্যাচ ৭—কালিচরণ

ভারত : ক্যাচ ৮—প্যাটেল ও সোলকার (প্রত্যেকে)

রবার্টসের রেকর্ড

ভারতের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত ১৯৭৪-৭৫ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অ্যান্ডি রবার্টস ৩৩টি উইকেট নেওয়ার সূত্রে স্বদেশের পক্ষে যে-কোন দেশের বিপক্ষে টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার পূর্ব রেকর্ড স্পর্শ করেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৫০ সালের টেস্ট সিরিজে নাটা স্পিন বোলার আলফ ভ্যালেন-টাইন ৩৩টি উইকেট নিয়ে যে-কোন দেশের বিপক্ষে টেস্টের এক সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার রেকর্ড করেছিলেন।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

৫ম টেস্ট ক্রিকেট খেলা

এডিলেডে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ৫ম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ১৬৩ রানে জিতে ১৯৭৪-৭৫ সালের টেস্ট সিরিজে ৪—০ খেলায় (ড্র ১) এগিয়ে গেছে।

বৃষ্টির জন্যে প্রথম দিনে খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক মাইক ডেনেস টসে জিতে জিজে উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ব্যাট করতে দেন। অস্ট্রেলিয়ার খেলার সূচনা খুবই খারাপ হয়েছিল—মাত্র ৮৪ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। দ্বিতীয় দিনেই ৩০৪ রানের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস শেষ হয়। ইংল্যান্ডের আন্ডারউড ১১৩ রানে ৭টা উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইংল্যান্ড এইদিন কোন উইকেট না খুইয়ে ২ রান করে।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ১৭২ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নেমে দুটো উইকেটের বিনিময়ে ১১১ রান তুলে ২৪৩ রানে এগিয়ে যায়।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়া তাদের ২য় ইনিংসের ২৭২ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। রেডপাথ ৫২ এবং মার্শ ৫৫ রান করেন। ওয়াল্টার্স ৭১ রান করে অপরাজিত থাকেন। আন্ডারউড ১০২ রানে ৪টে উইকেট পান। ইংল্যান্ড ৪০৪ রানের ব্যবধানে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যায়—তাদের ৯৪ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে।

শেষ পঞ্চম দিনে ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসে ২৪১ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ১৬৩ রানে জিতে যায়। অ্যালেন নট ১০৬ রান করে নটআউট থাকেন। টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নটের এই প্রথম সেঞ্চুরী।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৩০৪ রান (ওয়াল্টার্স ৫৫ এবং জেনার ৭৪ রান। আন্ডারউড ১১৩ রানে ৭ উইকেট)

ও ২৭২ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। রেডপাথ ৫২, ওয়াল্টার্স ৭১ নটআউট এবং মার্শ ৫৫ রান। আন্ডারউড ১০২ রানে ৪ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ১৭২ রান (মাইক ডেনেস ৫১ রান। লিলি ৪৯ রানে ৪, টমসন ৫৮ রানে ৩ এবং ম্যালেট ১৪ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৪১ রান (নট ১০৬ নটআউট এবং ফ্লেচার ৬৩ রান। লিলি ৬৯ রানে ৪, ওয়াকার ৭৯ রানে ৩ এবং ম্যালেট ৩৬ রানে ২ উইকেট)

দেশবিদেশের খেলা

রোগা ছেলের কীর্তি

হাড় জিরজিরে রোগা ছেলেটি কাঙালের মত এসে রোজ দাঁড়িয়ে থাকত সুইমিং পুলের আনাচে-কানাচে। ছ ফুট আড়াই ইঞ্চি লম্বা ছেলেটি যখন দ্রুতপায়ে হাঁটে তখন মনে হয় যেন হাওয়ায় উড়ছে। লম্বা লিকলিকে দশ বছরের এই কিশোর একদিন মনের অবদমিত বাসনা প্রকাশ করল সুইমিং পুলের প্রশিক্ষককে। প্রশিক্ষক ত ছেলেটির কথা শুনে বিস্মিত। বলে কি। দুর্বল শীর্ণকায় চেহারা নিয়ে সাঁতার শিখবে! এও কি হতে পারে। প্রশিক্ষকের প্রত্যাখ্যানে ছেলেটির উজ্জীবিত উৎসাহে ভাটা পড়ে। চোখের জল চেপে সে যায় বাধাতামূলক সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। এখানকার কোচ মার্বলিনস গোহে ছেলেটির অনুশীলনে অভূতপূর্ব দক্ষতা দেখে বিশেষ দৃষ্টি দেন। বিশেষতঃ ব্যাকস্ট্রোকে অসামান্য সম্ভাবনা দেখে গোহে উৎসাহিত হন।

পাকা জহুরীর মত গোহে সেদিন খাঁটি সোনা চিনতে ভুল করেননি। কয়েক বছরের মধ্যেই এই অধ্যবসায়ী শীর্ণকায় কিশোর রোগা হাড়ে ভেলকী খেলিয়ে সুইমিং পুলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পূর্ব জার্মানীর স্বনামধন্য এই কিশোরের নাম রোনাল্ড ম্যাথেজ।

মিউনিখ অলিম্পিকে যখন দড়ি-টানা-টানির মত সোনা জয়ের জন্যে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে তখন রোনাল্ড ম্যাথেজ ১০০ ও ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে সোনা কুড়িয়ে শুধু স্বদেশের মানকেই বজায় রাখেননি স্বপ্রতিষ্ঠ সুনামকেও অক্ষুণ্ণ রাখেন। কারণ মিউনিখের আগে মেকসিকো অলিম্পিকের ঐ দুই বিভাগেই ম্যাথেজের স্থান ছিল সর্বাগ্রে।

পূর্ব জার্মানীর লিপজিগ কলেজের ছাত্র এবং এস সি টারবাইন আরফার্ট ক্লাবের সদস্য ম্যাথেজ ১৯৭২-এর অলিম্পিকে স্বকীয় রেকর্ড ভেঙে নতুন নজীর স্থাপন করেন। তিনি ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক ৫৬-৬ সেকেণ্ডে ও ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক ২:০২-৮ সেকেণ্ডে অতিক্রম করেন। ১৯৬৮ সালের মেকসিকো অলিম্পিকে ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে ৫৮-৭ ও ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে ২:০৯-৬ সেকেণ্ডে ম্যাথেজ প্রতিযোগিতা শেষ করেন আর গত অলিম্পিকে তার নিকটতম প্রতিযোগী আমেরিকার মাইকেল ষ্টাম ১০০ মিটার ৫৬-৭ সেকেণ্ডে ও ২০০ মিটার ২:০৪-১ সেকেণ্ডে সমাপ্ত করে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী।

রিলে সাঁতার ম্যাথেজের প্রিয় ইভেন্ট। ৪০০ মিটার মেডলী রিলে এবং ১০০ মিটার মেডলী রিলে রেসে প্রারম্ভিক প্রতিযোগী হিসেবে ম্যাথেজ-এর বিশ্ব রেকর্ড রয়েছে। ১০০ মিটার মেডলীতে ৫৬-৩ সেকেণ্ডে নির্ধারিত দূরত্ব অতিক্রম করে স্বীয় মান অক্ষুণ্ণ রাখেন। বলে রাখা ভাল ইতিপূর্বে প্রায় পঞ্চাশবার ঐ সময়ের মধ্যে তিনি ১০০ মিটার সাঁতার শেষ করেছেন। সুতরাং মেকসিকো বা মিউনিখ অলিম্পিকে রোনাল্ড ম্যাথেজের সাফল্য কোন অবিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আর মিউনিখ অলিম্পিকে ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রিলেতে তৃতীয় ও ১০০ মিটার মেডলী রিলেতে দ্বিতীয় হওয়ার পেছনে যে ম্যাথেজের অবদান অনেকখানি তা বলাই বাহুল্য। কারণ রিলে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম প্রতিযোগী হিসেবে অন্যান্য প্রতিযোগীদের তুলনায় অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে ম্যাথেজ তার সতীর্থদের অনুকূল পরিস্থিতিতে পৌঁছে দিয়েছে।

১৯৬৬ সালে এক প্রতিযোগিতায় ১০০ ও ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে প্রথম হয়ে ম্যাথেজ সবাইকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৬৭ সাল থেকে একনাগাড়ে পূর্ব জার্মানীর বর্ষসেরা সাঁতারুর আখ্যায় ভূষিত। এছাড়া ১০০ ও ৪০০ মিটার মেডলী রিলেতে প্রথম প্রতিযোগী হিসেবেও ম্যাথেজ অনন্য। ১০০ মিটার বাটার ফ্লাইতেও ইউরোপীয়ান রেকর্ড সৃষ্টিকারী। ১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত স্বদেশীয় চ্যাম্পিয়ানশিপে ম্যাথেজ ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে ৫৬-৯৭ ও ২০০ মিটার ২:০৩-৪১ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে নিজেকে সেরা প্রতিপন্ন করেন। অন্তর্দেশীয় এই প্রতিযোগিতায় ম্যাথেজ এস সি টারবাইন আরফার্ট ক্লাবের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন।

স্বীয় সাফল্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে রোনাল্ড ম্যাথেজ বলেন—আমার দেশই আমাকে চরম সার্থকতার দ্বারে এগিয়ে দিয়েছে। স্বদেশের সাহায্য ছাড়া আমার প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ কোনদিন হত কিনা কে জানে।

সন্দেহ নেই স্বনিষ্ঠ ম্যাথেজ-এর জীবনে সাঁতারই মূলমন্ত্র। জীবনমন্ত্র। কিন্তু সাঁতার ছাড়াও ব্যক্তিগত জীবনে ম্যাথেজ বিচিত্র রসের রসিক। বুদ্ধিদীপ্ত মেধাবী ছাত্র। একনিষ্ঠ পাঠক। নানান স্বাদের বই পড়েন। তবে জুলিয়েন ভারেন আলেকজান্ডার ডুমাসের উপন্যাস এবং সমসাময়িক যে কোন বিষয়ের ওপর লেখা রচনা পাঠে বিশেষ আগ্রহী। মোটর সাইক্লিং ও মোটর ড্রাইভিং প্রিয় নেশা। হাস্যরসাত্মক ছায়াছবি দেখে অবসর বিনোদন করতে ভালবাসেন। দীর্ঘ কঠিন অনুশীলনের পর মিউজিকের ছন্দে দেহকে জিরিয়ে নেন। বিভিন্ন রস সম্ভারে পরিপুষ্ট রোগা লিকলিকে ছেলে ম্যাথেজকে দেখে আজও আপাতঃ দৃষ্টিতে মনেই হয় না যে সে একজন খ্যাতিমান দক্ষ সাঁতারু, আর ভাবতে বিস্ময় লাগে যে এই রোগা পাতলা আকৃতির ছেলে পর পর দুই অলিম্পিকে সেরা।

—প্রশান্ত দাঁ

মাঠের নায়ক

অমিতাভ রায়

বলতে গেলে প্রায় ধূমকেতুর মত আবির্ভাব। সোরগোল তোলা, রীতিমত সাড়া জাগানো প্রতিষ্ঠা। ভারতের ক্রিকেট অনুরাগীরা, বিশেষতঃ আমরা বাঙ্গালীরা নতুন আশায় বুক বেঁধেছিলাম কিছু পেয়েছি বলে। আমাদের এই নতুন প্রত্যাশা ঘরের ছেলে অমিতকে কেন্দ্র করে।

অমিত অর্থে অমিতাভ রায়। মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। ভারতীয় ক্রিকেটের বর্তমান পটভূমিকায় ফাস্ট বা মিডিয়াম ফাস্ট বোলারের অভাব যে মুহূর্তে চরম, ঠিক সেই মুহূর্তে অমিতের অনিবার্য আবির্ভাব। বাংলা তথা ভারত অমিতকে সেদিন স্বাগত জানিয়েছিল অন্তর দিয়ে। সুঁটে ব্যানার্জির পর ফাস্ট বোলার বলতে বাঙ্গালীদের মধ্যে আর যখন কোন মুখের সন্ধানই মিলছিল না তখন তুলনামূলকভাবে সমান্তরাল গণপনার অধি[illegible] না হলেও অমিত স্বস্তি এনেছিলেন। সুঁটে ব্যানার্জির বেনিফিট ম্যাচে ইডেনে তাঁরই উত্তরসূরী নতুন আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন—নৈরাশ্যেভরা ক্রিকেট অনুরাগীদের হৃদয়ে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অমিতাভ তাঁর সেদিনের প্রতিশ্রুতি, প্রত্যাশা জাগিয়ে রাখতে পেরেছেন কি? ঐ প্রশ্নের উত্তর অমিতাভ নিজেই দেবেন। হয়তো আজ নয় কিন্তু আগামীকাল নিশ্চয়ই।

অসামান্য নিষ্ঠা, অফুরন্ত উৎসাহ, নিটোল প্রত্যয় এবং অসীম আত্মবিশ্বাসকে মূলধন করে অমিতাভ ক্রিকেটের প্রথম ধাপ থেকে ক্ষিপ্রতার প্রায় শেষ ধাপে পা রেখেছেন বোলিংয়ের কলাকৌশল, কার্য-কারিতা রপ্ত করার সুযোগ এসেছিল কৈশোরেই হাজারীবাগ সেন্টজেভিয়ার্স বা কলকাতার সাউথ পয়েন্ট স্কুলে পড়ার সময়। অমিতের জন্ম ১৯৫৩ সালের ১৬ মার্চ কলকাতায়। বাবা দেবকুমার রায়ের আদি

নিবাস অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বাইশারী গ্রামে। অমিতাভ অবশ্য সে সব কথা শুধু মা (শ্রীমতী জয়ন্তী রায়) বাবার মুখেই শুনেছেন। বর্তমান আস্তানা দক্ষিণ কলকাতার সুইনহো স্ট্রীটে। বাবা ব্যবসায়ী লোক, তারাতলা রোডে ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতির কারখানা আছে। অমায়িক মানুষ। সংসার ছোট। দেববাবুর দু' ছেলে এক মেয়ে। তিনটি সন্তানের মধ্যে অমিত মেজ। দাদা বাবার সংগেই ফ্যাক্টরীর কাজ দেখা-শোনা করেন।

মডেল হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর বিদ্যাসাগর কলেজে (কলা প্রথম বর্ষ) ভর্তি হয়েছেন অমিতাভ রায়। স্কুলে পড়ার সময় ১৯৬৯, ১৯৭০, ৭১ ৭২র বাংলা স্কুল দলের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগেই কলকাতার ক্রিকেট জহুরীদের চোখে পড়ে যান। ১৯৬৬ সালে রণজি ট্রফিতে খেলার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন কিন্তু অসুস্থতার জন্য মনের সাধ অমিতের মনেই রয়ে যায়। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট আসরে প্রথম পদার্পণ ১৯৭৪-৭৫ সালে। কলকাতা পূর্বাঞ্চল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মূল সেমিফাইনালে দিল্লীর কাছে হেরে যায়। পাঁচটি ম্যাচে অমিতের সংগ্রহ একুশটি উইকেট। ১৯৭৪ সালটা অবশ্য তাঁর প্রায় বসেই কেটেছে হাতে চোটের জন্য। ১৯৭২-৭৩ সালে রণজি ট্রফিতে আবার ডাক পেয়ে বিহারের বিরুদ্ধে দু' ইনিংসে পাঁচটি উইকেট নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আসামের বিরুদ্ধে উইকেট মাত্র একটি। আন্তঃ আঞ্চলিক খেলায় পুণায় মহারাষ্ট্রের তিনটি উইকেট 'রাজু ভালেকার, আনোয়ার শেখ এবং নিক সালদানা) পান।

ঐ বছরই এম-সি-সির বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চল দলে অতিরিক্ত খেলোয়াড় রূপে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৭৩-৭৪ সালে বাছাই ভারতীয় দলের হয়ে ইরাণী ট্রফিতে ২টি উইকেট পেয়েছিলেন অমিতাভ। দলের নেতা ছিলেন প্রসন্ন। অন্যান্য সহ খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঘাবড়ি ও চন্দ্রশেখর। প্রতিপক্ষ বোম্বাই।

ইডেনে, সুঁটে ব্যানার্জি বেনিফিট ম্যাচে বেদীর নেতৃত্বাধীন বাছাই একাদশের খেলোয়াড় হিসেবে ভারতীয় টেস্ট দলের চারটি উইকেট পেয়েছিলেন প্রথম ইনিংসে। উইকেট চারটি হোল মানকাদ, ওয়াদেকার, ব্রিজেশ প্যাটেল ও বিশ্বনাথের। দ্বিতীয় ইনিংসে সংগৃহীত উইকেটের সংখ্যা দুটি বিশ্বনাথ ও মানকাদ। ঐ বছর করমারকার বেনিফিট ম্যাচে (পুণা) গাভাসকার ও পার্থ-সারথি শর্মাকেও আউট হতে হয়েছিল অমিতাভের বলেই। ইরাণী ট্রফির পর দলীপ ট্রফির খেলায় দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে অমিতাভ ছিলেন পূর্বাঞ্চলের অন্যতম খেলোয়াড়। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ঐ খেলায় প্রথম ইনিংসে তিনি দুটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে একটি উইকেট পান।

ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে অমিতাভ কালীঘাটের সুনীল দাশগুপ্ত এবং দাতু ফাদকারের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। দুজনই পরম স্নেহে অমিতকে লালন করেছেন। বলা বাহুল্য তাঁদের যৌথ প্রয়াসেই অমিত বাংলার ক্রিকেট অঙ্গনে এসে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। অমিতাভ কলকাতা ময়দানের ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রথমে খেলেছেন ১৯৬৮-৬৯ সালে ক্রিকেট ক্লাব অব ভবানীপুরের হয়ে। পরের বছর দক্ষিণ কলকাতা দলে। তারপর এক বছর কালীঘাটে। এই কালীঘাটে খেলার সময় লীগের আসরে ৯০ রানে বি এন আর-এর ইনিংস মুড়িয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যতঃ অমিতাভই—পাঁচ পাঁচজন জাঁদরেল ব্যাটস-ম্যানকে আউট করে। কালীঘাটের পর চলে আসেন অমিতাভ স্পোর্টিং ইউনিয়নে। বর্তমানে ঐ ক্লাবেই খেলছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে অমিতাভ ভারত বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী সুমা গুহঠাকুরতার স্নেহধন্য। স্নেহের কারণও অবশ্য রয়েছে। সুমাদেবীর পুত্র শ্রীঅমিতের সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু যে সে।

অমিত কি শুধু বোলারই? না, অমিতাভ প্রয়োজনে ভাল ব্যাটসম্যানও বটে। ব্যাটিং দৃঢ়তার নজীর রেখেছেন ১৯৭৩-৭৪ সালে রণজি ট্রফির খেলায় আসামের বিরুদ্ধে। বাংলার প্রথম চারটি উইকেট মাত্র আট রানে পড়ে যাওয়ার পর (গোপাল বসু, রুণী গোস্বামী, রাজা মুখার্জি ও পলাশ নন্দী) রাজু মুখার্জি ও সুব্রত গুহঠাকুরতা দলকে অনেকটা টেনে নিয়ে গেলেন। ওঁরা আউট হওয়ার পর উইকেটে ব্যাট হাতে দাঁড়ালেন অমিতাভ রায় ও দিলীপ দোসী (দুজনেই স্পোর্টিং ইউনিয়নের)। রান টেনে নিয়ে গেলেন ২২০'র কোঠায় (অমিতাভ ৩৯, দিলীপ দোসী ৩৩ অপরাজিত)। এমনি অমিত-বিক্রমে আর একবার ব্যাট ধরেছিলেন ১৯৭৫ সালে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে। দক্ষিণাঞ্চল ৭৫ রানে আউট হয়ে যাওয়ার পর ১০২ রানে পূর্বাঞ্চলের আটটি উইকেট পড়ে যাওয়ার পর রাজু মুখার্জি ও অমিতাভ রান টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন ১৬৯ পর্যন্ত। অমিতাভের সংগ্রহ ২০। খেলায় অবশ্য পূর্বাঞ্চলের পরাজয় ঘটেছিল।

১৯৭৪-৭৫ মরশুমে হায়দরাবাদে মোয়াজ্জেম সুলতান ট্রফিতে এবং ইন্দোরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের হয়ে খেলেছেন। অমিতাভর অভিমত: 'অ্যান্ডি রবার্টসকে নিয়ে যতই হৈচৈ করি না কেন, অ্যান্ডি হল গিলক্রিস্টের ধারে কাছে নন।'

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

গোরাঙ্গ নিয়েছে। ছমাস ধরে সে তক্কে তক্কে ছিল। সেদিন গল্পের আসরে অলৌকিক গল্পের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পর আর দেরী করেনি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গান শুনিয়ে মুগ্ধ নিতাইকে তুলেছে। খিল দেবার নাম করে খিল খুলে রাস্তায় বেরিয়েছে, নামবার সময়ে দরজার নীল পর্দাটা টেনে নিয়ে গেছে পাগড়ি বাঁধবে বলে। পরনের ধুতি গায়ে জড়িয়েছে, মিউজিয়াম থেকে মিশরীয় বাজনা নিয়ে তীক্ষ্ন শব্দ সৃষ্টি করে ফানুস ছেড়ে দিয়েছে দূর থেকে। সোনার মাছ আগেই সরিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল, মাছেরা উড়ে পালিয়েছে।

হুঁশিয়ার গিরিবালা সারদাচরণের অবর্তমানে নিজেই খিল তুলে দিয়েছিল বলেই খিল খুলতে গিয়ে শব্দ করে ফেলে-ছিল গোরাঙ্গ।

খেলার জগতে মেয়ে
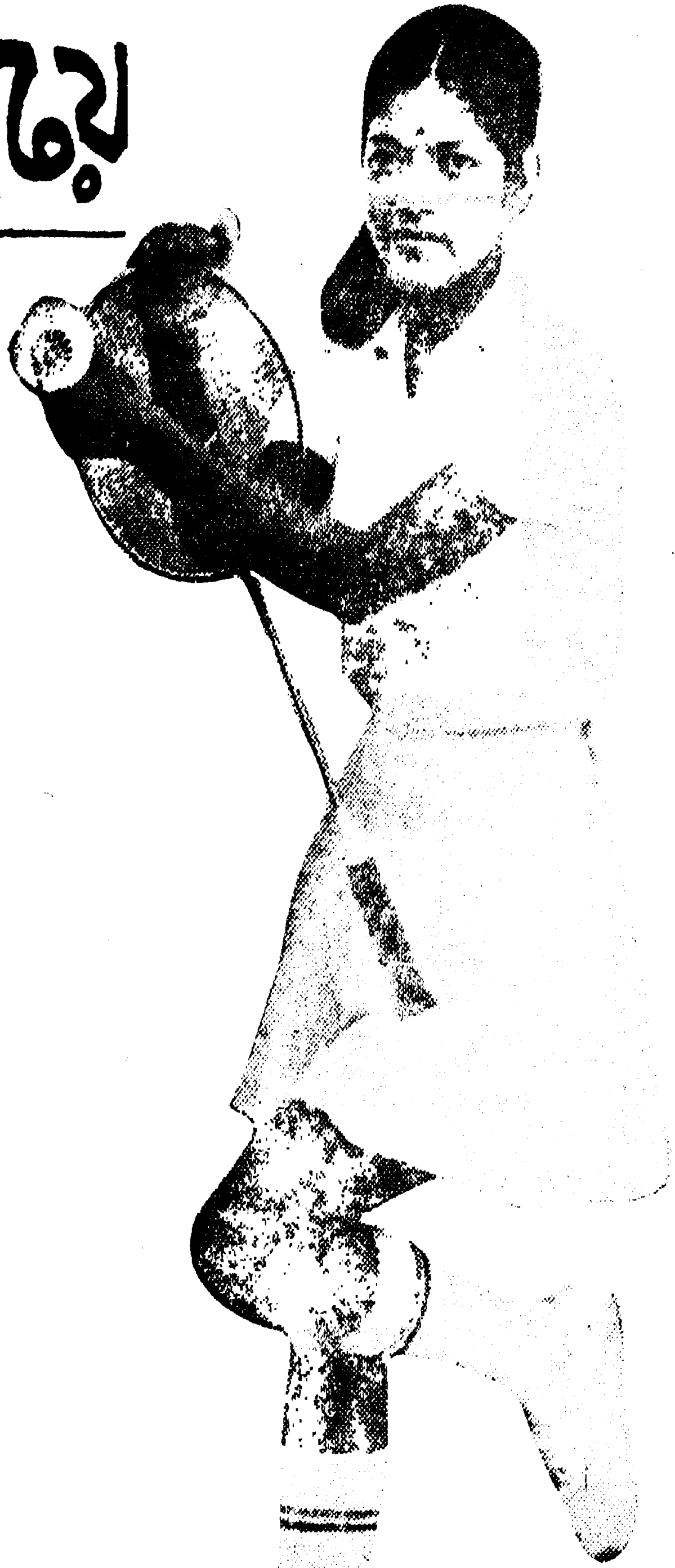
কলকাতায় অনেক পাড়াতেই বাড়ীর পাশে খোলা জমি থাকলে পাড়ার লোকে সেখানে ব্যাডমিন্টন কোর্ট কেটে খেলেন। পার্ক সার্কাসের ওরিয়েন্ট রোডে বাড়ীর কাছে এই রকমই এক ফাঁকা জমিতে কোর্ট তৈরী করে খেলতেন হরিলাল ব্যানার্জী ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা। তাঁদের খেলা শেষ হলে সেসব ছেলেমেয়ে সেই কোর্টে বড়দের বাতিল করা সাটল কক নিয়ে খেলত হরিলালবাবুর মেয়ে তুলসীও থাকত তাদের মধ্যে। বাবা বা মায়ের র‍্যাকেটটা নিয়ে সেও নেমে পড়ত। এইভাবেই তুলসী ব্যানার্জীর ব্যাডমিন্টন খেলার সূত্রপাত। সেটা বোধহয় ১৯৬৬ সাল তুলসী তখন দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। ঐ সময় হরিলালবাবু ওখানে এক প্রদর্শনী ব্যাডমিন্টনের আয়োজন করেন। বাংলার তখনকার বেশ কয়েকজন গুণী খেলোয়াড় ঐ আসরে উপস্থিত হন। মেয়েদের মধ্যে ছিল একমাত্র অনুরাধা সরকার। আর কোন মেয়ে না থাকায় সেদিন ঐ প্রদর্শনী খেলায় তুলসীকে নামান হয় অনুরাধার বিরুদ্ধে। তুলসী ঐ খেলার বিষয়ে বলে জানেন সেদিন আমি অনুরাধাদিকে হারিয়ে দিই। তখন পঙ্কজ-কাকু (পঙ্কজ গুহ) রথীন সোম এঁরা সবাই আমাকে নিয়মিত ব্যাডমিন্টন খেলার উপদেশ দিলেন। তাঁরা বললেন: বাংলায় ব্যাডমিন্টনে কুশলী মেয়ের খুবই অভাব। তুমি খেলা সুরু করে দাও। আমার বাবাও ওঁদের কথায় আমার খেলার ব্যবস্থা করে দেন।

তখন থেকেই তুলসী বাংলার নামী খেলোয়াড় বৈদ্যনাথ দাসের কাছে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিতে থাকে। আর মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলার চর্চা করতে থাকে:

ফল পেতেও দেরী হয়নি। পরের বছরই মাদ্রাজে জাতীয় আসরে তুলসী সুব্রত ব্যানার্জীর সহযোগিতায় মিক্সড ডাবলসে জয়মুকুট লাভ করে।

'৬৮-তে হায়দরাবাদে স্কুল ক্রীড়ার আসরে তুলসী পশ্চিম বাংলার ব্যাডমিন্টন দলের নেত্রী হয়। সঙ্গে ছিল ইলোরা মজুমদার। তুলসী তার সিঙ্গলস খেলায় জেতায় শেষ পর্যন্ত বাংলা দল ব্রোঞ্জ লাভ করে।

ব্যাডমিণ্টনে বিশিষ্ট নাম
তুলসী ব্যানার্জী

৬৮-তেই আসানসোলে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় তুলসী বালিকা বিভাগে তো বটেই মহিলা সিঙ্গলস মহিলা ডাবলস ও মিকসড ডাবলসে বিজয়িনীর সাফল্য লাভ করে দুর্লভ চতুর্মুকুটের অধিকারিণী হয়। তুলসীকে সেদিন সন্ধ্যায় পর পর পাঁচটি খেলায় নামতে হয়েছিল। এ থেকেই বোঝা যায় ওর প্রাণশক্তি কি সুপ্রচুর। তুলসী বালিকা বিভাগে থাকার সময় মহিলা বিভাগেও নেমেছে এবং জয়ী হয়েছে। পরের বছর (৬৯-এ) কলকাতায় জাতীয় ব্যাডমিন্টনের আসর বসে। এবার জুনিয়র (বালিকা) বিভাগে সাফল্যের সূত্রে তুলসী জাতীয় পর্যায়ে ঐ বিভাগে দু নম্বর খেলোয়াড়রূপে চিহ্নিত হয়। ওর বিভাগে পয়লা নম্বরের স্বীকৃতি পেয়েছিল মহারাষ্ট্রের মরীন ম্যাথিয়াস।

১৯৭০-থেকে তুলসী খেলছে বিহার রাজ্যের পক্ষ হয়ে। কোন পরিস্থিতিতে তুলসীকে বাংলা ছেড়ে বিহারের প্রতিনিধিত্ব বেছে নিতে হল সে এক অতি দুঃখজনক ব্যাপার।

আমাদের দেশের তথা রাজ্যের ক্রীড়া-সংস্থাগুলি যতদিন না সুস্থ সচেতন খেলোয়াড়ী বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তিদের পরিচালনাধীনে আসছে ততদিন তুলসীর মত অনেককেই অবিচার ও সাংগঠনিক দুর্নীতির শিকার হতে হবে। সেসময় কয়েকজন প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক তুলসীর প্রতি পশ্চিম বাংলার ব্যাডমিন্টন সংস্থার অবিচারের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। বাংলার পক্ষে খেলতে না পেয়ে তুলসী এখনও খুবই দুঃখিত এবং সংগঠকদের আচরণে ক্ষুব্ধ। ওর বাবা হরিলালবাবুও সংশ্লিষ্ট অনেক ঘটনা বর্ণনা করলেন যা শুনে মনে হয় পশ্চিম বাংলায় ব্যাডমিন্টন সংস্থার কয়েকজন কর্মকর্তার কয়েক বছরের কার্যকলাপের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তা হলেই সাংগঠনিক গলদের সূত্র জানা যাবে। রাজ্য সরকার এখন খেলা-ধূলার নানা শাখার সক্রিয় সহযোগিতা করছেন—তাই এই তদন্ত সরকারী পর্যায়ে হলেই বোধহয় যুক্তিযুক্ত হবে।

যাই হোক ওরিয়েন্ট রোর ৪।২ নম্বর বাড়ীর ৬ নম্বর ফ্ল্যাটে বসে তুলসীর কথা শুনছিলাম। ঘরের পরিবেশ হাল্কা করার জন্য আবার খেলার কথা জিজ্ঞাসা করি।

—তুমি বিহারের হয়ে খেলছ কোন সূত্রে।

—আমার জন্ম দেওঘরে। জন্মসূত্রে আমি বিহার রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারিণী। হ্যাঁ যা বলছিলাম—৭০ সালে পাটনায় বিহার রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশীপে প্রখ্যাত সরোজিনী আপ্তেকে (বর্তমানে গোখতে) ফাইনালে হারিয়ে দিই। ঐ বছরই জব্বলপুরে মধ্যপ্রদেশের প্রধান টুর্ণামেন্টে (মধ্য ভারত ব্যাডমিন্টন) বালিকা বিভাগে বিজয়িনী হই।

কেরলে দক্ষিণাঞ্চলিক আসরেও একই বিভাগে তুলসী বিজয়িণী হয়।

এরপর তুলসী আসে কলেজে। ১৯৭১-এ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিন্টনে তুলসীর ওপর কলকাতা দলের ভার পড়ে। শিলিগুড়িতে পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিযোগিতায় কলকাতাই বিজয়ী হয়। কিন্তু রুরকীতে নিখিল ভারত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় কলকাতা মহারাষ্ট্রের কাছে হেরে যায়। তবে তুলসী এই আসরে তার দুটি সিঙ্গলসে জয়ী হয়েছিল। এই প্রতিনিধিত্বের সূত্রে তুলসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু অর্জন করে। '৭২-এ তুলসী বিহার রাজ্যে মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ান খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখে। বিহার ছাড়াও ঐ বছর গোরক্ষপুরে আন্তঃ আঞ্চলিক আসরে তুলসী ও সরোজিনীকে নিয়ে গঠিত বিহার মহিলাদল রাণার্স-আপ হয়—বিজয়ী হয় মহারাষ্ট্র। পূর্বাঞ্চলে মহিলা বিভাগে বিজয়ী বিহার দলে তুলসীই ছিল প্রধান কাণ্ডারী। গত বছরও বিহারে তুলসী রাজ্য বিজয়িনী হয়েছে—হারিয়েছে সরোজিনী গোখলেকে। তবে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় আসরে তুলসী আবার কলকাতার ছাত্রী দলের নেতৃত্ব করে। এবারও তুলসী সবগুলি সিঙ্গলসে জয়ী হলেও দলের সতীর্থরা সুবিধা করতে না পারায় কলকাতাকে রবিশংকরের কাছে হারতে হয়। রবিশংকরই চ্যাম্পিয়ান হয়। তুলসীর সঙ্গিনী ছিল বিদ্যাসাগরের সুপ্রিয়া সেনগুপ্ত। অনুশীলনের সুযোগ না হওয়ায়—তুলসী বলল, তাছাড়াও খেলায় বোঝাপড়ার অভাবে আমরা ব্যর্থ হলাম।

বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিভাগের কর্তারা তুলসীকে তাদের ওখানে পড়ার প্রস্তাব দেন। তারা ওর ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণ অনুশীলনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতিও দেন। এই প্রসঙ্গে তুলসী জানায় ওখানে বার্ষিক পরীক্ষা কোন খেলোয়াড়ের খেলায় বাধা সৃষ্টি করে না। প্রতিনিধিত্বমূলক খেলার জন্য যখন কোন ছাত্র বা ছাত্রী বাছাই হয় তখন তার পরীক্ষা পরে নেবার ব্যবস্থাও করা হয়। এ-বছর তুলসী বি-এ পার্ট-টু পরীক্ষা দিল। এই সময় উবের কাপের খেলায় দল গঠনের উদ্দেশ্যে বাছাই ও অনুশীলনের জন্য পাতিয়ালার নেতাজী সুভাষ জাতীয় ক্রীড়া শিক্ষায়তন থেকে তুলসীকেও ডাকা হয়েছিল। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার জন্য ওর পক্ষে এই ডাকে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভারী ক্ষোভের সঙ্গে তুলসী বলে দেখুন দিকি পার্ট-টু পরীক্ষার জন্য উবের কাপে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ হারাতে হল। এ সুযোগ কি আর কখনও পাব?

কথায় কথায় রাজ্যের ও দেশের খেলার মানের কথা উঠল।—এ রাজ্যে অনুরোধাচি খুব ভাল খেলেন। কিন্তু ও'র পর আর কোন খেলোয়াড়ের ক্রীড়ামানের তেমন উন্নতি হয়নি। একবার ও'র কাছে আমি হেরে গিয়েছিলাম। তবে পরে ও'কে হারিয়েছি। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বোম্বাই বা মহারাষ্ট্রের মেয়েদের মান বেশ উঁচু। তবে মিনাক্ষী দময়ন্তী সুবেদার বা সরোজিনী বোনেদের তুলনায় এখনকার মেয়েদের ক্রীড়ামান নীচুতেই নেমে গেছে। এখন যে কেউ যে কোন খেলোয়াড়কে হারিয়ে দিতে পারে। মহারাষ্ট্রের ছেলেমেয়েরা খেলার অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের যেরকম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে তা দেখলে হিংসা হয়। ওদের সংগঠকরাও ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তুলসী আফশোষের সুরে বলে, মহারাষ্ট্রে প্রায় একশটি আচ্ছাদিত কোর্ট আছে। ওরা সারা বছর অনুশীলন করতে পায়। আর আমাদের? এক ওয়াই এম সি এ (চৌরঙ্গী) ছাড়া আর কোথাও সে-ব্যবস্থা নেই। আমরা যদি মহারাষ্ট্রের মত সুযোগ-সুবিধা পেতাম তাহলে নিশ্চয়ই অনেক বেশী উন্নতি করতে পারতাম। এখানে সুযোগ-সুবিধার চেয়ে বাধাই বেশী!

তুলসী বলে, আচ্ছা বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেলে ঐ স্টেডিয়ামে তো ব্যাডমিন্টন খেলা যায়। বেশ ভাল কভার্ড কোর্ট হবে।

তুলসী নানা জায়গায় ছোট-বড় অনেক প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হয়েছে। দেশের নানা প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় যোগদানের আমন্ত্রণও পেয়েছে। শীগগিরই কাটনী যাবে। ওখানে সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় খেলাতে আমন্ত্রণ এসেছে।

তুলসী একটি খাঁটি খেলোয়াড়ী বিবেকসম্পন্ন কুশলী মেয়ে। ওর অভাবে বাংলার ব্যাডমিন্টনের ক্ষতিই হচ্ছে। বর্তমানে তুলসী ক্রিকেট খেলা শিখতে আগ্রহী। কিন্তু কিছু টেবল টেনিসও খেলে। ওই বাড়ীর ছোট মেয়ে, ওর মেজদিদি নূপুর আকাশবাণীর গানের আসরে নিয়মিত গান গায়। ওরা পাঁচ ভাই তিন বোন। বড়দিদি বিবাহিতা। যেখানেই তুলসী খেলতে যায় বাবা-মা সঙ্গে যান। ও'রা মেয়ের খেলা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর খুব নজর রাখেন।

পরীক্ষা শেষ হবার পরই আর কালবিলম্ব না করে তুলসী রোজ অনুশীলন করছে। যখন ওদের বাড়ী উপস্থিত হলাম তখন ও সবেমাত্র পার্ক সার্কাস ময়দানে দৌড় শেষ করে এসেছে। তাছাড়া পিটি ও দড়ি লাফও নিয়মিত চলছে। বিকালে খেলা ওয়াই এম সি এ (চৌরঙ্গী)-তে। তুলসী তার বর্তমান প্রশিক্ষক সুকুমার দেবের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে।

বিদায় নেবার আগে শুভেচ্ছা জানিয়ে এলাম যেন সব বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে স্তরে স্তরে জয়ের সোপান ধরে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয় ওর ক্রীড়াজীবন।

—অমর

সিমী

একান্ত সাক্ষাৎকার

সিমী

প্রঃ ভারতীয় ছায়াচিত্রে যৌনতা, নগ্নতা, অন্তরঙ্গতার কী প্রয়োজন আছে? 'সিদ্ধার্থ' ছবিতে আপনি যৌনাবেদনপূর্ণ এবং নগ্ন দৃশ্যে অভিনয় করতে রাজী হলেন কেন?

উঃ হিন্দী ছায়াচিত্রে বকস অফিসের জন্যে আজকাল যৌনাবেগপূর্ণ দৃশ্যের আধিক্য দেখা যাচ্ছে। 'সিদ্ধার্থ' ছবিতে রাজনর্তকীর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে যে দেহসৌষ্ঠব প্রয়োজন, অনেক শিল্পীরই সেটা নেই। সেজন্যে তারা ঐ ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজী হননি।

প্রঃ 'সিদ্ধার্থ' ছবির একটি নগ্নচিত্র বম্বের এক চলচ্চিত্র পত্রিকার প্রচ্ছদে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে আপনি যে মন্তব্য করেছিলেন সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করবেন কী?

উঃ প্রথম ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লী পরে ফিল্ম
[illegible]

[illegible]

ববিতা

ছবির স্থিরচিত্রে আমাকে নগ্ন দেখানো হয়েছে। ওখানেই আমার আপত্তি ছিল। এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্যে আমি কোর্টে গিয়েছিলাম। আসলে নগ্নতার বাস্তব রূপায়ণের জন্যে আমি স্কিন কলার কস্টিউম ব্যবহার করেছিলাম সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে অভিনয় করিনি।

প্রঃ আপনি কী বিবাহের আগে রোমান্সের পক্ষপাতী? অথবা গুরুজনদের পছন্দ মত পাত্রকেই বিবাহ করবেন? চলচ্চিত্র-লোকের কারুকে কী বিবাহ করবেন বলে ঠিক করেছেন?

উঃ রোমান্স করেই হোক বা সব কিছু জেনেশুনে হোক বিবাহ করার পক্ষপাতী। চলচ্চিত্রশিল্পের সংগে ছাড়া কাউকে বিবাহ করার কথা ভাবছি না।

প্রঃ মৃণাল সেনের 'পদাতিক' ছবির পর আর কোন বাংলা ছবিতে অভিনয় করার কথা চিন্তা করছেন কী?

উঃ 'পদাতিক'এ অবাংগালী মহিলা হিসাবে মানিয়ে নিয়েছি। না হলে ভালো বাংলা না জানার জন্যে বিপদে পড়তে হোত। এবার ভালভাবে বাংলা না শিখে আর কোন ছবিতে অভিনয় করবো না। এখন কলকাতারই তরুণ পরিচালক গিরীশ-রঙ্গনের হিন্দী ছবি 'ডাকবাংলো'তে অভিনয় করছি।

ওয়াহিদা রেহমান

রেহানা সুলতান

সায়রাবানু

সায়রা বানু

প্রঃ 'ভিক্টোরিয়া ২০৩' ছবি দেখে এবং 'সাজিস' এবং 'কালাবাজার' ছবির স্থিরচিত্র দেখে মনে হয় আপনি ছবিতে যৌনতা ও নগ্নতার ব্যাপারে বিশেষ কিছু চিন্তা না করেই অভিনয় করেছেন। সত্যই কি তাই?

উঃ হিন্দী ছবিতে প্রযোজক পরিবেশক অর্থলগ্নীকারী প্রভৃতির একটা ব্যাপার রয়েছে। (কাহিনীকার বা পরিচালকের কথা বাদই দিলাম)। সকলের সন্তুষ্টির জন্যেই আমাকে এই জাতীয় ছবিতে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অভিনয়ে রাজী হতে হয়েছে। আমার অনেক সময় আলোক-চিত্রের বিশেষ কারসাজির জন্যে আমাকে যৌনতার প্রতিমূর্তি মনে হতে পারে।

প্রঃ দিলীপকুমারের মতো বিখ্যাত নায়কের সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় আপনি নিশ্চয়ই সুখী?

উঃ এমন দরদী শিল্পী পেলে সব অভিনেত্রীই সুখী হয়। আমার সেখানে অসুখী হবার কি কারণ থাকতে পারে।

প্রঃ যৌনতা ও নগ্নতার প্রতীক হিসাবে ছবিতে আপনাকে দেখে আপনার মা ও অন্যান্যরা ঐ জাতীয় ছবিতে অভিনয় করতে নিষেধ করেন না?

উঃ ব্যক্তিগত জীবনে আমি রোমান্টিসিজমের পক্ষপাতী। তবে প্রয়োজনে তেমন চরিত্রে অভিনয় করতেও আমার আপত্তি নেই।

প্রঃ রুপোলী পর্দায় দিলীপকুমার আপনার সঙ্গে অন্য নায়কের অন্তরঙ্গ বা যৌনাবেদনমূলক দৃশ্যে অভিনয় করার ব্যাপারে আপনাকে আপত্তি করেন না?

উঃ আমরা আমাদের নিজের নিজের ছবির অভিনীত চরিত্র নিয়ে আলোচনা করি না। কিন্তু আমরা একত্রে যেসব ছবিতে ('গোপী, 'সাগিনা', 'বৈরাগী') অভিনয় করছি সেসব ছবির অন্তরঙ্গ দৃশ্য নিয়ে আলোচনা করেছি এবং নিজেদের ত্রুটি সংশোধন করবার চেষ্টা করেছি।

প্রঃ বিবাহিত জীবনে অন্যান্য তারকা দম্পতির মতো সার্থক হতে পেরেছেন?

উঃ আমি খ্যাতনামা নায়কের স্ত্রী এবং আমিও বহু ছবিতে অভিনয় করেছি ওঁর ট্রাজিক অভিনয় যেমন সকলের প্রশংসা পায় তেমনি রোমান্টিক ভূমিকায় আমার অভিনয়ও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

প্রঃ বাংলা ছবিতে অভিনয় করার কথা কি চিন্তা করছেন?

উঃ তপন সিনহার 'সাগিনা' ছবিতে ললিতার চরিত্রে অভিনয় করে আনন্দ পেয়েছি। এখন স্বর্গত বিমল রায়ের শেষ ছবি আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'চৈতালী' ছবিতে নায়িকার পার্ট করছি।

ওয়াহিদা রেহমান

প্রশ্ন: কনরড রুকসের 'সিদ্ধার্থ' ছবিতে যৌনাবেদনময়ী রাজনর্তকী হতে রাজী হলেন না কেন? এ ছবির যৌনতা ও নগ্নতাকে মেনে নিলেন না কেন?

উত্তর: সম্ভবত কনরড রুকস নিউইয়র্কে 'দি গাইড' ছবিতে নর্তকীর ভূমিকায় আমার অভিনয় দেখে ওঁর 'সিদ্ধার্থ' ছবিতে অভিনয়ের জন্যে অনুরোধ করেন। দুই নর্তকী চরিত্রের প্রভেদ উনি বোঝেন নি, বুঝলে এরকম ভুল করতেন না। কোন ভারতীয় রমণীর পক্ষে নগ্ন বা অর্ধনগ্ন হয়ে কলাকুশলীর সামনে অভিনয় করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে আমার মতো অভিনেত্রীর পক্ষে। ভারতীয় ছবিতে নিজেদের কৃষ্টি ও সভ্যতা বিসর্জন দিয়ে বিদেশের লোকেদের মনোরঞ্জন করার পক্ষপাতী আমি নই। সেজন্যেই রাজী হইনি।

প্রঃ বম্বের পত্র-পত্রিকায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়কের সঙ্গে আপনার রোমান্স চলছে এজাতীয় খবর ছাপা হোত—এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী? আপনি কী বিবাহের আগে রোমান্সের পক্ষপাতী?

উঃ আপনি নিশ্চয়ই 'দিলীপকুমারকে কেন্দ্র করেই এই প্রশ্ন করেছেন তখন আমরা একাধিক ছবিতে অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করেছি। সুতরাং সেই অন্তরঙ্গতাকে পত্র-পত্রিকাগুলি রোমান্স হিসাবে প্রচার করতো। শিল্পী হিসাবে আজও ওঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। ব্যক্তিগত জীবনে রোমান্স করে বিবাহের চেয়ে গুরুজনদের মতামতের উপর নির্ভর করে জীবনসঙ্গী বেছে নিতে চাই।

প্রঃ ফরিদ আহমেদের সঙ্গে বাগদান হয়েও বিবাহটা ভেঙে গেল কেন?

উঃ আমি এবং আমাদের পরিবারের কেউই জানতো না যে ফরিদ আহমেদ বিবাহিত এবং সন্তানের জনক। জেনেও কী কেউ এরকম ভুল করে?

প্রঃ বাংলা ছবিতে এবং মালয়ালাম ছবিতে আপনার অভিনয় করতে কেমন লাগে? আপনি কী ছবিতে যৌনতা ও নগ্নতাকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে চান?

উঃ মানিকদার অনুরোধে 'অভিযান' ছবিতে অবাঙ্গালী চরিত্রে অভিনয় করেছি। বর্তমানে স্বদেশ সরকারের 'জীবন যে রকম' ছবিতে অভিনয় করছি। যৌনতা ও নগ্নতা [illegible] দৃশ্যগুলি খোলাখুলি না দেখিয়েও আমি 'আজ কী রাধা' ছবিতে উঁচু স্তরের কলগার্ল-এর চরিত্রে অভিনয় করছি। সুতরাং সবকিছুই নির্ভর করছে কাহিনী চিত্রনাট্য এবং প্রযোজক ও পরিচালকদের মতামতের উপর।

হেমা মালিনী

প্রঃ ছায়াচিত্রে যৌনতা নগ্নতা বা অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করার ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কী?

উঃ যৌনতা, নগ্নতা, শয্যাদৃশ্য বা অন্তরঙ্গ দৃশ্যে আমি অভিনয় করবার খুব প্রয়োজন বোধ করি না। এস ডি নারাং এর 'দো ঠগ' সুশীল মজুমদারের 'লাল পাথর' ছবিতে শয্যাদৃশ্যের পরিকল্পনা ছিল। 'প্রেমনগরে'ও অন্তরঙ্গ দৃশ্য আছে। সেটা ঠিক অশালীন নয়। যৌনতা বা নগ্নতাকে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি।

প্রঃ সঞ্জীবকুমারের সঙ্গে আপনার রোমান্স চলছে, এবারে কী আপনারা অন্যান্য নায়ক-নায়িকাদের মত ঘর বাঁধবেন?

উঃ ওঁকে আমার ভালো লাগে, ভালো লাগা আর ভালোবাসা এক নয়। বিবাহের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মা-এর উপর নির্ভরশীল। আমরা 'ধূপছাঁও' ছবিতে একত্রে অভিনয় করছি। কিন্তু বিয়ের কথা ভাবছি না।

প্রঃ বম্বের নায়কদের মধ্যে ধর্মেন্দ্রের সঙ্গেই আপনি সর্বাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। অভিনয়কালীন আপনাদের মধ্যে কোন রোমান্সের সৃষ্টি হয়নি?

উঃ ধর্মেন্দ্র বিবাহিত ও একাধিক সন্তানের জনক এবং বুদ্ধিমান ও সৎ। প্রথম ছবি থেকেই আমরা একে অপরের বন্ধু। সুতরাং আমরা 'বন্ধুত্ব' নষ্ট করতে চাই না!

রেহানা সুলতান

প্রঃ 'চেতনা' ও 'দস্তাক' ছবিতে যৌনাবেদন ও নগ্নতাকে উপস্থিত করা হয়েছিল। ছবিতে এজাতীয় দৃশ্য রূপায়ণের ব্যাপারে আপনি কোন অসুবিধা বোধ করেননি?

উঃ বি আর ইশারার 'চেতনা'তে আমার ভূমিকা ছিল এক 'কল গার্ল'-এর। সুতরাং কাহিনীর বাস্তব রূপায়ণের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু উপস্থিত করার চেষ্টা করেছি। রাজেন্দ্র সিং বেদীর 'দস্তাক'-এর নগ্নতাও এক মুহূর্তের ব্যাপার। ফিল্ম ইনস্টিটিউটে থাকতে এজাতীয় চরিত্রে অভিনয়ের ব্যাপারে তালিম পেয়েছিলাম সুতরাং অসুবিধা হবার কথা নয়।

প্রঃ চলচ্চিত্রে ইদানীং যৌনতা নগ্নতার পাশাপাশি চুম্বন ও শয্যাদৃশ্য উপস্থিত করা হচ্ছে এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

উঃ ভারতীয় নারীর চরিত্রে শয্যাদৃশ্য বা চুম্বনের কোন প্রয়োজন নেই। বিদেশী রমণীর ভূমিকায় চিত্রনাট্যের বাস্তবতার জন্যে অবশ্য এসব চিন্তা করা যেতে পারে।

প্রঃ বি আর ইশারার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী? আপনি বিয়ের কথা ভাবছেন কী? বাংলা ছবিতে অভিনয় করার ব্যাপারে আপনার ইচ্ছা কী?

উঃ বি আর ইশারাই আমাকে সর্বপ্রথম অভিনয় করার সুযোগ দেন। ওঁকে গুরুজনের মতোই শ্রদ্ধা করি। ওঁর 'দিল কী রাহে'তে আমার অভিনয় দেখবেন। বিয়ের কথা ভাবছি না। এসবের জন্যে আমার বাবাই যা ভাববার ভাবছেন। 'বর্ণ বিবর্ণ' ছবিতে অভিনয় করিনি। সম্প্রতি 'প্রতীক' ছবির কাজ শুরু করেছি।

ববিতা

প্রঃ বাংলাদেশের ছবিতে ধীরে ধীরে হিন্দী ছবির অনুকরণে যৌনাবেদনমূলক দৃশ্য ক্যাবারে সেকস ও ভায়োলেন্স আসছে। এ বিষয়ে আপনার কী মনে হয়?

উঃ বাংলাদেশের ছবিতে বাস্তবতার জন্যে ঐজাতীয় দৃশ্য পরিহার করা উচিত।

প্রঃ ভারতীয় তথা পশ্চিম বাংলার ছবিতে অভিনয় করতে চান?

উঃ জানুয়ারী ১৯৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের বাইরের ছবিতে অভিনয় করা সম্ভব নয়। আর অভিনয় করলে কেবল প্রখ্যাত পরিচালকদের ছবিতে অভিনয় করবো।

—সাক্ষাৎকার : অশোক মজুমদার

সংসার সীমান্তে / সৌমিত্র : সন্ধ্যা রায়

শিল্পী সাজ্জাদ হোসেন

'—আকাশ ছিল, রং ছিল, ভালোবাসা ছিল, আর সব মিলিয়ে ছিল আমার জীবন আমার স্বপ্নের বেড়া। আজ আর তা নেই। আমার আমির মধ্যে যতক্ষণ আছি সানাইয়ের সুর ততক্ষণই তারপর সব ফাঁকা। যতদিন আমার দম আছে, কলজের জোর আছে সানাইয়ের ফুঁ ততদিনই সুরে বলবে তারপর আমার কথা যাবে ফুরিয়ে আসরে আসরে সাজ্জাদ হোসেনের সানাই শুনে মুগ্ধ বিস্ময়ে তারিফ কেউ করবে না।'

কিছুটা দম নিলেন। ভাবলেন। কথাগুলোর মধ্যে বিষণ্ণতার দমকা বাতাস। মনে হোলো গভীর আত্মোপলব্ধি থেকে শিল্পী কিছু বলতে চান। বলতে চান ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে কোথায় তাঁর দ্বন্দ্ব। কিংবা সুরের সঙ্গে মনের কোথায় অমিল। অথবা অন্য কিছু। তাঁর মনের কথাটা আঁচ করার চেষ্টা করি। বুঝতে চেষ্টা করি সত্যিকারের দুঃখটা কোথায়। আমার রিডিংটা বাধা পেলো। বললেন—

এইতো চল্লিশ বছরের ওপর কলকাতায় আছি। কিন্তু কি করতে পেরেছি বলুন। সানাই বাজাবার ডাক যেখান থেকেই এসেছে—গেছি। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছি। কিন্তু বয়স যত বাড়ছে সেই অদম্য উৎসাহ আসছে কমে। আর সানাই বাজিয়েদের অসুবিধেটা কোথায় জানেন? বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকের জোর কমে গেলে সানাই বাজাতে কষ্ট হয়, দম যায় কমে, ফুঁতে সেই আমেজ মেলে না। ভালো খাবারদাবার খেয়ে শরীর ঠিক রাখতে না পারলে তা কি সম্ভব? বলুন? আর এখন যা বাজার পড়েছে তাতে তো বুঝতেই পারেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—

—আপনার ছেলেরা সানাই বাজাচ্ছে?

—না, এ লাইনে ওদের কারুকে দিইনি। সবই তো বোঝেন, দেখেছেন তো অবস্থা। সানাই বাজালে ভবিষ্যত কোথায়?

কঠিন বাস্তব শিল্পীর মানসলোকের অন্দর মহলে ঘা মেরেছে। নাহলে কয়েক পুরুষের যে সাধনা তা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে এ কি কম কথা? কিন্তু তাই হয়েছে। সাজ্জাদ হোসেনের ছয় ছেলে আর দুই মেয়ে। ছেলেদের কারুকেই সানাই শেখাননি। কেউ ব্যবসা করছে কেউ পড়ছে। গান-বাজনার ধার দিয়েও কেউ যায়নি। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় জামাই বিসমিল্লা খাঁর ছেলে নৈয়ার হোসেন খাঁ আর সুপরিচিত সানাই বাদক আলি আমেদ হোসেন ওঁর মেজ জামাই। সাজ্জাদ হোসেন নিজে সম্পর্কে বিসমিল্লার ভগ্নীপতি। প্রথম পক্ষের সেই স্ত্রী মারা গেছেন। তারপর আবার বিয়েও করেছেন।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। সাজ্জাদ হোসেন তখন কিশোর মাত্র। বড় দাদা মনসব আলী সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। দাদার পেছনে বসে ফুঁ দেওয়া ছাড়া একা আসরে বাজাবার ছাড়পত্র তখনও মেলেনি। পাথুরিয়াঘাটার প্রদ্যোৎনারায়ণ ঠাকুর সেবার বেনারসে বেড়াতে গেছেন। হঠাৎ একদিন মনসব আলীর বাজনা শুনে ভীষণ ভালো লেগে গেলো। কলকাতায় ফেরার সময় মনসব আলীকে একেবারে সঙ্গে করেই নিয়ে চলে এলেন। পাথুরিয়াঘাটায় প্রদ্যোৎনারায়ণ তাঁর সুবিশাল মহলের এক প্রান্তে তাঁর থাকার ব্যবস্থা ক[রে] দিলেন। দাদার সঙ্গে সাজ্জাদ হোসে[ন] সেই যে কলকাতায় এলেন তারপর আর ফিরে যাননি। হাজার দুঃখকষ্ট, বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করেও এখানেই থেকে গেছেন। পাথুরিয়াঘাটার ঐ রাজবাড়ীও ছেড়েছেন! কলুটোলায় ভাড়া ঘরে সংসার পেতে বসেছেন। সে-ও আজ বেশ কয়েক বছর হতে চলল।

সানাই বাজনায় সাজ্জাদ হোসেন ব[া] তাঁর দাদা আলী হোসেনই কেবল সুনাম অর্জন করেননি। বড়দা মনসব আলীও সানাই বাজিয়ে হিসেবে খুব নাম করে ছিলেন। শোনা যায় এঁর বাজনার নাকি তুলনা মেলে না। আলী হোসেন আ[র] সাজ্জাদ হোসেনের সানাইয়ের প্রকৃত শিক্ষ[া] এঁরই কাছে। বাবা ছোটে মিঞা আর জ্যেঠ মশাই বড়ে মিঞার মতো গুণী শিল্প[ী] আজ বিরল। এঁরা ছিলেন অনেকটা সাধ[ু] প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু ছোটবেলাতেই এঁ[দের]

এঁদের স্নেহচ্ছায়া হারান। তাই এঁদের যা কিছু তালিম বড়ভাই মনসব আলীর কাছে। সাজ্জাদ হোসেন সঙ্গীত শিক্ষার জন্যে পরবর্তী জীবনে ঘুরেছেন অনেক—মন যেখানে চেয়েছে সেখানেই কিছু না কিছু তালিম নিয়েছেন। কিন্তু আঁকড়ে পড়ে থাকতে পারেন নি। সেটা অবশ্য ঐ ভেতরের মানুষটার দোষ নয়, দোষটা বাইরের, বস্তুগ্রাহ্য জগতের। তিনি গেছেন রামপুরে আচ্ছন মহারাজের কাছে তবলা শিখতে। শিখেছেন। তানসেনের বংশধর এবং বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাজিয়ে মুনেশ্বর দয়ালের গুরু জামাল সেনের কাছে 'রাগ' রূপের তালিম নেন। তারপর আরো নানান শিল্পী আছেন যাঁদের কাছে তালিম নেওয়ার সুযোগ না পেলেও দূরে থেকে শুনে শুনে কিছু নেওয়ার চেষ্টা করেছেন, মনে মনে যাদের গুরুপ্রণাম দিয়ে এসেছেন। সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী ওঁর কাছে এমনি এক মহান শিল্পী—যাঁর সুরালোপন শুনে আপন ধ্যানধারণাকে আরো স্বচ্ছ আরো ভাস্বর করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন।

বাষট্টি বছরের প্রবীণ সানাই বাদক সাজ্জাদ হোসেন অনেক দেখেছেন, শুনেছেন, বাজিয়েছেন। কিন্তু কয়েকটি অনুষ্ঠান তাঁর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। যেমন একবার শান্তিনিকেতন থেকে আমন্ত্রণ এলো (সালটা ঠিক মনে করতে পারলেন না)। গেলেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম ঘটেছে। ব্যক্তিগতভাবে উনি কারুকেই চেনেন না। তবে চালচলন আদর আপ্যায়নে বুঝলেন যে এঁরা প্রত্যেকেই খুব মান্যগণ্য লোক। বাজনা ধরেছেন। এমন সময় চমকে উঠলেন একটি লোককে দেখে। তিনি আর কেউ নন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। শ্রোতার আসনে তিনি বসলেন। সারাক্ষণ ওঁর বাজনা শুনলেন। যাবার সময় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেলেন। সাজ্জাদ হোসেনের জীবনে এ এক ভাস্বর মুহূর্ত। আর একটা অনুষ্ঠানে কিছু লোকের সমাগম হয়েছে। যাকে ঘিরে সবাই বসে আছেন সাজ্জাদ দূরে থেকে সেই মানুষটিকে দেখছেন। ভেতরে ভেতরে একটা সঙ্কোচ ভাব। না জানি ঐ মানুষটির কেমন লাগছে। কিন্তু শেষে ওঁর বাজনায় মুগ্ধ হয়ে আবার শোনার জন্যে ব্যাকুলতা। সম্ভবত মালকোষ বাজিয়ে সাজ্জাদ হোসেন ঐ মহামান্য শ্রোতার সেই ব্যাকুলতা পূরণ করেছিলেন এবং তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। সেদিনের কথা ওঁর মনে পড়ে যখনই চুপ করে ভাবতে থাকেন, ঋজুদেহী সেই পুরুষটির চেহারাতে যে কি এক অসাধারণত্ব ছিল যা বলে বোঝানো যায় না। এই অসামান্য পুরুষটি হচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ।

একটা ব্যাপারে সাজ্জাদ হোসেন প্রচণ্ড প্রত্যয়হীন। বললেন—গানবাজনা যা হবার তা হয়ে গেছে। নতুন করে আর কিছু হবে বলে তো মনে হয় না। তখন সত্যিকারের গুণীর কদর ছিল, তাঁদের জন্যে কিছু ধনী লোক ছিলেন যাঁরা শিল্প ও শিল্পী দুয়েরই মর্যাদা বুঝতেন এবং সেই ক্ষমতা রাখতেন। কিন্তু এখন কি তা আছে? কোনো সত্যিকারের গুণীকে কদর করার মতো প্রকৃত সমঝদার নেই। বিশেষ করে ইয়ং আর্টিস্ট ভালো গাইলে বা বাজালেও বিনা স্বার্থে তার গুণপনাকে তুলে ধরা বা তাকে শিল্প নিয়ে বাঁচতে দেওয়ার মানবতাটুকু একেবারেই নেই। সে কারণে গানবাজনা আর গুণীর কদর (নির্ভেজালভাবে) যা হবার তা হয়ে গেছে।

খুব খাঁটী কথা। সাজ্জাদ হোসেনের এই যুক্তি একেবারে অকাট্য। ওকে মিথ্যে প্রমাণ করার কোনো সত্য আমার হাতে নেই। গান বাজনাকে জীবনের সম্পদ হিসেবে মেনে নেবে কিংবা তার মধ্যে দিয়ে কোনো প্রতিভা মহীরুহের মতো দাঁড়িয়ে দেশ বা জাতির শৈল্পিক সত্তাকে বাঁচার পথ দেখাবে এমন অবস্থা কোথায়? সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটের যতই পরিবর্তন হোক কোন দেশ তার সংস্কৃতির প্রসার পথকে রুদ্ধ করতে চায়? আমাদের মধ্যে তাই হচ্ছে। সাজ্জাদ হোসেনের আর একটা কথা খুবই দামী—একেবারে স্থির। তা হোলো শিল্প দুনিয়ায় এই দ্বন্দ্ব মূলত দুটি স্তরে। যার মধ্যে প্রতিভা আছে, অর্থের যন্ত্রণা তার প্রচণ্ড। আর প্রতিভার প্রয়োজন নেই কেবল শোনার অভ্যাসটুকু থাকলেই স্টেজ মিলছে যেখানে সেখানে অর্থের অভিমান আছে। বুঝলাম এই সত্য উপলব্ধির জন্যেই তিনি তাঁর ছেলেদের আর সুরের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার সুযোগ দেন নি।

মানুষ হিসেবে সাজ্জাদ হোসেন অত্যন্ত নিরহংকারী আর সাদা-মাটা। চালচলন পোষাক-আসাক, কথাবার্ত্তা কোথাও এতটুকু অহমিকার ছাপ নেই কোনো অহেতুক গাম্ভীর্য। যাঁর সানাই হাজারো লোকের মনে খুশীর জোয়ার নিয়ে আসে সেই মানুষটি সব সময় যেন সেই জোয়ারেই ভেসে চলেছেন। কোথাও তার ব্যত্যয় নেই। হয়তো এই কারণেই সকলেই তাঁকে আগে-ভাগে খোঁজে। তাই বিয়েবাড়ী পূজামণ্ডপ সভাস্থল আবার সঙ্গীত সম্মেলনের মঞ্চ কোথাও যেতে আপত্তি নেই। কলকাতার সদারংগ, তানসেন এবং সেকালের অলইণ্ডিয়া অলবেঙ্গল থেকে শুরু করে ছোট-খাট গানের আসরেও তাঁর রাগালাপ সুররসিকদের মন কেড়েছে। বড় বড় সভা বা অধিবেশন যেমন বিধাননগরে কংগ্রেস অধিবেশনের গুরুর সুর তিনিই ধরেছিলেন। আবার কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষের কন্যার বিয়েতে সমস্ত পরিমণ্ডলে এক অনবদ্য আনন্দের প্লাবন তুলেছিলেন এই প্রবীণ সানাই শিল্পী সাজ্জাদ হোসেন।

ছন্দের বৈচিত্র্যের সঙ্গে জীবনের ছন্দ এমনি নানা তালে-লয়ে বয়ে চলেছে। একের সঙ্গে অন্যের বহির্মিল না থাকলেও ফল্গু স্রোতের মতো অন্তঃ মিল একটা আছে যেখানে সুরশিল্পীরা আমার আমিকে খুঁজে নেবার চেষ্টা করেন। আজীবন ধরে চলে এই চেষ্টা। যিনি পেয়ে যান তিনি পরম সৌভাগ্যের অধিকারী। তেমন শিল্পী কমই জন্মান। বেশীর ভাগই ঐ সুরের আমিকে খোঁজার চেষ্টায় জীবন কাটিয়ে দেন। আর হয়তো বা সে কারণেই মনের সঙ্গে বোঝার একটা অমিল থেকেই যায়। যতটুকু জানি যতটুকু বুঝি সাজ্জাদ হোসেনও এমনি ভাবেই এগিয়ে চলেছেন—আরও এগোবেন শেষকালে হয়তো বা সুরের মধ্যে সেই আমিকে খুঁজে পাবেন আর না পেলেও ক্ষতি নেই। কেননা সুরই যার সব সেখানে কি ভাবের অভাব ঘটে?

সাক্ষাৎকার :

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃণ্ময়ানব কর্তার মাধবী চক্রবর্তী

প্রেক্ষাগৃহ

মোহিনী সাজে অপর্ণা সেন তখন এমরয়ডারি করছেন। মোহিনীর রূপের ছটা, চোখের তির্যক চাহনী, নিরুচ্চার অভিব্যক্তি স্পষ্ট করে দেয় — তোমার মত পুরুষকে আমি ঘৃণা করি। কোন দাম দিই না।...মোহিনী—সাগরের তলায় ডোবা বরফ পাহাড়ের মতন। বাইরে থেকে তাকে যতো দেখা যায় তার চেয়ে বেশী সে আড়ালে থাকে। তার চরিত্রের যেটা লুকোনো জায়গা সেখানে সে বড় বিচিত্র। যত বয়েস বেড়েছে ততই তার লুকোন চরিত্রটা বড় হয়েছে। সে অসম্ভব বুদ্ধিমতী. তার স্বভাবে ছেলেমানুষীর চেয়ে গাম্ভীর্য বরাবরই বেশী. তার সাহসের অভাব নেই। মানুষ দেখে দেখে তাকে চিনতে হয়। যে কোন বয়সেই সে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। দুশ্চরিত্র লম্পট স্বামীর (ভূমিকায় : নিমু ভৌমিক) সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে আসছে, শ্বশুর বাড়ী ত্যাগ করে আসতে তার মনে দ্বিধা আসে নি। তার কথা হল : কার কী ঘটবে, কে কবে কুলে শ্বশুরে সাধু হয়ে যাবে তার জন্য [illegible] আমি জন্মাই নি। আমি যা [illegible] তাই করেছি। একটা কুণ্ঠ রোগী ঝোলা করে বয়ে বেড়াতে পারলেই কি মেয়ে জন্ম সার্থক হয়?...অনুক্ষণ এই কথাগুলো মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বাজতে পারে। স্তব্ধ আঁধার করা ঘরে প্রতিধ্বনি হতে পারে।

কোনো কোনো অঘটন সংসারে ঘটে যায়। কেন ঘটে যায় কেউ জানে না। যেমন মোহিনীর জীবন থেকে শচিপতির চলে যাওয়া, অবিনের আসা। হাসপাতাল। মস্ত ঘর. সার সার বিছানা পাতা. বড় বড় জানলা অনেক উঁচু থেকে পাখা ঝুলছে, বাতি ঝুলছে. নানা বয়সের রোগীরা নার্সেরা. সমস্ত ঘরটা যেন ঠান্ডা. ওষুধের গন্ধ ঘরের বাতাসে। শচিপতি বিছানায় শুয়ে থাকে—গায়ে শাদা চাদর। মোহিনীর কাছে শচিপতি চিরদিনের অক্ষয় পুরুষ। তার না আছে সাহস, না তেজ, না উদাম। তাকে দেখে মেয়েদের মায়া হতে পারে. মন ভরে না। শচিপতি জীবনের ভয়টাকে এড়াবার জন্যে মৃত্যুর ভয় মাথায় নিয়ে বসে আছেন। অবিনের ভাষায় : তিনি সকালে ঘুম থেকে উঠে মাথার বালিশের তলা থেকে যে চশমাটা চোখে পরে নেন সেটা হল ওই মৃত্যুর।

কে এই অবিন? তার সঙ্গে ঝড়ের তুলনা চলে। অন্তত মোহিনীর কাছে।... অবিন সে জাতের পুরুষ নয়। তার চোখে সে দৃষ্টি কোন দিন দেখি নি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, অবিন যতখানি বেগে ঝড়ের হাওয়ার মতন ছুটে আসে ততটা প্রলয় করতে পারে না। তার বেগ আছে কিন্তু নিষ্ঠুরতা নেই। সত্যি কি সে নির্লোভ নির্লিপ্ত পুরুষ? তার মুখে যতটা অভিনয়, মনেও কি তাই? আমি বুঝি না। অবিনও আমায় বোঝে না। তার বোঝার ঝোঁক আছে আমার নেই। তবু এই যে সারা দিনের মধ্যে থেকে থেকে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই, হঠাৎ কোথাকার ভয় এসে আমার বুক কাঁপায়, রাত্রে শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে নিজে জীবনটাকে বার বার দেখি, এই যে আমি এতটা রাত করে প্রথম বর্ষার ঝিপঝিপে বৃষ্টির মধ্যে অবিনকে চিঠি লিখতে গিয়েও পারি না—এ সবই যেন আমার কি এক লজ্জা হয়ে উঠছে। দুঃখও। কোথাও এক শূন্য হয়ে যাবার বেদনা-দুঃখ আজ আমার মধ্যে ভরে উঠছে...

চলচ্চিত্রের ভাষায় এ হচ্ছে শূন্য মুহূর্ত গঠনের চিন্তা—এই জিরো ফিলিংসকে কেন্দ্র করে সিনেম্যাটিক লাইন আপকে স্মর্তব্য করে তরুণ চিত্রনাট্যকার পরিচালক ইন্দর সেন তাঁর কর্তব্য শুরু করেছেন। পর পর শট সাজান এক একটি দৃশ্য তিনি আগে ভিসুয়ালাইজ করেছেন। অর্থাৎ পরম্পরায় যাতে ছবির বক্তব্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেইভাবে

লালবাই মহত্তের পরিচালক ইন্দর সেন রাজশ্রী বসু দীপঙ্কর দে চিন্ময় রায় [illegible] শমিত ভঞ্জ।
—ফটো : অমৃত

স্টুডিও সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে বিগত সাতাশে জানুয়ারী ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে একটি হিন্দি ছবির মহরতানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল। কে বি ফিল্মসের পতাকা তলে এই ছবিটি কলকাতার স্টুডিওতেই নির্মিত হবে। পরিচালনা করবেন বিমল রায়। সম্পূর্ণ ছবিটি তোলা কালারে হবে। নায়ক চরিত্রে রূপদান করবেন 'শুভদিন' খ্যাত রাজেশ লহর। এ-ছবির চিত্রগ্রহণ ও শিল্প নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করছেন যথাক্রমে কানাই দে ও সুর্য চট্টোপাধ্যায়। ফেব্রুয়ারী মাসে শুটিং শুরু।

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে যাত্রিক গোষ্ঠীর পরিচালনায় 'সোনা ফকস ক্যাবারে' ছবির শুটিং হচ্ছে। কৌটিল্য গুপ্ত রচিত একটি কাহিনীর ভিত্তিতে এই ছবির জন্য চিত্রনাট্য রচনা করেছেন: পার্থপ্রতিম চৌধুরী। প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন: উত্তমকুমার। বিপরীতে নায়িকা মিঠু মুখোপাধ্যায়। একটি বিশেষ চরিত্রে আছেন: শমিতা বিশ্বাস। এছাড়া আছেন : সুব্রত সেনশর্মা, ছায়া দেবী ও ঝুমুর গাঙ্গুলী। চিত্রগ্রহণ করছেন: অনিল গুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন: নচিকেতা ঘোষ।

বেশ কিছুদিন বিরতির পর প্রবীণ চিত্র পরিচালক অজয় কর নতুন ছবি নিয়ে ফ্লোরে আসছেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল তিনি শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' চিত্রে রূপায়িত করবেন। জোর খবর হচ্ছে এ-ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সুচিত্রা সেন যথাক্রমে নায়ক-নায়িকা। সাত পাকে বাঁধার পর এই জুটি কোন ছবিতে কাজ করেন নি। অতএব দর্শকদের কাছে এক নতুন আবেদন উপস্থিত করবেন। শুটিং শুরু হতে হতে ফেব্রুয়ারী। চিত্রগ্রহণ করবেন: বিশু চক্রবর্তী। সুর-সৃষ্টি করবেন: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

শরৎ জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিনখানি শরৎ-কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়ণ প্রযোজনা করবেন। পরিচালনা করবেন তিনজন স্বনামখ্যাত। সত্যজিৎ রায় পূর্ণেন্দু পত্রী ও তরুণ মজুমদার। যতদূর জানা গিয়েছে সত্যজিৎবাবু চিত্রায়িত করবেন 'মহেশ' শ্রীপত্রী 'অভাগীর স্বর্গ' এবং তরুণবাবু 'পন্ডিতমশাই'। রূপায়ণের কাজ কবে শুরু হবে তা এখনো জানা যায়নি।

সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি কি? এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ এখনো হয়নি। তবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মহলের খবর তিনি শংকর-এর [illegible] চিত্রায়িত

বাবরথ/সোমা দে পরিচালক বিজয় চ্যাটার্জী ও শমিত ভঞ্জ। ফটো : অমৃত

করতে প্রস্তুত হচ্ছেন। পরিকল্পনা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। শিল্পী নির্বাচন শুরু হবে শিগগিরই। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম শোনা যাচ্ছে। এ-ছবিতে উৎপল দত্ত নির্বাচিত হলেও হতে পারেন।

শরণ দে পরিচালিত 'প্রতিবিম্ব' বেলগ্রেড আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। অল্প দিন আগে তরুণ পরিচালক শ্রীদে এই খানিখানির সমস্ত কাজ শেষ করেছেন। কাহিনী ও চিত্রনাট্য পরিচালক শ্রীদে এই ছবিখানির সমস্ত দিলীপ মুখোপাধ্যায়। নায়িকা: কৃষ্ণা বসু। এ-ছবির কাজ শেষ করেই শ্রীদে নতুন ছবির পরিকল্পনা করেছেন। শুভ সূচনা হয়েছে। ছবির নাম 'সুর্য আবিষ্কার' ছবির শুটিং কবে শুরু হবে তা জানা যায়নি।

[illegible]

অনতিবিলম্বে নতুন ছবির কাজ শুরু করবেন। সুনীল দাশের কাহিনী। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীমুখোপাধ্যায় স্বয়ং। ছবির নাম: 'কাল মধুমাস'। ছবিটি সম্পূর্ণ আউটডোরে তোলা হবে। নায়ক চরিত্র রূপায়িত করবেন: দেবরাজ রায়। নায়িকা: সোমা দে। একটি বিশেষ চরিত্র রূপায়িত করতে পারেন শমিত ভঞ্জ। চিত্রগ্রহণ করবেন: দীপক দাশ।

গত সপ্তাহে পরিচালক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পালাবার পথ নেই' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করলেন দীঘার সমুদ্র সৈকতে। নায়ক শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং নায়িকা অপর্ণা সেন—দুজনেই অংশগ্রহণ করেন। এ-ছবির আলোক চিত্রশিল্পী দীপক দাশ। সঙ্গীত পরিচালক [illegible] দাশ।

—স্টুডিও [illegible]

নাট্যমঞ্চ
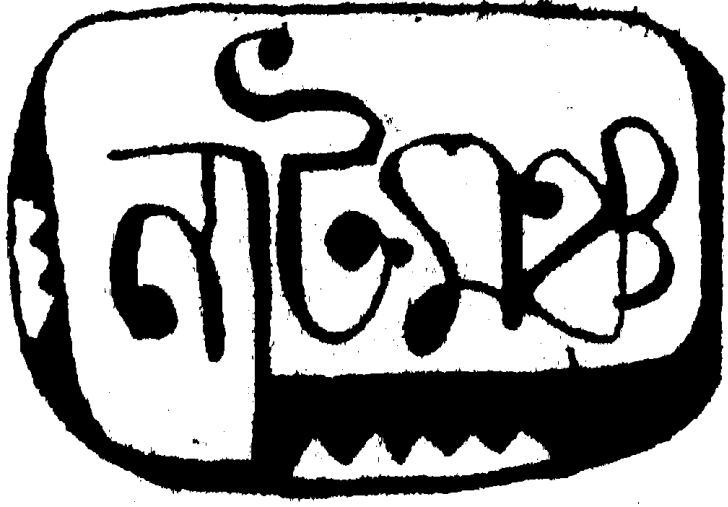
নয়াদিল্লীর যাযাবরের 'চৈতালী রাতের স্বপন'

'গান্ধার' নাট্য সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কোলকাতায় নয়াদিল্লীর সুখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী যাযাবরের দ্বিতীয় নাটক ছিল শেকসপীয়রের 'মিড সামার নাইটস ড্রিম'-এর বাংলায় রূপান্তরিত (উৎপল দত্ত কৃত) 'চৈতালী রাতের স্বপন'।

'মিড সামার নাইটস ড্রিম' বাঙালী পাঠকের কাছে নতুন কোন সাহিত্যসম্ভার নয়। একটা বয়সে এই রূপকথার সঙ্গে একাত্ম হননি এমন পাঠক-পাঠিকা বিরল। যার রোমাণ্টিক আমেজ নাটকীয়তা চিরকাল স্বপ্নের মত হয়েই থেকে যায় মনে।

কিন্তু এর কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর এবং স্বপ্নের মতই মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তেমনি এর রূপদান করাও দুরূহ সন্দেহ নেই। এবং বলা যায়, এমন নাটক মঞ্চস্থ করা এক হিসেবে দুঃসাহসেরও ব্যাপার।

যাযাবর গোষ্ঠী তবু যে সেই দুঃসাহসের কাজ করেছেন, তার জন্যে তাঁরা ধন্যবাদের পাত্র।

তবে যাযাবরগোষ্ঠী রসরাজ অমৃতলালের 'বাবু' নাটক পরিবেশনে যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, এ নাটকে তাদের সেই কৃতকার্যতা ততটা ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি, যে কোন কারণেই হোক।

নাটকের দিক থেকে 'বাবু' পরিবেশনও খুব সহজসাধ্য নয় বলাই বাহুল্য। কারণ বাবুর গল্প প্রহসনমূলক হলেও তার প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ এবং চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে তৎকালীন পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা সহজসাধ্য নয়। সেইদিক থেকে এঁরা সার্থক। যাঁরা এঁদের 'বাবু' দেখেছেন তাঁরাই একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন।

'চৈতালী রাতের স্বপন' যাযাবরের কোলকাতায় পরিবেশিত দ্বিতীয় নাটক। এ নাটক 'বাবু'র মত জমাটি হতে না পারার একটি প্রধান কারণ বোধহয় এর ঢিলেঢালা ভাব। অভিনয় এবং পরিবেশনের দিক থেকে আর একটু দ্রুতগতি এবং সংবদ্ধ—অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলা যায় কমপ্যাক্টনেস হলে নাটকটি আরও রমণীয় দর্শন হোত।

তবে প্রথমার্ধের চেয়ে নাটকের দ্বিতীয়ার্ধ অনেকটা দ্রুতগতি এবং অভিনয়ের দিক থেকে সাবলীল হওয়ায় নাটকটি দর্শনীয় হয়ে উঠেছিল এবং কুশীলবদের আড়ষ্ট ভাবও অনেকটা কমে গিয়েছিল।

অভিনয়ে যে দুজন দর্শকের সপ্রশংস 'বাহবা' কুড়িয়েছেন, তাঁরা হলেন যথাক্রমে তড়িৎ মিত্র ও রবীন ভট্টাচার্য। এঁদের অভিনয় দর্শকদের বহুদিন মনে থাকবে।

এর পরেই নাম করা যায় জগন্নাথ মুখার্জি, শঙ্কর দাশগুপ্ত, শ্যামল রায়চৌধুরী, সলিল ঘোষ এবং ছবি সেন আরতি ভট্টাচার্য ও আরতি গণচৌধুরীর অভিনয়ের কথা।

এছাড়া অসিত সরকার, তুষারকান্তি মণ্ডল, সজল মিত্র, দিলীপ ঘোষ, তুষার মিত্র, দিলীপ সরকার, সুবীর সেনশর্মা এবং নারী চরিত্রাভিনয়ে ছন্দা মজুমদার ও স্বপ্না সান্যাল সুন্দর।

মৃদু মুখার্জি, আলপনা সান্যাল, অনুরাধা চ্যাটার্জি ও নন্দা সমাজদার-এর পরীদের নাচ যেমন ছন্দময় তেমনি রোমাণ্টিক। মঞ্চে এদের উপস্থিতি বেশ একটা রূপকথার আমেজ সৃষ্টি করেছে।

সেই অনুপাতে সঙ্গীতের সহযোগিতা থাকলে নাটকের দৃশ্যবিশেষ আরও হৃদয়গ্রাহী হোত। সুরযোজনা কিন্তু সুন্দর ছিল (সঙ্গীত পরিচালনা নির্মল ভট্টাচার্য)। সলিল ঘোষ ও নারায়ণ ভট্টাচার্যর শব্দসংযোজনা নাটকের পরিস্থিতি সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হয়েছে। আর ভাল লেগেছে পিণ্টু বসুর আলোর কাজ।

সমগ্র নাটকটি পরিচালনায় সুবিমল ব্যানার্জির আন্তরিকতা ও যোগ্যতার ছাপ প্রতিটি দৃশ্যেই বিদ্যমান। এমন একটি দুরূহ নাটক পরিচালনা করার যে অসুবিধা তিনি তা অনেকখানিই উৎরে গেছেন।

ভবিষ্যতে এঁরা আবার এসে আমাদের আরো নতুন নাটক দেখিয়ে আনন্দ দিয়ে যাবেন সেই আশাই কোরবো।

আমরা আবার সাদর আহ্বান জানিয়ে রাখছি নয়াদিল্লীর যাযাবর নাট্যগোষ্ঠীকে।

সর্বশেষে কোলকাতার 'গান্ধার' নাট্য সংস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি তাঁদের এই সৎ প্রচেষ্টার জন্য। আমরা তাঁদের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের বাঙালী নাট্যগোষ্ঠীর নাটক ও কোলকাতায় বসে দেখতে পাবো এই আশাও রাখছি।

নাট্য সমালোচক

ময়ূরমহল নাট্যাভিনয়

অমৃতবাজার যুগান্তর ও অমৃত পত্রিকার কর্মচারী সমিতির বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন উপলক্ষে গত ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বরূপা মঞ্চে ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'ময়ূর মহল' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার স্বয়ং। সহকর্মীদের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলার পক্ষে সমিতির এই সৎ প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

'ময়ূর মহল' মূলত রহস্যধর্মী নাটক। দৃশ্যে দৃশ্যে এর যেমন নাটকীয়তা তেমনি তার পাশাপাশি রহস্যের আমেজ।

সমিতির সভ্যরা কেউ পেশাদার শিল্পী নয়। কিন্তু বলতে বাধা নেই অভিনয়ে কারোরই আন্তরিকতা বা প্রচেষ্টার অভাব ছিল না। বরং কোন কোন চরিত্রাভিনেতার অভিনয় দর্শকদের অভিনন্দন কুড়িয়েছে। তার প্রমাণ বীরেনকান্তি ঘোষ (ডাঃ বসন্ত মল্লিক) বরুণ ঘোষাল (উদয়নারায়ণ), ভোলানাথ ব্যানার্জি (রাঘব সর্দার) শিশিরকুমার চক্রবর্তী (জগৎনারায়ণ) শম্ভু রায় (ত্রিদিবনারায়ণ) অরবিন্দ ভট্টাচার্য (ডাঃ অমিয় চৌধুরী), শ্যামল দে (রজত) বিমল দে (রতনলাল) সুধীর মুস্তাফি (মাণিকলাল), সুশীল মুখার্জি (রজেশ্বর চৌধুরী) আশীষ ভট্টাচার্য (বীরেন্দ্র সিংহ) ও অনিল দাস (কল্যাণ রায়)।

অন্যান্য ভূমিকায় রমেশ ভঞ্জ, শীতল দাস, মৃত্যুঞ্জয় রায়, তরুণচন্দ্র কর, হিরণ্ময় মুন্সী, গৌতম সেনগুপ্ত এবং গোবিন্দ মান্না সুঅভিনয় করেন।

স্ত্রী ভূমিকায় গীতা দে, শিখা ভট্টাচার্য, গীতশ্রী দেবী ও কৃষ্ণা [illegible] বলিষ্ঠ অভিনয় করেন।

বিভাস মুখোপাধ্যায়ের আলোকসম্পাত অভিনব।

নাটকটি সার্থকভাবে পরিচালনা করেন সুধীর মুস্তাফি।

যদুবংশ

সম্প্রতি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কলকাতা লোকাল হেড অফিসের সাংস্কৃতিক শাখা বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কলামন্দিরে বিমল করের 'যদুবংশ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। শ্রীশ্যামল সেনের সুদক্ষ পরিচালনায় নাটকটি উপভোগ্য হয়েছিল। সেই সঙ্গে শিল্পীদের দলগত অভিনয়ও প্রশংসনীয়। শিল্পী দলে ছিলেন—গৌতম দে, কল্যাণ মল্লিক, চঞ্চল দত্ত, সুখেন্দু বসু, পুলক মুখোপাধ্যায়, ভূপাল বসু, দিবাকর ঘোষ, অলোক মুখার্জি, গোবর্ধন পাল ও শ্রীমতী চিত্রা সেন।

বিদেশী ছবি
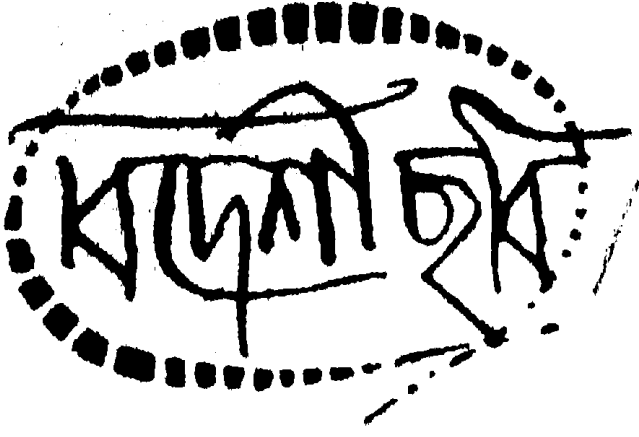
সম্প্রতি রাজধানীতে যে পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে গেল তার থেকে প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হয় নি এমন কয়েকটি ছবি (মোট ৭টি পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি এবং ৭টি (?) শর্ট) নিয়ে ভারত সরকারের তথ্য বিভাগের উদ্যোগে কলকাতায় এক চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে গেল গত ৩১শে জানুয়ারী থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।

উৎসবের সূচনা হয় ডায়েরী অফ এ শিনজুকু বার্গলার নামক জাপানী ছবি দিয়ে। তার আগে অস্ট্রেলিয়ার একটি শর্ট ফিল্ম অটোমেটিক যেটি উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে দেখান হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়। সাফল্য কামনা করে ভাষণ দেন শ্রীমতী কানন দেবী এবং ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিশনের কলকাতা শাখার প্রধান শ্রী জে আর হালদার ভারত সরকারের তরফ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলি সম্বন্ধে জানা থাকলে এখানকার দর্শকদের ছবি দেখা ও বোঝার পক্ষে সহায়ক হোত। কারণ একমাত্র ইংরেজী ছাড়া অন্য কোন ভাষা সম্পর্কে এখানকার সাধারণ দর্শকরা ওয়াকিবহাল নন। একমাত্র ভরসা সাব-টাইটেল। তাও সব ছবিতে সাব-টাইটেল ইংরেজীতে হয় নি: যেমন আলজেরিয়া ও ফ্রান্সের যুগ্ম উদ্যোগে তোলা ছবি ওয়ালস অফ ক্লে (অবশ্য এ ছবির গল্প বুঝতে দর্শকদের খুব একটা অসুবিধা হয় নি) ও কানাডার ছবি বিটুইন ফ্রেন্ডস ছবিতে ইংরাজী সংলাপ থাকা সত্ত্বেও ফরাসী সাব টাইটেল যুক্ত ছিল।

তবু কলকাতার দর্শকরা দিল্লীতে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসনেবর দৌলতে কিছু বিরল বিদেশী ছবি দেখতে পাবে, এটাই তাদের লাভ। সেই আশায়ই দর্শকরা কদিন ধরে উৎসবের ছবি দেখেছে। মন ভরেছে কিনা সেটা স্বতন্ত্র কথা।

তবে এর মধ্যে জাপানী ছবিটা যে দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে একথা সহজেই বলা যায়। তার কারণ এ ছবির বিষয়বস্তু। এমন দুঃসাহসিক এবং নির্বিকার তোলা ছবি দেখা একটা বিরল অভিজ্ঞতা সন্দেহ নেই। ছবিটি বলা যায় পুরোপুরিই যৌন ভিত্তিক। প্রায় খোলাখুলিই সব ব্যাপার। দৃশ্যে এবং সংলাপে। পাশে মহিলা নিয়ে কোন সুস্থ দর্শক এ ছবি সহজভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে বলে আমার খুবই সন্দেহ আছে।

মোহনবাগানের মেয়ে রাজশ্রী. বোস/দীপঙ্কর দে।

নরনারীর যৌন জীবন এর বিষয়বস্তু।

এ ছবি বেড সিন রেপ (এমন কি থিয়েটারের স্টেজেও গল্পের প্রয়োজনে—এমন কথাই ছবিতে বলা হয়েছে।) জবরদস্ত সম্পূর্ণ নারী দেহ নগ্ন করা এবং উৎক্ষিপ্ত অবস্থায় সেই দেহ ব্যবহার করা সেক্সো সাইকোলজিস্টের ভূমিকা ইত্যাদি এমন সব দৃশ্য এতে আছে যা দেখলেও বিশ্বাস করা মুস্কিল। এর সঙ্গে আছে বিশ্বের মনীষী ব্যক্তি রাজনৈতিক কৃতী পুরুষ ইত্যাদির যৌনতা বিষয়ে মতামত ব্যবহার।

দেখতে দেখতে বিস্ময়কর কথাটাও যেন হার মেনে যায়।

তবে একথা ঠিক যে, এমন স্পষ্ট এবং দুঃসাহসিক ছবি ইতিপূর্বে বোধহয় অন্য কখনও দৃশ্যাবদ্ধ হয় নি। এ ছবি নিয়ে নিশ্চয় খুব হৈ-চৈ এবং সমালোচনার ঝড় উঠবে অন্যত্রও।

আগামীতে মোটামুটি সব কটি ছবিরই বিস্তারিত জানাবার বাসনা রইল। অন্তত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি নিয়ে আলোচনা অবশ্যই করবেন।

দুটি উল্লেখযোগ্য ছবি

ডি এইচ গ্রিফিথের জন্ম শতবার্ষিকী স্মরণে সম্প্রতি ইউ এন ইনফরমেশন সার্ভিস তাদের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে তাঁর অবিস্মরণীয় প্রচেষ্টা ইনটলারেন্স ছবিটি দেখালেন। মানবিকতাবোধ এবং অন্য দিকে সমষ্টিগত মানুষের সহজাত সহনশীলতার এমন ছবি যে যুগে ভাবাই যেত না সেই সময়ই এটি সৃষ্টি করেন ডি এইচ গ্রিফিথ।

এ ছাড়া সম্প্রতি আরো একটি ছবি ইউ এস আই এসের উদ্যোগে দেখান হল কলকাতায় যা স্বভাবতই দর্শককে কৌতূহলী করে তোলে। ছবির নাম এলিস্টেয়ার কুকস আমেরিকা। অর্থাৎ এলিস্টেয়ার কুক নামক জনৈক ব্যক্তির চোখে আমেরিকা।

ছবিটির পেছনে একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্যই আছে তা হল আমেরিকা দেশটা কেমন, সেই কথাটাই সেলুলয়েডের মাধ্যমে বলা। বক্তব্য প্রচারমূলক হলেও একটা গোটা দেশকে বোঝার পক্ষে যে কিঞ্চিৎ সহায়ক তাতে সন্দেহ নেই।

গোটা ছবিটি কয়েকটি পর্যায়ে দেখান হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

—শা, র, চ

বাঙলাদেশের ছবি

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে ইতিমধ্যে নির্মিত একটি ছবির নাম 'পালংক'। ছবিটি পরিচালনা করেন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ পরিচালক রাজেন তরফদার। এ-ছবির শ্রেষ্ঠাংশে ছিলেন ভারতের সন্ধ্যা রায় উৎপল দত্ত ও ঢাকার আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। ছবিটির কাজ বহুদিন আগেই সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণেই আজও মুক্তি পাচ্ছে না এবং শেষ পর্যন্ত কবে মুক্তি পাবে, তাও সঠিক করে বলা যাচ্ছে না।

ভারত বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি আরো একটি ছবি নির্মিত হচ্ছে। এ-ছবির পরিচালক বাংলাদেশের জনাব আলমগীর কবীর। ছবির নাম সূর্য কন্যা।' ছবির নায়ক চরিত্রে ঢাকার বুলবুল আহমেদ ও নায়িকা চরিত্রে কলকাতার জয়শ্রী রায় ছাড়াও অন্যান্য চরিত্রে কলকাতার রাজশ্রী বসু অজয় ব্যানার্জী অজিত ব্যানার্জী রীতা দাস প্রমুখ থাকছেন।

সূর্যকন্যার ইউনিট সহ-পরিচালক সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন এবং ছবির কলকাতা অংশের সুটিং পর্ব শেষ করেছেন। কলকাতায় সূর্যকন্যার একটানা আঠারো দিন সুটিং হয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, এ-ছবির অন্য-অন্যান্য শিল্পীরা হলেন আনজুমান মোস্তফা সুমিতা চন্দনা প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালক সত্য সাহা। কণ্ঠ দিয়েছেন সন্ধ্যা মুখার্জি, শ্যামল মিত্র রুণা-লায়লা ও জাহেদুর রহিম।

জানা গেছে ছবির আশী ভাগ স্যুটিং ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। বাকি স্যুটিং অল্প দিনের মধ্যেই ঢাকায় হবে।

কলকাতায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসুর কাহিনী নিয়ে বাংলাদেশের একজন তরুণ পরিচালক শাইদুল হক খান একটি ছবি তৈরী করছেন। ছবির নাম 'ছুটির ফাঁদে'। এ-ছবির নায়ক ঢাকার উজ্জ্বল ও নায়িকা কলকাতার আরতি ভট্টাচার্য। ছবির কাজ একটানা অনেকটা এগিয়ে হঠাৎ থেমে গেছে। কারণ হিসেবে জানা গেছে ছবির পরিচালকের সঙ্গে ছবির প্রযোজক ও পরিবেশকের মতবিরোধ। ফলাফল ছবির স্যুটিং আর এগুতে পারছে না।

ছবির খবর থাক। এখন আপনাদের একটি ভূতের গল্প শোনাই।

না কেচ্ছা-কাহিনীর ভূতের গল্প নয়। —এ রীতিমত শিক্ষিত ভূতের গল্প। এফ ডি সি-তে ভূত আছে। এটা নতুন কোন কথা নয়। কিন্তু সম্প্রতি এফ ডি সি-র ল্যাবেও ভূতের আনাগোনা শুরু হয়েছে। এই অজ্ঞাত ও দক্ষ ভূতেরা রাতের আঁধারে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে ল্যাবে ঢুকে প্রিন্টিং মেশিন নষ্ট করে, কেমিক্যালে পানি মিশিয়ে দেয়। এছাড়াও এসব ভূতেরা নেগেটিভও উল্টেপাল্টে রেখে চম্পট দেয়।

আমার কথায় যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয়, তাহলে এফ ডি সির ল্যাবের কর্মীদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন আমি একবর্ণও বানিয়ে বলছি কিনা! ল্যাবের কর্মীরাও যে প্রায় রাতে ল্যাবে কারো কারো স্পষ্ট চলাফেরার শব্দ শুনতে পেয়েছে। অতএব সন্দেহের কোন প্রশ্নই এখানে উঠছে না।

আচ্ছা তাহলে এসব ভূতের কর্মক্ষমতার একটা নজীর তুলে ধরি। মাত্র কিছুদিন আগে 'ভাইবোন' ছবির প্রিন্ট হচ্ছিল। ছবির প্রিন্ট-ইনচার্জ ছিলেন খোকা। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি খেটেখুটে কেমিক্যাল তৈরি করে বাড়ী চলে গেলেন। পরদিন ভোরে তিনি যথানিয়মে ল্যাবে এসে অবাক। কেমিক্যাল পরীক্ষা করে তিনি দেখতে পেলেন অজ্ঞাত সুচতুর ভূত তার অনেক কষ্টে তৈরি-করা কেমিক্যালে পানি মিশিয়ে দিয়ে গেছে। অর্থাৎ এই পানি মেশানো কেমিক্যালে কাজ করলে ছবির সমস্ত প্রিন্ট নষ্ট হতে বাধ্য।

এখন আপনারাই বলুন, আমি যে বললাম এফ ডি সি-র ল্যাবে ভূত আছে, কথাটা কি মিথ্যা বললাম?

অবশ্য এ-ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম নয় মাঝে-মাঝেই ঘটছে। এসম্পর্কে সি পি জনাব বজলে হোসেনের বক্তব্য হলো এটা ল্যাব-কর্মীদের একে অন্যের প্রতি শত্রুতার ব্যাপার। ভূত-টুত কিছু নয়।

—আনওয়ার আহমদ

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলন প্রসঙ্গে

১০ জানুয়ারী থেকে ২৬ জানুয়ারী পর্যন্ত রবীন্দ্র কাননে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের উদ্যোগে ১৭ দিনে মোট ১৮টি যাত্রা নাটক অভিনীত হয়। তরুণ অপেরার মাও-সে-তুং অভিনীত হয়েছিল ১৮ জানুয়ারী। মাও-ৎ-সে-তুং-এর সমালোচনা ইতিপূর্বেই আমরা প্রকাশ করেছি। নাটকটির জনপ্রিয়তাই আমাদের সঠিক মন্তব্যের পরিচায়ক। সম্মেলন উপলক্ষে অভিনীত মাও-ৎ-সে-তুংর পুনরায় আমরা দেখেছি। পূর্বে সংগীতাংশ যে ত্রুটি আমাদের চোখে পড়েছিল ইতিমধ্যে তা সংশোধন করে নেবার জন্য নাটকটি আরো গতিময় হয়েছে। নামভূমিকায় শান্তিগোপাল বর্তমান অভিনয়েও তার গুণগ্রাহীদের আশা ও বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছেন পুরোপুরিভাবে। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন উৎপল দত্ত। সম্মেলনে অভিনীত নাটকের মধ্যে মাও-ৎ-সে-তুং সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তার্জন করেছে বলে ওয়াকেফহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ।

১০ জানুয়ারী উদ্বোধন রজনীতে অভিনীত হয়েছিল বহুপরিচিত নট্ট কোম্পানীর মা-মাটি-মানুষ। ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত নাটকটি পরিচালনা করেছেন খ্যাতনামা অভিনেতা অরুণ দাশগুপ্ত। সুর সংযোজনা করেছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'মা-মাটি-মানুষ' সঙ্গীত অভিনয় ও নাটকীয় বিষয়বস্তুতে বর্তমান বছরের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। নাটকটিকে মায়ের মহিমময়ী রূপের সঙ্গে মাটির প্রতি খাঁটি মানুষের আত্মিক যোগের সঙ্গে মাটির প্রতি অর্থাৎ গ্রামবাংলার প্রতি আমাদের সচেতন হবার আবেদন নিয়েই রচিত। বি-ডি-ওদের কর্তব্য সম্পর্কেও নাটকটিতে সচেতন করে তোলা হয়েছে। পরিচালক অরুণ দাশগুপ্ত অত্যন্ত দরদী মন নিয়েই নাটকটি পরিচালনা করেছেন। নায়িকা সাবিত্রী চরিত্রে শ্রীমতী বীণা দাশগুপ্তার অভিনয় এই নাটকটির অন্যতম আকর্ষণ। শ্রীমতী বীণা সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ে সমান পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। নায়ক ইন্দ্রনাথ চরিত্রে প্রিয়দর্শন দেবগোপাল ব্যানার্জি খলবন্ধু হিসেবে মদনকুমার দীপেন চ্যাটার্জির মহিম গাঙ্গুলী নির্মল অধিকারীর মাতন বাগদী এবং শিবনাথ চরিত্রে পরিচালক অরুণ দাশগুপ্তের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লখাই চরিত্রে খোকন বিশ্বাসের অভিনয় চলনসই কিন্তু তার উদাত্ত কণ্ঠের সঙ্গীত-লহরী যাত্রামোদীদের যথেষ্ট তৃপ্ত দেবে।

দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী নট্ট কোম্পানী আজও যাত্রামোদীদের কাছে সমান জনপ্রিয় থাকার জন্য পরিচালকদের অভিনন্দন জানাই।

৯১ জানুয়ারী নিরঞ্জন অপেরার ফেরারী ফৌজ নিঃসন্দেহে বর্তমান বছরে যাত্রানাটকের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উৎপল দত্তের মঞ্চসফল নাটকের যাত্রারূপ পরিচালনা করেছেন তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য উদীয়মান অভিনেতা মৃণাল ঘোষ। পরিচালনায় মঞ্চনাটকের স্বাদ যাত্রারূপে পুরোমাত্রায় মৃণালবাবু বজায় রেখেছেন অথচ যাত্রার বিশেষ প্রকাশভঙ্গীর কথা সব সময়ই তিনি মনে রেখেছেন। অভিনয়, সঙ্গীত ও দৃশ্যসংস্থাপনায় ফেরারী ফৌজকে অভিনন্দন জানাই। (ক্রমশঃ)

শান্তিতন্ত্র

শতবর্ষের স্মরণীয়
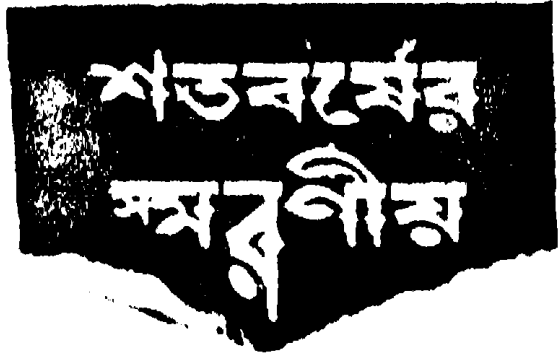
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯০০ খৃষ্টাব্দ ক্লাসিক তথা সমগ্র বাংলাদেশের পক্ষে আরো গৌরবজনক। হীরালাল সেন এতদিন ক্লাসিকে ইংরেজী ছবি দেখিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করছিলেন। ইতিপূর্বেই প্যাথে ফেরীজ কোম্পানীর মুভি ক্যামেরার তিনি চলচ্চিত্র গ্রহণে হাত পাকিয়ে নিয়েছেন। এবার তিনি সরাসরি বিদেশ থেকে ক্যামেরা আনিয়ে এদেশের মাটিতে ছবি তোলায় আত্মনিয়োগ করলেন। অমরেন্দ্রনাথ সর্ববিষয়ে তাঁকে উৎসাহ এবং সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমনকি আর্থিক শক্তি নিয়েও তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ালেন। ক্লাসিকের শিল্পীদের নিয়ে বিভিন্ন নাটকের দৃশ্যাবলী গ্রহণের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং স্থির হয় যে এরপর থেকে ক্লাসিকে বিদেশীয় চিত্র না দেখিয়ে দেশীয় চিত্রই দেখানো হবে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী সোমবার অমরেন্দ্রনাথের মজা সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয়। মজা উচ্চপ্রশংসিত হয়। তবে ছাত্রদের সম্পর্কিত দৃশ্যটির বিরুদ্ধে নানান প্রতিবাদও দেখা দেয়। ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্রের পান্ডব গৌরবের প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী। প্রথম রজনীর শিল্পীদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র—কঞ্চুকী। হরিভূষণ ভট্টাচার্য—দন্ডী। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—ভীম। নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু—[illegible]। লক্ষ্মীমণি—[illegible]। কুসুমকুমারী—উর্বসী। তিনকড়ি দাসী—সুভদ্রা। [illegible]—দ্রৌপদী। টুকুমণি — উত্তরা প্রভৃতি ছিলেন। পান্ডবগৌরব অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। প্রতিটি পত্রপত্রিকা পান্ডবগৌরবের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। ইন্ডিয়ান মিরর বঙ্গবাসী দৈনিক সমাচার [illegible] [illegible] নাটকের এবং বিশেষ করে ভীম চরিত্রে অমরেন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৫ এপ্রিল ১৯০০ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক পরিত্যাগ করে মিনার্ভায় যোগদান করেন।

২৬ মে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসুন্দরের [illegible]

ওদিকে মিনার্ভায় সীতারাম নাটকের বিজ্ঞপ্তি দেখে অমর দত্ত রাতারাতি সীতারাম-এর নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং ৩০ জুন তারিখে মঞ্চস্থ হলো সীতারাম। নামভূমিকায় অভিবাদন জানালেন বিডন-কেশরী অমর দত্ত। মিনার্ভার নামভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। তাই অমর দত্ত হ্যান্ডবিলে লিখলেন : ক্ল্যাসিকের সীতারাম দৃপ্ত যুবা স্থবির নহে।'

'অশ্বপৃষ্ঠে' সীতারাম—কি অপূর্ব শোভা।
ছুটে যেন রোধিবারে গিরিশ-প্রতিভা।
নট-গুরু সনে রণ
দম্ভে করে আস্ফালন
ক্লাসিকের সীতারাম বলদৃপ্ত যুবা।'

ক্লাসিকের পক্ষ থেকে হ্যান্ডবিলে গিরিশচন্দ্রকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হতে লাগলো। মিনার্ভার পক্ষ থেকেও কিছু কিছু উত্তর যে না দেওয়া হতে লাগলো—তা নয়। তবু অমরেন্দ্রনাথ অনেক সময় হ্যান্ডবিলের ভাষায় শালীনতা ছাড়িয়ে যান। যেমন একবার লিখলেন : নট নর্তকী ও নাপিত— তিন চল্লিশের পার হইলেই কাজের বার হইয়া যায়।' (ক্রমশঃ)

—[illegible] মুখোপাধ্যায়

বিবিধ সংবাদ

বাংলা চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির পুরস্কার উৎসব ১৯৭৪ (নির্বাচনে সবচেয়ে চলচ্চিত্র দর্শকরা ভোট দিন) : ১৯৭৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে এই পুরস্কার সীমাবদ্ধ। কয়েক বাংলা চলচ্চিত্রকে উৎসাহ প্রদানের জন্য এই সমিতি পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছে। বাংলা চলচ্চিত্র দর্শকগণকে ভোটপত্র ১৬৩ আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৫ থেকে সংগ্রহ করবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ভোটপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২।২।৭৫। দর্শকদের প্রেরিত ভোটের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত হবে।

বরণীয় সাহিত্যিকবৃন্দের স্মরণীয় গ্রন্থরাজি

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

- থৈথৈ হাহাকার ১৮
- অনেক রক্ত মাড়িয়ে ৯.
- গোধূলির কুমকুম ৮
- ভোর হল বিভাবরী ৮.
- রাই শোন আজ ৬.
- শুক নয় শাড়ী নয় ৫.
- বিবর্ণ বুলবুল ৫.

নারায়ণ সান্যালের

- বিহঙ্গ বাসনা ১০.
- গজমুক্তা ১০.
- অন্তর্লীনা ৮.
- আবার যদি ইচ্ছা কর ১২.

নিখিলচন্দ্র সরকারের

- দুঃখে সুখে বাঁচা ১০.

দীপক চৌধুরীর

- কুমারী কন্যা ৮.

শক্তিপদ রাজগুরুর

- যদি জানতেম ১২.
- মুক্তিস্নান ৬.
- নয়া বসত ৬.
- রূপ বদল ৫.
- গৌড়জন বধূ ১২.
- অভয়ারণ্য ১২.

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের

- যুগস্বাক্ষর ১০.

পরিতোষ মজুমদারের

- অগ্নিলতা ৫.
- আলোর সন্ধান ৪.

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

- সুবর্নাশিরি ২০.

নীলকণ্ঠের

- নীলকন্ঠ বিচিত্রা ১০.
- জীবনরঙ্গ ৬.

শংকু মহারাজের

মধু-বৃন্দাবনে (তিন পর্বে সম্পূর্ণ)

ব্রজপর্ব ১০. - বনপর্ব ১০. - মহাবন পর্ব ১২.

সুভাষ সমাজদারের

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান ১৮.

ফণিভূষণ ভট্টাচার্যের

- নৌ-বিদ্রোহের ইতিকথা ৮.

কাশীকান্ত মৈত্রের

- রাজনীতি বিপ্লব কূটনীতি ২০.

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

- আকাশের আয়না ৮.
- পূর্ব পুরুষ (১ম খণ্ড) ৮.
- পূর্ব পুরুষ (২য় খণ্ড) ১২.

শ্রীহংস-এর

- লাস্ট ওয়ার্ড ৮.
- গাইনিক ওয়ার্ড ৮.
- মায়া মৃগয়া ৭.

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

- স্বাতী ও দীপু ১০.
- বিশ্বাসের বাইরে ৫.

প্রফুল্ল রায়ের

- সুধা পারাবার ৬.
- সোনালী রেখা ৪.

আবদুল জব্বারের

- জনপদ জীবন ৮.

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

- নীলাঙ্গুরীয় ১২.
- আধুনিক ৬.
- অবগুন্ঠন ৫.

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

- রূপসী প্রতিবেশী ১২.
- ভূস্বর্গ কাশ্মীর ৬.
- বিপাশা নদীর দেশে ৬.

ডঃ জয়গুরু গোস্বামীর

- চারণকবি মুকুন্দদাস ২৫.

মণি বাগচীর

- দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ৬.
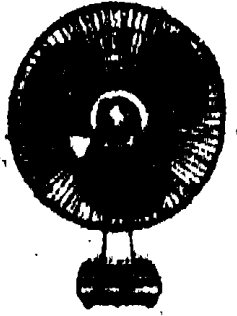
রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ফোন ৩৪-১৩৫৬

১৪ বর্ষ

অমৃত

৪১ সংখ্যা

ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য
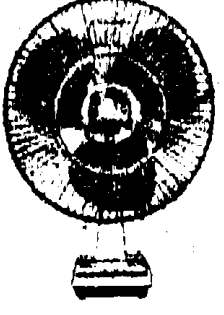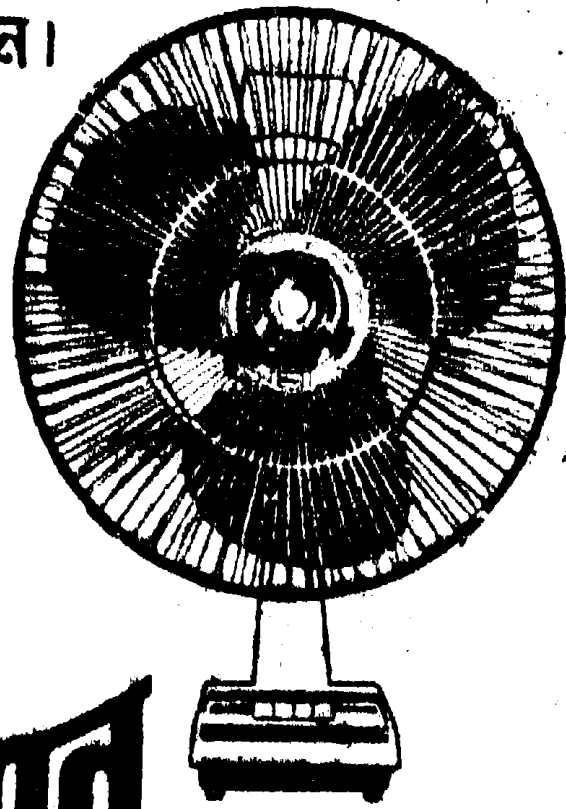
Friday, 21st February, 1975 শুক্রবার ৮ ফাল্গুন ১৩৮১

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীধ্রুব রায়

সংশোধন : গত সংখ্যার প্রচ্ছদ শিল্পী : কুমারী কুমুদ

সম্পাদকীয়

বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে

কেউ ভাবতে পারেনি যে আট মাস আগে যার কাজ শুরু, বর্ষা বাদলায় ধকল সামলে মাত্র চার মাস পুরো কাজের সময় পেয়ে কলকাতায় বিশ্ব টেবিল টেনিসের জন্য একটি স্টেডিয়াম তৈরি করা সম্ভব। পিকিং ছাড়া এশিয়ায় এত সুন্দর এবং এত বড় ইনডোর স্টেডিয়াম আর নেই। এত অল্প সময়ে বারো হাজার দর্শকের উপযোগী একটা সর্বাঙ্গসুন্দর স্টেডিয়াম তৈরি করা সব দিক থেকেই রেকর্ড। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগ সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছে। খেলাটা টেবিল টেনিস। ক্রিকেট বা ফুটবলের মতো এখনও তার জনপ্রিয়তা এদেশে ততটা হয়নি। কিন্তু ভারতে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা হবে, এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেই কলকাতায় গড়ে তোলা হয়েছে নেতাজী সুভাষ ইনডোর স্টেডিয়াম। পশ্চিম বাংলার যুবশ্রেণীর উদ্দেশ্যে এটি উৎসর্গীকৃত।

ভারত এখন পর্যন্ত ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পায়নি। কিন্তু বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পর ভারতের ক্রীড়ানুরাগীরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন একদিন ওলিম্পিক খেলোয়াড়দেরও আমরা আমন্ত্রণ করে আনতে পারব। খেলা শুধু প্রতিযোগিতা নয়। তার মধ্যে বন্ধুত্ব বিনিময়ই সবচেয়ে বড় কথা। আটষট্টি দেশের প্রতিনিধিরা কলকাতার মাটিতে খেলে গেলেন। এতে কোনো রাজনীতি নেই, সোজা সরল বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা। স্বভাবতই চীনা প্রতিনিধি দলের উপস্থিতি এদেশে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। প্রথম কারণ তারা টেবিল টেনিসে একেবারে প্রথম সারিতে। দ্বিতীয় কারণ, ১৯৬২ সালের পর এই প্রথম ভারতে একটি চীনা প্রতিনিধি দল এলো। তাদের সঙ্গে এসেছেন চীনের একজন উপমন্ত্রীও। টেবিল টেনিস বা পিং পং আন্তর্জাতিক কূটনীতির একটি অঙ্গ হয়েছে গত দু-তিন বছর ধরে। আমেরিকার সঙ্গে চীনের সম্পর্কের বরফ গলাবার কাজে অত্যন্ত সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল পিং পং খেলোয়াড়দের। আমেরিকায় মৈত্রী-মূলক প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে গিয়েছিল চীনের টেবিল টেনিস খেলোয়াড়রা ১৯৭১ সালে। একটি দেশ অন্য দেশের খেলোয়াড়দের কীভাবে গ্রহণ করে তা দেখেও দুই দেশের সম্পর্ক খানিকটা বোঝা যায়। চীনা খেলোয়াড়দের সহজ ও স্বচ্ছন্দ আমেরিকা ভ্রমণ পরবর্তী সময়ে চীন-মার্কিন সম্পর্ককে সহজ করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। তার পরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং যান পিকিং সফরে। ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক বর্তমানে না-ভাল না-খারাপ পর্যায়ে রয়েছে বলাই বোধ হয় ঠিক। অর্থাৎ আগে যতটা খারাপ ছিল এখন ততটা নেই। তবে কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতিও হয়নি। পিং পং খেলোয়াড়দের কলকাতা আগমনকে তাই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক সহজ করার ইঙ্গিতরূপে অনেকেই মনে করছেন। চীনা প্রতিনিধি দলের নেতা একথাও বলেছেন যে তারা বন্ধুত্বটাই প্রথমে দেখছেন প্রতিযোগিতা হল পরের কথা। এই খেলোয়াড়রা কলকাতার প্রতিযোগিতার পর দিল্লিতে যাবেন প্রদর্শনী খেলা খেলতে। এটাও মৈত্রী সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের শুভ ইঙ্গিত বলেই ধরা যায়।

অবশ্য অবিলম্বেই চীনের সঙ্গে ভারতের সব বিরোধ মিটে যাবে এমন আশা করা ভুল। বহু বিষয়েই চীনের সঙ্গে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে। নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের চীন পিছন থেকে মদৎ দিচ্ছে। সিকিম ভারতের সহযোগী রাজ্য হবার পর চীন তাকে নিন্দা করেছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে চীন বহুদিন বিরোধিতা করেছে, পাকিস্তান হল চীনের বন্ধু। এ সবই ভারত-বিরোধিতার কারণে। এবং ভারতের সঙ্গে বিরোধিতার অন্যতম কারণ ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী। চীন নিজেকে বিশ্ব বিপ্লবের ধাত্রী বলে মনে করে। যদিও তার ঘরের কাছে ভিয়েতনামে মুক্তি-সংগ্রামের সময়ে সে উল্লেখযোগ্য কোনো সাহায্যই দেয়নি। সে সাহায্য দিয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। কিউবাকে মার্কিন আক্রমণ থেকেও রক্ষা করেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। চীন তাকে কোনো সাহায্য করেনি।

তা সত্ত্বেও ভারত সব সময়েই চায় সমান মর্যাদার ভিত্তিতে সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব। দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ মিল না থাকলেও এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে কোনো বাধা নেই। যে পঞ্চশীলের নীতিতে একদা চীন বিশ্বাস করত এবং তার ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে ভাই ভাই সম্পর্ক স্থাপন করেছিল সে নীতি ভারত এখনও অনুসরণ করে চলেছে। চীন যদি সেই নীতির প্রতি শ্রদ্ধা রাখে তাহলে তার ভিত্তিতেই আবার দুই দেশের মধ্যে সহজ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব। শক্তির দম্ভ দেখিয়ে এ যুগে কোনো দেশ অপর দেশকে কাবু করতে পারবে না, ভারতকে তো নয়ই। আমেরিকা অনেকবার এ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। চীন তার নিজের দেশে অনেক বিষয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ভারত তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দেশের উন্নয়ন কর্মসূচী উদযাপন করে চলেছে। বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে যেমন সকল দেশ নিজ নিজ কৃতিত্ব দেখিয়েও একে অপরকে খাটো করে দেখে না, আন্তর্জাতিক মৈত্রীর ক্ষেত্রেও তেমনি নিজের কৃতিত্বের বড়াই দেখিয়ে বন্ধুত্ব আদায় করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও বিশ্বাস। কলকাতায় বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে তারই পরিচয় আমরা পেয়েছি।

বঙ্গরী

সুশীল রায়
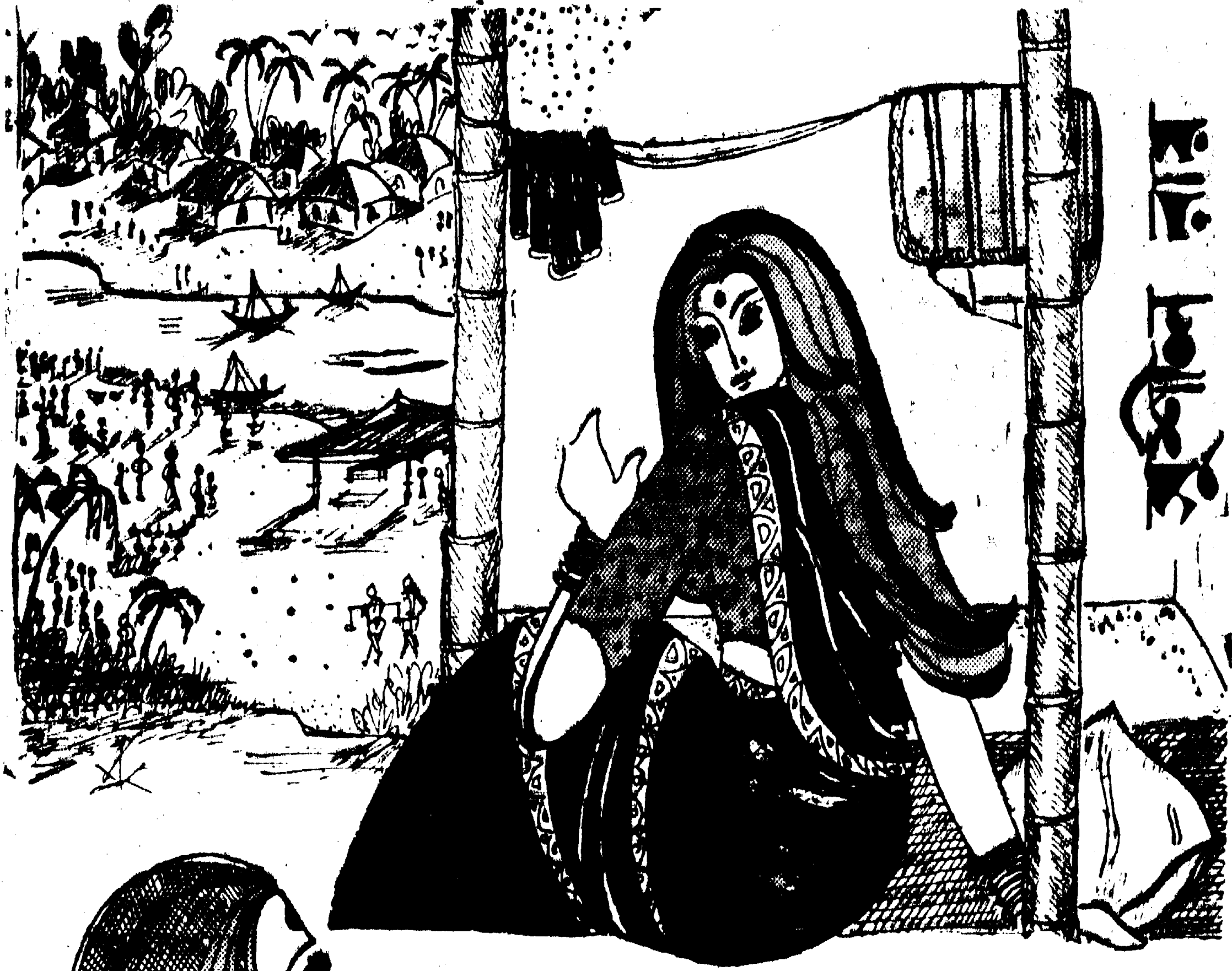
॥ ইন্দ্রাণী চৌধুরী ॥

গায়ের রং খুব কালো হলে কী হবে, আমি দেখতেও নাকি খুব খাসা। এ সাধের তারিফ আমি শুনেছি, অনেকের মুখে, অনেক জায়গায়। ওসব শুনে-শুনে আমার কেমন গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, আমি ওতে বিগলিত হয়ে পড়ি নে।

আমার নামটাও কিন্তু মন্দ না। একবার শুনলে তা মনে রাখতেই হবে কিম্বা মনে রাখার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। আমার নাম কোহিনূরকান্তি এ নামের মানে জানি নে জানতেও চাইনে। এর মানে আমাকেও কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করে নি অবশ্য।

আমাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না— আমার অভিভাবকেরা এ বিষয়ে নিশ্চিত। তাঁরা নিশ্চিত বটে কিন্তু নিশ্চিন্ত তাঁরা হতেই পারছেন না।

নিজেও অনেক সময় নিজের কথা ভেবেছি। বড়রা আমাকে দিয়ে যা করাতে চান আমি তা করব, এমন সংকল্পও করেছি। কিন্তু সব শপথ ভেসে গিয়েছে। নিজের রাশ কিছুতে টানতে পারি নি। আমি নিজেরাই খড়কুটোর মত ভেসে চলেছি।

যাত্রা-গান, তরজা, ঝুমুর কীর্তন—এই সবের দিকে আমার টান খুব। কোথাও তরজার আসর বসেছে শুনলেই আমার সব কাজ ভেস্তে যায়। কোথাও যাত্রাদল এসেছে জানামাত্র সেখানে আমার যাত্রা করা চাই-ই। কোথাও কীর্তন হচ্ছে শুনলে আমি ছুটে গিয়ে তাদের দলে ভিড়ে যাই, তাদের করতাল নিয়ে বসে গানের তালে-তালে টুংটাং শব্দ করি। লোকে আমাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে। আমার স্বাস্থ্য বেশ তাজা,

ঘরে আমার মন নেই। ঘরে আমাকে বেঁধে রাখাই দায়। আমাকে ঘরে বেঁধে রাখার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে বাড়ির লোক। পারে নি। আমি ঘর-ছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াই। ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভালো লাগে। কত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, কত নদীনালা কত গ্রামগঞ্জ। এসবের কি কোনো দাম নেই? বলুন।

চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স আজ হয়ে গিয়েছে আমার। গ্রামের ছেলে আমি, লেখা-পড়া বেশি জানিনে। কিন্তু যত্রা কীর্তন

কথকতা দেখতে-দেখতে শুনতে-শুনতে আমি যত-কিছু জেনে ফেলেছি অনেক লেখাপড়া-জানা ছেলেও বুঝি তা জানে না। তবে আর আফশোষ করার কী আছে আমার?

অনেক বয়স নাকি হয়ে গিয়েছে আমার। গ্রামের ছেলের পক্ষে আমার এই বয়সই নাকি অনেক বয়স। কিন্তু বয়সই তো মানুষের সব না, মানুষের মনটাই আসল। মনের খুশিটাই সব।

খাওয়া-পরার ভাবনা নেই আমার। অনেক জোতজমি আছে আমাদের আছে পুকুর আছে গরুর বাথান। এই বারুইপুর অঞ্চলে আমাদের চেনে না এমন কেউ নেই। কেবল বারুইপুর কেন, চম্পাহাটি ঘুটিয়ারী-শরিফ তালদি এই এলাকার এসব গ্রামের মানুষেরা এমনকি রেলের স্টেশনমাস্টার-মশাইরাও আমাদের চেনেন বিলক্ষণ।

এমন বাড়ির ছেলে আমি। আমাকে আর পায় কে। তার উপর স্বাস্থ্য আছে, বুদ্ধিবিবেচনাও নাকি আছে, আর আছে নাম। হাসবেন না। আমার নাম তো নামের মতনই নাম একটা। তাই না?

ঘরে আমার মন নাই। ঘরে আমাকে বেঁধে রাখার জন্যে অনেক চেষ্টা করে চলেছে বাড়ির লোক। অনেক চোখের জল ফেলেছেন আমার মা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আমার বৌদি তাঁর দেশ শ্যামনগর থেকে আনিয়েছিলেন একটি মেয়ে। তার নাম চম্পা। সে নাকি বৌদির মামাতো না পিসতুতো বোন। মেয়েটিকে আমি দেখেছি, দেখতে মন্দ না। খুব লাজুক। বৌদির মতলব সে জানত বলেই হয়তো আমার সামনে বড়-একটা আসত না, সামনা-সামনি পড়ে গেলে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে পড়ত। কাজে-কর্মেও মেয়েটা বেশ পটু। ঘর নিকোনো থেকে আরম্ভ করে গরুর বাথান সাফ করায় তার কাজে খুব পারিপাট্য।

বৌদি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন বুঝছ? ওকে এখানেই রাখব, না পাঠিয়ে দেব শ্যামনগরে?

বৌদির মতলব আমিও বুঝেছিলাম, কিন্তু কিছুই যেন বুঝি নি এইভাবে আমি থাকতাম। বৌদির কথা শুনে কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। বললাম, কে কে এই মেয়েটা?

বৌদি হাসলেন, বৌ। বৌ গো তোমার।

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। পর-দিনই আমি চলে গিয়েছিলাম নুরপুর সেখান থেকে লঞ্চে হুগলী-রূপনারায়ণ নদী পার হয়ে একেবারে গেঁওখালি। নদী আমার বড় ভালো লাগে।

আমি ফিরে এলাম দিন-কতক বাদে। ভেবেছিলুম চম্পা বুঝি চলে গিয়েছে। কিন্তু ফিরে এসে দেখি চম্পা আছে। আমি লক্ষ্য করলাম, বাথান থেকে এক ঝুড়ি গোবর হাতে নিয়ে সে উঠোন পার হতে-হতে আমার দিকে এক-চোখ চাইল.

ঐ চাউনিটা দেখে কেমন মায়া হল আমার।

দিন-দুই বাদে বৌদি আবার ওর কথা তুললেন, বললেন চাঁপা চলে যাচ্ছে।

সে আবার কে?

কেন চেন না চম্পাকে?

বললাম তাই বল। তুমি যে বললে চাঁপা।

ওই হল। ওর ভালো নামই চম্পা। চাঁপা বলে ডাকি।

বলেছি তো আমার কেমন মায়া হয়ে গিয়েছে ওর উপর। বললাম, ঘুরেই আসুক-না দিন-কতক।

আমার কথায় বৌদি বুঝি আশ্বাস পেয়ে গেলেন। বেশ খুশির হাসি হাসলেন, বললেন, কি চোখে লেগেছে তো?

বললাম, নাতো লাগেনি তো এমনই একটু লাল হয়েছে চোখ।

আমার কথা শুনে বৌদির গা বুঝি জ্বলে গেল। মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করে বললেন আহাম্মক।

চাঁপা সত্যিই চলে গিয়েছিল। সে চলে যাওয়ায় আমার মন কেমন খারাপ লাগছিল। কিন্তু তা প্রকাশ করিনি কারো কাছে।

ঘর আমাকে নাকি বাঁধতেই হবে, কোন-একটা কাজ দিয়ে আমাকে আটকে রাখার জন্যে বেশ সলা-পরামর্শ যে চলছে বাড়িতে আমি তা বুঝতে পারছিলাম।

আমাকে একটা মুদির দোকান করে দেওয়া হল বাড়ির কাছেই। সকাল হলেই ঝাঁপ খুলে সেখানে গিয়ে বসতে হয় আমাকে। দুপুরে ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়িতে খেতে আসি। আবার গিয়ে দোকান খুলে বসি রাত এস্তোক। বুঝতে পারি এ-কাজ আমার না। এতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি বন্দী হয়ে যাচ্ছি।

কানাঘুষোয় শুনেছি চাঁপা নাকি আবার আসছে। একথা শুনে আমার দম আরও যেন আটকে যাবার দশা হল। একটা চাপা আনন্দও বোধ করতে লাগলাম কেন যেন। মেয়েটা সত্যি দেখতে মন্দ না, মেয়েটা বেশ লাজুক। ঘর-সংসারে মেয়েটার খুব মন।

কিন্তু আমার মন আমিই চিনিনে। মুদিখানার এই বন্দীদশায় বসে আমার মন ছটফট করতে লাগল। তার উপর, স্টেশনের দেয়ালে হাতে-লেখা কয়েকটা বিজ্ঞাপন সাঁটা দেখলাম—সুন্দরবন গঙ্গামেলা। একটা নতুন গঙ্গাসাগর মেলা নাকি বসছে সুন্দরবনে।

এতে মন বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। কাউকে কিছু বললাম না। দুপুরে দোকানের ঝাঁপ লাগিয়ে বাড়িতে খেতে না গিয়ে রেল-স্টেশনে এসে একটা টিকিট কাটলাম ক্যানিং-এর। বেশি দূরে না ক্যানিং।

ট্রেন এসে যখন দাঁড়াল, দেখলাম কারা যেন নামল, ওদের মধ্যের একজনকে চিনি, চিনতে পারলাম তাকে চাঁপা। আমাকে দেখতে পায়নি কেউ। ট্রেনে উঠে পড়লাম।

ক্যানিং থেকে লঞ্চ ধরেছিলাম। মাতলাই বলো, বিদ্যাই বলো যাই নাম দাও ওর—ও হল নদী। নদী দেখলে আমি কেমন মাতাল হয়ে যাই। লঞ্চের চালে বসে আমি চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে দেখতে সন্ধ্যার ঝোঁকে এসে পৌঁছলাম বিরাজমণির ঘাটে।

যেমন কনকনে ঠান্ডা, তেমনি ঘুটঘুটে অন্ধকার চারধার। সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমি আকাশের তারা গুনতে লাগলাম।

একটা খাঁ-খাঁ দ্বীপ। কয়েকটা ঝুপড়ি ছাড়া ঘরবাড়ি নেই। কিন্তু ভিড় জমেছে কিছু। সুন্দরবনের নতুন গঙ্গামেলা হবে এখানেই। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম চারধার।

পুজোর মণ্ডপ কাছেই। গঙ্গাদেবীর মূর্তি কপিলদেবের মূর্তি বেশ খাসা বানিয়েছে এরা। তার সামনেই একটু নীচু জমিতে খাটানো হয়েছে চাঁদোয়া। তরজার আসর বসবে, কীর্তন হবে, যাত্রা হবে। চমৎকার।

সবই ভালো। কিন্তু একটু আস্তানা যে চাই। খোঁজ নিতে লাগলাম। এখান থেকে অনেক দূরে যে গ্রাম তার নাম বালি। বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম নাকি সেটা, সেখানে গেলে আশ্রয় নাকি মিলতে পারে।

পূজামণ্ডপে হ্যাজাক জ্বলছে, তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে শরীরে একটু তাপ নিচ্ছি। ভাবছি, পুরুষমানুষ, জোয়ান, ঠান্ডা একটু সইতে হবে। না হয় পড়ে থাকা যাবে ঐ চাঁদোয়ার তলায়।

যাত্রার দল, তরজার দল ইত্যাদি সব নাকি নাকি এসে গিয়েছে। তারা নাকি আছে গোসাবায়। রাতেই খেয়া পার হয়ে আসবে। রাতেই বসবে আসর। এসব শুনে শীত কমে গেল আমার। রাত-ভোর শোনা যাবে গান। শরীর তাতেই গরম হয়ে উঠবে।

দোকানপাটও বসেছে কয়েকটা। নতুন এই মেলা। সবই তাই কম। কয়েক বছর চললেই বেশ জমে উঠবে। আসল গঙ্গা-সাগরের মতন ভিড়ও একদিন এখানেও হয়তো ভিড় হবে।

এই সম্ভাবনার কথায় আমিই কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগলাম। অযথা। আমাকেই আমি ঠিক চিনতে পারিনে। এখানে একদিন ভিড় যদি জমেই ওঠে, তাতে আমার কী। তাতে আমার এত আনন্দ হবার আছে কী।

হ্যাজাকের তীব্র আলোয় দাঁড়িয়ে বিরাজ-মণির এই মেলার জমায়েত দেখছি: কর্ম-কর্তারা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। তাদের ব্যস্ততার কোনো কারণ বুঝছি নে। কিন্তু এটা জানি যে, ব্যস্তসমস্ত না-হলে কর্ম-কর্তা বলে চেনা যায় না।

নদীর সরু একটা শাখা। তার এপার বিরাজমণি ওপার গোসাবা। গোসাবায় অনেক মানুষের বাস। অনেক ঘরবাড়ি। অনেক লোকজন ক্রমশই আসছে ওপার থেকে। হাঁটাপথে বালির দিক থেকেও আসছে অনেক মানুষজন।

রাত বাড়ছে। সুন্দরবনের নিবিড় গাছপালার গায় অন্ধকারের মধ্যে এই

দ্বীপটিকে ঘিরে সান্ত্রীর মতন দাঁড়িয়ে। আমি চেয়ে-চেয়ে দেখছি সেই বন। বনের অগাধে আছে কত হিংস্র জন্তু। তারাও হয়তো গাছের ফাঁক দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে আমাদের, দেখছে তারা আমাদের এই তামাশা।

হঠাৎ বামাকণ্ঠের কলকাকলি কানে এল। নদী শান্ত। ভাটার টানে নম্র হয়ে আছে। এই নিস্তব্ধ পরিবেশে এই নারীকণ্ঠ একটু সচকিতই করে তুলল।

ওপার থেকে ওর নাকি আসছে, আসছে নাকি ঝুমুরের দল।

ঝুমুর-গান শুনেছিলাম বটে একবার। আমাদের কাছে-ভিতেই। ঘাটিয়ারি-সরিফে। কানে লেগে আছে তার বাউল। মনে-মনে আওড়াতে লাগলাম সেই কলি,—

নতুন মাঝি বাইতে
জা-নি-নে
জলে ঢেউ দিয়ো না!

এ গান শুনেছিলাম সেই ডাঙায় বসে, এবার সেই ঝুমুর-গান শুনব জলের রাজ্যে।

রাত বুঝি বারোটাই হবে তখন। কীর্তন-পালা আগে হয়ে গিয়েছে, এবার বসল ঝুমুরের আসর।

কী সে গান, বলে বোঝানো দায়। সামনের সারিতে বসে আমি আনন্দে আত্ম-হারা হয়ে হাততালি দিয়ে মাথা নেড়ে তাল দিতে লাগলাম। যে মেয়েটি গাইছিল সে হেসে হেসে আমাকে তারিফ করতে লাগল। বয়স তার বেশি না, বিশ-বাইশ হবে। চোখের কাজ অদ্ভুত, তাকানোর ভঙ্গিই আলাদা। মেয়েটা বেশ তাজা। হ্যাজাকের আলো তার একটা গালে পড়েছে ঐ আধখানা দেখেই পুরো মুখটার আন্দাজ করা যায়।

গাইতে-গাইতে এমনভাবে সে মাথা দোলাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে ঈশারা করে যেন কাছে ডাকছে। ওতে আমার শরীর কেমন শিউরে-শিউরে উঠছিল। শীতে অমন কেঁপে উঠছিলাম, কিংবা কেঁপে উঠছিলাম তার গীতে—তা ঠিক বলতে পারব না।

আমি ভিনদেশী লোক। আমাকে কেউ চেনে না। আমার নাম অমন জবরদস্ত বটে, ও-নাম কেউ একবার শুনলে মনে রাখেই বটে, কিন্তু এখানে সে নামের কোনো দাম পেলাম না। অন্তত এতক্ষণ তা পাইনি।

কিন্তু দাম পেয়ে গেলাম শেষরাত্রের দিকে। ঝুমুরের মেয়েটা আমাকে ডেকে পাঠাল। ডাক শোনা মাত্র আমি উঠে পড়লাম। তার কাছে গেলাম। কাছের একটা ঝুপড়ির মধ্যে সে ক্লান্ত হয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছে।

বাতার বেড়া সরিয়ে আমি মাথা নীচু করে ঢুকলাম, সে উঠে বসল, অদ্ভুত ভঙ্গিতে গা-মোড়ামুড়ি দিতে-দিতে বলল 'আসুন মহারাজ।'

এমন সম্বোধনের জন্যে তৈরি ছিলাম না। তার ইশারায় বসে পড়লাম।

ওর নাম নাকি বল্লরী। আমার নাম কী জানতে চাইল। বললাম। নাম শুনে সে হেসে গড়িয়ে পড়ল, বলল অত বড় নাম মনে রাখি কী করে?'

একটু বিরক্তই বুঝি হয়েছিলাম বললাম 'মনে রাখতে কে বলেছে?'

সে আবার হাসল, বলল, 'ওরে বাবারে, এক কথাতেই ফোঁস। ছোবল দেবে নাকি? বলে ভঙ্গি করে উঠল।

সে নাকি একা নেই, সঙ্গে আছে তার মাসি। তাকে পরে দেখলাম বটে। বাঘের দেশের মানুষ, তাই বুঝি অমন বাঘিনীর মত রূপ। রূপ তেমন হলেও কথায়-বার্তায় বেশ মিষ্টি।

মাসি আমাকে শুধাল, 'কেমন লাগল গো গান? খুব তো তারিফ করছিলেন ঘাড় নেড়ে।'

একটু বুঝি ভয়ই পেয়ে গিয়েছি। ভীত হয়ে বললাম, 'গান বেশ।'

বল্লরী প্রতিধ্বনির মত বলল, 'বেশ।'

ওদের বাড়ি নাকি বেশি দূরে না। কাছেই। বাঘবাগানে। নদী পেরিয়ে রাঙা-বেলিয়ায় নেমে বাঁধ ধরে দু কদম হাঁটতেই বাঘবাগান। 'চলো।'

তার গানের কলিটা কানে বাজছে—
মানসেটা যে আসবে বলেছে
তাই ধরেছি সাজ
কোথায় গেল, গেল কোথায়
কোথায় মহারাজ

বল্লরী বলল, কি ভাবতে লেগেছ? ওঠো, চলো। নৌকো যে ঘাটে—'

কোন কথা বলতে পারিনি, আমি নৌকোয় উঠেছি, চলে এসেছি বসমবাগানে।

এখানে এসে বন্দী হয়ে গেলাম। কত-দিন কেটে গেল তার হিসেব দিতে পারব না। অনেক বুঝিয়ে, অনেক প্রতিজ্ঞা করে, ছাড়া পেলাম। ফিরে চলেছি বাড়ির পথে।

ক্যানিং-এ এসে ট্রেন ছাড়তে দেরি আছে। একটা কামরার এক কোণে একা বসে আকাশপাতাল ভাবছি। বাড়ির লোকে আমার কথা কী ভাবছে তা তারাই জানে।

ট্রেন ছাড়তে আর মিনিট পাঁচেক বাকি। একটা কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে ছুটে এসে ট্রেনে উঠে আমার পাশে বসে পড়ল। পরনে তার পাজামা, সর্বাঙ্গ আলোয়ান দিয়ে জড়ানো, মাথাও ঢাকা আলোয়ানে। পাশে বসে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা ঢাকুরিয়া যাবে তো?'

বললাম, 'যাবে। কেন যাবে না কেন?'

'অনেক ট্রেন আবার সোনারপুর পর্যন্ত যায় কিনা।' বলে ছেলেটা আমার দিকে চেয়ে হাসল।

বললাম, 'কী হলো?'

সে হাসল, 'ভীষণ ব্যাপার। বাড়িতে কোন খবর না দিয়ে দু দিন বাদে ফিরছি। কী ভাবনাই ভাবছে সকলে।'

তার এই কথা শুনে একটু আগ্রহের সঙ্গেই তার কথায় মন দিলাম। সে বলল, 'আপিসে নিশ্চয়ই ফোন করেছে, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে খোঁজ করেছে, এতক্ষণে নিশ্চয় খবর দিয়েছে থানায়।'

কথায় কথায় ছেলেটা হাসে। হেসেই বলল, 'কী ব্যাপার বলুন। গ্রামের লোকরা কত সরল। অতিথি পেলে ছাড়তে চায় না।'

পরের সংখ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প

ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। মনে হতে লাগল সে যেন আমার মনের কথাই বলছে। বুঝতে পারলাম সে আমার মতন দশাতেই নিশ্চয় পড়েছিল।

এই জন্যে তার কাছে জানতে চাইলাম কি হয়েছিল।

বিশেষ কিছু নাকি হয়নি। আজ হচ্ছে বুধবার, বুধবারই তো? আমার সব হিসেব কিন্তু গোলমাল হয়ে গিয়েছে। আমি তো দু'দিন বাদে ফিরছি নে, আট-দশ দিন হবে কম করেও।

আজ হচ্ছে বুধবার। গত রবিবারে সকালে নাকি সে বের হয়েছিল একটু বেড়াতে। ট্রেনে চেপে চলে আসে ক্যানিং। তারপর ক্যানিং-বাজারের পিছনে গিয়ে দেখে ওপারে নৌকো যাচ্ছে। যেতে লাগে এক ঘণ্টা। তখন সে মনে-মনে নাকি হিসেব করে নেয় যে, যেতে আসতে মাত্র দু ঘণ্টা, এতে নৌকো-ভ্রমণও হবে বিকেলের মধ্যে বাড়ি-ফেরাও হবে। কিন্তু—

'কি হল?' ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলাম ছেলেটিকে।

সে হাসতে লাগল। মনে হল, ব্যাপারটা ভেবে তার যেমন অবাক লাগছে, তেমনি মজাও লাগছে তার।

নৌকোয় নাকি তার দেখা হয় মাঝবয়সী একটা লোকের সঙ্গে। নাম তার কিনু ঠাকুর। তার সঙ্গে ছেলেটার আলাপ হল। ফুলতলিতে নৌকো একটু থেমে তার পর চলল আমপাড়ার দিকে সেখান থেকেই নৌকো আবার ফিরবে ক্যানিং। ছেলেটিও ফিরে আসবে—এই ছিল তার প্ল্যান। কিন্তু—

'কি হল?'

'কিছুতে ছাড়লেন না আমাকে কিনু ঠাকুর। নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। বেশ বড় বাড়ি। বড় বড় গোলা। আমাকে আটকে দিলেন। কিছুতে ছাড়লেন না। ওঃ, কী আদরযত্ন। একটা অজানা-অচেনা মানুষকে এমন সমাদর ভাবা যায় না।'

একটু হাসল ছেলেটি, বলল, 'এই শীত। মাত্র একটা চাদর গায়ে দিয়ে বেরিয়েছি, দেখছেন তো!'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'খুব যত্নআত্তি করল বুঝি? অজানা মানুষ দেখে ভয় হল না তাদের?'

'ভয়? তাদের ভয় হবে কেন। আমারই ভয় হতে লাগল। ভাবলাম, কিছু মতলব নিশ্চয় আছে ওদের।'

আমি উৎকণ্ঠ হয়ে শুনতে লাগলাম ওর কথা।

'রাত্রিবেলা আমাকে ছেড়ে দিল একটা ঘর। বাচ্চাকাচ্চারা শুলো বারান্দায়। সত্যি অবাক হতে হয়। পুকুর থেকে মাছ ধরে আনছে, বাথান থেকে গোরুর দুধ। উঃ, ভাবা যায় না। একটা অপরিচিত লোকের জন্যে এভাবে প্রাণমন ঢেলে দেওয়া—'

'কি বললেন?'

'বলছিলাম, একজন অজানা মানুষের জন্যে এমন হৃদয় ঢেলে দেওয়া।'

আমি ভাবতে লাগলাম। ছেলেটা অবাক হয়ে গিয়েছে বটে, অবাক হয়েছি আমিও বটে, কিন্তু আমার কাছে এ ব্যাপারটা এক-ফোঁটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে না। কেন? সে আর খুলে কী বলব!

সে হাসতে লাগল, বলল, 'বারবার কবুল করে নিয়েছে—আবার যেন যাই।'

'কবুল করে নিল বুঝি?'

সে হেসে বলল, 'নিল।'

'রাজি হয়ে এসেছেন বুঝি?'

'অরাজি হইনি।'

বললাম, 'তা তো বটেই। অরাজি হওয়া মুশকিল।'

'তারপর' ছেলেটি হেসে উঠল বলল 'অত খাইয়েও আশা মেটেনি, বলে কি, ফাল্গুন মাসে গোরুর বাচ্চা হবে, দুধ বেশি হবে, তখন জানাব, আসতে হবে।'

গোরুর বাচ্চা হলেই তাকে যেতে হবে, এমন কি বাধ্যবাধকতা আছে ছেলেটির?

ছেলেটি যা বলে গেল সবই যে তা আমার কথা। আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। [illegible] ফিরছি কত দিন বাদে কে জানে। [illegible] ঝাঁপ ফেলে রওনা হয়েছি, আমাকে আর বোধ হয় কেউ খুঁজছে না। খোঁজা হয়তো ছেড়ে দিয়েছে।

যাবার দিন স্টেশনে দেখেছিলাম, চাঁপা এসে নামল। সেও মনে হচ্ছে বহুদিন আগের ঘটনা। এখনো হয়তো চাঁপা আমার অপেক্ষাতেই আছে।

ঐ কিনু ঠাকুরের মতই আমার অবস্থা করে তুলেছিল বহুরূপী। আসতেও দিতে সে চায়নি। জোর করেই আসা।

যখন চলেই আসছি তখন দুই চোখে অদ্ভুত চাউনি ছিটিয়ে সে বলল, 'খোকা হলে খবর দেব, তখন আসা চাইই কিন্তু। বুঝলেন মহারাজ?'

কবুল করে এসেছি। এ ক্ষেত্রে কবুল না করে কি পারা যায়? তার গায়ের তাপ এখনো যে আমার সারা গায়ে লাগা।

[ ]। ড্যাণ্ড হাসতে৷ বশম্বাস মবহ

পটভূমি

মন্ত্রীরা যে যার ইমেজ তৈরিতে ব্যস্ত

আজ পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বড়ই দুর্দিন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই যে যার নিজের 'ইমেজ' তৈরীর নেশায় মেতে উঠেছেন। কি দৌড় কি দৌড়! ওয়াংচু কমিশন বসিয়ে দুজন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় দিল্লীর কাছে মহাপুরুষ বনে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য বেশ কিছু দিন আগে অতি সন্তর্পণে হনুমনতাইয়া আর আসামের মৈনুল হককে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। কাক-পক্ষীকেও বুঝতে দেন নি; তাঁরা যাতে সম্মানের সঙ্গে সরে যেতে পারেন, তার জন্য দলের নেত্রী জার্মি তৈরী করে দিয়েছিলেন। এর ফলে দেখা গিয়েছিল, এদের কারোর সম্মানে কোন আঘাত লাগেনি।

কিন্তু পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে অন্য চিত্র। সবায়ের ঘোরতর আপত্তি, শুধু এক। মুখ্যমন্ত্রী সব ঝুঁকি নিয়ে ওয়াংচু কমিশন বসালেন। কয়েক মাস ধরে বিচার চলেলো। লোকের মুখে শোনা গেলো, আসল আসল অভিযোগগুলি ধামাচাপা দিয়ে ছোটখাটো অভিযোগগুলি কমিশনের সামনে পাঠানো হয়েছে। এমন কি ধরে নেওয়া হয়েছিল, কিছুই হবে না। লোকচোখে বরং প্রমাণিত হবে মুখ্যমন্ত্রী কি সৎ লোক; তাঁর কি দুর্দান্ত সাহস। দুর্নীতির অভিযোগের ব্যাপারে তিনি কোন সমঝোতা করতে রাজী নন। কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরূপে দাঁড়ালো। সিদ্ধার্থবাবু বিনা বাধায় তাঁর দুই সহকর্মীকে বলি দিয়ে বাহবা কেনার চেষ্টা করলেন।

ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী বাহবা পেতে শুরু করেছেন। দিল্লীর একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রথম পাতায় সিদ্ধার্থবাবুর ছবি দিয়ে পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছেন। ঐ পত্রিকার সম্পাদক অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সিদ্ধার্থবাবুর কার্যকলাপকে অনুসরণ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, ওয়াংচু কমিশন গঠন ও পরবর্তী পর্যায়ের ঘটনাগুলি ঘটিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর লাভ কি হলো? এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, দিল্লীর পত্রিকায় তাঁর ছবি সমেত প্রশংসা প্রকাশিত হত না, যদি তিনি 'ওয়াংচু' না বসাতেন। আর অন্যদিকে সুনীতি চট্টোরাজের কথা ভেবে দেখুন। যেদিন রাতে তাঁকে জোর করে পদত্যাগপত্রে সই করানো হলো সেদিন বিকেলেই তিনি এক প্লেনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লী থেকে কলকাতায় এসেছেন। রাজধানীতে এক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে বসে তার আগে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য রেখেছেন। অথচ পদত্যাগ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে জমি তৈরী করার কোন সুযোগও করে দেননি। তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে প্রায় শেষ করে দেওয়ার মতলব আঁটা হয়েছিল। কিন্তু সুনীতিবাবু কাবু হবার লোক নন; বলটা ঘুরিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কোর্টে ফেলে দিয়েছেন। এবার খেলা শুরু হয়েছে।

সুনীতিবাবু সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করতে আরম্ভ করেছেন। বীরভূমের মাটিতে তিনি সিদ্ধার্থবাবুকে সম্বর্ধনা নিতে দেবেন না। এমন কি ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচারও চলছে। অবস্থা যে কিছুটা জটিল হয়ে উঠছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে পদত্যাগকারী অপর মন্ত্রী সন্তোষ রায় কিন্তু সুনীতিবাবু যে স্ট্র্যাটেজি নিয়েছেন, সেই লাইন অনুসরণ করছেন না। তিনি ভিন্নভাবে প্রতিশোধ নিতে চাইছেন। সুনীতিবাবু ও সন্তোষবাবু উভয়েই এখন নিজেদের ইমেজ' বাঁচিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ছবিটা কিছুটা খাটো করতে চাইছেন। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক কাজ, এর মধ্যে নতুনত্বের কিছু নেই। কথায় আছে আপনি আমার ঘরে আগুন ধরালে আমিও ছেড়ে কথা বলবো না। যার ফলেই রাজ্য মন্ত্রিসভায় অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেছে। সবাই 'ইমেজ' তৈরী করতে চাইছেন।

সন্তোষ রায় বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করতে চাইছেন। এর নজীর যে নেই, তা নয়। পশ্চিমবাংলার স্বর্গত নেতা হেমন্ত বসু যখন কংগ্রেস দল ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন তিনি বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করে আবার জনমত গ্রহণ করেন। সন্তোষবাবু সেই পথ নিতে চাইছেন। যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ এমনকি সি পি আই তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছেন। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবু এতে রাজী হচ্ছেন না। তিনি সম্মতি দিতে দেরী করে চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি না দেবার একটা বিশেষ কারণ আছে। সন্তোষবাবু যদি নির্বাচনে দাঁড়ান তা হলে ভোটারদের কাছে তিনি কি বলবেন? ওয়াংচু কমিশন থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যে কাদা লেগেছে, তা ধুয়ে মুছে দিয়ে তিনি কি অন্যের গায়ে কাদা ছুঁড়ে মারবেন না? ইতিমধ্যে খেলা শুরু হয়েছে। সুনীতিবাবু তো প্রকাশ্যে আক্রমণ করছেন। ডালহৌসী স্কোয়ারে দেওয়ালে দেওয়ালে অনেক দিন পরে মুখ্যমন্ত্রীর নামে পোস্টার লাগানো হয়েছে। সিদ্ধার্থবাবু দিল্লী গেলেই পত্র-পত্রিকায় গুজব রটানো হচ্ছে, তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে দিল্লী চলে যাচ্ছেন। আর তাঁর পক্ষে প্রতিবাদ করা এক কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোদ্দা কথা, জল বেশ ঘুলিয়ে উঠেছে। এর মধ্যেই যুব কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীর ওপর চাপ দিচ্ছেন, সন্তোষবাবুকে নির্বাচনে দাঁড়াতে দেওয়া হোক। কারণ তা না হলে তাঁর 'ইমেজ' নষ্ট হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী চুপ করে বসে রয়েছেন।

সিদ্ধার্থবাবু যে চুপ করে বসেই আছেন, তাও বলা চলে না। তিনি সব দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। তবে সামনে যে বিপদ আসছে, তা আজ আর কারোর বুঝতে অসুবিধে নেই। বিধানসভার বাজেট অধিবেশন বসবে। সুনীতিবাবু তো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরী। তিনি নিজে বলছেন, একাই তিনি বিধানসভা ফাটাবেন। সরকারের মুখোশ খুলে দেবেন। সরকারের হঠাতে কি এর মধ্যে চীফ মিনিস্টার পড়বেন কিনা, তা অবশ্য জানা যায় নি। তবে তিনি এ কথাও জানিয়েছেন, নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতিমধ্যে এম এল এ-দের মধ্য থেকে সই সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হয়েছে। একদিকে বিজয় সিংহ নাহার কিন্তু, অন্যদিকে সন্তোষবাবু ও সুনীতিবাবু প্রতিশোধের চিন্তায় মেতে উঠেছেন। এর ওপর ছাত্র পরিষদ যুব কংগ্রেস এবং সংগ্রাম কমিটি ও শিক্ষা বাঁচাও কমিটি রয়েছে। সব মিলিয়েই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আশংকা। সবচেয়ে তাৎপর্যের কথা হলো, ঝড়ের সংকেত পাওয়া সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী না, থেমে নিজের 'ইমেজ' তৈরী করে চলেছেন। এখন দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

কৌটিল্য

এই বাংলার খবর

রেশনে সংকট

ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার মানুষের গুরুতর সংকটই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর। এফ সি আই কর্মচারীরা ধর্মঘট শুরু করেন জানুয়ারীর শেষে তাঁদের কয়েকজন ছাঁটাই সহকর্মীর পুনর্নিয়োগের দাবিতে। চিনি পাওয়া নিয়ে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল কয়েকদিন আগে থেকেই, কিন্তু এই ধর্মঘট শুরু হওয়ার পর অনেক এলাকাতেই চাল-গম পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হয় যে সরকারি গুদামে খাদ্যশস্যের কোনো অভাব নেই কিন্তু সেই খাদ্যশস্য গুদাম থেকে খালাস করে রেশন দোকানে পাঠানো যাচ্ছে না ধর্মঘটের ফলে।

গুদামের সামনে থেকে ধর্মঘটী কর্মচারীদের সরিয়ে খাদ্যশস্য খালাস করার চেষ্টা করেন এফ সি আই-য়ের কর্তারা। তার ফলে ধর্মঘটীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বেধে যায় একাধিক জায়গায়। ফেব্রুয়ারীর তিন তারিখে কলকাতায় ক্লিয়ারা-পোর্ট গুদামে এফ সি আই-এর কর্তা খাদ্যশস্য খালাস করাতে গেলে ধর্মঘটী কর্মীরা সেই সব কর্তাকে আটক করেন। পুলিশ তাঁদের মুক্ত করতে গেলে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। ধর্মঘটীদের মধ্যে ৩০ জন জখম হন। ৮৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের [illegible] জখম হন। পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয়। পরদিন আবার [illegible] একই ব্যাপার ঘটে। জখম হন দশজন ধর্মঘটী এবং [illegible] জন সাতজন পুলিশ কর্মচারী।

এফ সি আই কর্মীদের এই ধর্মঘটের ধাক্কা গিয়ে লাগে রেল ওয়াগন খালাসেও। খাদ্যশস্য বোঝাই বহু ওয়াগন রেল ইয়ার্ডে আটকে থাকে। গুদাম থেকে মাল খালাসের জন্যে রাজ্য [illegible] বাহিনীকে নিয়োগ করেন। ধর্মঘট মিটিয়ে ফেলার জন্যে বেগমখালী থেকে খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ এফ সি আই কর্মীদের কাছে আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী [illegible] কাজে দিল্লী চলে গেলেও সেখান থেকে [illegible] ধর্মঘট [illegible] খাদ্যমন্ত্রীর মারফত অনুরোধ জানান। কংগ্রেসী ইউনিয়নের ডাকেই এই ধর্মঘটের শুরু।

দুর্ঘটনার হিড়িক

এই কিছুদিন আগে কলকাতার পুলিশ কমিশনার জানিয়েছিলেন যে এই মহানগরীতে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমছে। পুলিশের এই দাবিকে ব্যঙ্গ করার জন্যেই যেন কয়েকদিন পর পর কয়েকটি দুর্ঘটনায় কয়েকজন মারা পড়লেন। সোমবার ফেব্রুয়ারীর তিন তারিখ বৌবাজার-কলেজস্ট্রীট মোড়ে গোয়েঙ্কা কলেজের ছাত্রী মিত্রা সেনগুপ্তা বাস চাপা পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান। মঙ্গলবার রামচন্দ্র গুপ্ত নামে এক কিশোরকে প্রাণ হারাতে হলো আলিপুর এলাকায় একটি সরকারি বাসের চাকার তলায়। বুধবার বালিগঞ্জ থানা এলাকায় আমীর আলি এভিনিউতে একটি বেসরকারি বাসের সঙ্গে একটি ট্যাক্সির সংঘর্ষে জন বারো জখম হন। তাঁদের মধ্যে যিনি ঐ ট্যাক্সির চালক তিনি পরে হাসপাতালে মারা যান। তারপর বৃহস্পতিবার উত্তর কলকাতায় আবার একটি বেসরকারি বাসের চাকার তলায় পড়ে একটি তরুণের জীবনান্ত ঘটে। মাঝে একদিন বাদ দিয়ে শনিবার বালিগঞ্জে গড়িয়াহাট রোডে মিনি বাসের সঙ্গে টেম্পোর ধাক্কায় মারা পড়েন এক যুবক। ঐ দিনই হাওড়ায় এক বৃদ্ধ নিহত হন বেসরকারি বাস চাপা পড়ে।

মিত্রার মৃত্যু ঘটে তার কলেজের সামনেই। তার উত্তেজিত সহপাঠীরা সঙ্গে সঙ্গে বাসটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। দমকল কর্মীরা এসে পৌঁছলে তাদের সেই আগুন নেবাতে দেওয়া হয় নি। ছাত্ররা যানবাহন চলাচলও বন্ধ করে দেয়। ছাত্র নেতারা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে অবস্থা আয়ত্তে আনেন। পরদিন গোটা শহরে ছাত্ররা ধর্মঘট করেন এই দুর্ঘটনার প্রতিবাদে। উত্তর কলকাতার দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করেও রীতিমতো উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। অপরাধী বাসটি পালাতে সক্ষম হলেও উত্তেজিত জনতা অপর একটি বেসরকারি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। হাওড়াতেও দুর্ঘটনার পর বাস চলাচল ব্যাহত হয়। দুর্ঘটনার এই হিড়িক দেখে সরকারি মহল উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছেন কী করা যায়।

নিম্ন দামোদর সংস্কার

পশ্চিমবাংলার সেচমন্ত্রী এ বি গণি খান চৌধুরী জানিয়েছেন নিম্ন দামোদর সংস্কার প্রকল্পের কাজ এবার শুরু হবে। অবশ্য নতুন করে শুরু হবে বলাই বোধহয় ভালো কারণ কয়েক বছর আগে একবার শুরু হওয়ার পর এই কাজ মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। তার একটা কারণ, এই প্রকল্প রূপায়ণ নিয়ে হাওড়া আর হুগলি থেকে নির্বাচিত বিধানসভা সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ। সেচমন্ত্রীর কাছ থেকে জানা গেল হুগলি থেকে নির্বাচিত এম-এল-এরা এই প্রকল্প সম্পর্কে আর কোনো আপত্তি জানাবেন না [illegible] কথা দিয়েছেন। এই প্রকল্পের জন্যে মোট প্রায় ৪০ কোটি টাকা খরচ হবে। তার মধ্যে ১৯৭৫-৭৬ সালে পাঁচ কোটি টাকা খরচের প্রস্তাব করেছে সেচ দপ্তর।

'৭১ সালের গোড়ায় নিম্ন দামোদর সংস্কারের কাজ শুরু হয়। দামোদর উপত্যকা প্রকল্প বা ডি ভি সি বাংলা-বিহারের কিছু লোকের পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিলেও হাওড়া হুগলি বর্ধমান মেদিনীপুরের প্রায় ৮০০ বর্গমাইল এলাকার মানুষের জন্যে ডেকে নিয়ে আসে অভিশাপ। এই এলাকা সম্পর্কে ডি ভি সি তাদের দায়িত্ব পালন না করায় বন্যার জলনিকাশের কোনো ব্যবস্থা হয় নি। তার ফলে বছরের পর বছর লাখ লাখ মানুষ চরম দুর্ভোগ ভুগছেন। সেই জন্যেই নিম্ন দামোদর সংস্কারের দাবি ওঠে। কিন্তু সেই দাবি অনুযায়ী কাজ শুরু হলেও তা মাঝপথে আটকে যায়। আমতা থেকে শ্যামপুরের গড়চুমুক পর্যন্ত নিকাশী খাল কাটা হয় দু কোটি টাকা খরচ করে। তারপর আর বিশেষ কিছু কাজ হয়নি। এখন গড়চুমুকে স্লুইস গেট তৈরি এবং মুণ্ডেশ্বরী নদীর বাম তীরে বাঁধ বাঁধার কাজ শুরু হবে। এদিকে ঐ এলাকার একটি সংগঠনের নেতৃত্বে কিছু লোক দ্রুত এই প্রকল্প রূপায়ণের দাবিতে সরকারি অফিসের সামনে ধর্মঘট শুরু করেছেন।

জঞ্জাল সাফাই

কলকাতার রাস্তা থেকে জঞ্জাল সাফাইয়ের সমস্যা কিছুতেই সামলাতে না-পেরে পৌর কর্তারা শেষ পর্যন্ত নতুন পথ ধরেছেন। জঞ্জাল সাফাইয়ের পথে অন্তত একটা বাধা হলো পৌরকর্মীদের ঠিকমতো সামলানো মোটেই সহজ নয়। পৌর কর্তারা এবার তাই এক শ্রমিক নেতা শান্তি সেনকে এই দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে ঐ বিভাগের অতিরিক্ত ডেপুটি ডিরেকটর পদে নিয়োগ করেছেন। জানুয়ারীর ২৭ তারিখে তিনি এই নতুন কাজে যোগ দিয়েছেন। পৌর প্রশাসক জানিয়েছেন, এই ব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

শান্তিবাবুর মতে, কলকাতার জঞ্জাল সাফাই নিয়ে ভাড়া লরির মালিকেরা বেশ পয়সা লুঠছেন। পৌরসভার নিজের যথেষ্ট লরি নেই বলে লরি ভাড়া করতে হয়। এইসব ভাড়া লরি অনেক সময়ে জঞ্জাল না-তুলেই শুধু কাগজে-কলমে ট্রিপ দিয়ে আসে। অনেক সময় যতোটা জঞ্জাল তোলার কথা তা তোলে না। শান্তি-বাবু এই ভাড়া লরির দুর্নীতি বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। লরি ভাড়া বাবদ খরচের পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে ৮০ লাখ টাকা। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ায় ইতিমধ্যেই ভাড়া লরির ট্রিপের সংখ্যা রীতিমতো কমে গেছে। জঞ্জাল সাফাই বিভাগের অনেক কর্মীর এখন কাজ নেই, কারণ পৌরসভার নিজস্ব গাড়ির অভাব। শান্তি-বাবু ঐসব কর্মীকে এখন ভাড়া লরির দুর্নীতি বন্ধের কাজে লাগিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট

এই বাংলার অন্তত দুটি বিশ্ববিদ্যালয় সংকটের মুখে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কিছুদিন ধরে বন্ধ। তার চারদিকে পুলিশ পাহারা। ছাত্র পরিষদের সভাপতি কুমুদ ভট্টাচার্য অভিযোগ করেছেন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা পুলিশ শিবির। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার প্রতিবাদে ছাত্র পরিষদ 'কালা দিবস' পালনের ডাক দেন। নদীয়া জেলায় একদিন ছাত্র ধর্মঘটও হয়ে গেল। বেতন হার সংশোধন নিয়ে কর্মচারী ইউনিয়নের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিবাদের পরিণতিতেই উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে অচলাবস্থা। কর্মচারীদের প্রধান দাবি বেতন হার সংশোধন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ অরবিন্দনাথ বসুর মতে, কর্তৃপক্ষ এ-ব্যাপারে কিছু করতে অপারগ। তাঁরা এ-বিষয়ে পি বি মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টের অপেক্ষায় আছেন। গত কয়েক বছরে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি বাবদ অতিরিক্ত ৩০ লাখ টাকার মতো খরচ করা হয়েছে। তার ফলে গবেষণা এবং অন্যান্য জরুরি কাজের ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু কর্মচারীদের দাবি, মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ বা গ্রহণের আগেই বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। এই দাবি আদায়ের জন্যে কর্মচারীদের কয়েকজন অনশনও শুরু করেন। কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে ক্লাস হওয়ায় বাধা পড়লেও বিভিন্ন পরীক্ষা অবশ্য ঠিকমতোই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১০।২।৭৫ —দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

ভুট্টোর অস্ত্র ভিক্ষা
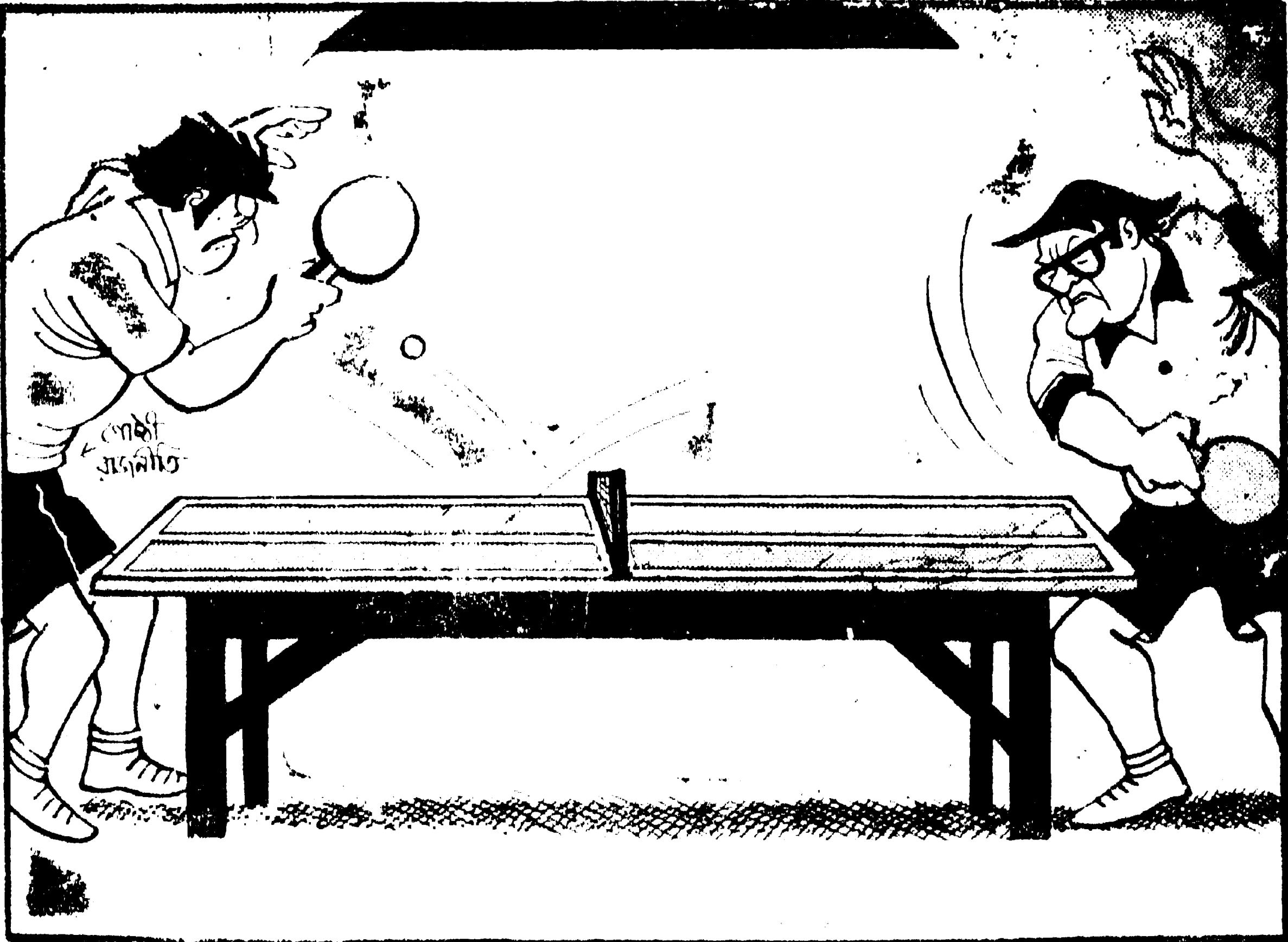
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফর করতে গিয়ে আমেরিকান অস্ত্রের জন্য যে প্রার্থনা জানিয়ে এসেছেন তাতে ওয়াশিংটন কি সাড়া দিয়েছে? এই সফরের শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইস্তাহারে যদিও এই প্রশ্নের উত্তর নেই তা হলেও প্রকাশিত সংবাদ থেকে অনুমান করা যায় যে, ভুট্টো সেদেশ থেকে একেবারে নিরাশ হয়ে ফেরেন নি। ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, ভারত ও পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র বিক্রয়ের উপর এখন যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেটা তুলে দেওয়া হবে কিনা আগামী দু-তিন মাসের মধ্যে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

এদিকে ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তায় ভুট্টো জানিয়েছেন যে মারণাস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হচ্ছে এবং তাঁর সরকার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ক্ষেপণাস্ত্র ও ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র কেনার উপরই অগ্রাধিকার দেবেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এখন যদিও তিনি আমেরিকা থেকে জঙ্গী বিমান চাইছেন না তাহলেও একবার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলে পর তিনি তাঁর অস্ত্র-ভিক্ষার তালিকায় জেট জঙ্গী ও বোমারু বিমানও অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

ভুট্টোর এই সফরের প্রাক্কালেই মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব আশ্বাস দিয়েছিলেন যে উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টায় ও সিমলা চুক্তির রূপায়ণে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এমন কোন কাজ আমেরিকা করবে না। এই আশ্বাস সত্ত্বেও আমেরিকা এখন তার নীতি বদলাচ্ছে এই সংবাদে ভারত স্বভাবতই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ভারতের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী যশোবন্তরাও চাবন ডঃ কিসিঞ্জারকে এক পত্র লিখে বলেছেন যে, মার্কিন অস্ত্র-সাহায্য সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তনে এই উপমহাদেশে আবার উত্তেজনা বাড়বে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তোলার জন্য ধীরে ধীরে যে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা গুরুতরভাবে ব্যাহত হবে।

ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের উপরও এই মার্কিন নীতি পরিবর্তনে যে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে চাবন লিখেছেন, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গঠনমূলক ভিত্তিতে সুসংহত সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য যে প্রয়াস চালাচ্ছে পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার নীতি গ্রহণ করলে সেই প্রয়াসও গুরুতরভাবে ব্যাহত হবে।

আমেরিকা সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে ভুট্টো কাশ্মীরবাসীদের হরতাল পালনের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাতেই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যে পাকিস্তান কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করতে উৎসুক। এখন মার্কিন অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা ঐ উত্তেজনায় আগুনে নতুন ইন্ধন যোগাবে বলেই নয়াদিল্লীর বিশ্বাস।

লক্ষ্য করার বিষয় হল ভুট্টো যখন আমেরিকায় গিয়ে ওয়াশিংটনকে তার পুরান পাকিস্তান-ঘেঁষা নীতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই দিল্লীতে একটি ভারত-মার্কিন সাব কমিশনের অধিবেশন হচ্ছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার শেষে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে তাতে জানান হয়েছে যে আগামী ১৩ ও ১৪ মার্চ ওয়াশিংটনে ভারত-মার্কিন যুক্ত কমিশনের বৈঠক হবে। ঐ কমিশনের বৈঠক উপলক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী চাবন আমেরিকায় যেতে পারেন। যদি যান তাহলে অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে মার্কিন অস্ত্রসাহায্য সংক্রান্ত প্রসঙ্গটি নিয়ে তিনি ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে অনুমান করা যায়।

•

গফুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

গত ৮ ফেব্রুয়ারী দিনের অধিকাংশ সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাজধানীতে অনুপস্থিত ছিলেন। বারাণসীতে একটি জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় নয়াদিল্লীতে ফিরেই তাঁকে কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া, আইনমন্ত্রী এইচ আর গোখলে প্রভৃতির সঙ্গে একটি জরুরী বৈঠকে বসতে হল, কেননা একটি জরুরী সমস্যা প্রধানমন্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করে ছিল। সমস্যাটা হল—বিহার বিধান মণ্ডলীর কংগ্রেস দলের বিদ্রোহী সদস্যদের দাবী মেনে নিয়ে গফুরকে দলের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে কিনা।

ঘটনার বিচিত্র পরিহাস এই যে বারাণসীর জনসভায় শ্রীমতী গান্ধীর প্রধান বক্তব্য ছিল একতার সাহায্যেই দেশের সব সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। তাঁর ঐ উপদেশের লক্ষ্য ছিল সরকার-বিরোধী দলগুলি। অথচ, বারাণসী থেকে ফিরেই তাঁকে যে সমস্যার দিকে মনোযোগ দিতে হল সেটা তাঁর নিজের দলের ভিতরই অনৈক্যের সমস্যা এবং সেই অনৈক্য এমন একটি রাজ্যে যেখানে কংগ্রেস সরকার-বিরোধী দলগুলির কাছ থেকে শক্তিশালী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী গফুরের গদী ও দলের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধপন্থীদের মাঝখানে এখন শুধু কংগ্রেস হাইকমান্ড দাঁড়িয়ে আছেন। গতবার গফুর যখন দিল্লীতে যান তখনই তিনি কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছ থেকে এই আশ্বাস নিয়ে এসেছিলেন যে এখন তাঁকে তাঁর পদ থেকে সরান হবে না। এই ভরসা পেয়ে তিনি অতিরিক্ত আত্ম-বিশ্বাসের বশে কয়েকটি ভুল করে বসলেন। প্রথমত, জয়প্রকাশ নারায়ণকে গ্রেপ্তার করার হুমকী দিয়ে তিনি কেন্দ্রকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেললেন। দ্বিতীয়ত, পাটনায় ফিরে গিয়েই তিনি বিধানমণ্ডলীর কংগ্রেস দলের কার্যনির্বাহক সমিতি ভেঙ্গে দিয়ে ও ঐ সমিতি থেকে তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর অনেক সদস্যকে বাদ দিয়ে নতুন সমিতি গঠন করলেন। গফুরের এই কাজে তাঁর বিরুদ্ধ-পন্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। প্রকৃত পক্ষে, তাঁদের এই বিক্ষোভ দলনেতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের আকার নিল। বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর দুই নেতা ডাঃ জগন্নাথ মিশ্র ও কেদার পাণ্ডে প্রকাশ্যে গফুরের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তাঁরা দাবী করলেন হয় আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী তারিখে বিহারের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার আগে গফুরকে দলের নেতার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক অথবা ঐ অধিবেশনে তাঁদের (গফুর-বিরোধীদের) অনুপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হোক। শুধু তাই নয় ডাঃ মিশ্র ও পাণ্ডে রাজ্যপাল আর ডি ভাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে এলেন যে যেহেতু গফুর তাঁর দলের আস্থা হারিয়েছেন তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক।

এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী গফুরের ভবিষ্যৎ এখন কংগ্রেস হাইকমান্ডের হাতে। গফুরের প্রতি তাঁরা যে সম্পূর্ণ প্রসন্ন তা অবশ্য নয়। তিনি যেভাবে বিধানমণ্ডলীর কংগ্রেস দলের কার্যনির্বাহক সমিতি ভেঙে দিয়ে তাঁর বিরোধীদের চটিয়েছেন তাতে নয়াদিল্লী বেজার হয়েছেন। কিন্তু, এখন গফুরকে সরাবার উপযুক্ত সময় নয় বলে তাঁরা মনে করেন। একজন মুসলমান মুখ্য-মন্ত্রীকে হঠিয়ে দেওয়ার কি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সেটিও কংগ্রেস নেতাদের বিবেচনা করতে হচ্ছে। তাঁরা আশা করছেন যে তাঁদের কঠোর মনোভাবের কথা পরিষ্কার বুঝতে পারলেই গফুর-বিরোধীদের নিবৃত্ত হতে হবে। প্রসঙ্গটি বিহারমণ্ডলীর কংগ্রেস দলের সভায় পেশ করলে গফুরই জয়ী হবেন এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর হয়ত কংগ্রেস হাইকমান্ড গফুরকে দলের আস্থা ভোট নিতে বলতে পারেন।

১০-২-৭৫

—পুণ্ডরীক

কবিতা

নোটিশ ॥ শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

এই একখানা ঘর...যার না আছে মুক্তি না সর্বনাশ...তবু
থাকুক। যেভাবে জীবনটা থাকে অর্থাৎ কোথাও যাবার নেই বলেই
থাকে। শোকহীন, স্মৃতিহীন। স্বচ্ছলতা ছিল
যখন বাবাদের বাবারা থাকতেন
যখন সরল ব্রাহ্মণপল্লীর ধার ঘেঁষে বঙ্করাজ গোক্ষুরের মত পথ
চলে যেত শৈব বা শাক্তপীঠের দিকে। আর সেই সব
মধুসঞ্চারী ব্রাহ্মণীরা...
থাক সে সব কথা। এখন ঘরের ভূতুড়ে দেওয়ালগুলোর কথাই চলুক
আর মরচেপড়া বিকল দেওয়াল ঘড়িটার কথা।

—তোমাদের ছিল কি শৈশব...ঘুমপাড়ানি মায়ের গান?
—আমার ছিল পেটরোগা দিন আর দিনরাত্রির মত লম্বা একখানা
ইচ্ছে যা শুধু বেড়েই চলতো...।
—আর কিছু না?
—থাকলে তো বলতাম ছিল জীবনখানা ঘাটে বাঁধা।
এখন মনে পড়ে না আর কি ছিল মনে পড়ে না
এমনকি সেই দ্রোণলতার মত কিশোরীটির কথাও না।
দেখি চুপি চুপি নড়ে যাচ্ছে ঘরের দেওয়াল...টলে যাচ্ছে,
ভিৎ। পাশের জমিতে বাড়ি উঠল কালোয়ারদের।
আর কিছুই নয়। এখন খটখটে দিনের গায়ে
ঘরের ভূতুড়ে ছায়াটা পড়েছে হুমড়ি খেয়ে...বালি খসছে...পলেস্তারা।

ভাবছি ঘরবদলের নোটিশখানা আসলো বুঝি?

গভীর দুঃখ ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায় ॥ শ্যামা দে

গভীর বেদনায় আমি অবনত হয়ে গেলে
আমার সামনে ধু ধু মাঠ ছাড়া
আর কিছু দেখি না।
নিদাঘের উত্তপ্ত আকাশ থেকে
ঝরে পড়ে হৃদয়-পোড়ানো আগুন—
আমার সমগ্র সত্তাকে
পুড়িয়ে ছাড়খার করে দেয়।

তখন আমার পরিচিত বিশ্বমণ্ডলী
কোথায় হারিয়ে, আমি একমাত্র
একক হয়ে যাই, জানি না।
বিংশ শতাব্দীর ভালবাসা নামক
পোশাকী সজ্জাটাকে দুহাতে
ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।

এরপর আমি যেন
কোথায় কার কাছে আমার
সর্বকিছু সমর্পণ করে
ভীষণভাবে হাল্কা হতে চাই।

রাখাল ॥ কমল চক্রবর্তী

বড় পথশ্রম হোল, বড় বেশী পথিক হয়েছ অকাতরে
এই যতিহীন দীর্ঘ পথবাস, কার ছিল, কার মুক্তি
প্রবাস রয়েছে বহুকাল
যেখানে বাতাস বয়, খোলামাঠে অশোকে আসানে
তারই পাশে শিয়াকুলে হাওয়া, পঙ্গপাল উপেক্ষাই করে
শিহরলতায় কাঁপে ফুল, এসব রাখাল জানে
তার থেকে বহু কম জানে বৈজ্ঞানিক।
সে কখনও বাতাস দেখেনি, দেখেছে পারদ
কাচের টিউবে তার শীত গ্রীষ্ম, হেমন্তের উদাসী স্তম্ভন।

তাদের অসুখ নিয়ে চর্চা করে দুঁদে ডাক্তারেরা
গ্যাংগ্রিন, অতিসার সমস্ত অসুখ ঘিরে তার ফলাফল
অমিত বিক্রমে খেলা করে জীবাণুর প্রকৃত ভুবনে।
এখানেই শেষ হলে ভালো হোত, ভালো হোত রাখালের
ব্যাধিগ্রস্ত পা
কোনদিন হাসপাতাল অতিক্রম হত না সম্ভব।

জীবাণু রহস্য নিয়ে সেই ভালো জানে তার গরুগুলি
শীতের দুপুরে চলে যায়, ছোট ছোট প্রহর পেরিয়ে
এক বিচুলির বন থেকে আর এক জঙ্গলে
ফেরে কামধেনু, ঘন ক্ষীরে ফুলে ওঠে বাঁট
ডাক্তার জানেন কিছু? জীবাণু রহস্য বোঝে ভিখিরি রাখাল।

রোজনামচা

ফাদার দ্যতিয়েন

আলো মেয়েটি চালাক : শ্রীশ্রীপ্রজাপতির কৃপায় মানিকতলাবাসী অমুকের পুত্র তমুকের পৌত্র মান্টু নামক ছোকরার সঙ্গে শ্রীমতীর শুভ পরিণয় যখন পাকা হল ওর বান্ধবীদের কাছে প্রেরিত নিমন্ত্রণ পত্রে এক পুনশ্চ জুড়তে ও ভুলল না : 'পাঁজাটিভাল আসবি কিন্তু...আর শোন্‌, রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রথম (দ্বিতীয় তৃতীয়...) খন্ডটা নিয়ে আসবি।' এমনিভাবে আজ উক্ত রচনাবলীর পুরো সেটটা নবদম্পতির বইয়ের শেলফে সগৌরবে বিরাজ করছে।

...না বই পড়ার—এমন কি ধুলো ঝাড়ার সময়টুকুও আলোর আর নেই : ওর বিবাহিত জীবনের প্রথম বর্ষসংক্রান্তির পূর্বেই শাশুড়ীর সাগ্রহ প্রার্থনার উত্তরে ষষ্ঠীদেবীর করুণা বাহুল্যস্বরূপে দুটি কাঁচকাঁচা প্রাণ, সরকারি লাল ত্রিকোণ অমান্য করে আলোর পতিসংসারের চিরদিনের আনন্দ (আর মাস-কাবারের মাথা-ব্যথা) বাড়াতে এসেছে। যমজ মেয়েদের নাম : রাধা ও বৃন্দা।

আলোর মতো সবার সুবুদ্ধি নেই। এই ধরুন নোকনের কথা : নিমন্ত্রপত্রে কোনো পুনশ্চ না লেখার দরুন বাসরগৃহে স্তূপীকৃত উপহারের মধ্যে সে গুনে দেখল 'হাজার বছরের প্রেমের কবিতার' আধ ডজন কপি। উৎসর্গপত্রগুলি কালিতে লেখা : মুছতে হলে কৌশল লাগে।

বাংলাদেশের মেয়েদের সমস্যাও অনুরূপ : ওদের পক্ষেও বিবাহের উপলক্ষে বেহেস্তের পুঁজি (মূলধন) বেহেস্তের কুঞ্জি (চাবি), বেহেস্তের জেওর (ভূষণ) প্রভৃতি ধর্মীয় পুস্তকের একাধিক নমুনা উপহার পাওয়া বিরলদৃষ্ট নয়। বইগুলো পড়ে জানা গেল, বেহেস্তের হুরগণের কাহারও মুখ হইতে এক বিন্দু থুথু যদি দুনিয়ার কোনো নদীতে পড়িত তবে ঐ নদীর সমস্ত পানিই স্বর্গীয় সুগন্ধ প্রাপ্ত 'হইত...' কিংবা 'হুরগণের সহিত বেহেস্তবাসী পুরুষগণের যে-মিলন ঘটিবে তাহার তুলনায় দুনিয়ার মিলন-সুখ লক্ষ ভাগের এক ভাগও নহে...' এমন কি আপনি আরাম-কেদারায় বসিয়া স্বাচ্ছন্দ্যে হুকো টানিতে পারিবেন কেহই কল্কেটা পাওয়ার জন্য হাত বাড়াইয়া আপনার সেই আরামের ব্যাঘাত ঘটাইবে না।'

ও-সব পুস্তকে অবশ্য শুধু বেহেস্তের বিবরণ নয় দৈনন্দিন জীবনের ইসলামীয় সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ মেলে : ধাত্রীর হাত থেকে সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুকে কোলে গ্রহণ করে একজন বুজর্গ আলেম (শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত) তার কানে আল্লাতালার নাম আউড়িয়ে স্বল্প মধু বা খোরমা চিবিয়ে লালার মতো করে তাকে খাওয়াবেন...আপনার সপ্তমবর্ষীয় বালক-বালিকাদের একত্রে স্কুলে পাঠাবেন না... দশমবর্ষীয় ছেলেমেয়ে নমাজ পড়তে না চাইলে ওদের মেরেপিটে পড়াবেন...চতুর্দশবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দেবেন...দাড়ি লম্বা করে রেখে মোচ খাট করে ফেলবেন...অর্ধেক রোদ্রে অর্ধেক ছায়ায় বসবেন না...জুতো কিংবা পায়জামা পরতে হলে সাইকেলে কিংবা মোটরে চড়তে হলে আগে ডান পা ওঠাবেন; খুলতে হলে, নামতে হলে বাঁ পা...

'বেহস্তে' সাহিত্যে প্রচারিত নীতি-শিক্ষা উচ্চ ও সূক্ষ্ম মানের : আপনার ছেলেমেয়েদের হাত দিয়ে দানখয়রাত করুন; বাচ্চাদের আপনি যা-কিছু দেন, ওদের খেলার সাথীদের সঙ্গে ভাগ করার অভ্যাস করান...তিনদিনের বেশি কারো সঙ্গে আড়ি করবেন না...খাওয়ার জিনিস নীচে পড়লে তা উঠিয়ে পরিষ্কার করে খেতে ঘৃণাবোধ করবেন না...অন্যদের খাওয়া শেষ হওয়ার আগে একা একা উঠবেন না অল্প অল্প খেতে থাকবেন অন্যেরা যাতে লজ্জায় পড়ে ক্ষুধার্ত না থেকে যান...সংকটাপন্ন কোনো ব্যক্তি কোনো মাল বিক্রি করতে এলে ওর দুর্দশার সুযোগ নেবেন না, বরং ন্যায্য-মূল্যের অতিরিক্ত কিছু দিয়ে ওকে সাহায্য করুন...

নিষিদ্ধ কার্যের তালিকা অবশ্য অমুসলিম পাঠককে সন্ত্রস্ত করে দেবে : শুয়োর শরাব কচ্ছপ সুদ [illegible] ঘুষ খাওয়া পাপ...সিনেমা দেখা-ও [illegible], তাতে সময় সম্পদ স্বভাব স্বাস্থ্য ও ইমান নষ্ট হয়...ট্রেনের [illegible]শিস আর যুদ্ধক্ষেত্রের রণবংশী প্রভৃতি বাদ্য ছাড়া সারাঙ্গী, বেহালা হারমোনিয়াম বাঁশী সেতার, ঢোল তবলা করতালাদি সর্বপ্রকার বাজনা না-জায়েজ (অননুমোদিত)...শিকারী ও পাহারাদার কুকুর ছাড়া কুকুর পালা অন্যায় ...কোনো মূর্তি, এমন কি শিশুদের খেলনারূপে ব্যবহৃত রবারের পুতুল পর্যন্ত রাখা নিষেধ; কেউ ছবি কিংবা ফটো নষ্ট করে ফেললে মালিক তার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবে না...নিন্দনীয় খেলার মধ্যে শুধু তাস ও পাশা নয় 'কেরামবোর্ড' ঘুড়ি ও আতশবাজিও স্থান পেয়েছে; জীবন-বীমা জুয়ার সামিল...

বলা বাহুল্য প্রতিটি বিষয়ে নিষেধের গুরুত্ব ধার্য করা প্রয়োজন : কাঁকড়া আর পিঁয়াজ উভয় খাদ্য নিষিদ্ধ তবে কাঁকড়া খাওয়া প্রায় হারাম, পিঁয়াজ খাওয়া প্রায় হালাল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার

মতভেদ আছে ঃ মহানবী বলতেন, বিদ্যা-শিক্ষার জন্য আবশ্যক হলে সুদূরে চীন দেশেও যাবে। কথাটা কি নারীসমাজে প্রযোজ্য? এক 'বেহেশ্‌ত' পণ্ডিতকে পড়েবেন, মেয়েদের দুনিয়ার বিদ্যা বেশি শিখাইবে না: লেখা এত পরিমাণ শিখাইবে যাহাতে আবশ্যকীয় হিসাব ও চিঠিপত্র লিখিতে পারে।" অন্য বইয়ে দেখবেন নূরজাহান জাহানারা, জিন্নাতুন্নিসা, রিজিয়া প্রভৃতি বিদুষীর ভূয়সী প্রশংসা, যদিও লেখকের মতে তুরস্ক ও যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশের মেয়েরা সীমা ছাড়িয়ে চলেছে।

মুমিনেরা ধর্মীয় উত্তরাধিকারে পেয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা ঃ তাতে সুনির্দিষ্ট হয়েছে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সম্বন্ধীয় বিশ্বজনীন বিধান, সামাজিক, রাজনীতিক, অর্থনীতিক, পরিবর্তনাতীত নিয়মাবলী। নেকটাই পরা বিধর্মী প্রথা ঃ নেকটাই-এর গিরা বাঁধাটা খৃষ্টানদের ধর্মীয় প্রতীক; কপালে 'সিন্দুরের ফোঁটা দেওয়া কিংবা সাড়ি পরা অন্যায় ঃ 'আমাদের মা ফাতেমা, মা আয়েশা প্রভৃতি কখনও শাড়ি পরেন নাই।'

এ সব আমি পড়ছিলাম নিবিষ্টচিত্তে সদ্য বিবাহিতা শামিম-আরার বাড়ির বারান্দায়। বাঙ্গালীদের সনাতনী প্রথা মতো মেয়েটি আমাকে বসিয়ে একটা বই পড়তে দিয়ে চা বানাতে গিয়েছে। চা বানানোর অর্থ—সুধী পাঠককে স্মরণ না করালেও চলে—পাড়ার কোনো কয়লা ভাণ্ডার থেকে শুরু করে মুর্গি আনা, ওমলেট করা পর্যন্ত। বইটির নাম 'বেহেশ্‌ত জেওরা'র উৎসর্গ করেছিল সহপাঠিনী সাফিয়া খাতুন শামার বিয়েতে অবিলম্বে নিজের ভুল বুঝে উৎসর্গকারিণী ...ক নামটা কেটে লেখল ঃ শামিম-আরার বিয়েতে। মুমিনের বিয়ের দিকে জানবেন, দেবদেবীর পরোক্ষ উল্লেখও অলক্ষণে।

পড়তে পড়তে হঠাৎ দেখলাম বইটির এক পৃষ্ঠা উপরের কোণটা মুড়ে দেওয়া ঃ 'স্বামীর সহিত প্রণয়-মহব্বত রাখিয়া সুখময় জীবনযাপনের উপায়। উপায় বিবিধ ঃ কোনো কাপড় কিংবা কোনো জিনিস পছন্দ হলে স্বামীর আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে মনের কথা মনেই চাপা দিয়ে রাখবেন, স্বামী যদি আপনাকে বলেন ...সারা রাত হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে, তবে তৎক্ষণাৎ তা-ই করবেন, তিনি রাগ করলে নিজের কোনো দোষ না থাকলেও, আপনি কাকুতি মিনতি করে হাত জুড়ে, পা ধরে অপরাধ স্বীকার করে মাফ চাইবেন, মনে রাখবেন 'স্বামীর সহিত আপনা-আপনি প্রণয় ও মহব্বত হয় না প্রাণপণে স্বামীর খেদমত করিতে হয় প্রাণে সব সময় স্বামীর ভয় ও আদর রাখিতে হয়।' এদিকে আপনার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে তবে কস্মিনকালেও স্বামীর কোনো খেদমত নেবেন না ঃ পা টেপা, বাতাস করা প্রভৃতি খেদমত পিতার কাছে নেওয়া পুত্রের পক্ষে যেমন অসম্ভব, আরো বেশী কল্পনাতীত স্বামীর কাছে ভার্যার পক্ষে।

চা আসার আগেই জনাব হাসান জমান হাজির। ভদ্রলোক শামিম-আরার কর্তা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক। শেষ ব্যাখ্যাটা ওঁকে শোনালাম অধিকারী সুলভ অভিমতের আকাঙ্ক্ষায়। স্মিত হাসি হেসে তিনি বললেন, 'আমার বিবি যেদিন ওর সাহেবকে গোলাম বানাতে অস্বীকার করবে ওকে বরং বাপের বাড়িতে গিয়েই তাঁর মত খাটাতে অনুরোধ করব।'

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন

কলকাতার তথ্যকেন্দ্রে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রবন্ধ লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করে শ্রীসতীকান্ত গুহ বলেন আজকের বাংলা সাহিত্যের নানা ব্যাপ্তির কথা স্বীকার করলেও একথা সত্য যে প্রবন্ধ সাহিত্য তেমন কোন লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারেন নি। তিনি বলেন শুধু তত্ত্ব ও তথ্যের সংমিশ্রণ ঘটালেই প্রবন্ধ হোলনা তাকে সাহিত্য হোতে গেলে শিল্পরসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠা চাই। প্রবন্ধ রচনার অন্তর্নিহিত প্রেরণার ওপর আলোকপাত করেন প্রধান অতিথি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁর ভাষণের মধ্যে যে কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হোল, প্রবন্ধ রচয়িতাকে আরো হৃদয়বৃত্তির অধিকারী হোতে হবে। প্রবন্ধ সাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন ডঃ অমলেন্দু বসু। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়ের আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রবন্ধ সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়। এছাড়া সম্মেলনে কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচনা চক্র

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে একটি আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন করেন উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন তাঁদের জীবনের মূলে ব্রত হবে ন্যায় নীতি ও সততার আদর্শকে প্রোজ্জ্বল করে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ সুবিমল মুখার্জি একটি মনোজ্ঞ আলোচনার অবতারণা করেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনায় অনেক ছাত্র-ছাত্রীই অংশ নেন।

লালন ফকিরের দ্বিশততম জন্মোৎসব

লালন ফকিরের দ্বিশততম জন্মোৎসব সম্প্রতি উদযাপিত হোল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে। বাংলা সাহিত্য আকাদমি ও ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার আবদুস শোভান চৌধুরী। বিভিন্ন বক্তাদের আলোচনায় লালন ফকিরের ত্যাগ, বৈরাগ্য ও মানবপ্রেমের বৈশিষ্ট্য প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

বেলঘরিয়ার 'রবীন্দ্রায়নে'র উদ্যোগে সাহিত্য সংগীত বিতর্ক চিত্রাঙ্কনের ওপর একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগের ঠিকানাঃ—অধ্যক্ষ প্রাণকৃষ্ণ দেবনাথ, ৫৪ জাগ্রত পল্লী, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬।

মায়াকোভস্কি ক্লাবের উদ্বোধন

বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েত বিপ্লবী কবি ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কির নামানুসারে একটি নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংস্থার আবির্ভাব সম্প্রতি সূচিত হোল। গোর্কি সদনে এর উদ্বোধন করলেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। শ্রীমিত্র উদ্বোধনী ভাষণে বলেন এই সংস্থাটি ভারত-সোভিয়েত সাহিত্য সংস্কৃতি বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। এই অনুষ্ঠানের একটি অন্যতম আকর্ষণ ছিল মূল রুশ ভাষায় রেকর্ডে মায়াকোভস্কির কবিতার আবৃত্তি।

এই নবগঠিত সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মপরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসিদ্ধেশ্বর সেন।

সাগরদাঁড়িতে মধুসূদন জয়ন্তী

যশোহরের সাগরদাঁড়িতে আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের স্রষ্টা মধুসূদন দত্তের ১৫১তম জন্মজয়ন্তী সম্প্রতি উদযাপিত হোল। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের জেলা সংযোগ দপ্তর। অনেক শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই উপলক্ষ্যে একটি সুন্দর প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

মুক্তগঙ্গার সাহিত্য সম্মেলন

বহরমপুর গ্রান্টস হলে মুক্তগঙ্গা পত্রিকার উদ্যোগে কবি-সাহিত্যিকদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ পশ্চিম দিনাজপুর ও কলকাতার কবি-সাহিত্যিকরা অংশ নেন। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ পড়ে শোনান কেদার ভাদুড়ী, গৌরাঙ্গ ভৌমিক তপনকিরণ রায় নীরদ রায়, অভিজিৎ ঘোষ শিশির গুহ দেবপ্রসাদ সরকার, সেখর চ্যাটার্জী এবং আরো অনেকে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রেজাউল করিম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন দেবকুমার বসু। মুক্তগঙ্গার পক্ষ থেকে সঙ্গীতসাধক সৈয়দ আলি মির্জা সাহেবকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

বিবেকানন্দ মেলায় জন্মোৎসব সভা

বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতির উদ্যোগে সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের ১১৩তম জন্মতিথি নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদযাপিত হয়। বিবেকানন্দ মেলা মঞ্চে সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রধান মিত্র।

উদ্দীপ্ত ভাষণে শ্রীমিত্র বিবেকানন্দের অবদানের কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তিনি আজকের যুবসমাজকে বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হোতে আহ্বান জানান। বিবেকানন্দের বিরাট কর্মসাধনার ওপর আরো যাঁরা আলোকপাত করেন তাঁরা হোলেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, ডঃ রমা চৌধুরী, শ্রীঅনিলচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীসমর সরকার ও শ্রীধীরাজ বসু।

বঙ্গীয় তরুণ সাহিত্য সম্মেলন : সন্ধানী সাহিত্য প্রতিযোগিতার উদ্যোগে আয়োজিত এই সাহিত্য সম্মেলনে শ্রেষ্ঠ পত্রিকার জন্য সুকান্ত ও মানিক পুরস্কার এবং লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত গল্পের জন্য দুটি সন্ধানী পুরস্কার দেওয়া হবে। লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য ঠিকানা : প্রধান সম্পাদক সন্ধানী ঃ গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী গান্ধীনগর। জেঃ শ্যামনগর ২৪ পরগণা।

● গ্রন্থাগার দিবস প্রদর্শনী

প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র সংপ্রতি চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার আয়োজিত এক শিক্ষা ও কৃষ্টিমূলক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। চিত্রকলা পর্বতাভিযান সংক্রান্ত আলোকচিত্র ব্যঙ্গ ও হাস্যরস সম্পর্কিত নানারকম প্রাচীরপত্র এবং সি এম ডি এর কলকাতা উন্নয়ন প্রয়াসের আলোকচিত্র প্রদর্শনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র

আজকের অসংখ্য সংকট ও নানা সমস্যাজটিল মুহূর্তে পরিশ্রান্ত মানুষকে তাদের দেশের জাতীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক অবদানের গভীরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। সেই প্রদীপ্ত অতীতের প্রহরে ডুব দিয়ে মানুষ অন্তত আজকের এই বিভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবার পথের সন্ধান পেতে পারে। এই প্রোজ্জ্বল সত্যের প্রতি গভীরতম বিশ্বাস সম্প্রতি নিটোল হয়ে উঠেছে তমলুকে। সেখানে সূচনা হয়েছে একটি সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রের। এই সংগ্রহশালার দরজা সবার জনাই উন্মুক্ত। শিক্ষিত অশিক্ষিত কিশোর যুবক, খেটে-খাওয়া চাষী ও মজুর একই সংগে এখানে এসে নানা নতুন উপলব্ধির সূত্রে একই অনুভূতিতে মিশে যেতে পারে।

একটা দেশের দীর্ঘ দিনের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বনিয়াদ গড়ে ওঠে এক একটি অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ অবদানকে কেন্দ্র করেই। সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমের তমলুক অঞ্চল শিল্প-সভ্যতার পীঠস্থান এবং দেশ-বিদেশের সংগে নানা নিবিড় যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। সেখানে কোন সংগ্রহশালা না থাকায় সেখানকার আহৃরিত সম্পদ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মিউজিয়মে স্থান পেয়েছে। কিন্তু একথা হয়তো ঠিক প্রাচীন তাম্রলপ্তের প্রত্নসম্ভার এখনো সাধারণের কাছে এবং পর্যটক শিক্ষক ছাত্র-দের কাছে অজানা রয়ে গেছে।

এই অভাবের কথা স্মরণ রেখে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয়েছে তমলুকে। এই সংগ্রহশালায় প্রাথমিকভাবে সংগৃহীত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক পাথরের নানা রকম অস্ত্র প্রাচীন মৃৎপাত্র, ভারতীয় মধ্যযুগের প্রথম পর্বের পোড়া মাটির মূর্তি, মুদ্রা মুদ্রাঙ্ক প্রাচীন লিপি-উৎকীর্ণ দ্রব্য, পাথরের মালার দানা, মধ্যযুগীয় ধাতুর মূর্তি। এই সংগ্রহশালায় রয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগের প্রাচীন অধিবাসী ও বহিরাগত অতিথিদের মুখ ও বেশভূষার চিহ্ন। আর একটি অন্যতম আকর্ষণ হোল বিখ্যাত এক পণ্ডিত পরিবারের বংশ-পরম্পরায় রচিত হাতে লেখা পুঁথি।

পূর্ণোদ্যমে এখন চেষ্টা চলছে কি করে সংগ্রহশালাকে নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে তোলা যায়। স্থানীয় স্বাধীনতা আন্দো-লনের নথিপত্র দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ করে সংগ্রামের ইতিহাসকে জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট করে তোলবার চেষ্টা চলছে। লোক-শিল্প ও লৌকিক সংস্কৃতির স্থানীয় কারুকৃতির নিদর্শন এতে স্থান পাবে। তমলুক কাঁথি অঞ্চলে পানের চাষ সর্বজন-বিদিত। কাজেই পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালায় পানের বিভিন্ন বিভিন্ন নিদর্শন, পান চাষের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে নানা জিনিস রাখবার পরিকল্পনা রয়েছে।

তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে সর্বাঙ্গীন গবেষণা করার মতো পুঁথি-পুস্তক মধ্যযুগীয় প্রত্নকেন্দ্র মন্দির প্রাসাদ ও দুর্গ প্রভৃতির বিভিন্ন ধরনের ছবিও রাখা হবে।

জানা গেছে তমলুক পৌরসভার কাছ থেকে সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি জায়গা পাওয়া গিয়েছে।

সংকলন ও পত্র পত্রিকা

—উপগুপ্ত

উদ্দালক। সম্পাদনা সুলেখা ভট্টাচার্য। ৫৪ বিন্ধ্যবাসিনী রোড, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

প্রবন্ধ কবিতা এবং গল্পে সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটিতে লিখেছেন, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাদেব সাহা নির্মলেন্দু গুণ বেলাল চৌধুরী আশিস পাঠক এবং আরও অনেকে।

সোমা। শেফালী খামারু এবং বৃন্দাবন দাশ সম্পাদিত। সাজিয়া, বাখরাহাট ২৪ পরগণা। দাম ৩০ পয়সা।

শীর্ণকায় এই পত্রিকাটির শারদ সংকলনে লিখেছেন, বৃন্দাবন দাশ সুবল মাঝি শেফালী খামারু এবং আরও কয়েক-জন। ছাপার ব্যাপারে যত্ন নেওয়া দরকার।

দধীচি। সম্পাদনা মৃণাল চক্রবর্তী। দুর্লভপুর। পোঃ খাসপুর, পশ্চিম দিনাজ-পুর। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

লিখেছেন, উমা ভট্টাচার্য অজিতেশ ভট্টাচার্য অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামলকুমার ঘোষ গুণরাজ খাঁ প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধনকুমার রক্ষিত এবং গোপাল সাহা।

শতাব্দী। সম্পাদনা শংকর চক্রবর্তী। ৪৭ নং উম শিলং, শিলং-৬। দাম এক টাকা।

লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কমল চক্রবর্তী সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত দেবী রায় এবং আরও কয়েকজন।

আল্যাদান। সম্পাদক সরোজকুমার সরকার। ৫।৩, সন্তোষ রায় রোড, কোলকাতা-৩৪। দাম দু' টাকা।

'আল্যাদান'-এর শারদ সংখ্যায় গল্প কবিতা, উপন্যাস এবং নিবন্ধ লিখেছেন— অন্নদাশংকর রায় আশাপূর্ণা দেবী প্রেমেন্দ্র মিত্র রাজকুমার মিত্র বিষ্ণু দে এবং আরও কয়েকজন।

অনুভব। জয়ন্ত কুমার সম্পাদিত ৩৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কোলকাতা-১২।

সম্প্রতি 'অনুভব' পত্রিকার দুটি সংখ্যা একত্রে হাতে এলো। মণীন্দ্র রায়ের নিজস্ব হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিতে একটি ভালো কবিতা পড়া গেল। কেন কবিতা দেবী রায়ের লেখাটি ভালো। তাঁর দুটি কবিতাও পাঠককে আকর্ষণ করবে। 'কংক্রিট কবিতা' সম্পর্কে পরেশ মণ্ডল জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। এছাড়া প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত কালীকৃষ্ণ গুহ জয়ন্ত কুমার জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় গৌরাঙ্গ ভৌমিক এবং সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতা ভালো লেগেছে। প্রচ্ছদ এবং ছাপা প্রশংসা করার মতো।

শিস। স্বপন চক্রবর্তী এবং সমর মুখো-পাধ্যায়। ১০-১, দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট কলকাতা-১২। দাম দু টাকা।

পরিচ্ছন্ন রুচির এই পত্রিকাটিতে বেশ কিছু ভালো কবিতা, গল্প এবং আলোচনা রয়েছে। চন্দন ঘোষ এবং সমর মুখো-পাধ্যায়ের গল্প ভালো লেগেছে। বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্তের আলোচনাটি ভালো লাগল। আর্ট প্লেটে দীপক দে এবং শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের ছবি। প্রচ্ছদ এবং ছাপা উন্নত মানের।

বেদব্যাস। সম্পাদক দেবানন্দ দে। সি ৩৬-১ রামগড়। কোলকাতা-৪৭। দাম এক টাকা।

সাম্প্রতিক প্রকাশিত পাঁচখানি পত্রিকার পর্যালোচনা বিভাগটিতে গঠনমূলক কিছু করার চেয়ে চমক সৃষ্টির দিকেই ঝোঁক বেশি। ছাপার ব্যাপারে যত্ন নেওয়া দরকার।

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

একত্রিশ

বম্বে আমেদাবাদে গান গেয়ে আশ্রমের জন্যে টাকা তুলবার পরে পণ্ডিচেরী থেকে বেরিয়ে প্রতি বৎসর দুতিন মাস ধরে নানা শহরে চ্যারিটি কন্সার্ট দিতাম। যতদূর মনে পড়ে আশ্রমের জন্যে চ্যারিটি কন্সার্ট সুরু করেছিলাম প্রথম ১৯৪৫ সালে—শেষ হয় ১৯৫০ সালে। এ কয় বৎসরে হিসেব ক'রে দেখেছি প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা তুলেছিলাম আশ্রমের জন্যে। লজ্জানিবারণকে প্রণাম করেছিলাম যখন শেষবার ফিরে শ্রীমার চরণে ছেষট্টি হাজার টাকা প্রণামী দিতে পেরেছিলাম। এ-সূত্রে বলি দুটি আসরের কথা—যে দুটি ঠিক চ্যারিটি কন্সার্ট ছিল না—কারণ মঞ্চে শোভমান হয়েছিলাম একা আমি।

কানপুরে গান গেয়ে আমি বরোদায় যাই গাইকবাড়ের অতিথি হয়ে। কয়েকটি বন্ধু আমাকে পেশ করেছিলেন নানা উপাধি দিয়ে। ফলে বরোদাবাসীরা চাইল আমাকে ভাষণ দিতেও হবে। এইই আমার প্রথম সত্যিকার পাবলিক ভাষণ। কিন্তু অত্যধিক গান গেয়ে আমি সে-সময়ে দারুণ ব্রংকাইটিসে ভুগছি—এমন কি দুতিনবার রক্তের ছিটেও ছিল নিষ্ঠীবনে। এ অবস্থায় গান ও ভাষণ—আর একেবারে একলা! কিন্তু ওরা বেশ মোটা দক্ষিণা দেবে শুনলাম পাঁচ সাত হাজার টাকা। নিমন্ত্রণও নিয়েছি। নিরুপায়।—'জয় গুরু' বলে তো গেলাম বরোদা। কিন্তু হায় রে, এক গুজরাতী ডাক্তার বন্ধু আমার গলা পরীক্ষা করে বললেন শিউরে উঠে: 'দুতিন মাস মৌনী বাবা না হলে আপনার গলায় এমন কি ক্যান্সারও হতে পারে।' আমি বললাম: 'দুঃখিত, বন্ধুবর কিন্তু আমি গুরুদেবকে কথা দিয়ে বেরিয়েছি—I won't spare myself—এখন পিছোতে পারব না।' তিনি বললেন: 'আমি শ্রীঅরবিন্দকে তার করছি, আপনি আমার বাড়িতেই থাকবেন আপনাকে আমি লুকিয়ে রাখব যতদিন না ফাঁড়া কাটে।' আমি বললাম: 'বন্ধুবর বহু ধন্যবাদ। কিন্তু আমি আড়াইমাস ধরে নানা শহরে চ্যারিটি কন্সার্ট করেও যখন টিঁকে আছি—তখন এই শেষ দুটি মঞ্চে উঠে গাইলেও বেঁচে বর্তেই থাকব।'

'শেষ দুটি? এর পরেও—'

'হ্যাঁ, বম্বেতে সুন্দরবাই হলে আমার অন্তিম আসর। দুঃখের বিষয় সেখানেও ভাষণ দিতে হবে গানের সঙ্গে।'

বন্ধুবর (উদ্বিগ্নকণ্ঠে): 'আপনি জানেন না ক্যান্সার কী বস্তু—'

আমি (করুণ হেসে): 'জানি বন্ধু। আমার একটি প্রিয় বন্ধুকে আশ্রমে ক্যান্সারে ভুগতে দেখেছি—সে-যন্ত্রণা চোখে দেখা যায় না—তবে (তাঁকে থামিয়ে) কথা দিচ্ছি এই দুটি আসরের শেষে বিশ্রান্ত হব—কিন্তু প্রেমরক্ষা না হলে মরণান্তিক দুঃখ পাব।' বলে হেসে। কবি বলেছেন All's well that ends well—মহাজন বলেছেন: 'গুরু-কৃপায় পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করে, আর আমি প্রবল প্রেত গুরুবাদী ক্যান্সারকে থাবা মেরে হটিয়ে দিতে পারব না? বলেন কী আপনি?'

প্রকাণ্ড প্রেক্ষাগৃহ—গাইকবাড়ের নিজের সভাগৃহ—নামটা ভুলে গেছি। রাজপুরুষেরা সবাই উৎকর্ণ। আমি কাশছি ও থার্মস ফ্লাস্ক থেকে বারবার গরম জল চুমুক দিয়ে কাশিকে দাবিয়ে ভাষণ দিয়ে চলেছি—গুরুদেবের নানা মহত্ত্বের নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে। প্রেরণার অভাব ছিল না, কেবল Spirit willing হলেও flesh weak হওয়ার দরুণ আশংকা ছিল শেষটায় গান গাইতে হয়ত পারব না। কী হবে তাহলে? মনে মনে প্রার্থনা সুরু করে দিলাম গান গেয়ে

'বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্বতে শত্রুমধ্যে
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।'

কী আশ্চর্য, গাইবার সময় একবারও কাশিনি। 'জয় গুরু' বলে ধরে দিলাম: 'বৃন্দাবনকী মঙ্গললীলা যাদ আরে যাদ আরে...' গাইলাম ঝাড়া আধঘণ্টা।

অঘটন বলে অঘটন! গরম জলে চুমুক দিতে দিতে ভাষণ দেওয়া চলে—কিন্তু গান গাওয়া চলে না তো। তাই প্রার্থনা করেছিলাম চোখের জলে—সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছিলাম ভবানীর আশীর্বাদ, কৃষ্ণের করুণা।

অবশ্য পরে সাতদিন বিশ্রাম নিতে হল। কিন্তু ক্যান্সার তো হলই না—মনও চলল বিশ্বাসে পাল তুলে কৃতজ্ঞতার দাঁড় বেয়ে। তবে ব্রংকাইটিস সমানই রইল নিত্যসাথী হয়ে।

ফলে দিন পনেরো বাদে সুন্দরবাই হলে ঠিক এই অঘটনেরই পুনরাবর্তন হল—ভাষণের সময় কাশির ঘনঘটা, গানের সময় গান-দারুণ—শান্ত নির্মল অনাময়। সভাপতি ছিলেন কে এম মুন্সি। তাঁকে বন্ধু পাওয়া গেল এই সূত্রে। করুণার অভ্যাগম হয় এমনি ছন্দেই অগ্নিপরীক্ষার পরে। নৈলে কেউ কি নিজের চেষ্টায় পারে অসাধ্য সাধন করতে?

বত্রিশ

প্রথমবার বম্বে ও আমেদাবাদের সফরের শেষে পণ্ডিচেরী ফিরে এসে আমার অভিমান বেশ একটু হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। কয়েকজন সাধক বললেন: 'আহা, আমরাও যদি এভাবে গুরুসেবা করতে পারতাম গো!' যাঁরা আমাকে অকেজো গায়ক বলে কৃপার চোখে দেখতেন তাঁরাও হেসে কথা কওয়া সুরু করলেন। সবচেয়ে মজা লাগল এক ডাক্তারের কথা শুনে। তিনি আমাকে সোজা এসে শুধালেন (without ado):

'শুনলাম আপনি বম্বে ও আমেদাবাদ থেকে আশ্রমের জন্যে দশহাজার টাকা তুলে এনেছেন? সত্যি?'

'আজ্ঞে।'

'কী আশ্চর্য!'

'কেন?'

'কারণ আমিও গিয়েছিলাম বম্বে ও আমেদাবাদ, কিন্তু কিছুই চাঁদা তুলতে পারিনি বহু চেষ্টা করেও।'

মনে পড়ল এক হরিণের গল্প। সে নেকড়ে বাঘের কাছে এসে বড় চোখ আরো বড় করে জিজ্ঞাসা করেছিল: 'শুনি, তুমি বুনো মোষকে লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়েছিলে? সত্যি?'

নেকড়ে বাঘ: হুঁহুঁ।

হরিণ: কী আশ্চর্য!

নেকড়ে বাঘ: কেন?

হরিণ: কারণ আমিও ঐ বুনো মোষের সঙ্গে লড়েছিলাম, কিন্তু জিততে পারিনি।

তবে সাহেবপুরাণে বলে: "It takes all sorts to make a world".

×

যাই হোক, আমি নেকড়ে বাঘ না হলেও এর পর থেকে গী[illegible]ন সুরু করলাম: প্রীতি

বৎসর দু'তিন মাস সারা ভারত চক্র দিয়ে আমার সাঙ্গীতিক গর্জনের দৌলতে নানা শহরে চারিটি কন্সার্ট দিয়ে আশ্রমের জন্যে টাকা তোলা প্রায় আমার যৌগিক পেশা হয়ে দাঁড়াল। ফলে আমার দুটি লাভ হল : আশ্রমে যাঁরা নিরপরাধ আমাকে সেন্টিমেন্টাল বিরোধী নাম দিয়ে হেনস্থা করতেন তাঁরাও ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করলেন কী করে আমি পারলাম যা আমার পারার কথা নয়—অর্থাৎ ভজন কীর্তনের বামন আঁকশি দিয়ে উঁচু ডালের টাকার ফল পাড়া। এঁদের মধ্যে আবার অনেকের ধারণা ছিল—ভজন কীর্তন গানই নয়, গান তো ওস্তাদি গান। তাই পণ্ডিচেরিতে আমার ভজনের আসরে তাঁরা সচরাচর আসতেন না বা কখনো এলেও একটু পরেই প্রস্থান করতেন। কিন্তু এঁরাও অতঃপর আমার ভজন শুনতে আসতেন। দান্তে গেয়েছিলেন : "L'amor che move l' sole e l'altre stelle"

—অর্থাৎ প্রেমই সূর্য ও তারাদের ঘোরায়। এ-যুগে প্রেমের শক্তি বর্তেছে টাকায়—

— it's money that makes the suns and stars go round —

কে অস্বীকার করবে? আমি কি নিজেই চাক্ষুষ করিনি এ-দুর্দান্ত সত্য—সব দেখেই? কেবল আশ্রমে এর দেখা পাব ভাবিনি। কিন্তু তা-ও পেলাম। অবশ্য অনেক শান্ত সৎস্বপ সাধক ছিলেন যাঁরা আমার অর্থাহরণের জন্যে আমাকে বিশেষ করে তারিফ করেননি। কিন্তু বেশ কয়েকজন আমার প্রতি সদয় হয়েছিলেন একথা আমি তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে হলফ করে বলতে পারি।

তেত্রিশ

কিন্তু এর পরে যখন আবার সফরে বেরুই তখন সময়ে সময়ে বেশ একটু বিপন্ন হতে হ'ত বৈ কি নানা কারণে। একটি এই যে, প্রতি বৎসরই কন্সার্ট দেওয়ার জন্যে আমাকে নানা ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করতে হত 'রেক্রুট' করার মতন। সব সময়েই কিছু সুগায়ক সুগায়িকা পেতাম না, তবে মনে হত সাহেবদের কথা : "A good workman makes do with the tools he has" —

—তাই যেমন আধার মিলত তেমনি গানের ব্যবস্থা করতাম অনুযোগ না করে। তান-ওয়ালা গান গাইতে পারে এমন বালক-বালিকা বা তরুণ-তরুণী সর্বত্র মিলত না-অথচ একলা গেয়ে গানের প্রোগ্রামে বৈচিত্র্যের আমদানি করা অসম্ভব বলে তারা যে-সব গান গাইতে পারে সেই সব গানই শেখাতাম বাধ্য হয়ে। আরো এক মুস্কিল হত—তারা অনেকেই ভক্তির গান গাইতে তেমন আগ্রহ বোধ করত না ভালোবাসত সেন্টিমেন্টাল প্রেমের গান বা স্বদেশী গান। স্বদেশী গানে তারা কিছুটা প্রাণসঞ্চার করতে পারত বটে, কিন্তু ভক্তিশক্তি আনতে পারত না। কাজেই তাদের কোরাস গানে আমাকেও যোগ দিতে হত যার ফলে আমাকে বেশ একটু ক্লান্ত হতে হত—একক গানের পর কোরাসেও গাইতে হত বলে। শেষে হঠাৎ মনে হল—বৈচিত্র্য আনার জন্যে নানা যন্ত্রের ঐকতান সংগীতের প্রবর্তন করা যাক। কিন্তু তার জন্যেও যন্ত্রীদের তুতিয়ে পাতিয়ে রাজী করিয়ে রীতিমত রিহার্সাল দিতে হত অনেক সময়ে স্বরলিপি সাজিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে, কন্সার্টলব্ধ অর্থ শ্রীঅরবিন্দের চরণে নিবেদন করা হবে শুনে সবাই না হোক পাঁচসাত-জন যন্ত্রী মিলে যেত। দুবার কলকাতায় চমৎকার অর্কেস্ট্রাও পেয়ে গিয়েছিলাম।

অতঃপর মনে বিদ্যুৎ-চিন্তা খেলে গেল—যাকে বলে brain wave — নৃত্যসংগতের ব্যবস্থা করা যাক। কিন্তু পেশাদার নর্তকীর কাছে তো যাওয়া চলে না, আর সুভদ্রা নর্তকী যোগাড় করতে হিমসিম খেতে হয়। অবশেষে গুরুর কাছে প্রার্থনা জানালাম যার ফল ফলল দেখতে দেখতে—মিলে গেল এক চমৎকার সুকুমারী—যে নৃত্যে অপরূপা না হলেও আমার কীর্তন ভজনের সঙ্গে হেলে দুলে উপভোগ্য রসসৃষ্টি করেছিল। সবচেয়ে সফল হয়েছিলাম—কলকাতার শোভন রক্সি প্রেক্ষাগৃহে অর্কেস্ট্রা তথা নৃত্যসংগতে বন্দে-মাতরম গেয়ে—তাতে নানা নতুন পদ জুড়ে—আমার 'সুরবিহার' স্বরলিপি দ্রষ্টব্য। পরে এ-গানটিতে চারটি মেয়ে নেচেছিল শিলঙে—সার্থক যন্ত্রসংগত ছিল না বটে, কিন্তু চার চারটি মেয়ের পরপর আবির্ভাবে তুমুল জয়-ধ্বনি করেছিলেন শ্রোতৃবৃন্দ। সভাপতি ছিলেন তৎকালীন আসাম-রাষ্ট্রপাল—শ্রীপ্রকাশ। তিনি বিশেষ মুগ্ধ হয়ে আমাকে তাঁর রাজ-ভবনে অতিথি হতে বাধ্য করে সাধুবাদ দিলেন রাজপুরুষদের মাঝে এক করতালি-বিধ্বনিত দীপোজ্জ্বল ভোজে। ফের চ্যুতি—মালাতিলকগ্রহণ—গুরুদেবের নিষেধ সত্ত্বেও

এর পরে আমার মনে বিষম উৎসাহ এসে গেল—কন্সার্টের চর্কিবাজি সুরু হল—যদিও নানা শহরে কন্সার্ট দেওয়া সহজ ছিল না মোটেই। তবে শ্রীঅরবিন্দের চরণে প্রণামী দেব ভাবলেই ক্লান্ত মনও চেতিয়ে উঠত—অপ্রত্যাশিত শক্তি এসে যেত।

(ক্রমশঃ)

ইরা দে

যুবক যুবতী

পল্লী উন্নয়ন ও সমাজসেবা

গ্রামবাংলার নানা সমস্যা। নানা সুযোগ-সুবিধা থেকে গ্রামের লোক বঞ্চিত। কোথাও রাস্তাঘাট ভালো নয়, আবার কোথাও স্কুল নেই—খাবার জল চিকিৎসারও ব্যবস্থা নেই। প্যানাপুকুর ইদানীং ম্যালেরিয়ার আক্রমণ। সরকারের পক্ষ থেকে পল্লী উন্নয়নের অনেক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে ব্লক অফিস খোলা হয়েছে। সেখানে গ্রাম-সেবক রয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন পল্লীর উৎসাহী যুবকরাও নিজেদের গাঁয়ের উন্নতিতে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, যেসব ছেলেমেয়ে ডানপিটে ভবঘুরের মতো কর্মবিহীন জীবন কাটায় তাদেরও সুযোগ দিলে সাহায্য করলে অনেক কাজ আদায় করে নেওয়া যায়। অমানুষ কেউ নয়। এরা চায় একটু ভালবাসা, সঠিক নেতৃত্ব এবং দুবেলা পেট পুরে খাবার।

আপনারা হয়তো অনেকেই ঘোষপাড়ার নাম শুনেছেন। কর্তাভজা সম্প্রদায় প্রবর্তিত ঘোষপাড়ার দোলমেলা খুবই প্রসিদ্ধ। এই ঘোষপাড়ার অপর পারে অনেক গ্রাম। মাঝ-খানে একটা খাল। গ্রীষ্মকালে জল থাকে না বললেই চলে, কিন্তু বর্ষাকালে দু কূল ছাপিয়ে ওঠে জলে। তখন গ্রামবাসীর অশেষ দুর্গতি। কেননা বেশীর ভাগ জমি নীচু। বর্ষার জলে সহজেই ডুবে যায়। গ্রামের ছেলেমেয়েদের কল্যাণী স্কুলে আসা মুস্কিল। কর্মজীবীদেরও একই অবস্থা। বন্যা হলে তো কথাই নেই। ঘর বাড়ী ছেড়ে সবাইকে আশ্রয় নিতে হয় শহরে। গ্রামে যাওয়ার পথে শ্রীশ্যামলেন্দু বিশ্বাসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি জানালেন, গ্রামের যুবক ছেলে আমরা মাথায় ঝুড়ি বয়ে মাটি ফেলে এসব রাস্তা-ঘাট করেছি। এই যে পুল দেখছেন, এটা ইদানীং সরকারের সাহায্যে তৈরী হয়েছে। আগে এখানে মাটির তৈরী পুল ছিল। তার ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে গরুর গাড়ী, সাইকেল রিকসা সব যাতায়াত করত। বান এসে সব ভেঙ্গে গেল।

সে সময় আপনারা যাতায়াত করতেন কি করে—জিজ্ঞাসা করি।

—সাঁকোর ওপর দিয়ে। সেই সাঁকোও আমরাই তৈরী করতাম।

—সাঁকো?

—বুঝতে পারছেন না? লম্বা কয়েকটা বাঁশ ফেলে দু পাশে বাঁশের খুঁটি পুতে সাঁকো তৈরী করতাম। তবে বৃষ্টির দিনে পিচ্ছিল হয়ে গেলেই মুস্কিল হত। যে-কোন সময়ে পা ফসকে পড়লেই সাঁতার জল।

সত্যিই গ্রামের যুবকদের প্রশংসা করতে হয়। তাদের চেষ্টা ও তদ্বিরের ফলেই হয়েছে এই পুল। তবে রাস্তার অবস্থা এখনো ভালো নয়। সেতু থেকে নেমে এগোতেই রাস্তা ভেঙ্গে আর একটা ছোট খালের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য পারাপারের জন্য গ্রামের ছেলেরাই একটা বিরাট তালগাছ ফেলে রেখেছে। তবে নিজের তাল সামলে তবে সাবধানে পেরোতে হবে। আর একটু এগোতেই আবার রাস্তা ভাঙ্গা, জল কাদা। গ্রামের পোস্টমাস্টার, বিভিন্ন সমাজকর্মীর সঙ্গে যুক্ত শ্রীকালীপদ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা এসবের সংস্কারের ব্যবস্থা করছেন না?

—মাঝে মাঝেই করা হয়। তবে গরু চরানোর জন্য রাস্তার সে সংস্কার বেশী দিন টেকে না।

—গ্রামের যুবকরা এসব বিষয়ে আগ্রহী নয়?

—নিশ্চয়ই। নবীন সংঘের উদ্যোগে ছেলেরা ছুটির দিনে রাস্তা তৈরী করে। রাস্তা পাকা করার জন্যও চেষ্টা চলছে।

—এখানে বিজিকের কাজ হয় না?

শ্যামলেন্দু বিশ্বাস

—হয় তবে তেমন নয়। তাছাড়া বর্ষা এলেই রাস্তার চরম অবনতি ঘটে।

—এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন?

নিশ্চয়ই। বিভিন্ন সময়ে আমরা মন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত ডেপুটেশনে গিয়েছি। বর্তমানে সি এম ডি এ প্রকল্প রাস্তার উন্নতির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের শান্তি নেই। আর এক প্রাকৃতিক বিপদ শুরু হয়েছে।

—প্রাকৃতিক বিপদ? বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করি।

—হুগলী নদীর ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। চরণডেসরাই, চরজাজিরা, চরগঙ্গামনোহরপুর, সরাটী, সাণ্ডেলচর—নদী সংলগ্ন সব গ্রামের জমি প্রচণ্ডভাবে ভাঙছে। নদী যেভাবে এগিয়ে আসছে তাতে গ্রাম টিকে থাকাই মুস্কিল।

—আপনারা নদীর পাড় বাঁধার কোন ব্যবস্থা করেন নি?

—এ ভাঙ্গন রোধ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। সামান্য কাঠ-খুঁটি-বাঁশ পুতে ঠেকানো যাবে না।

—সত্যি সমস্যার কথা! এ বিষয়ে আপনারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি?

—এম এল এ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সবাই জানেন। আপনারাও আপনাদের কাগজে লিখুন যদি সরকারের টনক নড়ে। সব চাষের জমি ঘরবাড়ী এভাবে ভেঙ্গে গেলে কি অবস্থা যে হবে...হতাশার সুর শুনতে পেলাম তাঁর মুখে।

এমনিতরো নানা সমস্যা নিয়ে আমাদের গ্রামবাংলা ডুবে আছে। আবার অনেক জায়গায় যেখানে একদিন বনবাদাড় ছিল, দিন-দুপুরে শেয়াল ডাকত, সেখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কত পাকা বাড়ী! পাকা রাস্তা! বনগ্রামে এ পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। বনগাঁ স্টেশনে নেমে বনগ্রামের উন্নয়ন সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলাম। একটি উৎসাহী যুবক আমাকে নিয়ে গেলেন কলেজপাড়ায় অধ্যাপক ননী দাশগুপ্তের কাছে।

বয়সে বৃদ্ধ তবে প্রাণোচ্ছলতায় ভরপুর। কর্মযোগী। নানা উন্নয়নমূলক কাজ, সমাজ-সেবা ইত্যাদি নিয়ে আছেন। ঘরে বসে একটা

ম্যাগাজিন পড়ছিলেন তিনি। আমার পরিচয় এবং উদ্দেশ্য জানতে হেসে বললেন—এই বুড়োর কাছে এসেছ বাবা! তা বেশ করেছ। মনে-প্রাণে এখনও আমি যুবকই আছি। বলো কি জানতে চাও?

—অনেক ছেলেমেয়েদের সংগে আলাপ করে জানতে পারলাম বনগ্রামের উন্নয়নে আপনারই মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। আপনি যুবক ছেলেমেয়েদের নিয়ে নানা উন্নয়নমূলক সংগঠনে জড়িত আছেন...

—ঠিকই শুনেছ। আমার বাড়ীর সামনে যে কলেজটা দেখছ এটা প্রখ্যাত 'নীলদর্পণ' স্রষ্টা দীনবন্ধুর স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়। ওঁর বাড়ী এখানে, কাছেই। এই কলেজের উন্নয়নেই কলকাতা থেকে আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়। সেই থেকে এখানেই আছি। ছেলেমেয়েদের নিয়ে নানা কাজে ডুবে আছি।

—এই বয়সে—এই শরীরে এতজোর কোত্থেকে পান?

—কাজ করার নেশা কিছুতেই ছাড়তে পারি না। এখন ছেলেমেয়েদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিই।

ইতিমধ্যে ইরা দে, অনীতা দে প্রভৃতিরা এসে হাজির। এঁরা নানা সমাজসেবামূলক কাজে জড়িত। দেখেই বোঝা গেল খুব ব্যস্তভাবে এসেছেন। সবে স্নান করে শাড়ী পরেছেন, ভালভাবে চুল আচড়ানোও হয়নি। ঘরে বিদেশ বিভুঁই-এর যুবক ছোকরাকে দেখে কিছুটা শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। —আমাদের ডেকেছেন? অধ্যাপক দাশগুপ্ত বললেন—এরা 'অমৃত' সাপ্তাহিকের যুবক-যুবতী বিভাগের পক্ষ থেকে এসেছে। তোমাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে জানতে চান। প্রাথমিক লজ্জা কাটিয়ে এবার বেশ চাঙ্গা হয়ে নিলেন শ্রীমতী ইরা দে। জিজ্ঞাসা করলাম—ইরাদেবী, আপনারা এখানে কি ধরনের কাজকর্ম পরিচালনা করছেন আমাকে একটু বলুন না।

—আমরা যে ধরনের উন্নয়নমূলক এবং সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করছি সেটা সবই আমাদের জীবনী কলোনী মহিলা সমিতির মাধ্যমে। অধ্যাপক দাশগুপ্ত এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টা।

—আপনারা এখানে কি কি শেখান?

—এখানে বালোয়াদি ক্লাস নেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিউট্রিশন স্কিমে এটা চলছে।

—এই স্কিমের সুবিধা কি?

—এখানে যেসব ছেলেমেয়েরা পড়ে, তাদের লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাচ, গান, খেলাধুলা সেলাই সবকিছু শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়া স্কুল থেকে তারা টিফিন খেতে পায়।

—এই বালোয়াদি ক্লাসে কিরকম সংখ্যা পড়েছেন?

—প্রচুর ছেলেমেয়ে আসে। আমি ও অনীতা এদের ক্লাস নেই।

—আর কি ব্যবস্থা আছে আপনাদের এখানে?

—এখানে সেলাই শিক্ষণ কেন্দ্র রেকর্ড ডিপ্লোমা শিক্ষা দেওয়া হয়। যাঁরা ডিপ্লোমা পান তাঁরা পরবর্তীকালে ক্রাফট টিচার অথবা গ্রামসেবিকা হিসাবে চাকরী পেতে পারেন।

এতক্ষণ শ্রীঅনীতা দে চুপচাপ বসে ছিলেন। আমি তাঁর নীরবতা ভাঙাতে বললাম—আপনি একদম চুপচাপ কেন, আপনি কিছু বলুন।

জিজ্ঞাসা করতেই বলছি শুধি—উত্তর জবাব দিলেন।

—পল্লীউন্নয়নে এবং সমাজসেবায় আপনাদের আর কি ভূমিকা আছে?

—আমি কলেজের মেয়ে। পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে এসব করতে ভালই লাগে। আমাদের এখানে লাইব্রেরী আছে। সেটা পরিচালনা করেন শেফালিদি। আজকে ছুটির দিন। অন্যদিন এলে দেখতে পেতেন কি উৎসাহে আমরা কাজকর্ম করি। তাছাড়া আমরা বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্রও পরিচালনা করি।

—বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্রে ছেলেমেয়ে সবার পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে?

—হ্যাঁ, সাবিত্রী সমাদ্দার এবং শেখর মজুমদার এই শিক্ষাকার্য সম্পাদন করেন। তবে যারা আসেন তাঁরা সবাই অভিযোগ করেন—'খালিপেটে কি করে লেখাপড়া করি বলুন, আমাদের রুজিরও কিছু ব্যবস্থা করুন।' এবার শ্রীমতী ইরা দে এগিয়ে এলেন। তিনি জানালেন, সবার এক সমস্যা—অর্থের। তবে দাদুর এক কথা, সমাজসেবা করতে হলে অনেক ত্যাগ করতে হয়। তাই পেটে খিদে থাকলেও কিছু বলতে পারি না।

—আপনারা গ্রামবাসীর রুজিরোজগারের কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন? জিজ্ঞাসা করি।

—শিক্ষিত যুবকযুবতীদের শেখানোর জন্য টাইপ মেশিন, সেলাইকল সব রয়েছে। তাছাড়া সাবান তৈরীর একটা স্কিম আমরা নিয়েছি। সরকার অনুমোদন করলে এবং সাহায্য পেলে ব্যাপকহারে উৎপাদন করার ইচ্ছা আছে।

বনগ্রামের উন্নয়নের নানা কথা নানা গল্প শোনালেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত। জানালেন, অনেক চেষ্টা চরিত্র করে রাস্তাঘাট স্কুল-কলেজ লাইব্রেরী কিছু হয়েছে, তবে এখনো অনেক কাজ বাকী। গভীর নলকূপের অভাবে ভালো চাষবাস হচ্ছে না। এই শরীর নিয়ে এখন এতো ছুটোছুটি করাও কষ্টকর।

শ্রীঅনীতা দের হাতে তৈরী চা খেয়ে এবার উঠে পড়লাম। এখনো অনেক কাজ বাকী। ফেরার পথে গ্রামে আলাপ হল কয়েকজন যুবকের সংগে। তিনি জানালেন ফুটবলখেলা অঞ্চল উন্নয়নে আনন্দ সম্মেলন ও জীবনী সমিতির অনেক অবদান আছে। তাছাড়া এখানের সায়েন্স ক্লাবও নানা কাজ করছে।

—এসব কাজকর্মে যুবকযুবতীদের ভূমিকা কতখানি?

—এসব কাজকর্ম তো তারাই করে। রাস্তাঘাট তৈরী, মেরামত, গরীবদের গৃহ-নির্মাণে সাহায্য সবকিছু।

পরমেশ ভৌমিক জানালেন, ছেলেদের খেলাধুলোর ক্লাবই বেশী। তবে এসব কাজে ও প্রয়োজনে তারা পেছপা নয়।

গোবরডাঙ্গা কলেজের ছাত্রী মসলন্দপুরের কৃষ্ণা রায়ের সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি হেসে উঠলেন—পল্লী উন্নয়ন সমাজসেবা এসব কাজের সুযোগ কোথায় আমাদের?

—আপনাদের সংগঠন নেই?

—যা আছে সেখানে ছেলেদেরই প্রাধান্য বেশী। আমাদের সব কিছু ঘরের মধ্যেই।

—গ্রামের উন্নয়নে আপনাদের উৎসাহ নেই?

—কেন থাকবে না! দেখছি রাস্তাঘাট হচ্ছে—বিদ্যুৎ আসছে তখন ভারী আনন্দ হয়। পাড়ার উন্নতি হলে আমাদেরও উন্নতি।

পাশে ছিলেন তাঁরই বন্ধু ডালি চক্রবর্তী। রসিকতা করে জানালেন, বন্ধুর আমার সদ্য বিয়ে হয়েছে। এখন ওর সব সমাজচিন্তা একজনকে কেন্দ্র করে!

কৃষ্ণাদেবী হাসতে হাসতেই প্রতিবাদ করলেন—চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। আমরা মেয়েরা যদি ঘরকে সুন্দর করে, ছেলেমেয়েদের ঠিক শিক্ষা দিই তবেই না প্রকৃত উন্নয়ন ও সমাজসেবা হবে? কি বলেন?

আমিও মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিলাম।

—অমর দাশ

চিঠিপত্র

চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী প্রসঙ্গে

২৪ জানুয়ারী ১৯৭৫ তারিখের সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখিত দীর্ঘ পত্রখানি পড়ে কৌতুকবোধ করেছি। তিনি বর্তমান পত্র-লেখককে 'ব্যক্তিগত আক্রমণ'-এর দায়ে অভিযুক্ত করেছেন ও বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিখ্যাত উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেকে উত্তম বলে দাবী করেছেন। অথচ বর্তমান পত্র-লেখককে 'সতীর্থ, সুহৃদ, অতিথি' ইত্যাদি ঘোষণা করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে 'সাধুর বেশে শয়তান' বলতেও তাঁর রুচি ও বন্ধুর প্রতি আচরণে আতিথেয়তায় বাধেনি। লেখকের সঙ্গে যুক্তির বিচারে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাঁর 'পরিজনের লেখা কিছু পত্র' নিয়ে টানাটানি শুরু করেছেন। এহেন কাজও যদি ব্যক্তিগত আক্রমণ না হয়, তবে তা কী আমার জানা নেই। শ্রীমুখোপাধ্যায়কে দৃঢ়তার সঙ্গে জানাচ্ছি তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বিরোধ কোনোকালে ছিল না, এখনো নেই। তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও আতিথেয়তার জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাই বলে তাঁর লেখার সমালোচনা করবো না বা ভুল-ভ্রান্তির প্রতিবাদ করতে পারবো না এমন অন্যায় দাবী তাঁর কাছ থেকে আশা করি না। প্রত্নবিদ্যা ভালোবাসি, তাই প্রত্নচর্চার ক্ষেত্রে অনাচার বা অসাধুতা ব্যক্তিবিশেষের মুখ চেয়ে মেনে নিতে বর্তমান পত্র-লেখক রাজী নন।

শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন তাঁর প্রবন্ধ (চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী) সম্পর্কে আমি নাকি কোনো আলোকপাত করিনি। কথাটা একেবারেই যে ঠিক নয় 'অমৃত' পাঠকগণই তা বলবেন। তাই পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। কেবল দুটি বিষয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

(১) শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন খনা-মিহিরের ঢিপির উৎখননের কোন স্তর-বিন্যাস করা হয়নি। কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য। ভারত সরকার (Archaeological Survey of India) কর্তৃক প্রকাশিত 'Archaeological Remains, Monuments and Museums' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৮০ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট লেখা আছে :

"The excavation has revealed almost a continuous sequence of occupations, divided into six periods, from the pre-Mauryan to Pala times, at the two mounds of Chandraketugarh and Khana — Mihirer Dhipi".

বেড়াচাঁপার মন্দিরটি যে গুপ্তযুগের—এই ধারণার সমর্থক আবিষ্কৃত প্রত্নদ্রব্যের উল্লেখও ওই একই পৃষ্ঠাতে রয়েছে। তবু যদি শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মনে হয় মন্দিরটি অন্য কোন যুগের, তবে তা কোন্ যুগের এবং সেই ধারণার স্বপক্ষেই বা কী যুক্তি আছে শ্রীমুখোপাধ্যায় দয়া করে জানালে সুখী হবো।

(২) ভগ্ন সূর্যমূর্তি প্রসঙ্গে নির্মলেন্দুবাবু লিখেছেন, 'হরিনারায়ণপুরে প্রায় অনুরূপ একটি ভগ্ন সূর্য মূর্তির পাদপীঠ পাওয়া গেছে।' এই প্রসঙ্গে বর্তমান পত্র-লেখকের বিনীত অনুরোধ শ্রীমুখোপাধ্যায় দয়া করে কৃষ্ণচন্দ্রপুরে প্রাপ্ত 'ভগ্ন সূর্য মূর্তির পাদপীঠ' ও হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত অনুরূপ 'ভগ্ন সূর্য মূর্তির পাদপীঠ' আমাদের দেখাবার ব্যবস্থা করুন। যদি তিনি তা পারেন তবে আমি অবশ্যই আমার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেবো।

দ্বিতীয়ত হরিনারায়ণপুর সম্পর্কে স্বর্গত কালিদাস দত্ত, সর্বশ্রী দেবপ্রসাদ ঘোষ, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, দেবকুমার চক্রবর্তী, অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকের লেখা ও বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ পড়েছি ব্যক্তিগতভাবে অন্তত চারবার হরিনারায়ণপুরে গিয়েছি ও বহু প্রত্নদ্রব্য সংগ্রহ করেছি কিন্তু প্রাগৈতিহাসিককালের কিছু প্রস্তর-আয়ুধ ব্যতীত আর কোনো প্রস্তর-নিদর্শন বা মূর্তি এখান থেকে পাওয়া গেছে বলে জানা নেই। একদা সরস্বতী নদীর অববাহিকায় অবস্থিত বন্দর হরিনারায়ণপুরের অস্তিত্বের কাল প্রধানত শুঙ্গ-কুষাণ-গুপ্তযুগ ও এখানে প্রাপ্ত সামগ্রীর প্রধান গৌরব তার terracotta বা পোড়ামাটির জিনিস। এহেন হরিনারায়ণপুরে পালযুগের ভাস্কর্য (প্রস্তর) খুঁজে বেড়ানো আর ধানক্ষেতে বেগুনের সন্ধান করা একই ব্যাপার। পরিশেষে নির্মলেন্দুবাবুর কাছে বিনীত নিবেদন, প্রত্নচর্চা করতে হলে নিজেকে 'অভ্রান্ত আচার্য' বলে মনে করা অনুচিত, তার ফল দাঁড়াতে পারে স্বর্গীয় সুকুমার রায় বর্ণিত 'অসিলক্ষণ পণ্ডিতের' মতো।
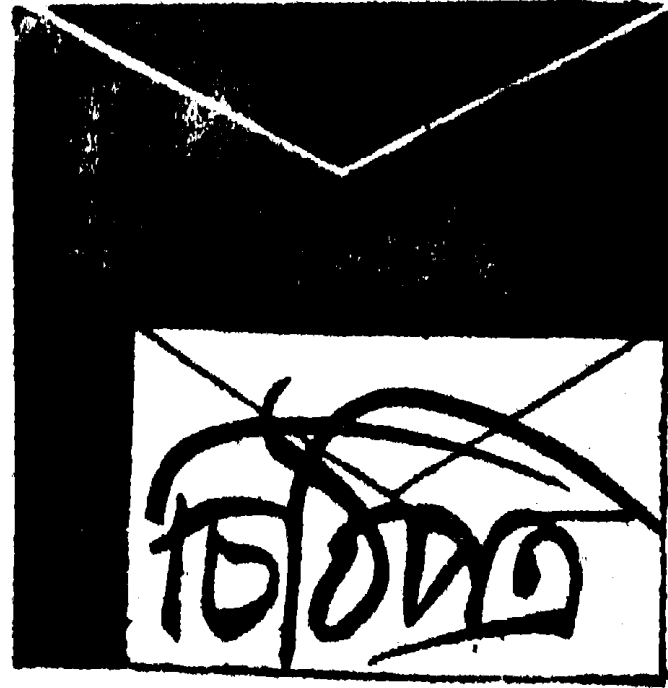
গৌরীশঙ্কর দে
হাবড়া, ২৪-পরগণা।

বিবাহ ব্যবস্থা

গত ২৪ জানুয়ারী 'অমৃত' 'যুবক-যুবতী' বিভাগে 'বিবাহ ব্যবস্থা' সম্পর্কে অমর দাস মশাই লিখেছেন, 'আমাদের দেশে বিবাহের সঙ্গে আরও অনেক সমস্যা জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হল পণপ্রথা ও যৌতুক সমস্যা কিন্তু শ্রীদাশ আরও একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করতে পারতেন যা সমগ্র গ্রাম-বাংলায় প্রকট, সেটা 'জাত বিচার'। ঠিকমত স্বজাত না হলে আজকের দিনেও এখনও ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া হয় না। এবং কেউ স্বেচ্ছায় বিবাহ করলে সমাজ থেকে আসে প্রবল বাধা। বীণা গুহ ঠিকই বলেছেন 'লাভ ম্যারেজ গ্রামের সমাজে কঠিন', কেননা সেখানে অশ্লীল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় ছেলে এবং মেয়েকে। বীণা গুহ আরও বলেছেন, মা-বাবা যেখানে দেখে দেবেন সেখানে কোন প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু প্রচুর দাবীদাওয়া মিটিয়ে অর্থ ব্যয় করে পিতামাতা যখন তাঁদের মেয়েটিকে বিবাহ-বৈতরণী পার করে দেনার দায়ে চুল বিকিয়ে দেন তখন কি ঘটে? তখন পিতা-মাতার অবস্থা কে হৃদয়ঙ্গম করবে? আবার যদি দাবীদাওয়া মিটিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে শ্বশুরবাড়ীর খোঁটাও খেতে হয় মেয়েকে। বীণা গুহর আরও বক্তব্য এই যে, 'গ্রামের রাস্তায় বাবা একা চলতে দেন না এবং বড় ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দেন না।' এর কারণ অনেকটা এই যে, সমাজে রক্ষণশীলতা ও নিজেদের সম্মানহানির ভয়। একজন গ্রামীণ যুবক হিসাবে আমি এ-স্বীকারোক্তি করতেও বাধ্য যে, অনেক এমন যুবক থাকে [illegible]দের কাছে প্রকৃত প্রেমের থেকে নোংরামিটা বড় বলে মনে হয়। সেইজন্যে পিতামাতারা সাবধানতা অবলম্বন করেন। শ্রীঅসিতকুমার ঘোষের সঙ্গে একমত, কিন্তু তিনি বলেছেন 'সাজিয়ে গুছিয়ে দেবার সামর্থ্য যাদের আছে তারা নিশ্চয়ই এসব বিষয়ে অরাজী হবেন না।' একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই দেওয়ার সামর্থ্য যাদের আছে তাদের দেওয়ার ফলে এটা একটা পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে গেছে, একটু অপারগ কন্যার পিতা-মাতারা তার শিকার হচ্ছেন। দাবীদাওয়া ব্যাপারটাকেই সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে হবে। পণপ্রথা বন্ধে সরকারী আইন কার্যত ব্যর্থ, তাই পণপ্রথা ওরফে 'ডিমান্ড' বন্ধে চাই অসবর্ণ বিবাহ বা স্বেচ্ছা বিবাহ, যা সম্ভব একমাত্র শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যুবক-যুবতীর দ্বারা, আমি মনেপ্রাণে একমত

অমরাবতীর তরুণী তনুশ্রী রাহার সঙ্গে তাঁর লাভ কাম সোসাল ম্যারেজ' মতে। বিয়েটা পিতামাতার সম্মতিক্রমেই হোক। পিতামাতাও তাঁদের রক্ষণশীল মনোভাব বা গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে) আজকের সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিন।

চঞ্চল সিংহরায়,
রোহিয়া, হুগলী।

পণপ্রথার বিরুদ্ধে

২৪ জানুয়ারীর 'অমৃতে' যুবক-যুবতী বিভাগে বিবাহ-ব্যবস্থা সময়োপযোগী আলোচনা। সত্যি কথা, কালো মেয়েরা বিয়ের বয়স এলে স্নায়ুর চাপে ভোগে। অবশেষে কারো কারো বিয়ে হয়, হয়তো টাকার জোরে অথবা প্রেম করে—এটা সবাই জানে। অন্যদিকে যেসব কালো মেয়ের বাবার অবস্থা স্বচ্ছল নয় অথবা প্রেমবিমুখ তাদের অবস্থাটা চিন্তা করার সময় এসেছে। এর একটা বিহিত করা দরকার এই মুহূর্তে। এ-সমস্যা সব জায়গাতেই সমান, কি গ্রামে কি শহরে।

আমার যত বন্ধু আছে সবাই পণপ্রথার বিরুদ্ধে। অবশ্য অনেকে বলবেন আমার বোনের বিয়েতে এত টাকা দিলাম, তার বেলা? ঠিক কথা আমরা যদি পণ না নিই, তাহলে অন্যদিকে আমাদের বোনের ক্ষেত্রেও দেওয়ার প্রশ্ন আসে না।

অসিতকুমার ঘোষের সঙ্গে আমি একমত। এই দুর্দিনে অপচয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কোর্টে রেজিস্ট্রেশন সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা। আসুন আমরা সবাই মিলে প্রাচীন প্রথাকে ভেঙে ফেলি। এতে হয়তো সাময়িক অসুবিধা আছে—কিন্তু ভবিষ্যতে এটাই হবে নতুন বিবাহ-রীতি। এর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করা দরকার।

তনুশ্রী রাহা বাস্তবসম্মত কথা বলেছেন। আমিও লাভ-কাম-সোসাল ম্যারেজের পক্ষপাতী। আজকের যুগে প্রার্থীর অজ্ঞাতসারে পতি অথবা পত্নী নির্বাচন সত্যিই ভাবা যায় না। তাছাড়া আজকের সমাজে মেয়েদের সেজেগুজে পাত্রপক্ষের সামনে বসবে এরকম মানসিক অবস্থা কারুর নেই। তার চেয়ে নিজেদের নির্বাচন বেশী সুখের। এযুগের অভিভাবকেরা এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করেন না এবং করতেও চান না। আমি বিশ্বাস করি অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের ভাগ্য তাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

ডিভোর্স। ওতো নিজেদের উপর। নিজেদের মধ্যে ভালো আন্ডারস্টান্ডিং না থাকলেই হবে। সাধারণ বিয়ের পরেও তো বনিবনা হয় না। সব ব্যাপারে সমঝোতা আনতে হবে, তাহলেই ভবিষ্যৎ জীবন হবে সুন্দর।

আসুন আমরা এগিয়ে আসি। নিজের পাত্র অথবা পাত্রী নিজেই নির্বাচন করি। শহরে বা গ্রামে স্থানীয় ক্লাবগুলি এ-ব্যাপারে অগ্রণী হতে পারে। বছরে একবার 'নির্বাচন মেলা' অনুষ্ঠান করে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের মেলামেশা করিয়ে দিতে পারে, যার মাধ্যমে নিজেরা নিজেদের নির্বাচন করবে। প্রয়োজন হলে সময় মত অভিভাবকদের নিকটে খোলাখুলি আলোচনা করা যেতে পারে, তাতে কারুর অসুবিধা থাকার কথা নয়।

অমিতাভ কুশারী,
রাণাঘাট, নদীয়া।

ক্রিকেট

গত ৩১ জানুয়ারীর 'যুবক-যুবতী' বিভাগে ক্রিকেটকে নিয়ে অমর দাশ মহাশয়ের নাতিদীর্ঘ আলোচনা ভালই লাগল। এদেশে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা কিছু অস্বাভাবিক নয়। বেতার, পত্রপত্রিকা, সরকারী, বেসরকারী মহল যেভাবে ক্রিকেট খেলার গুরুত্ব বাড়িয়ে চলেছেন তাতে আবালবৃদ্ধবনিতার ক্রিকেট-অনুরাগী না হয়ে উপায় কি? যে-দেশে ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য সবেতন ছুটি (উড়িষ্যা) পাওয়া যায়, রিলে শোনার নাম করে অফিস থেকে কেটে পড়া যায়, কিংবা ছাত্রদের ক্রিকেটানুরাগী করে তোলার জন্য স্কুলে কলেজে টেলিভিশনের ব্যবস্থা করা হয় অথবা ক্রিকেট খেলার জয়-পরাজয়কে কেন্দ্র করে দীর্ঘস্থায়ী গবেষণা চলে— সে-দেশের মানুষ ক্রিকেট খেলা নিয়ে পাগল হয়ে উঠবে না তো কি? তাই বোধহয় শ্রীদাশ ক্রিকেটের প্রতি বিরূপ কাউকে খুঁজে পেলেন না। অথচ ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে সময়ের যে অপচয় হয় তার হিসেব কে রাখে?

সারা শীতের দুপুর ধরে চলে 'ডিউজ বল' 'টেনিস বল' নিদেনপক্ষে 'রবারের বল' পেটানো। ফলে ধারাবাহিকভাবে ছাত্রদের চলে স্কুল কামাই, স্কুল পালানো। আর পাঁচটা টেস্ট ম্যাচের পঁচিশ দিন তো বাড়ীতে দূরস্থান—স্কুল-কলেজেও তাদের মুখ দিয়ে ক্রিকেট ছাড়া (অবশ্য ব্যতিক্রম আছেই) অন্য কথা শোনা যায় না। ফলে পড়াশুনার ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাহত হয় বাড়ীর কাজ। এবং তাদের মধ্যে নেমে আসে অবাধ্যতা অনৃতভাষণ ও কিছুটা শৃঙ্খলাহীনতা। এটা সমাজজীবনেরে পক্ষে ক্ষতিকর। সরকারী অফিসেও এই দিন যা কাজ হয় তা ঈশ্বরই জানেনে। এ'কদিন স্কুল কলেজ অফিস—সব একেবারে ছুটি দিয়ে দিলে ক্ষতি কি? কাজের বেলায় যখন 'লবডঙ্কা', তখন নামকা ওয়াস্তে অফিস খোলা রেখে দরকার কি? আর ক্রিকেট খেলাও তো জাতীয় উৎসবের নামান্তর তাই নয়? একটা কথা ভাবা দরকার। ক্রিকেট খেলা এদেশে যত জনপ্রিয়ই হোক—এটা যদি সত্যি সত্যি এত ভাল খেলা হত, তবে এ-খেলা আজও পুরোনো ব্রিটিশ কলোনীর বাইরে ছড়ালো না কেন? খোদ ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়াতেই বা আজ ক্রিকেট খেলার কতটা সমাদর?

ইংরেজের কোট প্যান্ট ইংরেজী বুকনির সঙ্গে সঙ্গে আমরা পেয়েছি ক্রিকেটের উত্তরাধিকার। তাই যতই ইংরেজী ছাড়তে চাই, ইংরেজের ঋণ ভুলতে চাই—ততই আমাদের চালচলনে ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণ ধরা পড়ে। তাই বলছি—ভারতীয় ক্রিকেটের বাড়বাড়ন্ত হোক, পতৌদি, মার্চেন্ট, মানকড়, বিশ্বনাথেরা সহস্রদিকে ছড়িয়ে পড়ুন আর আমরা পড়ার বই রেখে জরুরী চিঠির কথা ভুলে রেশনের লাইন ছেড়ে—রিলে শোনার লাইনে দাঁড়াই—জয়তুঃ ক্রিকেট।

অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিরাটী কলি—৫১

'অমানুষ' এবং সত্যজিৎ রায়ের ছবি প্রসঙ্গে

অমৃত'র ১৭ই মাঘ, ১৩৮১ (৩১-১-৭৫) সংখ্যায় ২৪ পরগণার খোলাপাতা থেকে পত্রলেখক শ্রীস্বপন শৈল ও কার্তিক দাসকে, ত্রুটি সংশোধনের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। 'অমানুষ' ছবির ভুবন বা অঘোর দারোগা (পুলিশ অফিসার) নয়, অভিনেতা অনিল চ্যাটার্জির অপূর্ব অভিনয়ই, বিগত চিঠির প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। এখানেই এপ্রসঙ্গের ছেদ টানছি।

মুর্শিদাবাদ থেকে শ্রীমতী তপতী সেনগুপ্তা সত্যজিৎ রায়ের ছবি "সোনার কেল্লা" প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ইতিপূর্বে উনি নিজের কাহিনী নিয়ে দুটি ছবি পরিচালনা করেছেন।

'সোনার কেল্লা' কিশোর ও শিশুদের ছবি, ঐটি ও'র দ্বিতীয় শিশু চিত্র পরিচালনা এবং নিজের লেখা ছোটদের কাহিনী নিয়ে প্রথম চিত্র পরিচালনা। সুতরাং এই প্রসঙ্গে ও'র প্রথম শিশু চিত্র 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'-এর প্রসঙ্গ আসতে পারে। কিন্তু 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' (১৯৬২) এবং নায়ক' (১৯৬৬)-এর মতো সমকালীন ছবির প্রসঙ্গে, উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় ন। এখানে ও'র প্রথম নিজের কাহিনীভিত্তিক চলচ্চিত্র পরিচালনা বলতে শিশু বা কিশোরদের জন্যে চিত্র পরিচালনাই বোঝানো হয়েছে। —চিত্রদূত

নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে

গত ১০ই মাঘের অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত অরুণচন্দ্র গুহের লেখা 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম।

লেখক তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায়

গান্ধীজীর প্রতি সুভাষচন্দ্রের মনোভাব সম্বন্ধে বলেছেন—'কিন্তু গান্ধীর প্রতিও তাঁর আস্থার অভাব ছিল না।' সামান্য এটুকু বলাতে আমার মনে হয় গান্ধীজী সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মনোগত ধারণাটি বেশ পরিষ্কার হোল না সাধারণ পাঠকদের কাছে। অনেক পাঠকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর মতবাদকে তেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না তাঁকে তিনি তেমন পছন্দ করতেন না এবং এরই পরিণামস্বরূপ সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে যে কত সম্মানের চোখে দেখতেন এবং জাতীয় আন্দোলনের নেতা হিসাবে গান্ধীজীর প্রতি সুভাষচন্দ্র যে কতখানি আস্থাবান ছিলেন তা গান্ধীজী সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের নিজস্ব কতকগুলি উক্তি থেকেই পাঠকেরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন। সুভাষচন্দ্রের উক্তিগুলি হোল—

'In 1920 India stood at the Cross-roads. Constitutional agitation, boycott of British goods, armed revolution— all had alike failed to bring freedom. There was not a ray of hope left and the Indian people, though their hearts were burning with indignation, were groping in the dark for a new method and new weapon of struggle. Just at this psychological moment, Mahatma Gandhi appeared on the scene with his novel method of Non-Co-operation or Satyagraha or Civil Disobedience. It appeared as if he had been sent by Providence to show the path to liberty. Immediately and spontaneously the whole nation rallied round his banner. India was saved. Every Indian's face was now lit up with hope and confidence. Ultimate Victory was once again assured'.

"For twenty years and more Mahatma Gandhi has worked for India's salvation, and with him, the Indian people too have worked. It is no exaggeration to say that if in 1920 he had not come forward with his new weapon of struggle, India today perhaps have been still prostrate. His services to the cause of India's freedom are unique and unparalleled. No single man could have achieved more in one single life-time under similar circumstances".

"Since 1920 the Indian people have learnt two things from Mahatma Gandhi which are the indispensable pre-conditions for the attainment of independence. They have, first of all, learnt national self-respect and self-confidence—as a result of which revolutionary fervour is now blazing in their hearts. Secondly, they have now got a countrywide organization which reaches the remotest villages of India. Now the message of liberty has permeated the hearts of all Indians and they have got a countrywide political organization representing the whole nation—the stage is set for the final struggle for liberty—the last War of Independence".

"Each nation has its own internal policies and its own attitude towards political problems. But that cannot affect a Nation's appreciation of a man who has served his people so well and has fought a first class modern power all his life".

"The service which Mahatma Gandhi has rendered to India and to the cause of India's freedom is so unique and unparalleled that his name will be written in letters of gold in our national history for all time".
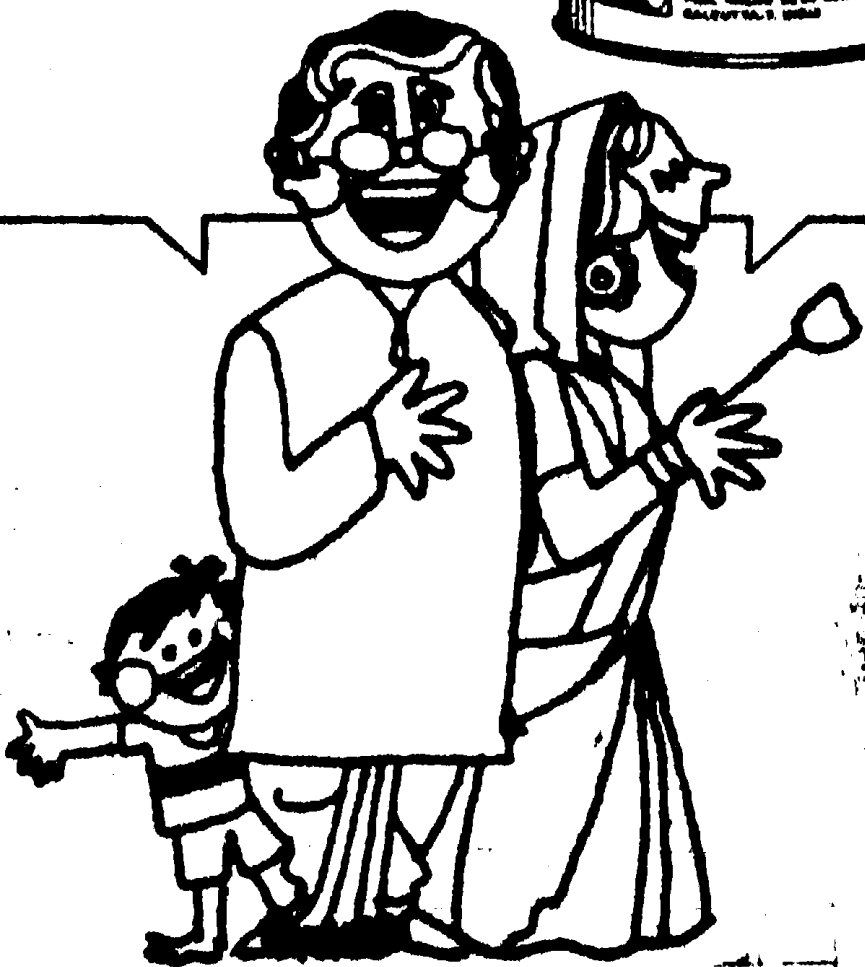
আর একটি কথা যার সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে। লেখক তাঁর এই প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন—...এই বিদ্রোহ কার্যত গান্ধী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। যিনি গান্ধীজীর নেতৃত্ব সম্বন্ধে উপরের উক্তিগুলি করেছেন তিনি কি করে গান্ধীজীর নেতৃত্বকে অবমাননা করতে পারেন বুঝে উঠতে পারলাম না। সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল জাতীয়-জীবনের মুক্তি বিকাশ কংগ্রেসকে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলাব। কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন এর পরিপন্থী। গান্ধীজী ছিলেন নরমপন্থী আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতালাভে তিনি ছিলেন পক্ষপাতী আর সুভাষচন্দ্র ছিলেন চরমপন্থী তিনি মনে করতেন আপোষহীন সংগ্রাম ছাড়া কখনও স্বাধীনতালাভ হয় না। গান্ধীজী যতদিন অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন সুভাষচন্দ্র ততদিন গান্ধীজীর সংগে মিলেমিশে চলেছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে সুভাষচন্দ্র বুঝলেন গান্ধীজী ও তাঁর অনুবর্তী কংগ্রেস আর কোন সংগ্রামের পক্ষপাতী নন সেই মুহূর্তেই তিনি গান্ধীজী তথা কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নামে এক সংগ্রামপন্থী কর্মীদল গঠন করলেন। এটা আর কিছুই নয় 'মত' ও 'পথ'-এর লড়াই। তার মানে এই নয় যে গান্ধীজীর নেতৃত্বকে অবমাননা করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা।

বারিদবরণ ঘোষ
[illegible] চুঁচুড়া।

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

পুজোর আনন্দে গ্রাম গুলজার। সব বাড়িতেই আত্মীয় পরিজনের ভিড়। এর মধ্যেই খুচরো পরব এক ধরনের পুজোই—ধান বনকে সাধ খাওয়ানো। আর এব পরব পার্সিও এই সময়েই। সধবা-বিধবা ছেলে-বুড়ো সবাই মেতে উঠলো। ওদিকে ভোর হতেই আহ্লাদ বৈরাগীর গলায় আগমনীর সুর বেজে উঠল।

কিন্তু তরঙ্গিনীর মন বড় চঞ্চল। বুকের মধ্যে তার টনটন করে ওঠে—ষষ্ঠী গেল—মহাসপ্তমীও এসে গেল কিন্তু তার মেয়ে এখনও এলো না।

আর কবে আসবে?

ক্রমে সপ্তমী অষ্টমী নবমী পেরিয়ে দশমীও এসে গেল। ভোরে উঠেই সবাই দেখে ভিজে চোখ মা-দুর্গার। শেষ রাত থেকে সানাই বাজছে। তারও কান্নার সুর গিরিকন্যা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাচ্ছেন বলে।

দুপুরের পরই মা দুর্গার কপালে সিঁদুর পরিয়ে সেই সিঁদুর মেয়েদের মধ্যে এ ওকে পরিয়ে দেবার ধুম পড়ে গেল।

কিন্তু ভবনাথের মন খারাপ। মণ্ডপ খালি করে মা চলে যাবেন, এ তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

ভবনাথের আরেক ভয় মা দুর্গাকে আনতে গিয়ে বুড়ি মাকে হারিয়েছেন। ধর্মকর্ম এ বংশে সয় না।

পুজোর পর পরই রাখীবন্ধন। এগাঁয়েও তার ঢেউ এসে লেগেছে। দেবনাথ পুজোর পরে গ্রামে এসেছে। সে এসেই রাখী উপলক্ষে স্বদেশী দল করেছে। ফলে খোদ ভবনাথের ভিতর বাড়িতেই 'বন্দে-মাতরম' ধ্বনি।

সেই উপলক্ষে হাটখোলার সভা পর্যন্ত হয়ে গেল।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরবর্তীকালে, বাবার স্মৃতি কুয়াসাচ্ছন্ন বাবার চেহারাটা অবধি কমল মনে আনতে পারে না—কিন্তু এই দিনটা হঠাৎ কখনো কুয়াসা ভেঙে দপ করে জ্বলে ওঠে। বাবার এই কোলের মধ্যে নিবিড় করে টেনে নেওয়া দেবতার প্রত্যাদেশের মতন বাবার এই আশ্চর্য কণ্ঠধ্বনি। মৃত্যুর পরে পাবে আবার বাবাকে—তখন আচ্ছারকম ধমক দেবেন মনে হয় : শুধুমাত্র মুখের বুকনি আর কাগজের কলমবাজিতে দায়িত্ব সেরে এলি রে খোকন গায়ে একটা আঁচড় দেখতে পাচ্ছিনে—ছি-ছি!

কামাররা বুঝি ঘুমোয় না। ঠনঠন ঠনাঠন আওয়াজ আসে। শুনতে শুনতে কমল ঘুমিয়ে যায়। ভোররাত্রে আবার জাগে তরঙ্গিণী তখন বাইরে নিয়ে যান একবার। চারিদিকে ফরসা-ফরসা ভাব, গাছে গাছে পাখি ডেকে উঠছে দিনমান ভেবে। নুলেবাছুরদের গলা শুকিয়েছে, ডাকছে গোয়ালের ভিতর। এ-বাড়ির ও-বাড়ির ছেলেপুলে কেঁদে কেঁদে উঠছে। তখনও কামারবাড়ি থেকে লোহা পেটানোর আওয়াজ।

ওরা ঘুমোয় না মা?

তরঙ্গিণী বলেন একটুখানি চোখ বুঁজে নেয় এক ফাঁকে। ঘুমুতে দিলে তো! গাছমলের মরশুম—খেজুরগাছ কেটে রস বের করবে সেজন্য দা গড়ানোর হিড়িক লেগে গেছে।

ভট্‌চাজ-বাড়ি ছাড়িয়ে সামান্য ঘুরে কামারশালা। ঘিঞ্জি বসতি—একই উঠান নিয়ে দু-তিন ঘর গৃহস্থ। এর হয়তো পশ্চিমপোতার ঘর, ওর উত্তরপোতা আর একজনের পুবের পোতা। কামারশালাগুলো পাড়ার বাইরে বাঁশবনের ছায়ায় রাস্তার এদিকে আর ওদিকে। কমল একদিন কোথায় যেন যাচ্ছিল—হাপর চালিয়ে কামারশালায় তখন পুরোদমে কাজ চলছে। দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। হিরু ছিল সঙ্গে সে হাঁকপেড়ে উঠল : হাঁ করে কি দেখিস? আয়, চলে আয়।

দেখারই বস্তু, সারাদিন ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হিরুর তাড়ায় লহমার বেশি দাঁড়াতে পারে নি।

গাছ-কাটা দা গড়ে কূল পাচ্ছে না, তার উপরে আবার ধান কাটা লেগে গেছে! কাস্তে গড়ার ফরমাস। সাধ্যে কুলোয় না কামারের দোষ কি। খদ্দেরের কাছে পালিয়ে বেড়ায় 'আজ দেবো' 'কাল দেবো' বলে ভাঁওতা মারে।

প্রহরখানেক রাতে ভবনাথ হাটখোলা থেকে হাট করে ফিরছেন। ধামা ঘাড়ে অটল মাহিন্দার পিছনে। মেঘা কর্মকারের সঙ্গে দেখা। তল্লাটের মানুষের হাটঘাট সারা হাট ভাঙো-ভাঙো—মেঘা সেই সময় ধামা খালুই নিয়ে চলেছে।

ভবনাথ বললেন, এখন যাচ্ছ মেঘনাদ হাটে কি আর আছে কিছু? মাছের মধ্যে ঘুসো চিংড়ি তরতারির মধ্যে শাকের ডাঁটা।

মেঘা বলল খাটনির গুঁতোয় ফুরসত করতে পারিনে বড়কর্তা। তা-ও তো লোকের গালমন্দ খেয়ে মরি।

মরসুমের মুখে এখন হয়তো কথাটা সত্য। কিন্তু কর্মকার-পাড়ার বারোমেসে নিয়মই এই। বিশেষ করে মেঘার। হাট ভাঙো-ভাঙো অবস্থায় জিনিসপত্র কিছু সস্তায় মেলে। ক্ষেতেল পারতপক্ষে ফেরত নিয়ে যেতে চায় না, লোকসান করেও দিয়ে যায়। মেঘা কর্মকার সেই সস্তাগণ্ডার খদ্দের।

মুখোমুখি পেয়ে গেছেন তো ভবনাথই বা ছাড়বেন কেন! সেই কবে একজোড়া কাস্তের কথা বলেছিলেন—গড়ে দেবে কি ধান কাটা কাবার হয়ে যাবার পর? বলছেন গালমন্দ লোকে এমনি-এমনি করে না। আমার তো সামান্য দুটো কাস্তে—কত আর ঘোরাবি বল দিকি?

মেঘার তুড়ুক জবাব : সে তো কবে হয়ে আছে।

পিছন থেকে অটল বলল, হয়ে আছে—তা একটু বলে পাঠাতে পারো নি। সক্কালে কাল গিয়ে নিয়ে আসব।

মেঘা বলে কাল নয়। ধার কেটে উকো ঘষে দেবো—কালকের দিনটা বাদ দিয়ে পরশু যেও

বলে আর মুহূর্তমাত্র দাঁড়ায় না, হনহন করে পলকে দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

অটল বলল, বেটা কিচ্ছু করে নি। ভাব দেখলেন না? ধরেই নি এখনতক। নেহাৎপক্ষে দশবার এর মধ্যে তাগিদ হয়ে গেছে।

ভবনাথ বললেন, তাগিদ দিয়ে কাজ নেই সামনে বসে কাজ ধরিয়ে আনতে

হবে। তোকে দিয়ে হবে না নিজে আমি কাজ চলে যাবো। ধোপার বাঁস কামারের অসি' বলে না?—ওটা জাতের ধর্ম।

ধোপার বাড়ি বাঁস কাচতে দিলে সে কাপড় কবে পাবে ঠিকঠিকানা নেই। তেমনি কামারও যদি 'আসি' বলে একবার সরে পড়তে পেরেছে, আর তার নিশানা পাবে না। ছড়াটা সেইজন্য চলিত হয়েছে। সকালে উঠে ভবনাথ কাজকর্মের বিলিব্যবস্থা করছেন। শিশুবর সাগরদত্তকাটি পাঁচ সর্দারের বাড়ি চলে যাবে—নিজেদের ধানই কাটছে তারা বর্গাজমি বলে নাজির বন্দে আজও কাস্তে ছোঁয়াল না। ঠিকারকলাই পেকে গেছে তেলিরভূয়ে গিয়ে অটল কলাই তুলতে বসে থাক: আর তিনি নিজে চললেন কামারবাড়ি—

কামারবাড়ির নাম কানে যেতে কমল বায়না ধরল আমি যাবো জেঠামশায়—আমি যাবো—

তুই যাবি কেন রে?

ঠনঠন ঠনাঠন লোহা পেটনো তখনই শুরু হয়ে গেছে। নাচন দিল কমল কয়েকবার : যাবো—

অন্যেরা ভবনাথের বড় একটা কাছ ঘেঁষে না—সবাইতে একটু বলেই খিঁচুনি দিয়ে ওঠেন। সে বড় বিষম জিনিস, হাতে মারা তার চেয়ে অনেক ভালো। সেই মানুষ কমলের বাবদে একেবারে ভোলা-মহেশ্বর। 'হবে না' 'হবে না' করে এই ছেলে কনিষ্ঠ দেবনাথের একমাত্র বংশধর—আদর দিয়ে দিয়ে তাই তিনি মাথায় তুলেছেন লোকে বলে। শিশুর বেশি জোরজুলুম জেঠা-মশায়ের কাছে। 'যাবো'—করতে করতে চোখ বড় বড় করে দীর্ঘ টানা সুরে সে বলে উঠল আমি যাবো-ও-ও—

হুঁ বলে ভবনাথ চাদরটা কাঁধে তুলে নিলেন।

চলল তবে তো। পন্টুর ভাল লাগে না বাগড়া দিয়ে এসে পড়ে : তোর পাঠশালা আছে না কমল?

কমল বলে, সোমবার তো। মাস্টারমশায় দেরি করে আসবেন।

ভবনাথ নিজেই অমনি সমাধান করে দিলেন : আসবার সময় মানুকে আমি নতুনবাড়ি বসিয়ে দিয়ে আসব। পন্টু তুই পাতা-দোয়াত বইপত্তর পেঁছে দিয়ে আয়।

যাচ্ছেন ভবনাথ কমল তাঁর আগে আগে। পন্টুর পানে হাসিমুখে তাকিয়ে পড়ল সে যেন—পন্টুর অন্তত মনে হল তাই। ছোটভাই হয়ে দিদিকে দেমাক দেখাচ্ছে। গজর গজর করে : উনি চললেন কামারবাড়ি, আমায় পাঠশালায় বই-খাতা বয়ে নিতে হবে। বলছে খুব মনে মনে— জেঠামশায়ের কথার উপরে কথা শব্দ করে বলা যায় না।

কামারশালা চারটে—পথের এধারে ওধারে সামান্য দূরে দূরে। প্রথমেই মেঘা কর্মকার। দোচালা ঘর মানুষে মানুষে ছয়লাপ। খদ্দেররাই বেশি, বাজে লোকও জমেছে কিছু। ছাঁচতলায় বাখারির বেঞ্চি বানানো সারবন্দি সেখানে বসেছে। আবার চালের নিচে ঘরের মধ্যে বসেছে—কেউ চাটকোলে কেউ বা তক্তার টুকরো-টাকরা টেনে নিয়ে। দাঁড়িয়েও আছে কতক কতক।

ভবনাথ গিয়ে বললেন কই দেখি আমার কাস্তে। ধার-কাটা শুধু মাত্তোর বাকি। বের করো, দেখব।

ঘাড় তুলে দেখে মেঘা তটস্থ হল।

আসেন বড়কর্তা বসেন—মুরুব্বি লোকদের জন্য জলচৌকি আছে একটা। কারা বসেছিল ভবনাথকে দেখে শশব্যস্তে উঠে হাত দিয়ে চৌকিটা ঝেড়ে দিল। ভবনাথ বসলেন।

পাশের জায়গা দেখিয়ে কমলকে মেঘা বলে বোসো খোকা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

বসবে কি—কমলের চোখের মণি তো ঠিকরে বেরুনোর গতিক। কী কান্ড রে বাবা!

হিরণ্ময়ের সঙ্গে যেতে যেতে রাস্তা থেকে সেই ঝলক মাত্র দেখেছিল আজ সামনের উপর একেবারে হাত পাঁচ-সাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছে। দু-চোখ ভরে দেখছে। হাপরের দড়ি মেঘা পা দিয়ে টানছে ফোঁস-ফোঁস করছে হাপর কেউটে সাপের মতন, কাঠকয়লার আগুন টানে টানে দপদপ করে উঠছে। লোহা সেই আগুনে—জ্বলেপুড়ে লোহা রক্তবরণ ধরেছে। সাঁড়াশি দিয়ে সেই লোহা নেহাই-এর উপর নিয়ে মেঘা কর্মকার হাতুড়ি ঠুকছে। সেটা ছোট হাতুড়ি। আর দশাসই এক মরদ—মেটে মেটে রং হাপরের আগুন ও লোহার লাল আড়া গায়ের উপর ঠিকরে পরে দৈত্যের মতন দেখাচ্ছে তাকে—দাঁড়িয়ে পড়ে সেই লোক দু-হাতে প্রকান্ড হাতুড়ির ঘা মারছে লোহার উপর। মেঘা কর্মকার প্রয়োজন মতো এদিক সেদিক ঘোরাচ্ছে গনগনে গরম লোহা। নিজে ঠুকঠুক করে মারছে, আর বড় হাতুড়ি ঠনঠন ঠনাঠন অবিরত এসে পড়ছে। দা কি কাস্তে কি কুড়ুল—পিন্ড লোহায় দেখতে দেখতে জিনিসের আদল এসে যায়। নেহাই-এর পাশটিতে মেজেয় নাদা পোঁতা নাদার মধ্যে জল। খেজুর-বাগড়ের গোড়ার দিকটা পিটিয়ে ফেস্টো-ফেস্টো করে জলে ডোবানো—সেই বস্তু মেঘা ঘন ঘন তুলে জল ছিটিয়ে নেয় গরম লোহার উপর। আবার হাপরের আগুনে দেয় আবার পেটায়। জোড়া হাতুড়ির ঘায়ে ফুলকি ছিটকে পড়ছে চারদিকে তারাবাজির মতো। শংকিত কমল তিড়িং করে লাফ দিয়ে সরে যায়।

মেঘা হেসে বলল পালাও কেন খোকা? তোমা অবধি যাবে না। আর গেলেই বা কি —ওতে পোড়ে না। পড়তে না পড়তে নিভে যায়।

হাপরে কাঠকয়লার আগুন—কলকে এগিয়ে ধরলে মেঘা সাঁড়াশি দিয়ে তার উপর আগুন তুলে দিচ্ছে। হাতে হাতে কলকে চলে। আর নানান গল্পগাছা—পাঁচ-খানা গাঁয়ের সুখ-দুঃখ অনাচার-অবিচার রং-তামাসা। ফষ্টিনষ্টি শোন এই কামার-দোকানগুলোয় বসে।

একখানা গাছকাটা-দা গড়ানোর দরকারে কুঞ্জ ঢালি অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে। কমলকে পেলেই ঠাট্টা-বটকেরা করে সে, আবার খেতেও দেয় রস-পাটালি ফলপাকড় —চাষার বাড়িতে যখনকার যে জিনিস। কমলকে সে শুধায় : এত্ত সমস্ত সরঞ্জাম দেখছ—বলো দিকিন খোকা কোন জিনিস বিনে কামারের দোকান একেবারে কানা? তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ ভাল ... দেখে তারপর জবাব দাও।

আরও বিশদ করে বুঝিয়ে বলে মেঘা কর্মকার আমায় আজ চার মাস ঘোরাচ্ছে। রেগেমেগে ধরো আজ মতলব করে এসেছি, দোকানের এমন এক জিনিস নিয়ে দৌড় দেবো যাতে তার কাজকর্ম বন্ধ হবে, কর্মকার বেকায়দায় পড়ে যাবে। কোন সে জিনিস?

ছোট্ট মানুষ কমলকে উদ্দেশ করে বলা সবগুলো চোখ তাকিয়ে পড়ে জবাব খুঁজছে। কিন্তু জবাব চায় নি কুঞ্জ ঢালি—গল্প ফাঁদছে তারই ওটা ভূমিকা। কামার বায়না নিয়ে বসে আছে—জিনিস গড়ে দেয় না, বায়নার টাকাও ফেরত দেয় না। মানুষটা বাঁধতে কিছু খাটো—কর্ম-কারকে জব্দ করবে মতলব নিয়ে আজ কামারশালে এসে বসেছে। দু-পাঁচটা ঘা মেরেই হাতুড়ি রেখে খেজুর-ডাঁটা দিয়ে জল ছিটায় বিস্তর ক্ষণ থেকে ঠাহর করছে সে। কামারের কাজে খেজুর ডাঁটাই অতএব

গোয়েন্দা ধাঁধা

ফাঁদে পড়ল ফন্দিবাজ ।।

অ্যালবার্ট ক্যাম্পিয়ন ।।

মার্গারি অ্যালিঙহ্যাম

কে বলেছে চেয়ারে বসে গোয়েন্দাগিরি হয় না? ঘরে বসে স্রেফ নকসা দেখেও খুনী ধরা যায়। অ্যালবার্ট ক্যাম্পিয়ন সব পারেন।

ভদ্রলোক চশমাধারী। ফিকফিকে রোগা। ধরকুণো। কিন্তু মাথাটি সাফ। আপদে-বিপদে তাই ইন্সপেকটর ওটস আসেন শলাপরামর্শ করতে।

সেদিন এলেন একটা ভারী সোজা কিন্তু ভারী কঠিন খুনের হেঁয়ালী নিয়ে। খবরের কাগজেও বেরিয়েছে খবরটা।

আগের রাতে খাস লন্ডন শহরেও গরম পড়েছিল। গুমোট গরম। জলের মাছ ডাঙায় উঠলে যেমন খাবি খায়, ঠাণ্ডার দেশের মানুষরা গরম পড়লে তেমনি হাঁসফাঁস করে। সাহেব মেমরা মাথা ঘুরে পড়েও যায়।

তাই রাত একটার সময়ে লোকটাকে টলে পড়ে যেতে দেখে অবাক হল না বীটের কনস্টেবল। হেলতে দুলতে কাছে এসে আঁৎকে উঠল কাঁধের ফুটো দেখে। পাকা হাত বটে। নলি ফুটোর মধ্যে দিয়ে ঢুকেছে বুলেট, ফুসফুস ফুটো করেছে হার্ট ফুটো করেছে তারপর আটকে গেছে বুকের খাঁচায়।

গুলির আওয়াজ শোনা যায় নি।

তার মানে হয় সাইলেন্সার ছিল বন্দুকে না হয় খুব দূর থেকে গুলি করা হয়েছে।

কিন্তু কতদূর থেকে? কোনখান থেকে? ধাঁধা তো সেখানেই। গজগজ করতে লাগলেন ইন্সপেক্টর ওটস। একটা নকসাও এঁকে ফেললেন। নকসাটা এই :

ত্রিশ বছর বয়স। তার মধ্যে দশ বছর জেলে ছিল। লোকটা গভীর জলের মাছ। খুনী জালিয়াৎ নিয়ে কারবার করে।'

তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন ক্যাম্পিয়ন সাহেব।

ওটস বললে— 'ওর চোরাই মালের কারবারের গোপন ঘাঁটি হল কোল কোর্ট'য়ের এই কাফে। যদিও কফি পানের জায়গা, ভাল আড্ডাখানাও বটে। চোরবাটপার খুনে গুণ্ডারাও থাকে সে আড্ডায়।

দাঙ্গাবাজ ডোনোভান ওদের মাথা বললেও চলে। জোসেফাইন মেয়েটাকে অষ্ট-প্রহর বসিয়ে রাখি কাউন্টারে—রাস্তার খদ্দেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ভেতরে টেনে আনার জন্যে। 'এহেন জোসেফাইনের সঙ্গে সত্যি সত্যিই পটে গেল গিলাকিক। রেগে টং হল ডোনোভান। শাসিয়ে দিল সবার সামনেই, ফের যদি জোসেফাইনের ধারে কাছে দেখা যায় তো টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে।

তা সত্বেও কাল রাতে বিরহী গিলাকিক এসেছিল প্রেয়সীর কাছে। মরণকালেই লোকের বুদ্ধিনাশ ঘটে। জোসেফাইন অবশ্য হাঁকিয়ে দিয়েছিল গিলাকিক-কে কিন্তু ডোনোভানের গুলি কখনো ফসকায় না।

'অথচ জোসেফাইন নিজে থেকেই দৌড়তে দৌড়তে থানায় এসে বলে গেল, ডোনোভান নাকি কাফে থেকে একদম বেরোয় নি। ওর গায়ে পড়ে সাফাই গাওয়া মোটেই ভাল চোখে দেখিনি আমি। কিন্তু আরো প্রমাণ পেলাম দুজন সাংবাদিকের কথা শুনে। জানেন তো ও অঞ্চলে দুটো খবরের কাগজের অফিস আছে। সারারাত কফি সাপ্লাই যায় সেখানে। রিপোর্টাররাও দুটো গুদোমের মাঝের দেওয়াল— একটা ফুটোও নেই।

নকসা দেখুন। গিলাকিক-এর লাশ পাওয়া গেছে বালির গাদার সামনে চৌকো চিহ্ন দেওয়া জায়গায়:

ভেকেন স্ট্রীটের রাস্তার দুপাশে দুজন কনস্টেবল মোতায়েন ছিল। কোল-কোর্ট-য়ের ডানদিকের ল্যাম্পপোস্ট পর্যন্ত দুজনের এখতিয়ার।

দুজনের কেউই গুলির আওয়াজ শোনে নি— বন্দুকবাজকেও দেখেনি। কনস্টেবলকে স্বচক্ষে দেখেছে গিলাকিক-কে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়তে। কনস্টেবল খ সেই সময়ে গুদোম টহল দিতে ভেতরে ঢুকেছিল।

'কনস্টেবল ক তাকে ডেকে আনে। অ্যামবুলেন্স ডাকে।

ডাক্তার বলছেন, যে-ভাবে গুলি লেগেছে তাতে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে গিলাকিক। ঐ গুলি খেয়ে তিন পায়ের বেশী হাঁটা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, ডোনোভান রাস্তায় বেরিয়ে এসে গুলি করে ফের ঢুকে গেছিল গলিতে এবং কাফের ভেতরে।

'অথচ কেউ তাকে বেরোতে দেখেনি।

মিস্টার ক্যাম্পিয়ন, বলুন দিকি একি রহস্য? ডোনোভান ছাড়া আর কেউ খুন করেনি—কিন্তু করল কেমন করে?"

অ্যালবার্ট ক্যাম্পিয়ন এতক্ষণে নড়ে উঠলেন চেয়ারে। বললেন—'গিলাকিক গুলি খেয়েছে চার দেওয়ালের মধ্যে। তার মধ্যে দুটো দেওয়াল হচ্ছে নিরেট কংক্রিটের—বাকী দুটো দেওয়াল হচ্ছে রক্তমাংসের—কনস্টেবল ক আর খ।

'ওটস, রক্তমাংসের দেওয়াল কি নির্ভরযোগ্য?'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন ওটস।

বিড়বিড় করে শুধু বললেন— '...গড!' পরক্ষণেই বাঁই বাঁই করে ছুটলেন থানায়।

খবর এল যথাসময়ে। কনস্টেবল ক ছুটিতে গেছে আজ সকালেই। লাশটা

ভেকেন স্ট্রীট

বালির গাদা

গিলাকিক-য়ের লাশ যেখানে পড়েছিল

কাফে
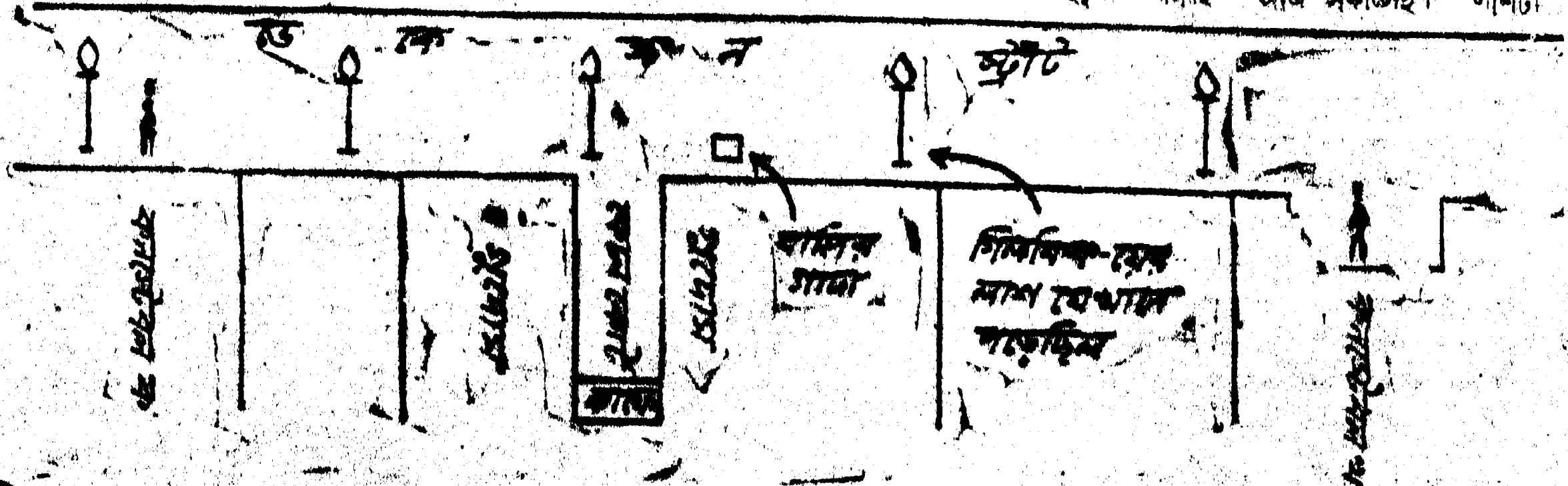
বললেন— খুন হয়েছে জনৈক গিলাকিক। জোসেফাইন বলে একটা ছুঁড়িকে নিয়ে অনেকদিন থেকেই তার মনকষাকষি ছিল ডোনোভানের সঙ্গে। ডোনোভান নামী বন্দুকবাজ। টিপ কখনো ফসকায় না। পাঁচ-আড্ডা মারে ফাঁক পেলেই। ডোনোভান যে কাফের বাইরে পা দেয় নি— তারাই হলফ করে বললে।

'খুনটা তাহলে হল কি করে? কোলকোর্ট একটা গলির মধ্যে। দুপাশে পাচার করেছিল সে-ই—পাছে চাকরিটা নষ্ট হয়, এই ভয়ে।

কিছু বুঝলেন? লাশটা কোথায় পাচার হয়েছিল?

—অদ্রীশ বর্ধন

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান ৫১ পৃষ্ঠায়

টুসু গানে সমাজমন ও প্রেমচেতনা

শান্তি সিংহ

।। এক ।।

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সিঁড়িভাঙা অজকমাঠ বুকে হিমেল-বাতাস আর শিশিরের ছোঁয়া মেখে যখন ধান শিষের আনম্র গোছায় কাঁচা হলুদ রংয়ের উজ্জ্বল শোভা ফুটে ওঠে, তখনই ঐ অঞ্চলের সাধারণ নরনারীর মুখে গুণগুনিয়ে ওঠে টুসু গান। ডঃ সুকুমার সেন পুষ্যা বা তিষ্যা নক্ষত্রের সংগে সম্পর্কযুক্ত ও তিষ্যা নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত এ গানকে শস্যোৎসবের গান বলেছেন। এই টুসু বা তুসু গানের ধারা মেদিনীপুর বাঁকুড়া পুরুলিয়া জামশেদপুর, ঘাটশিলা প্রভৃতি বিস্তৃত পশ্চিম সীমান্তে বহুদিন ধরে প্রাকৃত মানুষের মুখে বয়ে আসছে।

টুসু মূলতঃ মেয়েদেরই পরব। কুমারী থেকে বয়স্কা অবধি মেয়েরা অঘ্রাণ সংক্রান্তির দিন ইতুর ভাসান-জল নিয়ে টুসুর স্থাপনা করে। টুসু হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক। তাই লাল রংয়ের নতুন মাটির সরার গর্ভটিকে আলোচাল তুষ কড়ি দূর্বা, বেশ কিছুসংখ্যক ছোট্ট গোবরগুলি (ছ বুড়ি ছ গন্ডা মানে একশো চুয়াল্লিশটিই বিধি) এবং সর্ষে মুলো ও গাঁদা ফুল দিয়ে সাজানো হয়। ছোট ছোট মাটির প্রদীপ নাতিবৃহৎ সরার কানার চারদিকে সুন্দরভাবে বসানো থাকে। বাড়ীর কুলুঙ্গীতে আলপনা দিয়ে টুসু পেতে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করে মেয়েরা কলস্বরে গেয়ে ওঠে—"টুসালু গো রাই। তোমার দৌলতে আমরা ছ বুড়ি (ছ বুড়ি) পিঠা খাই। ছ বুড়ি লো লবুড়ি। গাং সিনানে যাই। গাংয়ের জলে বাঁধি বাড়ি। মকরেব জল খাই। চার মাস বর্ষা। পোখরনা না যাই।"

শুধুমাত্র মাটির প্রদীপ বসানো লাল সরাতেই যে টুসু পুজো হয়—তা নয়। ঘাটশিলা জামশেদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মাটির পুতুল করে পুজো হয়। এই অনতিদীর্ঘ টুসু মূর্তির রং হলুদ। বাহন মকর বা পদ্মফুল অথবা ময়ূর। দেবীর অলংকার হার, কর্ণফুল চুড়ি তাবিজ। পরনে মাটির শাড়ী। দেবীর বাঁ হাতে থাকে ধানের শিষ অথবা ফুল কিংবা পাখি।

অঘ্রাণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি অবধি প্রতি সন্ধ্যায় লম্ফ বা হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোর সামনে বসে গ্রাম্য কুমারী মেয়েদের ভিড়ে বর্ষীয়সীরা জড়ো করে টুসু গান গায়। দেহাতী মেয়েরা হাটেবাটে দল বেঁধে চলতে চলতে যূথবন্ধমনের আবেগে গেয়ে ওঠে টুসু গান। অনেক সময় খেত মজুর চাষী অথবা রিকসাচালক মাঠে বা পথে দিনদুপুরে বা বাড়ি-ফিরতি রাত্তির বেলায় জোর গলায় মনের আবেগে গায় টুসু গান। সারাটা পৌষ মাসে রুক্ষ টাঁড়-বাদের দেশে শাল-মহুয়া-অর্জুন-পলাসের তলায় তলায় এই টুসু গানের সুর মনে এক বিশেষ আবেশ জাগায়।

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন হল 'বাউড়ী'। ঐদিন সন্ধ্যায় গ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘরে পৌষ পিঠে আর খেজুর গুড়ের সুঘ্রাণের সঙ্গে মেশে টুসু গান। শীতার্ত সন্ধ্যা যতই গভীর হয়— টুসু গানের সোচ্চার কলগীতি মেয়েদের মনে ততই যেন উষ্ণ মদবিহ্বলভাব জাগিয়ে তোলে। সারা রাত চলে জাগরণ। "টুসু পুজার দিনে যত দেবী সন্ধ্যা লাও তুলে নে। শুভ্রকান্তি সরস্বতী গো প্রণমি মা চরণে। পদ্মাবতী সীতাদেবী বন্দি গো মনে মনে" দিয়ে শুরু হলেও এই ধর্মপ্রাণতা ঐহিকসুখ বর্জিত নয়। তাই মেয়েদের মুখে সোনা যায়—"টুসালু মায়ের কাছে চেয়ে লিব বর। ধনেপুত্রে ভরুক আমার ঘর।"

আহ্বান গীতির পর টুসু গানে পর্যায়ক্রমে নারী জীবনের কামনা বাসনা, সুখ-দুঃখ হতাশার জীবন রাগে সংরক্ত সুর ফুটে ওঠে। চলমান সমাজ জীবনের কথাও বাদ যায় না। রাত্রি জাগরণের পর সংক্রান্তির সকালে মেয়েরা দল বেঁধে ক্লান্ত গলায় গান গাইতে গাইতে নিকটবর্তী নদী বা জলাশয়ে গিয়ে টুসু বিসর্জন দেয়। বিসর্জনের সময় অনেকে টুসু সরাকে চোদলে অর্থাৎ ছোট্ট রথাকৃতি বাঁশের ফ্রেমে রঙিন কাগজে সাজিয়ে নিয়ে যায়। এই 'চোদল', সংক্রান্তির কয়েকদিন আগ বানানো বা কেনা হয়। ইচাগড়ের সুবর্ণরেখা তীরে সতীঘাটায় এবং পুরুলিয়ার কাঁসাই ব্রিজের তলায় টুসু ভাসানের সকালে অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তি সকালে অসংখ্য নরনারীর সমাগম হয়ে থাকে। এই বিরাট মেলার অন্তরশায়ী করুণ রাগিণী সহজেই অনুভব করা যায়। জনৈক লোকসংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ একে 'পৌষালি বিজয়া' বলে অভিহিত করে তাঁর রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

।। দুই ।।

লৌকিক দেবী টুসুর আভিজাত্য আনয়নকল্পে রচিত হয় সংস্কৃত মন্ত্র : 'গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ নানালংকারশোভিতাং। সর্বলক্ষণসম্পন্নাং পীনোন্নত পয়োধরাং। দিব্যবস্ত্রপরিধানাং শংখপদ্মধরাং শুভাং প্রসন্নবদনাং দেবীং ধ্যায়েৎ তুষলাং সর্বসিদ্ধিদাং।" টুসুকে লক্ষ্মীদেবীর সংগে এক করে দেখে নরনারীর মধ্যে এক সম্ভ্রমভাব জেগে ওঠে। কিন্তু ধর্মীয় বাতাবরণ ছাড়িয়ে টুসু গানে সমাজমন গভীরভাবে ক্রিয়াশীল।

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পৌষ সংক্রান্তি বড় পরব। এ সময় প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই আসেন লক্ষ্মী অর্থাৎ ধান। সকলের ভাগ্যেই দুবেলা পেটপুরে অন্ন জোটে। নতুন চাল থেকে তৈরী হয় পিঠে সকলেই সাধ্যমত নতুন কেনে জামা কাপড়। এহেন পরবে যদি কোন মেয়ে শ্বশুরঘর থেকে বাপের ঘরে না আসতে পারে তাহলে সে মনের দুঃখে গেয়ে ওঠে—"এত বড় পৌষ পরবে রাখলি মা পরের ঘরে। পরের মা কি বেদন জানে অন্তর ঝুরে মরে।" রবীন্দ্রনাথের 'বধূ'

পরমাণু শক্তি না দারিদ্র্য

কোনটা আমাদের কাম্য

বিশ্বের উন্নত দেশগুলো কেবল মাত্র জল-তাপ বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল নয়। তারা এখন পরমাণু বিদ্যুতের দিকে ঝুঁকেছে। ১৯৭৩ সালের আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধের পর যখন বিশ্বব্যাপী তেল সংকট দেখা দিল তখন থেকে ইউরোপ-আমেরিকার সব কটি রাষ্ট্র পরমাণু বিদ্যুতের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। কারণ আরব দেশের বা অন্য দেশের তেলের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকাটা আর বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তেলের যোগান বন্ধ করলে বিদ্যুৎ উৎপাদনও বন্ধ হবে।

ইউরোপের বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিশ্বে এখন শক্তির চাহিদা সাংঘাতিকভাবে বেড়েছে। ১৮৫০ সালে সমগ্র বিশ্বে যত শক্তি ব্যবহৃত হয়েছে তার চল্লিশ গুণ ব্যবহৃত হয়েছে ১৯৫০ সালে। আবার ২০৫০ সালে শক্তির চাহিদা বেড়ে হবে ১৯৫০ এর একশ গুণ বেশী। মধ্যযুগে সমগ্র বিশ্বে যত শক্তি ব্যবহৃত হয়েছে তার পুরোটা এখন ব্যবহৃত হচ্ছে তিন বছরে। অর্থাৎ কয়েক শ বছরে যে শক্তি ব্যবহৃত হত তার পুরোটা এখন দু-তিন বছরে লাগছে। গত দশ হাজার বছরে যত শক্তির ব্যবহার হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে বিংশ শতাব্দীতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৮ সালে শক্তির খরচ হত পাঁচানব্বই হাজার মেগাওয়াট। ১৯৭২ সালে লেগেছে সেখানে সত্তর লাখ মেগাওয়াট। এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ গ্যাস পেট্রল ইত্যাদি মিলিয়ে শক্তিগুলো।

জল-তাপ বিদ্যুৎ গ্যাস কয়লা পেট্রলজাত শক্তির সীমানা পরিসীমিত। তাই চাই পরমাণু শক্তি। হিরোসিমার পরমাণু বোমা যে ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরেছে সেকথা চিন্তা করলে পরমাণু শক্তির কথা উঠলে অনেকেই পিছিয়ে যাবেন। কিন্তু পরমাণু শক্তির ধ্বংসের কথা ছেড়ে দিলেও তার শুভ দিকটা আমাদের ভাবতে হবে। তাই উন্নত দেশগুলো ভবিষ্যতে তাদের পরমাণু শক্তি কেন্দ্র বাড়াতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আগামী দশ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুশোটি পরমাণু শক্তি কেন্দ্র নির্মাণ করবে। ফ্রান্স করবে পঁয়ত্রিশটি বৃটেন করবে বিয়াল্লিশ পশ্চিম জার্মাণী করবে সাঁইত্রিশটি সোভিয়েত ইউনিয়ন নির্মাণ করবে বত্রিশটি স্পেন করবে বত্রিশ জাপান উনত্রিশ কানাডা একুশটি সুইডেন করবে এগারটি ইতালি এগারটি সুইজারল্যান্ড নয়টি ও ভারত আটটি। বিংশ শতাব্দীর শেষে অথবা এক বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সমগ্র বিশ্বে এক হাজারের ওপর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হবে। ইউরোপ-আমেরিকার সকল রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে কে কার চেয়ে বেশী পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র খোলার জন্যে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে চলেছে তার ফলে এক বিংশ শতাব্দীতে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে বত্রিশ লাখ মেগাওয়াট।

পশ্চিম ইউরোপের কমন মার্কেট দেশগুলোর মধ্যে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ নিয়ে একাধারে যেমন প্রতিযোগিতা চলছে তেমনি আরেক দিকে চলছে সহযোগিতা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে ফ্রান্সের রোন নদীর তীরে ফিনিকস পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে আড়াইশ মেগাওয়াট। ইংলন্ডের সংগে সহযোগিতা চলছে ফলে তারা এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।

এক ফ্রান্সেই এখন ছটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়ে গেছে। তবে ইউরোপ ও আমেরিকায় হেভিওয়েট ও লাইটওয়েট ওয়াটার টাইপ দুই ধরণের রিয়্যাক্টার নিয়ে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতা চলছে। হেভি ওয়াটার রিয়াক্টর ব্যবহৃত হচ্ছে বৃটেন ও কানাডায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেনারাল ইলেকট্রিক কোম্পানী চালু করেছে লাইট ওয়াটার—প্রেসারাইজড ওয়াটার রিয়াক্টর আর ওয়েস্টিং হাউস কোম্পানী চালু করেছে বয়লিং ওয়াটার রিয়াক্টর। এদের দেখাদেখি ফ্রান্সের সাঁ লর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার করা হচ্ছে বি ডবলু আর।

ভারতের প্রতিটি রাজ্যে এখন চলছে বিদ্যুৎ সংকট। তার মধ্যে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। ইতিমধ্যে তারাপুরে রাণাপ্রতাপ সাগর ও কল্পাকমে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। উত্তর প্রদেশের নারোরায় আরও একটি নির্মাণের পথে। পশ্চিমবঙ্গের দাঁতান পরমাণু নির্মাণের কথা বহুবার আলোচিত হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা কার্যকরী রূপে নিতে পারল না। কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন পূর্ব ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যখন কয়লা রয়েছে তখন পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজন নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক আবেদন নিবেদন জানিয়েছেন কিন্তু কোনো সঠিক জবাব দিল্লী থেকে এখনও এসে পৌছয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হওয়া উচিত কিনা সে সম্পর্কে কলকাতার বিজ্ঞানিক মহল এক কথায় বলেছেন পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়া গতি নেই। কারণ সামনে কয়লার দাম বাড়ছে তেলের দাম ঊর্ধমুখী দাম আরও বাড়বে। তাই পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গঠন সুবিবেচনার কাজ হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতন দেশে যেখানে কয়লা ও তেল রয়েছে প্রচুর সেখানে এখন গোটা ত্রিশেক পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আমাদের দেশে যে হারে লোক সংখ্যা বাড়ছে তার সংগে তাল রেখে চলতে গেলে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়া গতি নেই। প্রথম ধাপে হয়ত খরচ বেশী হবে তবে কয়লা বা তেলের পরিবহণ খরচের মতন খরচের ভাবনা নেই পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। শহরের উপকণ্ঠে নির্মিত হলে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ট্রান্সমিশন কেন্দ্র বা তারের প্রয়োজন কম হবে। তবে এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরীর মত কেন্দ্র হলে খরচ কম হবে লাভ হবে বেশী। তাছাড়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানীর ভাবনা কম। ইউরেনিয়াম জ্বালানী এখন দেশেই পাওয়া যাচ্ছে। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো খুবই ছিমছাম ও পরিষ্কার।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি বৃটেনের যে সব অঞ্চলে কয়লাখনি রয়েছে তারই আশেপাশে নির্মিত হয়েছে কয়েকটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র। বৃটেনে এখন তেরটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়েছে। ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীতে কয়লার অভাব নেই। কয়লাখনির কাছেই পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। তার কয়েকটি আমি নিজেও দেখেছি। ওই দুটি দেশে এখন মোটাটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রয়েছে। মেশিনের শব্দ বা ধোঁয়া নেই। কারখানাগুলো ঝকঝকে তকতকে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাধা কোথায়।

বিশ্বের সর্বত্র এখন পরমাণু শক্তির সন্ধানে ছোট-বড় বহু রাষ্ট্র উঠে পড়ে লেগেছে। এদের মধ্যে সবার আগে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যত বিদ্যুৎ শক্তি লাগছে তার দ্বিগুণ লাগবে পঁচিশ বছর পর অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। তার অর্ধেক বিদ্যুৎ শক্তি আসবে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একুশটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু আছে আরও ৫৩টি কেন্দ্র নির্মাণের পথে। বৃটেনে ২৩টি জার্মানীতে ৮টি করে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রয়েছে এবং আরও আটটি কেন্দ্র নির্মাণের পথে। ইতালিতে তিনটি কেন্দ্র চালু হয়েছে। জাপানে ১১টি। কানাডা হল্যান্ড স্পেন সুইডেন সুইজারল্যান্ডে এ একটি করে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়েছে। এই কটি দেশে দু-চার বছরের মধ্যে তিন থেকে চারটি কেন্দ্র নির্মাণের পথে। আর্জেন্টিনা বেলজিয়াম চিলি ফরমোসা ফিনল্যান্ড কোরিয়া পাকিস্তানে একটি থেকে তিনটি করে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ৯টি পূর্ব জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় একটি করে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু আছে। আরও নির্মিত হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নে আটটি চেকোশ্লোভাকিয়া পূর্ব জার্মানী ও বুলগেরিয়ায় একটি করে।

—দিলীপ মালাকার

পুনশ্চ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। রাস্তাঘাট ।।

কলিকাতার আশেপাশে, ৫০ ক্রোশের মধ্যে পাথর পাওয়া যায় না তথাপ নগরের অধিকাংশ রাস্তাই পাথরের খোয়া ও রাবিস দিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। কোন কোন রাস্তায় ইটের খোয়া দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক রাস্তার মধ্যস্থল দিয়া গাড়ি-ঘোড়া চলে দুই পাশ দিয়া মানুষ গমনাগমন করে।

।। বাহন ও যান ।।

কলিকাতা শহরের কোন কোন বড় রাস্তায় ট্রাম গাড়ি চলে। তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ি বিস্তর কিন্তু বড় নড়েচড়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীর দুই ঘোড়ার গাড়িও বিস্তর আছে। এক্ষণে কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর ভাড়াটে গাড় হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় গড়ের মাঠে খুব ভাল ভাল গাড়ি-ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

।। বাণিজ্য ।।

ভারতবর্ষে যত বাণিজ্য বিনিময় হইয়া থাকে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ কলিকাতায় হয়। আমদানি জিনিসের মধ্যে বিলাতী সূতা ও কাপড় লোহা ইত্যাদি ধাতু কলকব্জা লবণ ও বিলাতী সুরা। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে অহিফেন পাট চাউল, তৈল নানা প্রকার শস্য নীল চামড়া চা রেশম সোরা। বিদেশের সঙ্গে বৎসরে ৯১২৪২৮২০২৮ টাকার বাণিজ্য বিনিময় হয়।

।। শিক্ষা ।।

ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা বঙ্গদেশে এবং কলিকাতা শহরে প্রথমে আরম্ভ হয়। অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কালেজে বহুসংখ্যক যুবক শিক্ষালাভ করে। স্বর্গীয় ডাক্তার ডফ ইংরাজী শিক্ষাবিষয়ে অনেক যত্ন করেন। গবর্ণমেণ্ট ও মিশনারী কলেজ ব্যতীত দেশীয় লোকদিগের স্থাপিত অনেক উৎকৃষ্ট কলেজ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার ফল আশানুরূপ হয় নাই। কলিকাতার সুযোগ্য নিবাসী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একবার কলিকাতার এক সভায় বলিয়াছিলেন—

'একশত বৎসর হইল এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে তথাপি প্রকৃত শিক্ষার প্রথম ফল অর্থাৎ বিদ্যালোচনা হয় নাই। আমার বলিতে ইচ্ছা করে যে সামাজিক শাসন-প্রণালী হিন্দু-চরিত্রের অতি কমনীয় লক্ষণ ছিল ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। আপনারা দেখিয়া থাকিবেন আমাদের সমাজে এক-প্রকার পশ্চাৎগতি চলিতেছে তাহাতে হিন্দু জাতির উন্নতির বিলক্ষণ বাধা জন্মাইতেছে যে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা পৃথিবীর এই অংশের কলঙ্কস্বরূপ লোকে পুনরায় সেই দিকে ধাইতেছে—ঋষিদিগের অমাজ্জিত উক্তি এবং অসত্য ধারণা নিতান্ত সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। তোমাদের পরস্পর মতের অনৈক্য হইতে পারে. আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত তোমার মতের মিলন না হইতে পারে কিন্তু ঋষিদের মত বেদবাক্য ইহার প্রতিবাদ করিতে নাই। বাস্তবিক এই পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের কথা বিশ্বাস করিলে ঋষিদিগের বাতুলতার অনুমোদন না করা আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষে অতি লাঞ্ছনার বিষয়।'

পরে বুঝাইয়া দিব যে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেও লোকের মনোভাব ন্যূনাধিক পরিমাণে বঙ্গদেশের ন্যায়।

কলিকাতার একটি কুরীতি দেখিয়া দুঃখ হয়. এখানে বাঙ্গালী নাট্যশালায় বেশ্যারা অভিনয় করিয়া থাকে, নাট্যশালায় অনেক যুবক তাহাদের হাবভাব দেখিয়া অবশেষে কুপথগামী হয়। এক্ষণে কলিকাতা কলেজ ও স্কুলের আশপাশ হইতে বেশ্যাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভরসা করি বাঙ্গালী যুবকেরা ক্রমে জ্ঞান শিক্ষা করিবেন আর দেখিবেন যে কেবল দেশীয় বলিয়া মিথ্যা ধর্ম্ম ও অনিষ্টকর দেশাচারের পক্ষপাতী হওয়া মিথ্যা দেশ-হিতৈষিতা মাত্র। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে যখন সহমরণ প্রথা তুলিয়া দেওয়া হয় তখন কলিকাতার গোঁড়া হিন্দুরা সেই নৃশংস প্রথা রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখনও যে সকল কু-প্রথা আছে তাহা উঠিয়া গেলে দেশের অনেক উপকার হইবে।

বঙ্গদেশের যুবকদিগের যে সকল গুণ আছে তাহার পোষণ ও যে সকল ত্রুটি আছে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যুবকদিগকে যত্নসহকারে গৃহে শিক্ষা দেওয়া বড় আবশ্যক। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও ধর্ম্মশিক্ষার সংযোগ অতি বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গালীর সংবাদ-পত্রের খেউড় গাওয়া রহিত হইলে অনেক উপকার হয়।

।। বাঙ্গালী ধর্ম্মসংস্কারক ।।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে কয়েকটি অতি বিখ্যাত ধর্ম্মসংস্কারক জন্মিয়াছেন। রাম-মোহন রায় স্বদেশীয় লোকদিগকে প্রতিমা পূজায় বিরত করণার্থ যথাসাধ্য যত্ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তিনি যে কার্য্যের আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা অবাধে চলিতেছে। বাবু কেশবচন্দ্র সেন বহু বৎসরকাল সরল অদ্বৈতবাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শেষকালে চক্ষের আঘাত ও মানসিক শক্তির ব্যতিক্রম হওয়াতে 'প্রভু' ও 'ভারতমাতার' নামে কথা কহিয়া 'নববিধান' নামে এক অভিনব ও মিশ্র ধর্ম্মমত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ১৮৮৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তদবধি তাঁহার স্থাপিত ধর্ম্মসমাজের আভ্যন্তরীণ বিচ্ছেদবশতঃ অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

১৮৭৯ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় ইহা কেশব সেনের সমাজ হইতে বহির্গত। ইহা অদ্বৈতবাদী, ইহার মুখপত্র ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার উদ্দেশ্য ভাল।

সমাজভুক্ত লোকদিগের মতের অসামঞ্জস্য ও দলভেদনিবন্ধন অনেকে দুঃখ করে। সামান্য অদ্বৈতবাদ কোন জাতির বা কোন দেশের ধর্ম্ম হয় নাই। অতএব ব্রাহ্মসমাজের স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ আছে।...

*

ভারতবর্ষের প্রতি ছয়জন লোকের মধ্যে একজন বাঙ্গালী। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করে ও এদের প্রধান খাদ্য ভাত। এই জন্য বাঙ্গালীরা ভারতবর্ষের মধ্যে অতি দুর্ব্বল জাতি, কিন্তু ইহারা পরিশ্রমী এবং বিদ্যা-বুদ্ধি বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান। ভারতের সভ্য ও অসভ্য সকল জাতীয় লোকের মাথায় পাগড়ী বা টুপি আছে. কেবল বাঙ্গালীর মাথা খালি।

বাঙ্গালা ভাষা আর্য্যভাষা পরিবারভুক্ত। ইহাতে অনেক সংস্কৃত কথা আছে। বাঙ্গালা অক্ষর দেবনাগরী অক্ষরের রূপান্তর কিন্তু সহজে ও শীঘ্র লিখিতে পারা যায়। বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাঙ্গালার সহিত অনেক আরবি কথার ব্যবহার করে এই জন্য তাহাদের ভাষাকে মুসলমানী বাঙ্গালা বলে এই ভাষায় অনেক গদ্য-পদ্য পুস্তক আছে। বঙ্গদেশের প্রধান আরাধ্য দেবতা কালী বা দুর্গা. নদীগণের মধ্যে গঙ্গার মান্য অধিক।

কৃষ্ণের অবতার বলিয়া অনেকে চৈতন্যে উপাসনা করিয়া থাকে।

—ক্ষপণক

অঙ্গনা

হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ ভিয়েতনামী মহিলা সম্মেলন

ভিয়েতনামের সুদীর্ঘকাল যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ আমাদের কাম্য নয়—সকলেই শান্তির জন্য আগ্রহী। যুদ্ধোত্তর শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর 'অহিংসা পরম ধর্ম' এই চিরন্তন বাক্যটি প্রচারে কোন বাধা আর থাকে না। বিশ শতকেও শক্তিশালী দেশগুলির নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পৃথিবীর বহু দেশ তীব্র লড়াই চালিয়ে যায়। এই লড়াই-এর ফলাফলের ওপর নির্ভর করে সেই দেশগুলির স্বাধীনতা শান্তি ও অগ্রগতি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি হিসেবে আমরা দেখতে পাই পূর্ব এশীয় দেশগুলি লড়াই-এর মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা অর্জন করে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম ভিয়েতনামের জনগণের মুক্তির সংগ্রাম বহুদিন থেকেই এ সংগ্রাম শুরু হয়েছে। প্রথমে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলেছে। তারপর স্বল্পকাল জাপানের আধিপত্যের বিরুদ্ধে এবং আজও সেই সংগ্রাম চলেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন শক্তি উপলব্ধি করেছে যে ভিয়েতনামের সম্মিলিত শক্তিকে তারা কিছুতেই পরাস্ত করতে পারবে না।

ভিয়েতনামের এই সংহতির মূলে রয়েছে ঐ দেশের নারী-পুরুষের স্বাধীনতার কামনা ও কর্তব্যনিষ্ঠার দৃঢ় সঙ্কল্প। পৃথিবীর কোন দেশের শক্তি সে দেশের নারী শক্তিকে অবহেলা করে বড় হতে পারে না। ভিয়েতনাম তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে থেকেও বীরাঙ্গনা ভিয়েতনামী মহিলারা কতখানি নির্ভীক ছিলেন এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ভিয়েতনামী মহিলাদের এই সাহসিকতার সঙ্গে আমাদের দেশের মধ্যযুগের রাজপুত মহিলাদের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে যদিও রাজপুত মহিলারা সাহসিকতার চরম নিদর্শনস্বরূপ আত্মোৎসর্গ করেছিলেন— ভিয়েতনামী মহিলারা কিন্তু সেভাবে আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথ বেছে নেন নি। তাঁরা দেশের স্বাধীনতা ও গঠনে দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিজেদের দেশকে মুক্ত করার জন্য মুক্তি ফৌজের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছেন। কোথাও তাঁরা একটুও পিছিয়ে পড়েন নি।

আধুনিক যুদ্ধে শুধুমাত্র যারা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক হিসেবে গোলাবারুদ কিম্বা ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার দ্বারা যুদ্ধ করে থাকেন শুধু তারাই যোদ্ধা নন। তাদের যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য করে থাকেন তাদেরও যোদ্ধা হিসেবে পরিগণিত করা হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় ভিয়েতনামের মহিলারা বিভিন্নভাবে মুক্তিফৌজকে সাহায্য করেছে। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ প্রধানতঃ ছিল গেরিলা যুদ্ধ। এই গেরিলা যুদ্ধে ভিয়েতকং মুক্তিবাহিনীকে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সমানভাবে মদত জুগিয়ে এসেছে মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভিয়েতনামী রমণীরা তিনটি মহৎ কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। আক্রমণকারীকে দেশ থেকে হটিয়ে দেওয়া দেশের উৎপাদন অব্যাহত রাখা এবং দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক শিশুদের বাঁচিয়ে রাখা ও তাদের এমনভাবে গড়ে তোলা বড় করা যাতে তারাও ভবিষ্যৎ সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদীদের পর্যুদস্ত করতে পারে। ভিয়েতনামী মহিলাদের বীরত্বের নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। ফরাসী জেনারেল বয়'র-দ্য'-লতুর বলেছেন 'মেয়েদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার' কারণ মেয়েরা শুধু লড়াই-ই জানে না তারা সংবাদ ও যোগাযোগ রক্ষা করে। তারা শত্রু সৈন্যদের ভুলিয়ে নিয়ে ফাঁদে ফেলে দেয়। তারা সেখানে স্কাউটের কাজ করে বহু নারী আহত সৈন্যদের সেবাকার্যে লিপ্ত। ভিয়েতনামী মহিলারা দৌত্য কার্যেও পারদর্শিনী তাই শত্রুর খবর এবং অবস্থান দেশের মুক্তিফৌজ তথা গেরিলা সৈনিকদের কাছে পৌঁছে দিতে তাদের বিলম্ব হয় না। মেয়েদের এই তীব্র সাহসিকতার পরিচয় পেয়ে কেনেডিকেও স্বীকার করতে হয়েছিল যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মত অসুবিধাজনক জায়গায় যুদ্ধ চালাতে আমাদের প্রতিটি গেরিলা সৈন্যের বিরুদ্ধে দশ জন এগারোজন মার্কিন সৈন্যকে নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু সে নিয়োগেও কোন লাভ হয় নি।

পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলারা চাষ এবং উৎপাদনের স্থানগুলিকে আগলে রেখেছে এবং খাদ্যাভাব না ঘটে সে জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে যুদ্ধের মধ্যেও বিশেষভাবে আয়ত্ত এবং অনুশীলন করেছে। একইভাবে তারা শিক্ষাব্যবস্থাকে নষ্ট হতে দেয় নি। দেশে দীর্ঘদিন যুদ্ধচলাকালে শিক্ষাব্যবস্থায় স্ত্রী-শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটানো হয় যার ফলে কোন নারীকে অশিক্ষিতা বলে ঠিক উপেক্ষা করা চলে না। অধিকারের ভিত্তিতে সমাজে নারী ও পুরুষ এবং স্ত্রী ও স্বামীর মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। দেশের কৃষ্টি সাহিত্য শিল্পকলাও অবহেলিত নয়। আগে যেখানে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে কোন মহিলাকে দেখা যেত না বর্তমানে তারা এক বিরাট অংশ অধিকার করে আছে। বহু মহিলা বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন এমন কি অনেকে পার্টির সদস্য পদ লাভ করেছেন। কিছুদিন আগে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের প্রেসিডিয়ামের সদস্যা মাদাম নোগুয়েন-বিন ভারত সফরে এসেছিলেন। তিনি এখনও সদস্য পদে অধিষ্ঠিতা। এছাড়া দেশের শাসনকার্য এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিষয়ক সংস্থার মধ্যেও অনেক মহিলা রয়েছেন।

(সম্প্রতি হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ ভিয়েতনামী মহিলা মহাসম্মেলন থেকে বিগত বারো বৎসরের ঐ দেশের মহিলাদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়। বিগত বছরগুলিতে কিভাবে ভিয়েতনামের নারী শক্তি যুদ্ধ-কালীন অবস্থার মধ্য দিয়ে দেশের সংগঠনে প্রয়াস চালিয়ে যান তার বর্ণনা 'দি প্রোগ্রেস অফ দি উইমেন অফ ভিয়েতনাম ইন ফিগারস' বইটির মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে)।

—অঞ্জলি চৌধুরী

আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষের প্রতীক এঁকেছেন ভ্যালেরি পেটিস
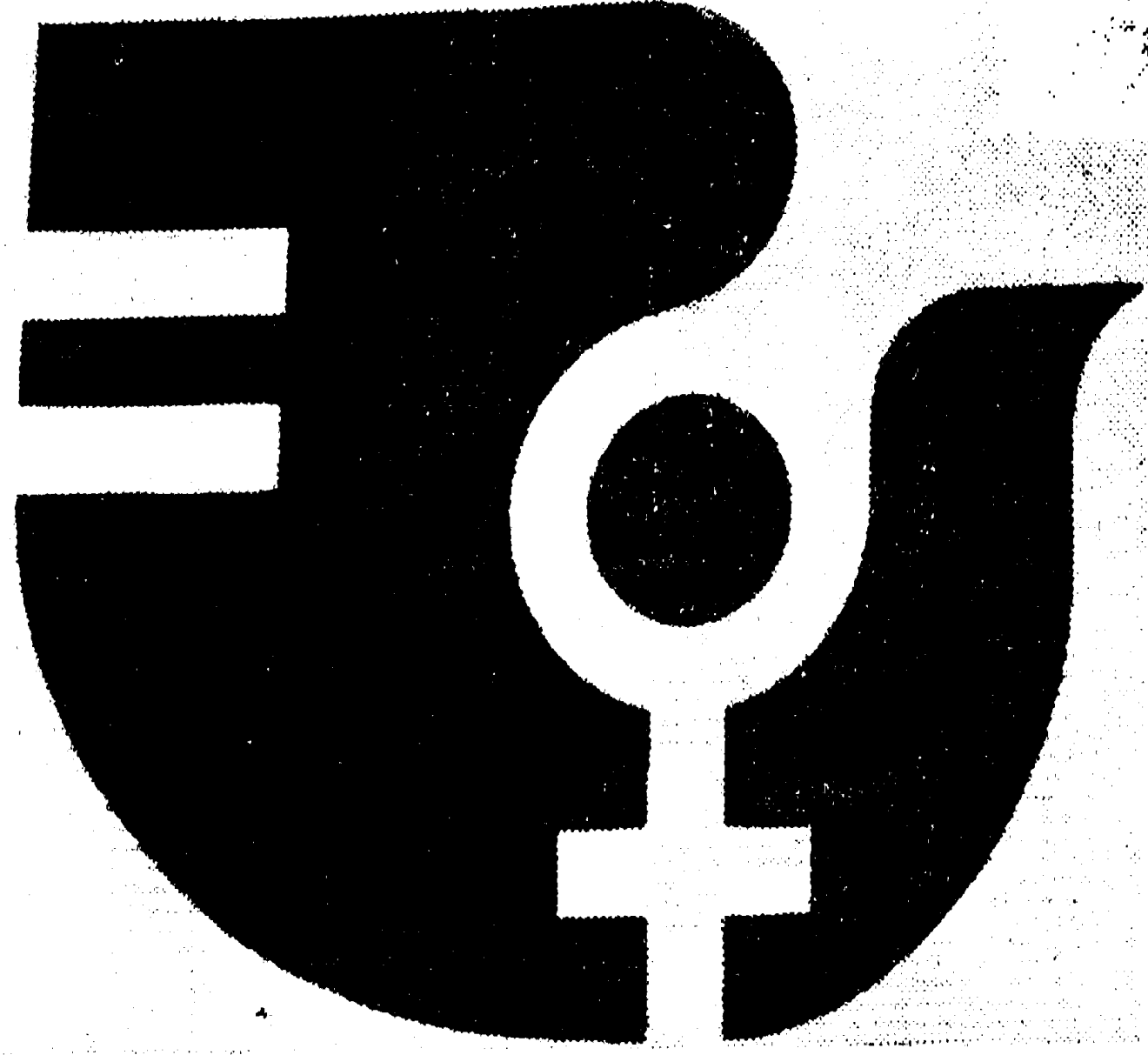
আন্তর্জাতিক মহিলা বছর

নারীদের কাছে ১৯৭৫ সাল নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক বছর। কারণ এই সালটি ঘোষিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মহিলা বছর হিসাবে। নারীমাত্রই এজন্য যথেষ্ট গৌরব বোধ করবেন নিশ্চয়ই। ১৯৪৭ সালের আগে নারীদের কথা কোনদিন কেউ এমন করে ভেবেছে কি কয়েকজন মণীষী আর চিন্তাবিদ ছাড়া? নারী অবলা পুরুষের পরিচয়েই তার পরিচয়। সমাজে অবহেলিত। অত্যাচারিত। জর্জরিত মানুষ তারা। মুখ ফুটে কিছু বলার অধিকার তাদের নেই। তাদের শিক্ষা ছিল না ছিল না স্বাধীনতা। কেমন করে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে কোন কিছু অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে? নারী জাগরণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দই অগ্রসর হলেন শিক্ষা প্রসারে নিয়োজিত করলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। সার্থক তার প্রয়াস সফল তার প্রচেষ্টা। তিনি বলেছিলেন—উড্ডীয়মান পক্ষীর দুটি ডানাই প্রয়োজন। নারীকে আঁধারে ফেলে রাখলে সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। দুটি ডানা বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন সমাজের নারী ও পুরুষকে।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা নারীকে দিলো সমঅধিকার। নারী প্রগতি দুর্বার বেগে এগিয়ে চললো। নারীরা ঘরে আর বাহিরে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়ালো। কখনো কখনো পুরোভাগে দেখা গেল নারীদের নাম। নারীরা যে প্রবল অনুশাসনের শৃঙ্খলে বাঁধা ছিলেন দেখা দিল জনমনে শিথিলতা। সাবলীল ভঙ্গিতে দৃপ্ত পদক্ষেপে চলাফেরা করতে দেখা গেল নারীদের পথে-প্রান্তরে রাস্তায় রেস্তোরাঁয় অফিসে-আদালতে। সে ভঙ্গিমা দেখে কি মনে হয় একবারও যে নারী অবলা? সত্যি কথা বলতে গেলে নারীরা বোধহয় কোনদিনও অবলা ছিলো না শুধুমাত্র শিক্ষা আর স্বাধীনতার অভাবই তাদের পঙ্গু করে রেখেছিলো। যাদের জীবনে শিক্ষা আর স্বাধীনতা ছিলো তারা অনেক নির্ভীক কাজই সাহসের সঙ্গে করে গেছেন—কি পুরাকালে কি স্বাধীনতা আন্দোলনে। রানী ভবানী রানী দুর্গাবাঈ ঝাঁসী রানী এরা ইতিহাস প্রখ্যাত নারী। আবার মাতঙ্গিনী হাজরা প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার এদের কথাও কি আমরা ভুলতে পারি? এঁরা চির উজ্জ্বল চির-ভাস্বর।

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
হে বিধাতা কেন নাহি দিবে অধিকার।

এ অভিযোগ করার দিন ফুরিয়েছে। সুদীর্ঘ আঠাশ বছর কেটে গেছে স্বাধীনতার পর। জীবনে তাদের এসেছে অনেক সুযোগ অনেক সাফল্য। প্রবীণারা খানিকটা হতচকিত আবার খানিকটা বা খুশী। তাদের যে সব আশা আকাঙ্ক্ষা দুস্তর বাধার প্রাচীরে মাথা কুটে নিষ্ফল হয়েছে তা সার্থকতা লাভ করেছে পরবর্তী যুগে। তারা খুশী কারণ তাদের নীরব আন্দোলন আজ সফলতার মুকুট পরে বিজয়ীর আসন দখল করেছে।

বেশ কয়েক বছর আগেও যে নারীদের কোন বিশেষ স্থান বা মান ছিলো না সমাজে বা সংসারে সেই নারীদের নিয়ে এত মাতামাতি যেন বিশ্বাসই করা যায় না। তাই আন্তর্জাতিক মহিলা বছর কথাটা কেমন যেন বিস্ময় জাগায় মনে তার সঙ্গে পুলকও জাগায় ঠিক নয় কি? এই বছরটা নাকি হবে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ আর অনেক ঘটনায় ভরানো। বছরটাকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রকাশিত হবে 'স্ট্যাম্প'। আন্তর্জাতিক মহিলা বছরের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো গঠনমূলক কাজে নারীদের ভূমিকা। এ বছরটা নতুন সুযোগ এনে দেবে নারীদের হাতে পলিসি মেকিং ও ডিসিশন মেকিং-এর ক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক মহিলা বছরের সঙ্গে শ্রীমতী হেলভি শিপিলার নাম বিশেষভাবে জড়িত। কারণ রাষ্ট্রসংঘ তাঁকেই আন্তর্জাতিক মহিলা বছরের 'সেক্রেটারি জেনারেল' পদে বসিয়েছে। শ্রীমতী শিপিলা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা গ্রহণে বিশেষ উৎসাহী ও আগ্রহী।

নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে অনেক আলোচনাই হয়েছে। নারীকে সংবিধান পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারই দিয়েছে। তবু আন্তর্জাতিক মহিলা বছরে দাবী আছে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের যে যে ক্ষেত্রে বৈষম্য আছে। নারী এখন যথেষ্ট পরিমাণে সুশিক্ষিতা। চাকরীও তারা পেয়েছে বহু ক্ষেত্রে কিন্তু পলিসি মেকিং-এর ক্ষেত্রে তাদের তেমন সুযোগই দেওয়া হয় নি। এ বছরটি সে সুযোগ দেওয়ার কথা ভেবেছে। আন্তর্জাতিক মহিলা বছর অনেক অনেক আশার আলো নিয়েই এসেছে। জানি না ১৯৭৫ সাল কি অবদান রেখে যাবে নারী প্রগতির ক্ষেত্রে। নারীদের লাভের ফর্দিতে নতুন কি লাভ হবে তারই দিকে তাকিয়ে থাকবে নারীমাত্রই আর কামনা করবে—আন্তর্জাতিক মহিলা বছর জয়যুক্ত হোক।

—[illegible] ধর

এ

রান্না করে দেখুন

কয়েকটি বিখ্যাত আমিষ পদ

নিরামিষ রান্নার মতো আমিষ রান্নারও নানারকম বৈচিত্র্য আছে। বিবিধ উপাদান দিয়ে মাছ মাংস ডিম রান্না করা হয়—এক একরকম রান্নার এক এক রকম স্বাদ। পার্শীদের ধনে সাগ মাংস বিখ্যাত। নানা-রকম ডাল তরকারি দিয়ে এই মাংস রান্না করা হয়। কিমার ভেতর ডিমের পুর দিয়ে তৈরী করা হয় নার্গিশ কোপ্তা। ম্যাকারনি ইটালিয়ানদের প্রিয় খাবার। ম্যাকারনি ময়দা দিয়ে নানা আকারের তৈরী করা হয়। ম্যাকারনির ভাত, ম্যাকারনির পায়েস, ম্যাকারনি দিয়ে মাংস এবং বিভিন্ন তরকারীও রান্না করা হয়। ওটস্ দিয়ে যে মাংস রান্না করা হয় তার নাম মটন হালীম। ছোলার ডাল ও মুসুরীর ডাল দিয়েও মাংস এবং ডিম রান্না করা হয়। মাংসের মতো মাছেরও চপ কাটলেট কাবাব ও কোপ্তা হয়। মাছের ফ্রাই তো বিখ্যাত এবং সব বাঙালী গৃহিণীরই জানা আছে। আজ সেই জন্যে এমন কয়েকটি আমিষ রান্নার কথা বলব যেগুলি বিখ্যাত হলেও বাঙালী বাড়ীতে সচরাচর রান্না করা হয় না।

মটন্ হালীম :

উপকরণ : ২৫০ গ্রাম হাড়বিহীন নরম মাংস, ½ কাপ সরু করে কুচোনো পেঁয়াজ, ½ কাপ সেদ্ধ করে পেষা ছোলার ডাল, ১ কাপ টক দই, ½ চা চামচ পেষা রসুন, ১ চা চামচ পেষা আদা, ১ আঁটি কুচোনো ধনে পাতা, ২ চা চামচ লংকার গুঁড়ো, ২ কাপ কুইক কুকিং ওটস্, ১ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো, আন্দাজ মতো নুন ও হলুদ।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। ওটস্ জল দিয়ে ঘন হওয়া পর্যন্ত সেদ্ধ করুন। ২। ½ ইঞ্চি লম্বা টুকরো করে করে মাংস কেটে নিন। মাংস মধ্যে লংকার গুঁড়ো, রসুন, আদা, নুন ও হলুদ এবং ফেটানো দই দিন। ৩। পেঁয়াজ মুচ মুচে করে ভেজে অর্ধেকটা সরিয়ে রাখুন। বাকি অর্ধেকটা মশলা মাখানো মাংসে দিন এবং মাংস কষে নিন। ৪। মাংস জল শুকিয়ে গেলে ওতে ছোলার ডাল বাটা দিন। ৫। ওটস্ জলে সেদ্ধ করে নিয়ে মাংসের মধ্যে দিন এবং ১½ কাপ জল দিন। ৬। পেঁয়াজ ভাজা ধনে পাতা ও গরম মশলা মেশান।

বীটরুট সালাদ :

উপকরণ : ৩টি বীট, ½ কেজি মাংস, ½ কাপ দই, একটি পাতিলেবুর রস, ১ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো, ১ চা চামচ চিনি, আন্দাজ মতো নুন ও ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। বীটরুট গোল গোল চাকতি করে কেটে ঘিয়ে ভাজুন। ২। আরও ঘি দিয়ে চিনি ভাজুন তারপর মাংস ও নুন দিন। ৩। মাংসের জল শুকিয়ে গেলে দই দিয়ে আবার কষে নিন। ৪। আন্দাজ মতো জল দিন। ৫। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে বীটের ভাজা চাকতি ও লেবুর রস মেশান। গরম মশলা মিশিয়ে পরিবেশন করুন।

কিমা ম্যাকারনি :

উপকরণ : মাংস ও তরকারি : মাংস ½ কেজি, দুটি পেঁয়াজ, ১টি বেগুন, ২টি টোম্যাটো, ২টি আলু, এক টুকরো কুমড়ো, ৪ কোয়া রসুন, ১ টুকরো আদা, এক আঁটি মেথির শাক।

ডাল : ১ টেবিল চামচ মুগের ডাল, ১ টেবিল চামচ মুসুরির ডাল, ২৫০ গ্রাম অড়হর ডাল।

মশলা : ১ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো, ½ চা চামচ আস্ত মেথি, ½ চা চামচ সর্ষেদানা, ১ চা চামচ ধনে গুঁড়ো, ১ চা চামচ জিরে গুঁড়ো, ১ চা চামচ লংকার গুঁড়ো, ½ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, নুন ও হলুদ আন্দাজ মতো ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। একটি পেঁয়াজ রসুন ও আদা বেটে নিন। আলুর খোসা ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে নিন। ২। মাংস টোম্যাটো বাদে সমস্ত তরকারী, পেঁয়াজ, রসুন, আদা বাটা, ডাল, নুন হলুদ ও জল দিয়ে সেদ্ধ করুন। ৩। মাংস নরম হলে নামিয়ে নিন। মাংসের টুকরো-গুলো আলাদা করে নিন। ৪। সমস্ত মশলা শুকনো খোলায় ভেজে রাখুন। ৫। একটি পেঁয়াজ কুচিয়ে ঘিয়ে ভেজে নিন। ডাল ও তরকারী ভাল করে ঘেঁটে নিয়ে ঘি ও ভাজা পেঁয়াজের মধ্যে ঢেলে দিন। মাংস ও ভাজা মশলা দিন আস্ত মশলাগুলো গুঁড়িয়ে নেবেন। টোম্যাটো চার টুকরো করে দিন। ৬। টোম্যাটো নরম হয়ে গেলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

নার্গিশ কোপ্তা :

উপকরণ : ৫০০ গ্রাম কিমা, ১০টি ডিম, ২ টেবিল চামচ বেসন, ২ চা চামচ লংকার গুঁড়ো, এক টুকরো আদা, ৮ কোয়া রসুন, ২টি পেঁয়াজ, ১ আঁটি ধনে পাতা ও ১ আঁটি পুদিনা পাতা, বিস্কুটের গুঁড়ো, আন্দাজ মতো নুন, ঘি বা বাদাম তেল।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। ৮টি ডিম ভাল করে সেদ্ধ করে ছাড়িয়ে নিন। ২। পেঁয়াজ, আদাকুচি, রসুন ও নুন দিয়ে কিমা সেদ্ধ করে পিষে রাখুন। ৩। লংকার গুঁড়ো, গরম মশলার গুঁড়ো, ধনে পাতা ও পুদিনা পাতা কুচি এবং বেসম মেশান। ৪। আস্ত সেদ্ধ ডিমের চার পাশে কিমা বাটা লাগান—এমন-ভাবে লাগাবেন যাতে সমস্ত ডিমটা ভাল করে ঢেকে যায়। কোপ্তার আকার ডিমের আকারের মতোই হবে। ৫। দুটি ডিম ফেটিয়ে রাখুন। কোপ্তা ডিমের গোলায় ডুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে ভেজে নিন। মাছ দিয়েও এই কোপ্তা তৈরী করা যায়। ইচ্ছে করলে এই কোপ্তা পেঁয়াজ, রসুন, আদা টোম্যাটো ও গরম মশলা দিয়ে তৈরী গ্রেভির মধ্যে ডুবিয়েও পরিবেশন করা যায়।

মটন কাটলেট : রেস্তোরায় যে মটন কাটলেট পাওয়া যায় তার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক স্বাদের এই কাটলেট বাড়ীতে তৈরী করে খেয়ে দেখুন।

উপকরণ : ৫০০ গ্রাম হাড় দেওয়া কাটলেটের মাংস, ২টি পেঁয়াজ, ১ টুকরো আদা, ৪ কোয়া রসুন, ১ চা চামচ কাঁচা লংকার গুঁড়ো, ১ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো ১ চা চামচ ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ জিরে গুঁড়ো, ২টি টোম্যাটো বা ½ কাপ টক দই, ৩টি ডিম, নুন, হলুদ ও আন্দাজ মতো ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। পেঁয়াজ কুচি, রসুন ও আদা বাটা দিয়ে এবং সমস্ত মশলা দিয়ে মাংস কষে নিন। ২। অল্প জল দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে বাসনের ঢাকা খুলে সমস্ত জল শুকিয়ে ফেলুন। ৩। ডিম ফেটিয়ে রাখুন। মাংসের টুকরো ঠান্ডা হলে এক এক টুকরো নিয়ে হাড়ের দিকটা হাত দিয়ে ধরে ডিমের গোলায় ডুবিয়ে খুব গরম ধোঁওয়া-ওঠা ঘিয়ে বাদামী করে ভেজে নিন। ঘি গরম না থাকলে সমস্তটায় ফেনা হয়ে গিয়ে ভাজবার অসুবিধে হবে।

দই দিয়ে ডিমের কারী :

উপকরণ : ৮টি বড় হাঁসের ডিম, টক দই ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ ২টি, আদা ১ টুকরো, রসুন ৪ কোয়া, চিনি চার চা চামচ লঙ্কার গুঁড়ো ২ চা চামচ, গরম মশলার গুঁড়ো ২ চা চামচ, তেজপাতা ২টি, কিসমিস, ঘি, আন্দাজ মতো নুন।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। ডিম ভাল করে সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে লম্বালম্বিভাবে কেটে ঘিয়ে ভেজে রাখুন। কিসমিস ভাজুন। সমস্ত মশলা একত্রে বেটে রাখুন। ২। ঘি গরম করে তাতে তেজপাতা ও চিনি দিন। চিনি ভাজা হয়ে গেলে এবং তেজপাতার সুঘ্রাণ বেরোলে সমস্ত মশলা দই দিয়ে ফেটিয়ে ঘিয়ে দিয়ে দিন। কিসমিস দিন। ৩। কিছুক্ষণ ফোটবার পর ভাজা ডিমের টুকরো ও গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নিন। ওপর থেকে কাঁচা লঙ্কার কুচি ছড়িয়ে দিতে পারেন। হলুদ না দেওয়ায় এই কারীর রঙ সাদা সাদা হবে।

—সাধনা মুখোপাধ্যায়

রূপসীর খাতা *

রূপের বিকাশের জন্য চুলের সৌন্দর্য বিশেষ ভাবে দরকার। অনেক সুন্দরীর চেহারা ঠিক প্রকাশ হয় না চুলের স্বল্পতা কিম্বা মলিনতার জন্য। এই মলিনতার অনেক কারণ আছে। উপযুক্ত যত্নের অভাবে চুলে উজ্জ্বলতা ও নরম ভাব আসে না, ফলে আঠা আঠা ও চাপ চাপ দেখায়। দ্বিতীয়তঃ চুলে গন্ধ হয়। চুলে খারাপ গন্ধ হলে তা মোটেই ভাল লাগে না। তৃতীয়তঃ চুল বেশী এলোমেলো ও নোংরা দেখায়। এসব থেকে মুক্তি পেতে হলে কয়েকটি বিষয়ে সাবধান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(১) চুল নিয়মিত পরিষ্কার রাখা ও ভাল শ্যাম্পু ব্যবহার করা। খুস্কী হতে না দেওয়া। (২) চুলের গোড়ায় উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া—যার ফলে চুলের গোড়া সুস্থ থাকে ও চুল ভালভাবে বাড়তে পারে। (৩) চুলকে যত্ন নিয়ে আঁচড়ানো বা ব্রাস করা ও উপযুক্ত ছাঁদে বেঁধে সৌন্দর্য আনা।

চুল নিয়মিত পরিষ্কার কি ভাবে করা যায় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আগেই করেছি। তবুও আবার একটু জানাচ্ছি। সপ্তাহে অন্ততঃ এক বার শ্যাম্পু করা। তবে শ্যাম্পুর সঙ্গে যদি একটি ডিমের কুসুম বেশ করে ফেটিয়ে তা মাথায় দেন তাহলে ফল আরও ভাল হবে। এতে চুল খুব নরম ও সিল্কের মতন থাকে। চুল ধোয়ার পর ডিমের গন্ধ একটুও যাতে না থাকে তারজন্য চায়ের লিকার দিয়ে মাথা ধোয়ারও পর যখন শেষ মগজল ব্যবহার করবেন তাতে একটু গোলাপজল ও ২।৩ ফোঁটা কোন ভাল পারফিউম মিশিয়ে সেই জলটা মাথায় ঢেলে চুল মুছে ফেলবেন। তাতে মাথার চুলে একটা সুন্দর গন্ধ হয়।

মাঝে মাঝে অলিভ তেলে লেবুর রস দিয়ে সেটা গরম করে মাথার খুলির ওপরের চামড়ায়—অর্থাৎ চুলের গোড়ায় বেশ করে ম্যাসেজ করে রাত্রে শুতে হয়। সকালে শ্যাম্পু করে ফেললেই চুলের তেলতেলে ভাবটা চলে যায়। এতে খুস্কী হয়না আর চুলের গোড়া ভিটামিন 'সি' পেয়ে ভাল থাকে। তবে চুল সম্বন্ধে আগে এতো বিস্তারিত ও ভালভাবে আলোচনা করেছি যে আমার মনে হয় আবার তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই।

চুলের পরে দেহের যে অংশের কথা আমার মনে হচ্ছে তা হোল হাতের তেলো ও হাতের অন্য অংশ। হাতের রমণীয়তা ও কমনীয়তার ওপর সৌন্দর্য বহু পরিমাণে নির্ভরশীল। শ্রী যুক্ত হাত দেখতে এবং ছুঁতে সত্যই লোভনীয়। মেয়েদের বাড়ীতে সংসারের নানান কাজ করতে হয়, ধুলো ময়লা ঘাঁটতে হয় তারপর শুধুমাত্র সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট নয়। তাতে হাতের নরম স্থান ফেটে দাগ দাগ হয়ে যায় এবং ময়লা বসে খরখরে হয়ে যায়। এসব কারণে হাত ধুয়ে নরম ক্রীম জাতীয় কিছু মেখে নিলে হাতের নরম ভাব কমা দূরের কথা বরং বেড়ে যায়। এবং সৌন্দর্যও কিছুমাত্র কমে না। এই ক্রীমটাও বাড়ীতে তৈরী করা যায়।

আধ চামচ (বড়) জিংক অক্সাইড (Zinc Oxide) এবং বড় পাঁচ চামচ

ভেসলিন এই দুটো জিনিস গরম করতে হবে (ফোটাতে হবে না)। গরম করলেই এগুলি গলে মিশে একটা পেস্ট তৈরী হয়ে যাবে। সেই ক্রীমটা যে কোন নোংরা কাজ বা রান্নার আগে হাতে বেশ করে মেখে নিতে হবে। এতে একটা পর্দা পরে যায় হাতে ফলে ত্বকের কোন ক্ষতি হয় না। কাজ শেষ হলে জলে বেশ করে হাত ধুয়ে নিতে হবে। এবং হাত ধোয়ার পর যে কোন ভাল ক্রীম মেখে নিলেই হবে।

হাত সাদা ও সুন্দর রাখার জন্যও বাড়ীতে ভাল সামগ্রী তৈরী করা যায়। এটা তৈরী করে রেখেও দেওয়া যায়। সেটা রোজ স্নানের আগে মেখে নিয়ে মিনিট ১০।১২ পর ঠাণ্ডা জলে শুধু ধুয়ে নিতে পারা যায়। জিনিসটা এইভাবে তৈরী করা যায়ঃ—

½ ভাগ কাপে গোলাপ জল
½ ভাগ কাপে গ্লিসারীন
১ চায়ের চামচ সাদা ভিনিগার
১½ চায়ের চামচ খাঁটি মধু।

এগুলি বেশ করে মিশিয়ে নিয়ে তারপরে মাখতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় মুখের চেয়ে হাতের রং কালো, সেসব ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা খুবই উচিত। এতে ভাল ফলও পাওয়া যায়।

হাতে লোশান ব্যবহার করাটা বহুদিন ধরে ফ্যাশান। বিলীতি ও দেশী যে কোন লোশানের আজকাল প্রচুর দাম। বিদেশী লোশান তো চোখেও দেখা যায় না। তাই বাড়ীর তৈরী লোশান সবচেয়ে ভাল।

১ বড় চামচ গ্লিসারীন
½ বড় চামচ গোলাপ জল
½ বড় চামচ ইউডিকোলোন

সেই সঙ্গে একটা বড় পাতিলেবুর রস। এগুলি বেশ করে মিশিয়ে একটা সুন্দর বোতলে রেখে দিন। তারপর প্রয়োজনমত ব্যবহার করুন। তবে প্রতিবারই ব্যবহারের আগে বোতলটা বেশ করে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। অতএব বাজারে ভাল প্রসাধন সামগ্রী না থাকলেই বা কি—বাড়ীতে নিজেরা সবই তো বানাতে পারি এবং সেগুলি ব্যবহার করে খুশী এবং উপকৃত হতে পারি।

—বরবর্ণিনী

আশ্চর্য এখন ফুটপাথের এই বকুল গাছের নিচে দাঁড়ান মাত্র অমিয়বাবুর কিন্তু রসময়ের কথা মোটেই মনে পড়ল না বা কবি জীবনানন্দ দাসের ট্রামে কাটা পড়ার কথা। মনে পড়ল বঙ্কিমবাবুর ঐ একটা কথাই। 'রাস্তায় চলতে ওপরের দিকে চোখ রেখে আকাশের পাখিটাখি দেখে হাঁটি বুঝি।'

কথাটা মনে হতে অমিয় এখন মনে মনে হাসলেন। কলকাতার আকাশে পাখি কোথায়। ওপরের দিকে চোখ তুলতেই কটা বদখত চেহারার কাক আর কিছু বিজলী বাতি ও ট্রাম টেলিফোনের তার চোখে পড়ে। অর্থাৎ নিজের উত্তরটাও এই সঙ্গে অমিয়র মনে পড়ল। এখন আর একটা উত্তর মনে এসে গেছে তাঁর। কলকাতার মানুষকে পাখি দেখতে হলে বোটানিকস-এ ছুটতে হয়, নয়তো আলীপুর চিড়িয়াখানায়। অমিয় তাই করেন। আর এমনি পাখি দেখার সাধ মেটাবার জন্য তিনি নিজের মেয়ে টুটুলে ও টুটুলের বন্ধুদের পাখি সাজিয়েছেন। তাদের সান্নিধ্য তাঁর পাখি দেখার শখ মেটায়। বঙ্কিমবাবুকে অবশ্য সরাসরি কোনোদিন কথাটা বলেন নি তিনি বলার দরকার পড়ে না। জজিয়তি করছেন বঙ্কিমবাবু। বেজায় বুদ্ধিমান চালাক লোক। অমিয় যখন টুটুলকে টুনি ও টুটুলের বন্ধুদের এই পাখি সেই পাখির নাম ধরে ডাকেন বুড়ো তখন ছেলের পক্ষি-প্রীতি নিশ্চয় টের পান।

এসব কথা ভেবে ভিতরে ভিতরে হাসি পেলেও ওপরের চেহারাটা অমিয় এখন অতিরিক্ত গম্ভীর করে রাখলেন।

ট্রামের জন্য রুদ্রেন্দু আটকে গেছে। রাস্তাটা ক্রশ করতে পারছে না। ট্রামটা সরে গেলেই আবার রুদ্রেন্দুর মুখটা পরিষ্কার তিনি দেখতে পেলেন।

কলকাতা শহরের এই মস্ত অসুবিধে। সন্ধ্যাবাতি লাগল কি হাজার আলো চারিদিকে জ্বলে উঠল। মফঃস্বলের রাস্তায় হয়, যদি গোটা জেলা শহরও হয় সন্ধ্যার পর রাস্তার এপারের মানুষ রাস্তার ওপারের মানুষকে পরিষ্কার দেখতে পায় না। অথচ সেখানে যে আলো জ্বলে না এমন নয়। আজ সেই চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছর আগের একটা মফঃস্বল শহরের ছবি অমিয়র মনে পড়ল।

মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিনের বাতি জ্বলছিল শহরের রাস্তায়।

তা হলে হবে কি। রাস্তার দুধারে বড় বড় বটগাছ। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ঝিঁঝি ডাকত। জোনাকী উড়ত ঝাঁকের ঝাঁক।

উঁহু সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বেরোনো নিষেধ ছিল অমিয়র। কিন্তু সেদিন তাঁকে বেরোতে হল। বঙ্কিমবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বাড়িতে আর পুরুষ কে অমিয় ছাড়া। ছোটভাই সুপ্রিয় পূর্ণিমা থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা আরম্ভ। অবশ্য তাদের দু ভাইকেই বাবা সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বেরোতে দিতেন না। সুতরাং রাতে অমিয়র বা সুপ্রিয়র রাস্তায় বেরোনো একই দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। তাহলেও বাবার জন্য ডাক্তার ডাকতে হবে। সেই প্রায় দেড় মাইল পথ হেঁটেই রেল-লাইন পার হয়ে সিভিল সার্জনের বাংলো। মা অবশ্য অমিয়র সঙ্গে বাবার অর্দালী বলাইকেও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ডাক্তারবাবুর কাছে বাবার অসুখের খুঁটিনাটি বিষয় বলাই ঠিক বলতে পারবে কিনা সন্দেহ করেই মা অমিয়কে সঙ্গে পাঠান। ট্রাম-বাস আসবে কোথা থেকে—সেদিন তাদের ডিস্ট্রিক্ট টাউনে ট্যাকসি বা রিকসারও চল ছিল না। ছিল ঘোড়ার গাড়ি। তা-ও এক মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে গাড়ির আড্ডায় খবর দিলে তবে গাড়োয়ান গাড়ি নিয়ে আসত, এতটা সময় অপেক্ষা করতে মা সাহস পাচ্ছিলেন না। কলেরার মত হয়েছিল বঙ্কিমবাবুর।

অমিয়বাবুর মনে আছে বলাই ও তিনি যখন পোস্টাফিসের লাল বিল্ডিংটা পিছনে ফেলে প্রফেসারপাড়ার রাস্তাটা ধরে, রাস্তার উল্টোদিক থেকে একটি মানুষ আস্তে আস্তে হেঁটে আসছিল। রাস্তাটা বেশ চওড়া। লোকজন নেই বললেই চলে। মফঃস্বল শহরে সন্ধ্যার পর রাস্তায় খুব বেশি মানুষে চলাফেরা করে না। তাছাড়া তখন ঠান্ডার সময়। কার্তিকের শেষ। যেন হিম লাগার ভয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে যে-যার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। আবছা মূর্তির মতন সেই মানুষটা অমিয়র চারপাঁচ হাত দূরে দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। অমিয় চিনতে পারলেন না। এবং লোকটিও অমিয়কে নিশ্চয় চিনতে পারেনি। কিন্তু বলাই চিনতে পেরেছিল। তার কারণ রাস্তার ওপাশটায় ঝোপঝাড় ছিল বলে বলাই রাস্তাটা পার হয়ে ওদিকটায় বসে প্রস্রাব করছিল। অমিয়বাবু তখন বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে গেছেন। একটু পরেই বলাই পিছন থেকে ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলল। দ্রুত শ্বাস পড়ছিল বলাইয়ের, বলল, দাদাবাবু এই মাত্তর একটা লোক চলে গেল—তাকে চিনতে পারলেন? বলাইর কথা শুনে অমিয়বাবু একটু থমকে গেলেন, বললেন, না, মানুষটাকে দেখলাম বটে কিন্তু চিনতে পারলাম না তো—কে ওটা?

—রুদ্রেন্দুবাবু। কেবল যে তাড়াতাড়ি ছুটে আসার দরুন বলাই দ্রুত শ্বাস ফেলছিল তা নয় যেন হঠাৎ রুদ্রেন্দুকে দেখে উত্তেজিত হয়ে এভাবে সে ঘন ঘন শ্বাস ফেলছিল। বলল ঝোপের ধার থেকে উঠে এসে যেই না আমি রাস্তায় নেমেছি একেবারে আমার সামনে পড়ে গেলেন রুদ্রেন্দু।

—তারপর! রুদ্রেন্দু নামটা শুনে বুকের ভিতর ধড়াস করে উঠেছিল অমিয়বাবুর।

—কি হে বলাই কেমন আছ তোমরা, বললাম ভালই আছি।

—তারপর? তুই কিছু জিজ্ঞেস করেছিলি?

হুঁ, বলাই ঘাড় কাৎ করেছিল। বললাম কোথায় আছেন আপনি এখন? বললেন, এই তোদের আশেপাশেই আছি বলে সামান্য হেসে ফেলেছিলেন তারপর আমায় জিজ্ঞেস করলেন কোথায় যাচ্ছিস তুই রাত করে! বললাম, কর্তার অসুখ করেছে ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে চলেছি দাদাবাবুও সঙ্গে আছেন—বলতে বললেন তাই নাকি কোথায় অমিয়? আমি আপনাকে আঙুল দিয়ে দেখাতেই ঘাড় ঘুরিয়ে উনি আপনাকে দেখলেন আপনি তখন বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছেন বললেন, তাই তো—আমার পাশ দিয়েই তো হেঁটে গেল—চিনতে পারলাম না!

—তারপর? প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসার অবস্থা হয়েছিল অমিয়বাবুর সেদিন। আর কি জিজ্ঞেস করল ও তোকে?

—না আর কিছু জিজ্ঞাসাটিজ্ঞাসা করলেন না আচ্ছা চল, তোরা ডাক্তারবাবুর কাছে যা, বলে হেঁটে চলে গেলেন।

অত্ত অমিয়বাবুর মনে পড়ল কী ভীষণ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠেছিলেন তিনি বলাইকে আচ্ছা করে ধমক লাগিয়েছিলেন—আমার কথা বলতে গেলি কেন মুর্খ। আমায় চিনতে না-পারছিল না-পারছিল হুট করে আমার নাম ওর কাছে তোর বলতে যাওয়ার দরকার ছিল কি।

ধমক খেয়ে বলাই চুপ করে ঘাড় নিচু করে হাঁটছিল। ধমকের কারণটা সে বুঝতে পেরেছিল। মুন্সেফের আদর্দালী। রুদ্রেন্দু যে তখন একটা সাংঘাতিক অবাঞ্ছিত মানুষ বঙ্কিমবাবুর বাড়ির লোকদের কাছে এতবড় কথাটা বলাইয়ের না বুঝতে পারার কারণ ছিল না।

সারা রাস্তা অমিয়বাবু আর একটা কথাও বলেননি। খুব খারাপ লাগছিল তাঁর না, অস্বীকার করবেন কেমন করে, রুদ্রেন্দুর নামটা শুনে তাঁর বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডের কাছে একটা ভয়ের পুঁটুলির মতন কিছু যেন ঝুলছিল টের পাচ্ছিলেন। যদি এই মুহূর্তে রুদ্রেন্দু ছুটে আসে! অস্বাভাবিক কি। এসে তাঁর হাত ধরে জিজ্ঞেস করতে পারে কি হে অমিয় অনেক দিন পর তোমাকে দেখলাম ভাল আছ নিশ্চয়। খুব মন দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছ, তাই না? বেশ বেশ। পাশটাশ করে বেরিয়ে বড় চাকরি করবে বাপ-মা-কে সুখে রাখবে—আমাদের মতন লক্ষ্মীছাড়াদের দলে মিশতে চেয়ে একদিন সাংঘাতিক ভুল করেছিলে ভাই। নিজে যেমন সারাজীবন কষ্ট পেতে তেমনি বাপ-মা-র চোখের জল কোনদিন ঘোচাতে পারতে না। ভুলটা চট করে বুঝতে পেরে বুদ্ধিমানের কাজ করেছ।

এভাবে খোঁচা দিয়ে ঠাট্টার সুরে কথাটা বললেই কি রুদ্রেন্দু থেমে থাকত। অমিয়বাবুর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না।

তাঁর যেন মনে হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে রুদ্রেন্দুরা তাঁর ওপর একটা সাংঘাতিক আক্রোশ পোষণ করছে। তাই স্বাভাবিক। এসেই হয়তো কিছু বলার আগে অমিয়র নাকে একটা ঘুষি বসিয়ে দেবে। রুদ্রেন্দু তারপর বলবে কি হে, ভাল ছেলে খুব যে স্বদেশী করবে টেরর সৃষ্টি করে ইংরেজকে দেশছাড়া করবে বলে আমাদের সঙ্গে মিশে দিনকতক খুব লাফিয়েছিলে সব লম্ফঝম্ফ শেষ হলো গেল? শেষটায় নেংটি ইঁদুরের মতন গর্তে ঢুকে পড়লে। কারণ কি? বাপ-মা মনে আঘাত পাবে বলে? তোমার মুন্সেফবাবার চাকরি চলে যাবে ভয়ে? তাছাড়া লেখাপড়া করে একটা বেশ বড় চাকরি বাগিয়ে বিয়ে থা করে বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের আরামের জীবন কাটাবার স্বপ্ন চিরকালের মতন নষ্ট হয়ে যাবে বলে? ওফ—তোমরাই দেশের আসল শত্রু অমিয়। আমরাও বাবা-মায়ের ছেলে আমাদের দিয়েও তাঁরা অনেক কিছু আশা করেছিলেন। তাঁদের সুখে রেখে ভাল চাকরিটাকরি বাগিয়ে বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে আরামের আহ্লাদের জীবন কাটাবার সাধ আকাঙ্ক্ষা আমাদেরও ছিল। তবে কেন আমরা আজ রক্তবরান সর্বনাশের পথে ছুটে চলেছি! এই দেশটা কি শুধু আমার ও আমার মতন ছন্নছাড়া গুটিকয়েক ছেলের? তোমার দেশ না এটা! তোমার মুন্সেফ-বাবা বঙ্কিম দত্তর দেশ না এটা? আঃ কত বড় নির্লজ্জ স্বার্থপর তোমরা একবার ভেবে দেখেছ কি! তাই বলছিলাম তুমি ও তোমার মতন ভাল ছেলেরা আর তোমার বাবার মতন বাবা কাকা জেঠা দাদারা দেশের পয়লা নম্বরের শত্রু। কেবল ইংরেজকে মেরে তাড়ালেই স্বরাজ আসবে না তোমাদের মতন আগাছা কাঁটাঝোপ নির্মূল করাও দরকার—

চিন্তাটা এই পর্যন্ত এসে অমিয় যেন আর হাঁটতে পারছিলেন না। পা দুটো দুর্বল ঠেকছিল। ভাগ্যিস তখন সিভিল সার্জেনের বাংলোর কাছে পৌঁছে গেছেন তাঁরা। ডাক্তারবাবু ভিতরে যাচ্ছিলেন। বলাইকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর বৈঠকখানায় অমিয়কে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। একটা চেয়ারে বসতে পেয়ে কিছুটা স্বস্তিবোধ করছিলেন তিনি। কিন্তু রুদ্রেন্দুর চিন্তাটা তখনও মাথায় ঘুরছিল। তোমার মুন্সেফ-বাবা—রুদ্রেন্দুর এই কথাটার মধ্যে একটু বেশিরকম ঝাঁজ ছিল না কি! অমিয়বাবুর তাই মনে হয়েছিল সেদিন। হয়তো তার কারণও ছিল। রুদ্রেন্দু ও আর দলের ছেলেদের সঙ্গে অমিয়র মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েই যদি বঙ্কিম দত্ত ক্ষান্ত থাকতেন। না, শুধু এই করে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ছেলের ওপর পুলিশের কোনোরকম সন্দেহ না থাকে এই জন্য বঙ্কিমবাবু ম্যাজিস্ট্রেট-এস ডি ও থেকে আরম্ভ করে থানার অফিসারদের সঙ্গে এঁদের সকলের সঙ্গে মেলামেশা অবশ্য তাঁর বরাবরই ছিল কিন্তু মেশামেশির মাত্রাটা হঠাৎ যেন তিনি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। লোকের চোখে ঠেকত জিনিসটা। নিশ্চয় রুদ্রেন্দুদের চোখেও ঠেকেছিল। যেন এমন না করে উপায় ছিল না বঙ্কিমবাবুর। চারদিকে তখন ভীষণ ধরপাকড় হচ্ছে। মাত্র কটা দিনের মধ্যে চাটগাঁয়ে কী সব কাণ্ড ঘটে গেল তারপরই কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্ট সাহেবকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয় আর ঠিক তার চারদিন পরেই ঢাকায় পুলিশের আই জি লোম্যান খুন এবং তিন মাস পার না হতে কলকাতায় দিনদুপুরে রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢুকে বিনয়-বাদল-দীনেশের সেই সাংঘাতিক অ্যাকশন। ইংরেজ সরকার তখন আগুন হয়ে গেছে। ইয়ংম্যান দেখলেই ধরে ধরে জেলে পুরছে। একে একে রুদ্রেন্দুদের দলের সবাই ধরা পড়ল। কেবল রুদ্রেন্দু ও তার একটি সঙ্গী পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। শহরের মানুষ কানাঘুষা করত রুদ্রেন্দু নাকি কখনও চাষী সেজে, কখনও মাঝি সেজে কখনও পাগল কখনও সন্ন্যাসীর বেশ ধরে দূরদূরান্তের গ্রামে ধানক্ষেতে পাটক্ষেতে কখনও বা গভীর জঙ্গলে অথবা খালে-বিলে নৌকোর মধ্যে লুকিয়ে থেকে দিন কাটাচ্ছে। দিন কাটাচ্ছে মানে লোকে ধরে নিয়েছিল পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে ভয়ংকর কিছু একটা করবার জন্য সুযোগ খুঁজছে রুদ্রেন্দু। আর ঠিক এমন দিনেই কিনা হুঁ, তখন রাত দশটা বেজে গেছে বঙ্কিমবাবুর আর্দালী বলাই একেবারে শহরের ভিতর রেল-লাইনের ধারে সদর রাস্তার ওপর হঠাৎ রুদ্রেন্দুকে দেখতে পেল।

সিভিল সার্জেনের বৈঠকখানায় বেতের চেয়ারটায় বসে থেকে অমিয় জিনিসটা যা চিন্তা করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল বুকে

ভিতর ভয়ের সেই পুঁটলিটা ক্রমশ খুলে গিয়ে তাঁর সারা শরীরে ভয়টা ছড়িয়ে পড়ছে। হাত-পা ঝিমঝিম করছিল তাঁর। গলা শুকিয়ে আসছিল। নিশ্চয় এভাবে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে শহরে ঢোকার কোনো উদ্দেশ্য আছে রুদ্রেন্দুর। অমিয় ভাবলেন, হয়তো রুদ্রেন্দু বঙ্কিম দত্তর ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে সে। পুলিশের লোকের সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর মেলামেশা রুদ্রেন্দু সহ্য করতে পারছে না। কোনো বিপ্লবীই এ-জিনিস সহ্য করবে না। হয়তো সেই সঙ্গে অমিয়কেও খুঁজছে সে। বাপের অন্যায় ছেলেকেও সইতে হয়।

কেননা সময় অবশ্য ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে বসে অমিয় [illegible] পেয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছিলেন। সিভিল সার্জন বন্দ্যোপাধ্যায়বাবুর চিকিৎসার গুণে বঙ্কিমবাবু দিন দুয়েকের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠেন। এবং অমিয়বাবুর মনে আছে একটু সুস্থ হতে না হতে আরদালী বলাইয়ের মুখে রুদ্রেন্দুর খবরটা শুনে বঙ্কিমবাবুকে কেমন চিন্তাগ্রস্ত হতে দেখা গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অমিয়কে ডাকেন। অমিয়বাবু জিনিসটার ওপর তেমন একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না এমন একটা ভাব দেখান। বলাই ভুল দেখেছে। রুদ্রেন্দুকে সে হয়তো চিনতে পারেনি। বাবাকে অমিয়বাবু বুঝিয়েছিলেন। কৈ, তাঁরা রেল-লাইন পার হবার পর তাঁর পাশ দিয়েই লোকটা হেঁটে গেল—ওটা যদি রুদ্রেন্দু হত নিশ্চয় অমিয় ঠিক চিনতেন তাকে ইত্যাদি। অর্থাৎ অমিয়বাবু চাইছিলেন না দুর্বল শরীর নিয়ে বঙ্কিমবাবু রুদ্রেন্দুর ভাবনা ভাবুক। এবং আড়ালে ডেকে অমিয়বাবু বলাইকে আর একবার ধমক লাগিয়েছিলেন। তোর মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই। হুট করে কর্তাবাবুর কানে রুদ্রেন্দুর কথাটা তোর না তুললেই চলছিল না আহাম্মক। বলাই ঘাড় গুঁজে চুপ করে ছিল। অর্থাৎ এবারও যা বুঝবার সে বুঝতে পেরেছিল।

এই ঘটনার ঠিক তিন দিন পরে পাশের একটা গাঁয়ে একটা রিভলবারসহ রুদ্রেন্দু ধরা পড়ে। রাত্রে ধরা পড়ে। রুদ্রেন্দু নাকি কোন এক চাষীর গোয়ালের পিছনে খড়ের গাদার মধ্যে পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। তার গ্রেপ্তারের খবরটা শুনে শহরের লোকের মনের ভাব কি হয়েছিল অমিয়বাবু বলতে পারেন না। কেননা এর আগে যদিও বা একটু-আধটু তিনি বাড়ীর বাইরে গেছেন সেদিন রাত্রে সিভিল সার্জনকে ডাকতে যাবার সময় রাস্তায় যে ঘটনা ঘটে তার পর থেকে একদম তিনি বাড়ী থেকে বেরোচ্ছিলেন না। রুদ্রেন্দু ধরা পড়েছে শোনার পরেও অমিয় বেশ কিছু দিন বাড়ীর বাইরে এক পা বাড়ান নি। রুদ্রেন্দু ধরা পড়লেও রুদ্রেন্দুর সঙ্গী শিবেনকে পুলিশ ধরতে পারে নি। ধরা পড়ার আগে রুদ্রেন্দু যে শিবেনকে কোন রকম নির্দেশ দিয়ে যায় নি তাই বা কে জানত। সে জন্য অমিয়বাবুর দুশ্চিন্তাটা তখনও এক রকম ছিল। দিন সাতেক পরে শিবেন আর একটা গাঁয়ে একটা ক্যাটলকেজের মধ্যে ধরা পড়ে।

খবরটা শুনে বঙ্কিমবাবু সেদিন যে কী খুশী হন—তাঁর চেহারা দেখে অমিয় বুঝতে পেরেছিলেন। অমিয়বাবুও কি কম খুশী হয়েছিলেন। [illegible] এতদিন পর একটা [illegible] রকম দুশ্চিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেল। অমিয় মনে মনে [illegible]। রুদ্রেন্দুকে [illegible] না।

আজ এখন [illegible] ট্রাম ও টুটবেলের [illegible] মধ্যে দিয়ে [illegible] বকুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে সেদিনের কথাগুলি মনে পড়তে অমিয় নিজের মনে হাসছেন যদিও। ওঃ—কি সব দিন গেছে।

তবে এটাও সত্য সেদিন যেমন রুদ্রেন্দু একটা অবাঞ্ছিত মানুষ ছিল, সিভিল সার্জনের বাংলোয় যাবার পথে রেল লাইনের ধারে বলাই তাকে দেখে চিনতে পারলেও রাস্তার অস্পষ্ট আলোর জন্য অমিয় যেহেতু চট করে তাকে চিনতে পারেন নি এবং রুদ্রেন্দুও অমিয়কে চিনতে পারে নি—এই জন্য ডাক্তারবাবুর বৈঠকখানায় বসে অমিয় মনে মনে ঈশ্বরকে যে কত ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। বলা যেত কি, চিনতে পারলে রুদ্রেন্দু হয়তো আক্রোশের বশে তখনই অমিয়র নাকে ঘুঁষি বসিয়ে দিত—বা সঙ্গে রিভলবার কি বোমাটোমা থাকলে—কথাটা চিন্তা করে বার বার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল অমিয়র।

আজও রুদ্রেন্দু সেই অবাঞ্ছিত মানুষই থেকে গেছে। ট্রাম গাড়ীটার মত রুদ্রেন্দু ওপারে আটকে গেছে। গাড়ীটা সরে গেলেই এই ফুটপাথে উঠে আসবে।

অমিয় মনে মনে তা আদৌই চাইছিলেন না। যেন মফঃস্বল শহরের মতন কলকাতার এই রাস্তাটাও আবছা অন্ধকার থাকলে ভাল ছিল। রুদ্রেন্দু তাঁকে দেখতে পেত না। হাত তুলেও ডাকত না।

তবে সেদিন [illegible] ছেলে যে যে কারণে একটা [illegible] আতঙ্কজনক মানুষ ছিল, আজ [illegible]।

অমিয় [illegible] এক টুকরো কাঠকয়লা। না কি তার চেয়েও অধম!

রুদ্রেন্দু সকলের হয়েছে—[illegible] ভাবনা। তা নয়। অমিয় যেটা আশঙ্কা করছেন—রুদ্রেন্দু [illegible]। টাকা-পয়সা ধার করার জন্য হয়তো এ-পাড়ায় ঘোরাঘুরি করছে। মজুর কাছে [illegible] সেদিন বলেছে, রুদ্রেন্দুর পরিচিত কে এক ভদ্রলোক আছেন এ-পাড়ায়। বলা যায় না যদি সেই ভদ্রলোকের কাছে ধার-কর্জ চেয়ে না পেয়ে থাকে তো রুদ্রেন্দু হয়তো যেহেতু রাস্তায় অমিয়র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এখন তাঁর কাছে হাত পাততে পারে। অর্থাৎ বঙ্কিমবাবু প্রথম দিন যা আশঙ্কা করেছিলেন ওটাই সত্য। না অম্বুজা-শিলয়ে ঢুকত না রুদ্রেন্দু ঠিকই। বাবার জন্য ঢুকত না। এখন রাস্তায় অমিয়কে দেখে সেই সুযোগটা যে নেবে না কে বলবে।

(ক্রমশঃ)

পক্ষী যুগল : ব্রোঞ্জ ঢালাই ভাস্কর্য : অজিত চক্রবর্তী

প্রদর্শনী

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচর্চার এক বছর

সম্প্রতি বিড়লা অ্যাকাডেমি অফ আর্ট-এর অষ্টম বাৎসরিক সাম্প্রতিক কলা প্রদর্শনী হয়ে গেল। বিড়লা অ্যাকাডেমির কর্তৃপক্ষ সৌভাগ্যবান। তাঁদের আয়োজিত বাৎসরিক এ প্রদর্শনীতে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় রামকিঙ্কর বেইজ, চিন্তামণি কর নীরদ মজুমদার এবং পরিতোষ সেন ছাড়া পশ্চিম-বঙ্গের প্রায় সমস্ত সক্রিয় চিত্রকর ভাস্কর এবং ছাপের-ছবি নির্মাতারা সোৎসাহে অংশ গ্রহণ করেন। চিন্তামণি কর এবং পরিতোষ সেন অবশ্য অন্যভাবে এ-প্রদর্শনীর সংগে যুক্ত থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের সক্রিয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পীদের মধ্যে এবারের প্রদর্শনীটিতে কেবল সোমনাথ হোড় বিকাশ ভট্টাচার্য সুনীল দাস যোগেন চৌধুরী শর্বরী রায়চৌধুরী শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বিজন চৌধুরী এবং মীরা মুখোপাধ্যায়ের কোন কাজ দেখা গেল না। এঁদের কাজও প্রদর্শনীতে দেখা গেলে নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারত প্রদর্শনীটি পশ্চিমবংগের শিল্পকলা চর্চার একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রদর্শনী। তবু যে-সব চিত্রকর ভাস্কর এবং ছাপের ছবি নির্মাতাদের কাজ এ-প্রদর্শনীতে দেখা গেছে তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে এ-প্রদর্শনীটি দেখলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পভাবনার এবং শিল্পচর্চার মূল ধারাগুলির পরিচয় যে রকম পাওয়া যায় তেমন আর কোন সংকলনধর্মী প্রদর্শনীতে পাওয়া যায় না। এটা উদ্যোক্তাদের পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নয়। এ-প্রসংগে বলা দরকার প্রদর্শনীটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবংগ সম্পর্কিত। বাঙালী এবং অবাঙালী শিল্পী যাঁরা পশ্চিমবংগে থেকে কাজ করেন যে-সব বাঙালী শিল্পী কার্যসূত্রে এখন এ-বাংলার বাইরে থেকেও পশ্চিমবঙ্গের সংগে যোগা-যোগশূন্য নন এবং যে-সব অবাঙালী শিল্পী একদা পশ্চিমবংগে ছিলেন এবং আজও এ-রাজ্যের শিল্পচর্চার সংগে নিজেদের যুক্ত রেখেছেন এ-প্রদর্শনীতে তাঁদেরই কাজ দেখা যায়।

প্রদর্শনীটি দেখে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-কলাচর্চার সাম্প্রতিকতম ধারা এবং ভাবনার যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাতে উল্লসিত হওয়া বা উৎসাহিত বোধ করা তো দূরে থাক খুব আশান্বিতও হওয়াও যায় না। অর্ধেকের উপর কাজ শিক্ষার্থীসুলভ অর্থাৎ সে-সবে উচ্চারিত নিজস্বতা দুর্লক্ষ্য; দেখলেই মনে হয় এখানে এর রীতির প্রভাব ওখানে ওর শৈলীর প্রভাব একটা না একটা ফ্যাশনকে দুরন্ত করার চেষ্টা হয়েছে। শিল্পসৃষ্টি কখনও প্রভাবশূন্যভাবে হয় না। কিন্তু প্রভাবটা যদি শুধুমাত্র বহিরংগেরই হয় তখন অসুন্দর হয়। সার্থক শিল্প-রীতি বা শৈলীর বহিরংগরূপ একটা ভূয়ো দর্শনকে দৃশ্যমান করে, কোন গভীর কথা বলে। সেই ভূয়োদর্শনকে আত্মস্থ না না করে বহিরঙ্গের মোহে যদি বহিরঙ্গটিকেই অবলম্বন করা হয় তবে তা অসুন্দর হয়ে উঠবেই। এ-প্রসংগে গণেশ পাইনের কথাই ধরা যাক। কেননা ইদানীং তাঁর কাজের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের বহু তরুণ চিত্রকরের কাছেই অপ্রতিরোধ্য। কাঠামোগতভাবে গণেশ পাইনের ছবির মূল উপাদান তাঁর আলো-আঁধারির ব্যবহার যা তিনি বর্ণ এবং বর্ণান্তরের সাহায্যে দৃশ্যমান করেন। তাঁর হাতে আঁধার রহস্যময় হয়ে ওঠে আলো হয় মায়াবী এ-কারণেই যে তিনি ছবিতে একটি উৎস থেকেই আলো আনয়ন করেন না এবং আঁধারকে বহু স্তরের ঘনত্ব দান করেন। বর্ণ এবং বর্ণান্তর ব্যবহার একান্তভাবেই তাঁর বিশিষ্ট মাধ্যমজাত; —যে মাধ্যমের ব্যবহার তিনি জানাতে অনিচ্ছুক। তাঁর ছবির দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান তাঁর চিত্রক্ষেত্র ব্যবহার এবং ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকার-ও-আয়তন বিশিষ্ট রূপবন্ধের পারস্পরিক সংস্থাপন। এখানেও তাঁর বর্ণিকাভঙ্গ ক্রিয়াশীল; প্রধানতঃ বর্ণিকা-ভঙ্গের কারণেই তাঁর সীমিত চিত্রক্ষেত্র অসাধারণ গভীরতা পায়। গণেশ পাইনের দুর্বলতা রূপবন্ধের আকার এবং শরীর নির্মাণে। আজ পর্যন্ত তিনি রূপবন্ধের শরীর এবং আকার নির্মাণের কোন নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করে ওঠেন নি, যদিও বহু আকর্ষণীয় আকার এবং রূপবন্ধ সৃষ্টি করেছেন। গণেশের অনুকারকরা সহজেই গণেশের দুর্বলতাটুকু অনুসরণ করেন কিন্তু তাঁর শক্তির উৎসটির সন্ধান পান না। এত কথা এ-জন্যই বললাম যে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত অন্যান্য প্রদর্শনীর মতন এ-প্রদর্শনীতেও বহু ছবি দেখা যায় যা পাইনের কাজের কথা মনে পড়ায়। গণেশ পাইনের মতন বিকাশ ভট্টাচার্যের পদাংকনুসারীর সংখ্যা কিছু কম নয়। দলে কম নয় সুনীল দাস এবং প্রকাশ কর্মকারের অনুসারীর।

এ-তো গেল সে-সব শিল্পীদের প্রসংগ যাঁরা মানসিকতায় এখনও শিক্ষার্থী এবং এখন পর্যন্ত নিজস্ব ভূয়োদর্শনজাত কোন নিজস্ব শিল্পরীতিতে উপনীত হতে পারেন নি। অপেক্ষাকৃত দক্ষ সুপরিচিত কলাকার যাঁরা তাঁদের শিল্পরীতিতে নিজস্ব ভাবনা রাখতে কথঞ্চিৎ সক্ষম হয়েছেন তাঁরাই বা আমাদের কি দিতে সক্ষম হয়েছেন তা একটু দেখা যাক।

গণেশ পাইন নিঃসন্দেহে এ-রাজ্যের তরুণ শিল্পীদের অগ্রগণ্য। সম্প্রতিকালে যে কজন অংগুলিমেয় শিল্পীর কাজের মধ্য

দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আবার সর্বভারতীয় শিল্পকলা ক্ষেত্রে সম্মানিত আসনে আসীন হতে পেরেছে গণেশ পাইন তাঁদের একজন। এ-প্রদর্শনীতে তাঁর যে ছবি দেখা গেল তা তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখে নি। এ ছবিতে কোথায় তাঁর সে আলো-আঁধারির রহস্যময় বহুস্তর খেলা কোথায় সে রঙের যাদু? ক্ষুদ্রায়তন চিত্রক্ষেত্রকে তিনি যে বিস্তার যে ঘনত্ব দিতে সক্ষম তার প্রমাণ কই এ-ছবিতে? বাচনিক অর্থে ছবিটি বড় বেশী ফ্ল্যাট একমাত্রিক সাদামাটা। গণেশ বোধহয় তাঁর শিল্পভাবনার মোড় ফেরার একটা মধ্যবর্তী পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। গণেশের কাছে আমাদের আশা অনেক সুতরাং চাওয়াও বেশী। তিনি ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে বাংলার নেতা। এ নেতৃত্বের দায়িত্ব বড় গুরুভার।

দুঃখ দেয় আরেকজন অসাধারণ প্রতিভাধর চিত্রকর প্রকাশ কর্মকারের ছবিতে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির প্রকাশ। পূর্ণ মানবদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন যোনি স্তন নিতম্ব অত জীবন্ত অত আকর্ষক অত পেলব কোমল মিষ্টি রঙে রাঙ্গান হতে যখন দেখি তখন মনে হয় প্রকাশ যৌনতার বেসাতি করছেন; যে যৌনতার বেসাতি করছেন তা জীবন মন মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ওঁর ছবির রঙ, বিন্যাস এবং রূপকল্প কোন আভ্যন্তরীণ অনিবার্য সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়।

প্রদর্শনী দেখে মনে হল আমাদের অধিকাংশ খ্যাতনামা শিল্পীই চিন্তার দৈন্যে ভুগছেন। এ দৈন্য বিষয়-ভাবনার দৈন্য। বিষয়-ভাবনার নতুনত্ব বিষয়-ভাবনা প্রকাশের তাগিদ নতুন অর্থবহ কিছু করার সাহস জোগায়। এই নতুন কিছু বলার নতুন কিছু করার সাহসের অভাব প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবিতে পরিলক্ষিত হয়। নতুন অর্থবহ শিল্পভাষায় নতুন কিন্তু অনুভূত সত্য অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার অক্ষমতা দু'ভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এক ধরনের প্রবণতা দেখা যায় ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত সনৎ কর গণেশ হালুই কাঞ্চন দাশগুপ্ত প্রমুখদের ছবিতে এবং অন্য আরেক ধরনের প্রবণতা দেখা যায় শ্যামল দত্তরায় রবীন মন্ডলদের কাজে। প্রথম প্রবণতার চরিত্র-লক্ষণ সুচারু হবার দিকে ঝোঁক। যে ঝোঁকটি থেকে আসে কারুকলা বিষয়ে অতি-সতর্কতা এবং কারুকর্মে শিল্পবস্তু নির্মাণে প্রাধান্য দেওয়া। সুচারুতা এবং বমাতা প্রকাশিত হয় নকশাধর্মী অলংকার-বাহুল্য মারফৎ। ধর্মনারায়ণকে তাঁর গল্প বলার প্রবণতা থেকে বিরত হওয়া উচিত। সনৎ করের কাজে যে নকশাধর্মী অতি-অলংকার প্রবণতা দেখা যায় তা তাঁর ছবির উদ্দিষ্ট গীতিময়তা (লিরিসিজম)-কে ব্যাহত করে। অন্য দিকে শ্যামল দত্তরায় এবং রবীন মন্ডলের কাজ দেখে মনে হয় বহুকাল ধরে এক ভাবনা তাড়িত হয়ে একই ধরনের কাজ করতে করতে দু'জনা অবসাদগ্রস্ত। সেই [illegible] প্রকাশ [illegible] ছবির শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বি আর পানেসর দক্ষ হাতে কোলাজ করেন। তবে হাতে পাওয়া ফোটো-গ্রাফের রং, বুনট ইত্যাদি তিনি চিত্রতলে বিন্যস্ত করে তিনি অর্থবহ নকশা গড়ে তুলতে যতটা দক্ষ হাতে পাওয়া রূপবন্ধ বা রূপকল্পের ব্যবহার সম্বন্ধে বোধহয় ততটা সচেতন নন। বড় ছবিতে তিনি হাতে পাওয়া রূপবন্ধের যে-ভাবে চারিত্র পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছেন ছোটটিতে তা করতে পারেন নি। তিনি সেখানে রূপবন্ধকে প্রায় তাদের ফোটোগ্রাফারের উদ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেছেন যা কোলাজের ধর্মসম্মত নয়।

মনু পারেখের তেল-রঙের ছবিটি বোধহয় প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি। জ্যামিতির কারাগারে জীবনের জন্ম-যন্ত্রণা গত কয়েক বছর যাবৎ পারেখের ছবির বিষয়বস্তু। ছবির নির্মাণে সেই বিষয়কে দর্শনেন্দ্রীয়গ্রাহ্য করে তোলার কাজে তিনি উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করে চলেছেন। তবে পারেখের ছবিতে সব সময়েই কথঞ্চিত অতি-কথনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বীণা ভার্গব এবং অলোক ভট্টাচার্যের ছবিতে যে শুধু সমধর্মী বিষয়-চেতনা লক্ষ্য করা যায় যে তা নয়, ও'দের উভয়েরই রূপবন্ধ উপস্থাপন এবং ক্ষেত্রবিন্যাস পদ্ধতির মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখা যায় যদিও ও'দের দু'জনের রূপবন্ধ নির্মাণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুহাস রায়ের কালি এবং ওয়াশের কাজে এক ধরনের বিষয় সচেতনতা ধরা পড়লেও ছবিতে ভাবের ভীষণ অভাব; কোন কিছু যেন ছবিকে ধরে রাখে না; না রঙের জোর (কালোর) না কোন ম্যাস না কোন বাঁধুনী ছন্দ না কোন রেখার বেড়। ফলে ছবি জমে ওঠে না। লালুপ্রসাদ সাউর এচিং-এ এক বিশুদ্ধাচারী সহজ সরল জ্যামিতির ধ্যানমগ্ন সত্তর সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় জ্যামিতি-সর্বস্ব বিশদ্ধতা কি আমাদের দেশের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য হতে পারে? হরেকৃষ্ণ বাগ-এর লিথোগ্রাফির বিভিন্ন কারুকৌশলে তাঁর সহজ বিচরণ আমাদের বিস্মিত করে, কিন্তু তাঁকে অনায়াসেই এ-প্রশ্ন করা যায় যে কারুকৌশলই কি শিল্পের সব? তুলনায় রিণী দাশগুপ্তের কারুকৃতি কম কিন্তু তিনি প্রায় বর্ণপ্রলেপের ভঙ্গির ভাষায় যে-সব মনুষ্যাকার সৃষ্টি করেন দর্শনেন্দ্রীয়ানুভূতির ভাষায় তারা কথা বলে ওঠে।

অজিত চক্রবর্তী এবং মাণিক তালুক-দারের ভাস্কর্যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বোঝা যায় এ'রা দু'জনেই ভাস্কর্য সৃষ্টির সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু যা পাওয়া যায় না তাঁদের কাজে তা হল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উত্তাপ। এটা বোধহয় আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যের মৌল সমস্যা।

অনিলবরণ সাহার চিত্রপ্রদর্শনী

গত সপ্তাহে কলকাতার ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস প্রেক্ষাগৃহে অনিলবরণ সাহার এগারোটি জল-রঙের ছবি পাঁচটি তেল-রঙের ছবি এবং দুটি কালি-কলমের ড্রইং-এর সমাহার-এর একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। অনিলবরণ সাহা কলকাতার শিল্পরসিক মহলের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব; তিনি বহুকাল ধরে ছবি এ'কে আসছেন। বিদেশীরা ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় শিল্প বলতে যে-সব রূপকল্পের সমাহার বুঝে থাকেন, অনিলবরণের ছবিতে সে-সব দেখতে পাওয়া যায়। সে-জন্য পশ্চিম দেশীয় বিদেশী মহলে অনিলবরণের ছবির বেশ কদর আছে।

বাৎসরিক প্রদর্শনী : এবারে ইন্ডিয়ান কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ড্রাফট্‌সম্যানসিপের (দিবা বিভাগ) বাৎসরিক প্রদর্শনী সম্পন্ন হয়েছে। দীর্ঘদিন কলেজটি বন্ধ ছিল। কলেজ খোলার পর ছাত্রছাত্রীরা আবার প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীটির সর্বাঙ্গে একটা পরিচ্ছন্ন সুন্দর রুচির ছাপ স্পষ্ট।

প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভাস্কর্য বিভাগের কয়েকটি কাজ। বিশেষ করে সুনীল দাসের টরসো (কাঠ) এবং সরোজ ব্যানার্জীর 'মা ও শিশু' (সিমেন্ট)। ফাইন আর্টে কিছু জল-রঙের ছবি উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে একটি 'পোর্ট্রেট' ও কিছু 'স্টিল লাইফ'। পেন ও কালির স্কেচগুলি প্রশংসার দাবী রাখে।

কমার্শিয়াল বিভাগের 'পোস্টার' ও 'রেকর্ড কভার'-এ নিপুণতার নিদর্শন স্পষ্ট। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হরিমোহন বাগালি দীনেশ দাস অজয় রায় দিলীপ দে ইলা দের কাজ।

এছাড়া প্রথম বার্ষিক ছাত্রছাত্রীদের কাজ প্রশংসার দাবী রাখে।

৭ম বার্ষিক সারা বাংলা শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা : প্রজাতন্ত্র দিবসে অন্যতম শিশু অনুষ্ঠান হিসাবে ২২ পল্লী সাংস্কৃতিক সংগঠন আয়োজিত ভবানীপুরের সুভাষ উদ্যানে এক শিশু চিত্রাংকন প্রতি-যোগিতার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীনীরোদ মজুমদার। তিনি ছোটদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে উৎসাহিত করেন। এই বার্ষিক প্রতিযোগিতায় প্রায় ২০০০ জন পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন বিদ্যা-লয়ের ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। দার্জিলিং বীরভূম পুরুলিয়া মেদিনীপুর নদীয়া ২৪' পরগণা ও কলকাতা থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীর এই সমাবেশ তাদের বিচিত্র বর্ণের পোষাকে বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে। সিনিয়র বিভাগের প্রতিযোগীদের 'শাবকসহ একটি পশু' জুনিয়র বিভাগের জন্য 'একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য' ও টাইনি বিভাগের প্রতিযোগীরা যা খুশী তাই এ'কে সময়ে শেষ করে।

সেকালের সঙ্গীতগুণী

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

গানও তিনি গাইতেন: সঙ্গীতকণ্ঠ ছিল তাঁর ছেলেবেলা থেকে। আর এমন দিকপাল গুণীদের সঙ্গলাভের ফলে তার চর্চাও হয়েছিল। তবে আসরে গাইবার মতন কণ্ঠপ্রস্তুতি করেননি তিনি। সেতার সুর-বাহারের মাধ্যমেই তাঁর সাধনা ছিল। কিন্তু বড় বড় ধ্রুপদী খেয়ালীদের কাছে গানের সংগ্রহ ও চর্চা নিশ্চয় সমৃদ্ধ করেছিল তাঁর যন্ত্রসংগীতকে। হাত যেমন মিষ্টি, সুরেলা হয়েছিল, তেমনি সুদক্ষ হন তিনি তাল ও লয়কারীতে। তাঁর সেতার বাজনার এই এক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সুরবাহারের মতন পাখোয়াজের সঙ্গতে তোমপরণ বাজাতেন। ভারি চালের বাজ ছিল তাঁর, সেকালের ধারায়। গভীর ভাবের দ্যোতক আর সাজ্জাদ মহম্মদ মহম্মদ খাঁর ঘরানার সেই দীপ মিড়ের সঙ্গে সূক্ষ্ম অলংকরণ তিনিও নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগ করতেন।

এক কথায়, সেতার সুরবাহারে তাঁর তুল্য শিল্পী বাঙালীদের মধ্যে হয়ত ছিলেন না তাঁর সমকালে।

চৌকস ব্যক্তি ছিলেন বামাচরণ। এক-দিকে ন্যায় দর্শনের পাণ্ডিত্য। তারপর নিজের সাধনায়, অধ্যবসায়ে আর ওস্তাদ-দের শিক্ষায় হলেন একজন প্রথম শ্রেণীর সেতার সুরবাহারের গুণী। আবার নিজের হাতে সেতারযন্ত্রও তৈরি করতেন। সে যন্ত্র দস্তুরমত বাজাতেন বড় বড় আসরে। তুম্বুরার বদলে আগাগোড়া কাঠের তৈরি তাঁর সেই সেতার—যার মধ্যে খোদাই করে-ছিলেন তাঁর ওস্তাদ মহম্মদ খাঁর চিত্র—জিতেন্দ্রনাথ পর্যন্ত পরে বাজিয়েছেন। বাঁশির মতন সুরেলা তার-ধ্বনি ছিল বামা-চরণের তৈরি সে সেতারের। তাছাড়া অতি সূক্ষ্ম সূচীকর্মও করতেন তিনি রেশমী বস্ত্রের ওপরে একবার একটি মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ীতে এত চমৎকার পুষ্প-লতাপাতার সূক্ষ্ম-শোভন সূচীকার্য করে-ছিলেন যে সেটি একটি দ্রষ্টব্য শিল্প-নিদর্শন হয়েছিল। সেজন্যে ময়ূরভঞ্জের রাজা হাজার টাকা পুরস্কার দেন বামা-চরণকে।

এমনি নানাভাবে তাঁর শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ আত্মপ্রকাশ করত। আর তাঁর সংগীতপ্রতিভার যোগ্য উত্তরসাধক হলেন একমাত্র পুত্র জিতেন্দ্রনাথ। ওই সেতার সুরবাহার যন্ত্রেই পিতার ধারায় তিনি বিকশিত হতে লাগলেন। অন্য বিদ্যার উত্তরাধিকার কিছু পেলেন না তিনি শুধু কিছু ব্যাকরণ ও কাব্য শিক্ষা তিনি পেয়ে-

চর্চা জিতেন্দ্রনাথ নিজেই করেছিলেন। তবে তা তাঁর উত্তরজীবনের কথা। সে প্রসঙ্গ পরে আসবে।

জিতেন্দ্রনাথের শিক্ষার ভাগ্য ভাল যে, বামাচরণ সেসময় থেকেই শেখাতে আরম্ভ করে দিলেন। দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান তখন ১২ বছরের হলেও ৫০ পার হয়ে গেছেন তিনি। তবু ৬।৭ বছর পুত্রকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন। সঠিক পথে উদ্বদ্ধ করে দিয়েছিলেন জিতেন্দ্রের সংগীতজীবন।

ভারতীয় রাগবিদ্যার শিক্ষা গুরুমুখী। অর্থাৎ একান্তভাবে গুরু নির্ভর। তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশে ও সঙ্গলাভেই শিক্ষার্থীর সংগীতজীবন গঠিত হয়ে থাকে। তেমনি একথাও সত্য যে, প্রতিভা ও সাধনা ভিন্ন এ বিদ্যালাভ গ্রহীতার পক্ষেও অসম্ভব। বিদ্যার্থীর অন্তরে শিল্পীর সৃজনশক্তি থাকা আবশ্যক। তবেই গুরুর শিক্ষা সার্থক হতে পারে। আর সে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল—রীতিনীতি। কারণ রাগসংগীত বিধিবদ্ধ শিল্প। রস-সৃষ্টির বাধা না হলেও তার শিক্ষা ও সাধনা সেজন্যে পদ্ধতিগত। একথা কণ্ঠ-সংগীতে যেমন সত্য, যন্ত্রসংগীতেও তার চেয়ে কম নয়। কারণ হস্ত সাধনের আছে নিয়ম প্রণালী। গুরু পরম্পরায় পরীক্ষিত সেই রীতি অনুসরণ করলে কুশলী বাদক হওয়া যায়। অন্যথায় হাত সাবলীল হবে না। শিল্পীরূপে উন্নতি তথা আত্মপ্রকাশের পথ থাকবে অবরুদ্ধ।

এমনি প্রণালীবদ্ধ শিক্ষা বামাচরণ পুত্রকে দিতে লাগলেন। নিয়মিত পাঠ—ক্রিয়া ও বিদ্যার অঙ্গাঙ্গী। একসঙ্গে নিয়ে বসে জিতেন্দ্রকে সাধন করাতেন। আর যখন রাণাঘাট থেকে বাইরে যেতেন—ময়ূরভঞ্জ নাড়াজোল পাথুরেঘাটা গোবরডাঙ্গা কল-কাতা (রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ভিন্ন এখানে বামাপুকুরের কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন বামাচরণের এক গুণ-গ্রাহী) কিংবা অন্য কোথাও—নির্দিষ্ট করে দিতেন চর্চার বিষয়বস্তু। সেতারে পরে রাগবিদ্যায় আরো অগ্রসর হলে, সুর-বাহারেও।

পিতার কাছে জিতেন্দ্র শুধু যে শিখত, তাই নয়। কোন কোন আসরেও তাঁর বাজনা শোনবার সুযোগ পেয়ে যেত। বামা-চরণের সেই পরিণত প্রতিভার সময়কার সব আসর বাইরের শ্রোতাদের, সমঝদারদের সামনে নামী তবলচীদের সঙ্গতে তিনি কেমন আসর মাৎ করতেন, তার কিছু কিছু পরিচয় সে পেয়েছে। পিতার সেই সব বাজনা শোনা শিক্ষার দিক থেকেও কম লাভ হয়নি তার পক্ষে। বামাচরণের তেমনি কোন কোন আসরের স্মৃতি জিতেন্দ্রনাথের মনে চিরদিনের জন্যে গাঁথা ছিল। বিশেষ ভৈরব সহায়ের সঙ্গে সেই বাজনার কথা। কাশীর দুর্ধর্ষ তবলিয়া ভৈরব সহায় সেবার এসে-ছিলেন রাণাঘাটে পালচৌধুরীদের দরবারে। 'বেনারস বাজ'-এর প্রবর্তক রাম সহায়েরই ঘরাণাদার দিকপাল সংগতকার ভৈরব সহায়। লহরা বাজিয়ে সে আসরে ত বিদ্যুৎ চমক সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন ছন্দ বৈচিত্র্য, তেমনি লয়কারী আর কি ধ্বনির ঐশ্বর্য—যেন মেঘমন্দ্র-শব্দ পরম্পরা। তাঁর সেই তবলা লহরার পর কথা উঠল—কোন যন্ত্রী আছেন এখানে যাঁর হিম্মৎ হবে ভৈরব সহায়ের সঙ্গে বাজাবার?

তখন বামাচরণ ছিলেন সে আসরে। তিনি কর্তাদের কথায় যন্ত্র আনালেন। বাজালেন ভৈরব সহায়ের সঙ্গে। তা সে শোনবার মতন বাজনা বটে। বামাচরণ সে-দিন রাণাঘাটের সঙ্গে যেন বাংলারও মান রেখেছিলেন। আর তাঁর নাম ভৈরব সহায় মনে রেখে ফিরে যান কাশীতে। অনেক বছর পরে জিতেন্দ্রনাথ তার পরিচয় পেয়েছিলেন।

জিতেন্দ্রনাথের যন্ত্রসংগীত-শিক্ষা পিতার ধারায় ও দৃষ্টান্তে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। প্রতিভাবান উত্তম আধার। আর শিক্ষাদাতাও বাংলার এক দিকপাল কিন্তু বিস্মৃত কলাবৎ। বহু দিন যাবৎ বহু গুণীর সংগলাভে যে বিদ্যা সঞ্চয় করে-ছিলেন বামাচরণ পুত্রকে তার উত্তর সাধক করতে লাগলেন। তিনি বুঝেছিলেন, অন্য কোন বিদ্যালাভ জিতেন্দ্রনাথের ঘটবে না। সংগীতই হবে তার জীবনের অবলম্বন। তা ছাড়া তাঁর নিজেরও আয়ু শেষ হয়ে আসছিল একথাও হয়ত মনে জাগত। আরো তৎপর হয়েছিলেন সেজন্যে।

একটা বিষয়ে লক্ষ্য করে বোধহয় বামা-চরণ আশ্বস্ত হতেন। সৃজনীশক্তি আছে জিতেন্দ্রনাথের। শুধু পাখির মতন কণ্ঠস্থ নয়। রাগের রূপ তার ধারণায় আসে। কায়দার ভোলটি দিলে তার বিস্তারও খানিকটা করতে পারে সে। আর সেই সঙ্গে মনও সুরের সূক্ষ্মতায় সংবেদনশীল। সুর-বোধও সহজাত। সাজিয়ে বাজাবার মতন সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্যজ্ঞান গড়ে উঠছে। রিয়াজ করে তন্ময় হয়ে। নিজের মনেরই তাগিদে। লেখাপড়ার মতন এজন্যে আর কিছু বলতে হয় না।

সবই সুলক্ষণ। কিন্তু একটি চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন বামাচরণ শরীর তাঁর যেন জীর্ণ হয়ে আসছে। আর কতদিন এ জীবন থাকবে? বয়স হল ত প্রায় ষাটের কোঠায়। এদিকে রাগ-বিদ্যা ত সমুদ্র বিশেষ। তাঁর নিজেরই রাগ সঞ্চয় ত বিপুল। শীর্ষ-স্থানীয় নানা কলাবৎ কলাবতীদের কাছে আপন প্রতিভায় সংগ্রহ বা আয়ত্ত করেছেন।

কত দুর্লভ, অপ্রচলিত রাগ পরম যত্নে লালন সাধন করেছেন এযাবৎ। একমাত্র পুত্র, সুযোগ্য বংশধরকে সবই দেবার বড় ইচ্ছা। কিন্তু তাকে এত শেখাবার অবসর কি এই শেষ জীবনে হবে?

এমনি ভাবনা থেকে এক উপায় স্থির করলেন বামাচরণ। স্বরলিপি রচনায় মন দিলেন। লিপিবদ্ধ করে রাখতে লাগলেন বিভিন্ন রাগ রূপ। স্বরলেখায় যতটুকু সম্ভব—এক একটি রাগের বিষয়ে নির্দেশ। তার বাদী সংবাদী কিংবা আরোহণ অব-রোহণ শুধু নয়। পকড় ও আওচারও। জিতেনের হাত তৈরি হয়েছে। পথ ধরে

নিতে পেরেছে। এইসব লিপি থেকে উদ্ধার করে নিতে পারবে আরো নানা বস্তু বা হাতে কলমে শেখবার সুযোগ হবে না হয়ত।

পন্ডিতেরা সেকালে পুঁথি লিখে রাখতেন। বামাচরণ তেমনি পুত্রের জন্যে সংগীত-লিপি লিখতেন যতখানি তাঁর পক্ষে সম্ভব। তাঁর হস্তাক্ষর ছিল যেন 'মুক্তার পাঁতি।'

অবশ্যই যত লেখবার ইচ্ছা করেছিলেন শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই শেষ হল বামাচরণের ইহজীবন। সেবার ময়ূরভঞ্জ থেকে রাণাঘাটে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আর জীবনের অবসান ঘটল দিন কয়েক রোগভোগেই।

তাঁর বয়স তখন কমবেশি ৬০ বছর। আর জিতেন্দ্রনাথ ২০-র নীচে।

বামাচরণেরও পৈত্রিক বাস ছিল নদীয়া জেলার এই রাণাঘাটে। আর জিতেন্দ্রনাথেরও সেখানে জন্ম ১৮৭৫ সালে।

ভট্টাচার্য তাঁদের বংশানুক্রমিক সংস্কৃত চর্চার জন্যে উপাধি। তাঁদের পদবী হল-চট্টোপাধ্যায়। কাশ্যপ গোত্র।

বেশ কটি জমিদার দরবারের শিল্পী হলেও দরিদ্রই ছিলেন বামাচরণ। বিদ্যাচর্চায় নিয়োজিত হবার যে জীবনচর্যা সেকালের পন্ডিত ব্যক্তিদের ছিল, তাঁরও তেমনি। জিতেন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারের তালিকা তাই বাহুল্যে সংক্ষিপ্ত। সেই মাটির ঘর দালান। সামান্য সম্বল। বামাচরণেরই হাতের তৈরী অপূর্ব আওয়াজী কাঠের সেতারটি। আর তাঁরই সুদর্শন হস্তাক্ষরে লেখা রাগ-পরিচয়ের কিছু পুঁথিপত্র।

জিতেন্দ্রের সব চেয়ে বড় পৈত্রিক সম্পদ লাভ হয়েছিল অন্তরে। শিল্পী-মানসে ও সেতারের সাধনে। সুর-জগতের বিচিত্র রহস্যলোকের চাবিকাঠি বামাচরণ পুত্রকে দিয়ে যান। তাঁর সুষম সংগীতজীবনে যাত্রাপথের পাথেয়। সুরশিল্পীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার মূলধন।

পিতার মৃত্যুতে জিতেন্দ্রনাথের সংগীত চর্চায় তখনকার মতন বাধা পড়ল। বিশেষ করে পিতার কাছে শিক্ষালাভের বিষয়ে। সাংসারিক দায়িত্ব নিতে হল একমাত্র বংশধর বলে। সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কোন অর্থকরী কাজের জন্যে তৎপর হলেন। কারণ পেশাদার শিল্পী হবার বয়স ও অভিজ্ঞতা হয়নি তখনো। আর বাঙ্গালী গুণীদের জন্যে সে যুগে সচরাচর তেমন সুযোগও ছিল না। অন্তত মফঃস্বলে ত নয়ই।

বিদ্যালয়ের অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষাও কিছু তিনি পেয়েছিলেন। সেই সূত্রে সচেষ্ট হলেন অর্থোপার্জনে।

অবস্থাচক্রে রাণাঘাটের বাস প্রায় তাঁকে তুলতে হল। মাতুলালয়ে এলেন একটি কাজের আশ্বাস পেয়ে। দক্ষিণে ২৪ পরগণা জেলায় সে গ্রামখানি। মহকুমা বারাসত। তবে বামনগাছি স্টেশনে নেমে পূব দিকে একটু যেতে হয়। বড় জাগুলিয়া [illegible] পথে পড়ে সেই মধ্যমগ্রাম মণ্ডলগাঁতি [illegible] [illegible]

সে গ্রামের স্বচ্ছল বর্ধিষ্ণু মুখুয্যে পরিবার জিতেন্দ্রনাথের মামার বাড়ী। আশুতোষ প্রভাতকুমার, অম্বিকাচরণ (এঁরই ছেলে কুমার রাণাঘাটে শশী অধিকারীর বেহালা শোনাতে নিয়ে গিয়েছিল জিতেনকে) কেদারনাথ প্রভৃতি তাঁর মামাদের সে অঞ্চলের সবাই চেনে। তাঁদের মধ্যে কেদারনাথ হলেন বারাসত আদালতের উকিল।

কেদারনাথ এই পিতৃহীন ভাগিনেয়কে নিজের মুহুরী করে নিলেন।

মামার মুহুরীগিরি করে সেখানে সংসারধর্ম আরম্ভ করলেন জিতেন্দ্রনাথ। তবে সেটিই তাঁর একমাত্র কর্তব্য হয়ে থাকে নি। সেতারের চর্চা ও সাধনা অব্যাহত রাখলেন। বামাচরণের নিজের হাতের তৈরী সেই যন্ত্র। তার মধ্যে তাঁরই খোদাই করা ওস্তাদ মহম্মদ খাঁর প্রতিকৃতি। তরফহীন ছোট সেতারটি। ঝঙ্কারে তেমন রেশ থাকে না বটে তরফদারের মতন। কিন্তু মিষ্টি সুরেলা হাতের টিপে বাঁশির মতন বেজে ওঠে। অথচ তবলটি তার তুম্বুরার নয়, কাঠের। সেতারটি নিয়ে বাজাতে বসলেই জিতেন্দ্রনাথ যেন পিতার স্নেহের, সুরের শিল্পী-চিত্তের পরশে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠেন। প্রেরণা পান অন্তরে। আর কোর্টে মুহুরীর কাজ আর বাড়ীতে সংসারের দায়-দায়িত্বের মধ্যে সাধন ঠিক রেখে দেন। বাঁচিয়ে রাখেন বাড়িয়ে চলেন নিজের সঙ্গীত জীবনকে। দারিদ্র্যের মধ্যেও সঙ্গীতের শিখাকে রাখেন অনির্বাণ।

কয়েক বছর এইভাবে যায়। সেতার বাদক বলে কাছাকাছি অঞ্চলে পরিচিত হয়ে পড়েন তিনি। উত্তরোত্তরের সঙ্গে নিজেরও সঙ্গীত-জ্ঞান, মনন অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত হতে থাকে। প্রস্ফুটিত হয় তাঁর শিল্পীসত্তা। ঘরোয়া আসর থেকে প্রকাশ্য জলসাতেও। ওই সব দিকের তবলচীরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। সঙ্গত করতে আসেন নিজেদের রিয়াজের জন্যে।

তাঁর এক পরিচয় বারাসত আদালতের উকিল কেদারনাথ মুখুজ্যের মুহুরী আর আন্তর সম্পদে সুরের গুণী।

এমনিভাবে মুহুরী জীবনের ভস্মে কত দিন সে প্রতিভার পাবক ঢাকা থাকত কে জানে।

কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় তাঁর জীবনে পট পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেল। স্বল্প পরিচয়ের ছায়ালোক থেকে রাজধানীর প্রখর আলোকিত আসরে আসরে। অখ্যাত পর্ব থেকে প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার অধ্যায়ে।

কি সূত্রে তা সঠিক জানা যায় না, একদিন জিতেন্দ্রনাথ কলকাতার একটি ভাল আসরে সেতার বাজালেন। তাঁর বাজনা হল চমৎকার। উদ্যোক্তা শ্রোতা সকলেই বড় আনন্দ পেলেন। প্রশংসা করলেন। সম্মান জানালেন শিল্পীকে। আর তিনি এমন বস্তু লাভ করলেন যা তখন তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল।

অনুগ্রহ করে কিছু দক্ষিণা নিন। এই বলে সে আসরের উদ্যোগীরা ৬০টি টাকা দিলেন জিতেন্দ্রনাথকে।

এই হল সূচনা।

সেদিন কলকাতা থেকে তিনি মণ্ডলগাঁতিতে ফিরে এলেন। কিন্তু সুনিদ্রা হল না সারা রাত।

এই নতুন রকমের স্বীকৃতিতে তিনি যুগপৎ আশ্চর্য পুলকিত এবং ভাবিত হলেন।

গোটা মাসটা বারাসত কোর্টে দৌড়-দৌড়ি আর অতি উঞ্ছ কাজ করেও তিরিশটা টাকার মুখ দেখতে পাই না। আর একটি আসরেই দু ঘণ্টায় সেই রোজগার! সঙ্গে এমন সম্মান, সুখ্যাতি। বাজিয়ে এত আনন্দ!

এমনি নতুন চিন্তায় জিতেন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে পড়লেন।

কিছু দিন পরে আবার এমনি একটি মুজরো পেলেন কলকাতায়। ভবিষ্যতের মনোরম স্বপ্ন দেখা এবার তাঁর আরম্ভ হল। মনে জাগতে লাগল নতুন এক পরিকল্পনা।

তারপরই আরো এক আসর হল।

এমনিভাবে নাম যশ তাঁর ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল কলকাতার সঙ্গীত সমাজে। গুণগ্রাহী অনুরাগী কত লাভ করলেন। বোদ্ধা সংগীতপ্রেমী পৃষ্ঠপোষকরা কদর বুঝলেন এই দরিদ্র সেতার শিল্পীর। তখন মাঝে মাঝে তিনি কলকাতা থেকে আসরের আমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। কিন্তু মফঃস্বল মণ্ডলগাঁতি থেকে আসতে পারতেন না সব সময়। জিতেন্দ্রনাথ ভাবলেন এত দূরে থাকলে প্রতিষ্ঠা লাভের শিল্পী জীবনে আত্মপ্রকাশের পথ রুদ্ধ থাকবে অনেকখানি। মুহুরীর বৃত্তিতেই জীবন অপচয়িত হয়ে যাবে। কি হবে এত সাধের এত সাধনার সেতার বাদন? কলকাতার এত বড় সাঙ্গীতিক পরিবেশ থেকে কি বিচ্ছিন্ন থাকবেন? না এই সুযোগ গ্রহণ করবেন পূর্ণভাবে?

তা ছাড়া সাংসারিক দিকও আছে চিন্তা করবার। পারিবারিক দায়িত্ব ইতিমধ্যে আরো বেড়েছে। এখন তিনি বিবাহিত। একাধিক সন্তানের পিতা। জননীও জীবিতা।

জীবন-পথের একটি বড় বাঁকের সামনে দাঁড়িয়ে জিতেন্দ্রনাথ বিবেচনা করলেন সব দিক। তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন।

বারাসত কোর্টের মুহুরীর কাজে ইস্তফা দিয়ে, মামার বাড়ীর বাস উঠিয়ে চলে এলেন কলকাতায়।

রাণাঘাটের জিতেন্দ্রনাথ মণ্ডলগাঁতি থেকে সপরিবারে কলকাতানিবাসী হলেন।

তাঁর বয়স তখন প্রায় ৩০ বছর। বিশ শতকের প্রথম দশক শেষ হয়ে আসছে।

(ক্রমশঃ)

স্মৃতির অন্যমনস্ক মুখ

আমরা কেউ কারও নই। কেউ কারও হতে পারি না। অথচ আমরা সকলে সকলের। পৃথক পৃথক। যেন দ্বীপান্তর। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন প্রায় পঁয়ত্রিশটা বছর কেটে গেল। শূন্য থেকে চারটে দেওয়াল ক্রমশঃ ওর দিকে সরে সরে আসছে। যেন একটা খাঁচার মধ্যে ও আটকা পড়ে যাচ্ছে। কিংবা একটা স্টেডিয়ামের চারপাশে ও দৌড়োচ্ছে, দৌড়োচ্ছে আর দৌড়োচ্ছে—ঘুরছে ঘুরছে আর ঘুরছে একটা রেকর্ড প্লেয়ারের মতো ঘুরছে। ওর কথাগুলো ভয়ানক জোর চীৎকার করে মাইক্রোফোনে জানানো হচ্ছে—ওর একান্ত নিজস্ব কথা, ভালবাসার কথা, সুখ-দুঃখের, গভীর-গোপন কথা। জানানো হচ্ছে বন্ধু-বান্ধবদের, পথে-ঘাটে অফিসে-বাজারে রেস্তোরায়, সিনেমায় সর্বত্র। যেন ওকে নীলাম করা হচ্ছে। একটা পুরোন মডেলের গাড়ি, চৌ-মাথার মোড়ে। ওর কোন দাম নেই। সকলেই মেশিনটাকে নেড়ে-চেড়ে দেখছে আর চলে যাচ্ছে। ওর বয়স কত? পঁয়ত্রিশ বছর বড্ড বেশি—বেশিদিন চলবে না—উই ওয়াণ্ট নিউ! সকলেই নতুন চায়। এক ফালি তরমুজের মতো তাজা টকটকে লাল।

সব কিছু ফ্রেশ চাই। একেবারে ফ্রেশ ইয়াং। চাকরীর এক ইন্টারভিউ বোর্ডের কথা ওর মনে পড়ে গেল। ওকে বোর্ড নিশ্চয়ই মনে করেছে বড্ড পুরোন হয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে, কাগজ কাটার শব্দ—ওকে দিয়ে সেলসের ক্যানভাসিং চলবে না। ওভাবে দিনে দিনে ও পুরোন হয়ে যাচ্ছে। ওর ভাবনায় মরচে ধরছে। যেন একটা জংধরা মেশিন স্টোর-রুমে পড়ে।

দীপেনের বাড়ীটাকে একটা স্টোর-রুমের মতো মনে হয়। আর বাড়ীর লোক-গুলোকে কতকগুলো ভাঙা আসবাবপত্রের মতো। অকেজো, নিতান্ত অকাজো অথচ পাল্টাবার উপায় নেই। কোনরকমে কাজ চলে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই ভাঙা জংধরা যন্ত্রের মতো। ওর কাছে বাড়িটা কখনও বা একটা গুমোট স্যাঁতসেঁতে অটোমোবাইলের কারখানা। তেল না পেয়ে মেশিনের গতি শ্লথ হয়ে আসছে। নতুন নতুন লোক-গুলো মনে হয় স্ট্রেঞ্জার।

দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ঘাটে বসে দীপেন এই সব ভাবছিল। ভাবছিল বাড়ী গিয়ে কী হবে? এখানে বেশ ভালো লাগে। এই খোলামেলা নির্জন জায়গাটুকুর মধ্যে কেমন যেন একাকী স্বাধীন। ইচ্ছা হল মাথার কাছে রুমাল পেতে শুয়ে পড়ে। একটা সিগ্রেট ধরায়। সব শান্তি যেন জল হয়ে অন্ধকারে মিশে গেছে। ঐ দূরে আকাশের তারাগুলো কত চেনা, এক পরিচিত সোঁদা মাটির গন্ধ নাকে লাগে। মনে হয় পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ও অনেকটা

পথ চলে এসেছে। এক অচেনা অজানা স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে দেখে সবুজ নিশান উড়িয়ে একটা কালো রঙের কাঠের রেল-গাড়ী ঝেঁকে ঝাঁকতে ঝাঁকতে চলেছে। সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে হাতের রুমালটা নাড়তেই ছোট্ট পাখি হয়ে উড়ে গেল। নিজেকে কত যেন ছোট্ট, আপন বলে মনে হয়। নৌকোগুলো ঘাটে বাঁধা। টিমটিম করে লন্ঠনের আলো জ্বলছে। হাল্কা হাওয়ায় নৌকোগুলো দুলছে। কাগজের নৌকো বলে মনে হয়। একটু হাত দিয়ে ঠেললেই যেন ভাসতে ভাসতে চলে যাবে—কতদূর কে জানে। দূরে অন্ধকারে বালী ব্রীজটা মিশে গেছে—কতকগুলো কালো রেখাটানা খাঁচার মতো মনে হয়। মাঝে মাঝে হেড লাইটের আলো পড়ে বিশাল দৈত্যের মতো দেহ নিয়ে ট্রাকগুলো পার হয়। গুম্ গুম্ আওয়াজ করতে করতে লোকাল ট্রেনটা চলে গেল। হাওয়ায় সেই শব্দ ভাসাতে ভাসাতে মিলিয়ে যায়—দীপেনের বুকের ভিতরটা কেমন অদ্ভুত ফাঁকা ফাঁকা মনে হোল।

আটটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেনটা গেল। এবার ওকে উঠতে হবে। কিন্তু আজকে কেন জানি ওর উঠতে ইচ্ছে হয় না। প্রতি-দিনের অভ্যেসের মুখোমুখী ওর দাঁড়াতে ইচ্ছে হল। একটা বিশাল বৃক্ষের মতো ডালপালা মেলে যেন ও এ পরিবেশটার সংগে মিশে গেছে। অন্ধকার একরাশ শালিকের মতো বৃক্ষের ডালের উপর বসে কিচির মিচির করে। এ ডাক যেন কত চেনা ও কি অন্ধকারকে ভালবেসে ফেলেছে?

গঙ্গার ওপারে উত্তরপাড়া, বালি বেলুড়...বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বাড়িগুলো প্লাস্টিকের খেলনার মতো সাজানো যেন কেউ বসিয়ে দিয়েছে। জলের বুকে আলোর ছায়া পড়ে ছবির মতো। মাঝে একটা লাল দাঁড়ি ভাসে। বাতাসে কাঁপছে। ব্রীজের মাথায় লাল বাতির নিশানা।

কেন জানি আজকাল ওর বাড়ি ফিরতে ভাল লাগে না। পথে পথে একা ঘুরতে বেশ লাগে। এদিক ওদিক, এ গলি ও গলি অনির্দিষ্ট পথ ধরে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেশ আনন্দ। এর মধ্যে কেমন এক অদ্ভুত স্বাধীনতা আছে। মাঝে মাঝে কখনও খেয়াল চাপে কোন এক ট্রেনে চড়ে কোথাও কোনদিন চলে যায়। ওকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর এইরকম উদ্দেশ্য-হীন ভাবে সবাই যেন ঘুরছে—পার্কে, কাফে, সিনেমায়, নাচঘরে, জলসায়—সর্বত্র ভিড় আর ভিড়। যন্ত্রে দম দেওয়া পুতুলের মতো সবাই ঘোরে এক সার্কাসের জালে। আমরা সবাই এক একটা ক্লাউন—কথাটা ভেবেই দীপেন কেমন যেন বিষণ্ণ বোধ করল। মনে ভাবে সে-ও যেন রঙ মেখে একটা ক্লাউন সেজে গঙ্গার ধারে বসে আছে। ওকে দেখে সবাই মজা পাচ্ছে। হাততালি দিচ্ছে। হঠাৎ মনটা পাথরের মতো ভারি হয়ে এল।

এবাঁর বাড়ি যেতে হবে—দীপেন উঠে পড়ে। রোজকার মতো আজও হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরে। কালো পীচ ঢালা বড় রাস্তা ধরে কিছু দূর এগোবার পর একটা কালো মাঠ, পাশে টিনের শেড লাগানো কতগুলি বাড়ীগুলো। পাশ দিয়েই সরু আঁকাবাঁকা একটা গলি সাপের মতো এঁকেবেঁকে অন্ধকারে মিশে গেছে। এ গলিতে লোক-জন বড় একটা বেশি যাতায়াত করে না। ছিনতাই আর জুয়াখোরদের আস্তানা। দীপেন এঁদের সবাইকে চেনে। একটা লোক রকে বসে বিড়ি ধরাবার চেষ্টা করছে বাতাসে বিড়িটা বারবার নিভে যায়। গালের চোয়াল দুটো ভাংগা মিশকালো রোগা পাতলা পাঁশা বেড়ালের মতো জ্বল্ জ্বল্ চোখ দিয়ে ওকে অদ্ভুত ভাবে দেখছে। একটু আগেই লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছে। বিকৃত ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে হাসছে। গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে, ময়লা হলুদ রঙের একটা চাদর জড়ানো, দু খন্ড হাড়ের মতো হাত দুটো বেরিয়ে রয়েছে। যেন কোন শয়তানি বুদ্ধি ওর মাথায় খেলছে। দীপেনের ইচ্ছা হল এক্ষুনি ছুটে গিয়ে প্রচন্ড জোরে ওকে থাপ্পড় লাগায়।

ইতিমধ্যে দু'একটা রিকসা, ঠেলা পার হয়। একটা কালো রঙের ভ্যান বিকট আওয়াজ করতে করতে চলে যায়। রাস্তার দুধারে ল্যাম্পপোস্টের বাতিগুলো জ্বলছে দেওয়াল পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে। হিন্দী সিনেমার কয়েকটা পোস্টার দেওয়াল থেকে ঝুলে পড়েছে যেন কাঠগড়ায় ছাগলের কাটা গলা ঝুলছে। লালচে আলোয় সব দেখা যায়। একটা ভাঙ্গা বোতল রাস্তার মাঝে গড়াগড়ি খাচ্ছে। একটা পানের দোকান, ক্লাব ঘর, কিংবা পাঞ্জাবী হোটেল...এইভাবে রাস্তাটা এগিয়ে চলে। আজ কেন জানি সমস্ত পরিবেশটাকে নতুন নতুন লাগছে। এর পরেই রাস্তাটা বাঁদিকে বাঁক নিয়েছে। একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

বাড়ির সামনের দোরে [illegible] [illegible] উপর সাদা প্লাস্টিকের অক্ষরে লেখা এ. কে. দাস। যেমন ল্যাকটোজেনের কৌটোর ওপর লেখা থাকে। ওর বাবা এ অঞ্চলে পরিচিত লোক। মামলা মকোদ্দমায় তাঁর জুড়ি নেই। সবাই 'উকিলবাবু' নামেই চেনে। বাবার কালো কোটটা দাঁড়কাকের ডানার মতো ঝুলছে—রাস্তার বাইরে জানলাটা দিয়ে দেখা যায়। দরজা দিয়ে ঢুকেই বিরাট লম্বা বারান্দাটা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তিমির পিঠের মতো মসৃণ। হাতের মুঠোয় সিগ্রেটটা চেপে ডানদিকের ঘরটায় সুরুত করে ঢুকে পড়ে—তখন নিজেকে চোরের মতো মনে হয়। যেন ও ভয়ানক অন্যায় করেছে। এখন পায়ে ফেরাটাও অন্যায়। এক্ষুনি ওকে দেখে সব্বাই হাঁ হাঁ করে ছুটে আসবে।

ঘরটা ফাঁকা। কেউ নেই। দীপেন যেন স্বস্তি পেল। খদ্দরের পাঞ্জাবিটা খুলে লোহার আংটাটায় ঝুলিয়ে দেয়। জড়াপোষে ঘুমোবার ভঙ্গীতে শুয়ে পড়ে। অন্ধকারে গোল গোল প্ল্যাসটিকের চেয়ারগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেল। রেডিওর সবুজ বাতিটা পিটপিট করে জ্বলছে। খুব মৃদু স্বরে দিনের খবর শোনা যাচ্ছে।

একটু পরেই মীরু ঢুকবে 'দাদা একটু অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও' মা ঢুকবে 'কোথায় গিয়েছিলি?' বাবা ঢুকবে, 'কি হল চাকরিবাকরি খুঁজছ তো?' ইত্যাদি ইত্যাদি। যেন সবকিছু আগে থেকেই ওর জানা। বাঁধা বাঁধা কতকগুলো বিবর্ণ, নিষ্প্রাণ, ছকবাঁধা কথা, জ্যামিতির মতো স্বতঃসিদ্ধ। কথার ফাঁকে কাগজ

[illegible] আমি [illegible]। আমার একটাও নতুন কথা বলতে পারি না। [illegible] বাঁচার যেন সবাই আচমকা পথে বেরিয়েছে, দীপেন ভাবে। [illegible] কাকা [illegible]। অন্ধকারে [illegible] আর্তনাদ শোনা যায়। [illegible] কথা ভাবছেন তার মনের ভিতর কেমন যেন ধুকপুক করতে থাকে।

রান্নাঘরে ঠুংঠাং শব্দ, রাত্রিরের রান্না হচ্ছে। পড়ার ঘরে মীনু জোরে জোরে চীৎকার করে কবিতার কয়েক লাইন মুখস্থ করছে। পাশের ঘরে তর্কাতর্কি, বোধহয় বাবার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া বেধেছে। উভয়ের গলার স্বর ক্রমশ উচ্চগ্রামের দিকে। এতো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এতে দীপেনের কিছুই মনে হয় না। যেন কাঠ-ফাটা রোদে রেলিঙের গায়ে দাঁড়িয়ে একটা কাক 'কা' 'কা' করছে। সমস্ত শূন্য, নিঝুম পরিবেশটার মধ্যে ঐ ডাকটা সুরের মতো ওর মনের ভিতর খেলতে থাকে। ওটা যান্ত্রিকে যেন দুপুরের সব সৌন্দর্যটাই মাটি হয়ে যায়। মায়ের জবলজবলে মুখটা জলছবির মতো কেবল চোখের সামনে ভাসতে থাকে। বাবার ক্লান্ত দেহটা ফাঁসের মতো ঝুলছে। মনে হয় ওকে নিয়েই যেন সংসারের সব অশান্তি। এই অভাব অনটনের সংসারে ওর কিছুই করার নেই। নিজেকে ভীষণ অসহায় ভাবে। নিঃশব্দে একটা কালো রঙের বেড়াল বারান্দা পার হয়। পিতলের অ্যাশট্রের সিগ্রেটের আগুনটা তখনও ধিকিধিক করে জ্বলছে।

কোম্পানীর [illegible] অফিসার হওয়ার দীপেনের চাকরী গেছে। 'বেকার' কথাটা শুনলেই ওর মনের মধ্যে ঘৃণা, ভয় ও লজ্জা মিশ্রিত এক অদ্ভুত অনুভূতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নিজেকে কেমন যেন খাপছাড়া, অতিরিক্ত মনে হয়। সাবানের মোড়কের মতো অতিরিক্ত একটা কিছু। পথে ঘাটে, দোকানে বাজারে, পার্কে রেস্তোরাঁয়, অজস্র মানুষের ভিড়ে নিজেকে সর্বদা বেমানান অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। একটা সাদা রুমালের মতো হাত মুছে, ইচ্ছে করলে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া যায়। বাজারে বিক্রী করলে ওর কোন দাম নেই।

আজকাল কফি হাউসে ওর ভালো লাগে না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে নিজেকে কেমন ছোট মনে হয়। রণেন এসে পটলপ্যান্টের বড়বাবুদের গল্প করে, সোমনাথ এসে ডকের মানুষের বিচিত্র জীবনের কথা বলে, তপন এসে ওদের কোম্পানীর নতুন প্রোগ্রামের কথা বলে। সবাই সবার কথা বলে। নতুন আশার কথা, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। দীপেনের সেই মুহূর্তে নিজেকে অতিরিক্ত, অতিরিক্ত একটা কিছু বলে মনে হয়। যেন এর জন্যে ও একাই অপরাধী।

নিজেকে সব সময় অদ্ভুত অপরাধী বলে মনে হয়। এক অপরাধ-ভয় ওর অবচেতন মনের মধ্যে বাড়তে থাকে। প্রত্যেকটা কাজ করতে গিয়ে অপরাধ বলে মনে হয়। কফি হাউসে আড্ডা দেওয়া, গঙ্গার ধারে বসে থাকা, রাতে বাড়ি ফেরা— সবই যেন অপরাধ। এই অপরাধবোধ দিনে দিনে শিকড় ছড়িয়ে ওর মনের মাটিতে কেবলই বসে যাচ্ছে। যেমন কোন মানুষ আস্তে আস্তে চোরাবালির মধ্যে ঢুকতে থাকে। চারপাশে ধু ধু করছে বালি আর বালি। আর ভাবছিল অঞ্জুকে ভালবাসাটাও বোধহয় অপরাধ।

'ভালবাসা' কথাটা ভাবলে ওর কেমন যেন হাসি পায়। একটা মজার খেলা ঃ একটা জোকার হাতে কতকগুলো রঙিন তাস নিয়ে দর্শকদের খেলা দেখাচ্ছে। একটা বাচ্চা ছেলে রাস্তার ধারে বাসের টিকিট কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ভালবাসার বোধটা অজস্র সংখ্যা হয়ে ওর মনের ভিতর ঘুরতে থাকে। দীপেন দেখে টেবিলের উপর পরে একটা নীল খাম। অনেকদিন আগে আলমোড়া থেকে অঞ্জু লিখেছে। অঞ্জু একই কথা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখে। কেবল আবেগ আর উচ্ছ্বাস ভরা বাছাবাছা কথাগুলো। দীপেনের কাছে এসব সেন্টিমেণ্টের কোন দাম নেই। চিঠিগুলো পড়তে পড়তে দীপেনের মনে হয়, অঞ্জু ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে আর ঐ নিঃস্বতা অজস্র শব্দের সোনালী রঙ মেখে ওর চোখের সামনে ময়ূরের পেখমের মতো মেলে ধরতে চাইছে। ও যেন নিজেকে বিজ্ঞাপিত করতে চাইছে 'দেখ, দীপেন দেখ, আমার ভিতর কত কি আছে!' অঞ্জু তোমাকে [illegible] নিষ্কলঙ্ক নির্মল বাতির মতো জ্বলতে আর দিচ্ছে। একটা ফাঁকা মাঠে বল নিয়ে কেবলই দৌড়োচ্ছে আর দৌড়োচ্ছে। অনন্ত [illegible] ক্লান্ত হলে এক জায়গায় বসতে চায়। সেই মুহূর্তে অঞ্জুকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছে হয়। অঞ্জুর ঈষৎ নরম বাদামী রঙের দেহের মধ্যে কী রহস্য আছে? তখনই দীপেন কেমন যেন শিশুর মতো ব্যবহার করতে থাকে। ওর বুকের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চায়। আর মনে হয় দিনে দিনে ওরা যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে ঃ দুটো শবদেহ সমুদ্রের ধারে শোয়ানো রয়েছে—সূর্য উঠলে শবদেহ দুটো মোমের মতো গলতে গলতে জলের সঙ্গে মিশে যায়। অঞ্জুর সঙ্গে দীপেন আজকাল কথা বলতে পারে না। কেবল ভয়ানক নির্জনতার ভিতর দুজন দুজনকে চিনতে চায়। গতকাল মনুমেন্টের তলায় দুজন এমনি ভাবেই বসেছিল। যেন কারও কিছু বলার নেই। একে অপরকে শুধু চেয়ে দেখে। অঞ্জু ফিস্‌ফিস্ স্বরে একবার বলেছিল 'কিছু বলো'। দীপেন কিছুই বলতে পারে না। মনে হয় সব কথা বলা হয়ে গেছে, কিছুই আর নেই। আর ঐ 'নেই' 'নেই' ভাবটা ওর মনকে এক ভয়ানক বিষাদে ভরিয়ে তুলছিল। তখন দীপেন শুধু বাড়ি ফিরতে চেয়েছিল।

এখন ঘরে কেউ নেই, দীপেন একলা। হাতের কাছে টেবিলের উপর কাগজপত্র নেড়েচেড়ে দেখে কতকগুলো পুরোন মাসিকপত্র বিবর্ণ হয়ে গেছে, সেদিনের কাগজটা, কামুর 'দি আউটসাইডার' বইটা, কয়েকটা বাসের টিকিট তাসের টুকরো, নীল ডাইরী আর কলমটা হাড়ের মতো পড়ে রয়েছে।

খোলা জানলাটা দিয়ে দীপেন দেখে একটা ছেলে শিষ দিতে দিতে রাস্তা পার হচ্ছে। ভাঙ্গা সুরে হারমোনিয়াম [illegible]। এক ভদ্রমহিলা তার স্বামীকে অ[illegible] ভাষায় গালাগালি দিচ্ছেন। 'আমাদের দাবী মানতে হবে', 'মানতে হবে'...চীৎকার করতে করতে একদল বাঁদিকে ল্যাম্পপোস্টের ধার ঘেঁষে অন্ধকারে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। টুংটাং শব্দ করে দু' একটা রিকশা যায়। সবকিছু কেমন যেন নতুন ঠেকছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সবকিছুর মধ্যে নিজেকে খাপছাড়া মনে হোল।

হাতের সামনে টেবিলের উপর কাগজটা পড়ে। 'হাইফংয়ে বোমারু বিমান আক্রান্ত', 'কিসিংগারের গোপন বৈঠক', 'ময়দানে পুলিশের লাঠিচার্জ', 'ব্যাঙ্ক লুঠ', 'ছাত্র ধর্মঘট', 'আত্মহত্যা' 'কলকাতা নরক হবে' ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রতিটি শিরোনামায় কেবল উত্তেজনা, আতংক ও ভয়। হঠাৎ মনে হোল সংবাদপত্রের কালো কালো মুদ্রিত অক্ষরগুলো অজস্র পিঁপড়ের মতো সার বেঁধে একটা মৃতদেহকে টেনে নিয়ে চলেছে। মৃতের মুখটা হুবহু নিজের মুখের মতো

মনে হোল। কাল রাতে কারা যেন ওকে গুলিবিদ্ধ করেছে। চমকে মুখ ফেরাতেই দেখে দরজায় কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

না, কেউ নয়। ওটা মনের ভুল। আজকাল এমনই মনে হয়। যেন সামনে পিছনে ছায়ার মতো কেউ দাঁড়িয়ে থাকে।

স্মৃতি যেন সার বেঁধে বুকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। পুরোন দিনের কথা মনে পড়ে। অজস্র ঘটনা বহু মানুষের মুখ উঁকিঝুঁকি মারে। অবসন্ন কাগজের ফুলের মতো ফস্‌ফস্‌ শব্দ করে তা খুলতে থাকে। মনে হয় পটে আঁকা কিংবদন্তীর ঘটনা, বিবর্ণ রক্তের দাগ, তাতে মৃতের মুখ চিত্রিত। ভয়ংকর ও অদ্ভুত।

পাড়ার কালীপুজোর দিনগুলোয় সারা-রাত নাচার কথা মনে পড়ে। অমাবস্যার রাত্রে চাঁদোয়ার তলায় মুখের মধ্যে ধুনুচি নিয়ে ঢাকের তালে তালে সেই উদ্দাম বেহুঁশ নৃত্য। ওকে ঘিরে আবালবৃদ্ধবনিতা বিস্ময়ে অভিভূত, এ নাচ দেখতে থাকে যেন কাহারও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে পাথরের মতো স্থির, দণ্ডায়মান মানুষেরা এক গভীর নিজর্নতায় মগ্ন ও অনিবার্য কিছু ঘটনার ভয়ংকর পরিস্থিতির অপেক্ষায় ভয় ও ভালবাসা বাঁচা ও না-বাঁচা, এমত যুগবৎ অভিজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হিমশীতল স্নায়ুর ভিতর এক আশ্চর্য তীব্র কামনা অনুভব করে। ধুনোর ধোঁয়ায়, মন্ত্রে, আরতির ঘণ্টায় অন্ধকারে সহস্র প্রদীপ ওর চোখের সামনে জ্বলতে থাকে। আর অবশেষে ক্লান্তি, ঘুম ও পরিতৃপ্তির চোখে আস্তে আস্তে যখন ও ভিজে মাটির মধ্যে শুয়ে পড়ে তখন অচেনা, অচেনা মুখসব অদ্ভুত শংকা ও আনন্দে অভিভূত, কালীমূর্তির সামনে নীরব, নক্ষত্রের মতো স্থির দণ্ডায়-মান রয়।

সহসা একদিন এমনিভাবেই দীপেনকে দেখতো। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনটার কথা মনে পড়ে। সেদিন সবার মুখে এক কথা : কী সুন্দর, আশ্চর্য অদ্ভুত ছেলেটা! কলেজ চত্বরে দাঁড়িয়ে রাজনীতি করেছে, আবৃত্তি করেছে, নাটক লিখেছে আর পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাশ পেলে সেদিন প্রেন্সিপ্যাল ওকে ডেকে 'উই হোপ ইওর সাকসেস্‌ ইন ফিউচার' বলে একটা হাতে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট গুঁজে দিলেন।

আজকাল সেই দীপেন যেন কত পাল্টে গেছে। কারণে অকারণে এক অদ্ভুত ভয় মনের মধ্যে বাড়তে থাকে। ঐ ভয়টা বিশাল বৃক্ষের মতো বুকের ভিতর কেবলই শিকড় ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঐ ভয়টা ছায়ার মতো কেবলই ওর পিছু পিছু ঘুরতে থাকে। ঐ ভয়টা মুখোশের মতো কেবলই মুখের সঙ্গে আটকে যাচ্ছে। আর তখনই ভিতরে ভিতরে ও ক্লান্তি অনুভব করে। স্বপ্নের ভিতর সেই ভয় আরও ভয়ংকর হয়।

একটা ফাঁকা অডিটোরিয়ামে দাঁড়িয়ে। জোরে জোরে চীৎকার করে কারা যেন কী বলে চলেছে। চারপাশে কেবল একটানা গুম্‌গুম্‌ আওয়াজ হচ্ছে। কে যেন মাইক্রোফোনে বলে চলেছে প্ল্যাটফরম নাম্বার এক, প্ল্যাটফরম নাম্বার চার—বালি বেলুড়, উত্তরপাড়া ট্রেন ছাড়বে। আর মাঝে মাঝে 'হো' 'হো' করে নারী কণ্ঠে কারাযেন হাসে। কে যেন একটা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে। জ্যোৎস্নার আলোয় ভদ্র-লোকের মুখের অংশবিশেষ দেখা যায়। ভদ্রলোককে চেনা চেনা ঠেকছে। কোথায় যেন দেখা—ইনসিওরেন্সের দালাল, ব্যাঙ্কের এজেন্ট নাকি ইন্টারভিউ বোর্ডের সেই ভদ্রলোক। গোলাকৃতি বিরাট মুখ, কালো ফ্রেমের চশমা আঁটা একটা সিগ্রেট ধরাবার চেষ্টা করছেন। বারবার বাতাসে নিভে যাচ্ছে। কালো স্যুটে সর্বাংগ ঢাকা। খটখট করে নেমে আসছেন—হঠাৎ একটা কংকাল নেমে আসছে মনে হয়। খানিক বাদে 'ধুপ' করে ভয়ানক জোর একটা শব্দ হল—কে যেন নিচে পড়ে গেল। একটা বিকট চীৎকার ও গোঙানীর আওয়াজ। পাশ ফিরতেই দেখে সেই বিশাল স্ফীতদেহী ভদ্রলোক পড়ে আছেন, মুখ দিয়ে অনর্গল রক্ত বেরুচ্ছে। মৃতদেহটা নিয়ে ও কি করবে ভেবে পায় না। সামনের সিঁড়ি দিয়ে একা দ্রুত উপরে উঠতে থাকে। জোরে ভীষণ জোরে। যেন এটা একটা খুন। ঐ খুনের জন্যে দীপেনই দায়ী। পিছনে কারা যেন ধাওয়া করেছে—'ধরো' 'ধরো' 'ধরো', পালাচ্ছে। দীপেন উঠছে, উঠছে আর উঠছে। সিঁড়ি যেন শেষ হয় না। অথচ ওর ভয় ক্রমশ বাড়তে থাকে।

দুঃস্বপ্নের রাত্রি ছাড়িয়ে ভোর হয়। গতরাতে কয়েক পশলা বৃষ্টির পর এখন চারদিকটা রূপোর মতো ঝকঝক করছে। কালকের চেয়ে আজকের আকাশটা যেন একটু বেশি নীল। খণ্ড খণ্ড মেঘে কোথাও বিষণ্ণতার ছাপ নেই। এক ফালি সূর্যের আলো চড়ুই পাখির মতো লাফাতে লাফাতে বিছানায় এসে পড়ল। আকাশটা জানলার ফ্রেমে আটকা পড়েছে। সামনের বাগানটার মাঝবরাবর দুটো সূর্যমুখী ফুলের গা বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। যেন জলের শরীর বেয়ে দুটো মাছরাঙা উঠে এসেছে। জলের মতো টলটলে একটা মুখ কেবলই ভেসে উঠছিল। দীপেনের মনে হোল কাঠের রেলগাড়ী চড়ে কু ঝিকঝিক করতে করতে কোথায় যেন চলেছে। আর এক একটা স্টেশন পার হলে গার্ডের সবুজ পতাকাটা এক একটা সবুজ পাখি হয়ে উড়ে যায়। কোন এক ম্যাজিক-ওয়ালা পথ ভুলিয়ে ভুলিয়ে ওকে কোথাও নিয়ে চলেছে। বুকের মধ্যে একটা অস্পষ্ট, ধূসর পাহাড় মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারে। স্বপ্ন স্মৃতির সবুজ পাহাড়। মনে হয় কোন সমুদ্রের তলদেশ থেকে ঐ পাহাড়টা উঠে এসেছে। যেমন উঠে আসে আশ্চর্য অনুভূতি দৃশ্যপটের পর্যায়ক্রমে। মাঝে মাঝে আকাশটার আড়ালে পাহাড়টা হারিয়ে যায়। সেই আশ্চর্য অনুভূতিটা সুরের মতো ওর মনের ভিতর খেলতে থাকে। চোখ ফেরাতেই দীপেন দেখে একটা বিরাট খাতা হাতে দরজার গোড়ায় টিংকু দাঁড়িয়ে আছে। কাছে এগিয়ে এসে বলে "কাকুমণি, ঐ শালিক পাখিটার একটা ছবি এঁকে দাও তো।"

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

বালির গাদার সামনে থেকে ডানদিকের গ্যাসপোস্ট পর্যন্ত— যেখান থেকে শুরু হয়েছে কনস্টেবল খ-য়ের এখতিয়ার।

কাফে-র দোতলা থেকে ডোনোভান গুলি করেছিল গিলকিক-কে। গুলি খেয়ে গিলকিক টলতে টলতে মুখ থুবড়ে পড়ল বালির গাদার সামনে। কনস্টেবল খ এসে দেখল, মহামুস্কিল! নিজের এলাকায় খুন হওয়া মানেই তদন্তে জড়িয়ে পড়া। ছুটি বাতিল হবেই।

কনস্টেবল খ সেই মুহূর্তে টহল দিতে ঢুকেছে ভেতরে। ফাঁকিবাজ ক লাশটাকে তুলে এনে শুইয়ে দিল 'খ'-য়ের এলাকায় তারপর ছাড়ল পুলিশী হাঁক।

ক্লিয়ার?

আর্থিক প্রসঙ্গ

কালো সোনা

কালো সোনা আদরের ডাকনাম— অনেক সময় অবশ্য পোশাকী নামেও পরিণত হয়। এই নামে ডেকে বোঝান হয় যে কৃষ্ণবর্ণের হলেও ঐ পুং-সন্তানের মূল্য কারো চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এক্ষেত্রে তুলনা অপরের সঙ্গে করা হলেও মানদন্ড হল ঐ পীত-বর্ণের ধাতু। সমগ্র ঐতিহাসিক যুগ ধরে যা সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন মাপকাঠির কাজ করে আসছে মানুষ যা নিরবচ্ছিন্নভাবে তার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? সম্প্রতি কিন্তু ঘটেছে পট-পরিবর্তন— স্বর্ণ-মৃগয়ার পরিবর্তে মানুষ আজ কালো-সোনা খোঁজার কাজে উঠেপড়ে লেগে গেছে। ফলে শুরু হয়েছে আর এক দফা পট-পরিবর্তনের পালা— আশা-নিরাশার দোলায় দুলছে বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী। মুকুলিত আশার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপটের সম্পূর্ণ পরিবর্তন যেন ঐন্দ্রজালিকের দন্ডের স্পর্শে ঊষর মরুভূমি সরে গিয়ে ক্ষণিকের মধ্যে অবস্থাপিত হচ্ছে রূপকথার রাজপুরী। আর সব ছেড়ে দিয়ে ল্যাটিন আমেরিকার ভেনেজুয়েলার কথাই ধরুন না কেন। ঠিক আক্ষরিক অর্থে না হলেও রাতারাতি কি পরিবর্তন! গগনচুম্বী অট্টালিকা, লিমুজীন নৈশ ক্লাব আর স্কচের ছড়াছড়ি।—সমুদ্র সৈকতে তিল ধারণের স্থান নেই দেশ-বিদেশে দেওয়া হয়েছে হাজার হাজার ইয়াটের অর্ডার—আর কত কি! ভেনেজুয়েলা যে হঠাৎ পেয়ে গেল কালো সোনার সন্ধান। আরব্য সহস্র রজনীর গল্পে এই কালো সোনাকেই কি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ বলে কল্পনা করা হয়েছিল? কালো-সোনা —ব্ল্যাক গোল্ড যে ক্রুড বা অপরিশোধিত খনিজ তৈলের নতুন নাম তা বোধহয় আর বলতে হবে না। এতদিন পর্যন্ত একে তরল সোনা— লিকুইড গোল্ডই বলা হত। সম্প্রতি কিন্তু এই নতুন নামেই ডাকা শুরু হয়েছে। নামটা বোধহয় আরও আদরের। তাৎপর্য হল (অপরিশোধিত অবস্থায় কৃষ্ণবর্ণের হলেও পদার্থটি সোনার মতই—বলা যায় সোনার চেয়েও —মূল্যবান। বর্তমানে ওপেক বা পেট্রোল রপ্তানীকারী দেশসমূহের সংস্থা এক ব্যারেল তেলের দাম ১০ ডলারেরও উপর নিয়ে গেছে। তুলনায় বিশ্বের বাজারে সোনার দাম নিশ্চয়ই বেশী। কিন্তু উৎপাদন ব্যয়? উৎপাদন ব্যয়ের আপেক্ষিকতার দিক থেকে বিচার করলে হলদে সোনা কালো সোনার কাছে দাঁড়াতেই পারে না। তা ছাড়া অ্যাডাম স্মিথ যে ব্যবহার মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন এ প্রসঙ্গে তারও উল্লেখ করা যেতে পারে। হলদে সোনার বিনিময় মূল্য তার ব্যবহার-মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী আর কালো সোনার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল ঠিক বিপরীত। কালো সোনার ক্ষেত্রে এই পার্থক্য ঘুচতে চলেছে। উপযোগসম্পন্ন দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলে—অর্থনীতির ভাষায় তার প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পেলে—তাই-ই হয়। এক এক স্থানে বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাম অকল্পনীয়।

এইভাবে যখন ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের পার্থক্য কমতে শুরু করে তখন স্বভাবতই উৎপাদকের মেলে মওকা। ওপেকের ১৩টি দেশের ক্ষেত্রে এই মওকাই মিলেছে—তাদের এখন বৃহস্পতির দশা। মাত্র গত বছরেই (১৯৭৪) এই ১৩টি দেশ পৃথিবীর অবশিষ্টাংশ থেকে ১১২০০ কোটি ডলার উপার্জন করেছে। এত অর্থ নিশ্চয়ই ব্যয় করা সম্ভব নয়। ফলে গত বছরে এই সব দেশের সামগ্রিক অনুকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৬০০০ কোটি ডলার।

আন্তর্জাতিক লেনদেন-উদ্বৃত্তের এই গতি যদি অব্যাহত থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াতে পারে তার একটা হিসেব করেছে লন্ডনের বিখ্যাত 'ইকনমিক' পত্রিকা। হিসেবটা এই রকম: বর্তমান দামে পৃথিবীর বিভিন্ন শেয়ার বাজারে ১৫-৬ বছরের মধ্যে সব কোম্পানীকে ৯-২ বছরের মধ্যে সব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সঞ্চিত সোনা এবং ১-৮ বছরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত বৈদেশিক বিনিয়োগকে ঐ ১৩টি ওপেকভুক্ত দেশ কিনে নিতে সমর্থ হবে।

কিন্তু এই গতি যে অব্যাহত থাকবে না তা তৈল রপ্তানীকারী দেশগুলোও বুঝেছে। কারণ দ্বিবিধ: (ক) দামবৃদ্ধির ফলে তেলের ব্যবহার বা কনজাম্পশন বেশ খানিকটা হ্রাস পেয়েছে (খ) বিভিন্ন দেশ জলেস্থলে নতুন তেলখনির সন্ধানে উঠেপড়ে লেগেছে। এই দ্বিতীয় কারণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সৌদি আরবের তৈলমন্ত্রী (সৌদি আরব বৃহত্তম তৈল উৎপাদক এবং এই দেশের সঞ্চিত তেলের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে পৃথিবীতে সর্বাধিক) ইয়ামানির হিসেব অনুসারে অপরিশোধিত তেলের দাম ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে চাহিদা দশ শতাংশের মত হ্রাস পায়। সুতরাং মোট প্রাপ্তি বা রেভিনিউ-এর পরিমাণ বেশীই হয়। সুতরাং তৈল রপ্তানীকারী দেশগুলোর আশঙ্কা এদিক দিয়ে নয়—আশংকা হল নতুন নতুন উৎসের সন্ধান চলছে এবং পাওয়া যাচ্ছে বলে। আগেকার অর্থাৎ বর্তমান দশকের গোড়ার দিক হলেও এই ধরনের সন্ধানকার্য হয়তো বিশেষ চলত না কারণ বোম্বাই-এর পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রে (বোম্বে হাই) উত্তর সাগরে বা আলাস্কায় তৈল পাওয়া গেলেও ব্যারেল প্রতি ১·৯৯ ডলার আন্তর্জাতিক বাজার দামে উৎপাদন ব্যয় সংকুলান হত না। এখন দাম যখন ব্যারেল প্রতি ১০ ডলারেরও বেশী তখন যে কোন জায়গা থেকেই তৈল উৎপাদন লাভজনক ব্যবসায়ে দাঁড়িয়েছে তা এই লাভ সরকারী কোষাগার বা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর পকেট যেখানেই যাক না কেন।

এই দিক দিয়ে বোম্বাই-এর পশ্চিম উপকূলে পর পর তিনটি তৈল খনির সন্ধান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। ইতিমধ্যেই এই সলিল গর্ভস্থিত খনি থেকে তৈল উৎপাদন কার্য শুরু হয়েছে এবং উৎপাদনের পরিমাণ হল বর্তমানে দৈনিক ২৩০০ ব্যারেল। এছাড়া দৈনিক ২৩৮০০ কিউবিক মিটার করে স্বাভাবিক গ্যাসও আহরণ করা সম্ভব হচ্ছে। আশা করা হয়েছে এই দশকের শেষে এই সমুদ্র গর্ভস্থিত উৎস থেকে বছরে এক কোটি মেট্রিক টনের মত অপরিশোধিত তৈল পাওয়া সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে আসাম ও গুজরাটের খনিসমূহ থেকে উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমান ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ১২০ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়াবে। ফলে মোট উৎপাদন হবে ২ কোটি ২০ লক্ষ মেট্রিক টন। যা আমাদের প্রয়োজনীয়তার সমান। সুতরাং খনিজ তৈলে ভারত স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে।

হিসেবের মধ্যে একটা বড় রকমের ভুল আছে। ১৯৮০ সালের মধ্যে ভারতে তৈল উৎপাদন যদি ২ কোটি ২০ লক্ষ মেট্রিক টনে গিয়ে পৌঁছায় তবুও ভারত কিন্তু স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে না, কারণ ঐ সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টনে গিয়ে দাঁড়াবে। তবে অবস্থার যে অনেক উন্নতি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই দশকের শুরুতে আমাদের তেল আমদানী খাতে ২০০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হত। এখন তার পরিমাণ ১২০০ কোটি টাকাকে ছাড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন দিক দিয়ে এর তাৎপর্য হল: আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঠিকমত কার্যকর করা যাচ্ছে না, দেশের লোককে বঞ্চিত করে চা-চিনি সব চালান হচ্ছে। আমরা ক্রমাগত আন্তর্জাতিক অর্থ-ভান্ডার প্রভৃতি থেকে ঋণ করতে বাধ্য হচ্ছি, ইত্যাদি। এক ধাক্কায় (ঠিক এক ধাক্কায় অবশ্য নয়) ২০০ কোটি টাকা থেকে ১২০০ কোটি টাকা। তুলনায় বোম্বাই উপকূল থেকে তৈল আহরণের জন্য যে কাঠামো বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরী করতে হবে তার ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা বলে ধরা হয়েছে। সুতরাং উঠেপড়ে লাগা উচিত। অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, পেট্রোলিয়াম দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তরিত করা হোক। নচেৎ আমলাতান্ত্রিক টালবাহানার দরুন কাজ অযথা বিলম্বিত হতে বাধ্য।

৩-২-৭৫

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মেয়েদের দলগত বিভাগের কর্বিলন কাপ বিজয়ী চীনের খেলোয়াড়রা হাত তুলে দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন। ছবির বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে—চেং হুয়িং কে সিন-আই চাংলি এবং হু ইউ লান

খেলাধুলা

দর্শক

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

কলকাতা ইডেন উদ্যানে নবনির্মিত নেতাজী সুভাষ ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রজাতন্ত্রী চীন পুরুষ ও মেয়েদের দলগত বিভাগের চ্যাম্পিয়ান হয়ে এশিয়ার মুখোজ্জ্বল করেছে। চীন পুরুষদের দলগত বিভাগের ফাইনালে ৫-৩ খেলায় যুগোশ্লাভিয়া এবং মেয়েদের দলগত বিভাগের ফাইনালে ৩-২ খেলায় গতবারের (১৯৭৩ সালের) চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার একই বছরে সোয়েথলিং এবং কার্বিলন কাপ জয়ের দুর্লভ গৌরব লাভ করেছে। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে একই বছরে সোয়েথলিং এবং কর্বিলন কাপ জয়ী হয়েছে মাত্র এই তিনটি দেশ—জাপান ৪ বার (১৯৫৪ ১৯৫৭, ১৯৫৯ ও ১৯৬৭), প্রজাতন্ত্রী চীন ২ বার (১৯৬৫ ও ১৯৭৫) এবং আমেরিকা একবার (১৯৩৭)।

দুই দলগত বিভাগেরই ফাইনালে চীনা দলে একজন করে অনামী খেলোয়াড় দলভুক্ত হয়েছিলেন—পুরুষ বিভাগে লু ইউয়ান সেং এবং মহিলা বিভাগে কে সিন আই। বিপক্ষ খেলোয়াড়দের ক্রীড়া পদ্ধতি বানচাল করার উদ্দেশ্যেই এইভাবে অনামী খেলোয়াড় দলভুক্ত করা হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, চীনের এই দুই অনামী খেলোয়াড় শেষ পর্যন্ত স্বদেশের জয়লাভের পথে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। পুরুষদের দলগত বিভাগের ফাইনালে ৪র্থ সিঙ্গলস খেলার পর ফলাফল সমান ২-২ দাঁড়ায়। পঞ্চম সিঙ্গলস খেলায় নবাগত চীনা খেলোয়াড় লু ইউয়ান সেং অপ্রত্যাশিতভাবে যুগোশ্লাভিয়ার প্রখ্যাত খেলোয়াড় সুরবেককে পরাজিত করে স্বদেশকে ৩-২ খেলায় এগিয়ে দিয়ে খেলার মোড় স্বদেশের অনুকূলে ঘুরিয়ে দেন। মেয়েদের দলগত বিভাগের ফাইনালে অনামী খেলোয়াড় কে সিন-আই দুটি সিঙ্গলস খেলায় জিতেছিলেন। চারটি খেলার পর খেলার ফলাফল সমান ২-২ দাঁড়ায়। এই অবস্থায় শেষ পঞ্চম খেলায় চীনের নবাগত খেলোয়াড় কে সিন-আই বিশ্বের ২নং খেলোয়াড় লী আইলেসাকে হারিয়ে স্বদেশকে ৩-২ খেলায় জয়যুক্ত করেন।

পুরুষদের দলগত বিভাগের ফাইনালে চীন তিন ঘণ্টার বেশী সময় খেলে ৫-৩ খেলায় যুগোশ্লাভিয়াকে পরাজিত করে। প্রাথমিক লীগের খেলাতেও চীন ৫-২ খেলায় যুগোশ্লাভিয়াকে হারিয়েছিল। এই নিয়ে চীন পুরুষদের দলগত বিভাগের খেলায় সোয়েথলিং কাপ পেল ৫ বার (১৯৬১, ১৯৬৩, ১৯৬৫, ১৯৭১ ও ১৯৭৫)।

মেয়েদের দলগত বিভাগের ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়াকে ৩-২ খেলায় হারাতে চীনের আড়াই ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এই নিয়ে চীন মেয়েদের দলগত বিভাগে কর্বিলন কাপ পেল ২ বার (১৯৬৫ ও ১৯৭৫)। তাছাড়া তারা রানার্স-আপ হয়েছে ৩ বার (১৯৬১, ১৯৭১ ও ১৯৭৩)।

চূড়ান্ত স্থান

(প্রথম চারটি)

সোয়েথলিং কাপ : ১ম চীন, ২য় যুগোশ্লাভিয়া, ৩য় সুইডেন এবং ৪র্থ চেকোশ্লোভাকিয়া।

কর্বিল্লন কাপ : ১ম চীন, ২য় দক্ষিণ কোরিয়া, ৩য় জাপান এবং ৪র্থ হাঙ্গেরী।

দলগত বিভাগে লীগ খেলা

পুরুষ ও মেয়েদের দলগত বিভাগের লীগ পর্যায়ের খেলায় (১নং শ্রেণী—গ্রুপ এ ও বি) যোগদানকারী মোট ১৮টি দেশের মধ্যে ইউরোপের ছিল ১৩টি দেশ এবং এশিয়ার এই পাঁচটি দেশ—চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া।

পুরুষদের দলগত বিভাগের লীগের খেলায় অপরাজিত ছিল—এ গ্রুপে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং বি গ্রুপে চীন। মেয়েদের দলগত বিভাগের লীগের খেলায় অপরাজিত ছিল—এ গ্রুপে দক্ষিণ কোরিয়া এবং বি গ্রুপে চীন। চেকোশ্লোভাকিয়া মেয়েদের দলগত বিভাগে ৪র্থ স্থান এবং দক্ষিণ কোরিয়া পুরুষদের দলগত বিভাগে ৫ম স্থান পেয়েছিল। একমাত্র চীনই উভয় বিভাগের লীগের খেলায় অপরাজিত থেকে শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালের ৩২তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় চীন পুরুষ ও মেয়েদের দলগত বিভাগে রানার্স-আপ হয়েছিল।

জাপান এবারের প্রতিযোগিতায় তার পূর্ব সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেনি। লীগের খেলায় পুরুষদের দলগত বিভাগে ৪র্থ স্থান (জয় ৪ ও পরাজয় ৩) এবং মেয়েদের দলগত বিভাগে ২য় স্থান (জয় ৬ ও পরাজয় ১) পেয়েছে। ১৯৭৩ সালের প্রতিযোগিতায় জাপান উভয় বিভাগেই তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। গত দুবারের (১৯৭১ ও ১৯৭৩) প্রতিযোগিতায় জাপান মাত্র দুটি খেতাব পেয়েছে—১৯৭১ সালে মেয়েদের দলগত বিভাগের পুরস্কার কর্বিল্লন কাপ এবং ১৯৭৩ সালে মেয়েদের ডাবলস খেতাব (রুমানিয়ার সঙ্গে)। ১৯৫২ সালে বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করে ১৪টি আসর থেকে জাপান এ পর্যন্ত ৪৫টি খেতাব জয়ী হয়েছে—পুরুষদের দলগত বিভাগে ৭, মেয়েদের দলগত বিভাগে ৮, পুরুষদের সিঙ্গলসে ৭, মেয়েদের সিঙ্গলসে ৭, পুরুষদের ডাবলসে ৪, মেয়েদের ডাবলসে ৫ এবং মিকসড ডাবলসে ৭। আজ জাপানের খেলায় দারুন ভাটা পড়েছে। জাপানের সেদিন আর নেই।

সেমি-ফাইনাল

পুরুষদের দলগত বিভাগের সেমি-ফাইনাল খেলায় গতবারের রানার্স-আপ চীন ৫—২ খেলায় গতবারের (১৯৭৩ সালের) বিজয়ী সুইডেনকে পরাজিত করে এবং যুগোশ্লাভিয়া ৫—৩ খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে।

মেয়েদের দলগত বিভাগের সেমি-ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়া ৩—০ খেলায় জাপানকে এবং গতবারের রানার্স-আপ চীন ৩—০ খেলায় হাঙ্গেরীকে পরাজিত করে ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

দক্ষিণ কোরিয়ার খ্যাতনামা খেলোয়াড় লী আয়লেসা। ইনি মেয়েদের দলগত কর্বিল্লন কাপের ফাইনালের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ৫ম খেলায় অপ্রত্যাশিতভাবে চীনের অনামী খেলোয়াড় কে সিন-আইয়ের কাছে হেরে যান। ফাইনালে চীন ৩-২ খেলায় দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে।
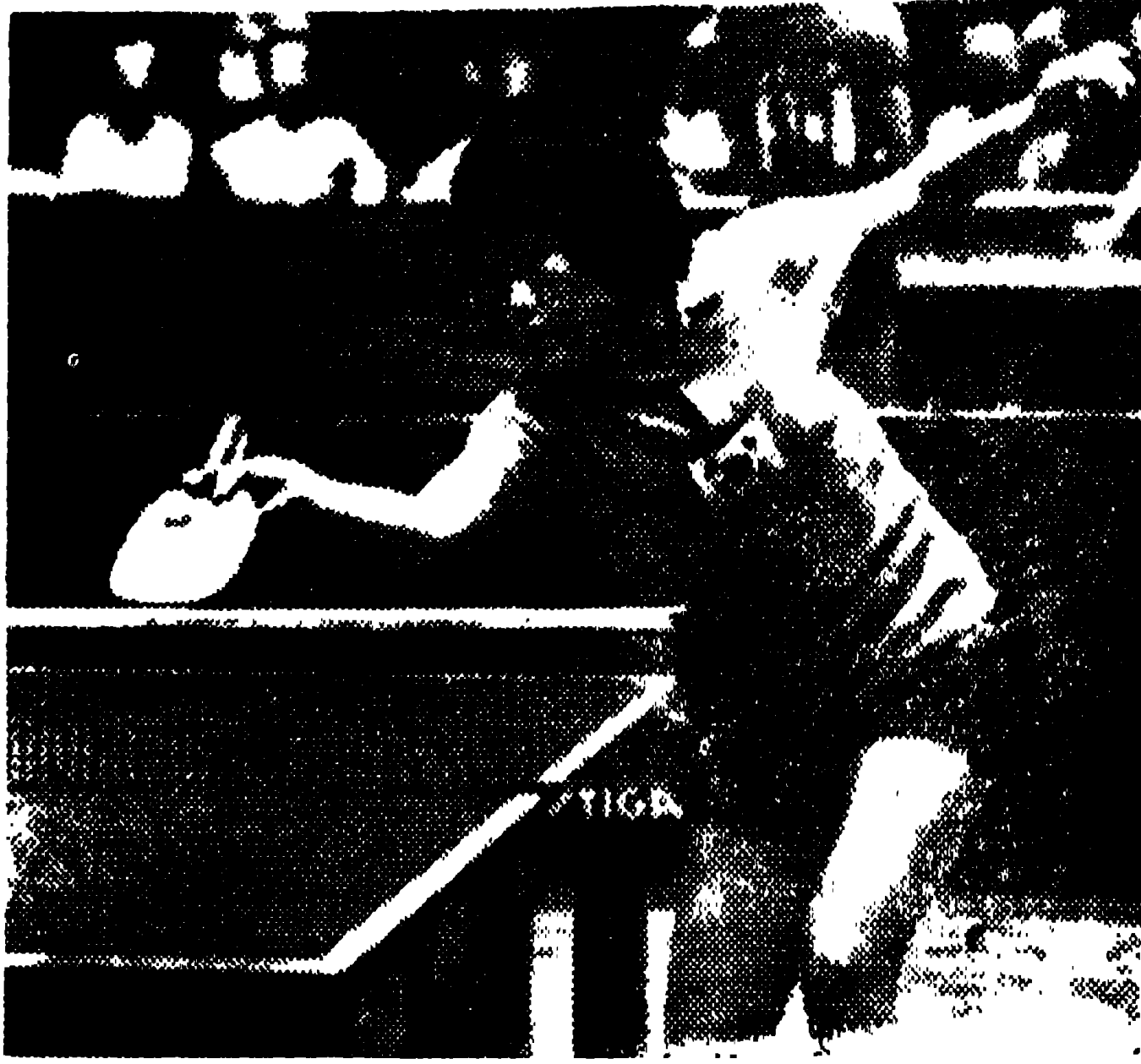
পুরুষ ও মেয়েদের দলগত বিভাগের চারটি গ্রুপ থেকে এই ৮টি দেশ লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হওয়ার সুবাদে সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল—পুরুষদের দলগত বিভাগের এ গ্রুপ থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া ও সুইডেন এবং বি গ্রুপ থেকে চীন ও যুগোশ্লাভিয়া। মেয়েদের দলগত বিভাগের এ গ্রুপ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া ও হাঙ্গেরী এবং বি গ্রুপ থেকে চীন ও জাপান।

ভারতের শোচনীয় ব্যর্থতা

পুরুষ ও মেয়েদের দলগত বিভাগের লীগের খেলায় ভারত প্রতিটি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের কাছে হেরেছে।

পুরুষদের দলগত বিভাগে ভারত সাতটি দেশের বিপক্ষে খেলে লীগ খেলার চূড়ান্ত তালিকায় সর্বনিম্ন স্থান পায়। ভারতকে পরাজিত করে চীন ৫—১, জাপান ৫—১, যুগোশ্লাভিয়া ৫—০, হাঙ্গেরী ৫—১, ইংল্যান্ড ৫—০ এবং ইন্দোনেশিয়া ৫—৪ খেলায়। ভারতের পক্ষে খেলায় জয়ী হন নীরাজ বাজাজ ৪টি (বিপক্ষে চীন, জাপান, হাঙ্গেরী এবং ইন্দোনেশিয়া), জগন্নাথ ২টি (বিপক্ষে ইন্দোনেশিয়া) এবং মেনন ১টি (বিপক্ষে ইন্দোনেশিয়া)।

মেয়েদের দলগত বিভাগে সর্বনিম্ন স্থান অধিকারী ভারতকে পরাজিত করে গতবারের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়া ৩—০, হাঙ্গেরী ৩—০, রাশিয়া ৩—০, চেকোশ্লোভাকিয়া ৩—১, সুইডেন ৩—০, ফ্রান্স ৩—০ এবং ইন্দোনেশিয়া ৩—২ খেলায়। ভারতের পক্ষে খেলায় জয়ী হন শৈলজা সালোখে ২টি (বিপক্ষে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া) এবং পি ভাটশালী (বিপক্ষে ইন্দোনেশিয়া)।

১৯৭৩ সালের ৩২তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারত পুরুষ বিভাগে ১৪শ এবং মহিলা বিভাগে ১৭শ স্থান পেয়েছিল। এই ফলাফলের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস আসরে দ্বিতীয় সারির দল। সংগঠক দেশ হিসাবেই ভারত কলকাতার ৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার দলগত বিভাগে প্রথম শ্রেণীর দলগুলির সঙ্গে খেলবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল, কিন্তু ভারত সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। আগামীবার প্রথম শ্রেণীর দেশগুলির সঙ্গে ভারত খেলতে পারবে না।

লীগ পর্যায়ের খেলা

সোয়েথলিং কাপ

১নং শ্রেণী—গ্রুপ এ

চূড়ান্ত তালিকা

দেশ	জয়	হার
চেকোশ্লোভাকিয়া	৭	০
সুইডেন	৬	১
রাশিয়া	৫	২
পশ্চিম জার্মানী	৪	৩
দক্ষিণ কোরিয়া	৩	৪
ফ্রান্স	২	৫
ডেনমার্ক	১	৬
অস্ট্রিয়া	০	৭

১নং শ্রেণী—গ্রুপ বি

দেশ	জয়	হার
চীন	৭	০
যুগোশ্লাভিয়া	৬	১
হাঙ্গেরী	৫	২
জাপান	৪	৩
ইংল্যান্ড	৩	৪
রুমানিয়া	২	৫
ইন্দোনেশিয়া	১	৬
ভারত	০	৭

মেয়েদের দলগত কার্বিলন কাপের ফাইনাল : চীনের কে সিন-আই এবং হু ইউ লান বনাম দক্ষিণ কোরিয়ার লী আয়লেসা এবং চাং হুন সুক

করবিলন কাপ
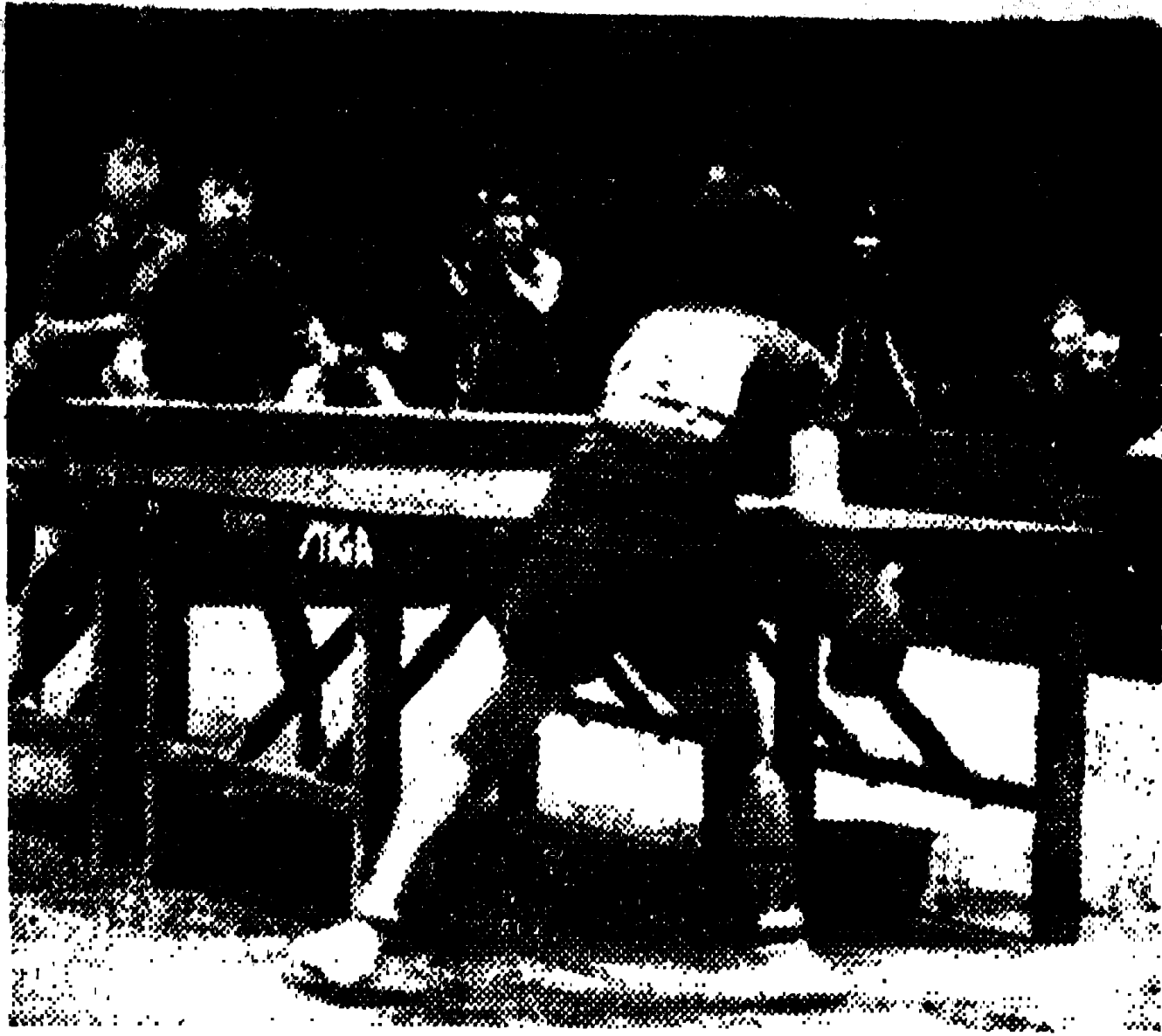
১নং শ্রেণী—গ্রুপ এ

দেশ	জয়	হার
দক্ষিণ কোরিয়া	৭	০
হাঙ্গেরী	৬	১
রাশিয়া	৫	২
চেকোশ্লোভাকিয়া	৪	৩
ফ্রান্স	৩	৪
সুইডেন	২	৫
ইন্দোনেশিয়া	১	৬
ভারত	০	৭

১নং শ্রেণী—গ্রুপ বি

দেশ	জয়	হার
চীন	৭	০
জাপান	৬	১
ইংল্যান্ড	৪	৩
যুগোশ্লাভিয়া	৪	৩
পশ্চিম জার্মানী	৩	৪
রুমানিয়া	২	৫
বুলগেরিয়া	১	৬
পোল্যান্ড	১	৬

কমনওয়েলথ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে আয়োজিত তৃতীয় কমনওয়েলথ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় আগের দু'বারের মত এবারও ইংল্যান্ড পুরুষ ও মেয়েদের দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ইংল্যান্ড পুরুষদের দলগত বিভাগের ফাইনালে ৫—১ খেলায় অস্ট্রেলিয়া এবং মেয়েদের দলগত বিভাগের ফাইনালে ৩—০ খেলায় কানাডাকে পরাজিত করে। এ ছাড়া ইংল্যান্ড ব্যক্তিগত বিভাগের পাঁচটি খেতাব জয়ী হয়ে প্রতিযোগিতার সমস্ত খেতাব (মোট সাত) জয়ের সূত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষদের সিংগলস : ট্রেভর টেলর (ইংল্যান্ড) ২০—২২ ২১—১২, ২১—১৪ ও ২১—১৫ পয়েন্টে স্টিফেন ন্যাপকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করে।

মেয়েদের সিংগলস : কুমারী জিল হ্যামার্সলে (ইংল্যান্ড) ২১—১৬, ১৯—২১ ২১—১৯ ও ২১—১৫ পয়েন্টে কুমারী লিন্ডা হাওয়ার্ডকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করে উপর্যুপরি তিনবার খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেন।

পুরুষদের ডাবলসে ডেসমন্ড ডগলাস এবং ডেনিস নীল, মেয়েদের ডাবলসে কুমারী জিল হ্যামার্সলে এবং লিন্ডা হাওয়ার্ড এবং মিকসড ডাবলসে লিন্ডা হাওয়ার্ড এবং ডেসমন্ড ডগলাস খেতাব জয়ী হন।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত

প্রথম মহিলা টেস্ট ক্রিকেট

পুনার নেহরু স্টেডিয়ামে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সরকারী মহিলা টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। ভারতীয় টেস্ট দলে বাংলা থেকে এই চারজন স্থান পেয়েছিলেন।

প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসের ৭টা উইকেট খুইয়ে ১৯৭ রান সংগ্রহ করেছিল। লিনেট স্মিথ মাত্র ৩ রানের জন্যে সেঞ্চুরী থেকে বঞ্চিত হন।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ২৩১ রানের মাথায় শেষ হলে বাকি সময়ের খেলায় ভারত ১ম ইনিংসের ৮টা উইকেট খুইয়ে ১০৮ রান তুলেছিল।

তৃতীয় দিনে ভারতের ১ম ইনিংস ১৪৬ রানের মাথায় শেষ হয় এবং অস্ট্রেলিয়া ২ ইনিংসের ১২৬ রানের মাথায় (৪ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারতের ৮৮ রানের মাথায় (৩ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ২৩১ রান (লিনেট স্মিথ ৯৭ রান। ডায়না এডুলজি ৪০ রানে ৬ এবং উজ্জ্বলা নিকাস ৪২ রানে ৩ উইকেট)

ও ১২৬ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। লিনেট স্মিথ নট আউট ৫২ রান। এডুলজি ৪৬ রানে ২, রুনা বসু ১৮ রানে ১ এবং শর্মিলা চক্রবর্তী ২২ রানে ১ উইকেট)

ভারত : ১৪৬ রান (ডায়না এডুলজি নট আউট ৪৮ রান। হোয়াইট ২২ রানে ৩ উইকেট)

ও ৮৮ রান (৩ উইকেটে। সুধা শা ৩৯ রান। সুশান চ্যাপম্যান ৩ রানে ২ উইকেট)।

ডেভিস কাপ

লক্ষ্ণৌতে ১৯৭৫ সালের ডেভিস কাপ আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে নিউজিল্যান্ড ৩—১ খেলায় ভারতকে পরাজিত করে পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে উঠেছে। এখানে উল্লেখ্য গত বছর ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা মূল প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছিল। কিন্তু ক্রীড়াক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির প্রতিবাদে ভারত ফাইনালে অংশ গ্রহণ করেনি।

প্রথম দিনে নিউজিল্যান্ডের এক নম্বর খেলোয়াড় ওনি পারুণ ৪—৬, ৬—২, ১০—১২, ৬—৩ এবং ৬—৪ গেমে বিজয় অমৃতরাজকে পরাজিত করেন। আনন্দ অমৃতরাজ বনাম ব্রায়ান ফেয়ারলির দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলাটি আলোর অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। আনন্দ এই সময় ৬—৩, ৮—৬ ও ৭—৯ গেমে এগিয়ে ছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ব্রায়ান ফেয়ারলি ৩—৬, ৬—৮, ৯—৭, ৬—৪ ও ৭—৫ গেমে আনন্দ অমৃতরাজকে পরাজিত করেন এবং ডাবলসে বিজয় ও আনন্দ অমৃতরাজ ১৩—১১, ৬—৪, ৪—৬ ও ৬—৪ গেমে ওনি পারুণ ও ব্রায়ান ফেয়ারলিকে পরাজিত করেন। ফলে নিউজিল্যান্ড ২—১ খেলায় এগিয়ে যায়।

তৃতীয় দিনে ওনি পারুণ ৫—৭, ৬—৪, ৬—৩, ৬—৮ ও ৬—২ গেমে আনন্দ অমৃতরাজকে পরাজিত করলে নিউজিল্যান্ড পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। বিজয় অমৃতরাজ বনাম ফেয়ারলির শেষ সিঙ্গলস খেলাটি দর্শকদের হস্তক্ষেপে পরিত্যক্ত হয়।

সি কে নাইডু ট্রফি

কলকাতার ইডেন স্টেডিয়ামে 'সি কে নাইডু ট্রফির' ফাইনালে বাংলা প্রথম ইনিংসে বেশী রান করার সুবাদে গত বছরের বিজয়ী পাঞ্জাবকে হারিয়ে পাঁচ বছর বাদে সি কে নাইডু ট্রফি জয়ী হয়েছে।

খেলার জগতে মেয়ে

ছাত্রীদলের নেত্রী সিক্তা গোস্বামী

গতবার কালিকটে আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের এথলেটিক প্রতিযোগিতায় কলকাতা দলের অধিনেত্রী হয়েছিল শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের সিক্তা গোস্বামী। সিক্তা ঐ আসরে দশমিটার দৌড় দীর্ঘ লম্ফন এবং হার্ডেলে স্বর্ণ পদক বিজয়িণী হলেও একশ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদকের অধিকারিণী হয়।

শুনে একটু অবাক লাগল। একশ মিটারে এরকম হল কেন? নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলে নাকী?

—না না। নার্ভাস আমি কোন সময়েই হই না। তবে কি জানেন অতগুলো বিভাগে পর পর যোগ দিয়ে বেশ খানিকটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তাই দ্বিতীয় দিনে একশ মিটার দৌড়ে ভাল করে উৎরোতে পারলাম না।

শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে সিক্তার সংগে দেখা করলুম এক বিকেলে ওর অনুশীলনের সময় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে।

কথায় কথায় ওর স্কুলজীবনের খেলা-ধুলোর কথাও উঠলো। সিক্তা বললে আমার বাবার বদলীর চাকরী তাই প্রথমে কলকাতার সেন্টমেরীজ কনভেন্টে পড়াশোনা আরম্ভ করলেও আমি বাড়ীর সংগে দুর্গাপুরে যাই। ওখানেই ভালভাবে দৌড়ঝাঁপ করার সুযোগ পাই। ১৯৭০ সালে আমি প্রথম ত্রিবান্দ্রমে জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় দীর্ঘ লম্ফন বিভাগে বাংলা স্কুলের হয়ে নামার সুযোগ পাই। পরের বছর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার অজুহাতে পাকিস্তান ভারতের সংগে লড়াই সুরু করে দেওয়ায় দেশে জরুরী অবস্থা সৃষ্টি হল। ফলে জাতীয় স্কুল ক্রীড়া স্থগিত হয়ে গেল। আমার ভাগ্যেও এবার স্কুলক্রীড়ার বাংলার প্রতিনিধিত্ব করা হল না। সত্যি যুদ্ধের মত বদ জিনিস আর কিছু নেই। সব ভাল কাজে বিঘ্ন আনে এই যুদ্ধ।

যাই হোক পরের বছর অর্থাৎ ৭২-এ সিক্তা দুর্গাপুরে বহুমুখী বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে এল কলকাতায়। ভর্তি হল শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজে।

শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের ক্রীড়াবিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা সবিতা বসু এবং ঐ কলেজের উপাধ্যক্ষও আমাকে বলেছিলেন, আমাদের কলেজের এই মেয়েটি খেলাধুলায় যেমন ভাল পড়াশোনাতেও তেমনি। খুবই সিরিয়াস ছাত্রী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পড়ছে—এখন পার্ট ওয়ান শেষ করেছে।

সিক্তার খেলার কথা যা বলছিলাম—৭২-এ বাটানগরে আয়োজিত রাজ্য প্রতি-যোগিতায় ও শত মিটার এবং দীর্ঘ লম্ফনে সাফল্যের ফলে কোট্টায়ামে জাতীয় স্কুল-ক্রীড়ায় বাংলাদলে স্থান পায়। সেবার দীর্ঘ-লম্ফনে ব্রোঞ্জ পেয়েছিল। ঐ বছরই আন্তঃ কলেজ ক্রীড়ায় একশ, দুশ মিটার দৌড় দীর্ঘলম্ফন ও হার্ডলসে সাফল্য অর্জন করে।

'৭৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের হয়ে সিক্তাও বারাণসী গিয়েছিল। কিন্তু কলকাতা দলের এমনি কপাল আনুষ্ঠানিক-ভাবে নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিযোগিতায় যোগ-দানের আবেদন পাঠানো হয়নি এই অভি-যোগে কলকাতা দলকে উদ্যোক্তারা ঐ আসরে যোগ দিতেই দেয়নি। কথা শুনে হঠাৎ বলে ফেললাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সবেতেই করিৎকর্মা বটে! তবে ৭৩-এ সিক্তা আন্তঃ কলেজ এথলেটিকসে ব্যক্তিগত বিজয়িণী আখ্যা জয় করে। প্রধানতঃ ওরই সাফল্যের

সিক্তা গোস্বামী

মূলধনে শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়।

গত বছরও সিক্তা আন্তঃ কলেজ এথলেটিকে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়। ওর কলেজও চ্যাম্পিয়ান খ্যাতি অক্ষুন্ন রাখে। তারপর কালিকটে যায় কলকাতার শাস্ত্রী দলের অধিনেত্রী হয়ে—সেকথা গোড়াতেই বলেছি।

কলেজের মেয়েদের ক্রীড়ামান সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে সিক্তা বললে এখন অনেক মেয়েই এথলেটিক আসরে নামে। আগে কিন্তু এমন ছিল না। পূর্ব রেলের শ্রীরূপার বোন শ্রীলতা চাটার্জীর সেন্ট এন্ড্রুজ কলেজ স্বরূপ পাল্লার দৌড়ের ও খুব প্রশংসা করলো আর দীর্ঘলম্ফনে ত্রিপুরার সাবিত্রী সুরের। ওরা দুজনেই গতবার আন্তঃ কলেজ আসরে যথাক্রমে একশ,

মিটার ও দীর্ঘলম্ফনে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

সিল্ভার বাবা শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী এখন দুর্গাপুরে হিন্দুস্থান স্টীলের এক শাখার পারচেজিং অফিসার।

—বাবা চান আমি খেলাধুলার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনাতেও সফল হই। মা অবশ্য আমায় খেলাধুলার দিকে খুবই উৎসাহ দেন। বাবা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দলের নিয়মিত খেলোয়াড়। আমাদের পৈত্রিক বাসভূমি বিক্রমপুরে। তবে দেশভাগের পর আমার বাবা-মা সবাই এদেশে চলে আসেন। আমি জন্মেছি কলকাতায়। আমরা দু বোন এক ভাই।

—তুমি নিশ্চয়ই মেয়েদের খেলাধুলার সুবিধা-অসুবিধার কথাও চিন্তা কর?

—হ্যাঁ তা কিছু কিছু করি। এই দেখুন না এখন মেয়েদের এথলেটিক প্রতিযোগিতার সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেশী মাত্রায় বেড়েছে তো? আর অনেক বেশী মেয়ে এসব আসরে যোগ দিতেও আসে। কিন্তু কজন টিকে থাকে বলুন?

—কারণটা কি মনে হয়

—এথলেটিকে সাফল্য অর্জন করতে হলে যতখানি মানসিক দৃঢ়তা আর ধৈর্য নিয়ে অনুশীলন করা উচিত এরা ততখানি খাটতে পারে না। কিছু অনুশীলন করেই ছেড়ে দেয়। আরও কারণ আছে আমরা অধিকাংশই আসছি সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসার থেকে। একজন এথলীটের পুরো সময় অনুশীলন করতে যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয় সেই অনুপাতে খাদ্য না পেলে এদের শরীর তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। চাই কি কারও কারও কঠিন অসুখ পর্যন্ত হয়ে যায়। এ বিষয়ে ক্রীড়া বিভাগের কর্মকর্তা এবং সরকারী ক্রীড়া বিভাগেরও কিছু করণীয় আছে? তাই নয় কি?

—হ্যাঁ এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে সবাই একমত হবেন। এছাড়া আর কোন কারণ তোমার নজরে পড়ে?

—হ্যাঁ। আর একটা হল মেয়ে এথলীটদের অনুশীলনের উপযুক্ত জায়গা পরিবেশ আর সাজ-সরঞ্জাম কলকাতায় এসবের খুব অভাব। তার ওপর মেয়েদের খেলাধুলোকে সাধারণ লোকে এবং অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও একটা কৌতুক বা মজার ব্যাপার বলে মনে করেন। এখনও এদেশে মেয়ে ক্রিকেটার এথলীট বা অন্য খেলোয়াড়কে কেউ স্বাভাবিক চোখে সম্ভবতঃ দেখেন না। বহু লোকের বহু রকম টিকাটিপ্পনী আমাদের কানে আসে। তাতে যাদের মর্ম স্পর্শ করে তারা খেলাধুলার আসন থেকে সরে দাঁড়ায়। আর সে সব কথা যারা কানেই তোলে না তারাই রয়ে যায় খেলার মাঠে ব্যাডমিন্টন টেনিস কাবাডি ক্রিকেটের আসরে। তাই আমার মনে হয় মেয়েদের খেলাধুলার উন্নতির প্রভূত সুযোগ রয়েছে। সুযোগ রয়েছে আমাদের খেলাধুলোকে সঠিক স্বাভাবিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার।

—কথাগুলি ভাববার মত। আমি এসব প্রকাশ করবো যাতে সংশ্লিষ্ট সবাই অবহিত হতে পারেন।

—হ্যাঁ বলবেন আমার কথা। বিশেষভাবে বলবেন পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের মেয়েদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের দেশের মেয়েদেরও খেলাধুলায় বিশেষ করে এথলেটিক ক্রীড়ায় নানা রকম সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যবস্থা করতে হবে। করতে হবে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা ঢালাও অনুশীলনের আয়োজন, শহরে গ্রামে আরও ক্রীড়াকেন্দ্র ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসরও চাই। এসব না হলে ৫৬ কোটির এই স্বাধীন দেশ কি করে সুনাম অর্জন করবে?

—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি প্রায়ই দুর্গাপুরে গিয়ে অনুশীলন কর কেন?

—কারণ কলকাতার চেয়ে ওখানে এথলেটিকসে অনুশীলন করা অনেক বেশী সুবিধাজনক। ওখানে আমি নেহরু স্টেডিয়ামে জাতীয় প্রশিক্ষক শিশুতোষ মুখার্জীর উপদেশ নির্দেশ নিতে পারি। উনি ওখানে নিয়মিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে এথলেটিক প্রশিক্ষণ দেন। শ্রীমুখার্জী এন আই এস-এর শিক্ষণ প্রাপ্ত। আমি ওখানে স্কুলে থাকাকালেই ওঁর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিই। বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণের কল্যাণে আমার দৌড় ও দীর্ঘ লাফে অনেক উন্নতি হয়েছে।

—ক্রীড়ামান বাড়াতে হলে কি পদ্ধতি নেওয়া উচিত বলে তোমার মনে হয়?

—এর আগে অনেকে যা বলেছে আমি সেই কথারই পুনরুক্তি করব। স্কুলের পর্যায় থেকেই—কি শহরে কি গ্রামে—সর্বত্র এথলেটিক প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুলে স্কুলে নিয়মিত ক্রীড়া প্রশিক্ষক রেখে ছাত্রীদের মধ্যে দৌড়-ঝাঁপের প্রতি আগ্রহ জাগাতে হবে। নানা প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে হবে ওদের জন্য। ওদের উৎসাহ দিতে হবে যোগদানের জন্য। তাহলেই দেখবেন সম্ভাবনাময় এথলীটের দেখা পাওয়া যাবে। এ কাজে আলসেমী বা কার্পণ্য করলে কোন সুফল হবে না। অনুশীলনের সময় ওদের উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা স্কুলেরই করা উচিত—সরকারও ভর্তুকী দিতে পারেন। উন্নতি করতে হলে সেই যে বলে—'ক্যাচ দেম ইয়ং।'

—ভাল কথা। সত্যিই মনের রাখবার মত। আচ্ছা ভবিষ্যতে তোমার কি করার ইচ্ছে?

—গ্র্যাজুয়েট হয়ে চাকরী করার আর এথলেটিক চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। এথলেটিকস দল আছে এরকম অফিসে কাজ পেলে অবশ্য সুবিধা হয়।

—প্রার্থনা করি তোমার ইচ্ছা পূরণ হোক।

—অমল

দেশবিদেশের খেলা

নবযুগের প্রবর্তক

পূর্ব জার্মানীর জেনা শহরের ছোট্ট একটি ছেলে দাদার হাত ধরে গুটি গুটি পায়ে এসে ভর্তি হল স্কুলে। বেশ কয়েক বছরেও পড়াশুনা খেলাধুলা কোনটাতেই নিজেকে মানানসই করে নিতে পারলো না। স্কুলের খেলাধুলোয় ব্যর্থতা তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। কারণ সহপাঠীদের কাছে লজ্জা। বাড়ীতে খেলাধুলোর পরিবেশে বেমানান। বড় দু দাদা রীতিমত নাম-করা দৌড়বীর। তাদের কাছ থেকেও কথা শুনতে হত অনেক সময়। বাবা জাহাজের নাবিক। তার অধিকাংশ সময় কাটতো জলে জলে। তিনিও যখন বাড়ীতে থাকতেন তখন এই ছেলেটিকে খেলাধুলোয় এগিয়ে যেতে উৎসাহ দিতেন বটে কিন্তু বাড়তি অনুপ্রেরণা এসেছিল দুই বড় অ্যাথলীট দাদার কাছ থেকে।

খেলাধুলোর নানান বিভাগ পরিক্রমা করে ছেলেটির স্থির অনুরাগ জন্মায় পোলভল্টের প্রতি। পোলভল্টের অনুশীলনেই নিজের নিষ্ঠা আন্তরিকভাবে কেন্দ্রীভূত করে। এবং ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন স্পোর্টসে পোলভল্ট প্রথম

উলফ গ্যাং নর উইক

হয়ে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে গভীর আত্মপ্রত্যয়ে।

পূর্ব জার্মানীর সব কটি অ্যাথলেটিকসের আসরে পোলভল্টে সেরা হয়ে পরিশেষে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরবও অর্জন করে অনায়াসে। পরে স্বচ্ছন্দে লাভ করে ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের আখ্যা। আর ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিকে ৫-৪০ মিটার লাফিয়ে তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জপদক পায়। সেদিন দূর-দর্শী বিশেষজ্ঞরা ও বিচক্ষণ সাংবাদিকেরা ছেলেটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কুঞ্চিতকপালে প্রমাদ গুনেছিলেন। এক ব্রিটিশ সাংবাদিক ছেলেটিকে 'মিউনিখ অলিম্পিকের নতুন আলো' বলে অভিহিত করেছিলেন।

সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত ঐ সাংবাদিকের মন্তব্য মিথ্যে কুহেলিকায় ঢাকা প্রহসনে পর্য-বসিত হয়নি। মিউনিখ অলিম্পিকে সত্যি সত্যি প্রথম হয়ে ছেলেটি সোনার পদক জয় করে। সর্বজনপরিচিত এই ছেলেটির নাম উলফগ্যাং নরডউইক।

নরডউইক পোলভল্টিং-এ নবযুগের প্রবর্তক। তিনিই প্রথম অলিম্পিক প্রতি-যোগিতার পোলভল্টে দীর্ঘকালের নিরঙ্কুশ আমেরিকান আধিপত্যকে ধরার ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে এথেন্স থেকে মেক্সিকো পর্যন্ত পনেরটি অলিম্পিকের অনুষ্ঠানের সবকটিতেই আমেরিকার সহজ-সুলভ প্রাধান্য বজায় ছিল। মিউনিখ অলি-ম্পিকেই আমেরিকা প্রথম পোলভল্টে তার শীর্ষাসন হারায়।

মিউনিখে নরডউইকের প্রধান প্রতিযোগী ছিল পোলভল্টে বিশ্বরেকর্ডধারী ও মেক্সিকো অলিম্পিকে সেরা বব সিগ্রেন। প্রতিযোগিতার প্রারম্ভে মনে হয়েছিল উভয়ের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলবে। বলে রাখা ভাল মিউনিখ অলিম্পিকের প্রাক মুহূর্তে সিগ্রেন ৫-৬৩ মিটার লাফিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েন। মিউনিখে কিন্তু সিগ্রেন ব্যক্তিগত পোল ব্যবহারে বঞ্চিত হয়ে ৫-৪০ মিটারের অধিক লাফাতে সক্ষম হননি। প্রসংগত স্মরণ করা যেতে পারে নরডউইক ৫-৪০ মিটার অতিক্রম করেছেন ছ'বার অনেক আগে অ্যাথলেটিক জীবনের সূচনায়। চারবার ৫-৪০ মিটার। এই দূরত্ব অতিক্রম করে মেক্সিকো অলি-ম্পিকে তৃতীয় স্থানাধিকারী হন। আর ১৯৭০ সালে একবার ৫-৪৬ মিটার ও ৫-৪৫ মিটার কৃতিত্বের সঙ্গে [illegible] উর্ধ্বারোহন করা [illegible]

আগে নরডউইক সত্তের বার ৫-৩০ মিটার ও ছিয়ানব্বইবার ৫-০০ মিটারের ওপর লাফিয়েছেন। আর মিউনিখ অলিম্পিকে ৫-৫০ মিটার লাফিয়ে চ্যাম্পিয়ন। তৃতীয় হন আমেরিকার জন জনসন ৫-৩৫ মিটার লাফিয়ে। নরডউইক প্রায় সত্তের বারের ওপর ৫-৩৫ মিটার লাফিয়েছেন। বিশ্ব রেকর্ডের খুব কাছাকাছি না গেলেও পূর্ব জার্মানীর অসাধারণ ছেলে উলফগ্যাং নরডউইকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব দীর্ঘ সূত্রের মত অবি-চ্ছেদ্য মার্কিন আধিপত্যকে পোলভল্টের জগৎ থেকে মুছে দেওয়া।

উচ্চলম্ফনে বহু কীর্তির অধিকারী দক্ষ কারিগর উলফগ্যাং নরডউইক একজন ইঞ্জি-নীয়ার। ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমাধারী নরড-উইকের মাঠের বাইরের জীবন কাটে তার পড়াশুনোর নানান বিষয় সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে। অপরদিকে পদার্থ বিদ্যার ছাত্র নরডউইক তাঁর লব্ধ জ্ঞানকে প্রয়োগ করেছেন ক্রীড়াগত কুশলতা বৃদ্ধির কাজে। যার অনেকটা ফলশ্রুতির পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর অসাধারণ সাফল্যের অন্তরালে।

শান্ত আলাপী স্বভাবের নরডউইক পরিচিতদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। সকলের সঙ্গে হেসে আলাপ করা নরডউইকের চরিত্রের একটি মূল্যবান অলঙ্কার বলা যায়। এমনকি দর্শকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক একই রকম। দীর্ঘ অনুশীলনের পর ক্লান্ত পায়ে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী ও প্রাণচঞ্চল শিশু-পুত্রের হাত ধরে পথ পরিক্রমা প্রাত্যহিক জীবনের একটি প্রধান অংগ। নরডউইক আনন্দ ও প্রাণপ্রাচুর্যে ঐশ্বর্যবান পুরুষ। তাই কি মাঠে কি সংসারের কাজে সর্বত্রই এক অনাবিল অপরিসীম আনন্দলোকে ভাসমান।

—প্রশান্ত দাঁ

প্রেক্ষাগৃহ

রফু চক্কর

প্রযোজনা : এম. আই. ফিল্মস প্রাঃ লিঃ

বিদেশী ছবির কাহিনীভিত্তিক একটি উপভোগ্য হিন্দী ছবি

সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও এক মহিয়সী মহিলাকে দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হয়েছে কুচক্রী স্বামীর জন্যে। শেষ পর্যন্ত অসামাজিক স্বামীর কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে এবং তার স্বামীর প্রভাব যাতে ছেলের উপর না পড়ে, সেই জন্যে একমাত্র ছেলে 'দেব'কে নিয়ে তাঁর এক মুসলমান বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে ক্রমে দুই বন্ধু দেব ও সেলিম, তাদের স্কুল ও কলেজের শিক্ষা শেষ করে সংগীতেরও তালিম নিতে লাগলো।

'রণজিত' নামে একজন কুচক্রীর হাতে এক অসহায় ব্যক্তির নিহত হওয়ার দৃশ্য দেখে দুই বন্ধু—ওদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ভুল করে মেয়েদের কামরায় ঢুকে পড়ে মেয়েদের দলে মিশে যায়, দেবী সালমা নামে মেয়ে সেজে ওরা গানের দলের সংগে মিশে গেল। সেই মেয়ে দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন 'নিতু' নামে এক তন্বী তরুণী। সেই শুরু। ধীরে ধীরে সংগীতের মধ্যে দিয়েই ওরা মন দেওয়া-নেওয়ার পালা চালিয়ে যেতে লাগলো। নিতু ও ভালবাসার কাঙাল ছিল। কাশ্মীরে যেখানে দুই বন্ধু ও নিতু এবং ওর বন্ধুরা আস্তানা নিয়েছিল, সেখানে হঠাৎ একদিন কুচক্রী 'প্রকাশ' এসে উপস্থিত হলো এবং আবিষ্কার করলে দুই তরুণীর ছদ্মবেশে 'দেবী' ও 'সেলিম'কে। দলের সর্দারের পরামর্শে ওরা দুই বন্ধু এবং 'নিতু'কে বন্দী করে রাখলো। 'দেবে'র মাকেও সেখানে নিয়ে এল ওরা ছেলের শাস্তি স্বচক্ষে দেখবার জন্যে। সেখানেই দেবের মা রণজিৎরূপী স্বামীকে চিনতে পারলেন। উনিও তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে দেব ও তাঁর প্রণয়ী নিতু এবং স্ত্রী-কে আপন করে নিলেন।

এ-ছবির অন্যতম সম্পদ অভিনয়, সংগীত ও কলাকৌশলের কাজ। অভিনয়ে : দেব (ঋষিকাপুর), সেলিম (আসমানী), নীতু (নীতু সিং), দেবের মা (সুলোচনা), সেলিমের মা (মমতাজ বেগম) ও কুচক্রীদের ভূমিকায় মদনপুরী, কে এন সিং, আনোয়ার হুসেন ছবির চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে রাজেন্দ্রনাথ, পেন্টাল, ভগবান, মনমোহন, ফরিয়াল, রাজন হস্কর এম রাজন হীরালাল, সপ্রু, ম্যাকমোহন প্রভৃতি চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আলোকচিত্রগ্রাহক পিটার পেরিয়েরা ছবির কাজে লাগিয়েছেন। সংগীতে কল্যাণজী আনন্দজী তাঁর সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন। কলাকৌশলের কাজ পরিচ্ছন্ন। পরিচালক নরিন্দর বেদী জনপ্রিয় হলিউডের ছবির ('সাম লাইক ইট হট')-এর প্রভাব এড়াতে পারেননি।

—চিত্রদূত

ফুলু ঠাকুরমা
রূপশ্রী রায় ও ইন্দ্রজিৎ। পরিচালনা ঃ সাধন সরকার

রানুর প্রথম ভাগ

প্রযোজনা ঃ মহামায়া প্রোডাকসন্স

পরিচালনায় অবাস্তবতা থাকলেও এ ছবি একটি উপভোগ্য শিশু চিত্র হিসাবে বিবেচিত হবে।

চঞ্চলা কিশোরী রানুর 'প্রথম ভাগ' এখনও শেষ হয় নি। দশ বছরের ছোট্ট মেয়ে সারা বাড়ী কেবল হুটোপাটি করে সবাইকে ব্যস্ত করে তোলে। কারোর শাসন মানে না, ওকে পড়তে বললেই বই হারিয়ে যায়। সারা বাড়ীতে তার 'প্রথম ভাগ' খুঁজে পাওয়া যায় না। 'মেজকা' আবার বই কিনে দেয়। কিন্তু পড়ার তাগাদা দিলে পেট ব্যথা ও অন্যান্য রোগের আবির্ভাব হয়। আর মেজকা পড়ার জন্যে রানুকে ধমক দিলে দাদুর নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যায়। অনেক সময় বাড়ীর লোকেরা রানুর মুখে বিজ্ঞজনের ভাষা শুনে চমকে ওঠে। যেমন বাজার দর বাড়ছে—দেশে দুর্ভিক্ষ হবে। 'সংসারের লোকেরা সামলে না চললে, পরে নানা অসুবিধায় পড়বে। মেজকার স্বপ্ন রানু একদিন লেখাপড়া শিখে বড় হবে। রানুও মেজকাকে ভালবাসে। বিশেষ করে অসুখের সময় নিজেই মায়ের মতো সেবা শুশ্রূষা করে ওঁকে সারিয়ে তোলে রানুর বাবার খেয়াল ছিল বিচিত্র। কখনও তিনি খৃশ্চান, আবার কখনও গোঁড়া হিন্দু। হঠাৎ ওঁর মনে হোল রানুকে গৌরীদান করে পুণ্য অর্জন করবেন। শিক্ষক দাদা এই প্রস্তাবকে মেনে নিতে না পেরে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে বিদেশে চলে গেলেন। এদিকে সমানে দিদির বিয়ে দেখে রানুর মনে সাধ হল, তার শ্বশুরের যেন মাথায় টাক, মোটা ভুঁড়ি আর পাকা গোঁফ থাকে। রানুর ইচ্ছানুযায়ী। মেজকা কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। সব শেষে ওর ইচ্ছানুযায়ী এক শ্বশুর পাওয়া গেল, পরমুহূর্তে বিয়েও হয়ে গেল রানুর। একদিন। কিন্তু বিদায় দিতে গিয়ে মেজকার চোখে জল। রানু তার সব লুকিয়ে রাখা 'প্রথম ভাগ' তুলে দেয় মেজকার হাতে। মেজকা ছুটে যায় 'রানু' বলে, কিন্তু সে তখন কোথায়। এ-ছবির অন্যতম সম্পদ রানুর ভূমিকায় রাষ্ট্রপতির পুরস্কারপ্রাপ্ত নীতা মালিয়ার অপূর্ব অভিনয়। অন্যান্য ভূমিকায় অতীতের বন্দ্যোপাধ্যায় (মেজকা ও দাদু), অসীম চক্রবর্তী (রানুর বাবা), নিভাননী দেবী, কণিকা মজুমদার, গীতা দে, বঙ্কিম ঘোষ, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজু ভাওয়াল, অমর বিশ্বাস, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। আলোকচিত্র গ্রহণে শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কলা-কৌশলের কাজ পরিচ্ছন্ন, তবে কখনও কখনও সম্পাদকের কাঁচি আরও নিষ্ঠুর হতে পারতো। সংগীত পরিচালনায় নিখিল চট্টোপাধ্যায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিশেষ করে আবহসংগীতে। দ্বিজেন্দ্রলালের গানটি প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ দরদ দিয়ে গেয়েছেন। পরিচালক নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ এমন একটি সুন্দর শিশুচিত্র উপহার দেবার জন্যে।

—চিত্রদূত

আপনজন চিত্রের প্রথম প্রয়াস **অসময়**-এর শুভ মহরতে স্বরূপ দত্ত, অনুপকুমার, নৃপেন সান্যাল ও অমলাশঙ্কর।

ফ্লোর থেকে বলছি
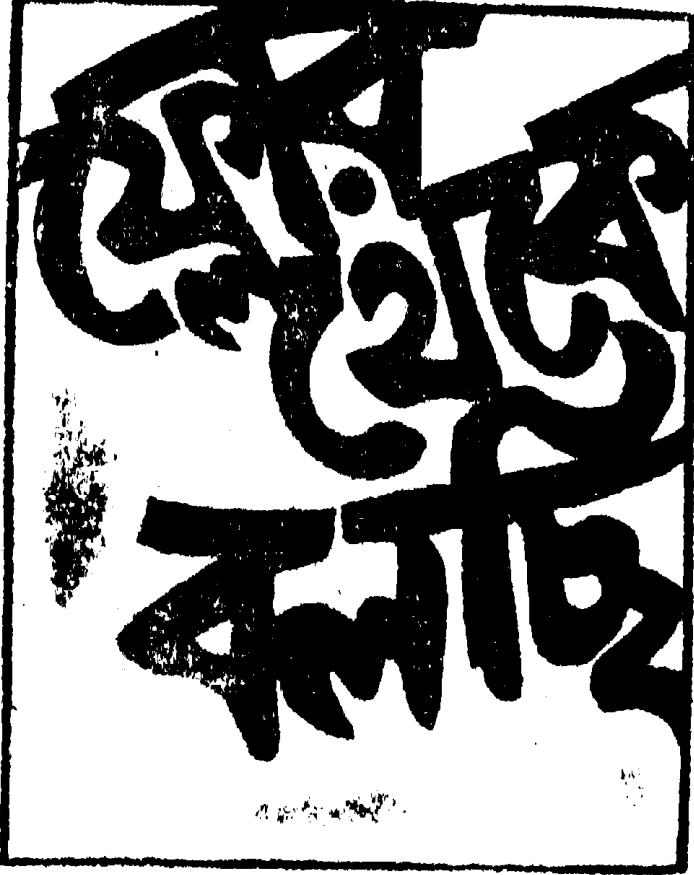
...অনেক স্তব্ধ দিনের এপারে চকিত
চতুর্দিক
আজো বেঁচে আছি মৃত্যুতাড়িত আজো
বেঁচে আছি ঠিক...

ঠিক এই মুহূর্তে হাজার জনতা এখানে। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর এই ফ্লোরে। শুটিং নয়। শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে একত্রিত সংহতি। শ্রমিক কলাকুশলী শিল্পী কনভেনশন। পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক কলাকুশলী শিল্পীদের জীবনের মান উন্নয়ন এবং শিল্পের সামগ্রিক উন্নতির দাবীতে। বিগত চৌঠা ফেব্রুয়ারী বিকেল পাঁচটা থেকে সুত্রপাত। সভাপতি : শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী এম পি। প্রধান অতিথি : শ্রীহীরেন মুখার্জি এম পি (সভাপতি বি এম পি ই ইউ)। উদ্বোধক : শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন : আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম অনেক, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রূপায়ণ তেমন হয় নি। এর জন্য ভেবে বসবেন না আমরা নিশ্চেষ্ট হয়েছিলাম। আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু বাধা আসছে নানা দিক থেকে। এরই মধ্যে আমরা এগিয়ে যাব। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। যেমন এ বছর থেকে পূর্বঘোষিত পঁচিশ লক্ষ টাকা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। ফিল্ম ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড স্থির করেছেন আটখানি ছবিকে নগদ দেড় লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে। এছাড়া এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে কলাকুশলীদের জন্য। দশটি গ্রুপে বিভক্ত কলাকুশলীদের এক একটি ইউনিটকে দশ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে যদি তাঁরা অ্যালায়েড বিজনেস করেন। অত্যন্ত সুখের কথা ইতিমধ্যে একজন প্রযোজক দেড় লক্ষ টাকা পেয়েছেন। দশটি কলাকুশলী ইউনিট স্কিম সাবমিট করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন ...আমি সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করছি যাতে বাংলা ছবি বাধ্যতামূলকভাবে প্রদর্শন করা যায়। যাতে আরো কিছু সিনেমা হল তৈরী করা যায় তারও চেষ্টা চলছে।...স্থানীয় প্রযোজকদের অমানুষ এবং সুজাতা ছবি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এরকম কমার্সিয়াল ছবি নির্মাণ করলে বাংলা সিনেমা শিল্প বাঁচবে। আর প্রয়োজন কলকাতা থেকে হিন্দী ছবি করা। সর্বভারতীয় বাজারের জন্য কলকাতার স্টুডিও থেকে হিন্দী চিত্র নির্মাণ একান্ত জরুরী। এরই মধ্যে অবশ্য দু-একজন এগিয়ে এসেছেন।...

অনেক কাহিনী আছে অন্তোত্ত গোপনে
ঘামের রক্তের আর চোখের জলের।...

টেকনিসিয়ানদের পক্ষ থেকে আশুতোষ নাগ বলেন : অনেক আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতির স্বপক্ষে আমরা অনেক হাততালি দিয়েছি। হাততালি দিতে দিতে আমাদের হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছে। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি। অথচ অন্যান্য রাজ্যে দিন বদলের পালা শুরু হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। আমাদের মত ছোট্ট একটা রাজ্যে সরকার অর্ধেক প্রমোদকর ফিরিয়ে দিচ্ছেন প্রযোজকদের। অন্যান্য রাজ্যেও ইনসেনটিভ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, কলাকুশলীদের মাথাপিছু আয় এখান থেকে বেশী। অন্যান্য সুখ-সুবিধার প্রতিও সরকার অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। আমাদের এখানে কলাকুশলীদের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ।...

প্রসঙ্গত ফেডারেশন সম্পাদক শ্রীসুব্রত সেনশর্মা এক সাক্ষাৎকারে : এখানে স্থায়ী কলাকুশলীর সংখ্যা প্রায় তিনশো। ফ্রি-লান্স বারোশোর মতো। স্থায়ী কলাকুশলীরা সারা বছর কাজ পেলেও পেতে পারেন, তাঁরা মোটামুটি সরকার নির্ধারিত সর্বনিম্ন বেতন পান। ফ্রি-লান্স টেকনিসিয়ান্সদের বলতে গেলে পায়ের তলায় মাটি নেই। তাঁরা স্রেফ আত্মবিশ্বাসের জোরে টিঁকে আছেন। একদম অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে। এই বারোশো মাত্র কুড়ি পার্সেণ্ট সারা বছর কাজ পান যদি কোন অঘটন না ঘটে। ফিফ্‌টি পার্সেণ্ট ছ মাস কাজ করেন। ছ মাস বেকার থাকেন। অবশিষ্ট থার্টি পার্সেণ্ট হয়তো সারা বছরই বেকার। আশায় আশায় থাকেন। কখনও কখনও ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ে যায়। এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠে অনেকেই এই শিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। এমনও হয়েছে কুড়ি-পঁচিশ বছর থাকার পর কেউ কেউ চলে গিয়েছেন। সরকার ঘোষিত যে ন্যূনতম বেতন তাও ঠিকভাবে পাওয়া যায় না। অরোরা স্টুডিও বেঙ্গল ল্যাবরেটরী, ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী এবং ইন্দ্রপুরী স্টুডিও—এঁদের কাছ থেকে কলাকুশলীরা উক্ত ন্যূনতম বেতন পান না। পান একশো কুড়ি থেকে একশো পঞ্চাশ টাকার মধ্যে। সরকার ঘোষিত ন্যূনতম বেতন শুরু হয় দুশো চল্লিশ টাকা থেকে।...

...এই সম্মেলন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এই অভিমত ঘোষণা করছে যে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্কটের মূল কারণ হল বাজারের অভাব। পণ্য হিসেবে বাংলা ছবিকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার রাস্তা প্রায় বন্ধ। এই কারণেই বাংলা ছবির জন্য অর্থ বিনিয়োগে অনীহা এবং কাজের অভাবে চৌদ্দটি স্টুডিও বন্ধ হতে হতে আজ মাত্র চার। পাঁচটি কোনমতে অন্তিম সময়ের অপেক্ষা করছে। এককালে যেখানে ষাট-সত্তরখানা ছবি তৈরী হত সেখানে আজ কুড়ি-পঁচিশখানা। স্বভাবতই শিল্পের প্রায় শতকরা পঁচাত্তর জন শিল্পী-কলাকুশলী সারা বছর বেকার থাকে—অনশনে অর্ধাহারে দিনযাপন করে। দীর্ঘদিন এই শিল্পে জীবন কাটিয়ে অন্য রুজি-রোজগারের কোন উপায় না থাকায় অনেক দক্ষ কলাকুশলী শিল্পী ভিক্ষাবৃত্তিতে নামতে বাধ্য হয়েছেন। বিনা চিকিৎসায় ও অনাহারে অনেকের জীবনাবসান হয়েছে।...

শ্রীপারিজাত বসু বলেন : এই ফিল্ম ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড আমাদের রীতিমত হতাশ করেছে। কারণ এই বোর্ডের হাতে স্ট্যাচুটারি পাওয়ার নেই। ফলে কোন কাজই এগিয়ে যেতে পারছে না। ফিল্মের জন্য একটি স্বয়ংশাসিত দপ্তর দরকার। এ ছাড়া শিল্পের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে না।...সিনেমা হাউসের সংখ্যা যতদিন না বহুল পরিমাণে বাড়ান হচ্ছে ততদিন এ রাজ্যে চলচ্চিত্র শিল্পের কোন ভবিষ্যৎ নেই!..

উত্তমকুমার বলেন : সরকারের উচিত অন্তত অর্ধেক প্রমোদকর প্রযোজককে ফেরত দেওয়া। তাহলে বাংলা ছবির সংখ্যা বাড়বে। শিল্প বাঁচবে।

...মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ—
বুকে আমার জ্বলে উঠবার উচ্ছ্বাস...

শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় বলেন : অথচ আমরা বিপ্লব করতে পারি না শুধু মিটিং করতে পারি, গালভরা বক্তৃতা দিতে পারি। সরকার যে আশ্বাস দিয়েছিলেন সেটা আজ বিলম্ব হতে হতে বিড়ম্বনায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই অচলায়তন ভাঙতে হবে। কেন হবে না। কাজের ক্ষেত্রে যাঁরা বাধার সৃষ্টি করছেন, গণ্ডগোল করছেন তাঁদের আয়ডেণ্টিফাই করা দরকার চিহ্নিত করা দরকার। সরকারকে এগিয়ে আসতেই হবে। সিক ফিল্মস সিক ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির ভার তুলে নিতে হবে। মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। বৃহৎভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী ফেডারেশন অফ ফিল্ম টেকনিসিয়ান এণ্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রস্তাবিত দাবীর ভিত্তিতে, অন্যান্য বক্তার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন : কাজ করার জন্য এক দল উৎসাহী আছেন। আরেক দল উৎসাহী আছেন যাতে কাজ না হয়। কাজ করলে সেই লোকের ক্ষমতা যদি বেড়ে যায় তার প্রতিরোধের জন্য অনেক রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এক দল মোটামুটি সঠিক পথে শিল্পের উন্নতিকল্পে এগিয়ে চলছিল কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিং তাদের অন্য পথে ঘুরিয়ে দিল। ন্যায্য কথা কিছু করা উচিত। সরকারের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ দরকার। সিনেমা হলের জাতীয়করণ দরকার। বাংলা ছবিকে ইনসেনটিভ দেওয়া দরকার। সরকার সামগ্রিক শক্তি। এখনই হতাশ হবার মতো পরিস্থিতি নয়। আপনাদের ঐক্য, সহযোগিতা এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত আমাদের চেষ্টা...

...তোমাদের ঘরে আজো অন্ধকার চোখে
আজো স্বপ্ন...

কিন্তু জানি একদিন সে সকাল
আসবেই...

—স্টুডিও সংবাদদাতা

নগর দর্পণ
উত্তমকুমার। কাবেরী বসু

স্টুডিও সংবাদ

বেশী ঢাক-ঢোল না পিটিয়ে পরিচালক অগ্রদূত তার আগামী ছবির শুভ সূচনা করলেন গত সপ্তাহে, স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এ। এর প্রধান কারণ অবশ্য অমিতাভ বচ্চন। অমিতাভ বাংলা ছবিতে কাজ করছেন, আগেভাগে তেমন প্রচার হয়নি। হঠাৎ স্টুডিওতে চলে আসলেন, অন্তত মহরতের কার্ড যারা পাননি তাঁরা অনুমান করতে পারেন নি। সে যাই হোক অমিতাভ বচ্চনের উপস্থিতিতে মহরত-শট নেওয়া হল। ক্ল্যাপস্টিক দিলেন প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়। শিল্পী : দেবরাজ রায়। সহযোগী আলোকচিত্রশিল্পী বীরেন মুখার্জি ক্যামেরায় চোখ রাখলেন। সংলাপ-মুখর কয়েকটা মুহূর্ত। অগ্রদূত গোষ্ঠীর কর্ণধার বিভূতি লাহার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি করল 'কাট'। অতএব শুভসূচনা। হাততালি। এবারে বলি শুনুন এ-ছবি 'কোয়েলের কাছে'। বুদ্ধদেব গুহ রচিত বহুপঠিত উপন্যাস। এরই চিত্ররূপে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন অমিতাভ। এই তাঁর প্রথম বাংলা ছবিতে অভিনয়। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম কেমন বাংলা জানেন মশাই। অমিতাভ স্মিত হাস্যে জানালেন 'লিটল বিট'। 'তা আপনার এই চরিত্রটার সংলাপ কি সবই বাংলা?' 'এখনো আমি স্ক্রীপ্ট শুনিনি।' 'কবে থেকে শুটিং করছেন?' 'নভেম্বরের আগে নয়।'...শ্রীরূপ চিত্রমের পতাকাতলে এই ছবি নির্মিত হতে চলেছে। প্রযোজনা করছেন পিনাকী চৌধুরী ও বিশ্বরঞ্জন সাহা।

বম্বের আরেকজন অভিনেতা, মূলতঃ গায়ক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি—শৈলেন্দ্র সিং কলকাতায় এসেছিলেন। একই সঙ্গে এসেছিলেন 'কোরা কাগজ' ছবির পরিচালক অনিল গাঙ্গুলী। এঁদের দুজনকে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত করেন প্রযোজক ও পি সিং, কলকাতার তরুণ শিল্পপতি। শ্রীসিং বর্তমানে একটি বাংলা ছবি প্রযোজনা করছেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে 'অজস্র ধন্যবাদ'। পরিচালক : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। এ-ছবির নায়ক চরিত্র রূপায়িত করছেন 'ববি'-খ্যাত গায়ক পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত নায়ক শৈলেন্দ্র সিং। নায়িকা : মহুয়া রায়চৌধুরী। এ-ছবির একটি বিশেষ চরিত্র রূপায়িত করতে পারেন দীপংকর দে। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন শ্যামল মিত্র। এ-ছবির শুটিং অনতিবিলম্বে শুরু হবে। এছাড়া শ্রীসিং অদূর ভবিষ্যতে একটি বাংলার হিন্দি ছবি প্রযোজনা করছেন পরিচালক হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন শ্রীগাঙ্গুলী। শ্রীগাঙ্গুলীকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—বর্তমানে আমার দুখানি ছবি ফ্লোরে আছে। এই দুই ছবির ফাঁকে ফাঁকে ডেট-অ্যাডজাস্ট করে এই ছবি করতে হবে। গৌরীবাবুর লেখা গল্প। নায়ক হবেন শৈলেন্দ। নায়িকা কে? এখনই মুখ খুলতে চান না তিনি। 'পরে বলব।' প্রসঙ্গত জানাই, অন্য এক সূত্রের খবর এই ছবিতে নায়িকা হবে সম্ভবত রেখা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই ছবির শুটিং হবে কলকাতার স্টুডিওতেই। কাজ করবেন কলকাতার শিল্পী ও কলাকুশলীরা।

পরিচালক অর্ধেন্দু সেন আগামী সপ্তাহ থেকে তাঁর নতুন ছবি আদর্শ নায়ক—এর শুটিং শুরু করছেন। রূপমায়ার ব্যানারে এই ছবি, গৌর শী রচিত কাহিনী অবলম্বনে। চিত্রনাট্যকার, পরিচালক নিজেই। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করবেন : রবি ঘোষ,

চিন্ময় রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায় মলিনা দেবী জহর রায়, অজিত চ্যাটার্জি, মহুয়া রায়-চৌধুরী ও সমিত ভঞ্জ। শেষোক্ত দুই শিল্পী যথাক্রমে নায়িকা ও নায়ক। ইতিমধ্যে এছবির জন্য একাধিক গান রেকর্ড করা হয়েছে। তরুণ সঙ্গীত পরিচালক অনুপম মুখোপাধ্যায়ের সুরারোপে কণ্ঠদান করেছেন রবি ঘোষ, চিন্ময় রায় ও অন্যান্য শিল্পীরা। এছবির আলোকশিল্পী ঃ মণীশ দাশগুপ্ত। শিল্পনির্দেশক ঃ গৌর পোদ্দার।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

সুবর্ণকন্যা। জয়শ্রী রায়। আহ্বান

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

বম্বের চিত্রতারকারা ইয়েলো জার্নালিজম-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বম্বে এবং দিল্লীর কয়েকটি পত্রিকা তৎসহ কলকাতার দু-একটি অনুকরণে শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে যেভাবে আজগুবি সব গাসিপ লিখছেন তারই বিরুদ্ধে এই তীব্র প্রতিবাদ। সম্প্রতি ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ার লনে এই পরিপ্রেক্ষিতে এক সভা হয়। আহ্বান করেন সিনে আর্টিস্টস এসোসিয়েশন। সভাপতিত্ব করেন ডেভিড অ্যাব্রাহাম, প্রবীণ শিল্পী। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঃ রাজকাপুর, দিলীপকুমার, ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্না, শশি কাপুর, ঋষি কাপুর, রাজেন্দ্রকুমার জীতেন্দ্র নবীন নিশ্চল, বিনোদ খান্না, প্রেম চোপরা, হেমা মালিনী জীনত আমন জয়া ভাদুড়ী সায়রা বানু মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ওমপ্রকাশ প্রভৃতি। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল এই শিল্পীদল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, এবার থেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁরা অত্যন্ত ফর্মাল ওয়েতে মেলামেশা করবেন। কোনরকম সাক্ষাৎকার দেবার পূর্বে তাঁরা ইচ্ছে করলে সাংবাদিকের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। সাংবাদিকরা সাক্ষাৎকার কিম্বা স্টুডিও কভারেজ গ্রহণ করতে পারেন উপযুক্ত অনুমতিতে। এর বাইরে যা কিছু, যদি কিছু ঘটে এবং এর জন্য যদি কোন শিল্পীও দায়ী থাকেন তাহলে এসোসিয়েশন প্রয়োজন হলে আদালতে পর্যন্ত যাবেন। বিস্তারিত আর কিছু জানা যায়নি।

সম্প্রতি ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনীকে নিয়ে প্রযোজক-পরিচালক রামানন্দ সাগর চরস-এর অন্তদৃশ্য গ্রহণ শুরু করেছেন বাঙ্গালোরের একটি স্টুডিওতে। এখানে একটি ছ দিনের সিডিউলে ওদের বেডরুম সিকোয়েন্স ঠিক করা হচ্ছে। বিলাসবহুল এই বেডরুমে ধর্মেন্দ্র এবং হেমা বেশ ভালই শুটিং করছেন। ওদের দুজনকে ঘিরে যাঁরা গুজব প্রচার করেন তাঁরা দেখলে তো সর্বনাশ। একেবারে আক্কেলগুড়ুম হবার দাখিল হবে। এমন সব রোমান্টিক দৃশ্য তোলা হচ্ছে। রামানন্দ সাগর ইচ্ছে করেই এই দৃশ্যগুলি বম্বের স্টুডিওতে তোলেননি কারণ তাতে ধর্মেন্দ্র-হেমা মালিনীকে নিয়ে তিল থেকে তাল হতে পারে। শিল্পীদের অনুরোধে এই বিশেষ দৃশ্যটি টেক করতে প্রযোজক-পরিচালক সদলবলে বাঙ্গালোর এসেছেন।

ঋষি কাপুরের সঙ্গে নীতু সিং-এর বিয়ে হয়ে গেছে বলে একটা প্রচার চালু হয়েছে বম্বেতে। আসলে ব্যাপারটা অন্য রকম। ঋষির সঙ্গে একটা ছবিতে নীতুর বিয়ে দেখান হয়েছে। তারই কিছু স্থির চিত্র নানা কাগজে বেরুনোর ফলে ঋষির কথায় ঃ নীতু আমার বান্ধবী এর বেশী কিছু নয়।

এত দিন জেমস বণ্ড মার্কা অনেক ছবির অনুকরণে হিন্দী ছবি হয়েছে। ক্রাইম থ্রিলার ছবির নাম করে শেষ করা যাবে না। এবার সেই রকম একটি বিদেশী ছবির হুবহু অনুসরণে একই নামে হিন্দী ছবি নির্মিত হতে চলেছে। যেমন রাজেশ খান্না অ্যাজ জিরো জিরো সেভেন। লক্ষ্য করার মত শিল্পীর নামটাই শুধু পাল্টেছে। বিদেশী শিল্পী এনে তো আর সম্ভব নয়। এই ছবি পরিচালনা করবেন তরুণ কুশলী নরেন্দর বেদী। শুটিং শুরু হতে বেশী দেরী নেই। রাজেশ খান্নার সঙ্গে এই ছবিতে বলাই বাহুল্য বেশ কয়েকজন লাস্যময়ী নায়িকার সন্ধান মিলবে। যথা পদ্মিনী কপিলা, কোটি মিরজা, অরুণা ইরানী, বিন্দু প্রভৃতি। এ ছাড়া দুটি বিশেষ চরিত্রে আসরাণী এবং এ কে হাঙ্গলকে দেখা যাবে। সঙ্গীত-পরিচালনা করবেন রাহুল দেববর্মন। একাধিক গান গাইবেন কিশোরকুমার।

...অভিজিৎ

হারমোনিয়ম-এর দুই শিল্পী রুমা চক্রবর্তী ও সোনালী গুপ্ত

কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ছবি

এবার কোলকাতার চলচ্চিত্র উৎসবে যে সাতটি বিদেশী ছবি (পূর্ণাঙ্গ) দেখান হোল তার মধ্যে নিপুণতার দিক থেকে আমাকে সব চেয়ে মুগ্ধ করেছে আলজেরিয়া ও ফ্রান্সের যুগ্ম উদ্যোগে নির্মিত ওয়েদার অব ক্রে ছবিটি।

এবং নির্মল আনন্দজনক ও পরিচ্ছন্ন ছবি হিসেবে পশ্চিম জার্মানীর ছবি বিকজ অফ ইউ যার আসল নাম ও জোনাথন জোনাথন।

গল্পের দিক থেকে আনন্দ দিয়েছে কানাডার ছবি বিটুইন ফ্রেন্ডস।

জাপানী ছবি ডায়েরী অফ সিনকুজু বার্গলার কেবলমাত্র দুঃসাহসিক বলেই মনে হয়েছে।

পশ্চিম জার্মানীর দ্বিতীয় ছবি রেন্স ওয়াল্ড-এর গল্পও মুগ্ধ করেছে। ছবিটি সত্যিই উপভোগ্য এবং মনকে/ ভারাক্রান্ত করে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ছবি চাম্পাকুয়া যার পরিচালক কনগান্ড রুকস ক্যামেরা এবং স্ক্রিপ্ট সেন্টের দিক থেকে উন্নত মানের হলেও এর বিষয়বস্তু এবং বক্তব্য মনকে সাড়া দেয় নি। অথচ শোনা যায় এই ছবিটাই নাকি মস্কোর চলচ্চিত্র উৎসবে সাড়া জাগিয়েছিল। (এ ছবিতে রবিশঙ্করের মিউজিক দারুণ উপভোগ্য)।

কানাডার ছবি বিটুইন ফ্রেন্ডস

সমালোচনা হওয়া আর সাড়া জাগানো কি এক কথা? এ ছবি নিয়ে সমালোচনা অবশ্য হতেই পারে। না হলেই বরং বিস্মিত হব। তবে অন্য বক্তব্যে।

আর্জেণ্টিনার ছবি দি আওয়ার অফ ফার্ণেসেস এক সময় নাকি আন্ডার গ্রাউন্ডের বিপ্লবীদের দেখানো হত সে দেশে। ছবিটি ডকুমেন্টারীধর্মী। একটা গোটা দেশের মোটামুটি সব কিছুই এ ছবিতে খুলে খুলে দেখান হয়েছে। আর্জেণ্টিনার রাজনৈতিক পটভূমি, রাজতন্ত্রের শাসন ও শোষণ পদ্ধতি। সাধারণ মানুষের জীবন ধারণ তাদের সমস্যা দেশের প্রধান সম্পদ ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যা থেকে মানুষের বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা ও অন্য দিকে স্বচ্ছল ও শাসক শ্রেণীর মানুষদের বিলাস-ব্যসনের জীবন মোটামুটি কিছু কিছু দৃশ্য ও রেখায় উপস্থাপিত করা হয়েছে এই ছবিতে।

সে দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী দরিদ্র ভারতবাসীদের জীবনযাপনও দেখান হয়েছে আওয়ার অফ ফার্ণেসেস-এ। সেই সব দৃশ্যগুলি এবং সাব-টাইটেলগুলি রোমাঞ্চিত করে। প্রায় বস্তিতে বাস করার মত জীবনযাপন। দারিদ্র্যের চরম অবস্থার মধ্যে বাস।

তাদের সম্পর্কে ভাষ্যকার বলেন (যা সাব-টাইটেলে পড়া গেছে) মানুষ হিসেবে ভারতীয়দের সঙ্গে একমাত্র পার্থক্য হল ভাষা। মুখের ভাষাই শুধু পৃথক। এ ছাড়া একই রকম রক্ত, ক্ষুধা উভয়ের মধ্যে একই রকম করে পায়ে হাঁটে।

মানুষের প্রতি মানুষের এই মমত্বের বুঝি কোন বিকল্প হয় না।

তবু মনে হয় এ ছবিটি সর্ব শ্রেণীর দর্শককে প্রীত করতে পারে নি।

এবার কোলকাতার দর্শকদের মধ্যে যে ছবিটি সর্বাধিক সাড়া জাগিয়েছে তা হল জাপানের ডায়েরী অফ সিনকুজু বার্গলার। এর প্রধান কারণ বলাই বাহুল্য। এতে যৌন দৃশ্য বলাৎকার নারী দেহ নিয়ে নানা রকমভাবে ব্যবহার করা ইত্যাদির ছড়াছড়ি ছিল বলে।

সেক্স এডুকেশন বলতে সাধারণত যা বুঝে থাকি (পর্ণগ্রাফী বলতে যা বোঝা যায় তা অবশ্য নয়—কারণ এতে একটা বক্তব্য আছে। যেটা হয়তো বুদ্ধির দিক থেকে শিক্ষণীয় এবং যাকে একদম উড়িয়েও দেওয়া যায় না।) এ ছবিতে তা প্রায়

জার্মান ছবি—ও জোনাথন, জোনাথন

পর্যাপ্তই আছে। খোলাখুলি দৃশ্যেরও অভাব নেই, উৎক্ষিপ্ত অবস্থায় যৌন চর্চা রেপ পাভারসন ইত্যাদি ইত্যাদি একাধিক নির্বিকার দৃশ্য এতে স্থান পেয়েছে।

ছবির গল্পের মধ্যেই একটা নাটকের দৃশ্য দেখান হয়েছে (যেটা অনেকটা দীর্ঘও) যার কুশীলব সবাই প্রায় মুখোস পরে বা মুখ রঙ করে—যাতে একদিকে বিগত যৌবনা রমণীর যৌন ক্ষুধার বিকৃতি, অন্য দিকে প্রকাশ্য স্টেজের ওপরেই দেহজ মিলানের দৃশ্য প্রায় খোলাখুলিই দেখান হয়েছে—যেটা অবিশ্বাসের পর্যায়েই পড়ে।

ছবিতে যে গল্পটি বলা হয়েছে তার শুরু সৌন্দর্যমণ্ডিত। যুবক-যুবতীর প্রেম। সেটা ক্রমে রোমান্স ডিঙিয়ে যৌনজীবন সম্পর্কে কৌতূহল; সে সম্পর্কে পুঁথিগত বিদ্যার স্পৃহা, যৌনশাস্ত্র বিশেষজ্ঞের (প্রফেসর) নিকট যৌনতা ও যৌন বিষয়ক পাঠ নেবার ভূমিকা—অন্যদিকে বাস্তব জীবনে যৌনতা উত্তেজনা ও তার উৎক্ষিপ্ততা—যার শিকার হয় ছবির নায়িকা কয়েকটি বিকৃত চরিত্রের ক্ষিপ্ত যুবকের হাতে। রাত্রের অন্ধকারে অন্যের যৌন লীলা দেখে উত্তেজিত হয়ে দুটি ছেলে একটি মেয়েকে তাড়া করে তার প্রেমিকের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে উৎক্ষিপ্ত অবস্থায় মেয়েটির দেহের বসন ছিঁড়ে প্রকাশ্য রাস্তায়ই যে রেপ-এর দৃশ্যটি দেখান হয়, সেই দৃশ্যটা প্রায় দম বন্ধ করে দেখতে হয়।

এ ছবির একটা শিক্ষামূলক ভূমিকা নিশ্চয়ই আছে—যাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেটা কি এ দেশের দর্শকদের কাছে গ্রহণীয় কিংবা সহজ চিন্তার বিষয়?

মদ্যপান, যৌন বিকৃতি, যৌন শিক্ষার নামে এ দেশেও এক শ্রেণীর মানুষ আজ দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু এ ছবির সমস্যার সঙ্গে নিশ্চয়ই খুব একটা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। এসব ব্যাপার এখনও পর্যন্ত ওয়েণ্টার্ণ সিভিলাইজড কানট্রির মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে ধারণা।

এ ছবিতে লেনিন এ্যাঙ্গেলস থেকে পৃথিবীর বহু জ্ঞানীগুণী মনীষীর লেখা থেকেই যৌনাচরণের স্বপক্ষে কোটেশন তুলে দেয়া হয়েছে।

এ ছবিটি ছাড়া কানাডার ছবি [illegible] ফ্রেন্ডস ছবিতে কিছু কিছু সেক্স সীন দেখান হয়েছে। কিন্তু সে সব এ ছবির মত এমন ভয়াবহ নয়।

মূলত সেটা ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। এক সুখী দম্পতির মধ্যে এসে উপস্থিত হওয়া স্বামীর বন্ধুকে নিয়ে কাহিনীর বিস্তার। বন্ধু যেখানে বন্ধুকে পেয়ে পরম খুশী, সেখানে বন্ধুপত্নী তার প্রতি ক্রমে চরম আসক্ত হয়ে পড়ে। যার ফলে অনিবার্যভাবেই কিছু যৌন মিলনের দৃশ্য এসে পড়েছে।

এ ছবির শেষটা দর্শককে ধাক্কা দেয়।

জার্মান ছবি 'ব্রিকজ অফ হে-এর' গল্প একেবারে বাঙালীর ঘরোয়া গল্পের মত। বাঙলা যোগাযোগ ছবির সঙ্গে এর কাহিনী-গত মিলটি আশ্চর্য হয়ে দেখবার মত। কেন তারই জার্মান ভার্সান দেখছি। দারুণ উপভোগ্য ছবি।

—[illegible]

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে। নজরুলের সেই অবিস্মরণীয় গানের কথাগুলি দিয়ে শ্রীশ্যামল ঘোষ একটি ছোট ডকুমেন্টারী ফিল্ম তুলেছেন। উপজীব্য বিষয়—ইন্দুবালা আঙ্গুরবালা আর কমলা ঝরিয়া। সেই অবিস্মরণীয় তিন কন্যা যাঁদের গান শোনা যেত বাংলার ঘরে ঘরে। সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোন বিজ্ঞাপনের দিনে গ্রামোফোনের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের গানের রেকর্ডও বিক্রী হত প্রচুর।

শ্রীঘোষ যে ছবিটি তুলেছেন তা একদিকে যেমন শিল্পসম্মত অন্যদিকে তেমনই তথ্যনিষ্ঠ। ছবির অন্যতম আকর্ষণ সঙ্গীত শিল্পীরা নিজেরাই। তাঁরা তাঁদের অতীতের কথা বলেছেন শ্যামলবাবু আমাদের পুরাতন ছবি দেখিয়ে সে যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। তিন শিল্পীই ছবিতে গান গেয়ে শুনিয়েছেন। আমরা প্রমাণ পেয়েছি এখনো তাঁদের গলা কত সুন্দর, কত সুরেলা। শ্যামলবাবু ফাঁকে ফাঁকে পুরাতন দিনের রেকর্ড শুনিয়েছেন। আমরা সুরের সাগরে ডুবে গিয়েছি।

টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায় বইটি কয়েকজন অভ্যাগতদের যেদিন দেখান হল সেদিন ইন্দুবালা আর আঙ্গুরবালা উপস্থিত ছিলেন। কমলা ঝরিয়া শরীর খারাপ থাকার জন্য থাকতে পারেন নি। ছবিটি দেখানোর আগে উদ্যোক্তাদের কিছু প্রীতি উপহার সত্যজিৎ রায় তুলে দিলেন শিল্পীদের হাতে। ইন্দুবালা আশীর্বাদ করলেন 'তুমি বাংলার মুখোজ্জ্বল করা ছেলে তুমি দীর্ঘজীবী হও। ছবিটির প্রযোজক বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত। আলোকচিত্র তুলেছেন শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করেছেন অমলেশ শিকদার। চিত্রনাট্য, সঙ্গীত সূত্রধার ও নির্দেশক শ্যামল ঘোষ। চলচ্চিত্র নিবেদিত এই ছবিটির জন্য এঁদের সকলকে ধন্যবাদ।

সেই চোখ/সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়/উত্তমকুমার জয়শ্রী ও ইন্দ্রজিৎ।

নাট্যমঞ্চ
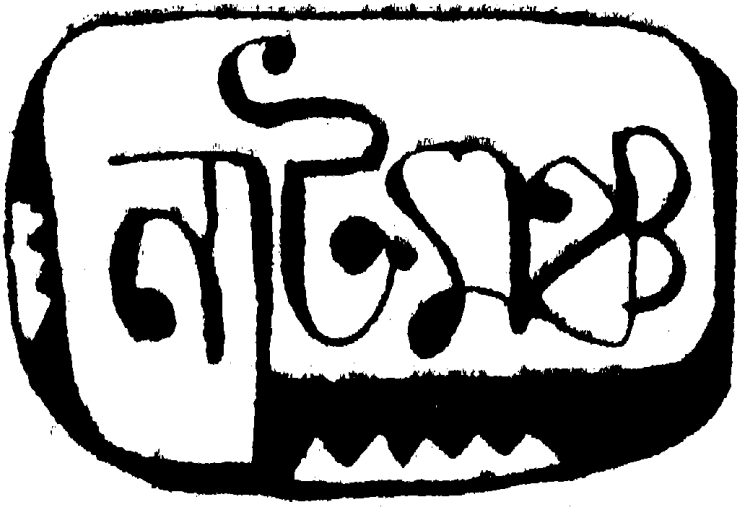
শৌভনিকের এক দুই তিন

শৌভনিকের নতুন নাটক 'এক দুই তিন'।

বলতে বাধা নেই শৌভনিক যখনিই কোন নাটক প্রযোজনা করেন আমরা তখন নতুন কিছু পাবো বলেই প্রত্যাশা করে থাকি। সে দিক থেকে এ নাটকও আমাদের অবশ্যই বঞ্চিত করে নি। বিশেষ করে এর বিষয়বস্তুর নতুনত্ব আমাদের আকর্ষণ করেছে। (কাহিনী নারায়ণ সান্যাল)।

এ নাটকের মূল সুরটি অবশ্যই ব্যংগাত্মক। নাটকে মনুষ্য চরিত্র বেশী নেই। মোট চারজন। বাকিরা সবাই জীব-জন্তু। নাটকের ভাষায় 'অমানুষ'। পরিকল্পনার দিক থেকে অভিনব সন্দেহ নেই। সমস্ত নাটকটিই প্রতীকের মত করে ব্যবহার করা হয়েছে।

হাঁস মুর্গি শুয়োর গরু ভেড়ার ফার্মের নাম 'অমানুষ স্থান'। মালিক বলাই বাহুল্য মানুষ। যে শোষণ করে আকণ্ঠ কিন্তু খাদ্য দেয় কম। প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। তাহলেই অত্যাচারের চাবুক নেমে আসে পিঠে।

শেষ পর্যন্ত (বলিবর্দকে বুড়ো হয়ে যাবার দরুন কশাইয়ের কাছে তাকে বেচে দেয়া থেকে যার সূত্রপাত) সেই অমানুষ স্থানের বাসিন্দারা যারা এতকাল মালিকের চাবুকের ভয়ে কথা বলে নি বিদ্রোহ করল মালিকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে। সেই প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ পেল তারা। নতুন করে দেশকে গড়ে তোলার মন্ত্র নিল তারা বৃদ্ধ বলিবর্দকে দেশের প্রধান করে।

কিন্তু কালক্রমে তাদের মধ্যে কয়েক জনের মনে গদীর মোহ সঞ্চারিত হোল। বৃদ্ধ বলিবর্দের উপদেশ তাদের কাছে ভাল লাগত না। ফলে এক সময় তাকে সরিয়ে দিয়ে দেশের প্রধান হয়ে বসল একে একে ক্ষমতাশালী জীবরা। সবারই মুখে প্রথমে দেশ গড়ার বুলি। ক্রমে সেটা পর্যবসিত হয় শ্রেণী স্বার্থে। ব্যক্তিগত লোভটাই তখন তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। মুখে বলে 'এ রাজ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ বিষ। চুরি আর জোচ্চুরি স্বজন পোষণ আর ঘুষ। একা আমি কি করতে পারি।'

সেই 'অমানুষ স্থানে'র একমাত্র বাসিন্দা একজন নারী (খামারের মালিকের কন্যা) যার নাম মানবী। সে চায় এদেশে সত্য ন্যায় আর কলুষমুক্ত সমাজ গড়ে উঠুক। শেষ পর্যন্ত যৌবনের দূত এক নওজোয়ান যখন দেশের হাল ধরে তখন সে ভাবে এবার তার স্বপ্ন সফল হবে। কিন্তু সেই আশা তার পূরণ হয় না। নওজোয়ানের মধ্যেও সে দেখতে পায় পুরাতনের পুনরাবৃত্তি।

আগেই বলেছি নাটকটি প্রতীক ধর্মী। জীবজন্তুর সব কটি চরিত্রই রূপক অর্থে ব্যবহৃত। মানুষের স্বভাব নিয়েই এরা স্ব স্ব চরিত্রে প্রতিভাত।

নাটক দেখতে দেখতে এক এক সময় মনে হয়েছে আমরা যেন আমাদেরই প্রত্যক্ষ করছি মঞ্চে। শুধু মুখোসটা আলাদা। এছাড়া সবই এক। সেই রিপু সেই স্বভাব স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, আত্মসুখ-সর্বস্ব মানুষই যেন জীব জগতের রূপ নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এ যেন একালের মানুষের দর্পণ।

নাট্যকার আশাবাদী। তিনি শেষ পর্যন্তও বলেছেন ঐ বিষের মধ্যেই তার প্রতিকারের ওষুধ লুকিয়ে আছে।

জানি না ভবিষ্যতে এই আশার বাণী মনুষ্য জগতেও প্রতিধ্বনিত হবে কি না। হলে নাট্যকারের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই দর্পণে আজকের মানুষ তার স্বরূপ দেখে তার ভুল সংশোধন করবে নাটকে এই আশার কথা নিরুচ্চারভাবে ছড়িয়ে আছে একথা আমার নাটক দেখতে বসে মনে হয়েছে।

সেদিক থেকে নাটকের উপস্থাপনা সার্থক। কিন্তু সেই অনুপাতে নাটকে গতিবেগ থাকলে এবং অভিনয় আরও প্রাণবন্ত হলে অর্থাৎ কম্প্যাক্টনেস থাকলে নাটকটি আরও হৃদয়গ্রাহী হোত। কয়েকটি চরিত্রের অভিনয় দেখে তাই মনে হয়েছে। এটুকু সংশোধন করে নিলে এ নাটক অবশ্যই বৃহত্তর দর্শকদের সপ্রশংস বাহবা কুড়োবে।

স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে যিনি দর্শকদের সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি এ নাটকের দালালেশ্বররূপী নিমু ভৌমিক। এবং ইনসানরূপী অমল মুখোপাধ্যায়। এর পরেই নাম করা যায় বলিবর্দ (সুধাংশু মণ্ডল), রাসভনাথ (মনী দাস) কুমার (বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়) অবতার (পান্নালাল মৈত্র) শূকরনাথ (বিশ্বেশ্বর মিত্র) ও বরাহেশ্বর [illegible] (প্রদীপ ভট্টাচার্য)।

মানবীর চরিত্রে শিপ্রা চক্র[illegible] আগাগোড়া সুন্দর অভিনয় করেছে[illegible] আর ভাল অভিনয় করেছেন আদম[illegible] শিশু মজুমদার।

হয়গ্রীব (বিমলেন্দু মজু[illegible]), অনড্বান (কাশীনাথ হালদার) সারমেয় [illegible] দাস) কুক্কুটস্বামী (শক্তিদাস ঠাকু[illegible]) হংসধ্বজ (নির্মল কংসবণিক) ও র[illegible] (মৃত্যুঞ্জয় আঢ্য) চরিত্রানুযায়ী।

মঞ্চ সংস্থাপনা (পা[illegible] মৈত্র) অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য ও নাটককে বাস্তবানুগ করে তুলেছে। [illegible] মিত্রর সঙ্গীত নাটকের একটি উল্লে[illegible] ভূমিকা পালন করেছে। রূপসজ্জা ([illegible] হোসেন) উচ্চপ্রশংসার যোগ্য।

শেষ কথা। নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে শৌভনিকের একটা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আছে। এ নাটক সেই গৌরবকে আরও বৃদ্ধি করবে নিশ্চয়ই। এবং দর্শকও এ নাটক সাদরে গ্রহণ করবে এ আশ্বাস আমরা নাটকের মধ্যেই পেয়েছি।

স্ট্যান্ডমেড-এর সুখের পায়রা : স্ট্যান্ডমেড রিক্রিয়েশন ক্লাবের ৮ম বার্ষিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন সম্প্রতি কলা মন্দির প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শ্রীঅমর দাশ ও পশ্চিম বাংলার ড্রাগস কন্ট্রোল ডাইরেক্টরের অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার শ্রীঅমল চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল ক্লাবের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত শ্রীমতী আলো দাশগুপ্তর সুখের পায়রা নাটকাভিনয়। হাস্যরসাত্মক এই নাটকটি সংস্থার প্রতিটি শিল্পীর আন্তরিক অভিনয়ে এবং পরিচালক শৈলেন মুখার্জির নিপুণ পরিচালনার গুণে সমগ্র দর্শকদের মাতিয়ে রাখে। গোবর্ধন মজুমদারের চরিত্রে সুপ্রকাশ সাহা, গোপাল-এর চরিত্রে সৌমেন্দ্রনাথ রায় এবং মিহির শঙ্কর ও ব্যোমকেশ চরিত্রে যথাক্রমে দীপক মুখার্জি, হিমাংশু দে ও

শ্যামল রায়চৌধুরী প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। স্বপন চরিত্রে সুব্রত পাকড়াশীর অভিনয়ের ধরণ একটু একঘেয়ে মনে হয়েছে। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র দে, রূপচাঁদ পাল, জ্ঞানরঞ্জন দাস, সত্যেন দাস, কাজল মুখার্জি, কৃষ্ণা চক্রবর্তী ও শিবাণী ভট্টাচার্যের অভিনয় যথাযোগ্য। অমিত রায়ের ব্যঞ্জনাপূর্ণ মঞ্চসজ্জা ও আবহসংগীত পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য।

কিংকুট-এর 'এই মন সেই মন'

কিংকুট নাট্য সংস্থা সম্প্রতি মঞ্চস্থ করলেন 'এই মন সেই মন' নাটকটি। (রচনা শ্রীরবীন্দ্র ভট্টাচার্য)।

আমাকে প্রথমে যা আকর্ষণ ও বিস্মিত করেছে তা হোল এই নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন। এ নাটকের পটভূমি ভারতের বাইরে। মূল চরিত্র চিত্রণ ইহুদীদের ওপর অত্যাচার। অবশ্যই মূল বক্তব্য মানবিকতাবোধ। সেদিক থেকে এর একটা সার্বজনীন আবেদনও অবশ্যই আছে।

আমাদের সবচেয়ে বিস্মিত করেছেন এ নাটকের নির্দেশক শ্যামল রায়চৌধুরী (ইনি নাটকের সম্পাদনার দায়িত্বও বহন করেছেন)। এমন একটি দুরূহ নাটক মনোনয়ন করে নাটক দর্শককে যদি এতটুকুও ভাবিত এবং আনন্দ দান করে থাকে, তবে তার কৃতিত্বের অনেকখানিই তাঁর প্রাপ্য। তবে তিনি নাটকটিকে আরো যদি খানিকটা পরিমার্জনা বা সম্পাদনা করতেন, তবে নাটকের গতি আরো কমপ্যাকট হোত।

কারণ কুশীলবদের সংলাপ দীর্ঘ হবার জন্যে অনেক সময় ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। ফলে অভিনয়েও জড়তা এসে গেছে। যেটা নাটকের একটা প্রধান ত্রুটি। অনেক সময় সংলাপের ওপর জোর না দেওয়ায় চরিত্রগুলিও সঠিকভাবে ফুটে ওঠেনি। এদিকে পরিচালকের আরও সচেতন দৃষ্টি বাঞ্ছনীয় ছিল।

অভিনয়ে ডাঃ আয়ানের চরিত্রে শম্ভু মিত্র একটু ঢিলেঢালা সত্ত্বেও আগাগোড়া সংযত অভিনয় করে গেছেন। জগরূপী শ্যামল রক্ষিত কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল অভিনয় করেছেন। কিন্তু তার অস্থির হয়ে সংলাপ বলা ও উচ্চারণের ত্রুটি কর্ণকে পীড়া দিয়েছে। ক্যাপ্টেন (মধুসূদন নন্দী) একটু নার্ভাস, মেজর (শ্যামল ব্যানার্জি) তেমন করে চরিত্রটিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পারেন নি। অথচ তার প্রচুর অবকাশ ছিল এবং মানিয়েও ছিল সুন্দর। অন্যান্য চরিত্রের অভিনেতাদের মধ্যে দিলীপ কর, কৃষ্ণচন্দ্র দাশ, গৌতম দত্তর অভিনয় ভাল। তবে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা গেছে।

সুকুমার ঘোষ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও প্রিয়গোপাল কুণ্ডু চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

মহিলাদের মধ্যে মীনা দাশের ডোরা আটামুটি ভালই করেছে। সেই অনুপাতে [illegible] লাহা দর্শকদের নিরাশ করেছেন।

স্ট্যান্ডমেড রিক্রিয়েশন ক্লাবের **সুখের পায়রা** নাটকে সুপ্রকাশ সাহা, কাজল মুখার্জি, শিবাণী ভট্টাচার্য এবং দীপক মুখার্জি।

তবে আগামীতে সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীই এই দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারবেন, নাটক দেখে এই বিশ্বাসই হয়েছে আমার। কিংকুট নাট্য সংস্থার কাছে সেটা আশাও করি।

কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারীর সাজসজ্জা এবং বিজয় কুমারের রূপসজ্জা খুবই ভাল। এ নাটক সার্থক হবার মূলে তাঁদের দান অনেকখানি কাজ করেছে। ভানু বিশ্বাসের আলো সুন্দর। মঞ্চ ও শব্দ (শ্যামল নন্দী) নাটকের সহায়ক হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীবঙ্কিম ঘোষ। স্বাগত ভাষণ দেন সুহৃদগোপাল দত্ত।

নাটকের পূর্বে উদ্বোধনী সঙ্গীত গেয়ে অশোক চক্রবর্তী এবং হরবোলা পরিবেশন করে মুক্তি চক্রবর্তী ও নৃত্যে ছোট্ট মেয়ে নিবেদিতা রায়চৌধুরী দর্শকদের আনন্দ দেয়।

কৃষ্ণলীলা নৃত্যনাট্য ও 'বাসবদত্তা' নাটক অভিনয়

ক্যালকাটা মিউজিক অ্যাণ্ড আর্ট সেণ্টারের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা সম্প্রতি 'কৃষ্ণলীলা' ও 'বাসবদত্তা' নাটক অভিনয় করেন।

'কৃষ্ণলীলা' নৃত্যনাট্য পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন শ্রীমতী বেলা অর্ণব। নৃত্যের সঙ্গে তাঁর রেয়াজী কণ্ঠের গান রীতিমত উপভোগ্য। নাচে যশোদারূপী স্বাতী লাহিড়ী, বালক কৃষ্ণরূপী পাপিয়া দেবনাথ ও সোমা নায়েক, বড় কৃষ্ণ শ্যামলী নন্দী ও রাধারূপী সুদত্তা দাস সুন্দর।

সেই সঙ্গে সখা এবং সখীদের নৃত্যও দর্শনীয়।

'বাসবদত্তা' নাটকটির নাট্যরূপ ও পরিকল্পনা শ্রীসন্তোষকুমার সেনের।

এতে অভিনয় করেন মহুয়া নিয়োগী (আনন্দ), স্মৃতিকণা সিংহ (উপগুপ্ত), অপর্ণা লাহা (বিশ্বজিৎ), অমিতা চ্যাটার্জি (রূপকুমার), অনিতা চ্যাটার্জি (অনন্তরাম) এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের ভূমিকায় শুক্লা দাস, গীতশ্রী বসু, মিনু কাবাসী ও ঝুমুর চৌধুরী অভিনয় করেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি দর্শকদের কিছুক্ষণের জন্য তন্ময় করে রেখেছিল।

এছাড়া অনুষ্ঠানে নাচ, গান ও যন্ত্রসঙ্গীতও পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীঅখিল নিয়োগী।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্তী ও ইন্দুব্রত চট্টোপাধ্যায়।

ইসারার শেষ প্রণাম : বারাসতের নাট্য গোষ্ঠী ইসারার নবতম নাট্যোপহার শেষ প্রণাম সম্প্রতি স্থানীয় রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে অভিনীত হোল। অভিনয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন নবাব (সিধুবাবু)-এর ভূমিকায় ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় (নাট্যকার ও পরিচালক)। এর পরে সুঅভিনয় করেন গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় নাড়ুৎ ঘোষ, তপন চট্টোপাধ্যায়, তপন ভট্টাচার্য, দুলাল সাহা, অজয় ভট্টাচার্য, সন্তোষ বিশ্বাস, দিবাকর চট্টোপাধ্যায় ও ছবি করের অভিনয়ও দর্শকদের প্রশংসা কুড়োয়।

—নাট্যসমালোচক

আয়না/মমতাজ

শতবর্ষের স্মরণীয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গিরিশচন্দ্র ও মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ সরকারকে ব্যঙ্গ করে 'থিয়েটার' নামে অমরেন্দ্রনাথ এক ব্যঙ্গ নাটিকা রচনা করেন। ২৫ আগস্ট ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সোনার স্বপন গীতিনাট্যের সঙ্গে 'থিয়েটার' মঞ্চস্থ হয়। মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয় নরেন্দ্রনাথ সরকার রচিত সাধের বাসর।

গিরিশচন্দ্র 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন বলে অমরেন্দ্রনাথও এক রাত্রির জন্য 'সধবার একাদশী' মঞ্চস্থ করে নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯ অকটোবর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

বেঙ্গল; মিনার্ভা স্টার এবং ক্লাসিকের মধ্যে তখন ক্লাসিক জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে। অমৃতলাল বসু কিছু টাকার প্রয়োজন হলে 'সরলা' নাটকের গ্রন্থস্বত্ব অমরেন্দ্রনাথের কাছে বিক্রয় করেন। ১১ নভেম্বর ক্লাসিকে সরলা মঞ্চস্থ হলো। দানীবাবু গদাধর আর অমর দত্ত বিধুভূষণ চরিত্রে অভিনয় করেন। অমরবাবু ১৬ নভেম্বর এক রাত্রির জন্য গদাধর চরিত্রে অভিনয় করেন। দানীবাবুর অভিনয়কে ম্লান করা অমরবাবুর পক্ষে সম্ভব হয় না।

ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্র নরেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে মতের অমিল হওয়াতে 'মিনার্ভা' পরিত্যাগ করে বাড়ীতেই বসে থাকেন। অনেকেই তখন অমরবাবুকে গিরিশচন্দ্রকে আবার ক্লাসিকে ফিরিয়ে আনবার পরামর্শ দেন। অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চেয়ে ক্লাসিকে যোগদানের প্রস্তাব দিলেন। গিরিশচন্দ্র কিছুতেই রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত 'থিয়েটার' নাটিকার অভিনয় বন্ধ ও প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইবার সর্তারোপ করেন। 'থিয়েটার' অসম্ভব জনপ্রিয়তার্জন করেছিল। তাই এবিষয়ে আপত্তি জানিয়ে অমরবাবু বলেন 'আপনি থিয়েটারের অভিনয় দেখে যদি বন্ধ করতে বলেন নিশ্চয়ই বন্ধ করবো।' গিরিশচন্দ্র অবুঝ ছিলেন না। একটি জনপ্রিয় নাটকের অভিনয় তিনি বন্ধ করতে চাইলেন না।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৫ নভেম্বর গিরিশচন্দ্র পুনরায় ক্লাসিকে যোগদান করলেন। ক্লাসিক তথা অমর দত্তের পক্ষ থেকে প্রচার করা হলো :

'নাট্যামোদী সুধীবৃন্দকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে নাটককারচূড়ামণি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত আমাদের সকল বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় যে কয়েকটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে। সকলগুলিরই সৃষ্টিকর্তা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র। প্রায় সকল অভিনেতা অভিনেত্রীই গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় শিক্ষিত। ইহার মধ্যে আমিও একজন। গিরিশবাবুর সহিত বিবাদ করিয়া নিতান্তই ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলাম। বড়ই সুখের বিষয় সমস্ত মনোমালিন্য অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া তাহার স্নেহময় কোলে পুনরায় তিনি টানিয়া লইয়াছেন। গিরিশবাবুর অন্য কোনও থিয়েটারের সহিত এখন কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। তাঁহার সমস্ত নূতন নূতন নাটক গানাভিনয়ে ও পঞ্চরং এখন ক্লাসিকে অভিনীত হইবে। ক্লাসিক থিয়েটার ব্যতীত অপর কোনও রঙ্গমঞ্চের সহিত গিরিশবাবুর কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র এখন ক্লাসিকের নিবেদনমিতি।'

১৯০১ খৃষ্টাব্দে ২ জানুয়ারী মঞ্চস্থ হলো অমর দত্ত রচিত কৌতুক নাট্য চাবুক। চাবুক নাটকটি বঙ্গবাসী সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বসুকে ব্যঙ্গ করে রচনা করা হয়েছিল। ছয় রাত্রির পর অবশ্য চাবুকের অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হয়।

২৬ জানুয়ারী ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হলো অশ্রুধারা।

কিন্তু ৯ ফেব্রুয়ারী অভিনয়তালিকার সঙ্গে পাওয়া গেল হীরালাল সেন নির্মিত চিত্রাবলী। এদিন নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে ভ্রমর দোললীলা হরিরাজ সরলা বুদ্ধ সীতারাম প্রভৃতি নাটকের দৃশ্যাবলী দেখে দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হন।

রাগ অনুরাগ　　রঞ্জিত মল্লিক/অপর্ণা/অনুপকুমার

৮ মার্চ মহেন্দ্রলাল বসু পরলোকগমন করেন। ১৬ মার্চ রাম নির্বাসন ১৩ এপ্রিল সধবার একাদশীতে গিরিশচন্দ্র নিমচাঁদ আর অমর দত্ত অটল এবং কাঞ্চন চরিত্রে অভিনয় করেন কুসুমকুমারী।

২০ এপ্রিল মনের মতন এবং ১ জুন গিরিশচন্দ্র নাট্যায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা মঞ্চস্থ হলো। গিরিশচন্দ্র দুটি চরিত্রে অভিনয় করেন। দানীবাবু পরে জাহাঙ্গীর চরিত্রে এবং অমর দত্ত নবকুমার চরিত্রে অভিনয় করেন। কপালকুণ্ডলা কুসুমকুমারী আর মতিবিবি চরিত্রে তারাসুন্দরী অভিনয় করেন। মতিবিবির চরিত্রে তারাসুন্দরীর অভিনয়কে কারোর পক্ষে ম্লান করা সম্ভব হয় না।

মিনার্ভা থিয়েটারে এই সময় অতুলকৃষ্ণ মিত্র নাট্যরূপায়িত কপালকুণ্ডলা মঞ্চস্থ করে। বলাই বাহুল্য ক্লাসিক প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করে। মিনার্ভায় প্রমথনাথ ঘোষ নবকুমার আর তিনকড়ি মতিবিবি চরিত্রে অভিনয় করেন।

২৭ জুলাই মৃণালিনীতে গিরিশচন্দ্র পশুপতি অমর দত্ত হেমচন্দ্র কিরণবালা মৃণালিনী আর গিরিজায়া চরিত্রে কুসুমকুমারী অভিনয় করেন। মৃণালিনীর অভিনয়ের সময় আগুনে গিরিশচন্দ্রের মাথার চামড়া পুড়ে যাওয়াতে তিনি আর পশুপতি চরিত্রে অভিনয় করেন না। দানীবাবু পশুপতি চরিত্রে অভিনয় করতে থাকেন।

অমর দত্তের মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করবার যে অসম্ভব জেদী ও প্রতিযোগিতা-পরায়ণ ছিলেন। অন্য থিয়েটার কোন নাটকের অভিনয় সংবাদ প্রকাশ করার সংগে সংগে তিনিও অনুরূপ নাটক মঞ্চস্থ করে বসতেন। কারোর সংগে কোন বিষয়ে মনো-মালিন্য দেখা দিলেই ব্যঙ্গ নাট্যের মধ্যে দিয়ে জবাব দিতেন। কারোর সঙ্গেই সম্মুখ সমরে তিনি পিছু হটতেন না।

পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়াতেই পূর্ণ গুপ্তকে ব্যঙ্গ করে রচনা করেন গুপ্ত কথা। ৩১ আগস্ট গুপ্ত কথা মঞ্চস্থ হয়। থিয়েটারে থিয়েটারে ব্যঙ্গ-নাট্যের মধ্য দিয়ে বেশ মজাদার লড়াই হতো। ৭ ডিসেম্বর অমরেন্দ্রনাথ তোমারই মঞ্চস্থ করেন। মিনার্ভা থিয়েটার তার জবাবে আমারই অভিনয় করলেন।

১৯০২ খৃস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারী ক্লাসিকে মঞ্চস্থ হলো দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বহুৎ আচ্ছা। মিঃ চম্পাট রূপে অমরেন্দ্রনাথ নতুন রূপে দেখা দিলেন। ১৯০২ খৃস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারী থেকে অমরেন্দ্রনাথ ম্যাটিনী অভিনয়ের প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে বেলা ১২টায় মধ্যাহ্ন অভিনয় চালু করেন। ম্যাটিনী অভিনয় আজও চালু আছে।

সংসার সীমান্তে/সৌমিত্র/শেলি পাল

প্রাধান্য অভিনয় থিয়েটারের ক্ষেত্রে না হলেও সিনেমার ক্ষেত্রে সম্প্রতি জনপ্রিয়তাঅর্জন করেছে। তবে অপেশাদার সম্প্রদায়গুলি প্রাক্তনকালীন অভিনয়কে চালু করেছেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে নতুন নাটকের মধ্যে শিবাজী কাটকজন উল্লেখযোগ্য।

শুধু অমরেন্দ্রনাথই নয় বাংলার নাট্য-জগত অনেক সময় এমন অন্যায় কর্মের সংগে লিপ্ত হয়ে পড়েছে যা কোন নাট্য ঐতিহাসিক কোনদিনই সমর্থন করবেন না। ন্যাশনাল থিয়েটারের পূর্বে থেকেই মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ নানাভাবে নাট্যান্দোলনকে সাহায্য করেছেন। অমৃতলাল বসু প্রভৃতি যখন গিরিশচন্দ্রের সংগে বিরোধ করেন তখন গিরিশচন্দ্রকে যেমন সমর্থন করেছেন—তেমনি সর্ববিষয়ে ন্যাশনাল থিয়েটার সম্প্রদায়কে সাহায্য করেছেন। অথচ অমৃতলাল যখন স্টার থিয়েটারের সর্বময় কর্তা ১৯০২ খৃষ্টাব্দেই শিশিরকুমারের সংগে তাঁর মনো-মালিন্য দেখা দিলে অবতার ব্যঙ্গনাট্য মঞ্চস্থ করে শিশিরকুমারকে আঘাত করেন। অমরেন্দ্রনাথও এমনি দলের মাঝে নিজেকে জড়িয়ে নিলেন লাট গোবিন্দ মঞ্চস্থ করে। পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞার লাট গৌরাঙ্গ শেষ পর্যন্ত ভক্ত বিটেল নামে অভিনীত হয়। এবং মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের হস্তক্ষেপে অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ পর্যন্ত ভক্ত বিটেল-এর অভিনয় বন্ধ করে দেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় করোনেশন দরবার অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাসিক থিয়েটারে দরবার উপলক্ষে অভিনয়ের জন্য আহূত হন এবং হীরালাল সেনও এই দরবারের চলচ্চিত্র গ্রহণের অনুমতি লাভ করেন। এই সময় তিনি নতুন করে ক্যামেরা আনান এবং ক্লাসিক থিয়েটারের বিভিন্ন নাটকের আরো নতুন নতুন দৃশ্য গ্রহণ করেন। জানুয়ারী থেকে জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন পুরোন নাটক অভিনীত হবার পর ২৯ আগষ্ট ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ক্লাসিকে মঞ্চস্থ হলো প্রতাপাদিত্য। ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য স্টার থিয়েটারে ১৫ আগষ্ট মঞ্চস্থ হবার সংগে সংগে অমরেন্দ্রনাথ হারাণচন্দ্র রক্ষিতের বঙ্গের শেষ বীর প্রতাপাদিত্য উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয়ে অগ্রসর হন। বলাই বাহুল্য স্টারের প্রতাপাদিত্যই জনপ্রিয়তাঅর্জন করে।

বসুমতির অন্যতম লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের একটি বিরূপ সমালোচনায় অমরেন্দ্রনাথ আবার তার বিরুদ্ধে হ্যাণ্ডবিল-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্লাসিক বাংলা রঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক রূপে প্রতিভাত। খ্যাতি এবং অর্থও প্রতিপত্তি সংগে সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ যেন খানিকটা অহমিকায়ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। মোসাহেবদের পরামর্শে অনেক-খানি প্রভাবান্বিত হতেন। সম্ভবতঃ এমনি পরামর্শেই ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ক্লাসিকের সংগে সংগে মিনার্ভা থিয়েটারও লীজ নিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ মে মিনার্ভার তদানীন্তন স্বত্বাধিকারী প্রিয়নাথ দাসের কাছ থেকে মাসিক ৫০০ শত টাকা ভাড়ায় মিনার্ভার পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। ৭ নভেম্বর ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ক্ষীরোদপ্রসাদের রঘুবীর নাটক দিয়ে উদ্বোধন করলেন মিনার্ভা থিয়েটারের।

আনন্দমঠের পর মিনার্ভায় হিরন্ময়ী অসম্ভব জনপ্রিয়তাঅর্জন করে। কিন্তু নানান মামলা-মোকদ্দমায় লিপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলেও অমর দত্তের পক্ষে মিনার্ভা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। মিনার্ভা সম্প্রদায় নিয়ে ঢাকায় অভিনয় করতে গিয়ে বহু লোকসান খেতে হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মনমোহন পাঁড়েকে মিনার্ভার লীজ হস্তান্তরিত করে দেন।

ঢাকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে অমরেন্দ্রনাথ ৩০ এপ্রিল ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সৎনাম মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু মুসলমান জনতার প্রতিবাদে ২১ মে সৎনামের অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়।

মিনার্ভার জন্য প্রায় ৫০০০০ টাকার লোকসান—মনোমোহন পাঁড়ের দেনা—দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য ৫।৬ হাজার ব্যয়িত—চারিদিক থেকে নানান বাধাবিপত্তি অমরেন্দ্রনাথকে গ্রাস করে ধরলো। ঠিক এমনি সময় বাড়ী ভাড়ার জন্য ২৫০০ টাকার যে চেকটি দিয়েছিলেন ব্যাঙ্কে টাকা না থাকার দরুন সেই চেকটি হলো ডিসঅনার্ড। ধারের জন্য মনোমোহন পাঁড়ের কাছে হাত পাতলেন। তিনি অস্বীকৃত হলে ক্লাসিক থিয়েটারের বিক্রয় কবলা লিখে দিয়ে শেষ পর্যন্ত টাকা পেলেন।

৪ জুন পেয়ার ১০ জুলাই শ্রীরাধা তরুণী সেন বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হলো। এদিকে সেপ্টেম্বর মাসে মনোমোহন পাঁড়ে মিনার্ভার সঙ্গে ক্লাসিকেরও স্বত্বাধিকারী বলে এক বিজ্ঞপ্তি দেওয়াতে অমরেন্দ্রনাথ দিশেহারা হয়ে পড়লেন। বিক্রয় কোবালার বিনিময়ে মনোমোহনবাবু সুদসমেত আড়াই হাজার টাকা দাবী করলেন। অমরেন্দ্রনাথ কপর্দক শূন্য। কোথায় পাবেন টাকা। এমনি বিপদে অমরেন্দ্রনাথকে উপযাচক হয়ে রক্ষা করলেন গিরিশচন্দ্র।

তিনি ২৫০০ টাকা ধার দিলেন অমরেন্দ্রনাথকে। এ যাত্রায় সম্পূর্ণ বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন অমরেন্দ্রনাথ।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ক্লাসিকে যেসব নাটক মঞ্চস্থ হলো সেগুলির মধ্যে চোখের বালি প্রেমের পাথার উল্লেখযোগ্য। প্রেমের পাথার জনপ্রিয়তা অর্জন করাতে অমরেন্দ্রনাথ কিন্তু আশার আলোক দেখতে পেলেন।

(ক্রমশঃ)

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

জলসা

গান-বাজনার মজলিশ : মজলিশ—এক সদ্যজাত সংস্থা। এর উদ্দেশ্য মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে সুনির্বাচিত অনুষ্ঠান পরিবেশনা এবং অনুষ্ঠানলব্ধ অর্থ দ্বারা দুঃস্থ শিল্পীদের সেবা।

গত ২৩ জানুয়ারী কলামন্দিরে মজলিশ পরিবেশিত গান-বাজনার আসরের প্রতিটি অনুষ্ঠানই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল শিল্পীদের আন্তরিকতার দাক্ষিণ্যে। প্রথম অনুষ্ঠান বাঁশীশিল্পী হিমাংশু বিশ্বাস। বাঁশের বাঁশী। কিন্তু শিল্পীর বাদনকুশলতায় বস্তুর সীমা পেরিয়ে এক অবাস্তব মধুরতায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল শিল্পী পরিবেশিত রাগ ইমন। ধীরে অতি ধীরে সকল রকম চাঞ্চল্যবর্জিত ইমনের প্রার্থনা যেন কলালক্ষ্মীর চরণে পৌঁছাল গান্ধারের আকুতি ও মধ্যমের শান্তিতে। বিলম্বিত অঙ্গের ঠিক এই ধরনের শুদ্ধ শান্ত এবং শাস্ত্রসম্মত রূপ আজকের দ্রুত ছন্দের অস্থিরতার যুগে দুর্লভ বলেই মনকে এমন করে স্পর্শ করেছে। বিলম্বিত একতালের ঠেকাটিও শিল্পীর মেজাজের অনুকূলে অনাহত রেখেছেন বিশ্বনাথ বসু। দ্রুত অংশে ত্রিতালের পটভূমিকায় তালের ছন্দ বৈচিত্র্য এবং তারই মধ্যে সুরে দাঁড়ানোর অসামান্য দক্ষতায় হিমাংশুবাবুর একনিষ্ঠ সাধনার স্বাক্ষর মেলে। বিলম্বিত দ্রুত উভয় অঙ্গের যথাযথ সংস্থাপনে রাগের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া গেল।

এর পর কণ্ঠ-সঙ্গীতের আসরে কলাবতী রাগে খেয়াল গেয়ে শোনালেন শ্রীমা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ একই তালে, বিলম্বিত একতাল ও দ্রুত ত্রিতাল। শিল্পীর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা শিক্ষা রাগ রূপায়ণে মুদ্রিত। তবে অনেক বেশী জমেছিল তাঁর ঠুংরী ও দাদরা। দেখে আনন্দ হল চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায় (এ'র সঙ্গে তবলা সঙ্গতে ছিলেন) অলক্ষ্যে এক পরিণতমান তবলাবাদককে পরিণত হতে চলেছিল।

সর্বশেষ অনুষ্ঠান ত্রয়ী বাদ্যযন্ত্র—হিমাংশু বিশ্বাস (সন্তুর) কালাচাঁদ লাহিড়ী (বেহালা) ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সরোদ)।

রাগ চন্দ্রকোষ। হিমাংশুবাবুর বাঁশী শুনে মনে হয়েছিল তিনি নিঃসঙ্গতাধর্মী আত্মলীন শিল্পী। কিন্তু সমবেত বাদ্যসঙ্গীতেও কুশলী পরিচালক ও প্রাণবন্ত ইঙ্গিতে সহযোগী শিল্পীদের গতি ও গতির পথ বেঁধে যথাযোগ্য পরিণতিতে পৌঁছে দিয়ে তিনি বহুমুখী প্রতিভার নিদর্শন পেশ করেছেন। সন্তুরে সরোদের অনেক প্রকাশভঙ্গী প্রবর্তনে তাঁর মৌলিকতা লক্ষ্য করবার মত।

সরোদে বাহাদুর খাঁর শিষ্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বেহালায় আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিকের ছাত্র কালাচাঁদ লাহিড়ী তাঁদের সম্ভাবনাদীপ্ত বাজনা দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিলেন এই ধরনের ত্রয়ী এবং সমধর্মী অনুষ্ঠানের উদ্গাতা আলাউদ্দিন ঘরানার শিল্পীবৃন্দ। তবলায় ছিলেন বিশ্বনাথ বসু।

নবীন ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় : হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্ট-এর এক উল্লেখযোগ্য অবদান অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত নবীন গীতিনাট্য এল পি রেকর্ড কাহিনীর দক্ষিকতা ও নাট্যপ্রবাহের দিকটির গতি লক্ষ্য রেখেছে অশোকতরু তুমি আবেগ নিয়ে কণ্ঠে গেয়েছেন কেন ধরে রাখা চলে যায়, আমার মল্লিকা বনে যাচ্ছে করুণ সুরে আমার সকল নিয়ে। সমবেত কণ্ঠের গানগুলিও সুপরিবেশিত। গ্রন্থনায় আছেন পার্থ ঘোষ গৌরী ঘোষ, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রদীপ ঘোষ।

ছড়াগানের আসর : সম্প্রতি কলামন্দিরের বেসমেন্ট হলে জয়-জয়ন্তী আয়োজিত ছড়াগানের আসর শিশুদের একাধারে আনন্দ এবং সংগীতের মাধ্যমে শিক্ষাদানের এক মধুর অভিজ্ঞতার স্মৃতি হয়ে থাকবে। শিল্পী শ্রীমতী জপমালা ঘোষ গানের আগে বাংলার সমৃদ্ধ ছড়াগানের সংস্কৃতি (যা আজ প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছে) ও এই বিষয়বস্তুতে শ্রীমতী ঘোষের একনিষ্ঠ চিত্তনিবেশের বিষয় উল্লেখ করে তাঁকে সাধুবাদ জানান শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী। শিবনারায়ণ ঘোষালের ভায়া ওয়াই এছ মুজকীর অক্টেট এবং সুমিতা বসু ও বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় শ্রীমতী ঘোষ তাঁর দু ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে ছড়াগানের এক ঘুমপাড়ানী পরিবেশ সৃষ্টি করে শ্রোতাদের যেন মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। ছড়াগানের সহজ সুর ও কথায় শিশুর কচিমনের উন্মেষ অনুভব ও ক্রম-পরিণতির ছবিটি লক্ষ্য করবার মতই। এই ধরণের আসর মাঝে মাঝে হওয়া দরকার। এতে শুধু শিশুমনই গড়ে ওঠে না এক শক্তিশালী গীতিকাব্যের ধারাটিও বেঁচে থাকে।

সুচিত্রা মিত্র ও ধীরেন বসু ইস্পাত নগরীতে : গত ২৩ জানুয়ারী বোকারোর সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে এক সঙ্গীত-সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের শিল্পীদ্বয় ছিলেন সুচিত্রা মিত্র ও ধীরেন বসু। শিল্পীদের আপনাপন ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল গানগুলি এক ভাব-গম্ভীর ও প্রাণময় পরিবেশ রচনা করে। সাংস্কৃতিক পরিষদের এই অনুষ্ঠান প্রবাসী বাঙালীদের শিল্পকর্মে রুচির স্বাক্ষর হয়ে থাকবে।

সিকসথ স্ট্রিং-এর অনুষ্ঠান : হাওড়ার সুবিখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সিকসথ স্ট্রিং-এর বাৎসরিক উৎসবের স্মরণীয় সাফল্যের জন্য ধন্যবাদার্হ সংস্থার পরিচালক ও উৎসবের উদ্যোক্তা শ্রীকানাই রায়চৌধুরী।

সাংস্কৃতিক উৎসবের আগে এঁরা সংবর্ধনা জানান শ্রীমতী কানন দেবী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও সুজিত নাথকে। শিল্প ও সংস্কৃতির জগতে শ্রীমতী কানন দেবী ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের বহুধাবিস্তৃত অবদানের কথা উল্লেখ করে সভাপতি বলেন, কানন দেবী শুধু চলচ্চিত্র জগতেরই নন— বৃহত্তর

সিকসথ স্ট্রিং-এর অনুষ্ঠানে অভীক কুন্ডু কৌশিক বসাক

বর্তমান সাংস্কৃতিক উৎসবগুলিতে অপরিহার্য। এছাড়া সামাজিক কল্যাণমূলক কাজেরও তিনি অন্যতমা নেত্রীস্থানীয়া।

আর জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ না থাকলে সারা ভারত আজ বাংলাদেশের শিল্পীদের তালবাদ্য শুনতেই পেতো না। শুধু তবলা নয় সংগীতের প্রতিটি শাখায় তাঁর সীমাহীন অবদানের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

সুজিত নাথের প্রসংগে শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও তাঁর শিষ্য কানাই রায়চৌধুরী বলেন, বিদেশী গীটারের ভারতে এমন ব্যাপক জনপ্রিয়তা সৃষ্টির মূলে আছে শ্রীসুজিতনাথের একনিষ্ঠ সাধনা।

রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান সুরু হয়। তারপর তবলাছন্দ। তালবাদ্য নিয়ে এই অর্কেস্ট্রার পরীক্ষানিরীক্ষা শ্রীঘোষ সুরু করেছিলেন শ্রীমতী পিকচাসে'র ব্যানারে 'আশা' চিত্রে। প্রায় পঞ্চাশজন শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। ত্রিতালের পটভূমিকায় দাদরা কাহারবা একতাল কখনও একক কখনও বা দ্বৈত-বাদনে—এবং সর্বশেষে সমবেতভাবে ত্রিতালে প্রত্যাবর্তন।

এরপর একে একে একক, দ্বৈত ও সমবেতভাবে গীটারে রবীন্দ্রসংগীত ও বাদ্যবৃন্দ কানাই রায়চৌধুরীর পরিচালনায়। কিন্তু সবচেয়ে ভাল লেগেছে শিশুশিল্পী অভীক কুন্ডু ও শুভেন্দু মাইতির আর্তি।

গঙ্গাপুরী মিউজিক কলেজ : গংগাপুরী মেউজিক কলেজের পূর্ব পাটিয়ারী প্রাঙ্গণে ৫ম বার্ষিক সংগীত সম্মেলন ২৫ এবং ২৬ জানুয়ারী দুই রাত্রব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বহু বিশিষ্ট শিল্পী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে শ্রোতাদের আনন্দ দেন। প্রখ্যাত সেতার শিল্পী মণিলাল নাগের হেমন্ত রাগে ও গাড়া ধুন রাগে বাজনা সমবেত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। শিল্পীর আলাপ ও ঝালার কাজ বহু দিন মনে রাখার মত। শিল্পীর সঙ্গে তবলা সংগত করেন হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রখ্যাত শিল্পী বিজয়কুমার কিচলু পর পর কয়েকখানি খেয়াল পরিবেশন করেন। শিল্পীর কণ্ঠে বিশেষ করে বেহাগ রাগে গান প্রত্যেকের মনে বিশেষ রেখাপাত করে।

প্রফেসার বিমল ভট্টাচার্য (কিড়ানা ঘরানার গায়ক) প্রথমে রাগ কৌষিক কানাড়া এবং পরে মাঝখাম্বাজ ঠুংরি পরিবেশন করেন। খেয়ালের সুরের জাল বোনা এবং সাপাট তানের কাজ শ্রোতাদের মন বহুকাল ভরে থাকবে। শিল্পী পরে ঠুংরি 'আব কি সাওয়ন ঘর যাউ' পরিবেশন করেন। শিল্পীর কণ্ঠে বিশেষ করে মীড় এবং পুকারের কাজ প্রশংসার দাবী রাখে। গানের সঙ্গে সংগত করেন প্রণব ভট্টাচার্য এবং সারেঙ্গীতে সহযোগিতা করেন কানাইলাল মিশ্র। শ্রীমতী রুকমা বাই ভজন খেয়াল এবং ঠুংরি পরিবেশন করেন।

বনহুগলী পঙ্গু হাসপাতালে সংগীতানুষ্ঠান : বনহুগলী পি এন রায় পঙ্গু হাসপাতালের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ৭ ফেব্রুয়ারী এক মনোজ্ঞ সংগীত নৃত্য আবৃত্তির আসর বসেছিল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে। কর্মী এবং রোগীদের মধ্যে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী মুক্তা রায়চৌধুরী, সাধনা রায়, সীমা পাল বীণা ভৌমিক ও দুলাল হালদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ম্যাজিকে চন্দ্রনাথ সরকার, নৃত্যে রূপা চৌধুরী, রশ্মি চৌধুরী, রূপা দাস এবং সঙ্গীত পরিচালিকা ডালিয়া বসুরায় নিজ নিজ ভূমিকায় দর্শকদের আকৃষ্ট করেন। বাইরের শিল্পীদের মধ্যে বরাহনগরের রবি বীণা শিল্পী গোষ্ঠী এবং একক সঙ্গীত পরিবেশনে সর্বশ্রী মৃন্ময় মিত্র—রবীন্দ্রসঙ্গীতে, শিবনাথ দাস—হাসির গানে এবং সর্বশেষ শিল্পী প্রখ্যাত শ্যামাসঙ্গীত [illegible] নিখিল বসু উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সর্বশ্রী অখিল পাল, স্বদেশ বসু ও ভাস্কর বসুরায়।

হাসপাতালের কর্মী ও রোগীদের আর্থিক ও কায়িক সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। সভানেত্রী ছিলেন হাসপাতালের সিস্টার ইন চার্জ মল্লিকা হোর।

মীড় সঙ্গীত সংস্থা : আগামী বৃহস্পতিবার ২০ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত সংগীত সংস্থা মীড়-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে সকল দে নিবেদিত পৃথিবীর জন্ম নৃত্যনাট্যটি সংগীত সংস্থার শিল্পিগণ কর্তৃক মঞ্চস্থ হবে।

—চিত্রাংগদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১৪ বর্ষ

অমৃত

৪২ সংখ্যা

ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য

Friday 28th February, 1975 — শুক্রবার ১৫ ফাল্গুন, ১৩৮১

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্য গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বলে
বার্ষিক	টাকা ৩৩.০০	টাকা ৪০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৬.৫০	টাকা ২০.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮.২৫	টাকা ১০.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন: ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীইন্দ্রাণী চৌধুরী

সম্পাদকীয়

এশিয়ার আশংকা

এশিয়ার জনসংখ্যা ও তার দারিদ্র্য নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মনে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের বাস এই মহাদেশে। কিন্তু জাপান এবং অধুনা চীন বাদ দিলে এশিয়ার অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, নিছক নিজেদের সরকারের অবহেলা এবং অপদার্থতার দরুন দক্ষিণ এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশের মানুষের চরম বিড়ম্বনা ঘটবে এই শতাব্দীর বাকী ক'বছরের মধ্যে। এশিয়া অ্যাণ্ড প্যাসিফিক সংস্থার এক সমীক্ষাপত্রে প্রকাশিত বিবরণও রীতিমত ভয়াবহ। দক্ষিণ এশিয়ার যে-সমস্ত দেশে কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে তাদের টেনে তুলবার জন্য যদি সামগ্রিক চেষ্টা করা না হয় তাহলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যাবে।

একে নেহাৎ আতঙ্ক ছড়ানোর রিপোর্ট বলে উপেক্ষা করা হয়তো ঠিক হবে না। ভারতীয় উপমহাদেশ-সহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশেরই প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি। এগুলো নতুন স্বাধীন দেশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এ-দেশগুলো ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছে। আজকের সুখী ও সচ্ছল সমাজ বলে যারা নিজেদের দাবি করে তাদের অধিকাংশই ছিল ঔপনিবেশিক শক্তি। ইংরেজ, ফরাসি, পর্তুগীজ, ডাচ, বেলজিয়ান সবারই বিরাট উপনিবেশ ছিল এশিয়া ও আফ্রিকায়। এই উপনিবেশগুলোর সম্পদ লুণ্ঠন করে তারা বড়লোক হয়েছে। উপনিবেশগুলোর উন্নয়নে যতটুকু না করলে শাসন বজায় রাখা যায় না তার বেশি তারা কিছুই করেনি। নিরক্ষরতা, ব্যাধি এবং অকালমৃত্যু ছিল এই দেশগুলোর মানুষের বিধিলিপি। তার ফলে, স্বাধীন হয়েও এই দেশগুলো স্বাধীনতার প্রকৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি। ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। দেশ স্বাধীন হল, কিন্তু তার প্রথম পুরস্কার জুটল লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আর হানাদারের আক্রমণ। এই ধাক্কা সামলাতেই প্রচুর ব্যয় হয়ে গেল। পাশে একটা বৈরি রাষ্ট্র সৃষ্টি করে রাখার ফলে প্রতিরক্ষার ব্যয় উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট ভাঁড়ারে হস্তক্ষেপ করতে লাগল স্বাভাবিক কারণেই। ঔপনিবেশিক শাসনের কুফল স্বরূপ জটিল স্বার্থপর ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্র। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও তাই প্রত্যাশিত ফল লাভ হল না।

এ রকম অবস্থা শুধু ভারতে নয়, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, পাকিস্তান সর্বত্রই। তবু ভারতবর্ষ এর মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা চালু রেখেছে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ভারী শিল্পের বুনিয়াদ করেছে মজবুত এবং সর্বোপরি সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন অব্যাহত রাখতে পেরেছে। অন্যান্য অনেক দেশই তা পারেনি। সামরিক একনায়কতন্ত্র নতুন স্বাধীন দেশগুলোর গলা টিপে মারছে। শাসনের এই অব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ। তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিকল্পনা তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারছে না। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না দেশের অর্থনীতি। বিশেষজ্ঞরা এই চূড়ান্ত ব্যর্থতার জন্যই আশংকা প্রকাশ করে বলেছেন যে মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্য ঘাটতি সমস্যা এবং ঋণ পরিশোধের চাপ এড়াবার জন্য যদি এই দেশগুলো নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উন্নয়ন কর্মসূচীর মৌল পরিবর্তন না করে তাহলে সমূহ বিপদ। কীভাবে এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা নিয়েই এখন চিন্তা সুরু হয়েছে।

গরিব এবং অনুন্নত দেশগুলোর সহায়সম্বল কম বলে তার জীবনযাত্রার লক্ষ্য পশ্চিমী দেশগুলোর মতো কখনোই হবে না। কিন্তু মোটামুটি খেয়ে-পরে এবং মাথার ওপর আস্তানা রেখে সবাই বাঁচতে চায়। এই কাজ করতে হলে নিছক পশ্চিমীদের অনুকরণ বা তাদের কলাকৌশল প্রয়োগ সব সময় বাঞ্ছিত নয়। আমাদের দেশের অবস্থা বিবেচনা করে এবং এখানে সহজলভ্য এমন উপকরণের ওপর নির্ভর করেই কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে। ইদানীং তাই কৃষি উৎপাদনের দিকে আগেকার তুলনায় বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে। অনুন্নত এবং গরিব দেশগুলো নিজেদের মধ্যে সাহায্য ও সহযোগিতার রাস্তা যদি আরও বাড়িয়ে দেয় তাহলে ধনী দেশগুলোর কৃপা ও করুণার ওপর এতটা নির্ভরশীল হতে হয় না। এশিয়া ও আফ্রিকার পারস্পরিক সহযোগিতাও এ-বিষয়ে অত্যন্ত কার্যকর হবারই সম্ভাবনা। জনসংখ্যা নিশ্চয়ই একটা উদ্বেগের কারণ। বেশি জনসংখ্যা নিয়েও চীন তার অর্থনীতিকে সচল ও সজীব রাখতে পেরেছে। এর একটা প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে তারা পশ্চিমী সচ্ছল সমাজের অনুকরণ করতে যায়নি এবং তার জনবলকে সে বোঝা মনে না করে তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে। সুতরাং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করে

এক সময় খেতে পারতেন

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমার এ-কাহিনী এই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত রেশনের যুগের নয়, আরও গোটা ষাটেক বছর পেছিয়ে যেতে হবে, তখন লোকে খেতে পেতো, খাওয়াবার দিল্‌ও ছিল। এক কথায় দেশে ভরা পেটের আনন্দ ছিল। হয়তো দুর্ঘটনাও ঘটে যেত ক্বচিৎ। এখন আনন্দও নেই, দুর্ঘটনাও নেই। নিমন্ত্রণপত্রের পাদটীকায় ভাষান্তরে জানিয়ে দিতে হচ্ছে—বেশি আশা থাকে তো না উপস্থিত হওয়াই ভালো।

রায়বাহাদুর অন্নদাচরণ চক্রবর্তী ছিলেন জমিদার। ভাগাভাগিতে অবস্থা একটু পড়েই আসছিল, তবে সামলে গেছে। তার জন্যে তিন ছেলের দুটিকেই চাকরি নিতে হয়েছে, তবে উঁচু দিকেই, একজন ডেপুটি, একজন মুন্সেফ। দুটি নাতি সে বেগতিক দেখে একবার এ-ব্যবসা ও-ব্যবসায় ঠুকরে লোকসান দিয়ে যাচ্ছে, তাতে বিশেষ ক্ষতি হয়নি। এখনও একান্নবর্তী পরিবার।

অন্নদাচরণ ছিলেন খাইয়ে মানুষ। শোনা যায় পাঁঠাটা মাঝারি সাইজের হলে তাতে কাউকে ভাগ বসাতে দেওয়া হোত না। তেমনি পাল-পার্বনে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াতেন। কারুর বিশেষ পারদর্শিতা আছে দেখলে রুপোয় বাঁধানো হুঁকো হাতে নিয়ে সামনে বসে যেতেন। দেবতা সম্বন্ধেও ঐ কথা। কালীভক্ত ছিলেন। চারিদিকে বলিদান বন্ধ করার হিড়িক উঠল, উনি করতে দেননি। বললেন—'ও বেটি কি তোদের জাবের ছিবড়ে চিবুবার মেয়ে? তার চেয়ে এ বোষ্টমি পুজো বন্ধ করে দে।'

চুরানব্বই বছর বয়সে মারা গেলেন। তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ হচ্ছে। ওদিকে ঘটা করে দানসাগরের আয়োজন হচ্ছে, একটা প্রশ্ন উঠল, কর্তা অত খেতে আর খাওয়াতে যে ভালোবাসতেন সে সম্পর্কে বিশেষ কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে? ফলের মধ্যে আমটা অত্যন্ত প্রিয় ছিল; আমের সময় একেবারেই নয়, তবে তার জন্যে কোথায় দোফলা আম পাওয়া যায় সন্ধান করে নিয়ে আসবার জন্যে চারিদিকে লোক ছুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় শখ, খাওয়ানো; সেইরকম ভোজনবিলাসী কাউকে পেলে হুঁকো হাতে করে সামনে বসে চেপে চেপে খাওয়ানো। ঠিক হোল, এই ব্যাপারটাকে একটা বিশেষ রূপ দিতে হবে তাঁর আত্মার বিশেষ তৃপ্তির জন্যে। অনেক আলোচনার পর সাব্যস্ত হোল—কর্তা সমস্ত পঙক্তির মধ্যে এবিষয়ে সবচেয়ে যোগ্যতম খাইয়েকে বেছে নিয়েই যখন তার সামনে বসে উৎসাহিত করতেন, তখন একজনের জায়গায় আরও কয়েকজনকে ঐভাবে পরিতুষ্ট করলে সেখানে বোধহয় তাঁর তৃপ্তিসাধন করা হবে। পনের সের থেকে আধমন পর্যন্ত উদরসাৎ করতে পারে এরকম ভোজনবিলাসী খোঁজ করা হোল। বিশেষ রকম দক্ষিণার ব্যবস্থা থাকবে।

সে-যুগ নেই। দশ থেকে তেরোসেরী খাইয়ে চারজন পাওয়া গেল। তারা কথা দিল, এর ওপর যথাসাধ্য তুলে তারা পরলোকগত কর্তার সন্তোষবিধান করবার চেষ্টা করবে।

অন্নদাচরণের শ্রাদ্ধে একটা সাড়া পড়ে গেল।

ঠিক হোল, পিতার মতোই দুই ভাই সামনে বসে এদের চারজনের উৎসাহ বর্ধন করবেন।

সব ঠিকঠাক, আগামীকল্য ব্রাহ্মণ ভোজন। পাড়ার কয়েকজন মাতব্বর গোছের ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছেন, অন্যান্য গল্পের সঙ্গে খাওয়া-খাওয়ানর কথা নিয়ে একাল-সেকালের আলোচনা হচ্ছে, এই সময় একটি বছর আঠারো-উনিশের ছেলে এসে বড় ভাই ষষ্ঠীচরণের পায়ের ধুলো নিয়ে একখানি খাম হাতে দিয়ে বলল—'বাবা দিলেন। ...আমি হচ্ছি নীলরতন হালদারের ছেলে।'

ষষ্ঠীচরণ খামটা উলটে দেখলেন ৭৪॥ লেখা রয়েছে, অর্থাৎ গোপনীয়, বা নিতান্ত ব্যক্তিগত। ছিঁড়ে আগাগোড়া পড়ে নিয়ে বললেন, 'তুমি একটু অপেক্ষা করো, ব্যবস্থা করছি।'

পরে করালীচরণকে ডাকিয়ে আনিয়ে বললেন—'তুমি এর সঙ্গে নিজে চলে গিয়ে নীলরতনমশাইয়ের বেহাইকে নেমন্তন্ন করে এসো। বলবে, বাবা খুবই ব্যস্ত রয়েছেন,

নৈলে নিজেই আসতেন। আর নীলরতনকেও বলবে, তাঁর জায়গায় নয়, তাঁকেও আসতে হবে, যেন অবিশ্যি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন।'

ওরা দুজনে চলে গেলে ছোটভাই ভবানীচরণের হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন —'পড়ে দ্যাখো।'

ভবানীচরণ অল্প হাসতে হাসতে পড়ে নিয়ে মন্তব্য করলেন—'ঠাট্টা জমিয়েছেন ভালো বেহাই।'

তখনকার মতো ৭৪|| দেওয়াটা চাপা পড়লেও বেরিয়ে পড়তে দেরি হোল না। নীলরতন গ্রামের একজন খুবই সম্পন্ন গৃহস্থ, তবে জাটকৃপণ বলে গ্রামে বদনাম আছে। কিছুদিন আগে পাশের গ্রামে মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন। বেহাই কোন একটা অছিলা করে ছেলের বিবাহসূত্রে তাঁর ওদিকের বেহাই পাঠিয়ে দিয়ে ফাঁপরে ফেলেছেন। নীলরতন তাঁকে এই ভোজের সুযোগ নিয়ে চক্রবর্তীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন। ও যে খেতে পারে। একটা বেলা তো বাঁচবেই চাইকি, রাত্রিটাও বাঁচতে পারে। ভোজের ব্যাপারই তো, তাও চক্রবর্তীদের বাড়ি, বসে খাওয়ানো নিয়ে একটা নাম রয়েছে, তার ওপর কর্তার শ্রাদ্ধে আবার খুঁজে পেতে এনে খাওয়ানো।

সাড়ার ওপর আরও একটা সাড়া পড়ে গিয়ে সমস্ত গ্রামটা গমগম করতে লাগল। অমন দানসাগর শ্রাদ্ধের আলোচনাকে ছাপিয়ে নীলরতনের নূতন সমস্যা আর তার চতুর সমাধানের কথাটাই রইল জেগে। বেহাইয়ের বেহাই সম্বন্ধে গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। লোকটির নাম সদানন্দ, তিন-খানা গ্রাম পেরিয়ে বাড়ি। ডাকসাইটে খাইয়ে একজন। ও অঞ্চলের মুনকে রঘু বলে পরিচিত। বিশেষ নিমন্ত্রণাদিতে আয়োজনের অনুপাতে উদরের আকার বেড়ে গিয়ে অসাধ্যসাধন করতে পারেন। এসব গুজব বাড়তে বাড়তে যেমন দাঁড়ায়। দেহের আকার সম্বন্ধেও একটা প্রায় অলৌকিক বিবরণ প্রচার হয়ে সবার কৌতূহলটাকে একেবারে চরমে ঠেলে দিল।

এত সমারোহের ভোজ, খাওয়ার আয়োজন সবার নীলরতনের বেহাইয়ের বেহাইয়ের ভোজনপর্ব দেখার আগ্রহে রুদ্ধশ্বাস হয়ে গেল।

পরদিন যথাসময়ে সদানন্দ এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে করে নিয়ে এল নীলরতনের ছেলে, প্রসাদ। ভবানীচরণ আরও কয়েকজনের সঙ্গে নিমন্ত্রিতদের শামিয়ানার মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসাচ্ছেন নীলরতনের ছেলে জানাল—বাবার শরীরটা খারাপ তিনি আসতে পারলেন না। ইনি আমার তালুইমশাই, বাবা বললেন আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে।'

ভবানীচরণ যেন অপেক্ষাই করছিলেন—'ও, আপনিই ...আসুন। আসুন।'—বলে কিছু কুশলাদি প্রশ্ন করতে করতে নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে শামিয়ানার ভেতরে দুজনকে ফরাসের ওপর বসিয়ে দিলেন।

সামনের দিকেই। সমস্ত গ্রাম নিয়ে নিমন্ত্রণ—শামিয়ানা ভরে এসেছে। দেখার জন্য একটু হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ঘুরে ঘাড় তুলে; একটু যারা বেশি পেছনে, তাদের মধ্যে বিশেষ কৌতূহলী কেউ কেউ উঠে এসে খানিকটা তফাৎ থেকে আড়চোখে দেখে নিয়ে আবার গিয়ে বসল নিজের নিজের জায়গায়।

এমন বিশেষ কিছুই নয়। ঢিলেঢালা শরীর, হয়তো একটু স্থূলত্বের দিকেই গৌরবর্ণ, মুখে খুব সূক্ষ্ম একটি নির্লিপ্ত প্রসন্ন হাসির ভাব সবার ঠাট্টা-প্রশংসার মধ্যে দিয়ে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে যেতে ভোজনবিলাসীদের যেমন এসে যায় সাধারণত। তবে স্বল্পবাক বলেই মনে হয়। পাশের দু'একজন একটু গল্পে নামাবার চেষ্টা করল, আহার নয়, অন্য প্রসঙ্গ দিয়েই অল্প কথায় উত্তর দিয়ে সামনে চেয়ে বসে রইলেন।

বাড়ির দিক থেকে এসে একজন করজোড়ে বলল—'ব্রাহ্মণরা গা তুলুন।'

ব্রাহ্মণদের একটি পুষ্ট ভিড় শামিয়ানা ছেড়ে এগুল। সদানন্দ নীলরতনের ছেলের সঙ্গে পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন—'তিনি কোথায়? আমাদের বেহাই?' বলতে বলতে ষষ্ঠীচরণ একটু ব্যগ্রভাবেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এলেন।

সাবেক আমলের উঁচু দোতলা প্রকাণ্ড সদর বাড়ি। সাবেক আমলের সিঁড়ি একটু সংকীর্ণই। তাই বেয়ে ভিড়টা আরও চাপ হয়ে গিয়ে এগিয়ে চলেছে, সদানন্দ খানিকটা দূরে থেকেই থেমে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—'ওপরেই যেতে হবে?'

ভবানীচরণ বললেন—'হ্যাঁ, দোতলার ছাতে। ভোজের খাওয়ানো ওখানেই হয় আমাদের। ...কষ্ট হবে?'

এক সেকেন্ড একটু যেন কি ভেবে নিয়ে সদানন্দ বললেন—'না, তেমন আর কি? চলুন।'

ওপরে এমড়ো-ওমড়ো চারটে সারিতে জায়গা হয়েছে। সমস্ত প্ল্যান করাই ছিল ভেতরে ভেতরে। নীলরতন স্বভাবতই চিঠিতে 'খাইয়ে মানুষ' বলে পরিচিত করতে পারেন নি কুটুম্ব মানুষকে। ষষ্ঠীচরণ শিষ্টাচার রক্ষা করে সদানন্দকে সঙ্গে করে প্রথম পঙ্ক্তির, একেবারে শেষের আসনের সামনে নিয়ে গিয়ে বললেন—'আপনি এইটেতে বসুন। খানিকটা নিরিবিলি হবে।'

প্ল্যান মতো খালিই রাখা হয়েছে এ আসনটা।

সদানন্দ একটু যেন থতমত খেয়ে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—'এইটাতে? ...তা বেশ।'

পা বাড়িয়ে আবার একটু থমকে গিয়ে পাশে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—'অর ওগুলো?'

বেশ খানিকটা জায়গা বাদ দিয়ে আরও চারটে আসন। আসন পাতার বহর জলের ব্যবস্থা, খুরির আকার—সব কিছু দেখলেই বোঝা যায় ব্যবস্থাটা বিশেষ রকমের।

পরিবেশন আরম্ভ হয়ে গেছে, ক তরকারি যা পড়ছে তার পরিমাণও (রকম। একটু সতৃষ্ণ নয়নেই চেয়ে আছে সদানন্দ।

ভবানীচরণ একটু কুণ্ঠিতভাবে বললেন—'আজ্ঞে—কি, যে বলে—ওঁ একটু বিলম্ব হয় আহারে। তাই পঙ্ক্তির আর সবাইয়ের যাতে অসুবিধে হয়, একটু আলাদা ব্যবস্থা করতে হয়েছে।'

সদানন্দ একটু কুণ্ঠিতভাবে হেসে বললেন—'আমাকেও তাহলে ঐদিকে একটু জায়গা করে দিলে ভালো হয়। আমারও ঐ দোষ। ওর নাম কি, এক সময় আহারেও রুচি ছিল। বয়েস হয়ে সেটা গেছে, তবে বিলম্ব করে খাওয়ার ঐ দোষটুকু গেছে থেকে। মানে, একবার বসে পড়লে কেউ তো পঙ্ক্তি ছেড়ে উঠতে পারবেন না...'

ওঁর মুখ দিয়ে বলাবারই প্ল্যান। একটু তাড়াহুড়ো পড়ে গেল—'ওরে, এঁর জন্যেও একটা ঐ সারিতেই, ওঁদের চার-জনের সঙ্গে। একেবারে শেষটায়...শীগ্গির নিয়ে এসো। এঁরা বসতে পারছেন না...এঃ তোমাদের যেমন! আগে একটু জেনে নিতে হয় কে কিরকম চান...উনি আবার নতুন মানুষ...'

সমস্ত একটু আড়ালে হাতের কাছেই ঠিক করা ছিল, দেরি হোল না।

এর পর, বাঁধ একবার ভেঙে যেতে আর আটকালও না।

খুব যে বিলম্ব করে খাওয়ার অভ্যাস এখনও শেষ হোল না। আর চারজনের সঙ্গেই তাল রেখে এগিয়ে চললেন সদানন্দ। এদিকে পরিবেশনের জন্য আলাদা দুজন মানুষ। দিস্তের পর দিস্তে লুচি। বেগুন ভাজা ও ছক্কা, তদনুযায়ী ডাল, তরকারি, মাছ, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। শুধু একটা রেষারেষির ভাবও এসে পড়ল।...'ওকি আচার্য মশাই! —যদুকাকা, করছেন কি ও! ...আপনাদের প্রত্যেকের মাপা মন্ড রয়েছে ওদিকে—সের ধরে। এখনও অর্ধেক হয়নি—মিষ্টিতে আর কত তুলবেন?—মুখ মেরে দেওয়ার জিনিস...'

তামাসা জমে উঠেছে। ষষ্ঠীচরণও এসে একটা চেয়ারে বসলেন—কর্তার হুঁকোটা হাতে করে।

—'ওকি হচ্ছে যদু খুড়ো তোমাদের। শেষে সুনামগঞ্জের দুর্নাম করবে? একটু কাপড়ের কষি ঢিলে করে দাও।...

—তোমাদের আক্কেল আর গাঁয়ের ইজ্জতের কথা ভেবে বলছি—বেহাইয়ের এ দিকে সের দশেক হয়ে এল—এখনও দই মিষ্টান্ন, রাবড়ি সব বাকি—মদখুড়ো আবার মিষ্টির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে...নাও, চালিয়ে যাও...'

মিষ্টান্ন পর্ব শুরু হয়ে গেল।

সবাই রাঙা হয়ে উঠছেন। খুড়োর রংটা কালো তামাটে হয়ে উঠেছে। শীতকাল তর্জনী দিয়ে মাঝে মাঝে ঘামও ঝেড়ে ফেলতে হচ্ছে [illegible]

...িয়ে যাচ্ছে। লুচি তরকারির দিকটা শেষ হয়ে গেলে সদানন্দ একবার শরীরটাকে একটু চাড়া দিয়ে টেনে একটু ঝাকানি দিয়ে বসলেন। আর সবাই গাঁয়ের লোক। এই মধ্যে একটু কথাবার্তা, রহস্যালাপে যোগ দিচ্ছিলেন, সদানন্দ একেবারে নিশ্চুপ ছিলেন, এতক্ষণে একটু বিনীত হাসির সঙ্গে বললেন—'খেয়েছি একসময়। সদানন্দের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে যাবে এমন লোক ও তল্লাটে থাকতে দিইনি।' বোধহয় সময় নেওয়ার জন্যেই নিজের আহারের একটি গল্পও ফাঁদলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন—'হোল কত আমাদের সেটাও একবার দেখতে হয়।'

এদিকে আর সবার খাওয়া-আঁচানো শেষ হয়ে গিয়ে পান হাতে সবই ঘিরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম মন্তব্য করছে। পরিবেশকের একজন হিসাব নিয়ে এসে বলল—'যদুকাকার সাত সের, নারাণজ্যাঠার সাড়ে আট, হলধরমামার ... সের, চক্রবর্তীর সাড়ে আট। বেহাই-মশাইয়ের বারো। তার মধ্যে লুচি সাড়ে তিন সের্তে।'

সদানন্দ একটু বিনীতভাবে হাসলেন, বললেন—'খাওয়া আর তেমন আছে কৈ?'—

মিষ্টান্ন পর্ব আরম্ভ হোল। দই, রাবড়ি রসগোল্লা সন্দেশ পান্তুয়া মিহি-দানা অমৃতি আলাদা আলাদা ত্রিজেল আর গামলায় প্রত্যেকের নিজের নিজের সামনে সাজিয়ে রাখা হল। আবার চলল এক ঝোঁক।

এদিকে ভিড়ের মধ্যে নানারকম মন্তব্য আরম্ভ হয়ে গেছে। 'এতসব যায় কোথায়? আশ্চর্য!...চেহারা দেখলে না? কিরকম ঢলোঢালা? আঁট হয়ে যাবে।'...মামা গুনামগঞ্জের নাম ডুবুলেন শেষকালে?... এরা তো নিজে খায় না, ভেতরে ভূত থাকে। এরা শুধু হাত মুখ নেড়ে যায়। ...তো চোয়াল দুটোও তো টাটাতে হয়।...'

ষষ্ঠীচরণ বললেন—'আমার কলকেটা পাল্টে নিয়েই আসুক।' প্রবল উৎসাহে নড়ে-চড়ে বসলেন। এতক্ষণ জিদ করে খাওয়ানোর দরকার হয়নি এইবার আরম্ভ করলেন! ও'দের চারজনের শেষ হয়েও গেল একরকম, রেষারেষিতে বেশি তুলতে গিয়ে কিছু বরং পড়েই রইল গামলা আর দই রাবড়ি ত্রিজেলে। ষষ্ঠীচরণ একা সদানন্দকে নিয়ে পড়লেন। ফলে ও'র ত্রিজেল আর গামলা খালি হয়ে যেতে আরও কিছু রসগোল্লা আর রাবড়ির কথা বললেন। সদানন্দ একটু পেছন দিকেই হেলে পড়েছেন, হাত দুটো পাতার ওপর উবুড় করে ধরে বললেন—'আর থাক দাদা' রাবড়ি আর রসগোল্লা নাকি বড্ড সরেস হয়েছে বেশ একটু চাপ হয়ে গেছে।'

রাবড়িটা আর পারা গেল না গোটা পনের রসগোল্লা উপরোধে পড়ে গলার নীচে গলিয়ে যখন পথ জুড়ে করে বসেছেন, ওঠার প্রস্তুতিতে ডাইনে বাঁয়ে করছেন ভিড়ের পেছনে সিঁড়ির কাছ থেকে রব উঠল কতকগুলো কণ্ঠে—'উঠে গেছেন নাকি?...না, শীগ্গির যান! ...আম এসে গেছে! ... জায়গা ছাড়ো! জায়গা ছাড়ো ...একটু বসিয়ে রাখুন জ্যাঠামশাই—আম এসে গেছে!'

ভবানীচরণের ছেলে একটা মাঝারি গোছের ঝুড়ি দুহাতে মাথার ওপর তুলে ভিড় চিরে এগিয়ে এল।

বাবার সবচেয়ে প্রিয় ফল, এমন অপূর্ব সুযোগ একরকম কাকুতি-মিনতি করেই ধরে বসলেন ষষ্ঠীচরণ।

'আর চলে না, জায়গা কোথায়?' —বলে পেটে একবার হাতটা বুলিয়ে নিলেন সদানন্দ, বললেন—'নেহাৎ বলছেন তাঁর আত্মার তৃপ্তির জন্যে, দিন গোটা দুই দেখা যাক।'

গোটা পাঁচশেক দিল, তার মধ্যে যখন বারোটা হয়ে গেছে হঠাৎ শরীরটা একটু থরথরিয়ে উঠল, এবং সবার একটু সচকিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শিবনেত্র। শরীরটা পেছন দিকে ঢলেও পড়ছিল—'কি হোল!...হঠাৎ একি! দুটো আসন! আসন!' —বলে কয়েকজন তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে দিল।

ভোজের ভরা বাড়িতে হৈ হৈ পড়ে গেল। ছাত থেকে নীচের বাড়ি, সেখান থেকে অন্দর মহল 'হায় হায়' পড়ে গেল। ...নাড়ি নেই। নাকের কাছে তুলো ধরে দেখা গেল নিশ্বাস নেই। ...হার্ট ফেল হয়েছে! ডাক ডাক্তার। গাড়ি ছুটিয়ে দে।

একি অভিশাপ পড়ল। একি অনর্থ। ...ব্রহ্মহত্যা! কী মর্মান্তিক ঘটনা!...'

সবরকম লোক থাকে পিছনের দিকে একজন টিপ্পনি করল—'হয়তো বসে খাওয়াবেন বলে কর্তাই ওপর থেকে ডেকে নিয়েছেন।'

নামানর সমস্যা। শরীরটা ভারী। প্রায় আধ মণের কাছাকাছি মাল পড়ে আরও ভারী হয়ে পড়েছে, তার ওপর এখন তো একটা লাসই। সিঁড়িও সাবেক কালের কিছু সংকীর্ণ।

পেছন থেকে সেই উর্বরমস্তিষ্ক ছোকরাটি বলল—'কপিকল দিয়ে সোজা নামিয়ে দিলে কেমন হয়?'

শেষ পর্যন্ত আটজন বেশ শক্ত-সমর্থ লোক দুদিকে পাঁজাপাঁজা করে ধরে নীচে এনে শামিয়ানার নীচে ফরাসের ওপর শুইয়ে দিল।

আবার চোখের পাপড়ি তুলে দেখা হোল। সে এক ভাব। ডাক্তারকে ডাকতে গাড়ি ছোটানো হয়েছে। একজন কম্পাউন্ডার কাছে ছিল বলল—'রক্ত চাপে হার্ট ফেল।'

ঐ গাড়ি এসে গেল। ...এসে গেছেন ডাক্তারবাবু। ...সরো সরো।।'

ভবানীচরণ এগিয়ে গেলেন।

সদানন্দ উঠে বসলেন। অচৈতন্য অবস্থা থেকে উঠে চারিদিকে বিহ্বলভাবে চাওয়া, কি অসংলগ্ন প্রশ্ন—সে সব কিছুই নয়। বললেন—'সিঁড়িতে নামাটা একটু যেন কষ্টকর হোত। তাই এটুকু।'

ষষ্ঠীচরণের দিকে চেয়ে করজোড়ে বললেন—'আচ্ছা তাহলে আসি দাদা। আয়োজন অতি সুচারু হয়েছিল।'

ষষ্ঠীচরণ একেবারে হতবাক হয়ে গেছেন।

বললেন—'তাহলে গাড়ি তো এসেই গেছে। পৌঁছে দিক।'

একটু হাসলেন সদানন্দ, বললেন—'না দাদা একটু হেঁটেই যাই।...রাত্তিরে আবার কুটুমবাড়ির অত্যাচার আছে তো।... চলো বাবা প্রসাদ।'

এই বাংলার খবর

বাজেট চিন্তা

পশ্চিম বাংলা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নানা মহলে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়ে গেছে। সরকারের সংসারের গৃহিণীপনার ভার যাঁদের হাতে সেই অর্থ দপ্তরের ভাবনা অবশ্যই কি করে আয়-ব্যয়ের হিসেব মেলানো যায়। গোটা মন্ত্রিসভার চিন্তা বাজেট অধিবেশনের গোড়ায় রাজ্যপাল যে-ভাষণ দেবেন তাতে কোন কোন বিষয় ঠাঁই পাবে। যে-বছরটা চলে যাচ্ছে সেই বছরে সরকারী কীর্তির তালিকা যেমন ঐ ভাষণে থাকে তেমনই থাকে আগামী বছরের কর্মসূচী। রাজ্যপালের ভাষণের খসড়া অনুমোদন করতে মন্ত্রিসভার পর পর দুটি বৈঠকের প্রয়োজন হলো। অবশ্য বাজেট অধিবেশনের মুখে সাধারণ মানুষের প্রধান চিন্তা, অর্থমন্ত্রী নতুন কর কতোটা চাপাবেন। কেন্দ্রীয় বাজেটের কর তো আছেই, তার ওপর রাজ্য সরকারও এ-বছর কিছু কর চাপাবেন এমন আভাস এখন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এর প্রধান কারণ, রাজ্য সরকার ১৯৭৫-৭৬ সালে যোজনা খাতে বরাদ্দ বিশ কোটি টাকা বাড়াবেন বলে ঠিক করেছেন। চলতি আর্থিক বছরে এই বরাদ্দের অঙ্ক ছিল ১৫০ কোটি টাকা। বার্ষিক যোজনার মোট বরাদ্দ বাড়াতে যোজনা কমিশন রাজী হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যোজনা খাতে কেন্দ্রীয় সাহায্য বাড়াবার জন্যে রাজ্য সরকার যে-দাবী করে আসছেন তাতে তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সব রাজ্যকে সাহায্য দেওয়ার জন্যে চলতি বছরে মোট যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আগামী বছরেও তাই-ই করা হবে বলে যোজনা কমিশন ঠিক করেছেন। তবে ওর মধ্যে থেকেই পশ্চিম বাংলা হয়ত বড় জোর দশ কোটি টাকা বাড়তি পেতে পারে। তবু যোজনা খাতে বাড়তি খরচের জন্যে আরো দশ কোটি টাকা লাগবে। সেই টাকাটা রাজ্য সরকারকেই যোগাড় করতে হবে আর যোগাড়ের প্রধান রাস্তা নতুন কর বসানো। চলতি বছরের বাজেটে নতুন করের পরিমাণ ছিল ২৪ কোটি টাকার মতো। আসছে বছরে নতুন করের পরিমাণ দশ কোটি টাকা হবে বলে ওয়াকেফহাল মহলের অনুমান। নতুন কর না-বসালে রাজ্যে উন্নয়নের কাজে ঢিলে দিতে হয়। কিন্তু রাজ্যের যা অর্থনৈতিক সমস্যা তাতে উন্নয়নের কাজ ঢিলে দিতে সরকার মোটেই আগ্রহী নন। তবে চলতি বছরের মতো আগামী বছরেও প্রধানত সমাজের সচ্ছল অংশের কাছ থেকেই নতুন কর আদায়ের চেষ্টা করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

এফ সি আই ধর্মঘট

দিল্লী থেকে ফিরে ফেব্রুয়ারীর দশ তারিখে ফুড কর্পোরেশন কর্মীদের ধর্মঘট মেটাবার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নিজে হস্তক্ষেপ করেও সফল হতে পারেন নি। ছাঁটাই সহ-কর্মীদের আবার কাজ দিতে হবে, এই দাবী নিয়ে এফ সি আই কর্মীরা জানুয়ারীর শেষে ধর্মঘটে নামার পর রেশন ব্যবস্থায় গুরুতর সংকট দেখা দেয়। কর্মীদের ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার সময় সিদ্ধার্থবাবু ধর্মঘট মিটিয়ে নিতে বলেন।

উত্তর কলকাতার রেশন সংকট নিরসনে কাশীপুরের একটি গুদাম থেকে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

ছাটাই ৩৮৬ জন কর্মীর মধ্যে ৩৫০ জনকে আবার কাজ দেওয়া হবে এবং বাকী ক'জনকেও নতুন কাজের সুযোগ এলেই কাজ দেওয়া হবে, মুখ্যমন্ত্রী এই প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু কর্মীদের নেতারা জানান, তাঁরা এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে ধর্মঘট মিটিয়ে নিতে পারবেন না। তাঁদের হিসেবে ছাটাই কর্মীর সংখ্যা ৩৮৬ নয়, ৮৮৪ জন। আর এঁদের সকলকেই যে আবার কাজ দেওয়ার সুযোগ নেই তাও নয়। এই ধর্মঘটের ফলে রেশন এলাকার মানুষের অসুবিধে হচ্ছে, একথা স্বীকার করে নিয়েও নেতারা বলেন, এটা রুটির লড়াই, সুতরাং এই লড়াইয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষের সমর্থন পাবেন।

এফ সি আই কর্মীদের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর সিদ্ধার্থবাবু সাফ জানিয়ে দেন, কয়েক শ কর্মীর জন্যে লাখ লাখ মানুষ কষ্টভোগ করবে, এটা তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। একটি কংগ্রেসী ইউনিয়নের ডাকেই এই ধর্মঘট হচ্ছে, একথা শুনে প্রধানমন্ত্রীও খুব চটে গেছেন। ধর্মঘট মীমাংসায় মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এফ সি কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটী কর্মীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে শুরু করেন। রাজ্য সরকার এ-ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। প্রথমে কর্মীদের ২৬ জন নেতাকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কাজে যোগ দিতে বলা হয়, অন্যথায় তাঁদের ছাটাই করা হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। পর দিন ছ'জন কর্মীকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়। তার পর স্থির হয়, ধর্মঘটীদের মধ্যে ৫০০ জনকে সাজা দেওয়া হবে। যে ২৬ জনকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছিল তাঁরা কেউই ঐ সময়ের মধ্যে কাজে যোগ দেন নি। তাই তাঁরা কাজ ছেড়ে দিয়েছেন বলে ধরে নিয়ে তাঁদের জায়গায় নতুন লোক নেওয়া হবে বলে এফ সি আই কর্তৃপক্ষ স্থির করেন।

একটুকু বাসা

এই বাংলার, বিশেষ করে বৃহত্তর কলকাতার মানুষকে মাথা গোঁজার ঠাঁই যোগাবার জন্যে রাজ্য সরকার বেশ বড় রকমের পরিকল্পনা তৈরী করেছেন বলে গৃহ নির্মাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রামকৃষ্ণ সারাগীর কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছে। এত দিন রাজ্য সরকার প্রধানত মাঝারী আয় এবং কম আয়ের লোকের জন্যে ফ্ল্যাট তৈরী করেছেন বা করার কথা ভেবেছেন। কিন্তু এখন ওপরতলার লোকের জন্যেও বাসা তৈরীর কথা ভাবছেন। কারণ বেশী দামের ফ্ল্যাট কেনার মতো লোকের অভাব নেই। সৌখিন এলাকায় চড়া দামের ফ্ল্যাট বেচতে পারলে বেশ কিছু লাভ করা যাবে বলে গৃহ নির্মাণ বোর্ড আশা করছেন। সেই লাভের টাকায় মাঝারী আর কম আয়ের লোককে ফ্ল্যাট কেনার জন্যে কিছুটা ভরতুকি দেওয়া যাবে।

সৌখিন এলাকা বলতে এখন দক্ষিণ কলকাতার সানি পার্ক এবং মিণ্টো পার্কে বড় বড় বাড়ী তৈরীর কথা ভাবা হচ্ছে। সানি পার্কে ১৮০ এবং মিণ্টো পার্কে শ' দেড়েক ফ্ল্যাট তৈরী হবে, মোট খরচ পড়বে সাড়ে তিন কোটি টাকার মতো। অবশ্য সরকার মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষের কথাও মনে রেখেছেন। সল্ট লেকে এবং টালিগঞ্জের গল্‌ফ কোর্সে যে-সব ফ্ল্যাট তৈরী হবে তা প্রধানত তাঁদেরই জন্যে। প্রথমোক্ত এলাকায় বিভিন্ন পর্যায়ে তৈরী হবে চার হাজার ফ্ল্যাট এবং দ্বিতীয়োক্ত এলাকায় ১৮০০ ফ্ল্যাট। মোট খরচের পরিমাণ ১৬ কোটি টাকা দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তার মধ্যে হাউসিং এণ্ড আর্বান ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন সাড়ে চার কোটি টাকা দিতে পারে। গ্রামের গৃহহীনদের মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরীর জন্যে রাজ্য সরকার একটি গ্রামীণ গৃহনির্মাণ পর্ষদ গঠন করতে পারেন। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা পৌনে তিন লাখের কিছু বেশী।

বিষ্ণুর প্রত্যাবর্তন

ঠিক দশ বছর এক মাস আগে কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভবন থেকে যে বিষ্ণু মূর্তিটি চুরি গিয়েছিল সেটি আবার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হলো ফেব্রুয়ারীর ১২ তারিখে। প্রতিষ্ঠিত করলেন রাজ্যপাল ডায়াস। মূর্তিটি পুনঃস্থাপনের পর রাজ্যপাল বিষ্ণু মূর্তির পায়ে চন্দন মাখিয়ে দেন, গলায় দেন মালা। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারীর ১৪ তারিখে পৌষ সংক্রান্তির দিনে মূর্তিটি চুরি যায়। চুরি যাওয়ার পর স্বভাবতই খুব হৈচৈ পড়ে যায়, কারণ দু ফুট উঁচু ব্রঞ্জের এই মূর্তিটি অমূল্য পুরাকীর্তি বলে গণ্য। কিন্তু অনেক খোঁজ-খবর করা সত্ত্বেও পাঁচ-পাঁচ বছর এটির কোনো সন্ধান মেলে নি। ১৯৭০ সালে কেউ বা কারা মূর্তিটি বিক্রী করে আমেরিকার বস্টন মিউজিয়ামকে। ৫০ হাজার ডলার দিয়ে মূর্তিটি কিনে নেন মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ। কিন্তু যখন তাঁরা জানতে পারেন যে মূর্তিটি চুরি করা হয়েছে তখন তাঁরা এটি ফিরিয়ে দিতে সানন্দে সম্মত হন। যারা মূর্তিটি বস্টন মিউজিয়ামকে বিক্রী করেছিল তারা অবশ্য মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষকে ঐ ৫০ হাজার ডলার ফিরিয়ে দিয়েছে।

রাজ্যপাল ডায়াস বস্টন মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, এই ধরনের অমূল্য পুরাকীর্তি নিয়ে যে আন্তর্জাতিক কারবার চলছে তা বন্ধ করার জন্যে কড়া আইন দরকার। অবশ্য শুধু আইন করেই এই কারবার বন্ধ করা যাবে না, এর জন্যে জনসাধারণের সজাগ পাহারাও প্রয়োজন। এই ধরনের অমূল্য সম্পদ ঠিক মতো রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বিভিন্ন মিউজিয়াম ও প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

হাসপাতালের শয্যা

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা গত তিন বছরে পাঁচ হাজার বেড়েছে। এ-খবর দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা। তাঁর হিসেব অনুযায়ী ১৯৭১ সালের শেষে এই রাজ্যে হাসপাতাল-শয্যার সংখ্যা ছিল ৩৮ হাজার। তিন বছর পরে অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের শেষে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩ হাজার। এর ফলে এই রাজ্যে প্রতি হাজার মানুষ পিছু হাসপাতাল-শয্যার সংখ্যা একের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভোর কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জনসংখ্যার হাজার-করা একটি শয্যা থাকা দরকার। ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যন্ত হিসেব নিলে দেখা যায়, গোটা দেশে এই সংখ্যা গড়পড়তা প্রতি হাজারে আধখানি। অর্থাৎ হাসপাতাল-শয্যা সংখ্যার বিচারে পশ্চিম বাংলার অবস্থা দেশের গড়পড়তা অবস্থার চেয়ে ভালো। আর হাজার তিনেক শয্যা হলেই এই রাজ্যে হাজারকরা হার পুরোপুরি এক দাঁড়াবে বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

১৭।২।৭৫

—দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

গফুর থাকলেন, নায়ক গেলেন

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী গফুর সম্প্রতি বলেছেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আমার বিরোধীরা আমাকে এক দিনের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেয়নি।' 'বিরোধীরা' বলতে গফুর অবশ্যই বুঝেছেন তাঁর নিজের দলের সেই সদস্যদের যাঁরা গফুরকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করে আসছেন। প্রকৃতপক্ষে, দিল্লির নির্দেশে গফুরকে বিহার বিধানমণ্ডলীর কংগ্রেস দলের নেতার আসনে বসাবার পর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্য থেকে অধিকতর উপযুক্ত কোন নেতাকে যতক্ষণ বাছাই করা না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই গফুরকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে বসান হচ্ছে। অতএব, এটা কিছু নতুন কথা নয় যে, গফুর মন্ত্রিসভার 'এই-যায়-সেই-যায়' অনিশ্চিত অবস্থাটা প্রায় সূচনা থেকেই চলছিল।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বসন্ত রাও নায়কের নেতৃত্বের পরমায়ু ফুরিয়ে আসার কথাটাও গত নির্বাচনের পর থেকে মধ্যে মধ্যেই শোনা যাচ্ছিল। তার কারণ, পুরোন একটা বোঝাপড়া অনুসারে এবার বিদর্ভের প্রতিনিধি নায়কের জায়গায় মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলের কোন প্রতিনিধির মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার কথা।

কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে প্রবীণতম বসন্তরাও নায়কের এক যুগের নেতৃত্বের অবসানের সময় সত্য সত্যই এসে গেল, কিন্তু অন্যদিকে গফুরের অনিশ্চয়তা রয়েই গেল।

বলা হয়েছে যে, গফুরকে এখন সরান রাজনৈতিক দিক থেকে সংগত হবে না।' অথচ, ইতিমধ্যে বিহারে কংগ্রেস লেজিসলেচার পার্টির ভিতরে গফুরের বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে কংগ্রেস হাই-কম্যান্ডের ভ্রূকুটি ও তিরস্কার সত্ত্বেও সেই বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পরিবর্তনকামীরা যে সভা করে গফুরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এবং সেকথা যে তাঁরা রাজ্যপালকে জানিয়ে এসেছেন, পাটনা বিমান বন্দরে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁদের মুখপাত্ররা যে কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়ার সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, এই সব কারণে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী নয়াদিল্লীর বিরাগভাজন হয়েছেন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতারা বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বিধানসভার বাজেট অধিবেশন বয়কট করার যে হুমকি দিয়েছিলেন তাঁদের সেই হুমকি প্রত্যাহার করে নিতেও বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু গফুর-বিরোধীরা জানিয়েছেন, বিধানমণ্ডলীর কংগ্রেস দলের সভায় গফুরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করার জন্য তাঁদের সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা ক্ষান্ত হবেন না। তাঁরা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 'প্রেরণাদায়ক নেতৃত্বের' প্রতি তাঁদের আস্থা অটুট আছে।'

মহারাষ্ট্রে নেতা বদলের পালাটা অবশ্য বিহারের তুলনায় অনেক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। সেখানে শ্রীনায়ক তাঁর দলের পরিবর্তনকামীদের ও কংগ্রেস হাই-কম্যান্ডের ইচ্ছা অনুসারে নিজেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে আসছেন এবং দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য শঙ্কররাও ভাওরাও চাবনের নাম প্রস্তাব করছেন। শঙ্কররাও মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলের মানুষ এবং পরিবর্তনকামীরা সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর নামই প্রস্তাব করেছেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা কিন্তু মনে করছেন, মহারাষ্ট্রে নতুন নির্বাচনের এই পর্ব যতটা নির্বিবাদে সম্পন্ন হয়েছে বলে উপরে-উপরে দেখান হচ্ছে, আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ততটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়নি। বসন্তরাও নায়ককে অপসারণ করার জন্য যদিও মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলের দাবির দোহাই দেওয়া হচ্ছে তাহলেও আসল কারণ নাকি হল এই যে, নায়ক সম্প্রতি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করে নয়াদিল্লির বিরাগভাজন হয়েছেন। গত মাসে মহারাষ্ট্রের বোরদিতে যে নারোয়া-ধরনের শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে নায়ক মন্তব্য করেছিলেন যে, একটা পৌরসভার যতটুকু স্বাধীনতা থাকে মহারাষ্ট্র সরকারকে ততটুকু স্বাধীনতাও এখন কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন না। গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি, সরকার কর্তৃক একচেটিয়াভাবে তুলো কেনা ইত্যাদি মহারাষ্ট্র সরকারের যেসব পরিকল্পনা কেন্দ্র নামঞ্জুর করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নায়ক সেগুলির উল্লেখ করেন। এতেই তিনি ক্ষান্ত হননি। একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে তিনি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং মহারাষ্ট্র থেকে নির্বাচিত এম-পি-দের কাছে ঐসব অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেছেন। মহারাষ্ট্রের পরিবর্তনকামীরা নায়কের এই কেন্দ্র-বিরোধী মন্তব্যগুলি দিল্লির গোচরে এনে তাঁকে সরাবার সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

*

শোনা যাচ্ছে, মহারাষ্ট্রে যাঁরা নায়ককে সরিয়ে চাবনকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসাতে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁরা নায়ককে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন না, রাজ্যে রাজনীতি থেকেও তাঁকে দূরে রাখতে চাইছেন। অসুবিধাজনক রাজনীতিককে তফাতে রাখার পরিচিত ফরমুলা এ উদ্দেশ্যে বসন্তরাও নায়কের উপর প্রয়োগ করার কথা শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ তাঁকে রাজ্যপাল করে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশে রাজ্যপালের পদটি খালি হচ্ছে, ঐ পদে নায়ককে বসানো হতে পারে।

এর আগে গুজরাটের রাজ্যপালের উপদেষ্টা, অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস অফিসার এইচ সি সরিনকে বিহারের রাজ্যপাল করে ঐ রাজ্যের বর্তমান রাজ্যপাল আর ডি ভাণ্ডারেকে অন্ধ্রের রাজ্যপাল করার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার পথে তিনটি বাধা দেখা দিচ্ছে। প্রথমত অন্ধ্রের কংগ্রেস সরকার ভাণ্ডারেকে রাজ্যপাল হিসাবে গ্রহণ করতে বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে ভাণ্ডারে বিহার মন্ত্রিসভার যে প্রকাশ্য সমালোচনা করেছিলেন তার কথা মনে রেখেই অন্ধ্র সরকার ভাণ্ডারে সম্পর্কে কিছুটা শঙ্কিত। দ্বিতীয়ত, বিহারে তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ানের জায়গা করে দেওয়া হবে, এটা শ্রীভাণ্ডারের মনঃপূত নয়। তৃতীয়তঃ তাঁর পূর্বসূরী দেবকান্ত বড়ুয়ার মত আর ডি ভাণ্ডারেও রাজ্যপালের পদ ছেড়ে দিয়ে আবার সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করতে চাইছেন।

পরের সংখ্যায় গল্প লিখবেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

জামা মসজিদে হাঙ্গামা

জামা মসজিদ সংক্রান্ত যে বিরোধ নিয়ে দিল্লীতে এক পক্ষ কালের মধ্যে দুবার দাংগা-হাঙ্গামা হয়ে গেল এবং মোট ১৩ জন মারা গেলেন সেই বিরোধের মূলে রয়েছে মসজিদ-এর উপর সরকারি কর্তৃত্বের প্রশ্নটি। অশীতিপর বৃদ্ধ সৈয়দ হামিদ বুখারির স্থলে তাঁর পুত্র সৈয়দ আবদুল্লা বুখারিকে অননুমোদিতভাবে মসজিদের ইমাম হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে, দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের মারফৎ কেন্দ্রীয় সরকার এই অভিযোগ সম্ভবত তুলতেনই না যদি না ইতিমধ্যে সৈয়দ আবদুল্লা বুখারি মসজিদে প্রার্থনা-সভায় নিয়মিতভাবে সরকার-বিরোধী প্রচার চালিয়ে সরকারকে বিব্রত করতেন। মোগল সম্রাট সাজাহান যেদিন বোখারা থেকে একজন মৌলানাকে আনিয়ে জামা মসজিদের ইমামের গদীতে বসিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তিনশ বছর ধরে একাদিক্রমে বাবার পর ছেলেই এই মসজিদের ইমামতি করে এসেছেন। এটাই যদি ইতিহাসের নজির হয়ে থাকে তাহলে ইমামের নিয়োগকর্তা হিসাবে দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের অনুমতি এক্ষেত্রে আগে থাকতে নেওয়া হয়নি, শুধু এইটুকু কারণেই বংশানুক্রমিক ইমামতির অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করা কঠিন। কেন্দ্রীয় সরকার এখন সরাসরি এই অধি-

কার অস্বীকার না করে বলছেন, মসজিদের শাহী ইমাম কার্যরত ইমাম সৈয়দ হামিদ বুখারি বেঁচে থাকতে আর কেউ ঐ পদে বসতে পারেন না।

ওয়াকফ বোর্ডের আরও অভিযোগ এই যে, মসজিদের ইমাম হিসাবে সৈয়দ আবদুল্লা বুখারি দোকানঘর ভাড়া দিয়ে, নজরানা আদায় করে ও অন্যান্য ফি ধার্য করে যেসব আয় করছেন সেটা নিয়মানুযায়ী বোর্ডে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করছেন। আবদুল্লার পক্ষের বক্তব্য হল, বোর্ড মসজিদ মেরামত করার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করছেন না।

কেন্দ্রীয় সরকার যখন এভাবে ওয়াকফ বোর্ডের মারফৎ মসজিদের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চাইছেন তখন আবদুল্লার অনুরাগীরা চাইছেন, এই মসজিদ পরিচালনার ভার সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত একটি সম্পূর্ণ বেসরকারি কমিটির উপর দেওয়া হোক।

প্রশ্নটি নিয়ে প্রথমে দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করার পর কেন্দ্রীয় সরকার এখন সম্ভবত বুঝতে পারছেন যে, দেশের ভিতরে ও বাইরে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। জামা মসজিদ ভারতে মুসলমানদের বৃহত্তম উপাসনাস্থল। সারা মুসলিম দুনিয়ার এটি সুপরিচিত। এখানে মুসলমানদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতায় সরকারি হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে, এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি হতে দেওয়া ভারত সরকারের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক।

সম্ভবত এই সব কারণেই ভারত সরকার এখন এ-বিষয়ে কিছুটা নরম মনোভাব অবলম্বন করেছেন। তাঁরা এই বিরোধের মীমাংসা করার জন্য শেখ আবদুল্লাকে মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ করেছেন। শেখ তাঁদের এই অনুরোধ মেনে নিয়েছেন।

বৃটিশ রাজনীতিতে নয়া ইতিহাস

৪৯ বছর বয়স্কা গৃহকর্ত্রী ও যমজ পুত্রকন্যার জননী মার্গারেট হিল্ডা থ্যাচার বৃটিশ কনজারভেটিভ পার্টির নেত্রী নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। কারণ, তিনিই প্রথম মহিলা যিনি ইউরোপের কোন বড় রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব লাভ করলেন। তাঁর এই নির্বাচনের অর্থ হল, পরবর্তী নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সমর্থ হয় তাহলে এই প্রথম বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন নারী।

শ্রীমতী থ্যাচার যদিও ইদানীং কমন্সসভায় তাঁর দলের মুখপাত্র হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছিলেন এবং নির্বাচনে পরাজিত কনজারভেটিভ পার্টির মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছিলেন তাহলেও পুরুষ-প্রধান রক্ষণশীল রাজনীতিতে তিনি এত অকস্মাৎ একেবারে সামনের সারিতে এসে যাবেন, এটা অনুমান করা যায়নি। শ্রীমতী থ্যাচার নিজে কিছুদিন আগে বলেছিলেন, বৃটিশ রাজনীতিতে কোন নারী দলের নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হবেন, এটা আমার জীবৎকালে হবে না।

কিন্তু কোন কোন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের ধারণা, শ্রীমতী থ্যাচার নেত্রী হওয়ায় কনজারভেটিভ পার্টির নির্বাচনী সাফল্যের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হয়ে গেল। 'ইকনমিস্ট' পত্রিকা লিখেছেন, 'শ্রীমতী থ্যাচারের নির্বাচন আগামী ২৫ বছরের জন্য শ্রমিক দলের শাসনকে সুনিশ্চিত করল।'

উত্তর লন্ডনের একটি নির্বাচনকেন্দ্র থেকে নির্বাচিতা শ্রীমতী থ্যাচার একজন শৌখীন মহিলা হিসাবে পরিচিত। তাঁর স্বামী একজন কোম্পানি ডিরেক্টর।

—পুণ্ডরীক

।। সংশোধন ।।

রাগ করে দেখুন

অমৃতর ৪০তম সংখ্যায় ৩৯ পৃষ্ঠায় 'কমলালেবুর স্যালাড'-এর স্থলে 'কমলালেবুর পায়েস' পড়তে হবে এবং ৪১তম সংখ্যায় ৩৭ পৃষ্ঠায় 'কিমা ম্যাকারনি'-র স্থলে 'ধনিয়াগ মীট' পড়তে হবে।
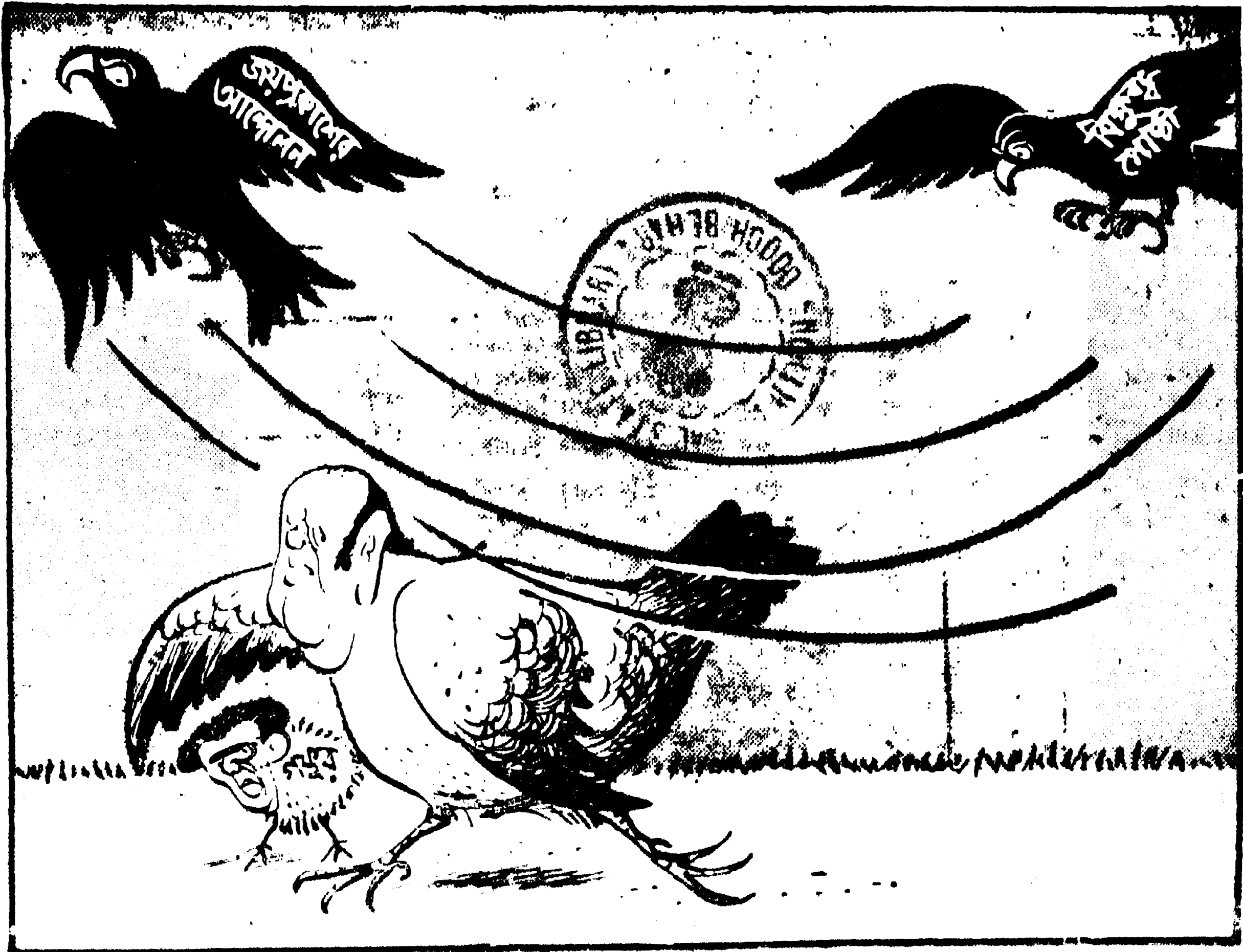
ফাদার দ্যতিয়েন
রোজনামচা

এমন এক মহিলাকে আমি চিনি, মার্জারাবৃতা দেবীর কাছে অহোরাত্র যিনি প্রার্থনা করেন পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষায়। তাতে বিচিত্র কি? বিচিত্র এই যে নামরক্ষণ, বার্ধক্যাবলম্বন, মুখাগ্নিদাহন প্রভৃতি কথা তিনি তত ভাবেন না যতটা ভাবেন প্রতিশোধের কথা : স্থির করেছেন, পতিদেবতার জন্মদাত্রীর উপর তিনি বদলা নেবেন আপন বৌমাকে জ্বালিয়ে।

শামিম আরা মেয়েটি এমনতর নয়। কেউ এখনও জানে না, কেউ এখনও টের পায় নি, তবে ডাক্তার নিঃসন্দেহ (আর ধাত্রীও সুনিশ্চিত) : শামিম আরা অন্তঃসত্ত্বা। খোদাতালার কাছে সে প্রার্থনা করে—আর আমাকে প্রার্থনা করতে বলে—সে যেন সুসময়ে কর্তা হাসানের কোলে তুলে দিতে পারে এক কন্যাকে। না, পুত্রের প্রতি তার অনীহা নেই : বরাবর সে বলে এসেছে, ইনশা-আল্লাহ (অর্থাৎ কিনা ঈশ্বরের প্রসাদে) উত্তরাধিকারিণীটি একটু বড় হলে পুংলিঙ্গের এক খেলার সাথীর সাহচর্য লাভ করবে।

শামিম আরাও আসলে প্রতিশোধ চায়, অদ্ভুত ধরনের এক পরিশোধ। আপন আম্মার কাছে মেয়ে বলে কস্মিনকালেও সে যে-আদর পায় নি, নিজ কন্যাকে সেবা করেই সে সুদসমেত তার ক্ষতিপূরণ করবে।

সে অনেক দিনের কথা। শামিম আরা তখন হয় নি। ওর আব্বা মহম্মদ নূর বখশ, সফর মাসের এক সকালে, পিতামাতা, শ্বশুর সাহেব, মাদ্রাসার ওস্তাদ ও ডেরার পীরের পদচুম্বন সহকারে, গর্ভবতী বালিকা বধূ ইসরাত জাহানকে পূর্বাঞ্চলের পৈত্রিক ভিটেয় রেখে, অতিরিক্ত বঙ্গের মহানগরীর অভিমুখে পা বাড়ালেন। আশ্রয় নিলেন মুমিনপুরে, সহৃদয়া এক বৃদ্ধার গৃহে, যাঁর প্রতিপালন উৎসাহ দান ও সৎ পরামর্শে বখশ মিয়া অল্প সময়েই ফেঁদে বসলেন এক অর্থকরী বোলবোলাও লোহার কারবার।

ইতিমধ্যে সংবাদ এল, পূর্বাঞ্চলের ঐ পৈত্রিক ভিটেতে নারীসমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি সাধন করতে এসেছে বেহেস্ত-ত্যাগিনী এক একরত্তি হুরী। কন্যা লাভে বখশ মিয়া খুশী হতে পারলেন কিনা, আজও তিনি বোঝেন না...। প্রতিটি বছরে, শাওয়াল ও জিলহজ্ মাসে—ইদুল ফিতর ও বকরইদের উপলক্ষে—মোটা টাকা আর হরেক রকম উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে তিনি দেশে গিয়ে স্বামীসুলভ ও পিতৃসুলভ কর্তব্য পালন করতেন। প্রতিটি বছর যথাসময়ে খবর আসত —বেহেস্ত-ত্যাগিনী নবাগন্তুকার আগমনের শুভসংবাদ। হাঁফ ছেড়ে বখশ মিয়া ইসরাত জাহানের উপহারগুলির নাম লিখতেন হালখাতার শেষ পৃষ্ঠায়, সুন্দর আরবী অক্ষরে : হোসনে-আরা, রোশনেআরা নাজমে-আরা, শামসে-আরা...লিখতে লিখতে ভাবতেন, নিদান দিনে যেদিন আল্লাতালার ডাক আসবে, কার হাতে বলুন তিনি দিয়ে যাবেন তাঁর আদরের এই ফলাও কারবার?

সহৃদয়া বৃদ্ধার ছিল এক নাতনী—শুভ্রবর্ণা, গজল-জ্ঞা, গৃহকর্মে সুনিপুণা ত্রয়োদশী রোকসানা। উর্দু স্কুলে পড়ত সে, বাংলা অক্ষর জানত না : শিখতে আসত মহম্মদ নূর চাচার কাছে, এশা নমাজের পর; পরিবেশন করত—প্রণামীস্বরূপ স্বহস্তে রাঁধত সুস্বাদু সিমাই-জর্দা।

সহৃদয়া বৃদ্ধার ষড়যন্ত্রটা বখশ মিয়া প্রথম বুঝলেন না; যেদিন বুঝলেন, সেদিন তিনি বুড়ীর পাতা ফাঁদে সানন্দে পা দিলেন, ক্ষিপ্র পদক্ষেপে দৌড়োলেন প্রসিদ্ধ এক ফকিরের আস্তানায়, পকেট উজাড় করে কিনলেন অব্যর্থ এক তাবিজ যার নাকি 'সুপ্রমাণিত ও বিজ্ঞানসম্মত' প্রভাবের ফলে যাবতীয় মুমিনের দ্বিতীয় পক্ষের বিবির গর্ভাশয়ে জন্মায় দিগ্বিজয়ী পুং সন্তান।

রোকসানার নানার আপত্তি ছিল খুব, ও'র নিজেরই এক ভাগনের ছেলের সঙ্গে নাতনীর সাদিটা তিনি এক রকম ঠিক করেছিলেন। বখশ মিয়ার আব্বা হাজী আবদুল হবিব সিদ্দিকীরও মত ছিল না : ভুক্তভোগী তিনি, একাধিক পরিণয়ের সুবিধা বোঝেন (বড় বিবি পা টিপতেই ছোট বিবি পাখা ধরবে...), তবে কিনা ঢাকা জেলায় আচ্ছা আচ্ছা লড়কী থাকতে বিদেশিনীর প্রয়োজন কৈ?...সুধী পাঠক জানতে পারেন, ঢাকাওয়ালাদের কাছে শুধু 'আসরফোশিয়ান' কেন, চাটগেঁয়েরাও ভিনদেশী।

সাদি অবশ্য হল...এল রমজান, উঁকি মারল শাওয়ালের নয়া চাঁদ, চললেন মহম্মদ নূর—গর্ভিণী রোকসানাকে মুমিনপুরের নানীর সেবায় রেখে—পয়লা বিবির অভিসারে।

আর ফিরলেন না...আটকে থাকলেন পূর্বাঞ্চলের পৈতৃক ভিটেয়, পিতৃদেবের সদাসতর্ক প্রহরাধীন। আর তখনই ঝলাকের মতো বুঝল রোকসানা—পরম অলক্ষ্যেও স্বপ্নেও এতদিন সে যা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারত না—তার সোহাগের সোয়ামীর পূর্বাঞ্চলের পৈতৃক ভিটেয় তার এক গ্রাম্য সতীন আছে। পরিত্যক্তা শহুরিয়া সহপত্নী জানল না, জীবনে জানবে না, স্বর্গপ্রাপ্তা নানী (আল্লাতালা ও'র অশরীরী আত্মার উপর তাঁর অসীম বরকত বর্ষণ করুন) নিজেই প্রতারিত হয়েছিলেন, নাকি সুপ্রতিষ্ঠিত জামাতৃ লাভের আকাঙ্ক্ষায় নাতনীকে ঠকিয়েছিলেন।

মহরমের প্রথম দিনের ভোরে, ফজর-নমাজের আজানের প্রতিধ্বনিতে, অতীব শুভ লক্ষণে (চন্দ্রাব্দের ঐ প্রথম মাসটা হজরত ইব্রাহিম তথা হজরত ঈসার পুণ্য জন্মের দ্বারা চিহ্নিত) আবির্ভূত হল বখশ মিয়ার পুংলিঙ্গের প্রথম বংশধর—যুবরাজ

মহিউদ্দিন বাবর, ওরফে খোকন। সঙ্গে সঙ্গেই ফিরল বিরহিণীর বরাতের মোড়—আর ফিরলেন খোদ মহম্মদ নূর, অমাবস্যার ঘোরে আত্মগোপন করে পালিয়ে। দু মাস পরে ভূমিষ্ঠ হল ইসরাত জাহানের পঞ্চম কন্যা। হালখাতায় ওর নাম উঠল না।

সেই বছরের দুটি ঈদ বখশ মিয়া মোমিনপুরেই পালন করলেন। পরের বছরও। পরের পরের বছরও। ইতিমধ্যে পয়দা হয়েছে মহিউদ্দিনের ছোট ভাই : জহিরুদ্দিন বাবর, ওরফে তাপু। রোকসানা এবার সুয়োরানি পদে অভিষিক্তা : যতদিন যায়, ততদিন বাড়ে সোয়ামীর সোহাগ, জহরের সংখ্যা, দেমাকের দৌড়...ভয় আর কিসের? সে কি পীরের হুকুম মাফিক এক হাজার আড়াই শ'টি বার আল্লাহ নামটা ছোট কাগজে লিখে কাগজগুলো ময়দার গুলির ভিতর পুরে লেক-এর কাৎলাদের খাওয়ায় নি?...মাহিবী আজ্ঞ জানে, তার পেটে আরও বেটা আছে—অনেক বেটা, শুধুই বেটা।

ততঃ প্রবিশতি শামিম আরা। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারে নি রোকসানা; হাসপাতালের যত নার্সকে বাপান্ত করে ঘোষণা করল, ছুঁড়ীরা মোটা ঘুষ খেয়ে কোন এক সদ্যপ্রসবা মাড়োয়ারিনীর বেটীকে তার কোলে বসিয়ে দিয়েছে, নিজের কলিজার টুকরোয় দুঃসাহসী বিনিময়ে। এদিকে (ইয়া হামিদু!) শিশুটি, বখশ মিয়ার অভিমতে জননীয়তার অবিকল প্রতিচ্ছবি : সেই অল্প কেশ, চেপটা নাক, চওড়া চোয়াল...। হার মানল রোকসানা—অর্ধ হার : মুখে মানল 'ওনার বেটী', মনে মানল 'মোর বেটী নয়'।

মানসিক আঘাতে হোক আর অন্য কারণে হোক, রোকসানার পয়োধরে এবার পয়োদগম হল না : বোতলের পাতলা দুধ, বাপের সলজ্জ আদর আর জননীর অবিরত তিরস্কার খেয়েই বড় হতে লাগল শামিম আরা। মধ্যাহ্ন ভোজে ভাইসাহেবদের পাতে গোটা করে মাছ পড়ত মেয়েটির থালায় পড়ত একটি—সব থেকে ক্ষুদ্র টুকরোটি। সান্ধ্য ভোজে একেক ভাইজান পেত একেক পো দুধ, মেয়েটি পেত তার গন্ধ।

একদিন রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিকূলোর পরিপ্রেক্ষিতে, পাকিস্তানি বখশ মিয়া ভারতীয় সম্পত্তি বিক্রয়ান্তে, সদলবলে ফিরলেন দেশে। সংসার পাতালেন শহরে, উগ্রচণ্ডী সুয়োরানির সাহচর্যে...। আশ্রয় নিতেন প্রতি শনি-রোববারে বড়বিবির ওখানে—মুক্ত হাওয়া সেবন করতে আর বেতো পা মালিশ করতে। ফলত, অনতিবিলম্বে, পাঁচ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে বিবিতে বিবিতে বাধল তুলকালাম। ঝগড়াটা অবশ্য অনেকটা একতরফা : ইসরাত জাহান যেন উদাসীন—সুয়োরানির শয়নকক্ষে অপচিত পতিপ্রণয়ের উচ্ছিষ্ট-ভুঞ্জনে সন্তুষ্ট।

রোকসানার পরম অভিযোগ : তার আত্মজা শামিম আরা (ছুঁড়ীটির আস্পর্ধা দেখুন!) ওর বড়মাকে আম্মা বলে সম্বোধন করে আপন জননীকে—আপন জননীর মাতৃত্বকে—অপমান করছে। শামিম আরা এখন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী : পুত্রদ্বয়ের প্রতি মুক্তহস্তা রোকসানা মেয়েটির হাত খরচের পিছনে এক কানাকড়িও ব্যয় করবেন না দেখে মহম্মদ নূর মাস-কাবারে হিসেব মিলিয়ে সুয়োরানিকে বোঝাবার আগে কিছু টাকা লুকিয়ে চুরিয়ে মেয়ের হাতে গুঁজে দেন...। রোকসানার আবার কড়া হুকুম : মিত্রবৈরী-নির্বিশেষে কারও গৃহে অনুষ্ঠিত পার্টিতে মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া চলবে না; পার্টির দিনে তাই মহম্মদ নূর রুদ্ধকণ্ঠ ষোড়শীকে কোলে তুলে সান্ত্বনা দেন আর লাইন ক্লীয়ার বুঝে ষড়যন্ত্রের সুরে মেয়ের কানে ফিসফিস করে বলেন, চাইনিজ খাবি? আয়...

আগমনে।

শামিম আরা হঠাৎ থামল—আত্মজীবনীর খেই হারিয়ে — শ্বশ্রূ ও শ্বশ্রূপুত্রীদ্বয়ের

মেজো ননদ বলল, জানেন, ফাদার আমাদের আম্মার অমার্জনীয় পক্ষপাত! বাড়ির যত কাজ আমাদের তিনজনকে দিয়েই তিনি করাবেন, ভাবীজিকে কিছুই করতে দেবেন না...'

বৌমাকে আলিঙ্গন করে ওর লজ্জিত রক্তাভ গণ্ডে ছোট্ট এক চুমু এঁকে (আপন জননীর কাছে বৌমার যা অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা) শাশুড়ী বললেন, 'আমার তিনটি মেয়ে আছে, আর একটিমাত্র বৌমা : পক্ষপাত করবই।'

(ক্রমশঃ)

কবিতা

সূর্য দেখলে চোখ ধাঁধাবে ॥

বটকৃষ্ণ দে

সূর্য দেখলে চোখ ধাঁধাবে
জানাই কথা।
কাছে গেলে হয়তো কেন
পুড়বে-ও বা।
তাই ব'লে কী আলোয় ফেরা
ভোর-দিগন্ত বরণ—
অকারণের বারণ
হ'তে পারে চিরকালের মন, বলো তো মন!

পাথর চাপা দিলে-ও ঘাস
পাশ কাটিয়ে বাঁচে
ঝড় আসবে জেনেও বট
আকাশ মুখী হয়
সংঘর্ষের প্রবল অভিলাষে।

তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করতে পার
তাই বলে কী
তোমার মেকী
অভিমানের ভয়ে
সন্নিবিষ্ট [illegible] ঘনিষ্ঠতা থেকে
পালিয়ে যাব সুদূরে ধ্বংসের অন্ধকারে?

সূর্য দেখলে চোখ ধাঁধাবে
সে তো জানাই থাকে—
তাই বলে কী অন্ধকারের বন্ধ দ্বারে বন্দী বিহঙ্গ-কে
চিরটা কাল মাথা কুটতেই হবে?

কথা দিয়েছিলাম আসবো ॥

হরিপদ দে

বাঁক ঘুরে বাঁক ঘুরে ক্লান্তি নামে দেহে
সূর্য কিরণ যেমন খসে পড়া ফুলে
মাঠ পেরিয়ে নদী পেরিয়ে শহরের
সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে
এখনো ঠিকানা ধূসর—

কোলাহল ক্ষীণতর যেন নির্বাসিতের কান্না
দূরতর দ্বীপে
পূরবী শান্ত সৌম্য আবেগে ঝরে পড়ে
সন্ন্যাসী-সূর্যের পদপ্রান্তে নম্র নৈবেদ্যের মতো।
শেষ সংকেত নিয়ে দাঁড়ায় ভেলা—
পাড়ি দিতে হবে অজানায়
কথা দিয়েছিলাম তোমাকে
দিন শেষ হলে আবার আসবো।

ছুটির ঘণ্টা পড়ে ফুলের ভিড়ে কথার জলসায়
আর বসন্তবাহারে।
সঞ্চয়ের পথে পথে কেটে যায় বেলা
বুকের ভিতরে দরবারী কানাড়া
কথা দিয়েছিলাম তোমাকে
দিন শেষে আবার আসবো।

এই শক্তিতে জাগে ॥

শান্তি কুমার ঘোষ

লাফিয়ে ছুটছে ঘোড়া
—গুহার দেয়ালে খোদাই-করা এই পশ্চাদভূমি
রেখে মোটর-বাইকে চড়লো যুবা,
পিছনে আঁকড়ে ধ'রে বসেছে তার সোহিনী;
বাইক গর্জে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একালের
বন্দী শিলাপাথর ছাড়া পেয়ে যোগ দেয় নাচে...

পাহাড় ও উৎরাই বেগে লাফ দিয়ে উঠছে-নামছে পথ
নদীর বুকে এসে পড়ছে শাখা-নদী
সেই কলতান আসছে কানে;
আর দূর থেকে দূরতর
সাদা ইস্পাতের তার কাঁপা তানে টেলিগ্রাফ
স্তম্ভে স্তম্ভে ভুলে চাকো বেঁধে জনপদ গড়ে স্থপতি...

এই শক্তিতে ভূস্তর ফুঁড়ে জাগে পদ্ম—পদ্মের ভিতর আলো...

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

পূজোর আনন্দে গ্রাম গুলজার। সব বাড়িতেই আত্মীয় পরিজনের ভিড়। এর মধ্যেই খুচরো পরব এক ধরনের পূজোই—ধান বনকে সাধ খাওয়ানো। আর এক পরব গার্সিও এই সময়েই। সধবা-বিধবা ছেলে-বুড়ো সবাই মেতে উঠলো। কিন্তু তুরঙ্গিনীর মন বড় চঞ্চল। বুকের মধ্যে তাব টনটন করে ওঠে—ষষ্ঠী গেল—মহাসপ্তমীও এসে গেল—কিন্তু তার মেয়ে এখনও এলো না। ক্রমে অষ্টমী নবমী পেরিয়ে দশমীও এসে গেল। ভোরে উঠেই সবাই দেখে ভিজে চোখ মা-দুর্গার। শেষ রাত থেকে সানাই বাজছে। করুণ কান্নার সুরে গিরিকন্যা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাচ্ছেন বলে।

পূজোর পর পরই রাখীবন্ধন। এগাঁয়েও তার ঢেউ এসে লেগেছে। দেবনাথ পূজোর পরে গ্রামে এসেছে। সে এসেই রাখী উপলক্ষে স্বদেশী দল করেছে। ফলে খোদ ভুবনাথের ভিতর বাড়িতেই 'বন্দে-মাতরম' ধ্বনি।

সেই উপলক্ষ হাটখোলার সভা পর্যন্ত হয়ে গেল। এই সময়টায় গ্রামের লোকেদের মধ্যে ব্যস্ততা বাড়ে। কামারদের কাজ বেড়ে যায়। সামনে ধান কাটার মরশুম। তাই কাস্তে গড়ার ধুম। তাছাড়া গাছ কাটা দা গড়ার কাজ তো আছেই।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডোবার ঘাট থেকে উঠে ঠাকুরমশায় অবাক দৃষ্টিগম্য হলেন। বিলে হাঁটার চাঁড়াড়ে চেহারা আর নেই। পাঁটৌল খুলে খড়ম বের করে পায়ে পরেছেন নামাবলী বের করে গায়ে জড়িয়েছেন। সাত্ত্বিক মানুষের সাজসজ্জা যেমন হতে হয়। সোনাখালিতে বিশ্বের শিষ্যসেবক ভুবনাথ তুলিনন্দী একেবারে সাক্ষাৎ শিষ্য হরিসেবক ঠাকুরের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন তাঁরা। খড়ম খটখট করে ঠাকুরমশায় এগিয়ে আসছেন। ভুবনাথ পথে নেমে পড়ছেন পিছনে কমল। খট করে ঠাকুরমশায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রণামের পর পায়ের আঙুল ঈষৎ উঁচু করে দেন, পদধূলি নিতে অসুবিধা না হয়। ভুবনাথের হয়ে গেল তো কমল। প্রণাম করল সে কিন্তু খড়মের উপর বুড়ো আঙুল তোলাই আছে।

ভুবনাথ বললেন পায়ের ধুলো নেওয়া হয় নি রে মনু।

ফটিক দেখেছে, সে বলল, নিলেন তো খোকাবাবু।

ভুবনাথ হেসে বলেন ডান পায়ের ধুলো নিয়েছে বাঁ-পা বাকি। বাঁ-পায়ের আঙুল তোলা দেখছিস নে। ছেলেমানুষ বুঝতে পারে নি।

বেকুব হয়ে কমল তাড়াতাড়ি বাঁ-পায়ের তলা স্পর্শ করল।

পদধূলি নিতে আরও কজন জমেছে। হাতুড় ফেলে মেঘা কর্মকারও এলো। হয়ে গেছে, ঠাকুরমশায় তবু নড়েন না। মেঘাই ঠাহর করল। প্রণামের ঘটা দেখে জল্লাদ সকৌতুকে অদূরের গাবতলায় দাঁড়িয়ে আছে। ডাকল এসো না জল্লাদ। ঠাকুরমশায় তোমার জন্য দাঁড়িয়ে।

জল্লাদ কানেই নিল না। আশশ্যাওড়া-বনের শুঁড়িপথ ধরে সে পা চালিয়ে দিল।

কামার-দোকান থেকে কার মুখের একটা মন্তব্য এলো : দেবদ্বিজে ভক্তি শেখায় না—পাঠশালে কী শেখায় যে ঘোড়ার ডিম।

হরিসেবক পাড়ায় ঢুকে গেলেন। মেলা কাজ। শিষ্যবাড়িতে বার্ষিক প্রণামী বরাদ্দ আছে—চার আনা আট আনা এমন কি এক টাকাও যার যেমন অবস্থা। ঘুরে ঘুরে প্রণামী আদায় করে বেড়াবেন। বর্ষার দরুন চার-পাঁচটা মাস আসা-যাওয়া একেবারে বন্ধ ছিল, তার মধ্যে বিয়েথাওয়া এবং আরও পাঁচরকম শুভকর্ম হওয়া সম্ভব। তেমনি ক্ষেত্রে গুরুপ্রণামী তোলা থাকে। এসবের খোঁজখবর নিতে হবে। সরাসরি খাজনা আদায়ও আছে নিশিকান্ত নায়েবের মতোই খানিকটা। জমির খাজনা নয়, ঠাকুরমশায়ের একফোঁটা জমিও নেই গাঁয়ের মধ্যে, নারকেল গাছের বাবদ খাজনা। হতে হতে হরিসেবক ঠাকুরমশায় অন্তত পঞ্চাশটা নারকেল গাছের মালিক হয়ে পড়েছেন। শিষ্যসেবকদের কেউ মারা গেলে শ্রাদ্ধের সময় গুরুঠাকুরকে নারকেল গাছ দানের বিধি। ভাল গাছ দেয় আবার বুড়ো গাছ যাতে ফল ধরা বন্ধ হয়ে গেছে তেমন গাছও ছ্যাঁচড়া শিষ্য কেউ কেউ দিয়ে থাকে। ব্রাহ্মণের বৃক্ষমূর্তি হলেন নারকেল গাছ—কুড়াল পেড়ে কাটা চলবে না, ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে। গাছের ডাব-ঝুনো সুদূরে পাড়ালায় বসে রক্ষে হয় না গাছ বেচে দেবো খদ্দেরে কেটেকুটে উনুনে পোড়াবে তা-ও হবে না। অতএব বার্ষিক খাজনায় জমা দিয়ে দিয়েছেন—গাছ প্রতি আট আনা। সেই খাজনা আদায় করাও ঠাকুরমশায়ের কাম একটা।

মানুষটি সাদাসিধে, কোনরকম লজ্জা নেই। গাঁয়ের আধাআধি লোক শিষ্য। সেবা নেবেন—কোন এক বাড়ি উঠে পড়লেই হল। পাড়ায় একটা চক্কোর দিয়ে সকলের যথা-সম্ভব খবরাখবর নিয়ে পুকুরবাড়ি এসে

পড়লেন আজ। ভবনাথ ফেরেন নি এখনো—কমল ঐ কামার দোকান থেকে অমনি পাঠশালায় গেছে ভবনাথও হয়তো সংগে গিয়ে প্রহ্লাদ মাস্টারের সঙ্গে গল্প বসেছেন। কড়ি-বাঁধা ব্রাহ্মণের হুঁকোয় স্বইস্তে জল ফিরিয়ে নিয়ে রোয়াকের উপর জলচৌকিতে তিনি বসে পড়লেন অটল কলকে ধরিয়ে ফুঁ দিতে দিতে নিয়ে এলো। নলচের মাথায় কলকে বসিয়ে হরিসেবক ধূম-উদ্গীরণ করছেন।

বিনো এসে গলায় আঁচল জড়িয়ে পায়ের ধুলো নিল। আশীর্বাদ বিস্মরণ হয়ে হরিসেবক হুকুম ছাড়লেন ঃ ভাতে-ভাত। অর্থাৎ এতখানি পথ হেঁটে এসে বুড়ো-মানুষের সবিশেষ ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে।

উমাসুন্দরী প্রণাম করে বললেন ক্ষেতের সোনামুগ, ক্ষেতের মানকচু—কচু দিয়ে মুগের ডাল রেঁধে নিন ঠাকুরমশায় অমৃত লাগবে।

উঁহু, ভাতে-ভাত। ভাতে-ভাত।

রান্নায় ঠাকুরমশায়ের বড় আলসা। অথচ শিষ্যবাড়ি ঘুরতে হয়, সবাই তারা অব্রাহ্মণ—স্বপাক ভিন্ন উপায় কি তখন? তবে ব্যাপারটা সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছেন। আলাদা তরকারি রান্না নয়—কাঁচকলা মেটে-আলু কচু ঝিঙের ন্যাকড়ায় বাঁধা ডাল বা শিম-বরবটি ভাতের মধ্যে ছেড়ে দিলেন, এক-সঙ্গে সব সিদ্ধ হয়ে গেল। তারপর তেল-নুন-লঙ্কা মেখে খাওয়া। উনুনে ভাত চাপানো ও নামানো—তা-ও নিজের হাতে নয়। বিনোকে বলেন নেয়ে ধুয়ে শুচি হয়ে এসেছ—বাস বাস ভাত তুমিই নামাবে। অনাচার হবে না ও ভাত এঁটো নয়, নুন না পড়া পর্যন্ত এঁটো হয় না।

কিছুদূরে রাজীবপুর—গণ্ডগ্রাম, বহু লোকের বাস। পোস্টাপিস সেখানে। পিওন যাদব বাঁড়ুয্যে চিঠি বিলি করতে এসেছেন। রবিবার আর বিষ্যুৎবার হপ্তার এই দুটো দিন আসেন তিনি সোনাখড়িতে। তাঁর ধরণ-ধারণ হরিসেবকের একেবারে বিপরীত। ভোজনবিলাসী মানুষ—রাঁধাবাড়ার কাজে অতিশয় উৎসাহী। রাঁধেনও চমৎকার খেয়ে মুখ ফেরে না। দত্তবাড়ি গিয়ে সর্বাগ্রে চিঠি-পত্র যা দেবার দিলেন। তারপরে খবরা-খবর নিচ্ছেন, দুধ হয় ঘরে কেমন তরিতরকারি কি মজুত আছে মাছের ব্যবস্থা হতে পারবে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। গৃহস্থ পুলকিত। বাড়িতে ব্রাহ্মণের পাত পড়বে সে জন্যে তো বটেই তাছাড়া রাঁধাবাড়া পিওনঠাকুর শুধু নিজের মতন করেন না সবাইকে খাইয়ে তাঁর আনন্দ, বাড়িসুদ্ধ সবাই প্রসাদ পেতে পারবে, খাওয়াটা উপাদেয় হবে।

দত্তগিন্নি বলেন, বেলা তো বেশ হয়েছে। স্নান-আহ্নিক সেরে জলটল মুখে দিয়ে লেগে যান, উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি আমি।

কিন্তু উপকরণ তেমন জুতের নয় পিওনঠাকুর দ্বিধান্বিত। বললেন, বোসো মা পাড়ার কিছু চিঠি আছে সেইগুলো সেরে আসি। তার পরে।

নাছোড়বান্দা গিন্নি বললেন, সিধেপত্তোর গোছাচ্ছি আমি কিন্তু।

তাড়া কিসের? ফিরে আসি আমি, তার পরে।

এ মকেল একেবারে বাতিল করে যেতে চান না অন্য বাড়ির অবস্থা এর চেয়েও যদি খারাপ হয়?

নতুনবাড়ি ঢুকলেন। হ্যাঁ, সার্থক হল এ বাড়ির চিঠি বিলি করা। বড় রুই ও শোল মাছ জিয়ানো আছে, গঞ্জের বাজারে নতুন গোল আলু উঠেছে তা-ও নিয়ে এসেছে কাল। নলেন পাটালি আর গোবিন্দ-ভোগ চাল আছে দিব্যি পায়েস হতে পারবে। তার উপরে মাদার ঘোষ বাড়ি এসে-ছেন, পুকুরে মাছ গিজগিজ করছে তার প্রস্তাব ঃ পাশখেওলা ফেলে এক্ষুনি একটা কাতলা মাছ তুলে দিচ্ছেন কৃপা করে এক খানা মুড়িঘণ্টের তরকারী পাক করতে হবে।

এর উপরে কথা কি। কাঁধের চিঠির ব্যাগ নামিয়ে পিওনঠাকুর আসন নিলেন। পাড়া-বেড়ানী পুঁটি এসে দাঁড়াল তাদের বাড়ির চিঠি থাকে তো নিয়ে যাবে। পিওন ঠাকুর বললেন, দত্তবাড়ি খবরটা দিয়ে যাস তো মা। মাদার ছাড়ছেন না, পাকশাক এই-খানেই করতে হচ্ছে।

হরিসেবকের এদিকে স্নানাদি রোয়াকের উপর আহ্নিকে বসেছেন। ঘরে দাওয়ায় ভাত ফুটছে টগবগ দেখা যাচ্ছে রোয়াক থেকে। নাক টিপে বিড় বিড় করে মন্তোর পড়তে পড়তে গুরু আঙুলের ইসারায় বিনোকে উনুনের [illegible] ঠেলে দিতে বলেছেন। এমনি সময় [illegible] ফিরে এসে অলকা-বউকে বলছে চিঠি জিজ্ঞাসা করে এসেছি। থাকলে উনি নি[illegible] তো দিয়ে যেতেন।

তারপর কলকল করে বলছে, [illegible] বসেছেন। মাদারকাকা পুকুরে [illegible] ফেলাচ্ছেন। মস্ত বড় এক কাতলা [illegible] করে উঠোনে এনে ফেলল—

হরিসেবক উৎকর্ণ। সোনাখড়িতে কালের আসা-যাওয়া — পিওনঠাকু[র] জানেন তিনি, খুব জানেন। রান্নাও কত খেয়েছেন। আহ্নিক সম্ভবত সারা [হয়ে] গেছে, তড়াক করে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন উমাসুন্দরীকে ডেকে বলেন কেষ্টর [মা] শোন। মাদার এসেছেন, অনেকবার [আমায়] খাবার কথা বলেন। আমি নতুনবা[ড়ি] চললাম। ঐ ভাত নামিয়ে নিয়ে তোম[রা] রান্নাঘরে নিয়ে যাও।

রাতের বেলা এ বাড়ি খাবো শোবো এখানে।

দোচালা বাংলা ঘর। তক্তপোষের উপর গুরুঠাকুর মশায়ের বিছানা, অটল নীচে মাদুর পেতে পড়েছে। রাতদুপুরে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড—অটল চেঁচামেচি করছে, কাঁদছে। ঘুম ভেঙে ভবনাথ ছুটলেন। হিরুও বাপের পিছু পিছু।

কি রে অটলা কাঁদিস কেন? কি হয়েছে?

অটল ঘরের বাইরে এসে, ঠাকুরমশায় মেরেছেন।

হরিসেবকও বেরুলেন। আকাশ থেকে পড়লেন তিনি ঃ সে কী কথা! দোষঘাট করিস নি, আমি কেন মারতে যাব মিছা-মিছি?

অটল নরম হয়ে বলে, মারেন নি লাথি? ঠাকুর মানুষ হয়ে মিছে কথা বলছেন। পৈতে ছুঁয়ে বলুন তবে।

হিরুও এসে পড়েছে। ইদানীং আমলের এই সব ছোঁড়া গুরু-পুরুত গো-ব্রাহ্মণ সম্পর্কে তেমন ভক্তিমান নয়। অটলের পক্ষ নিয়ে সে বলে, সারাদিন খেটেখুটে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিল। রাতদুপুরে উঠে আপনার নামে মিথ্যে বানিয়ে বলছে, তাই বলতে চান?

হরিসেবক আমতা আমতা করে বলেন মিথ্যে ইচ্ছে করে না বলুক পাকেচক্রে তাই তো হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাবা। পা লেগেছে ওর গায়ে সেটা মিথ্যে নয়। তা বলে লাথি মারি নি। বিনি দোষে লাথি কেন মারতে যাব?

তবে?

রাতে একবার নন্দবাবুর আমায় উঠতে

হয়। অন্ধকারে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে—পা বেধে বুড়োমানুষ আছাড় খেয়ে মরব? ঠিক কোন খানটায় খুঁজে দেখছিলাম। লেগে গেল দৈবাৎ।

হিরণ্ময় জেরা করছে: খোঁজার কথা তো হাত দিয়ে।

আমি পা দিয়ে খুঁজেছি। সে তো ওরই মঙ্গলের জন্য।

কৌতূহলী হয়ে ভবনাথ বলেন, কি রকম? কি রকম?

হরিসেবক বলেন, হাতে খুঁজতে গিয়ে অন্ধকারে যদি দৈবাৎ হাত ওর পায়ে গিয়ে লাগত: ব্রাহ্মণের অঙ্গে শূদ্রের পা পড়া—কি সর্বনাশ হত ভাবো দিকি। সে পাতকের কঠিন প্রায়শ্চিত্ত। পাতক বাঁচাতে গিয়েই এই গণ্ডগোল। আমার পা দিয়ে খোঁজা ও ভেবে নিয়েছে পায়ের লাথি।

অটলের কান্না একেবারে বন্ধ হয় নি তখনো। ফোঁপাচ্ছে। ভবনাথ বুঝিয়ে বলেন, শুনলি তো সব। মারেন নি পা। অমনি লেগে গেছে। দোষঘাট করিস নি, লাথি কি জন্যে মারতে যাবেন?

বিরক্ত হয়ে তেড়ে উঠলো, গায়ে পা ছুঁয়েছে কি না ছুঁয়েছে—ব্যথা কি এখনো লেগে আছে। ভারী কুলীন হয়েছিস, উঃ—টনটনে অপমানবোধ?

কান্নার কারণ অজানা, হাত ঘুরিয়ে অটল পিঠের দিকে দেখায়। ফোড়া হয়েছে, কদিন থেকে বলছিল বটে। পায়ের ঘাটে ফোড়া ফেটে গেছে টাটাচ্ছে খুব।

বেশ তো ভালই তো! হরিসেবক এবারে বলার জুত পেয়ে গেছেন: ফেটে গিয়ে তো ভালই হয়েছে রে। ফোড়া তো হীরে-মুক্তোর অলঙ্কার নয় যে গায়ে পরে থেকে শোভা বাড়াবি, দায়ে-বেদায়ে বন্ধক দিবি বিক্রি করবি। ডাক্তার বদ্যি লাগল না, এমনি এমনি ফোড়া ফাটিয়ে উপকার করেছি তোর।

ডুগডুগি বেজে উঠল একদিন। দেড়প্রহর বেলা। কানাপুকুর-পাড়ের ওদিক থেকে জঙ্গলের আড়াল বলে নজরে আসছে না। তারপর ফাঁকায় এসে গেল। দুজন মানুষ। পিছনের জনের মাথায় টিনে বানানো বেঢপ আকারের বাক্স—টিনের উপর রংবেরংয়ের ফুল লতা-পাতা আঁকা তিন গোলাকার মুখ, মুখ তিনটে কালো কাপড়ে ঢাকা। আগের জন বেশ খানিকটা বাবু মানুষ—গায়ে কামিজ পায়ে জুতো মাথায় টেরি।

এই লোকের হাতে ডুগডুগি কাঁধে বাঁশের তেপায়া। ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে আসছে আর চেঁচাচ্ছে বাক্সকল পেল্লায় পেল্লায় ছবি বত্রিশ দফা। সস্তায় যাচ্ছে—মাত্তর দু পয়সা। চলে এসো চলে এসো সব। সস্তায় যাচ্ছে দু পয়সায় বত্রিশ মজা—

গানের মতন সুর ধরে লোক জমাচ্ছে: কলকাতার শহর দেখ, চিড়িয়াখানার হাতী দেখ—

অটল বলে সোনাখড়িতে কলকাতা এনে দেখাচ্ছ?

দুটো পয়সা ফেলে কাচে চোখ দাও: কলকাতা দেখা থাকে তো রাস্তাঘাট ট্রামগাড়ি ঘরবাড়ি মিলিয়ে নাও।

পুবেবাড়ির হুড়কোর ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। ভবনাথ বাড়িতে না মামলা উপলক্ষে সদরে গেছেন। পুঁটি কোনদিকে ছিল ছুটে এসে পড়ল। হাঁপাচ্ছে সে। পাঁচিলের দরজায় বিনির আর নিমির মুখ দেখা যায়। বাক্সকলের সঙ্গে অটল দরদস্তুর করছে: দু-পয়সা কম হল নাকি? বিশ হাত মাটি খুঁড়ে দেখ, দুই কেন আধেলা পয়সাও উঠবে না! যতই চেঁচাও আর ডুগডুগি বাজাও দু-পয়সায় কেউ তোমায় ছবি দেখাবে না। কম-সম করে নাও মেলা খদ্দের হবে।

চাউর হয়ে গেল পুবেবাড়ি বাক্সকল এসে রকমারি ছবি দেখাচ্ছে। প্রহ্লাদের পাঠশালায় সুর করে নামতা পড়ানো হচ্ছে ঘণ্টু এসে বলল যাবেন না মাস্টারমশায়? প্রহ্লাদ উড়িয়ে দেন: দূর ছবি আবার পয়সা দিয়ে ঘটা করে কী দেখতে যাবো? কিন্তু নামতায় তারপরে আর জুত হয় না। সর্দার-পোড়ো অবধি অন্যমনস্ক এটা বলতে ওটা বলে উঠছে। ছুটি দিয়ে দিলেন প্রহ্লাদ—ছেলের দল ছুটল কমলও আছে। আর দেখা যায় স্বয়ং প্রহ্লাদ-মাস্টার গুটিগুটি পা ফেলে চলেছেন সকলের পিছনে কৌতূহল সামলাতে পারেন নি।

এক পয়সায় রফা করে লোকটা ইতি-মধ্যে ছবি দেখাতে লেগে গেছে। লতাপাতা আঁকা রহস্যময় বাক্সকলে পাশাপাশি চারটে ছিদ্র গোলাকার কাচে-ঘেরা। চারজনে সেখানে চোখ রেখেছে—পুঁটি বিনি নিমি আর অলকা-বউ। হাতল ঘোরাচ্ছে লোকটা আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছে: লাটসাহেবের বাড়ি দেখ চিড়িয়াখানার হাতি দেখ গণ্ডার দেখ জলহস্তী দেখ হাওড়ার পুল দেখ—

পাঠশালার ছেলের দল হৈ-হৈ করে এসে পড়ল। বাইরের লোক জুটেছে। বউমানুষ অলকা এতক্ষণ যা দেখে নিয়েছে—আর এখন দেখা সম্ভব নয়। ঘোমটা টেনে সে পাঁচিলের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। কমল আর দেরি করে—এক ছুটে গিয়ে বউদিদার সেই জায়গায় চোখ রাখল। বাক্সকলের লোকটা বিবেচক গলা উঁচু করে ভিতর বাড়ির দিকে চোখ প্রবোধ দিচ্ছে: এঁদের সব হয়ে যাক—কি আমি ভিতরে নিয়ে যাব মায়েরা। এয়েছি যখন, সকলকে দেখাব। যতবার দেখতে চান দেখিয়ে যাব।

সুর ধরল সঙ্গে সঙ্গে: হাওড়ার পুল দেখ খিদিরপুরের জাহাজ দেখ পরেশনাথের বাগান দেখ ফাঁসির ক্ষুদিরামকে দেখ সুরেন-বাবুর সভা দেখ লাটসাহেবের বাড়ি দেখ—
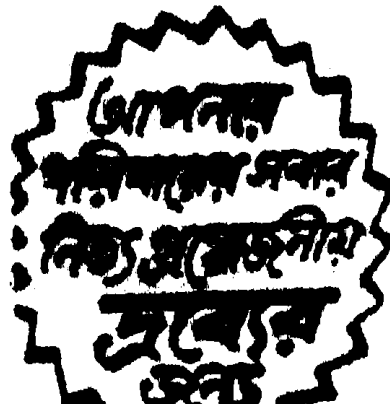
ক্ষুদিরামের গল্প দেবনাথ বলেছিলেন ধক করে তাই কমলের মনে এসে গেল। আর আহ্লাদ বৈরাগী গেয়েছিলেন: একবার বিদায় দাও মা—। ঐ গান পরে কমল অনেক মুখেও শুনেছে নিজেও একটু আধটু গায় কখনো-সখনো। ক্ষুদিরামকে জানে সে, আজকে এই চেহারা দেখল। কোঁকড়া-চুল রোগা রোগা খাসা ছেলে। একরকম মন্ত্র পড়ে নাকি অদৃশ্য হওয়া যায়। কমল তাই হয়েছে। প্রহ্লাদ মাস্টারমশায়ের জোড়াবেত না নিয়ে লাটসাহেবের বাড়ি ঢুকে গেছে। সপাং সপাং করে বেত মারছে বাবারে মলাম রে—করছে লাটসাহেব। অথচ কে মারছে দেখা যাচ্ছে না। বন্দেমাতরম বলার জন্য বেত মেরেছিল—তারই শোধ তুলে আসবে, ওকে কেউ যদি অদৃশ্য হবার মন্ত্রটা শিখিয়ে দেয়।

লোকটা বলে চলেছে লাটসাহেবের বাড়ি দেখ কালীঘাটের মন্দির দেখ জগন্নাথের রথ দেখ আগ্রার তাজমহল দেখ গয়া দেখ কাশী দেখ—

উমাসুন্দরী তারিফ করে বলেন গয়া কাশী শ্রীক্ষেত্র সমস্ত দেখাচ্ছ তুমি?

লোকটা হাসিতে দাঁত বের করে বলল আজ্ঞে হ্যাঁ। উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখতে পাচ্ছেন। খরচা একটা পয়সা মাত্তোর—

কমলের ছবি দেখা হয়ে গেছে বাক্সকল এবারে ঠাহর করে করে দেখছে। আয়তনে এত ছোট—এর মধ্যে লাটসাহেবের বাড়ি হাওড়ার পুল গয়া কাশী ইত্যাদি বড় বড় জিনিস অবলীলাক্রমে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বারোহাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি—তারও চেয়ে অনেক বেশি তাজ্জব
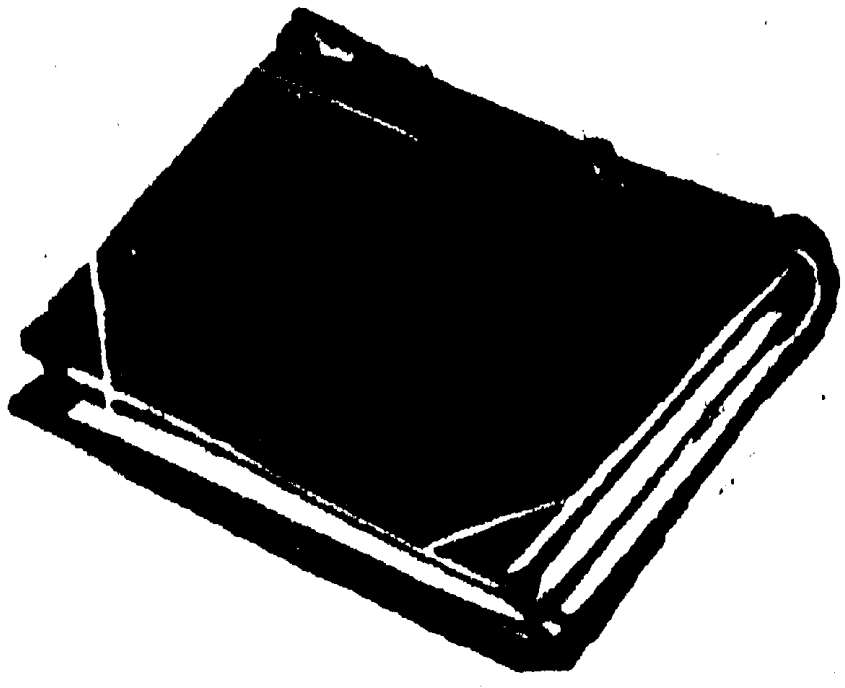
সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অনুবাদ পত্রিকা উদ্বোধন

বাংলা ত্রৈমাসিক অনুবাদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রকাশ উপলক্ষ্যে সম্প্রতি র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হলে একটি প্রীতিস্নিগ্ধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রীমতী লীলা রায় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীঅন্নদাশংকর রায়। এই সুন্দর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়।

বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের উপ-মন্ত্রী শ্রীযুক্তা অমলা সোরেন। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন বাংলা ভাষায় অনুবাদ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সেই ঐতিহ্যের কথা স্মরণে রেখে কেবলমাত্র অনুবাদ ও অনুবাদ বিষয়ক রচনা অবলম্বনে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এ সত্যি আনন্দের বিষয়।

প্রধান অতিথি বলেন এ রাজ্যের লেখক-দের আজকের দিনের একটি নৈতিক দায়িত্ব হোল বাংলা অনুবাদের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সাহিত্যের নানা লেখাকে পরিচিত করে তোলা।

সভানেত্রী শ্রীযুক্তা রায় বলেন, অনুবাদ পত্রিকাটি সাহিত্যের মূল্যেই বেঁচে থাকবে। অনুবাদ যদি সুষ্ঠু ও সুন্দর হয় তবে তা রসোত্তীর্ণ হবেই এবং রসোত্তীর্ণ হোলেই সাহিত্যানুরাগীদের তা দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

সভায় আরো যাঁরা বক্তৃতা করেন তাঁরা হোলেন ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার সাহিত্য একাডেমীর আঞ্চলিক সম্পাদক ডক্টর শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ জ্যোতি-প্রসন্ন সেনগুপ্ত, অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ও শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ডু।

অপহৃত বিষ্ণু মূর্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা

দশ বছর আগে পৌষ সংক্রান্তির মধ্যরাতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভবন থেকে যে বিষ্ণু মূর্তিটি অপহৃত হয় তারই পুনঃ প্রতিষ্ঠা হোল সম্প্রতি পরিষদ ভবনে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে নানা হাত ঘুরে আমেরিকান বোস্টন মিউজিয়ামে চার লক্ষ টাকা দিয়ে মূর্তিটি বিক্রী করা হয়। এই মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ পরে সাহিত্য পরিষদকে মূর্তিটি ফেরত দেন। [illegible] মূর্তিটির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন রাজ্যপাল এ এল ডায়াস। তিনি বিষ্ণু পাদপদ্ম চন্দনে চর্চিত করেন।

এই স্নিগ্ধ সুন্দর অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার ও রাজ্যপাল শ্রীডায়াস উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে এই মূর্তিটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু এই ধরণের প্রাচীন মহামূল্য নিদর্শনগুলির সংরক্ষণের জন্য রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের কথা তাঁরা সবাই বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীমদনমোহন কুমার এই মূর্তি চুরি হওয়া ও ফিরে পাওয়ার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার সাগরদীঘির কাছে ১১ শতকে এই বিষ্ণু মূর্তিটি পাওয়া যায়। পরিষদের তখনকার সম্পাদক আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কান্দীর শ্রীকিশোরীমোহন সিংহের কাছ থেকে যে তিনটি মূর্তি সংগ্রহ করেন এই মূর্তিটি তারই একটি। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গবেষণা করে ঘোষণা করেন এই মূর্তিটি লক্ষ্মণ সেনের আমলের। উইলিয়াম রদেন-স্টাইন এটি দেখতে এসে মুগ্ধ হয়ে বলেন বিশ্বে এমন আশ্চর্য সুন্দর দ্বিতীয় মূর্তি নেই। ১৯৪৭—৪৮ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত রয়েল একাডেমী অফ আর্টের শিল্প প্রদর্শনীতে এই মূর্তিটি প্রদর্শিত হয়। সৌন্দর্যের জন্য সেখানকার শিল্প-রসিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এই বিষ্ণু মূর্তিটির দিকে। ১৯৬৫ সালের ১৪ই জানুয়ারী পরিষদ কক্ষ থেকে এই মূর্তিটি চুরি যায় তারপর দীর্ঘ দশ বছর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। সব শেষে বোস্টন মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস সন্ধান দিলো। এবং সানন্দে ফেরতও দিয়ে দিলো। সাংস্কৃতিক এই তৎপরতা ও উদারতার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সাহিত্য উৎসবের আয়োজন

হাওড়ার সাহিত্য-প্রয়াসীর উদ্যোগে এবারও ২রা মার্চ শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে সারাদিনব্যাপী সাহিত্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে থাকবে সাহিত্য পাঠ আলোচনা সংগীত নৃত্যনাট্য আবৃত্তি চিত্র প্রদর্শনী ও বনভোজন। যোগাযোগের ঠিকানা বরুণ ঘোষ সাধারণ সম্পাদক সাহিত্য প্রয়াসী; ৪৫ যাদব দাস লেন হাওড়া ২ অথবা ৫৩।১।২ ধর্মতলা লেন হাওড়া-২।

ছোটগল্প প্রতিযোগিতা

নৈবেদ্য পত্রিকার পরিচালনায় ছোটগল্প প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোতে চলেছে। পাণ্ডুলিপি জমা দেবার শেষ তারিখ: ৩০শে জুন ৭৫। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছোটগল্প নৈবেদ্যতে প্রকাশিত হবে। যোগাযোগের ঠিকানা : যুগ্ম সম্পাদক, নৈবেদ্য বাণীকুটির ৪৭ রাজবল্লভ সাহা লেন রামকৃষ্ণপুর হাওড়া।

সাহাজৈন ক্লাবের শরৎ জন্মশতবার্ষিকী

সাহাজৈন ক্লাবের উদ্যোগে সম্প্রতি 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের জন্মশত বার্ষিকী পালিত হোল। এই উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নাটক পরিবেশিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপি সুব্রামনিয়ম।

বিচারপতিকে প্রাচীন গ্রন্থ উপহার

কয়েকদিন আগে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসমরেন্দ্র-নারায়ণ বাগচীকে তানকুনি দশমহাবিদ্যাশ্রমের আচার্য শ্রীশ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র সর্ববিদ্যা তান্ত্রিকসিদ্ধ সাধক সর্বানন্দদেব রচিত প্রায় দশ বছর আগের 'সর্বোল্লাস' গ্রন্থটি দেওয়া হয়। গ্রন্থটি হোল সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি। ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের উপর এখন গবেষণায় রত আছেন বিচারপতি শ্রীবাগচী।

পুরুলিয়া জেলা সাহিত্য মেলা— স্মারক গ্রন্থ ১৩৮১

হরপ্রসাদ মিত্র শান্তি সিংহ উৎপল হোমরায় সাধনা মুখোপাধ্যায় অমিতাভ কমল চট্টোপাধ্যায় কুশল হোমরায় মোহিনীমোহন গাঙ্গুলি মুকুল চট্টোপাধ্যায় তরুণ দাস অনিল মাহাতো প্রমুখ কবিদের কবিতার সঙ্গে এই জেলার সাময়িক পত্রিকার এবং লেখক পরিচিতির মূল্যবান দলিল সংযোজিত হয়েছে।

—উপগুপ্ত

নতুন বই
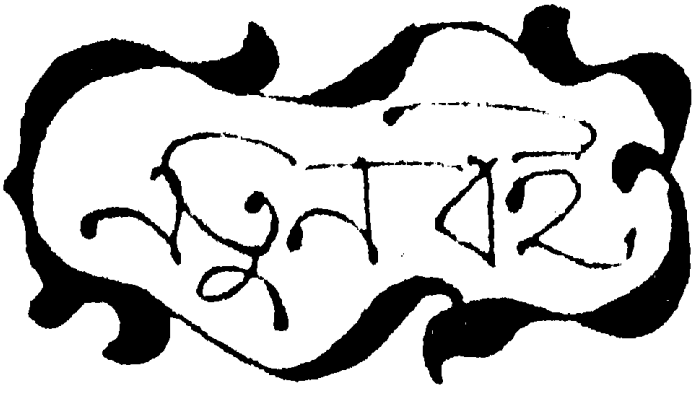
প্রেম তুই সর্বনাশী — মাহফুজ সিদ্দিকী। প্রকাশক : দানেশ প্রকাশনী ১১৭ আরাম-বাগ ঢাকা বাংলাদেশ। মূল্য ১৩ টাকা।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বাঙালী হিসেবে আমাদের যেটা সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছে সেটা হোল বাংলাদেশের সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া। যেন এপার-ওপারের সাহিত্য জগতের লৌহ কপাট এখন টান টান হয়ে খুলে গেছে দুই প্রান্তের বাঙালীদের কাছে।

বাংলাদেশের সাহিত্যের সমৃদ্ধিকাল বলা যায় স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছুকাল আগে থেকেই। অবশ্য পূর্ববঙ্গে সাহিত্যচর্চা কোন-দিনই কোন রাজনৈতিক আবর্তই ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। বাংলা সাহিত্যে তার প্রমাণ অজস্র। আমি বলছি সাহিত্যের নবমূল্যায়নের কথা। যা সাহিত্য জগতে এনে দিয়েছে এক নব চেতনা আর ভাবনার জোয়ার।

মাহফুজ সিদ্দিকীর বর্তমান ছোট গল্প সংকলনটি পড়ে আবার নতুন করে মনে পড়ল সেই কথাটা।

বর্তমান সংকলনে মোট তেরোটি বিভিন্ন স্বাদের গল্প সংকলিত হয়েছে। অকপটে স্বীকার করছি গল্পগুলি পড়তে পড়তে লেখকের গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন তার পরিবেশন ভঙ্গী এবং তা প্রকাশের মুন্সিয়ানা দেখে খুশি হয়েছি। এমন দু-একটি গল্প আছে যা আমাকে বিস্মিত করে দিয়েছে।

এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প আমার মতে 'পৃথিবীর নাম কালাচাঁদের গলি এবং কাপাডিয়া কমপ্লেকস' তারপরই নাম করবো 'খুন' নামক জাপানী গল্পের ভাবানুবাদটির। এ দুটি গল্পের বিষয়বস্তু যেমন বিচিত্র তেমনি এর প্রকাশ ভঙ্গীও। আর চমকে দেবার মত গল্পটির নাম 'প্রেম তুই সর্বনাশী।' এ গল্প পড়তে পড়তে যেন অন্য জগতে চলে যেতে হয়।

এমনি একটি আকর্ষণীয় গল্পগ্রন্থ উপহার দেবার জন্য লেখকের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। শিল্পী সৈয়দ এনায়েত হোসেন কৃত প্রচ্ছদটি অপূর্ব।

তবে লেখকের কিছু কিছু ভাষা প্রয়োগ আমাদের কাছে হোঁচট খাওয়ার মত মনে হয়েছে। যার মধ্যে 'উ'র বদলে 'ও'র ব্যবহার অন্যতম। এ সম্পর্কে অবহিত হতে বলি।

বইটি স্বনামধন্য সাংবাদিক সাহিত্যিক তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের উদ্দেশ্যে

গ্রাফিকস এ্যান্ড ড্রইং—অসিত পাল। প্রকাশক দাশগুপ্ত এ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ কলকাতা—১২।

শিল্পী অসিত প্যালের শিল্পকর্মের এটি প্রথম সংকলন কিনা জানি না। কিন্তু শিল্পীর বিভিন্ন জাতের কাজ দেখে মনে হয় তিনি শুধু পাকা শিল্পীই নন জাত শিল্পীও বটে।

এই সংগ্রহ পুস্তকে শিল্পীর নিজস্ব (সেলফ পোর্ট্রেট) ছবিটি ছাড়া মোট ৪৮টি বিভিন্ন মেজাজের কাজ স্থান পেয়েছে।

শিল্পীর নিজস্ব ছবিটি অবশ্য ব্লিচ করা। এছাড়া রয়েছে উডকাট লিনোকাট ড্রইং এবং একটি শিল্পীর ভাষায় 'সেলফলেস পোর্ট্রেট' যার ক্যাপশন দেওয়া হয়েছে 'ইন দি ট্রাইম্যান জু।'

এই সংকলনের ছবিগুলিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা মুস্কিল। কারণ প্রায় প্রতিটি চিত্রাঙ্কনই এমন এক আবেদন ও ঋজুতা নিয়ে উপস্থিত যে রস বিচার খেই হারিয়ে যায়। তবু তার মধ্যে বিষয়বস্তু দৃষ্টিকোণ দুঃসাহসিকতা ও কাজের দিক থেকে বিস্ময়াভিভূত করেছে ৫ ও ৬ নং (উডকাট) ১ ২ ৩ ৭ ১১ ১৫ নং লিনোকাট। এই-গুলি এবং অন্য কাজগুলিতে আপাতে দুর্বোধ্যতা থাকলেও আসলে সেগুলি যে দুর্বোধ্য নয় ক্যাপশন পড়েই তা বোঝা যায়। কিন্তু আরো বেশি খুশি করেছেন স্কেচে। প্রথম (খাটে মৃতের সম্মুখের পদ-যুগল লক্ষণীয়) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ছবি চমৎকার।

সেই সংগত আকাঙ্ক্ষা। অঞ্জনকুমার রায়। প্রাপ্তিস্থান' ১৮ এল টেমার লেন। কোলকাতা-৯। দাম ছয় টাকা।

চ্যাটার্জী এন্ড কোম্পানীর রহস্যময় অগ্নিকান্ড কোম্পানীর দীর্ঘকালের কর্মী অতীন হাজরার মৃত্যু ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে এক জমাট রহস্য তৈরী করেছেন 'সেই সংগত আকাঙ্ক্ষা'র লেখক অঞ্জনকুমার রায়। স্তরে স্তরে ঘনীভূত রহস্যের প্রতিটি গ্রন্থী নিপুণভাবে উন্মোচিত করেছেন লেখক। শেষ পর্যন্ত গল্পের টান পাঠককে টেনে রেখেছে চুম্বক টানে। পাকা লেখকের মতোই তিনি রহস্যের জালটি ছড়িয়ে দিয়েছেন একাধিক চরিত্রের ওপরই। বারবারই প্রশ্ন জেগেছে কে হত্যাকারী? চরিত্রগুলোও মোটামুটিভাবে প্রাণবন্ত হয়েছে। লেখকের গদ্য বেশ দুর্বল। ছাপার ভুলও বিরক্তি উৎপাদন করে। প্রচ্ছদ চলনসই।

মাঠ পাথারের গান। অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। স্টাডিজ ২২ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯। দাম ১-৫০।

কবি শিল্পী হিসাবে অরুণ চট্টোপাধ্যায় রসিক বিদগ্ধ মহলে সুপরিচিত। ইতিপূর্বে অন্ততঃ চারখানি কাব্যগ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছেন। গ্রামে গঞ্জে মাঠে পাহাড়ে ছড়িয়ে থাকা অতি সাধারণ মানুষের মূলতঃ আদিবাসী সাঁওতালদের ভাবনা ও ভাষার পটভূমিতে লোকগীতির আদলে রচিত 'মাঠ পাথারের গান' কাব্যগ্রন্থে তাঁর শিল্পী মনের নতুন পরিচয় পাই। একদিকে সহজ মানুষের হৃদয়ের সরল আবেগ অন্য দিকে সতীব্র শ্রেণী সচেতন সমাজ ভাবনা : দুয়ের সংমিশ্রণ এখানে একাত্মতায় রূপায়িত হয়েছে। বিশেষ উল্লেখ্য এর অনেকগুলি রচনা কলকাতা ও বাইরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীতরূপে পরিবেশিত হয়েছে বিশিষ্ট গায়কদের দ্বারা। ছাপা কাগজ খুব ভাল

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

চিত্রকল্প। তৃতীয় খন্ড চতুর্থ সংখ্যা। ১৩৮১। দাম আড়াই টাকা। প্রকাশক সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা। ২ চৌরঙ্গী রোড। কলিকাতা-১০।

চলচ্চিত্র সম্পর্কিত এই পত্রিকাটি ইতি-মধ্যেই ঐ বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই সংখ্যায় পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামল সেন সমু দত্ত এবং অশোক মজুমদারের লেখা পত্রিকাটির মূল্য বাড়িয়েছে। ছাপা পরিচ্ছন্ন

সাহিত্য মেলা। সম্পাদক পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ২৮।১ মানিকপাড়া রোড। কোলকাতা-৫০। দাম এক টাকা।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন এবং সারা বাংলা সাহিত্য মেলার সংবাদ নেপালী কবিতার অনুবাদ যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য নচিকেতা ভরদ্বাজের কবিতা এবং সমীর চৌধুরী ও বাধু গোস্বামীর গল্প এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। ছাপা মোটা-মুটি পরিচ্ছন্ন।

লোকসেবক—সম্পাদক : মুকুল রায়চৌধুরী। ৮৬এ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলকাতা-১৪।

শারদীয় লোকসেবক বিভিন্ন রচনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। আকর্ষণীয় গল্প, রম্য-রচনা, একগুচ্ছ কবিতা প্রবন্ধ এবং রহস্য উপন্যাস রয়েছে। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন : নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, অজিত চক্রবর্তী, কালিদাস রায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আশা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কৃষ্ণ ধর, অমিতাভ চৌধুরী, সুনীল বসু, জীবন সরকার, সত্যজিৎ রায় আশীষতরু মুখো-পাধ্যায়, কৃত্তিবাস ওঝা, অজয় বসু ও

চারুকলার এক বিস্মৃত পুরুষ : হেনরী হোভার লক

কমল সরকার

উনিশ শতকে শিক্ষায়তনের পরিবেশে চারুকলা অনুশীলনের যে সূচনা তার আদি-পর্বের যাঁরা শিক্ষাদাতা তাঁরা সবাই ছিলেন বিদেশী। সেই বিদেশী শিক্ষাব্রতীদের অনেকেই জীবনের দীর্ঘতম সময় এ-দেশেই অতিবাহিত করেন। জীবিকার প্রয়োজনে এসে এঁদের কেউ কেউ জীবনদানও করে গিয়েছেন এদেশে। এমন উৎসর্গিতপ্রাণ শিক্ষাব্রতীদের অন্যতম কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের প্রথম প্রিন্সিপাল হেনরি হোভার লক।

বিদ্যালয়ের মাধ্যমে এদেশে চারুকলা অনুশীলনের সূচনা ১৮৫০ খৃস্টাব্দে। মাদ্রাজের ইংরেজ সেনাবাহিনীর চিকিৎসক ডাঃ আলেকজান্ডার হান্টার ভারতের প্রথম চারুকলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তী সময়ে কলকাতা, বোম্বাই এবং জয়পুরে তিনটি চারুকলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। কলকাতা এ-বিষয়ে দ্বিতীয় এবং কলকাতার চারুকলা বিদ্যালয়ের জন্ম ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে। বিদ্যালয়টির তখন নাম ছিল 'স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'। কর্ণেল গুডউইন, হজসন প্র্যাট, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ, রেভারেন্ড লং, সিসিল বিডন, ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী প্রমুখ আরও কয়েকজন ভারতীয় ও ইংরেজের প্রচেষ্টায় কলকাতার এই বেসরকারী আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

মুখ্যত ললিতকলার ব্যবহারিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় দশ বছর পর অর্থাৎ ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে তদানীন্তন লেফটানেন্ট গভর্ণর স্যার সিসিল বিডন-এর উদ্যোগে এই বেসরকারী শিক্ষায়তনটির পরিচালনাভার সরকার গ্রহণ করেন।

১৮৬৪ খৃস্টাব্দে সরকার কর্তৃক ভার গ্রহণের সময় 'স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' পরিচালনার জন্য যে কমিটি গঠিত হয় সেই কমিটি ইংল্যান্ডের সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামের কাছে কলকাতার এই চারুকলা শিক্ষায়তনের জন্য একজন প্রিন্সিপাল চেয়ে পাঠান। কলকাতায় অনুরোধের উত্তরে সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামের অধীন 'গভর্ণমেন্ট স্কুল অব ডিজাইন' থেকে যাঁকে প্রিন্সিপাল মনোনীত করা হয় তিনিই হেনরি হোভার লক।

১৮৩৭ খৃস্টাব্দের ৮ মার্চ ইংল্যান্ডে হেনরি হোভার লকের জন্ম। লন্ডনের নিকটবর্তী সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামে অবস্থিত 'গভর্ণমেন্ট স্কুল অব ডিজাইন'-এ তাঁর চারুকলা অনুশীলন। সাউথ কেনসিংটনের স্কুল অব ডিজাইনে লকের সহপাঠীদের মধ্যে যাঁরা পরবর্তী সময়ে চারুকলার শিক্ষক হয়ে ভারতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে জন লকউড কিপলিং এবং জন গ্রিফিথস সুপরিচিত।

সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম অর্থাৎ ইংলন্ড থেকে চারুকলার শিক্ষক হয়ে যিনি প্রথম ভারতে এসেছিলেন তিনিই হেনরি লক। হেনরি লকের পরে দ্বিতীয় যে শিক্ষককে সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম ভারতে পাঠিয়েছিলেন তিনি জন লকউড কিপলিং। জন লকউড কিপলিং বোম্বাইয়ের স্যার জে জে স্কুল অব আর্টের প্রথম প্রিন্সিপাল হয়ে ভারতে আসেন। পরে লাহোরের মেয়ো স্কুল অব আর্টের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বিশ্ববিশ্রুত কবি রুডইয়ার্ড কিপলিং তাঁরই পুত্র এবং জন লকউডের বোম্বাই অবস্থানকালেই রুডইয়ার্ডের বোম্বাইতে জন্ম হয়।

সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম থেকে ভারতে প্রেরিত তৃতীয় শিক্ষক জন গ্রিফিথস। তিনিও বোম্বাইয়ের স্যার জে জে স্কুল অব আর্টে অধ্যক্ষতা করেন। ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বোম্বে আর্ট সোসাইটির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। তাঁর আঁকা অজন্তার চিত্রাবলী বোম্বাইতেই বোম্বে আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে প্রথম প্রদর্শিত হয় এই চিত্রগুলি উনিশ শতকেই গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছিল।

ভারত-চিত্রকলার প্রখ্যাতমনা ভাষ্যকার, অনুরাগী প্রবক্তা এবং অবনীন্দ্রনাথের গুরু আরনেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেলও এই সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম থেকে মনোনীত হয়ে প্রথম ভারতে আসেন। তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড কিম্বার্লি কর্তৃক মনোনীত হয়ে হ্যাভেলের মাদ্রাজে আগমন ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে। সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম থেকে প্রেরিত চারুকলা শিক্ষকদের মধ্যে তিনি চতুর্থ ব্যক্তি। সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম থেকে ভারতে আসার জন্য মনোনীত হবার পর ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের ৫ নভেম্বর লন্ডনের টাইমস সংবাদপত্রে এ সংবাদ প্রথম প্রচারিত হয়। হ্যাভেলের নিয়োগ সম্পর্কিত টাইমস-এর সে সংবাদ উদ্ধারযোগ্য :

> "Lord Kimberly has just appointed Mr. Havell, of the Science and Art Department at South Kensington, to the Superintendentship of the Madras School of Art. Mr. Havell's is the fourth appointment of this kind that has been made from South Kensington."

হ্যাভেলের ভাস্কর্য ও চারুকলা শিক্ষাও ঐ গভর্ণমেন্ট স্কুল অব ডিজাইনে। অবশ্য হ্যাভেলের যখন ললিতকলা অনুশীলন তখন সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামের স্কুল অব ডিজাইনের নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 'রয়াল কলেজ অব আর্ট'। তাই হ্যাভেল এ আর সি এ অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েট অব দি রয়্যাল কলেজ অব আর্ট। মাদ্রাজে আগমনের প্রায় বারো বছর পর ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে হ্যাভেল কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সাউথ কেনসিংটনের স্কুল অব ডিজাইনে ছাত্র থাকাকালে হেনরি লক এক ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সেই ছাত্র আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করায় হাউস অব কমন্স থেকে এক অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করা হয়। অতঃপর কেনসিংটন মিউজিয়ামের পরিচালক স্যার হেনরি কোল-এর মধ্যস্থতায় ছাত্র আন্দোলনের অবসান।

আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কৃতী ছাত্ররূপে হেনরি লক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আস্থাভাজন ছিলেন। তদানীন্তন বাংলা সরকার গঠিত কমিটি যখন স্কুল অব ডিজাইনের কাছে প্রিন্সিপাল হওয়ার অনুরোধ জানায় তখন গভর্নমেন্ট স্কুল অব

হেনরি হোভার লক (১৮৩৭-৮৫)

ডিজাইন হেনরি লককেই মনোনীত করেন। লকের ছাত্রজীবনের কথা কলকাতার 'ইংলিস-ম্যান' সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয় তাঁর পরলোকগমনের পর। 'ইংলিসম্যান'-এর সে-সংবাদে বলা হয়েছিল :

> "One of the reminiscences of his students days was a revolt againt the authority of the School, which attracted considerable attention of his time. A committee of the House of Commons inquired into the matter, but, mainly through the tact of the late Sir Henry Cole, the affair was tied over without serious consequences to anyone. Although Mr. Locke had taken an active part in the mutiny, he was recommended by South Kensington for the post of Principal of the Calcutta School of Art, to which he was duly appointed."

১৮৬৪ খৃস্টাব্দের ২৯ জুন মাত্র সাতাশ বছর বয়সে হেনরি লক কলকাতার স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট-এর প্রথম প্রিন্সিপালরূপে কর্মভার গ্রহণ করেন। লকের যোগদানের পর শিক্ষায়তনের নাম হয় গভর্ণমেন্ট স্কুল অব আর্ট। হেনরি লকের পরিচালিত এই চারুকলা বিদ্যালয়ই আজকের 'গভর্ণমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট'। হেনরি লক সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ের সঙ্গে কুড়ি বছর অধ্যক্ষ রূপে জড়িত ছিলেন। উনিশ শতকের বহু কৃতী শিল্পীর অনেকেই ছিলেন তাঁর ছাত্র। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার প্রবর্তন তিনিই করেন। তাঁরই উদ্যোগে একাধিকবার পুনর্গঠিত হয় পাঠ্যসূচী। অন্নদাপ্রসাদ বাগচী, শ্যামাচরণ শ্রীমানী ও আর বি লসন প্রমুখ কৃতী ছাত্রকে তিনিই প্রথম বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে নিয়োগ করেন।

উনিশ শতকের বহু সাড়া জাগানো গ্রন্থে, নানা ঐতিহাসিক গৃহ ও উপাসনা মন্দিরে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের একাধিক গবেষণামূলক কাজে লকের ছাত্রদের শিল্প-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর আজও বর্তমান।

লকের নেতৃত্বে সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্রদের নৈপুণ্য প্রদানের সর্বাধিক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত সেন্ট পিটার্স চার্চের অলংকরণ। ফোর্ট উইলিয়মের মধ্যে অবস্থিত সেন্ট পিটার্স চার্চটির আভ্যন্তরীণ অলংকরণ এবং

ফ্রেস্কো রচনার কাজে লক সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্রদের নিয়োজিত করেন। আর্ট স্কুলের ছাত্রদের নৈপুণ্য প্রদানের উদ্দেশ্যেই তাঁর একাজ গ্রহণ। তাঁর এদেশে আগমনের এক বছরের মধ্যেই ছাত্ররা একাজ সম্পন্ন করেন।

পরবর্তী সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটির জন্যও লকের ছাত্ররা কাজ গ্রহণ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রদর্শশালার জন্য বিভিন্ন জাতির মানুষের আবক্ষ মূর্তি এবং জন্তু-জানোয়ারের দেহের অংশ রচনা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। অধ্যক্ষ লক এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ এবং ছাত্রদের মধ্যে তা সমভাবে বন্টন করেন।

১৮৬৮-৬৯ খৃস্টাব্দে বাংলা সরকারের অনুরোধে পুরাতত্ত্ববিদ ডকটর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ওড়িশার প্রাচীন স্থাপত্য ও শিল্প-কলার এক-সমীক্ষা করেন। ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তিনি মন্দির, স্তূপ, গুহা শিলালেখ প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর সেই সমীক্ষার ফলশ্রুতি 'অ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িশা' নামের দুটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থ দুটি মুদ্রণের জন্য ১৮৭২ খৃস্টাব্দে ভারত সরকার সাড়ে সাত হাজার টাকা বরাদ্দ করেন। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজেন্দ্রলালের এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। অ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িশা-র প্রথম খণ্ডে ৩৬টি লিথোগ্রাফ এবং ৫০টি কাঠ খোদাই চিত্র আছে এবং এ-গ্রন্থের চিত্রগুলির নেপথ্যে রয়েছেন হেনরি লকের একাধিক কৃতী ছাত্র।

ওড়িশা ভ্রমণের আগেই রাজেন্দ্রলাল ঠিক করেছিলেন যে তাঁর এ গ্রন্থ সচিত্র হবে। মন্দির, চৈত্য, গুহা ও স্তূপের সম্ভাব্য সমস্ত নিদর্শন গ্রন্থে সংযোজিত হবে এবং সে চিত্রগুলি অঙ্কনের জন্য শিল্পীর প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, রাজেন্দ্রলালের এই সাড়া জাগানো গ্রন্থ রচনায় হেনরি লকের অবদান অসামান্য। তাঁরই নির্দেশে সরকারী আর্ট স্কুলের কয়েকজন ছাত্র প্রধান শিক্ষক ডি গ্যাবিকের নেতৃত্বে একাধিকবার ওড়িশা ভ্রমণ ও চিত্র অঙ্কন করেন। রাজেন্দ্রলালের এ-গ্রন্থের দুটি খণ্ডেই হেনরি লকের ছাত্র অন্নদাপ্রসাদ বাগচি, গোপালচন্দ্র পাল, কালিদাস পাল, হরিশচন্দ্র খাঁ, উদয়চাঁদ সামন্ত প্রমুখ শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত দেখা যাবে।

রাজেন্দ্রলাল হেনরি লকের এই অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন অ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িশা-র মুখবন্ধে। লকের উদ্দেশ্যে রাজেন্দ্রলাল লিখেছেন :

> "In the course of compiling this work I have derived assistance from several gentlemen, to whom I wish to avail myself of the present opportunity publicly to tender my thanks. H H. Locke, Esq., Principal of the Calcutta School of Art, has helped me most materially in a variety of ways. When I was proceeding of my tour, he placed

> of his best pupils, Annadaprasad Bagchi, who accompanied me to Orissa, and took sketches and plans of a large number of interesting objects."

রাজেন্দ্রলালের 'অ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িশা' রচনার অন্তর্বর্তী সময়ে প্রকাশিত হয় এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 'দি থ্যানাটোফিডিয়া অব ইন্ডিয়া : বিইং এ ডেসক্রিপশান অব দি ভেনোমাস স্নেকস অব দি ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা'। উনিশ শতকের কলকাতার প্রথিতযশা ইউরোপীয় শল্য-চিকিৎসক ডাঃ যোশেফ ফেরার-এর ভারতীয় বিষধর সর্প সম্পর্কিত সচিত্র এই গ্রন্থটি বিগত শতকের মুদ্রণ চাতুর্যের এক অভিনব দৃষ্টান্ত। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি বড়লাট লর্ড মেয়োকে উৎসর্গ করা হয়। বৃহৎ আকারের এ গ্রন্থে সর্পকুলের ২৯টি প্লেটের শিল্পী হেনরি লকের ছাত্রেরা। ডাঃ ফেরার-এর এই অকল্পনীয় গ্রন্থের রূপদানের জন্য তিনি হেনরি লকের স্বারস্থ হয়েছিলেন। ইউরোপীয় শিল্পীদের দ্বারা ভারতীয় সর্পের রূপদান অসম্ভব, একথা মনে রেখেই তিনি হেনরি লকের কাছে গিয়েছিলেন। শল্য-চিকিৎসক ডাঃ ফেরার-এর অনুরোধে তাঁর শিল্পীবাহিনীর শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের নিযুক্ত করেন একাজে। দি থ্যানাটোফিডিয়া অব ইন্ডিয়া গ্রন্থের সমস্ত চিত্রগুলি অঙ্কন ও তার লিথোগ্রাফ করেন অন্নদাপ্রসাদ বাগচী, হরিশচন্দ্র খাঁ নিত্যানন্দ দে ও বিহারীলাল দাস। লকের নির্দেশে সাপুড়েদের কাছ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল নানা বিষধর সাপ এবং জীবন্ত সাপ দেখে আঁকা হয়েছিল এই স্মরণীয় গ্রন্থের অধিকাংশ চিত্র।

লক নিজেও ছিলেন চিত্রশিল্পী। কিন্তু একটি মাত্র কাজ ছাড়া আজ তাঁর চারুকলা চর্চার দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্তের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। লকেরই কয়েকজন ছাত্র বিগত শতকে 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' নামে চারুকলার এক মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম চারুকলার সাময়িক। ১২৯২ বঙ্গাব্দের (১৮৮৫) আষাঢ় মাসে 'শিল্প-পুষ্পাঞ্জলি'র আত্মপ্রকাশ কলকাতায়। অন্নদা-প্রসাদ বাগচী, শরচ্চন্দ্র দেব কালিদাস পাল বিহারীলাল রায় অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পী ও শিক্ষকেরা পত্রিকাটির পরিচালকমন্ডলীর সদস্য ছিলেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'কলিকাতার ইতিহাস' শীর্ষক ধারাবাহিক রচনায় লিখিত আছে যে, গভর্ণমেন্ট হাউস অর্থাৎ বর্তমান রাজভবনের একটি হলঘরের সিলিং-এ যে অলংকরণ আছে তার শিল্পী হেনরি লক।

দীর্ঘদিন পরে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ভারতের প্রাক্তন বড়লাট লর্ড কার্জন রচিত 'ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' (১৯২৫) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি'-র মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

সরকারী আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপালের
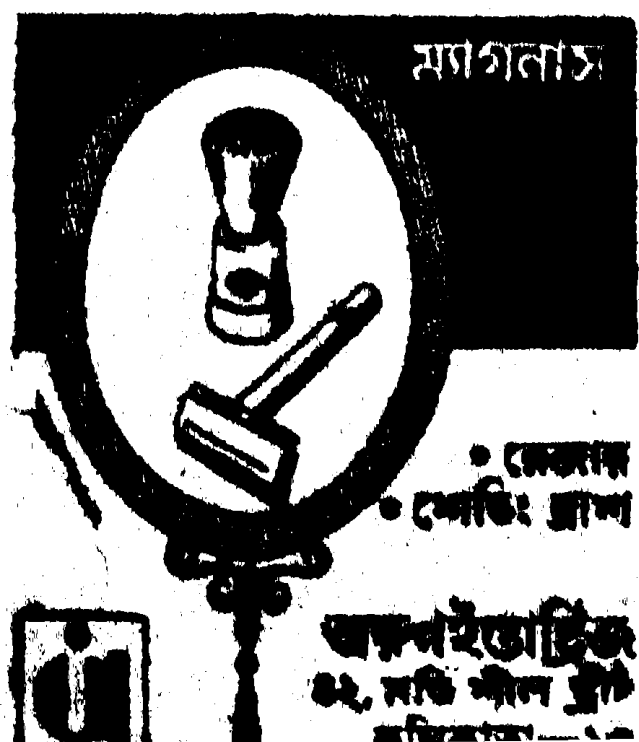
গভর্নমেন্ট হাউসের মার্বেল হল-এর সিলিং অলংকরণের কাজ গ্রহণ করেন। উই পোকার আক্রমণের জন্য সে সময় মার্বেল হলের সিলিং-এর কাঠের অংশগুলি বর্জন করা হয়। নতুন কাঠের সিলিং ব্যবহারের সময় ভাইসরয় স্যার জন লরেন্স লককে অলংকরণের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। পরিণামে লকের একাজ গ্রহণ।

লকের এই একটিমাত্র কাজের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর পরলোকগমনের বহু পরে লর্ড কার্জন তাঁর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া গ্রন্থে লিখেছেন :

> "It was not till Sir John Lawrence came in 1865 that the present coffe ied wooden ceiling was substituted for it. I believe that the present designs in white and gold were the work of Mr. H. H. Locke, formerly Principal of the Calcutta School of Art."

শিক্ষকতা ছাড়াও চারুকলা সম্পর্কিত নানা স্মরণীয় অনুষ্ঠানের সংগেও তিনি জড়িত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানগুলির পর্যালোচনায় লকের সংগঠন শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় প্রথম সর্বভারতীয় চারুকলা প্রদর্শনীর আয়োজন ১৮৭১ খৃস্টাব্দে। এ চিত্র প্রদর্শনীর নাম ছিল 'ক্যালকাটা ফাইন আর্ট এক্জিবিশান'। ভাইসরয় লর্ড মেয়োর পৃষ্ঠপোষকতায় ড্যালহৌসি ইনস্টিটিউটে (অধুনা বিলুপ্ত) অনুষ্ঠিত সে প্রদর্শনীর সঙ্গে হেনরি লকের কোন সম্পর্ক ছিল কি না তা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। যদিও লক সে সময়ে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন, তবুও এই প্রদর্শনীর সংগে সম্পৃক্ত কোন সংবাদেই তাঁর নামোল্লেখ নেই। তবে আর্ট স্কুলের ছাত্ররা যে এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। লকেরই ছাত্র দেবেন্দ্র মল্লিকের তৈলচিত্র 'স্পিরিটেড গ্রুপ অব হর্সেস' এই প্রথম প্রদর্শনীতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা উল্লেখযোগ্য।

ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয় শিল্পীরাই ছিলেন এই প্রদর্শনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিযোগী। প্রদর্শনীর সব পুরস্কারের প্রাপকও ছিলেন তাঁরা। ইউরোপীয় শিল্পীদের প্রাধান্য-প্রভাবিত সেই প্রদর্শনীতে সৌখীন শিল্পী দেবেন্দ্র মল্লিকের চিত্র ভাইসরয় এবং প্রদর্শনী সমিতির সভাপতি হিউ স্যানডেম্যানের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্র মল্লিকের এই স্মরণীয় চিত্রটি মার্বেল প্যালেসে রক্ষিত আছে।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয় 'ক্যালকাটা ফাইন আর্ট এক্জিবিশান' অনুষ্ঠিত হয় তিন বছর পর ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে। বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের লাল বাড়িতে দ্বিতীয় প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। এ প্রদর্শনীর সংগঠনের মূলে ছিলেন হেনরি লক। দ্বিতীয় প্রদর্শনীর তিনি অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং তাঁরই উদ্যোগে কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং জয়পুরের আর্ট স্কুলের ছাত্রদের শিল্পকর্ম ইউরোপীয় শিল্পীদের শিল্পকলার সংগে প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হয়।

দ্বিতীয় প্রদর্শনীতেই আর্টস্কুলের ছাত্রদের অগ্রগতি এবং কৃতিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে সবার কাছে। জল ও তেলরঙে আঁকা ছাত্রদের নানা চিত্রের শিল্পনৈপুণ্য স্বীকৃত হয় ছোটলাট রিচার্ড টেম্পলের ভাষণে। এই প্রদর্শনীতে যে সয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্ররা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র দাঁ এবং অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর নাম উল্লেখ করে রিচার্ড টেম্পল প্রিন্সিপাল লককে অভিনন্দন জানান। কৃষ্ণনগরের স্বনামধন্য মৃৎশিল্পী যদুনাথ পাল এই দ্বিতীয় প্রদর্শনীতেই মৃন্ময়মূর্তি রচনার জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

কলকাতার এই দ্বিতীয় সরকারী প্রদর্শনী অপর একদিক থেকে ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। কারণ, এই প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটনের সময় বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক কলকাতায় স্থায়ী একটি আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠার কথা প্রথম ঘোষণা করেন।

১৮৭৬ খৃস্টাব্দের ৬ এপ্রিল বৈঠকখানা-বউবাজারে নতুন আর্টস্কুলের নতুন বাড়িতে বড়লাট নর্থব্রুক কলকাতা তথা ভারতের প্রথম পাবলিক গ্যালারি অব আর্ট-এর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। গ্যালারির প্রথম তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ কীপার নিযুক্ত হন হেনরি লক। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কয়েক দিন আগে পটলডাঙ্গা অর্থাৎ মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু চিকিৎসা বিভাগের কাছে অবস্থিত বাড়ি থেকে বউবাজারের নতুন বাড়িতে উঠে আসে আর্ট স্কুল। আর্ট গ্যালারির উদ্বোধনের সংগে নতুন বাড়িতে আর্ট স্কুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও করেন বড়লাট নর্থব্রুক।

হেনরি লকের সাংগঠনিক উদ্যোগের অন্যতম দৃষ্টান্ত কলকাতার তৃতীয় সরকারী প্রদর্শনী। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে আর্ট স্কুলের বউবাজারের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এই চিত্র প্রদর্শনীর দুজন অবৈতনিক সম্পাদকের অন্যতম ছিলেন হেনরি লক। অপরজন হার্বার্ট হোপ রিজলি। বড়লাট লর্ড লিটন তৃতীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

তৃতীয় প্রদর্শনীর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই প্রদর্শনীতে প্রথম একজন ভারতীয় শিল্পী সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ভাইসরয়স প্রাইজ-এ সম্মানিত হন। বোম্বাইয়ের পার্শি শিল্পী পেস্টনজি বোমানজি তাঁর 'হেড অব এ গোঁসাই' প্রতিকৃতি চিত্রটির জন্য বড়লাট প্রদত্ত পুরস্কারে সম্মানিত হন। ইউরোপীয় শিল্পীদের গতানুগতিকভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্তির অবসান এই তৃতীয় প্রদর্শনীতে।

হেনরি লকের ছাত্রদের এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ প্রসংগে সে যুগের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ (৭ জানুয়ারি ১৮৭৯) লেখা হয় :

গভর্ণমেন্টের শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ৩০খানি চিত্র অংকিত করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। প্রদর্শিত চিত্রগুলির মধ্যে ১৬ খানি দেশীয় কর্তৃক অংকিত চিত্র আছে। তম্মধ্যে মান্দ্রাজ হইতে ২, বোম্বাই হইতে ১ এবং বাকি বাংলা হইতে প্রদত্ত।

সরকারী আর্ট স্কুলের একাধিক ছাত্রও এই প্রদর্শনীতে নানা পুরস্কারে সম্মানিত হন। পরবর্তী যুগের যশস্বী প্রতিকৃতি শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই তৃতীয় প্রদর্শনীতেই আত্মপ্রকাশ। হেনরি লকের কৃতী ছাত্র বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর তৈলাংকিত 'জাগলার অ্যান্ড মংকি' চিত্রটির জন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন। মতিলাল পাল নন্দকুমার বিশ্বাস এবং অন্নদাপ্রসাদ বাগচী প্রমুখ ছাত্র এই প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হন।

বিবিধ স্মরণীয় প্রদর্শনী বহু সংস্থা ও চিত্রকলা আন্দোলনের অগ্রদূত হেনরি লক সে যুগে মহাত্মা রূপে পরিচিত ছিলেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথও তাঁকে ঐ সম্মানে অভিহিত করেছেন বহুবার।

নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলা আন্দোলনের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা প্রসংগে দেখা যায় এই আন্দোলনের প্রথম যুগে ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথও হেনরি লকের দৃষ্টান্ত ছাত্রদের সামনে উত্থাপন করেছিলেন।

হ্যাভেলের ভারতে আসার বহু আগে হেনরি লকই প্রাচীন ভারতের শিল্প ঐতিহ্য

সম্পর্কে ছাত্র ও শিক্ষক সমাজকে সচেতন করেন। লকের পরলোকগমনের বহু পরে অবনীন্দ্রনাথ হেনরি লকের ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্য প্রীতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন :

'কিন্তু হায় তাঁহার আশা কতদূর সফল হইল। সেই সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে আসিয়া যে মহাত্মা আমাদের শিল্প-শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন তাঁহার সেই মহৎ আশা আমরা কতদূরে পূর্ণ করিলাম।'

সরকারী আর্ট স্কুলের জিওমেট্রিক্যাল ড্রইং শিক্ষক শ্যামাচরণ শ্রীমানী রচিত 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্প-চাতুরী' গ্রন্থকে উপলক্ষ করে অবনীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য। নাট্যকার ও কবি শ্যামাচরণ শ্রীমানীর এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষার প্রথম শিল্প ও চারুকলা সম্পর্কিত গ্রন্থ। ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। শ্যামাচরণ তাঁর এই গ্রন্থে ভারতের দেব-দেউল গুহা, স্তূপ প্রভৃতির নির্মাণ রীতি অর্থাৎ স্থাপত্যবিদ্যা এবং ভাস্কর্য গৃহচিত্র ও চিত্রবিদ্যার প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। লকের অধীনে সরকারী আর্ট স্কুলেই শ্যামাচরণের চিত্রবিদ্যা অনুশীলন। সেহেতু তিনি আর্য জাতির শিল্প-চাতুরী গ্রন্থটি হেনরি লককেই উৎসর্গ করেন।

গ্রন্থ প্রাপ্তির পর শ্যামাচরণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন প্রসঙ্গে হেনরি লক যে চিঠিটি লিখেছিলেন তা শ্যামাচরণের গ্রন্থে সংযোজিত হয়। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে সরকারী আর্ট স্কুলের গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে আয়োজিত এক ছাত্র সমাবেশে ভাষণদানকালে অবনীন্দ্রনাথ শ্যামাচরণের গ্রন্থে যুক্ত মহাত্মা হেনরি লকের অভিনন্দনবার্তার আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্য প্রীতির উল্লেখ করেন।

শ্যামাচরণকে লিখিত হেনরি লকের অভিনন্দনবার্তার এক অনুবাদও করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের এই অনুবাদ হেনরি লকের ভারতীয় শিল্প-প্রীতির এক স্মরণীয় দলিল। অতএব অবনীন্দ্রনাথের অনুবাদের অংশবিশেষ উদ্ধার করা হলো :

'প্রিয় শ্যামাবাবু...তোমার উপহৃত পুস্তক সাদরে গ্রহণ করিলাম। আর্যজাতির শিল্প-চাতুরী সম্যকভাবে আলোচনা করিতে হইলে যে সুযোগ তত্ত্বানুসন্ধান এবং শিক্ষার প্রয়োজন তাহা এ পর্যন্ত তোমার স্বদেশীয়গণের নিকট সুপ্রাপ্য ছিল না এবং সেই কারণেই বঙ্গবাসীগণ একদিকে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পথে যেমন অধ্যবসায় এবং প্রশংসার সহিত অগ্রসর হইতেছেন অন্যদিকে তেমনি শিল্পচর্চা সম্বন্ধে একেবারে মনোযোগ দিতেছেন না। ভারতের পুরাতন শিল্পকলার সম্যক চর্চা করিতে হইলে যে অবকাশ এবং সুযোগ ও শিক্ষার প্রয়োজন, আমি জানি তাহা তোমার নাই; তথাপি তুমি তোমার স্বদেশবাসীদিগকে তাঁহাদের মাতৃভাষায় তোমাদের পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব শিল্পকলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান দিবার জন্য এই যে পুস্তক রচনা করিয়াছ ইহার জন্য ভারতীয় শিল্পের বহুল প্রচারেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট তোমার এই স্বল্প চেষ্টাও বিশেষ প্রশংসার্হ।'

হেনরি লকের শেষ জীবন বেদনাদায়ক। সরকারী প্রশাসনের হৃদয়হীন আচরণ তাঁর শিক্ষাব্রতী জীবনের কোন মূল্যায়ন সেদিন করেনি। তাঁর দুই দশকের কর্মজীবনের সমাপ্তির কারণ যেমন অজ্ঞাত তেমনি অদ্ভুত। অবসর গ্রহণের আগেই সরকারী নির্দেশে তিনি বাধ্যতামূলক ছুটি নিয়েছিলেন; প্রকৃতপক্ষে এই বাধ্যতামূলক ছুটির মাধ্যমেই তিনি অপসারিত হন এবং তাঁর অপসারণের মূলে তাঁরই পরিচালিত অপর এক প্রতিষ্ঠান—ইকনমিক মিউজিয়াম।

লেফট্যানেন্ট গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের উদ্যোগে ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে হেস্টিংস স্ট্রীটে ইকনমিক মিউজিয়াম নামে ভূমিজাত দ্রব্যের শিল্প এবং চারু ও চারুকলা বিষয়ক এক সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সময়ে স্যার জর্জ ক্যাম্বেল হেনরি লককে এই সংগ্রহশালার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষতার সঙ্গে তিনি এই মিউজিয়ামের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার হেনরি টবি প্রিন্সেপ ইকনমিক মিউজিয়ামের পরিচালন সমিতির সভাপতি ছিলেন।

১৮৮৩-৮৪ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ ইকনমিক মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার প্রায় দশ বছর পর নিউ সাউথ ওয়েলস নিবাসী জনৈক জুলে জোবার্টের পরিকল্পনায় ভারত সরকারের উদ্যোগে কলকাতায় প্রথম এক ইন্টারন্যাশনাল বা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বড়লাট লর্ড রিপন মিউজিয়ামের সামনে ময়দানে এই বৃহৎ প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর প্রস্তুতি-পর্বে ইকনমিক মিউজিয়ামের সভাপতি স্যার হেনরি টবি প্রিন্সেপ এবং সম্পাদক হেনরি লকের মধ্যে অজ্ঞাত এক বিষয়ে মতানৈক্য হয়। তাঁদের মতভেদ তীব্র আকার ধারণ করায় তৎকালীন ছোটলাট স্যার অ্যাশলি ইডেন হেনরি লককে বিচারপতি প্রিন্সেপের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেন। কিন্তু লক ছোটলাটের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এই কারণে তিনি ছোটলাট অ্যাশলির বিরাগভাজন হন এবং সরকারী নির্দেশে অসুস্থতা হেতু তাঁর দীর্ঘ ছুটি গ্রহণ এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

প্রায় দু বছর তিন মাস পর ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে অসুস্থ অবস্থায় লকের কলকাতা প্রত্যাবর্তন। প্রত্যাবর্তনের পর তাঁকে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের পদে যোগ দিতে দেওয়া হলেও ইকনমিক মিউজিয়ামের সম্পাদকের পদ তিনি ফিরে পান নি। অসুস্থ শরীর নিয়ে প্রায় এক বছর পাঁচ মাস অধ্যক্ষতার পর কলকাতাতেই তাঁর পরলোকগমন।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দের বড়দিনের আগের দিন চৌরঙ্গী এলাকায় ওয়াটারলু হোটেলে এক যন্ত্রসঙ্গীতের ঐকতান সভায় তিনি যোগ দেন এবং ঐ হোটেলেই মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে হৃদরোগে ২৪ ডিসেম্বর তাঁর পরলোকগমন। পরের দিন অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর তাঁর মরদেহ লোয়ার সার্কুলার রোড সেমিট্রিতে সমাহিত করা হয়।

হেনরি লকের আকস্মিক পরলোকগমনের সংবাদে চারুকলা অনুরাগী প্রতিটি মানুষই সেদিন মর্মাহত হয়েছিলেন। নানা সংবাদপত্রে সেদিন প্রতিধ্বনিত হয় শোকাভিভূত চারুকলা অনুরাগীদের মর্মবেদনা।

১২৯২ বঙ্গাব্দের ১৯ পৌষ 'সঞ্জীবনী' সংবাদপত্রে লকের পরলোকগমনের যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা তাঁর কর্মজীবনের এক সমীক্ষারূপে পরিগণিত হতে পারে। লক্ষণীয় লকের জীবন পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ত্রুটি বিচ্যুতিরও সমালোচনা করে সঞ্জীবনী এবং ঐ সমালোচনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে হেনরি লকের মহত্ত্ব ও অবদান। সেহেতু সঞ্জীবনী-র সে রচনা উদ্ধার করা হলো :

'...মিঃ লক লাহোর শিল্প বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মিঃ কিপলিং ও বোম্বাই শিল্প বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ গ্রিফিথসের সহিত বিলাতের কেনসিংটন কলেজে একত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং উক্ত কলেজের কর্তৃপক্ষদিগের বিশেষ অনুরোধেই তিনি প্রায় ২২ বৎসর পূর্বে কলিকাতা শিল্প বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল পদে অভিষিক্ত হন।

কিন্তু লকের মেজাজ বড় ভাল ছিল না। বিচক্ষণ কার্যপটু ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক হইয়াও সামান্য ত্রুটিতে তাঁহার অন্তরে ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিত সেই জন্য তাঁহার নামে একটু কলঙ্ক পড়িয়াছে। এই অপরিহার্য ক্রোধের হাত এড়াইতে না পারিয়াই...সভাপতি জাস্টিস প্রিন্সেপ সাহেবের সহিত সাধারণের অজানিত কোন এক বিষয় লইয়া লকের বিবাদ হয় এবং সেই বিবাদ ঘনীভূত হইয়া মেলার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্যুত হয়। বিবাদের সময় লক অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন—পীড়িতাবস্থায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়াতে তিনি সভাপতির নিকট অবনত হইতে পারিলেন না। ...এই সময়ে ইডেন সাহেব বঙ্গের ছোটলাট ছিলেন। তিনি নিজে প্রদর্শনী সম্বন্ধে লকের ন্যায় একজন সুদক্ষ ব্যক্তি মেলার জন্য যেমন সকল উচ্চ দরের কথা লিখিয়া লক

সাহেবকে বিবাদ মিটাইবার জন্য গোপনে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহার অটল প্রতিজ্ঞার ব্যত্যয় হইল না। তিনি রাজপুরুষদিগের ক্রোধে পড়িয়া মিউজিয়ামের কর্ম হইতে কলে-কৌশলে অপসৃত হইবার জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের বিশেষ পীড়াপীড়িতে আড়াই বৎসর ফার্লো লইয়া বিলাত গমন করিতে বাধ্য হইলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর মিউজিয়ামের কর্ম পাইলেন না।...

অনেকেই তাঁহার ঔদ্ধত্য ও খিটখিটে মেজাজের পরিচয় দিয়া যথেষ্ট নিন্দা করিয়া থাকেন কিন্তু আমরা শুধু নিন্দায় কর্ণপাত করি না। আমরা বেশ জানি তিনি গুণীর গুণগ্রাহী ছিলেন কেবল অকর্মণ্যের পক্ষে ত্রাসস্বরূপ ছিলেন। কোন ভাল ছাত্র বা তাঁহার অধীনস্থ সুদক্ষ কর্মচারীগণ কখনও তাঁহার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হন নাই।'

বাংলা পত্র-পত্রিকার মত সে যুগের প্রায় সব ইংরেজি সংবাদপত্রেই লকের পরলোকগমনে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং এ শোকসংবাদগুলির মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাঁর অবদান। বিগত যুগের ইংলিসম্যান থেকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি শ্রদ্ধার্ঘ উদ্ধৃত করা হলো :

"The sudden death of Mr. H. H. Locke, Principal of the School of Art, Calcutta, will be a painful shock to his many friends. Mr. Locke had been in different health for some time past, but he had not been complaining recently of

any accession of suffering, and his death occurred on Christmas eve with startling suddenness... On the establishment of the Bengal Economic Museum, he was appointed Secretary by Sir George Campbell Mr. Locke was an artist of great ability and refinement, and it would be difficult to estimate the services which he rendered to art in India during his twenty years of office. He might have done more in the way of original work had his health been better and his judgement less exacting, but whatever he set his hand to bore the evidence of artistic skill and sound training."

আটচল্লিশ বছর বয়সে লকের পরলোকগমন নিঃসন্দেহে এক অপূরণীয় ক্ষতি। সরকারী আর্ট স্কুলের কর্ণধাররূপে মৃত্যুর দুই দশক আগে যখন তাঁর কর্মভার গ্রহণ তখন এদেশে চারুকলা চর্চা অসার্থক এবং অপদার্থ মানুষের জীবিকা রূপেই পরিগণিত হত। স্বভাবতই চারুকলার প্রতি সেযুগের শিক্ষিত মানুষের ছিল গভীর অনীহা। দুই দশকের অক্লান্ত পরিশ্রমে ললিতকলার প্রতি বাঙ্গালী সমাজের অনাসক্ত মনোভাবের পরিবর্তন সাধনে সফল হয়েছিলেন তিনি, তাঁর এ সাফল্যের স্বাক্ষর নিহিত রয়েছে সরকারী আর্ট স্কুলের প্রতিটি বাৎসরিক প্রতিবেদনে। সে প্রতিবেদন থেকেই জানা যায় যে ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে হেনরি লকের যখন এই শিক্ষায়তনে যোগদান তখন সেখানে ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩। কিঞ্চিদধিক কুড়ি বছর পর যেদিন তাঁর পরলোকগমন সেদিন সরকারী আর্ট-স্কুলে ১৩৯ জন শিক্ষার্থীর কল-কোলাহল।

উনিশ শতকে এদেশে চারুকলা আন্দোলনের যে ক্রমপ্রসার তা হেনরি লকের শিক্ষা ও পরিচালনারই ফলশ্রুতি। এ ফলশ্রুতির সীমা শিক্ষায়তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পাঠ্যসূচী বহির্ভূত বিষয়ে প্রতি দৃষ্টিপাত এবং প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসন্ধানের কাজে ব্রতী হওয়ার যে দৃষ্টান্ত তারও সূচনা লকের শিক্ষকতাকালেই সম্ভব হয়।

লকের ছাত্র ও সহযোগী শিক্ষক শ্যামাচরণ শ্রীমানীর নাম এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

ডকটর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম মনে রেখেও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে শ্যামাচরণ শ্রীমানীই বাংলা ভাষায় প্রথম প্রাচীন ভারতের ললিতকলা সম্পর্কিত গ্রন্থটি রচনা করেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্রের সমসাময়িক নাট্যকার রূপে পরিচিত শ্যামাচরণ শ্রীমানীর ললিতকলা সম্পর্কিত আর্যজাতির শিল্পচাতুরী বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ। লকের শুভেচ্ছা নিয়েই এ গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ।

পরবর্তীকালে বঙ্গসমাজে ললিতকলা চর্চার প্রসারে শিল্পপুষ্পাঞ্জলি নামে যে সাময়িকপত্রটি গভীর অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে তা হেনরি লকেরই একাধিক ছাত্রের যৌথ প্রচেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। তদানীন্তন শিল্পীদের চারুকলা অনুশীলনের নিদর্শন বঙ্গসমাজে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল এই মাসিক।

এই সাময়িকপত্রটির আত্মপ্রকাশের কয়েক বছর আগে ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে এদেশের শিল্পীদের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি আর্ট স্টুডিও। শিল্প রচনার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ যে সত্যিই সম্ভব তা সর্বপ্রথম লকের ছাত্ররাই প্রমাণ করেন ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও নামে এক চিত্রশালা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৮৫ বউবাজার স্ট্রীটে অবস্থিত এই চিত্রশালার প্রধান পরিচালক ছিলেন লকের যশস্বী ছাত্র অন্নদাপ্রসাদ বাগচী। ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রকাশিত দেব-দেবী ও পৌরাণিক ঘটনার রঙ্গীন লিথোগ্রাফ সে যুগে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে যখন প্রচারিত হয় তখন রাজা রবি বর্মার 'ওলিওগ্রাফ' সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে অপেক্ষমান এবং অবিশ্বাস্য পরিকল্পনা। নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিশুদের অক্ষর পরিচয় সম্পন্নের জন্যও সচেষ্ট হয় এই ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও। এঁদের প্রকাশিত ক্রমোলিথোগ্রাফিক আলফাবেট বোর্ড সেযুগে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

হেনরি লকের নিষ্ঠার সৃষ্টি যে শিল্পীবৃন্দ তাঁরা আজ বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত। চারুকলা আন্দোলনের ক্রমবিবর্তন এবং পালা বদলের ইতিহাসে তাঁরা আজ গবেষণার বিষয়। তবুও তাঁদের মধ্যে যাঁরা আজও স্মরণীয় তাঁদের অগ্রদূত অন্নদাপ্রসাদ বাগচী। অন্নদাপ্রসাদের সঙ্গে গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মতিলাল পাল কালীধন চন্দ্র নবকুমার বিশ্বাস বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছাত্র চারুকলার নানা শাখায় কৃতিত্বের জন্য প্রসিদ্ধ হন।

চারুকলা চর্চার অগ্রগতির সঙ্গে অতঃপর দেখা দিল শিল্পীদের সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন। সে প্রয়োজনীয়তার নেপথ্যে ছিল আরও এক উদ্দেশ্য—তা হলো আপামর মানুষের মধ্যে সুকুমারকলার প্রচার। তাই বিংশ শতকেই জন্ম নিল বাঙালীর নিজের চারুকলা সংস্থা 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দি প্রোমোশান অব ফাইন আর্টস অ্যান্ড ন্যাশনাল গ্যালারি'। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ চারুকলা সংস্থার নেপথ্যে গণ্যমান্য যে অন্নদাপ্রসাদ বাগচী প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় মন্মথনাথ চক্রবর্তী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কার্তিকচন্দ্র নাগ প্রমুখ যে শিল্পী-ভাস্করেরা ছিলেন তাঁদের সকলেরই আদর্শ ছিলেন হেনরি লক।

পরবর্তীকালে লকের পরিচালিত এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাধারায় শিক্ষিত হয়ে রোহিণীকান্ত নাগ শশিকুমার হেশ হরিনারায়ণ বসু রণদাপ্রসাদ গুপ্ত পরেশনাথ সেন যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ফণীন্দ্রনাথ বসু হিরন্ময় রায়চৌধুরী ললিতকলার জগতে যে স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে গৌরবের যোগ্য। পরবর্তী যুগে এ উত্তরাধিকারের গৌরবে যে ছাত্রেরা গৌরবান্বিত তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ দাস প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার সতীশ সিংহ যামিনী রায় ও অতুল বসুর নাম স্মরণীয়।

অপরদিকে এ শতাব্দীর সূচনায় ১৯০৫ খৃস্টাব্দে জন্ম নিল বাঙালীর দ্বিতীয় চারুকলা সংস্থা 'বঙ্গীয় কলা সংসদ'। রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মন্মথনাথ চক্রবর্তী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় রণদাপ্রসাদ গুপ্ত ননীগোপাল গোস্বামী অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের আহবানে এগিয়ে এলেন বহু কৃতী শিল্পী। জোড়াসাঁকোর গগনেন্দ্রনাথের বাড়িতে স্থাপিত হয়েছিল বঙ্গীয় কলা সংসদের কার্যালয়।

বঙ্গীয় কলা সংসদ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে সরকারী আর্ট স্কুলে হ্যাভেলের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নন্দলাল বসু সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অসিতকুমার হালদার হাকিম মহম্মদ খান দুর্গেশচন্দ্র সিংহ ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রমুখ ছাত্র-শিষ্যদের নিয়ে চারুকলা অনুশীলনের যে নবযুগের সূচনা সেখানেও দেখি পরলোকগত হেনরি লকের প্রবল প্রভাব। নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলা আন্দোলনের সূচনায় হেনরি লকের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে যখন অবনীন্দ্রনাথকে উদ্যত দেখি তখনই মনে হয় হেনরি হোভার লকের আদর্শ ও ভাবধারা এদেশের ললিতকলা অনুশীলনের পালাবদলের ইতিহাসেও অক্ষুণ্ণ ছিল। হেনরি লকের সার্থকতা সেখানেই সুপ্রমাণিত।

গোয়েন্দা ধাঁধা

গোয়েন্দা কবি পরাশর বর্মা ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

হ্যাঁ, এ সেই পরাশর বর্মা যার নাম শুনলে কান খাড়া হয়ে ওঠে না এমন ছেলে-মেয়ে জোয়ান-বুড়ো কোথাও আজ আছে কিনা সন্দেহ।

সেই পরাশর বর্মার সঙ্গে কৃত্তিবাস ওঝার প্রথম পরিচয় হয় একটা পত্রিকার অফিসে। নাতিপ্রসিদ্ধ এই পত্রিকাটির সম্পাদনা করতেন কৃত্তিবাস ওঝা।

একদিন বিকেলে অত্যন্ত সাদাসিধে পোশাকের এক ভদ্রলোক উপস্থিত হলেন সেই অফিসে। মাসের শেষ—কাগজ বার করবার তাড়ায় কৃত্তিবাস ওঝা তখন চোখে সর্ষেফুল দেখছেন। তাই ভদ্রলোকের দিকে দৃষ্টি দেবার ফুরসৎ পাননি।

সকালবেলায় ছাপা কাগজের একটা ফর্মা দেখে তখন সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে গেছে কৃত্তিবাস ওঝার। সে ফর্মায় এমন একটা লেখা ছাপা হয়ে গেছে যা বেরুলে কাগজের কলঙ্কের আর সীমা থাকবে না। এমন কি মানহানির দায়ে পর্যন্ত পড়া অসম্ভব নয়। বাংলাদেশের কোন এক অপরাজেয় লেখকের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যক্তিগত আক্রমণ ছাড়া সে লেখা আর কিছুই নয়; যাকে বলে কাঁচা খেউড় তাই দিয়ে কে একজন ছদ্মনামের লেখক তাঁর ওপর গায়ের ঝাল মিটিয়েছে। কে এই কপি ছাপতে দিয়েছে কে দিয়েছে 'প্রিন্ট অর্ডার' সেই কথাই রেগে আগুন হয়ে প্রিন্টার মনোমোহনকে জিজ্ঞাসা করছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা।

মনোমোহন কিন্তু একেবারে ভেজা তুলসীপাতাটি। বললে—'আজ্ঞে আমি আর লেখার ঝালটক কি বুঝি বলুন; যা দেন তাই ছেপে দিই!'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন কৃত্তিবাস ওঝা—'যা দিই তাই ছেপে দাও! এ-লেখার প্রিন্ট-অর্ডার আমি দিয়েছি বলতে চাও?'

'আজ্ঞে আপনি না দিলে আর কে দেবে?'

'কই নিয়ে এস দেখি আমার প্রিন্ট-অর্ডার!'

'আজ্ঞে সঙ্গে করেই এনেছি।' বলে মনোমোহন সইকরা কাগজের তাড়াটা ফেলে দিল টেবিলের ওপর।

তুলে নিয়ে কৃত্তিবাস ওঝা একেবারে থ'। নাত্যি সত্যি তাঁরই সই আর তারিখ। কাজের ভিড়ে কখন তাড়াতাড়িতে সই করে দিয়েছেন খেয়ালই নেই। ভাগ্যে সময় থাকতে লেখাটা চোখে পড়েছিল নইলে কাগজের সঙ্গে বাজারে বেরিয়ে গেলে আর কোনো উপায়ই থাকত না। এখন শুধু দুবার ছাপাবার মজুরিটুকু লোকসান দিয়েই কোনরকমে মান বাঁচানো যাবে।

বাজারে মান বাঁচলেও মনোমোহনের কাছে বেশ একটু অপ্রস্তুত বোধ করছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা। তার দিকে না চেয়েই বললেন—'আচ্ছা এখন যাও, এ ফর্মা আবার নতুন করে ছাপতে হবে। আমি কপি এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বেশ একটু জয়ের হাসি হেসেই বেরিয়ে যাচ্ছে মনোমোহন, এমন সময়ে পেছন থেকে ডাকলেন সেই ভদ্রলোক—'ওহে একটু শোন তো!'

ভদ্রলোকের কথা একেবারে ভুলেই গেছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা। হঠাৎ মাতব্বরী দেখে একটু বিস্মিত ও বিরক্তই হলেন। প্রিন্টারকে হুকুম করবার তিনি কে? বিরক্তি গোপন না করেই বললেন—'কেন বলুন তো? ওকে ডাকছেন কেন?'

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন—'আপনার প্রিন্ট-অর্ডারের সইটা একটু দেখব।'

'আপনি সই দেখবেন! তার আগে আপনার পরিচয়টা জানতে পারি? আপনি সিগ্নেচার একসপার্ট নিশ্চয় নন!'

আর কেউ হলে কৃত্তিবাস ওঝার গলার স্বরেই নিজের জায়গা যে কোথায় বুঝে নিয়ে অনধিকার চর্চায় আর মাথা গলাত না। কিন্তু ভদ্রলোকের গায়ের চামড়া বেশ পুরু, মনে হল। গলার ঝাঁঝ বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে নির্বিকারভাবে বললেন—'একসপার্ট না হলেও আপনাকে এ বিষয়ে কিছু সাহায্য বোধহয় করতে পারি।'

মনোমোহন তখন দরজার কাছে ফিরে দাঁড়িয়েছিল। ভদ্রলোকের দৌড় কতখানি দেখবার জন্যে বিদ্রূপের স্বরে বললেন কৃত্তিবাস ওঝা—'নিয়ে এস মনোমোহন তোমার কাগজটা। দেখি শার্লক হোমস কি বার করেন ও থেকে!'

মনোমোহন অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে কাগজটা টেবিলে এনে রাখবার পর ভদ্রলোক সেটা তুলে নিয়ে সইয়ের ওপর চোখ বুলিয়েই মৃদু হেসে শুধু বললেন—'হুঁ'।

তিক্ত বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন কৃত্তিবাস ওঝা—'দেখা আপনার হয়ে গেল এরই মধ্যে?'

ভদ্রলোক তেমনি ঈষৎ হেসে বললেন—'হ্যাঁ। দেখবার তো বেশী কিছু নেই আমি শুধু কালিটা দেখতে চেয়েছিলাম।'

'ও, শুধু কালিটা দেখতে চেয়েছিলেন! তাহলে হাতের লেখা নয়—আপনি কালি সম্বন্ধে একসপার্ট! তা কালি দেখে কি বুঝলেন জানতে পারি কি?'

'আপনি সত্যি তা শুনতে চান?'

ভদ্রলোকের মুখের সেই হাসি দেখে গা আরো জ্বলে গেল কৃত্তিবাস ওঝার।

বললেন—'আপনার কেরামতিটা একটু দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে বই কি!'

ভদ্রলোক আবার একটু হাসলেন। বললেন—'তাহলে শুনুন ও সই আপনার নয়!'

'আমার নয়!' জোরে হেসে উঠলেন কৃত্তিবাস ওঝা। 'আমার চেয়ে আপনি আমার সই বেশী চেনেন দেখছি। শুধু কালি দেখেই এতবড় একটা আবিষ্কার করে ফেললেন বোধহয়!'

ভদ্রলোক আবার তেমনি গা-জ্বালানো হাসি হেসে বললেন—'হ্যাঁ কালিটাও একটা প্রমাণ বই কি!'

'কিন্তু আপনার তাহলে জানা দরকার যে আমি সবুজ কালি ছাড়া ফাউন্টেন পেনে কিছু ব্যবহার করি না।'

'তা জানি। এবং সেই জন্যেই বলছি যে ও সই আপনি করেন নি।'

এবার বেশ একটু রেগেই গেলেন কৃত্তিবাস ওঝা—'দেখুন প্রলাপ শোনবার সময় ও ধৈর্য আমার নেই। সইটা স্পষ্ট দেখছেন সবুজ কালিতে করা, আমি আপনাকে বলছি যে সবুজ কালি ছাড়া আমি কিছু ব্যবহার করি না তবু আপনি বলছেন সবুজ কালিতে হলেই ও সই আমার নয়। হেঁয়ালিটা হয় পরিষ্কার করে বলুন নয় অনুগ্রহ করে কাজের সময় বিরক্ত করবেন না।'

ভদ্রলোক কৃত্তিবাস ওঝার রাগটা যেন উপভোগ করেই বললেন—'না আপনাকে বিরক্ত করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। তবে হেঁয়ালি যাকে মনে করছেন সেটা নেহাৎ সহজ সরল ব্যাপার। কাল আপনি ফাউন্টেন পেনটা অফিসে আনেননি মনে আছে!'

'ফাউন্টেন পেন আনি নি?' সত্যিই প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলেন কৃত্তিবাস ওঝা। তারপর কথাটা মনে পড়ায় অবাক হয়ে বললেন—'আপনি কি করে জানলেন?'

'যেমন করে জানলাম আপনি সবুজ কালি ব্যবহার করেন যেমন করে জানলাম কাল ও কাগজে সই আপনি করেন নি।'

'কি থেকে জানলেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'আপনি অত্যন্ত অগোছালো ঢিলে স্বভাবের বলে।'

নিজের অফিসঘরের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ভদ্রলোকের কথাটার আর প্রতিবাদ করতে পারলেন না কৃত্তিবাস ওঝা। ভদ্রলোক বলতে লাগলেন—'কাগজের অফিস হয়তো এইরকমই হয়। তবু আপনার অফিসে পরিচ্ছন্নতার কোনো বালাই নেই একথা আপনি বোধহয় অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনার ব্লটিং প্যাডটাই দেখুন না। সাতদিন অন্ততঃ এটা বদলান নি—'

ব্লটিং প্যাডটা এবার তুলে নিয়ে তিনি বললেন—'আপনি যে সবুজ কালি ছাড়া কিছু ব্যবহার করেন না এই ব্লটিং প্যাডটা দেখালেই তা বুঝতে দেরী হয় না। আগাগোড়াই এটার গায়ে সবুজ ছাপ। শুধু কয়েকটা জায়গায় কালো কালির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ব্লটিংয়ের ছাপে কিন্তু আপনারই লেখার ছাপ। এ ঘরে আপনি ছাড়া আর কেউ বসে না। কালো কালির ছাপ সব জায়গায় সবুজ কালির ওপর পড়েছে, কালোর ওপর সবুজ পড়েনি। আজকে আপনার পকেটে ফাউন্টেন পেন দেখা যাচ্ছে। সুতরাং কালো কালির লেখাগুলো নিশ্চয়ই কালকের। উপরো-উপরি দুদিনও কালো কালি ব্যবহার করেননি —কারণ কালো ছাপ খুব অল্প।'

ভদ্রলোককে বাধা দিতে গেলেন কৃত্তিবাস ওঝা। কিন্তু তিনি গ্রাহ্য না করেই বলে চললেন—'আপনার বুকপকেটে সবুজ কালির বেশ খানিকটা ছোপ পড়েছে। ছোপটা শুকনো। অর্থাৎ ফাউন্টেনপেন 'লিক' করেছে—কিন্তু আজকে নয়—পরশু। তাই কাল আনেননি ফাউন্টেনপেন।'

এবার জোর করে ভদ্রলোককে থামিয়ে দিয়ে বললেন কৃত্তিবাস ওঝা—'আপনার পর্যবেক্ষণ ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি দেখে অবাক হলাম, কিন্তু সইটা আমার নয় কি করে বুঝলেন?'

ভদ্রলোক হেসে উঠে বললেন—'.....'

বিমূঢ়ভাবে চেয়ে থেকে বললেন কৃত্তিবাস ওঝা—'আপনার নামটা কি জানতে পারি কি?'

'আমার নাম পরাশর বর্মা।'

'আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

পরাশর বর্মার মুখের চেহারা এক মুহূর্তে যেন বদলে গেল। কোথায় গেল সেই সপ্রতিভ আত্মবিশ্বাসের সহজ ভঙ্গি, এক মুহূর্তে একেবারে অত্যন্ত লাজুকের মত অপ্রস্তুতভাবে পকেট থেকে একটি কাগজের তাড়া বার করে বললেন—'আমার কয়েকটি কবিতা আপনাকে দেখাতে এনেছিলাম।'

সত্যি আকাশ থেকে পড়লেন কৃত্তিবাস ওঝা—'আপনি—আপনি কবিতা লেখেন?'

পরাশর আর যেন চোখ তুলে তাকাতেই পারেন না। মাথা নিচু করে বললেন—'ওই আমার জীবনের একমাত্র সাধনা।'

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি কৃত্তিবাস ওঝা। পরাশর বর্মার হাত থেকে কাগজের তাড়াটা নিয়ে বললেন—'এগুলো কিন্তু আমার কাছে আপনাকে রেখে যেতে হবে। সময়মত দেখব।'

'নিশ্চয়, তাই আপনি দেখবেন। আর যদি দু' একটা তেমন—'

'হ্যাঁ, তেমন ভাল হলে নিশ্চয় ছাপব।'

পরাশর এবার উঠে পড়ে বললেন-'আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না।'

সঙ্গে সঙ্গে কৃত্তিবাস ওঝাও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'দেখুন, হস্তভম্ব যা করে গেলেন তাতে বিরক্ত হয়েছি কিনা বুঝতেই পারছি না। ডাক্তার কবি ইঞ্জিনীয়ার কবি উকিল কবি অনেক শোনা গেছে, কিন্তু গোয়েন্দা কবি বোধহয় এই প্রথম দেখলাম।'

পরাশরের মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন—'গোয়েন্দাগিরিটা আমার সখ, কিন্তু কাব্য আমার সাধনা।'

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

●

পরাশর বর্মার কবিতাগুলো তারপর সাগ্রহে পড়ে দেখেছেন কৃত্তিবাস ওঝা। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ছাড়া তাদের আর কোথাও জায়গা নেই।

অদ্বীশ বর্ধন

(গোয়েন্দাধাঁধার [illegible] ৪৪নং পাতায়)

যুবক যুবতী

বিকাশ ঘোষ

সাক্ষরতা অভিযান

অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ বাণী আমরা অনেকেই শুনেছি। কিন্তু বাণীকে উপলব্ধি করে যথার্থে পৌঁছে দেওয়া আমাদের সবার পক্ষে সম্ভব হয়নি। মৃতজনে প্রাণ দেওয়া তো দূরের কথা যে সব লোক চক্ষুষ্মান হয়েও অন্ধ তাদের জনাই বা আমরা কতটুকু করেছি? সমাজের অবিচার দারিদ্রোর কষাঘাত কিংবা সুযোগের অভাব যাদের শিক্ষার আলোক থেকে দূরে রেখেছে সেইসব মানুষের জন্য কি আমাদের কিছুই করার নেই? নিশ্চয়ই আছে। আশার কথা আমাদের যুবসমাজের এক বিরাট অংশ নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিরাট কর্মযজ্ঞের পবিত্র কাজ হাতে নিয়েছেন। তাঁরা গঠন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি। এঁদের এ কর্মযজ্ঞ চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। সারা বাংলার দূর দূরান্তে শহরে গ্রামে এরা যেভাবে কাজের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছেন সেটা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। তখন একটা ভুল সহজেই ভেঙে যায় আমাদের যুবসমাজ গোল্লায় যায়নি তারা হানাহানি মারামারিতেই শেষ হতে চায় না—গঠনমূলক কাজে নিজেদের আত্মোৎসর্গ করে নিজেরা সৃষ্টির আনন্দে মাততে কখনো পেছপা নয়।

বাংলার কয়েকজন প্রাণপুরুষ নানাভাবে এই সমিতির কর্মধারায় উৎসাহ উপদেশ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের প্রেরণা উৎসাহ যুব সমাজের কাছে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী প্রনবকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ সেন উপাচার্য পূর্ণেন্দুকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার উপাচার্য ডক্টর রমা চৌধুরী প্রভৃতি স্মরণীয় ব্যক্তিরা এই কর্মযজ্ঞের নেপথ্যে আছেন, আর এই কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করছেন আমাদেরই যুব-বন্ধু পার্থ সেনগুপ্ত সুধীর চ্যাটার্জি স্বপনা দেব প্রমুখেরা। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির প্রচার সম্পাদিকা তথা পত্রিকা সম্পাদিকা রাজশ্রী বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁদের সমিতির বিভিন্ন কর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা করলাম।

কলকাতার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে এই সমিতির নিরলস কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন তিনি। বয়স আর কত! প্রাণচাঞ্চল্যে যৌবনে এখনো ভরপুর! অথচ সংযত নিষ্ঠাবতী কর্মী। সুন্দর ব্যবহার। আমি যেতেই সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁর দপ্তরে।

—আচ্ছা রাজশ্রী দেবী, আপনি তো আমারই মতো তরুণ— এ বয়সের ধর্ম তো একটু হৈ হুল্লোড়ে মেতে থাকা। দিনরাত এইসব বয়স্কদের লেখাপড়া নিয়ে ভাবা ভালো লাগছে আপনার?

—ওঃ আপনি আমায় পরীক্ষা করছেন। বিশ্বাস করুন—এসব কাজ খুব ভালো লাগছে। আমাদের কাজের মাধ্যমে অন্যদের উপকার হচ্ছে, এটাই তো সবচেয়ে বড় আনন্দের কথা।

—নিরক্ষরতা দূরীকরণে যুবকদের ভূমিকার কথা একটু বলুন না?

—দেখুন এই সমিতির বিভিন্ন কর্মধারার সঙ্গে জড়িত সবাই বয়সে তরুণ। কেননা তরুণেরাই একাজ উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

—গ্রাম বাংলার নিরক্ষরতা দূরীকরণে আপনারা কি পন্থা অবলম্বন করেছেন?

—গ্রাম বাংলায় আমাদের অনেক কেন্দ্র রয়েছে। চব্বিশ পরগণা হুগলী মেদিনীপুর মুর্শিদাবাদ বীরভূম, হাওড়া উত্তরবঙ্গ পুরুলিয়া—সবত্র আমাদের কেন্দ্র রয়েছে।

—নিরক্ষরতা সমস্যার ব্যাপকতা তো গ্রামেই বেশী কি বলেন?

—সারা ভারতে ৩৯ কোটি মানুষ আজও নিরক্ষর। শুনলে আশ্চর্য হবেন আমাদের শহর কলকাতাও নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। মহানগরীর নিরক্ষর নরনারীর সংখ্যা ১২ লক্ষের মতো। এছাড়া ৩ লক্ষের মতো শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

শহর কলকাতার চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলের নিয়ন আলোর রোশনাই এ যাঁদের চোখ ঝলমল করে তাঁরা কি শহরের এ অন্ধকারের দিকে কখনো তাকিয়ে দেখেছেন? মনে হয় না। আমাদের সরকারই বা অন্ধকারের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণের কি ব্যবস্থা করেছেন তাদের জন্য?

রাজশ্রী বিশ্বাস

রাজশ্রী বিশ্বাস জানালেন—এদের জন্যও আমাদের কাজ শুরু হয়েছে। শিল্পাঞ্চলের নিরক্ষর মানুষদের জন্যও সমিতি অনেক সাক্ষর কেন্দ্র পরিচালনা করছেন। এবিষয়ে রাজশ্রী দেবী জানালেন—টিটাগড় সোদপুর, শ্রীরামপুর মাহেশ, আলমবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে আমরা তেলেগু ভাষায় পর্যন্ত সাক্ষর কেন্দ্র পরিচালনা করছি।

নিরক্ষরতা কর্মী আর এক তরুণ শ্রীনীলকান্ত রায় এবার আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন। নিরক্ষরতা কর্মসূচী বিষয়ে তিনি ভারতের অনেক প্রদেশে ঘুরেছেন। তাঁর কাছেই শুনতে পেলাম তাঁরা যখন দিল্লীতে যান তখন কর্তাব্যক্তিরা তাঁদের তরুণ বয়স দেখে অবাক। সাইসাবাদে দেখে তাঁদের ধারণা হয়েছিল পার্থ সেনগুপ্ত

ইণ্ডাদিরা একটু বয়স্ক হবেন। এ যে দেখি তার উলটো ব্যাপার!

এইসব যুবকরা এতবড়ো কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন। রক্তদান করে সাক্ষরতা অভিযান চালানো এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এটা তো এ'দের দ্বারাই সম্ভব। নীলকান্তবাবু জানালেন ১৯৬৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন রক্ত বিক্রী করে পর্যন্ত এই আন্দোলনের সামিল হন। তাদের এই কাজের স্বীকৃতি তথা প্রশংসা থেকে গেলে ইউনেস্কোর মতো সংস্থার কাছ।

এবার আমি জিজ্ঞাসা করি—আপনি তো বাইরে অনেক ঘুরেছেন সেখানের সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করলেন কি?

—সত্যি কথা বলতে কি জানেন নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজকে সাক্ষরতা আন্দোলনের পর্যায়ে উন্নীত করার সর্বভারতীয় কৃতিত্ব আমাদের সমিতির। জাতীয় আন্দোলনের স্তরে সাক্ষরতাকে পৌঁছে দেওয়া—বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করার নজীর আর কোথাও নেই।

—এই বিরাট কর্মযজ্ঞে আপনাদের তো অনেক অর্থের দরকার। এর সংস্থান করছেন কি ভাবে?

—আমাদের সমিতির প্রকাশনা বিভাগ রয়েছে। যা থেকে আয় কিছু আছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার পাইলট প্রজেকট অনুসারে এক হাজার বয়স্ক কেন্দ্র চালানোর জন্য আমাদের সমিতিকে ২ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। এর সঙ্গে আমাদের কিছু অর্থনৈতিক প্রকল্পও হাতে নেওয়ার ইচ্ছা আছে।

এতক্ষণ রাজশ্রী দেবী চুপচাপ শুনছিলেন। এবার তাঁর কাছে জানতে চাইলাম—গ্রামের মানুষের তো দুঃখকষ্ট অভাব-অনটন, সাক্ষরতা কর্মসূচীতে তাদের সাড়া কেমন পাচ্ছেন?

—এটা তো একটা মৌলিক সমস্যা। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনীর পর অনাহারে অর্ধাহারে লেখাপড়া করা সত্যি সমস্যার ব্যাপার। তবুও আমরা যতটা সাড়া পেয়েছি সেটা আশাব্যঞ্জক।

—আচ্ছা এমন করলে হয় না যে ওরা হাতে কলমে কাজ করে কিছু রুজি-রোজগারও করলো, আবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পড়াশুনাও করলো।

—সেসব বিষয়ে আমরা চিন্তা করছি। যেমন ধরুন বীরভূমে অনেক অঞ্চলে পাথর-শিল্পের কাজের সুযোগ রয়েছে। পুরুলিয়ায় যেমন বিড়ি শিল্প উত্তরবঙ্গের চা শিল্প। এসব অঞ্চলে সাক্ষরতা কর্মের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকর্মকে জুড়ে দিতে পারলে খুবই ফলপ্রদ হবে বলে আমাদের ধারণা। এ ধরণের ফাংশনাল লিটারেসি নিয়ে আমরা চিন্তা করছি।

—আপনারা গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের সঙ্গে সাক্ষরতা অভিযান—এ ধরণের কোন প্রকল্প সরকারের কাছে পেশ করুন না কেন অনুরোধের সুরে জানাই।

—সব চেষ্টাই আমরা করেছি। আমাদের সম্পাদক এ ধরণের স্কিম পেশ করেছিলেন কিন্তু সরকারের তরফ থেকে কোন সাড়া আসেনি। এখন নিজেদের উদ্যোগেই কিছু করার চেষ্টা হচ্ছে।

—কিছুদিন আগে কাগজে লেখক কর্মশালার এক কর্মসূচী দেখলাম। এটা কি ব্যাপার বলুন তো!

—সদ্য সাক্ষরদের পড়বার জন্য বই লেখার উদ্দেশ্যে উৎসাহী লেখকবৃন্দ নিয়ে আমরা ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত হাওড়ার মতো গ্রামে এই কর্মশালা পরিচালনা করেছি।

—ঐ সময়ে ইডেনে ক্রিকেট নিয়ে এত হৈ-চৈ আর আপনারা মাতো গ্রামে বয়স্কদের জন্য বই লিখছেন, সত্যি ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

—ওখানেও আমরা কাজের মধ্যে বেশ ভালোই কাটিয়েছি। আমাদের অনুষ্ঠান প্রথমদিনে উদ্বোধন করেন ডকটর রমা চৌধুরী। কেন্দ্রীয় ভাষা সংস্থানের পক্ষ থেকে এসেছিলেন ডঃ রাও। আমাদের গাইড করেছেন মতাদ্ব দাশগুপ্ত। আমাদের কর্মশালা সবদিক থেকে সফল।

—ওখানে গ্রামবাসীর কেমন সাড়া পেলেন?

—অভূতপূর্ব। গ্রামের মেয়ে বি-এ ক্লাসের ছাত্রী জয়শ্রী বসুর সহযোগিতা পাওয়া উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া আমাদের সমিতি ও মাতো গ্রামে গ্রামোন্নয়ন সংস্থা স্থাপন করেছেন।

—আপনাদের এই ধরণের প্রকল্পও আছে নাকি?

—সাক্ষরতা কর্মসূচী যাতে গ্রাম-জীবনের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এর প্রতিষ্ঠা। গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে সংযোগ আছে এমনসব উৎপাদনমুখী কর্মসূচী যথা পশুপালন উচ্চফলনশীল কৃষি পদ্ধতি, দুগ্ধ প্রকল্প, মৎস্য চাষ এখানে শিক্ষা দেওয়া হবে।

—বেশ সুন্দর স্কিম তো! পুরুলিয়ায় আপনাদের লঙ্গরখানা চালানোর সংবাদেও আশ্চর্য হয়েছিলাম। সাক্ষরতা আন্দোলনকে জনজীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ায় আপনাদের অনেকেই সাধুবাদ জানাবেন।

বীরসিংহ গ্রামের বিকাশ ঘোষ রাজশ্রীদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। স্কুল জীবন থেকেই তিনি নিরক্ষরতা কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত। জিজ্ঞাসা করলাম—এসব কাজ কেমন লাগছে?

—ভালোই। সমাজের কোন কাজে নিজেকে যুক্ত করতে পেরে আমি খুব খুশী।

স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে কেমন সাড়া পাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করলাম রাজশ্রী দেবীকে।

—জাতীয় সেবা প্রকল্প অনুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য কলেজের ছেলেমেয়েরা সাক্ষরতা ক্যাম্পে অংশ নেয়। স্কুল জীবনে এটাকে আরো গ্রহণযোগ্য করার জন্য আমরা মাননীয় পর্ষদ সভাপতি সত্যেন্দ্রমোহন চ্যাটার্জি'র কাছে আবেদন জানিয়েছি।

স্বল্প পরিসরে অনেক আলোচনাই সংক্ষিপ্ত করতে এবং বাদ দিতে হ[illegible] পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ [illegible] যুবক-যুবতীদের যে কর্মচাঞ্চল্য অনুপ্রাণিত করছেন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্রতী হয়েছেন তার তুলনা নেই। বিদায়কালে রাজশ্রী দেবী অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। মুক্তিপদ রায়, চণ্ডী বাগ, নুর আলম, ভারতী রায়, প্রণব ঘোষ, সমীর চ্যাটার্জি, সুতপা চক্রবর্তী, মীরা ভট্টশালী, বন্ধুভূষণ মল্লিক প্রত্যেকেই নিষ্ঠাবান কর্মী। সবাই দেখলাম তারুণ্যে ভরপুর অথচ কর্মচঞ্চল।

ধন্যবাদ জানিয়ে যখন উঠছি তখন সুতপা চক্রবর্তী ও মীরা ভট্টশালী বললেন—সকলের সহযোগিতা পেলে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারব। আপনারা সহযোগিতা করবেন আশা করি।

নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলাম।

—অমর দাশ

শতবর্ষের স্মরণীয় প্রসঙ্গে

গত ১৩ ডিসেম্বর তারিখের 'অমৃতে' প্রকাশিত আমার পত্রের উত্তরে শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় যে-পত্রটি (অমৃত—১০-১-৭৫) লিখেছেন তা পড়লাম। কোন গৌরচন্দ্রিকা না করে তার উত্তরে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

(১) আমি লিখেছিলাম, 'কালীশবাবু অহীন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যু-তারিখ দিয়েছেন ৩ নভেম্বর। লেখা উচিত ছিল ৪ নভেম্বর।' কালীশবাবু এর উত্তরে লিখেছেন 'আমার রচনায় প্রকাশিত নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুদিবস রবিবার রাত ২-৩০টা, ৩ নভেম্বর ১৯৭৪—এই তথ্য অভ্রান্ত। ইংরেজীমতে রাত ১২টার পরবর্তী সময়ে গৃহীত হলেও বাংলা মতে সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সময় পূর্ববর্তী তারিখেরই অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য 'রাত ২-৩০' বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।'

কালীশবাবু তাঁর নিজের তথ্যকে অভ্রান্ত প্রতিপন্ন করতে গিয়ে ইংরেজি ও বাংলা মতের এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি করেছেন। তারিখটা ইংরেজী মতে কিন্তু তারিখ গণনার পদ্ধতি বাংলা মতে। সুধী পাঠক সমাজই বিচার করবেন উক্ত রবিবার রাত ২-৩০টা ৩ নভেম্বর না ৪ নভেম্বর।

(২) কালীশবাবু অহীন্দ্র চৌধুরীর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'-র প্রকাশকাল সম্পর্কে লিখেছেন অমৃত পত্রিকায় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে রচনাটি প্রকাশিত হয় নি—হয়েছিল ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে।'

কিন্তু আমি এই উক্তির তো প্রতিবাদ করি নি আমি প্রতিবাদ করেছিলাম তাঁর পূর্বেকার উক্তি সম্পর্কে। সেটি আবার উদ্ধার করিঃ ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র নামক তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এবং এই বছরই অমৃত পত্রিকায় 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' আত্মজীবন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।' (অমৃত—১৫।১১।৭৪)

'এই বছরই' অর্থে কোন বছর বোঝায়? ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে নয় কি? সেই কারণেই আমি বলেছিলাম উক্ত আত্মজীবনী (১ম পর্ব) ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি—ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর থেকে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সুধী পাঠক সমাজ লক্ষ্য করবেন, কালীশবাবুর উক্তিদ্বয় কেমন পরস্পরবিরোধী। তাঁর পরস্পরবিরোধী উক্তির আরও একটি নমুনা তুলে ধরছি। পূর্বে তিনি লিখেছিলেন 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' পুস্তকের দ্বিতীয় পর্ব ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে পুনরায় অমৃত পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে (অমৃত—১৫।১১।৭৪) আর আমার প্রতিবাদের পরে তিনি লিখলেন উক্ত আত্মজীবনী (কোন পর্ব তা উল্লেখ না করে) অমৃত পত্রিকায় [illegible] খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় নি—হয়েছিল ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে। কালীশবাবুর ব্যবহৃত 'পুনরায়' পদ টির দ্বারা কি বোঝাচ্ছে না আত্মজীবনীটির প্রথম পর্বও অমৃত-এ প্রকাশিত হয়েছিল? ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে যদি দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে কোন পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল?

কালীশবাবু লিখেছেন অমৃত পত্রিকায় 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' পুস্তকটির প্রকাশ তথ্যই আমি তুলে ধরেছিলাম। অন্য পত্রিকায় কবে কোন অংশ কখন প্রকাশিত হয়েছিল তা তুলে ধরতে চাই না।' নিজের ভ্রান্তি ঢাকবার জন্যে কালীশবাবু অসত্যের পথে পদক্ষেপ করছেন না কি? আরও একটা কথা। যিনি ভবিষ্যৎ গবেষকদের পথ-নির্দেশের জন্যে খুঁটি-নাটি সব তথ্যই বিশেষ ভাবে তুলে ধরেন তিনি কেন অহীন্দ্রবাবুর আত্মজীবনীর ১ম পর্বের প্রকাশ তথ্যকে তুলে ধরতে চাইলেন না?

চিঠিপত্র

(৩) কালীশবাবু বলেছেন, 'বিহারী-লাল চট্টোপাধ্যায়ের পিতার নাম 'হরিপ্রিয়া-লাল'-এর স্থানে পান্নালাল' বাংলা নাট্য বিবর্ধনে 'গিরিশচন্দ্র'-এর স্থানে বাংলার নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র' ভীমসিংহ-কৃষ্ণকুমারী-র স্থানে ভীমসিংহ—মৃণালিনী মুদ্রণ ভ্রান্তির জন্যে প্রকাশিত হয়েছেন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন 'বিধবা বিবাহ নাটকের স্থলে নব নাটক মুদ্রণ আমার নিজের অসাবধানতাবশতঃও মুদ্রিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।' এবং এর পরেই তিনি সাফাই গেয়েছেনঃ সুলোচনা চরিত্রের নাম যেখানে উল্লেখ আছে নাট্য সাহিত্য নিয়ে যাঁরা বিন্দুমাত্র ঘাটাঘাটি করেন তাঁরা যে এই ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হবেন না—তাঁদের সম্পর্কে এতটা খারাপ ধারণা আমার নেই।' কিন্তু যে সব পাঠক নাট্য সাহিত্য নিয়ে বিন্দুমাত্র ঘাটাঘাটি করেন না তাঁরা কী করে তাঁর এই ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হবেন?

কালীশবাবু পূর্বে লিখে ছিলেন, 'বিহারীলাল আবাল্য মাতামহের গৃহে পালিত-পালিত।' আমি তাঁর এই ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম, 'তিনি আবাল্য পিতামহের গৃহে পালিত-পালিত।' এবার তিনি লিখেছেন পিতামহ হরলাল চট্টোপাধ্যায় বিহারীলালকে প্রতিপালন করেন পিতামহের মৃত্যুর পর মাতুলালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় বিহারী-লালকে।' কালীশবাবু তাঁর পূর্বেকার মন্তব্য বহাল রাখলেন না সংশোধন করলেন?

(৫) কালীশবাবু লিখেছেন 'বিহারী-লালকে বিস্মৃতির পৃষ্ঠা থেকে আমিই' সর্ব প্রথম নতুন করে উদ্ধার করি একথা বাংলাদেশের প্রত্যেক বিদগ্ধজনই জানেন।'

বিদগ্ধ নই তাই শুধু জানি 'বিহারী-লালের জীবনী ও কীর্তির আলোচক রূপে গিরিশচন্দ্র (দ্রঃ রঙ্গালয়, ১৩০৮) ব্যোম-কেশ মুস্তফী (দ্রঃ বিশ্বকোষ' ১৬শ খণ্ড, ১৩১২) কিরণচন্দ্র দত্ত (দ্রঃ নাট্য মন্দির,' শ্রাবণ ১৩২০) অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (দ্রঃ গিরিশচন্দ্র,' ১৩৩৪) অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (দ্রঃ রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' ১৩৪০) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্রঃ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,' ১৩৪০ ও সাহিত্য সাধক চরিতমালা'-র ৬৭ সংখ্যক গ্রন্থ, ১৩৫৪) হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (দ্রঃ ভারতীয় নাট্যমঞ্চ—২ খণ্ড ও দি ইণ্ডিয়ান স্টেজ—৪ খণ্ড) প্রমুখ পূর্ব সূরীদের নাম। কালীশবাবু এঁদের পরিধির বাইরে দাঁড়িয়ে বিহারীলাল অথবা বাংলা নাট্যশালা সম্পর্কে নতুন তথ্য কী উদ্ধার করেছেন? কালীশবাবু বলেছেন এঁদের তথ্যমূলক প্রবন্ধ বা পুস্তক আমার পড়া নেই। তাই তিনি আমাকে তাঁর 'বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস' পুস্তকটি (প্রকাশকাল : ১৯৭৪) পড়তে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু কালীশবাবু যদি অনুগ্রহ করে বর্তমান পত্র-লেখকের 'বাংলা থিয়েটারে অভিনয়' গ্রন্থটির (প্রকাশকাল : ১৯৬৬) পৃঃ ৪—৭ ও 'কলকাতার থিয়েটার' দ্বিতীয় পর্ব গ্রন্থের (প্রকাশকাল : ১৯৭২) পৃঃ ২১—২৪ পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন উক্ত গ্রন্থ দুটিতে বিহারীলাল সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য তাঁদের রচনা থেকেই উদ্ধৃত বা গৃহীত। আর একটি কথা। কালীশবাবুর বইটি তাঁর অনুরোধের পূর্বেই পড়েছি এবং তাতে তথ্যের অসংখ্য ভ্রম দেখেছি। সুযোগ পেলে সেগুলি পাঠকসমাজে তুলে ধরতে প্রস্তুত আছি।

পরিশেষে বক্তব্য মুদ্রণপ্রমাদ ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু যিনি ভবিষ্যৎ গবেষক-দের জন্য দৃষ্টি রেখে 'অমৃত'-র মতো একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রে সপ্তাহের পর সপ্তাহ গবেষণামূলক (?) ফিচার রচনা করে যাচ্ছেন তাঁর রচনায় এ-জাতীয় ভুল থাকা অবাঞ্ছনীয়। বিশেষত, যখন মুদ্রণ-জনিত প্রমাদ পরবর্তী যে-কোন সংখ্যায় সংশোধনের যথেষ্ট সুযোগ থাকে। কিন্তু আমি তো মুদ্রণপ্রমাদের উপর ভিত্তি করেই পত্র লিখিনি। তাঁর তথ্যগত ভ্রান্তি-সমূহের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার সে-উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কিন্তু কারও লেখার তথ্যগত ভুলের প্রতি বিনীত-ভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে তা যে হীনতার প্রকাশক হয় এরকম অভিনব গবেষণামূলক তথ্য আমার জানা ছিল না। কালীশবাবু যে নিজেই একটা হীনতা কল্পনা করে বেদনাবোধ করেছেন সেজন্যে আমিই বেদনাবোধ করছি।

শঙ্কর ভট্টাচার্য
বিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, নদীয়া।

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু এ তো হল বাহ্য—যে-কোনো আসর মঞ্চস্থ করতে হলেই বাধা আসে নানা দিক থেকে। একদল লোক বলাবলি সুরু করলেন—যোগপন্থী হয়ে রঙ্গমঞ্চে নৃত্য-গীতের আয়োজন অনুচিত। তাঁদের ভ্রূকুটিকে গণ্য না করা তত কঠিন মনে হত না কিন্তু যখন দরদী ধার্মিক বন্ধুদের মধ্যেও কেউ কেউ প্রতিবাদ করা সুরু করলেন এই বলে যে, আমি স্বধর্মভ্রষ্ট হচ্ছি সব অনর্থের মূল অর্থকে আহরণ করতে তখন সময়ে সময়ে মন একটু ক্লিষ্ট হত বৈ কি। শেষে শ্রীঅরবিন্দকে জানাতে তিনি লিখলেন যে, অর্থ সংগ্রহ করা অনুচিত হত যদি আমি নিজের জন্যে টাকা তুলতাম কিন্তু যখন গুরুসেবার জন্যে অর্থোপার্জন করছি তখন প্রত্যবায় আসতেই পারে না। কেবল—লিখলেন তিনি—সামাজিক সভা সমিতি পার্টি ডিনার এসব বর্জনীয়। যতদূর মনে পড়ে—তৎপর আমি সামাজিকতায় বেশি যোগ দিইনি। কিন্তু তবু মন খুঁৎ খুঁৎ করত নেচে গান করে টাকা তুলতাম বলে—বিশেষ নাচ। কিন্তু এ নিয়ে আর বেশি বলার প্রয়োজন দেখি না এটুকুও যে বললাম সে শুধু জানাতে যে 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' (শ্রেয়ের পথে অনেক বাধা) এ-সত্যটিকে নতুন করে উপলব্ধি করে আদর্শবাদীকে কীভাবে বিব্রত-ক্লিষ্ট হয়ে হায় হায় করতে হয়েছিল।

কিন্তু লাভও হয়েছিল যথেষ্ট : কত চমৎকার হৃদয়বান গুণী তথা মনীষীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল; কতবার ভক্তির গানে নানা ধর্মার্থীর ব্যাপক সাড়া পেয়ে সব মনস্তাপ গলে আনন্দের জোয়ার বয়েছিল আমার মনে: কত যোগপন্থী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের কথা জানতে পেরে তাঁর মহিমা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন—যাঁদের মধ্যে অনেকেই শ্রীঅরবিন্দের দর্শনার্থী হয়ে পরে এসেছিলেন পণ্ডিচেরি আশ্রমে। শুধু তাই নয় নানা যোগবিমুখদেরও নানা ভুল ধারণার নিরসন হয়েছিল আমার সঙ্গে আলোচনায়।

শ্রীঅরবিন্দকে আমি সব কথাই খুঁটিয়ে জানাতাম—সাঁতাই নিজের গুণগান করে 'বা রে আমি' বলতে নয়—তাঁর সঙ্গে যোগ রাখতে। কারণ এখন তো আর উমা ছিল না (যার ভক্তি সঙ্গীতে আগে আগে মনের অবসাদ কাটত) তাই থেকে থেকে মনে হত দূর হোক, ফিরে যাই শ্রীগুরুর শীতল চরণে। কিন্তু কর্ম করলেই কর্মবন্ধনের ফাঁদে পড়তে হয়—নানা শহর থেকে ডাক আসত যেতে হত গান গাইতে বা কন্সার্টের ব্যবস্থা করতে—শেষে ভাষণও দিতে হয়েছিল নানা সভা-সমিতিতে তথা ধর্মার্থিসংসদে। আশ্রমে ফিরে গুরুদেবকে সব কথা লিখলাম খুঁটিয়ে—কোথায় কোথায় গুরু বাক্য মেনে চলেছি আর কোথায় কোথায় ত্রুটি হয়েছে যদিও (হায় রে!) সেজন্যে অনুতাপে তনু দগ্ধ হয়নি। তিনি আমার অননুতপ্ত 'কনফেশন' পড়ে হেসেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু যেটা জানি সেটা এই যে তিনি প্রাণভরা স্নেহাশিস পাঠিয়েছিলেন সব স্খলন ক্ষমা করে :

> "We have always had a full appreciation of what you have done for us and for your untiring effort and what you have achieved in collecting much-needed contributions for the Ashram funds and still more in turning the minds of people outside, previously indifferent, towards us and our work. You should throw away entirely your idea that we are so insensitive as not to have appreciated what you have done for us." (4.3.49).

(ভাবার্থ : তুমি আমাদের জন্যে যা করেছ, আশ্রমের জন্যে প্রণামী তুলেছ বাইরের অনেক জিজ্ঞাসুকে আমাদের দিকে টেনে এনেছ যারা আমাদের সাধনা সম্বন্ধে উদাসীন ছিল—এসবই আমাদের কাছে প্রশংসা লাভ করেছে। এ ধারণা তোমার মন থেকে একেবারে মুছে ফেলো যে আমাদের মন এমন অসাড় যে তোমার গুরুসেবার মর্ম বুঝতে আমরা অক্ষম।)

এর পরে আর এক মুস্কিল হল : যখন খেলাধুলো ড্রিল মার্চ ছোটাছুটির প্রবর্তন হয় তখন আমি কিছুতেই মনকে রাজী করাতে পারিনি স্পোর্টস-এ যোগ দিতে। কিন্তু মনে আশংকা হত প্রায়ই যে, গুরু যখন এসব চাইছেন তখন আমার পক্ষে সাড়া না দিলে অন্যায় হবে হয়ত— কে জানে? ভেবে কোনো কূলকিনারা না পেয়ে গুরুদেবকে খোলাখুলি লিখলাম আমার দুর্ভাবনার কথা : আমি খেলাধুলোয় যোগ না দিলে তাঁর স্নেহ ও কৃপা থেকে বঞ্চিত হব না তো?...ইত্যাদি। সব বলার দরকার নেই, কারণ খেলাধুলোর সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের বহু নিবন্ধ ও চিঠিই ছাপা হয়েছে। গুরুদেবের ব্যাখ্যার চুম্বক এই যে, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্' বলে দেহকেও তিনি পটু করতে চান নানা খেলাধুলো ছোটাছুটি সাঁতার ব্যায়াম ইত্যাদি বলসাধনায়। আমাকে তিনি এ সম্বন্ধে কয়েকটি সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। শেষের চিঠিটিতে স্পোর্টস সম্বন্ধে নানা লোকের নানা ভুল ধারণার নিরসন করে আমাকে আবার তাঁর স্নেহাশিস পাঠিয়েছিলেন এমন মধুর সুরে যে আমি বিষাদ কাটিয়ে ফের চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলাম। তিনি ২৭-৪-৪৯ তারিখের সুদীর্ঘ চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে লিখেছিলেন :

> I writee all this in the hope of clearing away all the strange misconceptions with which the air seems to have become thick and by some of which you may have been affected. I wish to assure you that my love and affection and the Mother's love and affection are constantly with you. We have had nothing for you but love and affection and a full appreciation of all you have done for us, your work, your service, your labour to make people over there appreciate our Ashram and what it stands for and to turn men's minds favourably towards us and what we are trying to do. As for me, you should realise that the will to help you towards divine realisation is one of the things that has been constantly nearest to my heart and will be always there. (27.4.49).

(ভাবার্থ : আমাদের স্নেহ সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। তুমি আমাদের জন্যে যা করেছ তার মূল্য সম্বন্ধে আমরা পূর্ণ সজাগ আছি : তোমার গুরুসেবা, অনেকের মন আমাদের দিকে ফেরাবার প্রয়াস তাদের বুঝিয়ে বলা আমাদের সাধনার লক্ষ্য কী ইত্যাদি। আর আমার নিজের কথা এই যে তোমার সাধনা সফল করতে আমার হৃদয় সর্বদাই সচেষ্ট থাকবে জেনো।)

চৌত্রিশ

গুরুসেবা করে যে যেমন পারে। আমি নানাভাবেই শ্রীঅরবিন্দের মহিমার দিকে বিশেষ করে আমার নানা বন্ধু বান্ধবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করতাম। অনেককে বহু

ব্যাখ্যা করেও বোঝাতে পারিনি যে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পূর্ণযোগে জীবনকে বাতিল করেন নি, কবিতা গান সাহিত্য এমন কি হাসিও তাঁর যোগে অস্পৃশ্য নয়। তিনি বাইরে দেখতে গুরুগম্ভীর একথা অনস্বীকার্য—তাঁর লেখায় হাসির কোনো সুদূর প্রতিধ্বনিও মেলে না—মানি। তবু বলবই বলব যে তিনি শুধু যে স্বভাবে রসিক ছিলেন তাই নয়, হাসির মোক্ষম জবাব দিতে জানতেন পাল্টা হেসে। আমার SRI AUROBINDO CAME TO ME স্মৃতিচারণে আমি একটি অধ্যায়ে তাঁর নানা হাসির ফুলঝুরির স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়েছি। এ দৃষ্টান্তগুলি পড়ে এক ধর্মিষ্ঠা ইংরাজ মহিলা মর্মাহত হয়ে আমাকে লিখেছিলেন: 'করেছ এসব কী প্রগলভতা! ছি ছি! মনে রেখো খৃষ্টদেব কখনো ভুলেও হাসেননি।' তাঁকে লিখতে ইচ্ছা হয়েছিল: কিন্তু কৃষ্ণ হাসতে জানতেন। তবে ভাবলাম কাজ কী? একেই তো কৃষ্ণের নিন্দায় ওরা পঞ্চমুখ—তার উপর হাসির দৃষ্টান্ত দিলে হয়ত একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবে তাঁর উপর। তাই তাঁর অশান্ত মনকে শান্ত করতে লিখলাম: 'আপনি না হয় শ্রীঅরবিন্দের হাসির অধ্যায়টি বাদ দিয়ে বইটি নতুন করে বাঁধাবেন।'

সৌভাগ্যের বিষয়, কৃষ্ণভক্তেরা কেউই শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণী সংবাদ অধ্যায়টি কেটে বাদ দিতে চাননি। এ-অধ্যায়টিতে কৃষ্ণের যে রসিকতার পরিচয় পাই তা এত উপভোগ্য যে, শ্রীঅরবিন্দের রসিকতার গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলে অবান্তর হবে না।*

একদা শায়িত কৃষ্ণকে রুক্মিণী যখন পাখা নিয়ে হাওয়া করছেন তখন কৃষ্ণ হঠাৎ তাঁকে বলে বসলেন গম্ভীর মুখেই:

অস্পষ্টবর্ত্মনাং পুংসামলোকপথমীয়ুষাম্।
আস্থিতাঃ পদবীং সুভ্রু প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ।।

অর্থাৎ (আমার মত)

যাদের পথ যায় না জানা—
চলে আপন খেয়ালে,
দুঃখ সয় জায়া তাদের
কণ্ঠে মালা পরালে।

কেন? কারণ—

আমরা সখী চির-উদাসী, নারীতে মন ভরে না কাজে কাজেই ভেবে দেখ:

যাহার নাই ঘর— সে কী বা
করিবে লয়ে ঘরণী?

হৃদয়ে সাম্রাজ্য যার সে
কবে চায় ধরণী?

দীপশিখার মত সে শুধু বিলায়
জ্যোতি নিভৃতে

যে লভে জ্যোতি—নয় শিখার
প্রিয় বা অপ্রিয় তো।

রুক্মিণী দেবী এমন পরিহাসকে পরিপাক করতে পারলেন না:

কমলকর হতে ব্যজনী পড়ে খসি,
তন্বী দেহলতা কাঁপিয়া উঠি'

দুগ্ধফেননিভ শয্যা হতে তিনি
মরেছি পড়িলেন ধূলায় লুটি'।

কৃষ্ণ অপ্রস্তুত। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি রসিক তো, তাই—

হেন প্রেমের হৃদি লক্ষ্মী নিদর্শন
নিলেন সরলারে বক্ষে তুলি'—

হাসির লঘুমেঘে অশনিটংকার শুনি
যে শংকায় ওঠে আকুলি',

তাহার হৃদয়ের ব্যথার ব্যথী হাসি
রাণীরে কহিলেন গাঢ় প্রণয়ে:

'জানিত কে বা হায় প্রিয়ের পরিহাসে
প্রেয়সী মুরছায় অহেতু ভয়ে?

ক্ষমো লো অপরাধ—তোমাকে ব্যথা
দিতে করি নি কৌতুক প্রগলভতা

তোমাকে অনুপ্রিয়া 'রসিকা' চেয়েছিনু
দেখিতে—শুনি শুনে রসাল কথা

কেমনে নিরুপম যুগল লোচনের
নীলাভা রাঙা হয়—তাহার পরে

রোষকটাক্ষের শায়ক ছোটে—করে মোহন
ঝংকার স্ফুরিতাধরে

কেমন সুন্দর ভ্রূকুটি ফোটে
অভিমানিনী-মুখে—ছিল দেখিতে সাধ,

সুপ্ত রেখেছিনু সে-সাধ বহুদিন—
জাগায়ে তারে আজ এ কী প্রমাদ!

তোমারে করি সখী, তবুও নিবেদন—
বনিতা সাথে বধূ এ-সংসারে

যেটুকু কাল যাপে মগ্ন পরিহাসে
সে বহুবাঞ্ছিত প্রেমবিহারে।

(তৃষ্ণচঃ শ্রোতুকামেন ক্ষেল্যাচরিতমঙ্গনে।।

মুখঞ্চ প্রেমসংরম্ভ—স্ফুরিতাধরমীক্ষিতুম্

কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং সুন্দর
ভ্রুকুটীতটম্।

অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু
গৃহমেধিনাম্।

যন্নর্মৈর্নীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু
ভামিনি!

কৃষ্ণকে নিয়ে বৈষ্ণব কবিরা আরো কত রসাল গল্পগাছা করেছেন হাসির উদ্ভাসে.

গীতায় অর্জুনও বলেছিলেন: 'জেনে না তোমার সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করেছি প্রভু, না জেনে তুমি কে? কৃষ্ণের উপাধি—রসরাজ রসসাগর রসিকচূড়ামণি—এমন কি তাঁকে জোর করে অপ্রস্তুত করতেও রাধিকার বাধে নি।

এ-হেন রসময়ের ভক্ত আমি কেমন করে সয়ে থাকি গুরুদেবের গুরুগম্ভীরতা? বৎসরে চারটি বার মাত্র দর্শন—মিনিটখানেকের জন্যে, তাও সয় কিন্তু তখনো গম্ভীরানন? না এ-হুল দুঃসহ 'শেষ খড়'—লিখলাম গুরুদেবকে যা থাকে কপালে বলে। উত্তরে তিনি লিখলেন—আচ্ছা, পরের বার হাসবেন সুসহ হতে।

পরের বার গেলাম দর্শনে। হা হতোস্মি! সেই চিরন্তন গম্ভীর মুখ—যথাপূর্বং তথাপরম্—দেখলে মন দমে যায়। আমার পিছনে ছিলেন শ্রীঅনিলবরণ রায়। তিনি আমাকে বললেন: সে কি! গুরুদেব আপনাকে দেখে তো খাসা হেসেছিলেন—আপনি বুঝতে পারেন নি।' আমি করজোড়ে বললাম: 'সাধকপ্রবর! আমি সপ্রোমেন্টাল বুঝতে না পারতে পারি কিন্তু হাসির রাজা দ্বিজেন্দ্রলালের সুযোগ্য কুলতিলক হাসিও বুঝতে অক্ষম একথাও যদি মেনে নিতে হয় তাহলে আমার কোমল প্রাণ কি আর সইতে পারবে? অতঃপর শ্রীঅরবিন্দের কাছে দরবার করতে তিনি আমাকে লিখলেন: 'আমি তোমার পানে সত্যিই হাসিমুখে চেয়েছিলাম—তবে সে-হাসি কিছু গান্ধীর মতন বালহাসি (childlike smile) বা রবীন্দ্রনাথের মতন দীপ্ত হাসি (radiant smile) ছিল না। ভাবটা এই যে he smiled as best he could.

কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা লিখলাম: 'আপনার পায়ে পড়ি এর পরের বার যেমন হাসি হাসতে চান হাসবেন কেবল এমন হাসি হয় যেন যাকে হাসি বলে সনাক্ত করতে পারি।' বলে তাঁকে একটি উদাহরণ দিলাম:

একদা হনুমান দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণের রাজসভায় বলেছিলেন: কৃষ্ণ রুক্মিণী রাজা রাণী এ চলবে না. কারণ যদিও

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ।

শ্রীনাথ জানকীনাথ যে অভেদ
পরমাত্মায় জানি গো মনে,

তথাপি হনুর প্রাণাধিপ
শুধু রাম সীতা, তাই চরণতলে

এ-মিনতি—আজ রাম সীতা রূপে
ধরি বোসো দোঁহে সিংহাসনে

নহিলে এ সভা ভেঙেচুরে
ফের লংকাকাণ্ড করিব পলে।

---

*আমার 'কৃষ্ণকথাকাহিনী দ্রষ্টব্য—১৪৫-৬ পৃঃ।

তাতে নাকি কৃষ্ণ মহিষী রুক্মিনীকে বলেছিলেন :

'কী করি হে বাণী? পরমভক্ত
হনুর মান তো রাখিতে হবে :
তাই তুমি ধরো সীতার মূরতি,
আমি হই রাম সগৌরবে।'

শেষে জুড়ে দিলাম : 'গুরুদেব একথার উত্তরে আপনি অবশ্যই লিখতে পারেন—একশোবার—'কালির দিলীপ কি দ্বাপরের হনুমানের মত ভক্ত যে তার মান না রাখলেই নয়?' উত্তরে আমি শুধু বলব : 'তা বটে। কিন্তু দয়া করে একটিবার ভাবুন—বীর হনুমান কী চেয়েছিলেন, আর বেচারি দিলীপ কী চাইছে। তিনি চেয়েছিলেন কৃষ্ণ রুক্মিণীর কমসীতার ভোলবদল আর আমি চাইছি মাত্র শ্রীমুখের একটুকরো সুবোধ্য হাসি।'

(এ-গল্পটি পরে পুনায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের কাছে করেছিলাম—তিনি শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েছিলেন—'স্মৃতিচারণ ২য় ভাগ' দ্রষ্টব্য)

আমার এই মোক্ষম 'প্রসঙ্গোক্তি'-র পরে যাকে বলে the ice was broken—অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দও পরিহাসের আসরে নেমেছিলেন কৃপা করে।

(ক্রমশ)

বিজ্ঞানের কথা

রঙ-করা খাদ্য গ্রহণ করা ও বিষ খাওয়া একই কথা

অনেক রকমের খাবার। প্রকৃতই যদি টাটকা ও খাঁটি হয় তাহলে উপাদেয় তো বটেই, শরীরের পক্ষে ভালো। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এই খাবারগুলো বাজারে হাজির হয় রঙ করা চেহারা নিয়ে, তখন দেখে মনে হয় বড়ো বেশি টাটকা ও খাঁটি। খুব ভালো চোখ না থাকলে বোঝা শক্ত খাবারের রঙ আসল না নকল। তাছাড়া ঠাণ্ডা পানীয় বা টমাটো সস বা এমনি ধরনের কতকগুলো খাবারে অবধারিতভাবেই রঙ থেকে যায়। কৃত্রিম রঙ সবসময়েই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মারাত্মক রকমের।

এমনকি এই শীতকালেও, যখন টাটকা শাকসবজিতে বাজার আলো হয়ে থাকার কথা, বাজারে ঢুকলে দেখতে পাবেন রঙে চুবিয়ে কৃত্রিমভাবে 'টাটকা' করে তোলা শাক-সবজির সমারোহ। কড়াইশুঁটিতে তো বটেই, এমনকি কাঁচালঙ্কা ও উচ্ছেতে পর্যন্ত কৃত্রিম রঙের প্রলেপ দিয়ে স্বাভাবিকের জেল্লা ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। পটলের সময় এল বলে তখন তো বাজারে বাজারে সবুজ রংয়ের ঢল নামে—পটলের স্বাভাবিক সবুজ নয়, কৃত্রিম সবুজ। কাটাপোনা বা অন্যান্য কাটা-মাছ তো অনেক দিন থেকেই কৃত্রিম লালের দৌলতে তাজা মাছের কৌলিন্য পেয়ে আসছে। আলুর গায়েও মাঝে মাঝে রং চড়ে পাতিলেবুও পিছিয়ে নেই। ব্যাপারটা এমনই বিরাট ও ব্যাপক, আর প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে এমনই আগ্রাসী যে এমন দিনও আসতে পারে যখন বাজারে ঢুকে অকৃত্রিম রংয়ের কোনো কিছুর সাক্ষাৎ পাওয়াটাই বাসরঘরে নববধূকে আটপৌরে সাজে দেখতে পাওয়ার মতো বিস্ময়কর মনে হবে।

আর শুধু শাকসবজির বাজার কেন, মিষ্টির দোকানে আসুন। সন্দেশ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়—কত তার রং, কত ঢং। তদুপরি তবকদার। রাজভোগকে এখন আর সাদা চেহারায় রাজকীয় মনে করা হয় না। দই পর্যন্ত ক্ষেত্রবিশেষে গাঢ় বাদামী।

পানের দোকান রাজার গৌরব তবক-দারের। সেখানেও কৃত্রিম রং মিষ্টি মশলায়, কখনো কখনো সুপারিতে।

ঠাণ্ডা পানীয়ের দোকানে তো রংয়ের পর রং, কি তার বাহার তার গাঢ়ত্ব ম্যাংগো হলেই সবুজ, অরেঞ্জ হলেই কমলা, আসলকেও হার মানায়।

আসল রং কি আছে মাখনে? জ্যামে? জেলিতে? কদাচিৎ।

এমনিতেই যখন চক্রবৃদ্ধি হারে প্রচণ্ড-ভাবে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়ে চলেছে, সেটা দারুণ এক সংকটজনক পরিস্থিতি। দেশের বেশির ভাগ মানুষ খেতে পায় না অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের অবস্থা, কিন্তু কথাটা এতই রূঢ় শোনায় যে খানিকটা মোলায়েম করার জন্য আমরা বলে থাকি 'অপুষ্টি'), যেটুকু জোটাতে পারে তাতেও আবার প্রচুর ভেজাল (এমন কি বেবিফুডে ও ওষুধেও)। দেশে বড়ো রকমের বিপর্যয় ঘটাবার জন্য এই দুটি সমস্যাই যথেষ্ট। কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশে তদুপরি এক সমান বিপর্যয়-কর সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে খাদ্যদ্রব্যে কৃত্রিম রংয়ের ব্যবহার। বিপর্যয়কর সমস্যা এ-কারণে যে, যে-সব কৃত্রিম রং ব্যবহার করা হচ্ছে (দামে কিছুটা শস্তা হয় বলে) সেগুলো অনুমোদিত নয়, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে হলে - বিষবৎ। এমন ভয়ানক পরিস্থিতি এই দেশেও আগে কখনো হয়নি।

•

খাদ্যদ্রব্যে কৃত্রিম রং ব্যবহার করা চলবে না, কথাটা তা নয়। খাদ্যদ্রব্যকে আরও লোভ-নীয় ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কৃত্রিম রংয়ের প্রলেপ দেওয়ার রেওয়াজ বহু শতাব্দী ধরেই চলে আসছে। যেমন, পোলাও হলেই তার সঙ্গে চোখ-জুড়ানো ও জিভে-জল-জাগানো জাফরানি রং। তা হোক কিন্তু এই রং এমন হওয়া চাই যাতে কোনোক্রমেই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়। এ-কারণে রংয়ের পক্ষে একটা অনুমোদনের প্রয়োজন থেকে যায়। এটি সরকারী কর্তব্য এবং আমাদের দেশেও তা আছে।

ভারতে এমনি অনুমোদিত রং আছে দশটি—কোনোর্ট লাল, কোনোর্ট কমলা, কোনোর্ট হলুদ, কোনোর্ট নীল, কোনোর্ট সবুজ। রংগুলো যেহেতু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয় তাই অনায়াসেই ব্যবহার করা চলে। কিন্তু আমাদের দেশের মুনাফাবাজ লোক-ঠকানোতে-পটু বিবেকহীন ব্যবসা-দাররা স্বভাবতই হাত বাড়িয়ে থাকে দামে অপেক্ষাকৃত শস্তা রংয়ের দিকে, যেগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, অতএব অননু-মোদিত।

বাজারে চালু এই অননুমোদিত রং-গুলো হচ্ছে অরামাইন (হলুদ), ব্লু ভি-আর-এস (নীল), কংগো রেড, সুদান-২, সুদান-৩ (লাল), ম্যালাকাইট গ্রীন (সবুজ), মেটানিল ইয়েলো (হলুদ), অরেঞ্জ-২ (হলুদ থেকে কমলা) ও রোডামাইন বি (পাটল)। খাদ্যদ্রব্যে রং করার জন্য এই রং-গুলোই এখন সারা ভারত জুড়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। দামে শস্তা, তাই।

সারা দেশের মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে এ যে কি মারাত্মক ছিনিমিনি খেলা, এ-বিষয়ে আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষ [illegible] বিশেষ অবহিত বলে মনে হয় না। তবে কিছুকাল আগে পার্লামেন্টে আলোচনা উঠেছিল এবং ঘোষণা শোনা গিয়েছিল যে, অননুমোদিত রং ও তবকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে শিগগিরই নাকি অর্ডিন্যান্স জারি করা হবে। পরবর্তী [illegible] আর [illegible]

শোনা যাচ্ছে না। তবে ইতিমধ্যে লক্ষ্ণৌ-এর শিল্পগত বিষবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (ইনডাস্ট্রিয়াল টক্সিকোলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টার) বড়ো একটি কাজ করেছেন। তা হচ্ছে খাদ্যদ্রব্যে নিষিদ্ধ রংয়ের বিষয়ে একটি সমীক্ষা। 'সায়েন্স রিপোর্টার'-এর জানুয়ারি সংখ্যায় এই সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রবন্ধ লিখেছেন কেন্দ্রের দুই বিজ্ঞানী ডঃ এস কে খান্না ও ডঃ জি বি সিং। উক্ত প্রবন্ধ থেকে তথ্য উপস্থিত করে এই অতিশয় গুরুত্বের বিষয়টি সম্পর্কে বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের অবহিত করতে চাই। আশা করব, তাঁরা নিজেরা সজাগ ও সক্রিয় হবেন, জানাশোনা অন্য সকলকেও করে তুলবেন, সম্ভব হলে এমন এক আন্দোলন সৃষ্টি করবেন যাতে রং-করা খাদ্য সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয় এবং স্বাভাবিক রংয়েই খাদ্যদ্রব্য সম্মানীয় হয়ে ওঠে।

•

লক্ষ্ণৌয়ের শিল্পগত বিষবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র খাদ্যদ্রব্যে কৃত্রিম রং পরীক্ষা করে দেখার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল ১২,৫৭৫টি, সবই উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে। পরীক্ষায় দেখা যায়, ৩,৭৭৫টি নমুনায় রং অনুমোদিত, বাকি ৮,৮২০টি নমুনায় অননুমোদিত বা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

অননুমোদিত রং চড়ানো ক্ষতিকর নমুনাগুলোকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করে দেখানো চলে।

দুগ্ধজাত সামগ্রী : মিষ্টির দোকানে লভ্য সমস্ত রকমের রং-করা খাদ্যদ্রব্যকে (আইসক্রীম সমেত) এই পরীক্ষার আওতায় আনা হয়। এই বিভাগে নমুনার সংখ্যা ছিল ১,১৫৪টি, তার মধ্যে অনুমোদিত রং পাওয়া গিয়েছে ৪৯৮টিতে, অননুমোদিত রং ৬৫৬টিতে। অর্থাৎ মিষ্টির দোকানের রং-করা খাদ্যদ্রব্যের ৫৭ শতাংশই ছিল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

অ-দুগ্ধজাত সামগ্রী : এই বিভাগে ছিল ময়দা, সুজি বেসন থেকে তৈরী রং-করা খাদ্যদ্রব্য (নিমকি, জিলাপি ইত্যাদি)। নমুনার সংখ্যা ছিল ৬,২৮২, তার মধ্যে অনুমোদিত রং পাওয়া গিয়েছিল মাত্র ১,০২১টিতে, বাদবাকি ৫,২৬১টিতেই অননুমোদিত বা নিষিদ্ধ রং। তার মানে, ময়দা, সুজি বেসন দিয়ে তৈরী রং-করা খাদ্যদ্রব্যের ৮৩ শতাংশই ছিল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

ডাল : এই বিভাগে নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছিল অড়হর ইত্যাদি ডাল এবং ছোলা বাদাম ইত্যাদি। নমুনার সংখ্যা ছিল ৯৪০টি। অনুমোদিত রং একটিতেও পাওয়া যায়নি। তার মানে, এই বিভাগের প্রত্যেকটি নমুনা ছিল (নিষিদ্ধ রং থাকার দরুন) স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। বিশ্লেষণ-এর ফলাফল এইরকম : মেটানিল ইয়েলো (হলুদ) ৯৯ শতাংশ নমুনায়, আর বাদবাকি ৩ শতাংশে অরামাইন, ব্লু ভি-আর-এস, অরেঞ্জ-২ ও রোডামাইন বি। নিষিদ্ধ রং সবচেয়ে বেশি ছিল অড়হর ডালে—মেটানিল ইয়েলোর সাহায্যে ঝকঝকে হলুদ করে তোলা। অন্যদিকে শুকিয়ে যাওয়া সাদা মটরদানা লাভ করেছিল সতেজ সবুজ—এক্ষেত্রে কৃত্রিম রং হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল হলুদ ও ব্লু ভি-আর-এস।

বিবিধ : এই বিভাগে ছিল চিনি থেকে তৈরী খাদ্যদ্রব্য, সাধারণ মিঠাই, ঠাণ্ডা পানীয়, মদ্য ও সুরা, চা, মশলা, গুঁড়া-মশলা, আচার, চাটনি, কাসুন্দি ইত্যাদি। রং-করা নমুনার সংখ্যা ছিল ৪,২৯৯টি, তার মধ্যে ২,২৩৬টিতে অনুমোদিত রং, ২,০৬৩টিতে অননুমোদিত। অর্থাৎ ৪৮ শতাংশ খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকর রং।

লজেন্স মিঠাই মালাই বরফ জাফরান সাবুর পাঁপড় পানের মশলা জর্দা হিং ও এমনি ধরনের আরো অনেক কিছুতেই নিষিদ্ধ রং পাওয়া গিয়েছে। যেমন, গুঁড়ো লঙ্কায় সুদান-২ বা সুদান-৩ বা কঙ্গো লাল। তবে সোডা লেমনেড ইত্যাদি, চা, দেশী মদ, টমাটো সস ও এমনি আরো কতকগুলোতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল অনুমোদিত রং। তবুও একটি কথা বলার আছে—চা ও দেশী মদ বিনা রংয়েই বাজারে আসা উচিত, অন্তত এই দুটি সামগ্রীতে রং মেশাবার অনুমতি নেই।

মোট হিসেব ধরলে রং-করা খাদ্যদ্রব্যের ৭০ শতাংশে নিষিদ্ধ রং, ৩০ শতাংশে অনুমোদিত রং। আঠারো রকমের নিষিদ্ধ রঙের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করা হয় মেটানিল ইয়েলো ২৯ শতাংশ, অরেঞ্জ-২ ১১ শতাংশ, অরামাইন ৯ শতাংশ, রোডামাইন বি ৮ শতাংশ, ব্লু ভি আর-এস ৬ শতাংশ ও ম্যালাকাইট গ্রীন ৪ শতাংশ। হিসেব এখানেই শেষ নয়, নিষিদ্ধ রং আছে আরো কয়েক প্রকারের—যেমন রেড ৬বি, সুদান-২, সুদান-৩, কঙ্গো রেড, মিথাইল ভায়োলেট, বাটার ইয়েলো, অ্যাসিড ম্যাজেন্টা ইত্যাদি ইত্যাদি।

*

খাদ্যদ্রব্যে যতো রকমের নিষিদ্ধ রং ব্যবহার করা হয় সেগুলো সবই অতীব বিষাক্ত। জন্তু-জানোয়ারের ওপরে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে এই সমস্ত রং শরীরের কোন-না-কোন ক্ষতি করেই থাকে। যেমন ধরা যাক অরেঞ্জ ২, অরামাইন, রোডামাইন বি, ব্লু ভি-আর-এস, ম্যালাকাইট গ্রীন ও সুদান-৩। এগুলো সবই নিষিদ্ধ রং কিন্তু তা সত্ত্বেও খাদ্যদ্রব্যে বহুভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পরীক্ষা কার্য থেকে জানা যায় এই রংগুলো শরীরের ভিতরকার কতকগুলো জরুরী অঙ্গ (যথা, কিডনি বা বৃক্ক সংলগ্ন বা প্লীহা, লিভার বা যকৃৎ) বিশেষ রকমের ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। কঙ্গো রেড প্রয়োগ করে দেখা গিয়েছে মস্তিষ্ক কিডনী ও চক্ষু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার ফলে জটিল কতকগুলো রোগের আক্রমণ ঘটতে পারে, এমন কি চক্ষুরোগ গ্লুকোমাও। অরামাইন রোডামাইন বি ও ব্লু ভি-আর-এস থেকে ক্যান্সার হওয়া অসম্ভব নয়। ম্যালাকাইট গ্রীন থেকে ফুসফুস বক্ষ ও লিভারের টিউমার হতে পারে এবং চামড়া হাড় ও ফুসফুসের নানা রকম পীড়া। লেড ক্রোমেট থেকে ঘটতে পারে রক্তশূন্যতা, অসাড়ত্ব ও ভ্রূণনাশ।

নিষিদ্ধ রংয়ের মধ্যে সবচেয়ে বহুল ব্যবহার মেটানিল ইয়েলো নামক হলুদ রংটির। নানা রকমের মিঠাইয়ে, জেলিতে, খাবারে দানা শস্যের রান্নায়, আচার ইত্যাদিতে চটকদার চেহারা আনবার জন্য এই রংটিই প্রচলিত। পরীক্ষাকার্যে দেখা গিয়েছে, এই রংয়ের প্রয়োগে অণ্ডকোষের ক্রিয়া ব্যাহত হয়।

অন্য দিকে এমন কি অনুমোদিত রংও কখনো কখনো বিপদের কারণ হতে পারে। যেমন একটি অনুমোদিত রংকে বলা হয় অ্যামারান্ট লাল রং করার জন্য যার প্রচলন রীতিমত ব্যাপক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ভেষজ প্রশাসনের হিসাব থেকে জানা যায় বিশ্বের ষাটেরও অধিক দেশে খাদ্যে ওষুধে ও প্রসাধনে এই লাল রংটি প্রতি বছর ব্যবহৃত হয় প্রায় ৭৫ লক্ষ কিলোগ্রাম পরিমাণ। সেই ১৯৫৩ সালেই দুজন বিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে জানা গিয়েছিল যে, জন্তু-জানোয়ারের খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মাত্র ৪ শতাংশ পরিমাণে এই রংটি থাকার ফলে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার দেখা দিয়েছিল। মস্কোর পুষ্টি ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ, এই রংটির প্রয়োগে ইঁদুরেরা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, আরও ধরা পড়েছে প্রজনন-শক্তি হ্রাস, মৃত ছানা প্রসব ইত্যাদি ধরনের কতকগুলো মারাত্মক লক্ষণ।

অনুমোদিত অন্যান্য রং নিয়েও বিশ্বের নানা দেশে নানা রকমের পরীক্ষা হয়েছে। এখন বিজ্ঞানীদের মোটামুটি সিদ্ধান্ত এই, মাত্রাতিরিক্ত ঘন অবস্থায় ব্যবহৃত হলে অনুমোদিত রংও জটিল ও প্রায় দুরারোগ্য বিবিধ রোগের কারণ হতে পারে।

•

আর, যে-কথা বলেছি, ব্যক্তিগতভাবেও প্রত্যেককে সজাগ ও সক্রিয় হতে হবে। সব সময়ে মনে রাখবেন, রং-করা খাদ্য গ্রহণ করা ও বিষ খাওয়া একই কথা। বাজারে শাক-সবজি কেনার আগে ভালো করে দেখে নেবেন তার রং স্বাভাবিক কিনা। গুঁড়ো মশলা ব্যবহার না করাই ভালো। ডাল ইত্যাদি রান্না করার আগে ভালো করে ধুয়ে নেবেন। রং-করা সন্দেশ ভুলেও মুখে দেবেন না। তবকদার সন্দেশ বা পানের তবকটি অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ঠাণ্ডা পানীয় যদি খেতেই হয় তো স্বাভাবিক সাদা রংয়ের অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের কৃত্রিম রংকে ভয় করে চলবেন, তা থেকে যতো দূরে থাকতে পারবেন ততোই মঙ্গল। আর সব সময়ে মনে রাখবেন, বিশেষ করে আমাদের দেশে খাদ্যদ্রব্যকে লোভনীয় ও আকর্ষণীয় করার জন্য নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর রংয়ের ব্যবহারই বেশি—সেগুলো শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হলে কিছু না কিছু ক্ষতি করবেই। তবে এমনকি অনুমোদিত রংও অত্যধিক ঘনত্বের হলে সমান বা কখনো কখনো ততোধিক ক্ষতিকর।

—অয়স্কান্ত

উপন্যাস

শেষ বাসর

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

[বৃদ্ধ বঙ্কিম দত্ত অমিয়কে নিজের হাতে করে মনের মত গড়েছেন। কিন্তু এক এক সময় তাঁর মনে হয় সেই অমিয়ও যেন কেমন পাল্টে যাচ্ছে। তাঁর কথায় প্রতিবাদ করে নিজের মতকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করে। যেন মনে হয় অমিয় তাঁকেই অস্বীকার করার চেষ্টা করছে ইদানীং। তাই নাতি রঞ্জুকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেন। তাকে নিজের মত করে গড়তে চান।

কিন্তু সেই রঞ্জুই দাদুর ব্যবহারে বিস্মিত। বাবা অমিয়র এক গরীব পুরনো বন্ধু তাদের বাড়িতে আসায় দাদুর অবহেলা এবং উষ্মার প্রকাশ দেখে তার খুব খারাপ লাগল। না হয় দাদু সারা জীবন জজিয়তি করেছে আর তার বাবা বার-এ্যাট-ল। আর ঐ লোকটা ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষ। রঞ্জুর এটা ভালো লাগে নি।

অথচ ঐ মানুষটাই তাকে বিপ্লবীদের কত গল্প শুনিয়েছে। শুনতে শুনতে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া যত দিন যাচ্ছে ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে, রঞ্জু অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। বঙ্কিম দত্ত যা চান রঞ্জু তা নয়। তার চিন্তার জগৎ পরিবেশ সবই স্বতন্ত্র। আর যূঁইদি এসে যেন ষোল বছরের রঞ্জুর মানসিক জগৎকে পর্যন্ত আমূল পাল্টে দিয়েছে। বিবাহিতা যূঁইদি যেন তাকে কাঁচপোকার মত আকর্ষণ করছে। বঙ্কিমবাবুর মত কি অমিয়ই হতে পেরেছে? শুধু একটা ভয় তার বাবার মতই। তার বন্ধু রুদ্রেন্দু গরীব এবং বিপ্লবী মেজাজের বলে তাকে সেও এড়িয়ে চলতে চায় ভয় করে।]

(আঠারো)

ট্রামটা সরে গেল।

রুদ্রেন্দুর মূর্তিটা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কেমন গোঁয়ো গোঁয়ো দেখায় লোকটাকে এ-পাড়ায়।

যেন অমিয় হঠাৎ লজ্জা পান। আড়-চোখে টুটুন ও টুটুলের বন্ধুদের দিকে তাকান একবার।

তাই তো হঠাৎ কাকে দেখে তিনি এভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন! ছেঁড়া-ময়লা পোশাক পরা মানুষটাই বা কে! টুটুন অবশ্য চিনে থাকবে। বাড়িতে রুদ্রেন্দুকে সেদিন দেখেছিল। কিন্তু ওর বন্ধুরা তো রুদ্রেন্দুকে চেনে না। টুটুনের বাবা ভিখিরির চেহারার ঐ মানুষটার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল দেখে তারা নিশ্চয় খুব অবাক হয়েছে।

মেয়েদের মনের ভাবটা লক্ষ্য করতে চোখ আড় করে অমিয় এক-একটি মুখ দেখেন আর চাপা লজ্জা নিয়েও মিটিমিটি হাসেন।

রুদ্রেন্দুর পরিচয় পেলে এরা কি খুব একটা অবাক হবে অমিয় চিন্তা করেন এরা ইংরেজ রাজত্ব দেখেনি দেশের অবস্থা তখন কেমন ছিল তাও জানে না ইংরেজ তাড়াবার জন্য কিছু লোক বোমা পিস্তল ধরেছিল—ব্যস এই পর্যন্ত ওরা শুনেছে এবং স্কুল-টুলের ইতিহাস বইয়েও ঐ একটা চ্যাপ্টার ছোট করে আজকাল জুড়ে দেওয়া হচ্ছে—কিন্তু এই নিয়ে পড়ুয়াদের যে খুব একটা কৌতূহল আছে অমিয় বিশ্বাস করেন না। মরা জিনিস নিয়ে অতীত নিয়ে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কতটা কৌতূহলই বা থাকতে পারে!

কিন্তু সেটা কথা নয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ক্ষুদিরামের নাম শুনেছে রেডিওতে 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গান শুনেছে বাঘা যতীনের নাম শুনেছে বিনয়-বাদল-দীনেশের নামও কেউ কেউ নিশ্চয় শুনেছে এবং তাদের স্ট্যাচুট্যাচুও কলকাতার এখানে সেখানে দেখে থাকবে। সেসব আলাদা জিনিস। যেমন নেতাজীর নাম শোনেনি বা তাঁর ছবি কি শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে অত বড় মূর্তিটা দেখেনি এমন ছেলেমেয়ে খুব কম আছে। আর নেতাজী-স্টেডিয়াম তো তাদের মুখে মুখে।

এবং এই জন্য এসব বিপ্লবীদের সম্পর্কে বাচ্চাদের মনে একটা শ্রদ্ধার ভাব পুজো-পুজো ভাব তৈরী হয়ে গেছে। কিন্তু এখন যদি এরা হুট করে শোনে যে রুদ্রেন্দুও একজন সেই আমলের বিপ্লবী ছিল আর সঙ্গে সঙ্গে তারা তার এই না খাওয়া কাকলাশ মূর্তি ও পোশাকের ছিরি দেখে তো সব কটা মেয়ে নির্ঘাৎ হেসে খুন হবে। রুদ্রেন্দুরা তাদের যুগটাকে ঘটা করে 'অগ্নি-যুগ' বলে না! এখন সেই যুগের প্রতিনিধি হিসেবে যদি রুদ্রেন্দুর মতন একটা মার খাওয়া মরা মানুষকে এনে এযুগের ছেলেমেয়েদের চোখের সামনে দাঁড় করান যায় তো সেই যুগটা সম্পর্কেই বা তাদের মনের ভাবটা কেমন দাঁড়াবে চিন্তা করে অমিয় ভিতরে ভিতরে একটু অস্বস্তি বোধও করেন বৈকি।

তাই চিন্তা করছিলেন এভাবে এখানে রুদ্রেন্দু যদি তাঁকে দেখতে না পেত ভালই হত। যেমন একদিন রাত্রে তাঁদের মফঃস্বল শহরের রাস্তায় পাশাপাশি হেঁটে গিয়েও রুদ্রেন্দু তাকে দেখতে পায়নি চিনতে পারেনি।

হুঁ টুটুনরা থমকে দাঁড়িয়েছে। জ্যোৎস্না নেই রাস্তার গাড়ি-ঘোড়ার ও চারদিকের বাড়ির আলোটালো ছিটকে এসে ঝুপসি বকুল গাছটার মাথায় পড়েছে। ফলে পাতার ফাঁক দিয়ে চিকরি-কাটা চাঁদের আলোর মতন ওদের কচি মুখে মাথায় ও গায়ে বিচিত্র আলপনা তৈরী করেছে। ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে।

সত্যি বলতে কি ওরা কেমন কলকাকলিতে গল্প করে এতক্ষণ পথ হাঁটছিল। এখন সব চুপ। যেন হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল। তা ছাড়া কি। অমিয় চিন্তা করেন সারাটা দুপুর বিকেল একটা কবিতার মতন গানের মতন কেটেছে ওদের। বোটানিকস-এর বন-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ওরা আজ কত পাখি দেখল পাখির গান শুনেছে শিস শুনেছে। বনের ভিতর রোদ্দুরের রং ফেরা দেখেছে কত গাছের পাতার সরসর শব্দ শুনেছে। পোকা মাকড় দেখেছে। অমিয় প্রায় সব সময় ওদের সঙ্গে ছিলেন। বয়স হয়েছে। হাঁপিয়ে উঠেছেন মাঝে মাঝে সন্দেহ কি। কাঁচাকাঁচা কিশোরীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কত আর ছুটোছুটি করতে পারেন।

তা হলেও তো করেছেন। কারণ তিনি সঙ্গে না থাকলে ওদের হরেকরকম পাখি চিনিয়ে দিত কে। মাঝে মাঝে ক্লান্ত এলেও মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্লান্তিটা

ফুলটা ঝেড়ে ফেলতে তিনি দেরি করেননি। না এখনও এদের সকলের গায়ে বনের গন্ধ বাদুরের গন্ধ লেগে আছে। চোখে চোখে বেরঙের পাখির স্বপ্ন। তাছাড়া এরা জেরাও যে এক একটি পাখি। সোনালী ফ্লাট সাতনরী ফ্লোমিংগো ঝকঝকে-টোঁর ফটিকজল চন্দনা টুনি কাকাতুয়া জন।

কাজেই কবিতার সুতটা কেটে যেতে মন যেন জবুথবু হয়ে গিয়ে পাখির একটা গাড়িয়াহাট রোডের এই বুনোশিস বকুল ছটার নিচে এখন এমন চোখ করে তাকিয়ে আছে যেন দূরে কোথাও বন্দুকের শব্দ শুনতে পেয়েছে ওরা যেন এই মুহূর্তে সাদাক কিছু ব্যাপার ঘটবে। এই জন্য ওরা নাটেই তৈরী নয়।

মুখগুলির দিকে তাকিয়ে অমিয়র কষ্ট হল। উপায় কি! নিজের মনে বললেন তিনি পৃথিবীতে চলতে ফিরতে মাঝে মধ্যে রুদ্রেন্দুর মতন খাপছাড়া কিম্ভুত চেহারার এক একটা চেহারার সামনে পড়ে যেতে হয়। তখন মনে হয় এই জগতে গান কবিতা সাতে কিছুই নেই। সবটাই নীরস খটখটে মাত্র। মনে হয় তখন বেঁচে থেকে বুঝি জীবনে আর সুখ নেই।

ট্রামটা সরে গেল। রুদ্রেন্দু ট্রাম লাইনের উঁচু জমি ডিঙিয়ে নিচের ফ্ল্যাট সড়কে নামল। কিন্তু আবার তাকে উজবুকের চেহারা করে দাঁড়াতে হয়। দুদিক থেকে দুটো নেকড়ের মতন গোঁ গোঁ আওয়াজ করে দুটো মিনি বাস ছুটে আসছে।

কলকাতার রাস্তা পার হওয়ার কত জ্বালা বোঝ চাঁদ। কেন মরতে আস তুমি রুদ্রেন্দু এ-পাড়ায়। অমিয় মনে মনে বলেন। এটা তোমার দমদম নাগেরবাজার দত্তপুকুর সেনপুকুর নয়। যার নাম বালিগঞ্জ প্রতি মিনিটে বিশেষ করে এই সন্ধ্যে সওয়া ছটায় এসব রাস্তায় সওয়া লক্ষ ট্যাকসি প্রাইভেট গাড়ি ছুটোছুটি করে। তার ওপর আছে ট্রাম-বাস। দেখছ তো কেবল যে অফিস আদালত সেরে মানুষ এখন ঘরে ফিরছে তা নয়। আরও সোওয়া লক্ষ মানুষ-মানুষী টাইস্যুট পরে রংবেরঙের শাড়ি বেলবটস ম্যাকসি লুঙ্গির জেল্লা ছড়িয়ে সবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। অফিস আদালত ছাড়াও অনেক কাজ থাকে এপাড়ার পুরুষ ও মেয়েদের। এখন কেনাকাটা আছে সিনেমা থিয়েটার বার রেস্তোরাঁয় যাওয়া হবে ক্লাব কালচারাল সেমিনার ধর্ম-সভায় যোগ দেওয়া আছে। বালিগঞ্জের মানুষের কাজের ফিরিস্তি দিতে গেলে রাত পুইয়ে যাবে রুদ্রেন্দু। দ্যাখো আবার একটা প্রাইভেট এসে যাচ্ছে। এখানে চাপা পড়লে কেউ তোমার জন্য শোক করবে না চোখের জল ফেলবে না। প্রাক্তন বিপ্লবী হিসেবে দমদমের মানুষ তোমার নাম নিয়ে কতটা হৈ-চৈ করবে সেটা তুমি জান। আমি বলতে পারব না। এখানে তুমি অজ্ঞাতকুলশীল। চাপা পড়লে লোকে ভাববে শহরের একজন বেকার কাঙাল বা উপোসকাপাসের হাত থেকে একটি ভিক্ষুক রক্ষা পেল।

—দুটো বাস দুদিকে সরে গেল। রুদ্রেন্দু আবার লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোয়। অমিয়র চোখ দুটো গোল হয়ে যায়। সেদিন তবু ছেঁড়া-খোঁড়া এক জোড়া চটি পায় ছিল। আজ রুদ্রেন্দু একেবারে নগ্নপদ। চটিটা আর চলছিল না। অমিয় চিন্তা করলেন। বাড়িতে রেখে এসেছে না কি রাস্তায় কোথাও ফেলে দিতে হয়েছে।

—কি খবর! আজ আবার এখানে?

—হুঁ আজ তিন দিন ধরে তোমাদের বাবুপাড়ায় হাঁটাহাঁটি করছি। রুদ্রেন্দু হাসল। তুমি? কোথায় গিয়েছিলে—প্রশ্ন করতে গিয়ে রুদ্রেন্দু থমকে যায়। গন্ডের মেয়ে অমিয়র পিছনে দাঁড়িয়ে। ফরসা সুন্দর সুন্দর চেহারা। দামী দামী পোশাক। কালো ঝকঝকে চোখ। রুদ্রেন্দুর মনে হল এক ঝাঁক ভোমরা অবাক হয়ে তাকে দেখছে। মুখটা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল সে।

নিশ্চয় নিজের এই দরিদ্র বেশভূষা ও ভিক্ষুক ভিক্ষুক চেহারাটার জন্য রুদ্রেন্দু লজ্জা পেল। চিন্তা করে অমিয় অল্প শব্দ করে হাসলেন।

—আরে এদিকে তাকাও এদের দেখে লজ্জা পাবার কিছু নেই আমার মেয়ে মেয়ের বান্ধবী এরা।

—অ তাই বুঝি। বেশ ভাল ভাল।

—রুদ্রেন্দু ঘাড় ফেরাল। মেয়েদের দিকে না অমিয়র দিকে চোখ দুটো ধরে রাখল। বেড়াতে বেরিয়েছিলে সবাইকে নিয়ে বুঝি? প্রশ্ন করল সে।

—উঁহু বিপ্লব করতে বেরিয়েছি সেই যে ব্রিটিশ আমলে তোমরা করতে বোমা পিস্তল নিয়ে টেররিজম। —অমিয় আস্তে আস্তে বললেন।

কেমন যেন বোকা বোকা চোখ করে রুদ্রেন্দু অমিয়র মুখের দিকে তাকায়।

—কি হল! বুঝতে পারছ না? অমিয় এবার নাকে হাসেন। মাথাটা সামান্য ঝাঁকান। টুটুনদের দিকে চোখ ফেরান তারপর আবার রুদ্রেন্দুকে দেখেন। সেদিন তোমাদের দলে ছেলেরা ছিল কচি কচি অনেক মেয়েও তো রিক্রুট করেছিলে হে মনে নেই? যমুনা রেবা গায়ত্রী কুন্তলা উজ্জ্বলা—আমার বেশ মনে আছে নামগুলো। আমিও এদের রিক্রুট করেছি হি-হি। হেসে থুতনি নেড়ে অমিয় টুটুনদের দেখান। তারপর টেনে টেনে হাসেন।

—রগড় করছ তাই না বন্ধু। রুদ্রেন্দু বিব্রত বোধ করে।

—আরে না না। রগড় বলছ কি! আমি সিরিয়াস। তুমিও আমাদের বিপ্লবী দলে যোগ দিতে পার দেবে?

—না রে ভাই সেই আগুন কি আর ভেতরে আছে। সেই সামর্থই বা কোথায় বুড়ো হতে চলেছি যে। রুদ্রেন্দু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—অ, বুড়ো হতে চলেছ। তাই আগুন আর জ্বলছে না। অমিয় ঘাড় বেঁকিয়ে আর একবার মেয়েদের দেখেন ও চোখ টেপেন তারপর আবার রুদ্রেন্দুর দিকে তাকান।—তা হলে বলছ জোয়ান বয়েস থাকলে আগুনটা দাউ দাউ করে উঠত যদি বা বয়স ফিরে পেতে আবার একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধিয়ে দিতে। কেমন?

—উঁহু আর না। রুদ্রেন্দু দু হাত কপালে ঠেকায়। অনেক হয়েছে অনেক করেছি এখন আর—

—সে কি! রুদ্রেন্দুকে শেষ করতে দেন না অমিয় যেন আকাশ থেকে পড়ার চেহারা করে। —বিপ্লবে অরুচি ধরেছে? অগ্নিযুগের রুদ্রেন্দুকে কোনো পুরস্কার-টুরস্কার দিলে না বুঝি দেশের লোক।

—ঢের দিয়েছে অনেক পুরস্কার পেয়েছি। এবার রুদ্রেন্দু কেমন করে যেন হাসল। বলল অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ ভাই। বুকে আঙুল ঠেকিয়ে রুদ্রেন্দু নিজের ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড় ও সেই সঙ্গে না-খেতে-পাওয়া চিমসান শরীরটা দেখায়।

অমিয় বুঝি ভিতরে ভিতরে খুশী হন। নিশ্চিন্তও হন কম না। রুদ্রেন্দু সেখানেই থামছিল না। —কী দুরবস্থায় পড়েছি তোমাকে বলেছি সেদিন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছিলে। চোখেও দেখছি। রুদ্রেন্দুর জীর্ণ পোশাক ও শুকনো শরীরটার দিকে নতুন করে চোখ বুলোন অমিয়। কিন্তু তাঁর গলায় ঠাট্টাটা তখনও চলকে চলকে উঠছিল। —কি জানি আমি ভাবলাম বিপ্লবীরা ভাঙে তো মচকায় না। ইংরেজ চলে গেছে স্বাধীন হয়ে আমরা বেকার সমস্যা খাদ্য সমস্যা রোগের সমস্যা ভেজালের সমস্যা স্মাগলিং-এর সমস্যায় নাকেহাল হয়ে গেছি। রুদ্রেন্দুরা বুঝি নতুন করে রেভোলিউশনের স্বপ্ন দেখছে। আবার আগুনটাগুন জ্বালাবে।

—না রে ভাই আগুনের আর ছিটে-ফোঁটাও আমার মধ্যে নেই। বলেছি আমি এখন তেজা ছেঁড়া কাঁথা। সুতোটুতো বেরিয়ে পড়েছে। হা-হা। রুদ্রেন্দু হাসল।

মেয়েরাও খিলখিল হেসে ফেলল। অমিয়র পিছনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ টিপে টিপে হাসছিল তারাই এখন রুদ্রেন্দুর কথায় তাদের কচি ঠোঁট ও গাল বেয়ে ফোয়ারার মতন হাসি উপচে পড়ল।

যাক গে! মরাকে আর ঘা দিয়ে লাভ নেই। অমিয় চিন্তা করলেন। একটা আর-শোলাও রুদ্রেন্দুর চেয়ে বেশি তেজ রাগে জোরে কামড় বসায় রুদ্রেন্দু একতাল কাদা-মাটি। আর অমিয়র বাবা বঙ্কিমবাবু কিনা কত সব উদ্ভট চিন্তা করছিলেন এই মানুষটাকে নিয়ে। রুদ্রেন্দু নকশাল হয়েছে। আগের চেয়েও ডেঞ্জারাস হয়েছে সে। গলার সুরটা এখন সুন্দরভাবে বদলে ফেললেন অমিয়—হুঁ একটু ঠাট্টা-মস্করা করছিলাম ভাই ঠিকই ধরেছ এখন কাজের কথায় এসো। বলছ আমাদের বালিগঞ্জের বাবুপাড়ায় কদিন ধরে ছুটো-ছুটি করছ ব্যাপারটা কি শুনি? নিশ্চয় আমাকে বলতে তোমার আপত্তি নেই।

—বলব দেখা হয়ে গেল যখন সবই বলছি তোমাকে। রুদ্রেন্দু রাস্তার [illegible]

ঘাড় ফেরাল। হঠাৎ তাকে একটু চিন্তাগ্রস্ত হতে দেখা যায় খানিকটা যেন অন্যমনস্ক।

—কি হল ভাই! কাউকে খুঁজছ? অমিয় প্রশ্ন করেন।

—আরে মেয়েটা যে সঙ্গে এসেছে। ঘাড় ফিরিয়ে রুদ্রেন্দু অমিয়র চোখে চোখ রাখল।

—তোমার মেয়ে! উৎসাহে অমিয়বাবুর দু'চোখ গোল হয়ে উঠল। কি জানি নাম বলেছিলে? হ্যাঁ মনে পড়েছে কুন্দ—কুন্দ—সেই বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনী। বিষবৃক্ষ তুমি পড়েছিলে রুদ্রেন্দু?

—মনে নেই। পড়েছিলাম যেন। রুদ্রেন্দু অল্প হাসল।

—তারপর? কোথায় তোমার মেয়ে? কার কাছে আবার ওকে রেখে এসেছ? কোথায় ফেলে এলে? অমিয় ব্যস্ত হয়ে রাস্তার দিকে চোখ ফেরালেন।

—না না এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই, কোথাও ফেলে আসিনি। রুদ্রেন্দু আস্তে বলল। মেয়ের নাম করতেই তার ব্যারিস্টার বন্ধু কী রকম চঞ্চল উত্তেজিত হয়ে উঠল লক্ষ্য করে তার ঠোঁটের আগায় একটু হাসি উঁকি দিল। কিন্তু মনে মনে সে অবাক হল ঢের বেশি। আর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তাটা দেখে নিয়ে অমিয়র মুখের দিকে তাকাল রুদ্রেন্দু।

—ঐ যে তোমাদের ওদিকটায় একটা ডিসপেনসারী আছে কি যেন নাম, হ্যাঁ, চক্রবর্তী ক্লিনিক আর একদিন ঢুকেছিলাম ওখানে তখন দুপুর ভিড় মোটে ছিল না, আজ একেবারে লম্বা লাইন পড়ে গেছে কাউন্টারে। অফিস-ফেরতা মানুষের ভিড়। কুন্দকে বললাম তোর দাদুর ওষুধটা এখান থেকে কিনে নে আমাদের দমদমের দোকানে আবার সব সময় ওটা পাওয়া যায় না।

—তাই বল ওষুধের দোকানে রেখে এসেছ মেয়েকে। কেন একসঙ্গে দোকান থেকে বেরোতে দোষ ছিল কি। একা একা মেয়েটা ঐ ভিড়ের মধ্যে আরো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে কে জানে। এই জন্যে তোমার আর কাণ্ডজ্ঞান হল না।

—আরে আসবে আসবে। ভদ্রপাড়ার দোকান। দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ওই তো রাস্তার ওপার, এখান থেকে প্রায় দেখা যায় ডিসপেনসারী।

—হুঁ দেখা যায় সে তো আমিও জানি। চক্রবর্তী ক্লিনিক আমি চিনি। ভেংচি কাটার মতন চেহারা করলেন অমিয়। তোমার মেয়েকে ছোঁ মেরে ওখান থেকে কেউ তুলেও নিচ্ছে না ঠিক। তবু যেমন বে-তোয়াক্কা গাড়িঘোড়া ছুটোছুটি করে এসব রাস্তায়—একলা বেচারা রাস্তা পার হয় কি করে!

বন্ধুর ধমক খেয়ে রুদ্রেন্দু বিস্মিত বোধ [illegible]। একটু যেন [illegible] পায়। ঘাড় ঘুরিয়ে ড্যাবড্যাব চোখে আবার রাস্তাটা দেখে।

—অ্যাঁ দু-দশ মিনিট অপেক্ষা করতে পারতে তুমি দোকানে। ওষুধটা কেনা হয়ে যেত তারপর একসঙ্গে দুজন বেরোলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হত না। রাগে অমিয় গজরাতে থাকেন।

—হঠাৎ তোমাকে দেখলাম কিনা ক্লিনিকের দরজা থেকে। বিড়বিড়িয়ে রুদ্রেন্দু বলল তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। কি জানি তোমাকে যদি ধরতে না পারি।

—তোমাকে যদি ধরতে না পারি! অমিয়বাবু এবার বড় করে ভেংচি কাটলেন। তাই তো বলি তোমাদের রেভোলিউশনারি পার্টির লোকগুলোর মাথায় কতটা ভাল পদার্থ আছে জানি না, তবে গোবরের পরিমাণটা যে অনেক বেশি তাতে সন্দেহ নেই। এখানে আমি বেশি না তোমার মেয়ে বেশি? কি রকম ট্র্যাফিকের চাপ। এটা তোমার দমদমের রাস্তা না। দেখি কোথায় তোমার মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে চল। ফুটপাথ ছেড়ে অমিয় বুঝি তখনি রাস্তায় পা বাড়াল।

—উঁহু যেতে হবে না রুদ্রেন্দু খপ্ করে অমিয়র হাত চেপে ধরল। এসে গেছে ঐ দেখা যাচ্ছে, ঐ যে আসছে ও। ঐ ওদিককার লাইটপোস্টটা পার হয়ে এল। হুঁ এখন রিকশটার আড়ালে পড়ে গেল কুন্দ।

অমিয়বাবুর চোখে পলক পড়ছিল না। রুদ্ধশ্বাস। রাস্তার দিকে তাঁর মুখটা ফেরানো হঠাৎ খুশি হন তিনি। চোখ বড় করেন। রিকশা সরে যেতে রুদ্রেন্দুর মেয়েকে দেখতে পান।

—এই যে গোপা টুটুন রুমী চামেলী—অমিয় রীতিমত চেঁচিয়ে ওঠেন। ভাল করে তাকিয়ে দ্যাখো তোমরা কেমন আশ্চর্য ফুটফুটে ঐ মেয়েটি, রুদ্রেন্দুর মেয়ে বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে? কক্‌খনো করে না। যেমন বদখৎ কেলেকুচ্ছিত একখানা চেহারা রুদ্রেন্দুর ওর দমদমের বাড়িতে ঐ মেয়েকে প্রথম দেখে আমার ভয়ানক মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রুদ্রেন্দুর মতন চাষাড়ে চোয়াড়ে চেহারার একটা মানুষকে ওর 'বাবা' ডাকতে হয়। কেমন ফাইন বডি দেখছ হাঁটার নমুনাটা দ্যাখো কত গ্রেস-ফুল। বাড়ির লোকে ওর কুন্দ নাম রেখেছে—আমি হলে 'লিলি' বলে ডাকতাম, লীলাগার্ল লিলি বা প্রিমরোজ অথবা 'ডেসমোডিয়াম' বা 'কমেলিনা ক্লাভাটা'—আর যদি দেশী ফুলের নাম ধরে ডাকতে হয় তো মল্লিকা—উঁহু সীতা ঝুমকো—ঝুমকো খুব লাগসই নাম হয় ওর। আর যদি পাখির নাম দেই? তোমরা চুপ করে আছ কেন গোপা টুটুন—আমার মনে হয় "নাইটিংগেল' নামটা ওকে বেশ মানায়, যার দেশী নাম বুলবুল। না কি 'সোনালী প্লোভার'? 'উইলো র‍্যাবলার' বলে ডাকা যায় বা 'রীড র‍্যাবলার' তার মানে বাংলার আমরা যাকে ফুটকি পাখি বলি—বাবুই কি 'ময়না' কি 'সুঁইচোরা' ডাকতেই বা ক্ষতি কি। সবকটাই সুন্দর নাম। তাই না রুদ্রেন্দু? ঘাড় ঘুরিয়ে অমিয় রুদ্রেন্দুকে দেখেন।

রুদ্রেন্দু 'হ্যাঁ' 'না' কিছু বলছে না। কেমন যেন বোকা হয়ে গিয়ে জজসাহেবের ছেলেকে দেখছে। রাস্তা ক্রশ করে কুন্দ আস্তে আস্তে বাবার পিছনে এসে দাঁড়ায়।

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

ডঃ অসীমা চ্যাটার্জির সঙ্গে

এ বছর সাধারণতন্ত্রের রজতজয়ন্তী দিবসে ডঃ অসীমা চ্যাটার্জিকে (ডিন বিজ্ঞান কলেজ কলিকাতা) পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত করা হয়েছে। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের খনিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে নিরলস সাধনায় ব্যাপৃত।

ডঃ চ্যাটার্জির জন্ম ১৯১৭ সালে। তাঁর বাল্যকাল কৈশোর ও যৌবন কেটেছে কলকাতায় বর্তমানে তিনি কলকাতায়ই বসবাস করছেন। তাঁর দেশ তারকেশ্বর থেকে তিন মাইল দূরে হুগলী জেলার গোপীনাথপুরে। শ্রীমতী চ্যাটার্জি বাল্যকালে কলকাতায় বসবাস করলেও ছুটি কাটাতে বাবা ও অন্যান্যদের সঙ্গে চলে যেতেন গ্রামে। গ্রামের পথে ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রকৃতির গাছপালা তাঁকে মুগ্ধ করতো। বাবা ছিলেন চিকিৎসক উপরন্তু ফুল লতা-পাতায় তাঁর ছিল বিশেষ জ্ঞান ক্ষেতের আল ধরে হাঁটতে হাঁটতে ফুল পাতা ছিঁড়ে এনে মেয়েকে দেখাতেন আর গল্প শোনাতেন প্রকৃতির গাছ লতা-পাতার। সময় পেলে বিশ্লেষণ করে দেখাতেন ফুল লতা-পাতা। বাল্যকাল থেকেই বাবার সাহচর্যে তাঁর প্রকৃতির ঐ সমস্ত জিনিসগুলি সম্বন্ধে কৌতূহল বেড়ে যায়। বড় হয়ে ছোটবেলার এই কৌতূহলই তাঁর রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়ে দেয়।

তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় বেথুন স্কুলে, স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি বেথুন কলেজেই আই এস সি পড়েন। বি-এসসি তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যয়ন করেন। কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ থেকে তিনি প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় হয়ে এম-এস-সি পাশ করেছেন, এজন্য তিনি রৌপ্য পদক পান। ছাত্রী অবস্থায় তিনি স্কলারশিপ ও মেডেল নিয়ে পড়াশুনো করেন। ১৯৪০ সালে লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপিকা হিসেবে তাঁর শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। এসময়ই তিনি কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে অবৈতনিক অধ্যাপিকার পদে যোগদান করেন।

১৯৪০ সালে তিনি নাগার্জুন পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি ও ১৯৪৪ সালে তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডকটর অব সায়েন্স উপাধিতে ভূষিত করে। ঐ বছরই তিনি মোয়াত স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন।

১৯৪৫ সালে অধ্যাপক বরদানন্দ চ্যাটার্জির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শুরু হয় সংসার জীবন। অধ্যাপক বরদানন্দ চ্যাটার্জি ছিলেন কেমিস্ট্রির ডি এস সি। সয়েল সায়েন্স এবং ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। ১৯৪৬ সালে অধ্যাপক চ্যাটার্জি আমেরিকাতে চলে যান। পরের বৎসর শ্রীমতী অসীমা চ্যাটার্জি মেয়ে ও তাঁর গাভারনেসকে নিয়ে আমেরিকায় পাড়ি দেন। কর্মস্থলের বিভিন্নতার জন্য স্বামী-স্ত্রী একই দেশে অবস্থান করেও পৃথক স্থানে বাস করতেন। ১৯৪৭ থেকে ৪৯ সালের কয়েকমাস ক্যালটেক ইউনিভার্সিটি অব উইশকনস-এ অধ্যাপিকার পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সালে তিনি সুইজারল্যাণ্ডের জুরিক ইউনিভার্সিটিতে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। বিদেশে থাকাকালীন তিনি অনেক বিজ্ঞান সম্মেলনে যোগদান করেন। অনেক দেশ পরিভ্রমণ করে তিনি ১৯৫১ সালে ভারতে ফিরে আসেন। ১৯৪৯, '৫৫ ৭০ ৭১ সালে-এ তিনি ইউকে ভ্রমণ করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন। এছাড়া একাধিকবার অস্ট্রেলিয়া, হংকং মালয় জাপান জার্মানী ও ফারনস ভ্রমণ করে নানা বিজ্ঞান সম্মেলনে যোগদান করেন। কোথাও কোথাও তিনি চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়েছিলেন এবং সে বছরই স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার পান।

১৯৫৪ সালে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে রীডার ও ১৯৬১ সাল থেকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালে ৬২তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন।

ডঃ চ্যাটার্জির সারাদিন ও অনেক রাত অবধি ব্যস্ত। ছাত্রছাত্রীদের গবেষণা পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে লেকচার নিজের কাজ ছাড়া ও বাইরের অনেক কাজের মাঝেও তিনি সহজ ও সরল। তাঁরই ব্যস্ততার মাঝে একটু সময় করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত হয়ে আপনার কেমন লাগছে? আমরা দেশবাসী সবাই খুব খুশী গর্বিত।

তিনি ধীরভাবে খানিক ভেবে উত্তর দিলেন এ সম্মান আমার মনে কোন গভীর রেখাপাত করে নি। তবে বাংলার এবং বাংলার বাইরের মানুষেরা আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমি পদ্মভূষণ উপাধি পাওয়ায় তাঁরা খুব আনন্দিত আর এ আনন্দটা তাঁরা পুরোপুরি উপভোগ করেছেন—সেটা আমার কাছে মস্তবড় জিনিস আমার সবচেয়ে বড় এচিভমেণ্ট। দেশের প্রত্যেক স্তরের লোকেরা যে আমায় আপনজন ভাবে এটাই আমার পরম পাওয়া।

তাঁকে আরও প্রশ্ন করেছিলাম বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কোন প্রদেশের মেয়েরা সবচেয়ে এগিয়ে গেছেন?

উঃ এ ব্যাপারে বিশেষ করে কোন প্রদেশকে পৃথক দেখার কিছু নেই, এক একটা বিষয়ে এক একটা প্রদেশ উন্নত। আজকাল মোটামুটি অনেক স্থানেই মেয়েরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা/গবেষণা করার সুযোগ পাচ্ছে।

প্রঃ বিদেশে আমাদের দেশের মেয়েদের বিজ্ঞানে উন্নতি সম্বন্ধে ধারণা কি রকম?

তিনি এবার সরাসরি উত্তর দিয়েছিলেন বিজ্ঞানে এখন আমাদের মেয়েরা অনেক এগিয়ে গেছে। অনেকেই বিশেষভাবে গবেষণায় রত কিন্তু ডাকতেন প্রতিনিধি হিসেবে বিদেশে মহিলা বিজ্ঞানী এত কম সংখ্যায় উপস্থিত থাকেন যে সেসব দেশের মেয়েদের লোকেদের আমাদের দেশের মেয়েদের বিজ্ঞানসাধনা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। অবশ্য বিদেশে যাঁরা বিজ্ঞানচর্চায় রত তাঁরা অবশ্য আমাদের দেশের মেয়েদের বিজ্ঞানের অবদান সম্বন্ধে জানেন।

প্রঃ আপনার কাজ সম্বন্ধে একটু কিছু বলুন যা আমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবান্বিত করবে।

উঃ দেশজ গাছগাছড়া থেকে গবেষণা ও তার থেকে ওষুধ বার করার কাজকেই আমি প্রধান লক্ষ্য হিসেবে ধরেছি। গবেষণা করতে করতে এমন অনেক জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে যা বিদেশীরাও ব্যবহার করছেন। যেসব জিনিস বার করেছি তার রাসায়নিক দিকটাও বিশদভাবে জানবার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছি, যার ফলে আমাদের যেমন জ্ঞান বাড়ছে সেসঙ্গে জানবার কৌতূহলও বেড়ে যাচ্ছে।

সবশেষে বললেন আমাদের গবেষণার দুটো দিক—জনকল্যাণ দিক ও নতুন আবিষ্কারের দিক। সুতরাং দেশের কাজে আমাদের প্রচেষ্টা সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সার্থক হয়ে ওঠা উচিত।

শ্রীমতী চ্যাটার্জির মেয়ে ও জামাই এখন বিদেশে। দুজনেই পি এইচ ডি। সেখানে তাঁরা নিজেদের কাজ ও অধ্যাপনার কাজ করে চলেছেন। ডঃ চ্যাটার্জি সকলেরই মাস্টার। ছাত্রছাত্রীরা তাঁর আন্তরিক ব্যবহারে মুগ্ধ। এত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে কোন বিরক্তি বা ক্লান্তি অনুভব করেন নি। কথার ফাঁকে বলেছিলেন কত জানার আছে, কত জানাবার আছে ছাত্র-ছাত্রী গবেষণা এগুলি নিয়ে মাঝে মাঝে আমি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

—অঞ্জলি চৌধুরী

রূপসীর কথা

এবারে সাধারণভাবে ত্বকের যত্ন ও পরিচর্যা কিভাবে করতে হয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব। সমস্ত শরীরের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা আছে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সেই পুরুষ বা মহিলার শরীর কেমন? অর্থাৎ মোটা মেদবহুল কি খুব রোগা কিম্বা দোহারা।

যাঁদের শরীরে মেদের পরিমাণ বেশী তাঁদের অন্য ব্যবস্থা আর অন্যদের ভিন্ন ব্যবস্থা। প্রথমে আসা যাক মেদবহুল শরীর সম্বন্ধে। এমন পরিচর্যার কথা লিখব যা করলে ত্বকও সুন্দর থাকে এবং মেদও কমে। প্রতিদিন সকালে নিয়মিতভাবে বডি-পাউডার দিয়ে শরীর ম্যাসাজ করালে শরীরের মেদগুলি নরম ও গরম হয়ে গলতে থাকে—ফলে প্রথমে মেদ নরম হয় তারপর সেই মেদ ম্যাসাজের ফলে স্বাভাবিক গঠন পেতে থাকে। তবে এই পাউডার ম্যাসাজেরও নিয়ম আছে। এই ম্যাসাজ বাড়িতে যে-কোন মহিলাকে দিয়ে করান যায়, তবে নিয়ম মতন। উল্টোপাল্টাভাবে ম্যাসাজ করালে গঠন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। ম্যাসাজের নিয়ম হল প্রথমে পেট। দুই হাত দিয়ে পেটের দুপাশ একসঙ্গে মাঝে তুলে ধরা তারপর ময়দা মাখার মতন করে গোল করে ঘুরিয়ে চেপে চেপে ধরতে হয়। এইভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে বারে বারে করতে হয়। এরকম করলে পেটের চর্বি নরম হয় ও পেট ঠেলে বেরিয়ে না এসে সমানভাবে ধসে যায়।

এরপর হচ্ছে পেটের দুই পাশ থেকে কোমর অবধি নীচ থেকে ঠেলে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া। এতে কোমরের অংশের চর্বি কমে যায়। সেই সময় পাশ ফিরে শুতে হয়। যখন যে পাশে ম্যাসাজ হবে সেই পাশে ফিরে শুতে হবে। তারপর হাত ঘষে বগল অবধি নীচ থেকে ওপরের দিকে টেনে তুলতে হবে। এভাবে দুই-চারবার বেশ জোরের সঙ্গে করতে হবে। তারপর পিঠ। পিঠও ঠিক একই রকমভাবে কোমর থেকে কাঁধ অবধি দুই হাতে আঙ্গুল ও তালুর সঙ্গে ত্বককে ধরে ধরে ঘষে ঘষে ওপরের দিকে তুলতে হবে। এরকম বেশ মিনিট ১০ করার পর দুহাত দিয়ে শরীরের অর্থাৎ পিঠের ডান দিক থেকে বাঁ দিক এবং পরে বাঁ দিক থেকে ডান দিক ডলে দিতে হবে। এইভাবে কিছুক্ষণ করার পর আবার চিৎ হয়ে শুতে হবে। এর পর পা। উরু থেকে শুরু করে পায়ের পাতা অবধি দুহাত দিয়ে গোল গোল করে ম্যাসাজ করতে হবে। বেশ মিনিট ১০।১৫ এরকম করে তারপর পা মুড়ে হাঁটু তুলে শুতে হবে। এবারে হাঁটু দু হাতের তেলোর মাঝে চেপে চেপে মালিশ করতে হবে। এবং হাঁটু থেকে উরু পর্যন্ত হাত চেপে নেমে আসবে। কিন্তু হাঁটু থেকে পায়ের পাতা অবধি নামবে না। এইভাবে বার ১০ পায়ের ম্যাসাজ করতে হবে। হাতও ঠিক একইভাবে করতে হবে। তবে হাত সামনে কোন টেবিল বা চেয়ারে রেখে শরীরের সঙ্গে এক লাইনে রাখতে হবে। এটা সোজা হয়ে বসে করতে হবে। এইভাবে পাউডার ম্যাসাজ করালে খুব উপকার হয়। কিন্তু যারা রোগা তাদের ঠিক এই নিয়মে তেল দিয়ে ম্যাসাজ করলে ভাল।

আর দোহারা হলে তাঁরা পাউডার ম্যাসাজ নিয়ে মাঝে মাঝে তেলের ম্যাসাজও করাবেন। ত্বকের যত্নের ব্যাপারে তো অনেক লিখেছি এবারে লিখছি দু-একটি বাড়ির তৈরি সামগ্রীর কথা—যা ত্বকে লোশানের মতন ব্যবহার করা চলে। এতে ত্বকও ভাল থাকে। দুই বড় চামচের অলিভ তেল, তাতে আধকাপ কাঁচা দুধ চার ফোঁটা মধু ও ৬।৭ ফোঁটা কোন পারফিউম দিয়ে সেটা ভালো সারা গায়ে লাগিয়ে নিতে হবে ঠিক স্নানের পরে। তারপর জল ঢেলে গা মোছা হয় তেমনি করে গা মুছে ফেলতে হবে। এতে শরীর সারাদিন ঝরঝরে থাকে এবং সুগন্ধিও হয়।

যদি কখনও মুখ গলা বা হাতের খোলা অংশ রোদে পুড়ে কালো দাগ হয়ে যায় তাহলে একটা সুন্দর উপায়ে সেই রং তোলা যায়। বড় চামচের এক চামচ পাতি লেবুর রস তাতে এক চামচ গ্লিসারিন ও দুধের সর একসঙ্গে ফেটিয়ে সেটা তুলো দিয়ে থুপে থুপে লাগাতে হবে, সেই অবস্থায় অন্ততঃ ১৫।২০ মিনিট থাকতে হবে। তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে জ্বলে-যাওয়া রং বা রং-এর মলিনতা দূর হয়।

সৌন্দর্য-লাবণ্য আসে নানাভাবে নানা উপকরণের সাহায্যে। তাকে আনতে জানা ও রাখতে জানাটাই আসল কাজ। ঘরের তৈরি উপকরণ তো অনেক হল। এগুলি ঠিক মতন ব্যবহার করা ও তৈরি করাটাই বিশেষ কাজ। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি বিষয়ে আলোচনা করব যা একটু বিস্মিত করলেও ঠিক। সেটা হল মন।

মন এমন জায়গা যার ভালমন্দ প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির ওপর মুখের চেহারা ও লাবণ্যের অনেকটা নির্ভর করে। রাগে ও বিরক্তিতে মুখের যেসব পেশীগুলি শক্ত হয়ে যায় বা সেখানে রেখা পড়ে সেগুলি চেহারার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। কপালে চিন্তার রেখা যাদের সর্বদা বিরক্তি ভাবের জন্য যেসব দাগ পড়ে সেগুলি অনেক সময় ক্রমাগত হওয়ার দরুণ কপালে ও গালে ভাঁজ ফেলে দেয়। অনেকে রাগের কারণে দাঁতে দাঁত চেপে চোয়ালের হাড় ও পেশী শক্ত করে থাকেন এমন বার বার করলে কপালের পাশের অংশ ফুলে থাকে ও চোয়াল বড় দেখায়। এভাবে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রাখলে নীচের অংশ মোটা হয়ে যায় ও ঝুলে পড়তে দেখা যায়।

এছাড়া অনেকের অভ্যাস থাকে গালের দুদিকের অংশ মুখের ভেতরে টেনে গর্ত সৃষ্টি করে রাখা। এতে খুবই অপকার হয়। এতে গালে সুগোল ভাব থাকে না, গর্ত হয়। আপনারা হয়ত শুনে থাকবেন, বিলেতে এক সময়ে মহিলাদের কণ্ঠার দু'পাশে গর্ত থাকাটা সৌন্দর্য বলে বিবেচিত হত। তাই তাঁরা গলা টেনে উঁচু করে কাঁধ শক্ত করে বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় কণ্ঠায় গর্ত করতেন। এবং দেখা গেছে—বিজ্ঞানীর মতে এভাবে প্রতিদিন অভ্যাস করলে যেমন চাওয়া যায় তেমন হয়ে থাকে। সাধারণ জিনিস আমাদের দেশে মা-দিদিমারাও করেছেন, ছোটবেলা থেকে বাচ্চাদের তেল মালিশ করার সময় বাঁকা পা বা হাত ঠিক করেছেন—খাঁদা বোঁচা নাককে বহু পরিমাণে উঁচু করেছেন। কানকে ঠিক মতন বসিয়ে সুন্দর করেছেন। তখনকার দিনের মেয়েরা সব সময় বাড়িতে থাকতেন ও শিশুদের পরিচর্যার ভার তাঁদেরই ওপর ছিল। এসব তাঁরা খুব ভাল মতন জানতেন ও সেইভাবে এদের যত্ন করে ভাল রাখতেন।

একটা মহৌষধ আছে—যেমন খুব রাগ হলে আয়নার সামনে গিয়ে নিজের চেহারা দেখা। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে রাগ পড়ে যাবে কারণ মনটা চেহারার বিকৃতি দেখে [illegible] পেয়ে যায়। আর একটা উপায় হোল এক দুই তিন করে গুণে যাওয়া। ভাল চিন্তা করলে, ভাল ছবি দেখলে বা ভাল বই পড়লেও যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তার ফলে চেহারায় লাবণ্য থাকে ও উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে। সেই কারণেই হয়ত অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সর্বদা প্রসন্ন থাকতে ও ভাল ছবি ইত্যাদি দেখতে বলা হয়।

—বরবর্ণিনী

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

পরাশর বর্মা বললেন—তারিখটা কালকের। এবং কাল আপনি যে কলম ও কালি ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে এই।

বলে, টেবিলের ওপর থেকে দোয়াতদানি ও কলমটা তুলে দেখিয়ে দিলেন।

রান্না করে দেখুন

রুটির সঙ্গে উপাদেয়

দু বেলা ভাত খাওয়ার অভ্যাস বাঙালীর বহুদিনই ছেড়ে গেছে। এখন র‍্যাশানের বরাদ্দ চালে এক বেলা ভাত, একবেলা রুটি। কখনও কখনও তাও কুলোয় না। জলখাবারে এবং টিফিনেও এখন রুটির একাধিপত্য। স্বাস্থ্যের দিক থেকে অবশ্য একবেলা ভাত একবেলা রুটি খাওয়া ভালই। তবে ভাল মন্দ যাই হোক রুটি যখন খেতেই হবে তখন তা নানারকম স্বাদু ব্যঞ্জন সহযোগে রুচিকর খাওয়াই শ্রেয়। বাঙালীর সঙ্গে রুটির পরিচয় অল্পদিনের। ভারতের অন্যান্য রাজ্য যেমন উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের অধিবাসীরা রুটি খেতে অভ্যস্ত—তাই তাঁরা রুটিকে নানান তরকারীর মাধ্যমে সুস্বাদু করে তোলবার ম্যাজিক জানেন। এই সব পদ রাঁধতে বেশী তেল ঘিও লাগে না বেশী ঝামেলাও নেই। এই রকমই কয়েকটি পদ রান্না করার প্রণালী আজ বলব।

করলা পেঁয়াজ :

উপকরণ : করলা ২৫০ গ্রাম পেঁয়াজ দুটি একটু তেঁতুল বা কাঁচা আম, একটু জিরে ভাজার গুঁড়ো একটু লংকার গুঁড়ো দুই কোয়া রসুন, তেল বা ঘি, নুন ও হলুদ আন্দাজ মতো।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। প্রথমে করলা ছোট ছোট টুকরো করে কেটে তেলে ভেজে নিন। ২। ওই তেলে দু কোয়া রসুন থেঁতো করে ছাড়ুন এবং পেঁয়াজ কুচি-কুচি করে কেটে ভাজুন। নুন ও হলুদ দিন। ৩। পেঁয়াজ বেশ ভাজা ভাজা হলে ওতে করলা ভাজা ছেড়ে দিন এবং অল্প একটু জল দিয়ে তাতে তেঁতুল বা আমের কুচি এবং লংকার গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। ৪। জল শুকিয়ে এলে নামিয়ে জিরে ভাজা ছড়িয়ে গরম গরম রুটির সংগে পরিবেশন করুন।

আলুর রসা :

উপকরণ : ছোট ছোট গোল আলু অর্ধ কেজি একটু আস্ত জিরেও দুটি তেজপাতা নুন ও হলুদ আন্দাজ মতো, একটু তেঁতুল বা দুটি টোম্যাটো ১ চা চামচ লংকার গুঁড়ো ১ চা চামচ ধনের গুঁড়ো, একটু হিং।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। প্রথমে আলু-গুলো সেদ্ধ করে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে ফেলুন। ২। তেল বা ঘিয়ে হিং তেজ-পাতা ও আস্ত জিরে ফোড়ন দিন। ৩। হিংয়ের গন্ধ বেরোলে ওতে টুকরো টুকরো করে কেটে টোম্যাটো বা তেঁতুল ছেড়ে দিন। নুন ও হলুদ দিন। টোম্যাটো ভাজা ভাজা হলে জল ও লংকার গুঁড়ো দিন। ৪। বেশ ফুটতে থাকলে সেদ্ধ করা আলু দিয়ে দিন। একটু ফুটলে নামিয়ে নিয়ে ধনে পাতার কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। ইচ্ছে করলে আলুর সংগে সেদ্ধ করা মটরশুটিও দেওয়া চলতে পারে।

খাট্টা আলু :

উপকরণ : এক কেজি খুব ছোট ছোটগুলি আলু, তিন টেবিল চামচ তেল অর্ধ চা চামচ মৌরী অর্ধ চা চামচ জিরে ভাজা, অর্ধ চা চামচ ধনে গুঁড়ো করে ভাজা অর্ধ চা চামচ আমচুর, অর্ধ চা চামচ গোল মরিচ, অর্ধ চা চামচ লংকার গুঁড়ো অর্ধ চা চামচ গরমমশলা, নুন আন্দাজ মতো।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। তেলে মৌরী ফোড়ন দিন এবং খোসা শুদ্ধ আস্ত আলু তেলে দিয়ে ভাজতে থাকুন। ২। পাঁচ মিনিট ভাজার পর সমস্ত মশলা ও অল্প জল দিয়ে নরম না হওয়া পর্যন্ত ফোটাতে থাকুন। ৩। জল শুকিয়ে গেলে অল্প একটু ঘি দিয়ে ভাজা ভাজা করে নামিয়ে নিন।

দম আলু :

উপকরণ : এক কেজি মাঝারি সাইজের আলু, এক টেবিল চামচ ধনের গুঁড়ো এক টেবিল চামচ কুচোনো ধনেপাতা, এক চা চামচ গরমমশলা অর্ধ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো একটি পাতি লেবুর রস একটি কুচোনো পেঁয়াজ, দুই টেবিল চামচ ঘি, নুন আন্দাজ মতো।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। আলু ছাড়িয়ে চার টুকরো করে কেটে নিন। এমনভাবে কাটবেন যাতে নীচের দিকটা জোড়া থাকে অর্থাৎ আলুর টুকরোগুলো আলাদা আলাদা না হয়ে যায়। ২। সমস্ত মশলা মিশিয়ে কাটা আলুর ফাঁকের মধ্যে ভরে দিন। ৩। ঘি গরম করে তাতে মশলা ভরা আলু ঢাকা দিয়ে ভাজতে থাকুন। যাতে পুড়ে না যায় সেইজন্যে একটু জল দিন। যখন সেদ্ধ হয়ে যাবে এবং ভাজা ভাজা হয়ে বাদামী হয়ে যাবে তখন নামিয়ে ধনে-পাতা দিয়ে পরিবেশন করুন।

লাউ দিয়ে ছোলার ডাল :

উপকরণ : ১ কাপ ছোলার ডাল, ½ কেজি লাউ, ২টি পেঁয়াজ, এক টুকরো আদা ২টি লংকা, ১ চা চামচ লংকার গুঁড়ো, ১ চা চামচ জিরে, দু টেবিল চামচ ঘি, ½ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, নুন আন্দাজ মতো, ধনে-পাতার কুচি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। ছোলার ডাল ধুয়ে নিয়ে গরম জলে এক ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। ২। লাউ টুকরো টুকরো করে কেটে নিন। হলুদ দিয়ে লাউ ও ছোলার ডাল একসংগে সেদ্ধ করুন। নুন দিন। ৩। পেঁয়াজ ও আদাকুচি ঘিয়ে ভেজে নিন। কাঁচা লংকা দুটো ভেঙে দিয়ে দিন। জিরে দিন। ৪। এই ভাজা মশলা দিয়ে ডাল সাঁতলে নিয়ে লংকার গুঁড়ো ও ধনেপাতা দিয়ে পরিবেশন করুন।

এঁচোড়ের কালিয়া :

উপকরণ : ½ কেজি এঁচোড়, ২৫০ গ্রাম আলু, দুটি পেঁয়াজ, এক টুকরো আদা, দু কোয়া রসুন, দুটি তেজপাতা, ½ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো, ½ চা চামচ গুঁড়ো হলুদ, আন্দাজ মতো নুন, ½ কাপ টক দই, এক চা চামচ চিনি, এক চা চামচ লংকার গুঁড়ো, ½ চামচ ধনের গুঁড়ো, অর্ধ চা চামচ জিরে গুঁড়ো, ঘি বা তেল।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। এঁচোড় ও আলু ডুমো ডুমো করে কেটে নিন। পেঁয়াজ আদা ও রসুন বেটে রাখুন। ২। ঘি বা তেলে আলু ভেজে তুলে রাখুন। ৩। এবারে ওই ঘিয়ে তেজপাতা ও জিরে ফোড়ন দিন ও গরমমশলা ছাড়া সমস্ত বাটা ও গুঁড়ো মশলা এবং চিনি ও দই দিয়ে ভাজতে থাকুন। ৪। একটু ভাজা ভাজা হলে এঁচোড় দিন এবং জল না শুকোনো পর্যন্ত ভাজুন। ৫। এঁচোড় যাতে সেদ্ধ হয়ে যায় সেই আন্দাজে জল দিন এবং আলু দিন। ৬। এঁচোড় সেদ্ধ হয়ে গেলে গরম মশলা দিয়ে পরিবেশন করুন। এঁচোড়ের কোয়ার সংগে মাংসের টুকরোর সাদৃশ্য দেখে এঁচোড়কে গাছপাঁঠা বলা হয়। ভাল করে রান্না করলে প্রায় মাংসের মতোই খেতে হয়। এইভাবে লাউ ও পেঁপের কালিয়াও রান্না করা যায়।

ধুঁধুল মুলোর ছেঁচকি :

উপকরণ : ছয়টি বড় ধুঁধুল, দুটি বড় কচি মুলো, একটু হিং, পাঁচফোড়ন, ½ চা চামচ শুকনো লংকার গুঁড়ো, একটু তেল বা ঘি, আন্দাজ মতো নুন, এক চা চামচ চিনি বা এক টুকরো গুড়।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। প্রথমে ধুঁধুলের খোসা ছাড়িয়ে মাঝারি সাইজের টুকরো করে কুটে নিন। মুলো কুচিয়ে নিন। ২। তেল বা ঘিয়ে হিং ও পাঁচফোড়নের ফোড়ন দিন। সুঘ্রাণ বেরোলে ওতে ধুঁধুল, মুলো, নুন, হলুদ ও লংকার গুঁড়ো দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। ৩। জল শুকিয়ে এলে চিনি বা গুড় দিয়ে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিন। সস্তা এই তরকারি রুটি দিয়ে খেতে চমৎকার লাগবে।

মশলাদার অরবী :

উপকরণ : এক সের গাটি কচু (ছোট কচু), নুন ও হলুদ আন্দাজ মতো। দু চা চামচ লংকার গুঁড়ো, দু চা চামচ পেষা জোয়ান, দু চা চামচ জিরে গুঁড়ো, দু চা

চামচ ধনে গুঁড়ো ২ চা চামচ আমচুর দু চা চামচ গরম মশলা একটু বেশী পরিমাণ তেল।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। কচু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিন—যেন গলে না যায়। ২। টুকরো টুকরো করে কেটে সমস্ত মশলা মাখিয়ে নিন এবং কড়াইয়ে বেশী পরিমাণ তেল দিয়ে অল্প আঁচে ভাজতে থাকুন। ৩। অল্প আঁচে অনেকক্ষণ ধরে ভাজুন ও মাঝে মাঝে নাড়তে থাকুন। ঠিক মতো ভাজলে সমস্ত কচুর গায়ে মশলা মাখা মাখা হয়ে যাবে। এই তরকারি মুসুরীর ডাল ও লেবুর আচারের সঙ্গে রুটি দিয়ে খেতে অতি চমৎকার।

মুসুরীর ডাল :

উপকরণ : ½ কেজি ডাল মুসুরির ডাল, দুটি পেঁয়াজ, দু কোয়া রসুন, ½ চা চামচ আস্ত জিরে দুটি তেজপাতা দুটি শুকনো লংকা ঘি এক চা চামচ চিনি নুন ও হলুদ।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। ঘি গরম করে তেজপাতা ও শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। ওই ঘিয়ে কুচোনো পেঁয়াজ ও রসুন বাটা ভাজুন। ভাজা হয়ে গেলে জল নুন হলুদ দিন। ২। জল গরম হলে ওতে ডাল করে ধোয়া মুসুরীর ডাল দিন। ৩। ডাল সেদ্ধ হয়ে গেলে চিনি দিয়ে নামিয়ে নিন। এই ডাল বেশ ঘন ঘন হবে।

সাধনা মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা 'পুনশ্চ'-র মধ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাচীন কলকাতার নানা বিষয় আলোচনা করে চলেছি এবং পরেও আরো করব। কিন্তু একটানা ঈদৃশ প্রবন্ধের একঘেয়েমি থেকে কিছুটা বিরত হবার জন্য ইতিমধ্যে আমরা 'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ও ব্রহ্মবিদ্যা' নামক একটি বিশেষ মূল্যবান ও তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ 'মানসী ও মর্মবাণী' (পৌষ ১৩২৬) পত্রিকা থেকে এস্থলে প্রকাশ করছি। প্রবন্ধটির লেখক অনাথনাথ বসু।

'মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ও ব্রহ্মবিদ্যা'

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যোগবিদ্যার উৎপত্তি-স্থান—এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই যোগ-রহস্য আলোচনার জন্য ধর্মপ্রাণা রুশ মহিলা মাদাম ব্লাভাৎস্কি তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত আমেরিকা নিবাসী কর্ণেল অলকট্‌কে সঙ্গে লইয়া এদেশে আগমন করেন। ইংলন্ড হইতে মিষ্টার উইনব্রিজ নামক জনৈক চিত্রশিল্পী ও মিসেস বেটস্ নাম্নী জনৈকা ভদ্রমহিলা তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। মাদাম ব্লাভাৎস্কি প্রবর্তিত যোগবিদ্যা প্রথমে আমেরিকায় প্রচারিত হইয়াছিল এবং এই বিদ্যা আলোচনার জন্য প্রথমে আমেরিকায় থিওজফিক্যাল সোসাইটি বা ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কর্ণেল অলকট এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের ধর্মতত্ত্ব মনোনিবেশ সহকারে আলোচনা করিয়া অনেক সময় বহু বিদেশীকে আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টায় যত্নবান হইতে দেখা গিয়াছে। আলোচনার অভাবে আমাদের দেশের বহু তত্ত্ব বলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। মধুচক্র নির্মাণ করিবার জন্য মক্ষিকাগণ নানা জাতীয় পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহে যত্নবান হইয়া থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীগণ সেইরূপ আপন আপন জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধশালী করিবার জন্য সমগ্র জগতের বিভিন্ন জাতির জ্ঞানাম্বুধি মন্থন করিয়া সার সংগ্রহে যত্নবান হইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে ভারতবাসীর মধ্যে যে পরিমাণ ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা জগতের বোধহয় অন্য কোন স্থানের অধিবাসীদিগের মধ্যে লক্ষিত হয় না।

রুশ মহিলা মাদাম ব্লাভাৎস্কি যোগ-রহস্য আলোচনা করিতে করিতে যখন বুঝিতে পারিলেন যে, যোগবিদ্যার উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষে আগমন করিলে বহু নূতন তথ্য অবগত হইতে পারিবেন তখন তিনি তাঁহার অনুচরগণসহ এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বোম্বাইয়ে আগমনের সংবাদ প্রথমে একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। শিশিরকুমার সংবাদপত্রে মাদাম ও কর্ণেলের এদেশে আগমনের সংবাদ ও তাঁহাদের অলৌকিক ক্ষমতার কথা অবগত হইয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। শিশিরকুমার [illegible]

আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ণেল অলকট্‌কে পত্র লিখলে কর্ণেল পত্রোত্তরে জানাইয়াছিলেন, তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা ও বিদ্যাদানের জন্যই এদেশে আগমন করিয়াছেন। শিশিরকুমার কর্ণেল অলকট্‌কে পুনরায় পত্র লিখিলেন, বিদ্যা অর্থে আপনারা কি বুঝিয়া থাকেন? উত্তরে কর্ণেল বিদ্রূপ করিয়া লিখিলেন, 'আপনি হিন্দু অথচ বিদ্যা কাহাকে বলে তাহা জানেন না? জগতে কেবল একটি মাত্র শিক্ষণীয় বিদ্যা আছে—সে বিদ্যার নাম যোগবিদ্যা।'

সাহেব যোগবিদ্যার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন, এই কথা অবগত হইয়া শিশিরকুমার বিস্মিত হইয়াছিলেন। মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অলকটের এবং তাঁহাদের কার্যকলাপের বিশেষ বিবরণ অবগত হইবার জন্য শিশিরকুমারের প্রাণে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া কর্ণেলকে পত্র লিখিলে কর্ণেল প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, তিনি যদি বোম্বাইয়ে আসিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার সহিত সকল কথার আলোচনা হইতে পারে।

শিশিরকুমার বোম্বাই যাইবেন স্থির করিয়া কর্ণেলকে পত্র লিখিলেন। নির্দিষ্ট দিবসে তিনি বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইলেন। কর্ণেল সাহেব তাঁহার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শিশিরকুমার কর্ণেল অলকট্‌কেই তাঁহাদের সম্প্রদায়ের নায়ক বলিয়া জানিতেন। কিন্তু রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে বাড়ী যাইবার সময় কর্ণেল শিশিরকুমারকে বলিলেন, 'আমাদের সম্প্রদায়ের কর্ত্রী মাদাম ব্লাভাৎস্কির প্রতি আপনি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবেন।'

শিশিরকুমার মাদামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। শিশিরকুমার বোম্বাইয়ে মাদাম ও কর্ণেলের সহিত একত্রে তিন সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি মাষ্টার উইনব্রিজ ও মিসেস বেটসের সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন।

বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইয়া মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অলকট আমেরিকার ন্যায় এদেশেও একটি থিওজফিক্যাল সোসাইটি (ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে তাঁহারা কাহারও সহানুভূতি লাভ করিতে পারেন নাই। কেবল জনৈক পার্শী যুবক তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার ও তাঁহার ন্যায় দুই একজন শক্তিশালী পুরুষের যত্নে, চেষ্টায় ও সহায়তায় মাদাম ব্লাভাৎস্কি ভারতবর্ষে ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, শিশিরকুমার তখন ব্যাকুল চিত্তে সত্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। ক্ষেত্রে উত্তমরূপে শস্য উৎপাদন করিবার জন্য কৃষক যেমন লাঙ্গল সংযোগে মাটিকে কর্ষণপূর্বক সার দিয়া প্রথমে ক্ষেত্রের উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে শিশিরকুমারও সেইরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতির আশায় ধর্মবীজ বপন করিবার পূর্বে প্রেতাত্মবাদ দ্বারা স্বীয় হৃদয়ক্ষেত্র উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল।

হিন্দুধর্মে মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে, এ কথায় শিশিরকুমারের আর সংশয় রহিল না। উদার-হৃদয় কর্ণেল অলকটের বালসুলভ সরলতায় শিশিরকুমার মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মাদাম ব্লাভাৎস্কির চরিত্রের বিশেষত্বে তিনি কখনও বিস্মিত কখনও চমৎকৃত কখনও মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। মাদাম ও কর্ণেলের চরিত্রগুণে শিশিরকুমার তাঁহাদের উভয়েরই প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

—ক্ষপণক

প্রেয়সী

নিরঞ্জন সিংহ

হিন্দুস্থান রোবোট লিমিটেড সংক্ষেপে এইচ আর এল-এর রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট ডিরেকটর ড: মূলচন্দানীর ঘরে এক জরুরী মিটিং চলছে। গত ৩ দশক থেকে দেশে দেশে রোবোটের প্রচলন হয়েছে। ধাপে ধাপে উন্নতও হয়েছে এই সব রোবোটের দল আর সেজন্য এইচ আর এল-এর আর-ডি ডিপার্টমেন্টের বৈজ্ঞানিকদের অবদান অনেকখানি। কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে এমনকি মানুষের সাধারণ গৃহস্থালী কাজেও আজ রোবোট ব্যবহৃত হচ্ছে। সমাজের সর্বস্তরে মানুষের সঙ্গে পাশাপাশি রোবোটরা কাজ করে চলেছে। তবু দেখা যাচ্ছে যে মানুষ রোবোটকে একটা উন্নত যন্ত্রের বেশী কোন মর্যাদা দিতে চাইছে না। এভাবে চললে অদূর ভবিষ্যতে রোবোট ও মানুষের মধ্যে একটা সামাজিক সংঘাত বাধতে পারে বলে সোসিওলজিস্টরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে সুরু করেছেন। সেজন্য এইচ আর এল এর বোর্ড অব ডিরেকটারস জীবন নিরাপত্তা পাঠিয়েছেন। সামাজিক সংঘাত সুরু হয় তাহলে কোম্পানীর সামনে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। সুতরাং আগে থাকতে সাবধান হওয়াই ভাল। এইচ আর এল এর বোর্ড গত দশ মাস আগে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে এবার থেকে এমন রোবট তৈরী করতে হবে যাদের চেহারা আর বুদ্ধিশুদ্ধি হবে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সফল হয়েছেন এ ধরণের রোবোটের ব্লু প্রিন্ট তৈরী করতে। আজকের মিটিং-এ সেই বিষয় নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা চলছে। ডঃ মূলচন্দানী উপস্থিত সমস্ত ইঞ্জিনীয়ার ও বৈজ্ঞানিককে ধন্যবাদ জানালেন কারণ এই ব্লু-প্রিন্ট শিডিউলড টাইমের দুমাস আগেই

সংক্ষেপে হওয়াতে প্রায় নয় লক্ষ টাকার মত কস্ট সেভ হয়েছে।

এবার সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ডঃ ভোরা বললেন—এই প্রোগ্রামের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শেষ করেছেন আমাদের রোবো-সাইকোলজিস্ট মিঃ সজল চ্যাটার্জী। ডঃ মুলচন্দানী ডঃ ভোরার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—ডঃ ভোরা আপনার কথা হয়ত ঠিক—এই প্রজেকটের বড় অংশ মিঃ চ্যাটার্জীর সাহায্য ছাড়া সুষ্ঠুভাবে শেষ করা সম্ভব হত না। তবু বলব এ সাফল্য সমস্ত আর-ডি ডিপার্টমেন্টের। ডঃ মুলচন্দানীর একথা বলার কারণ সবাই বুঝতে পারলেন। ব্যক্তিগত কোন প্রতিভাকে ডঃ মুলচন্দানী কখনই স্বীকার করতে চান না। ডঃ মুলচন্দানীর কথায় মিঃ চ্যাটার্জী একটু আহত হলেও সামলে নিলেন।

—কত তাড়াতাড়ি আমরা প্রোডাকসনে হাত দিতে পারব? ডঃ মুলচন্দানী একটু থেমে প্রশ্ন করলেন। সঠিক কাউকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন না করলেও টেকনিক্যাল ম্যানেজার মিঃ রাউত জবাব দিলেন—স্যার, এখুনি আমরা ব্লু-প্রিন্ট প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের হাতে দিতে পারছি না বলে দুঃখিত।

—কেন? ডঃ মুলচন্দানী একটু যেন উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন।

—রিপোর্ট থেকে আপনি দেখেছেন যে এই ব্লু-প্রিন্ট অনুযায়ী আমরা একটা মহিলা রোবোট তৈরী করতে চলেছি। কারণ তাতে আমাদের পরীক্ষার ফলাফল খুব ভালভাবে বোঝা সম্ভব হবে। ফিল্ড টেস্ট না শেষ করে এটা আমরা প্রোডাকশান ডিপার্টমেন্টের হাতে দিতে চাই না। এবারও জবাব দিলেন মিঃ রাউত।

—ফিল্ড টেস্ট না করে কোনো রোবোটই আমরা মার্কেটিং করি না—তাই নয় কি?

—ঠিক কথা স্যার। তবে এবার আমরা আগেই ফিল্ড টেস্টটা শেষ করে নিতে চাই। আর সেটা গোপনে আমাদের ডিপার্টমেন্টের মধ্যেই শেষ করতে হবে।

ডঃ মুলচন্দানী ডান হাতটা বোলাতে লাগলেন টাক মাথায়। একটু উত্তেজিত হলে এটা করা ও'র স্বভাব।

—ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন মিঃ চ্যাটার্জী। প্রশ্নটা এবার সরাসরি মিঃ চ্যাটার্জীকেই করলেন ডঃ মুলচন্দানী। কারণ উনি বুঝতে পারছিলেন এইসব পরিকল্পনা মিঃ চ্যাটার্জীরই দেওয়া। রোবো-সাইকোলজিস্টগুলো বড় ঝামেলা পাকায়। মিঃ চ্যাটার্জী উঠে দাঁড়ালেন। লম্বা ছিপছিপে ফর্সা বছর তিরিশের যুবক। মুখটা একটু লম্বাটে। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। চোখ দুটো বড় বড় ও স্বপ্নালু। সাইকোলজিস্ট থেকে কবি বলেই মানায় ভাল।

—আমরা একটা অ্যাডভান্সড রোবোট নিয়ে পরীক্ষা করতে চলেছি। আমাদের লক্ষ্য রোবোটকে মানুষ যেন আর যন্ত্র না ভাবে। আমাদের এমন রোবোট তৈরী করতে হবে যারা হবে অবিকল মানুষের মত।

মিঃ চ্যাটার্জীকে বাধা দিয়ে ডঃ মুলচন্দানী চেঁচিয়ে উঠলেন—অ্যাবসার্ড! রোবোটকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ করা কখনো কি সম্ভব? মিঃ সাইকোলজিস্ট একটা কথা মনে রাখবেন আমরা মানুষ তৈরী করতে চাইছি না। আমরা চাই রোবোট তৈরী করতে। সফিস্টিকেটেড রোবোট—যার মধ্যে মানুষের কোয়ালিটিস থাকবে অর্থাৎ সামাজিকভাবে মানুষ ও রোবোট পাশাপাশি থাকলেও কোন সংঘাত বাধবে না। ডঃ মুলচন্দানী কথা বলতে বলতে বেশ কয়েকবার মাথায় হাত বোলালেন।

মিঃ চ্যাটার্জী একবার ভাল করে ডঃ মুলচন্দানীর মুখের দিকে তাকালেন। মনে মনে যথেষ্ট রাগ হলেও তা চেপে রেখে বললেন—স্যার ডিরেকটর—আমি দুঃখিত। যে কথাটা আমি বলতে চেয়েছি তা হয়ত আমি ঠিকমত বোঝাতে পারিনি। আমি আর একবার বলবার চেষ্টা করছি। সামাজিক সংঘাত এড়াতে হলে রোবোটকে মানসিক দিক থেকে মানুষের সমান করে তৈরী করতে না পারলে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। মানুষ রোবোটকে যন্ত্রের বদলে হয়ত গৃহপালিত পশুর অথবা বড়জোর বাড়ীর চাকরবাকরের মর্যাদা দেবে—তার বেশী কিছু নয়। আর সেইজন্য এরকম একটা পরীক্ষা আগে থাকতে ভালভাবে যাচাই না করে আমার মনে হয় প্রোডাকশানে হাত দেওয়া ঠিক হবে না। অবশ্য ব্যাপারটার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আপনিই নেবেন। কথা শেষ করে মিঃ চ্যাটার্জী নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন।

ডঃ মুলচন্দানী ইতিমধ্যে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছিলেন। একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে দৃষ্টিটাকে সংহত করলেন সামনের হাল্কা নীল রঙের দেওয়ালে। একটু গম্ভীর গলায় বললেন—বেশ। আপনাদের প্রস্তাব মেনে নিলাম। সেইভাবে আমি বোর্ড অব ডিরেকটরে রিপোর্ট পাঠাবো, কিন্তু আগামী মাসের ৩০ তারিখে আমি প্রজেকট-স্যাম্পেল দেখতে চাই। সেইদিনই চেয়ারম্যান ও অন্যান্য ডিরেকটরদের সামনে ডেমনেস্টেট করতে হবে। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন আমার কথা।

ডঃ মুলচন্দানী থামলেন। আর কেউ কোন জবাব দিলেন না। এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে মিটিং শেষ হয়ে গেল।

(দুই)

আজ সেই স্মরণীয় ৩০ তারিখ। এইচ আর এল-এর কনফারেন্স রুমে গম্ভীরমুখে বসে আছেন ডঃ মুলচন্দানী। তাঁর সঙ্গে

একই সারিতে বসে আছেন কোম্পানীর অন্যান্য ডিরেক্টর ও চেয়ারম্যান ডঃ সেনাপতি। ডঃ সেনাপতির সাম্প্রতিক স্ত্রী মিসেস রমলা সেনাপতিও এসেছেন। ডঃ সেনাপতির পাশেই উৎফুল্ল মুখে বসে আছেন। এর আগে ডঃ সেনাপতি চারবার বিয়ে করেছেন আর প্রত্যেকবারেই স্ত্রীরা ডাইভোর্স নিয়ে চলে গেছেন। কিছুদিন হল মিসেস রমলাকে বিয়ে করেছেন ডঃ সেনাপতি। ভদ্রমহিলার বয়স তিরিশের বেশী হবে না। অসাধারণ সুন্দরী। বিয়ের আগে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আর্টসের অধ্যাপিকা ছিলেন। তাছাড়াও কবি হিসেবে ভদ্রমহিলার বেশ নামটাম আছে। ডঃ সেনাপতি অবশ্য মিসেস রমলাকে ওর রূপের জন্য বিয়ে করেছেন। সুন্দরী নারীর ওপর ডঃ সেনাপতির যে একটা অস্বাভাবিক দুর্বলতা আছে সেকথা সবাই জানে। তাই নিয়ে অনেকে হাসি-ঠাট্টাও করে আড়ালে।

সামনের মঞ্চের ওপর পর্দা ফেলা আছে। পর্দার পিছনে শুধু আর-ডি ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনীয়র আর বৈজ্ঞানিকেরা উর্বশীর ডেমনেস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। ডঃ মুলচন্দানী অস্থির হয়ে পড়ছেন। বার বার ঘড়ি দেখছেন আর মাথায় হাত বোলাচ্ছেন। ডিরেক্টরেরা, চেয়ারম্যান সবাই অন্ততঃ পনের মিনিট আগে এসে গেছেন। আর ধৈর্য না ধরতে পেরে ডঃ মুলচন্দানী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। যাওয়ার সময় ডঃ সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললেন—স্যর, কিছু মনে করবেন না। একটু দেখে আসি। ডঃ সেনাপতি কথা না বলে একটু ঘাড় দোলালেন। মিসেস সেনাপতি একটু হাসলেন।

ডঃ মুলচন্দানী মঞ্চের পিছন দিকে এগোতেই দেখলেন ডঃ ভোরা এগিয়ে আসছেন।

—ব্যাপার কি আপনাদের? আর কত দেরী? চেয়ারম্যান, ডিরেক্টরেরা সব কখন থেকে বসে রয়েছেন।

ডঃ ভোরা বললেন—না—মানে সামান্য একটু গণ্ডোগোল হয়েছিল তাই।

—কি গণ্ডোগোল?

—এখন ঠিক হয়ে গেছে। ওসব আর এখন শুনে কাজ নেই চলুন। বলে ডঃ ভোরা এগিয়ে গেলেন মিসেস সেনাপতির কাছে।

—ম্যাডাম এবার আপনাকে একটু কষ্ট দেব।

মিসেস সেনাপতি একটু হেসে বললেন—আমি?

ডঃ সেনাপতি হেসে বললেন—তুমিই তো এখানে একমাত্র মহিলা সুতরাং ওকাজটা তোমারই করা উচিত। ডঃ ভোরা ঠিক লোককেই পাকড়াও করেছেন।

ফিনান্সিয়াল ডিরেক্টর মিঃ আয়ার একটু চাটুকারিতার লোভ সামলাতে পারলেন না। হেঁ-হেঁ করে হেসে বললেন—গ্রেসিয়াস লেডী আমাদের প্রজেক্টের উদ্বোধন করে আমাদের কৃতার্থ করুন।

মিঃ আয়ারের কথায় সবাই হোহো করে হেসে উঠলেন। এমনকি ডঃ মুলচন্দানীও মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে হেসে ফেললেন। মিসেস সেনাপতি খুব খুশী হলেন। হাসতে হাসতে ডঃ ভোরার সঙ্গে এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। ডঃ ভোরা মিসেস সেনাপতিকে একটা লাল বোতাম দেখিয়ে দিলেন। মিসেস সেনাপতি বোতামে আলতো করে চাপ দিলেন। দ্রুত পর্দা সরে গেল। হাততালিতে ভরে উঠল কনফারেন্স রুম। মিসেস সেনাপতি মঞ্চের ওপর তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর মুখের হাসি উবে গেল। সুন্দরী বলে মনে মনে একটা গর্ব ছিল ওঁর। কিন্তু সামনের চেয়ারে বসে থাকা ওই মেয়েটির (যদিও মিসেস সেনাপতি ভালভাবে জানতেন ওটা একটা রোবোট) ওকি রূপ! এমন নিখুঁত চোখ-মুখ নাক। সব যেন শিল্পীর আঁকা ছবি।

হাততালির শব্দ থেমে গিয়ে ততক্ষণে সমস্ত কনফারেন্স রুমের মধ্যে নেমে এসেছে এক অসম্ভব নীরবতা। ডঃ সেনাপতি ও অন্যান্য ডিরেক্টরেরাও যেন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন মঞ্চের উপরের রোবোটকে দেখে। সবাই মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন সত্যিই রোবোটটি অপূর্ব সুন্দরী। রোবোটের পরণে গাঢ় লাল রঙের বেনারসী। মিঃ চ্যাটার্জীই পোষাকটা পছন্দ করে দিয়েছিলেন।

—মিসেস সেনাপতি এবার রোবোটের সুইচটা চালু করে দিতে হবে। বললেন ডঃ ভোরা।

—চলুন। যেন বহুদূর থেকে কথা বললেন মিসেস সেনাপতি।

ডঃ ভোরা সিঁড়ি দিয়ে মঞ্চের উপরে উঠতে সুরু করলেন। মিসেস সেনাপতিও ডঃ ভোরাকে অনুসরণ করলেন। মঞ্চের উইংসের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন আর-ডি ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনীয়র আর বৈজ্ঞানিকেরা। মিঃ চ্যাটার্জীও দাঁড়িয়েছিলেন ওদের মধ্যে। [illegible]

এসে ডঃ ভোরার নির্দেশমত একটা সুইচে চাপ দিলেন মিসেস সেনাপতি। এবার উইংসের পাশ থেকে ভেসে এলো হাততালির আওয়াজ কিন্তু মঞ্চের নীচ থেকে হাততালি দিতে যেন সবাই ভুলে গেল। সুইচটা টেপার সঙ্গে সঙ্গে রোবোটের চোখের পাতা দুটো কাঁপল থরথর করে। চোখ মেলে চাইলোও। তারপর মরাল গ্রীবা ঘুরিয়ে সবাই-এর উপর চোখ বুলিয়ে নিল। মিঃ চ্যাটার্জীর চোখে চোখ পড়তেই একটুকরো চোরা হাসি খেলে গেল ওর পাতলা ঠোঁটে। আর কেউ লক্ষ্য না করলেও মিসেস সেনাপতির চোখ এড়াল না ওই হাসিটুকু আর ওর অর্থ বুঝতেও ওঁর দেরী হল না এক মুহূর্তে। মিসেস সেনাপতি যেন তড়িতাহতের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন মঞ্চের ওপর। ওঁর চোখের সামনে থেকে মুছে গিয়েছিল যেন সমস্ত দৃশ্যপট। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল অসীম শক্তিধর এক প্রতিদ্বন্দ্বী।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল এমনি করে। তারপর রোবোটটা চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলো মিসেস সেনাপতির দিকে। লম্বা ছিপছিপে চেহারাটা এবার সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে উঠল। উন্নত বুক সরু কোমর আর প্রশস্ত নিতম্ব। ডঃ ভোরা মিসেস সেনাপতির পরিচয় দিলেন। রোবোট দুহাত তুলে অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গিতে নমস্কার জানালো।

মিসেস সেনাপতিও প্রতিনমস্কার করলেন। তারপর নিজেকে কিছুটা যেন সামলে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। সহজভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি নাম রেখেছে এঁরা?

—প্রজেক্ট যোর। জবাব দিল রোবোট। ভারী মিষ্টি সুরেলা গলা।

—তোমাকে এঁরা সত্যিই খুব স[illegible] করে তৈরী করেছে। মিসেস সেনাপতি আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলেন। রোবোট মুখ নামালো। ব্রীড়াবনত ভঙ্গী।

মিসেস সেনাপতি ডানহাত দিয়ে রোবোটের থুতনিটায় চাপ দিয়ে মুখখানা উঁচু করে ধরে খুব আস্তে আস্তে বললেন—'নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী

হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।'

—তোমাকে দেখে কবিতাটা মনে পড়ে গেল। জানো কার কবিতা?

—রবি ঠাকুরের 'উর্বশী।'

মিসেস সেনাপতি আর কোন কথা বলতে পারলেন না। দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন ওকে তারপর বেশ জোরে—যেন সবাইকে শুনিয়ে বললেন—তোমার নাম রাখলাম আমি উর্বশী। কি, পছন্দ হয়েছে তো?

উর্বশী জবাব দেওয়ার আগে সারা কনফারেন্স রুম যেন ফেটে পড়ল হাত- [illegible]

মিসেস সেনাপতি আস্তে আস্তে মঞ্চ থেকে নেমে গিয়ে ডঃ সেনাপতির পাশে বসলেন। কিন্তু ডঃ সেনাপতির চোখে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন। ডঃ সেনাপতি তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা উর্বশীর দিকে। সে চোখের দৃষ্টির ভাষা পড়তে মেয়েদের এক মুহূর্ত সময় লাগে না। মিসেস সেনাপতি ঘৃণায় চোখ নামিয়ে নিলেন।

এরপর ডঃ ভোরার কথামত উর্বশী মঞ্চ থেকে নেমে এসে একে একে সবাইকে নমস্কার জানাল। ডঃ ভোরা একে একে সবাই-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডঃ সেনাপতির চোখের দিকে তাকিয়ে উর্বশী চমকে উঠল। মিঃ চ্যাটার্জী নোটবুকে কি যেন নোট করে নিলেন।

তারপর ডঃ মুলচন্দানী ঘণ্টাখানেক ধরে সবাই-এর সামনে উর্বশীর ব্যাপারে অনেক কিছু বলে গেলেন। ডঃ মুলচন্দানীর বক্তৃতায় যে কেউ মন দিতে পারেননি সে কথা বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। যাহোক ডঃ মুলচন্দানীর প্রস্তাবে চেয়ার-ম্যান ও ডিরেকটরেরা ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে গেলেন। শুধু যাওয়ার আগে ডঃ সেনাপতি ডঃ মুলচন্দানীকে একান্তে ডেকে বলে গেলেন—প্রতি সপ্তাহে উর্বশীর রিপোর্ট ঠিকমত যেন ওঁর কাছে পাঠানো হয়। দরকার হলে উনি নিজে উর্বশীর ফিল্ড টেস্ট দেখতে পারেন সে কথাও জানিয়ে দিলেন। মিসেস সেনাপতি ডঃ সেনাপতির কনুই ধরে টান দিয়ে বললেন—চলো দেরী হয়ে যাচ্ছে আমাদের আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে না। ডঃ সেনাপতির হয়ত আরো কিছু বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মিসেসের তাড়ায় আর কিছু বলতে না পেরে মাথায় হাত বোলাতে সুরু করলেন।

(তিন)

মুলচন্দানীকে যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল। কোন কিছু ভালভাবে বুঝতে না পেরে মাথায় হাত বোলাতে সুরু করলেন। হ

আগেকার প্রোগ্রামমত উর্বশী আর ডি ডিপার্টমেন্টে মিঃ চ্যাটার্জীর আন্ডারে কাজ করতে সুরু করল। মিঃ চ্যাটার্জী অবশ্য প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিলেন। উনি বলে-ছিলেন উর্বশী ডঃ মুলচন্দানীর সঙ্গে কাজ করুক। ডঃ মুলচন্দানী একজন ব্যাচেলর মানুষ। প্রথম জীবনে একটা প্রেমঘটিত ব্যাপারে আঘাত খাওয়ার পর থেকে সযত্নে মেয়েদের উনি এড়িয়ে চলেন। এ ব্যাপারে তিনি এতই কঠিন যে উর্বশীকেও কাছে ভিড়তে দিলেন না। ব্যাপারটায় মিঃ চ্যাটার্জী ফলাফল সঠিক পথেই চলছে। প্রথমদিন মিসেস সেনাপতির রি-এ্যাকশানও ওঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। উর্বশীকে সবাই মানুষের মর্যাদা দিচ্ছে। এ একটা মস্ত জয় মিঃ চ্যাটার্জীর জীবনে।

ডেমনেস্ট্রেশনের আগে পুরো এক সপ্তাহ মিঃ চ্যাটার্জী উর্বশীকে নিয়ে যত রকম এক্সপেরিমেন্ট করা সম্ভব তা করেছেন। উর্বশী সব পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করেছে। অবশ্য সেগুলো ছিল সিমুলেটেড অর্থাৎ কৃত্রিম অবস্থা সৃষ্টি করে ওর মানসিক অবস্থার বিচার করা। এখন উর্বশী স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। প্রতিটি অবস্থা সে কেমনভাবে গ্রহণ করছে—তার রি-এ্যাকশান কি রকম—সব কিছুর নোট রেখে যাচ্ছেন মিঃ চ্যাটার্জী। সত্যিই ডিপার্টমেন্টের সবাই যেন ভুলে গেছে যে উর্বশী মানুষ নয় একটা রোবোট মাত্র।

উর্বশীকে একটা নতুন কাজে লাগিয়েছেন মিঃ চ্যাটার্জী। গ্রহান্তপুরের বিভিন্ন খনিতে কাজ করার জন্য যে নতুন ধরণের রোবোট প্রোগ্রাম হাতে আছে তাদের ইলেকট্রনিক ব্রেন স্ট্রাকচার কিভাবে ডিজাইনিং করলে সব থেকে ভাল ফল পাওয়া যাবে তারই উপর কাজ করছে উর্বশী। খুব সুন্দর কাজ করছে উর্বশী। প্রতি সপ্তাহে উর্বশীর রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে ডঃ সেনাপতির কাছে। একদিন দেবী হলে নিজে ফোন করেন ডঃ মুলচন্দানীকে। তাছাড়া এই দু মাসের মধ্যে অন্তত দশ-বারোবার নিজে ডিপার্টমেন্টে এসে উর্বশীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে গেছেন। সেই প্রথমদিন থেকেই উর্বশীর কেমন একটা ভয় আছে ডঃ সেনাপতি সম্বন্ধে।

একদিন উর্বশী মিঃ চ্যাটার্জিকে বলল—সজল ডঃ সেনাপতি আমার সঙ্গে যখন কথা বলেন, তখন তুমি একটু কাছাকাছি থেক।

—কেন? মিঃ চ্যাটার্জি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমার কেমন যেন ভয় ভয় করে। একটু আমতা আমতা করে বলল উর্বশী।

—ভয়! হো-হো করে হেসে উঠলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

—তুমি হাসছো? উর্বশীর পাতলা ঠোঁট দুটো যেন অভিমানে কেঁপে উঠল।

—হাসবো না। কোম্পানীর চেয়ারম্যান তোমার সঙ্গে কথা বলবেন এ তো খুব স্বভাবিক কথা। তাতে ভয়ের কি আছে?

—সে তুমি বুঝবে না। ভীষণ ভয় করে আমার।

—দাঁড়াও। দাঁড়াও। বলতে বলতে মিঃ চ্যাটার্জি ওর প্যাডটা খুলে কি যেন নোট করতে শুরু করলেন।

—এত নোট করার কি আছে। কিছু কথা বলতে গেলেই অমনি খাতা-পেনসিল নিয়ে বসবে। বলেই প্যাডটা টেবিলের উপর থেকে জোর করে তুলে নিল উর্বশী।

মিঃ চ্যাটার্জি একটু অবাক হয়ে উর্বশীর মুখের দিকে তাকালেন। সে মুখে আশ্চর্য একটা খেলা চলছে। রঙ পাল্টাবার খেলা।

—বলো তুমি কাছাকাছি থাকবে? আবার প্রশ্ন করল উর্বশী।

—আমি কাছাকাছি থাকলে তোমার আর ভয় করবে না? একটু হেসে পাল্টা প্রশ্ন করলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

—না। তুমি আমার কাছাকাছি থাকলে আমার কোন কিছুতেই ভয় করে না।

মিঃ চ্যাটার্জি মনে মনে ভীষণ খুশী হলেন। উর্বশীকে সত্যিই তাঁরা যথেষ্ট উন্নত করে তৈরি করতে পেরেছেন। পারফেক্ট হিউম্যান রিঅ্যাকশান। উর্বশী রোবোট তৈরি করা মোটেও অসুবিধা হবে না। উর্বশীর ইলেকট্রনিক ব্রেনে যে নতুন অংশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে প্রায় একশজন যুবতী মহিলার প্রোলঙড ব্রেন-ওয়েভ রেকর্ডিং থেকে তৈরি এক সিন্থেটিক ব্রেন-ওয়েভ যা ইলেকট্রনিক মেমারী-সেল-এ স্টোর করে দেওয়া হয়েছে। মেমারী-সেল, প্রসেসিং-সেল অত্যন্ত ভাল-ভাবে কাজ করছে।

—কি কথা বলছ না যে।

—হুঁ।

—কথা দিচ্ছ আমার কাছাকাছি থাকবে?

—আচ্ছা আচ্ছা হবে।

—হবে না। আমার গা ছুঁয়ে বলো থাকবে। বলে উর্বশী মিঃ চ্যাটার্জির দিকে ওর মসৃণ পেলব হাতখানা বাড়িয়ে দিল। মিঃ চ্যাটার্জি হাতখানা ধরলেন। একটু চমকে উঠলেন—উর্বশীর হাত বেশ গরম। একটু থেমে মিঃ চ্যাটার্জি বললেন—আচ্ছা কথা দিচ্ছি। উর্বশীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। মিঃ চ্যাটার্জি এমন হাসি আগে কোনদিন উর্বশীর মুখে দেখেননি। শুধু উর্বশীর কেন, কোন মেয়ের মুখেই এরকম হাসি দেখার সুযোগ ঘটেনি মিঃ চ্যাটার্জির।

—এই যে ম্যাডাম এখানে বসে আড্ডা দিচ্ছেন—ওদিকে দেখুন তুলকালাম কাণ্ড চলছে। ডঃ ভোরা মিঃ চ্যাটার্জির চেম্বারে ঢুকতে ঢুকতে বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে উর্বশী ডঃ ভোরার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল—কেন কি হয়েছে?

—ডঃ মুলচন্দানী কি ডাটা খুঁজছেন—ডাটা খুঁজছেন না আপনাকে খুঁজছেন দেখুন গে। বলে ডঃ ভোরা হেসে ফেললেন।

—আচ্ছা আমি দেখছি। বলে উর্বশী চলে গেল। যাওয়ার আগে মিঃ চ্যাটার্জিকে চোখে চোখে বারণ করে গেল যেন একটু আগের ব্যাপার ডঃ ভোরাকে কিছু না জানায়।

—কি ভায়া উর্বশীর প্রেমে পড়ে গেলে নাকি? ডঃ ভোরা ঠাট্টা করে বললেন মিঃ চ্যাটার্জিকে।

—কে কার প্রেমে পড়ছে বোঝা মুস্কিল। তবে ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে। ভাবছি উর্বশীকে মুলচন্দানীর কাছে ট্রান্সফার করে দেব। এখন হয়ত উনি উর্বশীকে নিতে রাজী হবেন। বলে একটু হাসলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

—তা ঠিক বলেছো। এতকাল মেয়েদের কাছ থেকে শত হস্তেন দূরে থেকে এখন কিনা একটা রোবোটের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে বুড়ো। আমার কিন্তু আজকাল মুলচন্দানীকে দেখলে ভারী মজা লাগে।

—ডঃ ভোরা প্লীজ উর্বশীকে রোবোট

—ডোন্ট বি সো-মাচ ইমোশনাল চ্যাটার্জি। তোমার চোখমুখ ওরকম গম্ভীর করার কোন কারণ নেই—আমি সেভাবে কিছু বলিনি। নাঃ মেয়েটা দেখছি একটা সাংঘাতিক কিছু না করে ছাড়বে না। এদিকে চেয়ারম্যানের আনাগোনা। ওদিকে ডিরেকটরদের ফোনের পর ফোন। ব্যাপার হোলোটা কি? সবাই কি উর্বশী-পাগোল হল নাকি? বলে ডঃ ভোরা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

—হ্যাঁ। আর সেখানেই আমাদের প্রজেকটের সাফল্য।

—তোমার কথাই ঠিক চ্যাটার্জি।

(চার)

মিঃ চ্যাটার্জি ডঃ মুলচন্দানীকে বলতেই উনি রাজী হয়ে গেলেন। উর্বশী খবরটা পেতেই ক্ষেপে গেল। ছুটে এসে ঢুকলো ও মিঃ চ্যাটার্জির চেম্বারে। মিঃ চ্যাটার্জি আগে থাকতেই আঁচ করেছিলেন এরকম কোন ব্যাপারের। উর্বশীর চোখদুটো উত্তেজনায় লাল। একদৃষ্টে ও কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মিঃ চ্যাটার্জির দিকে। মিঃ চ্যাটার্জি মুখ তুলে ওকে দেখে শান্তভাবে বললেন—বোসো উর্বশী।

—তাড়িয়ে দিয়ে আবার বসতে বলছো? উত্তেজনায় গলার স্বরটা কাঁপছে উর্বশীর।

ও-কথা কেন বলছ? ডঃ মুলচন্দানী কাজটা তাঁর নিজের আণ্ডারে করাতে চান তাতে আমার কি আপত্তি করা চলে তুমিই বলো? মিঃ চ্যাটার্জি নিজের অসহায়তার কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

—মিথ্যে কথা বলছ—মিথ্যুক তুমি। ডঃ মুলচন্দানীকে তুমিই বলে রাজী করিয়েছো। কেন—কেন? কেন তুমি এমন ছলনার আশ্রয় নিলে সজল? আমাকে বললেই তো আমি তোমার সামনে আসতাম না। বলতে বলতে উর্বশী যেন ভেঙে পড়ল। তাড়াতাড়ি টেবিলে মাথা রেখে চুপ করে গেল ও।

মিঃ চ্যাটার্জি উর্বশীর মাথায় হাত দিয়ে বললেন—উর্বশী লক্ষ্মীটি আমাকে ভুল বুঝো না। সত্যি এ-ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না।

উর্বশী এক ঝটকায় মিঃ চ্যাটার্জির হাত সরিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। আর একবারও মিঃ চ্যাটার্জির মুখের দিকে তাকাল না। মিঃ চ্যাটার্জির মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

উর্বশীর রি-এ্যাকশানগুলো নিয়মিত নোট করতে বলে এসেছিলেন ডঃ মুলচন্দানীকে। কদিন বাদে নোটগুলো আনতে গিয়ে অবাক হলেন মিঃ চ্যাটার্জি। নোটের

—ব্যাপার কি ডঃ মুলচন্দানী?

—মানে নোট করার মত কিছু নেই বুঝলেন মিঃ চ্যাটার্জি—সী ইজ বিহেভিং লাইক আ পারফেক্ট ওমেন। কথা বলতে বলতে ঘন ঘন টাকে হাত দিতে লাগলেন ডঃ মুলচন্দানী।

মিঃ চ্যাটার্জি কি করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। ডঃ মুলচন্দানীর মত একজন দুঁদে বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এরকম কাজে গাফিলতির কথা ভাবাই যায় না। আস্তে আস্তে ডঃ মুলচন্দানীর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন মিঃ চ্যাটার্জি। ঠিক করলেন এরপর থেকে নিজেই আড়াল থেকে খেয়াল রাখবেন আর নোট করবেন। কাজ তো আর ফেলে রাখা যায় না। মনে মনে বললেন—সাবাস উর্বশী।

কাজ করতে গিয়ে কিন্তু পুরোপুরি আড়ালে থাকতে পারলেন না মিঃ চ্যাটার্জি। দু-চারবার উর্বশীর সামনে পড়ে যেতে হল। একটু হাসলেন মিঃ চ্যাটার্জি—পরিচিতের হাসি। কিন্তু উর্বশী মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। সে যে কোনদিন মিঃ চ্যাটার্জিকে চিনত তার কোন আভাস দেখা গেল না ওর চোখেমুখে। মিঃ চ্যাটার্জির মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। তবে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলেন। খুশীই হলেন—চমৎকার রি-অ্যাকশান। আনন্দে ওঁর মন ভরে গেল। প্রথম চান্সেই এতখানি সাফল্য যেন ভাবাই যায় না।

এ-আনন্দ কিন্তু বেশীদিন থাকল না। কয়েকদিন বাদে মিঃ চ্যাটার্জির ডাক পড়ল ডঃ মুলচন্দানীর চেম্বারে। মিঃ চ্যাটার্জি ঘরে ঢুকতেই একটুকরো ছোট্ট নোট তুলে দিলেন ডঃ মুলচন্দানী মিঃ চ্যাটার্জির হাতে। চেয়ারম্যান ডঃ সেনাপতির নোট ডঃ মুলচন্দানীকে লেখা—'মিঃ চ্যাটার্জি যেন নিজের কাজে মন দেন। অকারণে উর্বশীর পিছনে ঘুর ঘুর করার কোন প্রয়োজন নেই। এতে ডিপার্টমেন্টের কাজের ক্ষতি হয়। স্টাফ মোরেল নষ্ট হয়।' নোটটা পড়ে মিঃ চ্যাটার্জি ডঃ মুলচন্দানীর হাতে ফেরৎ দিলেন।

ডঃ মুলচন্দানী আজ আর টাকে হাত বোলালেন না। বেশ গম্ভীর গলায় বললেন—আপনার কিছু বলার আছে এ-ব্যাপারে মিঃ চ্যাটার্জি। কারণ আমাকে আবার একটা জবাব দিতে হবে এই নোটের।

—না স্যার, আই অ্যাম সরি, ভবিষ্যতে আর কখনো এমন হবে না। বলেই গটগট করে ডঃ মুলচন্দানীর চেম্বার থেকে বেরিয়ে পড়লেন মিঃ চ্যাটার্জি। বেরোবার সময় দেখতে পেলেন উর্বশী, ডঃ ভোরা, ডঃ শংকরণ ও আরো কার সঙ্গে যেন গল্প করছে আর হো-হো করে হাসছে। একবার ইচ্ছে হল মিঃ চ্যাটার্জির এগিয়ে গিয়ে উর্বশীকে জিজ্ঞাসা করেন—চেয়ারম্যানের কাছে কমপ্লেন করার মত কি করেছেন তিনি। তারপরই নিজেকে সংযত করে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে কিসব লিখতে শুরু করলেন। এই নোটের পরই উর্বশীর ফাইল কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। এখন বোর্ড অব ডিরেকটর্স যা ভাল বোঝেন তাই করবেন। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম বেদনা যেন রিন-রিন করছে যাকে ধরা যাচ্ছে না ছোঁয়া যাচ্ছে না। কেন? তবে কি?—না-না। নিজের মনকে শক্ত করলেন মিঃ চ্যাটার্জি। তিনি বৈজ্ঞানিক—মনোবিশ্লেষণই তাঁর কাজ। তার বেশী কিছু নয়।

ক'দিন কেটে গেছে। আগামীকাল উর্বশীর ফাইল পাঠিয়ে দেবেন ডঃ মুলচন্দানীর কাছে। তাই ফাইনাল রিপোর্ট তৈরি করছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি। খেয়াল ছিল না অফিস ছুটি হয়ে গেছে। ডিপার্টমেন্টের সবাই চলে গেছে। ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই খেয়াল হল। হাতের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে উঠতে যাবেন এমন সময় কেউ যেন ঘরে ঢুকল খুব সন্তর্পণে। একটু অবাক হয়ে তাকাতেই দেখলেন মিঃ চ্যাটার্জি মুখ নীচু করে ঘরে ঢুকছে উর্বশী। মিঃ চ্যাটার্জি একটু হাসলেন—এসো উর্বশী—বোসো।

উর্বশী হয়ত এরকমটা আশা করেনি। একটু অবাক হয়ে মিঃ চ্যাটার্জির মুখের দিকে তাকালো ও তারপর এগিয়ে এসে সামনের চেয়ারটায় বসে বসে নখ খুঁটতে লাগল।

—কি কিছু বলবে?

তবু উর্বশী মুখ তুলল না। কি বলবে বা কোথা থেকে বলবে তাই হয়ত ও মনে মনে ঠিক করে নিচ্ছিল।

—আবার কি অভিযোগ নিয়ে এসেছো? মিঃ চ্যাটার্জির গলার স্বরটা ভারী।—বিশ্বাস করো তোমাকে বিরক্ত করার জন্য আমি খুবই দুঃখিত উর্বশী—কিন্তু আমি নিরুপায়। তোমার ফাইল কমপ্লিট করার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। যাহোক আমার কাজ শেষ। কালই ফাইল পাঠিয়ে দেব ডঃ মুলচন্দানীর কাছে। এই দ্যাখো সেই ফাইল। বলে মিঃ চ্যাটার্জি টেবিলের উপর থেকে ফাইলটা তুলে দেখালেন উর্বশীকে।

উর্বশী এতক্ষণ কোনরকমে নিজেকে শক্ত করে বসেছিল কিন্তু আর পারল না। [illegible] থেকে উঠে এক ঝটকায় ফাইলটা মিঃ চ্যাটার্জির হাত থেকে টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের এক কোণায়।

—ফাইল—ফাইল—আর ফাইল। আমাকে এমন করে কষ্ট দেবার জন্যই বুঝি তৈরী করেছিলে। নিষ্ঠুর! বলতে বলতে উর্বশী মিঃ চ্যাটার্জীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মিঃ চ্যাটার্জীর বুক থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেল। সেই রিণরিণে যন্ত্রণাবোধটা মিলিয়ে গেল অকস্মাৎ। পরম মমতায় উর্বশীর মুখখানা তুলে ধরার চেষ্টা করলেন উনি। কিন্তু উর্বশী জোর করে মুখ গুঁজে রাখল মিঃ চ্যাটার্জীর বুকে। উর্বশীর উষ্ণ নরম সিন্থেটিক দেহের স্পর্শ মিঃ চ্যাটার্জীর সমস্ত রক্ত কণিকার মধ্যে কী এক আদিম মন্ত্র গুঞ্জরণ করে চলল। মিঃ চ্যাটার্জী এবার জোর করে উর্বশীর মুখখানা দুহাতের মধ্যে তুলে ধরলেন। উর্বশী দুচোখ বন্ধ করল। মিঃ চ্যাটার্জীর উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শে উর্বশীর সমস্ত দেহ যেন গলে গলে যেতে লাগল। মহাকাল বোধহয় মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ইতিহাসের এই বিস্ময়কর ক্ষণটিকে লক্ষ্য করে। কতক্ষণ পরে মিঃ চ্যাটার্জী বলে উঠলেন—উর্বশী তোমার ফাইল কমপ্লিট হয় নি। শেষ কথাটা এখনও রিপোর্টে লেখা বাকি রয়ে গেছে।

উর্বশী কপট রাগ দেখিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল—আবার ফাইলের কথা। অসভ্য কোথাকার!

ইউং সুন কিম (উত্তর কোরিয়া) ৩৩তম বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় মেয়েদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান

ইস্টভান জনিয়ার (হাঙ্গেরী) ৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন

খেলাধুলা

দর্শক

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

ইডেন উদ্যানের নেতাজী সুভাষ ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৩৩তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। অনুষ্ঠান পরিচালনায় প্রতিযোগিতার কর্মকর্তারা যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। কলকাতায় বিশ্ব পর্যায়ে খেলার বড় আসর এই প্রথম হল।

প্রতিযোগিতার মোট সাতটি খেতাব এবং জাপান ১ (মেয়েদের ডাবলসে রুমানিয়ার সঙ্গে যুগ্ম বিজয়ী)। অপরদিকে ইউরোপের হাঙ্গেরী ২, রাশিয়া ১ এবং রুমানিয়া ১ (ছেলেদের ডাবলসে জাপানের সঙ্গে যুগ্ম বিজয়ী)। রানার্স-আপ খেতাব পেয়েছে ইউরোপের যুগোশ্লাভিয়া ৩, রাশিয়া ১; এশিয়ার চীন ২ এবং দক্ষিণ কোরিয়া ১। প্রতিযোগিতার দুটি বিভাগের

পুরুষদের সিংগলস খেতাব

পুরুষদের সিংগলস ফাইনালে উঠেছিলেন ৮নং বাছাই ইস্টভান জনিয়ার (হাঙ্গেরী) এবং ৭নং বাছাই এন্টন স্টিপানচিক (যুগোশ্লাভিয়া)। জনিয়ার ৩—২ খেলায় স্টিপানচিককে পরাজিত করে খেতাব জয়ী হন। স্টিপানচিক প্রথম খেলায় ২১—১৭ এবং দ্বিতীয় খেলায় ২১—১২ পয়েন্টে জিতে ২—০ খেলায় এগিয়ে যান। খেলার এই অবস্থায় খেতাব পেতে স্টিপানচিকের মাত্র একটা খেলায় জয়লাভের দরকার ছিল. অপরদিকে জনিয়ারের ছিল তিনটে খেলায়। স্টিপানচিকের মত শক্তিশালী খেলোয়াড়কে পরপর তিনটে খেলায় হারিয়ে জনিয়ার শেষ পর্যন্ত খেতাব পাবেন এমন কথা কেউ কল্পনা করেননি। শেষ পঞ্চম খেলায় একসময় উভয়েরই পয়েন্ট সমান ১৮—১৮ দাঁড়ায়। এর পরই জনিয়ার এগিয়ে যান।

হাঙ্গেরী এই নিয়ে ৯ বার পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয়ের পুরস্কার 'সেন্ট ব্রাইড ভেস' পেল। তাদের পক্ষে শেষ এই খেতাব পেয়েছিলেন সিডো, ১৯৫৩ সালে।

জয়ের পথে এশিয়ার আধিপত্যে তৃতীয় বাধা পড়লো। বিগত ১৫ বারের প্রতিযোগিতায় (১৯৫২-৭৫) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছে জাপান ৭ বার, চীন ৫ বার হাঙ্গেরী ২ বার এবং সুইডেন ১ বার। যুগোশ্লাভিয়া কখনও পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পায়নি।

মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব

মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে অবাছাই খেলোয়াড় ইয়ং সুন কিম (উত্তর কোরিয়া) অপ্রত্যাশিতভাবে ৩—১ খেলায় ২নং বাছাই চ্যাং লীকে (চীন) পরাজিত করেন। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে উত্তর কোরিয়ার পক্ষে এই প্রথম খেতাব জয়। আরও উল্লেখ্য, উত্তর কোরিয়ার এই ১৮ বছরের স্কুল ছাত্রী সুন কিম বিশ্ব টেবল টেনিস আসরে তাঁর প্রথম যোগদানের বছরেই খেতাব জয় করলেন। এমন কি তিনি এ বছরের দলগত বিভাগের খেলায় অংশ গ্রহণ করেননি। ফাইনালের প্রথম খেলায় চ্যাং লী ২৬—২৪ পয়েন্টে জিতে ১—০ খেলায় এগিয়ে যান। কিন্তু পরবর্তী তিনটি খেলায় যথাক্রমে ২১—১২, ২১—১৪ এবং ২১—১৭ পয়েন্টে ২নং বাছাই চ্যাং লীকে পরাজিত করে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও অভিনন্দন লাভ করেন।

গত ২৫ বারের প্রতিযোগিতায় (১৯৫২-৭৫) মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছে জাপান ৭ বার, রুমানিয়া ৪ বার চীন ৩ বার এবং উত্তর কোরিয়া ১ বার।

পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে ৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে এশিয়ার ৩ জন (জাপান ২ ও চীন ১) এবং ইউরোপের ৫ জন খেলোয়াড় ছিলেন (যুগোশ্লাভিয়া ২, সুইডেন ১, হাঙ্গেরী ১ এবং রাশিয়া ১)। সেমি-ফাইনালে এশিয়া এবং ইউরোপের খেলোয়াড় সংখ্যা সমান দাঁড়ায়—জাপানের ২, হাঙ্গেরীর ১ এবং যুগোশ্লাভিয়ার ১। সেমি-ফাইনালে জাপানের দু'জন খেলোয়াড় হেরে যাওয়াতে ফাইনালে এশিয়ার একজন খেলোয়াড়ও ছিলেন না। এটা নিঃসন্দেহে একটা মস্ত বড় ব্যতিক্রম। কারণ ১৯৫৪ সাল থেকে পুরুষদের সিঙ্গলসের গত ১২টি ফাইনালের প্রতিটিতে এশিয়ার খেলোয়াড় খেলেছিলেন এবং খেতাব জয় করেছিলেন ১১টি (জাপান ৬ এবং চীন ৫)।

মেয়েদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে ৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে এশিয়ার ৫ জন (চীন ৩, উত্তর কোরিয়া ১ ও দক্ষিণ কোরিয়া ১) এবং ইউরোপের ৩ জন খেলোয়াড় ছিলেন (রাশিয়া ১, রুমানিয়া ১ এবং যুগোশ্লাভিয়া ১)। সেমি-ফাইনালে খেলেছিলেন এশিয়ার ৩ জন (চীন ২ ও উত্তর কোরিয়া ১) এবং ইউরোপের ১ জন (রাশিয়া ১)। ফাইনালে উঠেছিলেন চীন ও উত্তর কোরিয়ার খেলোয়াড়। ১৯৫৬ সাল থেকে মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে এশিয়ার প্রাধান্য অক্ষুন্ন থেকে গেছে—একটানা ১১টি খেতাব জয় (জাপান ৭, চীন ৩ এবং উত্তর কোরিয়া ১)।

জাপানের ব্যর্থতা

গত দু'বারের (১৯৭১ ও ১৯৭৩) মত জাপান এবারও একটি খেতাব পেয়েছে। ১৯৭৫ সালের আসরে তারা মাত্র একটি বিভাগের ফাইনালে খেলে গতবারের মত রুমানিয়ার সঙ্গে মেয়েদের ডাবলস খেতাব জিতেছে। কি শোচনীয় ব্যর্থতা। অথচ এই জাপানের কি সুদিনই না ছিল। ১৯৫২ সালে বোম্বাইয়ের বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান তাদের প্রথম যোগদানের বছরেই ৪টি খেতাব জয়ী হয়েছিল। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপানই এশিয়া মহাদেশের পক্ষে সর্বপ্রথম খেতাব জয় করে। একক বছরের আসরে সাতটি খেতাবের মধ্যে জাপান ৬টি করে খেতাব পেয়েছে ২ বার (১৯৫৪ ও ১৯৬৭)। এ-রেকর্ড অপর কোন দেশ একবারও করতে পারেনি। জাপান এপর্যন্ত ১৪টি বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে খেতাব জয়ী হয়েছে ৪৬টি (রেকর্ড)। জাপানের পর এই সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জয়—চীনের ২১টি খেতাব, রুমানিয়ার ১৫টি খেতাব এবং হাঙ্গেরীর ১২টি খেতাব।

খেলার অবনতি

এবারের প্রতিযোগিতায় খেলার ফলাফলের দিক থেকে অনেক অঘটন ঘটেছিল। যোগদানকারী খেলোয়াড়দের খেলা বিচার-বিবেচনা করে যোগ্যতার যে বাছাই-তালিকা তৈরি হয়েছিল তার ওপরের দিকের খেলোয়াড়রা নীচের দিকে বাছাই অথবা অবাছাই খেলোয়াড়দের কাছে হেরে গিয়ে বিচারকদের মাথা হেঁট করে দিয়েছিলেন। ব্যাপার দেখে শুনে [illegible]ধমান দর্শকরা

খেলার ফলাফল সম্পর্কে মুখ খোলেননি—কখন কি হবে তার ঠিক কি?

পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে উঠেছিলেন ৭ নং ও ৮ নং বাছাই খেলোয়াড়। গতবারের (১৯৭৩) সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং ১নং বাছাই সী য়েন টিং (চীন) কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যান ৭নং বাছাই যুগোশ্লাভিয়ার স্টিপর্নচেকের কাছে। ২নং বাছাই যুগোশ্লাভিয়ার সুরবেক কোয়ার্টার ফাইনালে অবাছাই খেলোয়াড় জাপানের কোনোর কাছে পরাজিত হন। ৩নং বাছাই খেলোয়াড় লি চেন শী (চীন) ২য় রাউন্ডে অবাছাই খেলোয়াড়ের কাছে হেরে যান। এমনি করে এক-একজন ওপরের দিকের বাছাই খেলোয়াড় বিদায় নিয়েছিলেন।

মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে উঠেছিলেন ২নং বাছাই চ্যাং লী (চীন) এবং অবাছাই ইউং সুন কিম (উত্তর কোরিয়া)। গতবারের (১৯৭৩) চ্যাম্পিয়ান এবং ১নং বাছাই হু ইউ-লান (চীন) প্রথম রাউন্ডেই অবাছাই খেলোয়াড় রাশিয়ার স্টানাকেনের কাছে হেরে দারুণ বিস্ময় সৃষ্টি করেন। ৩নং বাছাই লী আয়লেসা (দক্ষিণ কোরিয়া) পরাজিত হন প্রথম রাউন্ডে। শেষ পর্যন্ত ২নং বাছাই চ্যাং লী ফাইনালে উঠে বাছাই তালিকার মর্যাদা কিছুটা রক্ষা করেছিলেন।

মেয়েদের ডাবলসের ফাইনালের দুদিকেই অবাছাই জুটি খেলেছিলেন।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষদের সিঙ্গলস : ৮নং বাছাই ইস্টভান জনিয়ার (হাঙ্গেরী) ১৭—২১, ১২—২১ ২১—১৪ ২১—১৫ ও ২১—১৯ পয়েন্টে ৭নং বাছাই এন্টন স্টিপানচিককে (যুগোশ্লাভিয়া) পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস : অবাছাই খেলোয়াড় পার্ক ইয়ং সুন কিম (উত্তর কোরিয়া) ২৪-২৬ ২১-১২ ২১-১৪ ও ২১—১৫ পয়েন্টে ২নং বাছাই চ্যাং লীকে (চীন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : ইস্টভান জনিয়ার এবং গ্যাবর গ্যারগেলি ২১-১৯ ১৯-২১ ২১—১৬ ও ২১—১৬ পয়েন্টে স্টিপ্যানচিক এবং সুরবেককে (যুগোশ্লাভিয়া) পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস : অবাছাই জুটি মারিয়া আলেকজান্দ্রু (রুমানিয়া) এবং সোকো তাকাহাসি (জাপান) ২১—১৮ ৯—২১ ২১—৯ ও ২১—১৪ পয়েন্টে অবাছাই জুটি চু সিয়াং-উন এবং লিন মী-চীনকে

মিকসড ডাবলস : স্ট্যানিসলভ গোমোজকোভ এবং শ্রীমতী ফার্ডম্যান (রাশিয়া) ২১—১৩ ২১—১৩ ও ২৩—২১ পয়েন্টে ৫নং বাছাই শ্রীমতী এলমিরা এন্টোনিয়ন এবং সার্কিস সার্বাখিযানকে (রাশিয়া) পরাজিত করেন।

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

৬ষ্ঠ টেস্ট ক্রিকেট খেলা

মেলবোর্ণে ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার শেষ ৬ষ্ঠ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ৪ রানে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করায় অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজে ৪-১ খেলায় (ড্র ১) 'রাবার' জয় করেছে।

প্রথম দিনেই অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ১৫২ রানের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৭৪-৭৫ সালের টেস্ট সিরিজে এই ১৫২ রান অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বনিম্ন রান। ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার পিটার লেভার ৩৮ রানে ৬টা উইকেট পান—টেস্ট খেলায় তাঁর এটা শ্রেষ্ঠ বোলিং। প্রথম দিনের বাকি সময়ের খেলায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের একটা উইকেট পড়ে ১৫ রান উঠেছিল।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৭৩ (৩ উইকেট)। ফলে ইংল্যান্ড ১২১ রানে এগিয়ে যায়। তাদের হাতে জমা থাকে প্রথম ইনিংসের ৭টা উইকেট। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক মাইক ডেনেস ১৩৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। এই নটআউট ১৩৩ রান টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় তাঁর সর্বোচ্চ রান। এবিষয়ে তাঁর পূর্ব রেকর্ড ১১৮ রান (বিপক্ষে ভারত, ১৯৭৪)। এইদিনের খেলায় ৩য় উইকেটের জুটিতে এডরিচ (৭০ রান) এবং ডেনেস দলের ১৪৯ রান এবং অসমাপ্ত ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ডেনেস (নটআউট ১৩৩ রান) এবং ফ্লেচার (নটআউট ৫৬ রান) দলের ১০৬ রান তুলে দিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার দুই নামকরা বোলার লিলি এবং টমসন খেলায় অনুপস্থিত থাকায় ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা হাতের সুখে পিটিয়ে খেলেছিলেন।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৫২৯ রানের মাথায় শেষ হলে তারা অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ১৫২ রানের থেকে ৩৭৭ রানে এগিয়ে যায়। মাইক ডেনেস ১৮৮ রান করে আউট হন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাঁর আগে ইংল্যান্ডের কোন টেস্ট-অধিনায়কই এক ইনিংসের খেলায় এত রান করেন নি। ইংল্যান্ডের ৪র্থ উঠেছিল—৪র্থ উইকেটের জুটিতে ডেনেস এবং ফ্লেচার ৩১৮ মিনিটে ১৯২ রান এবং ৫ম উইকেটের জুটিতে ফ্লেচার এবং টনি গ্রিগ ১২৩ মিনিটে ১৪৮ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের শেষ ৬টা উইকেট মাত্র ২২ রানে পড়েছিল আধঘণ্টার মত খেলায়। অস্ট্রেলিয়ার মিডিয়াম পেস বোলার ম্যাকস ওয়াকার ১৪৮ রানে ৮টা উইকেট পেয়েছিলেন। টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় তাঁর এই সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড। তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় অস্ট্রেলিয়া তাদের ২য় ইনিংসের সমস্ত উইকেট হাতে জমা রেখে ৩২ রান করেছিল।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৭৪ (৩ উইকেটে)। তখনও ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৫২৯ রানের থেকে অস্ট্রেলিয়া ১০৩ রানের পিছনে পড়েছিল। অস্ট্রেলিয়া ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে প্রাণপণ করে ব্যাট করেছিল। ১ম উইকেটের জুটিতে রিক ম্যাককস্কার (৭৬ রান) এবং ইয়ান রেডপাথ ১১১ রান এবং ২য় উইকেটের জুটিতে রেডপাথ এবং ইয়ান চ্যাপেল দলের ১০৫ তুলে দিয়েছিলেন।

শেষ পঞ্চম দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ৩৭৩ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ৪ রানে জিতে যায়। খেলা শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময় থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে খেলার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ১৫২ রান (ইয়ান চ্যাপেল ৬৫ রান। পিটার লেভার ৩৮ রানে ৬ এবং ৫৬ ৫০ রানে ৩ উইকেট)

ও ৩৭৩ রান (রেডপাথ ৮৩, ম্যাককস্কার ৭৬, ইয়ান চ্যাপেল ৫০ এবং গ্রেগ চ্যাপেল ১০২ রান। আরনল্ড ৮৩ রানে ৩, লেভার ৬৫ রানে ৩ এবং গ্রিগ ৮৮ রানে ৪ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ৫২৯ রান (ডেনেস ১৮৮, ফ্লেচার ১৪৬, গ্রিগ ৮৯ এবং এডরিচ ৭০ রান। ওয়াকার ১৪৩ রানে ৮ উইকেট)

ডাঃ বি সি রায় ট্রফি

কোয়েম্বাটুরে অনুষ্ঠিত ১২শ জুনিয়র জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা ২-০ গোলে গত দুবছরের বিজয়ী কেরলকে পরাজিত করে মোট পাঁচবার ডাঃ বি সি রায় ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। বাংলার পক্ষে দুটি গোল করেন রাইট-আউট

সী য়েন টিং (চীন)

স্টিপানচিক

ফটো ঃ অমৃত

সুরবেক

ইয়ং সন কিম এবং চাং লী

খেলার জগতে মেয়ে

জিমন্যাস্টিকে বাবলী বিশ্বাস

বহুবাজার ব্যায়াম সমিতির বাবলী বিশ্বাস প্রায় ১৯৬৭ সাল থেকে জিমন্যাস্টিক শিক্ষা করছে। তবে প্রতিযোগিতার আসরে প্রথম নামে ১৯৭২-এ। সে বছর রাজ্য প্রতিযোগিতায় বীম ব্যালেন্স ভল্টিং হর্স আনইভিনবার এবং ফ্লোর একসারসাইজে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামার সুযোগ পায়। সে বছর কেবল ভল্টিং হর্সে ব্রোঞ্জ পদক পেলেও ৭৫-এ অর্থাৎ এ বছর রাজ্য জিমন্যাস্টিকের আসরে বীম ব্যালেন্সে ভারতী দাসের সংগে যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে।

কদিন আগে গিয়েছিলাম রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বহুবাজার ব্যায়াম সমিতির জিমন্যাস্টিকের অংগনে। ওখানেই দেখা হল বাংলার কয়েকজন জিমন্যাস্টিক কুশলী মেয়ের সংগে।

প্রসংগত বলে রাখি এই ব্যায়াম সমিতির বয়স পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এখানকার কর্মকর্তারা আর প্রশিক্ষকরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় সাহায্য করে চলেছেন। জিমন্যাস্টিকের প্রতি আমাদের তেমন নজর নেই তাই এদের কোন খবরই রাখা হয় না। অথচ নানান অভাব-অনটন ও বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও এবং আধুনিক সাজ-সরঞ্জামের সাহায্য না পেয়েও পশ্চিম বাংলার জিমন্যাস্টরা—কি ছেলে কি মেয়ে—নিষ্ঠার সংগে অনুশীলন করে চলেছে। সর্বভারতীয় আসরে সাফল্য অর্জন করে এ রাজ্যের নাম রাখছে।

জিমন্যাস্টিক একটি অতি উচ্চস্তরের খেলা। এতে একদিকে যেমন শরীরের উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয় অন্যদিকে তেমনি দেহ সুগঠিত সুশ্রী ও দর্শনীয় হয়ে ওঠে। স্বাস্থ্যের পরিণতি সৌন্দর্যে। একথা জিমন্যাস্টিকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী করে প্রযোজ্য। এ[illegible] একটি ছেলে বা মেয়ে নিয়মিত জিমনা[illegible] অনুশীলন করলে তাদের পেশীগুলি যেমন সচল ও মজবুত হয় তাদের দৈহিক পেলবতাও তেমনি বাড়ে। উপরন্তু দেহগঠন চমৎকার হয়ে ওঠে। এই ব্যায়াম সমিতিতে দেখলাম এখানকার কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকরা কি অক্লান্ত প্রয়াসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অনুশীলন করাচ্ছেন। বারবার বিভিন্ন ফিগার করায় তালিম দিচ্ছেন। কিশোরী আর তরুণীদের এক সুসংহত কঠোর শৃঙ্খলায় পরিচালিত করা হচ্ছে। একদিকে যেমন শাসন আছে তেমনি আছে সস্নেহ আচরণ। বর্তমানের বাধাবিঘ্ন কর্মকর্তাদের হতাশ করেনি বরং তাঁরা আশা করে আছেন স্বাধীন দেশের সমাজ ও সরকার ছেলে-মেয়েদের সুস্থ সবল করে গড়ে তোলার এই কাজের একদিন না একদিন স্বীকৃতি দেবেনই। কারণ দেশবাসীকে সবল সক্ষম কর্মঠ করে তুলতে দেহচর্চার প্রয়োজন যে কতখানি বিশ্বের অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালেই তা উপলব্ধি করা যায়। বলিষ্ঠ দেহসম্পদের অভাবে আজ আমাদের খেলোয়াড়রা বিশ্ব আসরে পিছিয়ে পড়ছে। এ অবস্থা বদলাতে চাই সর্বাত্মক প্রস্তুতি।

আর প্রস্তুতিরই ভিৎ হচ্ছে সবল সক্ষম দেহ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মন। জিমন্যাস্টিকে এই দুটি কাজই সম্পন্ন হয়। ভাল জিমন্যাস্ট আর সুদক্ষ নৃত্যকুশলীরা তাই অপূর্ব দেহশ্রীর অধিকারী হয়। এখনও আমাদের দেশে সবাই এ সত্য পুরোপুরি উপলব্ধি করেন নি। তাই জিমন্যাস্টিক ক্লাবের সংখ্যা বাড়তির বদলে কমতির দিকেই ঝোঁক নিয়েছে। প্রাক স্বাধীন যুগে এই কলকাতা শহরেতো বটেই, গ্রামাঞ্চলেও দেহচর্চার বহু কেন্দ্র ছিল। কিন্তু উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সে সংখ্যা কমে গেছে। অথচ এই দিকে দেশবাসীর নজর না পড়লে দেশেরই ক্ষতি।

তাই এই ব্যায়াম সমিতির কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতের আশায় 'এই ক্ষীণ দীপশিখা' জ্বালিয়ে রেখেছেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দিয়ে চলেছেন।

ও কথা এখন থাক। বাবলীর কথায় ফিরে আসি। অতি লাজুক স্বল্পভাষিণী মেয়েটিকে নানাভাবে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম ও ৭২ সালেই কালীঘাট ব্যায়াম সমিতি আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ভল্টিং হর্সে দ্বিতীয় ও বীমব্যালান্সে শীর্ষস্থান অধিকার করে ফ্লোর একসারসাইজেও দ্বিতীয় স্থান পায়। তাছাড়া এই বছর চন্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় জিমন্যাস্টিক আসরে কুড়ি বছরের অনূর্ধ্ব বিভাগে পশ্চিম বাংলার দ্বিতীয় স্থান লাভে বাবলীর অবদানও কম নয়।

পরের বছর অর্থাৎ ৭৩-এ রাজ্য প্রতিযোগিতার আসরে কুড়ি বছরের অনূর্ধ্ব বিভাগে কুশলী জিমন্যাস্ট কৃষ্ণা সাহার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে বাবলী বীমব্যালান্সে রৌপ্যপদক জয় করে। ৭৩-৭৪ মরশুমে ত্রিপুরায় আয়োজিত জাতীয় আসরে ও বাংলাদলে স্থান পেয়েছে। আসন্ন জাতীয় জিমন্যাস্টিকের আসরেও বাবলী পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে এ আশা ওর আছে—এবং সেজন্যে খাটছেও একনিষ্ঠভাবে।

বাবলীদের আদিবাড়ী মুড়াগাছা। তবে বর্তমানে ওরা থাকে রাণাঘাটে। বাবা রামজীবন বিশ্বাস ব্যাটারী ফ্যাকটরীর অফিসার। ওরা সাত বোন এক ভাই—ছোট বোন সুস্মিতাও জিমন্যাস্টিক শিখছে।

জিমন্যাস্টিক শেখার আগ্রহ কেন হল এ প্রশ্নের জবাবে বাবলী বলল রাণাঘাটের পাড়ার ক্লাবে জিমন্যাস্টিক দেখে। ঐ জিমন্যাস্টিক ক্লাবের ফকির দফাদার বাবলীকে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেন। ফকিরবাবুর সহায়তায় ও বহুবাজার ব্যায়াম সমিতিতে যোগদানের সুযোগ পায়। উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ পাচ্ছে এখানকার প্রশিক্ষক সন্তোষ ওঝার কাছে।

বাবলী সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। তাই তার পক্ষে রাণাঘাট থেকে ট্রেনে কলকাতায় এসে নিয়মিত প্রশিক্ষণ চালান খুবই কষ্টকর। তবু জিমন্যাস্টিকের প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে বলেই নানা বাধা ও অসুবিধা অগ্রাহ্য করে বাবলী আসে। সপ্তাহে অন্ততঃ পাঁচদিন প্রত্যহ দু ঘন্টা অনুশীলন করে বাবলী। এদিকে ঠিকমত পড়াশোনাও চালাতে হয়। বাবলী রাণাঘাটের পালচৌধুরী গার্লস হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা ওকে খেলাধুলার ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেন। আর উৎসাহ দেন ওর বাবাসহ বাড়ীর সবাই। জিমন্যাস্টিকের মত এইরকম একটা জটিল ব্যায়াম চর্চা করতে হলে উপযুক্ত পরিমাণে দুধ মাংস এবং ডিম প্রভৃতি খাওয়ারও প্রয়োজন। বাবলী বলে বাবা আমার জিমন্যাস্টিক চর্চায় উৎসাহ দেন তাই তিনি আমার জন্য নানারকম পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করেন।

এথলেটিকসের ওপরও বাবলীর আগ্রহ ছিল। কিন্তু জিমন্যাস্টিক চর্চার পর আর দৌড়ঝাঁপ চর্চা করার সময় পায় না তাছাড়া সামর্থ্যও থাকে না। তবে ও স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়ায় প্রতিবারই যোগ দেয়। একশ দুশ মিটার দৌড়ে প্রথম দ্বিতীয় হয়। নিয়মিতভাবে এথলেটিকস অনুশীলন করার সময় না থাকায় বাবলী বাংলার স্কুল ক্রীড়ায় এথলেটিকসে যোগ দিতে পারে না।

বাবলীদের প্রশিক্ষক সন্তোষ ওঝাও জানান ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করে। তাঁর দৃঢ় আশা বাবলী ক্রমেই আরও উৎকর্ষ লাভ করবে। এরা সবাই বাঙালী সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। অনেকরকম অসুবিধা সত্ত্বেও এরা অনুশীলন করছে। সমিতির পক্ষে এদের সুষ্ঠু ব্যায়াম ও জিমন্যাস্টিক চর্চার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। এখানকার তুলনায় পাঞ্জাব ও ত্রিপুরার জিমন্যাস্টরা অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। কারণ ওদের রাজ্য সরকার জিমন্যাস্টিকের উৎকর্ষের দিকে কড়া নজর রেখেছেন। প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের সুব্যবস্থা ছাড়াও বছরে অন্তত দু'তিন মাসের জন্য বিশেষ জিমন্যাস্টিক শিবির বসানো হয়। সেখানে আধুনিক প্রথা-পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করানো হয়। ছায়াছবির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় জিমন্যাস্টিক সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রকাশিত হয় সেসব যাতে শিক্ষার্থীরা জানতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া সরকারী ব্যয়ে জিমন্যাস্টদের পুষ্টিকর খাদ্যদান এবং খাদ্য সম্পর্কে পরামর্শ দেবারও ব্যবস্থা আছে।

বাবলী বলে আমরা কতো অসুবিধা সত্ত্বেও জিমন্যাস্টিক চর্চা করছি, বুঝলেন তো? তবু আমি এই মহড়া চালিয়ে যাব। ভবিষ্যতে বড় জিমন্যাস্ট হবার আশা রাখি।

জিজ্ঞাসা করলাম জিমন্যাস্টিকের বিভিন্ন খেলার মধ্যে কোনটি তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে?

উত্তর পেলাম : বীম ব্যালেন্স। এই খেলা শেখাও যেমন কঠিন নিখুঁতভাবে সুন্দর 'ফিগার' করাও তেমনি কঠিন। মেয়েদের পক্ষে জিমন্যাস্টিক চর্চা মোটেই অসুবিধাজনক নয় বলেও জানালো।

এই প্রসঙ্গে আরও বলল বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পাঞ্জাবের মেয়েদের জিমন্যাস্টিকই সবচেয়ে দর্শনীয় মনে হয়েছে। ওদের কাজ আমার খুব ভাল লেগেছে। হয়ত ওদের মত সুযোগ সুবিধা পেলে আমাদের মেয়েরাও আরও এগিয়ে যেতে পারবে।

নানা অভাব ও অসুবিধা অগ্রাহ্য করে ও যে একাগ্রমনে জিমন্যাস্টিক চর্চা করে চলেছে তার জন্য বাবলীকে সাধুবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। জনৈক কর্মকর্তার আফশোষ-ভরা কথাটি কানে বাজতে লাগল—এইসব একনিষ্ঠ ছেলেমেয়ে যদি তাদের জিমন্যাস্টিক চর্চায় সরকার ও সমাজের সমর্থন ও স্বীকৃতি না পায় তাহলে এদেশে জিমন্যাস্টিকের অগ্রগতি হবে কোন পথে? মুষ্টিমেয় পৃষ্ঠপোষক আর শুভার্থী একে কতদূরই বা নিয়ে যেতে পারে? অথচ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জিমন্যাস্টিক এখন জাতীয় শরীর চর্চার এক মুখ্য অংশ।

অময়

ব্রেশটের থিয়েটার বের্লিনার আঁসেম্বল

কৃষ্ণ ধর

বের্লিনার আঁসেম্বলে শেকসপীয়ারের কোরিওলেনাস নাটকের একটি দৃশ্য

এবার বার্লিনে আমার সবচেয়ে সুখপ্রদ অভিজ্ঞতা হল ব্রেশটের থিয়েটার বের্লিনার আঁসেম্বলে তাঁর নাটক দেখা। বেরটোল্ট ব্রেশট নিজহাতে এই থিয়েটারকে নতুন রূপ দিয়ে গেছেন। তাঁর চিন্তাশীল নাটক কীভাবে মঞ্চস্থ করেন ব্রেশট থিয়েটারের শিল্পীরা তা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সে এক স্মরণীয় সন্ধ্যা।

যুদ্ধের পর বার্লিন দুভাগ হয়েছে। সৌভাগ্য বলতে হবে ব্রেশট তাঁর থিয়েটারের জন্য পূবের বার্লিনকেই আপন করে নিয়েছিলেন। আজকের জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের দর্শনীয় যা কিছু তার অন্যতম ব্রেশটের থিয়েটার বের্লিনার আঁসেম্বল। পনেরো বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করে বেরটোল্ট ব্রেশট, মহান সমাজবাদী নাট্যকার, মানবতাবাদী কবি ফিরে এলেন স্বদেশে। নাৎসীবাদের দীর্ঘবাহুর আক্রমণ এড়াবার জন্য ব্রেশটের মতো অনেককেই তিরিশের দশকে দেশান্তরে যেতে হয়েছিল। জার্মানীতে তাঁদের জায়গা ছিল না। একে একে চলে গেলেন টমাস মান, আলবার্ট আইনস্টাইন বেরটোল্ট ব্রেশট। নির্বাসন ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না তাঁদের সামনে। যাঁরা সত্যনিষ্ঠ, স্বাধীন ও মুক্তচিন্তার প্রতিভূ একনায়কতন্ত্রী নাৎসী জার্মানী তাঁদের জায়গা ছিল না।

এই বি বি, অর্থাৎ বেরটোল্ট ব্রেশট তখন কলম আর মগজ নিয়ে পাড়ি জমালেন সাগর পারে, রুজভেল্টের আমেরিকায়। যাবার আগে ক্ষমতামত্ত নাৎসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন তাঁরাই জার্মানীর শেষ কথা নন, মানুষই হল শেষ কথা। [illegible]

বিগড়ে গেলে তাদের সমস্ত রণসজ্জা, বিপুল অস্ত্রসম্ভার কোনো কিছুই আর কাজে লাগবে না। তিনি লিখলেন :

সেনাপতি মশাই তোমার ওই ট্যাংকটা জবর
 গোটা বন গুঁড়োতে পারে
 ছাতু করতে পারে
শ'খানেক মানুষ,
কিন্তু একটাই ওর গলদ
ড্রাইভার ছাড়া চলতে পারে না।
সেনাপতি মশাই, তোমার বোমারুটাও বেশ
বাতাসের চেয়ে আগে ছোটে
 হাতির চেয়ে বেশি
মাল বইতে পারে
কিন্তু একটাই ওর গলদ
মিস্ত্রী ছাড়া ও অচল।
সেনাপতি মশাই, মানুষ খুব কাজের জীব
 সে উড়তে পারে, সে মারতেও পারে
 কিন্তু একটাই ওর গলদ
 সে ভাবতে পারে। [১৯৩৮]

ব্রেশট দেশান্তরে চলে গেলেও তিনি নিজেকে দেশত্যাগী ভাবতে পারেননি কখনো। কেননা তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ পড়েছিল জার্মানীতে। তিনি বললেন : "যারা স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে চলে যায় তারাই হল দেশত্যাগী, কিন্তু আমরা স্বেচ্ছায় নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে বাস করতে আসিনি। সেদেশে স্থায়ীভাবে বা চিরকালের জন্য বাস করতেও নয়। আমরা বিতাড়িত, আমরা নির্বাসিত। যে-দেশ আমাদের গ্রহণ করেছিল সেটা আমাদের স্বদেশ নয়, আমাদের নির্বাসনভূমি। আমরা অপেক্ষা করে আছি দেশে ফিরে যাবার জন্য। আমাদের স্বদেশ সীমান্তের যত কাছে এসে থাকতে পারি। লক্ষ্য রাখছি, সীমান্তের ওপারে সামান্যতম পরিবর্তন হয় কিনা। নতুন যে-ই দেশ ছেড়ে আসছে তার কাছ থেকে জানছি। কিছুই ভুলিনি আমরা, কিছুই হারাতে রাজী নই। যা ঘটছে তা [illegible] ক্ষমা করিনি। পাপের চেঁচামেচি আমাদের প্রতারিত করতে পারেনি। আমরা আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি।" [১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ]

বহু দেশ থেকেই লেখকদের ভাগ্যে নির্বাসন জুটেছে কোনো না কোনো সময়ে। কিন্তু একটি দেশ থেকে একই সময়ে তেরোশোর বেশি লেখকের নির্বাসন ইতিহাসে তুলনাবিহীন। হিটলারের জার্মানীতে তাই ঘটেছিল। নাৎসী জার্মানীকে রিক্ত করে তাঁরা চলে এসেছিলেন মুক্ত পৃথিবী হয়েছিল সমৃদ্ধতর। ব্রেশটের মতো শিল্পী যেদেশেই যাবেন সেদেশই ঈর্ষণীয় প্রতিভার অধিকারী হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

রোমাঁ রলাঁ এই নির্বাসিতদের স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন :

> You have brought with you everything of that Germany which we love and respect you have the Spirit of Goethe and Bethoven; Lessing and Marx with you.

ব্রেশটের প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়নি। তৃতীয় রাইখের চূড়ান্ত ধ্বংসাবশেষের ওপর গড়ে উঠল নতুন জার্মানী। নির্বাসিত ব্রেশটকে স্বাগত জানাল পূর্ব জার্মানীর সমাজতান্ত্রিক সরকার। সেই ঘরে ফেরার দিন আশ্চর্য সংবেদনায় মূর্ত হয়েছে তাঁর কবিতায় :

নিজের শহর, কেমন দেখতে লাগবে
 তখন তাকে?
ঝাঁক ঝাঁক বোমারুর পিছু পিছু,
বাড়ি ফিরলাম আমি।
কিন্তু কোথায় সেই শহর?
পাহাড়-উঁচু ধোঁয়া ছড়িয়ে আছে সেখানে;
ওই জ্বলজ্বলে আগুনের মাঝখানে।
 [১৯৪৮?]

সেই জ্বলজ্বলে আগুনের মাঝখানে নতুন জার্মানী মাথা তুলে দাঁড়াল, যে জার্মানী নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে, শান্তি ও সমাজবাদের পক্ষে। ব্রেশট ১৯৪৯ সালে বের্লিনার

অ্যাসেম্বলে তাঁর থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করলেন। ভুবনবিখ্যাত ব্রেশট রংগমঞ্চের জন্ম হল। জীবনবাদী নাটক দীর্ঘকাল নির্বাসনে থাকার পর স্বদেশভূমিতে পেল পুনর্বাসন। ব্রেশটের সহধর্মিণী শ্রীমতী হেলেন হবাইগেল নাট্যকারকে নতুন রংগমঞ্চের শুভ যাত্রায় দিলেন প্রেরণা। বের্লিনার অ্যাসেম্বল নতুন নাটকের পথ দেখাল যাকে বলা হয় ব্রেশটের এপিক থিয়েটার।

নাটকের বিষয়বস্তু ও প্রকরণ উভয় দিকেই ব্রেশট আনকোরা নতুন পথের প্রদর্শক। করুণা নয় দর্শকদের মনে চিন্তা জাগিয়ে তুলতে চাইলেন ব্রেশট তাঁর নাটকের মাধ্যমে, যে-চিন্তা পৃথিবীর অবিচার ও অসাম্য দূর করতে সহায়ক হবে। সমাজ-বাদী বাস্তবতাকে কীভাবে শিল্পসৃষ্টিতে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে হয় ব্রেশটের নাটক তা শেখায়। ইতিহাসের ঘটনাবলীর সঠিক ব্যাখ্যা মিলে যায় তাঁর লেখায়। 'মাদার কারেজ' 'ককেশিয়ান চক সার্কেল' 'থ্রি পেনি অপেরা' কিংবা 'গ্যালিলিও' নাটকের বিষয়বস্তু ও প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য নাট্যানুরাগীদের বিস্মিত করে ব্রেশটের ইতিহাসবোধের তীক্ষ্ণতায়, তাঁর সঠিক বিশ্লেষণক্ষমতায়।

রংগমঞ্চের বিন্যাস ও অভিনয়কলার ক্ষেত্রেও ব্রেশট থিয়েটারের নিজস্বতা সহজেই চোখে পড়ে। সেদিন বের্লিনার অ্যাসেম্বলে ব্রেশটের 'সোয়েইক ইন সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার' নাটক প্রযোজনা দেখেও তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মনে মনে অনুভব করেছি। নাটকপ্রিয় জার্মানরা দলে দলে এসে ভীড় করে ব্রেশটের নাটক দেখতে; পশ্চিম বার্লিন থেকেও আসেন। লক্ষ্য করেছি দর্শকদের মধ্যে রয়েছে সব শ্রেণীর লোক। ছাত্র যুবক, সৈনিক থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমিক বুদ্ধিজীবী সবাই।

মঞ্চের যবনিকাপটে পিকাসোর শান্তির পারাবত। শান্তির জন্য, মানবতার জন্যই যে এই রংগমঞ্চ উৎসর্গীকৃত তারই প্রতীক। ব্যঞ্জনা; এক মহাশিল্পীর কাজে অন্য এক মহাশিল্পীর পরিপূরক সহায়তা। দর্শক-দের মন এই প্রতীকের ব্যবহারে আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে থাকে ব্রেশটের বক্তব্য মনেপ্রাণে গ্রহণের জন্য।

এই নাটকটি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। ফ্যাসিবাদী আরও অনেক নাটক লিখেছেন ব্রেশট 'সেনোরা কারারের রাইফেল' 'আর্টুরো উই' তাদের মধ্যে বিখ্যাত। এই নাটকটিতেও তিনি ফ্যাসিবাদের নানা ঘৃণিত চেহারার [illegible] দর্শকদের পরিচিত করান এবং

ব্রেশটের ফ্যাসীবিরোধী নাটক
শোয়েইক ইপন সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার'-এর একটি দৃশ্য

সংকেত রাখেন অমোঘভাবে ইতিহাসের সেই অনাগত অধ্যায়ের দিকে যেখানে মানুষই চূড়ান্তভাবে জয়ী তার স্বাধীন বিবেক ও অপরাজিত মনোবল নিয়ে। মঞ্চে প্রদর্শিত স্টালিনগ্রাদ রণাঙ্গনে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, অবসন্ন শোয়েইকের করুণ চিত্র নাৎসীবাদের অবধারিত বিনাশকে এমন তীব্রভাবে নিশ্চিত করে তোলে যে প্রতিটি দর্শক রুদ্ধশ্বাসে তখন অপেক্ষা করেন সেই পরিণতির জন্য। বক্তব্যে সুস্পষ্ট প্রয়োগে অসাধারণ।

ব্রেশট নেই, শ্রীমতী হাইগেলও সম্প্রতি লোকান্তরিত। আছে ব্রেশটের নাট্যচিন্তা, আছে তাঁর নিজের হাতে তৈরি শিল্পীর দল—দ্য ব্রেশট পিপল্। তাঁর বক্তব্য, প্রযোজনা অভিনয়রীতি ও মঞ্চসজ্জা সবই

স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। অথচ কোনো চমক বা জাদুর ব্যবহার নেই। আলোর ব্যবহারেও কোনো আড়ম্বর চোখে পড়েনি। উজ্জ্বলতম আলোয় রঙ্গমঞ্চের প্রতিটি কোণ প্লাবিত, অভিনেতাদের প্রতিটি ভঙ্গি ও অভিব্যক্তি পশ্চাদতম সারির দর্শকদের কাছেও প্রতিভাত। তাঁর নাটকে পাওয়া যায় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাস্তবতার প্রয়োগ। সমাজবাদী বাস্তবতার শৈল্পিক প্রয়োগে ব্রেশটের নাটক সমকালীন এবং চিরকালীন।

এ বিষয়ে জানবার কৌতূহল ছিল। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে নাটকাভিনয়ের প্রতি মুহূর্তে লক্ষ্য করেছি, এই নাটকের ভাষার সঙ্গে তাদের পরিচয় নিবিড়। ব্রেশটপদ্ধতির সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গ সখ্য। করতালিতে মুখরিত হয়েছে প্রেক্ষাগৃহ। নাটকের সংবেদনা পৌঁছে গেছে পশ্চাদতম সারিতে। জার্মান ভাষায় নাটক। দর্শকদের মধ্যে আমিই ছিলুম একমাত্র কৃষ্ণকায়। ভাষা না বুঝলেও ব্রেশটের বক্তব্য বুঝতে কষ্ট হয়নি। এত মানবিক ও সমকালীন তার প্রয়োগ ও উপস্থাপনা।

পরদিন সকালে গেলুম ব্রেশট থিয়েটারের অন্যতম কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে। ডঃ হানস-জোকেন ইরমার আমাকে স্বাগত জানালেন তাঁর কক্ষে। ভেতরে ঢুকবার আগে দেখলুম বাইরের লনে বসে আছেন অনেক শিল্পী ও কলা-কুশলী। একটি বিরাট ট্রাকে থিয়েটারের সাজসরঞ্জাম তোলা হচ্ছে। হয়তো বা বার্লিনের বাইরে যাবার প্রস্তুতি। ইরমারের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানালুম, কলকাতায় ব্রেশট কতটা জনপ্রিয়। তাঁর নাটকের বাংলা রূপান্তর দর্শকদের আগ্রহই শুধু বাড়ায়নি নাট্যরুচিরও বদল ঘটিয়েছে গত দুই দশকে। ডাঃ ইরমার শুনে আনন্দিত ও বিস্মিত হলেন। তিনি কলকাতায় ব্রেশটের এত জনপ্রিয়তার কথা জানতেন না। উঠে গিয়ে ড্রয়ার থেকে বার করে আনলেন একটি ফাইল। দেখে বললেন, দিল্লি থেকে একজন আলকাজি এসেছিলেন। ককেশিয়ান চক সার্কেল প্রযোজনার পরামর্শ নেবার জন্য।

জানতে চাইলুম, ব্রেশট থিয়েটার অভিনেতাদের কীভাবে সংগ্রহ করেন। তিনি বললেন, জি ডি আর-এ অভিনয় শিক্ষার অনেকগুলো স্কুল আছে। বার্লিন, লাইপৎসিগ ও রোস্টক শহরে এই স্কুল-গুলো থেকে শিক্ষার্থীরা স্নাতক হয়ে বেরোয়। তাদের মধ্যে থেকেই আমরা পাই অভিনেতা। তবে ভাল অভিনেত্রী পাওয়া সব সময়েই কঠিন।

চৌদ্দ বছর বয়সেই এইসব স্কুলে ভর্তি হওয়া যায়। দু বছরের কোর্স। বের্লিনার অংসেম্বলের শিল্পীরা সবাই চুক্তিবদ্ধ। কখনও কখনও অন্য থিয়েটার থেকে শিল্পীদের আনা হয় অতিথি হিসেবে কোনো বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করার জন্য। এমেচর অভিনেতাও আছেন যাঁরা অন্য জীবিকায় নিযুক্ত, কিন্তু অভিনয় করতে ভালবাসেন।

শিল্পীদের জীবিকার সম্মান ও নিরাপত্তা রাষ্ট্র দিয়েছে। ডাঃ ইরমারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, শ্রমজীবী হিসেবে অভিনয়শিল্পীদের বেতন সরকার নির্দিষ্ট নিয়মে দিতে হয়। শিল্পীদের মধ্যে অবশ্যই স্তরভেদ আছে। একজন নতুন শিল্পী শুরুতেই পাবেন মাসে ৭০০ মার্ক। সাধারণভাবে শিল্পীদের গড়পড়তা মাসিক বেতন ১৩০০ মার্ক। সরকার ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে এ বিষয়ে বোঝাপড়া করে শিল্পীদের বেতনক্রম ঠিক হয়। ডাক্তার ইনজিনিয়ারদের চেয়েও শিল্পীরা বেশি বেতন পান সমাজতান্ত্রিক জার্মানীতে।

ব্রেশট নিজে অফুরন্ত নাটক লিখেছেন এবং তাঁর সব কটিই চমকপ্রদ। এ ছাড়াও তিনি শেকসপীয়ার, বার্নার্ড শ সিয়ান ও কেসির নাটক তাঁর মঞ্চে তাঁর পদ্ধতিতে প্রযোজনা করে গেছেন। শেকসপীয়ারের 'কোরিওলেনাস' বার্নার্ড শ-র 'মিসেস ওয়ারেনস্ প্রফেশন' ব্রেশট-পদ্ধতিতে অভিনীত হয়ে প্রচুর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। প্রতিটি নাটক প্রযোজনার অন্তরালে রয়েছে অসাধারণ পরিশ্রম আর অনুশীলন। বের্লিনার অংসেম্বল বছরে ১২ থেকে পনেরোটি নাটক মঞ্চস্থ করে। পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়াবার আগে চলে কঠোর অনুশীলন যাকে নাটকের ভাষায় বলে মহলা বা রিহার্সাল। নতুন নাটক নামাবার আগে ৮০ থেকে ১০০ দিন রিহার্সাল ব্রেশট থিয়েটারে আবশ্যিক। কোনো কোনো নাটকের রিহার্সাল ২০০ দিনও হয়।

সোমবার ছাড়া রোজই বের্লিনার অংসেম্বলে নাটক অভিনীত হয়। কোনো কোনো দিন দুবার অভিনয়ের আয়োজন। একই নাটক রোজ অভিনয় হয় না। ঘুরে-ফিরে অভিনয়ের ব্যবস্থা। থ্রি পেনি অপেরা ৬০০ রজনী, কোরিওলেনাস ৬০০ রজনী, শোয়েইক ৬০০ রজনী, মিসেস ওয়ারেনস্ প্রফেশন ৫০০ রজনী, অভিনীত হবার পরও দর্শকদের আগ্রহ কমেনি।

নতুন নাট্যকাররাও আসছেন বের্লিনার অংসেম্বলে। তবে ব্রেশটপদ্ধতির নাটকই তাঁরা গ্রহণ করেন। জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের তরুণ নাট্যকার হাইনের মুলার (জন্ম ১৯২৮)-এর নাটক 'সিমেন্ট' অংসেম্বলের জন্যই লেখা। এটি অভিনীত হয়ে দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে। বের্লিনার অংসেম্বল এই নাটক লেখার জন্য মুলারকে দশ হাজার মার্ক আগাম দিয়েছিল। অভিনয়স্বত্ব হিসেবে নাট্যকার পাবেন বিক্রীর দশ শতাংশ।

ব্রেশটের নামাঙ্কিত রাস্তার ওপরেই বের্লিনার অংসেম্বল ভবনটি দাঁড়িয়ে আছে। বিদেশ থেকে আমন্ত্রণ আসে তার শিল্পীদের কাছে। ইয়োরোপের আমন্ত্রণই বেশি। প্রাচ্যদেশে এখনো তাঁরা যাননি।

আমি জানতে চেয়েছিলুম, কোনোদিন কলকাতায় কি ভারতবর্ষে আসবেন কি?

ডাঃ ইরমার বললেন, সরকারী স্তরেই এর ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব।

ভারত ও জি ডি আর-এর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যসূচীর মাধ্যমে যদি কখনো এই প্রস্তাব আসে তাহলে আমরা চাইব প্রথমেই কলকাতায় যেতে। যেহেতু কলকাতার দর্শক ব্রেশট থিয়েটারে অনুরক্ত।

কে এ আব্বাস পরিচালিত
ফয়সলা : রমন খান্না - কোমলা রিক

জেল থেকে বলছি
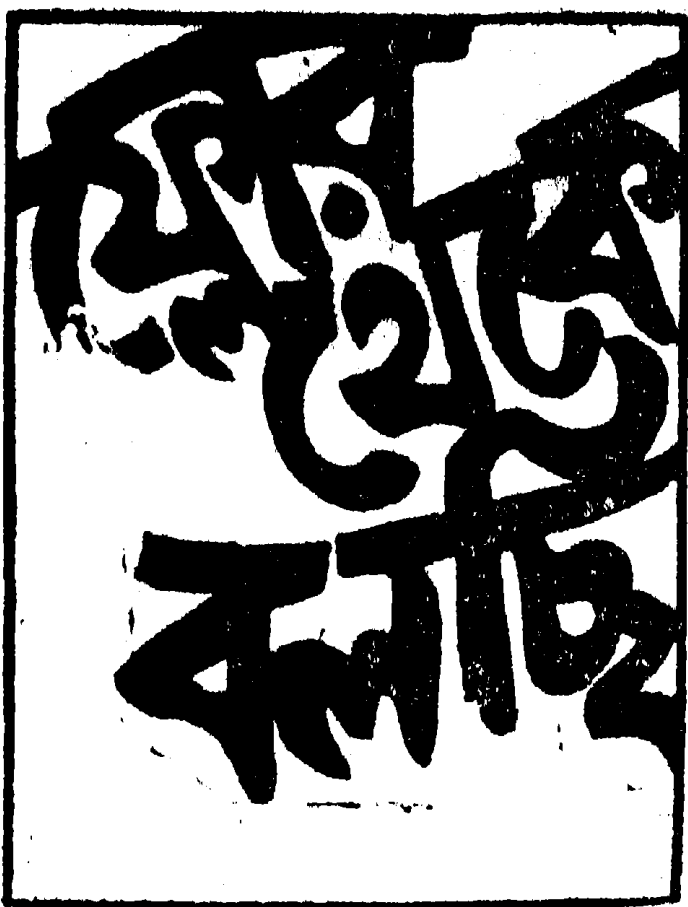
আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ভাংগা নৌকার পাল। অন্ন নেই। বস্ত্র নেই। চাকরী নেই। প্রতিরোধ নেই। অথচ হতাশা আছে। আছে নৈরাশ্য। বিতৃষ্ণা আছে। চারিদিকে সারি সারি লোভের পাঁচিল। জীবন নেই কিন্তু স্বপ্ন আছে। এখানে বিপ্লব হয় না। হাজার হাজার মানুষের মিছিল হয়। মিটিং হয়। বক্তৃতা হয়। মুষ্টিবদ্ধ হাত ওঠে আর নামে। এরই মধ্যে একজন যুবক আর একজন যুবতী, গল্প নয়, টুকরো টুকরো বাস্তব ছবি। ওরা স্বপ্ন দেখছিল। একটা নিজস্ব পৃথিবী গড়তে চেয়েছিল। যেখানে দুঃখ নেই, যন্ত্রণা নেই, হতাশা নেই, নৈরাশ্য নেই।...স্বাভাবিক জীবন থেকে পালাতে চেয়েছিল মানে এক দুঃখ থেকে আরেক দুঃখে, এক যন্ত্রণা থেকে আরেক যন্ত্রণায়।...

'পালাবার পথ নেই'...তরুণ পরিচালক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এই ছবির প্রথম পরিচ্ছেদে মোটামুটি নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজটাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন যারা ভাংগা কুঁড়েঘরে বাস করে আকাশকে বন্ধুত্ব জানায়। এই যুবক এবং যুবতী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যেন সেই দেশলাই কাঠিমুখে আমার উসখুস করছে বারুদ—বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস; ...ওদের প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা ওরা হারিয়েছে। তাই ওরা এই সমাজের, সমাজের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না। সেই দুর্দমনীয় শক্তি নেই। স্যাঁতসাঁতে ভিজে ঘরে উত্তাপ আর আলোর অভাব। প্রতি মুহূর্তে অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা। ঘর ভরে যাচ্ছে দীর্ঘশ্বাসের কালো ধোঁয়ায়। একজন যুবক—সারি সারি যুবকে রূপান্তরিত। তেমনি একজন যুবতী—সারি সারি যুবতী। ঐক্যহীন বিশৃংখলা দেখে স্তব্ধ হতে হয়। মনে হয় বার বার এদেশ বিপন্ন আজ। তৃতীয় পরিচ্ছেদে যুবক এবং যুবতী অনেক, অনেকটা দূরত্বে উপস্থিত। সমাজ এবং রাজনীতি বহির্ভূত ওদের সমস্যা! আকাশ, দিগন্ত, মাঠ আর সবুজ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা ওদের মনের চৌহদ্দি। সহসা ঝড় ওঠে। কাল যেখানে ফুলের গাছ আজ সেখানে বেড়া। এই বেড়া ডিঙোবার যেতে হবে সামনে।...হে জীবন, হে যুগসন্ধিকালের চেতনা—

আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত
দুর্দমনীয় শক্তি। প্রাণে আর মনে দাও
শীতের শেষের তুষার-গলানো উত্তাপ।
টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।...

পরিচালক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে সমাজ-এর ওপর তলার মানুষের ছবি তুলে ধরছেন। মোট কথা, তিনটে ক্রশ সেকসান অফ লাইফ—সমস্যাসংকুল জীবনের ভিন্নমুখী সমস্যার আয়নায় চরিত্রবিশেষ বা চরিত্র-মিছিলকে তুলে ধরা। সামগ্রিকভাবে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চরিত্রের সমাবেশ হলেও মূলতঃ এ-ছবিতে প্রধান দুটি চরিত্র—যুবক ও যুবতী। তিনটি পরিচ্ছেদে একই নামে এসেছে ওরা। তবুও আপাতদৃষ্টিতে সংযোগহীন। সংযোগ গভীর, গভীরতর পরিণতিতে যখন অ্যাবসলিউট লড়াইয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

এই চলচ্চিত্র ভাবনার ভগ্নাংশ থেকেই বোঝা যায় এর পরিপূর্ণতার লক্ষণ বর্তমান। চিত্রকর যে উদ্দেশ্যে ছবি আঁকেন, একজন কবি যে উদ্দেশ্যে কবিতা লেখেন, একই উদ্দেশ্যে এই ছবি। পরিচালক চান তাঁর বোধ বুদ্ধি অভিজ্ঞতা একালের যুবকদের যন্ত্রণার অন্তঃস্থল স্পর্শ করুক ওপর ওপর নয়। তোলপাড় তুলুক সকলের মধ্যে। অনুভবে আলোড়িত হয়ে আয়নায় সবাই নিজেকে দেখুক। কারণ [illegible]
এ-ছবির বিষয়বস্তু পরিচালকের চিন্তা।

মর্মমূল ধরে ঝাঁকানি দিয়েছে। বলতে গেলে সেদিন থেকেই মনে মনে ছবি তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

এই ছবি, তার চেহারার বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র-হয়ে উঠতে পারে। ইংগিত আছে। এখানে পরিচালক, আত্মপ্রকাশের তাড়না বলে একটা কথা আছে, এই তাড়নায় নিজেকে প্রকাশ করতে একান্ত নিষ্ঠাবান এবং দায়িত্বশীল। তবে বাস্তবের হাড়জিরজিরে ঘোড়া ভাবনার পক্ষীরাজ বলে রূপকথায় চলে বটে, কিন্তু চলচ্চিত্রে চলে না। অতএব ফলেন পরিচিয়তে। যেমনা চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি পদক্ষেপে অনিশ্চয়তা। অভাবিত বাধা বিঘ্ন ও বিপত্তি এসে উপস্থিত হয়। গতকালের সুনিশ্চিত স্থির সংকল্পগুলো পরবর্তী দিনে সংশয় কিম্বা সংকটে টলোমলো। চিত্র-নির্মাণের শুরু থেকে শেষ অবধি অনেকগুলি ধাবা-বাহিক স্তর। একটা অতিক্রম করলেই আরেকটা।

গল্প! পরিচালকের নিজেরই লেখা। কি কি কারণে এই গল্প ছবি করা অত্যন্ত জরুরী মনে হল? ছবি করার জন্য ছবি করা নয়। ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে যে কোন পরিচালকই সামাজিক দায়িত্ব বহন করবেন, এটাই ভাবা দরকার। পরিচালকের চারপাশে যে পৃথিবী, যা তিনি দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ করেন, যা তাঁর অবজারভেশান—সেইভাবে, ঠিক সেইভাবে ভেবেছেন। একালের যুবক যুবতী-দের নিয়ে একাধিক ছবি হয়েছে। এই পরি-চালক মনে করেন যা হয়েছে তার বেশীর ভাগটাই মিস রিপ্রেজেন্টেড। আজকের যুব-সমস্যা, যুগ যন্ত্রণা—বড় বড় কথার আড়াল করে এই ধরনের ছবি করার মাধ্যমে ব্যবসাটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা যেটা করে না তাই দেখানো হচ্ছে ছবিতে। তারা যেটা ভাবে না তাও দেখানো হচ্ছে ছবিতে। তারা যা বলে না, তাই বলানো হচ্ছে। তারুণ্যের ক্ষোভ ক্রোধ হাহাকার এসব ব্যাপার-গুলোর সংগে কজন একাত্ম হয়ে ছবি করে-ছেন? স্পষ্ট অবজারভেশান অথবা পার্টি-সিপেশান ছাড়া এই জটিল এবং বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে কি ছবি করা সম্ভব? অনেকে আবার তারুণ্যের অধঃপতন দেখাতে গিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের ঘটাতেই বেশী উৎসাহী। এটা সত্য ইদানীং কিছু কিছু ছবিতে একালের রাগী ছোকরাদের আমদানী ঘটেছে। আসলে এরা হচ্ছে শিল্পের কাঁচা-মাল। শিল্পী তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাঁচামালকে ব্যবহার করে একালের এসেন্সকে যদি ছুঁতে না পারেন তাহলে কি হয়! কিছুই এগোয় না। এগোয় নি এতাবৎ। সমস্যাটাকে জানতে হবে তার সামগ্রিকতায়। ছুঁতে হবে তার শিকড়, ধরতে হবে প্রত্যেকটা এলোমেলো হাওয়ার ঝুঁটি। শুধুমাত্র কতকগুলো রকবাজ সংলাপ চরিত্রের মুখে রাখলে জীবনসত্যের অনুগামী হওয়া যায় না। গভীরে যেতে হবে। অসা-ফল্য, বেকারী, দারিদ্র্য, ওয়াগন-ভাঙা, ছেলে-মেয়েদের উৎকেন্দ্রিকতা, রাজনীতি ইত্যাদি [illegible]

সচেতন হওয়া দরকার। তা না হলে একালের যুবক যুবতীদের জীবনের জটিল কেন্দ্র অনাবিষ্কৃতই থেকে যাবে।

এ ছবি নির্মাণ করতে আপনাকে কি কোনোভাবে আপোষ করতে হচ্ছে?

[illegible] একেবারেই না। আপোষ করলে আর যাই [illegible] শিল্প হয় না। তাহলে তো আদর্শের [illegible]ড়েও টান পড়ে। এখন পর্যন্ত পড়েনি। অর্থাভাবের জন্য (যেটা নাকি এ ধরনের ছবির ক্ষেত্রে প্রায়ই হয়) শুটিং বন্ধ হয়নি। চলছে।

এই তো কদিন আগে পরিচালক সদল-বলে দীঘায় গিয়েছিলেন বহির্দৃশ্য গ্রহণ করতে। এই পর্যায়ে একটি গানও পিকচা-রাইজ করা হয়। ছবির শুটিং অবশিষ্ট আর মাত্র কয়েকদিন।

এ ছবির প্রধান দুই চরিত্রের শিল্পী : শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং অপর্ণা সেন। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীরা : অপর্ণা দেবী, [illegible] মুখার্জি, পার্থ [illegible]ার্জি, জগন্নাথ গুহ, [illegible] এবং সোমা দে।

চিত্রগ্রহণ করছেন দীপক দাশ। সম্পাদনা করবেন প্রশান্ত দে। ব্যবস্থাপনায় আছেন—দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক অজয় দাশ। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং আরতি মুখোপাধ্যায়।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

জীবন মরুর প্রান্তে
মহুয়া - [illegible]

রং নম্বর ঃ নন্দিতা বসু ও পদ্মা দেবী

স্টুডিও সংবাদ

অনেক দিন পর প্রবীণ চিত্র পরিচালক চিত্ত বসু নতুন ছবি শুরু করেছেন। গত মাসে ঝাঁশাড়িতে বাহদৃশ্য গ্রহণের মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছে। সপ্তাহব্যাপী আউটডোর শুটিং শেষ করে শ্রীবসু গত সপ্তাহে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শুরু করেছেন। মণি বর্মার কাহিনী ও চিত্রনাট্যে, ছবি— ছুটি ঘর। এ-ছবির কেন্দ্রে রয় দশ-বারো বছরের একটি ছেলে। রাজু ওর নাম, চরিত্রের নাম রত্নেশ্বর। ওর বাবা ও মা-র ভূমিকায় রূপদান করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। দুটি বিশেষ চরিত্রে আছেন দিলীপ রায় ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। রাজু-র বিপরীতে আছে এক নবাগতা। ইকনমিক প্রোডাকশনের পতাকাতলে নির্মীয়মান এ-ছবির আলোকচিত্রশিল্পী বিভূতি চক্রবর্তী। শিল্পনির্দেশক ঃ সুনীল সরকার। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে দুখানি গান রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক সাহায্যে কয়েকজন পরিচালক ছবি করায় জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। যেমন পার্থপ্রতিম চৌধুরী। 'শুক্লপক্ষ' নামে উনি একটি ছবির কাজ শুরু করেছিলেন। কয়েকদিন শুটিং হয় এবং কয়েকখানি গানও রেকর্ড করা হয়। অর্থাভাবের জন্যই ছবিটি এতদিন বন্ধ ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেড় লক্ষ টাকা ঋণদান করেছেন। এর সাহায্যে শ্রীচৌধুরী অনতিবিলম্বে ছবির কাজ রিজিউম করতে চান। সম্প্রতি সাক্ষাৎ হলে তিনি স্বয়ং এই কথা জানান। আরো জানান, কাস্টিং-এর বিশেষ কিছু অদল-বদল হচ্ছে না। অর্থাৎ অপর্ণা সেন নায়িকা। নায়ক ঃ অর্জুন মুখোপাধ্যায়। একটি বিশিষ্ট নারী চরিত্র রূপায়িত করবেন দেবিকা মুখোপাধ্যায়। চিত্রশিল্পী ঃ কৃষ্ণ চক্রবর্তী। শিল্পনির্দেশক ঃ গৌর পোদ্দার। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন পরিচালক নিজেই। প্লে-ব্যাক করেছেন ঃ মান্না দে, আরতি এবং বনশ্রী।

আরেকজন তরুণ পরিচালক পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় একইভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেড় লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যে একটি ছবি করবেন মনস্থ করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রতিমা'র চিত্ররূপ হবে। প্রস্তুতি চলছে অনেকদিন আগে থেকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই চিত্রনাট্য রচনার কাজ শেষ। মার্চ মাসের প্রথম দিকে শুটিং শুরু হতে পারে। জানালেন পরিচালক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়। এখন পর্যন্ত যা স্থির আছে তা যদি হয় তাহলে এ ছবির মুখ্য ভূমিকায় রূপ দেবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মহুয়া রায়চৌধুরী। পার্শ্ব চরিত্রে উৎপল দত্ত, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী এবং আরো কয়েকজন নামী শিল্পীর অংশ গ্রহণ করার সম্ভাবনা আছে। চিত্রগ্রহণ করবেন দীপক দাশ। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

'বারবধূ' ছবির শুটিং শেষ হয়ে এসেছে। সুবোধ ঘোষ রচিত বিতর্কিত রচনা চিত্রে রূপায়িত করছেন বিজয় চট্টোপাধ্যায়। চিত্রনাট্যকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং পরিচালক শ্রীবসু। প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করছেন 'গরম হাওয়া' খ্যাত নায়িকা গীতা। নায়ক ঃ সমিত ভঞ্জ। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন ঃ রবি ঘোষ, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা চক্রবর্তী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, সাধনা রায়চৌধুরী এবং সোমা দে। চিত্রগ্রাহক ঃ শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন ঃ আনন্দশংকর। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই ছবিও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্য পাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন প্রযোজক অরুণ রায়চৌধুরী 'রাজা' ছবির জন্য। ছবির শুটিং শেষ। প্রফুল্ল রায়ের কাহিনী অবলম্বনে স্বরচিত চিত্রনাট্যে ছবিখানি পরিচালনা করছেন তপন সিংহ। চিত্রগ্রহণ করেছেন ঃ বিমল মুখোপাধ্যায়। সম্পাদনা করছেন ঃ সুবোধ

চুপকে চুপকে : ধর্মেন্দ্র - শর্মিলা ঠাকুর

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

কলকাতার মতো বম্বেতেও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সপ্তাহ পালিত হল। একটি মাত্র হলে এই প্রদর্শনসূচী নির্দিষ্ট ছিল—রিগ্যাল। দিল্লীতে ভারতের পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যে ছবিগুলি এসেছে তার থেকে বাছাই করা সাতটি ছবি এখানে পাঠানো হয়। এই সপ্তাহের আয়োজন করেন ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন। তেমনভাবে প্রচার করাও হয়নি। বলতে গেলে হঠাৎই এই সপ্তাহ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু কি করে চিত্ররসিকদের কানে পৌঁছে যায় যে ছবিগুলি দেখানো হচ্ছে তার মধ্যে অন্ততঃ দুটি ছবি সাংঘাতিক। কিভাবে সাংঘাতিক? সাংঘাতিক সব নগ্ন দৃশ্য আছে। একটি ছবির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে রটে যায়। ছবিটির নাম 'দ্য মার্ডার অফ ফ্রেড হ্যাম্পটন'। এই ছবি নাকি সেকস আর ভায়োলেন্স-এ ভরা। ব্যাস অমনি অ্যাডভান্স বুকিং ফুল হয়ে গেল। দেখতে দেখতে ছবি দেখানোর দিন এসে গেল। সেই দিনটি দর্শকদের কাছে 'এপ্রিল ফুল-'এর সামিল হল। আসলে ছবিটি ব্ল্যাক প্যানথারের বিপ্লবের ভিত্তিতে—অনেকটা দলিলচিত্র। প্রথম প্রদর্শনীর বিরতি হতে দর্শকরা বুঝলেন এ আর কিছু নয় এপ্রিল ফুল করা হয়েছে। ভীষণভাবে ঠকানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে গেল শ্লোগান। এই ছবি তারা দেখতে চান না, অন্য কোন ছবি দেখানো হোক অথবা টিকিটের পয়সা ফেরত দেওয়া হোক। একদল দর্শক ম্যানেজারকে খুঁজে বার করলেন এবং প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন —আমি চেষ্টা করছি। নিরীহ ম্যানেজার অনেক কষ্টে ফিল্ম ফিনান্স কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি জানালেন। বিষয় শুনে তো কর্তাব্যক্তিদের আক্কেল গুড়ুম। এ কি হল দেশের হাল। যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম উইক—নাড়ে সিন [illegible] দর্শকেরা ছাড়বেন না। ম্যানেজার পড়ল। প্রদর্শনী পুনরারম্ভ হতে যাবে শুরু হয়ে গেল চেয়ার ভাঙা। শোকেস ভাঙা। কেন? আমাদের সেরকম ছবি দেখাতে হবে যাতে সেকস আর ভায়োলেন্স-এর মশলা আছে। দর্শকদের মানসিকতার প্রশংসা না করে পারা যায় না—কি বলেন? পয়সা দিয়ে যখন তাঁরা ছবি দেখছেন তখন সব চাই। দেখাতেই হবে। না হলে ফিল্ম উইক-টুইক সব লাটে তুলে দেওয়া হবে। ভীত সন্ত্রস্ত ম্যানেজার পরবর্তী তিনটি প্রদর্শনী বাতিল করে দিলেন। তারপর ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের কর্তাব্যক্তিরা ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত করলেন। কি তদন্ত করলেন? দর্শকদের মানসিকতা? হয়তো তাই। তা না হলে ছবি বদল করে দেওয়া হল কেন? তিনটি ছবি বদল করে দেওয়া হল। নতুন একটি ছবি দেখানো হল 'ওয়ার্নিং স্মেল সেকস ইন ডেঞ্জার'। এই ছবিতে সেকস আর ভায়োলেন্স-এর মশলা যা ছিল তা দেখে দর্শকরা পরিতৃপ্ত। ছবি দেখে বেরুবার সময় উদ্যোক্তাদের ধন্য ধন্য করেছেন। পারলে ম্যানেজারের

হয়েছিল এতেও যদি দর্শকরা সন্তুষ্ট না হন। তাই তিনি গা ঢাকা দিয়েছিলেন। প্রথম প্রদর্শনী শেষ হবার পর তিনি বীরবিক্রমে তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছেন। এবং কদিন পরে হাসিহাসি মুখে কথা বলেছেন।

'আমীর গরীব' ছবির অসামান্য সাফল্য-এর পর প্রযোজক-পরিচালক মোহনকুমার নতুন ছবির পরিকল্পনা করেছেন। ছবির নাম এখনও স্থির না হলেও ভূমিকালিপি সম্পূর্ণ হয়েছে। এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবেন অশোককুমার, শশীকাপুর, হেমা মালিনী, প্রেমনাথ এবং আসরাণী। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।

হেমা মালিনী-শশী কাপুরকে নিয়ে একটি হিন্দি ছবি হতে চলেছে. নামকরা হয়েছে ইংরেজী ভাষায় 'নিউ ইয়র্ক' নিউ ইয়র্ক'। নিউইয়র্কেই গোটা ছবির শুটিং একটি হিন্দি ছবি হতে চলেছে, নাম করা নায়িকার পুত্র মীনা চিৎনীশ এ-ছবি প্রযো-

[illegible]

জা চাগ
হেমা মালিনী - শত্রুঘ্ন সিনহা

লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল জুটি। ছবিটি তৈরী হতে চলেছে আর্টস্কোপ ইন্টারন্যাশনালের ব্যানারে।

সুনীল দত্ত এবং প্রেমনাথ—দুজনেই মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছেন। স্বামী মুক্তানন্দের চেলাদ্বয়ের প্রতি এই নির্দেশ নাকি এসেছে। স্বামী বলেছেন, ভাল করে কাজ কর, মদ খাওয়া ছেড়ে দাও তাহলে দেখবে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে। সুনীল এই নির্দেশ পেয়েছিলেন আগে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বামীর নির্দেশ মেনে চলতে শুরু করেন। পরপর ছবি হিট হয়। সুনীল আবার তাঁর ফর্মে ফিরে আসেন। এখনও স্বামীর নির্দেশ আছে—মদ খেও না। সুনীল তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন বলে ভাগ্যের চাকা ঘুরেছে এই বিশ্বাসে প্রেমনাথ মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছেন। কেননা পরপর কয়েকটা ছবি ফ্লপ করেছে প্রেমের। ভাগ্যের চাকা যাতে ঘুরে যায় তার জন্য সচেষ্ট প্রেম মদ ছাড়া এক একটি বিনিদ্র রাত যাপন করছেন।

—অভিজিত

নাট্যমঞ্চ
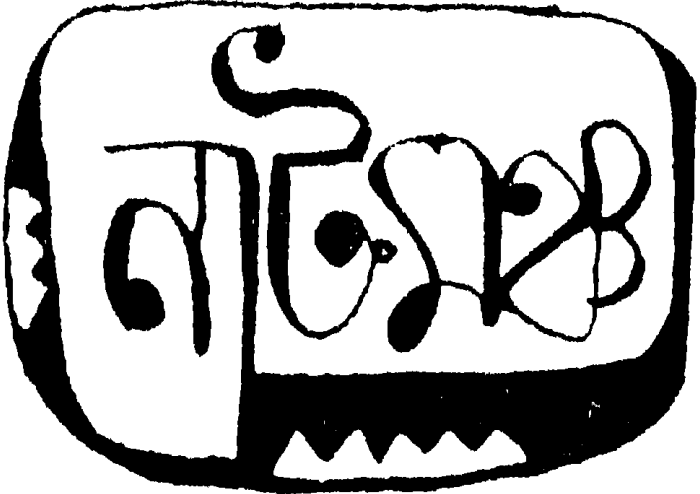
চারণদল-এর 'এই দশকের অভিমন্যু'

আজকাল নাটকের আঙ্গিক নিয়ে যত না পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়, তার চেয়ে বেশী হয় নাটকের বক্তব্য নিয়ে।

তাই আজ আর নাটক দেখতে যাওয়া শুধুমাত্র নাটকীয় কেরামতি বা আঙ্গিক দেখার জন্যই না, নতুন কিছু ভাবনা অনুধাবনেরও অবকাশ রয়ে যায় তাতে।

তবে এটা যে সব ক্ষেত্রেই সত্য তা অবশ্যই নয়। এই সমাজ সচেতনতার পাশাপাশি অবসর বিনোদনের নাটকও হয় বৈকি। তবে সে আর এক জগৎ। সেসব নাটকে তাৎক্ষণিক আনন্দের ব্যবস্থাই থাকে, তার বেশী কিছু নয়।

কিন্তু বলতে বাধা নেই, তাদের অস্তিত্ব ক্রমশই যেন মুছে আসছে মঞ্চ থেকে।

বলা যায়, প্রগতিশীল নাট্য গোষ্ঠী এবং তাদের পরিবেশিত নাটকই আজকাল পাদপ্রদীপ আলো করে তুলছে ক্রমশ। এবং এই নাটকের প্রতি সচেতন দর্শকদের

এর মধ্যে সব নাটকের প্রতিই যে দর্শকরা সহৃদয় বা একাত্ম হতে পারে এমন নয়, সমস্ত নাটক কি তার বক্তব্যের সঙ্গেই সবাই এক মত হবেন এমন কথাও সত্য নয়, তবু সেই সব প্রচেষ্টাকে অস্বীকারও করা যাবে না।

তার কারণ এই সব নাটকের প্রায় প্রতিটিতেই আজকের সমাজ— রাষ্ট্র, রাজনীতি বিতর্কমূলক মতামত এবং সর্বোপরি একদম হাল আমলের মানসিকতার সামগ্রিক একটা রূপের স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট রেখায়িত প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করা যায়। সেটা কখনও সত্য এবং যুক্তিবহ অবস্থায়, কখনও বা সোচ্চার অবস্থায়।

ইদানীং-কার নাকগুলি দেখে আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে।

চারণ দল-এর 'এই দশকের অভিমন্যু'-র শুরু মহাভারতের যুগ থেকে। প্রতীকী হিসেবে অভিমন্যু বধের দৃশ্য দিয়ে এ নাটকের সূত্রপাত এবং আজকের অভিমন্যু (দেশে বিদেশে) বধ দিয়ে নাটকের [illegible] দৃশ্য টানা হলেও এর পেছনে এমন [illegible] বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয়েছে [illegible] স্বভাবতই নাড়া দেয়। সেই [illegible] একটা প্রশ্নও থেকে যায়।

ইতিহাসের শিক্ষা আমরা যুগে যুগে প্রত্যক্ষ করেছি, আবার ভুলেও গেছি। কিন্তু তার মানে কি এই যে সেই ভোলার সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসও সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে? ইতিহাস যেমন পরিবর্তনশীল তেমনি তার গহ্বরেই রয়ে গেছে সেই 'রিপিটেশন'-এর সুপ্ত অঙ্কুর। যা কোন না কোনদিন আবার মহীরূহের রূপ নিয়ে সমাজ জীবনের উপস্থাপিত হবেই। ইতিহাসের এটাই শিক্ষা

এখানে তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। কিন্তু সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা কি নির্দিষ্ট কারুর মর্জি মতন ওল্টানো যায়? আমি যা ভাবছি সেটাই তো একমাত্র অভ্রান্ত সত্য নাও হতে পারে। সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক মতবাদ বা পরিবেশ, সময়ের প্রয়োজন এং সর্বোপরি বৃহত্তর মানুষের কল্যাণের জন্যও তো এমন পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে যা এক সময় অনিবার্যের পরিণতিই লাভ করে?

'এই দশকের অভিমন্যু' নাটকে পর্যায়ক্রমে পর পর কয়েকটি স্তরে 'মানুষের দুর্লভ জাগরণ'এর ইতিহাস ভিত্তিক রূপদানের চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে ধর্মের নামেও শাসক এবং অত্যাচারীর দ্বারা কলুষিত হয়েছে মনুষ্যত্ব এবং মানবিকতা— যুগে যুগে এসেছে মহাভারতের দুর্যোধন থেকে কখনও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ কখনও হিটলার।

এর একদিকে যেমন চলেছে মানবতা নিধনের যজ্ঞ অন্য দিকে পাশাপাশি তেমনি সেই গ্লানিময় মুহূর্তগুলিতেই তৈরী হয়ে চলেছে মানুষের আত্মজাগরণের প্রস্তুতি। যে আত্মজাগরণের অন্য নাম শৃংখল মুক্তি বা স্বাধীনতা। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে যাকে চিরকাল পথ ছেড়ে দিতে হয়েছে।

এই নাটকে যেমন দুর্যোধনের পাশাপাশি এসেছে কর্ণ অর্জুন যুধিষ্ঠির অশ্বত্থমা দুঃশাসন ভীম উত্তরা দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি মহাভারতের যুগের মানুষেরা তেমনি এসেছে পরবর্তীকালের মঙ্গল পাণ্ডে নানাসাহেব তাঁতিয়া তোপী ঝান্সীর রাণী, ওসমান খাঁ ঈশ্বরী পাণ্ডে

সেদিন দুজনে
দেবরাজ রায় - সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

ভ্যানট্রয়, হিটলার, গোয়েরিং, গোয়েবলস ইত্যাদি এবং এ সবের পাশাপাশি কখনও কৃষক, কখনও বা শ্রমিক এবং কখনও তাদের পাশে পাশে বিদ্রোহী সিপাহী। যারা অত্যাচারের শেষ পর্যায়ে এসে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তাদের প্রভু বা অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে। যা ইতিহাস হয়ে আছে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে।

'এই দশকের অভিমন্যু' নাটকের পট-ভূমিকা ব্যাপক। তাকে সীমিত করে দেওয়া হয়েছে ছোট ছোট কিছু দৃশ্যাংকে। প্রথম দৃশ্যটি ছাড়া একমাত্র শেষ দৃশ্যে, যেখানে যমরাজ স্বয়ং বিচারের আসনে বসে একটা হত্যাকে অবলম্বন করে নির্মম কণ্ঠে তার রায় দিলেন (এই দৃশ্যটির পরিকল্পনা ও পরিবেশনার মধ্যে মৌলিকতার ছাপ আছে) যদিও অন্য ফর্মে অন্যত্র এর উপ-স্থাপনা ইতিপূর্বে পরিবেশিত দেখা গেছে। সেই দৃশ্যটি একদিকে যেমন দীর্ঘ অন্যদিকে তেমনি নিবিষ্ট হয়ে দেখবার মত।

ন্যায় বিচার (?) এবং বিদ্রোহকে এ নাটকে স্পষ্টতই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি স্পষ্ট ভাষাতেই নাট্যকার পরি-চালক অলক রায়চৌধুরী তাঁর বক্তব্য রেখেছেন নাটকে। (তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্যে তিনি যা বিশ্বাস করেন।)

অভিনয়ে দর্শকদের সর্বাধিক আনন্দ দিয়েছেন দিলীপ বসু। অরুণ রায়চৌধুরীর অভিনয়ে নিষ্ঠা এবং মুন্সিয়ানা আছে। জজ্ঞী ডিমিট্রভ ও ভ্যানট্রয়-এর ভূমিকাভিনয় তাঁর সুন্দর। তবে অতি আবেগ ও অতি নাটকীয়তা মুক্ত নন।

অন্যান্য ভূমিকায় বিশ্বরঞ্জন বসু, সত্য-রঞ্জন দাসগুপ্ত, অসীম চক্রবর্তী, শেখর চৌধুরী রমাপ্রসাদ ব্যানার্জী অমিতাভ ব্রহ্মচারী অসীম চ্যাটার্জী দুলাল মিত্র রমেন সাহা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ ভাল উৎরে গেছেন।

বিবেকরূপী গোষ্ঠগোপাল দাসের কণ্ঠ দর্শকদের প্রীত করেছে। বড় মিষ্টি গানের গলা।

অনীতা অধিকারীর প্রত্যেকটি চরিত্রাভিনয়ই মনে দাগ কাটে।

তবে দলগত অভিনয়ের দিকে আর একটু নজর দিলে ভাল নয়। কারণ একটা ঢিলেঢালা ভাব সমগ্র নাটকের মধ্যে রয়েই গেছে।

তড়িৎ চৌধুরীর মঞ্চ পরিকল্পনা সুন্দর। শচীন আচার্য অগ্রজী প্রায় নিখুঁত বললেই চলে, আলো (চিত্ত সরকার), ধ্বনি প্রয়োগ (শ্রীপতি দাস) এবং রূপসজ্জা

পদধ্বনী যাত্রাভিনয়

প্রখ্যাত যাত্রাদলের খ্যাতনামা পরি-চালক এবং দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়াও যে কোন যাত্রাভিনয় দর্শক মনে আলোড়ন তুলতে পারে তারই প্রমাণ মিলল, ৭ই ফেব্রুয়ারী হাওড়ার গোয়াবেড়িয়া স্কুল প্রাঙ্গণে শালিমার পেন্টস নাট্যসমাজ অভিনীত শ্রীভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'পদধ্বনি' যাত্রাভিনয়ের মাধ্যমে।

নির্দেশক শ্রীবিশ্বনাথ ঘোড়ই সাংবাদিক প্যালারর ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেন।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানান ঘাত-প্রতিঘাত এবং স্পন্দনমূলক মনোগ্রাহী ঘটনার মাধ্যমে দলগত সংহতি আর দক্ষ প্রয়োগনীতি নাটকটিকে সফলতা দান করে।

বীরেন নাথ, সমীর চ্যাটার্জী, বলরাম মান্না, বুলা দাস ও মীরা মুখার্জীর অভিনয়কুশলতা মনে দাগ কাটার মত।

বারিক যদু মাহাতো সুলেখা ব্যানার্জী মীরা রায় এবং আরো অনেকে।

শ্রীএইচ দশ, শ্রীআই এম মালকানি, পি জে আর্ল এবং ডাঃ পি কে ভাণ্ডারীর সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

রেখা

বম্বের শিল্পীরা কলকাতায়

সম্প্রতি নবজীবন ফিল্মসের 'দো আনজানে' ছবির স্যুটিং উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন অমিতাভ বচ্চন, রেখা এবং পরিচালক দুলাল গুহ। নেপথ্য গায়ক ও শিল্পী শৈলেন্দ্র সিং এবং পরিচালক অনিল গাঙ্গুলীও কলকাতায় নিমন্ত্রিত। একটি হিন্দী ছবির শুভ সূচনা উপলক্ষে একই সময় কলকাতায় এসেছিলেন। এবারে আসছি ওঁদের কথায়।

অমিতাভ বচ্চন— বম্বের ব্যস্ততম শিল্পী, ১৯৭৪ 'নেমকহারাম' ও কশোটি ছবিতে অপূর্ব অভিনয় করেছেন। এছাড়া 'বেনাম' ও 'মজবুর' ছবিতে ওঁর অভিনয়ই ছবির একমাত্র সম্পদ। উনি কলকাতায় চাকুরী করতেন, একদা বালিগঞ্জে থাকতেন। সেই সুবাদে পরিচালক বিভূতি লাহার (অগ্রদূতের) সঙ্গে পরিচয়, ওঁরই একান্ত অনুরোধে একটি বাংলা ছবি 'কোয়েলের কাছে'তে অভিনয় করছেন।' ওঁর বিপরীতে থাকবেন সম্ভবত সায়রাবানু এবং কলকাতার রাজশ্রী বসু বা মহুয়া রায়চৌধুরী টেবিল টেনিস খেলার অতিথিদের জন্যে একাধিক ঘর পূর্ব থেকেই সংরক্ষিত থাকায় গ্রান্ড হোটেলে সেই হিন্দী ছবির স্যুটিং করা সম্ভব হয় নি। উনি এজন্যে আবার মার্চে আসবেন। এছাড়া উনি কলকাতায় রবি ঘোষের 'নন্দিনী' (মঞ্চ-সফল নাটক 'পরিচয়' অবলম্বনে) ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর অথবা তরুণী জয়ার সঙ্গে অভিনয় করবেন। বাংলা ছবির জন্যে গৃহিনীর কাছেই উনি বাংলা শিখছেন এবং হৃষিদার 'মিলি' ছবিতে ওঁরা একত্রে অভিনয় করছেন।

রেখা— ইতিপূর্বে 'হিফাজৎ' ছবির মুক্তি উপলক্ষে বিন বিন (বিনোদ মেহরা)-এর সঙ্গে এবং সম্প্রতি 'ম্যায় নেই উহ' ছবির মুক্তি উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলো। দুবারই ওঁকে খুব গম্ভীর দেখা গেছে, সাংবাদিকদের খুব একটা আমল দেয় নি। এবারে বিশেষ অনুরোধে জানালো—কলকাতায় নির্মিত একটি হিন্দী ছবিতে সে অভিনয় করবে। ওঁর প্রথম ছবি 'মেহমান' (বিশ্বজিতের বিপরীতে) এখনও মুক্তি পায় নি। তবে বিশ্বজিতের সাম্প্রতিক ছবি 'কাহতে হ্যায় মুঝকো রাজা' শীঘ্রই মুক্তি পাবে বম্বেতে। রণধীর কাপুরের সঙ্গেই ওঁর অভিনয় ছবির সংখ্যা দশ। বাংলা ছবিতে অভিনয় করবার ইচ্ছা না থাকলেও বম্বেতে ওঁর বাঙালী পরিচালকদের ছবিতে অভিনয় করতে ভালো লাগে। বিবাহের সম্পর্কে এখনই ভাবছে না। হাতে এত ছবি যে সেগুলির কাজ শেষ করতে দু'বছর লেগে যাবে। কিন কিন (কিরণকুমারের) সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকলেও ওঁকে স্বামী হিসাবে ভাববার কোন কারণ নেই। বম্বের পত্রিকা স্টার ডাস্টই এ জাতীয় গুজব রটাচ্ছে। বম্বে ছবির গতানুগতিক ভাবকে ত্যাগ করবার জন্যে কলকাতার হিন্দী ছবিতে অভিনয় করার ইচ্ছা আছে ওঁর।

সাক্ষাৎকার—অমর
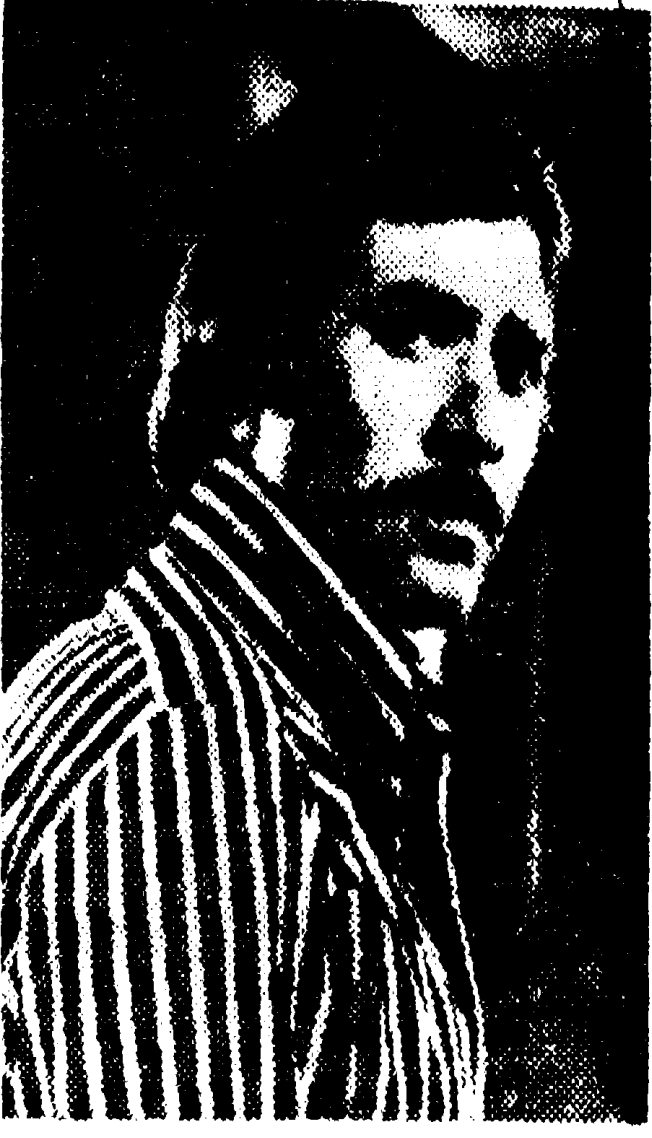
রাজেশ খান্না

আয়না

প্রযোজনা : কলাকেন্দ্র ফিল্মস

দক্ষিণ ভারতীয় স্টাইলে একটি ভাবপ্রবণ কাহিনীর সার্থক চলচ্চিত্রায়ণ

'রামশাস্ত্রী' গ্রামের বিশিষ্ট পুরোহিত, কায়ক্লেশে দিন কাটায়। সর্বদাই সংসারে অভাব। এর প্রধান কারণ সংসারে কেবল স্ত্রীই নেই, সঙ্গে আছে আটটি ছেলেমেয়ে ও তাদের বিভিন্ন সমস্যা। তারও পরে শাস্ত্রীমশায়ের বোন ও তার মেয়ে এসে হাজির হয় ওদের বাড়ীতে বসবাসের জন্যে। অপরের থেকে সাহায্য নেবার পক্ষপাতি নয় শাস্ত্রীমহাশয়। বাধ্য হয়ে বাড়ীর সকলেই প্রায় অনাহারে দিন কাটাতে লাগলো। এমন কী ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত খাদ্যের অভাবে উপোস করতে লাগলো। শাস্ত্রীমশায়ও পুরোহিতের কাজের অভাবে পাথর ভেঙে সংসার চালাতে লাগলো। এসব দেখে বড় মেয়ে শালিনী আপত্তি জানালো। সে কেবল সকলের দিদিই নয়, সকলের মায়ের মত। ছোট ছোট ভাইবোনেদের না খেয়ে সে কিছুতেই মরতে দেবে না। প্রথমে একটি করণিকের চাকুরী পেলেও শালিনীর অফিসের বসদের নজর তার রূপ ও যৌবনের ওপর কাজের দক্ষতার উপর নয়। ভাইয়ের ডাক্তারী পড়বার জন্যে চাই প্রচুর টাকা। তাই ছুটতে হোল সমাজসেবী এম-এল-এর কাছে। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে এক কুচক্রীর হাতে আত্মসমর্পণ করলো শালিনী ভাইয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। এইভাবে চাকুরীর উন্নতি করে দিল্লীতে বদলী হয়েও অর্থবান কুচক্রীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না সে। শেষ পর্যন্ত অর্থের বিনিময়ে ওকে তারা বারবনিতায় পরিণত করলো। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেটা যখন বাড়ীর সকলে জানলো তখন সকলেই, এমন কী ছোট ভাই যার জন্যে ওকে প্রথমে আত্মবিসর্জন দিতে হোল। সেও ওকে বাড়ী থেকে বিতাড়িত করলো। তবু পৃথিবীতে এখনও সংব্যক্তি আছে। খেলার সাথী অশোক ওকে ভুল বুঝলেও বিবাহের মধ্যে দিয়ে একদিন স্বীকৃতি দিতেও দ্বিধা বোধ করলো না, মাও ওকে আশীর্বাদ করলো।

অভিনয়ে শালিনীর ভূমিকায় মুমতাজ জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। অন্যান্য ভূমিকায় রাজেশ খান্না (অশোক), এ কে হাঙ্গল (রামশাস্ত্রী,) নিরুপা রায় (মা), ললিতা পাওয়ার (পিসি), মনমোহন কৃষ্ণ (অশোকের বাবা) এবং তিন বোনের ভূমিকায় রীতা ভাদুড়ী, বন্দনা রানে, কল্পনা পাল ও ভাইয়ের ভূমিকায় আর্দশ-এর অভিনয় যথাযথ। কলা-কৌশলের কাজ বিশেষ করে সম্পাদনার কাজ অপূর্ব। কাহিনীতে নতুনত্ব না থাকলেও পরিচালক কে বালচন্দ্র ভাবাবেগের মধ্য দিয়ে বিতর্কিত বিষয়বস্তু পর্দায় সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন।
নৌশাদের সঙ্গীত পরিচালনা ছবিটিকে প্রাণবন্ত করেছে।

—চিত্রদূত

জলসা

তানসেন সংগীত সম্মেলন:

কলামন্দিরে সাতদিনব্যাপী তানসেন সংগীত সম্মেলনে আকর্ষণীয় আসর হয়ে উঠেছিলো সারারাতব্যাপী অনুষ্ঠানটির—প্রতিটি মুহূর্ত।

সুরু হয়েছিলো সন্ধ্যা মুখার্জির 'গাওতি' দিয়ে। তারপর আসরে বসলেন বিসমিল্লা খাঁন। ধরলেন একটি অপ্রচলিত রাগ—চন্দ্রপ্রভা। গান্ধার পঞ্চম বর্জিত। মাঝে মাঝে শিবরঞ্জনীর আভাস ঝলকে উঠে পরিবেশকে 'রোমান্টিক' মাধুর্যে রঞ্জন করে তুলেছিলো। অনেকদিন বাদে খাঁসাহেবকে পাওয়া গেলো তাঁর নিজস্ব মেজাজে। প্রতিটি পর্দায় তিনি যেন ডুবে গেছেন। হারিয়ে গেছেন ধ্যানমৌনতায়। পর্দা থেকে পর্দান্তরে ও স্বরসমন্বয়ে গেছেন যেন সৃষ্টির দুর্বার প্রেরণায় আর সারা প্রেক্ষাগৃহকে সম্মোহিত করে রেখেছেন—তাঁর সাধনা লব্ধ দুর্লভ শক্তিতে। দ্বিতীয়ার্ধে পূর্বী ধুনে ও চৈতীর ছোঁয়া উদাস হাওয়ায় দুলে ওঠা ফুলের অফুরন্ত সৌন্দর্য লোক এক নিমেষে ফুটে ওঠে—। এ ইমেজ বিসমিল্লা খাঁনই সৃষ্টি করতে পারেন।

বিসমিল্লা খাঁর অমন জমজমাট অনুষ্ঠানের পর অন্য কোনো গান বা বাজনা জমে ওঠা সহজ নয়। সেই কথা স্মরণ করেই সংঘসচিব এর পর বসালেন সুনন্দা পট্টনায়কের মত শক্তিশালী শিল্পীকে। অনুষ্ঠান বিন্যাসের প্রশংসা না করে উপায় কি? আসরে উপস্থিত অনেক পুরানো শ্রোতা মনে করিয়ে দিলেন—ডোভার লেনে একবার রবিশংকর আলি আকবরের যুগলবন্দীর পরও সুনন্দাকে বসানো হয়েছিলো—এবং সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে সেদিনের সেই কিশোরী মেয়েটিও ভোর ছটা থেকে সকাল আটটা অবধি প্রতিটি শ্রোতাকে আরও শুনতে চাই এর মেজাজে ধরে রেখেছিলো (যদিও আজও তিনি পদ্মশ্রী বা অন্য কোনো খেতাব বিভূষিতা নন)।

যাই হোক—সুনন্দা পট্টনায়ক কৌশী-কানাড়া ধরতে না ধরতেই উচ্চগ্রামী কন্ঠের স্বর শ্রুতির পূর্ণতা উচ্চারণ সৌন্দর্য রাগ-রূপের যথার্থ ছবিটি ফুটিয়ে তুলেছিলো সুর ও ছন্দের অদৃশ্য রেখায়। গোয়ালিয়র ঘরাণার ধ্রুপদী বন্দেজ বাট বোলতানও—তুলনা বিহীন তারাণায় যেন সদাপটে বিঘোষিত। এরই মাঝে মাঝে স্বরের উত্তাল গতিকে থামিয়ে কলাবন্তী ঢঙের ছুটতানের সূক্ষ্ম কাজ অন্তরার তান অতিতারা স্পর্শন—'আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের স্বপ্নময়তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সকলের অনুরোধে ইনি শেষ করলেন—'জগন্নাথ স্বামী' ও 'যোগী মত যা' দিয়ে। এঁর সংগে সুযোগ্য তবলাসংগত করেছেন স্বপন চৌধুরী।

ভৈরবীর রেশের সংগে সংগীত রেখে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় বাজালেন ভৈরব—সকালের প্রার্থনা ও সৃষ্টিকে জাগ্রত করবার—মন্ত্র যেন ধ্বনিত হোল—তাঁর রেখাবও ধৈবতের সংগতে। আলাপে—আলাউদ্দিন ঘরাণার সেই ধ্রুপদী বিস্তার গতের আশ্চর্য ছন্দ সম্ভাব অবিশ্বাস্য রকমের জটিল ও কঠিন মীড় ও ঝটকার অনায়াস—বিহারে নিখিলবাবু বারে বারে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে তিনি শুধু শিল্পী নন—সিদ্ধ সাধকও। তবলা সংগতে রসের সমারোহ ঘটিয়েছেন কানাই দত্ত।

সরাফৎ খাঁর গান আগ্রা ঘরাণার ওজস ও বাজারে সমৃদ্ধ। শ্রোতাদের আকর্ষণ করে তাঁর সুগম্ভীর কন্ঠের ভরাট আওয়াজ। শিল্পীদের মধ্যে সরাফৎ খান ও সুনন্দার গানেই প্রাণখোলা আ-কারান্ত তান শোনা গেলো। অকারণ পুনরাবৃত্তি ত্যাগ করে আর একটু গুছিয়ে গাওয়া অভ্যাস করলে এঁকে আগ্রা ঘরাণার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ গায়ক বলা যায় (অবশ্য লতাফৎ খাঁ সাহেবের পরে)।

অন্যান্য দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে আনন্দদায়ক শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেমন্ত। এ রাগ আলাউদ্দিন খান ঘরাণার যন্ত্রীরা যন্ত্রে জনপ্রিয় করেছেন। কিন্তু কন্ঠসংগীতে বড় একটা শোনা যায় না।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে রাগের রূপ যেমন প্রাঞ্জল— তেমনই উপভোগ্য নানান তানের বৈচিত্র্য। দ্রুত অংশে বেশ মজার সৃষ্টি করেছেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হোলো যে সবাই সাধারণতঃ সুর-বিস্তারেই আগ্রহী। কিন্তু ইনি তাল-বিস্তারের দক্ষতায় সবাইকে চমকে দিয়েছেন। কানাই দত্ত তানের জবাব তবলায় দিচ্ছিলেন—কিন্তু ইনি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে। তবলার জবাব কন্ঠে দিয়ে শ্রোতাদের প্রচুর আমোদ দিয়েছেন।

আর এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হার্মোনিয়ম। পুরিয়া ও পিলুতে—কখনও বড়ে গোলাম আলির তান কখনও সানাই-এর ভরাট কাজ। পিয়ানোর হার্মনিতে ইনি পাণ্ডিত্য ও শিল্পবোধের অবিস্মরণীয় নজীর রেখেছেন। তবলায় মহারাজ ব্যানার্জিও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

গিরিজা দেবীর খেয়াল ভালই। কিন্তু তার চেয়েও চিত্তগ্রাহী তাঁর ঠুংরী ও টপ্পা। এবং এই অংগেই শিল্পীকে পুরোপুরি পাওয়া গেলো।

রবীন ঘোষ (বেহালা) ও বিমল মুখোপাধ্যায়ের (সেতার) দ্বৈতবাদনে এক-জনের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ... অন্যের পান্ডিত্য খন্ড সৌন্দর্যের ... করেছে কিন্তু উভয়ের কল্পনা এ... হয়ে কোনো অখন্ড অনুভূতিলোক সৃষ্টি করতে পারে নি।

আলি আকবরের আমেরিকার কলেজের শিষ্য বসন্ত রায়ের সরোদে অনেক প্রতিশ্রুতি মূর্ত হয়ে ওঠে।

তরুণ শিল্পী শ্যামল অধিকারীর গানে গুরু শৈলেন ব্যানার্জির সু-শিক্ষার ছাপ মুদ্রিত।

কিশোর শিল্পী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তবলালহরা তবলায় আর এক প্রতিভার সমাগমকেই ঘোষণা করে।

জিতেন অভিষেকীর গান ভীমসেন প্রভাবিত। ওর মধ্যে তাঁর স্বকীয় চিন্তা যেটুকু পাওয়া গেছে সেটুকুই স্ফূর্তি দিয়েছে।

—চিত্রাঙ্গদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক অমৃতের স্বত্বাধিকারিবৃন্দ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যের বিবরণ। প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারীর শেষ তারিখের পরবর্তী প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।

ফর্ম ৪

(রুল ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশনের স্থান—১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

২। প্রকাশনার সময়ক্রম—সাপ্তাহিক, প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিতব্য।

৩। মুদ্রকের নাম—শ্রীসুপ্রিয় সরকার। নাগরিকত্ব—ভারতীয়। ঠিকানা—১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীসুপ্রিয় সরকার নাগরিকত্ব—ভারতীয়। ঠিকানা—১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৫। সম্পাদকের নাম—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। নাগরিকত্ব—ভারতীয়। ঠিকানা—১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৬। যে সব ব্যক্তি পত্রিকাটির অংশীদার বা শতকরা এক অংশের বেশী শেয়ারের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা : সর্বশ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার (মৃত), ১৭১এ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা—২৬; প্রাণতোষ ঘটক (মৃত), ১১১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯; মুরারীবিলাস রায়চৌধুরী (মৃত), ৭৫ বনমালী নস্কর রোড, বেহালা; মনোজ বসু, পি-৫৬০, লেক রোড, কলিকাতা-২৯; গজেন্দ্রকুমার মিত্র, কেয়ার অব মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২; সুমথনাথ ঘোষ, কেয়ার অব মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২; বিশু মুখোপাধ্যায়, ১২ডি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৫; ভবানী মুখোপাধ্যায়, ৩/১/৪এ ম্যাচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলিকাতা-৩৪; তুলসীকান্তি দে বিশ্বাস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩; অমৃতবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩; তুষারকান্তি ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩; শচীবিলাস রায়চৌধুরী, ৭৫, বনমালী নস্কর রোড, বেহালা এবং প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩।

আমি সুপ্রিয় সরকার এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান-বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বৈব সত্য।

স্বাঃ—সুপ্রিয় সরকার

তাং—২৫-২-৭৫

১৪ বর্ষ

অমৃত

৪৩ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 7th March, 1975 — শুক্রবার ২২ ফাল্গুন, ১৩৮১

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীঅমলানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ

রাষ্ট্রসংঘ বর্তমান বৎসরকে নারীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। বিশ্বের নারীসমাজের সমস্যাবলীর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই সিদ্ধান্ত। সবাই স্বীকার করবেন যে বিংশ শতাব্দীতে বহু দেশে নারীপ্রগতি অনেকদূর এগোলেও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে নারীসমাজের সমস্যা এখনও জটিল। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর প্রতি অবহেলা এককালে ছিল স্বাভাবিক। আজ সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনেক পরিবর্তন হলেও কার্যত নারীজাতির মুক্তি এখনও দূরপরাহত। আমাদের দেশের দিকে তাকালেই বিষয়টি সম্ভবত স্পষ্ট হবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত। ভারতের প্রধানমন্ত্রীই একজন নারী। রাজ্যপাল থেকে শুরু করে বহু উচ্চপদেই নারীর অধিষ্ঠান হয়েছে এদেশে। কিন্তু তা বলে একথা আমরা বলতে পারি না যে ভারতের নারী-জাতির মুক্তি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অন্যদিকে ইয়োরোপে মেয়েদের জন্য এমন চোখ-ধাঁধানো পদমর্যাদা দান সীমাবদ্ধ হলেও সমাজে তার স্থান আমাদের দেশের মেয়েদের তুলনায় অনেক সহজ, স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ।

অতি সম্প্রতি ইংলণ্ডে রক্ষণশীল দলের নেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন একজন নারী। দুই সন্তানের জননী শ্রীমতী মার্গারেট স্যাচার পরবর্তী নির্বাচনে জিততে পারলে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। এটি ওদেশে একটি চমকপ্রদ খবর, কারণ, আজ পর্যন্ত ইংলণ্ডে বা ইয়োরোপের অন্যত্র কোনো নারী প্রধানমন্ত্রী হননি। অথচ সদ্য স্বাধীন হয়ে ভারত, সিংহল অথবা ইজরায়েল নারীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসাতে দ্বিধা করেনি। এই কারণেই আমাদের শহরবাসী শিক্ষিত সমাজ সহজে নারী-মুক্তির সমস্যাটা হৃদয়ঙ্গম করতে চান না। তাঁরা বলেন এখানে তো নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করেই নেওয়া হয়েছে। সমস্যাটা আইনের স্বীকৃতির নয়। ভারতের মতো এশিয়া আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির সমস্যা হল সামাজিক মানসিকতার এবং সংস্কার বন্ধন ছিন্ন করার দাবিদের। পাশ্চাত্যে যারা উইমেনস লিব আন্দোলন করছে সেই উন্মার্গগামীদের অনুসরণ করার কোনো প্রশ্নই আমাদের নেই। দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশ হল নারী। তাদের যদি পিছিয়ে রাখা হয় তাহলে সমাজের অর্ধাংশই থাকবে পিছিয়ে, এই কথাটি আমাদের মনে রাখা দরকার। মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত নারীর কৃতিত্ব বা গৌরব নিশ্চয়ই সপ্রশংস উল্লেখের দাবি রাখে। কিন্তু যে-ভারত তার সাড়ে সাত লাখ গ্রামে অনাদিকাল থেকে আত্মমগ্ন হয়ে আছে সেখানকার সমাজে নারীরা ঐতিহ্যপরম্পরায় যে মর্যাদা পেয়ে আসছেন তাকে ক্রীতদাসী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তার দুঃখ বঞ্চনা ও অবহেলার চিত্র দরদী শিল্পীরা এঁকেছেন সাহিত্যে সমাজ সংস্কারকরা তাঁদের জন্য আন্দোলন করেছেন। কিন্তু এখনও প্রার্থিত মুক্তি আসেনি। এখনও বহু নারীর পর্দা ঘোচেনি, এখনও মুসলিম সমাজে একাধিক বিবাহ বন্ধ করা যায়নি, এখনও পণ ছাড়া মেয়ের বিবাহ দেওয়া যায় না। নারীশিক্ষার হার পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। বহু গ্রামে বাল্য-বিবাহ প্রথাও রয়েছে আইনের চোখ এড়িয়ে। বিধবার বিবাহ বৈধ হলেও কজন বিধবা দ্বিতীয়বার বিবাহের সুযোগ পায়। সে তুলনায় বিপত্নীকের দারপরিগ্রহণ কত সহজ। মুসলিম সমাজে ইচ্ছামত তালাক দেওয়ার রীতি তো এখনো বন্ধ করা যায়নি। কারণ সরকার মুসলিম সামাজিক আইন সংশোধনে সাহসই পাচ্ছেন না।

এমন সমস্যা আরও বহু দেশের বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোর। রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ উদযাপন সে কারণেই ভারতবর্ষের মতো দেশে বিশেষ তাৎপর্যময়। গ্রামীণ সমাজের দিকেই এই বৎসরে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। নারীমুক্তির প্রধান দুটি পথ হল নারীকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেওয়া। গ্রামের মেয়েরা, চাষীর ঘরে বা শ্রমিকের ঘরের মেয়ে বৌরা পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করে। কিন্তু গায়েগতরে খেটে সন্তান প্রতিপালন করেও সে পুরুষের তুল্য স্বাধীনতা পায় না। অশিক্ষা কুসংস্কার এবং অবক্ষয়ী সামাজিক মূল্যবোধ নারীদের বঞ্চিত করার কাজেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং নারীমুক্তি শুধুমাত্র একটা শ্লোগান নয়, তাকে সামাজিক অগ্রগতির একটি অপরিহার্য কর্মসূচী হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। কজন নারী মন্ত্রী হলেন বা এম পি হলেন তা দিয়ে ভারতের নারী-সমাজের অগ্রগতি নির্দেশ করতে গেলে ভুল করা হবে। এই নারীরা সমাজের কোন শ্রেণী থেকে এসেছেন তার বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে এদের মধ্যে গ্রামীণ অনগ্রসর সমাজের প্রতিনিধি কত কম। সার্বিকভাবে সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও কর্মের সুযোগ বিস্তৃত করতে পারলেই নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভ সম্ভব হবে। সেই পথেই নারীর মুক্তি এবং সমাজেরও অগ্রগতি।

শীতের শহরে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রমে এ-শহরে হেমন্তকাল এসে গেল। রাস্তাঘাট আর পিচ্ছিল অথবা কর্দমাক্ত নয়। ঝড় বৃষ্টি নেই। মানুষেরা যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। বর্ষায় শহরের রাস্তাঘাট কখনও নদী-নালার মতো হয়ে গেলে নটুর ভীষণ কষ্ট হোত। সারা শহর সে চষে বেড়াতে পারত না। বদ্ধজলার মতো জায়গায় সে এবং পংখি অথবা ক্যাবা অর্থাৎ সব দুঃখী মানুষদের তখন একদম শহরে থাকতে ইচ্ছে হোত না। তবু কি যে থাকে প্রাণে—বৃষ্টি দিনে ওরা জলে সাঁতার কাটতে ভালবাসে। মানুষজনেরা যখন পঙ্গপালের মতো মোড়ে মোড়ে ভিড় জমাত নটু তখন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতো জলে। কোথাও বুকজল কোথাও কোমরজল আবার হাঁটু ডোবে না এমন জলে বাস-ট্রাম এলে সারা গায়ে জল উঠে আসত। দিনগুলো এভাবে তার কখনও বাবুদের বাড়ী, কখনও রাস্তায় যখন মন্দ কাটছিল না বেশ পালিয়ে এ-শহরে নিজের মতো আস্তানা গেড়ে ফেলছে তখন একদিন তাকে চ্যাং-দোলা করে বাবুটি বলল একেবারে এক আছাড়ে মেরে ফেলব। ফের যদি দেখি এ-রাস্তায় শুয়োরের বাচ্চা তোমার একদিন কি আমার একদিন।

নটু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল। চারু দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় দেখতে পেয়ে নটুকে দাদাবাবু চুল ধরে হিড় হিড় করে টেনে এনেছে। চিৎকার করে বলেছে, চারু চারু তুমি ওকে কোথায় রেখে এসেছিলে!

চারুর বুক গলা শুকিয়ে গেল। সে বলতে পারত বাড়ীতে। বলতে পারত অবিনাশের জিম্মায় বলতে পারত ওর মাসীর কাছে—কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। নটুকে ফের দেখে তার রাগে শরীর রি-রি করছে। কত বুঝিয়েছে, দাদাবাবু রাগ করে। তুই যদি ফের অমন করিস তবে আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবে। তখন তোকে আমি খাওয়াব কি? তোর মাসী তবে আরও কষ্ট দেবে তোকে। কখনও চারু তাকে ভাল হয়ে যাবার জন্য নানা-রকমের খেলনা এই যেমন কাঁচের বল ঘুড়ির লাটাই এবং একজোড়া হাঁস কিনে দিয়ে এসেছিল। নটুর তখন খুব ভাল-মানুষের স্বভাব। সে একটা কথা বলত না। এমন কি সে নিজে মার সঙ্গে স্টেশনে হেঁটে যেত। মাকে গাড়ীতে তুলে দিত। গাড়ী ছেড়ে দেবার সময় সে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত—মাকে একদম বুঝতে দিত না। গাড়ী চলে গেলে নটু একটা ফাঁকা মাঠে সারাদিন চুপচাপ বসে থাকত—তার মাসীর কাছে ফেরার কথা মনে থাকত না। তার হাঁসজোড়া ছেড়ে দিত পুকুরে, তারপর চালের বাতায় লাটাই গুঁজে সে বের হয়ে পড়ত। পকেটে থাকত কাঁচের বল সে কাঁচের বল সম্বল করে শহরে চলে আসত। মার কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করার স্বভাব। শহরের সে কোথাও ফুটপাথে অথবা গাছের নিচে সেই সব পরিচিত ফুটপাথ-বাসীদের সঙ্গে থেকে খেয়ে তার দিন কেটে যেত।

দাদাবাবু চুলের মুঠি কিছুতেই আলগা করছে না। তবু নটুর মুখে কোনো দুঃখের ছাপ নেই। যেন এই যে ধরে রেখেছে, দরজায় চারু এবং রাণীবৌদি, রাণীবৌদির মুখ দেখেই সে বুঝেছে ভীষণ বিরক্তিতে মুখ ভার। শরীরে বিছুটি দিলে যেমন জ্বালা তেমনি এক কষ্ট ভেতরে—কি করবে যেন কেউ বুঝতে পারছে না। বুমপা দিদি-মণির বোধ হয় সত্যি কষ্ট হচ্ছিল বাবার কাণ্ড দেখে এবং খোকাবাবুর বেশ তামাশা মনে হচ্ছে তখনও সে বলতে পারছে না, ছেড়ে দিন বাবু পায়ে পড়ি। ও তো

আপনাদের বাড়ীতে এসে ওঠে নি। রাস্তা থেকে কেন ধরে আনলেন। তবু চারু জানে সে বলতে পারবে না দাদাবাবু আমার একটা মাত্র ছেলে, ওর আর কেউ নেই মাসী ওকে ভীষণ কষ্ট দেয়, খেতে দেয় না মারে, ওর জন্য এত দূরে এয়েছি। একটা পেটের কি দুঃখ বলেন দু পেটের দুঃখ অনেক। সে কিছুই বলতে পারছিল না, দাদাবাবু হম্বিতম্বি করছে চুল ধরে টানছে—তোমার বাপু বজ্জাতি বুদ্ধি আমরা ধরে ফেলেছি—যেন সে আরও বলত আমরা বাড়ী থাকি না, রূমপা খোকন স্কুলে যায় অমুব অফিসে রাণীর কলেজ তুমি শয়তানের বাচ্চা সে সুযোগে সব খাবার নিয়ে যাও। এ-সব বললে চারুকে খাটো করা হবে চারু ভারী নির্ভরশীল মেয়ে। শত এই অপোগণ্ডের জন্য সংসারের সব কিছু এখন ভীতিপ্রদ: সে বলল, তুমি চারু ওকে কোথায় রেখে এসেছিলে! তোমার বোনপো তো ভারী সেয়ানা হয়ে গেল। বাড়ী না ছেড়ে দিলে আর দেখছি আমাদের রক্ষে নেই। —এই এই হারামজাদা দ্যাখো কেমন ভালমানুষ! একটা কথা বলছে না। তখন এ-বাড়ী ও-বাড়ীর জানালা থেকে কিছু মুখ যেন বেশ একটা সারকাসে কেউ খেলা দেখাচ্ছে। ওরা উপভোগ করছিল ভীষণ। আরে ঐ তো ছেলেটা ওকে সেদিন কাঁকুড়গাছির মাঠটায় দেখেছি, কেউ বলল কি বজ্জাত আবার চলে এয়েছে! সেদিন না ওকে রেখে এল চারু!

রাণী বলল আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। এত করে চাইলাম ঝাড়া হাত-পা একটা মানুষ তা আর খুঁজে পাওয়া গেল না। রাণী এবার চিৎকার করে উঠল, তুমি আগে কেন বলনি চারু? তখন তো খুব বলেছিলে আমার কেউ নেই। এখন তবে বোনপো কোথা থেকে আসে। তোমরা কি সবাই মিলে আমার মাথা খারাপ করে দেবে ভেবেছ! এবং এ-সব কথা কতবার যে শুনিয়েছে তাকে। সে বলতে পারত আমি তো ওকে রেখে আসি। এবং প্রথম যেবারে নুটু খুঁজে খুঁজে ঠিক তার কাছে চলে এসেছিল ঠিক বাড়ী বের করে বলেছিল, মা আমি, প্রাণে তার কি যে হয় এবং রিন-রিন করে একটা সুখ বাজছিল। এখন আর তেমন হয় না। তার চোখ মুখ কেমন হতাশায় অস্থির হয়ে ওঠে। তবু সে যখন দেখতে পেল বেশ একটা কুকুরের বাচ্চার মতো খোকনবাবু ওর হাত-পা ধরে টানছে, রাণীবৌদি ডাকছে, খোকন, চলে এস, এ-বাড়ী ও-বাড়ীর জানালায় রসিক মানুষজন দাঁড়িয়ে নানারকমের টিকা-টিপ্পনি কাটছে সে আর পারল না। সে ছুটে গেল। মুহূর্তে কেমন এক আকস্মিক দুর্ঘটনার মতো মাথার রক্ত প্রবল বেগে চারুকে খান-খান করে ফেলে। সে প্রায় অতর্কিতে দাদাবাবুর হাত থেকে নুটুকে ছাড়িয়ে এলোপাথাড়ি মার শুরু করে দিলে সবাই কেমন হতভম্ব। চারুর এমন চেহারা যেন এরা কেউ ভাবতেই পারে নি। এবং বাগানের ভেতর সব রঙিন ফুল ফুটে উঠছে। নুটু ঘাসের ভিতর পড়ে গেছিল, লাথি চড় ঘুঁষি যেভাবে যতভাবে সম্ভব চারু প্রহার করছিল। মাথায় রক্ত উঠে গেলে যা হয়—এবং দাদাবাবু নিজেই এবার কেমন বিব্রত মুখে বলল, তুমি কি ওকে মেরে ফেলবে?

অথচ চারুর মাথায় কেমন খুন চেপে গেছে তখন। তার শাড়ী ঠিক থাকছে না। নুটু মুখ বুজে আছে। কাঁদছে না।

রাণী বলল ছেলে বটে! দ্যাখো এক ফোঁটা চোখে জল আছে!

সেই যে মানুষের কি হয়ে যায়, দাদাবাবু এবার আগুনে ফেলল বলল, তুমি যাও। যাও বলছি!

এবং দাদাবাবুর ধমকেই বোধ হয় প্রথম চারুর হুঁস ফিরেছিল। সে শাড়ী সামলে কেমন হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

দাদাবাবু বলল, তুমি যাও। আমি দেখছি। এবং নিজের আহাম্মকির খেসারতের জন্য সে ডাকল এই ওঠ।

নুটু উঠে বসল। শরীরে তার কোথাও লেগেছে দেখে একদম বোঝা গেল না। ছেঁড়া জামা প্যান্ট সবই খোকনের, প্রথম প্রথম এলে সে দু-একদিন থাকতে পেত—ভাল খাবারের সেই যে লোভ পড়ে গেল আর অভ্যাসটা ছাড়াতে পারল না।

আর সেদিন বিকেলেই চারুকে দাদাবাবু বলল, তোমার ছেলে কি খেতে ভালবাসে?

পরের সংখ্যায় গল্প লিখবেন
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

—পুঁখিদা আমার কাছে আরও খাবার আছে। নুটু বেশ পা ছড়িয়ে বসল।

—কৈ দেখি। বের কর।

নুটু আরও একটা পুঁটুলি বের করে দেখাল।

পুঁখি বলল তোর মা খুব ভাল। এটা কিরে বলেই মুখে পুরে ফেলল।

—এটা আলুর পুলি। খেতে খুব ভাল না!

—খুউব।

—ওদের জন্য রাখবে না!

—ধুস। বলেই পুঁখি আরও দুটো গপগপ খেয়ে ফেলল।

নুটুর যেন কিছু আসে-যায় না। পুঁখি না থাকলে এত বড় শহরে সে তার মাকে কোথায় কিভাবে খুঁজে বের করত। সারা দিনমান তাদের ছিল বাসে ট্রামে ঘোরা। একটা থেকে নামিয়ে দিলে কত সহজে আর একটা বাসের পেছনে উঠে পড়ত পুঁখিদা। এবং তাকে প্রায় বগলদাবা করে তুলে নিত। পুঁখিদাই আবিষ্কার করেছিল খাল, পেটরোগা বাড়ী আর বকুল গাছ। ঠিক 'মলে যাচ্ছে: —রাস্তার নাম মনে করতে পারছিল না নুটু!

সে মাথা চুলকে সহসা একদিন বলে ফেলেছিল বড় একজন ডাক্তারবাবুর নাম বলেছিল। তার নামে জায়গাটা।

—তা বল। সন্ট লেক। বাবুদের একটা বড় মেলা হয়ে গেল। ইন্দিরা গান্ধী এসেছিল রে। চল তোকে সেই ঘরটা দেখাব—ইন্দিরা গান্ধী যে ঘরটায় থাকত।

পুঁখি বলল, তোর মা দিয়েছে না চুরি করে এনেছিস?

—কালির দিব্যি। মা আমাকে করে দিয়েছে।

—তোর মার বাবু কিছু বলল না?

—না। বাবু বলল, তুই কি খেতে ভালবাসিস?

—তুই কি বললি?

—বললুম কি বলব, কিছু তো মনে করতে পারি না। মাথা চুলকে বলাম, ফুচকা।

—ফুচকা বললি। দুনিয়ার আর খাবারের নাম মাথায় এল না!

—বাবু রাগে টং। বুঝলে চারু তোমার বোনপোর ফুচকা খাবার সখ। দাও করে। সব যোগাড় করে দিচ্ছি।

—তোর মার বাবু তো দেবতারে।

—খুব ভাল। আমাকে বলল মনে থাকে যেন আর ইদিকে পা মাড়াবি না। যা যা খেতে ইচ্ছে হয় একসঙ্গে বলে দে।

—তুই কি বললি।

—কিছু বললাম না।

—কিছু বললি না! তুই কি রে। ধুস। এমন সুযোগ হাতছাড়া করে।

—বাবু বললেন আর কি কি! চুপ করে আছিস কেন?

—এত করে তোকে খাওয়াতে চায়!

—বললাম চাঁপর পায়েশ।

—দিদিমা তো মনে থাকে সব।

—আর।

—বললাম পাটিসাপটা।

—আর!

—আর চিনেবাদামভাজা। আর ভগ্নীপতি বাবুর বৌটা চিৎকার করে কবে ফাটাচ্ছিল। —জন্মের মতো খাইয়ে দাও!

—তোর মা কিছু বলল না? পুঁখি ঠোঙা থেকে দুটো চিনেবাদাম ভাজা তুলে খেয়ে ফেলল।

—মা এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা কথাও বলছে না। মা তো আমাকে দুবার দেশে রেখে এসেছিলে। সটান আবার ফিরে গেছি। আমার জানো মাকে ছেড়ে থাকতে ভীষণ কষ্ট হয়।

তাই ক্যাবা বলছিল, নুটুর একদিন পাত্তা নেই। তুই খুব ভাল জাতের বাচ্চা হয়ে গিয়েছিলি কদিন।

—খুব। তবু কিনা ওরা আমাকে দেখলেই রেগে যায়। বাবু আমাকে খুব ভাল ভাল কথা বলেন তুই নুটু, দেশে যা, স্কুলে পড়গে। ভবিষ্যৎ নষ্ট করছিস কেন? আমাকে বলল কি করলে তুই আর এখানে আসবি না!

—তুই কি বললি।

—কিছু বললাম না।

—রেগে গেল না?

—আমার খুব ভয় লাগে! তারপর খুব ভালোমানুষের মতো বলল তুই যা চাইবি দেব। কথা দিবি আর আসবি না। খুব রাগ হল! কেবল আসবি না আসবি না বলছিল। বললাম, কেন আসব না! আমার মার কাছে আসব না কেন?

—তোর মা হয়! মুখে কথা ফুটেছে! বাবু বলল।

তখন মার চোখ মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। বাবু মানুষটি মার দিকে তাকিয়েছিল। —তুমি তো একথা বলনি চারু।

—আমাকে মা ডাকলে কি করব বলুন!

—তাই বল। বুঝলে বাবু শুনে খুউব খুশী। এমন বলে নুটু পা ছড়িয়ে বসল।

সহসা পংখি আংগুল চুষতে চুষতে বলল তোর বাবুর দাড়ি নেই

—না। তারপর নুটু কি ভাবল কিছুক্ষণ। সহসা আবিষ্কার করার মতো বলল গোঁফ আছে।

—গোঁফ! গোঁফ তুলে ফেললে কেমন হয়।

—একদম খারাপ দেখাবে।

—আরে তুই খা। পংখির যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে। —সব তো সাবাড় করে দিলাম।

নুটু বলল, তুমি খাও না। আমি তো আবার যাচ্ছিই।

—তার মানে।

—মানে বাবুরা যখন থাকবে না তখন যাব। খুব বুদ্ধিমানের মতো নুটু পংখির দিকে তাকাল। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। এখানে সে পংখিদাকে পাবে আশা করতে পারে নি। কারণ এ-সময় ওদের এখানে থাকার কথা না। পংখিদা একটা গাছের নীচে গামছা পেতে শুয়েছিল। ছেঁড়া একটা চাদরে মুখ ঢেকে শুয়েছিল। শীত লাগছে শরীরে। কার্তিকের হিমে ঘুরে পংখির অসুখ করেছে। জ্বর জ্বর শরীরে। আস্তানায় এসে পংখিদাকে পেয়ে সে ভীষণ খুশী। পাশে শুয়োরের খাটাল, ভাংগা পোড়ো বাড়ী তারপর একটা প্রকাণ্ড ইমারত উঠছে, সামনে ভি আই পিদের রাস্তা হরদম গাড়ী-ঘোড়া চলছে আর পূব দিকে তাকালে এখনও অনেক খালি মাঠ, জলাশয় তারপর বেংগল কেমিকেলে যাবার বাসরুট ঘুরে গেলে প্রাচীন কবরখানা। ছোট্ট একটা ভাংগা এসবেস্টসের নিচে ওদের তিন-চারজনের থাকার একটা আস্তান।

পংখি এমন একট সুযোগ কিছুতেই ছাড়তে চাইল না। ওর ময়লা তালিমারা প্যান্ট, খড়ি-ওঠা শুকনো ঠোঁট খাড়া চুল এবং চোদ্দ-পনেরো বছরের এক অতিশয় তারুণ্য নিমেষে লোভী পেটুক। সবটা সে খেয়ে ফেলল। বলল নুটু আমাদের সংগে থেকে যা। ভাল জাতের বাচ্চা হয়ে লাভ নেই। তোর মাকে কষ্ট দিয়েও লাভ নেই।

নুটু বলল তোমাদের সংগে থাকলে মা বকবে।

—তোর মা জানবে কি করে?

নুটু একটা ছোট্ট টিনের বাঁশী কিনেছে। সে সেটা মাঝে মাঝে খেলা শেষ এমনভাবে ফুরুত-ফারুত বাজাচ্ছিল। ওর ভাবতেই বিস্ময় লাগে কত বড় শহর তার মা কত বড় বাড়ীতে, কত বড় মানুষের ঘরে সে কিছুই করে না অথচ সবসময় ওরা তার পেছনে লেগে থাকে। সে কিছু বলল না। তার খুব ভাল লাগছে। 'বাড়ীতে গেলে মাসী ভাল ভাল খাবারগুলো ওকে না দিয়ে খেয়ে ফেলত। মা যতবার দিয়েছে একদিন যেতে না যেতেই বলেছে—আর নেই। খাও তো কম না। মার তো তোমার পাখা গজিয়েছে। উড়ছে—কেবল উড়ছে। নুটু বুঝতে পারত মাসী মার সম্পর্কে খারাপ কিছু বলতে চায়। সেটা সঠিক কি সে বুঝতে পারে না। সে দুঃখে মুখ ভার করে থাকত।

পংখি জামার খুঁটে মুখ মুছে বলল তা হলে তুই আমাদের সংগে থাকবি না।

নুটু কি বলবে ভেবে পেল না। তাকে যে শেষ পর্যন্ত যেতে হয় নি সে যে শেষ পর্যন্ত মায়ের কাছাকাছি থেকে যেতে পারল তাতেই আনন্দ। সে ইচ্ছে করলেই তার মাকে যখন খুশী দেখে আসতে পারে। তার তো এখন থাকবার শোবার ভাবনা নেই। ফুটপাথে, ইস্টিসনের বেঞ্চীতে অথবা পংখিদের আস্তানায় নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকতে পারে। পেটের খিদেটা কেবল তাকে কষ্ট দেয়। না হলে যখন যা দরকার তার হাতের কাছেই আছে। আর যখন সে এমন একটা বড় মাঠ আবিষ্কার করে ফেলেছে যত খুশী ছোটা যায়, যত খুশী সূর্য দেখা যায় আকাশ দেখা যায় তখন সে কোথায় রাত কাটাবে আর ভাবে না। সে বলল, আমি তো তোমাদের কাছেই আছি।

পংখি আর কথা বাড়াল না। সে ইতিমধ্যে তার যাবতীয় সাংসারিক খুঁটিনাটি যোগাড় করে ফেলেছে। যেমন তার আছে ভাংগা একটা এনামেলের গ্লাস, ছেঁড়া কাঁথা আট-দশটা খুরি একটা কলাই-ওঠা টিনের থালা, ছেঁড়া প্লাস্টিকের পাতলা চাদর ঝড়বৃষ্টির সময় সে প্লাস্টিকের চাদরটা দিয়ে সব ঢেকে রাখে। তারপর তিন-চারটে ইঁট রেখে দেয়। এবং তখন সে স্বাধীন, যেখানে খুশী সে চলে যেতে পারে। তবু কেন জানি খুব একটা বেশী দূরে যেতে পারে না। তার সাংসারিক খুঁটিনাটি তৈজসপত্র কেউ আবার চুরি করে নিয়ে গেলে সে একেবারে ভিখারি হয়ে যাবে। তার ভীষণ মায়া পড়ে গেছে এই ছোট্ট খুপরিটার ওপর। যখন কিছু ভাল লাগে না, অসুখ করে সে শুয়ে থাকে তার নিচে। ভাল না লাগলে এই মাঠ, গাছপালা রয়েছে কিছু অথবা গাড়ীবারান্দার নিচে সে বেশ

ঘুম যেতে পারে। সে এনামেলের গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বলল নুটু জল দে।

নুটু লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল কলের ধারে। এক গ্লাস জল সন্তর্পণে নিয়ে এল। তারপর বলল দাদা আমি আসছি। বলেই সে এক দণ্ড দাঁড়াল না। এমন একটা বিকেল, পেটে খিদের কষ্ট নেই, ভীষণ ভাল লাগছে সব কিছু, এমন কি মা তাকে আজ জলে চান করিয়েছিল, সাবান ঘসে তেল মাখিয়ে দিয়েছিল মা, চুল পাট করে দিয়েছিল। খোকাবাবুর পুরোনো প্যান্ট পুরোনো জামাতে সে ফিটফাট বাবু, প্রায় কোথাও নেমন্তন্ন খেতে যাবার মতো পোষাক সে এমন একটা বাবু মানুষ যখন, তার ভারী ইচ্ছে হয়েছিল দুটো বেলুন কিনে ফেলবে।

সে যাবার সময় দেখল মাঠে সব বাবুদের ছেলেরা খেলছে। একটা সাদা রঙের বল ছুঁড়ে দিচ্ছে একজন, ব্যাট দিয়ে সেটা হাঁকড়াচ্ছে। কেউ কেউ দূরে দাঁড়িয়ে আছে বলটা ধরবার জন্য। সে মাঠের এক কোণায় দাঁড়িয়ে পড়ল। দূরে রেললাইন দেখা যাচ্ছে। একটা গাড়ী এসে ঝপাং করে থেমে গেল। রেলগাড়ী দেখলেই অবিনাশ-মামার কথা মনে পড়ে যায়। গাড়ীর জানালায় মামা যদি বসে থাকে তবে দেখে ফেলবে। সে এখানেও এক দণ্ড দাঁড়াল না। তারপর গাড়ী যাচ্ছে বড় রাস্তা ধরে। খোকাবাবুর স্কুল থেকে ফেরার সময়। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে দেখে ফেলবে। দেখে ফেললে বাড়ীতে মার অশান্তি। তোমার বোনপো চারু রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। বেলুন ওড়াচ্ছে। সে আর সেখানেও দাঁড়াতে সাহস পেল না। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্ধকার হয়ে গেলে কেউ আর তাকে দেখতে পাবে না। সে তখন সব দোকানের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে পারবে। খুশীমতো এটা-ওটা কিনে খেতে পারবে। পকেটে মা তাকে তিনটে টাকা দিয়ে দিয়েছে। সে একবার প্রায় বলে ফেলতে যাচ্ছিল পরীখদা মা আমাকে আলাদা টাকা দিয়েছে দেখবে। অসলে মা তাকে কত ভালবাসে মার কত ভাবনা তার জন্য, সে যে পরীখদার মতো নয় এটা জাহির করার ভারী ইচ্ছে ছিল। তারপরই মনে হয়েছে, টাকা দেখলেই পরীখদা জোরজার করে নিয়ে নেবে। বলবে এত টাকা তুই রাখবি কি করে? দে আমার কাছে রেখে দি। সে এখন প্রায় এই উঠতি শহরে রাজার মতো হাঁটছিল। তার আর কোনো দুঃখ নেই কারণ পকেটে তার তিনটে টাকা। সোজা কথা না। সে আর বাবুদের বাড়ী যাবে না কথা দিয়ে টাকাটা মার কাছ থেকে আদায় করেছে।

এভাবে নুটু এত বড় শহরের সব কিছু প্রায় মুখস্ত করে ফেলেছিল। কত সহজে কোন রাস্তায় বাবুদের বাড়ীতে নিমেষে পৌঁছানো যায় তারচেয়ে আর কেউ জানে না। সে এখন ভীষণ সতর্ক থাকে। কথা-মতো সে এখন বাড়ীতে আছে। সে এ শহরে নেই। এটা-ওটা খেয়ে বেশ চলে গেল দু দিন। আবার পোষাক ঠিক আগের মতো, চুল খাড়া খাড়া খিদে পায়। যত খিদে পায় সে ঘুরে-ফিরে দেখতে পায় তত বাবুদের বাড়ীর কাছাকাছি চলে এসেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়, সে কথা দিয়েছে মাকে। সে তখন দৌড়ায়। এত বড় শহরে একজন বালক এভাবে ক্ষুধায় যখন পায়ে না, নিশুতি রাতে শহর যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সে কোনো গাছের নীচে, অথবা ইঁটের ডাই-এর পেছনে উবু হয়ে বসে থাকে। রাতের ঘণ্টা বাজে। দূরে কোনো লোহার কারখানায় পেটাঘড়িতে শব্দ হয়, এক দুই তিন এবং তখন ওর কলজের ভেতর কে যেন ঘড় ঘড় শব্দে হাঁকড়ায়, রাত বাড়ছে। রাস্তার লোকজন কমে আসে। বাস কমে আসে মোড়ে মোড়ে দু-একজন মানুষের চোখ অন্ধকারে শুধু জ্বলছে দেখতে পায়। শহরে তারা কি খুঁজে বেড়াচ্ছে সে ঠিক বোঝে না। তার তখন দ্রুত দৌড়াতে ইচ্ছে করে। শহরে ক্রমে উত্তুরে হাওয়া ঢুকে যাচ্ছে। সে কখনও দু হাত আর হাঁটুর ভেতরে মুখ গুঁজে একা নিশুতি রাতের নক্ষত্র গোনে এবং এভাবে আরও রাত বাড়লে সে টের পায় ঠাণ্ডায় শরীর অসাড় হয়ে উঠছে। সে তখন আর পারে না। ফুট-পাথবাসীদের ডিঙিয়ে সে চলে যায় সেই রাস্তাটায়। তারপর পাঁচিল টপকে জানালায় মুখ রেখে ফিসফিস করে ডাকে, মা, মা আমি নুটু। আমার খিদে পেয়েছে। মা, ভীষণ শীত। আমাকে মা খেতে দাও। সে তার কথা রাখতে পারে নি।

আর তারপরই জানালায় একটু মৃত সাদা মুখ বড় ফ্যাকাশে। এত রাতে নুটুকে দেখে কেমন ভয় পেয়ে যায়। নুটু তুই। বাবা তুই। কিন্তু বুঝতে পারে খুটখাট শব্দে ভেতরে কেউ জেগে যেতে পারে।

মা খিদে পেয়েছে। আমি খাব।

—কবে তুই এলি নুটু, তুই এত রাতে—আমি কি যে করি, আমার পোড়া মাসে আবার আগুন জ্বালাতে এলি।

—মা দরজা খোল। খুব শীত করছে।

—জেগে যাবে নুটু। কথা বলিস না।

—তবে খেতে দাও।

—কি দেব।

—যা আছে। আর আসব না দেখো।

চারুর চোখের জল দেখা যায়। চিক-চিক করছে। বলতে ইচ্ছে হয় যা বাবা বাড়ী যা। এখানে থাকলে মরে যাবি। বলতে পারে না। ছেলেটা তাকে ছেড়ে থাকতে পারছে না। সে তাড়াতাড়ি কিছু বাসি রুটি, তাও গোনা-গুনতি একেবারে এদিক-ওদিক করার উপায় থাকে না সংসারের এ-দিকটাতে সব কিছুর ওপর ভারী সতর্ক তবু সকালের রুটি যা ছিল খাবার, সে দিয়ে দেয়। —আর আসিস না।

—আর আসব না। একটু গুড় দাও।

—গুড় নেই। কিছুটা চিনি একটা কাগজে দিয়ে চারু বলল যা। ওরা উঠে পড়লে আমার রক্ষা থাকবে না।

নুটু ভালভাবে কথা বলতে পারছিল না। শীতে কাঁপছিল। হা হা করে ঠাণ্ডা বাতাস কলকাতার ওপর বয়ে যাচ্ছে। শীতের জন্য শহরের সব দরজা জানালা বন্ধ। কেবল এখন একটা জানালা খোলা এবং দু পাশে দুজন। চারুর মুখ কাতর। কোনরকমে বলতে পারছে না, তুই থাক না। এখানে থেকে যা। হপ্তা পায় হয়নি নুটু আবার চলে এসেছে। এমন শৌখিন জীবন চারু জীবনেও পায় নি। ওর সাহস ক্রমে যাচ্ছে। ভয়ে ভেতরটা গুড়গুড় করে ওঠে। ছাড়িয়ে দিলে তার আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। এমন একটা নিশ্চিন্ত জীবনে নুটু এখন উপদ্রবের সামিল। যতই সে রোয়াব দেখাক, আমি কি করব আমি তো বলি না ওকে আসতে ও চলে এলে আমি কি করব, আমাকে তবে তাড়িয়ে দিন—সবই অহংকারে লাগে বলে বলা। আসলে সে ভয়ে ভয়ে থাকে। নুটু দিন দিন যত বেয়াড়া হয়ে উঠছে তত তার ভয় বাড়ছে। সে তবু কেন যে বলল, নুটু ভেতরে আয়। খুব সকালে তুলে দেব। তুই চলে যাবি।

এক লাফে নুটু দরজার কাছে চলে গেল। চারু সন্তর্পণে দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে গেল। তারপর কম্বলে একটা শীতের বেড়ালছানা যেভাবে ঢেকে রাখে তেমনি ঢেকে রাখল। সারা রাত চারু জেগে থাকল। ভোররাতে একটা ছেঁড়া চাদরে ঢেকে বলল, যা বাবা আর আসিস না। এবং ওর আর যা নগদ ছিল সব দিয়ে বলল, বাড়ী যা। বাড়ী যা নুটু।

নুটু আবার কেমন ভালমানুষ হয়ে গেল। সে বলল, খিদে লাগলে আসব, কেমন মা!

চারু এবার আর বলতে পারল না, মা খিদে লাগলেও আসতে পারবি না। সে বলল, আসিস। বাবুরা কেউ না থাকলে চলে আসিস। এদিকের জানালা খোলা থাকবে। তুই খাবার নিয়ে যাস।

তারপর কে দেখে, নুটুর সব ঠাণ্ডা নিমেষে উবে যায়। চার পাশে কাক ডাকছে। শাঁখ এবং মোরগের ডাক। শীতে সব কুকুরগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে রাস্তায় সে যেতে যেতে যেখানে যত কুকুর দেখতে পেল, লাথি মেরে জাগিয়ে দিল। কুকুরগুলো সব কুঁইকুঁই করে ছুটছে। সেও তার পেছনে পেছনে ছুটবে। আর যা খাবার দু পকেটে ভরে দিয়েছিল চারু সব টেনে বের করছে আর খাচ্ছে। আর ছুটছে। কুকুরের পেছনে সে ছুটছে। হাড়কাঁপানো শীত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নুটু সারা সকালটা এভাবে এখন ছুটবে, আর শরীর গরম রাখার চেষ্টা করবে। শহরের মানুষেরা বুঝতেই পারবে না কেন এভাবে নুটু সারা সকালটা রাস্তায় ছুটে বেড়াচ্ছে। তারা বাজার হাট করবে। ফুলকপির ডালনা খাবে, শাকশব্জির দাম কিছু কমেছে যখন খাও। খাও আর খাও। এটা যে ক্রমে শীতের শহর হয়ে যাচ্ছে, নুটুরা ক্রমে অনেক নুটু হয়ে যাচ্ছে এবং এভাবে এক থেকে একশ হাজার লক্ষ ওরা বুঝতেই পারবে না। শীতের শহরে মরা গাছপালার ভেতর নুটুর সামান্য উত্তাপের জন্য ছুটে মরা তাদের কাছে ভারি তামাসার মতো। জানালায় এমন একটা দৃশ্য ভারী উপভোগের সামিল।

পটভূমি

জগজীবন অভ্যর্থনায় অরুণ মৈত্র—কেন ?

রবিবার অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারী দমদম বিমানঘাঁটিতে পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসের সভাপতি অরুণ মৈত্র উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গে কোষাধ্যক্ষ ধীরেন বসু ও প্রদেশ কংগ্রেস অফিসের অনেক লোকই হাজির। শীতের সকাল আটটা দশ মিনিটের সময় দিল্লী থেকে একজন মাননীয় অতিথি আসলেন। তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্যই এঁদের যেতে হয়েছিল। এঁরা ছাড়াও রাজ্য মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন প্রবীণ সদস্যও গিয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীদের যাওয়ার পেছনে কোন তাৎপর্য নেই। কারণ, প্রোটকলের চলতি নিয়মানুযায়ী এঁদের বিমানঘাঁটিতে হাজির থাকতেই হবে।

এই মাননীয় অতিথি অতীতে বহুবারই এসেছেন, কিন্তু কোন সময়ে অরুণবাবুকে বিমানঘাঁটিতে দেখা যায়নি। কিন্তু এবার……।

অরুণবাবুর উপস্থিতির সংবাদটি সেদিক থেকে নিশ্চয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ-ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যে নানা কোণে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। 'অরুণবাবু গেলেন কেন?'—এই হচ্ছে প্রশ্ন। তথাপি রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি বোধহয় এ-ব্যাপার নিয়ে বিশেষ কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হননি। তাই তাঁকে উত্তরও দিতে হয়নি।

এই মাননীয় অতিথির নাম বাবু শ্রীজগজীবন রাম। যাঁরা তাঁকে শ্রদ্ধা করেন বা ভয় পান তাঁরা তাঁকে 'বাবুজী' বলে ডাকেন। এমনকি শোনা কথা, ইন্দিরাজীও তাঁকে 'বাবুজী' বলেন। এই 'বাবুজী' যেদিন কলকাতায় এলেন সেদিনের ভোরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে এক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এবং তা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন : উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে তাঁদের পার্টির কোন কোন বড় নেতা তাঁকে নেতৃত্বের পদ থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন। তাঁরা বলেছেন, এই প্রধানমন্ত্রী সরে গেলে জয়প্রকাশজীকে কংগ্রেসে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। তাই একটা সংবাদ ও আর একটা ঘটনার সমন্বয়ে রাজ্যের রাজনীতিতে কিছুটা অবশ্যই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে জগজীবন রামকে স্বাগত জানাতে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় অবশ্য যাননি। তিনি এদিন কলকাতায় ছিলেন।

এই সকল ছোট-খাটো ঘটনার যদিও সুদূরপ্রসারী কোন তাৎপর্য নেই, তবু বলতে হয় দুই দুই যোগ করলে চার হয়। দিল্লীতে রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারসাম্যের কোন তারতম্য হলে তার প্রতিক্রিয়া যে এই পশ্চিমবঙ্গেও এসে পড়বে এবিষয়ে নতুন কিছু বলার নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে অরুণবাবুকে লোকে প্রগতিশীলদের ধারক ও বাহক বলে জানতেন তিনি সদলবলে বিমানঘাঁটিতে কেন উপস্থিত ছিলেন ?

রাজ্যের রাজনীতি ক্ষেত্রে শাসক পার্টির মধ্যে এখন প্রচণ্ড থমথমে ভাব। অনেকে আশংকা করেছিলেন, সম্প্রতি কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠকে ঝড় উঠবে। কিন্তু সব আশংকা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। ঐ বৈঠকে শুধু মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া আর কেউ বক্তব্য রাখেননি। এমনকি আর কেউ সিদ্ধার্থবাবুকে বিচলিতও করেননি। তাহলে কি ধরতে হবে এই রাজ্যের রাজনীতিতে সব শান্ত? এ প্রসঙ্গে জগজীবনবাবুর মন্তব্যের উল্লেখ না করে পারছি না। তাঁকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন : পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসের মধ্যে কি দলাদলি নেই? তিনি উত্তরে শুধু একটা কথাই বলেছিলেন : আপনারা আমার চেয়ে ভাল জানেন। অর্থাৎ দলাদলি আছে এটা প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও তিনি অস্বীকারও করেননি। আসলে এই রাজ্যের রাজনীতিতে ওয়াংচু কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়ে যাওয়ার পর নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। 'নতুন এলাইনমেণ্ট' তৈরী হতে চলেছে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন, অবশেষে বাধ্য হয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগকারী মন্ত্রী সন্তোষ রায়কে বিধানসভার সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছেন। অপর পদত্যাগকারী উপমন্ত্রী সুনীতি চট্টরাজ কয়েকদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত গালিগালাজ করার পর এখন একটু চুপ করে আছেন, কেউ কেউ বলছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর একটা আলোচনা ও বোঝাপড়া হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের বোঝাপড়া শেষ কথা নয়। সিদ্ধার্থবাবুও নিজে জানেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে যে-কোন সময়ে আক্রমণ হতে পারে। তবে এবারে কোনদিকের আক্রমণে তর্কের খাতিরে যদি ধরা হয় যে সিদ্ধার্থবাবুকে সরে যেতে হবে তাহলে একথা বলা যায় অতীতে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের তিনি যে হুমকী দিয়ে আসছিলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে তা কার্যকরী হবে না। তাঁকেই সরে যেতে হবে। সেখানে নতুন নেতা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন।

যে-কথা নিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম, সে-প্রসঙ্গে আসা যাক। অরুণবাবু কেন দমদম বিমানঘাঁটিতে গিয়েছিলেন? তিনি জানেন প্রধানমন্ত্রী এ-সংবাদ জানলে ফল ভাল হবে না; তথাপি তিনি ঝুঁকি নিয়েছেন। তাহলে তাঁকে অপসারণের চেষ্টা হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী যে অভিযোগ করেছেন তা কি সত্য?

কংগ্রেস রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের লড়াই যে কোন পর্যায়ে থাক না কেন বাইরের শত্রুর আক্রমণের সামনে তাঁরা যে সবাই এক, তা গত দুবছরে বিভিন্ন ধর্মঘটে ও অন্যান্য ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে। এদিকে সংগঠন কংগ্রেসের নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু জয়প্রকাশজীর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এক হয়েছেন। এঁদের যে প্রচণ্ড শক্তি আছে তা সব কংগ্রেস নেতাই মনে মনে জানেন অতএব আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কংগ্রেস-বিরোধী এই শক্তি যদি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চেষ্টা করে তাহলে কংগ্রেসের ভেতরের দ্বন্দ্ব কিছু সময়ের জন্য হলেও স্তব্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু যদি নিজেদের সংগঠনের মধ্যে ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় তাহলে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা এক্ষুনি কেউ বলতে পারবেন না। তখনই এই ধরনের অস্বাভাবিক চিত্র চোখে পড়বে। তখনই অরুণ মৈত্রকে যেতে হবে 'বাবুজী'কে স্বাগত জানাতে শীতের সকালে দমদম বিমানঘাঁটিতে।

কৌটিল্য

এই বাংলার খবর

রাজ্যের হাল-চিত্র

পশ্চিম বাংলা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল অ্যান্থনি ল্যান্সলট ডায়াস যে ভাষণ দিয়েছেন তার মধ্যে ফুটে উঠেছে আশার ছবি। আইন-শৃঙ্খলা, সরকারের আর্থিক অবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ভূমি সংস্কার, এই রকম নানা ক্ষেত্রে সরকারি কৃতিত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে ঐ ভাষণে। রাজ্যপালের দাবি, গোটা রাজ্যে শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন সরকার। অপরাধের সংখ্যা আর সমাজ-বিরোধীদের কার্যকলাপ, দুই-ই হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭১ সালে চরমপন্থীরা জড়িত ছিল ৩৪৫০টি ঘটনার সঙ্গে। ১৯৭৪ সালে ঐ সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ৩৭টিতে। ঐ বছরে মিসায় আটক করা হয় মোট ৬৩৬ জন চোরাচালানকারী, চোরাবাজারী, মজুতদার আর মাদকপাচারকারীকে। এদিকে আর্থিক কার্যকর্মের সুপরিচালনা আর কর আদায়ের ব্যবস্থা জোরদার হওয়ায় সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের দেনা ও সুদ বাবদ সব পাওনা (মোট ১৩০ কোটি টাকা) মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ঋণখাতে ঘাটতি ধরা হয়েছে ১২ কোটি টাকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৭৪-৭৫ সালে বার্ষিক যোজনার জন্যে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে মোট ১৫০ কোটি টাকা করা গেছে। এর আগের আর্থিক বছরে ঐ অংক ছিল মাত্র ৯১ কোটি টাকা।

চাষবাস এবং কল-কারখানা, দুটি ক্ষেত্রেই অবস্থার উন্নতির কথা জানান রাজ্যপাল। ১৯৭২ সালের পর এই রাজ্যে ২৯ হাজার অগভীর নলকূপ বসানো হয়েছে, আর বিলি করা হয়েছে ২২ হাজার পাম্প সেট। তা ছাড়া ৫০০ গভীর নলকূপ আর নদীর জল তোলার জন্যে ১৬০০ সেট বসাবার ব্যবস্থাও হয়েছে। কল-কারখানা স্থাপনের লাইসেন্স এবং অভিপ্রায়-পত্রের আবেদনের সংখ্যা ১৯৭৪ সালে দাঁড়ায় ৪১২। আগের বছরে ঐ সংখ্যা ছিল ১৬৮। ঐ বছরেই চালু হয়েছে রাজ্যের প্রথম সিমেন্ট কারখানাটি। বিদ্যুৎ সংকট এই রাজ্যে শিল্প প্রসারে একটা বড় বাধা ঠিকই কিন্তু বিদ্যুৎ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি করার পর অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যেও সরকার কয়েকটি কর্মসূচীতে হাত দিয়েছেন। সাঁওতালডিহির প্রথম ইউনিটে বিদ্যুৎ উৎপাদন এখন ঠিকমতো হচ্ছে, দ্বিতীয় ইউনিটে উৎপাদন [illegible] মাসের মধ্যে সুরু হয়ে যাবে বলে আশা করেছেন রাজ্যপাল। কোলাঘাট, ব্যাণ্ডেল প্রভৃতি জায়গায় নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগও সুরু হয়েছে।

ভিন্ন দৃষ্টিতে

রাজ্যপালের ভাষণে আশার ছবি ফুটে উঠলেও বিধানসভার সব সদস্য কিন্তু রাজ্যের এই হাল-চিত্রকে মেনে নিতে পারেন নি, এমন কি সব কংগ্রেস সদস্যও না। তাঁদের একটা বড় অভিযোগ, ঐ ভাষণে দুর্নীতি দমনের কথা বলা হয়েছে বটে কিন্তু ওয়াঞ্চু কমিশন নিয়ে এত হৈচৈ হয়ে গেল তার কোনো উল্লেখই নেই। ভিজিল্যান্স কমিশনের কার্যকলাপের কথা বলা হয়েছে কিন্তু ওয়াঞ্চু কমিশনের রিপোর্ট এবং দুর্নীতি সম্পর্কে সকলের [illegible] কথা মনে রেখে দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে আরো বিশদ কর্মসূচী ঘোষণা করা উচিত ছিল। রাজ্যপালের ভাষণে আরো যে-সব ত্রুটি তাঁদের চোখে ধরা পড়েছে তার মধ্যে রয়েছে উদ্বাস্তু-দের সমস্যার অনুল্লেখ এবং শিক্ষক ও পাঠাগারীদের দুরবস্থা সম্পর্কে নীরবতা। একজন সদস্যের ভাষায়, রাজ্যপালের ভাষণে গরু-ছাগলের কথাও ঠাঁই পেয়েছে, কিন্তু উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে কোনো কথা নেই।

বিরোধী পক্ষের সব সদস্য রাজ্যপালের ভাষণের সময় বিধানসভায় হাজির ছিলেন না। সংগঠন কংগ্রেস এবং আর এস পির সদস্যরা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা রাজ্যপালের ভাষণ বয়কট করবেন। শ্রীডায়াস ভাষণ সুরু করার আগেই কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় চটকল ধর্মঘট প্রসঙ্গে সরকারের শ্রমিক-বিরোধী নীতির সমালোচনা করতে আরম্ভ করেন। রাজ্যপাল অবশ্য সেদিকে কান না দিয়ে ভাষণ পড়ে যেতে থাকেন। কম্যুনিস্ট সদস্যরা দশ মিনিটের জন্যে সভা ছেড়ে চলে যান। এদিকে বিধানসভার অধিবেশনের প্রথম দিনেই সভার সদস্যপদে ইস্তফা দেন প্রাক্তন ত্রাণমন্ত্রী সন্তোষ রায়। ওয়াঞ্চু কমিশনের রিপোর্টের পর তাঁকে মন্ত্রীর পদ ছাড়তে হয়। কিন্তু ঐ কমিশন যে তাঁকে দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেছিল তা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনি [illegible] আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে চান। বিধানসভার সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে তিনি নতুন করে নির্বাচন প্রার্থী হবেন।

চটকল আবার চালু

জানুয়ারীর ৬ তারিখে রাজ্যের ৬২টি চটকলের আড়াই লাখ শ্রমিকের যে ধর্মঘট সুরু হয়েছিল তা পুরোপুরি মিটলো ফেব্রুয়ারীর ২২ তারিখে। অবশ্য মিটলো বললে ঠিক বলা হয় না, আস্তে আস্তে ভেঙে গেল বলাই বোধ হয় ঠিক। সব পক্ষ মিলে-মিশে যাতে একটা সমঝোতায় আসতে পারেন তার জন্যে সরকারি উদ্যোগে চেষ্টা কিছু কম হয় নি। দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে মালিক আর শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে সরকারের মধ্যস্থতায়। মাঝে মাঝেই শোনা গেছে, এই মিটমাট হয়ে গেল বলে। কিন্তু কিছুই হয় নি। শেষ পর্যন্ত মালিকপক্ষ সরকারি প্রস্তাব মেনে নিয়ে চটকলের দরজা একে-একে খুলে দিতে লাগলেন শ্রমিকরাও ধীরে ধীরে কাজে যোগ দিতে সুরু করলেন। দশটি ইউনিয়ন এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। অবস্থা দেখে তাদের মধ্যে চারটি (আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি, এইচ এম এস এবং এন এফ আই টি ইউ) ২১ ফেব্রুয়ারী থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিল। কিন্তু তারা এই সঙ্গে এ-কথাও বললো, সরকারের প্রস্তাব তারা মেনে নিতে পারে নি, কারণ সরকার চটকলের মালিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। বাকি ছ'টি (সিটু প্রভৃতি) ইউনিয়নও আরো দু'দিন অপেক্ষা করার পর ২৩ তারিখ থেকে শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে নির্দেশ দিল। কিন্তু যে চারটি ইউনিয়ন প্রথম ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছিল তাদের তারা এই বলে সমালোচনা করলো যে, তাদের কাজের ফলে শ্রমিকদের ঐক্যে ফাটল ধরেছে।

ধর্মঘট মীমাংসার জন্যে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রস্তাব করা হয়, ১৯৭৪ সালে যে সব শ্রমিক অন্ততঃ একশ' দিন কাজ করেছেন তাঁরা থোক ১২০ টাকা পাবেন। এই টাকা দেওয়া হবে দুই কিস্তিতে (মার্চ ও নভেম্বরে)। যাঁরা ৬০ দিনের বেশি কাজ

করেছেন তাঁরা কাজের দিনের আনুপাতিক হারে টাকা পাবেন। ধর্মঘটকালীন বেতন শ্রমিকেরা পাবেন না, তবে ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার জন্যে তাঁদের কোনো সাজা দেওয়া হবে না। ১৯৭৪ সালে শ্রমিকদের ৫৬ টাকা করে যে অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল তা কেটে না-নেওয়ার জন্যেও মালিকদের অনুরোধ করা হয়েছে। আর বোনাস দেওয়া হবে বোনাস আইন অনুযায়ী।

বিদ্যুৎ-চিন্তা

রাজ্যপালের ভাষণে বলা হয়েছে যে, বিদ্যুতের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। বিদ্যুৎমন্ত্রী আবু বরকত গণি খানচৌধুরীও সেদিন বলেছেন, আসন্ন গ্রীষ্মে বৃহত্তর কলকাতায় লোড শেডিংয়ের আশঙ্কা নেই। কিন্তু গ্রীষ্ম যদিও এখনও সুরু হয় নি, লোড শেডিং এর মধ্যেই সুরু হয়ে গেছে। ১৯ ফেব্রুয়ারী রাতে দুর্গাপুর প্রজেক্টসের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পাঁচ নম্বর ইউনিটের ট্রান্সফর্মার পুড়ে যায়। এটি সারাতে কয়েক মাস সময় লাগবে। ফলে ঐ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং কলকাতায় বিদ্যুৎ যোগানও কমে যাবে। ডি ভি সিও প্রত্যহ চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ যোগাতে পারছে না। ফলে বেশ কয়েক জায়গায় লোড শেডিং ঠেকানো যাচ্ছে না। এখন বিদ্যুৎ যোগানের অবস্থা এমনই যে, যে-কোনো একটি উৎপাদন কেন্দ্রে কোনো গণ্ডগোল হলেই অনেক এলাকাকে অন্ধকারে ডুবতে হবে। চটকলগুলো চালু হওয়ায় বৃহত্তর কলকাতায় এখন বিদ্যুতের দৈনিক চাহিদা ৯১০ মেগাওয়াট। বিভিন্ন উৎপাদন সংস্থার তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে এই চাহিদা তাঁরা কোনোরকমে মেটাতে পারবেন। কিন্তু গরমে ঐ চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে ৫৪০ মেগাওয়াট। সাঁওতালডিহি থেকে হাওড়া পর্যন্ত ট্রান্সমিসন লাইন টানার কাজ এপ্রিল নাগাদ শেষ হলে বাড়তি ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বলে সরকার আশা করছেন। কিন্তু টাকার অভাবে ঐ লাইন টানার কাজ ঠিকমতো এগোতে পারছে না বলে জানিয়েছেন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যান স্বয়ং।

গুপ্তধন

কলকাতায় ব্র্যাবোর্ণ রোডে শুল্ক বিভাগের অফিসারেরা হীরে-জহরত-সোনার "খনির" সন্ধান পেয়েছেন। ফেব্রুয়ারীর ১৯ তারিখে একটি সেফ ডিপোজিট ভল্টের লকার খুলে তা থেকে তাঁরা ৬০ লাখ টাকার হীরে উদ্ধার করেন। পরদিন ঐ লকার থেকেই পাওয়া যায় আরো ৫৪ লাখ টাকা দামের হীরে আর একটি সোনার ঘড়ি, যার দাম দশ হজার টাকা। সেই সঙ্গে পাওয়া যায় নগদ ৫০ হাজার টাকা। একদিন বাদ দিয়ে আরো লকার খুলে উদ্ধার করা হয় সোনা, সোনার গয়না আর নগদ মিলিয়ে মোট সোয়া ছ' লাখ টাকার সম্পত্তি।

ঐ ভল্টের কয়েকটি লকারে কালো টাকা এবং বেআইনী সম্পত্তি লুকানো আছে, এই খবর শুল্ক বিভাগের কর্তাদের কাছে কয়েকদিন আগে এসে পৌঁছয়। তখন তাঁরা ঐ সব লকার "সীল" করে দেন। যে সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়েছে তার মালিক কে বা কারা তা এখনও জানা যায় নি। লকারের মালিক হিসেবে যে-সব নাম-ঠিকানা দেওয়া আছে, খোঁজ নিয়ে জানা গেছে সেগুলো ভুয়া।
২৪।২।৭৫

দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

পাকিস্তানের জন্য মার্কিন অস্ত্র

চেস্টর বোলজ যখন ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন তখন দুই দেশের মধ্যে একটা বোঝাপড়া স্থাপনের চেষ্টা করতে গিয়ে কিভাবে বারবার আমেরিকার পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভিতর শক্তিশালী পাকিস্তান লবির কাছ থেকে বাধা পেয়েছেন তার একটি বিস্তারিত বর্ণনা তিনি তাঁর বইয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বোলজ সাহেব তাঁর ঐ বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

'পাকিস্তানের সামরিক শক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের যুক্তিটার সূত্র অনুসন্ধান করতে 'ওয়েলস অব পাওয়ার' নামে একটি বইয়ের দিকে সম্ভবত নজর দেওয়া যেতে পারে। বইটির লেখক হলেন স্যার ওলাফ ক্যারো নামে একজন বৃটিশ সিভিল সারভ্যান্ট। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে বইটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পররাষ্ট্র দপ্তরের নজরে এসেছিল। ক্যারোর বক্তব্য ছিল বৃটিশ উপনিবেশের কালে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থায়িত্ব নির্ভর করত প্রধানত তিনটি জিনিসের উপর ঃ বৃটিশ কূটনীতি, বৃটিশ নৌবহর ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনী। ভারত থেকে বৃটিশের পশ্চাদপসরণের পর ও ভারতীয় সামরিকবাহিনীকে অপরের ব্যাপারে অনাবশ্যকভাবে জড়িয়ে না ফেলার নেহরু-নীতি ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভারতীয় সামরিকবাহিনীর আর ভূমিকা নেই। অতএব ক্যারোর যুক্তি হল ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর একটা বিকল্প শক্তি খুঁজে বের করতে হবে। আর এ-ব্যাপারে সবচেয়ে সম্ভাব্য দেশ হল পাকিস্তান।'

চেস্টার বোলজ যখন ১৯৫২ সালে প্রথমবার ভারতে তাঁর দেশের রাষ্ট্রদূত হয়ে আসেন, তখন তিনি ভারতবর্ষস্থিত তৎকালীন বৃটিশ হাই-কমিশনার স্যার আর্চিবল্ড নাই-এর সমর্থন নিয়ে ওয়াশিংটনের সরকারি মহলের এই পাকিস্তান-ঘেঁষা যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সেই চেষ্টা কিভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে বোলজ তাঁর বইয়ে সেকথা লিখেছেন।

চেস্টার বোলজ বা অন্যান্য ওঝাদের প্রয়াস সত্ত্বেও ইতিহাসের সেই প্রেত যে আজও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের ঘাড় থেকে নামেনি আর একবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আরও একবার দেখা গেল ওয়াশিংটনের পাকিস্তান লবি এমনকি আপন দেশের কূটনীতিকদেরও একটা বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলতে দ্বিধা করে না। ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম স্যাকসবি তাঁর নতুন পদে যোগ দিতে আসবেন সোমবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাষ্ট্রপতির কাছে তিনি পরিচয়পত্র পেশ করবেন। সব ঠিকঠাক। আমেরিকা থেকে যাত্রার আগে স্যাকসবি ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি সম্পর্কে কিছু সদিচ্ছাও প্রকাশ করলেন। কিন্তু হঠাৎ জানা গেল স্যাকসবি নির্দিষ্ট সময়মত দিল্লিতে আসছেন না। নয়াদিল্লী-স্থিত মার্কিন দূতাবাস থেকে বলা হল, স্যাকসবি অসুস্থ। তিনি যাত্রাভঙ্গ করে ব্যাংককে রয়ে গেছেন এবং সেখান থেকে তিনি কবে আসবেন তাঁদের জানা নেই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাংকক থেকে স্যাকসবি জানালেন না, তিনি অসুস্থ নন কাজে যোগ দেওয়ার আগে এই এলাকার দেশগুলি সফর করে নিচ্ছেন মাত্র।

আসল কারণটা জানতে অবশ্য দেরি হল না। আগেকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অস্ত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হচ্ছে অতএব স্যাকসবি যেন দিল্লি যাওয়ার পথে একটু অপেক্ষা করে যান পররাষ্ট্র দপ্তরের এই নির্দেশমতই স্যাকসবির যাত্রাবিরতি।

এদিকে ব্যাংককে সাংবাদিকদের কাছে স্যাকসবি বলেছেন, অস্ত্র দেওয়ার সিদ্ধান্তটা তাঁর মতে সমীচীন হয়নি। তিনি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র দেওয়ার এই সিদ্ধান্তটিকে ভারতে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল গ্রেচকোর আগমনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু নয়াদিল্লি থেকে জানান হয়েছে যে এই যোগাযোগ নিতান্তই একটা ঘটনাচক্র। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে ভারতের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে সোভিয়েট প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভারতে এসেছেন।

মার্শাল গ্রেচকোর সঙ্গে সোভিয়েট নৌবাহিনীর প্রধান এ্যাডমিরাল গর্শকভ এবং সোভিয়েট বিমানবাহিনীর প্রধান চীফ এয়ার মার্শাল কুটাকভও ভারতে এসেছেন। এই সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ভারত সরকারের প্রতিনিধিরা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এদেশে মিগ-২১এর উন্নততর আরও আধুনিক সংস্করণ মিগ-২৩ বিমান তৈরির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

*

ভারত - মার্কিন সম্পর্ক

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী চাবন মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডঃ কিসিঞ্জারকে যে পত্র দিয়েছিলেন তার জবাব থেকে দেখা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার পাকিস্তানকে অস্ত্র দিতে আরম্ভ করলে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টা ব্যাহত হবে, এই যুক্তি ওয়াশিংটন মানেনি। আগামী মাসে ওয়াশিংটনে ভারত-মার্কিন যুক্ত কমিশনের অধিবেশন উপলক্ষে চাবনের আমেরিকায় যাওয়ার কথা আছে এবং সে পর্যন্ত আমেরিকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা স্থগিত রাখা হোক নয়াদিল্লির এই অনুরোধও আমেরিকা রক্ষা করতে রাজি হয়নি।

অথচ ভারত-মার্কিন সম্পর্কের মুখ চেয়ে ভারত যে মার্কিন-বিরোধী সমালোচনার ধার অনেক কমিয়ে দিয়েছে এবার পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণেই তার প্রমাণ রয়ে গেছে। পাকিস্তানকে অস্ত্র দেওয়ার প্রসঙ্গ এই ভাষণের মধ্যে দুবার উল্লেখ করা হয়েছে, এই দুটি উল্লেখের মধ্যে কোনটিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন কঠোর মন্তব্য নেই। ডিয়েগো গার্সিয়ার মার্কিন ঘাঁটির প্রসঙ্গটিও চাপা দেওয়া হয়েছে ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করার নির্বিশেষিত দাবির মধ্যে।

নয়াদিল্লির এই আশ্চর্য মৃদুকণ্ঠের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের সূচনাতেই যেটুকু প্রতিবাদ উঠেছিল তার মূল্য অবশ্য চাবন পরে দিয়েছেন। লোকসভায় ও রাজ্যসভায় বিবৃতি দিয়ে তিনি এ-ব্যাপারে উষ্মা প্রকাশ করে বলেছেন, আমেরিকা পাকিস্তানে একটি নৌঘাঁটি স্থাপন করবেন এমন একটা সম্ভাবনা বিলক্ষণ রয়েছে।

আগামী মাসে ভারত-মার্কিন যুক্ত কমিশনের বৈঠক উপলক্ষে চাবনের ওয়াশিংটনে যাওয়ার যে-কথা ছিল সেই কর্মসূচী এখন বাতিল করা হতে পারে, এমনও একটা ইঙ্গিতও চাবন রাজ্যসভায় দিয়েছেন।

*

নেপালে অভিষেক

২৯ বছর বয়সের বীরেন্দ্র বীরবিক্রম শাহ দেব ২৪ ফেব্রুয়ারি কাঠমাণ্ডুর প্রাচীন হনুমান ধোকা প্রাসাদে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। বিশ্বের একমাত্র হিন্দু নৃপতির এই রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বৈদিক আচারের মধ্যে দিয়ে ও দেশ-বিদেশ থেকে আগত রাষ্ট্রপ্রতিনিধি ও রাজপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হল। রাজাকে মৃত্তিকা ও 'পঞ্চামৃতের' তিলক পরান হল প্রধান রাজপুরোহিত তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলেন আনুমানিক দু কোটি টাকা দামের মরকত ও হীরকখচিত রাজমুকুট।

এভাবে ভারতের প্রতিবেশী একটি হিমালয়-লালিত রাজ্যে তিন শতাব্দীর পুরোন শাহ রাজবংশের বংশধর আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন।

পুণ্ডরীক

২৬-২-৭৫

ফাদার দ্যতিয়েন

রোজনামচা

আমাকে ভুল বুঝবেন না: রাজনীতি কূটনীতি দুর্নীতি বিষয়ে আমারও কৌতূহল কম নয়। তবে কি জানেন নীতি বলতে জাকির মিয়া শুধু বোঝেন সুনীতি জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি চ্যাটার্জিকে। আর আমি তো আজ ঘটনাচক্রে বাংলাদেশে আমার এই ক্ষণস্থায়ী প্রবাসে শব্দতাত্ত্বিক সেই জাকির মিয়ার চেলা বনে গেছি।

জাকির মিয়ার মতে হিন্দুস্থান কবরস্থান প্রভৃতি শব্দগুলো ভুল: লিখতে হয় হিন্দুস্থান (হিন্দু কথাটা যেহেতু ফার্সি। আর কবরস্থান। কবরস্থান কথাটাও অবশ্য সংকর শব্দ: তার প্রথমার্ধ আরবী দ্বিতীয়ার্ধ ফার্সি।

ফার্সিভাষীদের কাছ থেকে আমরা যে খাঁটি আরবী সমাস (গররাজি আদব-কায়দা) কিংবা খাঁটি ফার্সি সমাস (তক্তপোস আতসবাজি) আমদানি করিনি এমন নয় তবে মিশ্র সমাসের সংখ্যা অত্যধিক: আরবী-ফার্সি (আতরদান কসাইখানা মুনাফাখোর) ফার্সি-আরবী (আবহাওয়া কুচকাওয়াজ আজগুবি খামখেয়াল) এমন কি তুর্কী-ফার্সি (তোপন্দাজ) ও ফার্সি-তুর্কী (বাগচি অর্থাৎ মালী)।

আর শুধু কি তাই? সংকরনির্মাণের ব্যাপারে বাংলা ভাষার জুড়ি নেই। এই দেখুন না: তৎসম-ফার্সি (শিক্ষানবিস) তৎসম আরবী (প্রমাণসই) তদ্ভব ফার্সি (ছাইদানি ফাঁকিবাজ দাঁড়িপাল্লা সোঁটাবরদার) ফার্সি হিন্দী (দমকল) দেশী ফার্সি (গোলমরিচ)। এছাড়া তো আছে জেলখানা ও জংলাট হেডপণ্ডিত ও বোম্বেড মাতাল আরাম-কেদারা (ফার্সি-পর্তুগীজ) রাজমিস্ত্রী (আরবী পর্তুগীজ: আরবী ভাষায় 'রাজ' মানেই রাজমিস্ত্রী)। ইংরেজিতেও অবশ্য ফরাসি-থেকে-নেওয়া গ্রীক লাতিন সংকর-শব্দের পাশে (automobile, television) হোম-মেড সংকরশব্দ পাওয়া যায় self-service সবচেয়ে মজা লাগে সমার্থক সমাস যার মধ্যে একই অর্থ দুটি ভাষায় প্রকাশিত হয় পারসাফ গলিকুচা পাকাপোক্ত

শুধু ভাবি যে সমস্ত বিদেশী শিক্ষার্থী বাংলাভাষা শিখতে আসে এরকম শব্দতাত্ত্বিক তথ্য ওদের পরিবেশন করা হয় না কেন। মনে আছে— সে কিন্তু অনেকদিনের কথা বাংলাভাষায় তখন সবেমাত্র আমার হাতেখড়ি হয়েছে— বঙ্কিমচন্দ্রের কোন এক উপন্যাস পড়তে গিয়ে অসংস্কৃত আস্তাবল কথাটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল খুব: কথাটা আসলে আরবী ভাষায় আমদানী-করা এক গ্রীক শব্দ ফার্সি ভাষার মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। ঐ ধরনের শব্দ আরও আছে (কলম অফিস কানুন) এমন কি লাতিন শব্দও (দিনার) আরবী ও ফার্সি মধ্যস্থতায় আমাদের শব্দকোষ সমৃদ্ধ করেছে। পিয়ালা শব্দটা শর্ট কাট নিয়েছে: গ্রীক থেকে সোজা এসেছে ফার্সি ভাষার মধ্য দিয়ে। মুমিনদের ধর্মীয় ভাষাতেও গ্রীক এমন কি হিব্রু শব্দের অভাব নেই: ইবলিস (শয়তান) ও ইঞ্জিল (গস্পেল) কথা দুটো গ্রীক আদম মসীহ (Messiah) আর জাহান্নাম (নরক) শব্দগুলো হিব্রু।

ওপারের বাংলা সাহিত্য পড়তে হলে শুধু আরবী ও ফার্সি শব্দকোষের সংগে পরিচিত হলে চলবে না উভয় ভাষার ব্যাকরণের প্রাথমিক জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। যেমন ধরুন আরবী বহুবচন। তসলিম কথাটা মৌখিক অভিবাদন হিসেবে ব্যবহৃত হয়; পত্রান্তে কিন্তু মুমিনেরা লেখে: 'আদাব-তসলিমাত বাদ আরজ' আর পত্রশীর্ষে লেখে: পাক জনাব কিংবা পাক জনাবেষু (!)): ঐ তসলিমাত কথাটা তসলিমের বহুবচন। অজুহাত আর দেহাত কথা দুটোও—জানতেন কি? —আরবী বহুবচন: দেহাতের এক বচন দিহ (হিন্দীতে ডিহ: সাগরডিহ গিরিডিহ)। অন্যদিকে ফার্সি বহুবচনসূচক আন প্রত্যয়ও বাংলাদেশের পুস্তকে পুস্তকে মেলে: সাহেবান (ষষ্ঠীতে সাহেবানের) ওয়ারিসান খান খানান কিংবা শাহানশাহ যার অর্থ রাজাধিরাজ। মুসলমান (আসলে মুসলিমান) মুসলিমের বহুবচন।

অধিকাংশ আরবী শব্দের ক্ষেত্রে কোনো বহুবচন নির্দেশক প্রত্যয় যোগ দেওয়া হয় না শব্দের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে: গরীব গরবা ফকির ফকরা আমির ওমরা। শুধু তা নয়: নবাব (যার একবচন নায়েব) আসবাব আসামী প্রভৃতি শব্দের রূপও বহুবচন। আদাব (আদা আরজ আদবের (আদব-কায়দা) বহুবচন। আখবার (খ্যাতনামা পত্রিকার নাম) খবরের বহুবচন। আকবার কিন্তু কবির-এর (যার অর্থ মহৎ কবিরা গুণাহ গুরুপাপ) আধিক্যসূচক রূপ—মহত্তর মহত্তম আল্লাহ আকবার!

হ্যাঁ আল্লাহ শব্দান্ত ঐ উকারটা আরবী প্রথমার বিভক্তিচিহ্ন। নজরুল আবদুল প্রভৃতি আপাত অর্থহীন শব্দেও সেই প্রথমা-বিভক্তি বিদ্যমান। শব্দান্তের ল অক্ষরটি আসলে নির্দেশক উপশব্দ: তার আসল যোগ পরবর্তী (উহ্য) বিশেষ্যের সংগে: প্রথমা বিভক্তি এবং উত্তরপদের মাঝখানটিতে বসে সে কাজ করে ষষ্ঠী বিভক্তির। অতএব নজরুল ইসলাম-কে ভাঙলে দাঁড়াবে নজর-উ (আ) ল ইসলাম অর্থাৎ কিনা ইসলামের নজর। অনুরূপ আবদুল হাদী মানে আবদ-উ (আ) ল হাদী যার অর্থ দাঁড়ায় হাদীর কিংকর: সুধী পাঠক জানতে পারেন হাদী শব্দটা যার অর্থ পথপ্রদর্শক খোদাতালার নিরানব্বই নামের অন্যতম নাম। আলাউদ্দীন (ধর্মের অস্ত্র) হবিবুর রহমান (করুণাময়ের বন্ধু) প্রভৃতি শব্দে উপশব্দটি ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্বে রূপান্তরিত হয়।

ওপারের বাংলা বুঝতে হলে শুধু আরবী নয় ফার্সি সম্বন্ধপদও শেখা প্রয়োজন: আরব দেশে যিনি রসুলুল্লা ইরানে তিনি রসুলে খোদা বরং রসুল-ই-

খোদা : মধ্যকার ইজাফত-সূচক (অর্থাৎ ষষ্ঠীনির্দেশক) ই-টা সংযোজক অব্যয় (ইংরেজিতে of)। শব্দবিন্যাস বাংলা শব্দান্তর পরিপন্থী কোহিনূর জ্যোতির পর্বত রঙ্গ সীর অর্সাপ বাদশাহি ইরান ইরানের বাদশাহের অশ্বের শিরের রং বিশেষ। ও তার গুণাত্মক বিশেষণের মাধ্যখানেও সেই এক 'ই' অব্যয় প্রযোজ্য : পীর কামেল (পীর-ই-কামেল) মানে কামেল পীর অর্থাৎ উত্তম পীর পীরে কামেলের সংসর্গ মানে উত্তম পীরের সংসর্গ। কোনো কোনো সমাসে আবার সংযোজক ই-টা ব্যবহৃত হয় শুধু শ্রুতিমধুরতার জন্য তার কোনো ব্যাকরণ ঘটিত তাৎপর্য নেই। গুলিস্তান ঢাকার এক বিখ্যাত ছবিঘরের নাম। মানে গুলিস্তান অর্থাৎ ফুলবাগান কবরিস্তান মানে কবরস্থান।

অধ্যাপক আজিজের একমাত্র ছেলের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে। ওকে সবাই বাবলু বলে ডাকলে কি হবে আত্মপরিচয় দিতে হলে অম্লানবদনে সে ঘোষণা করে হাসান মামুদ ইবনে আজিজ মেয়ে হলে 'বিন্তে আজিজ' বলতে হত। ঐ ইবনে বিন্তে এবং উভয় লিঙ্গে ব্যবহার্য ওলদে (child of))আর জওজে (spouse of) সমাধিস্থানের বহু শিলালিপিতে পাওয়া যায়। জাকির মিয়ার ধারণা 'ওরফে' শব্দটিও ফার্সি রীতিতে নির্মিত : 'গুরুদেব ওরফে (ওরফ-ই) রবীন্দ্রনাথ' মানে : 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ওরফ' অর্থাৎ প্রচলিত নাম।

জাকির মিয়ার জ্ঞানগর্ভ ভাষ্য শুনলে ফার্সি ভাষা শিখতে ইচ্ছে করে। এই ধরুন সেই 'রঙ্গ সীর অসপ' (অশ্বের শিরের রঙ) ব্যাকরণগত উদাহরণটা : সংস্কৃত ও ফার্সি শব্দমালার মধ্যে কত-না সাদৃশ্য মেলে!...ভদ্রলোকের মতে নীল তার নাম (নামদার বদনাম) দূর (দূরবীন তমাশবীন মানে দর্শক : যে তামাসা দেখে সে) মিহির প্রভৃতি কত 'সংস্কৃত শব্দ ফার্সি অভিধানেও পাওয়া যায় তৎসম 'শক্ত'! মানে সমর্থ ফার্সি 'শক্ত' (শখৎ) মানে কঠিন।

মেষ সোগ শাখ হল মেষ শোক আর শাখার ফার্সি রূপ। বন্দ মানে বন্ধ (পাবন্দ মানে বাধ্য) নও মানে নব (নও মুসলিম মানে নবদীক্ষিত মুসলিম)। নারঙ্গ ও অঙ্গুষ্ঠত্রাণ হল নারেঙ্গী ও অঙ্গুস্তানার সংস্কৃত প্রতিশব্দ। তন মানে তনু : পাকতনের অর্থ সাধু ব্যক্তি পীলতন হল পারসিক ভীমবপু রুস্তমের নামান্তর সে নাকি হস্তীর মতো বিপুলকায় (তুলনীয় পীলখানা হস্তিশালা পীলপা (elephantiasis) দরদমন্ত কিম্বা দরদবন্ত প্রভৃতি ফার্সি শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত বাধিমন্ত কিম্বা লক্ষ্মীবন্ত প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

মিশনারী বাংলায় প্রচলিত 'নখ্রিস্টান' শব্দটি (তুলনীয় নগণ্য) জাকির মিয়ার চক্ষুশূল। ফার্সিতে নেতিবাচক প্রত্যয় হল 'না' : নাপাক নাখোশ (নাখোদার অর্থ অবশ্য নাস্তিক নয় নৌকা মালিক)। প্রত্যয়টা আরবী শব্দের সঙ্গেও ব্যবহৃত হয় : নামঞ্জুর নামাকুল। নাবালিগ শব্দটি যার অর্থ অপক্ক বাংলাভাষায় নাবালক রূপ ধরাতে আমরা সৃষ্টি করেছি বাঙালির অদ্ভুত এক প্রতিশব্দ : সাবালক বালকের সঙ্গে যার কোনো শব্দতাত্ত্বিক সম্পর্ক নেই।

'বে' নেতিবাচক প্রত্যয়টিও অবশ্য প্রকৃতপক্ষে ফার্সি (বেদনা, যার বীজ নেই, বেকার যার কাজ নেই বেচারা যার উপায় নেই...) যদিও আরবী শব্দের সঙ্গেও তার ব্যবহার মেলে : বেইমান, বেইজ্জত...। এদিকে আরবী ভাষার নেতিবাচক প্রত্যয় হল গায়ের যার বাংলা রূপ গর : গরহিসাব, গরহাজির, গরহজম (বেহজম কথাটা সংকর শব্দ।

জাকির মিয়ার সাহচর্যে সেই সন্ধ্যা কাটল বেশ। আর তবু একটি প্রশ্ন রইল অমীমাংসিত : সবুজ বলতে ফার্সি শব্দ যারা ব্যবহার করি হলদে বলতে সেই আমরা জর্দ বলি না কেন?...কিংবা পিঁয়াজ কথাটার এত সংস্কৃত শব্দ থাকতে (পলাণ্ডু) লতার্ক দুদ্রুম, মহাকন্দ, তীক্ষ্ণকন্দ সুকন্দক মুখগন্ধক মুখদূষক নীচভোজ্য গৃঞ্জন...) আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এক ফার্সি শব্দের শরণাপন্ন হলেন কেন? মুমিনদের ধর্মোতিহ্যে আবার পিঁয়াজ নাপাক খাদ্য! এ-ধরনের শব্দনির্বাচনের পিছনে বিশেষজ্ঞেরা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত কারণ আবিষ্কার করবেন—যেমন ধরুন মাংসের বেলায় beef আর pork পশুর বেলায় cow আর swine ইংরেজি শব্দগুলির ব্যবহার। আসলে ইংরেজদের পূর্বপুরুষদের আমলে মাংস রান্না খেত ওরা ছিল লাতিনভাষী ভূস্বামী পশু যারা চরাত তারা ছিল প্রাকৃতভাষী ভৃত্য।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

চন্দননগর পুস্তকাগার

শব্দ অক্ষর ও ভাষার বিন্যাসের মধ্যেই অনেক যুগের মানুষের মনের কল্লোল লুকিয়ে থাকে এবং চলতি সময়ের সঙ্গে এর সেতুবন্ধনে দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসই সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে। এই সেতু-বন্ধনের সার্থকতম কেন্দ্র হোল গ্রন্থাগার। বড় দুঃখের কথা যার মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একটি ছন্দে গ্রথিত হয় সেই গ্রন্থাগারগুলোই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারছে না। পশ্চিমবাংলায় এই মর্মান্তিক ছবি বেশ কিছু চোখে পড়ছে। এই ব্যাপারটিকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি চরমতম ঔদাসীন্য বললেও হয়তো খুব একটা অন্যায় হয় না।

এই রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্পর্কে যারা মোটামুটি ওয়াকিবহাল তারা নিশ্চয়ই একশ বছরের পুরনো চন্দননগর পুস্তকাগারের দুরবস্থার কথা শুনেছেন। নানা কারণে এই দীর্ঘ দিনের সাহিত্যের পীঠস্থানটি স্তিমিত আলোয় ম্লান হোতে চলেছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলে চোখের সামনেই দেখা যাবে শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী এই পুস্তকাগারটির বনিয়াদ ভেঙ্গে পড়ছে। ভাঙ্গন অবশ্যই একটু একটু করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। তবে এখনো সময় আছে এই ভাঙ্গন রোধ করার।

রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বহুদিন আগেই সাহায্য চেয়েছেন চন্দননগর পুস্তকাগারের কর্তৃপক্ষ কিন্তু এখনো পর্যন্ত আশাব্যঞ্জক কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। কয়েকদিন আগে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি জরুরী তারবার্তা গিয়েছে দিল্লী ও রাজ্যের সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে। এতে বলা হয়েছে এই ঐতিহ্যসমন্বিত সংগ্রহশালা রক্ষার জন্য যথার্থ অর্থ সাহায্য আসুক নয় পূর্ণ সরকারী দায়িত্বে চলুক চন্দননগর পুস্তকাগার। এ না হোলে এই মূল্যবান সংগ্রহশালাকে আর টিকিয়ে রাখা যাবে না। পোকায় কাটবে কয়েক যুগের মূল্যবান পুঁথি বই নিয়ে চলে যাবেন এমন লোক যার সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্পর্কই নেই। কেননা সংরক্ষণের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থাই সেখানে নেই।

নানান ধরনের বই এবং পুঁথি মিলিয়ে চন্দননগর পুস্তকাগারে সংগ্রহের সংখ্যা প্রায় ৩৬,০০০। এই রাজ্য এবং বাইরের বহু জ্ঞানীগুণীর স্বীকৃতিধন্য এই পুস্তকাগারটি এখন একটা মর্মান্তিক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। বই সংরক্ষণের কোন আধুনিক ব্যবস্থা এখানে নেই অর্থের অভাবে দপ্তরী গার্ড এবং অন্যান্য লোক রাখা সম্ভব হোচ্ছে না। সুতরাং নিরাপত্তার ব্যবস্থা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

দীর্ঘ একশ বছর ধরে এই পুস্তকাগারের পরিচালনায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীহরিহর শেঠ শ্রীচারুচন্দ্র রায় শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে, শ্রীফটিকলাল দাস। জি টি রোডের ধারে আজকের চন্দননগর পুস্তকাগারের যে পাকা বাড়িটি তা শ্রীহরিহর শেঠের বদান্যতাতেই গড়ে ওঠে। ৫১ বছর আগে পুস্তকাগারের স্থায়ী বাড়ীটির উদ্বোধন করেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে এই সংগ্রহশালার যাত্রা শুরুর কথা ঘোষণা করা হয়।

এই পুস্তকাগারের মূল্যবান সংগ্রহের মধ্যে আছে কাশীরাম দাস রচিত মহাভারতের পুঁথি: মার্টিনেউ-এর ডুপ্লেকস এ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ইণ্ডিয়ার প্যারিস সংস্করণ; হেনরী ওয়েবারের ফ্রেঞ্চ ইন্ডিয়া কোম্পানী (১৬০৬-১৮৭৫)। বহু মূল্যবান বাংলা বই সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের সংগ্রহও এই পুস্তকাগারের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

আসানসোল কবি সম্মেলন

গঙ্গোত্রী পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত পূর্বাঞ্চল কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী ২ মার্চ রবিবার আসানসোলে। সম্মেলন বসবে ডুরান্ড ইনস্টিটিউট হলে। সম্মেলনে উপস্থিত থাকছেন পূর্বাঞ্চলের খ্যাতিমান ও উদীয়মান কবি ও সাহিত্যিকগণ। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে থাকবে গান আলোচনা নৃত্য নাট্য কবিতা পাঠ প্রভৃতি। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সকলকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সম্পাদক : প্রফুল্ল মিশ্র প্রফুল্ল অধিকারী মতি মুখোপাধ্যায় শক্তি গড়াই। কাল্না, পোঃ মাজারিয়া। জেঃ বর্ধমান।

পরলোকে জুলিয়ান হাক্সলি

ভিকটোরীয় যুগের প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী টমাস হাকসলীর নাতী জুলিয়ান হাকসলী সম্প্রতি ৮৭ বছর বয়সে লণ্ডনে পরলোকগমন করেছেন। স্যার জুলিয়ান জীববিজ্ঞান এবং নানারকম চিত্তাকর্ষক বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে বৃটেনে এবং বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃতি অর্জন করেন।

স্যার জুলিয়ান ১৮৮৭'র ২২শে জুন জন্মগ্রহণ করেন তিনি ছিলেন স্কুল শিক্ষক ও একটি সাময়িক পত্রের সম্পাদক লিওনার্ড হাকসলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক অলডাস হাকসলির তিনি বড় ভাই।

বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির একটা সুন্দর পরিবেশের মধ্যে স্যার জুলিয়ানের মন এবং মনন লালিত হয়। তিনি যা লিখেছেন তার মধ্যে আছে কবিতা ধর্ম দর্শন ও ক্যানসার সম্পর্কে গবেষণা। এর প্রতিটি বিষয়ে জুলিয়ানের বিশিষ্ট মানসিকতা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁকে বলা হোত বৃটেনের পয়লা নম্বর জনকল্যাণবাদী বিজ্ঞানী। তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখা ও রেডিওর মাধ্যমে বিজ্ঞানের জটিলতম বিষয়কে সহজ করে বোঝাতে পেরেছেন।

১৯৪৬ সালে স্যার জুলিয়ান রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের ডাইরেকটর জেনারেল নিযুক্ত হন। তাঁকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করা হয় ১৯৫৮ তে।

উপগুপ্ত

নতুন বই
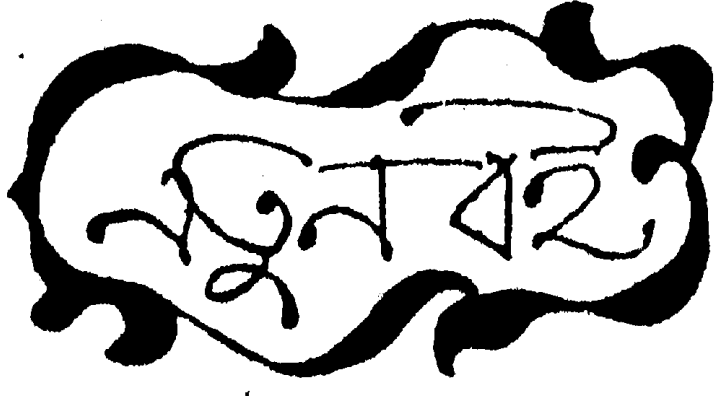
ন হন্যতে : মৈত্রেয়ী দেবী। মনীষা গ্রন্থালয় কলকাতা—১২। কুড়ি টাকা।

শাশ্বত ও পুরাতন আত্মা যেমন জন্মরহিত এবং মৃত্যুহীন মানুষের ভালবাসাও তেমনি। আপাত অদৃশ্য হলেও তার আগুন কোনোদিন নেভে না। সে জ্বলে এবং হৃদয়কে প্রজ্জ্বলিত করে রাখে। মৈত্রেয়ী দেবীর এই উপন্যাস পড়ে সেই সত্যই নতুন করে হৃদয়ঙ্গম হল। এ উপন্যাস জীবনসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই তা কাল্পনিক কাহিনীর চেয়ে বিস্ময়কর। মহৎ সত্যের মুখোমুখি যিনি হয়েছেন তাঁর পক্ষেই এমন কনফেশন সম্ভব। আমি অকপটেই বলব, বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে সাহিত্য ও জীবনের এমন যুগলমিলন খুব কমই চোখে পড়েছে। তাঁর অন্য কোনো উপন্যাস আছে কিনা জানি না। কিন্তু এই কাহিনীর তুলনা সাম্প্রতিক অন্য কোনো উপন্যাসের সঙ্গেই করা চলে না। আর যদি অন্য কোনো উপন্যাস তিনি নাও লেখেন তাহলেও মৈত্রেয়ী দেবীকে এমন একটি অসামান্য গ্রন্থ লেখার জন্য বাংলাদেশের পাঠক মনে রাখবে।

এই উপন্যাসের নায়িকা অমৃতার হৃদয়কে একদিন ছুঁয়ে গিয়েছিল তাঁর পিতার শিষ্য গুরুগৃহবাসী এক বিদেশী যুবক মির্চা ইউ ক্লিড। এ তো স্বাভাবিক ঘটনাই। কিন্তু এই ভালবাসার উন্মেষ হতে না হতেই প্রাজ্ঞ অথচ কঠোর পিতা শিষ্যকে বিতাড়িত করলেন গৃহ থেকে, দেশ থেকে। অমৃতার কিছুই করার ছিল না। ষোল বছরের মেয়ে কীই বা করতে পারে। কিন্তু সে কি জানত মির্চার ভালবাসার শেষ সেখানেই নয়? সারাজীবন এই ভালবাসা সে বহন করে নিয়ে চলেছে। অমৃতাকে চিরন্তনী নায়িকা করে রেখেছে তাঁর বইয়ে। মির্চা তাঁর স্বদেশে এখন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত সাহিত্যিক। তাঁর বই পড়ে ইয়োরোপের মানুষ জেনেছে অমৃতাকে, জেনেছে তাঁর বাবাকে, জেনেছে তাঁদের অসামান্য দেশকে। বিয়াল্লিশ বছর পর অমৃতা জানতে পারল মির্চার বইয়ের কথা। সে তখন অন্য এক অমৃতা। স্বামী পুত্র নিয়ে অন্য এক নারী। কিন্তু সত্যিই কি অন্য নারী? দেবযানী কি কোনোদিন কচকে ভুলতে পেরেছিল? আজ তাই অমৃতার মনে পড়ে যায় সেদিনের সব কথা। মনে পড়ছে মির্চা বলছে : তোমার কি মনে হয় আমি তোমার চেয়ে তোমার শরীরকে বেশি ভালবাসছি? তা নয় অমৃতা তা নয়, আমি তোমাকেই খুঁজছি তোমার আত্মাকে খুঁজছি।' সে মিথ্যা বলেনি। অমৃতার আত্মাকেই সে চিরসত্য জেনে তাকে সাহিত্যে অমর করে রেখেছে। যদিও আর কোনোদিন সে অমৃতার খোঁজ নেয় নি দেশে ফিরে গিয়ে। বিয়াল্লিশ বছর পর অমৃতাই সপ্তসিন্ধু পার হয়ে একদিন গিয়ে উপস্থিত হল অধ্যাপক মির্চা ইউক্লিডের বিশ্ববিদ্যালয়ে। এক ডাকে সবাই চেনে মির্চাকে, খুঁজে নিতে কষ্ট হয় নি। মির্চা হতচকিত। সে যাকে এতদিন কল্পলোকের রাণী করে রেখেছে লালন করেছে হৃদয়ে তাকে আজ মুখোমুখি দেখতে চাইছে না। অমৃতাই তাকে তখন শোনাল ভালবাসার অমৃতবাণী : মির্চা, আমি তো সেই তোমাকেই দেখতে এসেছি যাকে Weapon cannot pierce fire cannot burn —শস্ত্র ছেঁড়ে না অগ্নি দহে না যারে। বিশ্বাস করো এক মুহূর্তে তোমায় চল্লিশ বছর পার করে দেব—দেখবে আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি যেখানে প্রথম দেখা হয়েছিল। আমার দিকে তাকালেই তুমি অমর হবে মির্চা, অমর হবে।'

না, কোনো সাধারণ বাংলা উপন্যাসে এমন কথা পড়া হয় নি। ন হন্যতে তার নামকরণ সার্থক করেছে। কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন অমৃতার বিশ্ববিখ্যাত পিতা, যাঁকে চিনতে কোনো শিক্ষিত বাঙালীর কষ্ট হবে না আছেন রবীন্দ্রনাথ। সবাই স্ব স্ব স্থানে, কল্পলোকে এঁরা স্থান করে দিয়েছেন বাস্তবের এবং বাস্তবকে দিয়েছেন কল্পলোকের মুক্তি। লেখিকা স্বাপ্নিক কিন্তু আবেগ উচ্ছলতায় আপ্লুত করেন নি কাহিনীকে। যতটুকু বলার তার বেশি কোনো শব্দ ব্যবহার নেই। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য এবং দার্শনিক পিতার শিক্ষার গুণে তাঁর সাহিত্যবোধ এবং জীবনদীক্ষা যে কত গভীরে পৌঁছেচে পরিণত বয়সের এই গ্রন্থে তার পরিচয় পেয়ে একালের মানুষ মুগ্ধ হবেন।

-কৃষ্ণ ধর

মহারাজা—দেওয়ান জারমানি দাস। অনুবাদক : অরুণকুমার সরকার। প্রকাশক : দীপ পাবলিকেশন্স, পরিবেশক : প্রকাশ পাবলিকেশন্স ৬৯ চৌরঙ্গী সেন্টার, কলিকাতা—১৩। মূল্য—১৪ টাকা।

দেওয়ান জারমানি দাসের মূল ইংরেজী মহারাজা ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বাংলা অনুবাদ গ্রহণযোগ্য এবং সুখপাঠ্য। বৃটিশ আমলে সামন্ত রাজা-মহারাজা ও নবাবদের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন জারমানি দাস। সামন্ত রাজ্যে জনগণের কথা ভাববার সময় ছিল না রাজা—নবাবদের। তাঁরা বিলাস ও সম্ভোগে ডুবে থাকতেন। ভারতীয় ইতিহাসের সেই অন্ধকার অধ্যায় তুলে ধরেছেন লেখক। সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'মহারাজা'র মূল্য অনেকখানি। বহু ঐতিহাসিক দলিল সাক্ষ্য রেখে ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। রাজাদের খামখেয়ালির সুযোগ নিয়ে বৃটিশ রাজ কেমন করে তাদের বাঁদর নাচাত তার মজাদার কাহিনীও এই বইতে বর্ণিত আছে।

ভারতের নবাব নিজাম রাজা-মহারাজাদের লালসাময়, বিলাসবহুল বিকৃত যৌন-জীবন ব্যভিচার এবং খামখেয়ালীর বৈচিত্র্যময় কাহিনীতে ভরা 'মহারাজা'।

কিশোরী গ্রীষ্ম নীল-নয়না রাচনি নাম-না-জানা অপরূপ রূপসী রাজপুত নন্দিনী ও তাদের মত আরো অনেকের অশ্রুসজল নির্মম করুণ কাহিনী এবং তাদের অতৃপ্তির বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে রয়েছে বইটির প্রতিটি পাতায়। অধিকাংশ কাহিনী পাঞ্জাব, কাশ্মীর গুজরাত রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের সামন্ত রাজাদের নির্বোধ বিলাস গল্পে ভরা। পড়তে মজা লাগে। মনে হবে আমরা এখনও মধ্যযুগেই বাস করছি। যদিও বইটিতে রয়েছে বিংশ শতাব্দীরই কাহিনী। বহু মজাদার ঘটনা পড়তে পড়তে মনে হবে যেন গল্প পড়ছি। অনুবাদক একটু সতর্কতা অবলম্বন করলে ভাল হত। তাহলে বইটি আরও মনোরম হত। ছাপা ও বাঁধাই মন্দ নয়।

মণি-ময়ূখ। মমতা ঘোষ। ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় কলকাতা-১২। তিন টাকা।

রবীন্দ্র যুগের অন্ত্যপর্বের অন্যতমা মহিলা কবি মমতা ঘোষের (মিত্র) রচনা সে যুগে গ্রন্থাকারে ও বিচিত্রা প্রবাসী ভারতবর্ষ দেশ প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে পাঠকসমাজের কাছে পরিচিত ছিল। বহুদিন পরে প্রকাশিত তাঁর মণি-ময়ূখ কাব্যগ্রন্থ তাঁর রচনাধারায় একটি বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করেছে। পুত্রশোককাতর জননীর বেদনা এই কাব্যের বিষয়বস্তু। কিন্তু শুধু শোকমগ্ন হৃদয়ের ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস এর মধ্যে নেই এখানে আত্ম

মুহূর্তগুলির বিভিন্ন স্তরের নানা অনুভূতি উপযুক্ত আবেগের মাধ্যমে রূপ নিয়েছে: শুধু ভাবের গভীরতা ও গাম্ভীর্য নয় কবিতার কায়াগঠনেও রচয়িত্রীর অনায়াস-নৈপুণ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক কথায় বলতে গেলে শ্লোক এখানে কাব্য হয়ে উঠেছে।

আনন্দধারা (কাব্য সংকলন)। যুগ্ম সম্পাদক শিবব্রত দেওয়ানজী ও ক্ষিতীশদেব শিকদার। আনন্দধারা প্রকাশনী, ভিলাই, দুর্গ, মধ্যপ্রদেশ। তিন টাকা।

মধ্যপ্রদেশে প্রবাসী বাঙালী বন্ধু-কবিদের উদ্যোগে প্রকাশিত কাব্য-সংকলন 'আনন্দধারা'। কিন্তু সব কবিতা প্রবাসী কবিদের লেখা নয়। বাংলাদেশের বেশ কিছু খ্যাতনামা তরুণ কবির কবিতা এতে স্থান পেয়েছে। কবিদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী বিমলচন্দ্র ঘোষ, মেজবাহ খান, ময়ূখ চৌধুরী, অনন্ত দাশ, শান্তিকুমার ঘোষ, কবিরুল ইসলাম, কালীপদ কোঙার, অমিতাভ দাশগুপ্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায় সামসুল হক আলোক সরকার, হেনা হালদার, তারাপদ রায় শান্তি লাহিড়ী গৌরাঙ্গ ভৌমিক সুনীথ মজুমদার পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল কৃষ্ণ ধর সন্ধ্যাশ্রী চক্রবর্তী সতী সেনগুপ্ত ইত্যাদি। সংকলনভুক্ত কবিতাগুলি সুনির্বাচিত এবং প্রত্যেকটি কবিরই প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা।

বুকেতে ফুলের ঘ্রাণ : কাব্যগ্রন্থ। প্রশান্ত ভবাই। প্রকাশক : তরুণ সাহিত্য চক্র, শান্তিপুর নদীয়া মূল্য ২-৫০।

প্রশান্ত ভবাইর বোধকরি এটি প্রথম কাব্যগ্রন্থ। অন্তত এই বইয়ের কবিতাগুচ্ছের রচনা এবং গ্রন্থনায় তাই মনে হয়েছে। তবে প্রতিটি কবিতার মধ্যেই লেখকের নিষ্ঠা এবং হৃদয়ের অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়।

এবং বলতে বাধা নেই কোন কোন কবিতার মধ্যে ঋজুতা এবং পাকা কবি মেজাজের পরিণতি আমাদের আনন্দ দিয়েছে।

জপজী (গুরুনানক)। অনুবাদ : অমর চক্রবর্তী। প্রাপ্তিস্থান মহেশ লাইব্রেরী। কোলকাতা। দাম এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

শিখধর্মের প্রবক্তা গুরুনানক রচিত জপজী গ্রন্থ সাহেবার প্রথম অংশ। পাঞ্জাবী ভাষার মূল রচনা থেকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেছেন খুশবন্ত সিং এবং চেলারাম। লেখক তাঁদের অনুবাদকে ভিত্তি করেই বাংলা ভাষান্তর করেছেন। 'জপজী' শিখদের প্রাতঃকালীন প্রার্থনা। অমরবাবু মূল বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দিয়েই অনুবাদ করার চেষ্টা করেছেন। ছাপা এবং প্রচ্ছদ মোটামুটি।

সংকলন ও পত্র পত্রিকা

গবেষণা। সম্পাদনা মনোরঞ্জন দাস। পত্র বিতান-ছাপাঘর। পৌরাবিপণি। নিউ-মার্কেট। কুমিল্লা। দাম দু টাকা।

গবেষণামূলক নিবন্ধসমৃদ্ধ হয়ে কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'গবেষণা' পত্রিকাটি। লেখকসূচীতে রয়েছেন ডঃ রাম-মোহন চক্রবর্তী মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, ডঃ আহমদ শরীফ, তিতাশ চৌধুরী এবং আরও অনেকে। ছাপা এবং প্রচ্ছদ আরও ভালো হওয়া দরকার।

ঋক। সম্পাদনা শিবরতন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬৫, রায়বাহাদুর রোড। কোলকাতা-৩৪। দাম দেড় টাকা।

'ঋক' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যাটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। রমা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মৃণালকান্তি দাশগুপ্তের নিবন্ধ অসিত হাহার গল্প, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, তেজেশ অধিকারীর কবিতা এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। পরিচ্ছন্ন ছাপা এবং সুন্দর প্রচ্ছদ পত্রিকাটির মূল্য বাড়িয়েছে।

আশীর্বাদ। অমিতকুমার দে সম্পাদিত। রঞ্জনপল্লী। চাকদহ। নদীয়া। দাম ষাট পয়সা।

লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অমল গুহ, কোহিনূর দাস, চন্দন সেন এবং আরও অনেকে। বেগম আখতার সম্পর্কিত লেখাটি পত্রিকার মর্যাদা বাড়িয়েছে। 'বিচ্ছিন্নতা ও সত্যজিতের ছবি' নামের লেখাটিও ভালো।

নৈবেদ্য। সুধীরকুমার দে এবং শ্রীমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। রাণী কুটীর, ৪৭, রাজবল্লভ সাহা লেন, রামকৃষ্ণপুর। হাওড়া। দাম ৪০ পয়সা।

বাসুদেব সরকারের প্রবন্ধ, অশোক-কুমার সেনগুপ্তের গল্প এবং বটকৃষ্ণ দাসের কবিতা এই সংখ্যাটিকে আকর্ষণীয় করেছে। ছাপা এবং প্রচ্ছদ মোটামুটি পরিচ্ছন্ন।

চমকী। (রঞ্জিত মল্লিক সংখ্যা)। ১০৮/বি, রায়বাহাদুর রোড, কলকাতা-৩৪।

আজকের চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় নায়ক রঞ্জিত মল্লিক সম্পর্কে কিছু বিশেষ লেখা এই সংখ্যাটিতে প্রকাশ পেয়েছে। চিত্রজগতের অভিনেতা থেকে শুরু করে পরিচালক আলোকচিত্রশিল্পী, সাংবাদিক এবং সহ-পরিচালক সকলেই লিখেছেন এই জনপ্রিয় অভিনেতাকে নিয়ে। লেখকসূচীতে রয়েছেন—মৃণাল সেন, পূর্ণেন্দু পত্রী, দীনেন গুপ্ত, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, উত্তমকুমার রবি ঘোষ শেখর চট্টোপাধ্যায় অপর্ণা সেন ওয়াহিদা রহমান, সৌমিত্র সিংহ স্বপনকুমার ঘোষ রাণা চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে। ছাপা এবং প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

বঙ্গবাসী মর্ণিং কলেজ পত্রিকা (নবম সংখ্যা)। পঞ্চানন ঘোষ গোমেসমোহন লাল, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মদন-মোহন বসুর নিবন্ধ ভালো লেগেছে। গল্প এবং কবিতা লিখেছেন অশোক-কুমার ঘোষ তপনকুমার চক্রবর্তী অমিয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবি বিশ্বাস অপূর্বকান্তি ঘোষাল এবং আরও অনেকে। ছাপা এবং প্রচ্ছদ মোটামুটি পরিচ্ছন্ন।

নহবৎ। সম্পাদনা অরুণ ইন্দু সুবোধ ভট্টাচার্য এবং কালীকুমার চক্রবর্তী। ১৩৫, বেলেঘাটা মেন রোড, কোলকাতা-১০।

'নহবৎ' এমন একটি পরিচ্ছন্ন এবং উন্নত মানের 'লিটল ম্যাগাজিন' যা বহু ছোট কাগজের ভিড়ে হারিয়ে যায় না। অনিবার্যভাবেই আগ্রহী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গুটিকয়েক ভালো প্রবন্ধ, কয়েকটি নির্বাচিত গল্প এবং একগুচ্ছ তাজা কবিতায় পত্রিকাটি একটি বিশেষ চরিত্র সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। লেখক-সূচীতে রয়েছেন : যুগল সেন সুপ্রকাশ চাকী সামসুল হক সত্য গুহ সুজিত মুখোপাধ্যায় কমল চৌধুরী বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিভূষণ চাকী সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় অমিতাভ দাশগুপ্ত কালী-কুমার চক্রবর্তী ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় অরুণ ইন্দু কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং আরও অনেকে।

হাস্যরসিক ওডহাউস

শান্তি চট্টোপাধ্যায়

অবশেষে সেই মানুষটি, প্রায় ভুলে যাওয়া সেই বিখ্যাত হাস্যরসস্রষ্টা লেখক যাঁর লেখা একদিন ইংরেজী বইয়ের পাঠকদের বিস্ময় এবং নির্মল আনন্দ জাগিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে (বলতে কি, শেষ বয়সেও, প্রায় শেষ শয্যায় শুয়েও) সেই পেলহাম গ্রেনভিল ওডহাউস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন রেমসেনবুর্গের কাছে এক হাসপাতালে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪। বিস্ময়ের কথা সেই বয়সেও এবং হাসপাতালের বেডে শুয়েও তিনি একটি উপন্যাস লিখছিলেন। জানি না তাঁর সেই উপন্যাস শেষ হয়েছিল কি না। (মৃত্যু ১৪ ফেব্রুয়ারী '৭৫)।

গত জানুয়ারী মাসে ইংলন্ডেশ্বরী বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা চার্লস চ্যাপলিন ও প্রখ্যাত খেলোয়াড় গ্যারফিল্ড সোবার্সের সঙ্গে তাঁকেও স্যার উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। তারপরে আর একটা মাসও ভাল করে কাটল না, পি জি ওডহাউস সেঞ্চুরী করার আগেই মৃত্যুর হাতে বোল্ড আউট হলেন।

বৃটিশ সম্রাজ্ঞী তাঁকে স্যার খেতাবে ভূষিত করেও এবং ইংলন্ডে তাঁর জন্ম হলেও ওডহাউস ১৯৫২ সাল থেকে আমেরিকায়ই বাস করছিলেন সেখানকার নাগরিকত্ব নিয়ে।

বাবা ছিলেন হংকং-এর ম্যাজিস্ট্রেট। ছোটবেলায় পড়াশুনা করেন ডালউইচে। সেই সময়ই তিনি সহপাঠীদের বিচিত্র চরিত্র নিয়ে হাস্যরসাত্মক রচনা লিখতে শুরু করেন। তাঁর বিখ্যাত চরিত্র যার নামের সঙ্গে ওডহাউস প্রায় রূপকথার বা উপকথার মত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন জানি না সেই 'জীবস' নামক চরিত্রটির দেখা তিনি সেই স্কুল জীবনেই পেয়েছিলেন কি না।

এই জীবসের পরিচয়ই ওডহাউসকে এনে দিয়েছে বিশ্বব্যাপী পাঠকদের দুর্লভ খ্যাতি।

ওডহাউসের লেখার সবচেয়ে বড় প্রসাদগুণ হল তাঁর পরিবেশিত রস উপভোগের জন্য খুব একটা জ্ঞানীগুণী হবার দরকার হয় না। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তরে মোটামুটি শিক্ষিত পাঠকই তাঁর লেখা পড়ে উপভোগ করতে পারেন। আর যে পাঠক একবার তাঁর লেখার নির্মল আনন্দ উপভোগ করবেন তিনিই চিরকাল তাঁর লেখার প্রেমে পড়ে যাবেন।

অথচ মজার ব্যাপার ওডহাউসের লেখা যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে, তখনও এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী রক্ষণশীল পাঠক (অ্যারিস্টোক্র্যাট?) ও সমালোচক তাঁকে শুধুমাত্র ভাঁড়ের পর্যায়েই নামিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন।

এ সম্পর্কে অনেক মজার ব্যাপারের মধ্যে একটা হল কবি টি এস এলিয়টকে জড়িয়ে। এলিয়ট তখন নবীন হয়েও প্রচন্ড খ্যাতিমান পি জি'র বয়স তখন ৮০। সেই সময় তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য অন্যান্য লেখক ও সমালোচকরা একটি মানপত্রে কবি এলিয়টের সই আনতে গেলে তিনি সোজাসুজিই প্রায় উদ্যোক্তাদের বলেছিলেন ভদ্রলোক কি লেখেন তাই আমি জানি না। অতএব স্বাক্ষর দেবার প্রশ্নই আসে না।

তাই শুনে ওডহাউস বিনীত হেসে বলেছিলেন, আমি কিন্তু টি এস এলিয়টের একজন বড় ভক্ত। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাও অসীম।

ওডহাউস বোধহয় জীবনে একবারই চাকরী করেছিলেন। স্কুল ছাড়ার পর হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাঙ্কের লন্ডন অফিসে তিনি দু বছর চাকরী করার পর তাঁর নিয়োগকর্তা বাধ্য হয়ে তাঁকে একদিন ডেকে বললেন, তিনি কোন দিনই এই ব্যাঙ্কের চাকরীতে উন্নতি করতে পারবেন না।

সেই কথা শুনে ওডহাউস হেসে বলেছিলেন আপনি ঠিকই বলেছেন, এ চাকরী আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনি আমাকে রেহাই দিয়ে বাঁচালেন।

বলেই তিনি পত্রপাঠ সেখান থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

কিন্তু মজা হল তখন তিনি ব্যাঙ্কের চাকরী করে যা মাইনে পেতেন তার চেয়ে অনেক বেশী উপার্জন করতেন লিখে।

তারপর কিছুকাল স্বাধীনভাবে বিভিন্ন কাগজে নানা ধরনের কাজ করেছেন। এরপর লন্ডন গ্লোব নাম পত্রিকায় কাজ নেন। সেখানে তিনি 'বাই দি ওয়ে' নামক একটি পপুলার কলাম পরিচালনা করতেন। ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত। এই সময়ই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে বহু দূর দেশে।

এর কিছুকাল পরেই আমেরিকায় পাড়ি দেন। বস্তুত সেখানেই তিনি প্রথম বৃহত্তর পাঠকদের খ্যাতি কুড়ান। সেদিক থেকে বলা যায় লন্ডন নয়, নিউইয়র্কই তাঁকে বিশ্বের কাছে প্রতিভাশালী লেখক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। সেখানকার স্যাটারডে ইভনিং পোস্টে ২০টিরও বেশী ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয় তাঁর। ঐ পত্রিকার একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, ওতে বাস্তব জীবনভিত্তিক কোন লেখা প্রকাশিত হত না। অর্থাৎ অনেকটা বস্তুবাদী জীবনকে তির্যক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা লেখা প্রকাশিত হত।

এ যেন ওডহাউসের কাছে শাপে বর হয়ে আসা। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, ওডহাউসের লেখায় জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যেত না বা মানুষের সুখ-দুঃখ বেদনা বা কামনা বাসনার ছোঁয়া থাকত না। বরং এই বাস্তব জীবনটাকে তিনি সর্বদাই তাঁর হাসির লেখার আড়ালে সযত্নে লালন করতেন। যে অর্থে চার্লস চ্যাপলিন এবং পরশুরাম আমাদের হৃদয়ে চিরকালের জন্য স্থান করে নিয়েছিলেন।

ব্যঙ্গ, কষাঘাত অসৎ চরিত্রের মুখোস খুলে দেওয়া ইত্যাদি সবই তিনি পরিবেশন করেছেন আপাত অবাস্তব (?) চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে।

এক সময় ইংলণ্ডের পাঠকরা তাঁকে স্থূল রচনার লেখক বলে ব্যঙ্গও করেছেন। তাঁর সব লেখাতেই একটা স্থূল রসের ভাঁড়ামী প্রশ্রয় পেত এই তাঁদের অভিযোগ। (হয়ত এটা তাঁদের ওডহাউসকে ইচ্ছাকৃতভাবেই 'আন্ডার এস্টিমেট' করে রাখার প্রচেষ্টাও হতে পারে।)

ওডহাউসের রচনার চরিত্র বা পাত্র-পাত্রীরা বিংশ শতাব্দীর হলেও মেজাজে ও রুচিতে সপ্তম এডোয়ার্ডের আমলের। রসিকতাগুলিও বৃটিশ-ঘেঁষা এবং তাঁরা প্রায়ই একদিকে যেমন তথাকথিত বনেদী বা অ্যারিস্টোক্র্যাট অন্যদিকে তেমনি শহরঘেঁষা মফঃস্বলবাসী।

কিন্তু ওডহাউসের সেই লেখার মেজাজ এবং ধরন বা টেকনিক বোধহয় আজও অননুকরণীয়। তাঁর লেখার মধ্যে এমন একটা মজাদার ধাঁধা থেকেই যায় যা যেমন মোহময় তেমনি দুর্লভ সাহিত্যরসে পুষ্ট। তাঁর লেখায় এমন এক পৃথিবীর পরিমণ্ডল সৃষ্টি হত যার সঙ্গে বাস্তব পৃথিবীর আদৌ কোন যোগসূত্র নেই। অথচ পড়তে পড়তে মনে হয়, কোথায় যেন সূক্ষ্মভাবে আমাদের চেনা পৃথিবীর সঙ্গে একটা যোগসূত্র থেকেই গেছে। যাকে তিনি তির্যক বা ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে দেখে এসেছেন চিরকাল।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দি পোথান্টার্স' (১৯০২) তাঁর স্কুল জীবনের সতীর্থদের নিয়ে লেখা। জীভসের আবির্ভাব ঘটে এরও অনেক পরে ১৯২৪ সালে। তার আগে তিনি লেখেন উক্রিজ (১৯০৬), পাস্মিথ (১৯০৯), লর্ড এমসওয়র্থ (১৯১৫), ওলডেস্ট মেম্বার (১৯২২) এবং পরে ১৯২৭ সালে মিঃ মুলিনার। এ ছাড়া পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে তিনি আরও বহু চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। ১৯৭৪ সালের শরৎকালে শেষ যে বইটি প্রকাশিত হয় তার নাম আন্টস আরেন্ট জেন্টেলমেন।

মোট ৯০টি উপন্যাস, ৩০০টি ছোট গল্প এবং ৫০০টি বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ লেখেন। এ ছাড়া তিনি গোটা ছয়েক ছবির (চলচ্চিত্র) কাজ করেন, ১৬টি নাটক এবং ২৩টি সঙ্গীতবহুল হাসির নাটক লেখেন।

মজা হচ্ছে জীবনে তিনি একটি দিনও না লিখে থাকেন নি। এমন কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি যখন জেলে সেখানে বসেও একটি উপন্যাস শেষ করেন। ঐ সময় (১৯৪০) তিনি ফ্রান্সে ছিলেন এবং জার্মানদের হাতে বন্দী হন। ঐ বছরই জার্মানের হাতে ফ্রান্সের পতন ঘটে।

ওডহাউসের সাহিত্যকৃতি এবং ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর স্থান নিয়ে এক সময় প্রচুর তর্কের ঝড় উঠেছিল। খ্যাতি তাঁকে গৌরবান্বিত করলেও গোড়া সমালোচকরা তাঁকে বহু দিন পর্যন্ত স্বীকার করতে পর্যন্ত রাজী হন নি। কিন্তু এখন বিশ্বের প্রায় সব দেশের পাঠকরাই তাঁকে নির্মল হাস্যরস পরিবেশক, সাবলীল ও রসঘন অথচ সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণকারী সাহিত্যস্রষ্টা বলে এক বাক্যে স্বীকার করে থাকেন। যার জুড়ি এখনও ইংরেজী সাহিত্যে রম্যরচনার ক্ষেত্রে বিশেষ নেই বললেই চলে। আসলে ওডহাউসের চিন্তা ভাবনা ও তাঁর পরিবেশনের ধরণটা এমন ইনোসেন্ট অথচ বৈচিত্র্যময় যে, তার অনুকরণ সম্ভব নয়।

শোনা যায় এক সময় তাঁর অনুসরণে কিছু লেখক অনুপ্রাণিত হয়ে লেখারও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা বেশী দিন স্থায়ী হয় নি।

অথচ তাঁর লেখার চরিত্র ছিল মাত্র কয়েকটি। তারাই ফিরে ফিরে এসেছে তাঁর লেখায় বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন মেজাজে। তবে স্বভাবে তারা কম-বেশী সেই একই থেকে গেছে। তারা কেউই রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে আমাদের চারপাশে উপস্থিত না থাকলেও তাদের অস্বীকারও করা যায় না।

তাই তিনি সেইসব চরিত্রদের মাধ্যমে পাঠককে যত হাসিয়েছেন, ততটাই আবার ভাবিয়েছেনও।

এক সময় তাঁর রসিকতার ভাষা নিয়ে উন্নাসিক বৃটিশরা পুরনো ও অমার্জিত স্থূল কিছুটা বা অশিক্ষিতের রসিকতা বলে বিদ্রূপ করত, কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল সেই রসিকতার ভাষা তখনও সমান আকর্ষণীয় (যেমন এখনও। এখনও ওডহাউসের লেখা পড়লে সমান আনন্দ পাওয়া যায়। আমার হাতের কাছে যে বইটি আছে ওডহাউসের সেই 'আঙ্কল দি রেকলেস'-এর পৃষ্ঠা উল্টেও সেই প্রমাণ পেলাম।) এবং রসসমৃদ্ধ। এ যেন চিরকালীন সাহিত্য।

বাংলাদেশে এখন ওডহাউসের কেমন পাঠক আছে আমার জানা নেই। তবে যাঁরা পড়েন নি তাঁরা যদি চেষ্টা চরিত্র করে তাঁর বই সংগ্রহ করে পড়েন লাভবান হই ঠকবেন না এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই। আমরা হাসতে ভুলে গেছি। ওডহাউস আবার নতুন করে হাসাবে এবং ভাবাবে।

ওডহাউসের স্ত্রী এথেল এখনও জীবিত আছেন।

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

পুজোর পর পরই রাখীবন্ধন। এগাঁয়েও তার ঢেউ এসে লেগেছে। দেবনাথ পুজোর পরে গ্রামে এসেছে। সে এসেই রাখী উপলক্ষে স্বদেশী দল করেছে। ফলে খোদ ভবনাথের ভিতর বাড়িতেই 'বন্দে-মাতরম' ধ্বনি। সেই উপলক্ষে হাটখোলায় সভা পর্যন্ত হয়ে গেল। এই সময়টার গ্রামের লোকেদের মধ্যে ব্যস্ততা বাড়ে। কামারদের কাজ বেড়ে যায়। সামনে ধান কাটার মরশুম। তাই কাস্তে গড়ার তাড়া। তাছাড়া গাছ কাটা দা গড়ার কাজ তো আছেই।

পুজোর পর গ্রাম একটু নিস্তরঙ্গ হলেও একদিন আবার জমজমাট হয়। সহর থেকে বায়স্কোপ এসে রকমারি ছবি দেখায়। আর তাই দেখার জন্যে গ্রামে হুড়োহুড়ি। এই সময় গ্রামে ঠাকুর মশায়েরও পদধূলি পড়ে। চার-পাঁচ মাস পরে আসা। ব্রাহ্মণ বিদায়ের তোলা খাজনা আদায় করতে আসেন তিনি।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বর্ষার সময়টা বাড়ির উঠানে জঙ্গল জেগে ওঠে, এইবারে সাফ-সাফাই ও লেপা-পোঁছার ধুম পড়ে গেল। আগাছা ও ঘাস-বন উপড়ে ফেলছে, একটা দুর্বাঘাস অবধি থাকতে দিচ্ছে না। উঁচু জায়গা ছেটে সমান চৌরস করল, গর্ত থাকলে মাটি দিয়ে ভরাট করে দিল। তারপরে গোবরমাটি দিয়ে পরিপাটি করে নিকায়। একদিন দুদিন নিকিয়ে হয় না, নিত্যদিন। ঝাঁটপাট দিচ্ছে অহরহ ধুলোর কণিকাও থাকতে দেবে না, এমনি যেন পণ। ঝকঝক তকতক করছে। ইচ্ছা-সুখে উঠানে এখন গড়াগড়ি খেতে ইচ্ছে করে। শুধু এই পুবের বাড়ি বলে নয়, যে বাড়ি পা ফেলছ এইরকম। গৃহস্থবাড়ি ঠাকুরদেবতার মন্দির বানিয়ে তুলছে।

কে বলছিল কথা। উমাসুন্দরী অমনি বলে উঠলেন মন্দিরই তো। মা-লক্ষ্মী মাঠ থেকে বাস্তুর উপর উঠছেন, মন্দির ছাড়া তাঁকে কি যেখানে সেখানে রাখা যায়?

এক-আধ বাড়ি বাদ—ধনসম্পত্তি যা-ই থাকুক অভাগা তারা। যেমন মন্তার মা-র বাড়ি। এক-কাঠা ধানজমি নেই, এক আঁটিও ধান ওঠে না তাদের বাড়ি। প্রজা-বিলি গাঁতি-জমি আছে কিছু, আদায়পত্র করে সংসার মোটামুটি চলে যায়। তাহলেও অঘ্রাণ-পৌষে বাড়ি ও মেয়ে মন্তার ভাল ঠেকে না, প্রাণ হু-হু করে ফাঁকা উঠানের দিকে তাকিয়ে।

ধান পাকতে লেগেছে। কাটাও শুরু হয়ে গেছে। লক্ষ্মীঠাকুরুণ বিল ছেড়ে গৃহস্থের উঠানে গুটি গুটি আসন নিচ্ছেন। গোড়ায় অল্পস্বল্প—এই পাঁচ-দশ আঁটি করে। ক্রমশ যত পাকছে, কাটারও জোর বাড়ছে ততই। জনমজুরের দুনো দর। আরও উঠবে—তেদুনো, এমন কি টাকা অবধি উঠে যায় কোন কোন বছরের মরশুমে। ধান কেটে কেটে আঁটি বাঁধে। জোর হাতে শিষের বখন আর

নজর চলে না সেই সব আঁটি উঠানে বয়ে বয়ে এনে ফেলে। বোঝার ভারে বাঁকের নাচুনি—মজা লাগে কমলের দেখতে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস জলরাজ্যে কাটিয়ে এসে আঁটির গায়ে সোঁদা সোঁদা গন্ধ—শুঁক-শুঁক করে কমল নাক টানে, গন্ধ নিতে বেশ ভাল লাগে।

দেখতে দেখতে সব ধান পেকে গেল। ঐ তেপান্তরের বিলে সবুজের একটা গোছাও পাবে না কোন দিকে, কোথাও। সোনা চতুর্দিকে—সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে নজর যত দূর চলে পাকা ধানের সোনা ঢেলে দিয়েছে। সারাটা দিন, এবং চাঁদনি রাত হলে রাত্রিবেলাতেও ক্ষেতে পড়ে আছে ভাতের গ্রাসটা মুখে দেবারও ফুরসৎ পায় না। আঁটি বওয়া বাঁকে কুলোয় না আর এখন গরুরগাড়ি বোঝাই হয়ে আসে। মাঝবিলের কাদা-জলে গাড়ির চাকা বসে যায়, গরুতে পারে না বলে মানুষেই টেনে নিয়ে আসে তখন। বোঝার ভারে চাকা-দুটো ক্যাঁচ কোঁচে কান্নার সুর তুলে বাড়ি এসে ঢোকে। আঁটি উঠানে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিল। গাড়ি-খালাস, কমলও মনে মনে সোয়াস্তি পেয়ে যায়।

বারান্দায় চারা কাঁঠালগাছে ঠেসান দিয়ে সে একনজরে দেখেছে। একলা কমল। পুঁটির হাত ধরে টেনেছিল ঃ দ্যাখসে দিদি। 'দিদি' বলা সত্ত্বেও পুঁটি ভোলেনি। তাচ্ছিল্য করে বলেছিল, আঁটি এনে ফেলছে—দেখব কি রে তার? সে তো আর ছেলেমানুষ নয় কমল কিম্বা টুকটুকির মতন—তার বলে কত কাজ! প্রদীপের সামনে পা ছড়িয়ে পুতুলের বাক্স খুলে বসেছে—ছেলেমেয়েগুলো শোবে এখন। কাথার বালিশ পাশের বালিশ নিমিকে দিয়ে বানিয়ে নিয়েছে। অল্প অল্প শীত পড়েছে, পায়ের উপর চাদর চাপা দিতে হবে —নয়তো ঠান্ডা লেগে যাবে পুতুলের। পুঁটির এখন কত কাজ—বসে বসে তার কি পাকা জোড়া দেখার নজর আছে।

মাপ হয়ে দেখছে কমল। অন্ধকার—আবছা আবছা। জোনাকি উড়ছে, উঠানময় চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে। আঁটি এনে এনে ফেলেই হল না—আঁটির উপর আঁটি সাজিয়ে পালা দিচ্ছে। যত রাত্রিই হোক, পালা সাজানো শেষ করে বাড়ি যাবে। ভবনাথ কোন দিক দিয়ে এসে পড়লেন। হাঁক পেড়ে বলছেন, শোন হে, কী ক্ষেতের আলাদা পালা। এর আঁটির সঙ্গে ওর আঁটি মিশে না যায়। কার কার ক্ষেতে কেমন ফসল পৃথক পৃথক হিসেব থাকবে। গোলে হরিবোল হলে হবে না। ফসলের পরিচায়তে।—ফল বুঝে সামনের বছরের বিলিব্যবস্থা।

হচ্ছেও তাই। একসঙ্গে তিন-চারটে পালা এদিকে সেদিকে। পালা খানিকটা উঁচু হলে উপরে গিয়ে উঠছে একজনে, আর একজনে নিচে থেকে আঁটি তুলে দিচ্ছে। গোল করে সাজিয়ে যাচ্ছে উপরের সেই মানুষ। ক্ষেতের নামে নামে পালা—বড় বন্দের পালা, তেলির চকের পালা ইত্যাদি। বিলের ভিতর পুববাড়ির যেসব ধান-জমি, শুনে শুনে কমলের অনেকগুলো মুখস্থ হয়ে গেল ঃ বড়বন্দ, ছোটবন্দ, তেলির চক, মণির চক মোড়লের চক মেছেরের ভুঁই আরও কত। অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে। মানুষগুলোর মুখ দেখা যায় না আর তেমন। মানুষই নয় যেন একপাল দত্যিদানো উঠানের উপর নেমে এসেছে। এরই মধ্যে শিবুকর কলকে টানতে টানতে এলো। হাত বাড়িয়ে কলকে একজনের হাতে দিয়ে বলে, খাও। টানছে লোকটা ফকফক করে—আরও সব এসে ঘিরে ধরেছে, চারিদিকে হাত বাড়ানো। দু-চারবার টেনে লোকটা অন্য হাতে কলকে দিয়ে দেয়। সে-লোক দিল আবার অন্য হাতে। কলকে টেনে কিছু চাঙ্গা হলে তক্ষুনি আবার কাজে লেগে যায়। কাজ সারা করে তারপর বাড়ি যাওয়া। সকাল হতে না হতে আবার ক্ষেতে গিয়ে পড়বে। চাষার এখন নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই।

কমলের হাই উঠছে, জোর করে তবু বসে ছিল। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে তরঙ্গিণী দক্ষিণের ঘরে যাচ্ছেন, দেখে শিউরে উঠলেন ঃ ওমা খোকন, তুই এখানে? ও আমি জানি, ঘরের মধ্যে পুঁটির সঙ্গে আছে। ঘরে আয়, শুয়ে পড় এবারে, রাত হয়েছে।

ঘরে গিয়ে কমল শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে খস-খসানি আওয়াজ পায়, মাঝে-মধ্যে কথা একআধটা। উঠানে কাজ চলছে। সকাল বেলা উঠে এসে তো অবাক। নিচু

পালা দেখে শুয়েছিল, মাথার উপর আঁটি উঠে উঠে তারা অনেক উঁচু হয়ে গেছে। নতুন পালাও উঠেছে। পল্টিকে আঙুল দেখিয়ে গম্ভীর সুরে কমল বলে, সমতল-ভূমির উপর গ্রামের মধ্যে কত পাহাড় উঠে গেছে, দেখ।

কাজল পেলেই কমল আজকাল ভূগোলের ভাষায় কথা বলে। গ্রামের ইস্কুলে যাওয়া এমনি এমনি নয়।

আরও কদিন গেল। উঠানের জায়গা দিন-কে-দিন আঁটো হয়ে গোলকধাঁধা এখন। বাড়ি ঢুকে সাঁ করে দাওয়ায় উঠে পড়বে—তা পথ পাবে কোথা? পালা বেড় দিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠতে হয়। অতিথিকুটুম্ব এসে তাল ঠিক রাখতে পারে না—এ-ঘরে যেতে ও-ঘরে উঠে পড়ে। আবার মা-লক্ষ্মী যেহেতু উঠানের উপর—জুতো পায়ে কেউ এদিকে না আসে। বড়রা তো নয়ই—বাচ্চাদেরও পায়ে জুতো আঁটা থাকলে হাঁটা নিষেধ কোলে তুলে নিয়ে যাও। পুববাড়ি এই—নতুন বাড়ি পশ্চিম বাড়ি পালের বাড়ি উত্তরবাড়ি সর্বত্র এই। মন্তার মা-র মতন কজনই বা সোনা-খড়ি গাঁয়ের মধ্যে।

খেলার বড় জুত। দিনমানে তো খেলেই, রাতের বেলাও ছাড়ে না চাঁদনি রাত যদি পেয়ে যায়। সন্ধ্যায় খাওয়া-দাওয়া সেরে ছেলেপেলেরা এসে জোটে—কেউ চোর হয়, কেউ বা চৌকিদার—পালা বেড় দিয়ে ছুটে বেড়ায়। চোর-চোর খেলা না বলে শিয়াল-ফুলি বলাই ঠিক। চালাক পণ্ডিত শিয়াল,

মাথায় তার নানান ফন্দি-ফিকির, তাড়া খেয়ে বনের গাছ-গাছালির মধ্যে পিছনে পিছনে বেড়ায়। এদের খেলাও তাই — এই পালা থেকে ও-পালার আড়ালে ঝুপ করে বসে পড়ছে।

উমাসুন্দরী বকাবকি লাগিয়েছেন : ছ্যামড়া-ছেমড়ি তোরা সব বাড়ি চলে যা। নতুন হিম লাগাস নে, অসুখ করবে। পটি খোকন ঘরে আয়—

বড়গিন্নির কথা কেউ কানে নেয় না। ক'টা দিন তো মোটে—তার পরেই একটা একটা করে পালা ভাঙবে, পালা ভেঙে মলন মলবে। সারা উঠোন ফাঁকা—আগে যেমনটা ছিল অবিকল তাই।

কত ইঁদুর যে জুটেছে—গর্ত খুঁড়ে উঠোন চালা-চালা করেছে। আঁটি থেকে ধান কুটুর-কুটুর করে দাঁতে কেটে গর্তের ভাণ্ডারে তোলে, ধীরেসুস্থে তারপর চাল খেয়ে চিটে করে রাখে।

ভবনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ক্ষেতেল-দের তাগিদ দেন : কষ্টের ফসল সবই যে ইঁদুরের গর্তে চলে গেল। মলেডলে ফেল বাপসকল—তোদের অংশ মেপেজুপে ঘরে নিয়ে যা, আমাদেরটা গোলায় তুলে ফেলি।

সেটা জরুরি বটে, কিন্তু ক্ষেতেলেরই বা অবসর কই? ধান দাওয়া, আঁটি খুললে তোলা, বয়ে বয়ে গৃহস্থের উঠানে আনা, কলাই-মসুরি তোলা, এ-সবের উপরে আছে গাছ-মলা—খেজুরগাছ কেটে ভাঁড় পাতা, রস পাড়া ইত্যাদি। সারা দিনমান এবং প্রহর রাত অবধি খেটেও কুলিয়ে উঠতে পারে না। তা সত্ত্বেও ধান মলাটা ঐ সঙ্গে ধরতে হবে। ফেলে রাখলে আর চলে না। বিস্তর ধান বরবাদ হচ্ছে।

হাত তিনেক মাপের চাঁচা-ছোলা টুকরো বাঁশ যাকে বলে মেইকাঠ পুঁতে ফেলল উঠোনের মাঝখানটায়। মলনের আয়োজন। মেইকাঠ ঘিরে খুব ভাল করে আবার লেপা-পোঁছা হল। সিঁদুরটুকু পড়লে কণিকা হিসাব করে তুলে নেওয়া চলে। চার গরু নিয়ে মলন মলতে এনেছে। ধানের আঁটি খুলে খুলে মেইকাঠ ঘিরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এক দাঁড়তে পাশাপাশি চার-গরু জুড়ে দিল—দড়ির প্রান্ত মেইকাঠে বাঁধা। মেইকাঠের চতুর্দিকে গরুরা ঘোরে, খুরের চাপে পোয়াল থেকে ধান খুলে খুলে পড়ছে। গরুর মুখে ঠুলি আঁটা নয়তো চলার সময় ধানসুদ্ধ পোয়াল খেয়ে দফা সারবে। তা-ও ছাড়ে নাকি —ঠুলি-ঢাকা মুখ পোয়ালে ঘষে দিয়ে জিভ বের করে এক-আধ গোছা টেনে নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নড়ির ঘা পড়ে পিঠের উপর। লেজ মলে হেই-হেই আওয়াজ তুলে গরু ছুটিয়ে দেয়। ছুটছে, তবু গ্রাস ফেলে না— চিবোতে চিবোতে দৌড়য়।

শীত পড়েছে বেশ। কমল আর পটি ভাই-বোনে বুড়ি-সুড়ি দিয়ে দাওয়ায় বসে মলন-মলা দেখছে। আগ-বাঁশের মাথায় সামান্য কঞ্চি রেখে আঁকুশি বানিয়ে নিয়েছে মলনের মধ্যে আঁকুশি ঢুকিয়ে উল্টে-পাল্টে দিচ্ছে। ধান নিচে পড়ে গিয়ে উপরটায় এখন শুধুমাত্র পোয়াল। মেইকাঠের গরু এখানে পোয়ালের খুঁটির সঙ্গে বাঁধল, ঠুলি খুলে দিয়ে চাট্টি চাট্টি পোয়াল দিল মুখে। অনেক খেটেছে, খেটে কাজ তুলে দিয়েছে—আহা, খাক। আঁকুশি দিয়ে যাবতীয় পোয়াল এক-দিকে সরিয়ে গাদা করল। পড়ে রইল গোবর-নিকানো পরিচ্ছন্ন উঠোনের উপর মা-লক্ষ্মীর দেওয়া নতুন ধান। ঝিকমিক করছে। ভক্তি-যুক্ত হয়ে উমাসুন্দরী কুড়িয়ে এক জায়গায় করলেন। জুতোপায়ে ইদিকে কেন রে—যা, যা—। বড়রা বোসে, তারা আসবে না— পশ্চিম বাড়ির বাচ্চা একটাকে তাড়া দিয়ে উঠলেন। কাঁচাধান ঝট করে গোলায় তোলা যাবে না—কাল দিনমান উঠোনে মেলে দিয়ে পুরো রোদ খাইয়ে নিতে হবে। একদিনের একটা রোদে যদি না হয়, পরদিনও। শিশুবরকে ডেকে লাগিয়ে দিলেন, কুলোয় তুলে তুলে ধান উড়োক। চিটে একেবারে সমস্ত বাদ দেবে না—অল্পসল্প থাকবে। চিটের মিশান থাকলে ধানটা থাকে ভাল।

মলন-মলা এখন এক খেলা হয়ে গেছে কমলদের। কমল যতীনরা সব গরু, পটি চাষা। মেইকাঠ কমল বাঁ-হাতে জড়িয়ে ধরেছে ডান হাতটা ধরল যতীন। যতীনের ডান-হাত পটলা এসে ধরে, পটলার ডান-হাত নিমু। হঠ্‌হঠ্‌ করছে পটি, নড়ি উঁচিয়ে তাড়া দিচ্ছে. গরুরূপী এরা চারজন দৌড়চ্ছে ততই। মেইকাঠ বেড় দিয়ে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে কেমন হয়ে যায়—চারিদিককার ঘর-বাড়ি গাছ-গাছালিও ঘুরছে, মনে হয়। ধপ করে বসে পড়ল গরুরা। পটি বলল, ঘুমিয়ে লেগেছে। জল খেয়ে নে এট্টু, সেরে যাবে। কাঁচা সুপুরি খেয়ে দেখ, তাতেও ঠিক এমনি হবে।

ধান তুলে-পেড়ে রাখা এবারে। উঠোনের গোলায়, ঘরের ভিতরের আউড়িতে। কুনকে মেপে মেপে ধান তোলা হচ্ছে—ভবনাথ নিজে সামনে দাঁড়িয়ে কোন জমির কত ধান উঠল, খাতায় টুকে নিচ্ছেন। [illegible] তো প্রাণ কেড়ে নেয় : [illegible] [illegible] [illegible] পাগলা [illegible] পায়রাউড়ি [illegible] ঝিঙেশাল [illegible] —এই সমস্ত [illegible] ঝিঙে [illegible] পাটনাই [illegible] [illegible] খোরাকি ঐখানে। [illegible] মত আছে, [illegible] [illegible] দেশের ঘোর আপত্তি : এ [illegible] হলে—পেটে থাকে না, [illegible] গিয়ে পেট চোঁ-চোঁ করে। এবং [illegible] পেটে কিছুমাত্র ভর পাওয়া যায় না। [illegible] —ও ভাত শহুরে বাবুভেয়েরা এসে খাবেন, এক গ্রাস মুখে ফেলেই যাঁরা অম্বলের ঢেকুর তোলেন। সরু ধান আউড়িতে উঠবে— কুটুম্ব এলে ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারে কাজে লাগবে। বয়াধান, যা ফুটিয়ে খই হবে, তা-ও আউড়িতে। আর থাকবে লক্ষ্মী-পুজোর ধান—আউড়ির মধ্যে কলস ও হাঁড়া বোঝাই হয়ে। কুঁদির-ডাঙা বলে এক-টুকরো জমি আছে জুড়ন মোড়লের জেপাজতে। নিষ্ঠাবান চাষী জুড়ান—তার শানই বরাবর মা-লক্ষ্মীর নামে থাকে। রোদে নিয়ে ধরলে সোনার মতন ঝিকমিক করে সে ধান। একটি কালো ধান নেই তার মধ্যে— কালোধান থাকলে পুজো হয় না। লক্ষ্মী-পুজো পুববাড়িতে তিনবার—পৌষমাসে পৌষলক্ষ্মী আশ্বিনের কোজাগরী এবং শ্যামাপুজোর দিন, শ্যামাপুজো তো নিশি-রাতে—সন্ধ্যাবেলা আগেভাগে খুব জাঁকিয়ে লক্ষ্মীপুজো হয়ে যায়।

(ক্রমশঃ)

অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতার শতবার্ষিকী

দিলীপ মালাকার

অমৃতবাজার পত্রিকা শতবার্ষিকী পালন করেছে ১৯৬৮ সালে। অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা 'হিন্দু মেলার উপহার' শত বর্ষে পদার্পণ করল ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব অনেকখানি।

বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও অমৃতবাজার পত্রিকা বহুকাল ধরে জড়িত। অবশ্য দুয়ের ভূমিকা ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। বিদেশে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ে আমাদের পরিচয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন 'রবীন্দ্রনাথ' ছিলেন না ছিলেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেই বালক রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা প্রকাশ করার জন্য অমৃতবাজার পত্রিকা নিশ্চয়ই গৌরব প্রকাশ করতে পারেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়ার্ধে বাংলা দেশে স্বদেশীর বান ডেকেছে। সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে তখন নবযুগের জয়যাত্রা চলেছে।

অমৃতবাজার পত্রিকা তখন বাংলা সাপ্তাহিক। যখন এর আত্মপ্রকাশ ঘটল ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮ সালে তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র সাত। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ত্রিশ এবং প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। মধুসূদন তখন বঙ্গসাহিত্যের শিখরে।

বৃটিশ-রাজ তখন পাকাপোক্ত। ইংরেজ বণিকরা ভারতীয় চাষীদের রক্ত নিংড়ে নিচ্ছে। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করতে অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার-মতিলাল ভায়েরা তখন সোচ্চার। অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনমানসের মধ্যে নবচেতনার জোয়ার বইয়ে দেওয়া। শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় অমৃতবাজার পত্রিকা সেদিন সফল হয়েছিল তার প্রতিষ্ঠায়।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় স্বদেশী সমাজ গঠনে সে-যুগের বহু চিন্তাশীল তাঁদের জীবন-মন সঁপেছিলেন। একই উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারা নিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার সূত্রপাত হয় যশোহরের গ্রাম ১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখে। তখন ছিল বাংলা সাপ্তাহিক। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ২১ ডিসেম্বর, ১৮৭১।

বাংলা পত্র-পত্রিকায় স্বদেশী জোয়ার বয়ে চলেছে। সেই জোয়ার রোধকল্পে বৃটিশরাজ ফন্দি আটলেন। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার কণ্ঠরোধকল্পে চালু হল ১৫ মার্চ ১৮৭৪ ভার্নাকুলার প্রেস আকট। ওদের প্রধান লক্ষ্য ছিল অমৃতবাজার পত্রিকা বন্ধ করা। এই আইন এড়াবার জন্যে পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা পুরোপুরি ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। তারপরে আবার প্রকাশিত হতে থাকে দ্বিভাষিক পত্রিকা হিসেবে। ওই দ্বিভাষিক পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী থেকে অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরাজী দৈনিকে পরিবর্তিত হয়।

অমৃতবাজার পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা যখন প্রকাশিত হয় তখন এদেশের চিত্র দেখতে পাই পত্রিকার সম্পাদকীয় ও সংবাদ পরিবেশনায়। এদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া কেমন ছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে পত্রিকার কয়েকটি লেখার মাধ্যমে। যেমন—'যে রাজ্যে রাজায়-প্রজায় সম্প্রীতি নাই, সে রাজ্যে কখন ভদ্র নাই।...যদি গবর্ণমেণ্টের কুশাসনে আমরা অসভ্য হইয়া যাই তবে ১৮ কোটি অসভ্য লোকের উপর কর্তৃত্ব করিয়া লাভই বা কি গৌরবই বা কি? যদি গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারে আমাদের জাতি লোপপ্রাপ্ত হয় তবে এই বিস্তীর্ণ মাঠ লইয়া ইংলণ্ডের লাভ কি?...গুণে ইংরেজরা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, আর দোষে উহা হারাইবেন।...'

(অমৃতবাজার পত্রিকা ১০ মার্চ ১৮৭০)

আরেকটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়, ...আমরা দেশের অবস্থা যতদূর ভাল জানি ইংরাজদিগের তাহা জানিবার অতি অল্প সম্ভব আছে। দেশের আচার-ব্যবহার রীতি-প্রকৃতিও আমরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল জানি। ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদকেরা সম্ভবতঃ রাজনীতি আমাদিগের অপেক্ষা ভালরূপে জানিতে পারেন, তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা অধিক লেখাপড়া জানিতে পারেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রণালীতে কোন রাজকে শলে দেশের আভ্যন্তরিক কিরূপ পরিবর্তন করিতেছে প্রজারা তদ্বারা কিরূপ ফলভোগ করিতেছে, তৎসমুদয় আমরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল করিয়া জানিতে পারি।...এদেশীয় পত্রিকার উপর যেমন আস্থা থাকিলে উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন অসংখ্য লোক বিনষ্ট হইত না।...'

(অমৃতবাজার পত্রিকা ৩০ জুন ১৮৭০)

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতার ভাষা ও ভাব ছিল তৎকালীন আবহাওয়ার মতন। 'হিন্দু মেলার উপহার' নামে কবিতাটি তখনকার দিনের উপযোগী ছিল। হিন্দু মেলার সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর যোগাযোগ ছিল গভীর। হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ সালে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। আসলে হিন্দু মেলা ছিল জাতীয়তাবাদীদের সমিতি। তারই একটা সংবাদ প্রকাশিত হয় অমৃতবাজার পত্রিকায় ১১ মার্চ ১৮৬৯, '...যাঁহারা চাঁদা দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐ স্থানে তাহা অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন, আগামী চৈত্র মেলা উপলক্ষে যিনি যে সকল দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিবেন, তিনি তাহার তালিকা বা দ্রব্যাদিসকল শোভাবাজারে রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্রকুমার দেবের নিকট পাঠাইলে তিনি কিম্বা শ্রীযুক্ত বাবু রজনাথ দেব তাহার রসিদ দিবেন। শ্রীগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক। শ্রীনবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক।...'

মেলার নাম করে জাতীয়তাবাদীরা জাতীয়তাবাদ প্রচার করতেন। কি হত মেলায় তার রিপোর্ট ছেপেছিল অমৃতবাজার পত্রিকা ২২ এপ্রিল, ১৮৬৯।

'...গত চৈত্র সংক্রান্তিতে কলিকাতায় বাবু আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার বাগানে চৈত্র মেলার তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার অধিকতর সমারোহের সহিত কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। লোকের জনতা বিস্তর হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় স্থান সংকীর্ণ ও উত্তম বন্দোবস্ত না হওয়ায় ভারি গোল হইয়াছিল। এমনকি আমরা শুনিলাম অনেকগুলি ভদ্রলোককে ধাক্কা খাইতে হইয়াছিল। এদেশজাত অনেক জিনিষ-পত্রের আমদানী হইয়াছিল। এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিল্পজাত দ্রব্য বিস্তর প্রদর্শিত হইয়াছিল। এইগুলি দেখিয়া অনেকে সন্তোষ লাভ করেন, গত বৎসরের ন্যায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ও বাঙ্গালা প্রস্তাব সকল পঠিত হইয়াছিল। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় সংস্কৃত কলেজের কতকগুলি ছাত্র বেণী সংহার নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু নাট্যশালাটি অতিশয় অপ্রশস্ত হইয়াছিল এবং এই অভিনয় বিষয় দেখিবার লোকের এত সমাগম হয় যে তাহারা অভিনয় ভঙ্গ করতে বাধ্য হন। যাহা হউক ইহাদিগের উদ্যোগ অতিশয় মহৎ। ব্যায়াম চর্চা এবার উন্নত হইয়াছে বলিতে হইবে। অনেকগুলি ভদ্রসন্তান ব্যায়াম চর্চার পরীক্ষা দেন, তাঁহাদের নৈপুণ্যতা দেখিয়া সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।...'

সেকালে হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদ প্রচার করা। স্বদেশী জিনিসের ব্যবহারের শুরু হয় ওই সময় থেকে। বৃটিশ আমলে স্বদেশী মেলার সূত্রপাত ওই থেকে।

হিন্দু মেলার যে উদ্দেশ্য, সেই জাতীয়তাবাদের প্রচার কল্পেই রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দু মেলার উপহার' কবিতা লেখা।

স্বদেশী ভাবধারা প্রচলনে ঠাকুর পরিবার ছিলেন সে যুগের অগ্রদূত। ভারতের প্রথম আই সি এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষের সহপাঠী। শিশিরকুমারের সহপাঠীদের মধ্যে আরও অনেক খ্যাতনামারা ছিলেন, যেমন—

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতৃদেব ডাঃ গংগাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি।

অমৃতবাজার পত্রিকার সঙ্গে ঠাকুর-বাড়ির ঘনিষ্ঠতা যে ছিল তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা প্রকাশ। শিশিরকুমার ঘোষের সহপাঠী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। তাঁরই উৎসাহে বালক রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী ভাবাপন্ন কবিতা লেখা এবং অমৃতবাজারে প্রকাশ।

যে সময়ে হিন্দু মেলার মাধ্যমে স্বদেশীর জোয়ার বয়ে চলেছে অর্থাৎ ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ১২ থেকে চোদ্দ। ওই সময়ে হয় তাঁর উপনয়ন। আর ঠিক ওই সময়েই কবি তাঁর পিতার সঙ্গে বোলপুর হয়ে হিমালয় ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ঠিক ওই সময়েই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন প্রভাব আর শিক্ষা। এই সময়টি বালক রবীন্দ্রনাথের জীবনে ছিল ঘটনাবহুল। কবির মাতৃবিয়োগ হয় ৮ মার্চ ১৮৭৫ সালে।

হিন্দু মেলার উপহার কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্র-জীবনী বিশেষজ্ঞ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'ছাপার অক্ষরে 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' এই নামযুক্ত যে কবিতা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, সেটি হইতেছে 'হিন্দু মেলার উপহার'। কবিতাটি হিন্দু মেলায় (৩০ মাঘ ১২৮১) পঠিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তেরো বৎসর আট মাস মাত্র রবীন্দ্রনাথ জীবন-স্মৃতি বা অন্য কোন রচনার মধ্যে এই কবিতা সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ইহার দুই বৎসর পরে যে কবিতা হিন্দু মেলায় আবৃত্তি করেন, তাহার কথা জীবন-স্মৃতিতে বিস্তৃতভাবেই বলিয়াছেন।'

(রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক। —শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৭০, চতুর্থ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৭)

'হিন্দু মেলা' প্রথমে হ্যান্ডবিল আকারে পঠিত এবং প্রকাশিত হয়। এর গানের সুর দেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশিত হয় ১৪ ফাল্গুন ১২৮১, ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫ তারিখে দ্বিভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায়। এসম্বন্ধে শ্রীপুলিনবিহারী সেন তাঁর রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী ১৯৭৪ বইতে উল্লেখ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৯৬১, ৪ খণ্ড পৃঃ ২৪—২৭-তে কবিতাটি স্থান পেয়েছে। কিন্তু বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীতে স্থান পায়নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো বই-এ এই কবিতাটি সংযোজন করেননি। কবিতাটি তিনি কেন তাঁর কোনো বইয়ে প্রকাশ করেননি সেটা একটা রহস্য রয়ে গেছে।

ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয়'-তে লিখেছেন : রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা লেখা হয় বার বৎসর বয়সে। কবিতার নাম 'অভিলাষ'। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সেটা ছাপা হয় ১৮৭৪ সালের নভেম্বর মাসে। তখন কবির বয়স তেরো বছর সাত মাস।' (পৃঃ ৫৫)

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা নিয়ে ঐতিহাসিক মতবিরোধ থাকতে পারে। কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাটির ঐতিহাসিক মূল্য অনেকখানি। একালের রবীন্দ্রানুরাগীরা তাঁর সেই কবিতাটি পড়লে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারবেন। তাই কবিতাটি তুলে দিলাম।

হিন্দু মেলার উপহার

(১)
হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন পরি
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন
কাঁপায়ে নীহার শীতল বায়।

(২)
স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়েনাক পাতা-
বিহগ নিচয়, নিস্তব্ধ অচল;
নিরবে নিঝর বহিয়া যায়।

(৩)
পূরণিমা রাত্র চাঁদের কিরণ—
রজত ধারায় শিখর কানন,
সাগর-উরমি হরিত-প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।

(৪)
ঝংকারিয়া বীণা কবিবর গায়
কেনরে ভারত কেন তুই হায়,
আবার হাসিস। হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে!

(৫)
দেখিতাম যবে যমুনার তীরে
পূর্ণিমা নিশীথে নিদাঘ সমীরে
বিশ্রামের তরে রাজা যুধিষ্ঠির;
কাটাতেন সুখে নিদাঘ নিশি।

(৬)
তখন ও হাসি লেগেছিল ভাল,
তখন ও বেশ লেগেছিল ভাল
শ্মশান লাগিত স্বরগ সমান
মরু উরবরা ক্ষেত্রের মত।

(৭)
তখন পূর্ণিমা বিতরিত সুখ,
মধুর উষার হাস্য দিত সুখ
প্রকৃতির শোভা সুখ বিতরিত
পাখীর কূজন লাগিত ভাল।

(৮)
এখন তা নয় এখন তা নয়,
এখন গেছে সে সুখের সময়।
বিষাদ আঁধার ঘেরেছে এখন
হাসিখুশী আর লাগে না ভাল।

(৯)
আমার আঁধার আসুক এখন
মরু হয়ে যাক ভারত কানন
চন্দ্র সূর্য হোক মেঘে নিমগন
প্রকৃতি শৃংখলা ছিঁড়িয়া যাক।

(১০)
যাক ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক।

(১১)
চাই না দেখিতে ভারতেরে আর
চাই না দেখিতে ভারতেরে আর
সুখ জন্ম-ভূমি চির বাসস্থান
ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক।

(১২)
দেখেছি সে দিন যবে পৃথ্বিরাজ
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ
আশ্রয় নিলেন কৃতান্ত কোলে।

(১৩)
দেখেছি সেদিন দুর্গাবতী যবে
বীরপত্নীসম মরিল আহবে
বীরবালাদের চিতার আগুন,
দেখেছি বিস্ময়ে পুলকে শোকে।

(১৪)
তাদের স্মরিলে বিদরে হৃদয়
স্তব্ধ করি দেয় অন্তরে বিস্ময়
যদিও তাদের চিতা ভস্মরাশি
মাটির সহিত মিশায়ে গেছে।

(১৫)
আবার সেদিন (ও) দেখিয়াছি আমি
স্বাধীন যখন এ ভারত ভূমি
কি সুখের দিন! কি সুখের দিন।
আর কি সেদিন আসিবে ফিরে!

(১৬)
রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে)
স্বাধীন নৃপতি আর্য সিংহাসনে
কবিতার শ্লোকে বীণার তারে
সে সব কেবল রয়েছে গাথা

(১৭)
শুনেছি আবার শুনেছি আবার
রাম রঘুপতি লয়ে রাজভার
শাসিতেন হায় এ ভারত ভূমি
আর কি সেদিন আসিবে ফিরে

(১৮)
ভারত কংকাল আর কি এখন
পাইবে হায়রে নূতন জীবন
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া
আর কি কখন দিবেরে জ্যোতি,

(১৯)
তা যদি না হয় তবে আর কেন
হাসিবি ভারত! হাসিবিরে পুনঃ
সেদিনের কথা জাগি স্মৃতি পটে
ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে?

(২০)
অমার আঁধার আসুক এখন
মরু হয়ে যাক ভারত কানন
চন্দ্র সূর্য হোক মেঘে নিমগন
প্রকৃতি-শৃংখলা ছিঁড়িয়া যাক।

(২১)
যাক ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে
প্রলয় উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে
ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক।

(২২)
মুছে যাক মোর স্মৃতির অক্ষর
শূন্যে হোক লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবাক আমার অমর জীবন
অন্ত গভীর কালের জলে।'

শিখা সরকার

যুবক যুবতী

হোস্টেল জীবন

ছাত্রজীবনে এমনকি কর্মজীবনে অনেক তরুণ-তরুণীকেই হোস্টেলজীবন কাটাতে হয়। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কোথাও শাসনের নিগড় বন্ধন আবার কোথাও স্বেচ্ছা-জীবনযাপন। হোস্টেলজীবনের আনন্দ-কষ্টের সঙ্গে নানা দোষগুণও জড়িয়ে আছে। কেউ হোস্টেলজীবন যাপন করে নিজের চরিত্র গঠন করে ভাবীজীবনকে সুন্দর করে তোলে, আবার কেউ স্বেচ্ছা-জীবনযাপন করে নানা অসৎ সঙ্গে পড়ে নিজের জীবনে নানা দুঃখ ডেকে আনে।

নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলের আবাসিক ছাত্র দিব্যেন্দু রায়ের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বললাম। লাজুক, নম্রস্বভাব, বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল।

—আচ্ছা দিব্যেন্দু, তুমি ক'বছর এখানে আছ?

—প্রায় ছ'বছর। এবার হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দেব।

—এখানে তোমার কোন অসুবিধা হয় না?

—প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগতো। বাড়ী ছেড়ে মা-বাবাকে রেখে আসতে। তবে পরে আর অসুবিধা হয়নি।

—ছাত্রজীবনে হোস্টেলজীবনের কোন গুরুত্ব আছে কি? তোমার কি মনে হয়?

—সত্যিই নরেন্দ্রপুরে আসার সময় হোস্টেলজীবনের এতটা গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারিনি। এখন দেখছি এখানের হোস্টেল স্কুলেরই একটা অঙ্গ।

—একথা বলছ কেন?

—স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা এতো সুন্দরভাবে বাড়ীতে থাকলেও পেতাম না। নিজের জুতো পালিশ থেকে আমাদের প্রার্থনা হল সাজানো সব কাজই আমাদের করতে হয়। নিজের থালা-বাসন ধোয়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া, খাবার ঘরে পরিবেশন—সব আমরা আনন্দের সঙ্গেই করে থাকি।

—এখানে নিয়মের কড়াকড়ি—ভাল লাগে তোমার?

—নিশ্চয়ই! বাড়ীতে আমার সময় কাটতেই চায় না। আর এখানে ভোরবেলা টাইম কিপারের হাতের ঘণ্টায় ঘুম ভাঙে, মুখ ধোয়ার পর একটা হট ড্রিংক। তারপর কিছু ফিজিক্যাল একসারসাইজ। সেখান থেকে এসে যাই প্রার্থনা হলে ভক্তিমূলক গানে যোগ দিতে। তারপর পড়া শুরু হয়। প্রত্যেক ভবনের স্টাডি হলে সেই ভবনের ছেলেরা পড়ে। সঙ্গে থাকেন একজন শিক্ষক। পড়ার পর টিফিন খেয়ে স্কুল আবার দুপুরে এসে স্নান খাওয়া সেরে আবার স্কুল। বিকেলে নিয়মিত খেলা। সন্ধ্যায় আবার প্রেয়ার তারপর পড়া—রাতের খাবার খেয়ে লাইট অফ ঘণ্টায় ঘুমাতে যাই।

—সব দেখছি রুটিন বাঁধা। নিজেদের মনের আনন্দে একটু গল্পগুজবের অবসর নেই?

—বন্ধুদের মধ্যে গল্পগুজব ইয়ারকি সব চলে। স্কুলের দাদা (শিক্ষক) আমাদের সঙ্গেই থাকেন। ছাত্র ও শিক্ষকে এত মেলামেশা মনে হয় নরেন্দ্রপুরের বাইরে বিরল। তাছাড়া রবিবারে অভিভাবকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পাই।

—তোমরা বাইরে যাওয়ার সুযোগ পাও না? সিনেমা দেখার বা বেড়ানোর ইচ্ছা হলে কি কর?

—সারা দিনের সব উপকরণ আমাদের ক্যাম্পাসের ভিতর থাকার জন্যই আমরা একদম বাইরে যাই না। তবে ছুটিতে নিশ্চয়ই বাড়ী যাই।

—বাইরের পরিবেশ থেকে দূরে সরে থাকা পরবর্তী জীবনে খারাপ প্রভাব আনবে না কি? তোমার কি মনে হয়?

—আমার মনেও এ প্রশ্ন জেগেছে। তবে আমাদের মহারাজ আমার সব সন্দেহের নিরসন করেছেন। তিনি বললেন—চারা বট-গাছ যখন পোঁতা হয় তখন বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খায়। বেড়ার মধ্যে ক্রমে বড় হয়ে উঠলে আর বেড়ার দরকার হয় না, ছাগলেও খেতে পারে না। উপরন্তু তখন সে ছায়া দেয়, আশ্রয় দেয়।

বড় সুন্দর লাগলো এই কথাগুলো। এবার জিজ্ঞাসা করি- ছাত্রজীবনের বিভিন্ন

দিব্যেন্দু রায়

দিকের প্রতিফলনের কি ব্যবস্থা আছে তোমাদের এখানে?

—বাৎসরিক প্রদর্শনী, বিতর্ক, বক্তৃতা, আবৃত্তি প্রভৃতির মাধ্যমে আমরা আমাদের বিশেষ দিককে পরিস্ফুট করতে পারি। তাছাড়া আনন্দ, উৎসব, সবরকম খেলা, শিক্ষামূলক সিনেমা সব ব্যবস্থা আছে।

শ্রীমান দিব্যেন্দু রায়ের কাছ থেকে হোস্টেলজীবনের অভিজ্ঞতার যে কাহিনী এতক্ষণ শুনলাম তার বিপরীত চিত্র পাওয়া যাবে কলকাতার বিভিন্ন কলেজ হোস্টেলগুলোতে। অন্ধকার, স্যাঁতস্যেঁতে ঘর, জায়গার প্রচণ্ড অভাব। সরকারী কলেজ হোস্টেলগুলোর অবস্থা অনেক ভালো, তবে বেসরকারী কলেজ হোস্টেলগুলোর অবস্থা খুবই কাহিল। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পড়াশুনার পরিবেশের নিতান্ত অভাব। প্রয়োজনীয় সুপারিভাশনের ব্যবস্থা নেই। তবে সেসব হোস্টেলেও সীটের প্রচণ্ড চাহিদা। ইউনিয়নের দাদাদের ধরে, প্রফেসরকে তেলিয়ে একটা সীটের ব্যবস্থা করতে গলদঘর্ম অবস্থা। এসব হোস্টেলে নিয়মকানুনের শিথিলতা বেশ আছে। দু-একটা জায়গায় উচ্ছৃংখলতাও আছে। নানা কিছুর সঙ্গে বোতল, গঞ্জিকা সবই চলছে। তবে নিজেদের মধ্যে ছোটখাটো দু-একটা চুরির ঘটনা ছাড়া সম্বন্ধ বন্ধুত্বপূর্ণ। বিপদে আপদে একে অপরকে সাহায্য করে। অসুখ হলে তো কথাই নেই।

একদিকে এতো অসুবিধা আবার অন্যদিকে হোস্টেলের জন্য ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন চলছে। নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই কিছুদিন আগেও হোস্টেলের দাবী জানিয়ে আন্দোলন করেছে। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী জয়শ্রী সরকার জানালেন—মেয়েদের হোস্টেল-এর দুর্দশার কথা। কি হালে তাঁরা আছেন—তাঁদের হোস্টেলই নেই। সরকার ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থের দিকে একটুও নজর দিচ্ছেন না। তবে গ্রামাঞ্চলের স্কুল-কলেজের চেহারা এর তুলনায় ভালো। গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের ছাত্র প্রশান্ত দের সঙ্গে এ বিষয় আলাপ হল। তিনি জানালেন—এখানে মেয়েদের জন্য কোন হোস্টেল নেই। পরিমিত বাস না থাকায় বেশ কষ্ট হয়। অন্যান্য সমস্যার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি জানালেন কলকাতার হোস্টেলগুলোর চেয়ে আমরা এখানে ভাল আছি। পেটপুরে খেতে পাই।

—এখানে 'র‍্যাগিং' নেই?

—না, আমাদের হোস্টেলে র‍্যাগিং চালু নেই।

বনগাঁ কলেজের সুব্রত ঘোষও একই কথা শোনালেন।

—কলকাতার খারাপ ছোঁয়াচ কি আপনাদের হোস্টেলেও লেগেছে? —জিজ্ঞাসা করি।

—আপনি ড্রিংক—র‍্যাগিং এসবের কথা বলছেন? অস্বীকার পুরো করছি না, তবে কিছুই সীমার বাইরে নয়।

ভর্তির মরসুমে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেলে তো র‍্যাগিং-এর প্রচণ্ড বাড়াবাড়ি। তবে বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা বলে জেনেছি তারা প্রায় সকলেই এর বিরোধী। তাদের মতে এটা অপসংস্কৃতির একটা ধারক। এটাকে জিইয়ে রাখা কোনমতেই উচিত নয়।

কুমারী শিখা সরকার স্কুলের মেয়ে। তার এক বন্ধু কলকাতার একটা হোস্টেলে থাকে। (নাম উল্লেখ করতে বারণ করেছে) তার কাছে হোস্টেলের নানা কথা শুনে ওর হোস্টেলজীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গিয়েছে।

—তুমি বুঝি হোস্টেলে থাকা পছন্দ কর না? জিজ্ঞাসা করি।

—মহা বাজে জায়গা। কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না। এ ওর অনুপস্থিতিতে নিন্দা করবে। এ ওকে হিংসা করবে। সুযোগ পেলেই সামান্য জিনিসও চুরি করে নিয়ে যাবে। একটু এদিক ওদিক হলেই ঝগড়া। আর যা খেতে দেয়, অর্ধেক পেটও পোরে না।

—তুমি সব বাড়িয়ে বলছ। ভালো-মন্দ সব মিশেই থাকে।

—তা অবশ্য ঠিক। তবে দিদির মুখে তাদের কলেজের হোস্টেলের মেয়েদেরও তো নানা গল্প শুনি সেগুলোও কি মিথ্যা?

—কি সব শোনো?

—হোস্টেলের মেয়েরা ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে অনেক রাত করে হোস্টেলে ফেরে, দারোয়ান কিছু বললে ছেলেবন্ধুরা ধমকে যায়—বিয়ার খেয়ে হোস্টেলে নাচানাচি করে—আরো কত কি?

শিখার কথা যে একদম মিথ্যা নয়, এটা অনেকেই জানেন। উত্তর কলকাতা এবং দক্ষিণ কলকাতার কয়েকটি লেডিজ এবং স্টুডেন্ট (বয়েজ) হোস্টেলে এসব দু-একটা ঘটনার কথা শোনা যায় বৈ কি। তবে আজকাল ছেলেমেয়ে কেউ ধোয়া তুলসীপাতা নয়, কি বলো শিখা?

—আপনি দেখছি আমার ওপর রাগ করে এসব বলছেন। ভাল হোস্টেল নিশ্চয়ই আছে। তবে শৃংখলা না থাকলে হোস্টেলজীবনের মানেই থাকে না।

এবার শিখার সঙ্গে একমত না হয়ে উপায় নেই। ছাত্রজীবনের অভীষ্ট পথ থেকে সরে গেলেই বিপদ। সুশৃংখল জীবনের আনন্দই তো সত্যিকারের আনন্দ।

অমর দাশ

চিঠিপত্র

...ভুক্তের কর্তৃপক্ষ লেখককে দিতে পারেন কিনা।

তবে আগ্রহী পত্রলেখক মহাশয়কে জানানো দরকার যে এই ধারাবাহিক রচনার মধ্যে একটি পরিকল্পনা আছে। তাহলে তিনি বুঝবেন, তাঁর উল্লিখিত জীবিত বিগত ভাবং শিল্পীদের বৃত্তান্ত অন্তর্গত করা যায় না এ পর্যায়ে। পরিকল্পনার কয়েকটি সূত্র হল :—

(১) পরলোকগত শিল্পীদের কথাই লিখছি। একমাত্র ব্যতিক্রম অনাথনাথ বসু। তাঁকে বিষয়বস্তু করবারও কটি বিশেষ কারণ আছে। প্রথমত, ৭৮ বছর বয়সী অনাথনাথবাবুর গায়নক্ষমতা ও শিল্পীসত্তা এখনো সজীব থাকলেও তিনি বিগত যুগেরই এক শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ও অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণনীয় এবং মাননীয়। দ্বিতীয়তঃ এমন বিচিত্র প্রতিভাধর ও ঐকান্তিক সংগীতসাধক এতখানি বয়সেও কোন রাষ্ট্রীয় বা উপযুক্ত স্বীকৃতি পান নি, যা তাঁর পাওয়া উচিত ছিল। তৃতীয়ত, তাঁর এত ঘটনাপূর্ণ বিস্তারিত সংগীত-জীবন আমি সংগ্রহ করে প্রকাশ না করলে খুব সম্ভব অজ্ঞাতই থেকে যেত। কারণ বসু মহাশয় আত্মপ্রচারবিমুখ এবং অতিশয় বিনয়ী। তিনি কাউকেই এত বিবরণ জানাতে যেতেন না এবং জাতীয় চরিত্রের এই দারুণ দুর্দিনে এসব বিষয়ে কার মাথাব্যথা!

(২) বাংলার সংগীতজীবনের পট-ভূমিকায় সেকালের শিল্পীদের বর্ণনা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। সেজন্যে বাঙালী গুণীরাই এই পর্যায়ে প্রাধান্য পেয়েছেন। তিলমাত্র প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা যে আমার নেই, আশা করি এপর্যন্ত প্রকাশিত অধ্যায়-গুলিই তার সাক্ষ্য। আর একটি স্পষ্ট কথা এই যে, অনেক ক্ষেত্রেই বাঙালী গুণীরা তাঁদের প্রতিভা ও গুণের উপযুক্ত মর্যাদা, অর্থ, সম্মান পান নি। সাংগীতিক ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থানে তাঁদের প্রতিষ্ঠা করাও আমার কর্তব্য বিবেচনা করেছি। সেই প্রেরণা থেকেই আমার এই আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

(৩) পশ্চিমের অনেক গুণীও এই পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তবে বিশেষ তাঁরাই—যাদের সংগীত-জীবন অনেকাংশে বাংলাতেই উদ্যাপিত হয়, যাঁরা বাঙালী শিষ্যগঠন এবং বা দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে এখানকার সংগীতক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছেন, কেউ বা ... করেছেন বাংলার মাটিতেই।

(৪) প্রথম ... অধ্যায়ের লেখাই মৌলিক কিনা, পত্রলেখক ও সুধী পাঠক-পাঠিকারা বিবেচনা করবেন। সেকারণেই ... ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁর নাম এ পর্যায়ে নেই, পত্রলেখকের অনুযোগের উত্তরে জানাই। কারণ পত্রান্তরে এনায়েৎ খাঁর ... শিষ্য শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয় খাঁ সাহেবের কথা লিখেছেন। স্বর্গত লালচাঁদ বড়াল প্রমুখ কোন কোন গুণীর কথা অন্য কোন লেখক আগে প্রকাশ করলেও লক্ষ্যমান পর্যায়ে বহু অপূর্ব প্রকাশিত তথ্য সম্পূর্ণ আকারে হয়ত পেয়েছে বড়াল মহাশয়ের সংগীতজীবন। মৌজুদ্দিন সম্পর্কেও সেকথা বলা যায়। উপরন্তু মৌজুদ্দিনের প্রকৃত পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি সত্য উদ্ধারের আশায়, সাংগীতিক ইতিহাসের প্রেরণায়। সেজন্যে সংগীত-প্রবীণ, বয়োপ্রবীণ, সুপণ্ডিত ও শ্রদ্ধাস্পদ অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের মৌজুদ্দিন সম্পর্কে কোন কোন উক্তির প্রতিবাদও করতে বাধ্য হয়েছি। পিতৃতুল্য বর্ষীয়ান পূর্ব-লেখক মহাশয় যদি এ লেখা দেখে থাকেন, অনুগ্রহ করে আমায় নিরপেক্ষ তথ্য সন্ধানীরূপে মার্জনা করবেন—এই সশ্রদ্ধ প্রার্থনা।

(৫) বিগত যুগের সেইসব শিল্পীদের (বাঙালী অবাঙালী) দিকেই আমার বেশি লক্ষ্য যাঁরা নানা কারণে অপ্রকাশিত (সাহিত্য জগতে), উপেক্ষিত, অবহেলিত কিংবা আজ কালকার জগতে অজ্ঞাত রয়ে গেছেন। যথা—মানদাসুন্দরী, তাজ খাঁ, দক্ষিণাচরণ সেন, কিরণময়ী, কৃষ্ণভামিনী, মীর্জা সাহেব, শ্বেতাঙ্গিনী, লতাফৎ হোসেন, মোহিনী-মোহন মিশ্র প্রভৃতি।

(৬) এমন কজন স্বনামধন্য শিল্পীর বিবরণ দিয়েছি, যাঁদের নামমাত্র এখনকার শ্রোতা ও পাঠকরা জানেন কিন্তু তাঁদের তথ্যপূর্ণ জীবন-কথা তথা সাংগীতিক পরিচয় পূর্বে প্রকাশ পায় নি। যেমন—গহরজান, লছমী ওস্তাদ, আমীর খাঁ, গৌরীশংকর মিশ্র, শিব পশুপতি, জমিরুদ্দিন, এমন কি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী সম্পর্কেও একথা বলা যায়, যদিও ৩২ বছর মাত্র আগে তিনি গত হয়েছেন।

(৭) বাইজী শ্রেণীকে বাংলার সংগীত-জগতে অন্যতম ইনস্টিটিউশন রূপে পরিচিত, উপস্থাপিত ও মূল্যায়ন যুক্ত এই প্রথম করা হল 'বাইজী' পর্ব শীর্ষক তিনটি অধ্যায়ে।

(৮) পত্রলেখক এমন কজন শিল্পীর উল্লেখ করেছেন যাঁদের বিষয়ে আমি অন্যান্য বইতে, এমন কি 'সেকালের সংগীতগুণী' পর্যায়েই লিখেছি। অথচ অহেতুক বাগাড়ম্বরে তালিকা বৃদ্ধি করেছেন তিনি। 'আবদুল করিম খাঁর জীবন এবং সংগীত-সাধনার কথা বিস্তৃতভাবে শোনবার বিশেষ আগ্রহ রাখি' —একথা পত্রলেখক জানিয়েছেন। কিন্তু 'বিশেষ আগ্রহের' সঙ্গে যদি বাংলাসাহিত্যেরও পাঠক হতেন, তাহলে আমার 'আসরের গল্প' বইয়ের 'শেষের গান' অধ্যায়ে আবদুল করিমের বিস্তারিত এবং অপূর্ব প্রকাশিত তথ্যসমৃদ্ধ সংগীত-জীবনের পরিচয় পেতেন তিনি। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা লেখবার ফরমায়েসও তিনি করেছেন। শুধু গোপেশ্বরবাবু নন, তাঁর সমকালীন ও পূর্ববর্তী বিষ্ণুপুরের বহু গুণীর আলোচনা, মূল্যায়ন, জীবনী ইত্যাদি আছে আমার 'বিষ্ণুপুর ঘরানা' পুস্তকে। তবে সংক্ষিপ্ত আকারে। কারণ গোপেশ্বরবাবু দীর্ঘজীবী হয়ে সাম্প্রতিক কালেও পৌঁছে ছিলেন। তাঁর জীবনকালেই একাধিক পত্রপত্রিকায় তাঁর জীবনী, সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গ ইত্যাদি এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ পায় তাঁর সংগীতজীবনের পরিচয়। চর্বিত চর্বণ আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। পত্রলেখক মহাজ্ঞানীর মতন আরো যাঁদের নাম ... লিখতে বলেছেন, সে সম্পর্কে ...র উত্তর : রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কথা আমার 'সংগীতের আসরে' গ্রন্থের 'রাগাধ্যায়ে রাধিকাপ্রসাদ' পরিচ্ছেদে, মুরারি মিশ্রের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত আমার 'আসরের গল্প' বইয়ের শেষ অধ্যায়ে, মোহিনীমোহন মিশ্রের বিস্তৃত সংগীতজীবন এই 'সেকালের সংগীতগুণী'তেই 'আর একজন সব্যসাচী' নামে, নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিবরণ 'আসরের গল্প' পুস্তকের 'সংগীতময় জীবন' শীর্ষক অধ্যায়ে আছে। কিন্তু এত বড় 'সংগীত-রসিক' পাঠককে সেসব পাঠ করার অপবাদ কেউ দিতে পারবে না দেখছি! পত্রলেখক ওই বইগুলির সঙ্গে আমার 'সংগীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু' বইখানিও সময় পেলে অনুধাবন করতে পারেন—উনিশ শতকের বাংলার সংগীতজগতের নানা-প্রকার তথ্য ও বৃত্তান্তের জন্যে।

(৯) ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কথা জানাতেও পত্রলেখক মুন্সিয়ানা ... ফরমায়েস করেছেন। অথচ এই 'দেশ' পত্রিকাতেই ভীষ্মদেবের তথ্যপূর্ণ, বৈচিত্র্য-ময় সংগীতজীবন প্রকাশ করেছি, ...

দিন' নামে। অবশ্যই ভীষ্মদেব বক্ষ্যমান পর্যায়ভুক্ত হতে পারেন না, সেজন্যে তা একটি পৃথক রচনারূপে লিখি। (বছর তিনেক আগে সে লেখা পত্রস্থ হয়েছিল, সংখ্যাটি আমার কাছে না থাকায় তার তারিখ জানাতে পারলুম না।) অথচ, পত্রলেখক 'সংগীতরসিক' এবং 'অমৃতের পাঠক!

আরো কজনের নাম পত্রলেখক করেছেন যাঁদের কথা বই পর্যায়েই আমার লেখবার ইচ্ছা আছে। অবশ্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ কতটুকু স্থান দেবেন তার ওপরে তা নির্ভরশীল।

পত্রলেখক যে লিখেছেন 'তারানা বা তেলেনা',—ও দুটি শব্দ একার্থক নয়। তারানা হল উত্তর ভারতীয় সংগীতে প্রচলিত রীতি বিশেষ। আর তেলেনা বা তিলানা কর্ণাটকী অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতীয় একটি সংগীতপদ্ধতি। যদি সুযোগ ও প্রসঙ্গ আসে, এসব আলোচনা করা যাবে।

যাই হোক, আমি নাকি 'ইতিমধ্যেই যতটুকু (!) পরিবেশন' করেছি তা পত্রলেখক যে 'অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে' (সম্পূর্ণ?) পড়েছেন, সেজন্যে কৃতার্থ বোধ করতে হয়!

আশা করি, পত্রলেখক এবার বুঝতে পারবেন, তাঁর যাবতীয় অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব শুধু নয়, অর্থহীনও। আর আমার প্রার্থনা—ভবিষ্যতে এমন সব অসংলগ্ন উক্তির উত্তর দিয়ে যেন সময়ের অপচয় না করতে হয়। অলমতি বিস্তরেণ।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-২৩

শতবর্ষের স্মরণীয় প্রসঙ্গে

'অমৃত' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি নিবন্ধে তথ্যসম্বন্ধে স্থানে স্থানে ভুলভ্রান্তি নজরে পড়ল। সেগুলি পাঠকসমাজের গোচরে আনছি।

(১) ১৪ বর্ষ ৩০ সংখ্যায় (৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৪) প্রকাশিত 'শতবর্ষের স্মরণীয়' শীর্ষক রচনায় কালীশবাবু বিনোদিনী সম্পর্কে লিখেছেন, '১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ বেণীসংহার নাটকে। এটি ভুল। নাটকটির নাম 'বেণীসংহার' নয় 'শত্রুসংহার' নাটক। ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' অবলম্বনে হরলাল রায় উক্ত নাটকটি রচনা করেছিলেন। (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৬১ ও ২১১; হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' (১৫২৫-১৯৪৫), পৃঃ ২৮ এবং অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর বক্তৃতা, 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকা, আষাঢ়, ১৩৩৭)। অবশ্য বিনোদিনী তাঁর স্মৃতিকথায় ('আমার কথা', ১ম খণ্ড, সন ১৩২০ সাল, পৃঃ ২৫) লিখে গেছেন, 'ইঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় বেণীসংহার পুস্তকে একটি ছোট পার্ট দিলেন, সেটি দ্রৌপদীর একটি সখীর পার্ট, অতি অল্প কথা।' কিন্তু বিনোদিনীর স্মৃতিচারণাতেও বহু তথ্যগত ভুলভ্রান্তি আছে। সেগুলি সংশোধিত হয়েছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত বিনোদিনীর 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা' পুস্তকে (সুবর্ণরেখা সংস্করণ, ১৩৭৬ সাল)।

কালীশবাবু লিখেছেন, 'বিনোদিনীর মঞ্চজীবন মাত্র ৮ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।' এটিও ভুল। বিনোদিনীর মঞ্চজীবন ১২ বছর (ডিসেম্বর ১৮৭৪—ডিসেম্বর ১৮৮৬) ব্যাপ্ত ছিল।

(২) ১৪ বর্ষ ৩২ সংখ্যায় (২০এ ডিসেম্বর, ১৯৭৪) প্রকাশিত 'শতবর্ষের স্মরণীয়' শীর্ষক রচনায় কালীশবাবু লিখেছেন, 'চণ্ড নাটকে বুদ্ধদেব চরিত্রে গিরিশ-পুত্র দানীবাবুর সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ। এটি ভুল। গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড' নাটকের 'বুদ্ধদেব' বলে কোনও চরিত্র নেই। হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারে দানীবাবু গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড' নাটকে লাক্ষরাণার মধ্যম রাজকুমার (সংসারত্যাগী) 'রঘুদেবজী'-র ভূমিকায় অভিনয় করেন।

কিন্তু 'রঘুদেবজী'-র ভূমিকা নিয়েই দানীবাবু সাধারণ রঙ্গালয়ে (হাতিবাগানের স্টার) সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ করেন নি। সাধারণ রঙ্গালয়ে (হাতিবাগানের স্টার) তাঁর সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে বিষ্ণুর চরিত্রে। আর সৌখীন অভিনেতারূপে তাঁর সর্বপ্রথম অবতরণ শ্যামপুকুরে 'লক্ষ্মণবর্জন'-এ 'লক্ষ্মণ' চরিত্রে (দ্রঃ 'দানীবাবুর জীবনকথা' : নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩২০, পৃঃ ১৮১-১৮৩)।

(৩) ১৪ বর্ষ ৩৪ সংখ্যায় (৩রা জানুয়ারি, ১৯৭৫ প্রকাশিত 'কবি রাজকৃষ্ণ রায় ও বীণা থিয়েটার' নামক নিবন্ধে কালীশবাবু লিখেছেন, '১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৫ মার্চ রাজকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু হয়।...১১ই মার্চ তাঁর মৃত্যুতে স্টার থিয়েটার বন্ধ রাখা হয়।'

কালীশবাবু এ তথ্য সংগ্রহ করেছেন হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' (১৫২৫—১৯৪৫) গ্রন্থের ৪৮ পৃষ্ঠা থেকে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যুতারিখ উল্লেখ করেছেন (২৮ ফাল্গুন, ১৩০০ সাল) ১১ই মার্চ, ১৮৯৪ (দ্রঃ 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২০৭ ও 'রাজকৃষ্ণ রায়', পৃঃ ২৬)। এব্যাপারে ব্রজেন্দ্রনাথ 'অনুসন্ধান' পাক্ষিক পত্র থেকে প্রমাণও দাখিল করেছেন। আমরা ব্রজেনবাবুর তথ্য অভ্রান্ত মনে করি।

কালীশবাবু লিখেছেন, '৩৮, মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ রায়ের স্বত্বাধিকারিত্বে বীণা থিয়েটার গড়ে ওঠে।' কালীশবাবুর অবগতির জন্যে জানাই ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের নাম ছিল মেছুয়াবাজার রোড। এসম্পর্কে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৯এ ডিসেম্বর তারিখের 'অনুসন্ধান' পত্রে বলা আছে : 'রাজকৃষ্ণবাবুর ঠিকানা ৩৮নং মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা।' নিষ্ঠাবান গবেষকদের 'মেছুয়া বাজার রোড'-ই লেখা উচিত।

এর পরের ছত্রেই কালীশবাবু লিখেছেন, '১০ই ডিসেম্বর চন্দ্রহাস নাটক মঞ্চস্থ করেন এবং শরৎ কর্মকার চরিত্রে নিজে অভিনয় করেন।' তাহলে এর নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই যে, রাজকৃষ্ণ রায় 'চন্দ্রহাস' নাটকের অন্তর্গত 'শরৎ কর্মকার' নামক একটি চরিত্রে নিজে অভিনয় করেছিলেন। কালীশবাবু গবেষণা করে হয়তো এই তথ্য বিস্মৃতির পৃষ্ঠা থেকে সর্বপ্রথম নতুন করে উদ্ধার করলেন কিন্তু আমরা যতদূর জানি তা হচ্ছে এই যে, 'চন্দ্রহাস' নাটকের নামভূমিকায় শরৎ কর্মকার নামক জনৈক অভিনেতা অভিনয় করেছিলেন।

কালীশবাবু জানিয়েছেন, রাজকৃষ্ণ রায় 'তাঁর মীরাবাঈ নাটক মঞ্চস্থ করেন ৪ আগস্ট ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে।' কালীশবাবু এই ভুল তথ্যটি সংগ্রহ করেছেন হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠা থেকে। তাঁর অবগতির জন্যে জানাই, মীরাবাঈ মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে। এসম্পর্কে প্রমাণও উপস্থাপিত করছি। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩০এ জুলাই তারিখের 'অনুসন্ধান' পাক্ষিক পত্র লিখিছেন : 'বীণা রঙ্গভূমি। কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের নূতন নাটক 'মীরাবাঈ' উক্ত রঙ্গালয়ে আজকাল বড়ই দক্ষতার সহিত অভিনীত হইতেছে।'

কালীশবাবু বলেছেন, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ রায় স্টার থিয়েটারে যোগদান করেন। এ তথ্যও ভুল। রাজকৃষ্ণ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারে যোগদান করেন। (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাজকৃষ্ণ রায়', পৃঃ ২৬)।

(৪) ১৪ বর্ষ ৩৬ সংখ্যায় (১৭ই জানুয়ারি, ১৯৭৫) প্রকাশিত 'নীরদাসুন্দরী' শীর্ষক রচনায় কালীশবাবু লিখেছেন, 'গিরিশচন্দ্রের দোললীলা ক্লাসিক থিয়েটারে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ মঞ্চস্থ হয়।'

কালীশবাবুর এ তথ্যও ভুল। গিরিশচন্দ্রের 'দোললীলা' নয়, অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'দোললীলা' উক্ত তারিখে ক্লাসিক মঞ্চস্থ হয়েছিল। এসম্পর্কেও প্রমাণ উপস্থাপিত করছি। 'রমাপতি দত্ত' ছদ্মনামে শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিত 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' (১৩৪৮) নামক বিখ্যাত গ্রন্থের ১৮১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে : '১৮৯৮ সালের দোলের দিনে, মঙ্গলবার, ৮ই মার্চ, অমরেন্দ্রনাথ বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া, তাঁহার নূতন গীতিনাট্য দোললীলার প্রথম অভিনয় করেন।' শ্রদ্ধেয় হরীন্দ্রনাথ স্বর্গত অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। এব্যাপারে আমরা তাঁর প্রদত্ত তথ্য অভ্রান্ত মনে করি। আর একটি কথা। 'দোললীলা'র

সখীর দলে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের নামগুলি (নীরদাসুন্দরী সহ) হরীন্দ্রবাবুর লেখা থেকেই কালীশবাবু সংগ্রহ করলেন কিন্তু দোললীলার রচয়িতারূপে অমরেন্দ্র নাথের নামটি উল্লেখ না করে গিরিশচন্দ্রের নাম উল্লেখ করলেন কী উদ্দেশ্যে?

শংকর ভট্টাচার্য
মোহনপুর, নদীয়া

মাঠের নায়ক

গত ১০-১২-৭৬এর সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকায় শ্রীবিশ্বদেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীগোপাল বসুর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে লিখেছেন বাংলার শ্রীঅম্বর রায় শুধু শ্রীলংকার বিরুদ্ধে বেসরকারী ক্রিকেট টেস্ট খেলেছেন। এতে কিছু ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। শ্রীরায় ১৯৬৯।৭০ সালে ভারত সফরকারী নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে নাগপুর ও হায়দরাবাদ এবং দিল্লী এবং কলকাতায় খেলেন। অতএব তিনি যে সরকারী টেস্ট খেলেন নি এটা উদ্দেশ্যভাবে ভুল। তাছাড়া আরও দুজন বাঙালী খেলোয়াড় ভারতের হয়ে সরকারী এবং বেসরকারী টেস্ট খেলেছেন। তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয় নি। তাঁরা হলেন বিখ্যাত খেলোয়াড় শ্রীকার্তিক বসু ও শ্রী এ সেনগুপ্ত। শ্রীবসু খেলেন ১৯৩৫ সালে লর্ড টেনিসন দলের বিরুদ্ধে একটি বেসরকারী টেস্ট এবং শ্রীসেনগুপ্ত খেলেন ১৯৫৮।৫৯ সালে ভারত সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে। তাছাড়া শ্রীসেনগুপ্তের নির্বাচন নিয়ে সেই টেস্টে অধিনায়ক ... ও বোর্ডের কর্মকর্তাদের ... উঠেছিল।

[illegible]কুমার চট্টোপাধ্যায়,
চন্দননগর,
হুগলী।

বাংলা নাটক ও সাহিত্য প্রসঙ্গে

'অমৃতে' যুবক যুবতী বিভাগে 'বাংলা নাটক ও সাহিত্য' প্রসঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে সে প্রসঙ্গে কিছু বলবার অভিপ্রায় জাগল। আশা রাখি পল্লীগ্রামের একজন তরুণ হিসাবে আমার বক্তব্য 'অমৃতের' চিঠিপত্র বিভাগে স্থান পেয়ে উপকৃত হবে।

গত ৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে 'অমৃতে' শ্রীকার্তিক ঘোষ পত্রের চতুর্থ স্তবকে মন্তব্য করেছেন 'সেকস সম্পর্কে এত বেশী আলোচনা হচ্ছে যে অপরিণত কিশোর কিশোরীরা এর শিকার হচ্ছে। ফলে সমাজে অপরাধ করবার প্রবণতা বাড়ছে। এর জন্য দায়ী নিশ্চয়ই অপসংস্কৃতির ধারক-বাহক বিষ, শিল্পসাহিত্য।' মন্তব্যটি যথার্থ! প্রত্যেকটি যুবকের উচিত অশ্লীল সাহিত্যের বিরোধী হওয়া। কারণ অশ্লীল সাহিত্য যৌন অপরাধপ্রবণতা এবং অসুস্থ মানসিকতা সৃষ্টির সহায়তা করে। ... অপরাধপ্রবণতার অজুহাতে ... সাহিত্যকেই দায়ী করা ... [illegible]

অশ্লীল বা অপরাধজনক ব্যবহার শিখতে চাইলে সাহিত্যের বাইরে এমন অনেক পথ আছে যা তাদের শিখতে সাহায্য করে। এবং সেটাই বেশী ঘটে। এ সম্পর্কে কোন উদাহরণের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া সৎসাহিত্যও তো রয়েছে। কিন্তু কতজন তা পাঠ করে শরৎচন্দ্র হতে পেরেছে?

সাহিত্য সমাজ ও জীবনের দর্পণ। 'সেকস' নিয়ে অনেক ঘটনাই ঘটছে সমাজে। তাহলে সাহিত্যে কি তাকে ধরে রাখবার প্রয়োজন নেই? 'সেকস'কে অন্ধকারে রেখে দেয়া হবে? লেখক অমর দাশ মহাশয় এ বিষয়ে সঠিক কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে সমর্থ হননি। এ বিষয়ে জুঁই দেবীর বক্তব্য সঠিক 'সেকস থাকাটাই খারাপ নয়, তার প্রকাশ শিল্পসম্মত হওয়া চাই।' সমাজের বা জীবনের প্রত্যেকটা দিকই শিল্প-নিপুণতার সঙ্গে সাহিত্যে প্রতিফলিত হোক তাতে ক্ষতি নেই। যৌন উপন্যাস বা পত্রিকা এবং নাটককে সাহিত্য পর্যায়ের অন্তর্ভুক্তই করা চলে না।

'বাতায়ন' সম্পাদক কার্তিক ঘোষ পত্রের পঞ্চম স্তবকে নবীনের পাশে প্রবীণের লেখা প্রকাশের যে উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন তা যুক্তিসম্মত। দুঃখের বিষয় কলকাতা শহর থেকে যে বড় বড় পত্রিকা বেরোয়, তাতে কজন নবীনের দেখা মেলে? তারপর আছে 'গোষ্ঠীতন্ত্র'। গ্রাম থেকে যোগাযোগ করা খুবই শক্ত। তবুও এখন অমৃতের পাতায় দু'একজনের নতুন লেখকের দেখা মিলছে এটাই আশ্বাস।

চঞ্চল সিংহরায়
[illegible], (পুরুলিয়া)

বেকার ভাতা

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী যুবক যুবতী বিভাগে প্রকাশিত 'বেকার ভাতা' শীর্ষক সময়োপযোগী আলোচনাটি পড়ে ভাল লাগল। বর্তমানে সমাজ-ব্যবস্থা যেভাবে চলছে তাতে বেকার ভাতা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তার আগে যদি আমরা বেকার সমস্যার সমাধানের কথা ভাবি তাহলে বেকার ভাতার প্রশ্নই ওঠে না। ফোঁড়ায় মলম দিলে তাকে দাবিয়ে রাখা যায় কিন্তু তার দূষিত রক্ত শোধিত হয় না। কুটিরশিল্প কৃষি ও কারিগরী বিদ্যা দিয়ে শুধু বেকার সমস্যার সমাধান করা যায় না সমাধানের পথ হিসেবেই প্রথমে আমাদের ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে বেকার সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণ সম্ভব হবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী দেশ। কিন্তু সেখানকার এক সাপ্তাহিক বুলেটিনে (লেবরস ইকনমিক রিভিউ) প্রকাশ সেখানে চার কোটিরও বেশী লোকের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ... নেই। সমৃদ্ধশালী ... পত্রিকায় ... সেটা ... এবং ... তান্ত্রিক

দেশে এমনি হতে বাধ্য। সমাজতান্ত্রিক পথেই দেশে বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমাদেরও সেই পথে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সেটা সময়সাপেক্ষ। তার আগে ফোঁড়ায় মলমের মত কিছু বেকার ভাতা দিলে হয়তো আমরা এই সময়ের ব্যবধানে পঙ্গু হয়ে পড়ব না।

কার্তিক দত্ত
সম্পাদক 'বিশালাক্ষী'
খোলাপোতা, ২৪ পরগণা।

বিবাহ ব্যবস্থা

গত ২৪শে জানুয়ারী 'যুবক-যুবতী' বিভাগে 'বিবাহ ব্যবস্থা' প্রসঙ্গে সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে সাধারণ যুবক হিসাবে কিছু বলবার ইচ্ছা জাগল, জানি না এ অভিমত অমৃত' চিঠিপত্র বিভাগে স্থান পাবে কিনা। কারণ কলকাতার কাগজে গ্রাম বাংলার মতামতকে খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় না দেখছি।

আলোচনাটি 'বিবাহ ব্যবস্থা' প্রসঙ্গে। গ্রাম বাংলার অগণিত নিম্ন শ্রেণী বা সম্প্রদায় রয়েছে। কিন্তু বিবাহ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তাদের কোন বক্তব্য উক্ত আলোচনায় স্থান পেল না দেখে মর্মাহত হলাম। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে এরাও একাত্ম হতে পারছে কিনা বোঝা গেল না। এছাড়াও যুবক-যুবতীর অন্যান্য আলোচনাতেও প্রায়ই এরা উপেক্ষিত। যৌতুক বা পণপ্রথা আলোচনাও আরও বিস্তারিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। আর এই যৌতুক ভয়কে উপেক্ষা করে অসবর্ণ বা স্বেচ্ছা বিবাহের প্রয়োজন এ কথা খোলাখুলি ভাবে কেউই বললেন না। বা শ্রীঅমর দাশ মহাশয়ও এ বিষয়ে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করলেন না। এরপর গ্রাম বাংলায় বিবাহে সেটা প্রকট তাহল জাত বিচার। সে প্রসঙ্গে কিছু আলোচনার প্রয়োজন ছিল। সঠিক স্বজাত না হলে আজও বিবাহ হয় না। স্বেচ্ছায় বিবাহ করলে সহ্য করতে হয় অশ্লীল আলোচনা। কিন্তু জাতি প্রথার সামাজিক গণ্ডিকে কি ভাঙবার প্রয়োজন নেই? বিবাহ ব্যবস্থায় কালো মেয়ের সমস্যা সত্যই হৃদয়বিদারক। কেউ স্বেচ্ছায় বিবাহ করতে রাজী হয় না। টাকার জোরে তাকে পার করতে হয়। কিন্তু যাদের টাকা নেই? যুব সমাজের এ বিষয়ে এখুনি এগিয়ে আসা দরকার। এ বিষয়ে বাবলু [illegible]'র মন্তব্য গ্রহণযোগ্য। প্রসঙ্গটিতে আরও আলোচনা প্রয়োজন ছিল। লাভ কাম সোশ্যাল ম্যারেজ এর সমর্থক তনুশ্রী [illegible]কে ধন্যবাদ। চাপিয়ে দেওয়া বিবাহ প্রথা থেকে স্ব-নির্বাচিত স্বামী সোশ্যাল ভাবেই বিয়ের পিঁড়িতে বসুক না। গ্রামাঞ্চলে রক্ষণশীল পিতা-মাতারা অন্তত এবার একটু প্রগতিশীল মনোভাব গ্রহণ করুন। আজকের প্রচন্ড সংকটময় মুহূর্তে পুরনো সে সব সংস্কার প্রথা অলৌকিকতাকে আঁকড়ে আছি, তার অবসান ঘটুক এবার।

বঙ্কু সিংহরায় হুগলী

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু একটু ভুল বলেছি কারণ বরফ অনেক আগেই ভেঙেছিল নানা বিশ্রম্ভালাপের প্রসাদে—কতরকম আলোচনা যোগ বাবা ছন্দ এ ও তা! ফলে তাঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপের সম্বন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্বচ্ছ সহজিয়া। এ আমার কল্পনা নয়। তাঁর একটি দরদী চিঠি উদ্ধৃত করি আমার বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করতে। তিনি লিখেছিলেন:

"I was a little taken aback by the first letter for my remarks about X had been perfectly casual and I attached little importance to them when I wrote them. I would certainly not have written them if I had thought they were of a kind to cause trouble to you. In scribbling them I had no idea of imposing my views about X on you — I had no idea of writing as a Guru to a disciple or laying down the law, it was rather as a friend to a friend expressing my ideas and discussing them with a perfect ease and confidence. Both the Mother and myself have a natural tendency to speak or write to you in that way, expressing the idea that comes without measuring of terms or any arrière — pensée because we feel close to your psychic being always and that is the relation we have quite naturally with you".

ভাবার্থ: আমি অমুকের সম্বন্ধে তোমাকে লিখেছিলাম এমনিই—একবারও মনে হয়নি তার কোনো গুরুত্ব আছে। আমি ভাবলেই লিখতাম না আমার মন্তব্য যদি ভাবতাম তার ফলে তুমি কিছু মনে করবে। আমি অমুকের সম্বন্ধে আমার মত লিখেছিলাম এ ভেবে নয় যে তোমাকে সে-মত মেনে নিতে করতেই হবে। আমি তোমাকে লিখেছিলাম সেভাবেও নয় যেভাবে গুরু লেখে শিষ্যকে—লিখেছিলাম যেমন বন্ধু লেখে বন্ধুকে—তোমার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে। শ্রীমা ও আমি এইভাবেই তোমাকে লিখি বা তোমার সঙ্গে আলাপ করে থাকি—যা মনে আসে তাই লিখে যাই একটানা না ভেবেচিন্তে—কারণ তোমার চৈত্যপুরুষের সঙ্গে বরাবর আমরা এমনি সামীপ্যই বোধ করে থাকি।*

কার সম্বন্ধে তিনি কী লিখেছিলেন আমার মনে পড়ছে না। তার একটা কারণ অনেকের সম্বন্ধেই তিনি আমাকে এইভাবে লিখতেন আমার প্রশ্নের বা মন্তব্যের উত্তরে—নিজে গুরুর বেদীতে চড়ে আমাকে তলে বসিয়ে তাঁর কথামৃত পান করতে বাধ্য করেননি কোনোদিনই *de haut bas*. তাঁর এহেন করুণাকেও আমি ভুল বুঝতাম সময়ে সময়ে—ভাবতে আজো আমার মন ব্যথিয়ে ওঠে।

তবে মনে আছে আমি তাঁর জবাবদিহি চেয়েছি তিনি এমন কথা মনে করলে আমি ভারি দুঃখ পাব—এ অনুতাপ প্রকাশ করেছিলাম। ক্ষমার অবতার তিনি ক্ষমাও করেছিলেন যেমন বারবারই করতেন ব্যথা দিয়ে ব্যথা বুঝে।

এবার ফিরে আসি তাঁর রসালাপের প্রসঙ্গে।

আমার স্নানাগারের উপরের কাঠে আমার মাথা ঠুকে গিয়ে বেশ কুলের মতন ফুলে উঠেছিল কেশহীন কপাল। ঠাট্টা করে তাঁকে লিখলাম বামন চন্দুলালের কীর্তি। গুরুদেব হেসে লিখলেন: 'তোমার মাথা ঠুকে গেছে! আহা ...কেবল এইটুকু বলা চলে তার ওকালতি করতে যে সে মানবক হওয়ার দরুণ ভুলে যায় যে আশ্রমে এমন সাধকও আছেন যাঁদের শীর্ষ উচ্চতর ও স্কন্ধ প্রশস্ততর।'

("You struck your head against the upper sill of the door our engineer Chandulal fixed in your room? . May I suggest, however, if it is any consolation to you, that our Lilliputian engineer perhaps measured things by his own head, forgetting that there were in the Ashram higher heads and broader shoulders?").

কখনো কখনো তিনি হাসির মধ্যে দিয়ে গম্ভীরকে ফুটিয়ে তুলতেন। নীরদ একদা তাঁকে নানাভাবে চ্যালেঞ্জ করত তাঁর শ্লেষ উপভোগ করতে। (সেসব পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।) একবার আমি তাঁকে লিখলাম যে যদিও আমি স্বভাবে বিষম রাজসিক তবু আমি সত্যিই চাই কর্মবিমুখ হয়ে ধ্যান-ধারণা করে সবাসর সমাধিতে ডুবে বুঁদ হয়ে থাকতে। আমি শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত উদাহরণ দিলাম: তিনি বলতেন কোনো মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ী তার কাজ-কর্ম কমিয়ে দেয় উত্তরোত্তর—যতই তার প্রসবের দিন কাছে আসে।

উত্তরে তিনি লিখলেন: তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের নজির দিয়ে আবার আমাকে কাবু করতে চাইছ। কিন্তু আমি কেমন যেন ধাঁধায় পড়ে যাই তাঁর আর একটি উপমায় যে শূন্য কলসী পুকুরে ডুবোলে ভক ভক করে কিন্তু পূর্ণ হওয়ামাত্রই সে নীরব হয়ে যায়। কিন্তু তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে যখন অক্লান্ত আলাপ করতেন তখন কি তাঁর জ্ঞানের পূর্ণ কলসী অর্ধপূর্ণ হত না বলবে—সে কলসী আদৌ পূর্ণ ছিল না? কথাবার্তা কওয়াও তো কর্মের মধ্যেই পড়ে।

তুমি লোকহিতসাধনা কর্মসাধনা...... ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছ। এসব আদৌ আমার যোগের অঙ্গ নয়। আমি কোনোদিনই মনে করি নি যে কংগ্রেসের নানা কর্মভঙ্গি বা বাঙালী বিদায় বা চমৎকার কবিতা লেখার ফলে আমরা রাতারাতি বৈকুণ্ঠে বা ব্রহ্মনির্বাণে পৌঁছে যাব। তা যদি হত তাহলে রমেশ দত্ত বা বদগেয়ান সিদ্ধি লাভ করে আমাদের ডাক দিতেন ঊর্ধ্বলোক থেকে। কর্মের মাধ্যমে বা নিছক

---

*আমি তাঁর মূল চিঠির ভাবার্থ দিলাম। এ চিঠিটি ছাপা হয়েছে আমার SRI AUROBINDO CAME TO ME-র দশম অধ্যায়ে—তৃতীয় সংস্করণে। সব চিঠির আদ্যন্ত উদ্ধৃত করার স্থানাভাব।

কর্মে বন্ধুলাভ হয় না—কর্মের পিছনে ভাগবতী ইচ্ছার সমর্থনই কর্মযোগের প্রাণের কথা।

'পরিশেষে কেন তুমি মনে করলে যে আমি ধ্যান বা ভক্তির বিরোধী? আমার একটুও আপত্তি নেই যদি তুমি উভয়কেই বা দুয়ের একটিকে বরণ করে ভগবদুন্মুখী হতে চাও। আমার কথা শুধু এই যে কর্মকে বরখাস্ত করতে চাওয়া ভুল বা তাঁদের এজাহারকে বরখাস্ত করা অন্যায় যাঁরা কর্মযোগের মধ্যে দিয়েই আপ্তকাম হয়েছেন—জনকপ্রমুখ অনেকেই কর্মের মাধ্যমেই 'সংসিদ্ধি' লাভ করেছেন গীতায় বলেনি কি?

তাই আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি ধরে নিলে যে কর্মসম্বন্ধে আলোচনায় আমি রাগ করেছি? আমি নীরদকে নিশানা করে তীরন্দাজি করেছিলাম বিরক্তি থেকে নয় শুধু একটু মজাদার কথা বলতে তথা কর্তব্যবোধে। সে-উদভ্রান্ত তার্কিক যখন তার সীমিত অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ সূত্রের পাঠ দিতে দুঃসাহসী হয়ে আমার অবিনশ্বর দর্শনকে খারিজ করতে চাইলে তখন আমি এক লাফে তার টুঁটি চেপে ধরে উপাদেয় হত্যাকাণ্ডের প্রবর্তন না করে করি কী বলো?'

এইভাবে গুরুদেব তাঁর চটুল ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্যে দিয়েও কখনো কখনো গুরু-

গম্ভীর আলোচনা করে আমাদের নিরস্ত করতেন আমাদের স্তরে নেমে। কিন্তু মুস্কিল এই যে ইংরাজী রসিকতার বাংলা তর্জমা অত্যন্ত কঠিন। তবু কিছু নমুনা দিতে চাই আগে থেকে কবুল করে যে আমার অনুবাদের অনেক খুঁৎ আছে—যাঁরা তাঁর রসিকতার পূর্ণ স্বাদ পেতে চান তাঁরা যেন আমার বা নীরদের স্মৃতি-চারণ পড়েন—তাঁর অবিমিশ্র রসধারা পান করতে মূল ইংরাজীতে।

এবার পালা আসুক নির্ভেজাল রসিকতার।

একদা আমি এক গর্দভবিলাপ কাহিনী শুনে একটি কথিকা লিখি হাল্কা ছড়ার পদ্যে:

শ্রীঅরবিন্দেষু,

গাধা এক চলল ভেসে নিরুদ্দেশ
উদ্দাম বন্যাধারায়
কেঁদে সে ডুকরে ওঠে: 'ঢেউরা ছোটে
এ-ধরা ডুবল যে হায়!'
ওঠে এক জ্ঞানী বলে: 'গাধা তবে কী
যে কুযুক্তি ফাঁদে:
ডুবলে তুই এ-ধরায় কী আসে যায়?
রবে সব অপ্রমাদে।'
তার্কিক গাধা ভনে: 'ভাই কেমনে
একে কুযুক্তি মানি?
যদি আমিই ডুবে যাই বাকি সবাই
কেমনে টিঁকবে জানি?'
জ্ঞানী কয়: 'আমি জানি তাই বাখানি
ভরসার তত্ত্ব তোরে।'
গাধা গায়: 'এ-তত্ত্বে হায় কী আসে
যায়—যদি যায় গাধাই মরে?'
গুরুদেব! ধমকিয়ো না। আর দিও না
উড়িয়ে হেসে আমার কথা।
হল মন তর্ক বিলাপ শুনে খারাপ
প্রাণে জাগে গভীর ব্যথা।
জিতল কে এখানে—বলো? মানে
গর্দভের না জ্ঞানীর বিচার?
পড়েছি কী ফ্যাসাদেই—ভাবতে গেলেই
আলোয় ছেয়ে আসে আঁধার।
জ্ঞানী কয়: 'দূর বেল্লিক। দিই তোকে
ধিক গাধা গাধাই জ্ঞানীই জ্ঞানী।
গাধা নাম রটল রে যার—জ্ঞান কোথা
তার? অবোধ বলেই তাকে মানি।'
ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বুদ্ধি চড়াৎ
করে উঠে পড়ল যা—তা
বলব? (কই গোপনেই) প্রশ্নটা এই—
জ্ঞানীও কী হয় তর্কে গাধা?

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন এক গম্ভীর পত্র (অনুবাদ দিই আগে):

দিলীপেষু,

তোমার ঐ জ্ঞানী গাধা (বিষম জ্ঞানী
নয় তবু) যে প্রশ্নলেঠা
তুলেছে হায় সে-ফ্যাসাদ নয়ক
বড় কেও কেটা।
শুধু তার হয়ে উকিল বলব: মোটেই
নয় বেচারীর বুদ্ধি মোটা
কেমনে কাজ গুছোতে হয়—জানে
সে তবু খোঁটা
তাকে দেয় কেন মানুষ 'গাধা' বলে?
নিজেই বোকা বলে বেটা
যেহেতু মেরেও হাসিল করতে নারে
চায় সে যেটা।
আসলে দুই কারণে কিন্তু গাধার হল
এমন রীতি-আচার:
এক সে সাচ্চা রসিক—চায় খুঁচোতে—
[illegible] গাধার
দ্বিপদী জন্তুটি এই ঘোর [illegible]
[illegible]
দ্বিতীয় মানুষ তাকে [illegible] বলে
[illegible]
সে [illegible] পায় না [illegible] কোনো
[illegible]
ভেবে: 'এ-কাজ করা কি উচিত
[illegible]?'
অপিচ গাধা [illegible]
[illegible]
যখন [illegible] সে [illegible]
তার [illegible]—
করে সে প্রচার [illegible] গভীর [illegible]
বিশ্ব ও মনুষ্য পরে।
কেন না নেইক আমার ভিতর
সংশয় এ অন্তরে।—

যে-হাসি আমরা হাসি বলতে
'গাধা' ব্যঙ্গ ডাকে
গাধাও বলতে 'মানুষ' সেই হাসি
রোজ হেসে থাকে।
অথ এই মৌলিক সুগম্ভীর গবেষণাৎ
দেখছ—প্রসঙ্গত—
যে তোমার এই বিচারে গাধা-প্রেমে
নেই কো তেমন ভয় অন্ততঃ।

জানি এ-ছড়ার অনুবাদে শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী ব্যঙ্গের চমৎকারিত্ব ফোটে নি ফুটতে পারে না। তবু কিছুটা আমেজ মিলবে আশা করি বলেই এ-পাঠ দিলাম। যাঁরা তাঁর ব্যঙ্গের পূর্ণ স্বাদ চান তাঁদের জন্যে উদ্ধৃত করছি তাঁর মূল পদ্যটি:

Dilip.

..Your wise but not otherwise ass has put a question that cannot be answered in two lines. Let me say, however, in defence of the much-maligned ass that he is a very clever and practical animal and the malignant imputation of stupidity to him shows only human stupidity at its worst. It is because the ass does not do what man wants him to do, even under blows, that he is taxed with stupidity. But really the ass behaves like that first because he has a sense of humour and likes to provoke the two-legged beast [illegible] "[illegible]" [illegible] "[illegible]" [illegible]. These deep and [illegible] considerations are [illegible] [illegible] meant to [illegible] that your balancing between a wise man and the wise ass is not so alarming a symptom after all.

Sri Aurobindo
(29.1.34)

(ক্রমশঃ)
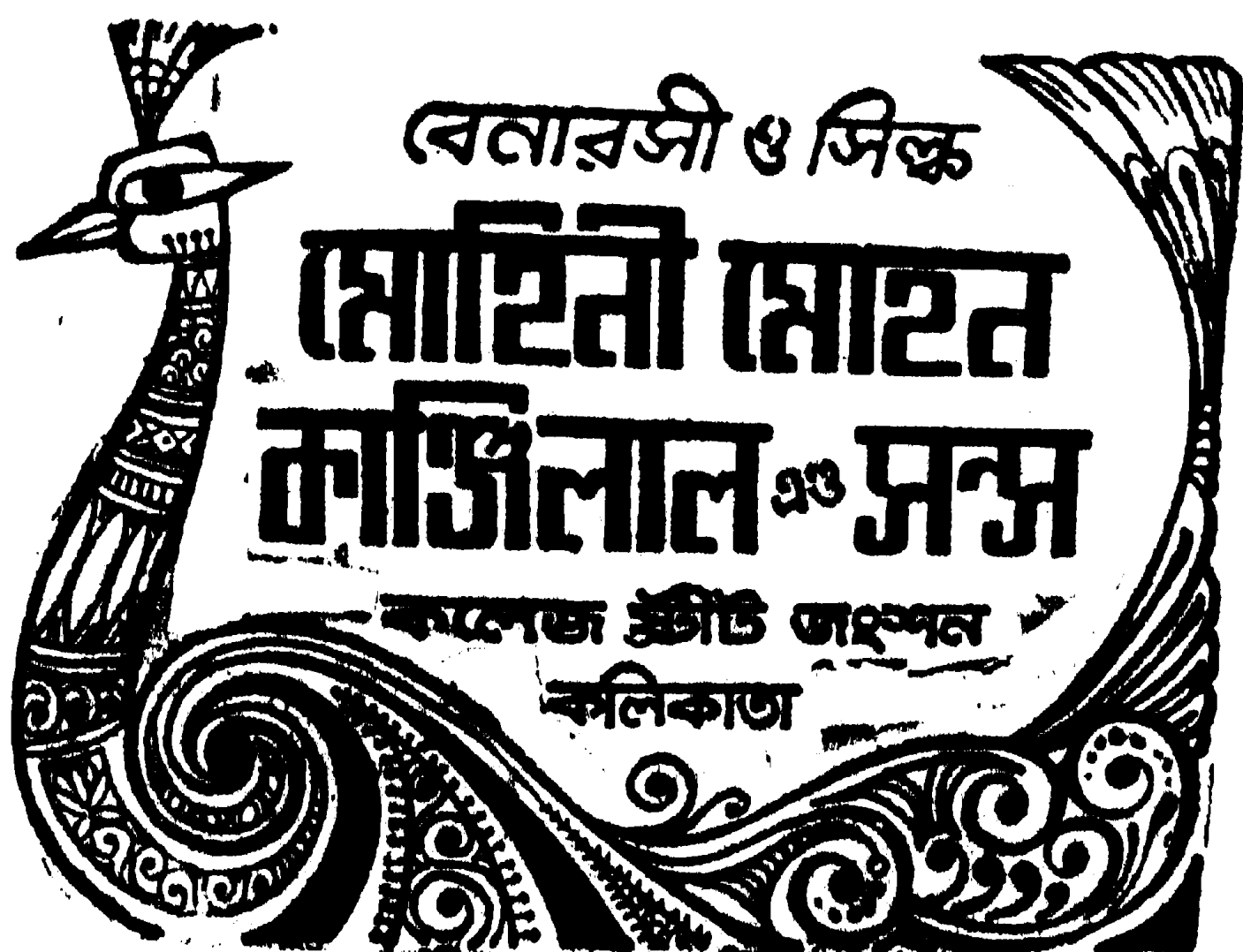
কলকাতার টেলিভিশন নিয়ে

কথা হচ্ছিল কয়েকজন উপযুক্ত পাত্রের মায়েদের সঙ্গে যাঁরা নিজেদের ছেলেদের বিদ্যা, বুদ্ধি, উপার্জন ও চেহারা নিয়ে রীতিমত গর্বের অধিকারিণী, ছেলেদের বিয়ের কথা আলোচনা করতে করতে তাঁরা কেউ কেউ বললেন, 'ছেলের বিয়েতে আমাদের দাবী কিছু নেই মেয়ের বাবা-মা খুশি-মনে যতটুকু পারবেন দেবেন।' নিঃসন্দেহে এঁরা উদার মনের পরিচয় দিচ্ছেন। তাছাড়া কিছুমাত্র চাহিদা নেই এমন পরিবারে মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারলে বিশেষ করে সে পাত্র যদি যথেষ্ট উপযুক্ত হয় তাহলে পিতা-মাতার এবং মেয়ের সৌভাগ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই আলোচনারই মহিলাদের মধ্যে দু' একজনের অবশ্য চাহিদা বলতে তেমন কিছু নেই তবুও অনেক ইতস্ততঃ করে বললেন 'ছেলের শ্বশুর শাশুড়ীকে বলবো আসবাবপত্র, গয়না, বাসনকোসন ওসব না দিলেও চলবে তার বদলে একটা টেলিভিশন দেবেন।' সঙ্গে সঙ্গে অন্যসব বর্ষীয়সী মহিলারাও সেটা সমর্থন করলেন। তাঁরা বললেন, 'ওসব জিনিসের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই তবুও আমরা যা রেখে যাবো তাতেই ওদের মোটামুটি চলে যাবে—শুধু মেয়েদের বাবার কাছে একটা টেলিভিশন আবদার করলে মন্দ হয় না।' বলা বাহুল্য উপস্থিত মহিলারা সকলেই মোটামুটি অবস্থাপন্ন। নিজেদের একটা টেলিভিশন কেনার সামর্থ্য এঁদের অনেকেরই আছে—তবুও বোধহয় উপহার হিসেবে একটা টেলিভিশন তাঁদের অনেকেরই কাম্য। এতদিন শুনে বা দেখে এসেছি পাত্রের বাবা বা পাত্র নিজে অনেক সময়েই ক্রিকেট খেলার টিকিট-এর জন্য পাত্রীর বাবা বা দাদার কাছে বায়না করেন। এবার দেখছি টেলিভিশন-এর জন্য আবদার করবেন আমাদের গৃহিণীরা—বর্ষীয়সীরাও বাদ যাবেন না।

গত বছর ডিসেম্বর মাস অর্থাৎ টেস্ট ক্রিকেট খেলার শুরু থেকেই কলকাতার টেলিভিশনের বলতে গেলে গোড়াপত্তন। এখন যে কোনরকম খেলা সম্বন্ধে কৌতূহল মেয়েমহলেও যথেষ্ট বেড়ে গেছে! সেখানে টিকিটের জন্য লড়াই করার চেয়ে ঘরে বসে শান্তিতে টি-ভিতে খেলা দেখার বাসনাই ভাল যদি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মত ব্যবস্থা।

১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে বোম্বেতে টেলিভিশন-এ বিভিন্ন প্রোগ্রাম দেখানো শুরু হয়। দিল্লী এবং পাঞ্জাবে তারও আগে টেলিভিশন সেন্টার চালু হয়েছে। টেলিভিশনের সবচেয়ে সুবিধা তা একসঙ্গে সংবাদ ও ছবি দুটোকেই পরিবেশন করতে পারে। সমাজের ওপর টেলিভিশনের প্রভাব খুব বেশী। রেডিওতে সমাজের উপকারের জন্য যেসব বাণী বারবার প্রচার করা হয় টেলিভিশনে সেসব বাণী ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রচার করে তা আরও কার্যকরী করা সম্ভব। এই প্রচারকার্যের সাহায্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গে টেলিভিশনের গুরুত্বও কম নয়। তার ওপর সৌখীন জিনিস হিসেবে তো তার মূল্য অবস্থাপন্নদের ঘরে ঘরে আগেই শোভা পাবে। শুধু এখন স্থায়ী সেন্টারের অপেক্ষা।

দিল্লী ও বোম্বে এ দুটো স্থানেই যখন টেলিভিশনের আগমন পাড়ায় পাড়ায় একটা কি দুটো করে হতে থাকে তখন যে সমস্ত বাড়ীতে টি-ভি সেট প্রথম প্রথম বসানো হয়, সেসব বাড়ীর কর্তাগিন্নীদের অনেকের অদ্ভুত এক সেন্টিমেন্ট গড়ে উঠেছিল যে প্রতিবেশীরা টেলিভিশন দেখতে ওঁদের বাড়ীতে আসবেন অন্যত্র বেড়াতে না গিয়ে। এই নিয়ে আমার এক দিল্লীর আত্মীয় আজ থেকে কয়েক বছর আগে চিঠিতে কলকাতার কয়েকজনকে আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করেছিলেন। দীর্ঘদিনের প্রবাসজীবনে আমাদের না যাওয়াতে তার যতটা ক্ষোভ তার চেয়ে বেশী দুঃখ তিনি পাবেন যদি আমরা একবার কষ্ট করে তার ওখানে টেলিভিশন দেখতে না যাই। সেজন্য তিনি নিজের খরচেই দিল্লী ঘুরিয়ে দেবার পুরো দায়িত্ব বহন করতে রাজি। আর্থিক দিক দিয়ে দিল্লী ঘুরিয়ে দেখাবার ক্ষমতা তার আছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। দিল্লী, বোম্বেতে এখন অনেক ঘরে ঘরেই টেলিভিশন শোভা পাচ্ছে যখন তখন কলকাতায় টেলিভিশন আসামাত্র কিছু কিছু বাড়ীতে তা তাড়াতাড়িই প্রবেশ করবে। এরই মধ্যে অনেক বাড়ীতে ঠিক করা হয়েছে টেলিভিশন কোথায় বসানো হবে। এ ব্যাপারে বাড়ীর গৃহিণীদের দায়িত্ব ও চিন্তাই সবচেয়ে বেশী কারণ বাড়ীর গৃহিণীর উপস্থিতিতেই পাড়া-প্রতিবেশীদের অনেকেই টেলিভিশনে প্রোগ্রাম দেখতে আসবেন। কলকাতায় স্থায়ী টি-ভি সেন্টার চালু হলে হয়তো দিল্লী বা বোম্বের আত্মীয়দের দেখার নিমন্ত্রণ করতে হবে না। কিন্তু গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চলের আত্মীয়স্বজনদের তাঁদের নিমন্ত্রণ মাঝে-মধ্যে করতেই হবে। সে নিমন্ত্রণ যে সব সময় স্বেচ্ছায় হবে একথা বলা চলে না। আবার এমন ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটবে যাঁদের আমরা টি-ভি দেখাতে চাই তাঁদের বদলে যারা উপস্থিত হবেন তারা বাঞ্ছিতের পরিবর্তে অবাঞ্ছিতই হয়তো—সেখানে গৃহিণীদের অবস্থা বোঝাবার আর দরকার নেই। যেমন দিল্লী বা বোম্বেতে হামেশাই দেখা যায় টি-ভি দেখতে মালী বা ধোপার ছেলেমেয়েরা এসে হাজির হয়। সেটা মধ্যবিত্ত বা অবস্থাপন্ন গৃহিণীদের অভিপ্রেত নয়। তাতে নিজেদের ছেলেমেয়েদের ঠিক নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। এখানে অবশ্য শ্রেণী বৈষম্যের কোন প্রশ্ন নেই, কারণ শিক্ষাদীক্ষার অভাবে মালী বা ধোপার ছেলেরা যেভাবে মানুষ হয়, সেভাবে শিক্ষিত পরিবারে ছেলেমেয়েরা মানুষ হোক সেটা কাম্য নয়। অবশ্য এই টি-ভি দেখতে এসে যদি মালী, ধোপা বা রাস্তার ছেলেদের স্বভাব ও রুচির কিছু কিছু পরিবর্তন হয়, সেটা অশুভের পরিবর্তে শুভই হবে।

বাইরের পাঁচ-দশ বা তারও বেশী লোকজন যখন টি-ভি দেখতে জমায়েত হবেন টি-ভিকে কোথায় বসানো হবে সেটা নিয়ে চিন্তা কম নয়। এরই মধ্যে কলকাতার কেউ কেউ ভাবতে শুরু করছেন টি-ভি কোথায় সেট করা হবে—ড্রয়িংরুম অথবা বড় বেডরুমেরই একধারে। এ এক বিরাট সমস্যা। বাসস্থানের সমস্যা কলকাতায়ও কম নয়। অথচ যেখানে সেখানে বাইরের লোকেদের ঠাঁই দেওয়া সম্ভবও নয় উচিতও নয়। টেলিভিশন নির্বাচিত জায়গায় বসাবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মাথায় এখন ভাবনাও রয়েছে তখন আসবাবপত্রের কিছু কিছু রদবদলও করা দরকার হয়ে পড়বে।

পশ্চিমবঙ্গে টি-ভি চালু করা এখনই দরকার কি দরকার নেই, সে নিয়ে এরই মধ্যে অনেক কথা উঠেছে। কেউ বলছেন, পশ্চিমবঙ্গের মতো দরিদ্র রাজ্যে যেখানে ভাল করে খাওয়া-পড়ার সংস্থান করে অনেকেই উঠতে পারছেন না সেখানে টি-ভির কি দরকার? এত আলোচনা সত্ত্বেও কলকাতায় টি-ভি স্থায়ী সেন্টার চালু হতে বোধহয় আর বেশী সময় লাগবে না। টি-ভি চালু হলেই শিশুদের কাছে তা অত্যন্ত প্রিয় জিনিস হয়ে পড়বে কারণ টি-ভিতে তারা বাড়ীতে বসে নানারকম অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পাবে। তদুপরি নানারকম অনুষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন সিনেমা দেখারও তাদের সুযোগ ঘটবে। বাড়ীর বড়রা কখনই নিজেরা বাড়ীতে বসে যা দেখবেন ছোটদের তা দেখা থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন না। যেমন দিল্লী বোম্বেতে হিন্দী সিনেমা যখন দেখানো হয় সেখানে ভিলেনকে দেখতে ছোটরা বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। সেখানে অনেক বাবা-মাই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন যে তাদের বাচ্চাদের কাছে সিনেমার মারামারিটা বেশ উপভোগ্য। সে সঙ্গে মাঝে মধ্যে সেই উপভোগ্য জিনিসকে সিনেমার কায়দায় নিজেরা বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাইছে। সাহিত্য, সিনেমা সমাজেরই দর্পণ। সেই সিনেমাকে সব সময়ই প্রত্যক্ষ করার সুযোগ টি-ভিতে আমাদের ছোটরা পাবে। সুতরাং টি-ভিতে যেসব অনুষ্ঠান দেখানো হবে বিশেষ করে চলচ্চিত্র—তা যেন শিক্ষামূলক হয়। বই-এ পড়া, কানে শোনার চেয়ে যা প্রত্যক্ষ করা যায়, তার মূল্য অনেক বেশী।

অঞ্জলি চৌধুরী

রান্না করে দেখুন

বিচিত্র খাবার

কমলালেবুর স্যালাড :

উপকরণ : ১টি ছোট ফুল কপি, চারটি কমলালেবুর শাঁস, নুন, গোলমরিচ, একটু পেঁয়াজের রস।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। ফুল কপির ফুলগুলো হাত দিয়ে খুব ছোট ছোট করে ভেঙে নিন। ২। কমলালেবুর কোয়ার শাঁস বার করে রাখুন। ৩। ফুল কপি, লেবুর শাঁস, পেঁয়াজের রস, নুন ও গোলমরিচ এক সঙ্গে মিশিয়ে রাখুন। রুটির সঙ্গে খেতে ভালই লাগবে।

মটরশুঁটির চপ : উপকরণ : ছাড়ানো মটরশুঁটি ২৫০ গ্রাম আলু ৫০০ গ্রাম ২ বড় চামচ ময়দা বা বেসন গরম মশলার গুঁড়ো ১ চা চামচ লংকার গুঁড়ো ১ চা চামচ আদা বাটা ২ চা চামচ ১ চা চামচ জিরে ভাজার গুঁড়ো একটি পাতি লেবুর রস। ভাজবার জন্যে তেল বা ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। মটরশুঁটি শিলে থেঁতো করে নিন—মিহি করে পিষবেন না। ২। আলু সেদ্ধ করে ময়দা বা বেসন দিয়ে চটকে রাখুন। আদা বাটা আধ চা চামচ লংকার গুঁড়ো আধ চা চামচ জিরে ভাজা গুঁড়ো আধ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো ও নুন মেশান। ৩। থেঁতো করা মটরশুঁটি বেশী তেলে ভেজে ঝুরঝুরে করে ভেজে নিন। গরম মশলা লংকার গুঁড়ো জিরে ভাজা ও লেবুর রস মেশান। ৪। আলু লেচি কেটে তার মধ্যে পুর দিয়ে চপের আকারে গড়ে নিন। ৫। বেশী আঁচে ছাঁকা তেলে ভাজুন।

মটরশুঁটির বরফি : উপকরণ : ৫০০ গ্রাম ছাড়ানো মটরশুঁটি, ২৫০ গ্রাম শুকনো খোয়া ক্ষীর, ৪০০ গ্রাম চিনি, ২ টেবিল চামচ কুচানো কাজুবাদাম, একটু গোলাপ জল, একটু ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। মটরশুঁটি সেদ্ধ করে শিলে মিহি করে পিষে নিন। কড়াইয়ে ঘি দিয়ে মটরশুঁটি বাটা ছেড়ে দিন ও কম আঁচে ভাজতে থাকুন। ২। একটু ভাজা ভাজা হলে খোয়া ক্ষীর মিশিয়ে নাড়াচাড়া করুন। ৩। চিনি মেশান। চিনি ভালভাবে মিশে গেলে নামিয়ে একটু গোলাপ জল দিন। ৪। কানা উঁচু থালায় ঘি মাখিয়ে মিশ্রণটি ছড়িয়ে দিন। ওপর থেকে কুচোনো কাজুবাদাম দিয়ে দিন। ৫। গরম থাকতে থাকতেই ছুরি দিয়ে চৌকো চৌকো দাগ দিয়ে দিন। ঠাণ্ডা হলে বরফির আকারে কেটে নিন।

মটর পনীর : উপকরণ : ২৫০ গ্রাম জল ঝরানো ছানা, ১ কেজি মটরশুঁটি, ১টি বড় পেঁয়াজ, ১টি বড় টোম্যাটো, ১ টুকরো আদা, ½ কাপ কুচোনো ধনেপাতা, ১ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো, ১ চা চামচ লংকার গুঁড়ো, ½ চা চামচ হলুদ, ১ চা চামচ নুন, ২ টেবিল চামচ ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। ছানা টুকরো টুকরো কেটে ভেজে নিন। ২। পেঁয়াজ ও আদা বেটে নিন এবং কড়াইয়ে ঘি দিয়ে বাটা মশলা টোম্যাটোর টুকরো নুন হলুদ ও লংকার গুঁড়ো দিয়ে ভেজে নিন। ৩। চার কাপ জল দিন। মটরশুঁটি ছাড়িয়ে রাখুন। জল ফুটলে এতে মটরশুঁটি দিয়ে দিন। ৪। মটরশুঁটি সেদ্ধ হয়ে গেলে ছানার টুকরো দিয়ে দিন। ৫। নামিয়ে ধনেপাতার কুচি ও গরম মশলা ছড়িয়ে রুটি বা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

স্পিন্যাচ কাটলেট :

উপকরণ : ১ কেজি পালং শাক. ছোলার ডাল ২৫০ গ্রাম, পাঁউরুটির স্লাইস দুটি, একটি ডিম, কাঁচা লংকা তিনটি পেঁয়াজ দুটি আদা এক টুকরো গরম মশলা এক চা চামচ, রসুন দু কোয়া, নুন আন্দাজ মতো বিস্কুটের গুঁড়ো, ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। পালং শাক কুচি কুচি করে কেটে জল না দিয়ে শুধু নুন দিয়ে সেদ্ধ করে বেটে নিন। ২। ছোলার ডাল ভাল করে ধুয়ে সেদ্ধ করে নিয়ে পিষে নিন। ৩। পেঁয়াজ কুচিয়ে রাখুন ও আদা রসুন বাটা ও আন্দাজমতো নুন দিন। ৪। কড়াইয়ে ঘি গরম করে পেঁয়াজ আদা রসুন বাটা ও আন্দাজমতো নুন দিন ৫। পালং শাক ও ডাল বাটা কড়াইয়ে দিয়ে নাড়তে থাকুন এবং কাঁচা লংকার কুচি মেশান। ৬। মশলার সঙ্গে বেশ মিশে গেলে নামিয়ে নিন ও ঠান্ডা করে কাটলেটের আকারে গড়ে নিন। প্রতিটি কাটলেট ডিমের গোলায় ডুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে বাদামী করে ভেজে নিন। চাকা চাকা করে কোটা পেঁয়াজের সঙ্গে [illegible] সঙ্গে পরিবেশন করুন।

মিক্সড ডাল :

উপকরণ : ছোলা, মুগ এবং কলাইয়ের ডাল ১ কাপ করে, ২টি কুচোনো পেঁয়াজ, ১ চা চামচ লাল লংকার গুঁড়ো, এক টুকরো আদা, এক চা চামচ জিরে, ½ চা চামচ হলুদ, ২ টেবিল চামচ ঘি, ধনে পাতা কুচানো।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। চার কাপ জল ও হলুদ দিয়ে ডাল সেদ্ধ করুন। সেদ্ধ হয়ে গেলে নুন দিন। ২। ঘিয়ে কুচানো পেঁয়াজ ও আদার কুচি নিন। জিরে ও লংকার গুঁড়ো দিন। ৩। সেদ্ধ ডাল ওই ঘি দিয়ে সাঁতলে নিয়ে ধনে পাতার কুচি দিয়ে পরিবেশন করুন।

মাছের কবাব :

উপকরণ : মাছ ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ৩টি, আদা এক টুকরো রসুন ৪ কোয়া, গরম মশলা ২ চা চামচ, ধনে পাতা ও পুদিনা পাতা এক আঁটি করে, লংকার গুঁড়ো ১ চা চামচ, কাঁচা লংকা ৪টি, বেসন ২ টেবিল চামচ, কিসমিস, একটি লেবুর রস, ২টি ডিম, বিস্কুটের গুঁড়ো, ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : যে কোন মাছ যাতে কাঁটা কম আছে তাই দিয়ে মাছের কবাব তৈরী করা যায়। ১। মাছ সেদ্ধ করে কাঁটা বেছে শিলে পিষে নিন। ২। দুটি পেঁয়াজ, আদা ও রসুন পিষে নিন, ধনে ও পুদিনা পাতা কুচিয়ে নিন। একটি পেঁয়াজ, কাঁচা লংকা মিহি করে কুচিয়ে রাখবেন। আন্দাজ মতো নুন দিয়ে এই কুচোনো মশলা ঘি দিয়ে ভেজে নিন। একটা লেবুর রস গেলে দেবেন। ৩। ঘিয়ে সমস্ত পেষা ও সমস্ত গুঁড়ো মশলা (গরম মশলা বাদে) দিয়ে পিষে নেওয়া মাছ ভাজুন। জল শুকিয়ে গেলে গরম মশলা, ধনে ও পুদিনা পাতার কুচি দিয়ে নামিয়ে নিন। বেসন মেশান। ৪। চপের আকারে গড়ে নিয়ে মধ্যে একটু খানি করে ভাজা পেঁয়াজের পুর দিন। ৫। দুটি ডিম ফেটিয়ে নিন। ডিমের গোলায় এই চপ বা কবাব ডুবিয়ে নিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে খুব গরম ঘিয়ে বাদামী করে ভাজুন।

সাধনা মুখোপাধ্যায়

রূপসীর খাদ্য

রূপচর্চা করতে হলে বা শরীর সুন্দর সুঠাম রাখতে হলে এতোদিন যা যা ব্যবহার করতে বলেছি বা যেসব ব্যায়াম সম্বন্ধে আলোচনা করেছি সেগুলিই সব নয়। এর সংগে যদি সমান যত্নের সংগে খাদ্য তালিকা সম্বন্ধে সচেতন হই বা ঠিক মতন খাদ্য খাই তাহলে আরোও ভাল হয়, সুন্দর হয়। আজকের দিনে কথায় বলে জলেও ভেজাল। এহেন অবস্থায় প্রতিটি সময় খাওয়ার ব্যাপারে একটু লক্ষ্য রাখা দরকার। ভগবানদত্ত সৌন্দর্য ও ধীরে ধীরে ম্লান হতে দেখা গেছে কিম্বা কুশ্রী হতে দেখা গেছে—শুধু মাত্র খাদ্যাভ্যাসের জন্য। খুব বেশী মশলা ও তেল ঘি খেয়ে (বিশেষ করে ভেজাল) পেটের অবস্থা ভাল থাকে না। লিভারের গণ্ডগোল হতে দেখা যায়। ফলে অম্বল, পেট জ্বালা ইত্যাদি নানা রকমের অসুখ হয়, আর এসব অসুখের ছায়া মুখে চোখে ফুটে ওঠে। দেহের ত্বকে সাদা দাগ হয় চোখের কোণে কালি পড়ে গাল বসে যায়—এবং শেষ পর্যন্ত মুখের ওপর একটা অদ্ভুত কালি পড়ে, যার ফলে মুখের সব লাবণ্য সব জৌলুস নষ্ট হয়ে যায়।

এছাড়া অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাওয়ার দরুন বহু রূপসীর রূপ নষ্ট হতে দেখা গেছে। এজন্য আমার মতে খাদ্য সম্বন্ধেও আমাদের একটা আলোচনা দরকার। শরীরের ভিতরের ভাল মন্দের ওপর শরীরের বাইরের দিককার রীতিমত যোগ যখন আছে তখন সেই সম্বন্ধে যত্ন নিলে ক্ষতি কি? বিশেষ বিশেষ খাদ্যের কারণে রং ফরসা হয় ও রক্ত চলাচল ভাল হওয়ায় এবং রক্ত পরিষ্কার হওয়ায় চেহারায় জৌলুস আসে এবং যৌবন বাঁধা পড়ে থাকে। এবারে সেই সব খাদ্য নিয়ে আলোচনা করব। প্রকৃতির সংগে খাদ্য আর তার সংগে রূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এটা নিশ্চয়ই মানবেন যে ছোট বয়েস থেকে খাওয়ার তালিকার ওপরই বাচ্চাদের চেহারা ও স্বাস্থ্য প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। বাচ্চাদের হাড় শক্ত ও মজবুত করার জন্য চিনি খাওয়াতে হয়, রক্ত পরিষ্কার রাখার জন্য অর্থাৎ রং পরিষ্কার ও চামড়া মসৃণ রাখার জন্য মধু, ফলের রস, কডলিভার তেল ও অলিভ তেল খাওয়ান হয়ে থাকে। এমনও দেখা গেছে যে, যে রং নিয়ে শিশু জন্মেছে পরিচর্যা ও যত্নের ফলে বিশেষ করে নিয়মিত ও প্রয়োজনীয় খাদ্য তাকে খাওয়ানোর ফলে তার চেহারার ও রং-এর অপূর্ব পরিবর্তন হয়েছে। বড়দের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য।

খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করার সময় মনে রাখতে হবে যে, খাদ্যের মধ্যে ক্যালোরি থাকতে হবে, পুষ্টি থাকতে হবে অথচ অতিরিক্ত করে শরীরের ক্ষতি না করে। বেশী মোটাও যেমন ভাল না, তেমনি বেশী রোগাও ভাল না। ঠিক ঠিক সুন্দর সুঠাম চেহারাই সবচেয়ে দরকার। তার জন্য চাই সুষম খাদ্য।

অনেক ভুল ধারণার জন্য আজকাল বহু মহিলা রোগা হতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয়, অসুস্থতার জন্য চেহারায় মলিনতা আসে, আর সুন্দরের বদলে খারাপ দেখতে হয়ে যায়। সাধারণ ধারণা, রাতে কম খেতে হয়। মোটা হলেই খাওয়া কমাতে হয়, পাউরুটি ভাতের বদলে বা আটার রুটির বদলে খাওয়া চলে। এগুলি কিন্তু ঠিক ধারণা নয়। প্রথমত, বেশী রাতে সাধারণত খাওয়াই উচিত নয়, অর্থাৎ ১০।১১ টার পর। রাত্রের খাওয়া ৭।৮টার মধ্যে সেরে ফেলা উচিত। এবং বেশ পেট ভরেই খাওয়া উচিত। কারণ এর পরের খাওয়ার সময় অনেক দেরীতে আসে। তাছাড়া এই খাদ্য শরীরের পুষ্টি যোগায়। তারপর শোয়ার আগে অর্থাৎ রাত দশটা সাড়ে দশটার সময়—এক কাপ গরম দুধ অথবা হরলিকস খেয়ে শোয়া ভাল।

ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে এক গেলাস ঠান্ডা জল খাওয়া খুবই দরকার। সারা রাত্রের কাজের পর পেটের ভেতরের যন্ত্রগুলি পরিশ্রান্ত থাকে ও লিভার শুকিয়ে থাকে। তাই প্রথমেই ঠান্ডা এক গেলাস জল খেয়ে নেওয়া খুবই ভাল। এরপর বেশির ভাগ মহিলার অভ্যাস আছে চা খাওয়ার। সেই চা যদি একটু হেরফের করে খান তাহলে ভাল ফল হয়। চায়ের পাতলা লিকারে পাতিলেবুর রস ও সামান্য চিনি দিয়ে খেলে উপকারই হয়। এরপর যদি সম্ভব হয় বা উপায় থাকে তাহলে যে কোন ফলের রস এক গেলাস একটু জল মিশিয়ে খেলে খুব ভাল। এতে রং পরিষ্কার হবেই। আখরোট, কাজু, পেস্তা-বাদাম বাটা ইত্যাদিও রং ফর্সা করার জন্য সাহায্য করে। এগুলি বিকেলের দিকে বা দুপুরেও খাওয়া চলে। দুপুরের খাওয়ার সময় সাধারণত আমরা ভাত (বাঙালীরা) ও অবাঙালীরা রুটি খাই ডাল তরকারী মাছ মাংস ইত্যাদি সহযোগে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি নজর রেখে আমাদের খাদ্য তালিকা কেমন হওয়া উচিত।

এটা সবাই বোঝেন ও জানেন যে, অতিরিক্ত মশলা, তেল, ঘি বিশেষ করে আজকের ভেজালের দিনে না খাওয়াই সবচেয়ে ভাল। তাহলে খাব কি? খাদ্য সুস্বাদু হওয়া তো চাই। এ প্রশ্ন জাগে ঠিকই। তবে একটা কথা, জিবের স্বাদের জন্য শরীর নষ্ট করা বা রূপের হানি ঘটান বুদ্ধির কাজ বলে মনে হয় না। সবই খাব অথচ ঠিক মতন ব্যবস্থা করে। সবচেয়ে প্রথম কথা যারা মোটা অর্থাৎ যাদের দেহ চর্বিবহুল, তাদের ভাত বা রুটি না খাওয়াই সব চেয়ে ভাল। তবে রূপের ক্ষেত্রে একটা কথা আছে—শীতকালে ভাত না খেলে চলে, কিন্তু গরমের দেশে গ্রীষ্মকালে অন্তত এক হাতা ভাত দিনে একবার খাওয়া উচিত—না হলে চেহারার নরম ভাব নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে বাঙ্গালী-রমণীরতার রুক্ষতা আসে। তবে হ্যাঁ, যদি ভাতের বদলে এই একই কারণে কিছু খেতে হয়, তাহলে ফলের রস। সাধারণ বাড়ীতে আজকের দিনে অত ফলের রস খাওয়া সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা। তবে যদি দিনে তিন-চারবার ফলের রস এক এক গ্লাস করে খাওয়া যায়—তার উপকারের তুলনা হয় না।

ডালের জলে লেবু, কারীপাতা, গোল-মরিচের গুঁড়ো, একটু নুন ও কাঁচালঙ্কা টমেটো চাক চাক করে কেটে মিশিয়ে খেলেও ভাল। ডালে প্রোটিনও পাওয়া যায়। আর এর সংগে স্বাদও তৈরী হচ্ছে। এছাড়া দুপুরে আসল খাওয়ার সময় একটা স্যালাড তৈরী করে খেলেও ভাল। এই স্যালাড দু-বেলা খাওয়া যায়। বা বলতে পারেন খেলেই ভাল। স্যালাড তৈরীর কতকগুলি নমুনা দেবো, যা খেলে উপকার হবে, পেটও ভরবে আর সেই সঙ্গে খেতেও ভাল লাগবে। শশা টমেটো কড়াইশুটি সেদ্ধ গাজর লেটুস পাতা, ধনেপাতা, লেবুর রস ও গোলমরিচ ছড়িয়ে খাওয়াটা তো সাধারণ ও সহজে যা সবাই খেয়ে থাকে।

আর এক রকমের স্যালাড হোল—পালং শাক বড় বড় টুকরো করে সেদ্ধ করে তাকে পরিষ্কার শিলে বেটে নিতে হবে এবং তাতে পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, আদা কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি ইত্যাদি মিশিয়ে তার সংগে একটু টক দই, গোলমরিচ, নুন ইত্যাদি মিশিয়ে নিয়ে সামান্য ভাল ঘি অথবা মাখনে বেটে নিয়ে খেতে হবে। এটা রীতিমত খেতে ভাল ও উপকারী। এইভাবে প্রতিটি খাদ্য সাজিয়ে নিতে হবে—মুখের ও রূপের প্রয়োজন অনুযায়ী।

বর্ণবর্ণিনী

পুনশ্চ

॥ মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ও ব্রহ্মবিদ্যা ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বোম্বাইবাসিগণের নিকট হইতে কোনরূপ সহানুভূতি ও সহায়তা পাইবেন না বুঝিতে পারিয়া কর্ণেল অলকট তাঁহাদের ভারতবর্ষে আগমনের উদ্দেশ্য শিশিরকুমারের নিকট প্রকাশ করেন। শিশিরকুমার ও কর্ণেল অলকটের মধ্যে এসম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিলাম—

কর্ণেল—যোগাভ্যাস দ্বারাই জগতে মহাত্মারা অলৌকিক শক্তিলাভ করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মধ্যেই অধিক সংখ্যক মহাত্মা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মাদাম ব্লাভাৎস্কি যোগসিদ্ধা রমণী। মহাত্মাদিগের নির্দেশক্রমেই তিনি ভারতবর্ষে যোগবিদ্যা আলোচনার জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে এখানে আগমন করিয়াছেন।

শিশির—মহাত্মারা তাঁহাদের শক্তিপ্রভাবে এমন কোন আশ্চর্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন যাহা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব?

কর্ণেল—নিশ্চয়ই পারেন। তাঁহারা তাঁহাদের শরীর পরিত্যাগ করিয়া কিম্বা সশরীরেও ইচ্ছামত নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে পারেন। ইচ্ছামত তাঁহারা লোকচক্ষুর সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইতেও পারেন।

শিশির—চক্ষুতে না দেখিলে কিরূপে বিশ্বাস করিব? আচ্ছা আমাদের ভাগ্যে কি এই মহাত্মাদিগের দর্শন ঘটিতে পারে না?

কর্ণেল—আপনি যদি তাঁহাদের অনুগ্রহলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন তাহা হইলে আপনাকে তাঁহাদের কার্যে সহায়তা করিতে হইবে।

শিশির—তাঁহারা আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন বা নাই করুন আমি তাঁহাদের কার্যে যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তুত আছি, আমি এই কয়েকদিন বোম্বাইয়ে অবস্থান করিতেছি, কিন্তু মাদাম এপর্যন্ত আমাকে কোন অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করান নাই।

কর্ণেল—আপনি আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে মাদাম আপনাকে কিছুই দেখাইতে পারেন না।

শিশির—যদি তাহাই হয় তবে আমাকে আজই দীক্ষিত করুন।

শিশিরকুমারের অভিপ্রায় অনুসারে কর্ণেল অলকট তাঁহাকে মাদাম ব্লাভাৎস্কির নির্দেশমত দীক্ষিত করিলেন। কর্ণেল শিশিরকুমারকে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিয়া কয়েকটি সাঙ্কেতিক শব্দ শিখাইয়া দিলেন।

শিশিরকুমার দশ টাকা দিয়া থিওজফিক্যাল সোসাইটির সভ্য হইলেন। ভারতবর্ষে তিনিই বোধহয় এই সমিতির সর্বপ্রথম সদস্য।• শিশিরকুমার ক্রমে ক্রমে বোম্বাইয়ে মালাবারি, মুরারজি গোকুল দাস প্রভৃতি তাঁহার কয়েকজন বন্ধুকে মাদাম ব্লাভাৎস্কি ও কর্ণেল অলকটের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। তিনি বোম্বাই হইতে বঙ্গদেশে তাঁহার কতিপয় বন্ধুকে থিওজফিক্যাল সোসাইটি বা ব্রহ্মবিদ্যা সমিতির উন্নতিকল্পে অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কাসিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী, যশোরের অন্তর্গত চাঁচড়ার রাজা বরদাকান্ত রায় প্রভৃতি বহু সহৃদয় ধনী ব্যক্তি সমিতিকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

শিশিরকুমার ভারতে থিওজফিক্যাল সোসাইটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ যত্নে কার্য করিতে লাগিলেন কিন্তু মাদাম ব্লাভাৎস্কি তাঁহাকে কোন অদ্ভুত ঘটনা দেখাইলেন না। শিশিরকুমারের ধৈর্য যেন ক্রমশই হ্রাস পাইতে লাগিল। তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া কর্ণেল অলকট একদিন তাঁহার সমক্ষে মাদামকে বলিলেন হিন্দুদিগের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথমে সোসাইটিতে যোগদান করিয়াছেন এবং তাহার উন্নতিকল্পে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন তাঁহাকে এখনও অলৌকিক ব্যাপার না দেখাইয়া আপনি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

মাদাম নিরুত্তর তিনি যেন কর্ণেলের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। শিশিরকুমার ইহার পরেই কয়েকটি [illegible] প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঘটনা [illegible] নিম্নে বিবৃত হইল।

(২)

শিশিরকুমার যে বাংলোতে অবস্থান করিতেন একদা তাহার বারান্দায় শয়ন করিয়া তিনি কর্ণেল অলকটের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। কর্ণেল অনাবৃত দেহে শিশিরকুমারের ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। বাংলোটি রাস্তার উপরে, সম্মুখে একটি প্রাচীর থাকিলেও রাস্তা হইতে লোকে উভয়কেই দেখিতে পাইত। মাদাম ব্লাভাৎস্কি ঐ সময় নিজের বাংলোতে অবস্থান করিতেছিলেন। শিশিরকুমার ও কর্ণেলের মধ্যে কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময় মাদামের প্রিয় পরিচারক বাবুলাল আসিয়া একখণ্ড কাগজ কর্ণেলের হস্তে প্রদান করিল। কাগজখানা পাঠ করিয়া কর্ণেল ব্যস্তভাবে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় কোট পরিধান করিলেন। শিশিরকুমার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কর্ণেল মাদাম লিখিত কাগজখণ্ড তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। শিশিরকুমার তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা রহিয়াছে 'অনাবৃত দেহে সাধারণের সমক্ষে থাকিবার কারণ কি? আপনার কোট পরিধান করিয়া সভ্য হউন।'

শিশিরকুমার বিস্মিত হইলেন। তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া কর্ণেল বলিলেন 'এইরূপেই মাদাম তাঁহার অন্তরঙ্গ অনুচরগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকেন। শিশিরবাবু আপনি মাদামের নিকট গিয়া এই ঘটনার কথা অনুসন্ধান করিতে পারেন।'

মাদাম ব্লাভাৎস্কি ভিন্ন বাংলোতে অবস্থান করিতেছিলেন সেখান হইতে শিশিরকুমার ও কর্ণেলকে দর্শন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অরূপ অবস্থায় কর্ণেল যে অনাবৃত দেহে শয়ন করিয়াছিলেন তাহা তিনি কিরূপে জানিতে পারিলেন এই চিন্তায় শিশিরকুমার অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মাদাম ব্লাভাৎস্কির নিকট উপস্থিত হইয়া সেই কাগজখানি তাঁহাকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার এ আদেশের তাৎপর্য কি?'

(ক্রমশঃ)

ক্ষপণক

• শিশিরকুমার লিখিয়াছেন,

"I was, I belive, the first member of the Society". (Hindu Spiritual Magazine, Vol. 3, pt.2, P. 426).

উপন্যাস

শেষ বিচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বন্ধু বঙ্কিম দত্ত অমিয়কে নিজের হাতে করে মনের মত গড়েছেন। কিন্তু এক এক সময় তাঁর মনে হয় সেই অমিয়ও যেন কেমন পাল্টে যাচ্ছে। তাঁর কথায় প্রতিবাদ করে নিজের মতকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করে। যেন মনে হয় অমিয় তাঁকেই অস্বীকার করার চেষ্টা করছে ইদানীং। তাই নাতি রঞ্জুকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেন। তাকে নিজের মত করে গড়তে চান।

কিন্তু সেই রঞ্জুই দাদুর ব্যবহারে বিস্মিত। বাবা অমিয়র এক গরীব পুরনো বন্ধু তাদের বাড়িতে আসায় দাদুর অবহেলা এবং উষ্মা প্রকাশ দেখে তার খুব খারাপ লাগল। না হয় দাদু সারা জীবন জজিয়তি করেছে আর তার বাবা বার-এ্যাট-ল। আর ঐ লোকটা ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষ। রঞ্জুর এটা ভালো লাগে নি।

অথচ ঐ মানুষটাই তাকে বিপ্লবীদের কত গল্প শুনিয়েছে। শুনতে শুনতে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া যত দিন যাচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে রঞ্জু অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। বঙ্কিম দত্ত যা চান রঞ্জু তা নয়। তার চিন্তার জগৎ পরিবেশ সবই স্বতন্ত্র। আর যূথীদি এসে যেন ষোল বছরের রঞ্জুর মানসিক জগৎকে পর্যন্ত আমূল পাল্টে দিয়েছে। বিবাহিতা যূথীদি যেন তাকে কাঁচপোকার মত আকর্ষণ করছে। বঙ্কিমবাবুর মত কি অমিয়ই হতে পেরেছে? শুধু একটা ভয় তার বাবার মতই। তার বন্ধু রুদ্রেন্দু গরীব এবং বিপ্লবী মেজাজের বলে তাকে সেও এড়িয়ে চলতে চায় ভয় করে। সেই রুদ্রেন্দুর সঙ্গে হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল অমিয়র। প্রথমটা সে খুব বিব্রত হলেও পরে সামলে নিল এবং বেশ ঠাট্টার মেজাজেই ঠুকে ঠুকে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। যেন একটা মজার লোকের সঙ্গে কথা বলছে সে।

—উনিশ—

বাবাকে কিরকম দেখাচ্ছে? শরীরটা বেশ বড়সড় উঁচুলম্বা। এককালে চেহারার জেল্লা ছিল। টকটকে রং ছিল। এখন বুড়ো হতে চলেছে। রং গায়ের জোর সবই মজে এসেছে।

ব্যারিস্টার হয়ে প্র্যাকটিস তো আর করে না। কলেজে মাস্টারিও করল না। কাজেই অনেকটা বেকারের মতন চালচলন পোষাকআসাক। চুলের যত্ন নেই। দাড়ি কখনও কামাচ্ছে কখনও না। নিজের খেয়াল নিয়ে বুঁদ। তাহলেও মানুষটা খাওয়া-দাওয়া করে একটা নিয়মের মধ্যে আছে। তেমন একটা হাঁটাচলা গতরের পরিশ্রম নেই। বাবাকে দেখায় যেন দেওয়ালের হুকে ঝুলান একটা দামী জমকালো ওভারকোট। ব্যবহার নেই। অনেকদিন একভাবে ঝুলে ঝুলে ধোঁয়া কালি ও ঝুলোটুলো লেগে নতুন থেকে মলিনতর হয়ে যাচ্ছে।

উপমাটা মাথায় আসতে রঞ্জু মনে মনে হাসল।

আর ঐ যে বাবার সামনে দাঁড়ান বাবার ছেলেবেলার বন্ধু'

ঠিক যেন একটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি। শুকিয়ে শরীরে আর কিছু নেই। হয়তো চিরকালই ময়লা রং গায়ের। কিন্তু তারও যেন আর কিছু অবশিষ্ট থাকল না। জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেছে।

অথবা বাবাকে দেখাচ্ছে যেন একটা বুড়ো ভালুক। সার্কাসের ভালুক। তেজ-বির্য কিছু নেই। খেলাটেলা মোটেই দেখায় না। তা হলেও পোষাকী জন্তু হিসাবে সার্কাসওয়ালা ভালুকটাকে পুষছে। তিন-বেলা চারবেলা পেটভর খেতেটেতেও দেয়। সার্কাসওয়ালা কি বঙ্কিম দত্ত? কথাটা মনে হতে রঞ্জু খুক করে হেসে ফেলল। কিন্তু তক্ষুনি হাসিটা নিবে গেল আর একটা মানুষকে দেখে। তার খুব কষ্ট হচ্ছিল ঐ বিপ্লবী রুদ্রেন্দুর জন্য। যে কিনা একদিন আগুন জ্বালাত। এখন দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে? যেন গাড়ির হর্ণ শুনলেও ভীরু শেয়ালের মতন চমকে উঠবে। যেন রাস্তার ভিড় এড়িয়ে চলা লোকটার স্বভাব। কুণ্ঠিত বিপন্ন চাউনি, হাসলে মনে হয় একটা মরা মানুষ হাসছে। সেদিন এতো খারাপ লাগছিল কি বাবার বন্ধুকে দেখে রঞ্জু চিন্তা করল। দূরে কটা বস্তির ছেলে-মেয়ে শুধু খেলা করছিল। তা ছাড়া পার্কের ভেতরটা মোটামুটি নির্জন ছিল। কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে চায়ের দোকানের সামনেটাও একেবারে ফাঁকা ছিল। সেই ফাঁকার মধ্যে নির্জনতার ভিতর রুদ্রেন্দুর একটা শক্ত ব্যক্তিত্ব একটা তেজী মূর্তি মাঝে মাঝে ফুটে উঠতে দেখেছে রঞ্জু। আজ তার ছিটেফোঁটাও নেই। না থাকারই কথা। গড়িয়াহাটের এই সন্ধ্যার রাস্তায় চারদিকে ঝকমকে আলো, ভাল ভাল পোশাক পরা ফ্যাশানদুরস্ত সব মানুষের আনাগোনা চকচকে ঝকঝকে রকমারী গাড়ির ছুটোছুটি, এমন জায়গায় ঐ পোশাকে রুদ্রেন্দুকে কেমন গেঁয়ো বুনো দেখাচ্ছে, খাপছাড়া। তার ওপর উপোসী শরীর। বাবাকে যদি অলস মুটিয়ে যাওয়া সার্কাসের একটা ভালুকের মতন দেখায়, বাবার সামনে দাঁড়ান বাবার ঐ বন্ধুকে মনে হচ্ছে একটা ভিরু রোগা শেয়াল। যেন জঙ্গল থেকে কি করে মানুষের আস্তানায় ছিটকে এসে পড়েছে, ভয়েই বাঁচে না কে পিছন থেকে তাড়া করে। পালাতে পারলে বাঁচে চোখে মুখে একটা বিষম ত্রাস আর তাই ইতিউতি তাকানো। কি কথা হচ্ছে দুজনের কে জানে রঞ্জু চিন্তা করে।

জায়গাটা সে বেছে নিয়েছে ভাল। পরিবার পরিকল্পনার লাল ত্রিকোণ ছবি ঝুলছে একটা কিয়স্ক-এর গায়ে। তার পিছনে দাঁড়িয়ে কাঠবিড়ালের মতন ঘাড়টা উঁচু করে করে রঞ্জু ওপাশের দৃশ্যটা দেখছে। তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কাজেই এদিক থেকে সে বেশ নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্ত

হলেও তার ভিতরের উদ্বেগটা কমছে কি? খুব সম্ভব কাল যাইদি কেষ্টনগর চলে যাবে। রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। কদিন ওখানে থাকা হবে তার কিছু ঠিক নেই। যাইদি বলছে পনেরো দিনের আগে বড় কলকাতায় ফিরতে পারবে না। যাইদি তাকে ছাড়বে না। কলকাতায় ফিরে লাভ কি? রঞ্জুও চাইছে না চট করে এখানে আবার চলে আসে। সেই তো বুড়োর বকুনি খাওয়া। সারাক্ষণ শকুনের মতন চোখ জোগায়ে আশা বছরের একটা মানুষকে আগলে রাখবে। ভাবতেও কেমন লাগে! সে জন্য রঞ্জুর নিজেরও ইচ্ছে পনেরো দিন না টানা একমাস কেষ্টনগরে কাটিয়ে আসার। যদি এর মধ্যে রেজাল্ট বেরোয় কাগজে খবরটা বেরোবে। পুজোর ছুটি পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে রেজাল্ট বেরোবে না জানা কথা। যাক গে, সেসব তো কথা নয়, পনেরো দিন কি একমাস কলকাতায় থাকছে না সে—তার মানে অনেকদিন। একবার ওকে খবরটা দেওয়া দরকার। অবশ্য এই খবর চাপা থাকবে না। জেনে যাবে ও। টুটুলের মুখে শুনবে। না বললে। তা হলেও রঞ্জুর নিজের মুখে ওকে একবার বলে যাওয়া উচিত। না হলে ও ভীষণ মন খারাপ করবে। রাগ করবে খুব। আশ্চর্য, বাজে সারাদিনের মধ্যে একবার কথাটা মনে হয়নি কিন্তু রঞ্জুর। পরশু বিকেল থেকেই তো তার কেষ্টনগর যাবার

কথা হচ্ছে। পরশু বিকেল থেকে আজ বিকেল—আটচল্লিশ ঘন্টার বেশি হতে চলল।

ভেবে আজ দুপুরের পর খবরটা বলতে ওদের বাড়ির দিকে যাবে সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল। কিন্তু দুপুরে বাড়ি গিয়ে ভাত খেতে বসে দেখল টুটুল খাবার টেবিলে নেই। বাবাও নেই। কোথায় গেছে বাবা? যাইদি বলল টুটুলদের দলটাকে নিয়ে বাবা সেই বেলা দশটায় বোটানিক্যাল গার্ডেন বেড়াতে চলে গেছে। ব্যস হয়ে গেল মনে মনে সে বলল সন্ধ্যার আগে ওরা ফিরছে না, কাজেই সেই সন্ধ্যার আগে তার কেষ্টনগর যাবার খবরটা একজনকে সে জানাতে পারছে না। দারুণ অস্বস্তি বোধ করছিল রঞ্জু ভিতরে ভিতরে।

হ্যাঁ খুব চাপা জিনিস এটা।
পার্থ না সে সোমেন নয়!

পার্থর ব্যাপারটা তো রাস্তার মানুষও জেনে গেছে। এত হাউ-হাউ করে সে এমন সব ডেলিকেট জিনিস নিয়ে। কিন্তু করার কিছুই নেই। পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু মানুষ আছে। নিজেদের পেটের কথা বাইরের মানুষকে শুনিয়ে আনন্দ পায়। বিচ্ছিরি! রঞ্জু এই জিনিসটা খুব অপছন্দ করে।

ডোভার লেনের বন্দনা যার ডাক নাম পিংকু—ইঞ্জিনিয়ার মিত্র বাবুর মেয়ে পার্থর লাভার। এই খবরটা কে না জানে। স্কুলে রঞ্জুদের ক্লাসের বন্ধুরা সবাই জেনে গেছে। পার্থদের পাড়ার মানুষ জানে। রঞ্জুদের বাড়িতে টুটুল জানে। কাজেই টুটুলদের দলের আর পাঁচটা মেয়েও জানবে জানা কথা। আবার এদিকে পার্থকে চিঠি-ফিঠি লিখে অমিতের বোন টুবলিটা যা কাণ্ড আরম্ভ করেছে। এ খবরও রঞ্জুরা জেনে গেছে। পার্থই জানিয়েছে। অর্থাৎ নিজের এসব গোপন কথা অন্যদের কাছে বলে পার্থ বেশ যেন একটা বাহাদুরি নিতে চায়। তাদের বন্ধুদের মধ্যে এমন আর একজন হল সোমেন। সাউথ-এন্ড পার্কের মীরা—মীরা চ্যাটার্জি তার লাভার। কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতদিন যে রঞ্জুদের শুনিয়েছে সোমেন। মীরা লরেটোয় পড়ে। বাবা বিলেত-ফেরত ডাক্তার কাকা ওয়েস্ট বার্লিনের ইঞ্জিনিয়ার জেঠা জলপাইগুড়ি একটা চা বাগানের মালিক। অর্থাৎ মীরাদের সবাই বড়লোক। সবাই গাড়ি-বাড়ি ও ব্যাংক বোঝাই টাকা নিয়ে রাজা-মহারাজার মতন আছে। মীরার কথা বলতে গিয়ে এমন সব গল্প করে না সোমেন। রোগটা শোভনেরও আছে। পাম-এভিনিউর এক বিয়েতে গিয়েছিল শোভন কদিন আগে। ঐ বিয়েবাড়িতেই মালা নামের একটা মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয়। সম্পর্কে অবশ্য তার জেঠতুতো দাদার শালীর মেয়ে। সেন্ট মার্গারেটে পড়ে। দুজনের সম্পর্কটা এমন দাঁড়িয়েছে—

দুবেলা এ ওকে না দেখলে নাকি পাগল হবার অবস্থা। বাড়িতে মালবা কি দিয়ে ভাত খায় কি দিয়ে দাঁত মাজে কোন সিনেমা হলে ওরা সিনেমা দেখে—সব এসে শোভন বলবে। অবশ্য সকলের কাছে না। রঞ্জু পার্থ অমিত ও সোমেন—এখন পর্যন্ত তাদের ক্লাসের এই চার বন্ধুই শুধু শোভনের ফিয়াসীর খবরটা জানতে পেরেছে। আর কারো কাছে যেন শোভন বলে নি। না বলল আর কারো কাছে, চারজন তো ব্যাপারটা জেনে গেল। কাল ভাবছে রঞ্জু, এদিক থেকে সে যে কী ভয়ানক চাপা! অমিতের নিশ্চয় এখন পর্যন্ত কোনো গার্ল ফ্রেন্ড জোটে নি। না হলে তার গল্পের ঠেলায় লোকের ... খারাপ হয়ে যেত। রঞ্জুর যতটা অনু... যা চালিয়াৎ ছেলে অমিত। এবং রঞ্জু ... করে ওর বেশি চালচাল দেয় বলেই ... পর্যন্ত অমিতকে কোনো মেয়ে ... ভালবাসতে পারছে না। যাক গে, ... পরের ব্যাপার। অন্যদের ব্যাপার ... মোটেই মাথা ঘামাতে রাজী নয় সে ... রঞ্জু নিজেরটাই কেবল ভাবছে। ... গভীর গোপন তার এই জিনিস ... সত্যিকারের প্রেম 'ভালোবাসা' ইত্যা... তারা স্বীকার করবে রঞ্জুরটাই ... প্রেম। 'রীয়্যাল লাভ' বলতে ... এই জিনিসই বোঝায়। বন্ধুবান্ধব না, আত্মীয়-স্বজন না, পাড়াপ্রতিবেশী ... এরাই এমন কি চন্দ্র সূর্য আকাশ নক্ষত্র ... কীট-পতঙ্গও টের পাবে না জানতে পারবে না কত গোপনে ধীরে ধীরে একটি মন একটি হৃদয় আর একটি হৃদয় ও মনের কাছে ধরা দেয়। অবিকল ফুল ফোটার মতন এই জিনিস। যেন রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি পাপড়ি মেলে দেওয়া। রঞ্জু তাই মনে করে। গায়ে গায়ে লেগে আছে গাছের পাতারাও টের পাবে না একটা বোজা কলি কখন ফুটে উঠল কখন আর একটি ফুলের কাছে বুকের সবটা খুলেমেলে ধরল। কথা নেই শব্দ নেই: তারা দুজনও কি একজন আর একজনকে মুখ ফুটে বলেছে যে তোমাকে আমি ভালবাসি। নিঃশব্দে সব হচ্ছে! এ জিনিস মুখে বলার দরকারই পড়ে না। চোখের মধ্যে ফুটে ওঠে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দের সঙ্গে ধরা পড়ে। এদিক থেকে রঞ্জু যেমন চেয়েছিল, তেমন সে নিজে ও-ও তাই। ভীষণ রিজার্ভ মেয়ে। এই জনাই তো এত তাদের বাড়ি আসে-যায়, তবু ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পাচ্ছে না। কেউ না। টুটুল না বাবা না মা না। বুড়ো শকুন? ওই ব্যাটার কথা আলাদা। প্রেমট্রেম এই জীবনে করেও নি, বললেও এসব বুঝবে না। সেই চোখ সেই মন দক্ষিণ দত্তকে ঈশ্বর দেননি। কোনোদিন একটা বিয়ে করেছিল, একটা স্ত্রী এসেছিল ঘরে, ব্যস ঐ পর্যন্ত। তারপর গিন্নীর সঙ্গে স্রেফ বেফল-এর সম্পর্ক পাতিয়েছিল আর একটার পর একটা ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছিল। একটা

নয় পয়সারও যে হিসেব রাখে তেল নুন লংকার বাজার দর যার মুখস্ত, আর আদালতের চেয়ারে বসে সারাজীবন যে মোকদ্দমার রায় লিখে কাটাল তার মনে আর যাই থাক প্রেম বলতে কিছু ছিল না। বাবার কথা আলাদা। যদিও বাবার বিয়েটাও রঞ্জু যতটা জানে, কথাবার্তা চালিয়ে কনে দেখেশুনে, ইংরেজীতে যাকে 'নেগোশিয়েবল ম্যারেজ' বলে সেভাবেই হয়েছিল, তা হলেও বাবার মধ্যে একেবারে প্রেমবোধ ছিল না, বঙ্কিম দত্তর মতন সবটাই সেক্স ছিল, রঞ্জু বিশ্বাস করে না। তা হলে তার বাবা আরও প্র্যাকটিক্যাল হতেন ছুটিয়ে প্র্যাকটিস করতেন বা কলেজের প্রফেসারীটাও অন্তত করতেন। টাকা পয়সা রোজগারের দিকে মন থাকত ও বঙ্কিম দত্তর মতন স্ত্রীর সঙ্গে কেবল বিছানায় সম্পর্ক রেখে চলতেন বাবা। ফলে রঞ্জুর আরো কয়েকটি ভাই-বোন জন্মাত। রঞ্জুরা মোটে তিনজন। আর বঙ্কিম দত্ত আধ ডজন সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। মা-র মুখে শুনেছে সে। তার কাকা বাবা ও দুই পিসি ছাড়াও আরও দুটি সন্তান ছিল বুড়োর। একটা আঁতুড়েই মারা যায়। আর একটা নাকি দেড় বছরের সময় দেশের বাড়িতে পুকুরের জলে ডুবে শেষ হয়েছিল। কাজেই তুলনায় বাবার সংযমটা বেশ বোঝা যায়। তা ছাড়া মনটা তো কিছুটা শিল্পীর। তেল নুন লঙ্কার চিন্তাটা বাবার প্রায় নেই। হৃদয়ের ব্যাপার-ট্যাপারটা নিশ্চয়ই কিছুটা বোঝেন। শিল্পবোধের সঙ্গে হৃদয় মনের সম্পর্ক আছে। বিয়ের আগে বাবার হয়তো কোনো গার্ল-ফ্রেন্ড ছিল না। এই দেশে অত আগে এসবের রেওয়াজ থাকবে না জানা কথা। তা ছাড়া তখন বিপ্লব-টিপ্লবের দিকে ছেলেরা ঝুঁকত বেশি। মনটা ওদিকেই থাকত। রঞ্জু তো শুনেছে। তার বাবারও ঝোঁক ছিল ওদিকে। বঙ্কিম দত্তর জন্য শেষ পর্যন্ত ওই পথ ছেড়ে বাবাকে ঘরকুনো হতে হয়েছিল। যেটা রঞ্জুদের বেলায় ঘটতে পারেনি। তাদের বাবারা অন্য ধাতের মানুষ ছিলেন। কাজেই রঞ্জুর বাবার মধ্যে একটা নরম জিনিস, সফট কিছু আছে। মানুষটা যে সেন্টিমেন্টাল তাঁর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ছেলে-মেয়েদের প্রেম ভালবাসা যে তিনি বোঝেন অস্বীকার করার উপায় নেই। বুঝলে কি হবে, রঞ্জু আর ও—দুজনেই এত সাবধান এত চাপা এত হুঁশিয়ার হয়ে চলে যে বাবাও কোনোদিন টের পাচ্ছেন না জিনিসটা। তেমনি রঞ্জুর মা। মা-র আলাদা একটা সত্তা আছে বলে রঞ্জু মনে করে না। বাবার একটা ছায়া মাত্র। সুতরাং মা-ও নেই রকম। ভুলেও ভাবতে পারে না রঞ্জু আর টুটুলের ওই বন্ধু—কাঁকুলিয়া রোড থেকে যে-মেয়েটি এ বাড়ি আসছে তার মধ্যে একটা কিছু ঘটতে পারে। হয়তো কেউ যদি বলেও দেয় রঞ্জুর বাবা মা বিশ্বাস করবে না কথাটা। আকাশ থেকে পড়ার মতন চেহারা হবে দুজনের। বাবা মা-র কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। টুটুলটা কি। এ-যুগের মেয়ে। বিশেষ করে বালিগঞ্জের মতন জায়গায় বড় হচ্ছে। ওর ওই বয়স থেকেই মেয়েরা যেখানে আকছার বয়-ফ্রেন্ড জুটিয়ে নিচ্ছে—উঁহু, টুটুলও টের পায় না তার বন্ধু গোপা বাবা যাকে ফ্লেমিঙ্গো বলে ডাকে—বাবাকে সে ভজন গেয়ে শোনায় তার সঙ্গে রঞ্জুর কিছু আছে।

কাজেই রঞ্জু যেমনটি চেয়েছিল, গোপা তাই। স্মার্ট। তেমনি রিজার্ভড। এমন না হলে চলে! ওর তুলনায় পিঙ্কুকে মীরাকে মলিকে—অমিতের বোন টুম্পির কথা আলাদা অকথ্য বললেও ওর সঠিক সংজ্ঞা হয় না—বোকা তো বটেই হ্যাংলা, লোককে জানিয়ে শুনিয়ে ভালবাসাবাসি—ভাবতেও কেমন বোধ লাগে, উঁহু। গোপার সঙ্গে তুলনা করলে পিঙ্কুকে মলিকে মীরাকে কত কাঁচা আনাড়ি মনে হয় রঞ্জুর। এদিক থেকে রঞ্জু নাকি ভীষণ লাকি। টিকটিকিও টের পাচ্ছে না ফুলের মতন তারা একজন আর একজনের কাছে কেমন চুপি চুপি পাপড়ি মেলে ধরছে। গোপা এবাড়ি আসছে টুটুলের সঙ্গে গল্প করছে বাবার সঙ্গে পাখির কথা বলছে, বাবা ওকে সামনে বসিয়ে ফ্লেমিঙ্গো বলে আদরের ডাক ডাকছে ওর মিষ্টি গলার ভজন শুনছে—কিন্তু তারা কেউ জানে না টের পায় না যতক্ষণ ও এবাড়ি থাকে ওর মন ওর চোখ কার জন্য সজাগ থাকে। টুটুলের পড়ার টেবিলের কাছে কি বারান্দায় বা সিঁড়িতে বা বাবার ঘরে রঞ্জুর সঙ্গে দেখা হলে শুধু একবারের জন্য ও চোখ তুলে তাকাবে। রঞ্জুও চোখ ঘুরিয়ে একবার ওর চোখের ভিতরের কালো ভাইওলেট-এ মেশানো ছোট কাচের বলের মতন চকচকে মণি দুটো দেখবে। ব্যস ওতেই যথেষ্ট। ওই একবার তাকানোর মধ্যে দুজনে লক্ষ কথা হয়ে যায়। ঠোঁট খোলার দরকার পড়ে না, যেমন দিদির মনের খুশি। সকলের সামনে রঞ্জুর চোখের দিকে একবার তাকিয়ে হাসিটা [illegible] দিয়ে দেয়। অবশ্য খুশিদিতে আর গোপাতে তফাৎ আছে—এখানে খুশির অ্যাপ্রোচটা রঞ্জু প্যাসিভ—খুশিদের ভালবাসার ক্ষুধার্ত ভিকটিম সে তার নিজের কিছু করার নেই তাকে দিয়ে খুশিদের ভাল লাগাতে দেওয়াই শুধু তার কাজ। যতক্ষণ খুশি খুশিদির ভাল লাগুক—রঞ্জু আপত্তি করবে না। চুপ থাকছে। এখানে চুপ করে থাকাই তার পার্ট। যাত্রার বা থিয়েটারের কাঠ-সৈনিকের মতন। কিন্তু গোপার বেলায় তো তা নয়। সেখানে তারা দুজনেই দুটো ফুল হয়ে ফুটে উঠছে। ভালবাসার ফুল। এই ভালবাসার মধ্যে মধু আছে কিনা তারা জানে না। এখনও মধুর জন্ম হয়েছে কিনা তারা বুঝতে পারছে না। তবে ফুরফুরে গন্ধ আছে। বর্ষার রাতে দুটো শাদা [illegible] টাটকা [illegible] [illegible] বলে কি সবাই এই গন্ধ টের পায়। টুটুল পাচ্ছে না, রঞ্জুর বাবা মা, [illegible] [illegible] বাড়িতে গোপার মা-ও টের পাচ্ছে না। [illegible] মা ছাড়া ওর আছেই বা কে। এক দিদি। বাবা নাকি কবেই [illegible] [illegible] [illegible] কাজ করতে করতে মারা গেছেন। [illegible]। গোপার মা একদিন [illegible] [illegible] [illegible] রঞ্জুকে সব বলছিলেন। একদিনই রঞ্জু ওদের বাড়ি যায়। এখন তো আর সে ওখানে যেতে পারে না। কেমন দেখায়। যেন হঠাৎ গোপার সঙ্গে টুটুলের স্কুলের রাস্তায় দেখা হয়েছিল আর গোপা টুটুলের দাদাকে তখন বাড়িতে ডেকে নিয়েছে। তা না হলে রঞ্জু কি করে বলা-কওয়া নেই হুট করে ওবাড়ি গিয়ে উপস্থিত হত! গোপার মা নিশ্চয় কিছু একটা সন্দেহ করতেন, কিন্তু সেটা আর হল না। বুদ্ধি করে গোপার সঙ্গে আগেই রঞ্জুর এভাবে কথাবার্তা ঠিক করা ছিল, বাড়িটা সুন্দর। যদিও একতলা। ছিমছাম। ভারি নিরিবিলি। গেট-এর কাছে প্রকাণ্ড হাস্নুহানার ঝোপ। আর পিছন দিকে কত বড় দুটো নিচু গাছ। সব সময় ছায়ায় ঢাকা থাকে। সারাক্ষণ পাখি কিচকিচ করে। ছবির মতন ছায়ায় ঢাকা ছোট্ট বাড়িটার চেহারা রঞ্জুর চোখে
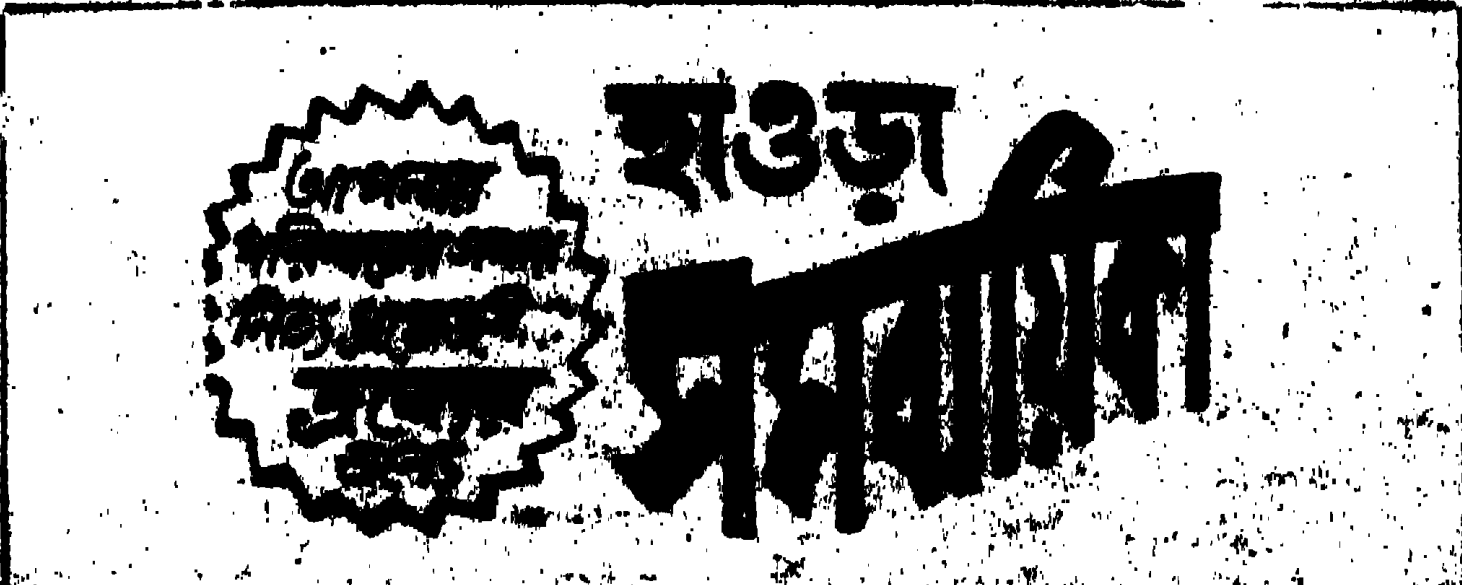
এখন জেগে উঠল। গোপা আজ স্কুল পরেনি। স্কার্ট পরেনি। টুটুলও তাই। ওদের দলের সবাই আজ শাড়ি পরেছে। সবুজ রং। আজকেই বাবার পিছনে [illegible] গাছের ওই সবুজ পাতার উপরে দাঁড়াল টুটুলদের পালটাকে মনে হচ্ছিল এক ঝাঁক টিয়ে। বেশ আলাদা করে গোপাকে আর চেনার জো নেই। আজ আর কেউ ফ্রকপরা না সালোয়ারী না চলনা না টুকাট্রিম না। সব কটাই টিয়ে পাখি। এটা নিশ্চয় বাবার প্ল্যান। একরকম পোশাক পরে বাড়ি থেকে বেরোতে হবে। বাবা যে কী ছেলেমানুষ হয়ে যায় এক এক সময়! সারাটা দিন ওদের নিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে পাখি দেখে এখন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরছে। বিরূপক-এর আড়ালে দাঁড়িয়ে রঞ্জু একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। আ যদি ওদের সঙ্গে সে-ও যেতে পারত। তা তো আর হয় না। ওদের মেয়েদের মধ্যে একলা বাবাই পুরুষ। বাবা ওদের গাইড। আর কোনো বেটাছেলে সঙ্গে নেই। গোপা নিশ্চয় এখন অম্বুজা-নিলয়ে গিয়ে এনাকে ভজন শোনাবে। গোপার সঙ্গে টুটুলের বাকি কটা বন্ধুও যাচ্ছে। গোপার ভজন শেষ হয়ে গেলে যে-যার বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু ফেরবার সময় রাস্তায় কি গোপার সঙ্গে একলা কথা বলা সম্ভব হবে! রঞ্জু ভাবনায় পড়ল। রাত হয়েছে ভেবে বাবা যদি আবার ওদের একজন একজন করে বাড়ি পৌঁছে দেবার ভার নেয়? এসব ব্যাপারে বাবার আলসেমী নেই। একটা অস্বস্তির কাঁটা বুকে নিয়ে রঞ্জু ফ্যালফ্যাল করে ওখানের ফুটপাথটা দেখতে লাগল। গোপাকে কথাটা বলে যাওয়া দরকার। আজ যদি সম্ভব না হয় কাল সকালে ওকে যেভাবে হোক খবরটা জানাতে হবে। খুব সম্ভব কাল দুপুরের ট্রেনে বুইয়ের সঙ্গে কেষ্টনগর চলে যাচ্ছে রঞ্জু কদিনের জন্য। আবার ফিরে আসবে। ও যেন চিন্তা না করে। ওখানে গিয়েও রঞ্জু ওর কথা ভাববে।

হঠাৎ রঞ্জুর চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল। পলক পড়ছিল না। ওটি কে? রাস্তা ক্রশ করে রুদ্রেন্দুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল! রঞ্জু বড় করে একটা ঢোক গিলল।

(ক্রমশঃ)

সেকালের সঙ্গীতগুণী
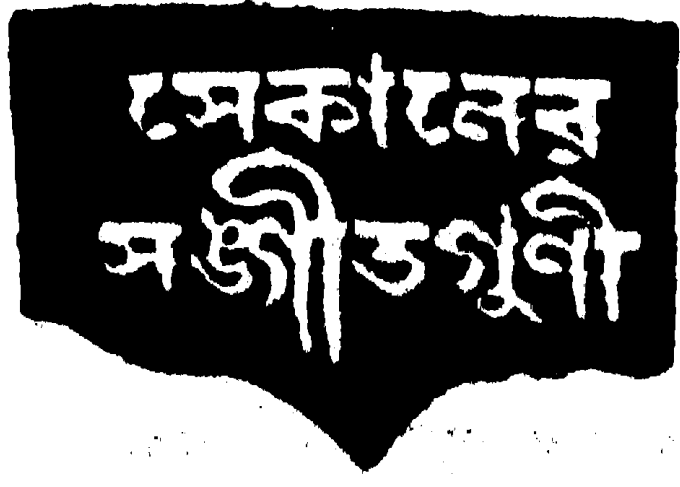
সেতারে তিন পুরুষ

তখন কলকাতায় জিতেন্দ্রনাথ বেশ থায়ী হয়েছেন। সঙ্গীতসমাজের অনেকের কাছেই স্বীকৃতি পেয়েছে তাঁর প্রতিভা। সেতার সুরবাহারের একজন প্রকৃত গুণী বলেও অনেকে তাঁকে জেনেছেন। তবে সকলেই নয়।

এমনি এক সময়ের কথা। সেদিন শংকর উৎসবের আসরে তিনি এসেছেন সেতার বাজাতে।

সেকালের কলকাতায় দুটি সংগীত সম্মেলন হত। মুরারি সম্মেলন (১৯০৫-এ প্রতিষ্ঠা) ও শংকর উৎসব (১৯১৫ থেকে আরম্ভ)। প্রথমটির স্থাপন করেন পাখোয়াজী দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর গুরু মুরারিমোহন গুপ্তের স্মৃতিতে। দ্বিতীয়টিও পরিচালনা করতেন দুই পাখোয়াজ গুণী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও দীননাথ হাজরা। দুটিই বার্ষিক সংগীত সম্মেলন। শংকর উৎসব হত শিবরাত্রিতে।

মুরারি সম্মেলনে আগেই জিতেন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছেন। সেবার প্রথম এলেন শংকর উৎসবে।

উৎসবের প্রধান পরিচালক সে সময়েও পাখোয়াজী নগেন্দ্রনাথ। আসরও প্রতি বছরের মতন পটলডাঙা ভবনেই বসেছে। ১৮ রাধানাথ মল্লিক লেনের সেই বসুমল্লিক পরিবারের বাড়িতে।

তরুণ গায়ক-তবলা বাদক অনাথনাথ বসু—যেমন মুরারির সম্মেলনে তেমনি শংকর উৎসবেও একজন উদ্যোগী কর্মী। শুধু শিল্পী নন। একজন সংগঠকও। তিনিও আসরে উপস্থিত। আরো নানা নামী কলাকার এসেছেন। কারণ সারারাত্রি-ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন।

এখন সুরবাহার শোনাচ্ছেন হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল। তাঁর বাজনার পরে এক গায়কের খেয়াল গান হবে। তার পর সেতার বাজাবেন জিতেন্দ্রনাথ।

সেতার সুরবাহারের শিল্পী বলে তখন হরেন্দ্রকৃষ্ণ বেশ বিখ্যাত, স্বনামধন্য কৌকব খাঁর ছাত্র। সৌখীন গুণী শীলমশায়ের আরো নাম মহা ধনী হিসেবে। প্রায় কোটিপতি ছিলেন। তবে এই আসরের সময় তাঁর ঐশ্বর্য-ভার লাঘব হয়েছে অনেকখানি। নানা কারণেই তাঁর বিপুল সম্পদ উড্ডীয়মান। শুধু ভোগ বিলাস ব্যসনে নয়। নানা ব্যবসায়িক ব্যর্থতায়। অভাবিত ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতায়। সংগীত চর্চায় দরাজ সংগীতপ্রেমে। দানদাক্ষিণ্য এবং হৃদয়ের উদারতায়। এত সত্ত্বেও ধনাবশেষ তাঁর তখনো ছিল। তাই মোসাহেবেরও একেবারে ঘাটতি হয়নি। আসরে যখন বাজাতে যেতেন হরেন্দ্রকৃষ্ণ, সঙ্গে হাজির থাকত তেমনি ৮।১০ জন। তাঁর ঘণ্টে সুর বাঁধা থেকেই তারা 'আহা' 'আহা' আরম্ভ করে দিত। বাজনা চলবার সময় ত বলাই বাহুল্য।

তবে ভাল বাজাতেন হরেন্দ্রকৃষ্ণ। সেতার সুরবাহার দুই-ই। পরিণত বয়সে আবার খেয়ালও গাইতেন। বাংলা খেয়াল। তবে তা অনেক পরের কথা। আমীর থেকে তখন তাঁর প্রায় ফকির অবস্থা।

সে আসরে সুরবাহার বাজাবার পরই তিনি চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর অঙ্গের বহুমূল্য শালখানিতে টান পড়ল পেছন থেকে। তিনি চমকে দৃষ্টি ফেরালেন। অবাক হয়ে দেখলেন, শাল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন অনাথনাথ। দু'চারজন মোসাহেব তেড়ে এল।

কিন্তু অনাথবাবু যেমন এলেমদার গাইয়ে বাজিয়ে তেমনি ডানপিটে।

সপ্রতিভ ভাবে বললেন, 'এ কি শীল মশায়? নিজের বাজনা হতেই চললেন? একটু বসুন। অন্তত এঁর সেতার শুনে যান।'

বলে জিতেন্দ্রনাথের দিকে দেখালেন। তাঁকে চিনতেন না শীল মশায়।

তবে নিরভিমান মহাশয় হরেন্দ্রকৃষ্ণ। ঐশ্বর্যের অহংকারশূন্য। যথার্থ শিল্পী-প্রাণও। ক্রোধ বা বিরক্তি না দেখিয়ে আসরে বসলেন তিনি।

এবার একজনের গানের পর ঘোষণা করা হল জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এখন সেতার বাজাবেন। তবলা সংগত করবেন অনাথনাথ বসু।'

বেহাগ ধরলেন জিতেন্দ্রনাথ। উত্তরাঙ্গ প্রধান, করুণ মধুর রাগ রূপ। আর তাঁর পিতার হাতের সেই ছোট কাঠের সেতারটি। তার উত্তর অঙ্গের সুর বাঁশির মতন বেজে ওঠে।

অল্প আলাপের পরেই গৎ আরম্ভ করলেন শিল্পী। যেমন তাঁর বাজনার ধরন —ভারি চালের খেয়াল-রীতিতে বাজাতে লাগলেন। বলতে গেলে সুরের জাল বুনে দিলেন আসরে। ছন্দ তান বিস্তারের জমাটি বুনট। চিত্তাকর্ষক নতুন নতুন সৌন্দর্যের আস্বাদ। সুরের চমৎকার সব টান টোন্। জিতেন্দ্রনাথের অনুষ্ঠান হল প্রকৃতই উচ্চশ্রেণীর।

হরেন্দ্রকৃষ্ণ বিস্মিত হয়ে শুনছিলেন। তিনি নিজে সেতার বাদক। সুতরাং এই অপরিচিত যন্ত্রশিল্পীর মর্ম তিনি বুঝলেন। সত্যিকার শিল্পী বটে। কোন সন্দেহ নেই।

বাজনার শেষে জিতেন্দ্রনাথকে তিনি আন্তরিক প্রশংসা করলেন।

'বড় ভাল হয়েছে আপনার বেহাগ। পরে আপনার বাজনা আরো শুনব। আমার বাড়িতে আসবেন অনুগ্রহ করে।'

তাঁর আমন্ত্রণ জিতেন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন। পরে অনেকবারই বাজিয়েছেন হরেন্দ্রকৃষ্ণের সেই প্রাসাদোপম ভবনের আসরে। (কালের গতিকে জোড়াসাঁকোর যে গৃহ এখন লোহিয়া মাতৃ সেবা সদন!)।

শীল মশায়ের মতন কলকাতায় তিনি আরো গুণগ্রাহী পেয়েছেন। যেমন—ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটের সুপরিচিত নাহার বংশীয় রায় বাহাদুর মণিলাল নাহার। বিশ্বান পূরণচাঁদ নাহার। এঁরা জিতেন্দ্রনাথকে স্বর্ণ পদক দিয়েও সম্মান জানান। এই পরিবারের কেশরী সিং নাহার শিষ্যও হয়েছিলেন তাঁর। সংগীতবিদ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। নাটোররাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়। প্রতিভা দেবী ও তাঁর স্বামী বিচারপতি সার আশুতোষ চৌধুরী। তাঁদের 'সংগীত সঙ্ঘ'-র অন্যতম শিক্ষকও ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ। রামগোপালপুরের জমিদার সৌখীন তবলাবাদক হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (একালের সরদী রাধিকামোহন মৈত্রের মেসোমশায়) পাথুরিয়াঘাটার স্বনামধন্য সংগীত-প্রেমী, নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনকর্তা ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ। সংগীতজগতে লালাবাবু নামে সুপরিচিত দামোদরদাস খান্না—কলকাতায় নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনের উদ্যোক্তা। ধনকুবের ওঙ্কারমল জেঠিয়া। রবীন্দ্রসংগীতের 'ভাণ্ডারী' ও 'কাণ্ডারী' জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের দিনেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথও। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে একাধিকবার শান্তিনিকেতনেও জিতেন্দ্রনাথ বাজিয়ে এসেছেন। সংগীতের পৃষ্ঠপোষক শশিকান্ত আচার্য চৌধুরী। মনীষী বিদগ্ধ সংগীতরসিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

কলকাতা ও বাংলার বাইরেও জিতেন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধের নাম করা যায়। যথা—মুঙ্গেরের রাজা দেওকীনন্দন প্রসাদ সিং। রাজস্থানের বাঁশওয়ারার মহারাওয়াল পৃথ্বী সিং বাহাদুর প্রভৃতি।

আচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীরও প্রিয়পাত্র হন জিতেন্দ্রনাথ। গোঁসাইজী মাঝে মাঝে নবদ্বীপ অঞ্চলে মুজরো করতে যেতেন। তখন জিতেন্দ্রনাথকেও নিতেন সঙ্গী করে। সেসব আসরে রাধিকাপ্রসাদ ধ্রুপদ খেয়াল গাইতেন। আর জিতেন্দ্রনাথ বাজাতেন সুরবাহার সেতার। গোঁসাইজীর সঙ্গে তাঁর সাঙ্গীতিক যোগাযোগ অনেকদিন ছিল।

বিষ্ণুপুরের এক জমিদার স্থিতিরাম পাঁজা ছিলেন সৌখীন পাখোয়াজী। তিনি জিতেন্দ্রনাথকে দক্ষিণা দিয়ে বিষ্ণুপুরে আনাতেন নিজের সংগতের জন্যে। স্থিতিরামের পাখোয়াজের সঙ্গে জিতেন্দ্রনাথ সুরবাহারে তারপরণ বাজাতেন।

(ময়মনসিংহ) রামগোপালপুরের হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীরও তেমনি সখের তবলাচর্চা। মাঝে মাঝেই তিনি কলকাতায় আসেন। থেকে যান ভবানীপুর অঞ্চলে। একাধিক কলাবতের কাছেই তিনি তবলায় তালিম নেন। যেমন—লক্ষ্ণৌর খলিফা আবেদ হোসেন বারাণসীর মৌলবীরাম মিশ্র প্রভৃতি। হরেন্দ্রকিশোর নিজের রিয়াজের জন্যে মুজরো দিতেন জিতেন্দ্রনাথকে। রায়চৌধুরী মশায়ের তবলা

সাধনের সঙ্গে তিনি সেতার বাজাতে যেতেন। সেখানেই একদিন লড়াই বেধে যায় তিন চারজন কলাবৎকে নিয়ে। সেকথা পরে বলা যাবে।

এমনিভাবে জিতেন্দ্রনাথ বাংলার সঙ্গীতজগতের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। মুরারি সম্মেলন আর শঙ্কর উৎসবে ত বাজাতেনই। তারপর যখন নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন আরম্ভ হল, সেখানেও। সর্বভারতীয় গুণীদের সামনে সেই বৃহৎ আসরে গুণপনা দেখাতেন। তবে সে তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে। পুত্র লক্ষ্মণকে নিয়ে যুগলবন্দীও বাজিয়েছেন সেই সম্মেলনে।...

সঙ্গীতই ছিল তাঁর জীবনের বস্তু। সেজন্যে শিষ্যও কজন করেছিলেন। যেমন —গোবর্ধন ভট্টাচার্য (ভাটপাড়া)। শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যারাকপুর; স্টেশন রোড)। হরেন্দ্রনাথ দত্ত (হাটখোলার দত্ত বংশীয় কিন্তু কালিঘাটে নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট নিবাসী)। কেশরী সিং নাহার (ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট)। ক্যালকাটা মিউজিক এ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মকর্তা)। হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর)। হরেন্দ্রনাথ হালদার (নকুলেশ্বরতলা কালিঘাট) ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মণ (গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের শিক্ষক, চিত্রশিল্পী)। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি (তত্ত্বজ্ঞ সঙ্গীতবিদ খ্যাতনাম্নী গায়িকা যাদুমণিরও শিষ্য তিনি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের মুক্তির বক্তব্যের প্রতিবাদে যাদুমণি প্রেসিডেন্সী থিয়েটারে একটি বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান করেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সে সম্পর্কে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন। সে আসরের বিস্তৃত বিবরণ লেখকের আসরের গল্প-র চন্দ হারা অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। ধ্রুপদ গায়ক রূপে কলকাতায় পরিচিত কুমারেশ্বর মুখোপাধ্যায় ছিলেন ধ্রুপদাচার্য সুরশৃঙ্গারগুণী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য। কিন্তু গোপনে কুমারেশ্বর আরো সুর ছন্দ ইত্যাদির আকর্ষণে জিতেন্দ্রনাথের কাছেও শিক্ষার্থী হয়ে আসতেন। কুমারেশ্বর বলতেন, কত বিচিত্র জোড় জোড় ইত্যাদিতে অপূর্ব ছিল জিতেন্দ্রনাথের বাজনার চলন। তা ছাড়া প্রতিভা দেবী পরিচালিত সঙ্গীত সংঘতেও নিয়মিত শিক্ষা দিতেন তিনি। সেতার ও সুরবাহার দুই যন্ত্রেরই শিক্ষক রূপে কলকাতায় তাঁর পরিচিতি ছিল। এটাও তাঁর পেশাদার জীবনের অংশ।

তবে এই শিষ্য তালিকা থেকে পাওয়া যাবে না জিতেন্দ্রনাথের গুণবত্তার পরিচয়। কারণ তাঁরা কেউই গুরুর নাম রাখবার যোগ্য নন। ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন তা তাঁর জীবিকা বলে। কিন্তু শিল্পী হওয়া শিষ্যের মেধা সাধনার ওপর নির্ভরশীল। ছাত্রের যোগ্যতা না থাকলে কোন গুরুই তৈরী করে দিতে পারেন না। জিতেন্দ্রনাথের বিদ্যা সঠিক আত্মস্থ করেন তাঁর প্রতিভাবান পুত্র লক্ষ্মণ। সেতারে পিতার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী তিনিই। বলা যায় পিতৃপিতামহের সার্থক উত্তরসাধক লক্ষ্মণ বংশগত সঙ্গীতবিদ্যার ধারক ও বাহক। লক্ষ্মণই জিতেন্দ্রনাথের যথার্থ শিষ্য। কিন্তু লক্ষ্মণের কথা এখন নয়। জিতেন্দ্রনাথের অনেক প্রসঙ্গ এখনো বাকি।

তিনি যখন কলকাতায় প্রতিষ্ঠা পান তা হল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের কথা। সঙ্গীতচর্চা তখন পেশা হিসেবে তেমন অর্থকরী ছিল না। অন্তত বাঙ্গালীদের পক্ষে ত বটেই। কোন প্রকার প্রাদেশিক মনোভাব না রেখেও একথা বলা যায়। শুধু তখন কেন। তার দু'তিন দশক পরেও ওই অবস্থা। পশ্চিমী ওস্তাদের তুল্য মূল্য হয়েও কোন কোন বাঙ্গালী কলাবন্তের মজুরো হত অল্পই। তা ছাড়া রীতিমত গুণী হলেও বেশির ভাগ বাঙ্গালী অপেশাদারই থাকতেন। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ কজন মাত্র ছিলেন ব্যতিক্রম। জিতেন্দ্রনাথও তেমনি একজন পেশাদার শিল্পী।

আর তিনিও রাধিকাপ্রসাদের মতন নিরীহ স্বভাব। শান্তিপ্রিয় দাপট-শূন্য ব্যক্তি। সেজন্যেও উপার্জন কম ছিল, গুণের নিরিখে। যেমন ক্ষীণ শরীর তেমনি অশান্তিকর পরিবেশে এড়িয়েই চলতেন।

কিন্তু সেকালের আসরে মাঝে মাঝেই বেধে যেত লড়াই। রাগ তাল বা লয় নিয়ে ওস্তাদে ওস্তাদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জিতেন্দ্রনাথ গোসাইজীর মতন সাবধানে সেসব থেকে দূরে থাকতেন। কিন্তু প্রয়োজন হলে কিংবা আত্মসম্মানের প্রশ্নে থাকতেন অটল। তখন যে-কোন আসরে অবতীর্ণ হতেন গোসাইজীর মতন। আত্মপ্রতিষ্ঠা করতেন।

যেমন সেবার হল হরেন্দ্রকিশোরের আসরে। তাঁর তবলার ওস্তাদদের মধ্যে একজন হলেন বিখ্যাত আবেদ হোসেন। একদিন তাঁকেই লড়িয়ে দেবার মজা জাগল। আর তাতে শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়লেন জিতেন্দ্রনাথ। তবে তা অন্যরকমভাবে।

সেদিন আবেদ হোসেনের সঙ্গে লড়বার জন্যে আনা হল শিবসেবক মিশ্রকে। বিখ্যাত শিব পশুপতি ভ্রাতাদের একজন। তিনিও পশুপতির তুল্য তাল লয়ে দুর্ধর্ষ। তাল-লয়ের অতি সূক্ষ্ম কূট হিসাবে তাঁদের অদ্ভুত দক্ষতা। গায়ক শিবসেবক মিশ্রেরও সেজন্যে যথেষ্ট খ্যাতি। এখানে বলে রাখা যায় তাল লয়ের ওই সব কেশ-বিভাজন অঙ্ক কিংবা মাত্রার ভগ্নাংশ নিয়ে কারিগরি —সঙ্গীতে বড় কথা নয়। শিল্প-মূল্যে তা অকিঞ্চিৎকর। তবু সেকালে ওইসব নিয়ে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেছে।

হরেন্দ্রকিশোরের সে আসরেও হল তেমনি। ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়া রোডের সেই বাড়িতে।

আসরে শিবসেবক খেয়াল গাইতে বসলেন। তবলা সঙ্গতে আবেদ হোসেন। আর অন্য একটি ঘরে আড়ালে রাখা হয়েছে কাশীর তবলিয়া নান্নু সহায়কে। বেনারস বাজ ঘরাণার বিখ্যাত ভৈরব সহায়ের পৌত্র তিনি। সেই ভৈরব সহায়ের সঙ্গেই একবার বামাচরণের শক্তি পরীক্ষা হয়েছিল রাণাঘাটে পালচৌধুরীদের দরবারে। নান্নু সহায়ের পোষাকী নাম দুর্গাসহায়। দৃষ্টিহারা বলে তাঁকে অন্ধ সুরদাসও বলা হত। অতি গুণী তবলচী তিনি। আবেদ হোসেনের সঙ্গে যে শিবসেবকের লড়াই হবে এ আসরে, তা তিনি জানেন না। তাঁকে যেমন বলা হয়েছে তিনি অপেক্ষা করছেন অন্য একটি ঘরে। তাঁর পালা এলেই তাঁকে আসরে আনা হবে। তিনি বাজাবেন তখন। এই রকমই তিনি শুনেছিলেন।

এদিকে শিবসেবক মিশ্রের গান আরম্ভ হল। সমঝদার শ্রোতাও আসরে ছিলেন বেশ কয়েকজন। কিছু শিল্পীও। তাঁদের মধ্যে একজন জিতেন্দ্রনাথ। আর তাঁর সঙ্গে তবলাবাদক পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু জিতেন্দ্রনাথ সে আসরে বাজাতে আসেন নি। শরীরও তাঁর সুস্থ ছিল না তেমন। হরেন্দ্রকিশোরের তবলার সঙ্গে সেতার নিয়ে অন্যদিন বসতেন। সেই [illegible] আসেন এই আসর শুনতে। চুপচাপ [illegible] সে শুনছিলেন। প্রথম থেকেই গানের মধ্যে শিবসেবক মাত্রার প্যাঁচ আর নানা কেরামতি দেখাতে লাগলেন। তার পরিচয় দেওয়া এখানে অপ্রয়োজন। আর আবেদ হোসেন যে সেই কসরতের ফলে বেকায়দায় পড়লেন তাতেও খাঁ সাহেবের শিল্পীরূপে অগৌরবের বিশেষ নেই। এমন বিপাকে ফেলা যায় অনেককেই। যাই হোক এখন আসর ত ভেঙ্গে যাবার মতন হয়ে পড়ল লড়াইয়ের ফলে। এই অবস্থায় অন্তরাল থেকে দুর্গাসহায়কে আসরে আনা হল। তিনি নিজের তবলা নিয়ে ভাঙ্গা আসর জোড়া দিলেন, অসামান্য দক্ষতায়। গায়কের তাবৎ জটিল লয়কারীর সমান দাপটে জবাব দিতে লাগলেন। উত্তেজনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল আসর। এ এক প্রকারের মজাদার চমক। উপভোগ করতে লাগলেন শ্রোতারা।

তারপর মহা উদ্দীপনার মধ্যে তাঁদের গান বাজনা শেষ হল।

কিন্তু তখন সবে গরম হয়েছে নান্নু সহায়ের হাত। তিনি আরো বাজাতে চান। এবার কোন যন্ত্রী হলে আরো জমে সঙ্গত। আর কোন বাদককে পাওয়া যায় না? বাদক অর্থাৎ সুরশিল্পী।

এমনি পরিস্থিতিতে কি করে যেন কথাটা উঠল কোন বাঙালী যন্ত্রশিল্পী কি বাজাতে পারবেন দুর্গাসহায়ের সঙ্গে?

জিতেন্দ্রনাথ সামনেই বসেছিলেন। নির্বিরোধী। এই কালোয়াতী বিতণ্ডার মধ্যেও ছিলেন শান্ত-চিত্ত। এমনি ধরনের বিসংবাদে অংশ নিতে স্বভাবতই নারাজ তিনি।

কিন্তু এখন একটা অন্য রকম অবস্থা দাঁড়াল। এ এক রকম আহ্বান যেন। তিনি মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আঘাত পেলেন শিল্পী সত্তায়। তিনিও ত বাঙালী এবং যন্ত্রসঙ্গীতেরই সাধক! সুতরাং কি করে নির্বিকার থাকেন? কোথায় উধাও হয়ে গেল অসুস্থতার ভাবনা। তিনি প্রস্তুত হলেন।

হরেন্দ্রকিশোরকে বললেন, তাহলে আমিই একটু বাজাই।

তাঁর সেতারটি ত সে বাড়িতেই ছিল।

একটু পরেই বাজনা আরম্ভ করলেন তিনি। বলা সঙ্গতে নামু সহায়। নতুন করে আসর আরম্ভ হল। তখন জিতেন্দ্রনাথের শিল্পী মানসে সাড়া জেগেছিল। তাই প্রকাশ পেতে লাগল তাঁর পূর্ণ প্রাণের নন্দন সুষমা। সেতারের পর্দায় পর্দায়। ছন্দের বন্ধনে সুর মায়ার অপরূপ অলঙ্করণে।

এখন আর শুধু তাল লয় মাত্রার বিকাশ নয়। তার অতিরিক্ত অনেক কিছু। তা অনুভব উপলব্ধির ক্ষেত্র। রাগের রূপে

রসসৃষ্টি। সুরের ধারায় আসর নিষিক্ত করে দিলেন জিতেন্দ্রনাথ।

বাজনার শেষে তবলিয়াই সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত হলেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কোন ঘ্যার ইয়ে সেতারিয়ে?

বাদকের সঙ্গে নাম্নুজীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। জিতেন্দ্রনাথ বংশ পরিচয়ের কথায় পিতার নামও জানালেন তাঁকে। এই যন্ত্র বাজাতেন তাঁর সেই স্বর্গত পিতৃদেব। তাঁর কাছেই সেতারের শিক্ষা পাওয়া।

সে নাম শুনেই দৃষ্টিশক্তিহীনের মুখাবয়বে তীক্ষ্ণ একাগ্রতা ফুটে উঠল।

বামাচরণ বাবু? রাণাঘাটকা?

ঠাকুরদা ভৈরব সহায়ের মুখে অনেকবার যে সে নাম শুনেছিলেন দুর্গাসহায়। রাণাঘাটে পাল চৌধুরীদের আসরে বামাচরণের সেতার বাজনা ভৈরব সহায়ের সঙ্গে। সে গল্প তাঁর ছেলেবেলায় শোনা। অন্ধের স্মৃতিশক্তি। তাই হয়ত ভুলে যাননি। সেই অতীতস্মৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল আজকের এই সফল আসর। এতকাল পরে দুটি ধারার বংশধরের মধ্যে অভাবিত যোগাযোগ ঘটল। আর প্রায় একই ধরনের নাটকীয় আবহে।

এখন এই প্রীতিময় পরিবেশে জিতেন্দ্রনাথ একটি অনুরোধ করলেন নাম্নুজীকে।

নিজের তবলচী পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় দিয়ে বললেন ছেলেটি আমার আত্মীয়। খুব রিয়াজ করে। আর আরো তালিম পেতে চায়। ওকে বাড়িয়ে দেবেন, আপনার সুবিধা মাফিক।

রাজি হয়েছিলেন দুর্গাসহায়। তারপর যতদিন কলকাতায় ছিলেন শেখাতেন পঞ্চাননকে। পরেও যখনই কলকাতায় এসেছেন তাঁকে তালিম দিয়েছেন। বেশ কয়েক বছর এইভাবে তাঁর কাছে শেখেন পঞ্চানন। বাংলাদেশে নাম্নুজীর শিক্ষা তাঁর তুল্য আর কেউ বোধহয় পাননি। ধরতে গেলে তাঁরই হাতে গড়ে ওঠেন এই বাঙালী তবলচী।

পরে জিতেন্দ্রনাথের বেশির ভাগ বড় বড় আসরে পঞ্চাননই সঙ্গত করতেন। এমন কি সেই নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন পর্যন্ত। যেদিন লক্ষ্মণের সঙ্গে বাজিয়েছিলেন জুটিতে। কি চমৎকার হয়েছিল ৪৫ মিনিটের সে আসর। সম্পর্কে তিনি হতেন তাঁর মাসতুত ভাই। জিতেন্দ্রনাথের চেয়ে ১৮।১৯ বছরের কনিষ্ঠ। তাঁর সংগত বড় পছন্দ করতেন। বাজিয়ে আনন্দ পেতেন তাঁর সঙ্গে। স্নেহও করতেন খুব। পঞ্চাননের সঙ্গে এক-একদিন তাঁর ভাটপাড়ার বাড়িতে চলে যেতেন। সেই ৬ ইস্ট ঘোষপাড়া রোডে। সেখানে ঘরোয়া আসরে কত দিন কত ভাল বাজনাই তাঁর হয়ে গেছে। পঞ্চাননের রিয়াজও হত তাঁর সঙ্গে। আর তিনিও প্রাণের আনন্দে বাজাতেন। বলতেন প্রেমের বাজনা তোর বাড়িতেই বাজাই। কয়েকটি মাত্র অন্তরংগ অনুরাগী শ্রোতা। নিস্তব্ধ গভীর নিশীথিনী জনকোলাহলের লেশ নেই তখন ভাটপাড়া অঞ্চলে। জিতেন্দ্রনাথের সেতারে সুরের অফুরন্ত ঝংকার সেই ঘরে ভরিয়ে তুলত। সাধারণের আসরের অনেক দূরে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের আরামের অনুষ্ঠান সেসব।

তেমনি প্রকাশ্য বড় বড় আসরেও তিনি রীতিমত গুণপনা দেখাতেন। একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত যন্ত্রসঙ্গীতের ধারা পেয়েছিলেন পিতার মাধ্যমে। তাঁর হাতেও তা মূর্ত হয়ে উঠত। সাজ্জাদ মহম্মদ—মহম্মদ খাঁর ঘরাণা তালিমী বাজ বামাচরণের সেতার সুরবাহারে একটি অতিশয় সমৃদ্ধ বাদন-রীতি। আর কলকাতায় তার ধারক বাহক তখন জিতেন্দ্রনাথ। এই ধারায় অপর বাঙালী শিল্পী সে সময় আর একজন ছিলেন। গোবরডাঙগার জমিদার বংশীয় সৌখিন গুণী জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। কিন্তু জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাজাতেন শুধু সুরবাহার সেতার নয়। আর তাঁর আসরও জিতেন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক অল্প হত। প্রকাশ্য আসরে জ্ঞানদাপ্রসন্নের পরিচিতি ছিল স্বল্পতর।

পরিণত বয়সে সেতারের চেয়ে সুরবাহারই বেশি বাজাতেন জিতেন্দ্রনাথ।। সুরবাহারটি নিয়ে সুরে মশগুল হয়ে থাকতেন। তার জোড়া ঝালা ইত্যাদি সেতারের কাজের দিকে আর মন টানত না তাঁর।

তখন বলতেন আমি যন্তর নিয়ে বসি। সুরের কাজ করতেই ভালবাসি। তবলার লড়ালড়ির মধ্যে নেই।

আর রাগ বিদ্যার কি বিপুল ভাণ্ডার তাঁর ছিল। সবই ত পিতার কাছে পাওয়া। দ্বিতীয় কোন গুরু কখনো করেননি। এমন কি বামাচরণ যেমন অসংখ্য আসর শুনতেন পালচৌধুরী ভবন বা গোবরডাঙ্গার আসর বা ময়ূরভঞ্জ দরবারে, আর সেই সব সূত্রে সংগ্রহ সঞ্চয় আত্মস্থ করতেন—জিতেন্দ্রনাথ তাও নয়। শুধু পিতার কাছেই শিখেছিলেন। আর পেয়েছিলেন তাঁর মুক্তাক্ষরে লেখা রাগ-রাগিণীর পুঁথিপত্র লিপি। পরে নিজের প্রতিভায় সেই বিদ্যা প্রস্ফুটিত বিকশিত করে তুলেছিলেন।

বামাচরণ শেষ বয়সে পুত্রকে বলতেন, হাত তৈরি করে তোকে রাস্তা ধরিয়ে দিয়েছি। পথ পেয়ে গেছিস। আর খাতা পত্তরেও এসব রইল। পরে ঠিক বুঝতে পারবি।

তা জিতেন্দ্র হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন সেসব। পিতার অন্তিম আশা তাঁর সংগীতজীবনে পূরণ হয়েছিল।...

সকল কলাবতেরই কটি রাগ থাকে যা তাঁদের বেশি প্রিয়। সেসব রূপায়নে তাঁর প্রাণে অধিক স্ফূর্তি আসে। আসরেও সেই সমস্ত রাগ সচরাচর বাজান তাঁরা। তেমনি জিতেন্দ্রনাথও। তবে ফরমায়েস করলে আরো নানা রাগও শোনাতেন। কিন্তু বিশেষ প্রিয় ছিল তাঁর কয়েকটি। যেমন—পরজ ভীমপলশ্রী দরবারি কানাড়া, বেহাগ পূরিয়া ছায়ানট মুলতান খাম্বাজ ইত্যাদি। আর সকালের—ভৈরব রামকেলি আশাবরী ভৈরবী এমনি কটি সকালে আসর তাঁর—অন্য অনেকেরই মতন—কম হত। কিন্তু খাম্বাজ দেশ ভৈরবী সবই বাজাতেন বিশুদ্ধ খেয়াল অঙ্গে। ঠুংরি কখনোই বাজাতেন না।

ঠুংরিতে ঘোর আপত্তি ছিল তাঁর। আসলে তিনি ধ্রুপদাঙ্গের শিল্পী। যখন খেয়াল অঙ্গে বাজাতেন তখনো ভারি চালেই। গম্ভীর্যের মধ্যেই তাঁর সে সব সুরের কাজে সৌন্দর্য ফুটে উঠত। ঠুংরি চাল আমদানি না করেও যে রসসৃষ্টি করা যায় তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন নানা আসরে। পরম্পরাগত ধারায় শিল্পচিত্ত তাঁর গড়ে উঠেছে। আগেকার যুগের গুণী। যেমন শিখেছেন, বুঝেছেন ভেবেছেন সেই বিশ্বাসেই ছিলেন অটল। ঠুংরি কোনো বরদাস্ত করতেন না।

লক্ষ্মণ একদিন খাম্বাজ বাজাবার সময় ঠুংরির ঠোক ঠমক দিয়েছিলেন তাঁর সামনে।

শান্ত-স্বভাব জিতেন্দ্রনাথ তা শুনেই বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। খবরদার ঠুংরি বাজাবি না।

লক্ষ্মণ অনুমতি চেয়েছিলেন নজির দিয়ে, 'কিন্তু এনায়েৎ খাঁ যে ঠুংরি করেন?'

'এনায়েৎ খাঁ করুক, তাতে তোর কি? তোর বাপ ঠাকুর্দা কখনো যা করেনি, তুই কেন সে রাস্তায় যাবি? ঠুংরি না করে সেতার বাজনা হয় না নাকি? খবরদার।'

এটা ছিল তাঁর সাংগীতিক আদর্শ। সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর মূল ধ্যান ধারণার কথা। কিন্তু ঠুংরি যাঁরা বাজান তাঁদের কারো ওপর ব্যক্তিগত বিরূপতা তাঁর ছিল না। ওই এনায়েৎ খাঁর পিতা এমদাদ খাঁর সঙ্গেই ত বেশ হৃদ্যতা ছিল জিতেন্দ্রনাথের। আচার-বিচারে আলাদা জগতের হলেও এমদাদের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করতেন। জিতেন্দ্রনাথের যে আর একটি গুণ ছিল—

জ্যোতিষ পটুত্ব। শাস্ত্রজ্ঞ পৈত্রিক বংশের শাস্ত্রীয় বিদ্যা কিছু পাননি বটে, কিন্তু জ্যোতিশ্চর্চার খানিক জ্ঞান জন্মেছিল। আর এজন্যে তাঁকে খাতির করতেন এমদাদ খাঁ। নিজের হাত দেখাতেন। একবার জিতেন্দ্রনাথের একটি মজাদার ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যায় বলে তাঁর ওপর আরো বিশ্বাসী হয়ে পড়েন এমদাদ খাঁ। তাঁর চেয়ে ১৫।১৬ বছরের বড় হয়েও।

যাক সে কথা। জিতেন্দ্রনাথের ওই যে রাগ জ্ঞানের কথা হচ্ছিল। বামাচরণের কত দিন ধরে কত ওস্তাদের কাছে সংগ্রহ করা বিদ্যার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তিনি। কত অপরিচিত অপ্রচলিত রাগ ঃ ত্রিবনী। ধবলশ্রী। রাজশ্রী। কদম্ব নট। গম্ভীর নট (কানাড়া নট)। আহিরী নট। জয়েৎ পূরিয়া। জলধর কেদারা। গৌরী কামোদী। টংক কানাড়া। নাগধ্বনি কানাড়া। প্রদীপকী। মঞ্জরী। রম্ভাবতী। দেও বেহাগ। অরুণ। অরুণ বেহাগ। অরুণ মল্লার। জাজ মল্লার। গম্ভীর মল্লার। লংকা-দহন মল্লার। পারাবতী (দেবগিরি পূরবী ও গৌড়ের মিশ্রণ)। তারাকোশ। সূর্যকোশ (তোড়ি ভৈরবী ও ললিতের মিশ্রণ) ইত্যাদি কত। কটি রাগের নামকরণ আবার এক একটি ফুলের নামে। যেমন—জুহি (জুঁই), চম্পক, হরশৃঙ্গার (শিউলি ফুলের পোষাকী নাম)। এই সমস্তই জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গীতভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল।

এই জুহি শেখাবার সময়েই জিতেন্দ্রনাথ লক্ষ্মণের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পান। তাঁর মনে হয়—পূর্বজন্মের সংস্কার। এ প্রসঙ্গও লক্ষ্মণের কথায় পরে বলা যাবে।

এখন জিতেন্দ্রনাথের বাজনার বৈশিষ্ট্যের কথা। তিনি বিলম্বিত লয়ে সিদ্ধ ছিলেন। দীর্ঘ মিড়ের সূক্ষ্ম সুরের কাজে অপূর্ব কুশলী। সুর ও ছন্দের শিল্পী অথচ লয়কারীতে কি পারদর্শী। তাঁর লয় যেন সুরের আকাশে ভেসে বেড়াত। দ্রুত তানের মধ্যে কত ভাঙ্গাচুর করতেন লয়কে। ত্রিতালের মধ্যে ধামার ঝাঁপতাল বিন্যস্ত করে দিতেন। সে সব লয়ের মুন্সিয়ানা যেমন কঠিন তেমনি উপভোগ্য। অনুলোম বিলোমের ছন্দ কারু। প্রতিলোমের মধ্যে অনুলোম বিলোমের ছন্দিত রূপ। তারপর বাহারমন্দ্ ছন্দ। যাকে বলা যায় সামঞ্জস্যময় সৌন্দর্য। লয়কারীর শেষ ও শ্রেষ্ঠ উপহার। অথচ সুরের লীলাবিহার এসবের অন্তস্থলেই প্রবহমান থাকত। লয়ের এইসব আশ্চর্য সৌন্দর্য কুশলতাও তিনি পিতার কাছে পেয়েছিলেন। আর বামাচরণ নাকি লাভ করেন বারাণসীর কোন কোন গুণীর সঙ্গলাভে।

কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও পেশাদারজীবনে জিতেন্দ্রনাথ কি আর পেতেন? নির্দিষ্ট আর ত সেসব নয়। কখনো শেঠ ওঙ্কারমল জেঠিয়ার কাছে। তাঁর বাড়িতে শিবমন্দিরে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে। কখনো ব্রজেন্দ্রকিশোরের কাছে। কখনো নাটোর ভবনে। নিয়মিত আসরের মুজরো আর কত? যা দিয়ে একটি বাঙ্গালী পরিবারের সংস্থান হতে পারে। বয়সের সঙ্গে তাঁর সংসারও বড় হয়। চার পুত্র, দুই কন্যা, স্ত্রী। কলকাতায় ভাড়াবাড়িতে বাস। জননীও বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ছিলেন। বিবাহ দেন দুই কন্যার। পুত্রেরা তাঁর মৃত্যুকালেও উপার্জনক্ষম হয়নি। তার একটি কারণ তাদের বয়সের অল্পতা। মোট কথা নামী শিল্পী হয়েও কলকাতায় দারিদ্র্য ঘোচেনি জিতেন্দ্রনাথের। অবশ্য সেযুগে বাঙ্গালী পেশাদার গুণীদের উপার্জন ওই রকমেরই ছিল। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে তাঁর নিজেরই একটি দোষ। দারিদ্র্য থেকে নিষ্কৃতির আশায় যে নেশায় পড়লেন, আবার তারই কারণে দারিদ্র্য হল নিত্যসঙ্গী। ঘোড়দৌড় থেকে তিনি ভাগ্য ফেরাতে চেয়েছিলেন।

কলকাতা টাকার সহর। এখানে উপার্জনের যেমন নানা পন্থা তেমনি ব্যয়েরও। আর এখানে দারিদ্র্য বড় লজ্জার। রাণাঘাটের শাস্ত্রজীবী বংশে যা ছিল গৌরবের কলকাতায় জিতেন্দ্রনাথ দারিদ্র্য থেকে বাঁচতে 'রেস' খেলতে আরম্ভ করলেন। সে দুর্দৈব ছিল জীবনের শেষ পর্যন্ত।

রেস খেলবার টাকা হাতে নেই। তবু যে কোন প্রকারে আনতেন টাকা। ধার যখন পাওয়া যেত না, এক একটি রাগ বন্ধক রাখতেন। ধনী, গুণমুগ্ধ পৃষ্ঠপোষক তাঁর। রেসের জন্যে কর্জ দিতে চাইতেন না।

তখন জিতেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করতেন আচ্ছা দরবারি কানাড়া বাঁধা রইল। ত্রিশ টাকা দিন। যতদিন না শোধ দিচ্ছি দরবারি বাজাব না আসরে।

এই সর্তে টাকা ধার পেতেন। দরবারি কানাড়া সে সময় বাজাতেন না-ও। কিন্তু পরিশোধ করবার ক্ষমতা হত না। আবার অন্যত্র আবেদন জানাতেন পরজ বন্ধক রেখে আজ ত্রিশটা টাকা দিন। সেই অর্থে হয়ত মুক্ত করতেন দরবারি কানাড়া। কিম্বা সে টাকাও ঘোড়ার পায়ে আর বাজির চক্রান্তে বিসর্জন দিতেন।

মন্ডলঘাট থেকে এসে প্রথমে তিনি বাস করতেন মধ্য কলকাতায়। কখনো নেবুতলায়। কখনো হিদারাম ব্যানার্জী লেনে। কখনো ২০ আমহার্স্ট স্ট্রীটে। কখনো বৃন্দাবন মিত্র স্ট্রীটে নাহারদের কোন বাড়িতে। শেষ জীবনে দক্ষিণ কলকাতায় নানা অঞ্চলে। কালিঘাটে। ভবানীপুরে। একেবারে অন্তিমপর্বে রূপনারায়ণ নন্দন লেনে। সেই বাড়িতেই ১৯৩৮ সালে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল। বয়স তখন বাষট্টি বছর। লক্ষ্মণের বয়স ২১।

সে সময়ে দিকপাল গুণী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (হরিশ চাটার্জী স্ট্রীটের) বাড়ির কাছে তিনি বাস করতেন। ১৫।১৬ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের প্রতিভার জন্যে।

মৃত্যুর কদিন আগে জিতেন্দ্রনাথ লক্ষ্মণকে বলেন আমি টাকাকড়ি কিছুই রেখে যেতে পারলুম না। কিন্তু এইসব লেখা যা রেখে গেলুম এর যত্ন কর না।

লক্ষ্মণকে তিনি তৈরি করেছিলেন যত্ন করে হাতে কলমে। আকার বহু রাগের লিপিও রেখেছিলেন। ঠিক বামাচরণের মতন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিতেন্দ্রনাথও লিখে রাখতেন ওই রকম। নানা রাগের রূপ, বিস্তার ইত্যাদি। একাধিক খাতায় লিপিবদ্ধ করতেন। যখন যেমন মেজাজ সময় বা সুবিধা হত তাঁর। হয়ত পিতার দৃষ্টান্তেই তাঁর এমনিভাবে লেখার কথা মনে হয়েছিল।

তাঁর সেসব সঙ্গীত ভাবনা ও রচনার সময় স্থান কালের কাণ্ডজ্ঞান থাকত না অনেকদিন। এমন তন্ময় শিল্পী মন যে বললে গল্পকথার মতন শোনাবে। তখন থাকতেন কালিঘাটের নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীটে। রাত্রিরে একলা বসে সুরবাহার বাজাচ্ছেন। কানাড়ার ঘর। বিস্তারের নতুন নতুন রাস্তা যেন খুলে যাচ্ছে মনের পটে। পর্দায় পর্দায় আন্দোলনের টিপ। ভাবলেন লিখে ফেলি। কাল হয়ত ভুলে যাবেন দেওয়া হবে না লক্ষ্মণকে। কিন্তু—শীতের রাত। ঘড়িতে দেখলেন—এগারোটা বেজে গেছে। এত রাতে আরো কতক্ষণ থাকতে হবে বাজনা নিয়ে, এসব লিখতে। বাড়ির অন্য লোকদের অসুবিধা হবে। তখন সুরবাহারটি আর খাতা পেনসিল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। কাছেই একটি পার্ক। তার একধারের বেঞ্চে বসলেন সুরবাহার হাতে। গ্যাসের আলো এসে পড়েছে। তিনি খানিকটা করে বাজান আর লিখে নেন খাতায়। লিপি করা যখন শেষ হল রাতও ভোর হয়ে এসেছে। কানাড়ার যা কিছু নতুন বিস্তার মনে ও হাতে এসেছিল সমস্ত লিখে ফেলাবার পর তাঁর খেয়াল হল—স্থান কালের কথা।...

এমনি একাধিক খাতা তিনি লিখেছিলেন। তার কিছু পেয়েছিলেন লক্ষ্মণ। অনেকটাই ছিল জিতেন্দ্রনাথের এক ধনী শিষ্য ও পোষক পরিবারে। হয়ত বামাচরণের সেইসব লিপিও সেই সঙ্গে ছিল। অন্তত জিতেন্দ্রনাথের খাতাগুলি সেই গৃহে থাকবার কথা জানতেন লক্ষ্মণ।

তাই পিতার মৃত্যুর পর অশোচ যেতেই লক্ষ্মণ সেখানে আবেদন করতে যান—বাবার সেই সব লেখা যদি অনুগ্রহ করে দেন বড় উপকার হয়। সেগুলি বই ছাপাতে দিয়েও কিছু টাকা পেতে পারি আমরা।

কিন্তু বড়ই রূঢ় উত্তর পেয়েছিলেন। তাঁর সে সমস্ত লেখা টাকা দিয়ে আমরা কিনে নিয়েছি। বই ছাপবার মালিক আমাদের। তুমি ভবিষ্যতে কোন দিন এ বাড়িতে এসোনা।

পিতারই মতন নিরীহ স্বভাব লক্ষ্মণ। মাথা নত করে সেখান থেকে চলে এসেছিলেন। আর বলেনি কোনদিন। জিতেন্দ্রনাথের সেই বইও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

(ক্রমশঃ)

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রতিযোগিতা

পরিমল সরকার

পার্থকে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। অদ্ভুত গোখরো সাপের মত ও দুবার [illegible] নিল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসছে। মিঠে হাওয়া আসছে বাইরে থেকে। এই মুহূর্তে সবকিছুই ওর কাছে অগোছাল [illegible]। আকাশটার [illegible] থেকে [illegible] যেমন কৃত্রিম তেমনি কৃত্রিম মনে হয় পৃথিবীটাকে। ঊর্বশীর মত পৃথিবীটাও [illegible] মুখে স্নো পাউডার মেখেছে। ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়েছে। প্রত্যেককে আকৃষ্ট [illegible] করার জন্য যেন গায়ে সেন্ট [illegible]। সর্বাঙ্গ [illegible] [illegible] [illegible]। ঊর্বশীর মুখের দিকে [illegible] [illegible]। ঊর্বশীকে [illegible] [illegible]

—তুমি তাহলে কালিদাসের প্রিয়েষু সৌভাগ্য ফলাহি চারুতা' কথাটাকে মান না একেবারে উড়িয়ে দিতে চাও?

ঊর্বশী হো-হো করে হেসে উঠল বলল,

—নিশ্চয়ই। দেখলে মহাদেব পার্বতীর রূপে ভোলেনি। বরং উল্টোটা হয়েছে। মাঝখান থেকে বেচারা কামদেব মদন নিজের প্রাণটা দিল। পার্বতী কাল মেয়ে ছিল তাই বল। বুঝেছিল রূপ দেখিয়ে মেকে-মেয়ে মহাদেবকে ভোলান যাবে না। মহাদেবকে পাওয়া বড় কঠিন কাজ। মহাদেব ভোলানাথ হলে কি হবে এদিকে বড় সেয়ানা। ভোলানাথকে স্বামীরূপে পাবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সবাই মন্থন করল পার্বতীকে। তপস্যা করো না। একফোটা মেয়ে এত কষ্ট সহ্য করতে পারবে কেন? পার্বতীর মা পার্বতীকে বলেছিলেন উ—মা। তপস্যা কোরো না। তাইতো পার্বতীর আর এক নাম উমা। শেষে পার্বতী কিন্তু মহাদেবকে তপস্যা করেই পেয়েছে। এ তো তোমাদের কালিদাসই কলাও করে লিখে গেছেন।

ঊর্বশীর কাছ থেকে বার বার খোঁচা খেয়ে পার্থ হঠাৎ গুম হয়ে গেল। ঊর্বশীর কাছে হেরে যাওয়ার একটা গ্লানি ওকে ভীষণভাবে বিঁধছিল। বেশ কিছুক্ষণ ও চুপ করে ঊর্বশীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আবার ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সামনে একটা মাঠ। মাঠে ছোট-বড় ছেলেমেয়েতে ভর্তি। সম্ভবত কোন স্কুলের স্পোর্টস হচ্ছে। পার্থ ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। পাশের রাস্তা দিয়ে একটা মেয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। পার্থ সেদিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটার পায়ে বোধহয় একটু ডিফেক্ট আছে। তার চলার ভঙ্গি দেখে তাই মনে হল। এখন পার্থর মেয়েটার জন্যে করুণা হল না। মুখে চুক-চুক শব্দ করে বলল না বেচারা! কেমন যেন রূঢ় হল মেয়েটার উপর। মনে মনে ও বলল তোমার ও-পা নিয়ে তুমি হয়ত একদিন ত্রিভুবন জয় করে ফেলবে। তোমাদের বিশ্বাস নেই। তোমরা সবকিছু করতে পার। তোমাদের জন্যে ট্রামে-বাসে সিট রিজার্ভ থাকে। কেন থাকবে। তোমরা তো আজকাল পুরুষদের চেয়ে কোন কিছুতেই পেছিয়ে নেই। তবুও তোমাদের প্রতি কেন দয়া দেখান হবে। হৃদয়ের দিক থেকেও আজ তোমরা মৃন্ময়ী কুলপ্রদীপ নয় বরং রত্নদীপ কম্প্যানি। পার্থ একটা হাই তুলল। ঊর্বশীকে দেখতে লাগল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার বার দেখল ও। স্লিভলেস আঁটসাঁট ব্লাউজ পরেছে ঊর্বশী। কাপড়টা পায়ের সঙ্গে বেশ শক্ত করে জড়ান। ঠোঁটে লিপস্টিক মুখে ক্রেস পাউডার ইত্যাদি ইত্যাদিতে ও আজ একেবারে সিনেমার কোন এক রোমান্টিক হিরোইন সেজেছে।

পার্থ হঠাৎ ক্রোধ করল। চোখ দুটো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাওয়ার [illegible]

—আমাদের কালিদাসের পার্বতীকে নিয়ে টানাটানির দরকার কি। আমাদের এখানেই তো প্রমাণ আছে।

উর্বশী প্রথমে পার্থর কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারল না। ও ঘরের এদিক-ওদিক তাকাল। কিছুই দেখতে পেল না; অবাক চোখে তাই পার্থর দিকে তাকিয়ে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করে রইল। পার্থর চোখমুখ আনন্দে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হঠাৎ পার্থ হো-হো করে হেসে উঠল.

—বুঝতে পারোনি তো? ঘরের মধ্যে কিছু দেখতে পেলে না না? কিছু থাকলে তবে তো পাবে। আমি তোমার কথা বলছি।

উর্বশী বিস্ময়ে চোখ দুটো কপালে তুলল.

—আমার কথা?

পার্থ আরও জোরে হাসল

—হ্যাঁ তোমার কথা। এই যে তুমি। তুমি আমার ডেরায় ঠিক দুপুর একটায় এসেছো। এসেছো কিনা? উর্বশী ঘাড় নেড়ে পার্থর কথা সমর্থন করল।

—যদি প্রশ্ন করি কেন এসেছ?

উর্বশীকে হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত মনে হল। একটু থতমত খেয়ে বলল.

—জাস্ট গল্প করতে।

পার্থ বিস্ময় প্রকাশ করল।—ভর-দুপুরে জাস্ট গল্প করতে! এনিওয়ে। আমি ধরে নিলাম ইউ আর মাই ফ্রেন্ড এন্ড ইউ হ্যাভ কাম জাস্ট টু গসিপ। পার্থ এবার উকিলের মত জেরা করতে লাগল।

—সাধু উদ্দেশ্য নো ডাউট। তুমি জান দুপুরে বিশেষ করে ছুটির দিনে বাড়ীতে আমি একা থাকি। যদি বলি তুমি আমার একা থাকার সুযোগটা নিয়েছ। অস্বীকার করতে পার?

উর্বশী হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল,

—মানে? হোয়াট ডু ইউ মিন?

পার্থ ছোট্ট করে হাসল;

—তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? টেক ইট ইজি। আমার এখনও অনেক কিছু বলার আছে। যদিও আমরা চুক্তিবদ্ধ, আমরা কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের লুকোচুরি খেলা শেষ করব। যাই হোক আমার প্রশ্ন থেকে আমি সরে যাচ্ছি। যা বলতে চাইছিলাম। এই যে ব্লাউজটা তুমি আজ পরেছ। এ-ধরনের ব্লাউজ তোমাকে আগে কখনও পরতে দেখিনি। বুকের অনেকটা অংশ যাতে সহজে চোখে পড়ে তুমি হয়ত তাই এই ব্লাউজটা পরেছ। অবশ্য আমার ধারণা ভুলও হতে পারে। লিপস্টিক, স্নো পাউডার মেখে তুমি আজ নিজেকে ভীষণ আকর্ষণীয় করে তুলেছ। তোমার গা থেকে এমন একটা মিষ্টি গন্ধ ছাড়ছে যাতে আমি আস্তে আস্তে মাতাল হয়ে পড়ছি। তোমার আজকের এই সাজসজ্জার ব্যাপারে তুমি নিজেকে এমন আকর্ষণীয় করে তুলেছ তাতে আমি কেন একটা চোদ্দ বছরের ছেলে থেকে একটা আশী বছরের বুড়োও যে কাবু হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নির্জন এই ঘরে হঠাৎ যদি আমি কিছু করে ফেলি তুমি হয়ত দোষ দেবে আমাকে। কিন্তু সত্যি করে বলো তো এর জন্যে দায়ী কে? না, মনে হচ্ছে তুমি রেগে যাচ্ছ। ধরে নাও না তোমার আর আমার মধ্যে ডিবেট হচ্ছে। প্রতিযোগিতাও বলতে পার।

উর্বশী উত্তেজনায় হিটারের কয়েলের মত লাল হয়ে উঠল.

—তুমি কি বলতে চাও আমি বুঝি না না? আই অ্যাম নট এ নিউ বর্ণ বেবি। তুমি এত নোংরা? কাওয়ার্ড। অলরাইট··· এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তোমার সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু জানা হয়ে গেল। তুমি আমাকে এত নীচ হীন মনে কর?

পার্থ বুঝতে পারছিল উর্বশী ভীষণ রেগে গেছে। ওকে প্রথমে একটু ঠান্ডা করা দরকার। তা না হলে এখান থেকেই একটা ভুল বোঝাবুঝির পর্ব শুরু হয়ে যাবে। পার্থ তাই অন্য প্রসঙ্গ টানতে চেষ্টা করল;

—তোমার বাবার প্রেসার কমেছে?

পার্থর কথাটা হঠাৎ এই পরিবেশে কেমন যেন বোকা বোকা মনে হল। উর্বশী পার্থর কথার হ্যাঁ-না কোন উত্তর করল না। পার্থ মুখে একটু হাসি টেনে আবার বলল;

—তুমি আচ্ছা মেয়ে যা হোক। সামান্য একটা ব্যাপার ডিসকাসন হল। তাও আমেশ্য টু ফ্রেন্ডস। তুমি এই সামান্য ব্যাপারটাকে এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন? যথেষ্ট বড় হয়েছ চাকরী করছ। এত সেণ্টিমেণ্টাল হলে চলে। যাকগে যেতে দাও। বল চা খাবে, না কফি?

উর্বশী গুম হয়ে বসে রইল। বাইরে সূর্যের আলো ক্রমশ কমে আসছে। মাঠের স্পোর্টস শেষ হয়ে গেছে। স্পোর্টসের কর্মকর্তারা সব চলে গেছে। কয়েকটা কৌতূহলী ছেলে এখনও মাঠে ইতস্তত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। উর্বশী সেই দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। ঘরের মধ্যে পাখা চলছিল তবুও উর্বশীর কপালে বেশ কয়েক বিন্দু ঘাম। উর্বশী রুমালটা বার করে কপাল মুখ চোখ বেশ ভাল করে মুছল।

পার্থ বলল

—বসো কফি নিয়ে আসি।

উর্বশী উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাতে ব্যাগটা তুলল বলল

—আমি কফি খাব না। কফি খাবার জন্যে তোমার এখানে আমি আসিনি।

পর্থ বলল.

—না তুমি দেখছি ভীষণ রেগে গেছ। এক মিনিট তুমি বোসো. আমি এক্ষনি আসছি।

পার্থ উর্বশীকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উর্বশী ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেয়ালের ছবিগুলো দেখতে লাগল। পার্থর বাবা মা দিদির ছবি। একখানা বড় অয়েল পেণ্টিংয়ের কাছে উর্বশী এসে দাঁড়াল। সম্ভবত পার্থর ঠাকুরদার ছবি। পার্থর বাবার মুখের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে। তবে পার্থর বাবার চেয়ে পার্থর ঠাকুরদার চোখ মুখ আরও তীক্ষ্ম। চোখে মুখে বেশ একটা বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। উর্বশী বার বার ছবিটা দেখছিল। উর্বশীর দাদুর সঙ্গে পার্থর ঠাকুরদার চেহারায় অনেক মিল আছে।

পার্থ এসে ঘরে ঢুকল। হাতে দু কাপ কফি আর কিছু বিস্কুট।

উর্বশী এবার হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল.

—না, আমি আর বসব না। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে।

পার্থ একটু বিস্ময় প্রকাশ করল.

—বারে তোমার জন্যে কফি তৈরি করে নিয়ে এলাম. কফিটা অন্তত খেয়ে যাও। আচ্ছা বাবা বেশ, আমি তোমাকে যে কথা-গুলো বলেছি সব উইথড্র করছি। অন্যায় যদি কিছু বলে থাকি তার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি।

উর্বশী এবার রীতিমত নায়িকার ভঙ্গিতে পার্থর মুখোমুখি হল. বলল,

—গরু মেরে জুতো দানের অভ্যেসটা তোমার বেশ ভালই জানা আছে দেখছি।

পার্থ ঠান্ডা গলায় বলল

—আমি তো আমার অপরাধ স্বীকার করছি। আই কনফেস দ্যাট আই অ্যাম কাউয়ার্ড। হয়েছে এবার?

উর্বশী পার্থকে একটু অপমান করার জন্যে চেয়ারে বসল। উর্বশী পার্থর টেম-পারামেন্ট জানে। পার্থ পারতপক্ষে এখন ডিফেন্ড করবে না। ডিফেন্ড করার চেষ্টাও করবে না। ও কাফটা তুলে নিল। কফিতে এক চুমুক দিয়ে টেবিলে কাপটা নামিয়ে রাখল, বলল

—তোমাকে আমার কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আছে।

পার্থ বলল

—তুমি একটা কেন হাজারটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পার।

উর্বশী পার্থকে খোঁচা দেবার জন্যে বলল

—তুমি অস্বীকার করতে পার আমার আগে তুমি দুটো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছ।

পার্থ উর্বশীর উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারল। হঠাৎ ও হেসে ফেলল,

—তুমি দেখছি এখনও ভীষণ রেগে আছ।

উর্বশী বলল

—আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু আমি পাইনি।

পার্থ বলল.

—আমার জীবনের সবই তুমি জান। তোমাকে আমি বলেছি। তুমি ভাল করেই জান তুমিই আমার জীবনে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং শেষ। তবুও আমাকে এ-ধরনের প্রশ্ন করছ কেন? আমি তো বলেছি আমি যদি তোমায় কিছু অন্যায় বলে থাকি তবে তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। যাকগে যেতে দাও। সব দোষই আমার। এদিকে বাড়ীতে ভীষণ তাগাদা দিচ্ছে। আর এভাবে দূরে দূরে থাকাটাও ভাল লাগছে

না। পিসিমণীর একটা দিন দেখে আমাদের শুভ কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়া দরকার।

উর্বশী এ ধরনের কথাই পার্থর কাছ থেকে আশা করছিল। সুযোগ বুঝে উর্বশী পার্থকে ছোবল দিল

—বাঃ, বেশতো! আমি কি তোমাকে কোন ফাইনাল কথা দিয়েছি নাকি?

পার্থর মুখে কে যেন এক পোঁচ কালি বুলিয়ে দিল

—কেন? আমরা তো এনগেজড।

উর্বশী প্রবল বেগে মাথা নাড়ল

কক্ষনো না। তোমার যাকে ইচ্ছা তুমি বিয়ে করতে পার, তাতে আমার কি? বিয়েটা সারা জীবনের জন্যে। এটা কি ছেলের হাতের মোয়া? একটা ফেলে দিয়ে আর একটা নিলাম। তাছাড়া তোমাকে আমার ভাল করে জানাই হয়নি।

—এই ছ' বছর ধরে দেখেও না?

—না। একটা মানুষকে জানার পক্ষে ছ' বছর যথেষ্ট নয়। অন্ততঃ এখনও চার বছর লাগবে।

পার্থ রীতিমত লাফিয়ে উঠে বলল

—অসম্ভব। আমার পক্ষে চার বছর ওয়েট করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

উর্বশী একটু গম্ভীর হয়ে বলল

—তুমি যদি ওয়েট না কর বুঝব তুমি কাউয়ার্ড। প্রতিযোগিতায় তুমি হেরে গেছ।

উর্বশী আর দাঁড়াল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

মেয়েদের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

দিল্লীতে মেয়েদের ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি দারুণ উত্তেজনার মধ্যে অমীমাংসিত থেকে গেছে। অস্ট্রেলিয়া জয়লাভের দোরগড়ায় এসে মাত্র তিন রানের জন্যে ভারতকে হারাতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়ার ৮ম উইকেট পড়ার পর দলের ক্যাপটেন উইলসন খেলতে নামেন। তখন খেলা শেষ হতে মাত্র এক ওভার বাকি। এই শেষ ওভারের শেষ বলে উইলসন বোল্ড আউট হয়ে যান। তখন দলের রান ১১৮—জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান থেকে মাত্র ৩ রান কম।

প্রথম দিনেই ভারতের প্রথম ইনিংস ১৮১ রানের মাথায় শেষ হয়। শান্তা রঙ্গস্বামী ৯২ রান করে আউট হন। ৯ম উইকেটের জুটিতে শিরীন কিয়াস এবং শান্তা রঙ্গস্বামী দলের অতি মূল্যবান ৭৯ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়া কোন উইকেট না খুইয়ে ১ রান করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংসের ১৭৫ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। লিনেট স্মিথ দলের সর্বোচ্চ ৬৬ রান করেন। ক্যাথি গারলিক ৩২ রান করে নটআউট থেকে যান। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ১৪ রান করেছিল।

শেষ তৃতীয় দিনের লাঞ্চের সময় ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৭৯ (৩ উইকেটে)। কিন্তু লাঞ্চের পরবর্তী সময়ের খেলায় ভারত দারুণ সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার ন্যাটা স্পিন বোলার, এস চ্যাপম্যান মাত্র এক রান দিয়ে ৩টে উইকেট পান। চা-পানের আধঘণ্টা আগে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ১১৪ রানের মাথায় শেষ হয়। চ্যাপম্যান ২৫ রানে ৫টা উইকেট পান। প্রথম ইনিংসে পেয়েছিলেন ৫৯ রানে ৪টে উইকেট।

অস্ট্রেলিয়া জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১২১ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। খেলার এক সময় অস্ট্রেলিয়ার ৩টে উইকেট পড়ে ১১২ রান উঠেছিল—জয়লাভের থেকে মাত্র ৯ রান কম। কিন্তু তাড়াতাড়ি এই ৯ রান তুলতে গিয়ে তারা আরও ৬টা উইকেট হারায় মাত্র ৬ রানের বিনিময়ে। দলের ১১৮ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়। শেষ বলে আউট হন দলনেত্রী উইলসন।

ক্যাথলিন গারলিক : মেয়েদের ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ৩য় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সেঞ্চুরী করেন (১৫০ নটআউট)।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত : ১৮১ রান (শান্তা রঙ্গস্বামী ৯২ রান। মার্টিন ২৬ রানে ৪ এবং চ্যাপম্যান ৫৯ রানে ৪ উইকেট)

ও ১১৪ রান (সুধা শাহ ২৮ রান। মার্টিন ৪১ রানে ৪ এবং চ্যাপম্যান ২৫ রানে ৫ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ১৭৫ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। লিনেট স্মিথ ৬৬ এবং ক্যাথলিন গারলিক নটআউট ৩২ রান। একুলজি ৪৩ রানে ২ এবং লোপামুদ্রা ভট্টাচার্য ৪৭ রানে ২ উইকেট)

ও ১১৮ রান (৯ উইকেটে। স্মিথ ৪৭ নটআউট এবং গারলিক ৪৩ রান। শান্তা রঙ্গস্বামী ৫৪ রানে ৫ উইকেট)

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট

ইডেনের রঞ্জি স্টেডিয়ামে মেয়েদের ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলাতেও জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি, আগের দুটির মত খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে ২৩৮ রান সংগ্রহ করেছিল। ক্যাথলিন গারলিক ১০৫ রান করে নটআউট থাকেন। লিনেট স্মিথ ৬১ রান করে রান-আউট হন। স্মিথ এবং গারলিক ২য় উইকেটের জুটিতে ১৫২ মিনিটে ১৩৯ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। প্রথম দিকে খুবই মন্থর গতিতে রান উঠেছিল—প্রথম ঘণ্টায় ২০ রান এবং পরবর্তী ঘণ্টায় ৩৮ রান। লাঞ্চের সময় বিনা উইকেটে ৫৮ রান উঠেছিল। চা-পানের সময় অস্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়ায় ১৫৯ (১ উইকেটে)।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের ৩০১ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ক্যাথলিন গারলিক ১৫০ রানে নটআউট থেকে যান। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারত ৯ উইকেটে ১৭৫ রান তুলে কোনরকমে ফলো-অন থেকে অব্যাহতি পায়।

খেলার শেষ তৃতীয় দিনে ভারতের প্রথম ইনিংস ১৭৬ রানের মাথায় শেষ হয় এবং অস্ট্রেলিয়া তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ৭২ রানের মাথায় (৩ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে, খেলার বাকি সময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৯৮ রান তুলতে ভারত দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৮৬ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) খেলাটি শেষ হলে মাত্র ১২ রানের জন্যে ভারত জয়লাভে বঞ্চিত হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৩০১ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ক্যাথলীন গারলিক ১৫০ নট আউট এবং লিনেট স্মিথ ৬১ রান। রুনা বসু ৬৮ রানে ২ এবং এডুলজি ৮৫ রানে ২ উইকেট)

ও ৭২ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গারলিক ৫১ নট আউট। রুনা বসু ২০ রানে ১ এবং রঙ্গস্বামী ২৪ রানে ১ উইকেট)

ভারত : ১৭৬ রান (শোভা পণ্ডিত ৪২ রান। মার্টিন ৩৮ রানে ৩ এবং চ্যাপম্যান ৩৭ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৮৬ রান (৫ উইকেটে। শান্তা রঙ্গস্বামী ৫৫ এবং ফৌজী খলিলি ৪৫ রান)

রেদের ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ৩য় টেস্ট ক্রিকেট খেলার ২য় ইনিংসে ভারতের শোভা পান্ডিত এবং ফৌজী খালিল ব্যাট করতে নামছেন

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তান

প্রথম টেস্ট ক্রিকেট

লাহোরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেছে।

প্রথম দিন মাঠ ভিজে থাকায় পুরো সময় খেলা হয়নি চার ঘণ্টা খেলা হয়েছিল। লাঞ্চের আগে খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড টসে জিতে পাকিস্থানকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান। প্রথম দিনের খেলায় পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১১১ রান সংগ্রহ করেছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলার রবার্টস ২৭ রানে ৪টে উইকেট পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ১৯৯ রানের মাথায় শেষ হয়। শেষ ১০ম উইকেটের জুটিতে অধিনায়ক ইন্তিখাব আলম (২৯ রান) এবং আসিফ মাসুদ (নটআউট ৩০ রান) দলের অতি মূল্যবান ৫৭ রান সংগ্রহ করে দেন। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৩৯ রান তুলেছিল। কালিচরণ ৪০ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ২১৪ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ১৫ রানে এগিয়ে যায়। এইদিন ৭৫ রানের বিনিময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৬টা উইকেট পড়েছিল। কালিচরণের দুর্ভাগ্য তিনি সেঞ্চুরী করতে পারেননি। ৯২ রান করে তিনি অপরাজিত থেকে যান। সরফরাজ ৮৯ রানে ৬টা উইকেট পান। তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে ১৫৩ রান করেছিল।

চতুর্থ দিনে পাকিস্তান তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ৩৭৩ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। চতুর্থ দিনে পাকিস্তান ৩৩০ মিনিট খেলে আরও ৩টে উইকেট খুইয়ে ১২০ রান যোগ করেছিল। মুস্তাক মহম্মদ ৪৬৬ মিনিট খেলে ১২৩ রান করেন (বাউন্ডারী ১২টা)। ৩৭টি টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর এটা ৭ম সেঞ্চুরী।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩৫৯ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং কোন উইকেট না পড়ে তাদের ১৫ রান উঠেছিল।

শেষ পঞ্চম দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৫৮ রানের মাথায় (৪ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়—জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩৫৯ রানের থেকে ১০১ রান কম। লিওনার্ড বেচান ১০৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। টেস্ট খেলায় তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে লয়েড (৮৩ রান) এবং বেচান ১৬৪ রান সংগ্রহ করে এ বিষয়ে পূর্ব রেকর্ড ভেঙ্গে দেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৪র্থ উইকেট জুটির পূর্ব রেকর্ড ছিল—১৬২ রান (সোবার্স এবং কানহাই, লাহোর ১৯৫৮-৫৯)।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান : ১৯৯ রান (আশিফ মাসুদ নটআউট ৩০ রান। রবার্টস ৬৬ রানে ৫, বয়েস ৫৫ রানে ৩ এবং গিবস ২১ রানে ২ উইকেট)

ও ৩৭৩ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মুস্তাক মহম্মদ ১২৩ এবং বাশুচ নটআউট ৬০ রান। রবার্টস ১২১ রানে ৪ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ২১৪ রান (কালিচরণ ৯২ নটআউট। আসিফ মাসুদ ৬৩ রানে ২, সরফরাজ নওয়াজ ৮৯ রানে ৬ এবং ইন্তিখাব আলম ১৭ রানে ২ উইকেট।

ও ২৫৮ রান (৪ উইকেটে। বেচান নটআউট ১০৫, লয়েড ৮৩ এবং কালিচরণ ৪৪ রান। ইন্তিখাব ৬০ রানে ২ উইকেট)

১৯৭৪ সালের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়

আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান ক্রীড়া-সাংবাদিকদের ভোটে আমেরিকার জিমি কোনর্স ১৯৭৪ সালের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে 'মার্টিনী এবং রোসী গোল্ড র‍্যাকেট' পুরস্কার লাভ করেছেন। ভোটের ফলাফল এইরকম দাঁড়ায় : ১ম জিমি কোনর্স (আমেরিকা) ২য় জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া) এবং ৩য় জি ভিলাস (আর্জেন্টিনা)।

জিমি কোনর্স

অম্বর রায়

মাঠের নায়ক

ভাগ্যকুলের রাজবাড়ীর ছেলেরা জন্মেই নাকি ক্রিকেট খেলতে সুরু করে। এক কথায় বলতে গেলে অধুনা কুমারটুলি পাড়ার ভাগ্যকুলের বাড়ীটি একটি ক্রিকেট ঘরানার অস্তিত্ব জিইয়ে রেখেছে। এ বাড়ীর পঙ্কজ রায়কে সারা ভারতের ক্রিকেট অনুরাগীরা চেনেন। চেনেন সাগরপারে দেশ বিদেশের অনেকেই। নিঃসন্দেহে পঙ্কজ রায় ভারতীয় ক্রিকেট অঙ্গনে ভাগ্যকুল পরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোজ্জ্বল উপহার কিন্তু তা বলে অন্যরাও উপেক্ষণীয় নন।

গোড়া থেকেই ধরা যাক। রঙ্গলাল রায় ননীলাল রায় ক্ষীরোদলাল রায় ক্রিকেট এবং ফুটবলের সূত্রে অবিভক্ত তথা বিভক্ত বাংলার সর্বজন পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এঁদেরই কর্মে এবং ঘর্মে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। পরলোকগত বিচারপতি কিরণলাল রায়ও যৌবনে ভাল ক্রিকেট খেলেছেন টাউন ক্লাবের হয়ে। পরবর্তী পর্বে সর্বশ্রী পঙ্কজ রায় গোবিন্দ রায় নিমাই রায় অম্বর রায় এবং প্রণব রায় বাংলার ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে, এঁদের মধ্যে পঙ্কজ রায় সর্বোত্তম কিন্তু অন্যান্য রায়েরাও উপেক্ষণীয় নন।

উদাহরণ হিসেবে অম্বর রায়ের নাম স্বাভাবিক কারণেই এসে পড়ে। অম্বর স্বকীয় ক্রীড়া-দক্ষতায় ভাস্বর। অম্বর অনন্য। অম্বর মুখ্যতঃ ব্যাটসম্যান কিন্তু বোলিংয়েও অফ স্পিন যে তাঁর দক্ষতা নেই একথা বললে নিঃসন্দেহে ভুল বলা হবে। অনেক উত্তেজনাকর মুহূর্তে অম্বর রায়ের বল নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি করেছে। তবু অম্বর রায়ের বোলারের ঐ ভূমিকাটি তেমনভাবে স্বীকৃত নয়, যেমনভাবে তাঁর স্বীকৃতি অসাধারণ আত্মপ্রত্যয় গড়া ব্যাটসম্যান হিসেবে। অম্বর রায় ব্যাটসম্যান। অখণ্ড আত্মবিশ্বাস, অকুণ্ঠ একাগ্রতা শান্ত সমাহিত মেজাজ বিচক্ষণতা এবং

প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব তাঁকে একটি পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ ক্রিকেটার হওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। হাতের কব্জার জাইভ পুল সুইপ লেট কাট মাঝে মাঝে যেন ছবি হয়ে ওঠে।

আগেই বলেছি ভাগ্যকুলের রায় পরিবারের ছেলে অম্বর। বাবা অজিত রায় সম্ভবতঃ অম্বরের সবচেয়ে বড় গুণগ্রাহী উৎসাহদাতা। মা দুর্গা দেবীও অম্বরের আর এক প্রেরণা। অম্বর শৈশবে লেখাপড়া করেছেন শৈলেন্দ্র সরকার স্কুলে। ওখান থেকে ৬৪ সালে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে ভর্তি হন বিদ্যাসাগর কলেজের সান্ধ্য বিভাগে। বি-এ পাশ করেন ১৯৬৮ সালে। বিয়ের পাট চুকে গেলেও অম্বরের এখনও পড়ার পাট চোকে নি। এবার ল-য়ের ফার্স্ট পার্ট দিয়েছেন। স্ত্রী বীণা চান খেলার সংগে তাল রেখে অম্বর লেখাপড়াটাও চালিয়ে যাক। সত্যি কথা বলতে কি, অনেকটা স্ত্রীর চাপে পড়েই অম্বরকে বই নিয়ে বসতে হচ্ছে। স্টেট ব্যাংকের চাকরী, ছেলে অনিন্দ্যের আবদার এবং মাঠ ময়দানের খেলা অব্যাহত রেখেও।

ক্রিকেটে হাতেখড়ি অম্বরের ১৯৫৮ সালে। প্রকৃত প্রতিভা চাপা থাকে না বলে অম্বর প্রায় আবির্ভাবের সংগে সংগেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন স্পোর্টিং ইউনিয়নে (দীর্ঘ ১৭ বছরে ক্লাব ছাড়েন নি একদিনের জন্য)। ১৯৫৮-৫৯ থেকে ১৯৬২-৬৩ পর্যন্ত একনাগাড়ে বাংলার হয়ে কোচবিহার ট্রফিতে (আন্তঃ রাজ্য স্কুল ক্রিকেট) খেলেছেন। বাংলা স্কুল দলের অধিনায়ক ছিলেন ১৯৫৯-৬০ সালে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য অম্বরের নেতৃত্বে ঐ ১৯৫৯-৬০ সালে বাংলা স্কুল দল কোচবিহার ট্রফি বিজয়ী হয়। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটের আসরে কলকাতার অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন অম্বর। ৬৭-৬৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে রোহিংটন বারিয়া ট্রফি জয়ের গৌরব অর্জন করে। ফাইনালের আসর বসেছিল সেবার আমেদাবাদে। অম্বর ছিলেন কলকাতার অন্যতম খেলোয়াড়। দলনেতা—সুবীর গাঙ্গুলী।

রণজি ট্রফিতে অম্বরের প্রথম প্রবেশ ১৯৬০-৬১ সালে। তারপর একটানা খেলে চলেছেন আজ পর্যন্ত। ১৯৬৮-৬৯ এর মরসুমে তাঁর ওপর বাংলা দলের নেতৃত্ব দেওয়ার ভার পড়ে। পরের বছর অবশ্য নেতা বদল হয়। অম্বরের জায়গায় আসেন চুণী গোস্বামী। বাংলা সেবার মূল ফাইনালে উঠে বোম্বাইয়ের কাছে হেরে যায়। দলীপ ট্রফিতে অম্বর খেলছেন ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে। ১৯৭০-৭১-এ বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত দলীপ ট্রফির ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে অম্বর ছিলেন পূর্বাঞ্চলের ব্যাটিং শক্তির অন্যতম উৎস। ৫৯-৬০ সালে ভারত সফরকারী পাকিস্থান ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে জামশেদপুরে খেলেছেন পূর্বাঞ্চলের হয়ে। বয়স তখন নেহাৎই কাঁচা।

রণজি ট্রফির আসরে অম্বর রায়ের ভূমিকাটি রীতিমত উজ্জ্বল। রণজি ট্রফির আসরে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিলেন ১৯৬৪ সালে বিহারের বিরুদ্ধে মাত্র ১৯ বছর বয়সে। তারপর থেকে একটানা খেলেই চলেছেন। তাঁকে বাদ দিয়ে বাংলা দল বলতে গেলে ভাবাই যায় না। রণজি ট্রফি প্রতিযোগিতায় অম্বর এ পর্যন্ত দশটি সেঞ্চুরী করেছেন। এটি অবশ্য রেকর্ড নয় কেননা অম্বরের কাকা পঙ্কজ রায় এর চেয়ে আরও বেশীসংখ্যক সেঞ্চুরীর অধিকারী। পঙ্কজ রায়ের পরই অম্বরের স্থান। রণজির আসরে অম্বরের সর্বোচ্চ রান হোল ১৯৭। কটকের বারবাটি স্টেডিয়ামে ব্যাটিং দক্ষতার ঐ অসাধারণ নজীর রেখেছিলেন ১৯৬৫-৬৬ সালে। দু বছর বাদে অর্থাৎ ১৯৬৮ সালে দলীপ ট্রফিতে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে অম্বরের (পূর্বাঞ্চল) সেঞ্চুরীটিও ভোলবার নয়। এ ছাড়া কতবার যে তিনি সেঞ্চুরীর দোরগোড়ায় গিয়ে ফিরে এসেছেন তার হিসেব নেই। ১৯৬৬ সালে মাদ্রাজে শ্রীলংকার বিরুদ্ধে অম্বর রায় জীবনের সর্বপ্রথম বেসরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন। ঐ বছরই সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের অন্যতম সদস্যরূপে শ্রীলংকা একাদশের বিরুদ্ধে ১৩৬ রান করেছিলেন অপরাজিত থেকে। সফরকারী দলের বিরুদ্ধে আমেদাবাদ টেস্টে ছিলেন দ্বাদশ খেলোয়াড়। '৬৪ সালে নিউজিল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে নাগপুর টেস্টে ৪৮ রান করেছিলেন। সেরা ব্যাটসম্যানরূপে চিহ্নিতও হয়েছিলেন। দিল্লী ও বোম্বাই টেস্টেও অম্বর দ্বাদশ খেলোয়াড়রূপে মনোনীত হয়েছিলেন। '৬৬ সালে শ্রীলংকার বিরুদ্ধে বেসরকারী টেস্ট পর্যায়ের খেলায় অম্বরের ভূমিকা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টম্যাচে দিল্লীতে অম্বর তেমন সুবিধে করতে পারেন নি। কলকাতায়ও না। কলকাতায় আউট হয়ে গিয়েছিলেন ১৮ রান করে।

ব্যক্তিগত জীবনে অম্বর রায় সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ নীহার মিত্রের কাছে। তাঁর কাছ থেকে অম্বর অনেক কিছু শিখেছে ক্রিকেটে অনেক কিছু পেয়েছেনও।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলার জগতে মেয়ে

আর এক জিমন্যাস্ট

চায়না পাল

রাজ্য জিমন্যাস্টিক দলের আর এক সম্ভাবনাময়ী কিশোরী ক্রীড়াকুশলী হচ্ছে চায়না পাল। চায়না জিমন্যাস্টিক শিখতে সুরু করে আজ থেকে ছ'বছর আগে।

এ-ও রাণাঘাটের মেয়ে। বর্তমানে লাল-গোপাল গার্লস হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। চায়নার বাবা প্রবীরকুমার পাল রাণাঘাটের একজন প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী। ওরা সাত বোন, চার ভাই। ছোট বোন পার্বতীও জিমন্যাস্টিক খেলায় তালিম নিচ্ছে।

—প্রধানতঃ আমার মেজদাদা গৌর পালই আমাকে জিমন্যাস্টিক শিখতে উৎসাহিত করেন। তবে পরে বাবা এবং মাও তা সমর্থন করেন। বাড়ীতে আমার দাদা-দিদিরাও নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা করছেন। আমাদের বাড়ী বিশ্বাস পাড়ায়।

—তুমি রাণাঘাটে জিমন্যাস্টিক শিখলে কার কাছে?

—রাণাঘাট জিমন্যাস্টিক ক্লাবে শ্রীফাকির দফাদারের কাছে। জিমন্যাস্টিকে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ও'র কাছ থেকেই পাই। পরে উনি আমাকে এখানে এই বহুবাজার ব্যায়াম সমিতিতেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

—কোন্ কোন্ বিভাগে সাধারণতঃ অনুশীলন কর?

—বীম ব্যালেন্স, আনইভনবার লাও হর্স আর ফ্লোর একসারসাইজ এই চারটি বিভাগে। আমাদের এখান সব মেয়েকেই প্রধানতঃ এই চারটি বিভাগে তালিম দেওয়া হয়।

চায়না জাতীয় স্কুল প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছে। '৭২ সাল থেকে রাজ্য প্রতিযোগিতার আসরে নামছে। সে বছর কলকাতার চারটি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বীম ব্যালেন্সে তৃতীয় স্থান দখল করে। পরে চন্ডীগড়ে জাতীয় জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় রাজ্য দলে স্থান পায়। সে বছর বাংলার মেয়েরা দলগত বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। চায়নার মত কিশোরীর পক্ষে প্রথম বারেই জাতীয় আসরে সুযোগ পাওয়া কম কৃতিত্বের কথা নয়। পরের বার অর্থাৎ ৭৩—৭৪-এ রাজ্য আসরে চায়না বীম ব্যালান্সে ব্রোঞ্জ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর এক ধাপ উঠে ফ্লোর একসারসাইজেও তৃতীয় স্থান দখল করে। ঐ বছরও ত্রিপুরায় জাতীয় আসর বসলে চায়না বাংলা দলে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায় এবং এবারও বাংলার মেয়ে দল দ্বিতীয় স্থান লাভ করে কৃতিত্ব প্রকাশ করে। '৭৫-এ রাজ্য প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। এবার চায়না বীম ব্যালেন্সে, আনইভনবার ও ফ্লোর একসারসাইজে যোগ দিয়ে প্রত্যেকটিতেই ৩য় স্থান লাভ করে। এই আসরে প্রথম দুটি বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে এই ব্যায়াম সমিতিরই মেয়ে ভারতী দাস। এবারও চায়না জাতীয় জিমন্যাস্টিকে বাংলা দলে স্থান পাবার আশা করে।

—জিমন্যাস্টিকের জন্য বিশেষ ধরনের খাদ্য দরকার হয় না?

ী তাত হয়ই। কিন্তু আমাদের মত মধ্যবিত্ত ঘরের লোকেদের পক্ষে ষ্টী পুষ্টিকর খাদ্য যেমন মাংস, ফল, জী নিয়মিত পাওয়া খুবই অসুবিধা-। বাড়ীর আর সবারের কথাও তো হয়। তবু যতদূর সম্ভব বাড়ীতে র খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়।

না বলে, জানেন, আমরা চণ্ডীগড়ে র মেয়েদের কাছে শুনেছি, ওদের রাজ্যের ছেলেমেয়েদের জিমন্যাস্টিকে জন্য যত্নখানি সম্ভব সুযোগ দেন। ছেলেমেয়েদের নিয়মিত লিন তো আছেই। ওদের শারীরিক বাড়িয়ে তোলার জন্য স্বল্প খরচায় ম-মাংস দেবার ব্যবস্থা আছে। লনের পর পুষ্টিকর জলযোগের ও করা হয়। ওরাজ্যে জিমন্যাস্টিকে উৎসাহী। আমাদের মত নয়। এখানে কউ আমাদের বা আমাদের ক্লাবের রাখে না।

ওদের প্রশিক্ষক সন্তোষ ওঝাও বললেন, নানারকম অসুবিধার মধ্যে নিজেদের ক্ষমতা নিয়ে যতটুকু পারি, করছি। ন্যাস্টিক শেখা খুবই কষ্টকর, এর কাশলও বেশ দুরূহ। তবে একথা ার করতেই হয়, আমাদের মেয়েরা খুব র সঙ্গে শিখছে।

অন্যান্য রাজ্য জিমন্যাস্টিকের জন্য খানি যত্ন নেয়, আমাদের এখানে ততটা। বরং বলা চলে খুবই সামান্য। ভাল আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই। কায়ক্লেশে নরকমে পুরানো সাজসরঞ্জাম নিয়ে ক্ষণ ও অনুশীলন চালাতে হয়। এখানে ন জিমন্যাস্টিক প্রশিক্ষণ ক্লাবের সংখ্যাও কম। তাছাড়া, অধিকাংশ শিক্ষার্থীই স মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। অর্থাৎ নতঃ আর্থিক সমস্যার জন্যই আমাদের লাময়রা যথোপযুক্ত সুযোগ সুবিধা চ্ছ না।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও দেখুন আমাদের মেয়েরা কি সুন্দর সুন্দর ফিগার তৈরী । এদের একাগ্রতা অসীম।

আমাদের এখনকার মেয়েরা দূর থেকে আসে জিমন্যাস্টিক শিখতে। লনা তো এরা কেউ বাগাঘাট, কেউ খড়দা ভৃতি অঞ্চল থেকে আসে। এখনকার দিনে ন আর বাসের অনিশ্চিত অবস্থাও এদের নুশীলনের পথে অন্তরায়। তবু এদের মর জোর অসাধারণ।

চায়না বলে, জিমন্যাস্টিক করার সঙ্গে শা আমাদের পড়াশোনাও নিয়মিত চালিয়ে তে হচ্ছে। ক্লাস পড়া না বলতে পারলে াই নেই। বাড়ীর কাছে ভালরকম অনু-লনের ব্যবস্থা না থাকায়, ট্রেনে আসতে । তারপর বাস আছে। এখানে পৌঁছে ন হয়ে পড়ি। তবু, জিমন্যাস্টিক আমি ই ভালবাসি। তাই অত বাধা সত্ত্বেও শন যাবৎ অনুশীলন নিয়মিত চালিয়ে ছি।

—আমি ত। স্কুলে এথলেটিক প্রতি-যোগিতায় নামি। এবার চারশ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছি। তবে ঐত বললুম জিমন্যাস্টিকই আমি সবচেয়ে ভালবাসি। তাই এই খেলাটি মন দিয়ে শিখছি। এক একটা 'ফিগার' ঠিক ঠিকভাবে করতে পারলে কি আনন্দ হয়, তা আর কি বলব?

—অন্য রাজ্যের আসরে গিয়ে কি রকম অভিজ্ঞতা হল?

—অন্য রাজ্যের মধ্যে পাঞ্জাবের কথাতো আগেই শুনেছেন। ত্রিপুরাতেও জিম-ন্যাস্টিকের চর্চা বেশ ভাল রকম হয়। আগে কেন্দ্রীয় সরকার (কেন্দ্রীয় শাসনের সময়) আর এখন রাজ্য সরকার ত্রিপুরার জিম-ন্যাস্টদের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তাই ওখানেও এই খেলাটি বেশ ভালভাবে চলছে।

—তোমার ভবিষ্যৎ বাসনা কি?

—বেশ ভাল করে জিমন্যাস্টিক চর্চা করে সর্বভারতীয় আসরে বাংলার নাম প্রতিষ্ঠিত করা।

—তুমি বিদেশী জিমন্যাস্টদের বিষয় পড়ো না?

—পড়বার সুযোগ পাই না। কারণ, ওদের বিষয় যেসব পত্র পত্রিকায় বের হয়, তা আমরা নিয়মিত পাই না। তাছাড়া বিদেশী জিমন্যাস্টরা এদেশে এলে, তাদের খেলা দেখার সহজ সুযোগও পাই না। চড়া দামের টিকিট কিনে আমাদের পক্ষে ওই সব খেলা দেখা সম্ভব হয় না। আমাদের জন্য সংগঠকরা কিছু ব্যবস্থা করলে তো পারেন। তাছাড়া ঘন ঘন যেমন বিদেশী ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস দল আসে, জিমন্যাস্ট দলতো সেরকম আসে না। অনেক বছর পরে একবার আসে। সে সময় দেখার সুবিধাই থাকবে না।

বিদেশী পত্র-পত্রিকায় ইংরেজী ভাষায় ঐসব দেশের জিমন্যাস্টদের বিষয় প্রকাশ হয় বলে সেসব পড়ে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এদের পক্ষে সম্ভব হয় না বলে চায়না জানাল। আমাদের বাংলা পত্র-পত্রিকায় ওসব দেশের কৃতি জিমন্যাস্টদের কথা লেখা হলে পড়ার বড় সুবিধা হয়।

জিমন্যাস্টিক ক্লাবে জিমন্যাস্টিক ক্রীড়া সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা নিয়মিত রাখার পরামর্শও চায়না দিল।

—রাশিয়া, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি দেশের জিমন্যাস্ট মেয়েদের জীবনী বাংলা ভাষায় পেলে বড় ভাল হয়। এদের কথা জেনে নিজেরাও সেভাবে তৈরী হবার চেষ্টা করতে পারি। বিদেশী জিমন্যাস্টদের সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল খুবই। চায়না বলে, আচ্ছা আমাদের সরকারী তথ্যকেন্দ্র তো ইচ্ছা করলে বিদেশী জিমন্যাস্টদের বিষয়ে তৈরী ছায়াছবি দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারেন।

—হ্যাঁ চেষ্টা করলে তা পারেন। সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করা যায়।

চায়নার কাছ থেকে অনেক কিছু জানা গেল। তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আর উৎসাহ দিয়ে ফিরে এলাম।

অময়

দেশবিদেশের খেলা

অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনে ট্রিপলজাম্প-ইভেন্টে ক্রমান্বয়ে যেন একটা উল্লেখনীয় ঐতিহ্য গড়ে উঠছে। এক অলিম্পিকের চ্যাম্পিয়ান পরের অলিম্পিকে সেরা।

১৯৫২ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত গত ৬টি অলিম্পিকে একই ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত। ১৯৫২-র হেলসিংকি ও ১৯৫৬-র মেলবোর্ণ অলিম্পিকের ট্রিপল জাম্পে ব্রাজিলের এডিমার দিশিলভা পর পর দুবার চ্যাম্পিয়ান। আবার ১৯৬০ সালের রোম ও ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকেও পোল্যান্ডের যোয়েফ শিটমিড উপর্যুপরি দুবার সেরা। এই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে ১৯৬৮ সালে মেকসিকোতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে এগিয়ে এলেন সোভিয়েট রাশিয়ার ভিকটর স্যানিয়েভ। ১৯৭২-এর মিউনিখ অলিম্পিকেও ভিকটর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করে পূর্বসূরীদের যোগ্য উত্তরসাধক হিসেবে চিহ্নিত।

মিউনিখ অলিম্পিকের প্রাক্কালে ট্রিপল-জাম্পকে কেন্দ্র করে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনার ঝড় উঠেছিল। যদিও অধিকাংশের অভিমত ভিক্টরের অনুকূলে ছিল তবুও সংশয় দানা বেঁধেছিল অপর সম্ভাবনাময় কয়েকজনকে ঘিরে। এদের মধ্যে পূর্ব জার্মানীর ড্রিগেল, রুমানিয়ার ক্যারল করবু ও ব্রাজিলের নেলসনের নাম উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু প্রতিযোগিতার আসরে ভিক্টর স্যানিয়েভ অকপটে সব দ্বিধার অবসান ঘটিয়ে মেকসিকোর সোনা মিউনিখেও

উপর্য্যুপরি দুই অলিম্পিকে সেরা

নিজের অধিকারে রাখেন। ভিক্টর ১৭-৩৫ মিটার লাফিয়ে প্রথম ও পূর্ব জার্মানীর ড্রেমেল ১৭-৩১ মিটার লাফিয়ে দ্বিতীয় হন। ভিক্টরের এটি ট্রিপল জাম্পে বিশ্ব-রেকর্ড। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে এই উচ্চতা লম্ফন করে তিনি নিজের গড়া পূর্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ইতিপূর্বে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন ১৯৫২ সালে ব্রাজিলের এধিমার দিসিলভা ও '৬৪ সালে পোল্যাণ্ডের যোয়েফ স্মিটমিডের।

ভিক্টরের সাফল্য কুসুমাস্তীর্ণ পথের অনুগামী ছিল না। বাবা চিররুগ্ন হয়ে শয্যাশায়ী। অসহায় মা শক্ত হাতে হাল ধরলেন সারা পরিবারটিকে বাঁচিয়ে রাখবার গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে। বাগানের মালীর চাকরী নিলেন সামান্য বেতনের বিনিময়ে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর গৃহে ফিরে এসে হাড় জিরজিরে ছেলে ভিক্টরের দেখাশুনা করতেন। রোগাক্রান্ত স্বামীর সেবা করতেন। মাসের শেষে ঘাটতি খরচ মেটাবার জন্যে ধার দেনা করতেন। ভিক্টরের স্নেহশীলা মা সন্তানের দিকে নজর দেওয়ার সময় খুব কমই পেতেন। সত্যি কথা বলতে কি ভিক্টরের ছেলেবেলা কেটেছে অযত্নে অনাদরে অর্ধাহারে কণ্টকিত পথে। তখন কে জানত সহস্র দুঃখ কষ্টের হার্ডল পেরিয়ে এই কিশোরটি ভবিষ্যৎ জীবনে হবে বিশ্ব বিশ্রুত।

সোভিয়েত রাশিয়ার লেসেলিডজ্ শহরকে অ্যাথলেটদের জন্মভূমি বলা যায়। ভ্যালেরিয়ুমেল থেকে সুরু করে অতি আধুনিক রুশ জাতীয় অ্যাথলেটদের অনুশীলনভূমি। এইখানেই কিশোর ভিকটর দিনের পর দিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে ট্রাক এণ্ড ফিল্ডের প্রতি অনুরক্ত হন। একই সঙ্গে হপস্টেপ ট্রিপলজাম্প লং জাম্প দৌড় প্রভৃতি ইভেন্ট শুরু করেন। স্বল্প-কালের মধ্যে রুশ-প্রশিক্ষক একপক ওসোলিয়ানের নজরে পড়েন এবং তারই তত্ত্বাবধানে অনুশীলন আরম্ভ করেন। বিভিন্ন সময়ে ভিকটর ট্রাক এণ্ড ফিল্ডের বিভিন্ন ইভেন্টে সফলকাম হলেও শেষ পর্যন্ত প্রশিক্ষকের নির্দেশে ট্রিপল জাম্পকেই বেছে নেন এবং চরম উৎকর্ষ লাভের জন্যে একাগ্রভাবে আত্মনিয়োগ করেন। শেষ পর্যন্ত মেক্সিকো অলিম্পিকের কষ্টিপাথরে সর্বোচ্চ লাফ দিয়ে নিজেকে সেরা প্রতিপন্ন করেন। আর মেক্সিকোর অলিম্পিকের স্বর্ণোজ্জ্বল পুনরাবৃত্তি নিঃসন্দেহে ভিকটরকে এক অনন্য মর্যাদায় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আটাত্তর কেজি ওজনের মানুষ ভিকটর স্যানিয়েভ ব্যক্তিগত জীবনে একজন আদর্শবান কৃষিবিদ। মাঠের বাইরে কৃষি-বিষয়ক পরীক্ষা নিরীক্ষাতেই অধিকাংশ সময় কাটে। জর্জিয়ার অন্তর্গত ট্রান্সককেশিয়ান অঞ্চলে অ্যাথলিট ভিকটরের নাম দক্ষ কৃষিবিদ হিসেবে কিছু কম নয়। কৃষিবিষয়ক গবেষণায় ডিপ্লোমাধারী। ব্লাকসীর তীরবর্তী ভিকটর স্যানিয়েভ বিয়ে করেছেন মেডিক্যাল ছাত্রী টানিয়া খভাতাস্কিয়াকে। অন্তরঙ্গ জীবন সঙ্গিনী টানিয়াই ভিকটরের জীবনের বাড়তি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার মূল উৎস।

প্রশান্ত দাঁ

কিছুক্ষণ

রঞ্জিত মল্লিক

কাকে দিয়ে শুরু করা যায়? সত্যিই তো কাকে নিয়ে শুরু ক'র। পরদিনই সরস্বতী পুজো। এই দিনে কার কাছে গিয়ে চড়াও হব। হঠাৎ মনে পড়ল একটা নাম।—রঞ্জিত মল্লিক।

মৌচাক সুপার হিট হবার পর এখন তিনি তো অনেকের মতে ইয়ং জেনা-রেশনের এক নম্বর রোমান্টিক নায়ক। মেয়েদের মধ্যে ইতিমধ্যে তাঁকে নিয়ে রসালো গপ্পোও হতে শুনেছি।

সুতরাং মাথাটাকে বিশ্রাম নেবার অনুরোধ জানিয়ে রাত্তির তো কাবার হোল। আর সত্যিই বিনা নোটিশে হাজির হলাম মোহিনীমোহন রোডের মল্লিক-বাড়ীতে। দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়েই পেলাম বাধা। ওপরে ওঠা আর গেল না! ভাবলাম কেঁচে গেল সব। মুখখানা পরিতাপিষ্ট ডিগ্রী কোণে তুলতেই দেখি বাধা দিয়েছেন স্বয়ং বোচা ওরফে শীতেশ রায় ওরফে রঞ্জিত মল্লিক। বাংলা ছবির জগতের যা আগেই বলেছি নাম্বার ওয়ান 'সট-আফটার' হিরো। আমায় মুখ খোলার কষ্ট না দিয়ে তিনিই বলে উঠলেন—'ওপরে পরে যাবেন, আগে চলুন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আসি।'

আমি স্পিকটি নট। বোবা প্রায়। ফিল্মের হিরো রঞ্জিত মল্লিক সরস্বতী পুজোয় পুষ্পাঞ্জলি দেবে! ভাবতে পারছি না। ফিল্ম ম্যাগাজিনে পাবলিসিটির জন্য সাজানো কিছু ছবি-টবি তোলা হয় বিভিন্ন পোজে শুনেছিলাম। সত্যিকার পুষ্পাঞ্জলি! একটা শব্দই শুধু বেরোল—'চলুন।'

রাস্তা পেরিয়ে ডানদিকের ঠাকুর-দালানে ঢুকে দেখি সকলে বেরিয়ে যাচ্ছে। মানে পুজো শেষ। রঞ্জিতবাবু গিয়ে পুরুতমশাইকে পাকড়াও করলেন। বললেন—'সেকি ভটচাযিমশাই আমি পুষ্পাঞ্জলি দেবো না?' বারবেলা পড়ে যাবে, আরও পুজো বাকি ইত্যাদি নানা অজুহাত দিয়েও রঞ্জিতকে নিরস্ত করতে পারলেন না পুরুতমশাই।

আমাকে পাশে নিয়ে দাঁড়ালেন রঞ্জিত-বাবু। ফুল-বেলপাতা দিলেন আমাকে। হাতজোড় করে পুষ্পাঞ্জলি সারা হলো। পুরুতমশাই তিনবারের মন্ত্রকে একবারেই সারলেন। সময়াভাব আর কি! অবশ্য সেজন্য রঞ্জিত মল্লিকের ভক্তির কোনো ত্রুটি দেখলাম না। বেশ আন্তরিকতার সংগেই প্রণাম করলেন তিনি।

তারপর এক বন্ধুকে সঙ্গে দিয়ে আমায় বললেন—'একটু বসুন গিয়ে আমি আসছি।' অবশ্য পাশের পাঞ্জাবীর দোকানে চায়ের অর্ডার দিতে ভুল হয়নি। একটু বাদে যখন ফিরলেন, সঙ্গে তখন আর দুই

দাদা। একজন চণ্ডীদা আরেকজন বুড়োদা। (নামগুলো পরে জেনেছি অবশ্য)।

ঘরোয়া আসর বসে গেল চারজনের। কিন্তু বাইরে তখন মুখোমুখি দুই মাইকে ঝগড়া চলছে। একজন বলছে 'ঝুম বরাবর ঝুম শরাবি' অপরজন—'ম্যায় না ভুলুঙ্গা, ম্যায় না ভুলুঙ্গা'। আরেকটু দূরে থেকে মিহি সানাইয়ের সুর। আর তিনে মিলে সাউণ্ডমণ্টাজের এফেকট। একজনের কথা অন্যজন শুনছে অনেক কষ্টে। বললাম—'উঃ এ তো বিরক্ত করে মারলো দেখছি।'

রঞ্জিতবাবু দেখলাম বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। বরং হাসতে হাসতে বললেন—'তা যাই বলুন, মাইক-টাইক না চললে পুজো বলেই মনে হয় না। একটু অসুবিধে হলেও একটা হলিডে মুড আসে কিনা বলুন?' নিঃশব্দে হাসি ছাড়া তখন আর কিছু করার ছিল না। বাইরের রাস্তায় তাকাতে দেখি কে একজন রঞ্জিতবাবুকে উইশ করে বেরিয়ে গেল। শুধুমাত্র ঐ একজনই নয়। আমি থাকতে থাকতেই কম করে দশজন।

আসর জমেছে। পাঞ্জাবীর দোকান থেকে আসা চা ততক্ষণে প্রায় শেষ। বুড়োদা ওরফে রঞ্জিতবাবুর জ্যাঠতুতো দাদা ঘরে ঢুকেই বললেন—'তুই অমানুষকে হারাতে পারলি না রে!'

—কি বলছ দাদা ওখানে গুরু হিরো! আর আমি কোথায়? বলেই একগাল হাসি ছড়িয়ে দিলেন তিনি। আমাদের গায়েও তার ঢেউ লাগল। রঞ্জিতবাবুর কাছেই শুনেছিলাম এই বুড়োদা নাকি খুব মেজাজী আর হুজুগে লোক। প্রমাণও পেলাম সেদিন।

টেবিল টেনিসের সেদিন ফাইনাল ডে। একখানা টিকিট কেটেছিলেন তিনি। সকাল বেলা খেলা দেখতে যাবেন কি যাবেন না—এই নিয়ে পড়েছেন দোটানায়। খেলা হচ্ছে কিনা খবর জানার জন্যই পত্রিকা অফিসে ফোন করলেন একটা। যুগান্তর কিনে এনে দেখলেন—কোন খবর নেই। তবুও হাল ছাড়লেন না বললেন—'যাই একবার দেখেই আসি।'

ঘর ছেড়ে যাবার সময় বললেন—'রঞ্জিত, তুই হিরো হওয়ায় আমাদের কি মুশকিল হয়েছে জানিস? নিজেদের পরিচয়টা আমরা প্রায় হারাতে বসেছি। লোকের সঙ্গে দেখা হলে বলে—'আপনি রঞ্জিত মল্লিকের দাদা!' বোঝো ঠ্যালা। কার নামে কে খায়! বলেই কাঁধে একখানা স্নেহের থাপ্পর কসিয়ে তিনি ঘরের বাইরে।

চায়ের পাট চুকিয়ে বললাম—'শুনলাম কালই ফিরেছেন আউটডোর থেকে। কোন ছবির জন্যে গিয়েছিলেন?'

—অপরাজিতা।

: ওঃ ওঃ সেই রোমান্টিক গানের দৃশ্যের সুটিং করতে?

—হ্যাঁ। আরও দু-একটা সিন ছিল।

রঞ্জিত মল্লিক শুধু নয় রোমান্টিক গান যখন—স্বাভাবিকভাবেই নায়িকা রাজশ্রী বসুও ছিলেন সঙ্গে। ভাবুন তো একবার দৃশ্যটা। ভয়ানক রোমান্টিক লাগবে। রঞ্জিত-রাজশ্রী নরিম্যান পয়েণ্টে ওবেরয় শেরাটন হোটেলের অপজিটে হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পরিচালক অমিতাভ দাশগুপ্তের গ্রীন সিগন্যাল দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্লে-ব্যাক সাউণ্ডে বেজে উঠলো—

যদি একথাই বলি আমি
আরও একবার তুমি যে আমার...

দুজনে হেঁটে চলেছেন। গলায় গান বাজছে সামনে উত্তাল সমুদ্র। ক্যামেরাম্যান বেণুবাবু সেলুলয়েডে দুজন প্রেমিক-প্রেমিকাকে চিরদিনের মত ধরে রাখছেন এমন সুন্দর ব্যাকগ্রাউণ্ডে। প্রেমের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে জুহুর বীচে এসে প্রেমের ছবি তুলতে তুলতে যখন বেণুবাবু প্রায় ক্লান্ত, তখনও রঞ্জিত ওরফে মান্না দে গাইছেন—

আরও একবার যদি দেখা হয়
আবার তখনই সেই দেখা চায়
এইভাবে বারবার স্বপ্ন শুধু তোমার
দেখবো আবার তুমি যে আমার...

এরই মধ্যে রঞ্জিত-এর বুকে মুখ লুকিয়ে রাজশ্রীর প্রথম প্রেমের স্বাদ নেওয়া আরব সাগরের লোনা হাওয়ায় আঁচল খসিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়া বা ইণ্ডিয়া গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সাগরপারের স্বপ্ন দেখা সবকিছুই হয়ে গেছে। পাঁচ-ছটা দিনও কাবার চোখের পলকে।

রঞ্জিত মল্লিকের কাছে সুটিং-এর গল্প শুনতে শুনতে আমিই প্রায় প্রেমে পড়ে যাবো যাবো ভাব। মাইকের সাউণ্ডমণ্টাজ কখন কানের পর্দা পেরোতে পারছে না। বন্ধে চলে গেছি সবাই। আমাকে রঞ্জিতবাবুর বলার কায়দাটাই মাৎ করেছে।

রোমান্টিক সিন করতে কেমন লাগে জিজ্ঞেস করতে সলাজ হাসি ছুঁড়ে বললেন—'মন্দ কি পর্দায় রোমান্স ব্যাপারটা সত্যিই রোমান্টিক। রিয়্যাল লাইফে তো আর হোল না পর্দাতেই প্রেম করি—আর কি!'

চণ্ডীদা ইতিমধ্যে কখন চেয়ার শূন্য করে চলে গেছেন। দুজনে বসে আছি।

জানলা দিয়ে দুজন ভদ্রলোক মুখ বাড়াতে রঞ্জিতবাবু তাঁদের একটু অপেক্ষা করতে বললেন। উনি ভেবেছেন—আমি নিশ্চয়ই ইণ্টারভিউ-ফিউ কিছু নিতে গেছি বুঝি! তাই আলোচনায় ছেদ টেনে বললেন—'কি ব্যাপার ধরবাবু, আপনার আসার কারণটাইতো জানা হয়নি।'

—কোনো কারণ নেই। এমনিই এসেছিলাম। কি আর বলব এছাড়া। এই ফাঁকে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছি। বললাম—'আপনাদের বাড়ীতে তো শুনেছিলাম সব পুজোই হয়। সুতরাং সরস্বতী পুজো নিশ্চয়ই হচ্ছে। তাই অঞ্জলি দিতে এলুম আর কি।' বলেই একগাল হাসি।

রঞ্জিতবাবু বুঝলেন ব্যাপারটা সত্যি নয়। চেপে ধরলেন আমাকে।

—না না বলুন তো কি ব্যাপার?

যখন দেখলাম উনি প্রায় নাছোড়বান্দা তখন ফস করে বলেই ফেললাম—'লেখার মশলা খুঁজতে এসেছিলুম।'

: ঠিক আছে, আসুন একদিন।

—না তার আর দরকার হবে না। আমার কাজ হয়ে গেছে।

রঞ্জিতবাবু চুপ। হাসতে হাসতে দরজার বাইরে এসে গুডবাই করার জন্য আমার হাতটা ধরে বললেন—'সত্যি বলছেন, মশলা পেয়ে গেছেন।'

: সত্যি না তো মিথ্যে? দেখবেন ক'দিন বাদে। কালই হয়তো আমাদের ফোটোগ্রাফার এসে হানা দেবে।

নির্মল ধর

সেদিন দুজনে

প্রযোজনা : চলচ্চিত্র ভারতী

দুর্বল কাহিনীর অভিনয়

সমৃদ্ধ চলচ্চিত্রায়ন।

সুমিত্রা মুখার্জি। দেবরাজ রায়। সিদ্ধার্থ দত্ত

স্বনামধন্য আদিত্য মুখার্জীর একমাত্র পুত্র অর্ঘ প্রতাপ, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ায়, ডিবেটিং ও খেলাধূলোয়ও সে চৌখস ছেলে। আচমকা কফি হাউসে এক ঘটনার মধ্যে দিয়ে পরিচয় হল এম-এ ক্লাসের নতুন ছাত্রী শিখারাণী পাঠকের সঙ্গে। ধীরে ধীরে ও'রা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হোল। ক্রমে ওঁদের প্রেম পর্ব প্রকট হয়ে দেখা দিল।

শিখাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও আর্থিক অবস্থার কথা জেনে আদিত্য মুখার্জী ছেলের প্রেমকেও যেমন স্বীকার করে নিতে পারলেন না, তেমনি শিখারাণীকে পুত্রবধূ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে রাজী হলেন না। এমনকি ওরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও হতাশা নিয়ে ফিরে এলো ও'রা। এই অসামাজিক বিয়ের ফলে ইতিমধ্যে অর্ঘকে পিতার সংস্পর্শ ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে অন্যত্র। স্কুল মাস্টারী করে অর্ঘ ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। অন্যদিকে শিখাও গান শেখাত আর বাচ্চাদের পড়াত। এক সময়ে ফাইনাল পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পেয়ে পাশ করে ভাল একটা চাকুরীও পেল অর্ঘ। তবু ওরা সুখী হতে পারলো না। শিখা চায় সন্তান। অবশেষে সত্যিই মা হতে চলেছে শিখা, কিন্তু অর্ঘের মনে শান্তি নেই। ডাক্তারের ধারণা মা হলে শিখা বাঁচবে কিনা সন্দেহ। শেষ পর্যন্ত সত্যিই অপারেশনের পর শিখা মারা গেল। দুর্বল কাহিনী ও চিত্রনাট্যের জন্যে ছবি জমে উঠতে পারে নি। অগ্রদূতের মত শক্তিমান পরিচালক, যিনি একদা বহু হিট ছবি উপহার দিয়েছেন, তিনিও কাহিনীর গতানুগতিকতার জন্যেই বোধ হয় ছবিটিকে খুব একটা আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন নি। ছবির শেষ অংশে, যেখানে কাহিনীর সঙ্গে এরিখ শেগালের লভ স্টোরীর কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়, সেই অংশে পরিচালক হিসাবে তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

বহির্দৃশ্যের আলোকচিত্র গ্রহণে পরিচালকের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পাদকের কাঁচি কখনও কখনও আরো নিষ্ঠুর হতে পারতো। কলাকৌশলের অন্যান্য কাজ পরিচ্ছন্ন। সুধীন দাশগুপ্তের সুন্দর সুরে মান্না দে ও আরতি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানগুলি শুনতে ভাল লাগে। এ ছবির বিশেষ আকর্ষণ অভিনয়। শিখার ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেছেন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। ছাত্রী, প্রেমিকা, মানসিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত স্ত্রীর ভূমিকাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন উনি। অন্যান্য ভূমিকায়— দেবরাজ রায়, উৎপল দত্ত, নমিতা বিশ্বাস, অসিতবরণ সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

শর্মিলা । মিস জ্যানেথ ম্যাকয় ও রাজশ্রী বসু

সুরজিৎ সরকার কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও কালো-বাজারী। ইনকামট্যাক্সের হাত থেকে কালো টাকা বাঁচাতে গিয়ে উনি কেবল দুশ্চিন্তারই শিকার হলেন না, হৃদরোগেও আক্রান্ত হলেন এক সময়। সিমেন্ট ব্লাক করে এক অসৎ ইঞ্জিনীয়ারের কবলে পড়ে ওঁকে মান, সম্মানও খোয়াতে হোল একদা। অন্যদিকে জমানো কালো টাকা খরচ করবার জন্যে তিনি স্ত্রী ও কন্যার জন্যে হীরা জহরতের গহনা বানাবেন এবং ছেলেদের পেছনে নানাভাবে অর্থ খরচ করে ইনকামট্যাক্সকে ফাঁকি দিতেন। তিন ছেলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ইন্দ্রজিত ব্যবসা দেখে। বিয়ে করেছে এক দক্ষিণ ভারতীয় রমণী শুভলক্ষ্মীকে। মেজো বিশ্বজিৎ চাকুরী করে। ব্রাহ্মণের মেয়ে সুপর্ণাকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। কনিষ্ঠ অন্য ভাইদের মত বিলেতে পড়াতে গিয়ে ইংরেজ মেয়ে লরেণকে বিয়ে করে দেশে ফিরেছে।

একমাত্র মেয়ে শর্মিলা। গৃহশিক্ষক সমীরণকে ভালোবাসে, সুরজিৎবাবু ভবিষ্যতের কথা ভেবে সমীরণকে জবাব দিয়ে এক বৃদ্ধ গৃহশিক্ষককে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু একবারও ভাবলেন না যে ভালবাসার মোহ কাটাতে না পেরে সমীরণই বৃদ্ধ অধ্যাপকের ছদ্মবেশে শর্মিলাকে পড়িয়ে যাচ্ছে।

একদিন আচমকা সুরজিৎ সরকারের ব্যবসায়ে বিপর্যয় নেমে এলো। পুরনো বন্ধু ঝুনঝুনওয়ালা ওর কালো টাকার কথা পুলিশে জানিয়ে আসে এবং ওঁর সহকারী যাবতীয় গোপন অ্যাকাউন্টের তথ্য ইনকামট্যাক্সকে বলে দেয়। ফলে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়, ব্যাংকের যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরিবারের দৈন্যের দিনে ভাইয়েরা যখন সম্পত্তির ভাগাভাগিতে ব্যস্ত, তখন শর্মিলাই এগিয়ে এলো মার পক্ষ নিয়ে। আর শর্মিলাকে বধূর মর্যাদা দিতে এগিয়ে এল সমীরণ।

এ ছবির অন্যতম সম্পদ অভিনয়। শর্মিলার ভূমিকায় রাজশ্রী বসু তিনটি শট ডিভিশনের মাধ্যমে (সমীরণের সঙ্গে রোমান্টিক মুহূর্তে, বৃদ্ধ অধ্যাপকের সঙ্গে হাস্যকৌতুকে ও পরিবারের বিপর্যয়ের দিনে সমবেদনায়, বিশেষ করে ভাইফোঁটার দৃশ্যে) বুঝিয়ে দিয়েছেন, উনি নবাগতা হলেও অভিনয় জানেন। শুভলক্ষ্মীর ভূমিকায় বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়ও সুন্দর অভিনয় করেছেন। সমীরণের ভূমিকায় শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় চরিত্রানুযায়ী।

কলাকৌশলের তথা আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ পরিচ্ছন্ন। বিশেষ করে সুধীন দাসগুপ্তের সংগীত পরিচালনা ও অনিল সরকারের সম্পাদনা উল্লেখ করার মতো।

শর্মিলা

প্রযোজনা : সিনে কোয়ালিটি

ভাবাবেগপূর্ণ নাটকের

উপভোগ্য চিত্ররূপ

শক্তি সামন্ত পরিচালিত চরিত্রহীন সঞ্জীবকুমার/শর্মিলা ঠাকুর

ফ্লোর থেকে বলছি
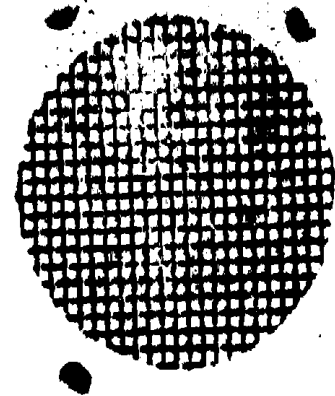
যেতে যেতে কত নদীর সঙ্গে দেখা। কত পাহাড়ের সঙ্গে দেখা। কত গাছ-পালার সঙ্গে দেখা। কত মানুষজনের দেখা। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ানো শুধু। এক একটা স্টেশন কিম্বা সিগন্যাল। আবার ছুটে চলা। আবার নদী পাহাড় গাছপালা এবং মানুষজন। এরই মধ্যে স্তূপাকৃতি কিছু শব্দের ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া। ঝিক ঝিক ঝিক—আদি-অনন্তকাল ধরে এইভাবে শব্দগুলো জট পাকাচ্ছে আর খুলছে। অনেকটা জীবনের মতো। শব্দের উৎস মুখে এসে দাঁড়ায়। একটা শূন্য প্রান্তে। ওইমতো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়। রত্নেশ্বর অপলক তাকিয়ে থাকে। যতদূর দেখা যায়। দৃশ্য মিলিয়ে যায়, শব্দ মিলিয়ে যায়—রত্না ছুটতে ছুটতে চলে আসে। মাত্র দশ বছরের তার জীবন, মুহূর্তে স্থির হয়ে যায়। সময় তার কাঁধে এসে হাত রাখে। সেই শব্দ সেই দৃশ্য ফিরে ফিরে আসে। বুঝিয়ে দেয় —আমি অমনি করে আসি, অমনি করে যাই। রত্না এর মধ্যে জীবনের অর্থ খুঁজে বেড়ায়। একটা তুচ্ছ কারণে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে হয় ওকে। রত্নার কাছে সেই দিনটি ভয়ংকর। বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশে ফেটে পড়েছে। আপাততঃ আকাশ ফেটে পড়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। দেখা যায় কিছু সংখ্যক কলাকুশলী কৃত্রিম উপায়ে ফ্লোর ভাসিয়ে দেবার উদ্যোগ করছেন। অন্যদিকে আলো করা হচ্ছে। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর এই ফ্লোরের মধ্যে বর্তমানে এলাহি ব্যাপারের প্রস্তুতি চলছে। বালতি বালতি জলের আয়োজন করা হয়েছে। যাতে আলোর বন্যা বয়ে যায় তার ব্যবস্থাও হয়েছে। ক্যামেরা বাঁচিয়ে জল ফেলার জন্য কলাকুশলীরা সুবিধেমত জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ঠিক হল সমস্ত আলো জ্বলে উঠলে, ক্যামেরা চালু হলে পরিচালকের নির্দেশ এলে তবেই বৃষ্টিপাত হবে। বেশ ভাল কথা। আমরা সব শুটিং দর্শনার্থীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। জোন ছেড়ে বেশ কিছুটা দূরত্বেই রয়েছি। ইতি-মধ্যে একটা রিহার্সাল হয়েছে। আলোর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে সহকারী পরিচালকরা ছুটলেন শিল্পীদের খবর দিতে। একে একে ফ্লোরে পদার্পণ করলেন। অনিল চট্টোপাধ্যায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় মাস্টার অংশুপ্রকাশ এবং একাধিক নতুন মুখ। প্রবীণ পরিচালক চিত্র বসু অনেক দিন পর ছবি করছেন। সেটা একবারের জন্যও মনে হয় নি। মনে হয়েছে সময়ের সঙ্গে তিনি সমানে পা ফেলে চলতে পারেন। তাঁর নিষ্ঠা আন্তরিকতা এবং কর্মকুশলতা মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে দেয়। এইবার তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় দৃশ্য বিস্তারিত করছেন শিল্পীদের। অনিল চট্টোপাধ্যায় যথারীতি প্রায় বৃদ্ধ। এই ধরনের বেশী বয়েসী চরিত্রে তিনি আজকাল জমিয়ে অভিনয় করছেন। এর প্রমাণ সুজাতা। পুরোপুরি বৃদ্ধ সেজেছেন তপন সিংহের 'রাজা' ছবিতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ছবিতে তাঁর অভিনয় বহুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রসঙ্গত আরেকটি ছবিতে অভিনয়ের কথা স্মরণ করতে হয়—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বন্দীবিধাতা। এই ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায়কে চরিত্র থেকে আলাদা করে এক মুহূর্তের জন্যও ভাবা যাবে না। এখন স্র

ছবির শুটিং হতে চলেছে তার নাম গুমটি-ঘর—এখানে তাঁর কি ধরনের চরিত্র জানা হয় নি। জানা হয়েছে শুধু—তিনি সিদ্ধেশ্বর নামক একটি বিশেষ চরিত্র রূপায়িত করছেন। স্ত্রী বিজলীর ভূমিকায়—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এঁরা দুজনেই একটা তুচ্ছ কারণে বরং বলা ভাল, অভিমানবশতঃ ছেলেটিকে বেদম প্রহার করবেন। অবশেষে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। মায়ের মন, তার ছেলেকে এভাবে বের করে দিতে চান নি। তিনি ভেবেছিলেন রত্না আর যাবেই বা কোথায়। এদিক ওদিক একটু ঘুরবে ফিরবে চলে আসবে। পেটে আগুন জ্বললে ঘরের বাইরে কতক্ষণ থাকবে। রত্না নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।

কিন্তু রত্না ফিরে এল না। বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। এলোমেলো বাতাস বইছে। রত্না সবকিছুকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলে। একাকী অন্ধকারে। সেই দৃশ্য আর শব্দ ফিরে ফিরে আসে। রত্না সেই দিকেই ছুটতে থাকে। তারপর আর কিছু মনে নেই তার। দুর্ঘটনা। কিছু মনে করতে পারে না। এক নতুন পরিবারে তার আগমন হয়েছে। এখানে এক তরুণ দম্পতি—সত্যপ্রসন্ন-অপর্ণা। একমাত্র মেয়ে রীণা। ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে ওঠে রত্না। ফেলে আসা কোন দৃশ্যই তার চোখে এসে ভীড় করে না। কোন শব্দই কানে এসে পৌঁছয় না। তার কাছে অতীত মৃত। বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুনভাবে শুরু করতে চেষ্টা করে রত্না। কিন্তু বাদ সাধেন অপর্ণা। তিনি শত হলেও বংগনারী। তিনি তো আর রাস্তার ছেলেকে নিজের হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন না। বংশ পরিচয়হীন এই ছেলেকে তিনি আশ্রয়দান করে কৃতার্থ করেছেন সেটা বলাই বাহুল্য। সত্যপ্রসন্ন এ বিষয়ে মাঝে মাঝেই অপ্রসন্ন হন। স্ত্রীর মুখের সামনে কিছু বলতে পারেন না। মনে মনে মেঘ জমা করেন। ঝড় উঠবে বৃষ্টি হবে—এতো সকলেরই জানা। জানা হল, পরিণতিতে তীব্র ক্লাইম্যাকস। সেই ট্রেন—শব্দ ও দৃশ্য। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হয়। রত্না আপন মনে ট্রেন লাইন ধরে এগিয়ে চলেছিল। ওভারব্রীজ থেকে লক্ষ্য করছিল রীণা। সে প্রাণপণে ছুটল। রত্না, রীণার কথা শুনতে পেল না। শেষ পর্যন্ত রীণা রত্নার কাছে পৌঁছে গেল। ট্রেনটা দুরন্ত গতিতে বেরিয়ে গেল। লাইনের পাশে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রইল রত্না। একসময় জ্ঞান ফিরে এল। শব্দ ও দৃশ্য—বার বার ওকে ছুঁয়ে গেল। ওর ভাবনা চিন্তার রাজ্যে মেঘ জমল। ঝড় উঠল। বৃষ্টি এলো। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রত্না ফিরে পেল স্মৃতিশক্তি। তার বাবাকে। মাকে। ফিরে এল সব সব কিছু। সে স্মৃতির মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূর এগিয়ে গেল। পিছিয়ে এল। হ্যাঁ এখনই এতটা এগিয়ে যাবার দরকার নেই। সবে তো চিত্রনাট্যের সূত্রপাতে পড়ে আছি। এ ছবির শুটিং শুরু হয়েছে গত মাসে। গড়িয়া এবং ধ্রুলিভিতে বহির্দৃশ্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে মূলতঃ এ ছবির শুটিং শুরু হয়েছে। এই প্রথম অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের কাজ করা হচ্ছে। পরিকল্পনা মত পরিচালক শ্রীবসু সদলবলে আবার বহির্দৃশ্য গ্রহণ করতে বেরিয়ে পড়বেন। আদ্রায়। সেখানে ছবির চূড়ান্ত দৃশ্যগুলি গ্রহণ করা হবে। উল্লেখযোগ্য ছবিতে কয়েকটি ট্রেন দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখানো হবে। কোনরকমভাবে স্টক-শট ইউজ করে নয় রীতিমত শুটিং করা হবে। সেজন্য রেল কর্তৃপক্ষ সাহায্যদান করতে সম্মত হয়েছেন। কয়েক কামরা যুক্ত কিছু ট্রেন নিয়ে শটগুলি টেক করা হবে। সত্যিকারের দুর্ঘটনা ঘটানো হবে। এই সব দৃশ্যগুলো ধরে রাখা হবে ক্যামেরায়। আদ্রায় বিরাট রেলওয়ে ইয়ার্ড শুটিং করার অনেক সুবিধে।

ইকনমিক প্রোডাকসন্সের পতাকাতলে নির্মীয়মান এই ছবির কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার ঃ মণি বর্মা। আলোকচিত্র শিল্পী ঃ বিভূতি চক্রবর্তী। শিল্প নির্দেশক ঃ সুনীল সরকার। এ ছবির সংগীত পরিচালক ঃ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দুখানা গান রেকর্ড করা হয়েছে। একটি গান রেকর্ড করেছে মানসী—সংগীত পরিচালকের কন্যা। বয়স আট কি নয়। এই গান পিকচারাইজ করা হবে রত্নেশ্বরের লিপে। অন্য গানটি গেয়েছেন সংগীত পরিচালক স্বয়ং।

এ ছবির অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন ঃ দিলীপ রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় সোমাই সেনগুপ্ত প্রভৃতি। এতদসত্ত্বেও আরো কিছু নতুন মুখ।

স্টুডিও সংবাদদাতা

আলমগীর কবির পরিচালিত—সূর্যকন্যা ঃ জয়শ্রী রায়

চৈতালী/সারদাবাদ

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

অংকুর ছবিতে কাজ করে বিখ্যাত শবানা আজমীকে নিয়ে কয়েকজন নায়কের বেশ কৌতূহল আছে। যেমন রণধীর কাপুর। রণধীর ওর পিছু নিয়েছে দিল্লী থেকে। দিল্লীতে ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অ্যাটেণ্ড করতে গিয়েছিল দুজনেই। ওখানে শবানার লেটেস্ট ফিঁয়াসে শেখর কাপুর অনুপস্থিত, অতএব রণধীর ওরফে ডাব্বু আদাজল খেয়ে লেগে গেল। অশোকা হোটেলে রাতের পার্টিতে ডাব্বু শাবানার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে অনেকবার। এমন কি ডাব্বু তার নিজের ঘরে খাবারও আমন্ত্রণ জানিয়েছে, কিন্তু শাবানা ভীষণ চালু মেয়ে। ডাব্বুর সংগে কথা বলেছে। ঘনিষ্ঠ হয়ে ছবি তুলেছে। হাতে হাত রেখে গল্প করেছে কিন্তু ঠিক সময়মত কেটে পড়েছে। ডাব্বুর তো আক্কেল গুড়ুম। আচ্ছা মেয়ে তো। গেল কোথায়। খোঁজ খোঁজ। ততক্ষণে শাবানা নিজের ঘরে গিয়ে নিদ্রা দিয়েছে। ডাব্বু ওর ঘর পর্যন্ত ধাওয়া করবে ভেবেছিল—কি মনে করে শেষ মুহূর্তে ডিসিশান চেঞ্জ করে। এমনিভাবে শাবানা তার কথা বলার সঙ্গী চেঞ্জ করে। ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। হৃদয়ের ব্যাপারে একদম নেই। সে কি। শাবানা বলে : হ্যাঁ মশাই, আমি কারুর সঙ্গে শত্রুতা করতে চাই না। একজনের সংগে প্রেম করলে সব ছোকরা চটে যাবে। তাই ঠিক করেছি সকলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করব। প্রেম করব না। আপনারা আমার নামের সঙ্গে ইদানিং শেখর কাপুরের নাম জড়িয়ে কত কিছুই লিখছেন। লিখুন যত পারেন। আসলে ডাব্বুর মতো শেখরও আমার বন্ধু। শশী কাপুরও আমার বন্ধু। এমন কি দেব সাহেবও। আমি আমার কাজের বিষয়ে ডেড্লি সিরিয়াস। ওখানে কোনরকম কম্প্রোমাইজ আমি করতে পারি না। কাজের ক্ষেত্রে যদি এমন হয়, আমার সঙ্গে ছবির নায়কের একটা সাংঘাতিক ইনভলভমেণ্ট—তাহলে আমি তার প্রেমে পড়তে পারি। রিয়ালিস্টিক অভিনয়ের জন্য তার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা পর্যন্ত করতে পারি। এতে যত কেচ্ছা রটুক আমার আপত্তি নেই।

অম্বিকা জোহর আই এস জোহর-এর কন্যা ছবির জগতে এসে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন। অম্বিকা, শাবানার মতো অভিনয়ের ব্যাপারে এতটা সিরিয়াস। তিনি বেশী সিরিয়াস মেলামেশার ব্যাপারে। অম্বিকার পুরুষ বন্ধুর সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ে। [illegible] অম্বিকার কাছে ছেলেরা ভীড় করে কারণ নিজেই ডিজাইন করে। এমন সব মড ড্রেসেস পরে যাতে করে ছেলেরা হোঁচট খায়। ছবির জগতে অম্বিকার স্বাধীনচেতা মনের উদার ব্যবহারের ভীষণ প্রশংসা হয়। সবাই বলে : অম্বিকা ভীষণ ফ্র্যাঙ্ক। কোন বিষয়ই খুব সিরিয়াসলি নেয় না। ছেলেদের সংগে গভীরভাবে মেলামেশাতে ওর আপত্তি নেই। একই সঙ্গে চার পাঁচজনের সংগে প্রেম করতে পারেন। সম্প্রতি অশোক রায়ের 'কালা বাজ' ছবিতে অভিনয়ের সময় দেব আনন্দ অম্বিকার সংগে পরিচিত হন। অম্বিকার উদার ব্যবহার দেবকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি বোধহয় ওর মধ্যে জাহিদার ইমেজ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সে যাই হোক অম্বিকার এখন প্রধান পুরুষ বন্ধু হলেন দেব আনন্দ। দেব সম্পর্কে অম্বিকার ধারণা খুব ইনটারেস্টিং। দেব নাকি বিদেশীদের মতো প্রেম করেন। প্রেম বলতে ঠিক প্রেম নয়। বন্ধুত্ব বলতে ঠিক বন্ধুত্ব না—এর মাঝামাঝি একটা কিছু।

রাজেন্দ্রকুমার এককালের সুপার হিট স্টার বর্তমানে প্রোডিউসার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত। কয়েকটা ছবি করেছেন। তেমন ভাল ব্যবসা করে নি। এবারে তিনি চেষ্টা করছেন অন্য কাউকে প্রোডিউসার সামনে রেখে কাজ করতে। কারণ তাতে নিজের ইমেজ কাজ করতে পারে। আসল উদ্দেশ্য অবশ্য প্রযোজক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। এইভাবে তিনি সম্প্রতি একটি ছবি সাইন করেছেন। ছবির নাম বদলা আউর বলিদান। নায়িকা চরিত্রে রূপ দেবেন আশা পারেখ। অন্য দুটি চরিত্রে থাকছেন বিনোদ মেহরা ও মৌসুমী চ্যাটার্জি।

কলকাতার নায়িকা মিঠু মুখোপাধ্যায় বম্বেতে আসছেন একটি ছবি করতে। পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে। ছবিখানি পরিচালনা করছেন পুণা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা হোল্ডার মনমোহন বহেল। মিঠুর বিপরীতে এ ছবিতে নায়ক জীতেন্দ্র। এ ছবিতে একটি বিশেষ চরিত্র রূপায়িত করবেন ওমপ্রকাশ। সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন কল্যাণজী আনন্দজী।

ঋষি কাপুরের সঙ্গে রীতা ভাদুড়ী আজকাল খুব ঘুরছে। রীতা চন্দ্রিমা ভাদুড়ীর কন্যা, পুণার ডিপ্লোমা হোল্ডার ইন অ্যাকটিং। কলকাতায় গিয়ে একটা বাংলা ছবিতে কাজ করেছে। মাদ্রাজেও কাজ করে এলো। বম্বেতে শুধু কাজ নয় প্রেমও করছে। শোনা যায় রীতার সঙ্গে অসিত সেন-পুত্র অভিজিতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু রীতার প্রেমিক অনেক। ইদানীং সে নাকি ঋষি ছাড়া আর কাউকে সময় দিতে পারছে না। একদা স্মরণ থাকতে পারে এই ঋষি রীতার সঙ্গে কাজ করতে রাজী হয় নি। ঋষির ইচ্ছেমত ছবিতে নায়িকা পরিবর্তন করা হয়েছিল, সেই ছবির নাম 'জিন্দাদিল'। ঋষি এখন রীতার সঙ্গে কাজ করছে রাহুল রাওয়েল পরিচালিত 'গুনেহেগার' ছবিতে।

…অভিজিৎ

চুপকে চুপকে/ অমিতাভ বচ্চন

স্টুডিও সংবাদ

কলকাতার স্টুডিও বেশ কিছুদিন ধরে সরগরমই বলা যায়। বছরে ছবির সংখ্যা বাড়ছে। ফলে কাজও বাড়ছে। অবশ্য এমন কিছু কাজ বাড়ছে না যাতে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের দৈন্যদশা দূর হয়। তবে এই জানবেন, আগের বলতে মাঝে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার চেয়ে ভাল। অর্থাৎ অবস্থা মন্দের ভাল। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে ব্যস্ততা বেশী। এখানে যাত্রিক গোষ্ঠী নগরদর্পণে ছবির শুটিং শেষ করেছেন কদিন আগে। চলছে অধিকার এবং স্নো-ফকস ক্যাবারে ছবির শুটিং। অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত কোয়ালিটি পিকচার্সের অধিকার, মহাশ্বেতা দেবীর লেখা কাহিনী অবলম্বনে। উমানাথ ভট্টাচার্যের চিত্রনাট্যে বিভিন্ন চরিত্রের শিল্পীরা হলেন : উত্তমকুমার নন্দিতা বসু অনিল চট্টোপাধ্যায় ছায়া দেবী এবং সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। ছবির কেন্দ্র চরিত্রে শিশুশিল্পী অর্ণ বসু। চিত্রগ্রহণ করছেন অনিল গুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন : নচিকেতা ঘোষ। কৌটিল্য গুপ্ত রচিত পার্থপ্রতিম চৌধুরী চিত্রনাট্যায়িত স্নো ফকস ক্যাবারে ছবির শুটিং এগিয়ে চলেছে। এ ছবিতেও নায়ক উত্তমকুমার। বিপরীতে নায়িকা মিঠু মুখোপাধ্যায়।

প্রচলিত প্রেম কাহিনী 'ফিরমণাক' চলচ্চিত্রায়িত করছেন প্রবীণ কুশলী গোবিন্দ রায়। স্বরচিত চিত্রনাট্যে পরিচালনা করছেন তিনি। এ ছবিতে নতুন রোমান্টিক জুটি : সোমা দে - সমিত ভঞ্জ। অন্যান্য চরিত্রগুলিতে আছেন : শেখর চট্টোপাধ্যায় গীতা দে পদ্মা দেবী এবং চিন্ময় রায়। চিত্রগ্রহণ করছেন : দীপক দাশ। সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন : অনিল বাগচী। ইতিমধ্যে কয়েকখানি গান রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছে। মার্চ মাস থেকে ছবির তৃতীয় পর্যায়ের শুটিং শুরু হবে। এ ছবির পরিবেশন স্বত্ব গ্রহণ করেছেন সাহা ফিল্মস।

মাদার ইন্ডিয়া পিকচার্সের পতাকাতলে জীবন মরুর প্রান্তে ছবির শুটিং শুরু

এগিয়ে চলেছে। গত মাসে সপ্তাহব্যাপী বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয় ঘাটশিলায়। মার্চ মাসে অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের কাজ চলবে। স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্যে ছবিখানি পরিচালনা করছেন সলিল চৌধুরী। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন : সমিত ভঞ্জ মহুয়া রায়চৌধুরী কল্যাণী মণ্ডল পদ্মা দেবী শিবানী বসু এবং পিনাকী। চিত্রশিল্পী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত-পরিচালক তরুণ-রঞ্জিত।

গত সপ্তাহে দু খানি ছবির শুভ সূচনা হয়েছে। একখানি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। আরেকখানি ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে। ইন্দ্রপুরীতে গোপেন লাহিড়ীর প্রযোজনায় শুভসূচনা হল 'অসামাজিক' ছবির। মহরত শিল্পী ছিলেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। ক্ল্যাপস্টিক দিলেন চন্দ্রাবতী দেবী। চিত্রগ্রহণ করলেন সত্য রায়। জানা গেল, এ ছবির শুটিং শুরু হতে বেশী দেরী নেই। মুভিটোনে পরিচালক শচীন অধিকারী নতুন ছবির সূচনা করলেন। শৈলেশ দে-র লেখা একটি হাসির গল্প অবলম্বনে, কয়েকজন বিশিষ্ট কলাকুশলীর প্রযোজনায় নির্মিত হতে চলেছে এই ছবি। চলচ্চিত্রায়ন সংস্থার ব্যানারে এই ছবির জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী শিপ্রা মিত্র। তিনি এই ছবির বিশেষ একটি চরিত্রে রূপ দেবেন। নায়িকা সুপর্ণা সেন ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন। ক্ল্যাপ দিলেন উত্তমকুমার। ছবির নাম এখনও স্থির হয় নি। তবে এই জানা গেল, এ ছবির চিত্র গ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছেন নিমাই রায়। সংগীত পরিচালনা করবেন মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

আঁধি
সুচিত্রা সেন/সঞ্জীবকুমার

ড্যান্স অফ শিব

আনন্দ কুমারস্বামী একালের একজন শ্রেষ্ঠ আর্ট স্কলার। যাঁর প্রচেষ্টায় ভারতীয় শিল্পকর্ম, ভাস্কর্য, সংগীত ও নৃত্য আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে আজ কৌতূহল ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

তিনিই বোধকরি প্রথম ভারতীয় যিনি অক্লান্ত এবং আজীবন চেষ্টা ও গবেষণা করে এদেশের শিল্প (সর্বস্তরের) সংগীত ও ক্লাসিক্যাল নাচ বহির্ভারতের রসিক পাঠকদের কাছে তাঁর লেখনী মারফৎ পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি এসব সম্পর্কে প্রচুর বইও লিখেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও তিনি ভারতীয় শিল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা করে গেছেন।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত হলেও কুমারস্বামীর জন্ম সিংহলে। এবং শেষ বয়স পর্যন্ত জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই অতিবাহিত করেছেন বিদেশে। বাবা ভারতীয়, মা ইংরেজ। লেখাপড়া করেন ইংলন্ডে। এবং বোস্টন মিউজিয়মের সঙ্গে দীর্ঘ ৩০ বছরকাল যুক্ত থাকেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি ৫০০-রও বেশী নিবন্ধ লেখেন ভারতীয় ও এশীয় শিল্পকর্মের ওপর। (এমন ব্যাপকভাবে আর কেউ এর ওপর লেখেন নি।)

এই সব লেখার মধ্যেই তিনি প্রমাণ করেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে যেসব শিল্পকর্ম বিরাজমান, তার প্রায় প্রতিটির ওপরেই প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকর্ম ও সংস্কৃতির পুরোপুরি ছাপ রয়ে গেছে। অর্থাৎ ঐসব শিল্পকর্ম ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতি ও কৃষ্টি দ্বারা পুরোপুরিই প্রভাবান্বিত।

কুমারস্বামীর এই প্রচেষ্টার একটা সুন্দর নিদর্শন অক্ষয় করে রেখে গেছেন শিল্পী নন্দলাল বসু তাঁর অঙ্কিত একটি ছবিতে।

ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি, সংগীত ও নৃত্যকলা সম্পর্কে গবেষণার জন্য কুমারস্বামী মাঝে মাঝেই ভারতে আসতেন এবং এখানকার দিকপালদের সঙ্গে সে সম্পর্কে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

সেই সময় তিনি সেই সুবাদে অবধারিতভাবেই কোলকাতার জোড়াসাঁকোস্থ ঠাকুরবাড়িতেও একাধিকবার পদার্পণ করেছিলেন।

সেই সময়কারই একটি মুহূর্ত নন্দলাল বসু অক্ষয় করে রেখেছেন তাঁর শিল্পকর্মের রেখায়। যে-ছবিতে অবন ঠাকুর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শিল্পীর সঙ্গে কুমারস্বামীও উপস্থিত।

হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ : আরতি ভট্টাচার্য। পরিচালনা : স্বদেশ সরকার।
ফটো : অমৃত

এর থেকেই বোঝা যায় কুমারস্বামী প্রবাসী হয়েও কি ঘনিষ্ঠভাবে ভারতীয় শিল্পকলার বিভিন্ন দিকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সেই আনন্দ কুমার স্বামীর ওপর তোলা একটি ডকুমেন্টারী ছবি (৪ রীল) গত ৩১শে জানুয়ারী ইউ এস ইনফর্মেশন সার্ভিসের তরফ থেকে দেখানো হোল গ্লোব সিনেমায়। নাম ড্যান্স অফ শিব'।

এটি ইউ এস আই এস-এর পক্ষে প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত। তাঁকে পরিচালনায় সহযোগিতা করেছেন বি ডি গর্গ, ক্যামেরায় পূর্ণেন্দু বসু ও ভানু মূর্তি। সঙ্গীত পরিচালনা পন্ডিত রবিশঙ্কর।

এ ছবিটি করতে গিয়ে চিদানন্দবাবু যে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন তা ছবি দেখলেই বোঝা যায়। একথা বলাই বাহুল্য যে, এমন একটি তথ্যমূলক ছবি করতে গেলে একদিকে যেমন নির্দিষ্ট ব্যক্তিটির সম্পর্কে প্রচুর পড়াশুনা (যা এক রকমের গবেষণাই) এবং নিষ্ঠার প্রয়োজন অন্যদিকে তেমনি সেটাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিশ্রম।

এ ছবিতে ভারতীয় শিল্প, ভাস্কর্য তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ভারতীয় রাগ সঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় ধর্মী নাচের দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে উপমা স্বরূপ তেমনি অন্যদিকে তার ফাঁকে ফাঁকে কুমারস্বামীর ধারাবাহিক জীবনীও তুলে ধরা হয়েছে।

এতে ছবিটি জীবনী নিভ[illegible] রূপ পেয়েছে।

শুধু ভারতের শিল্পকলাই নয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এবং অন্যত্র যে সব অঞ্চলের শিল্প ভাস্কর্যের উপর ভারতীয় প্রভাব। সেই সব স্থানের কিছু কিছু শিল্পকলার নিদর্শনও পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে। এবং বলাই বাহুল্য, সবটাই কুমারস্বামীর গবেষণা ও প্রমাণের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

সাদা কালোর সঙ্গে মাঝে মাঝে রঙের ব্যবহার ছবিটিকে দর্শনীয় করে তুলেছে।

বৃহত্তর ভারতীয় দর্শক এ ছবিটি দেখলে আনন্দ কুমারস্বামী ও তাঁর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা করে নিতে পারবেন।

এমন একটি সৎ প্রচেষ্টার জন্য চিদানন্দ দাশগুপ্ত অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র। ক্যামেরার কাজ খুবই ভাল।

কলকাতায় বেলজিয়ান ছবির উৎসব

কলকাতাস্থ বেলজিয়ান কনসুলেটের সহযোগিতায় এবং ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ৬ থেকে ১২ মার্চ গ্লোব চিত্রগৃহে বেলজিয়ান ছবির এক উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

নিম্নলিখিত ছবিগুলি উৎসবে প্রদর্শিত হবে। জন এ্যান্ড জেসী, লা চেম্বে রৌজ, রংডভু এ ব্রে, লুইসা মালপার্টিয়াস, লা এমোরেস এবং তৎসহ কয়েকটি শর্ট ফিল্ম।

নাট্যমঞ্চ

কবচ কুণ্ডলের 'কৃষ্ণপক্ষ'

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের নতুন নাটক 'কৃষ্ণপক্ষ' সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে মঞ্চস্থ হোল। বিজন ভট্টাচার্য যখনই কোন নাটক লেখেন, আমরা তখনই নতুন কিছুর প্রত্যাশা মনে পোষণ করি। কিছু নতুন ভাবনা কি বক্তব্য বিষয় বস্তুত ব্যতিক্রম সব সময়ই তাঁর নাটকে উপস্থিত থাকে। যা আমাদের চেতনাকে নাড়া দেয়।

'কৃষ্ণপক্ষ' নাটকেও তার সেই প্রসাদগুণ বর্তমান অনিবার্য ভাবেই। বরং বলা যায়—এ-নাটকের দুঃসাহসিকতা আমাদের বিস্মিত করেছে।

'শহরের প্রান্তে' গঙ্গাতীরের নির্জন পরিবেশ নাটকের পটভূমি। এখানে যে প্রাচীন কালীমূর্তিটি এনে পুনঃস্থাপিত করা হয়েছে—প্রধান পুরোহিত দর্শনার্থীদের কাছে তাঁর পরিচয় দেন 'মা যশোরেশ্বরী কালী' বলে। যিনি জাগ্রত দেবী বলে দূর-দূরান্তের ভক্তদের মনে অধিষ্ঠিত। কেউ ইতিহাসের সাল-সন, মাতৃরূপ ইত্যাদি সম্পর্কে সন্দেহ বা কৌতূহল প্রকাশ করলে পুরোহিত তাকে কৌশলে সন্তুষ্ট করে দেন। এবং নিজেকে সে নিরাসক্ত ধর্মনিষ্ঠ বলে প্রমাণ করেন। সেখানে তাঁর একটি আশ্রম আছে। আশ্রমে আছে কিছু ব্রহ্মচারী শিষ্য। যাদের তিনি ধর্ম ও শাস্ত্র শিক্ষা দেন। আত্মপ্রচারের মোহ নেই। শুধু মা যশোরেশ্বরীর সেবা ও ধর্মচর্চাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত।

অন্ধ রাতের অন্ধকারে সেই পরিবেশ আমূল পাল্টে যায়। ক্রমে সেখানে ভিড় করে অর্থবান ব্যবসায়ী রূপসী সুন্দরী বাইজী আর লোলুপ রিটায়ার্ড উচ্চপদস্থ (শ্রেণী ছাড়া সবাই ঐ মন্দিরের ট্রাস্টের লোক!) অফিসার। মন্দিরের চাতালে বসে শুরু হয় গান সুরা পান (যে সুরা অর্থের বিনিময়ে সরবরাহ করে পুরোহিতেরই আশ্রমের ভৃত্য) এবং সব শেষে অপ্রকৃতিস্থ লোকগুলির রূপ যায় পাল্টে।

অন্যদিকে সেই রাতের অন্ধকারেই মন্দিরের পিছনের ঘরে হাজার হাজার বস্তা খাদ্যবস্তু এসে গোপনে জমা হয়। (এই দৃশ্যটি স্টেজের পেছনে পর্দায় সিনেমাটিক টেকনিকে দেখানো হয়েছে। আলোর খেলা এবং পরিকল্পনার দিক থেকে দৃশ্যটি অভিনব সন্দেহ নেই। পর্দায় কোরাসের উপস্থাপনাও সুন্দর।)

একদিন লোকের মুখে শুনে সেখানে একজন উৎসাহী অধ্যাপক-লেখক এসে উপস্থিত হলেন তাঁর একদল ছাত্র নিয়ে। তিনি মা যশোরেশ্বরীর মূর্তি দেখে এবং সেবাইতের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে বিদেশী পত্রিকায় সেই মন্দিরের ঐতিহ্যের ওপর সচিত্র প্রবন্ধ লিখলেন। যার ফলে প্রায় রাতারাতিই ঐ মন্দির বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিখ্যাত হয়ে উঠল। (এর পেছনে যে নিপুণভাবে একটা পরিকল্পনা কাজ করছে নাট্যকার সে-ইঙ্গিতটাই প্রকারান্তরে উল্লেখ করেছেন)

আর সেই আলোর নীচে যে মানুষগুলি সবকিছু চোখের ওপর দেখেও যারা নির্বাক ছিল, আশ্রমের সেই শিষ্যরা তখন বুঝতে পেরেছে যে তারা এমন এক ফাঁদে এসে জড়িয়ে পড়েছে যেখানে থেকে কোন অবস্থায়ই বেরিয়ে যাবার কোন পথ নেই, অথচ তুষের আগুনের মত বুকের মধ্যে জ্বলছে বিদ্রোহ। তারা শেষ পর্যন্ত একদিন ফুঁসে উঠল। কিন্তু সেই বিদ্রোহের আগুনও চাপা পড়ে গেল সেবাইতের কঠিন হস্তক্ষেপে।'

মোটামুটি এই হোল নাটকের মূল গল্প। এর অন্তরালের বক্তব্য বা উদ্দেশ্য কোথাও সোচ্চার না হলেও অস্পষ্ট নয়। নাটক দেখতে দেখতেই গোটা বক্তব্যটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক সময় দর্শকও তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

এর পটভূমি অর্থাৎ একটি সেটের ওপরেই সমস্ত নাটকটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনীত হয়েছে। দৃশ্য বদলের কোন প্রয়োজন হয়নি। নাটকের সবকটি চরিত্রই এই গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ করেছে। তবু সব মিলিয়ে একটা ব্যাপকতা আছে এ-নাটকে যা সচরাচর স্টেজে দেখা যায় না।

অভিনয়ে সর্বপ্রথমে যে-চরিত্রটি দর্শককে নিবিষ্ট করে রাখে সে হোল সেই বিকট দর্শন শৃংখলিত পাগলটি। যে প্রায় সর্বক্ষণই নির্বাকভাবে অভিনয় করে গেছে হাত-পায়ের শৃংখল বাজিয়ে। যে একটি বৃহৎ শক্তির প্রতীক হয়েও অসহায় পাগল সেজে থাকতে বাধ্য হয়েছে সেবাইতের ইচ্ছার দাস হয়ে। যে চেষ্টা করেও বিদ্রোহ করতে পারছে না। তার অর্ধস্ফুট ভাষাও কেউ বোঝে না। তার চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি মুখের কাঠিন্য, চলাফেরায় বলিষ্ঠতাকে রক্তচক্ষু চাবুক আর শৃংখল দিয়ে দাবিয়ে রাখা হয়েছে।

আর একটি প্রতীক চরিত্র আছে এ-ছবিতে। সে বানররূপী মানুষ। বানরের মত তার চলাফেরা, মুখের ভাষা চোখের চাহনি। সেও নির্বাক।

এক সময় এরা দুজনেই বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। আবার ফিরে যেতে হয়েছে সেই পরাধীন জীবনে।

পাগলের চরিত্রটি একটি বিস্ময়কর পরিকল্পনা নাট্যকারের। শেষের দিকে তার মুখ দিয়ে ছাড়া ছাড়া ভাবে এমন সব সংলাপ বলা হয়েছে যা কোন পাকা অভিনেতা ছাড়া অন্য কেউ আয়ত্তেই আনতে পারবে না। যেন একটা বিরাট শক্তিকে শেকল দিয়ে জবরদস্ত বেঁধে রাখা হয়েছে এটা তাঁর অভিনয়ে দুরন্তভাবে প্রস্ফুটিত।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিজনবাবু নিয়মিত এ-নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করলে নাট্যজগৎ এবং দর্শকদের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হবেই। নাটকের বক্তব্য যা-ই থাকুক না কেন।

নাটকের শুরুতে সংস্কৃত শ্লোক নাটকের পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। আবহসংগীত মুগ্ধ হয়ে বসে শুনবার মত।

উদয়নের 'নহবত'

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত আবেগমথিত নাটক 'নহবত' কয়েক বছর আগে সাধারণ দর্শকদের মধ্যে বেশ একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

যদিও এ-নাটকের গল্প কিছু আধুনিক নয় বা নতুন কোন সমস্যা এতে প্রতিফলিত হয়নি, তবু এই নাটকে এমন একটা মাধুর্য আছে যা এখনও দর্শকের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত করে তোলে। তবে বলাই বাহুল্য এর বেশীটাই নির্ভর করে মুখ্য চরিত্রগুলির প্রাণবন্ত অভিনয়ের ওপর।

সম্প্রতি উদয়ন নাট্য সংস্থা মিনার্ভা মঞ্চে 'নহবত' পরিবেশন করলেন। প্রথমদিকে নাটকটি একটু ঢিলেঢালাভাবে চলার জন্য নাট্যরস তেমন জমে না উঠলেও পরের দিকে কুশীলবদের আন্তরিক অভিনয়ের ফলে বেশ দর্শনীয় হয়ে উঠেছিল।

অভিনয়ের দিক থেকে প্রথমেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শান্তনু বোস (রামু)। তারপরেই বড় মেয়ের পুত্রের ভূমিকাভিনেতা এবং সুধাংশু রায় (বরের পুরুত) দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। ত্রিদিব সরকারের হরি চরিত্রোচিত। সেদিক থেকে জ্যাঠামশাই (শিবনাথ মিত্র) কিছু আড়ষ্ট। সোমেন মল্লিকের অক্ষয় ভাল।

দীপা হালদারের কেয়া প্রশংসা কুড়িয়েছে, কিন্তু তিনি অতি অভিনয়ের ঝোঁক থেকে মুক্ত নন। অন্য দুটি মহিলা চরিত্রে রাণু রায় ও মীনা মুখার্জি মানিয়ে নিয়েছেন।

অন্যান্য ভূমিকায় বিপ্লব রায় জয়ন্ত চৌধুরী, সরোজ বসু, মলয় ঘোষ, অশোক চক্রবর্তী, পাঁচুগোপাল সিংহরায়, অমল ঘোষ, অশোক ঘোষ, এম এস জোহা, স্বপন দাস, আশীষ ধর, মণি চট্টোপাধ্যায়, মলয় তালুকদার, স্বদেশ বসু মোটামুটি।

ফরহাদ হোসেনের রূপসজ্জা সুন্দর। তবে সমগ্র নাটকটি যতটা দর্শকদের আনন্দ দান করেছে, তার সর্বৈব কৃতিত্ব অবশ্যই নির্দেশক বিশু চট্টোপাধ্যায়ের প্রাপ্য।

বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী পরিচালিত 'একাংক নাটক প্রতিযোগিতা'

বিগত বছর গুলির ন্যায় এ বছরও বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী কমিটির কর্তৃপক্ষ আগামী মার্চ মাসে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। যোগাযোগ করুণ সমর সেন, সাধারণ সম্পাদক অথবা অভয় ভট্টাচার্য, সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী ৭৮ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট (রেজিষ্টার্ড কার্যালয়) কলিকাতা-৭০০০০৩ সময় রাত্রি ৭টা থেকে রাত্রি ৯টা।

নহবত নাটকে সোমেন মল্লিক ও শিবনাথ মিত্র

জলসা
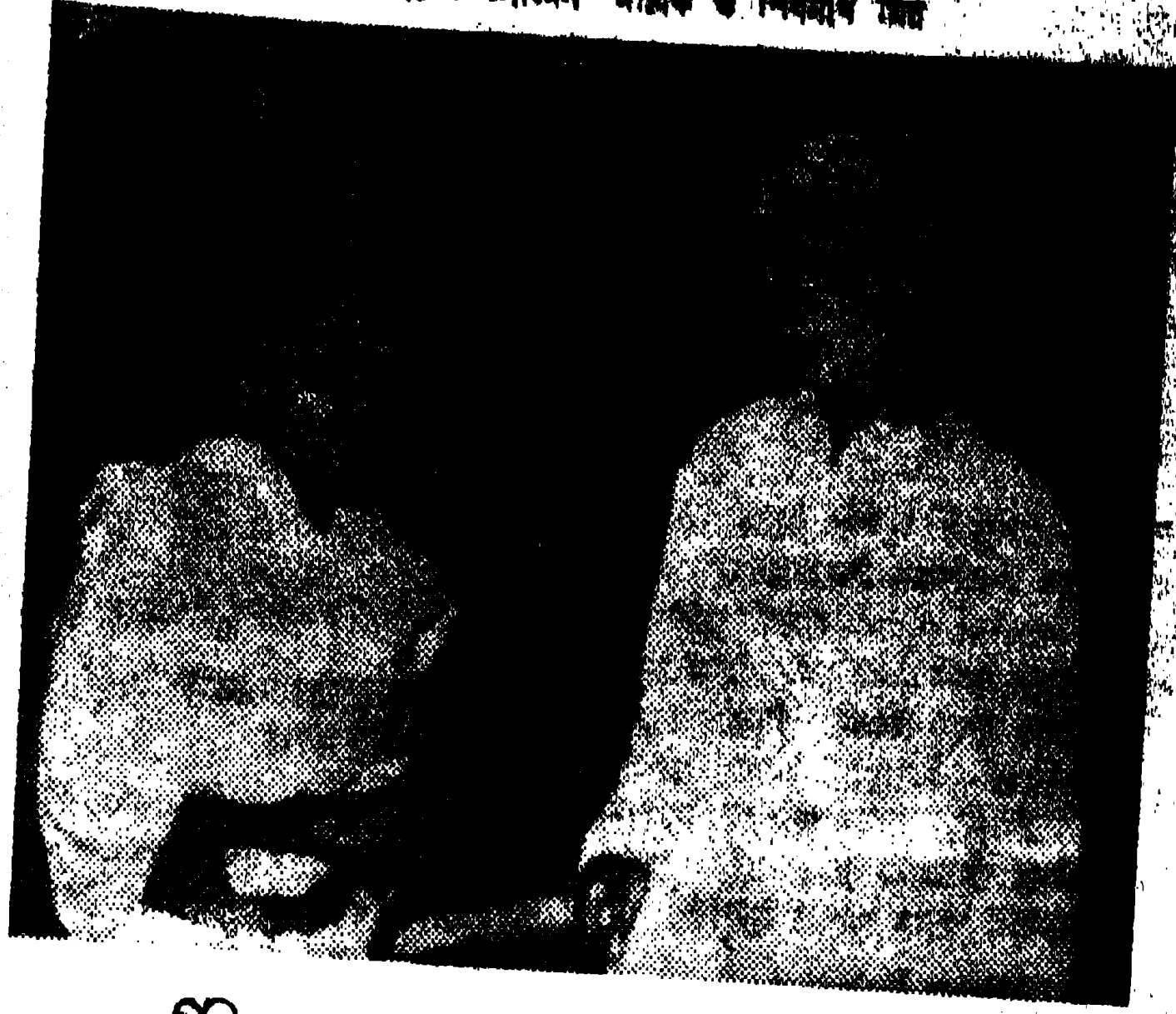
পাহাড়ী স্মরণে

পাহাড়ী সান্যাল শুধুমাত্র শিল্পীই ছিলেন না। তুলনাবিহীন সংবেদনশীলতার সম্পদে তিনি ছিলেন শিল্পী ও রসিক-মহলের অতি কাছের মানুষ। সেই কথা স্মরণ করেই দীপেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, বিমান ঘোষ, বন্দনা সিংহ শিল্পী ও সাংবাদিকদের নিয়ে এক মিলনসভা আহ্বান করেছিলেন নমিতা সিংহের ওল্ড বালিগঞ্জ রোডের বাড়ীতে। কিন্তু পাহাড়ীদার মধুর ব্যক্তিত্বের স্মৃতি যেন আলোর মত জ্বলে উঠে গতানুগতিক স্মরণসভার অনেক উর্ধ্বে এক রঙিন কল্পনালোকে পৌঁছে দেয় সভায় উপস্থিত সকলের মনকে। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করেছিলেন রবি গুহমজুমদার, বিমল মুখোপাধ্যায়, অরুণ বাগচি ও সন্ধ্যা সেন।

সংগীতাঞ্জলিতে অংশগ্রহণ করেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, মান্না সেন, বনানী ঘোষ, শিখা বসু, বাণী ঠাকুর, অপর্ণা চট্টোপাধ্যায় ও বন্দনা সিংহ।

সবশেষে রিষড়া সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সংবর্ধিত পাহাড়ীদার প্রাণচঞ্চল ভাষণ ও গান অতীতকে যেন জীবন্ত করে তুলেছিলো।

সভার শেষে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়
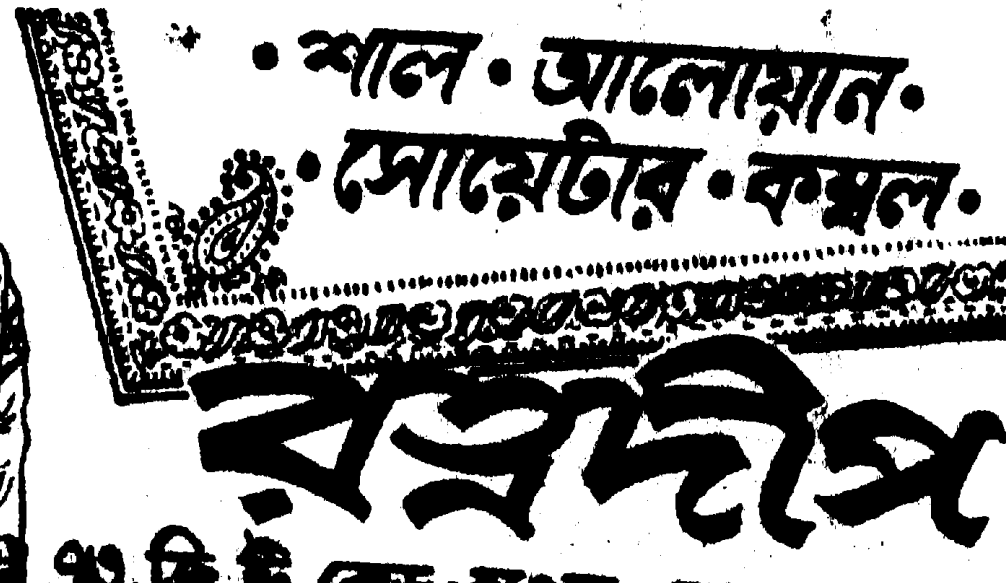
প্রস্তাব করেন যে স্বর্গত পাহাড়ীদার নামে প্রতি বছর কোনো মেধাবী সংগীত নৃত্য অথবা অভিনয় শিক্ষার্থীকে প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে একটি বৃত্তি দেওয়া হবে। অর্থসংগ্রহ কঠিন নয়। শিল্পীরা বিনা পারিশ্রমিকে এক নৃত্য ও সংগীত সম্মেলনে আয়োজন করে এ-অর্থের ব্যবস্থা করতে পারেন। পরে এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ জানান।

সংগীতাঃ সরস্বতী পূজোর দিনে ৩ বি, পলিন মিত্র লেনস্থিত (শ্যামবাজার কলিকাতা-৩) সংগীতা গুঞ্জন গানের স্কুলে এক অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীসুভাষকুমার মিত্র। সংগীতে ছিলেন মিতা মোদক মাধুরী মিত্র, চন্দ্রা নাগ। গীটারে শিবনাথ সাহা। তবলায় গোরাচাঁদ অধিকারী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শান্তা সাহা।

তরংগ উৎসব

সম্প্রতি কলামন্দিরে সুর ও ছন্দের অপরূপ সমন্বয়ে এক অভিনব সংগীত-সন্ধ্যা উপহার দিয়েছিলেন শ্রী আর এল বিনানী। সংগীতাসরের নাম তরংগ। সত্যিই তরংগ। নানা রকমের যন্ত্রের ওপর শিল্পী-দের যাদুকরী হাতের স্পর্শে এক-একটি সুরে উজ্জ্বল তরংগ যেন শ্রোতাদের মনের তটে আছড়ে পড়ছিলো, মিলিয়ে যাচ্ছিলো অনন্তের বুকে তার জায়গায় বেজে উঠ-ছিলো আর এক সুরের উচ্ছ্বাস—তরংগই যাকে বলা যায়।

মঞ্চসজ্জায় এমন শিল্প-সৌন্দর্যও বিরল। মঞ্চের মাঝে ও চার কোণে অর্ধ-বৃত্তাকারে এক-এক যন্ত্রী তাঁর যন্ত্র নিয়ে বসে; সারা মঞ্চ অন্ধকার। নীলাভ পীতাভ ও গোলাপী আলোর আভা এক-এক শিল্পীর ওপর। আর মঞ্চ ঘিরে সবুজ-লতা ও নানারঙা ফুলের ছোট্ট ছোট্ট মনোরম ঝোপের মত। সব মিলিয়ে যেন গন্ধর্বলোক রচিত হয়েছিলো। সত্যিই সংগীতের এক মনোহর পটভূমিকা।

উদয়শংকর কালচারাল সেন্টারের যুগচ্ছন্দের একটি দৃশ্য

প্রথম শিল্পী গোপাল ঘোষ। ইনি পরি-বেশন করেন হাণ্ডিতরংগ। পাশাপাশি সাজানো কয়েকটি হাঁড়ির ওপর কাঠির আঘাতে ধ্বনিত হোলো 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে' এরপর ব্রজ-তরংগে বলাবতী রাগ মূর্ত করে তোলেন ব্রজেন বিশ্বাস। বোতল-তরংগ, কণ্ঠ-তরংগ এলুমিনিয়ম-তরংগ ও জলতরংগে যথাক্রমে দুর্গা ভৈরব ধুন ও শিবরঞ্জনী রাগ পরিবেশন করেন গোবিন্দ ঘোষ, নীরদবরণ ডলি চন্দ্র। আপনাপন পরিপ্রেক্ষিতে সকলের বাজনাই শ্রুতিমধুর। কিন্তু কণ্ঠতরংগে সম্পূর্ণ রাগ 'ভৈরব' অবাক করে দেবার মতই। সবচেয়ে জমে-ছিলো তবলাতরংগে কমলেশ মৈত্রের ইমন-কল্যাণ। বোলের পরতে পরতে সুরের ঝুমঝুমি। বিশেষ করে তানের বাহার মনের মধ্যে যেন দীর্ঘস্থায়ী রেশ রেখে যায়। পিয়ানোতে ওয়াই এস মুলকীর সুরের ধ্বনিমাধুর্য মায়ালোক হয়ে উঠেছিলো। বিশেষ অনুরোধে ইনি বাজান 'চিনিগো চিনি তোমারে।'

সবশেষে সন্তোষচন্দ্র রচিত ও পরি-চালিত অর্কেস্ট্রায় সারা প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়ে অনুষ্ঠানের মধুর পরিসমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয়ার্ধে তালকাচার্য গোবিন্দ বসুর পরিচালনায় পাখোয়াজ তবলা মৃদংগ ঢোল ইত্যাদি নানান তালবাদ্যে—চৌতাল থেকে শুরু করে দাদরা, কাহারবা ধামার হয়ে ত্রিতাল প্রত্যাবর্তন যুগ্ম একক ও সমবেত বাদ্যে। এ-বাজনার উপভোগ্যতা সন্দেহের অতীত।

আওয়ার অর্কেস্ট্রা : উত্তর কলিকাতার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী 'আওয়ার অর্কেস্ট্রা'র ষটত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এটা শুধু সংগীত উৎসবই নয়, সংঘগুরু, সংগীতাচার্য সুরেন্দ্রলাল দাসের স্মৃতিপূজা। এই পরিপ্রেক্ষিতে এক শ্রদ্ধা-নম্র পরিবেশ রচিত হয়েছিলো।

বছরে একবার এই অনুষ্ঠানেই শোনা যায়—বাংলার সেইসব প্রতিভাবান সুরকার ও গীতিকারদের রচনা যাদের অবদানে বাংলা গানের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ কিন্তু যাঁদের আমরা আজ ভুলতে বসেছি। এই উৎসবের উদ্যোক্তারা তাঁদের স্মরণ করে এক বিরাট সাংস্কৃতিক কর্তব্য পালন করেন। নানা রং-রস-এর গান শ্রোতাদের মনকে বিচিত্র অনু-ভূতির শরিক করে তোলে। সমগ্র অনু-ষ্ঠানটির শিল্পশোভন পরিচালনার কৃতিত্ব প্রাপ্য সুরকার-গায়ক নির্মল ভট্টাচার্যের।

এই সংগীত-সভার গানের ডালি দিয়েছেন বুলু বল্লভ (ঠুংরী ও দাদরা) শ্রীলেখা চক্রবর্তী (অমরগীতি শৈলেন রায় ও সুরসাগর হিমাংশু দত্তর)। শ্যামল গুপ্ত ও সৌরেন দে (দ্বৈত গীটার) বীথি দাস (কাব্যগীতি—রচনা ও সুর অনিল ভট্টাচার্য ও নির্মল ভট্টাচার্য। কান্ত-কবির গান শুনিয়েছেন আবির রায়, কল্যাণী চট্টো-পাধ্যায় কৃষ্ণা রায়চৌধুরী কৃষ্ণা ভদ্র, গীতা বসু নরেন্দ্র মান্না মঞ্জু বিশ্বাস মঞ্জু দে মীনা মজুমদার রত্না বসু রঞ্জিত দে শ্যামল গুপ্ত সৌরেন দে সমর সাহা রথীন ভট্টাচার্য (প্রাচীন বাংলা গান) বাণী দাশগুপ্ত (কীর্তন) ডাঃ সারদা গুপ্ত (নলিনীকান্ত সরকারের হাসির গান)। সংগতে ছিলেন সমর সাহা আবির রায়।

চিত্রাঙ্গদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১৪ বর্ষ

অমৃত

৪৪ সংখ্যা

Friday, 14th March, 1975

শুক্রবার ২৯ ফাল্গুন, ১৩৮১

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীইন্দ্রাণী চৌধুরী

সম্পাদকীয়

শান্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত

এই উপমহাদেশে আবার উত্তেজনা বাড়াবার প্ররোচনা দিচ্ছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। পাকিস্তানকে ঢালাওভাবে অস্ত্র সরবরাহ করবে তারা। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করেছিল আমেরিকা। দশ বৎসর পর এই সময়ে, সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের লক্ষ্য একটাই। তা হল ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সমরশক্তিতে বলীয়ান করে তৈরি করা। বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সময় সপ্তম নৌবহর পাঠিয়ে বৃহৎ যুদ্ধের ভয় দেখিয়েছিল আমেরিকা। হুমকি দিয়েছিল চীনও। কিন্তু ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি সম্ভাব্য সমস্ত বিদেশী হস্তক্ষেপকে সেদিন ব্যর্থ করেছিল। কিন্তু আমেরিকার রাগ কমেনি। মুখে যতই বলুক দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত একটি প্রধান শক্তি, কাজের বেলায় ভারতকে হেনস্তা করার সুযোগ তারা ছাড়ে না। নতুবা পাকিস্তানকে নতুন করে অস্ত্রসজ্জিত করে তোলার কোনো যুক্তি আছে কি?

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো আত্মগরিমায় আপ্লুত হয়ে বলেছেন, পাকিস্তান অস্ত্র জোগাড় করছে তাতে ভারতের ভয়ের কোনো কারণ নেই। পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্যই নাকি এই অস্ত্রগুলো তার দরকার। আমেরিকা, চীন, ফ্রান্স প্রভৃতি নানা দেশ থেকে অস্ত্র এনে পাকিস্তান আজ তার অস্ত্রাগার ভরে তুলছে শুধু নিজেকে রক্ষা করার সাধু উদ্দেশ্যে? এটা কে বিশ্বাস করবে? পাকিস্তানের অর্ধেক অংশ চলে গেছে। তার দায়িত্বও কমেছে। এ দিকে সিমলা চুক্তি অনুযায়ী ভারত পাকিস্তান সকল বিষয়ে উত্তেজনা হ্রাস এবং অবস্থা স্বাভাবিক করে আনার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারত একের পর এক দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু পাকিস্তান কার্যত তা ব্যর্থ করতে চাইছে আমেরিকার উস্কানিতে।

আমেরিকার সংগে ভারতের বিরোধ নেই। কিন্তু আমেরিকা মনে করে ভারতের চেয়ে পাকিস্তান তার প্রতি বিশ্বস্ত। একথা ঠিক ভারত তার নিজের আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করে চলেছে। প্রবল স্নায়ুযুদ্ধের দিনেও ভারত আমেরিকাকে পরোয়া করে নি। তার সামরিক জোটবদ্ধতার নিন্দা করেছে। সে সময়ে রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে আমেরিকার চরম বৈরিতা ছিল। তাই রাশিয়া ও চীনকে প্রতিহত করার জন্য এই উপমহাদেশে সে ঘাঁটি করার সুযোগ খুঁজছিল। পাকিস্তানের পেশোয়ার ঘাঁটি থেকে মার্কিন ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান রাশিয়ার আকাশে চরতে গিয়েছিল। ক্রুশ্চেভের সতর্ক সেনাবাহিনী গুলী করে সেই বিমানকে নামিয়েছিল রাশিয়ার মাটিতে। গ্রেপ্তার হয়েছিল তার পাইলট স্যারী পাওয়ার্স। সেই কেলেঙ্কারীর পর পেশোয়ার ঘাঁটি ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। তবে গোয়েন্দাগিরি তারা কমায় নি। যে-দেশের সরকার তাদের মনঃপূত নয় তাদের বিব্রত করা এবং সম্ভব হলে গদীচ্যুত করা মার্কিণ সি আই এ-র প্রধান লক্ষ্য। চিলির ঘটনার পর মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরের মুখপাত্র নিজেই তা স্বীকার করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থেই এই কর্ম তাঁরা করে থাকেন।

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সরকার ও সমাজব্যবস্থার প্রতি মার্কিন সরকার মুখে শ্রদ্ধা জানাতে ভোলেন না। বলা হয়ে থাকে, ভারতবর্ষ হল পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। কিন্তু আমেরিকার বন্ধুবান্ধব হল এমন সব রাষ্ট্র যেখানে গণতন্ত্রের ছিটে-ফোঁটাও নেই। ভিয়েতনামে থিউ সরকার, কম্বোডিয়ায় লন নল, পাকিস্তানে ভুট্টো স্পেনের ফ্রাঙ্কো এবং অনুরূপ ডিক্টেটর শাসিত দেশগুলোর সঙ্গেই আমেরিকার বন্ধুত্ব ছিল এবং আছে। পর্তুগাল নতুন গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের পর তার প্রতি আমেরিকার উৎসাহে ভাটা পড়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইউরোপে স্নায়ুযুদ্ধ হ্রাস এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করলেও আমেরিকা আমাদের উপমহাদেশে এবং পশ্চিম এশিয়ায় অশান্তি জিইয়ে রাখতে চায়। ওদিকে ইস্রায়েল এবং এদিকে পাকিস্তান হল তার বিশ্বস্ত অনুচর। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমেরিকার বর্তমান নীতি পুরনো ক্ষত-গুলোকে আবার উন্মুক্ত করে দিল। ভারতবর্ষ আমেরিকার কোনো ক্ষতি করে নি। তা সত্ত্বেও ভারতের প্রতি বৈরিতা করা তার রাজনৈতিক বিদ্বেষপ্রসূত নীতিরই পরিচায়ক। পাকিস্তানকে দিয়ে ভারতকে কাবু বা পর্যুদস্ত করার দুরাশা যদি তার থাকে তবে তা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে। গত ২৭ বছরে তিনবার ভারত আক্রান্ত হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিবারই পরাজিত হয়েছে। ভবিষ্যতে আক্রমণ করলেও ভারতবর্ষ তা প্রতিহত করবে। আমেরিকা কি চায় এই উপ মহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হোক; ভারতবর্ষ এই প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর চায়।

কুমারী মাতা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

রাত ঠিক ন'টায় আহার জোট পেরিয়ে গাড়িটা সিঁড়ির গায়ে এসে দাঁড়াতে বিধু সরকার ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলেন। সামনের চওড়া বারান্দায় জোরালো আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় গাড়ির ছবি দেখে বিধু সরকার মনে মনে নাক সিঁটকেছেন। অত দেমাক না দেখিয়ে যেখানে একটা গাড়ি পাঠাতে বলে দিলেই হতো। সেই তো সড়সড় করে আসতে হল আবার। মাঝখানে [illegible] এই আধঘণ্টা [illegible] [illegible] কটা দিন।

তাঁর মুখ দেখে মনের কথা কেউ বুঝবে না এ তিনি নিজেও জানেন। বিগলিত অভ্যর্থনায় শশব্যস্তে এগিয়ে এসেছিলেন।

পাঁচ ধাপের মস্ত চাতালা সিঁড়ি টপকে এগিয়ে আসার আগে গাড়ির দরজা খুলে রমণী নিজেই নেমে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝকঝকে লালের ধাক্কায় কয়েক মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত এই বয়সের মানুষটাও।

সামনে কমনীয় অথচ দৃপ্ত রাজেন্দ্রাণী মূর্তি যেন একখানা। পরনে টকটকে লাল দামী সিফন গায়ে আরো গাঢ় লাল ভেলভেট ব্লাউস। এক-গা গয়না। আঙুলে হীরের আংটি। কানে হীরের দুল।

এই রমণীর জন্যেই উদগ্রীব প্রতীক্ষায় ছিলেন বিধু সরকার। কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে টান [illegible] দাঁড়িয়ে সোজা তাঁর দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে হকচকিয়ে গেছেন কেমন। সামলে নিতে সময় লাগে নি অবশ্য। সস্নেহ অভ্যর্থনায় উপচে উঠেছেন, এসো মা এসো। একেবারে [illegible]

রমণী জবাব দেয় নি। সিঁড়িতে পা দিয়ে একবার শুধু মুখ তুলে তাকিয়েছে তাঁর দিকে।

তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন বিধু সরকার। চকচকে ঝরঝরে গাড়িটা তখনো সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে। গলা খাঁকারি দিয়ে বলেছেন, গাড়িটা চলে যেতে বলি, আমাদের গাড়ি পৌঁছে দেবে'খন—

রমণী আধা-আধি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্রসারিত দু' চোখ সোজা আবার তাঁর মুখে এসে থেমেছে। বিধু সরকার থতমত খেয়েছেন। গত দেড় মাসের মধ্যে কম করে দশ বার এই মেয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁর, কথা হয়েছে। কিন্তু এ যেন সেই মেয়েই নয়।

—গাড়ি ওখানেই থাক।

আবার সামনে পা বাড়িয়েছে। বিধু সরকার শশব্যস্তে অনুসরণ করেছেন তাকে। ছোট বারান্দা পেরুলে সামনে দোতলায় ওঠার তকতকে মোজেক করা সিঁড়ি। দুধারের দেয়ালে খান তিনেক অয়েল পেন্টিং। বাড়ির মালিকের রুচির পরিচয় এগুলো। সিঁড়ি ভেঙে রমণী আগে আগে উঠছে। পিছনে বিধু সরকার। ভদ্রলোকের বয়েস এখন আটান্ন। ছয় রিপুর মধ্যে অন্তত কাম-মোহ-মাৎসর্য থেকে নিজেকে মুক্ত ভাবেন এখন। তাঁর হিসেবী মন আর হিসেবী চোখ একটিমাত্র মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর তুষ্টির ব্যাপারে তীক্ষ্ণ সজাগ। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজের মনের খবর রাখেন না বিধু সরকার চোখ দুটোও সচলমন্থর লালের ঘোরে আচ্ছন্ন। আগে আর কখনো এই বেশে আর এই মূর্তিতে দেখেন নি একে। মঞ্চের বাইরে সাদাসিধে বেশ-বাস দেখেছেন, হাসি-ছোঁয়া কমনীয় মুখখানায় বুদ্ধির বিনম্র ছটা দেখেছেন। কিন্তু এই সাজ আর এই মূর্তি দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে আচমকা ধাক্কায় সজাগ করে তোলার মতো, আবার তার পরেই নিষেধের এক অমোঘ ভ্রুকুটিতে পঙ্গু করে ফেলার মতোও।

...নিষেধ লঙ্ঘনের তাগিদ যাঁর তিনি দোতলার বারান্দার শেষ মাথার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। পুরুষ। বিধু সরকারের চোখে পুরুষকারের প্রতীক। বয়সে সাত আট বছরের ছোট হলেও ওই মানুষের মাথা হিমালয়ের মতো উঁচু। আজ তিরিশ বছরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে বিধু সরকারের নিজেকে অসহায় মনে হয় কত সময়। তবু ওই লোকের মুখের প্রতিটি অদৃশ্য আঁচড় চেনেন। দূর থেকে এক নজর তাকিয়েই মনে হল নীরব গাম্ভীর্যের আড়ালে পরিতুষ্ট প্রতীক্ষায় আসন দেখলেন।

...নিষেধ-লঙ্ঘনও বুঝি ওই একজনেরই অনায়াসসাধ্য।

বিধু সরকার দোতলার বারান্দার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে গেছেন। রমণী নিশ্চিন্তে ওই কোণের ঘরের দিকে, ওই পুরুষের দিকে এগিয়ে গেছে। ...নীরব অভ্যর্থনায় পুরুষ দরজার সৌখিন পুরু পর্দাটা টেনে ধরেছেন।

তারপর সেই পর্দা আবার সরে এসে দুজনকেই আড়াল করেছে।

এতক্ষণে বিধু সরকারের চোখের লালের ঘোর কেটেছে। স্নায়ুগুলো সব বশে এসেছে। অগ্রহায়ণের গোড়ার দিক এটা। বেশ একটু ঠান্ডার আমেজ পড়েছে। সুতির চাদরটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নীচে নেমে এসেছেন তিনি। বারান্দার এ-ধারে এসে বাইরে উঁকি দিয়েছেন। ঝরঝরে গাড়িটা সিঁড়ির গায়েই দাঁড়িয়ে আছে। বিহারী ড্রাইভারটা পিছনে মাথা ঠেকিয়ে একটু নিদ্রা দেবার মতলবে আছে বোধহয়। ভাবলেন ওকে ডেকে গাড়িটা আঙিনার ও-ধারে নিয়ে রাখতে বলবেন। সকালের আগে আর এ-গাড়ির দরকার হবে মনে হয় না। কিন্তু বললেন না। ওটাকে সচল করতে হলে যে শব্দ উঠবে সেটুকুও কাম্য নয় যেন।

বাইরের বারান্দার আলোটা নেভালেই ও-গাড়ি আর কারো নজরে পড়বে না। তাই করলেন।

এখনো কিছু কাজ বাকি। মালিক দুজনার মতো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা রাখতে বলেছিলেন। নির্দেশ মতো বাবুর্চি বেয়ারারা প্রস্তুত। তবু ভিতরে এসে আর এক দফা তদারক সেরে নিলেন বিধু সরকার। একজন বেয়ারাকে দোতলার বারান্দার সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করতে বললেন। সাহেব ঘরের বোতাম টিপলেই ওপরে-নীচে দু জায়গাতেই প্যাঁক করে মিষ্টি শব্দ হয় একটু। কিন্তু নীচে থেকে লোক ছুটে যাওয়ার থেকে একজনের ওপরে অপেক্ষা করাই ভালো।

ঠান্ডার আমেজ বাড়ছেই। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে খুব বেশি রাত হবে মনে হয় না। মালিকের শৃঙ্খলাবোধ আছে, অযথা কাউকে কষ্ট দেন না বড় একটা। ক'টা রাত ভালো ঘুম হয় নি। এই মেয়েটাই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। আজ ছুটি পেলেই নিশ্চিন্ত মনে শয্যায় গিয়ে টান হতে পারবেন।

বয়েস আটান্ন কিন্তু এই মুহূর্তে ভিতরটা উন্মুখ একটু। এই গোছের প্রতিক্রিয়া আগে কখনো হয় নি। নীচের বারান্দায় পায়চারি করছেন নিজের মনেই হাসছেন অল্প অল্প আর এক-একবার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছেন। চোখ দুটো তাঁর দোতলার বারান্দার কোণের ঘরের পর্দা ঠেলে ভিতরের দিকে ধাওয়া করছে। আগে এ-রকম কখনো হয় নি। বিকেল থেকে এই রাতের সবটুকুই যেন স্বতন্ত্র।

আধ ঘন্টার মধ্যেই বিষম চমক আবার। অদূরে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল চোখে সিঁড়ির দিকে চেয়ে আছেন বিধু সরকার। ঠিক দেখছেন কিনা সেই সংশয়। সিঁড়ির সাদা আলোয় হঠাৎ লালের আভা। তারপরেই নির্বাক বিমূঢ় বিধু সরকার।...রমণী নেমে আসছে। তেমনি দৃপ্ত আত্মস্থ মূর্তি। নেমে এলো। পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে এগলো। ধীর অবিচলিত পদক্ষেপ। ঠিক চার দিন আগে প্রায় এই সময় এই মেয়েই এখান দিয়ে ভীত ত্রস্ত হরিণীর মতো ছুটে পালিয়েছিল?

খানিক আগে আলো নিভিয়েছিলেন তাই বাইরেটা অন্ধকার। নিজের অগোচরে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন বিধু সরকার। এনজিনে স্টার্ট পড়ার শব্দ কানে এলো। অন্ধকারে হেড-লাইট জেবলে গাড়িটা ফটক পেরিয়ে চলে গেল।

বুকের তলায় ঠক-ঠক কাঁপুনি বিধু সরকারের। কি ব্যাপার ঘটল হঠাৎ তিনি জানেন না—কিন্তু এ-সব-কিছু যেন তাঁরই অযোগ্যতার নজির। পায়ে পায়ে দোতলায় উঠে এলেন। বেয়ারাগুলো হাঁ করে চেয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে। ওই কোণের ঘরের দিকে এগোলেন বিধু সরকার। পা যেন আর চলে না। গিয়ে কোন মূর্তি দেখবেন মালিকের?

পুরু পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিলেন। মালিক শয্যায় বসে আছেন পাথরের মতো, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে একটু। কি-রকম যেন অস্বাভাবিক লাগছে এ-রকম দেখবেন আদৌ আশা করেননি। পর্দা ঠেলে সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু মালিক টের পেয়েছেন কিনা বোঝা গেল না মাথা তেমনি নীচু।

তারপরেই হতচকিত বিধু সরকার। হ্যাঁ, অস্বাভাবিকই বটে এমন অস্বাভাবিক যে কল্পনা করা যায় না। এই ঠান্ডায়ও মালিক দরদর করে ঘামছেন। ঘামে সমস্ত মুখ জবজবে ভিজে। গায়ের বিলিতি আদ্দির পাতলা জামাটাও গেঞ্জির ওপর দিয়ে ভিজে উঠেছে।

*

আজ দেড় মাস হল পেশাদার রাজ্যে বড় রকমের ওলট-পালট হয়ে গেছে একটা। শহরের একটা প্রথম শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চের এত কালের জীবনশিখা এবারে সত্যিই নিভু-নিভু। নির্বাণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কোনো কাগজে বেরোয়নি এখনো কিন্তু দেড় মাস হয়ে গেল মঞ্চের নাটক বন্ধ। মঞ্চের মালিক বছর খানেক আগে বিগত হবার পর থেকেই নানান গোলযোগের সূত্রপাত। অনেক সরিকের মধ্যে মনোমালিন্য দুর্নীতির দায়ে তাদের আসল পৈতৃক ব্যবসার অবস্থাই টলোমলো। মঞ্চের দিক সামলায় কে? এর মধ্যে সুপরিচালনার অভাব, খরচপত্রের নানান অব্যবস্থার দরুন মঞ্চের শিল্পী আর কর্মচারীরাও বিক্ষুব্ধ। বাড়তি দাবিদাওয়া ছেড়ে তারা নিয়মিত বেতন আর ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছে না। অতএব তাদেরও চোখ হামেশাই লাল। প্রায় আচমকাই মালিকরা একদিন মঞ্চের দরজা বন্ধ করে দিলেন। শিল্পী টেকনিসিয়ান আর কর্মচারীরা অবশ্য আশ্বাস পেলেন মালিকদের পারিবারিক ঝামেলা মিটলে শিগগীরই আবার মঞ্চের দরজা খোলা হবে আর তখন সমস্ত রকমের সুব্যবস্থাও হবে। কিন্তু এ-আশ্বাসের দাম কতটুকু সকলেই জানে। তারা প্রথমে মাথায় হাত দিয়ে

বসল। পরে ছোট-বড় সকলে দল বেঁধে ছুটল অঞ্জলি চক্রবর্তীর কাছে।

আজ প্রায় বারো বছর যাবৎ এই মঞ্চের প্রধান অভিনেত্রী অঞ্জলি চক্রবর্তী। এই মঞ্চের প্রধান তো বটেই মহানগরীর আর কোনো মঞ্চেই অভিনেত্রী হিসেবে তার জুড়ি নেই। সমস্ত পশ্চিমবাংলায় মঞ্চ-শিল্পী অঞ্জলি চক্রবর্তী উজ্জ্বলতম নাম।

নামের আরো কারণ আছে। মঞ্চানুরাগের এমন নজির আর দুটি নেই। কুড়ি-একুশ বছর বয়সে তার মঞ্চে পদার্পণ। বয়েস এখন বত্রিশ-তেত্রিশ। কিন্তু এই বয়সটা আজো যেন তার সেই বাইশ-চব্বিশের যৌবনমঞ্চে স্থির, অনড়। অভিনেত্রী জীবনের প্রায় শুরু থেকেই সে নায়িকা। তার আগে গোটা কয়েক অ্যামেচার ক্লাবের নায়িকা ছিল সে। এই রূপ-যৌবন আর তীক্ষ্ণ অভিনয়-ক্ষমতা নিয়ে কালে দিনে সে কোন পর্যায়ের শিল্পী হয়ে উঠবে বর্তমান মঞ্চের সেদিনের মালিকের সেটুকু আঁচ করার ক্ষমতা ছিল। পাঁচ বছরের শর্ত-সাপেক্ষে বেশ চড়া মাশুল গুনেই তিনি তাকে সপথেকে জনপ্রিয় মঞ্চটিবে তুলে এনেছিলেন। তাঁর হিসেবে ভুল হয়নি। অভিনয়ে অসামান্য সাফল্যের দরুন প্রতি বছর শর্তের থেকেও ঢের বেশিই দিয়েছেন তাকে। আর প্রত্যেক বারই শর্তের একটা বিশেষ অংশ তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

হ্যাঁ অঞ্জলি চক্রবর্তী সেই মালিককে সত্যিই ভক্তি করত শ্রদ্ধা করত, আর তার শর্তের কথা শুনে মনে মনে হাসত। আসলে ভদ্রলোকের ভয়। অঞ্জলির কাছে সিনেমার দল তখন ভিড় করে আসছে। একের পর এক লোভনীয় টোপ ফেলছে। ক্ষতিপূরণ দিয়ে শর্ত নাকচ করার মতো মুরুব্বিরা তখন ওর পিছনে লেগে আছে।

অঞ্জলি চক্রবর্তী একদিনের জন্যেও লুব্ধ হয়নি। যে-মঞ্চ তাকে ঝড়ের মুখে কুটো হয়ে ভেসে যাওয়ার মতো দুর্দিন থেকে টেনে তুলেছে, সম্মান দিয়েছে, মর্যাদা দিয়েছে—সেই মঞ্চকে সে ভাল-বেসেছে। লোভের বশে মঞ্চ ছেড়ে যাওয়াটাকে স্বামীর ঘর থেকে অপরের ঘরে চলে যাওয়ার মতোই ভেবেছে সে। ভেবেছে বলেই আজ সে-সমস্ত পশ্চিমবাংলার মঞ্চ-সম্রাজ্ঞী।

সহশিল্পী আর কর্মচারীরা তার কাছে এসে ধর্না দেবে না তো আর যাবে কোথায়। তাদের সানুনয় অনুরোধ এবং মিনতি সে যেন আরো কিছুকাল অপেক্ষা করে, চট করে অন্য কোনো মঞ্চের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ না হয়। কারণ এই মঞ্চের দরজা বন্ধ হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনটে মঞ্চের মালিকেরা যে সোল্লাসে তার কাছে ছুটে এসেছে, দেড়গুণ বেশি পারিশ্রমিক দিয়ে যে তাকে টেনে নিতে চেষ্টা করছে—এ-খবর তারা রাখে। তাছাড়া সহজ অনুমান সাপেক্ষও বটে এটা। অঞ্জলি চক্রবর্তী যদি সত্যিই চলে যায়, তাহলে আর কোনো আশা নেই, গেলই এটা।

অঞ্জলি চক্রবর্তী হাসিমুখেই আশ্বাস দিয়েছে তাদের। বলেছে, অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই কিন্তু কি দিয়ে কি করবেন আপনারা বুঝছি না।

প্রবীণ ম্যানেজার ভদ্রলোক একটু আশার কথা শুনিয়েছেন। বিরাট বিত্তবান এক বাঙালী ব্যবসায়ী নাকি মঞ্চসুদ্ধু এই এলাকা সোজাসুজি কিনে নেবার ইচ্ছেয় মালিক পক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা কইছেন। খবরটা প্রথম কানে আসতে সকলে ঘাবড়ে গেছল। কেনার পর ভদ্রলোক এটাকে তাঁর গোডাউন বানাবেন, কি মঞ্চ চালাবেন কে জানে। কিন্তু তাঁর নাম শুনেই ম্যানেজার আশ্বস্ত কিছুটা। এতদিনের ম্যানেজারীর কল্যাণে ওই ভদ্রলোকটিকে তিনি ভালো চেনেন। সত্যিকারের মঞ্চানুরাগী। এখানকার প্রতিটি নাটক অনেক বার করে দেখে থাকেন। আর তখন সব থেকে চড়া মাশুলের বকস-এর স্বতন্ত্র আসন তাঁর জন্য বুক করা হয়।

মঞ্চানুরাগী মানুষটির নাম দেবেশ মজুমদার। বিলেত জার্মানী ফেরত মস্ত এঞ্জিনীয়ার কিন্তু ব্যবসা এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের। বছরের মধ্যে তিন-চার মাস বিদেশে কাটান।

নামটা শোনা এবং জানা অঞ্জলি চক্রবর্তীরও। বর্তমান মালিকদের একজনের মুখেই শুনেছে। যা বলত, প্রকারান্তরে তারই প্রশংসা সেটা। যার অভিনয়ের টানে ওমুক মাল্টিমিলিয়নেয়ার ভদ্রলোক এক-একটা শো অনেকবার করে দেখে থাকেন। ঠাট্টার ছলে মাজেস্টিজে আগে থাকতে জানান দিয়েছে তোমার সেই মাল্টিমিলিয়নেয়ার এক্সপোর্ট-ইমপোর্টার এনজিনীয়ার প্রেমিক নাটক দেখতে এসেছেন, ভালো করে কোরো।

না, অঞ্জলি চক্রবর্তী সেই ভদ্রলোকের কথা শুনেছে শুধু, তাকে চোখে দেখেনি। কারণ, ভদ্রলোক সকলের সঙ্গে গ্রীনরুমে আসেন না কখনো। আর আদিখ্যেতা দেখিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতেও আসেননি। তাছাড়া এই নামের সঙ্গে পরিচয়ের আরো বিশেষ কারণ আছে। দু'বছর আগে একটা নাটকের হাজার রজনী অভিনয়ের অনুষ্ঠান জাঁকজমক করে সম্পন্ন হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানেও সকলের আকর্ষণের প্রধান সম্রাজ্ঞী অঞ্জলি চক্রবর্তী। সেই রাতে প্রধান মালিক তার হাতে কম করে বিশ ভরি ওজনের একটা অদ্ভুতসুন্দর সোনার কাপ তুলে দিয়ে মাইকে ঘোষণা করেছিলেন, শিল্পীর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে এটি দিয়েছেন শিল্পপতি ওমুক মজুমদার। সন্ধ্যার সেই অনুষ্ঠানে অঞ্জলি চক্রবর্তীর অনুসন্ধিৎসু দুই চোখ ভদ্রলোককে খুঁজেছিল। তিনি আসেননি। সেই সোনার কাপ এখনো তার ব্যাঙ্কের ভোল্টে মজুত।

প্রবীণ ম্যানেজার জানালেন দেবেশ মজুমদারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি বা কথা হয়নি। নিজে তিনি কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন না বা কথা বলেন না। সবকিছুই তাঁর সেক্রেটারির মারফত হয়ে থাকে। সেই সেক্রেটারির সঙ্গে ম্যানেজারের দেখা হয়েছে কথা হয়েছে। তিনি নাকি আশ্বাস দিয়েছেন মঞ্চের মালিকানা খুব শিগগীরই হাতবদল হবে। আর নাটকই হবে এখানে। তবে এর ভবিষ্যৎ কতটা সফল বা কতটা উজ্জ্বল সেটা নির্ভর করছে এখানকার প্রধান অভিনেত্রী অঞ্জলি চক্রবর্তীর ওপরে। শুধু অভিনয় নয় এদিকের সবকিছু ম্যানেজ করার দায়-দায়িত্বও তাকেই নিতে হবে।

এতটা শোনার পরেই আশান্বিত হয়ে সকলে তার কাছে ছুটে এসেছে।

এই স্তুতির কথা শুনে অঞ্জলি চক্রবর্তীর মুখ একটু লাল হয়েছিল। এই প্রস্তাবনার পিছনে অনুক্ত ইঙ্গিত কিছু আছেই। অবাক খুব হয়নি। সে-রকম রমণীর কারণে অনেক মহাজনের ধুলোয় গড়াগড়ি খাওয়ার কথা শোনা আছে আর নিজের অভিজ্ঞতায় জানাও আছে কিছু। নগ্ন প্রত্যাশার অনেক কাণ্ডকারখানা দেখেছে সে। হাসিমুখেই বিদায় করেছে সকলকে বলেছে, খুব ভালো দেখি আমার। ঠিক আছে, অপেক্ষা করব—দেখা যাক।

এত নিঃশব্দে এত দিনে দেখার খবরটা কানে আসবে কেউ ভাবেনি।...দেবেশ মজুমদারের সেক্রেটারি তিন চার দিনের মধ্যে এসে সোজা অঞ্জলি চক্রবর্তীর সঙ্গেই দেখা করে খবরটা জানিয়েছেন। মালিকের নির্দেশও পেশ করেছেন। পাবলিসিটি দিয়ে যথাশীঘ্র আবার মঞ্চ চালু করার নির্দেশ। খরচপত্র ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করলেই হবে। পাবলিসিটি অফিসার থেকে শিল্পী টেকনিশিয়ান এবং কর্মচারীরা আগে যেভাবে বহাল ছিল তেমনিই থাকবে। অদলবদল কিছু করার দরকার হলে সে স্বাধীনতাও অঞ্জলি চক্রবর্তীর সম্পূর্ণ আছে। নতুন নাটক নিয়ে শুরু করা হবে কি আপাতত পুরনো নাটকই চলবে সে বিবেচনাও অঞ্জলিদেবীরই।

সহজাত হাসি মুখে অঞ্জলি চক্রবর্তী শুনেছে আর নিরীক্ষণ করে দেখেছে লোকটাকে। তারপর আরো একটু হেসে বলেছে যতটা পারি চেষ্টা করব কিন্তু আমার ওপর মিস্টার মজুমদার এতটা নির্ভর করছেন, দেখে ভয় করছে...।

সেক্রেটারি বিধু সরকার। এই আটাশ বছর বয়সে অনেক দেখেছেন অনেক জেনেছেন। আভিজাত্যবর্জিত অন্তরঙ্গ সহজতায় অনায়াসে কাছে এগিয়ে আসতে পারেন। কোনরকম ভণিতা না করে সোজা জবাব দিলেন সাহেব নির্ভর যখন করেন তখন সবটাই করেন। তাছাড়া এ ব্যাপারে যা কিছু সবই তোমার জন্যে না—

অঞ্জলির কানের ডগা লাল হবার উপক্রম একটু। কিন্তু এ লাইনে এতদিন কাটিয়ে এ-সব কথা গায়ে না মেখে অভ্যস্তও। ঈষৎ কৌতুকে চেয়ে রইল।

বিধু সরকার বললেন আমার সাহেবের বিলাস বলো ব্যসন বলো ওই একটি জিনিস—নাটক। ছেলেবেলা থেকেই তাই। এখন ব্যবসা এত বেশি ফেঁপে উঠেছে যে সময় বেশি পান না তবু এরই মধ্যে সময় করে তোমার এক-একটা নাটক কতবার করে দেখেছেন ঠিক নেই। সেই তোমাদেরই মঞ্চের দরজা বন্ধ হতে দেখে আমার ওপর সোজা হুকুম কিনে নিয়ে আবার চালু করার ব্যবস্থা করো।

এই সেক্রেটারিটি মালিকের কোন পর্যায়ের বশংবদ অঞ্জলি চক্রবর্তী অনায়াসে সেটুকু আঁচ করে নিতে পেরেছে। নিজেকে তুচ্ছ করে এইসব মানুষ সর্বদাই তাদের মনিবকে এগিয়ে দিয়ে থাকে মনিবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।

হেসেই বলল তাঁর অসীম অনুগ্রহ আর আমাদের ভাগ্য।...কিন্তু তাঁর সঙ্গেই দেখা করে একটু কথাবার্তা কইলে ভালো হত না?

বিধু সরকারের সাদাসাপটা জবাব দেখাও অনেক হবে কথাও অনেক হবে তার জন্য ভাবনা কি...তবে এ ব্যাপারে সাহেব একবার গ্রীন সিগন্যাল যখন দিয়েছেন তুমি নিশ্চিন্ত মনে কাজে এগিয়ে যাও আর আমাকে টেলিফোনে জানালেই যা লাগবে নিয়ে হাজির হব। তাছাড়া সাহেব তো আজ ভোরেই সিঙ্গাপুরে রওনা হয়ে গেছেন পাঁচ সাত দিনের আগে ফিরবেন না।

মুখে না বললেও সরাসরি যেভাবে ভদ্রলোক ভবিষ্যতে অনেক দেখা আর অনেক কথা হওয়ার আশ্বাস দিলেন তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত কিছু আছেই। কিন্তু অঞ্জলি চক্রবর্তী এ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। এ যাবৎ সে অনেকরকমের জটিলতার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে আবার কখনো-সখনো সাময়িকভাবে আটকেও গেছে। অতএব এতগুলো লোকের সুখদুঃখ ভালোমন্দ যেখানে জড়িত সেই সংস্থাকে আবার টেনে তোলাটাই প্রধান বিবেচনার ব্যাপার। নিতান্ত বেগতিক দেখলে অথবা না পোষালে সরে আসতে কতক্ষণ। অঞ্জলির ঝুঁকি নেওয়ার প্রশ্ন নেই এখানকার কাজ ছাড়লে আর পাঁচজন তাকে নেবার জন্য হাত বাড়িয়েই আছে। সে-ক্ষেত্রে বিপাকে বরং ওই বিত্তবান পুরুষবর। বহু টাকার বিনিময়ে এই সংস্থার মালিকানা পেয়েছে কাজ শুরু হবার আগেই আরো অনেক ঢালতে হবে।

গত দেড় মাসের মধ্যে সেক্রেটারি বিধু সরকার আরো অনেকবার এসেছেন। অঞ্জলির বাড়িতেই অন্যান্য শিল্পী টেকনিসিয়ান আর কর্মচারীদের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেছে। অঞ্জলির পরামর্শ মতো সকলের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিয়েছেন। আপাতত যে নাটক বন্ধ হয়েছিল সেটাই আবার চলবে স্থির হয়েছে। কিন্তু তার সাজ-সরঞ্জাম বদলানো হয়েছে। সংস্কারে আর নতুন রঙে মঞ্চ-গৃহের ভোল পাল্টে গেছে। বিধু সরকার অম্লানবদনে টাকা দিয়ে যাচ্ছেন। খোদ মালিককে কেউ দেখেনি এর মধ্যে ফলে সকলের কাছে বিধু-সরকারেরই মস্ত খাতির। খাতির তাকে একটু আধটু অঞ্জলিও করছে। একান্ত বিশ্বাসযোগ্য লোক না হলে খরচের এমন ঢালা পরোয়ানা কেউ ছেড়ে দেয় না। আরো একটা জিনিস অঞ্জলি চক্রবর্তীর ভালো লেগেছে। লোকটার আচরণে রাখা-ঢাকা ব্যাপার কিছু নেই। মনের কথা মুখ দিয়ে অনায়াসে বেরিয়ে আসে।

একান্ত আলাপের সময় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মালিকের প্রসঙ্গেও অনেক কথা জেনে নিয়েছে। কৌতূহল অঞ্জলিরও কিছু আছেই। বিশ ভরি ওজনের অমন সুন্দর সোনার কাপ উপহার দেবার সময়ও নিজেকে জাহির করার জন্য কাছে এগিয়ে আসেনি। আর এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে এখনো ওই লোক চোখের আড়ালে। অঞ্জলির মনে মনে ধারণা মানুষটা দাম্ভিক এবং নিজের সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। বিধু সরকার অবশ্য বলেন মাটির মানুষ অক্লান্ত কাজের মানুষ। একদিকে যেমন অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন অন্যদিকে তেমনি শিশুর মতো সরল। তারপর হেসে যোগ দিয়েছেন তুমি তো জানবেই তখন মিলিয়ে দেখো।

এই নতুন মালিকটিকে অঞ্জলি জানবে এবং বিশেষভাবে জানবে এ যেন ধরা-বাঁধা ব্যাপার। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি ফুটিয়ে অঞ্জলি চক্রবর্তী এই লোভটাকেই একপলক দেখে নিয়েছে।

কথায় কথায় আরো শুনেছে। মানুষটা অর্থাৎ এই নয়া মালিক নাকি বিয়েই করেন নি। বিয়ের মতিও হয়নি ফুরসতও হয়নি। ভাইয়েরা আছে তাদের ঘর-সংসার আছে মাস গেলে সাহেব তাদের অনেক টাকা দেন—এ ছাড়া আর কোনো সংস্রব নেই। বয়েস তো এখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল নিজের ঘর-সংসার আর হবেও না কোনদিন।

এই কথাগুলোও প্রচ্ছন্ন টোপের মতোই মনে হয়েছে অঞ্জলির। হাসি মুখেই জিজ্ঞাসা করেছে ঘর-সংসার হল না বলে আপনাদের সুবিধে হয়েছে না অসুবিধে?

নির্বিকার জবাব দিয়েছেন বিধু সরকার আমাদের সুবিধেই হয়েছে। কারণ কি জানো মা এ-রকম বিরাট মানুষের যোগ্য সঙ্গিনী হতে পারে এমন মেয়েও তো বড় একটা দেখলাম না। যেমন তেমন একজন এলে কোনদিন সাহেবের নাগাল পেতেন না মাঝখান থেকে আমরা নাজেহাল হতাম।

এত সব শোনার পর অঞ্জলি চক্রবর্তীর কেমন মনে হয়েছে সে নিজেই যেন কোনো একটা পরিণতির অনিশ্চিত মোহনার দিকে পা বাড়াতে চলেছে। ভিতরে ভিতরে এক ধরণের চাপা অস্বস্তি শুরু হয়েছে তার।

ঠিক চারদিন আগে এই গোছের আমন্ত্রণের জন্য অঞ্জলি চক্রবর্তী একটুও প্রস্তুত ছিল না। সে ধরেই নিয়েছিল নাটক শুরু হবার পর মালিকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ এবং আলাপ পরিচয় থেকে নিজের ভবিষ্যতের আঁচটা ভালো মতো পাবে।

জানান না দিয়েই বিধু সরকার এলেন। সেইরকমই সংকোচশূন্য সাদাসিধে আচরণ তাঁর। বললেন আজ তো একবার আসতে হচ্ছে গো মা।

অঞ্জলি অবাক একটু। —কোথায়?

—আমাদের ...মানে সাহেবের বাড়িতে।

অঞ্জলি থমকে তাকালো মুখের দিকে।

—সাহেব বলেছেন?

—হ্যাঁ এই তো খানিক আগে তাঁর টেলিফোন পেয়ে ছুটে আসছি।

—টেলিফোন পেয়ে!

—হ্যাঁ গো ...সাহেব তো দিল্লীতে এখন ট্রাংক কল করেছিলেন এখানকার সব খবরাখবর নিলেন ...আজই রাতের প্লেনে ফিরছেন বাড়ি পৌঁছুতে প্রায় নটা হবে তোমাকে সাড়ে নটায় আসতে বললেন। আমি ঠিক সময়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেব... ওখানেই খাওয়াদাওয়া করবে।

শোনামাত্র ভিতরটা বিরূপ হয়ে উঠল অঞ্জলির। যেভাবে ওই মালিক তার কর্মচারীকে হুকুম বা নির্দেশ দিয়ে অভ্যস্ত এও অনেকটা সেইরকম। ওর নিজের সুবিধে অসুবিধের প্রশ্ন নেই যেন। আমন্ত্রণ বাতিল করার তাগিদটা ঠোঁটের ডগায় এসেও ফিরে গেল। এত বছরের অভিনয় জীবনে অনেক-রকমের সংযমও শিখেছে। এত বড় একটা দায়িত্ব তার মাথায় এতগুলো মানুষ তার মুখ চেয়ে আছে—শুরুর আগেই সব ভেস্তে দেওয়ার ইচ্ছে নেই।

স্বাভাবিক বিড়ম্বনার আড়াল নিয়ে বলল অত রাতে গেলে ফিরব কখন।

বিধু সরকার লজ্জাটাই বড় করে দেখেন আলগা ছলাকলার ধার ধারেন না বড়। যেভাবে তাকালেন তার একটাই অর্থ। অর্থাৎ তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে বাজে ভাবনা ভেবে লাভ কি। মুখে বললেন সে ব্যবস্থা যখন চাইবে তখনই হবে তার জন্যে চিন্তা করতে হবে না। তুমি তৈরি থেকো আমি এই ধরো সোয়া নটা নাগাত গাড়ি পাঠাব।

চলে গেলেন। ভিতরের রাগটা একটা যন্ত্রণার মতো ঠেলে উঠতে লাগল অঞ্জলির। মঞ্চের এই নয়া মালিক এমনিই কলাকৌশল বর্জিত মানুষ ভাবতে পারেনি। বরং এতদিন একটি বারের জন্যেও সামনে এসে দাঁড়ায় নি বলে অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং দোরালো মানুষ বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু এ যেন সবটাই দম্ভ। আমার ডাকার সময় হয়েছে এবার তুমি এসো। কি করবে অঞ্জলি চক্রবর্তী এখন? ম্যানেজারকে ডেকে সহ-শিল্পীদের ডেকে আর টেকনিসিয়ানদের ডেকে সব বানচাল করে দেবে? বলবে এই মঞ্চের সঙ্গে আর আমার কোনো সম্পর্ক নেই?

কিন্তু অভিনেত্রী অঞ্জলি চক্রবর্তী হঠাৎ ঝোঁকের বশে কোনো কাজ করে না। রাগ চেপে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে জানে। সেই চিন্তার ফলে একটা বিপরীত সংকল্প দানা বেঁধে উঠতে লাগল। ক্ষমতাবান প্রবল পুরুষের আচরণ ওই অদেখা মানুষটার। যাচাই করে দেখতে আপত্তি কি? তাতে নতুন করে আর কতটুকু ক্ষতি তার?

...এ-যাবত পুরুষের নগ্ন প্রত্যাশার আঁচে কলজে পোড়ে নি এমন নয়। খানিক আগে রাগের আকারে সেই যন্ত্রণাই অনুভব করেছে। সত্যিকারের মানুষ পেলে তার যৌবনের দোসর হতে আপত্তি ছিল না। সেই ভুলের ফাঁদেই পা দিয়েছিল অঞ্জলি চক্রবর্তী। একে একে তিন বার। প্রথম আর শেষের ভুলের ফসল শুধুই ঘৃণা। আর মাঝের স্মৃতি তিক্ত বেদনার।

...ভদ্র এলাকার প্রায় বস্তিঘরের উনিশ বছরের এক রূপসী মেয়ে প্রলোভনের হুজুগে মুগ্ধ হয়ে অতি বিশ্বস্ত জনের সঙ্গে ঘর ছেড়েছিল। সেই গতানুগতিক প্রলোভন। ফোটো স্টুডিওর এক ক্যামেরাম্যান সিনেমা-জগতের নায়িকাদের পুরোভাগের আসনে বসানোর স্বপ্ন দেখিয়েছিল তাকে। আর সেই সঙ্গে তার গ্রহণের ব্যাপারটা [illegible] স্বতঃসিদ্ধ। তার সর্বস্ব গ্রাস করে [illegible] কাপুরুষ নিতান্ত অনাবশ্যক হয়ে [illegible] তার এক অ্যামেচার থিয়েটার ক্লাবের [illegible] চালক বন্ধুর হাতে সঁপে দিয়ে পালিয়েছিল। বলেছিল অভিনয় রপ্ত হোক তারপর [illegible] ছবির রাস্তা সুগম হবে।

সত্যি সুগম হয়েছে একদিন কিন্তু ঘৃণায় আর সে-রাস্তা মাড়ায় নি অঞ্জলি চক্রবর্তী। পেশাদার মঞ্চে দিনে দিনে ওর সেই উন্নতির মুখে লুব্ধ পতঙ্গের মতোই যৌবনের সেই প্রথম দোসর আবার এসেছিল। অঞ্জলি চক্রবর্তী কিছুদিন তার সঙ্গে প্রেম-প্রীতির নিখুঁত অভিনয় করেছে তারপর চিবুনো ছিবড়ের মতো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

..হ্যাঁ সত্যিকারের ভালও বোধহয় বেসেছিল ওই অ্যামেচার ক্লাবের আধপাগলা বন্ধুটিকে। অভিনয় জীবনে ওই মানুষটিই গুরু তার। হাতে ধরে আর কড়া শাসন করে অভিনয় শিখিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মদের নেশাই কাল হল লোকটার। সেই আধ-পাগল প্রতিভাধর মানুষটার কাছে অঞ্জলি নিঃশেষে সমর্পণ করেছিল নিজেকে। তার ভালবাসার জোর বড় কি লোকটার মদের নেশা—সেটা যাচাইয়ের জানাপোস পণ নিয়েই ওই লোকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। হেরে গেছে অঞ্জলি চক্রবর্তী। লিভারের ব্যামোয় অকালে চোখ বুজেছে লোকটা। এই স্মৃতির সবটুকুই তিক্ত বেদনার।

...লোকটার [illegible] এই মঞ্চের এক-সময়ের সহ-অভিনেতা। সেই লোকের এখনো নামডাক খুব। অন্য একটি মঞ্চে শুরু করেছে। তার সঙ্গে অঞ্জলি চক্রবর্তী ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল আর তারা দুজনে মিলে একদিন কোনো একটি মঞ্চের মালিক হবে—এই সিদ্ধান্তও স্থির হয়েই ছিল। মানুষটা খেপাটে কিন্তু তার ওই খেপাটে দিকটাই অঞ্জলির ভালো লাগত। অথচ সরল বিশ্বাসে রোজগারের বহু টাকা ওই লোকের হাতে তুলে দিয়েছে। ব্যাঙ্কে দুজনার নামে সেই টাকা জমা পড়ছেও ঠিকই। ভবিষ্যত মঞ্চের মূলধন। লোকটা হাসত আর বলত তা না—আসল মূলধন তুমি। এই মূলধন হস্তান্তরের ব্যাপারেও তেমনি বেপরোয়া এই লোক।

...একদিন আচমকা প্রকাশ পেল সে বিবাহিত। চারটি সন্তান নিয়ে তার স্ত্রী বছরের পর বছর দেশেই পড়ে আছে। নিরুপায় হয়েই শেষ পর্যন্ত সেই স্ত্রী মঞ্চের মালিকের শরণাপন্ন হয়েছে—তাঁকে চিঠি লিখেছে। মালিক যথাযথ যাচাই করে জেনেছেন চিঠির এক বর্ণও মিথ্যে নয়।

ঠাণ্ডা কঠিন মুখে অঞ্জলি চক্রবর্তী তার টাকা ফেরত চেয়েছে। কিন্তু জবাবে সেই লোক হাসি মুখে আশ্বাস দিয়েছে তাকে নিয়েই সে ঘর বাঁধবে—আগের স্ত্রীকে ডিভোর্স করবে।

যা দিয়েছিল তার একটি কপর্দকও ফিরে পায়নি। কারণ মঞ্চের মালিককে অঞ্জলি শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল এই মঞ্চে হয় সে থাকবে নয়তো ওই লোক থাকবে—দুজনের একসংগে জায়গা হবে না। মালিক ওই লোককেই জবাব দিয়েছেন।

রাত তখন সাড়ে আটটা। অঞ্জলি উঠল। প্রস্তুত হবার সময় হয়েছে। তার মন স্থির। যাবে। গেলে নতুন করে খুব বড় ক্ষতির সম্ভাবনা আর কিছু নেই। ক্রমশ একটু আগ্রহ বোধ করছে বরং। এ পর্যন্ত দেবেশ মজুমদারের আচরণ কিছুটা স্বতন্ত্রই বটে। বয়েস পঞ্চাশ শুনেছে। তা নিয়েও মাথা ঘামায় না। পুরুষের ওই বয়েসটাই বরং কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য। ...বিধু সরকারের মুখে অঢেল বিত্তের মানুষটার যে পরিচয় শুনেছে তার সবটুকু সত্যি হলে যাচাইয়ের আগে বাতিলের প্রশ্ন ওঠে না। সত্যিকারের কোনো পুরুষের সংগে তার বোঝাপড়া এখনো হয়নি। প্রয়োজনে তাকে পতঙ্গের মতো দগ্ধ করেই জীবনের এতগুলো খেসারতের জবাব সে দিতে পারবে। পুরুষ জাতটার কাছে তার কিছু প্রাপ্য আছে।

অল্প প্রসাধন [illegible] প্রায় সাদাসিধে পরিচ্ছন্ন বেশবাসে [illegible] [illegible]। [illegible] তার ব্যক্তিত্বের প্রধান মাধুর্য এখানে নিজেও জানে। প্রস্তুত হতে খুব [illegible] [illegible] লাগল না।

দোতলায় এসে কোণের [illegible] [illegible] খোপখুপে পর্দা সরিয়ে বিধু সরকার আর [illegible]-

-বার গলা বাড়ালেন। শয্যার অবল তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে দেবেশ মজুমদার একটা বিলিতি স্টেজ জার্নালের পাতা ওল্টাচ্ছেন। মুখে বাড়তি প্রত্যাশার একটা আঁচড়ও চোখ পড়ল না তাঁর। মালিকের এই চিরকালের স্থিতধী মূর্তিটি বরাবর পছন্দ। এই মূর্তিই তাঁর চোখে পুরুষকারের প্রতীক।

...এই ঘরে রমণীর পদার্পণ আরো ঘটেছে। দু মাস চার মাস ছ মাসে একবার বড় জোর দুবার। এ-যেন প্রাকৃতিক বিধানের অতি তুচ্ছ অথচ স্বাভাবিক অংগ একটা। তার বেশি কিছুই নয়। তবু আজ একটু ভাবান্তর দেখবেন আশা করেছিলেন হয়তো বিধু সরকার। কারণ যে রমণীটি আসছে এই রাতে তার জন্যে সাহেব বিরাট একটা পরিকল্পনা ফেঁদে বসেছেন। কিন্তু আজও ওই পুরুষোচিত নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে এতটুকু আতিশয্যের ফাটল চোখে পড়ল না।

নীচে নেমে এলেন। খানিক বাদেই বাড়ির সব থেকে বড় বিলিতি গাড়িটা ফটক পেরিয়ে সিঁড়ির গায়ে এসে দাঁড়াল।

অঞ্জলি চক্রবর্তী গাড়ি থেকে নামল। হাসি মুখের সাদর অভ্যর্থনায় বিধু সরকার তাকে দোতলায় নিয়ে চলল। অঞ্জলি চক্রবর্তীরও ঠোঁটের ফাঁকে অল্প একটু মিষ্টি হাসি লেগে আছে।

চারদিন আগের এই মেয়ের সেই প্রথম পদার্পণে বিধু সরকারের মনে হয়েছিল ওই সাদাসিধে বেশবাসে মেয়েটাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে বটে তবু আর একটু চকচকে বেশ-বিন্যাস করে এলেই ভালো হত।

দোতলার কোণের ঘরের পর্দা ঠেলে তাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

দেবেশ মজুমদার সোজা হয়ে বসলেন একটু। হাতের জার্নাল পাশে সরিয়ে রেখে সৌম্য স্মিত মুখে তাকালেন।

দুহাত বুকের কাছে জুড়ে অঞ্জলি সপ্রতিভ মুখে নমস্কার জানালো। জবাবে তেমনি হাসিমুখে সামান্য মাথা নাড়লেন দেবেশ মজুমদার। এটুকুই তাঁর অভ্যর্থনার রীতি।

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে বিধু সরকার ব্যস্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ঈষৎ তুষ্ট মুখে দেবেশ মজুমদার অঞ্জলির পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলেন একবার। ভালো লাগছে। বললেন আজ দশ এগারো বছর হয়ে গেল তুমি খুব চেনা আমার। তোমার অভিনয় ভালো লাগে। সামনের নরম গদিমোড়া সোফাটা দেখিয়ে দিলেন বোসো—।

হঠাৎ কিরকম যেন অস্বস্তি বোধ করছে অঞ্জলি চক্রবর্তী। ঠিক বুঝছে না। সামনের সোফায় এসে বসল। মুখ তুলে তাকালো। অস্বস্তিটা দ্বিগুণ হয়ে উঠল সংগে সংগে। ভিতরে ভিতরে কি যেন একটা গণ্ডগোল শুরু হয়েছে।

মৃদু হেসে দেবেশ মজুমদার জিজ্ঞাসা করলেন থিয়েটার ... আজ ঠিক ঠিক এগুচ্ছে?

অঞ্জলির কালো দুটো চোখের তারা স্থির তাঁর মুখের ওপর। মাথা নাড়ল কি নাড়ল না।

—কোনরকম অসুবিধে হচ্ছে না?

আবারও সামান্য মাথা নেড়েছে। তাঁর মুখের ওপর অপলক দুটো চোখ কি যেন খুঁজছে।

দেবেশ মজুমদার আবার জিজ্ঞাসা করলেন সামনের মাসের গোড়া থেকেই শুরু করা যাবে?

এবারে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত অঞ্জলি চক্রবর্তী। চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে। চেয়েই আছে। চোখের কালো তারার শূন্যতা ঠেলে সে যেন কোথায় কোন দূরে পাড়ি দিতে চাইছে।

অস্বাভাবিক লাগছে একটু দেবেশ মজুমদারেরও। হেসেই বললেন তোমার সংগে আলাপ করব তোমাকে ভালো করে দেখব এ অনেক দিনের ইচ্ছে আমার—কিন্তু কি ব্যাপার উল্টে তুমিই আমাকে এত অবাক হয়ে দেখছ কি?

জবাবে অঞ্জলি চক্রবর্তী আচমকা প্রবল একটা ঝাঁকান খেয়ে যেন চেয়ার ঠেলে ছিটকে উঠে দাঁড়াল। সমস্ত চোখে মুখে হঠাৎ একটা আর্ত ত্রাস। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা সামলাবার চেষ্টায় ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল বারকয়েক। তারপর একরকম ছুটেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাইরে এসেও ছুটে পালাবার দিশে-হারা আকুতি। নীচে নামল। সামনে বিস্মিত বিধু সরকার। তার পাশ কাটিয়ে ত্রস্ত হরিণীর মতোই ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো। গাড়ির জন্য দাঁড়াবার ধৈর্য নেই। কোনরকমে ওই ফটক পেরিয়ে অন্ধকারে মিশে যেতে পারলে বাঁচে যেন।

...চার দিনের দিন এই সকালে শুকনো বিস্মিত মুখে থিয়েটারের ম্যানেজার আর আরো জনাকতক বাড়িতে এলো অঞ্জলির সংগে দেখা করতে। দেখা পেয়েই ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার?

—কি ব্যাপার? অঞ্জলি ফিরে জিজ্ঞাসা করল। তখনো থমথমে লালচে মুখ।

—থিয়েটার কি সেই বন্ধই থেকে গেল নাকি?

—কে বলল বন্ধ থাকল? গলার স্বর চাপা তীক্ষ্ন।

...সেক্রেটারি বিধু সরকার গত সন্ধ্যায় দেখা করতে গেছলাম তিনি বললেন। বললেন আপনাদের থিয়েটারের বারোটা বেজে গেল।...তুমি নাকি দেবেশ মজুমদারকে যাচ্ছে-তাই অপমান করে তাঁর বাড়ি থেকে চলে এসেছ?

গলার স্বর ঈষৎ অসহিষ্ণু অঞ্জলি চক্রবর্তীর। দেবেশ মজুমদার নিজে আপনা-দের কিছু বলেছেন?

—তো ম্যানেজার বললেন না তাঁর দেখা আমরা পাব কি করে!

অঞ্জলি ভাবল একটু। তেমনি গম্ভীর। তেমনি লালচে মুখ। বলল আমি কাউকে

অপমান করিনি। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে কাজে যাবেন থিয়েটার ঠিক দিনেই শুরু হবে।

ম্যানেজার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার সঙ্গে মালিকের কথা হয়েছে কিছু?

গলার স্বর আরো অসহিষ্ণু অঞ্জলির। বললাম তো সব ঠিক আছে আপনারা নিশ্চিন্ত মনে ঘরে যান।

তারা চলে যেতে অঞ্জলি ঘরের মধ্যে পায়চারি করল খানিকক্ষণ। তারপর টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। ওধারে বিধু সরকার। বলল আপনার সাহেবকে বলবেন আমি জানি আমার কিছু কৈফিয়ৎ দাখিল করার আছে। তাঁকে জানাবেন আজ রাত্রে আগের দিনের ওই সময়েই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।...না কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না আমি যাচ্ছি বলে দেবেন... না গাড়ি পাঠানরও দরকার নেই।

রিসিভার নামিয়ে রাখল।

ওদিকে হন্তদন্ত হয়ে বিধু সরকার ছুটলেন তাঁর মনিবের কাছে। সমাচার শুনে দেবেশ মজুমদার ভাবলেন দুই এক মুহূর্ত। বললেন ঠিক আছে।

রাত সেই সাড়ে নটা।

বিধু সরকারের দু চোখে ঝকমকে লালের বিভ্রম ছড়িয়ে তাঁর সঙ্গে দোতলায় উঠেছে অঞ্জলি চক্রবর্তী। দেবেশ মজুমদার তাঁর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ-বাসের সেই লালের ধাক্কা তাঁর চোখেও লেগেছে। তারপর মনে মনে হেসেছেন তিনি। আগের দিনের ওই আচরণ আর আজ নিজে থেকেই এই বেশে পুনরাগমনের মধ্যে অভিনয় চাতুর্যের চড়া ব্যাপার কিছু আছে কিনা একটু পরেই বুঝতে পারবেন। নিজেই শৌখিন পর্দাটা টেনে ধরেছেন অভিসারিকা ভিতরে ঢুকেছে। পোশাকের আভায় সম্ভবত সুন্দর মুখখানা লালচে দেখাচ্ছে। চোখ ফেরানো সহজ নয়।

দেবেশ মজুমদার শয্যার তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলেন। তাকেও বললেন বোসো।

অঞ্জলি বসল। শুধু লালচে নয় সমস্ত চোখে মুখে একটা অদ্ভুত সুন্দর দীপ্তি ছড়াচ্ছে যেন। না এরকম মূর্তি দেবেশ মজুমদার আগের দিন দেখেন নি।

সোফায় বসে অঞ্জলি সোজা তাকালো তাঁর দিকে। বলল তুমি এখন বেশ ভালই আছ তাহলে?

তুমি! এ আবার কোন পর্যায়ের অভিনয় চাতুর্য! চোখে লালের ঘোর লাগছে একটু তাঁরও কিন্তু তা বলে এই গোছের আচরণও প্রত্যাশিত নয়। জবাব দিলেন এখন কিরকম আমি তো বরাবরই ভালো আছি।

অঞ্জলি বলল বরাবর খুব ভালো ছিলে না। আজও পলক পড়ছে না চোখে কিন্তু আজকের চাউনি স্বচ্ছ তীক্ষ্ণ। বেশ স্পষ্ট সুরেই অঞ্জলি আবার বলল শোনো আমার সেদিনের ব্যবহারে তুমি খুব অবাক হয়েছ জানি অবাক হবারই কথা।...আট বছরের একটা মেয়েকে হঠাৎ মনে পড়ে গেছল আমার

আর কথা শুনলে আর অবাক লাগবে না তোমার রাগও থাকবে না।

নড়েচড়ে বসলেন দেবেশ মজুমদার অভিনয় দেখছেন কিনা জানেন না কিন্তু এই দুপ্ত লালিমা ছড়ানো ভঙ্গীটুকু ভালো লাগছে।

অঞ্জলি বলল আট বছরের সেই মেয়েটা ফুটফুটে সুন্দর ছিল দেখতে পাড়ার সকলে জলি বলে ডাকত। গরিবের সেই মেয়েটা বস্তিঘরে থাকত কিন্তু পাড়ার গরিব বড়-লোক সকলেই খুব ভালবাসত তাকে। উল্টোদিকে প্রাসাদের মত মস্ত বাড়ি একটা অত বড়লোক হলেও মেয়েটা সেই বাড়িতেও হরদম যাতায়াত করত সেখানে তার আদর খুব। সেই বড়লোক বাড়ির এক ছেলের নাম খোকা খোকাবাবু তার পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়েস তখন—তিনিও মেয়েটাকে খুব ভাল-

পরের সংখ্যায় গল্প লিখবেন দেবলদেব বর্মা

বাসতেন কাছে পেলে আদর করতেন লজেন্স বিস্কুট খেতে দিতেন—

চোখে চোখ রেখে একটু থমকেছে অঞ্জলি চক্রবর্তী। হঠাৎ বিমূঢ় মুখ দেবেশ মজুমদারের। সোজা হয়ে বসে ভালো করে তাকালেন।

—খুব ধর্ম-কর্মের বাড়ি সেটা। খোকা-বাবুর ঠাকুরদা ঠাকুরমা পুজো আর্চা যাগযজ্ঞ নিয়ে থাকতেন তাঁর বাবা মাও ধার্মিক। খোকাবাবু এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন কিন্তু কোনো কাজ করতে পারছেন না—মাথায় যখন তখন সাংঘাতিক যন্ত্রণা হয়—বড় বড় ডাক্তার বদ্যিরা আসছে যাচ্ছে। কিছু হচ্ছে না। তাঁর ঠাকুরদা ঠাকুরমার গুরুদেব বিধান দিলেন কুমারী পুজো করতে হবে খোকা-বাবুকে, কুমারী গৌরী পুজো—তাতে সব-দিকে মঙ্গল হবে।

সোজা হয়ে বসেছেন দেবেশ মজুমদার। বিমূঢ় চোখে চেয়ে আছেন অঞ্জলির দিকে।

সে বলে গেল বড়বাড়ির সেই কুমারী পুজোর মেয়ে ঠিক হল—পাড়ার ওই জলি মেয়েটাই। মেয়েটা অবাক যেমন খুশিও তেমন—তাকে পুজো করা হবে, শাড়ি পরিয়ে সাজানো হবে—কত কি খেতে দেওয়া হবে। খোকাবাবুর ঠাকুরদা ঠাকুমা তিনদিন ধরে মেয়েটাকে বোঝালেন নিজেকে সত্যিকারের

গৌরী মা বলে ভাবতে হবে ছেলের জীবনের সমস্ত অমঙ্গল দূর হওয়ার মতো আশীর্বাদ করতে হবে।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে দেবেশ মজুমদারের। স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়েই আছেন।

আর এক নজর তাকে দেখে নিয়ে অঞ্জলি বলে চলেছে পুজোর দিন কত আদরে জলিকে বড় বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। গুরুর কথা মতো খোকাবাবু নিজে তার পা ধুইয়ে দিলেন। মুছে দিলেন। তাঁর মা পায়ে আলতা পরিয়ে দিলেন। তারপর পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে ঝকঝকে লাল একখানা বেনারসী শাড়ি পরিয়ে দিলেন। মেয়েটা তারপর পুজোর আসনে বসল গুরুদেব অনেকক্ষণ ধরে খোকাবাবুকে পুজো করালেন তারপর মেয়েটার পায়ে কপাল ঠেকিয়ে খুব ভালো করে প্রণাম করতে বললেন।

খোকাবাবু তাই করলেন।

...আর আশ্চর্য মেয়েটা সেই মুহূর্তে যেন তাঁর কুমারী মা হয়ে গেল তাঁর গৌরী মা হয়ে গেল। একমনে সত্যি সে মনে মনে বলতে লাগল, তোমার খুব ভালো হবে—খুব-খুব ভালো হবে তোমার—তোমার কক্ষনো কোনো অমঙ্গল হবে না। কোনো অমঙ্গল হতে পারে না—

সমস্ত কপাল ঘেমে উঠেছে দেবেশ মজুমদারের। এ কোন দৃপ্ত রমণীমূর্তি দেখছেন তিনি চোখের সামনে জানেন না! ঘরের সমস্ত আলোও যে সেই আভায় লাল হয়ে উঠেছে।

অঞ্জলি চক্রবর্তী সোফা ছেড়ে উঠল আস্তে আস্তে। অপলক দু চোখ দেবেশ মজুমদারের ঘর্মাক্ত মুখের ওপর স্থির তখনো।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। নীচে নেমে এলো। লালের আভা ছড়িয়ে হতচকিত বিধু সরকারের পাশ কাটিয়ে বাইরে এলো। নিজের গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়িটা গেট পেরুতেই ছুটে দোতলায় উঠে এসেছেন বিধু সরকার। আজও আবার কি বিভ্রাট হল। বুকের তলায় কাঁপুনি শুরু হয়েছে তাঁর। কিন্তু ঘরে ঢুকে স্তব্ধ নির্বাক তিনিও।

...পুরুষকারপ্রতীক দেবেশ মজুমদার শয্যায় বসে আছেন স্থাণুর মতো। মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে একটু। এই ঠাণ্ডাতেও দরদর করে ঘামছেন তিনি।

এই বাংলার খবর

উদ্বৃত্ত বাজেট
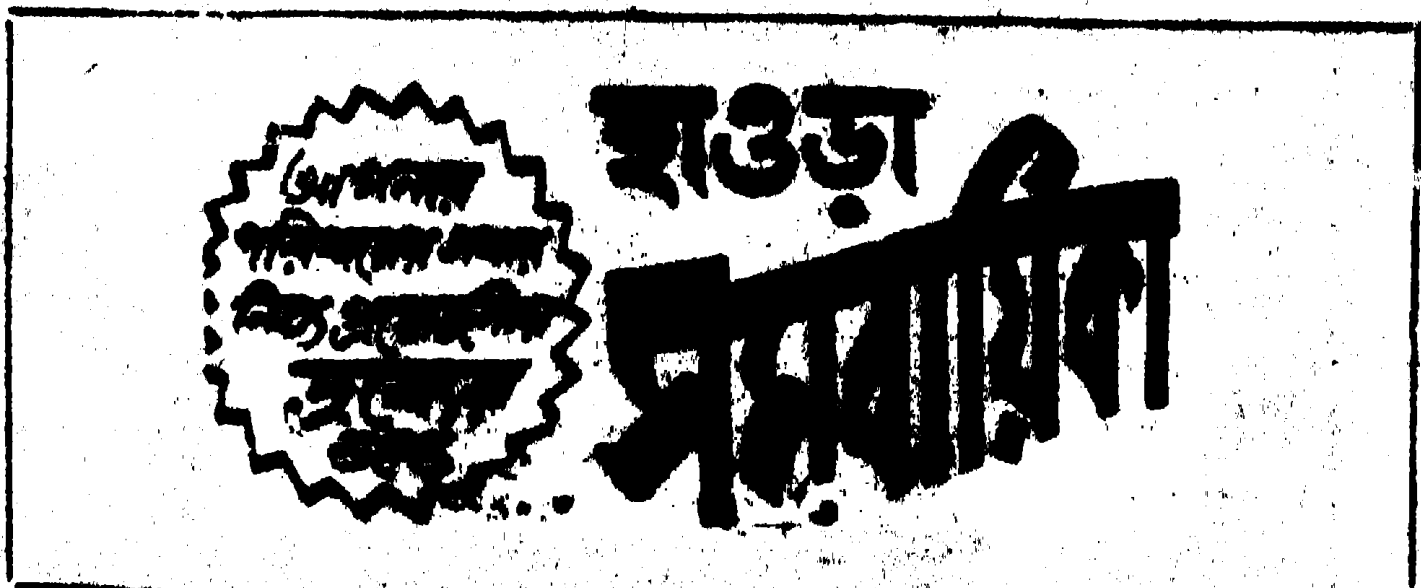
পশ্চিমবাংলা সরকারের ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে যে নতুন ১২ কোটি টাকা কর চেপেছে সেটা একটা খবর তো বটেই, তবে শ্রীশঙ্কর ঘোষের এই চতুর্থ বাজেটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় বোধহয় এর উদ্বৃত্ত। এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ খুব একটা বেশি নয়, মাত্র ২৭ লাখ টাকা। কিন্তু উদ্বৃত্তের অঙ্কটা তেমন বড় কথা নয়, শঙ্করবাবু জানিয়েছেন সেই ১৯৬২-৬৩ সালের পর রাজ্যের বাজেটে এই প্রথম উদ্বৃত্ত হলো। আর এই উদ্বৃত্ত শুধু আগামী বছরের বাজেটেই দেখা যাচ্ছে না, এতদিন ধরে রাজ্য সরকারকে যে-ঘাটতির বোঝা বইতে হচ্ছিল সেইসব ঘাটতির পাট চুকিয়েই এই উদ্বৃত্ত দেখানো সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের দেনা বাবদ বকেয়া পাওনা সুদে-আসলে মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে, চলতি দেনাও মিটিয়ে দেওয়া হবে। আর্থিক অবস্থার যে উন্নতি হয়েছে তার প্রমাণ, রাজস্ব খাতে সরকারের আয় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ১৯৭৪-৭৫ সাল অর্থাৎ চলতি আর্থিক বছরের বাজেটে প্রথমে অনুমান করা হয়েছিল যে রাজস্ব আদায় হবে ৪৩৫ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। এখন তা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৪৬৯ কোটি ৬১ লাখ টাকা। আগামী আর্থিক বছরে আয় আরো ১৮ কোটি ৬১ লাখ টাকা বাড়বে। নতুন কর বসানো হচ্ছে ১২ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার এমন কয়েকটা আর্থিক ব্যবস্থা নেবেন যার ফলে পশ্চিমবাংলা বাড়তি ১১ কোটি টাকা পাবে। তার ফলে ১৯৭৫-৭৬ সালের অনুমিত ঘাটতি ১১ কোটি ৯৫ লাখ টাকা আর সেই সঙ্গে আগের ঘাটতির জের (১০ কোটি ৭৮ লাখ টাকা) দুইই মিটিয়ে দিয়ে উদ্বৃত্ত থাকবে ২৭ লাখ টাকা।

শঙ্করবাবু বলেছেন, জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়া রাজ্য সরকারের আর্থিক অবস্থার এই উন্নতি সম্ভব হতো না। বিক্রয়কর বাবদ আদায় রীতিমতো বেড়েছে। বেড়েছে স্বল্পসঞ্চয় বাবদ সংগৃহীত অর্থ। বাজেটে যে উদ্বৃত্ত হয়েছে তা লাগানো হবে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের কল্যাণে, কারণ তারাই সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশ। ক্ষেতমজুরদের জন্যে সর্বনিম্ন মজুরির হার কিছুদিন আগে বেঁধে দিয়েছেন রাজ্য সরকার। সেই মজুরি যাতে তাঁরা পান তার ব্যবস্থা করা হবে।

নতুন কর ও রেহাই

শঙ্করবাবু জানিয়েছেন, নতুন কর চাপানোর প্রয়োজন হয়েছে প্রধানত বার্ষিক যোজনার বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্যে। চলতি বছরে এই বরাদ্দ ছিল ১৫০ কোটি টাকা, আগামী বছরে তা ২১ কোটি টাকা বাড়বে। গোটা চতুর্থ যোজনায় রাজ্যে যে-টাকা লগ্নী হয়েছে, পঞ্চম যোজনার প্রথম দু' বছরেই (১৯৭৪-৭৬) লগ্নীর পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে তার প্রায় সমান। নতুন কর আদায়ের ব্যবস্থা হয়েছে প্রধানত সমাজের সচ্ছল অংশের কাছ থেকে। হুইস্কি-ব্র্যান্ডি প্রভৃতি পানীয়ের ওপর আবগারি শুল্কের হার চড়ানো হবে। [illegible] শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রেও করের হার বাড়ানো। [illegible] হারেও পুনর্বিন্যাস করা হবে যেমন [illegible] হবে 'বিলাস' কর। [illegible] সম্পত্তির [illegible] হার বাড়বে, তবে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে এই হার বাড়বে না। সম্পন্ন চাষীর কাছ থেকে বাড়তি কর আদায়েরও প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর বিভিন্ন কর-প্রস্তাবের মধ্যে নতুন হলো শহরের বহুতল বাড়ির ওপর সম্পত্তি কর।

অর্থমন্ত্রী নতুন কর যেমন চাপিয়েছেন, তেমনই কোনো কোনো ক্ষেত্রে রেহাই দেওয়ার প্রস্তাবও করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি হলো শিল্পের ক্ষেত্রে। ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে বিক্রয়করের রেহাই-সীমা দশ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১৫ হাজার টাকা করা হচ্ছে। নতুন ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রথম তিন বছর কোনো বিক্রয়কর দিতে হবে না। রাজ্যের ওষুধ শিল্পকে সাহায্যের জন্যে রেকটিফায়েড স্পিরিটের ওপর থেকে চুঙ্গীও তুলে নেওয়া হবে। ছাত্রদের সুবিধের জন্যে বিক্রয়কর তুলে নেওয়া হবে পেন্সিল, ম্যাথেমেটিক্যাল বকসের ওপর থেকে। মুর্শিদাবাদ আর মালদহের রেশম প্রস্তুতকারকদেরও বিক্রয়করের ব্যাপারে কিছু সুবিধে দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী।

ওয়াঞ্চু রিপোর্টের জের

পাঁচ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে ওয়াঞ্চু কমিশনের রিপোর্টের সারাংশ মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছেন, আর সেই রিপোর্টের সূত্র ধরে দুই মন্ত্রী সন্তোষ রায় ও সুনীতি চট্টরাজ আগেই ইস্তফা দিয়েছেন। তবু সেই রিপোর্টের জের এখনও মেটেনি। ২৭ ফেব্রুয়ারি পূর্ণ রিপোর্টটি আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা হলো বিধানসভায়। ঐদিন সকালেই রিপোর্টের মোটামুটি বিশদ বিবরণ দু-একটি দৈনিকে বেরিয়ে যায়, তাই বিচারপতি ওয়াঞ্চুর নানা মন্তব্য সম্পর্কে আগ্রহও কিছুটা হ্রাস পায়। এখন এ-কথা সবাই জানেন যে বিচারপতি ওয়াঞ্চু সন্তোষবাবু আর সুনীতিবাবুর বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ সত্য বলে মেনে নিয়েছেন এবং অজিত পাঁজা, সীতারাম মাহাতো ও গোবিন্দ নস্করকে রেহাই দিয়েছেন। কেন তিনি দুটি ক্ষেত্রে 'অন্যায্য প্রভাব' খাটানোর অভিযোগ মেনে নিয়েছেন, তার ব্যাখ্যা করে বিচারপতি যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য।

তাঁর মতে, মন্ত্রীর সততা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠা চলবে না। তাঁর আচরণ হতে হবে সীজারের পত্নীর মতো সব সন্দেহের উর্ধ্বে। কমিশনের সামনে শুনানীর সময় এই যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, অবস্থাঘটিত প্রমাণের ওপর নির্ভর করে যদি কোনো মন্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করতে হয় তবে সব ঘটনাকে এমন ধারাবাহিকভাবে সাজাতে হবে যাতে মন্ত্রীর অপরাধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফৌজদারি মামলায় তাই হয়ে থাকে। কিন্তু বিচারপতি ওয়াঞ্চু বলেছেন, কমিশন যে-সব অভিযোগের বিচার করছেন জনসাধারণের স্বার্থের দিক থেকে তার বিশেষ গুরুত্ব আছে। এক্ষেত্রে ঐ নীতি প্রয়োগ করা চলে না। প্রভাব খাটানো সম্পর্কে নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া কঠিন। যিনি প্রভাব খাটিয়েছেন অথবা যিনি প্রভাবিত হয়েছেন তাঁদের কেউই এই অভিযোগ স্বীকার করবেন না। আর তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছ থেকে চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়ারও সম্ভাবনা [illegible]

পদত্যাগী মন্ত্রী সুনীতিবাবু বিধানসভায় তাঁর পদত্যাগের কারণ নিয়ে বিবৃতি দেওয়ার ব্যাপারে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। প্রথমে তিনি একটি বিবৃতি দেন। স্পীকারের কাছে তিনি যে লিখিত বিবৃতি জমা দেন তার বাইরেও তিনি অনেক কথা বলেন। কিন্তু ঐ দিনই (২৬ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় আর একটি বিবৃতি দিয়ে তিনি জানান, প্রথম বিবৃতিতে তিনি যে-সব কথা বলেছিলেন তা তাঁর বলা উচিত হয় নি, তাই তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। প্রথম বিবৃতিটি তিনি বাতিল করে দেওয়ার জন্যে স্পীকারকে অনুরোধ জানান। স্পীকার সেই অনুরোধ মঞ্জুর করে দ্বিতীয় বিবৃতিটি গ্রহণ করেন। ঐ দিনই কংগ্রেস পরিষদীয় দলের এক জরুরি সভা বসে। ঐ সভায় সুনীতিবাবুকে এই বলে হুঁসিয়ার করে দেওয়া হয় যে, ভবিষ্যতে তিনি যদি দলের নেতাদের সম্পর্কে কোনো অন্যায় মন্তব্য করেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নাগরিক সম্মেলন

বামপন্থী নানা দল আর নবনির্মাণ সমিতির উদ্যোগে কলকাতায় আয়োজিত নাগরিক সম্মেলন এই রাজ্যের রাজনৈতিক জীবনে একটা বড় রকমের ঘটনা। এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন সেই অধিকার রক্ষা করতে হবে এই ডাক দেওয়া হয় ঐ সম্মেলন থেকে। সম্মেলন থেকে যে-সব দাবি ওঠে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : (এক) নিজের মতামত প্রচার, সভা-সমিতি গঠন, নিজ এলাকায় বসবাস ইত্যাদির অধিকার দিতে হবে; (দুই) বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে; (তিন) জরুরি অবস্থা এবং মিসার মতো বিভিন্ন আইন প্রত্যাহার করতে হবে; (চার) শাসক দলের প্রশ্রয়পুষ্ট সমাজবিরোধীদের কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে; (পাঁচ) নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে; (ছয়) কোনো নির্বাচনপ্রার্থীর জন্যে তাঁর দল বা অপর কোনো ব্যক্তি যে-টাকা খরচ করবেন তা সবই প্রার্থীর নির্বাচনী খরচ হিসেবে ধরতে হবে। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন বিচারপতি ভি এম তারকুণ্ডে।

কিন্তু গণতন্ত্র রক্ষার ডাকের চেয়েও এই সম্মেলন উল্লেখযোগ্য ছিল আর একটি কারণে। এই সম্মেলনেই প্রথম সংগঠন কংগ্রেস, সি পি এম, জনসঙ্ঘসহ বাম-দক্ষিণ নানা দলের নেতাদের এক মঞ্চ থেকে বক্তৃতা করতে দেখা গেল।

কলকাতার জল

গ্রীষ্ম এখনও সরকারিভাবে শুরু হয়নি, কিন্তু কলকাতায় মানুষের পানীয় জলকষ্টের পালা শুরু হয়ে গেছে। কলকাতা পৌরসভা যে-পরিমাণ পরিস্রুত জল যোগাচ্ছেন তাতে শহরবাসীর চাহিদা মিটছে না। কোনো কোনো এলাকায় ঘোলা জল মিলছে। কলকাতার মানুষকে বেশি জল যোগাবার জন্যে সি এম ডি এ যে-প্রকল্প হাতে নেন তা সম্পূর্ণ হওয়ার পর দৈনিক সাড়ে ১৪ কোটি গ্যালন জল পাওয়ার কথা। তার মধ্যে সাড়ে ১২ কোটি গ্যালনের বেশি ইদানীং মিলছিল না। এখন আবার তা থেকেও প্রায় চার কোটি গ্যালন ছাঁটাই হয়েছে। এর প্রধান কারণ, পলতায় থিতান ট্যাঙ্কে কচুরিপানা, শ্যাওলা আর পাঁক জমেছে। অনেক পাম্পও বিকল। পলতা থেকে টালা পর্যন্ত পথে পাইপে নানা জায়গায় ফুটো। এদিকে মেরামতির কাজ নিয়ে সি এম ডি এ আর পৌরসভার মধ্যে চলছে দ্বৈত শাসন। তার সুযোগ নিয়ে ঠিকাদাররা নাকি কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। জল যোগানের এই হাল দেখে কেন্দ্রীয় সরকারের এক বিশেষজ্ঞ দল সুপারিশ করেছেন, কলকাতায় জল যোগানের পুরো দায়িত্বটাই সি এম ডি এর হাতে দিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু পূর্তমন্ত্রী এবং সি এম ডি এর চেয়ারম্যান ভোলানাথ সেন পলতায় ঘুরে এসে বলেছেন সি এম ডি এ'র হাতে এখনই এই দায়িত্ব দেওয়ার দরকার নেই। পৌরসভা এবং সি এম ডি এ'র এঞ্জিনিয়ারেরা জলের যোগান বাড়াবার জন্যে মিলিতভাবে চেষ্টা চালাবেন।

৩।৩।৭৫ দেবদত্ত

পটভূমি

সন্তোষ ও সুনীতি নাটকের যবনিকাপাত

সন্তোষ ও সুনীতি মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিয়েছেন। সন্তোষ রায় শুধু মন্ত্রিত্বে নয়, বিধানসভার সদস্য পদেও ইস্তফা দিয়ে কোচবিহারে নতুন জমিরো লাড়বার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন। আর সুনীতি চট্টরাজ নিজের মূর্খতার জন্য আজ পর্যন্ত নাকে খৎ দিয়ে কংগ্রেসের সদস্যপদ রক্ষা করেছেন। কিন্তু কংগ্রেসের ও মন্ত্রিসভার ভিতরে ও বাইরে সন্তোষ ও সুনীতির পক্ষে বিপক্ষে কলকাঠি ঠিকই নড়ছে। এবং এই উত্তেজনার স্রোত আরও কিছু দিন বইবে।

সুনীতির আস্ফালন বন্ধ হলেও বীরভূমের মাটিতে আন্দোলনের ডাক স্তব্ধ হয় নি। তেমনি সন্তোষ বাবু কোচবিহারের যে বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর কোপানলে পড়ে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন তাঁদের এক হাত দেখে নেওয়ার সংকল্প ছাড়েন নি। সৌভাগ্য তাঁর তিনি পাশে পেয়েছেন কংগ্রেসের প্রগতিশীল একাংশকে। তাই তিনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির আনুকূল্যে আবার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে বিজয়ীর বেশে বিধানসভায় ঢুকতে চাইছেন। কিন্তু আশংকা উপনির্বাচনও হবে না, সন্তোষবাবুর পক্ষে কংগ্রেসের নমিনেশনও জুটবে না।

সুনীতি চট্টরাজ বয়সে নবীন, কাজেই কাজে ও কথায় যৌবনের জোয়ার থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি বিধানসভায় এ কি নাটক করলেন? নিজেই নিজের ভাষণ প্রত্যাহার করে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেন অপভাষণের। এ এক বেদনাদায়ক ইতিহাস।

তাঁর ক্ষোভ স্বাভাবিক। কারণ তাঁর মতে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা একটা সাজান ব্যাপার। বিনা দোষে তিনি দণ্ডিত। আর যদি কোন অন্যায় করেও থাকেন তবে তাও করেছেন গরীব বেকার বাঙালী যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়ার মহান লক্ষ্য সামনে রেখে। তার ভাইকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহারই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। ওয়াঞ্চু কমিশনের মতে সেই অভিযোগ প্রমাণিত।

বিধানসভায় ভাষণ দেওয়ার দিনটিতে সুনীতিবাবুর মুখ দিয়ে যদি মাননীয়র ব্যাপারে অশোভন অন্যায় ইঙ্গিত হঠাৎ বেরিয়ে না পড়তো তবে হয়তো তাঁকে এভাবে নাজেহাল হতে হত না। শেষ পর্যন্ত সকলের পরামর্শে দলীয় দণ্ড এড়াবার জন্য বিধানসভায় সব বক্তব্য তাঁকে প্রত্যাহার করতে হল: ক্ষমা চাইতে হল পারিষদীয় দলের সভায়। মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কোন ইঙ্গিত সেদিন কোন সদস্যই মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। দলীয় শৃঙ্খলার পক্ষে দলীয় নেতারা ঠিকই করছেন। বিপাকে পড়ে সেদিন সুনীতিবাবুও নিজের দোষ স্খালনের জন্য সব কিছু মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সুনীতিবাবুর ক্ষোভ এখনও রয়েছে।

কিন্তু সুনীতি / সন্তোষ নাটকের যবনিকাপাত কি ঘটেছে? ঘটনা-পরিস্থিতির মূল্যায়ণে মনে হয় এখনও নাটকের কয়েকটি দৃশ্য বাকী আছে।

সুনীতি/সন্তোষ বিদায় নিলেও দলের ভেতরে ও বাইরে কাদাছোঁড়াছুড়ি বন্ধ হয় নি পারস্পরিক চরিত্রহননের জঘন্য স্পৃহা থেকে কংগ্রেসীরা মুক্ত হতে পারেন নি। বিধানসভায় কংগ্রেসী সদস্যের একাংশের কণ্ঠে এখনও অভিযোগ আর অভিযোগ শুনতে পাচ্ছি।

প্রশাসন বা মন্ত্রিসভাকে সৎ ও পরিচ্ছন্ন করার প্রয়াস এখনও কার্যকরী হয় নি। নব এম এল এ ধোয়া তুলসী পাতা তাও কেউ বলবেন না। কংগ্রেসীরা সবাই দুর্নীতিমুক্ত একথাও কেউ দাবী করছেন না। কারণ খাই খাই গোষ্ঠী এখন সারা রাজ্যে কংগ্রেসের আদর্শকে বিনষ্ট করতে ব্যস্ত। এঁরাই কংগ্রেসের ভাবমূর্তির তোয়াক্কা না করে নিজেদের পকেটভারী করার জন্য সব কিছু করে চলেছেন। সুযোগ না পেলেই এর অসন্তোষ বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। এঁদের খপ্পর থেকে কংগ্রেসকে উদ্ধার করার প্রয়াস নেই। এখানেই কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা। এবং বিপদ।

এই দুর্বলতা থেকেই সন্তোষ রায় বিধানসভায় কংগ্রেস টিকিটে পুনরায় প্রার্থী হওয়ার কথা উঠেছে। কংগ্রেস মন্ত্রিসভার বিচারকের নিরপেক্ষ বিচারে যিনি দোষী ও দণ্ডিত সেই ব্যক্তি কংগ্রেসের নমিনেশন কি পেতে পারেন? গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও সাংগঠনিক সুনাম এবং সততার পক্ষাবলম্বীরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন এ অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষে সন্তোষবাবুর নমিনেশন দিতে পারে না। যদি সন্তোষবাবুকে নমিনেশন দেওয়া হয় তবে ধরে নিতে হবে কংগ্রেস ওয়াঞ্চু কমিশনের রায় মেনে নেন নি। এবং যে মন্ত্রিসভা ও দলপতি এই কমিশন গঠন করেছিলেন ও রায় মেনে নিয়েছেন তাঁদের প্রতি কংগ্রেসের আস্থা নেই। মনে রাখা দরকার যে, জনগণের রাজনৈতিক রায় দিয়ে বিচারকের রায় নস্যাৎ করা সম্ভব নয়।

তবে সন্তোষবাবুর বিক্ষোভ করার কারণ আছে। কারণ, লঘু পাপে তাঁর গুরু দণ্ড হয়েছে। সমাজে প্রশাসনে ও দলের ভিতরে সর্বত্র যখন দুর্নীতি বাস বেঁধেছে তখন শুধু সন্তোষ ও সুনীতি ছাঁটাই করেই সর্বগ্রাসী দুর্নীতি ও অন্যায়কে ছাঁটাই করা যাবে না।

এখন কোচবিহার জেলায় সন্তোষ বনাম তার বিরোধী গোষ্ঠীর লড়াই চরমে। অভিযোগে প্রকাশ, সন্তোষবাবুর বিরুদ্ধে যাঁরা কমিশনে অভিযোগ এনেছিলেন বা অভিযোগকারীকে সাহায্য করেছেন তাঁদের জীবন বিপন্ন। কয়েকটি খুন ও ঘর পোড়ানোর অভিযোগের তদন্তের জন্য এক দল কংগ্রেসী সেখানে গিয়েছেন।

তেমনি বীরভূমে সভার পর সভা করে সুনীতি চট্টরাজকে জনগণ তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন দিচ্ছেন। সেই জেলা থেকে আগত নতুন রাষ্ট্রমন্ত্রীর আচরণ সুনীতিবাবুর দল ভাল চোখে দেখছেন না। এই রেষারেষি থেকে বহু কিছু ঘটনার সূত্রপাত হতে পারে।

কিন্তু এই সবকিছু কংগ্রেস দলেই সম্ভব। কারণ এটি একটি সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল নয়। এই বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠনে শৃঙ্খলা সততা ও নিষ্ঠা ফিরিয়ে আনতে না পারলে ভবিষ্যতে কংগ্রেসের ঘরোয়া ঝগড়া, উপদলীয় মারপিট রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে বিপন্ন করে তুলবে; ভবিষ্যতে সুনীতি ও সন্তোষের মতো আরও বহু নাটকের জন্ম হতে পারে।

কৌটিল্য

দেশে বিদেশে

রাজনীতির নতুন মোড় ?

জয়প্রকাশের রাজনীতি ও কংগ্রেসের রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের গতিটা কোন দিকে সে বিষয়ে কিছুকাল যাবৎ দুটি বিপরীত ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। আগামী ৬ মার্চ পার্লামেন্টের সামনে লাখ দশেক মানুষের জমায়েত করে জয়প্রকাশের অনুরাগীরা যখন প্রতিবাদের রাজনীতিকে একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি করছিলেন তখন অন্যদিকে কিছু কিছু আপোষেরও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। শোনা যাচ্ছিল, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর পার্টির লোকদের জয়প্রকাশকে 'ফ্যাসিস্ট' বলে অভিহিত করা বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর নিজের রাজ্য উত্তরপ্রদেশে সফররত জয়প্রকাশের জন্য ডাকবাংলা খুলে দিয়ে ও তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখার জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করে রাজ্য সরকার সর্বোদয় নেতার প্রতি অপ্রত্যাশিত সৌজন্য দেখাচ্ছিলেন। জয়প্রকাশও উত্তরপ্রদেশে বিহার ধাঁচের আন্দোলন আরম্ভ করার আগে সেখানে একটা আপোষ মীমাংসার দরজা খোলা রাখছিলেন।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপরে বিতর্কের জবাব দিতে গিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতেই সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই আপোষের সুর। এই বক্তৃতার ঠিক আগেই শেখ আবদুল্লার সঙ্গে নয়াদিল্লীর বোঝাপড়ার সংবাদ ঘোষিত হয়েছিল। পার্লামেন্টে এই বোঝাপড়ার সর্তগুলি উপস্থিত করার আগে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলগুলিকে ঐসব সর্তের কথা জানিয়েছিলেন। দুই দশকের পুরানো একটি বিরক্তিকর ও বিপজ্জনক সমস্যার সমাধানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। সামান্য কিছু আপত্তি বাদে এই বোঝাপড়া বিরোধীপক্ষ থেকে যে সমর্থন পেয়েছে সেটা জাতীয় রাজনৈতিক বিতর্কের উত্তাপ কমাতে সাহায্য করেছে। ঠিক একই সময়ে পাকিস্তানকে আবার অস্ত্র বিক্রি করার মার্কিন সিদ্ধান্ত বিরোধীপক্ষকে সরকারের কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। এই অনুকূল পরিবেশে প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় একটি নরম-মেজাজী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঐ বক্তৃতায়ও তিনি যথারীতি জয়প্রকাশের রাজনীতির সমালোচনা করলেন। কিন্তু [illegible] তিনি ঐ সমালোচনার ধার [illegible] দিলেন। আর সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, ঐ বক্তৃতায় তিনি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রশ্নে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে সলা-পরামর্শ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, সরকার আত্মমর্যাদার প্রশ্ন আঁকড়ে ধরে না রেখে সব বিষয়েই বিরোধী দলগুলির সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন এবং নির্বাচন সংস্কার প্রসঙ্গ নিয়ে এই আলাপ-আলোচনা শুরু হতে পারে।

একদিকে যখন বিরোধীপক্ষের সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনার দিকে পদক্ষেপের এইসব আভাস পাওয়া যাচ্ছিল অন্যদিকে কিন্তু তখন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল যে, জয়প্রকাশের রাজনীতির অভিঘাতে কংগ্রেসের ভিতরে ভিতরে একটা আলোড়ন চলছে। এমন কি পরিস্থিতিটা যে একটা বিস্ফোরণের দিকে যেতে পারে মাদ্রাজে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতায় সেকথা প্রকাশ পেল। তিনি সেখানে বললেন যে, তাঁকে দলের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে। কৌশলটা হচ্ছে এই যে তিনি সরে গেলে এখন কংগ্রেসের বাইরে আছেন এমন কোন কোন বিরোধী নেতার কংগ্রেসে ঢোকার পথ খোলা হয়ে যাবে। তিনি আরও বললেন, এ ব্যাপারে উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের দুই দিকপাল হাত মিলিয়েছেন। কংগ্রেসের ভিতরে থেকে যাঁরা জয়প্রকাশের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছেন শ্রীমতী গান্ধীর হুঁশিয়ারির লক্ষ্য যে তাঁরাই সে বিষয়ে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মধ্যে মতান্তর নেই। জয়প্রকাশের সঙ্গে সংঘর্ষের ক্ষেত্র আর না বাড়িয়ে তিনি যেসব সংস্কারের প্রশ্ন তুলেছেন সেগুলির ব্যাপারে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছুবার চেষ্টা করা হোক এই দাবি নিয়ে কংগ্রেসের ভিতর থেকে প্রথমে যিনি আন্দোলন আরম্ভ করেন তিনি হলেন ওয়ার্কিং কমিটির ও লোকসভার সদস্য চন্দ্রশেখর। পরে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন হরিয়ানা থেকে নির্বাচিত লোকসভার সদস্য কৃষ্ণকান্ত, পূর্ত ও গৃহনির্মাণ দপ্তরের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী মোহন ধারিয়া। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শের সিং প্রভৃতি। একই ধরনের কথা বলেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা।

কংগ্রেসের ভিতর জয়প্রকাশের রাজনীতির প্রতি এই ধরনের আপোষকামী মনোভাব এখন পর্যন্ত কতটা প্রবল [illegible] ব্যাপক, একথা অনুমান করার কারণ রয়েছে। জয়প্রকাশের রাজনীতির সঙ্গে মোকাবেলা করতে গিয়ে কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক ফয়দা ওঠাবার সুযোগ করে দিয়েছে সি-পি-আইকে। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা একদা [illegible] রাজও [illegible] সম্ভবত তাঁদের অন্যতম। [illegible], গুলজারিলাল নন্দ, [illegible] প্রভৃতি যাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে সি-পি-আইয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বিরুদ্ধে প্রবল অথবা [illegible] প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা চন্দ্রশেখর-কৃষ্ণকান্তদেরই হাত জোরদার করছেন।

কংগ্রেসের ভিতর জয়প্রকাশ-ঘেঁষা এই অভিযানের বিপরীতে একটি শুদ্ধি অভিযানও ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছিল। রাজনৈতিক দিক দিয়ে কংগ্রেসের যে অংশ সি-পি-আই-এর নিকটতর তাঁরা জয়প্রকাশ-ঘেঁষাদের তাড়িয়ে দিয়ে পার্টিকে শুদ্ধ করার জন্য ক্রমেই গলা চড়িয়ে দাবি তুলছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলী থেকে মোহন ধারিয়ার অপসারণ রাজনীতির একটি সন্ধিক্ষণ সূচিত করছে। এই অপসারণ দিয়েই কি শুরু হল কংগ্রেসের শুদ্ধিকরণ পর্বের? এই ঘটনা থেকে ইঙ্গিত গ্রহণ করে মোহন ধারিয়ার সমমতাবলম্বীরা কি অতঃপর চুপ করে যাবেন? মোহন ধারিয়ার মত যাঁরা সরকারের সঙ্গে যুক্ত নয়, অথচ জয়প্রকাশের রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একমত তাঁদেরও কি শাস্তি দেওয়া হবে? হলে সেই শাস্তি কি ধরনের হবে?

যেসব বিরোধী দল জয়প্রকাশের সঙ্গে আছে তারা মোহন ধারিয়ার এই অপসারণকে কিভাবে নেবে। বিরোধীপক্ষের সঙ্গে সরকারের সেতুবন্ধ রচনার ক্ষীণ প্রয়াস কি কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে একটা তীব্রতর রাজনৈতিক সংঘাতের চাপে শুরুতেই শেষ হয়ে যাবে?

শেখ আব্দুল্লার প্রত্যাবর্তন

কেন্দ্রের সঙ্গে শেখ আবদুল্লার যে বোঝাপড়ার ফলে দুইদশকের অধিককাল পরে কাশ্মীর নেতা শ্রীনগরে ক্ষমতায় ফিরে এলেন সেই বোঝাপড়ার সর্তগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে কাশ্মীরের বিশেষ অবস্থানের কথাটা এইসব বোঝাপড়ার মধ্যে যেমন স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তেমনি অন্যদিকে এবিষয়ে বেশ কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে যাতে কাশ্মীর বিধানসভা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রয়োগ করে ভারতের সঙ্গে সাংবিধানিক যোগসূত্র শিথিল করে দিতে না পারে। ১৯৫৩ সালের আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে, অর্থাৎ শেখ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর যেসব কেন্দ্রীয় আইন কাশ্মীরে বলবৎ করা হয়েছে সেগুলি বাতিল করে দিতে হবে শেখ আবদুল্লার এই দাবি নয়াদিল্লি থেকে মেনে নেয় নি। [illegible] কাটাকে পিছিয়ে [illegible] কথা [illegible] করে [illegible], [illegible] দেওয়া হয়েছে যে কাশ্মীর বিধানসভা যদি চায় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ ধরনের কতকগুলি আইন কাশ্মীর থেকে তুলে নেওয়ার কথা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। এই সুযোগ কেবল সেইসব আইন সম্পর্কেই দেওয়া হবে যেসব আইন ভারতীয় সংবিধানের সমবর্তী তালিকার অন্তর্ভুক্ত (যেসব বিষয়ে আইন করার অধিকার কেন্দ্রীয় আইনসভারও আছে, আবার রাজ্য আইনসভারও আছে সেগুলি সমবর্তী তালিকার অন্তর্ভুক্ত)।

৩-৩-৭৫ [illegible]

আর্থিক প্রসঙ্গ

বাজেট বিচার

কেন্দ্রীয় বাজেটে আয় ও ব্যয়ের অঙ্ক উভয়ই ১০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেল, অবশ্য রাজস্ব ও মূলধন খাত দুইই ধরে। বছর পনের আগে আয়-ব্যয়ের অঙ্ক ছিল এর এক-দশমাংশ বা এক হাজার কোটি টাকার মত। সুতরাং আকার-বৃদ্ধির হার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আয়-ব্যয়ের অঙ্ক এক হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। এই স্ফীতির কতটা দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির কারণে আর কতটাই বা কল্যাণবতী রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির দরুন তা নির্ণয় করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্ল্যাডস্টোনের যুগের পাবলিক ফিনান্স সরকারী আয়-ব্যয় শাস্ত্রকে আমরা অনেক পেছনে ফেলে এসেছি—বর্তমানে কেউই আমরা আর বিশ্বাস করি না যে টাকা লোকের পকেটে থাকলেই ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। তবে সরকারী কোষাগারে টাকা কিভাবে আসছে এবং সেখান থেকে কোথায় যাচ্ছে তা নিশ্চয়ই আমরা দেখতে চাই। কারণ, এই মাপকাঠিতেই সরকারী আয়ব্যয়-শাস্ত্রের আধুনিকতা বিচার বা মূল্যায়ন করা হয়।

দেখা যায় রাজস্ব ও মূলধনের সামগ্রিক খাতে প্রস্তাবিত প্রতিটি টাকার মধ্যে ২৭ পয়সা আসবে কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক এবং ১২ পয়সা আসবে কাস্টমস বা আমদানী-রপ্তানী শুল্ক থেকে। অপর-পক্ষে কোম্পানীর আয়কর থেকে ৭ পয়সা এবং ব্যক্তিগত আয়কর থেকে ২ পয়সা পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে। বাদবাকিটা সংগৃহীত হবে অন্যান্য কর (২ পয়সার মত), কর-বহির্ভূত বিভিন্ন রাজস্ব এবং বিভিন্ন প্রকারের ধার ইত্যাদি থেকে।

এই হিসেব থেকে দেখা যায় মোট প্রত্যাশিত সংগ্রহে কর-রাজস্বের অংশ হল ৫০ শতাংশের মত এবং তার মধ্যে আবার উৎপাদন ও আমদানি-নির্গম শুল্ক—এই পরোক্ষকরের দান ৩৯ শতাংশ বা মোট রাজস্বের শতকরা ৭৮ ভাগ। এই সঙ্গে রাজ্য সরকারসমূহ প্রবর্তিত বিভিন্ন পরোক্ষ কর ধরলে (রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কর পরিমাণে মোটেই উল্লেখ্য নয়) ভারতীয় কর-ব্যবস্থায় পরোক্ষ করের তুলনামূলক ভার ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার হিসেব এখনও করা হয় নি। কর-তদন্তকারী কমিশনের (১৯৫৩-৫৪) প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছিল, মোট কর-রাজস্বের শতকরা ৭৯ ভাগ আসে পরোক্ষ কর এবং বাকী ২১ ভাগ সংগৃহীত হয় প্রত্যক্ষ কর থেকে। ১৯৫৬ সালে অধ্যাপক নিকোলস ক্যালডোরও অনুরূপ তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। এই অবস্থার কোনরকম উন্নতি ঘটেছে কি? ভারতের কর-ব্যবস্থা আজও কি অধোগতি-শীল (রিগ্রেসিভ) নয়? এ বছরের বাজেট বিচার করলে কর-ব্যবস্থাকে অধিকতর অধোগতিশীল বলে বর্ণনা করা ছাড়া উপায় নেই। বিরাট ঘাটতি পূরণের জন্যে যখন মূলত পরোক্ষ করের ওপর নির্ভর করা হয় তখন কর-ব্যবস্থার গতিশীলতার হানি না ঘটে পারে না। বলা যেতে পারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্র, লোহার আলমারি ধূমপানের মিকসচার ইত্যাদি সাধারণের ব্যবহার্য পণ্য নয়। কিন্তু চা-চিনি-বিড়ি-সিগারেটের বেলায় বক্তব্য কি আছে? আর মাঝে মাঝে এক-আধ বস্তা সিমেন্ট কোন গৃহস্থেরই বা লাগে না অথবা বর্তমান যুগে প্রসাধন দ্রব্যকে বিলাস-পণ্যের পর্যায়ে ফেলা যায় কি?

একটি নতুন ব্যবস্থা ঃ

কর-ব্যবস্থাকে আরও অধোগতিশীল করে তোলা হয়েছে একটি নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে। এতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় উৎপাদন-শুল্ক নির্দিষ্ট পণ্যসমূহের ক্ষেত্রেই ধার্য করা হত। আগামী বছর নির্দিষ্ট পণ্য ছাড়া সকল ক্ষেত্রে ঐ শুল্ক ধার্য করা হবে যদি পণ্যটি শক্তিচালিত এবং অন্তত ৫০ জন শ্রমিক নিয়োগকারী কারখানায়, অথবা শক্তিচালিত নয় কিন্তু অন্তত ১০০ জন শ্রমিক নিয়োগকারী কারখানায় নির্মিত হয়। অর্থমন্ত্রী এই ব্যবস্থাকে পরীক্ষামূলক—এক্সপেরি-মেন্টাল—বলে বর্ণনা করেছেন এবং নতুন নতুন পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্কের হার মাত্র ১ শতাংশ হলেও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ২৪ কোটি টাকা সংগ্রহের আশা করেছেন।

আগামী বছরে সংগ্রহের পরিমাণ এর কমবেশী হতে পারে তবে ব্যবস্থাটি যেন পাকাপোক্ত হয়ে বসবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। মোটকথা, অর্থমন্ত্রী কর-রাজস্বে একটা নতুন সূত্রের সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু সূত্রটি যে অধোগতিশীলতারই দ্যোতক সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য এখনও শোনা যায় নি।

ইতিহাসের দিক দিয়ে কর-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য অর্থ-সংগ্রহ সন্দেহ নেই। কিন্তু কর-ব্যবস্থার যে রাজস্ব-বহির্ভূত উদ্দেশ্য বা সাম্পচুয়ারী মোটিভও আছে তাও অন-স্বীকার্য। এই রাজস্ব-বহির্ভূত উদ্দেশ্যের মধ্যে আছে আর্থিক বৈষম্য হ্রাস দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণ, অর্থ-ব্যবস্থায় তেজীমন্দার প্রাবল্য হ্রাস ইত্যাদি। আগামী বছরের জন্যে বাজেট এই কর-বহির্ভূত উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষাই করেছে বলা চলে। পরোক্ষ করের আনুপাতিক ভার বৃদ্ধি পেলে আর্থিক বৈষম্যও বৃদ্ধি পায় পণ্য-শুল্কের ওপর মূলত নির্ভর করলে মূল্য-স্ফীতিতে বেগসঞ্চারই করা হয় এবং পণ্য-শুল্কের দরুন যে দামবৃদ্ধি ঘটে তার একাংশ উৎপাদককে বহন করতে হয় বলে মন্দারও গতিবৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং যে মন্দার ভয় আজ তথাকথিত সমগ্র উন্মুক্ত সমাজব্যাপী তাকে এড়ানোর ব্যবস্থা না করে যেন আহ্বানই করা হয়েছে।

টাকা কোথায় যাচ্ছে ঃ

আগেকার দিনে সরকারী ব্যয় নিয়ে বিশেষ আলোচনা করা হত না। কিন্তু আজকে অবশ্য দেখা দরকার সরকার-সংগৃহীত অর্থ কোথায় যাচ্ছে। রাজস্ব খাতে ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ ধরা হয়েছে ৬৩১ কোটি টাকা এবং মূলধন খাতে মাত্র ৩০ কোটি টাকা। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ধরলে প্রতিরক্ষার ব্যয় বাড়বে ১১৭ কোটি টাকার মত, কৃষি-উন্নয়নের ব্যয় ৭৭ কোটি টাকার মত সার উৎপাদনের জন্যে ৮৪ কোটি টাকার মত। ব্যয়বৃদ্ধি টাকার অঙ্কে যত আসলে ঠিক ততা নয়, কারণ ইতিমধ্যে দ্রব্যসূচকের ঊর্ধ্বগতির কথাও স্মরণ রাখতে হবে। অর্থমন্ত্রীর বিবৃতি অনুসারেই দ্রব্যমূল্য মূল্যস্ফীতি এখনও সীমিত হয় নি তবে দ্রব্যমূল্যের নিম্নগতির দিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছে। এবং তাও মাত্র বিগত সেপ্টেম্বর মাস থেকে। তার আগে দাম বেড়েই চলছিল। সুতরাং মূল্যসূচকের হ্রাস যদি না ঘটে তবে উন্নয়নের গতি-বৃদ্ধি আশা করা যায় না।

উপসংহার ঃ

সুতরাং ভবিষ্যতের জন্যে বর্তমান ত্যাগস্বীকার-এ যুক্তির অবতারণাও করা কঠিন। সবদিক দিয়ে বিচার করলে এ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটকে সংরক্ষণ-মূলক বাজেট বলে বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়—অবস্থা-ব্যবস্থাকে বজায় রাখাই যেন এর মূখ্য উদ্দেশ্য।

[illegible] মুখোপাধ্যায়

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

পুজোর পর পরই রাখীবন্ধন। এগাঁয়েও তার ঢেউ এসে লেগেছে। দেবনাথ পুজোর পরে গ্রামে এসেছে। সে এসেই রাখী উপলক্ষে স্বদেশী দল করেছে। ফলে খোদ ভবনাথের ভিতর বাড়িতেই 'বন্দে-মাতরম' ধ্বনি। সেই উপলক্ষে হাটখোলায় সভা পর্যন্ত হয়ে গেল। এই সময়টায় গ্রামের লোকেদের মধ্যে ব্যস্ততা বাড়ে। কামারদের কাজ বেড়ে যায়। সামনে ধান কাটার মরশুম। তাই কাস্তে গড়ার তাড়া। তাছাড়া গাছ কাটা দা গড়ার কাজ তো আছেই।

পুজোর পর গ্রাম একটু নিস্তরঙ্গ হলেও একদিন আবার জমজমাট হয়। সহর থেকে বায়স্কোপ এসে রকমারি ছবি দেখায়। আর তাই দেখার জন্যে গ্রামে হুড়োহুড়ি। এই সময় গ্রামে ঠাকুর মশায়েরও পদধূলি পড়ে। চার-পাঁচ মাস পরে আসা। ব্রাহ্মণ বিদায়ের তোলা খাজনা আদায় করতে আসেন তিনি।

ক্ষেতে ধান পাকতে লেগেছে। কাটাও শুরু হয়ে গেছে। লক্ষ্মীঠাকরুণ বিল ছেড়ে গৃহস্থের উঠানে গুটি গুটি আসন নিচ্ছেন। আঁটির গায়ে সোঁদা সোঁদা মিষ্টি গন্ধ। দেখতে দেখতে সব ধান পেকে গেল। তেপান্তরের বিলে সবুজের একটা গোছাও নেই কোন দিকে। চতুর্দিকে সোনা। যতদূর নজর চলে, দেখা যায় পাকা ধানের সোনা ঢেলে দিয়েছে যেন প্রকৃতি। সেই সঙ্গে হিমের আমেজ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হিরন্ময় বলল ক্ষেতের ধান বাড়ি উঠছে। ভেনেকুটে আজই চাট্টি চাল বানিয়ে ফেল। নতুন চালের ফ্যানসাভাত চাই কাল।

সকালবেলা বাড়ির লোকে ফ্যানসাভাত খায় প্রবীণেরা শুধু বাদ। নতুন-চালের ফ্যানসাভাত অতি উপাদেয়—ভাত এবং তৎসহ বীচেকলা-ভাতে। কড়াইতে রান্না হয়ে নীলাভ রং ধরে, স্বাদ তাতে আরও যেন বেড়ে যায়। হিরু তাই চাচ্ছে। সামান্য কথা—বিশেষ করে বাড়ি ছেড়ে বিদেশে চাকরি করতে যাচ্ছে সে সেই মুখের কথাটা। তা বলে কালই কেমন করে হবে— 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' হয় কি কখনো?

উমাসুন্দরী বলেন নবান্ন হয়নি যে বাবা। ঠাকুরদেবতারা পেলেন না—আগে-ভাগে তোরা খাবি কি করে?

হিরন্ময় বলল, সামনের বিষ্যুদের হাট অবধি দেখব। ঠাকুরদেবতা তার মধ্যে খেলেন তো ভাল—না খেলে নাচার আমি। একটা দিনও আর সবুর মানব না।

ভবনাথের তিন ছেলের মধ্যে হিরুই সৃষ্টিছাড়া—ঠাকুরদেবতা নিয়ে তাচ্ছিল্যের কথা তার মুখে বাধে না। কম বয়সে কলকাতায় থেকে এই হয়েছে। লেখাপড়া শিখিয়ে বিদ্বান বানাবেন এই মতলবে দেবনাথ তাকে নিজের কাছে নিয়ে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। লেখাপড়ায় লবডঙ্কা। দেবনাথের ভাল গুণ একটাও পায়নি—জেদটা পেয়েছে আর পেয়েছে ব্রহ্মজ্ঞানীর মতন আলাপ-আচরণ।

হিরু জোর দিয়ে আবার বলে, তোমরা কেউ রেঁধেবেড়ে না দিতে চাও বলে যাচ্ছি উঠোনের উপর ঐ উনুনে নিজে আমি চাল কুটিয়ে খাব—ঠেকিও তোমরা।

বলে জবাবের অপেক্ষা না রেখে হন-হন করে সে বেরিয়ে পড়ল।

উমাসুন্দরী ভয় পেয়ে গেলেন। এক-রোখা ছেলে—যা বলল ঠিক ঠিক তাই করবে। ভবনাথের সঙ্গে এই নিয়ে লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়। অটল মাহিন্দারকে ডেকে উমাসুন্দরী চুপি চুপি বলেন, সর্বকর্ম ফেলে তুই বাবা বড়েঙ্গায় পুরুতঠাকুর মশায়ের বাড়ি চলে যা। এখন না সন্ধ্যের পর যাস ঠাকুরমশায়কে বাড়ি পেয়ে যাবি। মঙ্গলবার এসে অতি অবশ্য যেন নবান্নের কাজ করে দিয়ে যান। মঙ্গলবার নিতান্ত না পেরে ওঠেন তো বুধবার—তার ওদিকে নয়। কর্তার কানে না যায় দেখিস—কোথায় যাচ্ছিস জিজ্ঞাসা করলে যা হোক বলে কাটান দিয়ে দিবি।

নতুন ধান চাট্টি রোয়াকের উপর ফেলে দেওয়া হল। বাড়ির আশেপাশে কয়েকটা খেজুরগাছ কুঞ্জ পাখি সেগুলো ভাগে কাটছে। চার ভাঁড় রস দিয়েছে সে আজ রস জ্বালিয়ে গুড় বানানো হচ্ছে ঘরের উনুনে। সন্ধ্যাবেলা বিনো আর অলকাবউ ননদ-ভাজে ঢেঁকিশালে গেল—ক্ষেতের নতুন ধান প্রথম এই লোটের মুখে পড়ল। ঢা-কুচকুচ ঢ্যা কুচকুচ অলকা পাড় দিচ্ছে বিনো এলে দিচ্ছে। কতক্ষণের বা কাজ দেখতে দেখতে হয়ে গেল। সেই নতুন চাল শিলে লেটে গুঁড়ো গুঁড়ো করে রাখছে। নবান্নের উপকরণ।

পুরুত মঙ্গলবারেই আসবেন, বড়েঙ্গা থেকে অটল খবর নিয়ে এলো। সকাল সকাল কাজ সেরে দিয়ে চলে যাবেন তাঁর নিজ গ্রামেই আরও দু-বাড়ি নবান্ন আছে।

রান্নাঘরের কানাচে আদার ঝাড়। ঝাড়ের গোড়ায় মরশুমে এখন নতুন আদা নেমেছে। ধাড়ীগিন্নি ও তরঙ্গিণী টেমি ধরে কিছু আদা তুলে আনলেন। চালের গুঁড়ায় আদার মিশাল লাগে। আয়োজন সারা। সকালে কাপড়চোপড় ছেড়ে তরঙ্গিণী শুদ্ধাচারে গোটা দুই ঝুনো নারকেল কুরিয়ে ফেললো। ঠোঁটেকলা ঘরেই আছে। নতুন চালের গুঁড়া নতুন গুড় নতুন আদা নারকেল-কোরা এবং ঠোঁটেকলায় আচ্ছা করে চটকে মাখা হল। পাতলা করার জন্য জলের আবশ্যক—এমনি জল চলবে না, ডাবের জল। দেবভোগ্য উপাদেয় বস্তু হল। এখন জিভে ঠেকানোর জো নেই—পুজোআচ্চা হয়ে যাক—পরে।

পুজো অধিক কিছু নয়। পুরুত এসে এসে মন্তোর পড়ে নিবেদন করলেন—বাস্তুদেবতা পিতৃপুরুষ গুরু-পুরুত নামে নামে দেওয়া হল। গরু-বাছুরের মুখে দেওয়া হল তারপর কাকেদের মুখে। সকলের হয়ে গেল পরিজনদের মুখে পড়তে আর বাধা নেই। সামান্য সময়ের ব্যাপার। দক্ষিণা ও নৈবেদ্য নিয়ে পুরুত ঠাকুর বাড়িমুখো হন-হন করে ছুটলেন।

হিরন্ময় খুশি হয়ে তরঙ্গিণীকে বলল, কাল এই চালের ফ্যানসাভাত কোরো খুড়িমা। বীচেকলা-ভাতে মেটে আলু-ভাতে আর একটু সর-বাটা ঘি সেই সঙ্গে। খাওয়াটা যা হবে।

যা বলছে হবে তাই। বাড়িছাড়া গ্রাম-ছাড়া অঞ্চল-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে সে। দেবনাথ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বাদাবনে চলে যাচ্ছে, বনঝরের কাজে ঢুকবে।

(১৬)

বড়ি দেওয়া কাল। আয়োজন সন্ধ্যে রাত থেকেই। রান্নাঘরের চালের উপর পাকা পাকা জাতকুমড়ো চুন-মাখানো চেহারা নিয়ে পড়ে আছে—একটা নামিয়ে এনে তাড়াতাড়ি চিরে বিনো হাতকুরুনি দিয়ে কোরাচ্ছে। ছাইগাদার প্রকাণ্ড এক মানকচু তোলা হয়েছে। তলার দিকটা খাওয়া যায় না গাল ধরে—বড়ির মধ্যে চালিয়ে দেওয়া ভাল। বচুর এঠে তরঙ্গিণী কুচি কুচি করে কাটছেন। সকালবেলা একসঙ্গে সব ঢেঁকিতে কোটা হবে।

টেমি জ্বলছে কাঠের দেলকোর উপর, গল-গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কমল ওঁত পেতে আছে কুমড়োর শাঁস সবখানি বেরিয়ে আসার পর খোলা দুটো নিয়ে নেবে। খাসা দুখানা নৌকো।

পুঁটি বলে একটা কিন্তু আমার। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে পারছিনে নৌকোর অভাবে।

কমল বলে, আমার নৌকো ভাড়া

ফাঁসি, আমি পৌঁছে দিয়ে আসব। নিজের লোকের আদরে ফিরবে?

নিমো কমলের দিকে মুখ তুলে বলল, তুই-তোকারি করছিস খোকন, দিদি হয় না? বড় হয়ে গেছিস এখন, লোকে নিন্দে করবে।

তা বড় বইকি পাঠশালায় দ্বিতীয় মানে পড়ে কমল, তার উপর কাকা হয়ে গেছে। অলিমির সেই দুর্গোৎসব হল, তারপরে তিন বছর—দেখতে দেখতে তিনটে বছর পার হয়ে গেল। অলকা-বউয়ের মেয়ে হয়েছে—আর কিছু বড় হলেই তো সে কাকাবাবু বলে ডাকবে কমলকে, দেবনাথ যেমন হিনু-নিমিদের কাকা।

কলঘরলোকে নিমি হামানদিস্তায় ঠনঠন করে পান সেঁচছে ভবনাথের জন্য। আমগাছে পাছটা জোনাকিতে ভরে গেছে আরও কত চারদিকে ঝিকমিকিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। অলকার মিহিগলায় ঘুমপাড়ানি গান আসে পশ্চিমের ঘর থেকে: ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমার বাড়ি এসো, আমার বাড়ি পিঁড়ি নেই টুকটুকির চোখে বোসো—

ঘুমন্তে টুকটুকির বয়ে গেছে। অলকা অবিরত থাবা দিচ্ছে চোখের উপর। যখন থাবা পড়ে পাতা বুঁজে যায়, হাত ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে পিটপিট করে আবার সে তাকিয়ে পড়ে।

এই হুঁদোল দেখ টকুরানী বজ্জাতি করছে ঘুমুচ্ছে না, ধরে নিয়ে যাও। এই যে এসে গেছে হুঁদোল—

এবং হুদোলের উপস্থিতির প্রমাণস্বরূপ অলকা গলা চেপে আওয়াজ বের করে হুদোলই ডাক ছাড়ছে যেন। মেয়ে ভয় পাবে কি, উল্টো উৎপত্তি। যেটুকু ঘুমের আবিল এসেছিল সম্পূর্ণ মুছে গিয়ে টুকটুকিও দেখি মায়ের স্বরের অনুকরণ করে। ফিক করে অলকা হেসে পড়ল: নাঃ তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই। বজ্জাত মেয়ে কোথাকার। দু বছর বয়সে এই বড় হয়ে তুমি তো সবসুদ্ধ চোখে তুলে নাচাবে—

ডিবে ভরতি সেঁচা-পান ভবনাথের শয্যার পাশে রেখে নিমি বারান্দায় এলো। অলকাকে ডাকছে: ঘুম পাড়াতে গিয়ে তুমিও ঘুমুলে নাকি বউদি? ডালে জল দিয়ে যাবে এসো।

এই ডাল ভেজানোর বাবদে এক-একজন বড় অপয়া। অলকা-বউও বোধহয় তাই। গেল বছর পরখ হয়ে গেছে। রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে সারাটা দিন, দেখেশুনে বউকে দিয়ে ডাল ভেজানো হল। পরের দিন আকাশ মুখ পুড়িয়ে থাকল বড়ি শুকাল না। সন্ধ্যেবেলা ফোঁটা ফোঁটা পড়তে লাগল, তার পরের দিন বৃষ্টি দস্তুরমতো। ফাল্গুনে এই কাণ্ড। বড়ির কাই সামান্য কিছু বড়া ভেজে খেয়ে বাকি সব ফেলে দিতে হল। আরও একদিন এমনি নাকি হয়েছিল।

ব্যাপারটা সেই থেকে ঠাট্টার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষম খরা যাচ্ছে, খাল-বিল শুকনো, মাটি ফেটে চৌচির, জল জল করছে লোকে চাতক পাখির মতো। নিমি তখন টিপ্পনী কাটে: আমাদের বউদি ইচ্ছে করলে হয়। চাট্টি ঠিকরির ডাল ভেঙে বউদিকে দিয়ে ভিজিয়ে দাও। হুড়হুড় করে বৃষ্টি নামবে।

লজ্জায় অলকা আর সে-দিগরে নেই।

আজ অলকা নিমিকে বলল, বড় ফুক্কুড়ি তোমার ঠাকুরঝি। আজ তুমি জল ঢালবে। তোমারও পরখ হোক।

নির্মলার মুখ চকিতে কালো হয়ে গেল। বলে পরখের কি আছে? আমি তো হেরেই আছি। সকল দিক দিয়ে আমি পোড়া-কপালি। আমায় হারিয়ে দিয়ে আর কী লাভ বলো।

অলকা মরমে মরে যায়। হচ্ছে হালকা হাসি-তামাসা, তার মধ্যে বড় ব্যথার জিনিস টেনে আনে কেন? এই বড় দোষ ঠাকুরঝির—সকলের পিছনে লাগবে, তাকে ছুঁয়ে কিছু বলবার জো নেই।

তরঙ্গিণী মীমাংসা করে দিলেন: ঠেলাঠেলি কোরো না তোমরা। কারো জল ঢালতে হবে না, জল আমি ঢালছি। সুনাম হোক, দুর্নাম হোক আমার হবে।

খাওয়াদাওয়ার রাতে ডালে তিনি জল দিলেন। ভোরে বড়ি কোটা, রোদ্দুর উঠলে বড়ি দেওয়া।

চঞ্চলার মৃত্যু থেকে তরঙ্গিণীর ঘুম একেবারে কমে গেছে। তার উপর কাজের দায় থাকলে আর রক্ষে নেই। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে, পাখপাখালি ডেকে উঠছে এক-একবার। রাত পোহালে বড়ি কোটা—তরঙ্গিণীর মাথায় গেঁথে আছে। দরজা খুলে বাইরে এলেন তিনি। ওমা, মাথার উপরে চাঁদ, রাত ঝিমঝিম করছে। আবার দরজা দিলেন।

বার দুই-তিন এমনি। পোড়া রাত আর পোহাতে চায় না। পশ্চিমের ঘরের কাছে গিয়ে অলকা-বউকে ডাকাডাকি করছেন: ওঠো বড়বউমা। বড়ি দেওয়া আছে না? ছড়াঝাঁটগুলো সেরে ফেল এসো এইবার।

খসর-খসর আওয়াজে উঠোনে মুড়ো-ঝাঁটা পড়ছে। ঝাঁটপাটের পর গোবর-জলের ছড়া। বাসি ঘরবাড় পরিশুদ্ধ হয়ে থাকবে মানুষজন উঠে পড়ার আগে। চোখ মুছতে মুছতে অলকাও উঠে পড়েছে, গোবরজল গুলে ছড়াৎ-ছড়াৎ করে উঠোনময় ছড়াচ্ছে।

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা উঠোন দুই শরিকের মধ্যে ভাগাভাগি। বেড়া নেই, একটা নালি উঠোনের ঠিক মাঝখান দিয়ে। বৃষ্টির জল ঐ পথে বেরিয়ে রাস্তার পগারে গিয়ে পড়ে। উত্তরের অংশ বংশীধর ঘোষের। বংশীধরের ছোট ছেলে সিধু। নতুন বাড়ি আড্ডা সেরে রাতদুপুরে বাড়ি ফেরে। বাড়ির লোক অঘোরে ঘুমুচ্ছে তখন। রান্নাঘরে ভাত ঢাকা আছে খেয়ে-দেয়ে—উত্তরের ঘরের দাওয়ায় খাট পাতা আছে, খাটের বিছানায় সে শুয়ে পড়ে। নিত্যিদিনের এই নিয়ম রোদে চারিদিক ভরে যায়, গৃহস্থালী কাজকর্ম পুরোদমে চলে। সিধু কিন্তু নিঃসাড়ে চোখ বুজে পড়ে আছে তখনো।

-এসবে কিছু নয় কিন্তু ঝাঁটার আওয়াজটা সিধুর কাছে অসহ্য—হয়তো বা শরিক উঠোনের ঝাঁটা বলেই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে কলহ করে: কী লাগালে ছোট খুড়িমা, অর্ধেক রাত্রে এখনই উঠে পড়েছ? তোমার চোখে ঘুম নেই, তার জন্যে বাড়িসুদ্ধ আমরা যে না ঘুমিয়ে মরি।

পুবের কোঠা থেকে ভবনাথের ডাক এলো: মনু—

তরঙ্গিণী উঠে গেছেন আর অভ্যাসবশে কমলেরও অমনি ঘুম ভেঙেছে। জেঠামশায়ের মনু ডাকের জন্য উসখুস করছিল সে, কাঁথা ফেলে তড়াক করে উঠে একছুটে পুবের কোঠায় চলে যায়। একেবারে ভবনাথের লেপের মধ্যে।

(ক্রমশঃ)
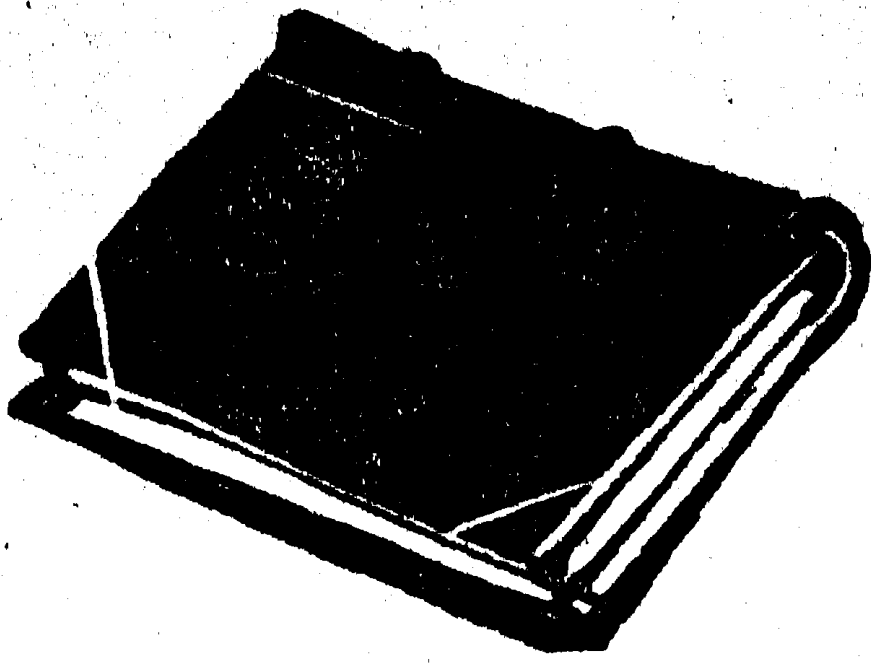
সাহিত্যে ও সংস্কৃতি

ডঃ রাধাকৃষ্ণন পুরস্কৃত

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ও ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডকটর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সম্প্রতি তাঁর ধর্মীয় চিন্তার ব্যাপকতা ও সূক্ষ্মতার জন্য টেমপেলটন ফাউণ্ডেশন পুরস্কার পেয়েছেন।

চল্লিশ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং-এর এই পুরস্কারটি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের নামে ঘোষণা করার সময় ফাউণ্ডেশন কর্তৃপক্ষ থেকে বলা হয়েছে—'তিনি ঈশ্বর উপলব্ধির একটা বিশিষ্ট স্তর আবিষ্কার করেছেন। আজকের আন্তর্জাতিক ধর্মের ক্ষেত্রে আধুনিক হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট চিন্তা এবং গবেষণা একটি অমূল্য সম্পদ।

১৯৭২ সালে এই টেমপেলটন ফাউণ্ডেশন পুরস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং ১৯৭৩এ সেই পুরস্কার পান মাদার তেরেসা। ১৯৭৪-এ এই গৌরবে গৌরবান্বিত হন রাদার রজার।

এই প্রথম টেমপেলটন পুরস্কারটি খৃষ্টান ধর্মের গণ্ডীর বাইরের লোকের কাছে এলো। ফাউণ্ডেশন কর্তৃপক্ষ থেকে বলা হয়েছে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মতে প্রকৃত ধর্মের উদ্দেশ্য হোল সমস্ত ধর্মের গণ্ডী পেরিয়ে একটি গভীরতম সত্যের দীপালোককে উদ্ভাসিত করা। অকসফোর্ডের সমাবর্তন উৎসবে তাঁর সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে—আমরা ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মধ্যে সেই দার্শনিক সম্পর্ককেই খুঁজে পেয়েছি যাঁর স্বপ্ন দেখতেন প্লেটো।'

ন'জন বিচারকের সিদ্ধান্তে ডঃ রাধাকৃষ্ণন এই অসাধারণ সম্মানের পুরস্কারটি অর্জন করেছেন। এই ব্যাপারে ফাউণ্ডেশন কর্তৃপক্ষের কাছে নাম এসেছিল কয়েক হাজার। বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোলেন বেলজিয়ামের রাণী ফেবিওলা জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি ও স্যার জাফরুল্লা খান।

টেমপেলটন পুরস্কার পরিকল্পনার রূপকার হোলেন যুক্তরাষ্ট্রের জন টেমপেলটন।

কবি সম্মেলন

শ্রীঅরবিন্দ যুব সম্মেলনের শিল্প-সাহিত্য বিভাগ ও ঐক্য সম্মেলনের উদ্যোগে সম্প্রতি দু'দিনব্যাপী এক কবি সম্মেলন হয়ে গেল শ্রীঅরবিন্দ ভবনে। শ্রীমা জয়ন্তী ও ভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের দু'দিনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র এবং শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দোপাধ্যায়। 'জাগরী' সম্পাদক, শ্রীঅপূর্ব সাহা ভবিষ্যতের কবিতা ও কথাসাহিত্য বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আধুনিক সাহিত্যের যে সব অশুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তার বিরুদ্ধে আন্তরিকভাবে সংঘবদ্ধ হবার যথার্থ প্রয়োজন যে আছে সে বিষয়টি ডঃ মিত্র তাঁর আলোচনায় সুস্পষ্ট করে তোলেন। ডঃ বন্দোপাধ্যায় নবীন কবিদের আহ্বান জানিয়ে বলেন তাঁরা যেন জীবনের সত্য উপলব্ধির জন্য শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের মহাজীবনকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেন।

আলোচনায় আরো যাঁরা অংশ নেন তাঁরা হোলেন শিবাজী গুপ্ত, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, পবিত্র সেনগুপ্ত বিভূতি ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে 'জাগরী'র পক্ষ থেকে একটি গীতিআলেখ্যও পরিবেশিত হয়।

হিন্দী কবি সম্বর্ধিত

দক্ষিণ আমেরিকার সুরিনামের হিন্দী কবি শ্রীমতী কমলা জগমোহন সিং-কে কয়েকদিন আগে রাজস্থান ইনফরমেশন সেণ্টারে সম্বর্ধনা জানানো হোল। সেই উপলক্ষে সেদিন বহু গুণীজনের সমাবেশ হয়েছিল। শ্রীমতী সিং সুরিনামের সামাজিক ধর্মীয় রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনের ওপর আলোকসম্পাত করেন।

সাহিত্য প্রতিযোগিতা

'অঙ্গীকার' শিল্পপত্রের উদ্যোগে সারা বাংলা ছোট গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোতে চলেছে। যোগাযোগের ঠিকানা—সম্পাদক অঙ্গীকার, চাঁদমারী, পোঃ সোনারপুর ২৪ পরগণা।

একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপন

রবীন্দ্রাঙ্গণের উদ্যোগে সম্প্রতি বেল-ঘরিয়ায় 'একুশে ফেব্রুয়ারী' বাংলা ভাষা বিপ্লব দিবস ও পণ্ডিচেরীর শ্রীমার জন্ম-জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেল। তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সভায় অধ্যক্ষ শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দেবনাথ একুশে ফেব্রুয়ারীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের এই বাংলা ও বাংলাভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী পর্যায়ে আরো মর্যাদা দেওয়া আবশ্যক।

পণ্ডিচেরী আশ্রমের শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শন ও কর্মযোগ সম্পর্কে বিভিন্ন কবি শিল্পীরা আলোক-সম্পাত করেন।

সুপর্ণা

পঃ বাংলায় বিশিষ্ট সাহিত্য সংস্থা 'সুপর্ণা' ৬০ জন নবাগত কবিদের একটি কাব্যসংকলন 'উদিতি' প্রকাশ করেছেন। সম্পাদনায় শ্রীমতী ফুলু নায়ার ও প্রবাসী বিনয়কৃষ্ণ। এই সংকলনের প্রকাশ উপলক্ষে একটি সাহিত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ের হলে। 'উদিতি'র উদীয়মান কবিদের উৎসাহদানের জন্য যেসব প্রখ্যাত কবি ও লেখক উপস্থিত ছিলেন তাঁরা—সিদ্ধেশ্বর

গুপ্ত, রমা বসু, দেবী রায়, স্বদেশরঞ্জন দত্ত অমরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরিনাথ মিত্র, সুকৃতি বন্দ্যো, নরেন চৌরাশিয়া, মৃত্যুঞ্জয় উপাধ্যায়, শঙ্কর মহেশ্বরী, শামিম আনোয়ার, খালিক আবদুল্লা হসমত জালাল্দেশী প্রভৃতি। সম্পর্ণার নিয়মানুযায়ী 'উদীতির' একাডেমিক রয়ালটি বারশো টাকা নগদের পরিবর্তে সমানভাবে প্রতিটি কবিকে 'উদীতির' ৪৫টি কপি হাতে হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে তরুণতম কবিদের ভিতর থেকে শ্রীঅজিতকুমার সামন্তকে আহ্বান জানানো হয়।

গ্রামাঞ্চলে কবি ও লেখকদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য 'সম্পর্ণা'র গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বাগনান কলেজে (হাওড়ায়) চতুর্দশ কাব্য পাঠ-এর আয়োজন করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে কলকাতার বিশিষ্ট কবি ও লেখক ছাড়াও—মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া জেলার তরুণতম কবিরা হাজির ছিলেন। 'সম্পর্ণা'র জাতীয় সংহতি এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী লেখক ও কবিদের একত্রিত করার উদ্দেশ্যে পঃ বাংলার বিভিন্ন জেলায় এধরনের 'সাহিত্য মেলা'র সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

উপগুপ্ত

নতুন বই
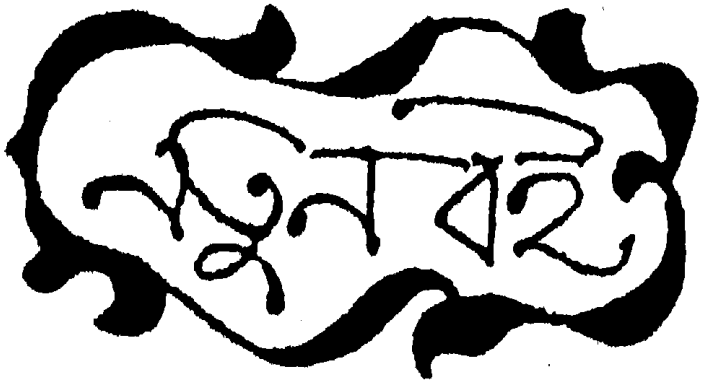
কবি ভারতচন্দ্র : শংকরীপ্রসাদ বসু। মন্ডল বুক হাউস; ৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯। কুড়ি টাকা।

বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের কথা মনে পড়লেই কেন যেন ইতালির 'দি প্রিন্স' গ্রন্থের রচয়িতা ম্যাকিয়াভেলীর কথা মনে পড়ে যায়। ম্যাকিয়াভেলীকে তাঁর কালে যেরকম একইসঙ্গে নিন্দা ও প্রশংসা শুনতে হয়েছিল ভারতচন্দ্রের নিন্দা-প্রশংসা বুঝি সেই সমপর্যায়ের। সাধারণভাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর বিভিন্ন সমালোচক কর্তৃক একই সঙ্গে 'নিন্দা' ও প্রশংসায় আলোচিত হয়েছেন ভারতচন্দ্র। কিন্তু সেই সমস্ত আলোচনা কোথাও চর্বিত চর্বণ কোথাও বা সুকুমারমতি ছাত্রদের মগজে পরীক্ষাপাশের উপযোগী করে রেখে দেওয়ার মত রচিত।

শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসু রচিত 'কবি ভারতচন্দ্র' সেসব থেকে এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বলেই এই কথাগুলি বলতে হল। আলোচ্য সমালোচক ভারতচন্দ্র সম্পর্কিত মননে যেমন একান্ত মৌলিকতা রাখতে অভ্যস্ত তেমনি তাঁর আলোচনা পদ্ধতির প্রকাশেও গতানুগতিকতা বর্জনে বদ্ধপরিকর। যেহেতু ভারতচন্দ্র প্রাচীন যুগের শেষ কবি সুতরাং একাধিক তথ্য সেখানে দিতেই হবে—এমন মানসিকতা আলোচ্য প্রবন্ধকারের নেই আবার ভারতচন্দ্রকে নিয়ে নিছক সাহিত্যগ্রন্থ রচনা করব—এই ভাবনাও তাঁর লেখক-মানসিকতায় সক্রিয় নয়।

শ্রীযুক্ত বসু নিপুণতার সঙ্গে ভারতচন্দ্র আলোচনায় বসেছেন। পূর্বসূরী সমালোচকদের চিন্তাধারায় যে দাসত্ব করেন নি তার বহু স্পর্ধিত মন্তব্যে তার প্রমাণ আছে। শ্রীযুক্ত বসুর আলোচনার মূল্যবান যে দিক, তা হল ভারতচন্দ্রের কাব্যবিষয়কে তার কাহিনীকে অতি সুকৌশলে পাঠকদের সামনে রেখে কবি ভারতচন্দ্রের মানস স্বরূপ বিশ্লেষণ করা। লেখক মোট পাঁচটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ে ভারত কবিমানস বিশ্লেষণে তৎপর থেকেছেন। 'ভারতচন্দ্রের কবিমানস' 'ভারতচন্দ্র সমালোচনার ধারা' 'নবমূল্যায়নের প্রমাণ সন্ধান', 'সর্বাঙ্গসুন্দর রোমান্টিক কাব্য' ও 'বিদ্যা-বিদগ্ধ রূপসুন্দর কাব্য'—এই পাঁচটি উপশিরোনামায় পাঁচটি অধ্যায় চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত, আলোচনায় নিরাসক্তচিত্ততা শ্রীযুক্ত বসুর আলোচনায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেভাবে উল্লেখ্য পূর্বসূরীদের ভারতচন্দ্র সম্পর্কিত মতামত বিশ্লেষণ করে তাঁদের যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জানিয়েই আপন মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা বাস্তবিকই মৌলিকতার ও নিস্পৃহ দৃষ্টির পরিচয় দেয়।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের 'বিদ্যাসুন্দর' অংশের আলোচনায় কাহিনী অংশকে সমালোচক আলোচনার মধ্যে এমনভাবে রেখেছেন, যা পাঠকদের পক্ষে আদৌ বিরক্তিকর মনে হয় না। ভারতচন্দ্রের কবিমানস ছিল অসাধারণ আত্মবশ। এবং সেই আত্মবশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বরূপকে শ্রীযুক্ত শংকরীপ্রসাদ বসু বিদ্যাসুন্দর আলোচনায় তাঁর ক্লাসিক্যাল দৃষ্টি ও রোমান্টিক মন এবং মননের সূত্রে উপস্থিত করেছেন। শ্রীযুক্ত বসুর মৌলিক মন্তব্যগুলি যেমন সরস শ্লেষাত্মক তেমনি ভারতচন্দ্রের কবিস্বভাবের নূতন দিক নির্দেশকও বটে। প্রমথ চৌধুরী 'বুদ্ধিমানের বজ্জাতি'র মত শব্দগুচ্ছ তৈরী করে বুদ্ধিজীবীদের এক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছিলেন। শ্রীযুক্ত বসু ভারতচন্দ্রকে দেখেছেন বুদ্ধির চোখে, সেই সঙ্গে ভালবাসার হৃদয়ও যুক্ত হয়েছে। তাই ভারতচন্দ্র সম্পর্কিত মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত তাঁর নিজস্ব ও একই সঙ্গে অদ্ভুতভাবেই 'বুদ্ধিমানের বজ্জাতি' আবার সর্বজনগ্রাহ্যও। 'কবি ভারতচন্দ্র' গ্রন্থটি সর্বকালের গবেষক পাঠক ও বুদ্ধিজীবীর অবশ্য সংগ্রহযোগ্য বলে আমাদের বিশ্বাস।

মোপাসাঁ রচনাবলী (প্রথম খন্ড)—সম্পাদক হরপ্রসাদ মিত্র। জ্যোতি প্রকাশন ২-এ, নবীন কুণ্ডু লেন কলকাতা—৯। কুড়ি টাকা।

মোপাসাঁর 'বেল আমি' উপন্যাস এবং মোট ২৪টি ছোটগল্পের অনুবাদ নিয়ে 'মোপাসাঁ রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। মোপাসাঁর রচনাবলী এ পর্যন্ত যতগুলি প্রকাশিত হয়েছে, আলোচ্য গ্রন্থটি সে সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম এই কারণে যে এ গ্রন্থের মোপাসাঁ পরিমিত ও অন্যান্যগুলির অনুবাদক যথেষ্ট পরিচিত এবং উত্তম অনুবাদে প্রশংসাধন্য। 'বেল আমি' অনুবাদক ইন্দুভূষণ দাস। ভাষান্তর আদৌ আড়ষ্ট মনে হবে না। গল্পগুলির অনুবাদকমণ্ডলীতে আছেন সর্বশ্রী অরূপ ভট্টাচার্য বিষ্ণু বাগচী, শংকর সেনগুপ্ত, নিখিল সেন সমরেশ মৈত্র, চিত্তরঞ্জন রায়। এঁদের অনুবাদ স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে সুপাঠ্য। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র মোপাসাঁ পরিচিতিতে প্রকৃতিবাদ নিয়তিবাদ মোপাসাঁ এই শিরোনামায় মোপাসাঁর যে দীর্ঘ পরিচিতি দিয়েছেন, তা যুক্তিসিদ্ধ। ডঃ মিত্রের প্রবন্ধটি মোপাসাঁকে স্বাধীনভাবে বোঝায় সহায়কও বটে। 'মোপাসাঁ রচনাবলী'টি সাধারণ ও বুদ্ধিজীবী পাঠকদের অবশ্য সংগ্রহযোগ্য।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

দক্ষিণীবার্তা—সম্পাদক : প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী। ৩৬বি কে পি রায় লেন। কলকাতা-৩৩। দাম তিন টাকা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত দক্ষিণীবার্তার বর্তমান সংখ্যাটি একটি মূল্যবান সংকলন। সম্প্রতিকালে এই ধরনের সংকলন বিশেষ চোখে পড়ে না। সুভাষচন্দ্রের সমকালীন কয়েকজনের স্মৃতিচারণসহ আরও বহু আকর্ষণীয় রচনা আছে, যা পাঠককে আজকের অস্থিরতার মাঝে নতুন পথ দেখাবে। লিখেছেন সতীশচন্দ্র সামন্ত অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় হরিদাস মিত্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র শিশিরকুমার বসু বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় নির্মল বসু সুবোধ ঘোষ শান্তিকুমার মিত্র সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সন্তোষকুমার বসু ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রবোধচন্দ্র সেন সুষমা রায় (চক্রবর্তী) গোপাললাল সান্যাল প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কমলা দাসগুপ্ত শান্তিদেব ঘোষ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মনকুমার সেন ব্রহ্মচারী শঙ্কর সত্যরঞ্জন বকসী এবং প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী। নেতাজীর উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মণীন্দ্র রায় এবং শক্তিব্রত চৌধুরী। দুটি স্বদেশী গল্প লিখেছেন আশাপূর্ণা দেবী এবং জরাসন্ধ। সুভাষচন্দ্রের তিনটি চিঠি এবং রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি সংখ্যাটির অন্যতম সম্পদ।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্রষ্টা বনাম শিল্পী

দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার

কিছুদিন ধরে শিল্পীরা রবীন্দ্রসংগীতে কতোখানি স্বাধীনতা নিতে বা পেতে পারেন, তা নিয়ে জোর বিতর্ক চলছে। এই বিতর্কটা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে এটা মূলতঃ দুটো মতবাদে বিভক্ত। এদের মধ্যে একদল বলছেন যে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের ওপর অতটা বাধা নিষেধ আরোপ করার কোন মানে হয় না। এই সমস্ত বাধা নিষেধ আরোপ করে রবীন্দ্রসংগীতকে শুষ্ক ও প্রাণহীন করে তোলা হচ্ছে। রবীন্দ্রসংগীতে এই প্রকার বাধা নিষেধও তাকে একটা নির্দিষ্ট সুরে বেঁধে দেওয়াটাকে অনেকে ভারতীয় সংগীতের আদর্শের পরিপন্থী বলে মনে করেন। কেউ কেউ, আবার শিল্পীর স্বাধীনতায় বাধা নিষেধ আরোপ করার পেছনে একটা কায়েমী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের গন্ধও পান।

আবার অন্যদল বলেন যে রবীন্দ্রসংগীতে কোন বাধা নিষেধ আরোপ না করে যদি শিল্পীদের যথেচ্ছভাবে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করবার স্বাধীনতা দেওয়া হয় তবে রবীন্দ্রসংগীতের স্বাধীনতা ও বৈশিষ্ট্য একেবারে বিনষ্ট হয়ে যাবে।

এই দুটো মতবাদকে পরীক্ষা করে দেখবার আগে আমাদের একটা বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে গোড়াতেই একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

প্রথমতঃ আমাদের পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন যে শিল্পী বলতে এখানে কাদের বোঝাচ্ছে।

রবীন্দ্রসংগীত বা এই জাতীয় সব সংগীতের বেলাতেই পরিবেশনের দুটো দিক আছে—একটা ঘরোয়া বা আটপৌরে আর একটা দিক হোল তার প্রতিনিধিত্বমূলক পরিবেশন।

রবীন্দ্রসংগীত আজ শুধু একটা পোষাকী সংগীত নয় যা শুধু বৈঠক ও মজলিশেই সীমাবদ্ধ। এ গান হচ্ছে আমাদের বাঙালীদের 'জীবন-সংগীত'। এই গান জীবনের সুখে দুঃখে উৎসবে অনুষ্ঠানে আজ আমাদের নিত্যসংগী ও এ গান আমাদের সকলের, তা ওস্তাদই হোক বা আনাড়ীই হোক সকলের কণ্ঠেই ফেরে। আটপৌরে বা ঘরোয়া পরিবেশে এই গান গাইবার অধিকার সকলেরই আছে ও তাতে কোন বাধা নিষেধ আরোপ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না এবং আমরা আটপৌরে গাইয়েদের ঠিক শিল্পীদের মধ্যে ধরছি না। তারা কোন বাধা নিষেধের আওতার মধ্যে আসছেন না।

কিন্তু এই আটপৌরে পরিবেশন ছাড়াও সংগীত পরিবেশনের আর একটি দিক আছে যাকে বলা চলে প্রতিনিধিত্বমূলক পরিবেশন। অর্থাৎ রেকর্ড রেডিও, সংগীত সম্মেলন, অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে সংগীত পরিবেশন ও ঐ সব অনুষ্ঠানে যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে থাকেন শিল্পী বলতে আমরা এখানে তাঁদেরই বোঝাচ্ছি। সেইটাই হলো বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

তবে একটা ভাববার কথা এই যে রবীন্দ্রসংগীতে শিল্পীদের স্বাধীনতা কতটুকু হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অধিকাংশ সময়েই আমরা শুধু নিজেদের যুক্তি ও বক্তব্য পেশ করে এই বিষয়ে তর্ক করে থাকি। কিন্তু এই ব্যাপারে রবীন্দ্রসংগীতের স্রষ্টা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতামতটা কি তা আমরা অনেক সময়েই জানতে বা বুঝতে চেষ্টা করি না।

বর্ত্তমানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন ও শিল্পীদের স্বাধীনতা নিয়ে যে সব প্রশ্ন তোলা হচ্ছে তার অনেকগুলিই বহুদিন পূর্বে দিলীপকুমার রায় আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সামনে তুলে ধরেছিলেন ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তার জবাবও দিয়ে গেছেন। কবির ঐ সব মতামতকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রসংগীতে শিল্পীরা কতখানি স্বাধীনতা পেতে পারেন সে বিষয়ে বিচার করা বা কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে একটু খতিয়ে দেখা যাক কবির মতামতটা কি। (নিম্নে উদ্ধৃত কবির মতামত বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত)।

তাঁর গানে ভারতীয় সংগীতের আদর্শে শিল্পীদের কোন স্বাধীনতা দেওয়া হবে না এই প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '...আমি যে গান তৈরী করেছি তার ধারার সংগে হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে—এ একথা কেন তুমি স্বীকার করতে চাওনা।

তুমি বলবে আমাদের দেশের গানের বৈশিষ্ট্যই তাই, গায়কের রুচি ও শক্তিকে সে দরাজ জায়গা ছেড়ে দেয়। কিন্তু সর্বত্র একথা খাটে না। খাটে কোথায়? যেখানে গানের চেয়ে রাগিণীই প্রধান, রাগিণী জিনিষটা জলের ধারা; বস্তুত সেই রকম আকৃতি-পরিবর্তন দ্বারাই তার প্রকৃতির পরিচয়। কিন্তু আমি যাকে গান বলি সে হচ্ছে সজীব মূর্তি যে যেমন খুশি তার হাত পা নাক চোখের বদল করতে থাকলে জীবনের ধর্ম ও মূর্তির মূল প্রকৃতিকেই নষ্ট করা হয়। সে হয় কেমন? যেমন চাঁপা ফুল পছন্দ নয় বলে তাকে নিয়ে স্থলপদ্ম গড়বার চেষ্টা। সে স্থানে উচিত চাঁপার বাগান ত্যাগ করে স্থলপদ্মের বাগানে আসন পাতা। কারণ যে জিনিষ জীবধর্মী তাকে উপেক্ষা করলেও চলে কিন্তু উৎপীড়ন করলে অন্যায় হয়।'

তাঁর গানে গাইয়েদের অতিরিক্ত কাজ বা অলংকার সংযোজনের প্রস্তাব বিবেচনা করতে বললে তিনি জবাব দিয়েছেন '......আমার গানে তো আমি সে রকম ফাঁক রাখিনি যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠবো।'

গান যে সহজ সরল অলংকরণের দ্বারাই সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে ও তাতে অলংকরণের বাহুল্য যে সব সময়েই তাকে খুব একটা শ্রীমন্ডিত করে না। তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, আমি গান রচনা করতে করতে সে গান বারবার নিজের কানে শুনতে শুনতেই বুঝেছি যে দরকার নেই প্রভূত কারুকৌশলের। যথার্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতায়—অতি সূক্ষ্ম অতি সহজ ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে। অন্য এক জায়গায় বলেছেন সরস্বতীর কমলবনে সোনার পদ্ম আছে, সেখানে লোভীর মতো এনকোর এনকোর করে চীৎকার চলে না। বেনের দল যতই দুঃখিত হোক শতদলের উপর আর একটা পাপড়ি চাপানো চলবে না। সে আপন সম্পূর্ণতার মধ্যে থেমেছে বলেই সে অপরিসীম।

কারও সংগীত সৃষ্টির ওপর অন্যের হস্তক্ষেপ করা উচিত কিনা সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কবি বলেছেন, কিন্তু তুমি যেমন বিচারের অধিকারী, অন্য ব্যক্তিও তেমনি। এমন অবস্থায় সহজ মীমাংসা এই যে, যে ব্যক্তি গান রচনা করেছে তার সুরটিকে বহাল রাখা। কবির কাব্য সম্বন্ধেও এই রীতি প্রচলিত, চিত্রকরের চিত্র সম্বন্ধেও। রচনা যে করে রচিত পদার্থের দায়িত্ব একমাত্র তারই; তার সংশোধন বা উৎকর্ষ সাধনের দায়িত্ব যদি আর কেউ নেয় তা হলে কলাজগতে অরাজকতা ঘটে। কবির জীবদ্দশাতেই তাঁর গানে বিভিন্ন শিল্পীদের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা লক্ষ্য করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন......আজকালকার অনেক রেডিও গায়কও অহঙ্কার করে বলে থাকেন তাঁরা আমার গানের উন্নতি করে থাকেন। মনে মনে বলি পরের গানের উন্নতি-সাধনে প্রতিভার অপব্যয় না করে নিজের গানের রচনায় মন দিলে তাঁরা ধন্য হতে পারেন। সংসারে যদি উপদ্রব করতেই হয় তবে হিটলার প্রভৃতির ন্যায় নিজের নামের জোরে করাই ভালো।

তাঁর গানে নানা বিকৃতির অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে কবিগুরু এইভাবে তাঁর ক্ষোভ ব্যক্ত করেছিলেন। 'এখন এমন হয় যে আমার গান শুনে নিজের

[illegible] কিছু [illegible] পারি না। মনে হয় কথাটা [illegible] যেন নয়। নিজে রচনা করলুম, [illegible] মুখে নষ্ট হচ্ছে এ যেন অসহ্য। মেয়েকে অপাত্রে দিলে যেমন সব কিছু সইতে হয়, এও যেন আমার পক্ষে সেই রকম।'

উপরে ব্যক্ত রবীন্দ্রনাথের মতামত পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে রবীন্দ্রনাথ কখনই তাঁর গানে শিল্পীদের অতিরিক্ত সংযোজন বা নিজেদের ইচ্ছেমত করে গাইবার স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং এই বিষয়ে তাঁর মতামত দিনকে দিন কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রসংগীতের মূল কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে তার ঢং-এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে অতিরিক্ত সুর সংযোজনের কথা অনেকে ভেবেছেন। মনে হয় গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথের এতে কিছু অনুমোদনও ছিল। কিন্তু এই অতিরিক্ত সংযোজনের অধিকার তিনি কখনই সাধারণ গাইয়েদের ওপর ছেড়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন এই কাজটা কজন গুণী যাঁদের পরিমিতি ও রুচিবোধের ওপর তাঁর আস্থা ছিল, তাঁরাই করুন। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, '...অবশ্য যাঁরা সত্যকার গুণী তাদের আমি অনেকটা বিশ্বাস করে এ স্বাধীনতা দিতে পারতাম।' কিন্তু মনে হয় শেষ অবধি তিনি তাঁর মতের পরিবর্তন করেছিলেন বা যোগ্য কোন লোকের সন্ধান পান নি যার জন্যে শেষ অবধি কারও ওপর এর ভার ন্যস্ত করে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। এই সম্পর্কে কবির নিম্নোক্ত উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য 'ললিতকলার সৃষ্টির স্বকীয় বিশেষত্বর উপরই তার রস নির্ভর করে। গানের বেলাতে তাকে রসিক হোক অরসিক হোক সকলেই আপন ইচ্ছামত উলট-পালট করতে সহজে পারে বলেই তার উপরে বেশি দরদ থাকা চাই। সে সম্বন্ধে ধর্মবুদ্ধি একেবারে খুইয়ে বসা উচিত নয়।' মনে হয় গাইয়েদের এই দরদ ও ধর্মবুদ্ধির ওপরে কবি শেষ অবধি আস্থা রাখতে পারেন নি। এখন প্রশ্ন হলো এই যে কবি যখন তাঁর জীবদ্দশায় কাউকে এর দায়িত্ব দেন নি তখন তাঁর অবর্তমানে এই অধিকার প্রয়োগ করবে কে?

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কোন কোন সংগীতসমালোচক কয়েকজন প্রবীণ ও বর্ষীয়ান গাইয়েকে রবীন্দ্রসংগীতে কিছু কিছু অতিরিক্ত কাজ সংযোজন করবার অধিকার দেবার প্রস্তাবকে সমর্থন করছেন। কিন্তু এই করে তাঁরা ঐ সব গাইয়েদের রবীন্দ্রসংগীতে তাঁদের স্বকীয় ঢং আমদানিও কিছুটা পরিমাণে কয়েকটি ঘরানা সৃষ্টির পরোক্ষ অনুমোদন করছেন না কি ও ইতিমধ্যেই একজন প্রবীণ রবীন্দ্রসংগীত গাইয়ের তাঁর নিজস্ব ঢং-এ রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন কিছুটা বিভ্রান্তি ও বিতর্কের সৃষ্টি করেন নি কি? রবীন্দ্রসংগীতে তো শুধু একটা ঘরানা থাকবারই কথা এবং সেটা হলো রবীন্দ্র ঘরানা।

তাছাড়া তর্কের খাতিরে যদি এটা মেনে নেওয়াও যায় যে ঐ সব প্রবীণ রবীন্দ্রসংগীত গাইয়েদের পরিমিতি ও রুচিবোধ থাকায় তাঁরা রবীন্দ্রসংগীতে অতিরিক্ত কাজ সংযোজন করবার অধিকার পেতে পারেন তো তার পরও একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে এঁদের দোহাই দিয়ে যখন অন্যান্য সাধারণ গাইয়েরাও এই অধিকার প্রয়োগ করতে চাইবেন তখন তাঁদের ঠেকাবে কে? এই অধিকার প্রয়োগের ফলে পরবর্তীকালে গাইয়ে-পরম্পরার দুর্দম কণ্ঠতাড়নায় রবীন্দ্রসংগীতে রবীন্দ্রনাথের হয়তো আর কিছুই বাকি থাকবে না।

এই ধারার গানের পরিবেশনে যদি কোন বাধা নিষেধ না থাকে তবে কি পরিমাণ হতে পারে তার নমুনা আমরা কাজী নজরুল ইসলামের গানেই দেখতে পাচ্ছি। একই নজরুলের গান অনেক সময়ে বিভিন্ন শিল্পী দ্বারা বিভিন্ন ঢং-এ সুরান্তরিত হয়ে পরিবেশিত হতে দেখা যাচ্ছে ও এর ফলে বোঝাই মুস্কিল হয়ে পড়ে যে ঐ সব গানে নজরুল প্রদত্ত মূল সুর ও রূপটি কি?

এটা বোধহয় সকলেই জানেন যে রবীন্দ্রসংগীতে বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকায় ও সৌভাগ্যক্রমে সেগুলো এখন অবধি বেশিরভাগ শিল্পী বজায় রাখায় রবীন্দ্রসংগীতে একটা গায়কী গড়ে উঠেছে ও কোন না জানা রবীন্দ্রসংগীতকেও শুনে ও তার লক্ষণ ও ঢং দেখে আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে রবীন্দ্রসংগীত বলে চিনতে পারি। কিন্তু নজরুলের গান অনেকটা শিল্পী-নির্ভর হওয়াতে ও তাতে শিল্পীর কিছুটা স্বাধীনতা থাকাতে তাতে কোন সুনির্দিষ্ট গায়কী গড়ে উঠতে পারে নি। রবীন্দ্রসংগীতকেও সেই অবস্থায় এনে ফেলাটা কতটা সমীচীন হবে আশা করি সকলেই তা ভেবে দেখবেন।

নজীর হিসেবে অনেকে রাধিকামোহন গোস্বামী ও দিলীপকুমার রায় প্রভৃতি গুণীদের নাম উল্লেখ করে থাকেন। এঁদের নাকি রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান ইচ্ছেমত পরিবেশন করবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে এটা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে ঐ সব শিল্পীরা যখন রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন তখন রবীন্দ্রসংগীতের অত্যন্ত প্রচার ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়তো তখন কিছুটা সংশয় থেকে থাকতে পারে যে জনসাধারণ তাঁর গান ঠিকমত নেবে কিনা। তাই রবীন্দ্রসংগীতের প্রচারের দিকটা ভেবে ও ঐ সব গুণীদের রুচিবোধ ও পরিমিতিবোধের ওপর তাঁর আস্থা থাকায়, তিনি হয়তো তাঁদের সেই স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কিন্তু কালক্রমে যখন রবীন্দ্রসংগীত রেডিও ও বিশেষ করে সিনেমার দৌলতে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করলো তখন রবীন্দ্রনাথ শঙ্কিত হলেন ও তাঁর গানের রূপ এই ব্যাপক বিস্তৃতিতে যাতে সাধারণ গাইয়েদের হাতে পড়ে নষ্ট না হয় সেজন্যে তিনি নিজে সেই সব গানের রেকর্ড শুনে অনুমোদন শুরু করলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড কর্তৃক সব রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডের অনুমোদনের ব্যবস্থা হোল।

কিছুদিন আগে কোলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে অতীত স্মৃতি অনুষ্ঠানে গৌরকিশোর ঘোষ সেই যুগের কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড বাজিয়ে শোনালেন যখন শিল্পীরা যেভাবে ইচ্ছে রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করতে পারতেন ও যখন তার কোন অনুমোদনের বালাই ছিল না। ঐ অনুষ্ঠানে আমরা তাতে পেলাম শ্রীকে মল্লিকের নিজস্ব সুরে গাওয়া রবীন্দ্রনাথের 'আমার মাথা নত করে দাও' গানটি ও জনৈক শিল্পী রবীন্দ্রনাথের 'যদি বারণ কর তবে গাহিব না' গানটি যেভাবে যাত্রার দলের ঢং-এর কনসার্টের সহযোগিতায় পরিবেশন করলেন তা বোধহয় বর্তমান যুগে কল্পনাও করা যায় না। ঐ সব গাওয়া গানের নজীর দেখিয়ে কেউ যদি রবীন্দ্রসংগীতকে আবার সেই নৈরাজ্যের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান তো সেটা কি খুব সমর্থনযোগ্য হবে?

প্রশ্ন উঠতে পারে যে রবীন্দ্রসংগীতে প্রত্যেকটি গানের বেলাতেই যদি স্বরলিপির নির্দেশ হুবহু মেনে চলতে হয় তবে শিল্পীর স্বাধীনতা রইল কোথায়? এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রসংগীত যখন একান্তভাবে কবিগুরুর নিজস্ব সৃষ্টি এবং খেয়াল বা ঠুংরীর মত সংগীতের একটি বিশেষ ধারা নয়, যা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শিল্পী বা গুণীর অবদানে পুষ্ট হয়েছে, তখন তার পরিবেশনে কিছুটা বাধা নিষেধ থাকাটা স্বাভাবিক ও মূল রচনার বাইরে যাওয়ার অধিকার পরিবেশনকারী শিল্পীর পক্ষে থাকাটা খুব স্বাভাবিক এবং সঙ্গতও নয়। পাশ্চাত্য দেশেও আমরা দেখি যে প্রখ্যাত সংগীতরচয়িতাদের সংগীতসৃষ্টিতে পরিবর্তন বা অতিরিক্ত সংযোজনের কথা কেউ ভাবতেই পারেন না এবং [illegible]

সেখানকার সুধীসমাজ তা কখনই ক্ষমা বা বরদাস্ত করে না।

তবে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনধারার কিছুটা পরিমাণ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া স্বরগতভাবে প্রত্যেকটি রবীন্দ্রসগীত এক হলেও যেসব শিল্পীরা তা পরিবেশন করেন তাঁরা ব্যক্তিত্ব ও মেজাজের দিক দিয়ে ঠিক এক নন। সুতরাং তাঁদের গান একই স্বরলিপিতে অনুসরণ করলেও মেজাজ ও ভাব ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে কিছুটা ভিন্ন হতেই পারে এবং শিল্পীর তাতে একটা জিনিষ ফুটে ওঠা খুবই স্বাভাবিক, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'স্বকীয়তা'। রবীন্দ্রসঙ্গীতে বোধহয় এইটুকুই শিল্পীর স্বাধীনতা। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গান নানা লোকের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলেই গায়কের নিজের দোষগুণের বিশেষত্ব গানকে নিয়তই কিছু না কিছু রূপান্তরিত না করেই পারে না। তাঁর গানে শিল্পীর স্বাধীনতা সবন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি শ্রীদিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন, '...তোমার একথা আমিও স্বীকার করি যে সুরকারের সুর বজায় রেখেও একসপ্রেশনে কমবেশী স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে। কেবল প্রতিভা অনুসারে কম ও বেশির মধ্যে তফাৎ আছে একথাটি ভুলো না। প্রতিভাবানকে যে স্বাধীনতা দেব অকুণ্ঠে, গড়পড়তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা চাইলে না করতেই হবে।'

এখন প্রশ্ন হোল যে রবীন্দ্রসংগীতকে তার সঠিক রূপে কি করে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে? অনেকেই হয়তো বলবেন, কেন স্বরলিপি তো রয়েছে। কিন্তু মনে হয় এ ব্যাপারে শুধু স্বরলিপিই যথেষ্ট রক্ষাকবচ নয়। কারণ স্বরলিপিতে থাকে শুধু গানের কাঠামোটি এবং তা থেকে গায়কী শুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত তুলে নিতে পারেন তাঁরাই যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা করে এসেছেন। কিন্তু যাঁরা তা করেন নি তাঁরা স্বরলিপি দেখে গান তুললে হয়তো শুধু স্বরগতভাবে গানটি তাঁদের কণ্ঠে আসতে পারে, কিন্তু এর গায়কী তাঁদের কণ্ঠে নাও ধরা পড়তে পারে। তাছাড়া কোন গানের স্বরলিপিকে অক্ষুন্ন রেখেও তাকে বিকৃত করা যায় ও আজকাল অনেক বিকৃতিই এই-ভাবে লোকের চোখ এড়িয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনুপ্রবেশ করছে এবং এগুলো হোল সাধারণতঃ গানের লয়কে অনাবশ্যকভাবে কমানো বা বাড়ানো স্বরে অযথা কম্পনের প্রয়োগ গানের মূল তালকে অক্ষুন্ন রেখে তাতে নানা ভাব প্রয়োগ করে গানের স্বচ্ছন্দ গতি ও তার কাব্যময় রূপকে ব্যাহত করা, গানকে প্রথম লাইন থেকে না ধরে তার মাঝখান থেকে ধরা ও গানে বেশী ভাব আরোপ করে তাকে অতিনাটকীয় করে তোলা ইত্যাদি। কোন স্বরে বিচ্যুতি অর্থাৎ কোমল ধা এর স্থলে শুদ্ধ ধা লাগালে রবীন্দ্রসংগীতের গায়কী তাতে যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ঐ সব বৈচিত্র্য প্রয়োগ দ্বারা। সুতরাং স্বরলিপির সংগে চাই এই সব রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশুদ্ধ ও সঠিক গীতিরূপ ও সেটা সম্ভব হতে পারে দুই উপায়ে।

ক) যেসব রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তাঁদের উচিত হবে উপযুক্ত শিষ্যগোষ্ঠী সৃষ্টি করে যাওয়া, যাতে তাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঠিক গায়কী রূপটি কণ্ঠে ধারণ করে তাঁদের শিষ্যপরম্পরায় পরবর্তীযুগে সেই গায়কীর ধারাটি প্রবহমান রাখতে পারেন। যেমন একটি প্রদীপ থেকে অনেকগুলো প্রদীপ জ্বালানো যায়, তেমনি এক একটি কণ্ঠ থেকে শত শত কণ্ঠে সেই সব গান তাঁদের বিশুদ্ধ রূপে ছড়িয়ে দিতে হবে।

খ) রবীন্দ্রসঙ্গীত - বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের দ্বারা রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড বা টেপরেকর্ড করিয়ে তা সংরক্ষিত করতে হবে। এ কাজে বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী হতে পারেন এবং এ কাজটা যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই মঙ্গল।

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনার শিল্পীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামতকে কেউ যদি অত্যন্ত বেশী সংরক্ষণশীল ও ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শের পরিপন্থী বলে মনে করেন তো তিনি স্বচ্ছন্দে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বর্জন করে ভারতীয় সংগীতের আদর্শে বাংলা গান রচনা করে তাতে শিল্পীদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে বাংলা গানের নূতন দিগন্ত খুলে দিতে পারেন। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত করবো, তাতে অর্থ কামাবো, যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করবো, কিন্তু এর পরিবেশনায় তার স্রষ্টা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা বা নির্দেশকে মানবো না এরূপ মনোভাব অত্যন্ত আপত্তিকর।

রবীন্দ্রসঙ্গীত ভবিষ্যতে তার অস্তিত্ব ও জনপ্রিয়তাকে অক্ষুন্ন রাখতে পারবে কিনা তা একমাত্র মহাকালই নির্ধারণ করতে পারে। কিন্তু যতদিন এ গান বাঁচবে, ততদিনই সে তার অবিকৃত স্বরূপেই বেঁচে থাকুক—এটাই কাম্য। কবিগুরুও তাই চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমার গান যাতে আমার গান বলে মনে হয় এইটি তোমরা কোরো। আরও হাজারো গান হয়তো আছে তাদের মাটি করে দাওনা, আমার দুঃখ নেই। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার মিনতি—তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান বলে চিনতে পারি।'

শিল্পীদের তাঁর গানে অতিরিক্ত সংযোজন বা স্বাধীনতা নেবার প্রচেষ্টার রবীন্দ্রনাথ কতটা স্পর্শকাতর ছিলেন তা তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি থেকেই বোঝা যাবে। 'আমাদের দেশের গায়ক কথায় কথায় রচয়িতার অধিকার নিয়ে থাকে তখন সে সৃষ্টিকর্তার কাঁধের ওপর চড়ে ব্যায়াম কর্তার বাহাদুরী প্রকাশ করে।'

সুতরাং রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পীরাও রবীন্দ্রসংগীতে খোদার ওপর খোদকারী বা স্রষ্টার কাঁধের ওপর চড়ে ব্যায়াম কর্তার বাহাদুরীর প্রচেষ্টাটা যত কম করেন ততই মঙ্গল।

কবিতা

ধুলোর নিয়তি ॥

রাম বসু
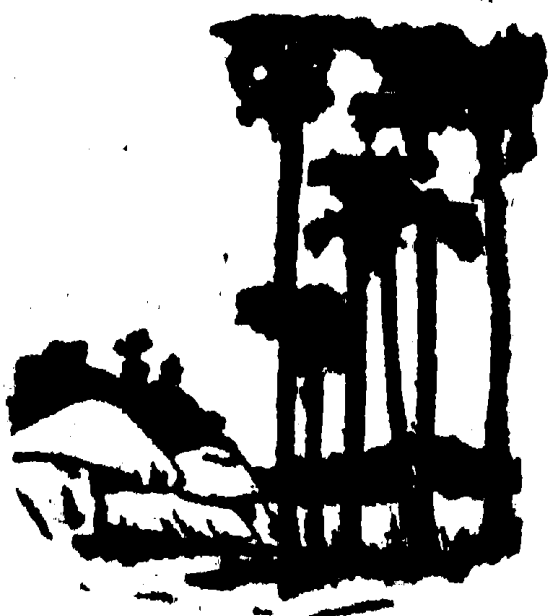
জন্ম নিয়েছি ধুলিতে,
এই তো চরম সত্য
ভুলি নি কখনো

যখনই তাকাই আমি বুকের গভীরে
শিউরে উঠি ধুলোর প্রলয়ে
পশুর দাঁতের চাপে ভেঙে যায় পাঁজরের খাঁচা
মাথার খুলির মধ্যে বিদ্যুতের ধারালো করাত
অন্ধকারে যাতায়াত করে

জন্ম নিয়েছি ধুলিতে
ধুলোর সাম্রাজ্য তাই পার হতে চাই
বাড়াই স্পর্ধার মুখ অকলঙ্ক নক্ষত্রের দিকে
নীল ঢেউ অঙ্গে মেখে হতে চাই সামুদ্রিক পাখি
পার হয়ে যেতে চাই সীমা

নিত্য টানে দুই বিপরীত
বুকে নিত্য কুরুক্ষেত্র নিয়ে যাত্রা আমাদের
মহাপ্রস্থানের দিকে
রেখে যাওয়া কিছু গন্ধ, ক্ষতের গোলাপ
অসমাপ্ত রঙিন ক্যানভাসে কয়েকটি শিশির, অশ্রু, নক্ষত্রের মাটি

এই হল জীবনের রীতি
এই হল ধুলোর নিয়তি।

কেন, এইসব কেন ? ॥

তুলসী মুখোপাধ্যায়

দশটা নেকড়ে কেন আমাকেই তাক করে
অবিরাম থাবা ছুঁড়ে মারে
কেন নষ্টমেয়ের লালা নিশিদিন নষ্ট করে
হৃদপিণ্ডের ব্যাকুল প্রার্থনা
দক্ষিণের প্রতীক্ষায় কেন বারবার উড়ে আসে
উত্তরের দুরারোগ্য হিম
অঞ্জলিবদ্ধ হাতে আমি নিকটে গেলেই কেন
বৃক্ষের দয়া মুছে যায়—
সাঁইতিরিশ বছর অব্দি কেন, এইসব কেন?
আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।
তবুও রক্তের গন্ধক কেন ভিজে থাকে ঘামে
কেন ভেতরের বাঘের বাচ্চারা
গাধার পোশাকে ঘাস খায়!
সাঁইতিরিশ বছর অব্দি কেন, এইসব কেন?
আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

এমন হৃদয় রাখা ॥

অমিয়কুমার হাটি

এখনো পারি না কেন? সমর্পণ এত কি কঠিন?
সমস্ত প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষায় গুনি কত কাল?
এত কি দুর্জয় বাধা? কেন খুঁজি, কবিতা, আড়াল?
সহস্র বিজলী মালা রক্তে আনে অসামান্য দিন।

একাকী পাঁজরে ফেরা ভীরুতার নয় পরিচয়?
কেন যে নিষ্ঠুর হই! হাসিরাশি যখন মুখর,
ক্রন্দন মন্থন করি তখনি যে! কোন তীক্ষ্ণ শর
এখনো পারিনি টেনে ফেলে দিতে? দুর্বল হৃদয়!

এমন হৃদয় রাখা ঝকমারিই। বিষম বিভুজ।
অশান্ত, উন্মেল সে যে, অর্বাচীন অবোধ অবুঝ।।

গোয়েন্দা ধাঁধা

কুরুক্ষেত্র ॥ প্রতুল লাহিড়ী ॥

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

স্থান—নির্জন কক্ষ **কাল—রাত্রি**

(বিছানার ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম; মুখখানা চিন্তাচ্ছন্ন। কৃষ্ণ বসে অদূরে একখানা চেয়ারে। সেক্রেটারিয়েট টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্র।)

কৃষ্ণ : বেশ, তাহলে ধ্বংসই চলুক।

ভীষ্ম : পাঁচখানা তরবারির বিরুদ্ধে একশোটা তরবারি ঝলসে উঠবে...

কৃষ্ণ : এটা তরবারির যুদ্ধ হবে না, ঠাকুর্দা।

ভীষ্ম : তবে কিসের যুদ্ধ হবে?

কৃষ্ণ : এটা বিজ্ঞানের যুগ...

ভীষ্ম : (অসহ্য বিস্ময়ে) বিজ্ঞানের যুগ আবার কি হে? চার যুগের নামই ত জানি, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এটা আবার কিসের ফ্যাকড়া?

কৃষ্ণ : (হাসলেন) বিজ্ঞানের যুগের সঙ্গে কারুর চালাকি খাটবে না। খাপের তরবারি খাপেই থাকবে, হাতের লাঠি থাকবে হাতে, তীর-ধনু পিঠেই ঝুলবে, মাঝ থেকে যোদ্ধার অকস্মাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটবে, অর্থাৎ হাত দুটো উড়ে যাবে দক্ষিণে, পা দুটো উড়ে যাবে উত্তরে, ধড়টার কোনো অস্তিত্বই থাকবে না।

ভীষ্ম : কিন্তু তা কি করে সম্ভব?

কৃষ্ণ : (দৃঢ়কণ্ঠে) বুদ্ধি, ঠাকুর্দা, বুদ্ধি, স্রেফ কৃষ্ণের ক্ষুরধার বুদ্ধি...

ভীষ্ম : বুদ্ধিটা কি তোমার বৈজ্ঞানিক যুগেরই স্বধর্ম?

কৃষ্ণ : আমার বুদ্ধি আমারই স্বধর্ম, বৈজ্ঞানিক যুগের নয়। যুদ্ধের নামে লোক-ধ্বংসের জন্য বৈজ্ঞানিকরা সৃষ্টি করবে এরোপ্লেন, মাস্টার্ড গ্যাস, বিমান-বিধ্বংসী কামান, হাউইৎজার, শ্র্যাপনেল, ইউবোট আর আমি...

নাটকটা অজয়ের লেখা।

ধনঞ্জয় মিত্রের প্রথম পক্ষের ছেলে অজয়। বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্টের বাতিক আছে। এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে প্রাণীহত্যা করে জেল পর্যন্ত খেটেছে। দীর্ঘদিন স্বদেশ ছাড়া। বোম্বাইবাসী। রহস্যময় চরিত্র।

বৃদ্ধ ধনঞ্জয় মিত্র প্রথমে তাঁর দেড় কোটি টাকার সম্পত্তি এই অজয়ের নামেই উইল করেছিলেন। তারপর অজয়ের কীর্তিকাহিনী যৎকিঞ্চিৎ শুনেই উইল পাল্টানোর মনস্থ করলেন। অমনি তাঁর এটর্নী মাধবচরণ মারা গেলেন বিষপ্রয়োগে। কিন্তু কেউ ধরতে পারল না, বিষটা কি ধরনের, শরীরেই বা ঢুকল কি করে। অজয় তখন বোম্বাইতে।

মুলতুবী রইল উইল পাল্টানো। দিন কয়েক পরে এটর্নী সারদাচরণকে ডেকে পাঠালেন বৃদ্ধ ধনঞ্জয় মিত্র। সারদাচরণ মাধবচরণের ছেলে। বাপবেটা দুজনেই এটর্নী।

দ্বিতীয় পক্ষের দুই ছেলে বিজয় আর সুজয়কেও ডাকলেন ধনঞ্জয় মিত্র।

বিজয়কে ধমক দিয়ে বললেন ধনঞ্জয় মিত্র—তুমি যদি সেই অভিনেত্রীটিকে বিয়ে করার সংকল্প ত্যাগ কর, তবেই সম্পত্তি পাবে। নইলে—

'আপনার সম্পত্তি চাই না,' বিজয় বললে সোজাগলায়।

ঠিক এমনি সময়ে একটা চিঠি এল ভৃত্যের হাতে। খাম ছিঁড়ে পড়লেন ধনঞ্জয় মিত্র। জবাব লিখে তক্ষুনি দিলেন ভৃত্যকে —ডাকবাকসে ফেলে দেওয়ার জন্যে।

বিজয়কে বললেন—'গলাটা শুকিয়ে গেছে। সোডা আর গ্লাস দাও।'

গেলাসে সোডা ঢেলে দিল বিজয়। তার কয়েক মিনিট পরেই অপমৃত্যু ঘটল ধনঞ্জয় মিত্রের। শরীরে দেখা গেল বিষক্রিয়া।

গ্রেপ্তার হল বিজয়।

কিছুদিন পরেই বোম্বাই থেকে ফিরে এল অজয়।

কোর্টে দাঁড়িয়ে সে বললে—'বিজয় খুনী নয়। ওকে ছেড়ে দিন।'

ছাড়া পেল বিজয়। কিন্তু অজয় সুনজরে দেখল না তাকে। বরং চেষ্টা করল তার প্রেয়সী অরূপা দেবীকে ফুসলে আনার। এই সেই অভিনেত্রী যার জন্যে সম্পত্তিও ত্যাগ করতে চেয়েছিল বিজয়।

টাকার লোভে মেয়েরা সব পারে। অরূপা দেবীকেও একদিন দেখা গেল অজয়ের বাড়ীতে। অজয়ের নিমন্ত্রণ সে রেখেছে। অজয় নাটক লেখে। সেই নাটকের গান্ধারী রোলটা তাকেই করতে হবে। বাড়ীর মধ্যেই একখানা ঘরে বসবাস শুরু করে দিল অরূপা দেবী। মনোমালিন্য হয়ে গেল বিজয়ের সঙ্গে।

অজয় কিন্তু কল্পনাও করতে পারল না, নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নাড়ছে প্রতুল লাহিড়ী। সে-ই পাঠিয়েছে অরূপা দেবীকে, সরিয়েছে বিজয়কে মনে আঘাত দিয়ে।

এমন সময়ে একখানা চিঠি এল অজয়ের নামে। প্রতুল লাহিড়ী হস্তগত করল চিঠিখানা। লিখেছেন সারদাচরণ। শুধু দুটি শব্দ —"পঞ্চাশহাজারেও নয়।"

পরদিন সকালে দেশশুদ্ধ লোক জেনে গেল আর একটা অপমৃত্যুর চাঞ্চল্যকর সংবাদ। সারদাচরণও মারা গেছেন রহস্যজনকভাবে বিষপ্রয়োগে।

পুলিশ দপ্তরে খবর এল। অজয় টেলিফোন করে জানিয়েছে—সারদাচরণের মৃত্যুর আগে নাকি বিজয়কে সেখানেও দেখা গিয়েছে।

পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল বিজয়কে।

প্রতুল লাহিড়ী অরূপা দেবীকে পরামর্শ দিলে বিজয়কে নিয়ে গা-ঢাকা দিতে। কেদঘাটির এক কুঞ্জে ঘরে পালিয়ে গেল দুজনে। অজয়ের নাটকটা পড়বার জন্যে সঙ্গে করে নিয়ে গেল অরূপা দেবী।

নাট্যকার হওয়ার সখ তখন মাথায় উঠেছে অজয়ের। জেল পালানো একটি মেয়ে এসে উঠেছে তার বাড়ীতে। নাম তার উজ্জালী। বোম্বাইতে বিয়ে করেছিল। মারাত্মক একটা বিষের সন্ধান এই উজ্জালীর কাছেই সে জেনেছিল। বিষটা আসে একটা ফুল থেকে। ফুলটার নাম টামুই...

অরূপা দেবীকে অজয় বিয়ে করতে চায় জানতে পেরে বাঘিনী মূর্তি ধারণ করল উজ্জালী। অজয়ের কুকীর্তি সে ফাঁস করে দেবেই। মাধবচরণ ধনঞ্জয় মিত্র এবং সারদাচরণকে দূরে থেকেও খুন করার গুপ্ত রহস্য আর কেউ না জানলেও সে জানে...

কেদঘাটি থেকে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এল অরূপা দেবী। হাতে নাটকের পাণ্ডুলিপি। চোখ বড়বড়।

প্রতুলবাবু প্রতুলবাবু, খুনগুলো হচ্ছে কি করে ধরে ফেলেছি। বিষ...বিষ... ফুলের বিষ।

জানি। বলল প্রতুল। টামুই ফুলের বিষ। কিন্তু প্রয়োগ হচ্ছে কি করে? চিঠির মধ্যে দিয়ে বললে বিশু। অজয়ের বাড়ীতে ছদ্মবেশে হেঁসেল সামলেছে আদ্দিন। আড়ি পেতে সাংঘাতিক চক্রান্তটা শুনেছে সে। এক্ষুনি কেদঘাটিতে লোক পাঠাতে হবে। বিজয়কে চিঠি লিখেছে অজয়। সে চিঠির জবাব দিলেই মারা পড়বে বিজয়।

কিন্তু কিভাবে?

উজ্জালীকে বলল অজয়—চলো আমরা পালাই বোম্বাইতে। খতম করে যাই বিজয়কে। পুলিশ তাকে খুঁজছে খুনের অপরাধে। হঠাৎ মারা গেলে বুঝবে আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছে।

বলে মারাত্মক চিঠিখানা লিখে ফেলে দিয়ে এল ডাক বাক্সে।

ফিরে এসে গুলি করল উজ্জালীকে।

পুলিশ এসে দেখল বিষ খেয়েছে অজয়। টামুই ফুলের বিষ। মারা গেল বিশ মিনিট পরে।

অরূপা দেবীর হাত থেকে নাটকের পাণ্ডুলিপিটা টেনে নিয়ে পড়ল প্রতুল লাহিড়ী

কৃষ্ণ। আর আমি—আর আমি ধ্বংস করব বিপুল কৌরব কুল— সামান্য একখানা চিঠির সাহায্যে।

ভীষ্ম। চিঠির সাহায্যে!

কৃষ্ণ। হ্যাঁ। আমি লিখব যাকে লিখব সে জবাব দেবে—বাস। আয়োজনের কোনো ঘটা নেই আধ ঘণ্টার ভেতর মৃত্যু এসে ধীরে ধীরে গ্রাস করবে। কেউ জানবে না কেউ বুঝবে না ডাক্তারের বিশ্লেষণ শক্তি হবে পরাহত বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পরাজয়ের কালিমায় কালো হয়ে উঠবে।

ভীষ্ম। ব্যাপারটা বুঝিয়ে না বললে তোমার কথার একটা বর্ণও যে আমার মাথায় ঢুকছে না কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। মাথায় ঢুকবে না ঠাকুর্দা। ফুলে কীট আছে শুনেছেন তো? এ সেই ফুল আর এ-সেই কীট...

লাফিয়ে উঠে বললেন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর অনঙ্গমোহন—ব্যস ব্যস আর পড়তে হবে না বুঝেছি।

খাতা বন্ধ করে বলল প্রতুল লাহিড়ী— হ্যাঁ শুধু একখানা ডাক টিকিট!

কি বুঝলেন?

অদ্রীশ বর্ধন

(গোয়েন্দা ধাঁধার উত্তর ২৯ পাতায়)

যুবক যুবতী

পরিবহণ সমস্যা

আজকের দিনে পরিবহন এক মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিনই যাত্রীদের মুখে এক কথা—ট্রেণ নেই বাস নেই, ট্রাম নেই—কিছুই নিয়মিত চলছে না। প্রতিদিন অফিসযাত্রী আর স্কুল কলেজের ছেলে-মেয়েদের কি দুর্ভোগ! তার ওপর রয়েছে পথে নিরাপত্তার অভাব। অমুক জায়গায় বাস চাপা পড়ে মৃত্যু, লাইনের কাছে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ সব কিছু ছাড়িয়ে গিয়েছে গত উনত্রিশে জানুয়ারি উল্টো-ডাঙা স্টেশনের দুর্ঘটনায়। নিরপরাধ কর্ম-ক্লান্ত ঘরমুখো পাঁচ শতাধিক যাত্রীকে অনিবার্য মৃত্যু আর দুরবস্থার ঠেলে দিয়েছে—দার্জিলিং মেলের ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে থাকা হাবড়া লোকালকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে। মর্মান্তিক-ভয়াবহ দৃশ্য! চারদিকে চাপ চাপ রক্ত, আর্তনাদ গোঙানি কান্নার শব্দ। মাঝি-মাল্লারা যেমন নদীবক্ষে নিজেদের শেষ দিন গোনে তেমনি রেলযাত্রীরাও রেল লাইনেই তাদের মৃত্যুর ছায়া দেখছে। চারিদিকে শুধু অব্যবস্থা। ঘন্টার পর ঘন্টা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থেকেও ট্রেনের পাত্তা নেই। তারপর যদি বা একটা ট্রেন এলো তার অগে কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। বাসের বেলায়ও ঠিক তেমনি। নিয়মানুবর্তিতা-সময়নিষ্ঠা কথাগুলো যেন ক্রমে ক্রমে ডিকশেনারির পাতা থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

মালা বোস খড়দহের মেয়ে। বয়স আর কত হবে? মুখটা এখনো বেশ কচি। কলকাতার ভিকটোরিয়া কলেজে পড়ে। পরিবহণ সমস্যার সেও একজন শিকার। সময়মতো পৌঁছে ক্লাস করতে পারে না। সেদিন ট্রেনে গন্ডগোল—কোথায় কি তার চুরি গিয়েছে না কি যেন হয়েছে। ট্রেন আসছে না। চোখেমুখে তার প্রচন্ড উত্তেজনা। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি—এতো ছটফট করছ কেন? আমরা অফিসে যাব—দেরীতে গেলেই লাল ঢেরা পড়ে যাবে। কিন্তু কি করব বল—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব হজম করতে হবে।

—বারে আপনাদের তো বেশ মজা। একদিন অফিস গেলেন না ছুটি কাটা যাবে। আর আমি কলেজে না গেলে অনার্সের ক্লাসটা করতে পারব না।—কত ক্ষতি হবে বলুন। তাছাড়া আপনারা পয়সা রোজগার করেন বাসে গেলেই বা দোষ কি?

—রোজ রোজ বাসে যাওয়া সম্ভব—তুমিই বলো।

—তা সত্যি কথা, তাহলে আমরা সবাই নিরুপায়!

পাশে দাঁড়িয়েছিল ওরই এক বন্ধু সুদেষ্ণা রায়। এবার সে বলে উঠলো—আমরা চুপচাপ থাকলে চলবে না। আমাদের এ-বিষয়ে সোচ্চার না হলে কোন সমাধান নিজ থেকে আসবে না।

তাহলে তুমিই বলো আমাদের কি করণীয়—আমি প্রশ্ন করি।

—ট্রেন বাড়ানোর জন্য আমাদের দাবী করতে হবে। যেসব ট্রেন এখনো চালু অবস্থায় আছে তাদের ঠিকমতো সার্ভিসিং সরকারকে করতে হবে। প্রায়শই দেখা যায় ট্রেনে আলো নেই, মাঝপথে ট্রেন যেতে যেতে হঠাৎ থেমে গেল, তখন কেমন লাগে বলুন তো?

—কেন? জিজ্ঞাসা করি।

—অন্ধকারে ভিড় ট্রেনে মেয়েদের যাতায়াত করা কি অসুবিধাজনক। লেডিজ কম্পার্টমেন্টে উঠেও স্বস্তি নেই। সেখানে কিছু স্বার্থান্বেষী দুষ্টু ছেলে ওঠে। সুযোগমতো তারা কাজ হাসিলের চেষ্টায় থাকে। ছিনতাই করাও আশ্চর্য কিছু নয়।

—তাহলে?

এবার মালা দেবী আবার মুখ খুললে।—মেয়েদের নিরপত্তার জন্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা ঠিক ঠিক ভাড়া দেব আর সরকার কোন কিছু করবেন না—এ হতে পারে না।

ট্রেনের আর এক সহযাত্রী তরুণ ছাত্র দিলীপ হাজরা জানালেন—সময়মতো ট্রেন চললে যাতায়াতের এতো কষ্ট হয় না।

এবার জিজ্ঞাসা করি—ঠিকমতো ট্রেন না চলার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে আপনার মনে হয়?

—আপনি বাড়ী ফেরার সময়ে শেয়ালদহে প্রতিদিন মাইকে ঘোষণা শোনেনি—রেকের অভাবে ট্রেন বাতিল করা হল। ডাউন ট্রেন দেরীতে আসার জন্য আপ ট্রেন ছাড়তে দেরী হচ্ছে। এজন্য কারা দায়ী? নিশ্চয়ই রেল কর্তৃপক্ষ। তাঁদের প্রোটেকশন ফোর্স রয়েছে—পুলিশ রয়েছে অথচ দিন দিন চুরির মাত্রা বেড়েই যাচ্ছে। ট্রেনে আলো নেই—পাখা নেই সিট নেই, বাংক নেই—দরজা-জানলা কিছু নেই—সব কিছুই তাদের অতন্দ্র প্রহরার জন্য চোরেদের হাতে চলে গিয়েছে।

—এসব দূর করার জন্য আপনি কি সাজেশন দেবেন?

—প্রশাসন শক্ত হাতে চালাতে হবে। যে-কোন মূল্যে চুরি কর্তব্যে গাফিলতি বন্ধ করতে হবে। শিয়ালদহ সেকশন জুড়ে রেলে যে নৈরাজ্য চলছে তার জুড়ি নেই—কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়ে প্রশাসন চালালে জনগণের সহযোগিতা সব সময়ই পাওয়া যাবে।

সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি জানালেন—এজন্য যৌথভাবে সবাই দায়ী। রেলওয়ে মেনটেনান্স বিভাগ তাঁদের কর্তব্য করেননি—কেবিনের সিগন্যালম্যান গণ্ডগোল করেছেন—সর্বোপরি ড্রাইভার-ফায়ারম্যান অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছেন। সবার অপদার্থতা-গাফিলতির বলি হয়েছে সাধারণ যাত্রীরা। কর্তৃপক্ষের ভুলের মাশুল আমরা কেন দেব বলুন তো? —এ-বিষয়ে আমাদের প্রতিবাদ জানাতে হবে।

পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন বেলঘরিয়ার মিণ্টু ঘোষ। তিনি বলে উঠলেন—প্রতিবাদ জানানোর লোক আছে? আমরা সব ভেড়া হয়ে গিয়েছি। আর এক সহযাত্রী জয়দেব কুণ্ড ফোড়ন কেটে বলে উঠলেন—ভয় নেই, ভয় নেই পাতাল রেল হলেই আপনাদের সব কষ্ট দূরে হয়ে যাবে। এদিক-ওদিক করলেই একেবারে জ্যান্ত কবর।

এ তো গেল ট্রেনযাত্রীদের অসুবিধার কথা। বনগাঁ বারাসতের লোকদের তো অবর্ণনীয় কষ্ট। সিঙ্গল লাইনে ট্রেন চলে। অসংখ্য যাত্রী—ট্রেন নেই, এতো কষ্ট করে কলকাতা পৌঁছেও স্বস্তি নেই। ট্রাম-বাসের একই হাল। অন্যদিকে কলকাতায় রাস্তার যা হাল, সেখানে ভালভাবে বাস-ট্রাম চালানোও আর এক সমস্যা। সবকিছুর পেছনে একই সমস্যা—আমরা যাত্রীর সংখ্যায় অনেক আর আমাদের যারা পরিবহণ করবে তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম। প্রাইভেট বাস-মালিকরা নানা অজুহাতে বেশী পরিমাণে বাস চালাচ্ছেন না। তেলের দাম বেশী, পার্টসের দাম বেশী ভাড়া না বাড়ালে বাস চালাতে পারব না কত বাহানা তাদের, অথচ তাদের লাভের অঙ্ক কখনো কমাতে যায় না। অন্যদিকে স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের অবস্থাও কাহিল। পরিবহণ সংস্থার এক কর্মী শ্রীঅমল দাসের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হল।

অমল দাস

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা অমলবাবু বেসরকারী সংস্থায় লাভ হয় আর আপনাদের এতো লোকসান কেন?

—আমি একজন সাধারণ কর্মী। তবে আমার যেটুকু মনে হয় ওপরতলার বড় ধরনের চুরিগুলো বন্ধ না করলে লোকসান কমবে না।

আমি পাল্টা প্রশ্ন করি—কেন কর্মীদের কোন দোষ নেই— জাল টিকিট বিক্রী—টিকিট বিক্রীতে কারচুপি?

—আমাদের নিজেদের ছোটখাটো দোষ-ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে। এসব অসৎ কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক আপত্তি নেই। তবে যেখানে পুকুর চুরি হচ্ছে, অব্যবস্থার চূড়ান্ত চলছে সেখানে হাত না পড়লে কিছুই হবে না।

—স্টেট বাসের সংখ্যা দিন দিন এতো কমছে কেন?

—সেকেলে যন্ত্রপাতি মেনটেনান্সের অভাব, অকেজো খারাপ বাস সারা হচ্ছে না।

—স্টেট বাসের সার্ভিস আরো ভালো করা যায় কি করে? আপনার কি অভিমত।

—দেখুন আমরা সাধারণ কর্মীরা নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যথাসাধ্য তৎপরতার সঙ্গে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করি। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত প্রশাসন ঠিকমতো না চললে এর উন্নতি হবে না।

—আচ্ছা অমলবাবু, এর পরিচালনায় যদি আপনাদের ভূমিকা স্বীকার করে আপনাদের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকে তাহলে কি আরো উন্নতির আশা আছে?

—এর পরিচালনায় শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি নিলে হয়তো অবস্থার হেরফের হতে পারে। তাছাড়া শ্রমিকদের ন্যায়সংগত ন্যূনতম কতকগুলো দাবী মেনে নিলেও মনে হয় সেবার মনোভাব আরো বৃদ্ধি পাবে। তবে বাসের সংখ্যা বাড়ানো সেগুলো ঠিকমতো চলার উপযোগী তৈরী করা এসব কিন্তু কর্তৃপক্ষের পুরো দায়িত্ব। আপনারাই বলুন আমাদের কি ইচ্ছে করে আমাদের মা বোন-ভাইদের এরকম ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে?

—কেন আপনারা কর্তৃপক্ষকে এসব বিষয়ে চাপ দেন না? কথা বলছেন।

—নিশ্চয়ই আমদের ইউনিয়ন সবসময়ই যাত্রীস্বার্থের জন্য সব বিষয়ে কথা বলছেন।

টেলিফোন একসচেঞ্জের মহিলা কর্মী সোনা সমাদ্দার জানালেন মহিলা ট্রামের মতো কিছু মহিলা বাস করা দরকার। এতে ছোট ছেলেমেয়েরাও স্কুলে যেতে পারবে।

—এরকম আলাদা ব্যবস্থা করলে নিশ্চয়ই ভাল হয়। তবে...

—কিছু 'তবে' নেই। মেয়েদের সিটের সামনে ভীড়গুলো দেখেছেন? মেয়েদের সিটের কাছে কি মধু আছে এরাই জানে। ভীড়ের বাসে মেয়েদের তো উঠতেই দিতে চায় না কেউ।

অমর দাস

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

চিঠি লিখে খামে মুড়ে ডাক টিকিট লাগানোর সময়ে শতকরা নিরানব্বইজন মানুষ জিভের ডগায় ডাকটিকিট বুলিয়ে নেন—হাতের কাছে জল বা জলশোষক স্পঞ্জ থাকে না বলে।

অজয় ডাকটিকিটের পেছনে টাম্‌ই ফুলের বিষ মাখিয়ে রাখত। যাকে খুন করতে হবে তাকে চিঠি লিখে জবাব চাইত এবং ঝটিতি জবা পাওয়ার আশায় নিজের ঠিকানা লেখা একটা খাম আর বিষ মাখানো ডাকটিকিট সঙ্গে দিত।

ধনঞ্জয় মিত্র উইল পালটাবেন শুনেই মাধবচরণকে সরিয়ে দিয়েছিল এইভাবেই—হাতে খানিকটা সময় নেওয়ার মতলবে। তারপরেই একই কায়দায় চিঠি লিখল ধনঞ্জয় মিত্রকে। উইল পালটাবার জন্যে তিনি সবাইকে ডাকলেন এবং সবার সামনেই সেই চিঠির জবাব দিয়ে বিদায় নিলেন ধরাধাম থেকে।

মারা গেলেন সারদাচরণ একই পন্থায়। তিনি বোধহয় কিছুটা আঁচ করেছিলেন। অজয় তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল। ওটা আছিলা। উদ্দেশ্য জবাব নেওয়া। 'পঞ্চাশহাজারেও নয়'—লিখে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়লেন ভদ্রলোক।

এই হল কুকের বৈজ্ঞানিক কুরুক্ষেত্র।

চিঠিপত্র

বিবাহ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

গত ২৪ জানুয়ারী ১৯৭৫ তারিখের সাপ্তাহিক অমৃতে যুবক-যুবতী বিভাগে অমর দাশ মহাশয়ের বিবাহ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আলোচনাটি পড়লাম। আলোচনাটি নিঃসন্দেহে মুখরোচক কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়। অর্থাৎ গভীরতাহীন। অর্থাৎ আলোচনাটিতে বর্তমান বিবাহ ব্যবস্থায় সঠিক সমস্যার উল্লেখ ও তার সমাধানের কোন ইংগিত নেই। তবুও সমসাময়িক পটে কিছু প্রাসঙ্গিক ও যৌক্তিক তথ্যপূর্ণ বক্তব্যের অবতারণা করবার প্রয়াসী।

(এক)—বর্তমান বিবাহ ব্যবস্থা সমাজের প্রতিটি যুবক-যুবতী ও অভিভাবকদের কাছে একটা ভীতিস্বরূপ। এর কারণ পণ প্রথা। বিয়ের হাতে পণ মোটাতে অধিকাংশ (শতকরা ৮০ ভাগ) পরিবারের মেয়ের অভিভাবক ছাড়াও যুবক দাদা ভাই বা যুবতী দিদি বোনকে সর্বস্ব দিতে হয়। (অনেক নিম্নশ্রেণী বা আদিবাসী উপজাতির মধ্যে ছেলের অভিভাবক বা যুবক দাদা ভাই বা যুবতী দিদি বোনকে মেয়ের অভিভাবকদের পণ বা যৌতুক দিতে সর্বস্বান্ত হতে হয়।) অথচ প্রাচীনকালের বাল্য বিবাহ প্রথম বহু বিবাহ প্রথা, সমাজে বিধবার প্রতি অত্যাচার গোষ্ঠীগত চিন্তা ইত্যাদি আজ প্রায় (বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া) অবলুপ্তির পথে। কিন্তু প্রাচীনকালের এই পণ প্রথা আজও বিলুপ্ত না হয়ে সমাজের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রকটভাবে দেখা দিচ্ছে কেন? অনেকেই বলবেন আজকের সমাজে রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মত মহান ব্যক্তির বড়ই অভাব। কিন্তু কথাটি কি সম্পূর্ণ ঠিক—আমার মনে হয় না। একদিন বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে জীবনপণ আন্দোলন চালিয়েছিলেন। বহু মনস্বীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন। অনেকের সমর্থনও যে তিনি পাননি তাও নয়। তবুও তিনি কি বহু বিবাহ প্রথার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটাতে পেরেছিলেন? অবশ্যই এই বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর সরকারী আইন প্রয়োগ করতে হয়েছিল। অথচ আজ এই পণ প্রথার বিরুদ্ধে সরকারী আইন খড়্গ হস্ত হচ্ছে না কেন? জনমত যতই উগ্র হোক জনমত যতই চেতনাসম্পন্ন হোক যতক্ষণ না সরকারী আইনে পণ প্রথা অতীব দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই পণপ্রথামূলক বিবাহ ব্যবস্থা সমাজে অভিশাপ হয়ে বেঁচে থাকবে। শুধু তাই নয় এই পণপ্রথামূলক বিবাহ ব্যবস্থা একদিন সমাজের টুঁটিটাকে চেপে ধরবে এবং সেদিন আর কেউ বাঁচার পথ পাবে না। যারা পণ দিতে সক্ষম তারাও নয়। যারা বিবাহের অন্য পথ বেছে নিচ্ছে তারাও দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে পারবে না। কারণ এই পণপ্রথা উৎকোচ প্রথার মত ছদ্মবেশে সমাজের ভিতটাকে নড়বড়ে করে দেবে।

(দুই)—বর্তমান বিবাহ ব্যবস্থা সমাজের প্রতিটি যুবক-যুবতী বা অভিভাবকদের কাছে ভীতিস্বরূপ। এর কারণ জাতিভেদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বিবাহ প্রথা। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা প্রচার করে আসছেন যে, ব্রাহ্মণ প্রধানত সত্ত্বগুণের অধিকারী, ক্ষত্রিয় রজগুণের অধিকারী এবং বৈশ্য শূদ্র ও অস্পৃশ্যেরা (মুচি মেথর ডোম হাড়ি কাওরা ইত্যাদি) তমোগুণের অধিকারী। এই চারিত্রিক বিভেদ ধারণাকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজজীবনে যে ভ্রান্ত মূল্যবোধের মাপকাঠি সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান কালেও তা যে শুধু বহাল-তবিয়তে বিরাজ করছে তাই নয় এই ভ্রান্ত মূল্যবোধের উপর ভর করে সমাজের কিছু সংখ্যক বিত্তবান ও উঁচু শ্রেণীর মানুষ আজও সমাজের বহু সংখ্যক (অল্প শিক্ষিত অশিক্ষিত ও দরিদ্র) মানুষকে প্রতি পদে শোষিত ও লাঞ্ছিত করছে। আর এই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দু সমাজে জাতিভেদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বিবাহ প্রথা পবিত্রতায় (শাস্ত্রকারদের মতানুযায়ী) নামে আজও অনিবার্য জৈবিক অবক্ষয়ের পথে টেনে নিয়ে চলেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলছি—যখন কোন ব্রাহ্মণ পাত্র ও কায়স্থ পাত্রী নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনের সান্নিধ্যে আসে, যখন দরিদ্র কায়স্থ পিতা অর্থের প্রয়োজনেই বা মাহিষ্য মেয়ের বিভিন্ন সৎ-গুণে প্রীত হয়ে নিজের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে রাজী হয় তখন তাদের প্রত্যেককেই (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই) সমাজের কাছে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে, নিজেদের মনের কাছে, প্রচণ্ডভাবে জবাবদিহি করতে হয়। অথচ এই অন্তঃসারশূন্য জবাবদিহির কোন সঙ্গত কারণ না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহোত্তর কালে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাত্র-পাত্রী বাবা-মার স্নেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। শ্বশুর-শাশুড়ী সমাজে একঘরে হয়ে যায়। অনেক সময় বিবাহের পরেই পাত্র-পাত্রী আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। অবশ্যই এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সামগ্রিক জন-চেতনা ও জন-জাগরণ বিশেষভাবে দরকার। কিন্তু আমরা একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই দেখব অধিকাংশ জন-চেতনা ও জন-জাগরণ ক্ষণিকের জন্য। (এই প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তব্যের সারমর্ম তুলে ধরছি—একদিন সারা দেশে পণ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দিল। দেশব্যাপী যুবকেরা প্রতিজ্ঞা করল তারা কোন পণ নেবে না। অবশ্য পরবর্তী ক্ষেত্রে বিয়ের পিঁড়েতে বসে এরাই আবার পণ নিল।) আসলে এর জন্য প্রয়োজন কঠোর সরকারী আইন যা সমাজজীবনে আমূল পরিবর্তন আনতে পারবে।
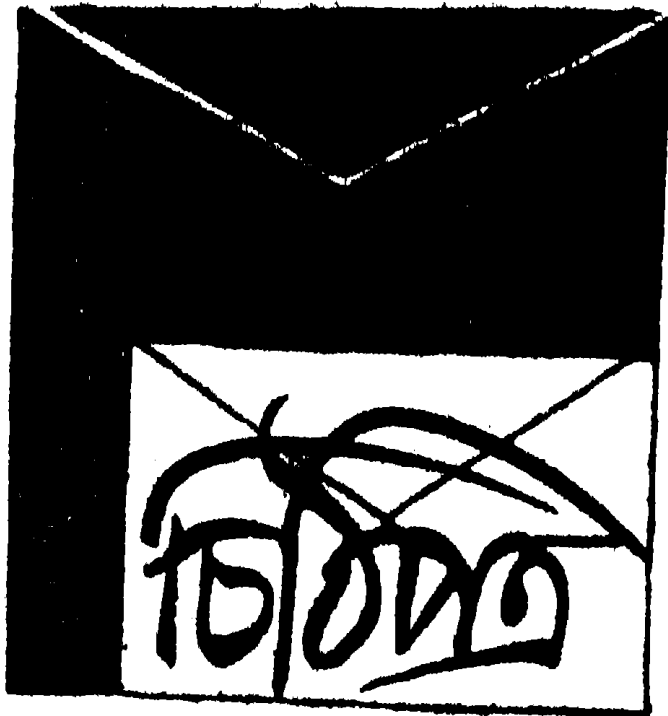
(তিন)—বর্তমান বিবাহ ব্যবস্থা সমাজের প্রতিটি যুবক-যুবতী ও অভিভাবকদের কাছে একটা ভীতিস্বরূপ। তার কারণ—আর্থিক স্বাবলম্বনের ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি সরকারী অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার। স্বাধীনতার ছাব্বিশ বৎসর পরেও দেশে আর্থিক ক্ষেত্রে মেয়েদের স্বাবলম্বনের হার তুলনামূলকভাবে খুবই হতাশাজনক। প্রথমেই শহরের কথা তুলে ধরছি। পাশ্চাত্য দেশের শহর অঞ্চলগুলিতে চাকুরী ও অন্যান্য অর্থ উপায়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের ভীড় লক্ষ্য করবার মত, অথচ কলকাতার ক্ষেত্রে তার এক-চতুর্থাংশও চোখে পড়বে না। আমাদের দেশে আজও বহু ইঞ্জিনীয়ারিং ও শ্রমবহুল শিল্পে মেয়েদের অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছে। অথচ এই বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের কোন মানুষই একে বরদাস্ত করবেন বলে মনে হয় না। এবার গ্রামের কথা বলছি। গ্রামে কৃষিক্ষেত্রে দেখা যায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মজুরী কম। কিন্তু মেয়েরাও পরিশ্রমে যে ছেলেদের তুলনায় কিছুই কমতি নয় এ প্রমাণ প্রতিটি কৃষক পরিবারে, আদিবাসী অঞ্চলে সুন্দরবনে চা-বাগানে, কোলিয়ারীতে মেদিনীপুরে ও পুরুলিয়ায় সাঁওতাল পল্লীগুলোতে ঘুরলেই বোঝা যায়। তাহলে? —মোদ্দা কথা আজও সমাজে কুসংস্কার কাজ করে যাচ্ছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে শাস্ত্রকারেরা ভাবতেন মেয়েরা শ্রমকাতর, বিলাসী ও পুরুষের ভোগ্যবস্তু। এবং তাঁদের এই ভাবনা আজও সমাজের বুকে (বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া) মহাদাপটের সঙ্গে বজায় রয়েছে। ফলস্বরূপ মধ্যযুগীয় এই ভ্রান্ত ধারণায় শিকার হচ্ছে বর্তমান যুগের অগণিত যুবতী মেয়েরা ও তাদের অভিভাবকেরা। যে কোন বাস্তবনিষ্ঠ চিন্তাবিদ ব্যক্তি নির্দ্বিধায় নিশ্চিতভাবেই বলবেন—বর্তমান বিবাহ ব্যবস্থার দোষগুলো (পণ প্রথা জাতিভেদ প্রথা) মেয়েদের আর্থিক স্বাবলম্বনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং সরকার এবং সমাজের উচিত এই মুহূর্তেই আর্থিক স্বাবলম্বনের ক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রাধিকার দেওয়া। এবং তাহলেই

দেখা যাবে—কালো মেয়ের বিয়ের জন্য অভিভাবককে বা তার যুবক দাদা, ভাই বা তার যুবতী দিদি বোনকে ভাবতে হবে না। অথবা ফর্সা মেয়েকে নিয়েও পাত্রপক্ষে আগ্রহ থাকবে কম। তখন থাকবে দক্ষতা বা সৎ-গুণের চাহিদা।

কল্লোল সরকার,
সম্পাদক ঝংকার,
খেলাপোতা, ২৪ পরগণা।

যুবক-যুবতী
লেখকের উত্তর

'অমৃতে' প্রকাশিত যুবক-যুবতী ফিচারের বিভিন্ন আলোচনার ওপর বিভিন্ন পাঠকের নানা মতামত চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে। অমৃত যে দিন দিন পাঠকমহলে সমাদৃত হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট প্রতিফলন এই চিঠিপত্রগুলো। বিশেষ করে 'যুবক-যুবতী' ফিচার আপনাদের ভাল লেগেছে এবং ভাল লাগছে জানতে পেরে আনন্দিত হয়েছি। সচেতন পাঠক বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছেন এজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এবার পাঠকদের দু' একটা চিঠিপত্রের প্রসঙ্গে আসা যাক। 'ঝংকার' সম্পাদক মাননীয় কল্লোল সরকার মহাশয় আমার 'নেশা ও মাদকতা' আলোচনা প্রসঙ্গে দু একটি প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কাছে কলকাতার অবসরবিনোদনের জায়গাগুলোর সঙ্গে 'কৃষ্ণসাগরের বালুকাবেলার' তুলনা অর্থহীন মনে হয়েছে। স্বাভাবিক কথা। তবে এ তুলনা আবার অনেকের কাছে ভালোও লেগেছে। এসব জায়গায় স্বেচ্ছায় হৃদয় অভিসারের কত সুযোগ আছে বৈকি? বাঁধভাঙ্গা হাজার হাজার তরুণ এই কল্পিত সাগরের বুকে সাঁত্যে আছড়ে পড়ে না তবে যারা পড়ে তারা আমাদের সমগোত্রীয় তরুণ-তরুণী। দ্বিতীয় প্রশ্নে তিনি অনিল হাজরা, অধ্যাপক শ্রীমজুমদার প্রভৃতির প্রতি দোষারোপ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতায় নেশা ও মাদকতার কুফলের উদাহরণ দিয়েছেন। এসব তো সবার জানা, তাহলেও এসব ঘটছে। সাট্টা, জুয়া, মদ গাঁজা প্রেমের বিকৃতি, যৌন উপভোগ চলছে না কি? তারা তো আমাদেরই সমাজের এক অংশ। তৃতীয় প্রশ্নে তিনি ডাঃ সাহার বক্তব্যে অসত্য সন্ধান করেছেন। সাধারণ ঘরের ছেলেরাও আজ নেশা ও মাদকতার বলি, এতে এতটুকু মিথ্যা নেই। পাড়ায় রাস্তাঘাটে চোখ খুললেই দেখা যায়, তবে কমবেশী এই যা। চতুর্থ প্রশ্নে 'কল্পলয়'কে হিন্দী ফিল্মের নায়ক মনে হলেও কিছু করার নেই এটা বাস্তবিক সত্য। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিটিও উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাছে নেশাসক্ত যুবক-যুবতীর সংখ্যা নগণ্য মনে হয়েছে। ভাতও রুটির সমস্যা আমাদের মৌলিক সমস্যা কিন্তু গরীব স্কুলের ছেলেকে যখন সাট্টায় নম্বর লাগাতে দেখি, রিকসাচালককে মদ খেতে দেখি তখন অন্য কথা মনে পড়ে যায়। নেশা ও মাদকপ্রবণতার পেছনে আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক বিবিধ কারণ লুকিয়ে আছে। সবদিক থেকে একসঙ্গে না এগোলে এসব প্রবণতা বাড়বে ছাড়া কমবে না। 'বাংলা নাটক ও সাহিত্য' আলোচনা প্রসঙ্গে কার্তিক ঘোষ মহাশয় আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন আমি সব আলোচনাতেই 'সেকস' এর প্রসঙ্গ আনি। প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে সাহিত্যে চলচ্চিত্রে নাটকে পোশাকে-আষাকে সেক্স প্রবণতা বাড়ছে। এসব নিয়ে যুবক-যুবতীদের চিন্তাধারার প্রকাশ আমার মনে হয় যথার্থ এবং সময়োপযোগী। কিন্তু সেক্স নিয়ে বাড়াবাড়ি কখনোই করিনি। জনৈক পত্রলেখক আমার সাক্ষাৎকারের গন্ডীটাকে নদীয়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে আরো বিস্তৃত করতে বলেছেন। আমি এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক আছি এবং অদূর ভবিষ্যতে হুগলী মেদিনীপুর, বীরভূম, হাওড়া প্রভৃতি জেলার যুবক-যুবতীদের সাক্ষাৎকার আপনাদের উপহার দিতে পারব বলে আশা রাখি। উপসংহারে মাননীয় অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য (বিরাটি) মহাশয়ের চিঠির আলোচনায় আসছি। তিনি 'ক্রিকেট' প্রসঙ্গে শ্লেষাত্মক চিঠি লিখেছেন। অনেক সময় অর্থের অপচয়—কত কি না জড়িয়ে আছে ক্রিকেটের সঙ্গে। ক্রিকেট বড়লোকের খেলা—গরীব দেশে এসব মানায় না। কিন্তু আমাদের দেশের তরুণদের ক্রিকেট প্রীতি যেভাবে গড়ে উঠেছে সেখানে এভাবে এটাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তাহলে বিকল্প চিন্তা করে তাদের অন্যান্য সুযোগ বাড়িয়ে দিতে হবে। আপামর যুবক-যুবতীদের মনের কথা প্রকাশ করে যুবচেতনার উপলব্ধিতে যদি কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারি এবং আমার প্রয়াস যদি আপনাদের ভালো লাগে তবে নিজেকে ধন্য মনে করব। আমার অপূর্ণতা অজ্ঞানতা আপনাদের গঠনমূলক আলোচনায় প্রকাশিত হয়ে প্রকৃষ্ট যুবমানস গড়ে উঠবে এটাই একান্ত কাম্য।

অমর দাস,
কলকাতা।

পণ-প্রথা

অমৃতের 'যুবক-যুবতী' ফিচারে সম্প্রতি বিবাহ-ব্যবস্থা সম্পর্কিত শ্রীদাসের সাক্ষাৎকারটি পড়ে আমার নিজস্ব কিছু বক্তব্য চিঠি-পত্র বিভাগে প্রকাশের জন্য উপস্থাপিত করছি।

শ্রীদাসের জনৈক বন্ধু (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) পণপ্রথা পুরুষের রিওয়ার্ড হিসাবে অধিকারগত প্রাপ্য বলে দাবী জানিয়েছেন। ভদ্রলোকের এই রিওয়ার্ড প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বিংশ শতাব্দীতে কাওয়ার্ডের মতই কাঙালপনা বলে মনে হয়। যে পিতামাতা একটি ছেলেকে তৈরী করতে পঞ্চাশ হাজার টাকা (আনুমানিক) খরচ করেছেন তাঁরা ছেলের বিয়েতে পঞ্চাশ হাজার টাকার যৌতুক দাবী করবেন এবং ছেলের রোজগার আমৃত্যু ভোগ করবেন? কিন্তু যে পিতামাতা একটি মেয়েকে জীবনে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পঞ্চাশ হাজার টাকা (আনুমানিক) খরচা করেছেন, সেই কন্যাপক্ষের দাবী কি হবে? শ্রীদাসের বন্ধুর মতে যৌতুক ছেলের প্রাপ্য। তবে মেয়ের প্রাপ্য কি? হয়তো সেই মেয়েটি বিবাহিতা জীবনেরও তার লব্ধ শিক্ষার বিনিময়ে অর্থোপার্জন করে স্বামীকে জীবনযাপনে আরও সচ্ছলতা এনে দিতে পারবে। অপরপক্ষে মেয়ের বাবা শুধু মেয়েকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জনাই খরচা করবেন। মেয়ের বিয়েতে জামাইকে রিওয়ার্ড দিতে ফকির হবেন। অথচ মেয়ের উপার্জনের হকদার হওয়ার কোন অধিকারই থাকবে না তাঁর। তবে কোন স্বামীদেবতার দয়া-দাক্ষিণ্য থাকলে মেয়ে হয়তো বড়জোর কিছু মুষ্টি-ভিক্ষা দিতে পারে, এইটুকুই কি পুরুষের শেষ কর্তব্য নাকি উদারতার পরম পরিচয়! উক্ত ভদ্রলোকের আরেকটি চমকপ্রদ মতামত, এই 'রিওয়ার্ডের' টাকা ছিনিয়ে নিতে পারলেই নাকি দেশের ধনবৈষম্য দূর হবে! হয়তো তাই। গরীব কন্যার পিতাকে ভিখিরী বানিয়েই তো দেশের ধনবৈষম্য দূর হতে পারবে। কেননা পণপ্রথা ধনীর ক্ষেত্রে বিলাস বা রিওয়ার্ড হলেও মধ্যবিত্ত সংসারে জুলুমেরই নামান্তর মাত্র। তবে আমি এমন কথা বলতে চাই না যে সব পুরুষই শ্রীদাসের সেই বন্ধুটির মতাদর্শী। বহু ব্যতিক্রম না হলে বরং বলতে পারি আজকের যুগে ঐ ভদ্রলোকের মত চিন্তাধারা ক্রমশই পুরুষ সমাজে অবলুপ্ত হচ্ছে। এটা নারীজাতির পক্ষে আশার কথা। /

এইসঙ্গে আমি সমগ্র নারীজাতিকে নিজেদের মর্যাদা, অধিকার ও স্থান সম্পর্কে আরও সচেতন হতে অনুরোধ জানাব। কেননা লিব-আন্দোলন নিয়ে আমরা যতই মাথা ঘামাই না কেন তাতে আমাদের সচেতন আন্তরিকতার এখনও যথেষ্ট অভাব আছে। কন্যাপক্ষ উপযুক্ত পণ দিতে না পারায় বিয়ের পিঁড়ি থেকে পাত্রকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অজস্র ঘটনা শোনা যায়। এমন কি এই বিংশ শতাব্দীতেও পাত্রপক্ষের দাবী মেটাতে না পেরে বহু কন্যার পিতাকে হতাশা আর অসহায়তার মধ্যে জীবন কাটাতে হয়—এমন ঘটনা বিরল নয়। কিন্তু এই প্রথার সোচ্চার প্রতিবাদ কেন মেয়েদের তরফ থেকেই আসে না? পণপ্রথার প্রতিবাদ জানিয়ে কোন মেয়েই কি কখনও বিয়ের আসর থেকে বেরিয়ে গেছে? এত সভ্য শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিপরায়ণ হয়ে আজও কি আমরা এইটুকু প্রতিবাদ জানাবার মতো উপযুক্ত হই নি? বিয়েই কি নারীজীবনের একমাত্র সার্থকতা? যেখানে যৌতুকের নিক্তিতে মেয়ের মূল্য নির্ধারিত হয়, সেই বেচাকেনার বিয়ে কি সত্যিকারের মাধুর্য নিয়ে মানুষের জীবনে আসতে পারে? শ্রীদাস এক জায়গায় বলেছেন 'কালো মেয়ের বিয়ে হওয়া সত্যিই কঠিন এক সমস্যা।' এই একটিমাত্র উক্তি নারীজাতির সমস্ত ব্যর্থতা ও গ্লানিকে যেন ভীষণ নগ্নভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে। যে যুগের মেয়েরাও বৈজ্ঞানিক উন্নতির চরম শিখরে সেই যুগেই এ কি নিদারুণ মানসিক অসহায়তা! বিশ্বের চরম অবহেলিত নারী সংখ্যা সম্ভবত ভারতবর্ষেই সবচেয়ে বেশী। এজন্য দায়ী আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন সামাজিক প্রথানিষেধ। এইসব অনুন্নত পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে পড়ে আমাদের নিজেদেরই মানসিক অধোগতি ঘটছে। সুবিধাবাদী সমাজপতিদের স্বার্থান্ধতার চরিতার্থতা হেতু যে সামাজিক বিধি-নিষেধ এতকাল নারীসমাজকে পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখতে সহযোগিতা করে এসেছে, আজ নারীসমাজ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হয়ে তাকে অনেকাংশেই সমাজের বুক থেকে উপড়ে ফেলতে পেরেছে। কিন্তু যতদিন নারীজাতি নিজের উদ্দেশ্য স্থান ও মর্যাদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হতে না পারবে, ততদিন এই পণপ্রথা কালো মেয়ের বিবাহ-সমস্যা বয়স্থা মেয়ে নিয়ে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তা ইত্যাদির অবসান হবে না।

লিব-আন্দোলন কথাটা শুনতে বেশ গালভরা। কিন্তু একে সার্থকভাবে বাস্তবায়িত করতে হলে আমাদের লিব-ফ্যাশান মুক্ত হয়ে মানসিক দিক দিয়ে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে তৈরী করে নিয়ে সামাজিক অধিকার আদায় করতে হবে। তাই বলে এই নয় যে, সামাজিক অধিকার পেতে হলে স্বেচ্ছাচারিতার জুলুম চালাতে হবে। ক্ষেত্র এমনভাবে তৈরী করতে হবে যে আমাদের নিজেদের প্রাপ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এসে পড়বে। নারী-স্বাধীনতা বলতে পুরুষকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলা নয়। পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদায় তালে তাল ফেলে চলতে পারা। পুরুষ ও নারী পরস্পরের পরিপূরক হিসাবেই পরস্পরকে এগিয়ে চলতে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। একে অপরকে টেক্কা দিয়ে বা দাবিয়ে রেখে এগিয়ে যেতে পারা সম্ভব নয়।

—এলা রায়,
ভেহিকেল এস্টেট
জব্বলপুর।

একটি পত্রিকা প্রসঙ্গে

কদিন আগে দোকান থেকে কয়েকটা বই কিনেছি। একটা বই সম্পর্কে কিছু বক্তব্য আছে। নাম ঃ 'চলচ্চিত্র'। পত্রিকা হিসেবে বেরিয়েছিল ১৩৫৭ সালের আশ্বিন মাসে। (সেপ্টেম্বর-অকটোবর ১৯৫০)। শিল্পী গুণী দর্শক চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী সকলেই সামাজিক ও শিল্পিক শক্তি হিসাবে চলচ্চিত্রের গুরুত্ব আর তার সম্ভাবনার প্রতি অবহিত করে দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির পথ সুগম করাই সম্পাদকমণ্ডলীর অভিপ্রায় ছিল। সকলেই জানি, এদেশে যথার্থ চলচ্চিত্র আলোচনা ও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সূচনা করেন সত্যজিৎ রায় আর চিদানন্দ দাশগুপ্ত ১৯৪৭ সালের ৫ অকটোবর কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ঠিক তিন বছর বাদে তাঁরা এই পরিচ্ছন্ন মনোগ্রাহী সিরিয়াস অথচ সরস পত্রিকাটি বের করেন। পূর্বোক্ত দুজন ছাড়া সম্পাদকমণ্ডলীর আরো চারজন সদস্য ছিলেন ঃ কমল মজুমদার, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, সুভাষ সেন, নরেশ গুহ। ঘোষণা ছিল, চলচ্চিত্র পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা হবে। আমি যতদূর জানি, আর বেরোয় নি (কেউ নির্ভুল তথ্য জানালে বাধিত হবো)। কারণটা সহজেই অনুমেয়। একটা সংখ্যা বিক্রি করতেই যদি পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় লাগে তাহলে কোন্ ভরসায় নিয়মিত প্রকাশ সম্ভব?

পঁচিশ বছরে সিনেমা সম্পর্কে শিক্ষিত লোকের মানসিকতার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কলকাতায় এখন ফিল্ম সোসাইটির সংখ্যা তেরো চোদ্দটা। সবগুলোরই নিয়মিত বা অনিয়মিত পত্রিকা আছে। এছাড়া সিনেমা সম্পর্কিত হালকা ও সিরিয়াস নানান কাগজ রয়েছে। কিন্তু চলচ্চিত্রর মতো সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকা তার চোখে পড়ছে না কেন? এরকম উঁচুমানের পত্রিকাকে পঁচিশ বছর আগের পাঠকরা তাচ্ছিল্য করেছিলেন সিনেমা সম্পর্কে তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা রুচি আর দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে। পঁচিশ বছরে চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষিত লোকের মানসিকতার যে পরিবর্তন হয়েছে, চলচ্চিত্র আলোচনার মান ও পরিমাণ ক্রমশ যেরকম বাড়ছে, তার মূলে এই পত্রিকার অবদান যথেষ্ট। প্রথম সংখ্যাই শেষ সংখ্যা হলেও এজন্যেই বোধহয় চলচ্চিত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল।

চলচ্চিত্র পত্রিকাটিকে আমাদের দেশের সিরিয়াস ফিল্ম ম্যাগাজিনের প্রথম ও সার্থক রূপ হিসাবে চিহ্নিত করা অসঙ্গত হবে কি?

রমাপ্রসাদ দত্ত
কলকাতা-৩৫

যুবক - যুবতী

অমৃত সাপ্তাহিকে প্রকাশিত যুবক-যুবতী বিভাগটি সত্যই খুব প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই বিভাগে প্রকাশিত বিভিন্ন তরুণ যুবক-যুবতীদের অভাব, ভাবনা চিন্তা সম্পর্কে আমরা আপনাদের সংবাদ ভাষ্যকার মারফৎ জানতে পারি। এই ব্যাপারে নূতন করে বলার কিছু নেই।

কিন্তু আমার বক্তব্য এইসব সাক্ষাৎকারী যুবক-যুবতীদের অধিকাংশই হয় কোলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের। কিন্তু কোলকাতার বাইরে সুদূর গ্রামেও যে বহু যুবক-যুবতী আছে তাদেরও নিজস্ব অনেক ভাবনা, চিন্তা এবং অভাব রয়েছে।

যদি অনুগ্রহ করে সুদূর পল্লী যুবকদের তথ্য সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন তবে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হই এবং আপনাদের পত্রিকার গৌরবও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। নতুবা পল্লী অঞ্চলের পাঠকদের প্রতি অবিচার করা হয়।

রাসমোহন দত্ত,
মসলন্দপুর ২[illegible]

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে
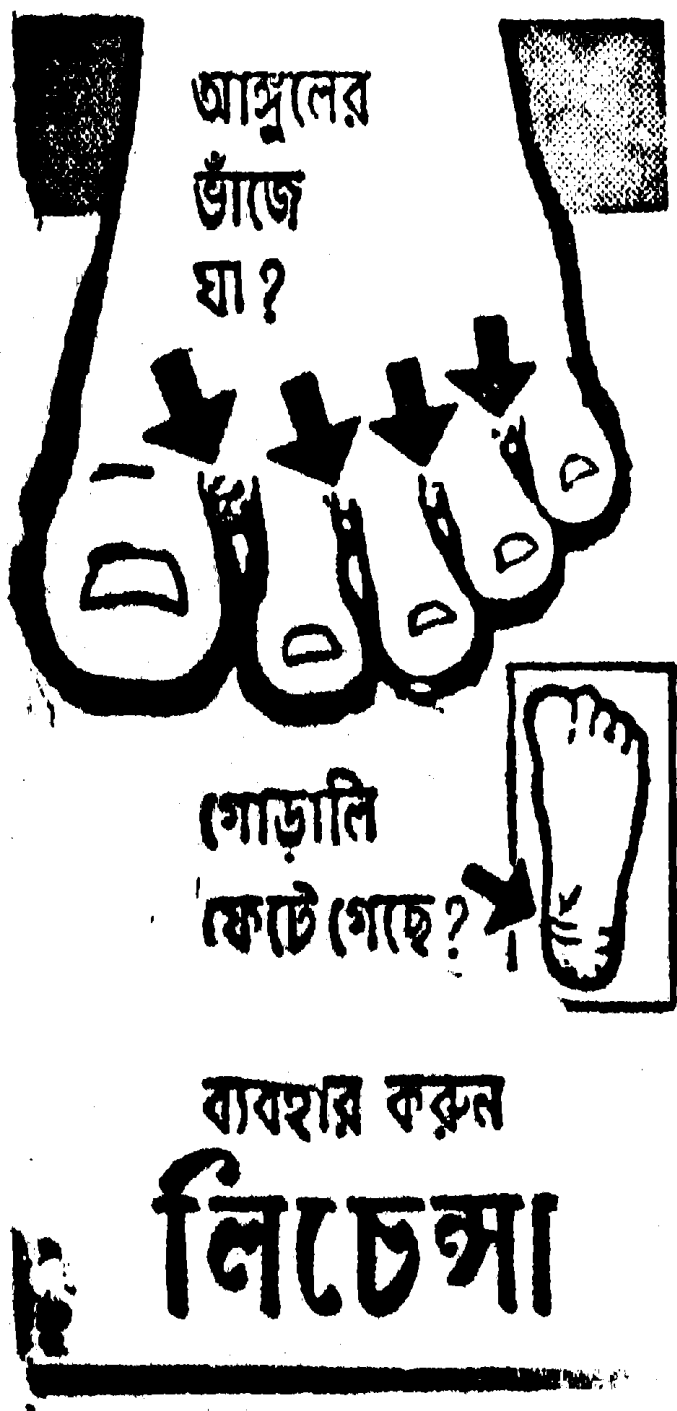
দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার এক বন্ধুর ডাক নাম বিন্দু। এখনো সে বেঁচে বর্তে আছে কলকাতায়। পাণ্ডিচেরি আশ্রমে সে মাঝে মাঝে আসত ও গুরুদেবের জন্যে একটি দুটি তরকারি রাঁধত। একদিন সে আলুর ঝোল—লুচি—এবং পরমান্ন রেঁধে পাঠায়। পাত্র দুটি ফিরে আসে। গুরুদেব অল্পই গ্রহণ করেছিলেন। বিন্দু তাঁকে লেখে :

"Nalina brought me back the dishes. I was stunned to find that you had hardly touched them. I am deeply pained, sorely disappointed, utterly dejected and cannot imagine why you are so unsympathetic to me".

(নলিনা আমাকে পাত্রগুলি ফিরিয়ে দিল। আমি মর্মাহত হয়েছি—আপনি প্রায় কিছুই খান নি। কেন আপনি এমন বেদরদী হলেন আমি ভেবে পাই না।)

গুরুদেব উত্তরে তাকে লিখলেন : 'তোমার প্রতি আমাদের দরদ নিবিড় ও নিখুঁত কিন্তু তাকে মাপা চলে না তোমার রান্নার প্রতি আমাদের দরদ দিয়ে। তোমার পরমান্ন খেয়ে মনে পড়ল প্রেমিকের সম্বোধন প্রেমিকাকে : 'মরি মরি! কী মিষ্টি—কী মিষ্টি—কী মিষ্টি!' তোমার আলুর ঝোলও অসামান্য, যদিও অন্য স্বাদের। প্রথম চামচ আমি মুখে দিলাম সোৎসাহে দ্বিতীয় চামচ ভয়ে ভয়ে। তারপরে এ-অজানা রাজ্যে আর বেশি এগুতে ভরসা পেলাম না।'

এ-হেন মহাপাচক বিন্দু একদিন আমাকে চ্যালেঞ্জ করল রাঁধতে। বলল : 'কবিতা! ফুঃ! যদি রাঁধতে পারতে গুরুদেবের জন্যে তবে বুঝতাম।' আমি মুখে উঠে বললাম : 'আমিও পারি রাঁধতে। ফুঃ! খুব সোজা।' ও বলল : 'আচ্ছা রাঁধো দেখি।' আমি বললাম : 'নিশ্চয় রাঁধব।' ও বলল : 'কিন্তু একলা রাঁধতে হবে—আর কাউকে যদি হাত লাগাতে দাও—' আমি বললাম : 'না দেব না। একাই রাঁধব।'

কিন্তু তারপর ভয়ে সারা। হাসি-মস্কারার যা খুশি বলা চলে—কিন্তু গুরুদেবকে তো আর যা তা রান্না রেঁধে পাঠানো চলে না। অথচ কথা দিয়েছি—একাই রাঁধব। কী করি। হঠাৎ মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল : শরণ নিলাম এক রন্ধননিপুণা সাধিকার, নাম অমিয়া। তাকে বললাম : 'তুমি সামনে বসে আমাকে নির্দেশ দাও কী কী করতে হবে—কিসের পরে কী মশলা...ইত্যাদি।' সে হেসে রাজী হয়ে আমাকে বলতে থাকে আর আমিও আদিষ্টবৎ রেঁধে চলি এক স্টোভের উপর কড়া চাপিয়ে। ...প্রায় আধঘণ্টা পরে টোমাটো মটরশুঁটি, পেঁয়াজ আলু...ইত্যাদি দিয়ে যথাবিধি গব্যঘৃতে ঢেলে রেঁধে পাঠালাম গুরুদেবকে—চিঠিতে লিখে যে আমি একাই রেঁধেছি—কেবল অমিয়া ফিশফিশ করে নির্দেশ দিয়েছিল (whispers) পরদিন গুরুদেব লিখলেন :

"Your cooking is remarkable and wonderful; If you had not disclosed the secret about Amiya's 'whispers' I would have been inclined to claim it 'as a Yogic miracle. Even with the 'whispers' it is an astonishing first success! Ashcharyavat Pashyati Kashchip Enam, as the Gita says".

(দিলীপ তোমার রান্না আশ্চর্য অপূর্ব। তুমি যদি অমিয়ার ফিশফিশ করে-বলা নির্দেশের গুহ্য' কথাটা উহ্য রাখতে তাহলে আমি একে যৌগিক অঘটন বলে জাহির করতাম। .. গীতার কথা মনে পড়ে : কেউ কেউ একে দেখে বলে—আশ্চর্য।)

•

কখনো কখনো আমি টেলিগ্রামের ছন্দে চিঠি লিখতাম মজা করে। একদা লিখলাম : 'গুরু পাঠাচ্ছি আমার আবৃত্তি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ। দেখে দেবেন? চলবে? গড়পড়তা? বাজে? সোজা জবাব চাই, দোহাই! রাহানার চিঠিটি ফেরৎ দিলেন না। দেবেন না? নিশ্চুপ কেন? কী হয়েছে? সেতু-বাঁধা? সুপ্রামেণ্টাল? মন উড়ুক্কু?'

পরদিনই এল তাঁর উত্তর গানের প্রতি-ধ্বনির মতন : 'আমি দেখব তোমার অনুবাদটি মাজাঘষা করবার যদি সময় পাই। কিন্তু তুমি ইংরাজী কবিতায় খুব উন্নতি করেছ দেখছি। এত দ্রুত প্রগতির হেতু? যৌগিক শক্তি? আন্তর অগ্নি-প্রেরণা? অবচেতন? রাহানার চিঠির হঠাৎ

গুরুতরদায় হয়েছে। ভুতুড়ে কাণ্ড! তোমার অন্যমনস্কতা? আমার?'

•

একদা আমি লিখলাম : 'গুরু! সম্প্রতি আমি আদৌ ধ্যানে মন বসাতে পারি নি—পর্বতপ্রমাণ প্রুফের জন্যে। কিন্তু আমি ম'ক্তোড়বান্দা ফের ধ্যানে বসলাম বলে—সাবধান!'

গুরুদেবের পিঠ পিঠ জবাব : 'পর্বতপ্রমাণ প্রুফের পরে পর্বতপ্রমাণ ধ্যান—যে-পর্বতের শিখরে আসীন 'বাবা'? বহুৎ আচ্ছা। আমি হব তোমার মুখোমুখি।'

•

'গুরু, তিন তিনটি চমৎকার সুখবর : প্রথম, আবুল ফজল নামে এক মুসলমান লা'ই তাক—আমাকে অভিনন্দন করেছেন। দুই এক মহাপণ্ডিত আমার বাংলা উপন্যাস 'দোলা'-র প্রশংসা করেছেন, তিন এক জমিদার আমাকে লিখে দিতে অনুরোধ করেছেন একটি অভিনন্দন-পত্র জনৈক স্থানীয় ডাক্তারের জন্যে—যিনি রাজসমাদৃত।'

'দিলীপ, আমার সহানুভূতি। আবুল ফজল ও মহাপণ্ডিতের জন্যে সাধু সাধু সাধু। কেবল ডাক্তার 'রাজসমাদৃত' হলেও আমি উজিয়ে উঠতে পারছি না। এ আমরা চলেছি কোথায়? অনুরোধ : নীরদকে বোলো না একথা। তবে হয়ত এর মূলে আছে এই প্রাসিদ্ধ : 'ডাক্তারকে মান দাও যদি দীর্ঘজীবী হতে চাও।' অপিচ তোমার মতন প্রখ্যাত সাহিত্যিককে এজন্যে ধরা সমীচীন বৈ কি, তুমি একটি দীর্ঘ মানপত্র লিখবে নিশ্চয়ই দাওয়াইয়ের রোমান্স সম্বন্ধে প্রথমে ধন্বন্তরীর তারপর চরক গ্যালেনের Galen, গুণগান করে শেষে উপসংহার করবে ডাক্তার নীরদ তালুকদার তথা রামচন্দরের প্রসঙ্গ এনে।...

শ্রীঅরবিন্দ'

•

'গুরু, আপনি সবশুদ্ধ কজনকে স্পেশাল অনুমতি দিয়েছেন, প্রত্যহ আপনাকে পত্রাঘাত করতে? নীরদ গোপনে বলে : ১২১ জনকে। বিন্দু বলল : 'না মাত্র ৯৭ জনকে'—এখন সাধকদের সংখ্যা বুঝি ১৫০?'

'দিলীপ খোলাখুলি যাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তারা সংখ্যায় দুজন—মানে, কতকটা উহ্য ভাবে গৃহীত। জরুরি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে দুজনকে। আর দুজন—স্বনির্বাচিত লেখক। ৯৭ বা ১২১ জন রোজ পত্রাঘাত করলে আমাকে গোবি মরুভূমি বা মানস সরোবরে মহাপ্রয়াণ করতে হত...শ্রীঅরবিন্দ।'

'গুরু, শ্রীল সুনিশ্চিত শর্মা আজ আমার কাছে এসে সে কী বক্তৃতাই করলেন : তাঁর মধ্যে এক আশ্চর্য দৈবী শক্তি সক্রিয় হয়েছে যার ফলে তিনি সফল হয়েছেন গুরুচরণে আশ্চর্য আত্মসমর্পণ করতে। শুনে আমি অভিভূত। আপনি?'

'দিলীপ তিনি যখন তাঁর মধ্যে অন্তর্গূঢ় শক্তির কথা বলতে উজিয়ে ওঠেন তখন আমার মনে হয়—আহা, যাঁরা এত আশ্চর্য তাঁরা তাঁদের আশ্চর্যতার সম্বন্ধে একটু কম বাগ্মী হলে মন্দ হত না। আত্মস্ফূর্তির এহেন আতিশয্য যে মানুষকে কোন আঘাটায় টেনে নিয়ে যায় কেউ কি জানে?...শ্রীঅরবিন্দ।'

•

আমি সাধনায় ত্বরিৎ প্রগতি লাভ করতে চেয়ে মাঝে মাঝেই ভাবতাম 'কঠোর' করা দরকার—বড় বেশি আরামে আছি বলেই হয়ত ধ্যানধারণায় আমার মন বসছে না—কর্মের নাগপাশে বাঁধা পড়ছি। ভেবেচিন্তে স্থির করলাম কীভাবে কঠোর করতে চাই গুরুদেবকে না জানিয়ে করতে গেলে হয়ত উল্টো উৎপত্তি হবে কাজ নেই। যদি কঠোর করা আমার সাধনার অনুকূল হয় তবে গুরুদেব নিশ্চয়ই মত দেবেন। তাই তাঁকে লিখলাম যে আমি স্থির করেছি (১৪-৯-৩৫) :

১) আমি চা-পান করা ছেড়ে দেব। কারণ আমি চা ভালোবাসি।

২) পনীর (cheese) খাব না আর, কারণ পনীর আমার ভালো লাগে।

৩) স্বাদু ব্যঞ্জন সব বরখাস্ত করব। কারণ বিস্বাদ ব্যঞ্জন আমার সয় না।

৪) একাদশীতে উপবাস—আগাগোড়া মনোযোগে।

৫) একটিমাত্র কম্বলে নিদ্রা—বালিশ না নিয়ে।

৬) মশারি না খাটিয়ে শয়ন। এইটেই হবে আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন। কারণ মশকগুঞ্জনকে আমি ঘুমপাড়ানি গান মনে করতে পারি নি কোনোদিনই। আর পণ্ডিচেরিতে বেজায় মশা।

আপনি ও শ্রীমা অনুমোদন করবেন কি? —যদিও বলে রাখি আমি এ-প্রার্থনা করছি চোখের জলে—শান্তচিত্তে নয়।

গুরুদেব উত্তরে লিখে পাঠালেন : 'তুমি যে-সব প্রস্তাব করেছ পড়ে আমি হতভম্ব! উপবাস? ওতে আমি নেই যদিও আমি নিজে উপবাস করেছি তাই জানি যে, উপবাসের পরে পারণে তুমি খাবে রাক্ষসের মতন। আর মাথা মুড়োবে? সর্বনাশ? তার ফল কী হবে ভেবে দেখেছ কি? এর পরে চব্বিশে নভেম্বরের দর্শনের দিনে আমার কোমল মন তোমার কঠোর মূর্তি দেখে যে ঘা খাবে—হয়ত আমি তার টাল সামলে উঠতে পারব না কে জানে? —আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—কিন্তু তোমার এই নিদারুণ মূর্তি দেখে কন্যাকুমারী থেকে হিমালয় পর্যন্ত যে তুমুল আন্দোলন শুরু হবে—তার ফলে তুমি প্রখ্যাত হয়ে উঠবে আর এক ভঙ্গিতে তোমার অতীত খ্যাতিকে ছাপিয়ে—আর কোন সুগুণে ভেবে দেখ একবার : ঠিক যখন তুমি যশমানবর্গীয় সব অহন্তাকে জয় করতে উদ্যত! না না—বিপদ বলে বিপদ! আর মশারি না টাঙিয়ে ঘুম? তার মানে অনিদ্রা—অনশনের মতনই সাংঘাতিক বৈ কি? ফলে তোমার যুগল নয়ন শুধু যে ম্লান হয়ে পড়বে তাই নয়—হয়ে উঠবে ভীষণ—সুপ্রামেন্টাল সম্বন্ধে তোমার কল্পিত বিভীষিকতাকেও দুয়ো দিয়ে। না না না।

'খতিয়ে কৃচ্ছ্রসাধন অসম্ভবের কাছাকাছি—কেবল কুঁড়ে ঘরে বা হিমালয়ে ছাড়া। বৈরাগ্যের ভিত্তি হচ্ছে নিষ্কামনা অনাসক্তি—যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্টি। বাহ্য কৃচ্ছ্রসাধনার ফল দাঁড়ায় এই যে, সে হয়ে ওঠে একটা বাঁধা নিয়ম মাত্র যাকে মানুষ মেনে চলে শুধু নিয়মানুবর্তী হয়ে নিজেকে সাবাস বলতে—আত্মাদরের মুখরক্ষা করতে।

'হয়ত এসব কথা শুনে তুমি ঠাওরাবে যে আমি কৃচ্ছ্রসাধনদীক্ষার পথে যোগ্য গুরু নই—হয়ত অভ্রান্ত এ-সিদ্ধান্ত। কি জানো? আমি অন্তর নির্দেশ মেনে চলারই পক্ষপাতী, তাই মনে করি—তুমি তোমার চৈত্যপুরুষকে বহাল করলে এত শত ছন্দ মন্দ ঝামেলার হাত থেকে নিস্তার পাবে।'

উত্তরে আমি তাঁকে লিখলাম এক লম্বা চিঠি। তার চুম্বক এই যে, আমার মনে হয়েছিল যে যখন আমাকে অতিমানস-বোধ করতেই হবে তখন আমার সব মানস প্রবণতাকে কাটিয়ে না উঠলেই নয়।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

* আবহাওয়া ও বিশ্বের খাদ্য
* ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস
* অর্থহীন ও প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক সম্মেলন
* কল-গার্ল

আবহাওয়া ও বিশ্বের খাদ্য

'নেচার' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক জন গ্রিবিন কিছুকাল আগে কোনো একটি ফাউন্ডেশনের টাকায় আমেরিকা ও কানাডার কয়েকটি শহরে সফর করেন। সে-সময়ে কয়েকজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে নানা বিষয়ে তাঁর আলোচনা হয়—বিশেষ করে খাদ্যের যোগান নিয়ে, বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে। পরে এই সমস্ত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে একটি লেখা দাঁড় করান, 'আবহাওয়া ও বিশ্বের খাদ্য' শিরোনামে লেখাটি 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার ২৮ নভেম্বর ১৯৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রণিধানীয় এই লেখার কিছু অংশের বক্তব্য নিচে প্রকাশিত হল।

জন গ্রিবিন যে-সময়ে সফর করছিলেন তার কিছুকাল আগে রোমে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে জাতি-সঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পক্ষ থেকে বিশ্বের ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে (বিষয়টি নিয়ে ৩৪নং সংখ্যায় আমরা আলোচনা করেছি)। তার আগেই বিজ্ঞানীরা ও সংশ্লিষ্ট সকলে মোটামুটি মেনে নিয়েছিলেন যে সবুজ বিপ্লব ব্যর্থ, সত্তর দশক-এর গোড়ার দিকের উজ্জ্বল আশাবাদ আঁকড়ে থাকার মতো কোনো অবলম্বনই আর নেই। একই সময়ে আরও শোনা যাচ্ছিল পৃথিবী ক্রমেই শীতল হয়ে যাচ্ছে এবং সর্বগ্রাসী এক হিমযুগ আসন্ন। যে-ক্ষেত্রে খোদ বিজ্ঞানীরাই বিপর্যয়ের কথা শোনান সেখানে অবিশ্বাস করে এমন সাহস কার, বিশেষ করে যখন আবহাওয়া-নিরীক্ষণকারী আধুনিকতম সব যন্ত্র মুহুর্মুহু তথ্য হাজির করে চলেছে। পশ্চিমের বড়ো বড়ো শহরের টেলিভিশনে পাল্লা দিয়ে দুর্ভিক্ষের ছবি দেখানো শুরু হয়ে যায় (ভারত ও বাংলাদেশ থাকতে দুর্ভিক্ষের ছবির অভাব কি)।

এই পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে জন গ্রিবিনের লেখাটি পড়া দরকার। তিনি কোনো নিজস্ব মতামত চাপান নি, বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মত উপস্থিত করেছেন মাত্র। পাঠক এই আশ্বাস অবশ্যই পাবেন যে, হতাশ হবার কোনো কারণ নেই।

আমাদের এই বিশ্বে বড়ো বেশি মানুষ, প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব, আর ঝগড়া-বিবাদ তো লেগেই আছে—অতএব এই বিশ্বের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এমন ধারণা যদি কারও থাকে তিনি যেন কখনো রাইড ব্রীসনের কাছে না যান। রাইড ব্রীসন হচ্ছেন উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশগত অধ্যয়ন ইনস্টিটিউটের কর্তা। তিনি এমন সব তথ্য উপস্থিত করতে পারেন, এত প্রচুর পরিমাণে, যে অবধারিত সিদ্ধান্ত করতে হয়—শেষের সে-দিন অতি আসন্ন, সম্ভবত আর মাত্র বছর দুয়েক বাদেই। তথ্যগুলো এমনই হতভম্বকর যে তার পাশে এমনকি বিশ্বের বর্তমান শক্তি-সংকটকেও তুচ্ছ মনে হয়। কারণ, শক্তি-সংকট সম্পর্কে দারুণ নৈরাশ্যবাদীরাও কখনো বলেন নি যে দশ বছরের আগে সর্বনাশ ঘটে যাবার কোনো সম্ভাবনা আছে। ব্রীসন আরো বলেছেন, আমাদের এই ভূ-গোলকের গড় তাপমাত্রা গত কুড়ি বছর ধরে একটানা কমছে—সরাসরি এই কারণে যে মানুষের কার্যকলাপের ফলে পরিবেশ হয়ে গিয়েছে দূষিত। বায়ুমণ্ডলে ধুলোর পরিমাণ এখন এত বেশি যে সূর্যের উত্তাপের আরো বেশি ভাগ এবং তাৎপর্যপূর্ণ রকমের বেশি ভাগ এখন বায়ুমণ্ডলই শুষে নিতে পারে। বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ-শোষণ এত বেশি ছিল না। খাদ্যাভাব ইত্যাদির কথা বাদ দিয়ে যদি ব্রীসনের এই পরিবেশ দূষিত হওয়া সম্পর্কিত চমকপ্রদ তথ্য ধরে অগ্রসর হতে হয় তাহলেও কিন্তু আশা করার কিছু থাকে না। শেষ সর্বনাশ তখনো দু-বছর দূরবর্তী না হয়ে আর সামান্য কিছু বেশি হতে পারে।

প্রতীক

১৯৭৫ জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যে যৌথ মহাকাশ গবেষণা শুরু হচ্ছে, এটি তার সরকারী প্রতীক। ইংরেজিতে লেখা আছে অ্যাপোলো, রুশীতে সয়ুজ, মাঝখানে পৃথিবীর কক্ষে দুটিকে যুক্ত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

তাহলে? তাহলে বরফ যদি গ্রাস নাও করে তো গ্রাস করার জন্য আছে দুর্ভিক্ষ। তবে আর হিসেব-টিসেব করে চলার দরকারটা কি। যেমন প্রাণ চায় ফুর্তি-টুর্তি করে নিয়ে জীবনটাকে শেষ করে দিলেই তো হয়। নতুবা পালটা প্রতিকারের ব্যবস্থা চাই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, শুধু ব্রীসন নন, যে-সব বিজ্ঞানী এইসব তথ্যে বিশ্বাস করেন তাঁরাও কিন্তু দিব্যি নির্বিকার।

আসলে ব্রীসন যা বলছেন তা হচ্ছে খারাপ একটা পরিস্থিতিকে চূড়ান্ত রকমের খারাপ করে দেখার ফল। বাড়াবাড়ি বা আতিশয্য কোনো ক্ষেত্রেই ভালো নয়—না বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণীতে, না এমনকি সামান্য একটা নাটকের দৃশ্যকল্পনায়।

আবহাওয়ার সঙ্গে খাদ্য-উৎপাদনের ব্যাপারটা অবশ্যই বিজড়িত। এই দুয়ের সম্পর্ক নিয়ে ভাবলে অবশ্যই হতাশ হবার কারণ আছে। কিন্তু কতখানি? এ-বিষয়ে যাঁরা মতপ্রকাশ করেছেন তাঁরা তিনটি স্পষ্ট বিভাগে বিভক্ত। একদল বলেন, হ্যাঁ, আবহাওয়ার অবনতি ঘটেছে বটে কিন্তু তাতে হয়েছেটা কী? হয়তো আগামী সপ্তাহেই আবার আবহাওয়ার উন্নতি হয়ে যেতে পারে। তা যদি নাও হয় তো বিজ্ঞানের আবিষ্কার তো আর থেমে থাকছে না, আশ্চর্য নতুন ফসল কিছু একটা আবিষ্কার হয়ে যাবে হয়তো। আর মানুষের সংখ্যা বাড়ছে? সে তো উন্নতিশীল দেশগুলিতে। সেখানেও হয়তো রাতারাতি এমন কিছু ঘটতে পারে যার ফলে জন্মহার কমতে বাধ্য।

ব্রীসন রয়েছেন একদিকে আর এই শেষোক্তরা অন্যদিকে। দু-দলই চূড়ান্তবাদী—বা, রাজনীতির ভাষায় বলা যেতে পারে উগ্রপন্থী। কিন্তু এই দুই উগ্রপন্থী দলের মাঝখানে রয়েছেন একদল মধ্যপন্থী, যাঁদের বলা যেতে পারে বাস্তববাদী। তাঁরা বলেন, অল্প সময়ের ব্যাপ্তির মধ্যে দেখলে সমস্যা গুরুতর সন্দেহ নেই, কিন্তু বিরাট কালের পরিধির মধ্যে সকল সমস্যারই আসান সম্ভব। এই দলের বিজ্ঞানীরা সবাই যে এক ভাষায় কথা বলেন তা নয়। তফাৎটা মাত্রাগত—অসুবিধাগুলো কাটিয়ে উঠতে কতখানি মাত্রার প্রয়াস প্রয়োজন হবে তাই নিয়ে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ মহাকাশ গবেষণা

আগামী জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমন্বয় মহাকাশ গবেষণার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, শিল্পীর তুলিতে আঁকা তার একটি ছবি। বাঁ-দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সয়ুজ, ডানদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপোলো, নিচে পৃথিবী। পৃথিবীর কক্ষে পরিক্রমারত অবস্থায় সয়ুজ ও অ্যাপোলো যুক্ত হবে। চিত্রে এই দুটি মহাকাশযানকে যুক্ত হবার প্রাক্কালের অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

ব্রীসন বলছেন, মানুষের কার্যকলাপের ফলে পৃথিবীর আবহাওয়া পালটে যাচ্ছে। এই কথাটি অনেক বিজ্ঞানীই মানেন না। যেমন কলোরাডোর জাতীয় আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্রের কার্যনির্বাহক অধিকর্তা জন ফিরর বলেন, এমন কোনো সাক্ষ্য নেই যা থেকে প্রমাণ হয় গত দশ বছরের মধ্যে বায়ুমণ্ডলে ধুলোর স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রিটেনের আবহ দপ্তরের বিজ্ঞানী জে এস সয়ার বলেন, কলকারখানার দরুন ধুলো সৃষ্টি হয় পৃথিবীর অতি সামান্য অংশে মাত্র এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়। ব্রীসনের সিদ্ধান্তের ভিত্তি হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের এলাকায় বায়ুমণ্ডলের ধুলো সম্পর্কে কিছু তথ্য। সয়ার বলছেন, এই তথ্য ভুল, কেননা এই ধুলোর বেশির ভাগটাই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তার দরুন।

তাছাড়া, পৃথিবী ক্রমেই শীতল হচ্ছে—এমন কথাও এখনো পর্যন্ত সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে না। বড়ো জোর বলা চলে লক্ষণটা সেদিকে। তবে কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন, যে-সব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। কানাডার একজন বিজ্ঞানী বলেছেন (গর্ডন ম্যাকে, পরিবেশ কানাডার আবহ প্রয়োগ শাখার অধ্যক্ষ), গত কয়েক বছরে কানাডার কয়েকটি স্টেশনের রীডিং থেকে মনে হতে পারে যে তাপমাত্রা বরং বাড়ছে। আসলে হয়তো সেই কথাটাই ঠিক—হাতে আসা পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য যথেষ্ট নয়, ফলে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক স্টেশন থেকে প্রাপ্ত রীডিং-এর গড় করতে গিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত টানতে হয়।

তাহলে কি আবহাওয়ার পূর্বাভাস জোর. ব্রীসনের যে প্রচুর সেটা কোনো বিজ্ঞানী অস্বীকার করতে পারেন না।

আবহাওয়া কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে পাবার মতো কোনো নিশ্চিত হাতিয়ার আমাদের হাতে নেই? সূর্যোদয়ের সময়ে আকাশ লাল ছিল কিনা তাই দেখে আঁচ করতে হবে? ব্যাপারটা এখনো এতদূর গড়ায়নি। খাদ্যসংকট যে আছে এ-বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। আর আবহাওয়া হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ যার দ্বারা নির্ধারিত হয় পরিস্থিতি কেমন দাঁড়াবে। ব্রীসন যে-কথা বলছেন, পরিস্থিতি গুরুতর, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী—ব্রীসনের এই কথাটি স্বীকার্য নয়।

ধরে নেওয়া গেল মানুষ এ-ব্যাপারে নির্দোষ, আবহাওয়ার ব্যাপারে তার কোনো হাত নেই। কিন্তু এখন একথা সুস্পষ্টভাবেই জানা গিয়েছে যে, মানুষের হাত ছাড়াই আবহাওয়ায় বড়োরকমের পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে এবং খুবই অল্প সময়ের মধ্যে। ম্যাডিসন-এ গবেষণারত বিজ্ঞানীরা তাঁদের বিশেষ গবেষণা থেকে অতীতের আবহাওয়ায় প্রকাণ্ড পরিবর্তনের হদিশ দিতে পেরেছেন। তাঁদের মতে মাত্র সতেরো বছরের মধ্যেই 'আমূল' পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। আজকে আমরা আছি দুই হিমযুগের মাঝামাঝি অবস্থার পরিস্থিতিতে, আর কিঞ্চিদধিক একশো বছরের মধ্যেই পুরোপুরি একটি হিমযুগ শুরু হওয়াও অসম্ভব নয়। এই উক্তির প্রতিবাদে কোনো কোনো আবহবিজ্ঞানী বলেছেন, এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটাবার তো কোনো আয়োজন ভূ-জগতে আছে বলে তাঁদের জানা নেই। উত্তরে ব্রীসন বলেছেন, তত্ত্বকে দাঁড় করাতে হবে তথ্যের ওপরে, তথ্যকে তত্ত্বের ওপরে নয়। তত্ত্বের আমরা যা সঠিক জানি না তার মানে এই নয় যে আবহাওয়ার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। গত দশ বা পনেরো বছর ধরে প্রযুক্তিবিদ্যা ছিল আর আবহাওয়াও মোটামুটি ভালোই গিয়েছে। ফলে কৃষির ফলন থেকে সরবরাহ হতে পেরেছিল চাহিদার থেকে বেশি এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচুর এলাকা অনাবাদী পড়ে ছিল। কিন্তু এখনকার অবস্থা ভিন্ন। সরবরাহ ও চাহিদা এখন এতই কাছাকাছি যে আবাদী জমিও আর পড়ে থাকতে পারে নি। কাজেই আগামী কয়েক বছর ধরে খুব ভালো আবহাওয়া চাই, যাতে সংকট কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে।

মধ্যপন্থী অনেকে ভাবছেন, এই সংকট থেকে পরিত্রাণ সম্ভব, তার জন্য প্রয়োজনীয় কৃৎকৌশল আমাদের আয়ত্তে—এখন শুধু রাজনৈতিক ইচ্ছা থাকলেই হয়।

ব্যাপারটা সহজ নয়, সরলও নয়। মনে করা যাক কোনো একটি দেশের টেলিভিশনে সংবাদচিত্রে দেখানো হল যে সরকারী নীতির প্রতিবাদে কৃষকরা শয়ে শয়ে বাছুরকে গলা কেটে মেরে ফেলছে। পরক্ষণেই দেখানো হল বাংলাদেশের হাজার হাজার ভুখা মানুষের ছবি (কল্পনা নয় কানাডার টোরোন্টোতে পরপর এমনি দুটি সংবাদচিত্র দেখানো হয়েছে ১৯৭৪ সালের ৩০শে অকটোবর তারিখে)। প্রথম সংবাদচিত্রের বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষ প্রতিবাদ জানাল, সেটা নাকি অশ্লীল। কেন অশ্লীল? এ কারণে নয় যে বাংলাদেশের মানুষ যখন ভুখা টোরোন্টোর কৃষক তখন কত সহজে খাদ্যের অপচয় করছে! এটা হচ্ছে সমস্যার সামাজিক দিক, আবহাওয়ার পরিবর্তনকে খুঁটিয়ে জানা গেলেও তা দিয়ে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

তাই মনে হয় বহু বিজ্ঞানীর মতো (তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন জাতীয় আবহ গবেষণা কেন্দ্রের উইল কেলোগ) সতর্ক একটি আশাবাদে নির্ভর করাই ভালো। তাপমাত্রা কমছে? কিন্তু কমতেই থাকবে—তাই বা কেন? কিছুকাল পরে বাড়তেও পারে। চল্লিশের দশকে এমনি একবার কমে যাবার পরে আবার বেড়েছিল। মানুষের তৈরী ধুলোর ফল খারাপ হচ্ছে? তেমনি মানুষের তৈরী এমন জিনিস প্রচুর যা এই কুফলকে কাটাতে পারে। ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব ভয়ের কোনো কারণ নেই।

৬২তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

১৯৭৫ সালের ৩ থেকে ৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত দিল্লীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৬২তম অধিবেশন হয়ে গেল। এবারের অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে নিবন্ধ পাঠ করার চেয়েও আলোচনা-বৈঠকের ওপরে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে—শুধু বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ওপরে নয়, জাতীয় সমস্যার ওপরেও।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এবারের অধিবেশনেরও উদ্বোধন করেছেন প্রধান মন্ত্রী। উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেনও সেই

একটা কথা দেশের প্রয়োজনে—অর্থাৎ দারিদ্র্য দূর করার প্রয়োজনে—বিজ্ঞানীদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে হবে। কৃৎকৌশল হওয়া চাই গ্রামাঞ্চলের উপযোগী এবং স্থানীয় প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্য-সাধক। নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যে উদ্যমের কাজের নিদর্শন রেখেছেন তার স্বীকৃতি দেশে ও বিদেশে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় পাওয়া যাচ্ছে। এখন খাদ্য ও জ্বালানীর উৎপাদন বৃদ্ধি করাটাই দেশের সামনে আশু সমস্যা।

কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের বিজ্ঞান ফ্যাকালটির ডীন ডঃ শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায় (ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের তিনিই প্রথম মহিলা সভাপতি।) তিনি তাঁর ভাষণে একটি ভয়ংকর বিপদ সম্পর্কে গভর্ণমেন্টকে সতর্ক করে দেন। বিপদটি হচ্ছে বিজ্ঞানের স্নাতকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকারী। এই বিপদের যদি প্রতিকার না হয় তাহলে দেশের যাঁরা সেরা নাগরিক তাঁরা যে শুধু হতাশ হবেন তাই নয়—ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণুও হয়ে উঠতে পারেন। সেই অবস্থা সমাজের পক্ষে আরও গুরুতর।

অসাধারণ গবেষণা-কর্মের জন্য বাইশজন তরুণ বিজ্ঞানীকে ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়। এই ব্যবস্থা এখন থেকে চলবে, 'জ্ঞানের অগ্রগতিতে অসাধারণ অবদান রাখতে পারবেন ত্রিশ বছরের কম বয়স্ক এমন তরুণ বিজ্ঞানীদের একটি রৌপ্যপদক ও কিছু নগদ টাকা দিয়ে প্রতি বছর সম্মানিত করার ব্যবস্থা হয়েছে।

অতঃপর বিভাগীয় সভাপতিরা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বহু গুরুতর বিষয় নিয়ে ভাষণ দেন।

অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক সম্মেলন

দিল্লীর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস শুরু হবার সাতদিন পরে (১০ই জানুয়ারি) বাংগালোরে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অন্য একদল বিজ্ঞানী সমবেত হন তাঁদের নাম 'উন্নতিশীল দেশগুলির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটি', বা সংক্ষেপে কস্টেড। তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল—'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ভারতের পক্ষে ব্যর্থ হয়েছে'। বুঝুন ব্যাপারখানা বিজ্ঞানীদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

আসলে এই সমস্ত কংগ্রেস ও সম্মেলনের কি বিশেষ কোনো সার্থকতা আছে? সেগুলো কি অপ্রয়োজনীয় আচারে পর্যবসিত হয়ে যায়নি? এ-প্রশ্ন তুলেছেন অজ্ঞান ও অপগণ্ডরা নন মহান বৈজ্ঞানিক কর্মে নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানীরা নিজেরাই। এ-বিষয়ে একটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ লিখেছেন বোম্বাই হফকিন ইনস্টিটিউটের ইমিউনোলজি বিভাগের প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ ডঃ এস এস রাও (সায়েন্স টুডে, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫)। প্রবন্ধটির মূল এইরকম:

শীতকালটি বৈজ্ঞানিক সভাসমিতির পক্ষে চমৎকার সময়। আপনি যদি বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানের প্রশাসক হন তাহলে স্থান থেকে স্থানে সভা থেকে সভায় পর্যটন করে বেড়াতে পারবেন। এই সমস্ত সভার আয়োজন করবে পেশাদার সংস্থা বা এজেন্সিগুলো—যেমন সি-এস-আই-আর, পারমাণবিক শক্তি কমিশন আই-সি-এম-আর ইত্যাদি। মাঝে মাঝে আপনাকে যেতে হতে পারে দিল্লীর শারীরবিদ্যা কংগ্রেসের মতো আন্তর্জাতিক সভাতে। সেখানে ডঃ এইচ জি খোরানা প্রচুর ভিড় টানেন। তবে বৃহত্তম ভিড় জমে থাকে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে, যেটি সচরাচর অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে যেটি সচরাচর উদ্বোধন করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে অবশ্যম্ভাবীরূপে বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে ডাক দেওয়া হয় তাঁরা যেন দেশের সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে বারে বারে এই যে একই ডাক দেওয়া হচ্ছে তার মানে দাঁড়ায়—বিজ্ঞানীদের যা করতে বলা হচ্ছে তা তাঁরা করেন না। কথাটা মনে হয় সত্য। হফকিন ইনস্টিটিউট থেকে অবসর নেবার আগে ডঃ রাও বছরের পর বছর যে-সব বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন সেখানে তিনি বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন যে অধিকাংশ নিবন্ধই নিম্নমানের। তাঁর মনে হয়েছে সেই সমস্ত ব্যক্তিই ভাগ্যবান যাঁরা শুধু বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও চায়ের আসরে যোগ দিয়ে থাকেন।

তখন তিনি ভেবেছেন এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক সভা-সম্মেলনের সত্যিই কি কোনো সার্থকতা আছে? তারপরে 'সায়েন্স ফোরাম' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ তার চোখে পড়ে। নিবন্ধটির নাম 'দরিদ্র জাতির দেশে বিজ্ঞান বিষয়ক সম্মেলন কি অর্থহীন অপব্যয়?' লেখকের নাম ডঃ রবার্ট অ্যান্ডারসন। প্রশ্নের জবাবে লেখক স্পষ্ট বলছেন, হ্যাঁ। এবং বক্তব্যের সমর্থনে জোরালো তথ্য উপস্থিত করেছেন। কানাডা পরিষদের একটি বৃত্তি নিয়ে (১৯৬৭-৬৯) তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাজের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান এবং এই অনুসন্ধানের ফলাফলের ভিত্তিতে রচিত নিবন্ধের জন্য শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ডঃ রাও মনে করেন, ডঃ অ্যান্ডারসনের বক্তব্য যদিও তিন বছর আগে প্রকাশিত কিন্তু এখনো পর্যন্ত রূঢ় বাস্তব।

বিষয়টি এতই গুরুতর যে বিজ্ঞানী অ-বিজ্ঞানী নির্বিশেষে সকলেরই এ-বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। আগামী বারে আমরা ডঃ রাও ও ডঃ অ্যান্ডারসনের বক্তব্য বিস্তৃতভাবে উপস্থিত করব। তার আগে বিখ্যাত লেখক আর্থার কোয়েসলারের একটি উপন্যাসের বিষয়ে উল্লেখ করাটা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উপন্যাসটির নাম—

কল্-গার্ল

বৈজ্ঞানিক সম্মেলনগুলি আসলে সুসংগঠিত সার্কাস মাত্র আর কোনো কিছু নয়। চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া ছাড়া বৈজ্ঞানিক সম্মেলনগুলি থেকে আসল লাভ কিছুই হয় না। বৈজ্ঞানিক সম্মেলন-রূপী এমনি এক সার্কাসের বিষয় নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন আর্থার কোয়েসলার। সম্মেলনটি ডাকা হয়েছে এক আলপাইন গ্রামে। তাতে যাঁরা যোগ দিতে এসেছেন তাঁরা এতই পরিচিত টাইপ যে চিনতে একটুও ভুল হয় না। কোয়েসলার তাঁদের নাম দিয়েছেন—কল-গার্ল।

কলগার্ল কেন? উপন্যাসের একটি চরিত্র তা বুঝিয়ে বলে। বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দেওয়াটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, বা নেশায়। চিঠি বা টেলিফোন মারফৎ ডাক আসে কোনো নামডাকওলা সংস্থা, বা বিশ্ববিদ্যালয় বা ফাউণ্ডেশন থেকে। বিনীত প্রার্থনা শোনা যায়—আপনি কি অনুগ্রহ করে একটু সময় করতে পারবেন, হেঁ হেঁ, আমরা কৃতার্থ হব, ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পরে তাঁরা আসেন, সেই একই চেহারা, দেখে মনে হয় যেন পোকায় খাওয়া। আসেন নির্ধারিত সময়ের চেয়েও একটু দেরি করে, কেননা, জাতির পক্ষে আরো অনেক বেশি জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো কাজ সারবার জন্য তাঁদের অন্যত্র যেতে হয়েছিল। অনেকে আসেন নির্ধারিত সময়েই কিন্তু অনেক আগেই চলে যান কেন না আরো জরুরি ডাক। তাঁদের সারতে হবে যে নিবন্ধগুলো তাঁরা পড়েন সেগুলো অন্য যে-কোনো সময়ে অন্য যে-কোনো জায়গায় পড়া চলত। সম্ভবত একই নিবন্ধ সামান্য অদল-বদল করে সর্বত্রই পড়া চলে। তাঁদের দেখে মনে হয় একদল ভ্রাম্যমাণ কুস্তিগীর যেন। সকলেই জানেন কার আয়ত্তে কী প্যাঁচ আছে, অভ্যস্ত ভঙ্গিতে তাঁরা লড়াই করে যান।

ভঙ্গিটাও সনাতন। কেউ বলতে চান একমাত্র তার ঝুলিতেই আছে সর্বরোগের দাওয়াই। কারও অসহিষ্ণুতা এত বেশি যে অন্য কেউ মুখ খোলা মাত্র ঘোরতর সমালোচক হয়ে ওঠেন। কেউ-বা হাতে পাঁজী মঙ্গলবার করতে রাজী নন। মাত্র পাঁচদিনের মধ্যে পঞ্চাশ-ষাটটি প্রবন্ধ পাঠ। কোনো কোনোটি আদৌ পড়া হয় না। তাতে কোনো ক্ষতি নেই সম্মেলনের পরে মহাভারতের চেয়েও বৃহদাকার যে পঞ্জী প্রকাশ করা হবে তাতে কিছুই বাদ পড়বে না। এমনকি শুভেচ্ছার বাণীগুলোও নয়।

এই সমস্ত সার্কাসের জন্য টাকা যোগান কারা? অবশ্যই ধন-কুবেররা। নামান্তরে কোনো সংস্থা বা ফাউণ্ডেশন বা নিদেনপক্ষে গৌরীসেনীয় সরকার। টাকার তহবিল থাকলেই তা খরচ করতে হয়, তা খরচ করার ব্যবস্থা করতে হয়—অতএব সার্কাসের আয়োজন। অন্য গতি নেই। এই চক্র চলতেই থাকে, চলতেই থাকে।

এক সার্কাস শেষ হয়, তখন অন্য কোথা অন্য কোনো সার্কাসে যোগ দেবার ডাকের জন্য অপেক্ষা করা চলে।

অয়স্কান্ত

ফাদার দ্যতিয়েন
রোড নামচা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ-দেশে আছে লরি-সাহিত্য, ও-দেশে আছে রিকসা-কলাশিল্প। বাংলাদেশে আর যত-কিছুর অভাববোধ করুন না কেন রাজধানীর রিকসা-বাহিনীর বেলায় রঙের কোনো অনটন অনুভব করবেন না।

ঢাকার সাইকেল-রিকসার সংখ্যা আল্লা-ই জানেন : সরকারি হিসেবে কুড়ি হাজার, সাধারণ শুমারিতে তেত্রিশ। প্রতিটি রিকসা আবার রাজপুতানী-সুলভ রঙ-বেরঙে সজ্জিত। ফরাসি প্রবাদ বলে : 'রুচি ও রঙের বিচার করিবে না।' করিব না।

আমার রিকসার নম্বর ১৮০১৪, রিকসা-ওয়ালার নাম নসিরুদ্দিন; উভয়েরই হাঁপানি আছে। বাহনটির গায়ে বড় অক্ষরে লিখিত একটা নাম : 'পথের বন্ধু'। প্রতিটি রিকসার একটি নাম থাকে—সাধারণত মিস্ত্রির, মহাজনের কিংবা তাদের কোনো ছেলেমেয়ের নাম : সালিম নাসিম ফজল মিস্ত্রি...। সীটের পশ্চাৎপট এক চিত্রিত দৃশ্যে অলংকৃত। আমার রিকসার দৃশ্যটা ইসলামী সংস্কৃতি অনুযায়ী—জীববর্জিত : কোন এক কাল্পনিক তাজমহলের অপটু নকসা। সংখ্যাধিক রিকসার শিল্পকার্য অবশ্য অধিকতর দুঃসাহসিক : পেখম-মেলা ময়ূরের ছবি, সিনেমার নায়িকার প্রতিকৃতি, স্বাধীনতা-সংগ্রামের দৃশ্য : সৈনিক হস্তে-প্রহৃতা এক বীরাঙ্গনা।

দেওয়ালে দেওয়ালে বিজ্ঞপ্তি : 'তোরা যে যা বলিস ভাই মোরা মুজিববাদ চাই' কিংবা মিষ্টতর সুরে : শ্রমের শেষে ক্লান্তির বন্ধু : পর্যটন সিগারেট...পাদুকা-শিল্পে দুটি অক্ষর একটি নাম : বাটা।

লাল ত্রিকোণের বড় একটা বালাই নেই : ইসলামী সংস্কৃতিতে নাকি 'জনসংখ্যা বন্ধ করার অধিকার কাহারও নাই'। একটিমাত্র প্রাচীরে একটিমাত্র আবেদন দেখলাম : 'যতন করি আমরা গড়ি/সুখের সংসার। সুখের সংসার যে গো/ছোট পরিবার...'

বাংলাদেশের রাজধানীতে আঠারোটি ছবিঘর আছে। সুন্দর সুন্দর সব নাম : সংস্কৃত (মানসী, বলাকা আনন্দ অভিসার...), আরবী-ফার্সি (নাজ আজাদ নিসাত গুলিস্তান...) এমন কি ইংরেজি (ডায়না মুন, স্টার লায়ন...)। কিন্তু প্রত্যেকটা সেই অবিস্মরণীয় পঁচিশে মার্চ পুড়ে গিয়েছে। সারা শহরে আজ এক নতুন ছবির প্রকাশপত্র : 'আবার তোরা মানুষ হ'; আটটা ছবিঘরে একসঙ্গে তার 'শুভমুক্তি'। ১৯৬৫ সালের ৬ই অকটোবরের পর থেকে ভারতীয় কোনো ছবি আর আসে নি, তবে হ্যাঁ, টেলিভিশন যাদের আছে তারা মহানগর ও তিন কন্যা অতিথি ও অপুর সংসার দেখার সুযোগ পেয়েছেন।

লায়ন ঘরে প্রবেশ করলাম। কুর্তা-পরা এক কর্মচারী ভদ্রভাবে জিগ্যেস করলেন, আমি সাংবাদিক কি না। ভদ্রভাবে উত্তর দিলাম, 'সাহিত্যিক' আখ্যায় অধিকতর সম্মান ও আনন্দ বোধ করলেও সাংবাদিক বলে আমাকে যদি অল্পমূল্যে উচ্চশ্রেণীর আসনে বসতে দেওয়া হয়, তবে আমি সাংবাদিক বটে। প্রবেশমূল্য এক থেকে চার টাকা; তিন বৎসর পূর্ণ হলেই বাচ্চাদের ফুল টিকেট লাগে। হ্যাঁ, টিকেট; টিকিট ওরা লেখে না। আটশটা সীটে; তার মধ্যে আবার তেতালায় পঞ্চাশখানা মহিলাদের জন্য। ছবিটা পুরোনো খুব, হপ্তাখানেক চলবে : 'কোথায় যেন দেখেছি'। পাঁচটি গান, আড়াইঘণ্টার শো।

কুর্তা-পরা কর্মচারীটি মিষ্টি আনিয়ে চা খাওয়ালেন। মিষ্টিগুলো যে পুরোনো বইয়ের ছেঁড়া পাতায় মোড়া ছিল তা পড়ে দেখা যায় : 'মা বাপের আঘাত গৌরব মনে কর...চিঠি লিখিয়া তাহার উপর কিছু ধুলো ছড়াইয়া দাও...রৌদ্রে থাকিয়া যে-পানি গরম হইয়া গিয়াছে সে-পানি ব্যবহার করিও না : শ্বেত-কুষ্ঠ রোগ জন্মাইতে পারে...।' ইসলামীয় সংস্কৃতি, দেখছি, সর্বত্র বিদ্যমান।

আমাদের আছে রেড রোড, পার্ক-সার্কাস, আপার সার্কুলার রোড...ওদের গ্রীণ রোড, লেক সার্কাস, আউটার সার্কুলার রোড। আর হ্যাঁ, ওদের ডি আই টি অ্যাভিনিউ-ও আছে। তাছাড়া ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চ রোড, এলিফ্যান্ট রোড (যার নামান্তর হাতী সড়ক)।

দেশে দেশে দেখি, যাবতীয় রাস্তাঘাট দিনে দিনে মানুষের স্মৃতিরক্ষার্থে নব-দীক্ষা লাভ করে। রেওয়াজটা ইসলামীয় সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞরাই বলবেন, তবে বাংলাদেশের রাজধানীতে গিয়ে দেখবেন কত হাজী অমুক লেন, কত কাজী তমুক রাস্তা। অমুসলিম নামও আছে : ওয়াল্টার স্ট্রীট, মিটফোর্ড রোড, হার্নি লেন...... গঙ্গারাম বাজার লেন, রাধাশ্যাম সাহা স্ট্রী...। রাস্তাঘাটের নামান্তরীকরণ প্রথাটি যৌক্তিকতা বিচার্য। আমি কিন্তু পছন্দ করি : তোপখানা রোড, পীলখানা রো... কসাইটুলি লেন, মালীটোলা লেন, পাঁচ ভা... ঘাট লেন, ভূতের গলি...নামগুলো এখন শোনা যায়, যদিও বেশির ভাগ সময় বো... হয় নানা-নানী, দাদা-দাদীর মুখে।

রাস্তার দু ধারের ফুটপাত কোথাও প্রক্ষালনালয়ে কিম্বা প্রস্রাবখানায় পরিণত হয় না (পুলিশ নাকি ধরে...); উলঙ্গ কোন শিশুকেও কোথাও দেখিনি। দেখেছি ফুটপাতে শুয়ে একদল ভিখারি একটানা দ... ঘণ্টা ধরে আল্লার নাম জপ করছে—ঘণ্টায় পাঁচ হাজার বার করে। আমার কৌতূহল দেখে এক সহৃদয় পথিক বুঝিয়ে দেন দুনিয়ার সমস্ত পানি কালি করে জমিনকে কাগজ বানিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত লিখলেও আল্লার নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা সম্ভবপর নয়। নামটার একনিষ্ঠ জিকিরে (জাপ) বহুবিধ কলা-মসিবত দূরীকৃত হয়। তবে হ্যাঁ সঠিক আরবী উচ্চারণ চাই, আর সব নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা প্রয়োজন।

হিন্দুরা যেমন সর্পদংশনে মনসাকে বসন্ত রোগে শীতলাকে, পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় ষষ্ঠীকে ডাকে, খৃস্টানেরা যেমন গলাপীড়ায় সেন্ট ব্লেজকে মৃগীরোগে সেন্ট গায়কে সারমেয়দংশনে সেন্ট রককে ডাকে, ও-দেশের মানুষ তেমনি ভিন্ন ভিন্ন সংকটে একে ও-অদ্বিতীয় আল্লাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে আহবান করে : 'আল কাবিরু' আপনাকে সাপের (কিংবা কুকুর বিছে প্রভৃতি প্রাণীর) দংশন থেকে রক্ষা করাবেন, 'আল ওয়াকিলু' ঝড় তুফান শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত থেকে...। অন্য উপায় অবশ্য আছে : 'আল ওয়ালিউ' নামটা কাগজে লিখে, কাগজটা কুয়োতে ফেলে সেই কুয়োর পানি ঘরে, উঠোনে, চালায় ছিটিয়ে সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রেহাই পাবেন। গর্ভপাতের আশঙ্কায় স্বামী গর্ভিণীর পেটের উপর 'আল মুবদিউ' নামটা উনিশবার লিখবেন, মায়ের স্তনা যদি হ্রাস পায় আল মাতিনু নামটা কাগজে লিখে কাগজটা পানিতে ধুয়ে পানিটা তাকে পান করাবেন... (ক্রমশঃ)

উপন্যাস

শেষ বাসর

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বঙ্কিম দত্ত যা চান রঞ্জু তা নয়। তার চিন্তার জগৎ পরিবেশ সবই স্বতন্ত্র। আর যূঁইদি এসে যেন ষোল বছরের রঞ্জুর মানসিক জগৎকে পর্যন্ত আমূল পাল্টে দিয়েছে। বিবাহিতা যূঁইদি যেন তাকে কাঁচপোকার মত আকর্ষণ করছে। বঙ্কিমবাবুর মত কি অমিয়ই হতে পেরেছে? শুধু একটা ভয় তার বাবার মতই। তার বন্ধু রুদ্রেন্দু গরীব এবং বিপ্লবী মেজাজের বলে তাকে সেও এড়িয়ে চলতে চায় ভয় করে। সেই রুদ্রেন্দুর সঙ্গে হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল অমিয়র। প্রথমটা সে খুব বিব্রত হলেও পরে সামলে নিল এবং বেশ ঠাট্টার মেজাজেই ঠুকে ঠুকে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। যেন একটা মজার লোকের সঙ্গে কথা বলছে সে।

সেই দৃশ্যটা হঠাৎ রঞ্জুও দেখে ফেলল দূর থেকে। বাবার পাশে এক ঝাঁক টিয়ের মত টুটুলদের দলটা। সবাই আজ শাড়ি পরেছে। বাবাকে দেখাচ্ছে যেন একটা বুড়ো ভালুক। তার পাশে বাবার বন্ধু রুদ্রেন্দুকে মনে হচ্ছে ভীরু রোগা তাড়া খাওয়া শেয়াল। বাবার পাশে গোপাও আছে। তার সঙ্গে গোপার একটা নীরব সম্পর্ক আছে। যেটা কেউ জানে না। কাল রঞ্জু যূঁইদির সঙ্গে কেষ্টনগর চলে যাবে বেশ কিছুদিনের জন্যে। সেই খবরটা ওকে দেবার জন্যে ভেতরে ভেতরে চঞ্চলতা অনুভব করে রঞ্জু।

(কুড়ি)

শিউলির গন্ধে ভুরভুর করছে অম্বুজা-নিলয়ের বাতাস। বিশেষ করে নিচে বারান্দায় দাঁড়ালে পাগল করে দেবার অবস্থা। তার ওপর একাদশীর চড়া জ্যোৎস্না। বাগানের গাছগুলি কী অসম্ভব চিকচিক করছে!

গানটান শেষ। এখন ওদের বাড়ি ফেরার পালা। আটটা ভজন গেয়েছে গোপা একলা। গৌরী গেয়েছে তিনটে নজরুল-গীতি। আর কেউ অবশ্য গান করে নি। পারেও না তেমন। বসে বসে গান শুনেছে। গৌরীর গলাও বেশ ভাল। তবে গোপার মতন নয়।

গান শেষ হতে দোতলা থেকে সবাই নিচে নেমে এসেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। অমিয়বাবু মাঝখানে। তাঁকে ঘিরে টুটুলের বন্ধুরা কলগুঞ্জন করছে। বুক ভরে শিউলির গন্ধ নিচ্ছে। বাগানের শোভা দেখছে। গ্রীলের ফাঁক দিয়ে ছোট বড় মাঝারি বরফির সাইজের কাটা কাটা জ্যোৎস্না এসে ঠিকরে পড়েছে তাদের কপালের ওপর নাকের ওপর ভুরুর কিনারে শাড়ির ভাঁজে চুলের ঢেউয়ে।

অল্প বাতাসে কিছু চুল উড়ছে কোনো শাড়ির আঁচল কাঁপছে। ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে শিউলি গাছটা। একটি ফুলও এখন নিচে ঘাসের ওপর পড়ে নেই।

—উঁহু এখন তো ফুল ঝরার সময় নয়। অমিয় বললেন রাত নটাও বাজে নি। ঝরতে আরম্ভ করবে সেই ভোর তিনটে থেকে। টুপটাপ টুপটাপ ডাল থেকে লাফিয়ে ঘাসের বিছানায় পড়ে সব শুয়ে পড়বে।

—ইস তখন না জানি দৃশ্যটা কত সুন্দর। রুমি বলল, আমার ভীষণ ইচ্ছে করে টুপটাপ শিউলির ঝরা দেখতে।

—তাহলে তো ভোর রাত অবধি তোমাকে এখানে জেগে বসে থাকতে হয় দিদিমণি।

সবাই চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল। সকলের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বঙ্কিম দত্ত। টুকটুক করে কখন ঠিক নিচে নেমে এসেছেন।

অবশ্য বুড়ো সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে আছেন। দোতলায় অমিয়বাবুর শোবার ঘরে গানের আসর বসেছিল। ওটাই বাড়ির সবচেয়ে বড় ঘর। বঙ্কিম দত্ত বাইরে বারান্দায় দরজার কাছে একটা চেয়ার বিছিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বসে সব কটা গান মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। গানের ফাঁকে ফাঁকে ওরা যত কথা বলেছে সব কথায় তিনি কান পেতেছেন। এবং দু-একটা মন্তব্যও করেছেন। ওরা যতবার হেসেছে তিনিও হেসেছেন। এবং ভিতরে বসা অমিয়বাবুর মতন তিনিও বারান্দার দরজার এ-পাশ থেকে গলা বাড়িয়ে এক-একটা গান শেষ হতে উচ্চ কণ্ঠে প্রচুর বাহবা জানিয়েছেন। কাজেই বুড়োর উপস্থিতি সম্পর্কে টুটুলের বন্ধুরা গোড়া থেকে সচেতন ছিল। কিন্তু এখন রাত করে তিনি নিচে নেমে আসবেন ওরা যেন ভাবতে পারে নি।

—কি হল চুপ করে গেলে যে। বঙ্কিম দত্ত এবার সরে এসে মেয়েদের প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়ান।

রাত জেগে এখানে বসে থাকার প্রস্তাবের ভিতরে রুমি কি বলবে বুঝতে পারছিল না। অন্য বন্ধুদের দিকে চোখ রেখে ঠোঁট টিপে হাসছিল। ওর দেখাদেখি গৌরী চামেলী চন্দনা গোপা ও ক্রমান্বয়ে ঠোঁট টিপে হাসে।

—বেশ তো দুম করে অমিয়বাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে বসেন যদি শেষ রাতের শিউলি-ঝরার দৃশ্য দেখতে হয় সবাই না হয় রাতটা এখানে থেকে যাও। দারুণ মজা হয়।

যেন এ-প্রস্তাবটা আরও অদ্ভুত এবং চমকে দেবার মতনও বটে। না কি সাংঘাতিক রকম হাস্যকর। অমিয়বাবু ঠিক বুঝতে পারেন না। তাই মেয়েরা বুড়ো বঙ্কিমবাবুর কথায় যেমন সলজ্জ কৌতুক নিয়ে ঠোঁট টিপে চাপা হাসি হাসল এখন কিন্তু তা করল না—এক সঙ্গে সবাই ভীষণ শব্দ করে হেসে উঠল। বারান্দাটা প্রায় কেঁপে উঠল। যেন হাসির মধ্যে একটা রুক্ষতা অমসৃণতার ঝাঁজ বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে শোনা গেল।

অমিয়বাবু থতমত খেলেন। অপ্রস্তুত হলেন।

এক সঙ্গে হেসে উঠেই মেয়েরা তৎক্ষণাৎ চুপ করে গেল। যেন তাদের নিজেদের কানেও হাসিটা বড় খারাপ লাগল। যেন এই হাসির ভিতর দিয়ে একটা বয়স্ক মান্য লোককে উপেক্ষা করার অপমান করার ঝোঁক প্রকাশ পেল। বারান্দাটা অনেকক্ষণ থ [illegible] লাগল।

—ঠিক রাতটিত জ্যবছে হবে না। এই বেলা যে যার বাড়ি ফিরে যাও। সারাদিন তো বেড়িয়ে-টেড়িয়ে আমোদ করে ফিরলে। তারপরও বেশ রাত করে ফেলেছ এখানে। এখন ঘরে না গেলে তোমাদের বাড়ির লোকেরা চিন্তা করবেন। আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবেন।

কথাটা ভেসে এল দোতলার প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি পথের মাঝখান থেকে। অমিয়বাবুর স্ত্রীর গলা। খুবই গম্ভীর। শুধু তাই না গলার স্বরে একটা চাপা ভর্ৎসনার মতন কিছু যেন ফুটে উঠল।

ফলে নিচে বারান্দার আবহাওয়াটা আরও অস্বস্তিকর আরও বেশি থমথমে শ্বাসরোধী মনে হতে লাগল:

টুটুলের বন্ধুরা ফিস ফিস করে পরস্পর কিছু বলাবলি করল। বোঝা গেল তারা লজ্জা পেয়েছে। যেন একটু ভয়ও পেল। অমিয়বাবু অত্যন্ত সাদাসিধে খোলামেলা মানুষ। তাঁর কাছে তাদের আব্দার ও প্রশ্রয়ের সীমা নেই। আর অমিয়বাবুর বাবা বুড়ো বঙ্কিম দত্ত তো দিদিভাইদের দেখলে রীতিমত চ্যাংড়ামি আরম্ভ করে দেন। হাসি-ঠাট্টার বান ডাকে বুড়োর। টুটুলের বন্ধু কাজেই সকলকেই বঙ্কিম দত্ত নাতনী সম্পর্কীয়া মনে করেন। কিন্তু অমিয়বাবুর স্ত্রী—টুটুলের মা যে বেশ রাসভারী ও চাপা প্রকৃতির মানুষ টুটুলের বন্ধুদের তা অজানা ছিল না।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে সারা দিন পাখি দেখে আজ সন্ধ্যার পর টুটুলের বাবার সঙ্গে যখন তারা অম্বুজা-নিলয়ে ফেরে তখন অবশ্য টুটুলের মা বাড়ি ছিলেন না। ভবানীপুরে নীহারের এক পিসতুতো দাদা থাকেন। নীহার তাঁকে দেখতে গিয়েছিল। ভদ্রলোক ক'দিন ধরে অসুস্থ। আজ দুপুরে হঠাৎ টেলিফোনে অসুখের বাড়াবাড়ির খবর পেয়ে নীহার তৎক্ষণাৎ ভবানীপুর চলে যায়। তারপর সন্ধ্যার পর কখন সে বাড়ি ফিরল অমিয়বাবু যেমন টের পান নি তেমনি বঙ্কিম দত্তও ততটা খেয়াল করেন নি। তখন গানের আসর পুরোপুরি জমে উঠেছে। মন দিয়ে তারা গান শুনছিলেন। বাড়ি ফিরে নীহার যদি সরাসরি শোবার ঘরে ঢুকত অমিয়বাবু স্ত্রীকে দেখতে পেতেন। বঙ্কিমবাবুও পুত্রবধূকে দেখতে পেতেন। কিন্তু নীহার শোবার ঘরে না ঢুকে সোজা রান্নার জায়গায় চলে গিয়েছিল। ঝি রান্না চাপিয়েছিল। তার আগে অবশ্য বঙ্কিমবাবু ঝি মালতীর মা-কে দিয়ে দোকান থেকে বিস্কুট আনিয়ে চা করিয়ে টুটুলের বন্ধুদের আপ্যায়িত করেছিলেন। অম্বুজা-নিলয়ের পক্ষে সেটা খুবই আকস্মিক ও নতুন। কেননা এ-বাড়ির কর্তা বুড়ো বঙ্কিম দত্ত সম্পর্কে কিপটে অপবাদটা প্রায় কিংবদন্তির মতন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজ গানের আসরে হঠাৎ চা-বিস্কুটের আবির্ভাব দেখে গৌরী লুকিয়ে রুমার উরুতে একটা চিমটি কাটে। ইঙ্গিতটা রুমা বুঝতে পারে। বাড়িতে টুটুলের মা উপস্থিত নেই বলে যে বুড়োর মেজাজ এতটা খুলে গিয়েছিল বুঝতে তাদের মোটেই বেগ পেতে হয় নি। রীতিমত জোড়া জোড়া ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট ও চা খাইয়ে টুটুলের বন্ধুদের খুশি করা! অমিয়বাবুর মেজাজ অবশ্য আজ সকাল থেকেই দারুণ খুশি ছিল। যে জন্য তাঁর আদর ও প্রশ্রয় এক এক সময় সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আর তাই না এই মাত্র তিনি এমন একটা কথা বলে ফেললেন যা শুনে টুটুলের বন্ধুরা হেসে কুটিকুটি। যেন তারা এখনও ছয়-সাত বছরের শিশু। সবাই আজ টুটুলদের বারান্দায় রাত কাটিয়ে শেষ রাত্তিরে বাগানের শিউলি ঝরা দেখে যাক। টুটুলের বয়স যদি তেরো-চোদ্দ হয় তার বন্ধুরা তার চেয়ে কেউ ছোট তো নয়ই বরং দু-একজন ষোল-তে পা দিয়েছে। এই অবস্থায় টুটুলের বাবা যে কি করে এমন বিদঘুটে একটা প্রস্তাব করতে পারেন শুনে তারা হেসে বাঁচে না।

যাই হোক সবাই যে-যার বাড়ি ফিরে যেত। কেউ এখানে রাত কাটাত না। এখনও এ-পাড়ায় পুরোপুরি ট্রাম বাস চলছে রিকশা চলছে। এইটুকুন রাতকে বালিগঞ্জ-টালিগঞ্জের মেয়েরা রাত বলেই গণ্য করে না। কিন্তু হঠাৎ টুটুলের মা যেভাবে সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন আর যেমন একটা গলার সুর করে কথাগুলি বললেন—জিনিসটা রীতিমত অপমানের মতন লাগছিল রুমা গৌরীদের। দিনের বেলা হলে বোঝা যেত তাদের মুখ রীতিমত কালো হয়ে গেছে।

কথাটা শেষ করে নীহার আর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকে না। তখনি আবার ওপরে উঠে যায়।

বঙ্কিম দত্ত ঘুঘু লোক। এত রাত করে বড় বড় মেয়েদের আটকে রেখে গানটান গাওয়ানটা অমিয়র ঠিক হয় নি। সারাদিন তো ওদের নিয়ে বোটানিক্যালের জঙ্গলে কাটিয়েই এল। বঙ্কিমবাবু বুঝতে পারলেন অমিয়র কথায় নীহার খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছে। তাই পুত্রবধূ প্রায় সিঁড়িতে দাঁড়ান থাকতে থাকতেই অথবা ইতিমধ্যে যদি ওপরেও চলে গিয়ে থাকে নীহার যাতে সেখান থেকেও শুনতে পায় গলাটা সেভাবে বেশ উঁচু করে বড় করে বঙ্কিমবাবু বললেন, না না আর শিউলি-ঝরা দেখার দরকার নেই। অনেকটা রাত হল। এবার দিদিভাইরা যে-যার বাড়ি ফিরে যাও।

কথাটা শেষ করেই বঙ্কিমবাবু চেঁচিয়ে রতনকে ডাকলেন। রতন গেট খুলে দে।

বঙ্কিমবাবুর নির্দেশ মতন সন্ধ্যাবাতি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই চাকর অম্বুজা-নিলয়ের লোহার গেট-এ তালা ঝুলিয়ে দেয়। এখন বুড়ো কর্তার ডাক শুনে চাবি হাতে ছুটে এসে রতন তালা খুলে দিল।

টুটুলের বন্ধুরা আর অপেক্ষা করে না। চলি। একটা অস্ফুট শব্দ করে সবাই এক সঙ্গে বারান্দা থেকে নিচের ঘাসে নেমে গেল। এখন এই 'চলি'টা কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হল বঙ্কিমবাবু বুঝতে পারলেন না। বাগানের দিকে চোখ রেখে তারা কথাটা বলল। অমিয়র দিকে যেমন তাকাল না তেমনি মেয়ের দলটা তাঁর দিকেও আর ঘাড় ঘুরিয়ে একবারও তাকাল না। বৌমার কথায় ওরা অসন্তুষ্ট হয়েছে। চিন্তা করে তিনি চেহারাটা অতিরিক্ত গম্ভীর করে ফেললেন।

—দাঁড়াও। হঠাৎ হাত তুলে অমিয়বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন। টুটুলের বন্ধুরা তখন গেট-এর কাছে চলে গেছে। ব্যস্ত হয়ে অমিয়বাবু বারান্দার সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামছিলেন।

—তুমি কোথায় যাচ্ছ! বঙ্কিমবাবু ছেলেকে বাধা দিলেন।

—ওদের ট্রামে বাসে তুলে দিতে হয় বা কেউ যদি রিকশায় যায় রিকশা ডাকতে হয়।

—উঁহু দরকার নেই। বঙ্কিমবাবু জোরে মাথা ঝাঁকালেন। ট্রাম বাসে চলে যাবার ওদের অভ্যেস আছে। রিকশাও খুব ডাকতে পারবে। তুমি বরং ওপরে যাও।

—কেন দোষটা কি! রাত করে ওরা বাড়ি ফিরছে—একটু এগিয়ে দেওয়া কি আমার উচিত নয়!

—হ্যাঁ উচিত কিন্তু এখন উচিত নয়।

—কেন! হাঁ করে অমিয়বাবু তাঁর বাবার মুখের দিকে তাকান।

—তুমি ওপরে যাও। থমথমে চেহারা করে বঙ্কিমবাবু কথাটা আবার বলেন তারপর বেতের চেয়ারটায় বসে পড়েন। অমিয়বাবু আর শব্দ করেন না। এতক্ষণ পর কিছুটা যেন আঁচ করতে পারেন।

ওরা বেরিয়ে গেল। গেট বন্ধ করে দিয়ে রতন তালা লাগাচ্ছে। শিকলের ঝন ঝন শব্দ হয়। শিশুর মতন অমিয়বাবু ফ্যালফ্যাল করে সেদিকে চেয়ে থাকেন। লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে রুমি গৌরীদের শরীরের কিছু কিছু অংশ দেখা যায়। রাস্তার আলো পড়ে সবুজ শাড়ি ঝলমল করছে। সকলের আগে হাঁটছে বসন্ত বউড়ি—লেক গার্ডেনসের ঝুমঝুম।

খোকনের পিছনে হাঁটছে কাঁকুলিয়া রোডের গোপা—অর্থাৎ ফ্লেমিঙ্গো। মাঝখানে রুমি গৌরী ও চামেলী। আজ টুকনী এদের সঙ্গে যায় নি। হঠাৎ অমিয়বাবুর খেয়াল হয় টুটুলকে যেন তিনি অনেকক্ষণ দেখছেন না।

তাই তো। বন্ধুরা চলে যাচ্ছে। একবারও ও নীচে নামল না। অমিয়বাবু ধড়ফড়িয়ে উঠলেন।

—কার কথা বলছ তোমার মেয়ে টুটুল? বঙ্কিমবাবু ছেলের দিকে ঘাড় ফেরান।

অমিয়বাবু থুতনি নাড়েন। হুঁ ও তো নীচে আসে নি।

—না। বঙ্কিমবাবু কেমন করে যেন শ্বাস ফেললেন। একটু থেমে থেকে জ্যোৎস্নায় মাখামাখি শিউলি গাছটা দেখেন তারপর আবার ছেলের দিকে ঘাড় ফেরান। —ও যে গানের আসর থেকে এক সময় উঠে গিয়েছিল তোমার খেয়াল আছে?

তাই নাকি। অমিয় অবাক হয়ে বাবার মুখ দেখেন। আমি কিন্তু লক্ষ্য করি নি।

—এই জগতে তুমি যে কি লক্ষ্য কর বুঝতে পারি না। বুড়োর গলায় আক্ষেপের সুর শোনা গেল। —তোমার ওই গৌরী মানে স্যাতসেঁয়ালী বলে যাকে ডাক মনে আছে নজরুলের কে বিদেশী মন উদাসী গানটা তখন গাইছিল? ঝি এসে টুটুলকে ডেকে নিয়ে যায়। আমি ভাবলাম রান্নাঘরের কোন দরকারে মালতীর মা টুটুলকে ডাকছে —বৌমা বাড়ী নেই। এখন বুঝতে পারছি তোমার স্ত্রী ঠিক ওই সময় ওর ভবানী-পুরের দাদাকে দেখে বাড়ী ফেরে এবং ঝিকে পাঠিয়ে টুটুলকে ভেতরে ডেকে নিয়ে যায়। কেননা তারপর তোমার মেয়েকে আমি আর একবারও গানের আসরে আসতে দেখি নি। শেষ পর্যন্ত ওকে আর দেখ-লামই না। হুঁ নীচেও এখন নামল না।

—কি ব্যাপার! অমিয়বাবুর গলায় কেমন যেন একটা ভয় জাগল। আমি এত বড় জিনিসটা খেয়ালই করলাম না।

—তাই তো বলি, এই সংসারে কিছুই তোমার খেয়াল থাকে না তুমি চিরকাল ভ্যাবলারাম। বঙ্কিমবাবু গুম গুম স্বরে বলে উঠলেন।

—কেন টুটুলকে ও হঠাৎ এভাবে ডেকে নিয়ে গেল এর অর্থ কি? খুবই অভদ্রতা। তা ছাড়া টুটুলের বন্ধুরাই বা কি ভাববে। অমিয়বাবু উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তোমার বৌমাকে আমি ঠিক জিজ্ঞেস করতাম। এটা কিছু বাজে লোকের গানের আসর ছিল না।

—আস্তে! বঙ্কিমবাবু হিসহিস করে ছেলেকে সাবধান করেন। শুনতে পাবে। হয়ত টুটুলের মা ওপরে রেলিং ঝুঁকে এদিকে কান রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

যেন তেতো ওষুধ-টষুধ গিলছেন চেহারাটা এমন করলেন বঙ্কিমবাবু। আবার একটু সময় বাগানের দিকে চোখ রাখলেন। কিছু ভাবলেন। তারপর ছেলের দিকে মুখ ঘোরালেন।

—না ওরা মানে টুটুলের বন্ধুরাও এতটা খেয়াল করতে পারে নি। আনন্দের মধ্যে ছিল উত্তেজনার মধ্যে ছিল সব। তা ছাড়া একেবারে ছেলেমানুষ বাচ্চা ওদের ভেতরে এখনো তেমন কিছু কুট প্যাঁচ তৈরী হয় নি—টুটুলকে কেন যে ঝি এসে ফট করে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল কেনই বা ও আর ফিরে এল না বা এখন ওরা চলে যাচ্ছে, টুটুল একবার দেখা করতেও নীচে নামল না—এই নিয়ে ওরা হয়ত কিছু ভাবতই না। আমিও কি ছাই ভাবতাম। কিন্তু এখন ভাবছি—এখন নিশ্চয় রাস্তায় গিয়ে টুটুলের বন্ধুরাও জিনিসটা আলোচনা করছে। এই-মাত্র বৌমা কেমন একটা ভঙ্গী করে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলে গেল। ওরা বেশ বুঝে গেছে টুটুলের মা বাড়ী ফিরে টুটুলকে আর গানের আসরে বসতে দেয় নি। নীচেও নামতে দিলে না।

—ছি ছি লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। কেন তোমার বৌমার এমনটা করার কারণ কি! যেখানে আমি ছিলাম আমার নিজের সন্তান টুটুল ছিল টুটুলের বন্ধুরা ছিল। এর মধ্যে খারাপটা কি ও দেখতে পেল।

—কি বলব বলো? খারাপ কি আমিই কিছু দেখছিলাম। আমি তো এত কড়া ডিসিপ্লিনের লোক। তা হলে আমিই বা বারান্দায় তোমার ঘরের দরজায় চোখের বিছিয়ে আগাগোড়া বসে থেকে ওদের গান-টান শুনব কেন। যদি দোষের কিছু থাকত আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম না। তোমাকেও নিষেধ করতাম। কিন্তু করার কিছু নেই যে। টুটুলের মা নিশ্চয় জিনিসটা ভালভাবে নিতে পারে নি—পৃথিবীর এই নিয়ম সকলের দেখার পদ্ধতি ভাবনা চিন্তার ধারা এক রকম নয়—যদি এক রকম হত তো এটা স্বর্গরাজ্য হত এত বিরোধ কলহ হিংসা দ্বেষ মারামারি খুনো-খুনির আগার হত না।

—অ্যাঁ! রেলিঙের কাছে সরে গিয়ে বাগানের দিকে মুখ করে অমিয় নিজের মনে গজগজ করতে থাকেন। আমি সাদা চোখে পৃথিবীটাকে দেখি— সরল মনে সব কিছু করে যাই আমার ভেতরে পাপ নেই, ক্লেদ নেই। শিশুর মতন সারাদিন আজ ওদের নিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরে পাখি দেখিয়েছি কোন পাখি কি খায়, কেমন করে ডাকে কে কোন গাছে বাসা বাঁধতে ভালবাসে—সব ওদের বুঝিয়ে দিয়েছি, চিনিয়ে দিয়েছি। তারপর ফিরে এসে আবার গৌরীর কয়েকটা গান শুনলাম —এতে পৃথিবী অশুদ্ধ হয়ে গেল—আমি সাংঘাতিক একটা অপরাধ করলাম!

কথাগুলি শুনলেন বঙ্কিমবাবু। শোনার পর একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়লেন।

—ঐ তো মুস্কিল অমিয়! ছেলের চওড়া পিঠের ওপর চোখ দুটো ধরে রেখে তিনি আস্তে বললেন বৌমা তোমার মতন সরল শিশু হতে পারছে না—যদি পারত তবে কোন হাঙ্গামাই ছিল না। সারাদিন ওদের নিয়ে বনে-জঙ্গলে কাটিয়ে এলে এখন আবার ঘরে ফিরে রাত নটা পর্যন্ত সবাইকে নিয়ে গানের আসর বসালে—এই জিনিস তোমার স্ত্রী সহ্য করতে পারছে না।

—কেন সহ্য করতে পারছে না এটাই তো আমার জিজ্ঞাস্য। অসহিষ্ণু গলার অমিয় বললেন এত ছোট মন এত সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীতে কোন মানুষের বেঁচে থাকা উচিত নয়।

—আসল কথা কি জান অমিয়?

—কি কথা শুনি। অমিয় ঘুরে দাঁড়ালেন।

—আমার মনে হয় বিশেষ করে তোমার সম্পর্কে বৌমার আচার আচরণ দেখে আমার যা ধারণা জন্মেছে—গলার স্বরটা প্রায় নাকের সঙ্গে ঠেকিয়ে বঙ্কিমবাবু বললেন একটু যদি রোজগারপাতির দিকে তুমি মন দিতে তা হলে বোধ করি টুটুলের মা তোমার ওপর এতটা রাগারাগি দাপাদাপি করত না। তার মনটা আর একটু উদার হত প্রশস্ত হত—ঐ যাকে বলে সহিষ্ণুতা —টলারেশন—

—থাম থাম আর তোমাকে বলতে হবে না ব্যাখ্যা করতে হবে না। হাত তুলে অমিয়-বাবু বাপকে নিরস্ত করেন।

এখন রাত—বারান্দায় অন্ধকার ও গ্রীলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে আসা জ্যোৎস্নার হিজিবিজি রেখা মিশে একটা খাপছাড়া ঝাপসা দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। দিনের আলো হলে পরিষ্কার বোঝা যেত অমিয়-বাবুর ফরসা মুখটা কেমন ছাইবর্ণ হয়ে গেল ও দুচোখের কোণায় চামড়া কতটা কুঁচকে উঠল। এমন সুন্দর সুখী সুখী চেহারাটা প্রায় চেনাই যাচ্ছিল না। বুড়ো বাপকে তিনি থামতে বললেন কিন্তু তাঁর মুখ দিয়েও হঠাৎ কথা সরল না। ঠোঁটের কাছে এসে সব কথা আটকে আছে। আর সেই অস্বস্তি নিয়ে তিনি হাঁসফাঁস করছেন।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দুজন সেদিকে ঘাড় ফেরালেন। রতন নীচে নামছে।

—কর্তাবাবু মা খেতে ডাকছেন। রতন বলল।

—হুঁ যাচ্ছি। বঙ্কিমবাবু মৃদু ঘাড় নাড়লেন।

—বড়বাবু ঠাঁই হয়েছে।

অমিয় শব্দ করলেন না। চাকরের মুখের দিকে তাকালেন না। অন্য দিকে চোখ রেখে পাথরের মতন শক্ত হয়ে রইলেন।

(ক্রমশঃ)

রূপসীর খাদ্য

আর ত্বকগুলি খাদ্য তালিকা দেখো যা খেলে শরীরে পরিমাণ মত প্রয়োজনীয় ভিটামিন আয়রণ ইত্যাদি পাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে ত্বক সুন্দর থাকে, আর চেহারায় স্বাভাবিকভাবে রূপ-লাবণ্যও অটুট থাকে। যাঁদের মেদবহুল শরীর তাঁদের খাদ্য তালিকা সম্বন্ধেই আলোচনা করব প্রথমে। তবে ত্বকগুলি ব্যাপারে আগে থেকেই সাবধান করে দেওয়া দরকার। যে আগে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে জেনে নিতে হবে যে মোটা হওয়ার আসল কারণ কি। অনেক সময় দেখা যায় মোটা হওয়ার কারণ মেদ নয় জল অথবা গ্ল্যান্ড-এর কোন বিশেষ দোষের জন্যও দেহে মেদ হয়। অতএব শুধু মাত্র খাদ্য সম্বন্ধে সচেতন হলেই হবে না হয়ত বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে। এবং ওষুধও খেতে হবে। এছাড়া নানান ব্যায়ামের কথা বহু আগেই আলোচনা করেছি। সেগুলিও নিয়মিত করে দেখতে হবে। আসলে সব কিছুই একে অপরের সঙ্গে জড়িত, তাই প্রতিটি ব্যাপারেই বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে ও তা অভ্যাস করতে হবে। তাহলে ফল ভাল হতে বাধ্য। আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন যে ত্বক ভাল রাখার জন্য ও তাকে মসৃণ উজ্জ্বল রাখার জন্য অনেক সুন্দরীরা তেল বা ঘি একেবারেই খান না। এছাড়া ফলের রস দুধ টমেটো পাতিলেবু শশা বাঁধাকপির পাতা গাজর ইত্যাদির রস ও সেদ্ধ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় খেয়ে থাকেন। এবং এর ফল যে সত্যি অপূর্ব তাদের চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। প্রাকৃতিক আবহাওয়ার জন্যও রং-এর হেরফের হয়। তবে খাদ্য একটা বিশেষ কারণ। বিদেশে অতিরিক্ত টিনের মাংস মাছ ইত্যাদি এবং শুয়োর গরু ইত্যাদির মাংস খাওয়ার জন্য তাদের চামড়ায় নানান রোগ হয়। শুধু তাই নয়, তাদের চামড়ায় এক রকমের ছিট ছিট দাগ হয়। এছাড়া ওঁরা ফরসা ঠিকই কিন্তু নরম এবং চকচকে নয়। এই নরম চকচক রং পাওয়া যায় ইতালি জাপান ইত্যাদি দেশে। আমাদের দেশে রং খুব ফর্সার সংখ্যা কম। কিন্তু ভাল ও চকচকে মসৃণ ত্বকের সংখ্যা বেশী। আর বর্তমানে প্রত্যেকেই যথেষ্ট সচেতন হচ্ছেন এসব বিষয়ে এটা সুখের বিষয়। তাই আর একটু জেনে এবং ভেবে চললে সৌন্দর্য আমাদেরই একচেটিয়া হয়ে যাবে। খাদ্য সম্বন্ধে তাই সচেতনতা বিশেষ দরকার।

দুধ বেশীর ভাগ মহিলারাই খেতে ভালবাসেন না। কিন্তু দুধ একটু বিশেষ ভাবে তৈরী করে খাওয়া যায় যেভাবে খেলে উপকার পাওয়া যায় বেশী। যেমন ধরুন সকালের ব্রেকফাস্টে এক কাপ দুধ ওপরের সর তুলে তাতে একটি মুরগীর ডিম আধ চামচ ভ্যানিলা এসেন্স বরফের কুচি আধ কাপ কমলা লেবুর রস কিম্বা আমের রস (আমের দিনে) কিম্বা যে কোন ফলের রস —যেমন আঙ্গুর বেদানা মুসাম্বি দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। তার পর নামমাত্র চিনি দিয়ে খেয়ে ফেলুন। এতে পেটও ভরে খেতেও ভাল লাগে। আর সেই সঙ্গে ত্বক ও চেহারায় প্রচুর উন্নতি হয়। যারা কাজে যান তারা যদি এর সঙ্গে দুটো পাউরুটি কড়া করে টোস্ট বা একটু মুড়ি খেয়ে বেরিয়ে পড়েন ভাল হয়। যারা বাড়ীতে থাকেন তাঁরা দুপুরে একটা দেড়টার সময় গরমকালে ভাতের চেপ্টা হাতার এক কিম্বা দেড় হাতা ভাত ও পাতলা মাছের ঝোল খেতে পারেন বা কাঁচা পেঁপে ও সময়ের সবজি দিয়ে ছোট মাছের ঝোল। সামান্য তেলে মাছ সাঁতলে নিতে হবে। তারপর মেথি জিরে ও আদা ফোড়ন দিয়ে তরকারিগুলি দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে তাতে হলুদ কাঁচালঙ্কা আর জিরেবাটা বাটিতে গুলে তার জল দিয়ে ঝোল করে [illegible] দিয়ে সেই ঝোল খাওয়া ভাল। তবে যাঁরা খুব মোটা এবং খাদ্য মেপে খেতে চান তাঁরা ভাতের [illegible] বা খেতে পারেন [illegible] তালিকা [illegible] প্রতিদিন কাঁচা পেঁপে সেদ্ধ [illegible] পেটও ভরবে আর উপকার [illegible] তালিকা দিচ্ছি।

[illegible] একটি পেঁয়াজ [illegible] একটি ক্যাপসিকাম [illegible] চামচ ভিনিগার তিন কাপ [illegible] চামচ অলিভ [illegible]

মেসিনে দিতে হবে। তারপর সেগুলি যখন বেশ মিশে যাবে তখন তাতে নুন গোলমরিচ রুচি অনুযায়ী দিয়ে খাওয়া যায়। অবশ্য স্বাদের জন্য টমেটো সস্ বা অন্য কোন সসও দেওয়া চলতে পারে। তবে যাদের বাড়ীতে মেশিন নেই তারা ওগুলো প্রেসার কুকারে দিয়েও তৈরী করে নিতে পারেন। এই সুপ খুব উপকারী। এতে যা যা মেশান হচ্ছে তার ফলে রং পরিষ্কার ও ত্বক মসৃণ হবে। এটা একেবারে ঠিক। তবে অনেকের সাধারণ ধারণা আছে যে পাউরুটিতে ভাত ও আটার রুটির মতন দ্রব্যগুণ নেই কিন্তু এটা ভুল। আরো ধারণা আছে যে কড়া করে রুটি টোস্ট করলে রুটির দ্রব্যগুণ কমে যায়। তা নয়। রুটির জল শুকিয়ে যায় এই পর্যন্ত।

ফল বহু রকমভাবে খাওয়া যায় এবং খাওয়াও উচিত। যেমন ধরুন আনারস কিম্বা তরমুজ টুকরো টুকরো করে কেটে তাতে এক কাপ দুধ ও এক বড় চামচের লেবুর রস (পাতি) দিয়ে ব্লেন্ডারে দিয়ে ফেটে মিশিয়ে তাতে একটু অতি সামান্য চিনি দিয়ে খেয়ে ফেলা যায়। কিম্বা গোলমরিচ ও নুন দিয়েও খাওয়া যায়। সেটা নির্ভর করবে মুখের স্বাদের উপর।

এই ফলের রসের তৈরী সুপ শরীরের ও ত্বকের পক্ষে খুবই ভাল। এটা দুপুরেও খাওয়া যায় আবার বিকেলের দিকেও খেতে পারেন। এর সঙ্গে পালং শাক সিম কড়াইশুঁটি ইত্যাদি এক সঙ্গে সেদ্ধ করে তাতে একটু নুন গোলমরিচ ও সস মিশিয়ে বেশ ভাল খাওয়া যায়। পেঁপে সেদ্ধও খুব উপকারী। তার সঙ্গে উচ্ছে সেদ্ধ ও ওল সেদ্ধ খাওয়া ভাল। ওল এবং উচ্ছে খেলে রক্ত পরিষ্কার হয়। পাইলস-এর গোলযোগ থাকলে তা ভাল হয়ে যায়। আর ত্বকের সাধারণ ব্যাধিগুলি হয় না। উচ্ছে করলা সেদ্ধ অথবা কাঁচা বেটে তার রস এক চামচ সকালে খেলে তা ত্বকের পক্ষে খুব উপকারী। লিভার ভাল থাকলে ত্বকে সাদা দাগ হয় না। এইসব তেল ঘি ছাড়া সেদ্ধ জাতীয় খাদ্য ফলের রস তেতো ইত্যাদিতে লিভার ভাল থাকে।

দুপুরের খাওয়ার সময় আর এক ভাবেও খাওয়া যায়। শীতকালে অবশ্য এটা করা যায় ভাল করে। অর্ধেক টমেটো অর্ধেক শশা ও একটি পেঁয়াজ পাতলা করে কাটতে হবে। তারপর সেগুলি এক কাপ দুধ গরম করে তাতে একটি পাতিলেবুর রস দিয়ে ছানা কাটিয়ে নিতে হবে। সেই দুধে এইগুলি সব মিশিয়ে তারপর স্বাদ অনুযায়ী নুন মিষ্টি মিশিয়ে নিতে হবে। বাঁধা কপির পাতা ভাপিয়ে নিয়ে তাতে একটু নুন গোলমরিচ ছড়িয়ে তার ওপর এই খাদ্য তুলে খাওয়া যায়। টেবিলে খেতে দেওয়ার সময় বেশ যত্ন করে সাজিয়ে খেতে পারেন তাতে দেখতেও ভাল লাগে আর খাওয়ার রুচিও বাড়ে।

মধুপর্ণী

অঙ্গনা

শিশুমন বিকাশে অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

অভিভাবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শুধুমাত্র শিশু ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই প্রয়োজন নয় দেশের কাঠামোকে শক্তিশালী ও মহান আদর্শে গড়ে তুলতে হলে কৈশোর ও যৌবনের শিক্ষাব্যবস্থায়ও অভিভাবক ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিবিড় সম্পর্কের প্রয়োজন।

অঞ্জলি চৌধুরী

শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। তারাই এক সময় জাতির মেরুদণ্ড হয়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। সেই শিশুদের শিক্ষা নিয়ে দেশে দেশে নানা চিন্তা-ভাবনা গবেষণা চলছে। কিছুদিন পূর্বে লিউবভ ইভানোভা শিক্ষা ব্যবস্থার কয়েকটি নীতি সম্বন্ধে 'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকায় আলোচনা করেন। কালুগার ১৩ নং স্কুলের অধ্যক্ষা এশিনা তাঁর ছুটির দিন ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ী ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দেন। তিনি শিশু ছাত্রদের পারিবারিক আবহাওয়াটা জানতে পারলে তখনই তিনি ছাত্র সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টি-ভঙ্গি খুঁজে বার করতে পারেন, ওমস্ক শহরের একটি স্কুলের অধ্যক্ষ ইভান শেরেদভ পরিবারের মধ্যে বড়দের সঙ্গে বাচ্চাদের যোগাযোগ তাড়াতাড়ি ছিন্ন হওয়া নিয়ে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। কালুগার অধ্যক্ষা ও ওমস্ক শহরের অধ্যক্ষের চিন্তাটা আমাদের দেশের শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের গড়ে তোলার পক্ষেও বিবেচ্য।

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকা অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গভীর সংযোগ রক্ষা করে চলতে পারলে আমাদের ভবিষ্যতের আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠতে পারে। শিশুকে শিক্ষা দেবার প্রারম্ভেই (যেভাবে কিণ্ডার গার্ডেন স্কুল-গুলিতে শিক্ষা দেওয়া হয়) শিশুদের নিজস্ব পৃথক পৃথক পছন্দের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। রং-তুলি খেলনা রঙীন ছবি থেকে শুরু করে অনেক রকমের জিনিস শিশু ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা হয়। শিশুরা নিজেরাও নিবিষ্ট মনে নিজেদের পছন্দ মাফিক জিনিস তুলে নিয়ে খেলার ছলে শিক্ষাজীবন শুরু করে। নিজেদের পছন্দ মতো জিনিস পেয়ে অনেক দুরন্ত ছেলেও বশ মেনে যায়। স্কুলই তখন তাদের সবচেয়ে প্রিয়স্থান হয়ে ওঠে। শিক্ষক বা শিক্ষিকার সঙ্গে সম্পর্ক তখন বাড়ীর লোকেদের চেয়ে গভীর। কলকাতার কোনো জনৈকা শিক্ষিকা একদিন বলেছিলেন জানেন দুরন্ত বলে যেসব ছেলে-মেয়েরা বাড়ীর লোকেদের অতিষ্ঠ করে তোলে তারাই আমাদের কাছে কত শান্ত ভাবুক, সুবিবেচক। কোন কোন শিশুদের সুবিবেচনা আমাদের মুগ্ধ করে দেয়। ওদের বুদ্ধি সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই।

শিশুদের বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশে বাড়ীর পরিবেশের গুরুত্ব অনেকখানি। শিশু মনটি প্রথম বিকশিত হয় বাড়ীতে। অভিভাবকেরা শিশুর মন ও মেজাজ-এর ওপর জোর দিয়ে তার প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করতে পারেন। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে আট বছরের এক ছেলে স্কুলের অশান্তি ও দুর্ভাবনার কারণ, ছেলেটি লেখাপড়া অপেক্ষা মাটির পুতুল গড়তে ও ছবি আঁকতে পারলেই খুশী। অথচ বাড়ীর লোকেদের তাতে ঘোর আপত্তি। ছেলেটির শখ ও অভিভাবকদের আশা উভয় মিলে মাঝে মাঝে বাড়ীতে অশান্তির ঝড় বয়ে যায়। এই হট্টগোলের প্রভাব শিশুমনের ওপর এত গভীরতা বিস্তার করে যে বালকটি অভিভাবকদের দেখলেই বই-এর পাতা অন্যমনস্কভাবে উল্টিয়ে যায় আর নিজের শখ মেটাতে বাড়ীর ছাদ অর্থাৎ গোপন ও নিরালা স্থানগুলিকে বেছে নেয়। উপরন্তু নিজের প্রতিভায় যা সৃষ্ট হল তাকেও সংগোপনে লুকিয়ে রাখতে হয়, ফলে ছেলেটি সব সময় অন্যমনস্ক। বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশায় জড়তা থেকে মুক্ত হতে পারে না। নিজস্ব রুচি ও পছন্দ বিকাশের দিনে এখনও অনেক পরিবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন করাকে মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করে শিশুদের জন্মগত প্রতিভাকে ধ্বংস করে। শিশু-শিক্ষায় পরিবেশের মূল্য অনেকখানি। বাড়ীর যে পরিবেশে শিশু ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে ও যে পরিবেশে অর্থাৎ স্কুলে সমবয়সীদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মেলা-মেশার সুযোগ পায় সেখান থেকে তার বুদ্ধিবৃত্তি ও সৃজনীশক্তির স্ফুরণ হয়। এই ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে অভিভাবকদের যোগাযোগ যদি গভীরতর না হয় তবে শিশুটি সম্বন্ধে উভয়পক্ষে অনেক কিছুই অজ্ঞাত থেকে যায়।

সমাজচেতনা প্রতিবেশীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া, অপরের সুবিধার জন্য নিজের সুখের কিছু বিসর্জন দেওয়া —এসব গুণগুলিই শিশুর মনে বিকশিত হতে থাকে শিশুবয়স থেকেই এবং এসময় তারা যাদের সান্নিধ্য সবচেয়ে বেশী পায় পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব তাদেরই।

রূপ-বিশেষজ্ঞ পামেলা রোল্যান্ড

ম্যাকস্ ফ্যাক্টরের আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন রূপ বিশেষজ্ঞ শ্রীমতী পামেলা রোল্যান্ডস রূপ সাধনার জগতে একটি সুপরিচিত নাম। সুদর্শনা এক মাথা সুন্দর কেশের অধিকারিণী পামেলা যেন সচেতন নারী মনের কাছে সৌন্দর্যের দূতস্বরূপ।

এই রূপচর্চার জীয়ন কাঠি নিয়ে তিনি সমস্ত ইউরোপ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকা ভ্রমণ করেছেন। তাই বিভিন্ন দেশের নারীর রূপচর্চা বিষয়ে তাঁর জ্ঞানও প্রচুর।

তার স্বীকৃতি স্বরূপ লণ্ডনের আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা আর্নল্ড টেলর স্কুল অফ বিউটি থেরাপী কর্তৃক তিনি সম্বর্ধিতও হন।

শ্রীমতী পামেলা স্কুল জীবন শেষ করার পরই প্রখ্যাত রূপচর্চার সামগ্রী প্রস্তুতকারক সংস্থা ম্যাক্স ফ্যাক্টরে যোগদান করেন। তাঁদের প্রতিভূ হয়েই শ্রীমতী পামেলা সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন। বোম্বাই ও নয়াদিল্লীতে তিনি এ দেশের রূপচর্চার ব্যাপারে উৎসাহীদের সঙ্গে সর্বাধুনিক রূপচর্চার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

রান্না করে দেখুন

মিষ্টিমুখ

এখানে যে মিষ্টিগুলি তৈরীর কথা বলা হল তার মধ্যে গাজরের হালুয়া, গুলাব জামুন ও লাউয়ের পায়েস ছাড়া অন্যগুলিতে বেশী দুগ্ধজাত উপকরণ লাগবে না। অবশ্য চিনি আর ঘি ছাড়া কোন মিষ্টিই তৈরী করা যায় না কাজেই ওগুলি লাগবেই।
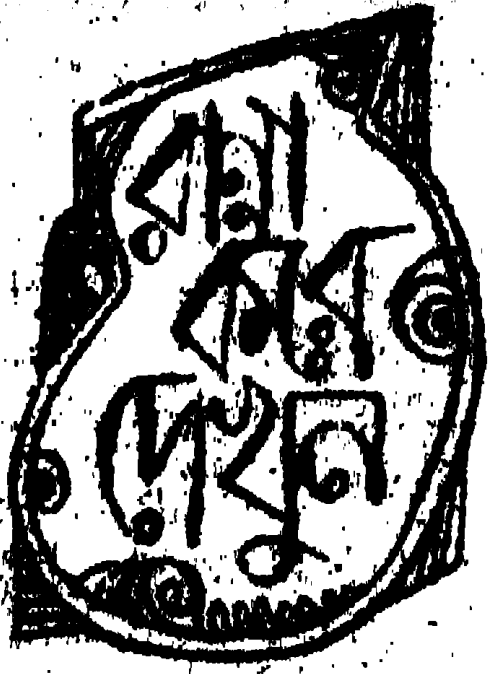
উপকরণঃ গাজর ১ কেজি ২৫০ গ্রাম খোয়া ক্ষীর, ৪ কাপ দুধ, ৪০০ গ্রাম চিনি, ½ কাপ কাজুবাদাম কুচোনো ও কিসমিস, ১০০ গ্রাম ঘি।

প্রস্তুত প্রণালীঃ ১। গাজরের ওপরের ছাল ছাড়িয়ে কুরে নিয়ে দুধ দিয়ে সেদ্ধ করুন। ২। গাজর সেদ্ধ হয়ে গেলে এবং দুধ শুকিয়ে গেলে ঘি, চিনি ও খোয়া দিন। ৩। নাড়তে নাড়তে শুকিয়ে এলে ঘি মাখানো থালায় ছড়িয়ে দিন এবং ওপর থেকে কিসমিস ও কাজু বাদামের কুচি দিয়ে দিন। একটু গরম থাকতে থাকতেই ছুরি দিয়ে চৌকো চৌকো করে দাগ দিয়ে দিন। ঠাণ্ডা হলে টুকরো টুকরো করে কেটে থালা থেকে তুলে নিন।

গুলাব জামুন ঃ

উপকরণ ঃ ২৫০ গ্রাম খোয়া ক্ষীর অথবা মিল্ক পাউডার ও এক টেবিল চামচ মাখন, ৫০ গ্রাম ময়দা, একটু দুধ, ½ কেজি চিনি, ঘি।

প্রস্তুত প্রণালীঃ ১। খোয়া ক্ষীরে ময়দা মিশিয়ে দুধ দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। মিল্ক পাউডার হলে মাখন ময়দা ও দুধ দিয়ে মাখুন। ২। চিনি দিয়ে ঘন রস তৈরী করে নিন। এই রসে এলাচ গুঁড়ো কিম্বা গোলাপ জল দিয়ে সুগন্ধিত করে নিন। ৩। খোয়া ক্ষীরের ছোট ছোট গুলি পাকিয়ে ঘিয়ে লাল করে ভেজে নিন এবং রসের মধ্যে ছেড়ে দিন। এটি উত্তর প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ মিষ্টি।

লাউয়ের পায়েস ঃ

উপকরণ ঃ ২৫০ গ্রাম লাউ, ১ কেজি দুধ, একটু ঘি, ২৫০ গ্রাম চিনি, গোলাপ জল।

প্রস্তুত প্রণালীঃ ১। লাউ কুরুনি দিয়ে কুরে নিয়ে হাত দিয়ে চেপে জল বার করে দিন। ২। ঘিয়ে ভাজুন। ৩। দুধ দিয়ে সেদ্ধ করতে থাকুন। ৪। দুধ ঘন হয়ে এলে এবং লাউ সেদ্ধ হয়ে গেলে চিনি দিন। ৫। চিনি গলে গেলে এবং চিনির রস মরে এলে নামিয়ে নিয়ে গোলাপ জল দিন।

পেঠা ঃ

উপকরণ ঃ চাল কুমড়ো ½ কেজি, চিনি ½ কেজি, একটু গোলাপ জল।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ ১। চাল কুমড়োর খোসা ছাড়িয়ে কাঁটা দিয়ে বিঁধে বিঁধে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে নিন ও বড় বড় টুকরো করে কেটে রাখুন। ২। চুনের জলে টুকরোগুলো আধ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। ৩। চুনের জল থেকে তুলে নিয়ে ভাল করে ধুয়ে সেদ্ধ করুন ও জল ঝরিয়ে নিন। ৪। চিনির খুব ঘন রস তৈরী করুন। রসে একটু গোলাপ জল দিন। ৫। চাল কুমড়োর টুকরোগুলো ওই রসে নাড়াচাড়া করুন। রস উনুনে বসিয়ে নেবেন। টুকরোগুলোর গায়ে ভাল করে রস লেগে গেলে নামিয়ে নিন। ৬। রস থেকে তুলে নিয়ে টুকরোগুলো থালায় সাজিয়ে রাখুন। ঠাণ্ডা হলে সমস্ত গায়ে চিনি শুকিয়ে সাদা হয়ে লেগে থাকবে এবং পেঠাগুলো শুকনো খটখটে হবে। এই মিষ্টি অনেক দিন ভাল থাকে এবং এতে দুধ ঘি কিছুই দেওয়া হয় না বলে যাঁরা হজমের গোলমাল বা পেটের অসুখে ভোগেন তাঁরাও নির্ভাবনায় খেতে পারেন।

মুগের ডালের বরফি ঃ

উপকরণ ঃ ২৫০ গ্রাম মুগের ডাল, ৩০০ গ্রাম চিনি, ½ খানা নারকেল, ৪ টেবিল চামচ ঘি, একটু এলাচ গুঁড়ো।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ ১। আগে মুগের ডাল ভিজিয়ে রাখুন তারপর নরম হওয়া পর্যন্ত সেদ্ধ করুন। মিহি করে বেটে নিন। ২। নারকোল কুরে পিষে নিন। ৩। চিনিতে এক কাপ জল দিয়ে রস তৈরী করুন। ৪। কড়াইতে ঘি দিয়ে ডাল বাটা একটু ভেজে নিন। ৫। ভাজা ডালে পেষা নারকোল ও রস দিয়ে নাড়তে থাকুন। ৬। সমস্তটা ভাল পাকিয়ে এলে একটা ঘি মাখানো থালায় ছড়িয়ে দিন এবং ওপর থেকে গুঁড়োনো ছোট এলাচ দিন। ৭। গরম থাকতে থাকতেই ছুরি দিয়ে দাগ দিয়ে দিন এবং ঠাণ্ডা হলে বরফির মতো টুকরো করে কেটে নিন।

লাউয়ের লাড্ডু ঃ ঠিক পেঠার মতোই লাউয়ের মিষ্টিও তৈরী করা যায়। পেঠার মতো বড় বড় টুকরো না করে কুরুনি দিয়ে কুরে নিতে হয়। কুরুনি দিয়ে কুরে নিয়ে সেদ্ধ করে বাড়তি জল চেপে বার করে সম্পূর্ণ জল ঝরিয়ে নিয়ে ঘন চিনির রসে নাড়াচাড়া করে নিলেই লাউয়ের লাড্ডু তৈরী হল। লাউ না কুরেও পেঠার মতো টুকরো টুকরো করে মিষ্টি তৈরী করা যায়।

মোহন পুরি লাড্ডু ঃ উপকরণঃ ২৫০ গ্রাম সুজি ২৫০ গ্রাম ময়দা ২৫০ গ্রাম চালের গুঁড়ো ½ কেজি পেষা চিনি ১০০ গ্রাম কাজু এলাচ গুঁড়ো।

প্রস্তুত প্রণালীঃ সুজি ময়দা ও অর্ধেকটা চালের গুঁড়ো একসঙ্গে মেখে আধ ঘণ্টা রেখে দিন। ২। ছোট ছোট লেচি কেটে চালের গুঁড়োয় ডুবিয়ে ডুবিয়ে লুচির মতো বেলে নিন এবং ঘিয়ে মুড়মুড়ে করে ভাজুন। ৩। সমস্ত লুচি ভাজা হয়ে গেলে হামানদিস্তা দিয়ে গুঁড়িয়ে নিয়ে চিনির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। কাজু বাদাম কুচি কুচি করে কেটে মেশান এলাচের গুঁড়ো দিন। ৪। একটু আঁচে বসিয়ে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে লাড্ডুর আকারে গড়ে নিন। শুধু ময়দা দিয়েও এই একই প্রণালীতে মোহন পুরির লাড্ডু তৈরী করা যায়। খেতে অতি চমৎকার।

বেসনের লাড্ডুঃ

উপকরণঃ ২৫০ গ্রাম বেসন ২৫০ গ্রাম চিনি এক কাপ ঘি একটু এলাচ গুঁড়ো।

প্রস্তুত প্রণালীঃ ১। ঘি গরম করে কম আঁচে বেসন ভাজতে থাকুন। ২। চিনি ও জল দিয়ে ঘন রস তৈরী করুন। ৩। বেসন ভাল করে ভাজা হয়ে গেলে আস্তে আস্তে চিনির রস দিয়ে সাবধানে নাড়তে থাকুন যাতে দলা না পাকিয়ে যায়। এলাচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। গরম অবস্থাতেই গোল গোল করে লাড্ডু পাকিয়ে নিন। ইচ্ছে করলে থালায় ঢেলে বরফির আকারেও কেটে নিতে পারেন।

সুজির লাড্ডুঃ

উপকরণঃ এক কাপ সুজি তিন-চার কাপ পেষা চিনি তিন টেবিল চামচ ঘি এক কাপ দুধ এলাচ গুঁড়ো কিসমিস ও কাজু বাদাম।

প্রস্তুত প্রণালীঃ ১। কাজু বাদাম ও কিসমিস ঘিয়ে ভেজে কুচিয়ে নিন। ২। সুজি ঘি দিয়ে ভাল করে ভাজুন। ৩। চিনি ও কুচানো কাজু বাদাম ও কিসমিস দিন। ৪। সমস্তটা একটা পাত্রে ঢেলে নিয়ে দুধ ছড়িয়ে দিন এবং হাত দুধে [illegible] ভিজিয়ে নিয়ে লাড্ডুর আকারে [illegible] করে নিন।

ছোলার ডালের টফিঃ

উপকরণঃ ২২৫ গ্রাম ছোলার ডাল একটি নারকোল ৪৫০ গ্রাম চিনি এক টেবিল চামচ ঘি ১০০ গ্রাম কাজু বাদাম এক চা-চামচ এলাচ ও জায়ফল গুঁড়ো একটু ভ্যানিলা এসেন্স।

প্রস্তুত প্রণালীঃ ১। কাজু বাদাম কুচি কুচি করে কেটে নিন। ২। ছোলার ডাল সেদ্ধ করে পিষে নিন। ৩। নারকোল কুরে নিন। পেষা ছোলার ডাল নারকোল ও চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে পাক করুন। ৩। ভাল করে পাক হয়ে গেলে এলাচ ও জায়ফল গুঁড়ো ও ভ্যানিলা দিন। ৪। কাজু বাদাম মিশিয়ে একটি ঘি মাখানো থালায় ছড়িয়ে দিন। ৫। গরম থাকতেই ছুরি দিয়ে চৌকো চৌকো করে দাগিয়ে নিন। ঠাণ্ডা হলে টুকরো টুকরো করে কেটে নিন।

সাধনা মুখোপাধ্যায়

জননী

সুস্মিতা রায়

মা ভাই-বোনদের ছেড়ে সুজিত যখন বৌ মালা আর দু বছরের মেয়ে নয়নাকে নিয়ে আলাদা হোল, মা কিরণময়ীর বুকটা যেন নরম ঘাস-মাটির ওপর দুরন্ত ঘোড়া ছুটে যাওয়ার মত ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

সুজিত তাঁর বড় ছেলে মালা এ বাড়ীর প্রথম বৌ আর মেয়েটা সেটাতো যেন একতাল মাখনের ডেলা, সেই মাখনের ডেলাটাকে তো বলতে গেলে কিরণময়ীই বড় করেছেন, মালা তো শুধু নামেই মা, শুধু যে কটা মাস যন্ত্রণা সহ্য না করলেই নয়, সেটুকু যন্ত্রণারই ভাগীদার কিন্তু তারপর ...পৃথিবীর মাটি ছোঁওয়ার পর সব তো কিরণময়ীর, মালা তো এনেই নিশ্চিন্ত... দু মাস ছুটি নিয়ে নিজের শরীর সারিয়ে আবার সেই দশটা পাঁচটা। দশটা পাঁচটাই বা কেন, নটা ছটা। কোন দিন আবার সাতটা। আর তার মানেই সকাল থেকে রাত্তির। সকাল থেকে সময় থাকে নাকি মালার মেয়ের দিকে নজর দেবার।...আর রাত্রে সে তো তখন ক্লান্ত তখন মেয়ের ঝামেলা...মাঝে মাঝে শুধু বুকে চেপে আদর করা আর ঘুমের মধ্যে বারকয়েক কাঁথা বদলানো...এইতো। তাও তো সে কাজটা বেশীর ভাগ সময় সুজিতই করে। সুজিতই রাত্রে পাঁচবার মেয়ের কাঁথা পরীক্ষা করে...মালা জানার বোঝার আগেই নিঃশব্দে কাজ সেরে নেয়। ভোরবেলা সুজিতই তো ওকে তুলে কিরণময়ীর ঘরে দিয়ে আসে। সেই একরত্তি মানুষটাকে এই দুটি বছর ধরে নাড়াচাড়া করছেন কিরণময়ী, গায়ে হাতে বুকে মানে সব মিলিয়ে মেয়েটা তো তাঁরই সঙ্গে মিশে আছে। সেই মাখনের ডেলাটাকে ছিঁড়ে নিয়ে আলাদা বাসা কোরলো সুজিত, সে সুজিত সেদিনও মা ছাড়া কথা বলতো না...মা না রাঁধলে ভাল করে খেতো না...

মা না বললে কোন কাজে এগোতো না।

সুজিত যেন তাঁর বুকের খুব কাছেই ছিল সেই নৈকট্য যে ঘোচালো মালাকে বিয়ে করে। ভিনজাত, ভিনদেশের মেয়ে, হুট করে বলে বোসলো সুজিত, বিয়ে করবো। কিরণময়ী তা-ও আপত্তি করেন নি, বয়স ত্রিশ হলে কি হবে, সুজিত এখনও ছেলেমানুষ, তার বিয়ে করাটাও যে একটা বায়না, সেই বায়না কিন্তু জেদে রূপান্তরিত হোল। সবাই কত বোঝালো, কিন্তু সুজিতের জেদ, না ওকেই বিয়ে করবো। তোড়জোড় করে মামা-মাসীরাই একদিন মেয়ে দেখে এলো, সুন্দর মেয়ে ভাল মেয়ে...আপত্তির কি আছে। অতএব বিয়ে হয়ে গেল। আর মায়ের আঁচলের আড়াল থেকে বেরিয়ে সুজিত যে কখন বৌ-এর আঁচলের তলায় ঢুকলো, কিরণময়ী টেরও পেলেন না। আর টের পেলেই বা...এতে অন্যায়ই বা কি? বরং দুটিতে মিলে মিশে ভাব-সাব করে থাক এই দেখেই খুশী হন তিনি। আহারে! বেচারী সুজিত, ছোটবেলায় বাবা মারা গেছে, চিরকালই বলতে গেলে অবহেলায় মানুষ। সেজন্যই বড় বেশী মা-ঘেঁষা। এখন স্ত্রীর একটু ভালবাসা...আদর... চাইবেই তো। কিরণময়ী নিশ্চিন্ত হোলেন মালাকে বললেন, বৌমা ওর দিকে একটু নজর রেখো...ও কিন্তু এখনও ছেলেমানুষ...

নতুন বৌ মালা ফোয়ারার মত হেসে বললো, সে আপনাকে ভাবতে হবে না মা, আমি সব বুঝি!

তারপর তো এলো সেই মাখনের ডেলাটা বছর না ঘুরতেই। কিরণময়ী ভাবলেন, আহা ছেলেমানুষ ওরা ছেলেমানুষীর বশে একটা পুতুল এনেছে...বেশ তো ভালই তো। কিরণময়ী তো আছেন...তাঁর সুজিতও যেমন...মালাও তেমন...মা যা করবেন...মা যা বলবেন...হাসপাতালে নয়না হবার সময়—মালার সে কী কান্না...আপনি যাবেন না... সবাই অবাক হয়ে বলছে—কেমন মেয়ে মাকে আপনি বলে!

ভুলটা ভেঙে দেন মালার মা আমি হলাম ওর মা উনি হলেন ওর স্বামীর মা... মানে শাশুড়ী।

সবাই অবাক। নিজের মা পাশে দাঁড়িয়ে...শাশুড়ীর আঁচল চেপে ছেলেমানুষের মত কাঁদছে মালা। নিজের মা চলে গেলেন। শাশুড়ী রয়ে গেলেন সারা রাত।

তারপর নয়না এলো। মেয়ে দেখে তো খুশী ধরে না কিরণময়ীর। মাখন মাখন রং, মাথায় একমাথা চুল...টুকটুকে ঠোঁট...ছোট্ট একটা বিলিতী পুতুল যেন। কিরণময়ীর বুক জুড়ে গেল...মন ভরে গেল...

বাড়ী এসে মালা বিশ্রাম নিলো... আবার শুরু হোল তার কাজের জীবন...আর কিরণময়ীর কাছে দিনে দিনে কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটার মত বাড়তে লাগলো নয়না...আর ক্রমশঃ দূরে সরতে লাগলো সুজিত।

প্রথম প্রথম এতটা বোঝেন নি কিরণময়ী, বড় ছেলে হলেও তাকে সংসারের আক্রমণের কোনদিনই বিশেষ জড়ান নি কিরণময়ী, যেটুকু ঝড় গেছে তার সবটুকুই তাঁর নিজের ওপর দিয়েই গেছে। ঝাপটার মত লেগেছে অন্য ছেলেমেয়েদের। সেই না বুঝতে দেওয়াটা যে সত্যিই না বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কিরণময়ী বোঝেন নি। কিন্তু সেই ছেলেমানুষ সুজিত যে ভেতরে ভেতরে একখানি স্বার্থপর হয়ে উঠেছে, কেউ কল্পনাও করে নি, তার বিয়ের পর থেকেই সংসারের বেশীর ভাগ দায়িত্ব কখন যেন তার পরের ভাই প্রসেনজিতের ওপর এসে পড়েছিল, কিছুটা নিজের কর্তব্যবোধে কিছুটা বা দাদা-বৌদির প্রতি আন্তরিক ভালবাসায় প্রসেনজিৎ কবে থেকে যেন মাকে বলতে শুরু করলো, দাদাকে বেশী বলার দরকার কি মা...দাদার এখন কত খরচ...

সত্যিই তো, কিরণময়ীও তো তাই চান, ওরা দুটিতে ছেলেমানুষ, এখন কত খরচ... কত দায়িত্ব...মালাকে ডেকে বলেন কিরণময়ী, দেখো মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভেবে একটু হিসেব করে খরচ কোর...

বেলকুঁড়ির মালার মত হেসে মালা বলে, সে হবেখন মা, আর আপনারা তো আছেন...

সেই তো, আর কেউ না থাক, প্রসেনজিৎ তো আছে। প্রসেনজিৎই নিচ্ছে...সব দায়িত্ব।

সেই সুজিত যখন আধ আধ কথা বলতে শেখা দু বছরের মেয়েটাকে নিয়ে আলাদা হোল, কিরণময়ী কেমন যেন অবাক

গিয়ে গেলেন। আর আলাদা হোলেও তো অন্তত, একটা ঠিকানা পর্যন্ত রেখে গেল না। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে তর্কাতর্কি করে প্রসেনজিতের দায়িত্বে মা, দুটো ছোট ভাইকে রেখে চলে গেল সুজিত। আর প্রসেনজিতের বৌ সুতপা তো আছেই।

বিয়ে করেছে প্রসেনজিৎ। নেহাতই সাদা-মাটা প্রেমের গল্পের মত...কলেজে পড়ার সময় আলাপ...অনেক দিন হয়ে গেল প্রসেনজিৎ যখন উপযুক্তই তখন আর...আর তার বিয়ের পাঁচ মাসের মাথাতেই চলে গেল সুজিত।

কিরণময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন. মনে মনে সুতপাকে দোষী সাব্যস্ত করে যে অভিসম্পাত দিলেন না তা নয়...ভাবলেন, কি হোল, থাকগে যা হবার হোল।

ছোট্ট একটা ছিমছাম বাড়ী। নিজের পছন্দমত আসবাব আর সব কিছু। আর এমন সুপুরুষ উপযুক্ত স্বামী তো রয়েছেই আর ছোট্ট পুতুলের মত মেয়েটা। এমন একটা ছবিই তো কতদিন ধরে মনে মনে এঁকে রেখেছে মালা। সেই ছবিটাই তো আজ চোখের সামনে দেখছে।

বাড়ী দেখতে আসার সময় প্রতিটি তাক প্রতিটি কোণ...প্রতিটি দরজা...জানলা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে মনে মনে আনন্দর ফুলঝুরি হয়ে বলেছে মালা, এসব আমার, আমার নিজের মত করে এসব আমি সাজাবো।

ছোটবেলা থেকে পাঁচজনের সংসারে মানুষ। বিয়েও হোল পাঁচজনের মধ্যে, ভাল লাগতো না। মালার দিদিদের বাড়ী গেলে যে কি ভাল লাগতো, বেশ থাকে ওরা। সুজিতকে বিয়ে করে মনে ভেবেছে, একটু চাপ দিয়ে...তারপর তো দুর্ঘটনাটা ঘটলো... যাক তবু একটা দিক দিয়ে শ্বশুরবাড়ীর প্রতি কৃতজ্ঞ মালা, শুধু বিয়ের পর নটা মাস কষ্ট করা ছাড়া মেয়ের জন্য আর বিশেষ কোন কষ্ট পেতে হয়নি। এখন তো সেই মেয়ে প্রায় বড়ই হতে চললো...আর দেড় দু বছর কাটালেই তো স্কুল, আর তার নিজের মা তো আছেনই বিয়ে না হওয়া দুটো বোনও আছে। কচি বাচ্চার ঝামেলা নিতে চায়নি মা, এখন আর আপত্তি করেন না। বাবা সবে রিটায়ার করেছেন, ভাই পড়ছে। দুটো বোনের বিয়ে বাকী।

সুজিত প্রথমে একটু ইতস্তত করেছিলো, কিন্তু যেদিন থেকে সুতপা এলো... বড্ড বেশী তীক্ষ্ম মেয়েটা...সে যেন এসেই বুঝে গেল তার স্বামীটি বড় বেশী মুখচোরা...বড় বেশী দায়িত্বশীল।

থাকগে ওসব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি। নিজের মনের মত করে ঘর সাজালো মালা।

মেয়েকে বাপের বাড়ী রেখে অফিস যায় মালা। ফিরে এসে দেখে সুজিত বসে আছে। ছোট্ট বোন জলি হাসিমুখে বলে, সুজিতদা কোয়ার্টার পেয়েছে শুনে [illegible]।

সুজিতের মুখের দিকে তাকালেন মালা, দ্বিধাভরা গলায় বললেন, হ্যাঁ রোজ চেয়ারে বসে বসে পা দোলাচ্ছে জলি। তেল পনেরো বছরের পুষ্ট পা...হাঁটুর উপর ফ্রক পরেছে...সুজিতের কেমন অস্বস্তি হয়।

জলি খবরের কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে নিজের মনেই বলে, কবে থেকেই তো শুনছি কোয়ার্টার পাচ্ছি... দেখি না তো কিছু...

সুজিতের মুখটা বিবর্ণ দেখায়। মালার মা চা নিয়ে এসে ক্ষমা চাওয়ার গলায় বললেন, তুমি কিছু মনে করো না সুজিত... মেয়ের দিকে ফিরে তীক্ষ্ণস্বরে বলেন, বড্ড মুখ হয়েছে তোর না।

কাছাকাছি আত্মীয়রা থাকে। বাড়ী বয়ে এসে খোঁজ খবর নেয় অনেকেই, সুজিতের কোন খবর পেলি। কেউ কেউ তির্যক চোখে তাকায় সুতপার দিকে। বড় বেশী সোজা মেয়েটা। এক কাপ চা করে নিয়ে আসে সুতপা, হাসিমুখে বলে, শুনেছেন পিসিমা, আমাদের বিপু যে চাকরি পেয়েছে।

পিসিমা অবাক হয়ে যান। এই বাজারে চাকরি...

কিরণময়ী বললেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে হ্যাঁ দিদি, প্রসেনের একজন...বলেন আর ভাবেন আহা রে। এখন যদি ও থাকতো সুজিতের যা খাওয়া নিয়ে...

একদিন এসে খবর দিলে এক ভাই-এর বৌ। কথা বলতে বলতে সব সময় হাসে বীণা, জানেন দিদি, সুজিতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বললো, কোয়ার্টার পেয়েছে, খুব ভাল জায়গা গড়িয়াহাটের কাছেই।

ভাল। সেই ভাল, কিরণময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু জোরের সঙ্গেই বলেন, আমি তো তাই বলি, আলাদা হোক আর যাই হোক, সুজিত আমার তেমন ছেলে নয় যে শ্বশুরবাড়ীর কাছে থাকবে...মালাও তো কখনো বাপের বাড়ী যেতে চাইতো না, থাক তো দুয়ের কথা।

হঠাৎ একদিন সকালে ভাই এসে বলল, কাল রাতে সুজিত আর মালা এসেছিল।

দুঃসংবাদ শোনার মত ফ্যাকাশে হয়ে যায় কিরণময়ীর মুখ। ভাই বললে, নয়নার খুব অসুখ, রাতে কোন ডাক্তার যায়নি, তাই আমার এখানে এসেছিল, চেনা ডাক্তার নিতে।

সুতপা প্রসেনজিৎ বেরিয়ে আসে। প্রসেনজিৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে, কি হয়েছে নয়নার। জানি না কি, কিরণময়ীর ভাই পকেটে হাত দিলো, তোর বৌদি নিজে এসেছিল, কিরণময়ীকে বললো, তুমি একবার যাও দিদি।

প্রসেনজিৎ তাকালো মায়ের দিকে। অভিমানী গলায় কিরণময়ী বললেন, আমাকে তো একটা খবরও দেয় নি...

শুধুই রয়েছে একটা ঠিকানা আর কয়েক কিরণময়ীর হাতে দেয় ভাই।

চিরকুটটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে যান কিরণময়ী। প্রসেনজিৎ এগিয়ে এসে কাগজটা মায়ের হাত থেকে তুলে নিলে।

নিজে এগিয়ে পড়ে না, কিন্তু কিরণময়ীর জানতে বাকী নেই বড় চালাক মেয়ে ঐ সুতপা, নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েই ঠিকানাটা সে পড়ে নিয়েছে, কিরণময়ীর মনে হোল, সুতপা হাসছে, সারা মুখে চাপা হাসি...সহ্য করতে পারেন না কিরণময়ী, নির্বাক হয়ে গেছেন তিনি।

কিরণময়ীর এত দিনের সঞ্চিত অভিমান আজ যেন এক কঠিন পাথরে ধাক্কা লেগে চৌচির হয়ে ফেটে পড়ল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। শীর্ণ গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

পুনশ্চ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মাদাম ঃ কর্ণেল যদি ভদ্রভাবে না থাকেন, তাহা হইলে এদেশের লোকেরা আমাদিগকে সম্মান করিবে কেন?

শিশির ঃ কর্ণেল যে অনাবৃত দেহে আমার বাংলোতে শয়ন করিয়াছিলেন তাহা আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন?

মাদাম ঃ আপনাদের এই দেশেরই জনৈক মহাত্মার অনুগ্রহে জানিতে পারিলাম।

শিশির ঃ তিনি কে?

মাদাম ঃ মহাপুরুষ; আমাদের প্রভু।

শিশিরকুমার শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

(২)

শিশিরকুমার একদিন প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় কর্ণেল অলকট, মিস্টার হুইনরিজ ও মিসেস বেটসের সহিত একত্রে আহার করিতেছেন এমন সময় মধুর ঘণ্টাধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ঘরের ভিতরে অন্য কেহ ছিল না, অথচ ঘন্টাধ্বনি হইতেছে লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার বিস্মিত হইলেন। তিনি কর্ণেলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিসের শব্দ?

কর্ণেল মৃদু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, 'ঘন্টাধ্বনি।'

শিশির ঃ কে বাজাইতেছে?

কর্ণেল ঃ মাদাম।

শিশির ঃ মাদাম? কই তিনি তো এখানে উপস্থিত নাই।

কর্ণেল ঃ অলৌকিক শক্তি প্রভাবে তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব।

শিশিরকুমার ও কর্ণেলের মধ্যে উক্তরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময় বাচুলা এক খণ্ড কাগজ লইয়া শিশিরকুমারকে প্রদান করিলেন। শিশিরকুমার দেখিলেন মাদাম লিখিয়াছেন, মিস্টার ঘোষ তুমি কি আমার স্বর শুনিতে পাইতেছ? মাদাম বিভিন্ন বাংলোতে অবস্থান করিতেছিলেন শিশিরকুমার ছুটিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। মাদাম তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন। শিশিরকুমার তাঁহার অলৌকিক শক্তি লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

(৩)

একদিন সন্ধ্যার পূর্বে শিশিরকুমার ও কর্ণেল অলকট বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় পূর্বোক্ত পার্শী যুবক তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন। যুবকটি মাদাম ব্লাভাৎস্কির অলৌকিক শক্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কর্ণেল ও মাদামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তিনি শিশিরকুমার ও কর্ণেলের সহিত কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে মাদাম সেখানে উপস্থিত হইলেন। মাদাম যুবকের মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন, উপরি উপরি দুইটি টুপি মাথায় দেওয়া কি এ দেশের প্রথা?

ইহার পর তিনি যুবকের মস্তক হইতে একটি টুপি খুলিয়া লইলেন আর একটি তাহার মস্তকেই রহিল। যুবক একটি টুপি মাথায় দিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু কিরূপে দুইটি টুপি হইল তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। শিশিরকুমার মাদামের কার্য প্রত্যক্ষ করিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। কর্ণেল অলকট হাসিয়া বলিলেন, শিশিরবাবু দেখিলেন তো? যুবক একটি টুপি পরিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু মাদাম তাঁহার টুপি স্পর্শ করিয়া মাত্রই ঠিক সেইরূপ আর একটি টুপি সৃষ্টি হইল।

শিশিরকুমার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন দুইটি টুপিই একরূপ। স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিলেন শিশিরকুমার কিরূপে তাহা অবিশ্বাস করিবেন? কিন্তু তাঁহার মনোমধ্যে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল; মাদাম আসিবার সময় কি তাঁহাদের অলক্ষ্যে একটি টুপি হাতে লইয়া আসিয়াছিলেন? যদি তাহাই হয় তবে পার্শী যুবক যে টুপি পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ টুপি তিনি তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে পাইলেন? শিশিরকুমার মনের মধ্যে অনেক যুক্তিতর্ক করিয়া স্থির করিলেন যে, মাদাম টুপি লইয়া আসেন নাই। তবে কি পার্শী যুবক মাদামের নির্দেশ মত একই রকমের দুইটি টুপি মাথায় দিয়া আসিয়াছিলেন? তাহাও সম্ভব হইতে পারে না; কারণ প্রতারণার দ্বারা মানবের হৃদয় অধিকার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব! মাদাম যদি পার্শী যুবকের সহিত একযোগে প্রতারণার দ্বারা শিশিরকুমারকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে যুবক কিছুতেই মাদামের অনুরক্ত সেবক হইতে পারিতেন না। তিনি যতই মাদামের অলৌকিক শক্তির কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার প্রতি তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

(৪)

একদিন শিশিরকুমার ও কর্ণেল বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় কর্ণেল একগুচ্ছ সুচিক্বণ কেশ শিশিরকুমারকে দেখাইলেন। শিশিরকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কেশ কাহার? আপনি রাখিয়াছেন কেন? প্রত্যুত্তরে কর্ণেল বলিলেন, এ কেশ মাদাম আমাকে দিয়াছেন। একদিন তিনি তাঁহার মস্তক হইতে এক গুচ্ছ পলিত কেশ লইয়া স্বীয় শক্তি প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহা এইরূপ সুচিক্বণ কৃষ্ণবর্ণে পরিণত করিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছেন। শিশিরকুমার দেখিলেন ইহাও এক অতি-বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি একদিন মাদাম ব্লাভাৎস্কিকে বলিলেন, 'আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এইরূপ কেশগুচ্ছ আপনার মস্তক হইতে দিন, আমি তাহা কলিকাতায় আমার বন্ধুবর্গকে দেখাইব।'

মাদাম বলিলেন আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতে পারিব না, কারণ মহাত্মাদের অনুগ্রহ ব্যতীত আমার এই পক্বকেশ কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইতে পারে না।

এইরূপ কথোপকথনের দুই একদিন পরে, একদিন রাত্রে শিশিরকুমারের শয়নকক্ষে বসিয়া কর্ণেল মাদাম ও শিশিরকুমার [illegible] বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। মাদাম বক্তা, শিশিরকুমার ও কর্ণেল শ্রোতা। মাদাম ব্লাভাৎস্কির জ্ঞানের গভীরতা লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমারের মনে হইতে লাগিল যে মাদাম মানবী নহেন, তবে দেবী; এ জগতের সৃষ্টি-রহস্য যেন তাঁহার কিছুই অজ্ঞাত নাই। কোন হিন্দু মহাত্মা মাদামের শরীরে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়াই শিশিরকুমারের ধারণা জন্মিয়াছিল। মাদামের বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে শিশিরকুমার বলিয়া উঠিলেন 'আর নয় আজ এই পর্যন্ত থাক: আমি আপনার গভীর তত্ত্বগুলি আর হৃদয়ংগম করিতে পারিতেছি না।'

মাদাম নীরব হইলেন। তিনি স্বীয় কক্ষে গমন করিবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলে শিশিরকুমার তাঁহাকে বলিলেন 'কই আমাকে তো কর্ণেলের ন্যায় কেশগুচ্ছ দিলেন না?'

(ক্রমশঃ)

[illegible]

হিন্দী গীত-সাহিত্যে নতুন পদক্ষেপ: নবগীত

মঞ্জুলী ঘোষ

হিন্দী গীতি-সাহিত্যের শুরু ভক্ত কবিদের পদে। সেইসব প্রথম যুগের গীতি-কবিতায় কবির আত্মনিরপেক্ষ ভাব অভিব্যক্ত হয়েছে প্রভুর প্রতি ভক্তের নিবেদনে। তাতে আধ্যাত্মিক প্রেমের প্রকাশই মুখ্য।

পরবর্তী কালে ভারতেন্দু এবং দ্বিবেদী যুগের পদে গীতের অন্তরঙ্গ এবং বাহ্য, দুদিকেই কিছু পরিবর্তন নজরে পড়ে কিন্তু তা বিরাট পার্থক্য কিছু নয়। আত্ম-নিরপেক্ষতা থেকে আত্মমুখীনতার দিকে গীত আগ্রহী হয়েছে মাত্র কিন্তু বিশেষ প্রকটভাবে নয়।

কবির আত্মমুখীন অনুভব সর্বপ্রথম ঠিকমত রূপ নিল ছায়াবাদের যুগে। (ছায়াবাদের শুরু মোটামুটি ১৯২০ থেকে ধরা হয়) প্রসাদ, নিরালা, মহাদেবীর গীতি রচনাগুলিতে তার প্রমাণ ছড়ানো। মানবিক প্রেম নিবেদন, প্রকৃতি চিত্রণ, প্রকৃতিকে অবলম্বন করে কবি অনুভূতির প্রকাশ ইত্যাদি নিয়ে ছায়াবাদকালের গীত অজস্র রচিত হয়েছে। ছায়াবাদের যুগে গীতের নির্মাণশৈলিতেও অনেক পরিবর্তন আসে। এই ভাব বা রূপের পরিবর্তনের প্রসঙ্গে বিশেষ করে নিরালার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি গীতকে তুলসীর প্রভাবমুক্ত করতে চেয়েছিলেন সচেতন ভাবে। আবার গীতের এক শাখাকে লোকগীতের ধারায় এনে নতুনত্বও দিতে চেয়েছেন। ভক্তিভাবের বাহক গীত যখন লোকভাবের পর্যন্ত বাহক হল, তখনই গীতে নবীনতা সংযোজিত হল। তাঁর কোন কোন গানে নবীন লোকচেতনার জাগৃতি দেখা যায়। এই দিক থেকে দেখেই, অনেকে মত দিয়েছেন হিন্দী নবগীতের উন্মেষ নিরালার গীতি রচনায়। নবগীতের অন্যতম যে দাবী তা হোল সে ব্যক্তিচেতনার দৃষ্টিকোণ থেকে লোকচেতনাকে অনুভব করে, এমন কি তারও আভাষ পাওয়া যায় নিরালায়।

গীতের উপর ছায়াবাদী প্রভাব গভীর। তবু এই ধারার অন্ধ অনুকরণের প্রতি ছায়াবাদ, প্রয়োগবাদের মধ্যবর্তী প্রগতিবাদের (১৯৩৬-এর আশপাশ থেকে) যুগে কিছু কবির বিতৃষ্ণা জেগেছে। সুতরাং এই সময় থেকে গীতের ভাষা ও শৈলী এই দুইয়ের নবীনতার প্রতি গীতিকারদের আগ্রহ দেখা গেল। উদাহরণ হিসেবে বচ্চনের সহজ এবং খোলামেল এক ধরনের গীত রচনার উল্লেখ করা যায়। ছায়া, প্রয়োগবাদের মধ্যেকার সময়টার পরম্পরাগত ধারায় অতিরিক্ত আর এক ধরনের গীত বা রাষ্ট্রীয়তাবোধক গীত তাও রচিত হল। স্বাধীনতা সংগ্রাম, পরাধীনতার বেদনা ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন সমকালীন বোধ এইসব গানে অভিব্যক্ত হয়েছিল। এই সময়কার যুবগোষ্ঠী থেকেই ছায়াবাদী ভাবনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জোরদার হয়ে উঠেছিল। নয়ী কবিতর সঙ্গে সঙ্গেই গীতও রচিত হয়েছে নয়ী কবিতার কবিদের দ্বারা। কবিতার সঙ্গে সমান্তরালভাবে একটা নতুন দিক, নতুন ধারা পরিচিত হয়ে উঠতে লাগলো গীতের ক্ষেত্রে। এই চেষ্টা অজ্ঞেয়, শমশের, কেদারনাথ আগরওয়াল ত্রিলোচন; ভবানীপ্রসাদ মিশ্র প্রভৃতির গীত রচনায়।

অনেকের মতে অজ্ঞেয় সম্পাদিত 'তার সপ্তক' কবিতা সংকলন প্রকাশের (১৯৪৩এ) সঙ্গে হিন্দী সাহিত্যের বিখ্যাত প্রয়োগবাদ, আপন ব্যক্তিত্বের জোরে প্রতিষ্ঠা নিয়েছে। গীতকে তখনই কেবলমাত্র প্রকৃতি আর লোকপ্রিয় বক্তব্যে সীমিত রাখা সম্ভব হয়নি। প্রয়োগবাদিতা সব কিছুর মত গীত-ভাবনা গীত-নির্মাণেও পরিবর্তন ঘটাতে লাগলো। ১৯৫০-এর আশেপাশে হিন্দী সাহিত্যে একটি 'নবলেখন বাদ' স্পষ্টভাবেই জেগেছিল। গীতে যে নতুন ভাবনা অনুস্রোত হয়েছে, তা বোঝাবার জন্যে নয়ী কবিতার মত 'নওগীত' (নবগীত) নামটিও প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৫৮য় কবি রাজেন্দ্র সিংহ 'গীতাঙ্গিনী' গীত সংকলনের ভূমিকায় নবগীত নামটি ব্যবহার করলেন এবং নয়ী কবিতারই মত অন্য এক জোরালো সাহিত্য আন্দোলনের (নবগীত প্রবক্তাদের মতে) কয়েকটি লক্ষণও নির্ণীত করলেন। নবগীত নাম প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল তর্ক শুরু হয়ে গেল এর শিল্পগত ভাবগত প্রাকৃতিগত ইত্যাদি দিকগুলির অজস্র আলোচনা সহ। কেউ এর পৃথক অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার প্রতি কটাক্ষপাত করলেন কারুর বা মত হল নয়ী কবিতা জীবনের আধুনিক ভাবের পরিচয় দেয়, নবগীত দেয় না।

নবগীতকারদের মতে কিন্তু নয়ী কবিতা এবং নবগীত দুইই নতুন সাহিত্য শাখা, সাহিত্যিক প্রয়োগ, সাহিত্য প্রবৃত্তি এবং একই কথা সামান্য পার্থক্য নিয়ে দুয়েরই বাচ্য হতে পারে। 'দুসরা সপ্তক' (অজ্ঞেয় সম্পাদিত সমকালীন হিন্দী কবিতা সংকলন, ১৯৫২য় প্রকাশিত) এবং 'তীসরা সপ্তক' (ঐ ১৯৫৯-এ প্রকাশিত) এর বহু কবির গান রচনায় তার প্রমাণ। তবু যে নবগীতের বিষয়ে অনাধুনিকতার অভিযোগ তার কারণ কোন কোন আলোচকের মতে, গীত সম্বন্ধে বহু কবির চিন্তায় গ্রথিত একটা পারম্পর্যবোধ

অনুভাব। কখনো কখনো এমন হয়েছে যে, যে কবি নয়ী কবিতা রচনার সময়ে জীবন-ধর্মী বস্তু এমন কি উৎকট আধুনিক তিনিই কিন্তু নবগীত লিখতে গিয়ে রোমান্টিক প্রতিক্রমধর্মী। তবু এই সব তর্ক থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে গীত রচনা নিছক ভাবুকতাকে অতিক্রম করে মূল্যবোধ সংক্রমণকে আত্মসাৎ করেছে এবং মানববোধ আর বৌদ্ধিকতা নিয়ে কবিসংবেদনাকে প্রভাবিত করেছে।

অনৈতিকতা, দুর্নীতি, বেকার-সমস্যা অনশন প্রভৃতি নিয়ে জীবনের ভয়ংকর সমস্যা-জর্জরতার সঙ্গে প্রতিদিনের সাক্ষাৎকার কবিচেতনাকে উত্তরোত্তর প্রভাবিত করেছে। নয়ী কবিতাকে নগর চেতনার ছবিও বলা হয়। নবগীতেও এই নগর-বোধকে আঁকবার চেষ্টা পাওয়া যায়। জীবন সম্বন্ধে একটা মোহভঙ্গের চেতনা যেন গীতেও কবিকে জীবনের সমগ্রূপকে নিরীক্ষণ করাচ্ছে। অর্থাৎ, 'নয়ী কবিতা', 'নয়ী কহানীর' মত নবগীত ও সাহিত্যিক এক প্রকাশ শৈলী যা কবির ব্যক্তিক অনুভূতি মাত্র নয় সামগ্রিক জীবনকেই প্রকট করছে নিজের রীতিতে।

সাহিত্যিক অভিব্যক্তির ধারায় স্বাভাবিকভাবে গীতিশাখায় নবগীতের জন্ম, এটাই মোটামুটি গৃহীত মত। কিন্তু কবিতা বিন্যাসের দিক থেকে নবগীত বিষয়ে অন্য একটি মতেরও অস্তিত্ব আছে। সেই অনুসারে নিরালা যখন কাব্যরচনায় প্রথম মুক্তছন্দ প্রয়োগ করেন তখন থেকেই কাব্যরূপের চেয়ে কাব্যবস্তু বা বিষয়ের উপর গুরুত্ব অর্পিত হল বেশি। বক্তব্য যেন ছন্দসীমার শাসনে থাকতে চাইল না। মুক্তছন্দের অবাধ প্রয়োগ অতএব অবশ্যম্ভাবী এবং বহুবিস্তৃত হয়ে পড়ল। কিন্তু প্রয়োগের সেই বিস্তৃতি অযোগ্যের হাতে শোচনীয় ব্যর্থতার প্রমাণ রেখেছে বহুবার। কাজেকাজেই ছন্দের অনুশাসন আবার দরকার হল। এই অনুশাসনের প্রয়োগের মধ্যেও নবগীতের জন্ম।

নবগীত মোটামুটি ছন্দবন্ধনেই থেকেছে কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে। বিশেষ করে— প্রয়োগবাদের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে গীত-নির্মাণশৈলীও অপরিবর্তিত থাকবে না তাই স্বাভাবিক। অনেকের মতে, কবির সংবেদন যখন সমসাময়িকতার দ্বারা অবিরাম প্রভাবিত হচ্ছে কাব্যরচনাশৈলী তখন গদ্যধর্মী হবে এবং কাব্যের আভ্যন্তরিক সংবেদনা থেকে লয় প্রাধান্য ক্রমশ সরে আসবে তাই স্বাভাবিক। আর গীতও বৃহত্তরভাবে কাব্যই।

সব সাহিত্যশাখায়, মতই নবগীত সম্বন্ধেও বিভিন্ন চিন্তকের সুচিন্তিত মত আছে। 'গীতাঙ্গিনীর' ভূমিকায় যাত্র শ্রীরাজেন্দ্র সিংহের মতে, নবগীত হল কাব্যর নতুন নতুন অভিজ্ঞতাজাত নবগীত অনুভূতিতে সম্পৃক্ত মর্মবোধের আন্তরিক স্বীকৃতি যাতে সাহিত্য অভিব্যক্তির নবতর কোমল-গতির প্রয়োগ হচ্ছে। এরই আধারে তিনি নবগীতের পাঁচটি লক্ষণ নির্ণয় করেছেন। যেমন জীবনদর্শন আত্মনিষ্ঠা ব্যক্তিত্ববোধ প্রীতিতত্ত্ব এবং পরিসঞ্চয়।

নবগীতের রচয়িতার জীবনদর্শনে এর মতে এক ধরনের সুক্ষ্ম ব্যাপ্তি আছে। সমগ্র মানবসংস্কৃতির আধুনিকতম বিকাশ নবগীতকার হৃদয়সংগম করে সমকালীন ঐতিহাসিকতার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নেন।

আত্মনিষ্ঠা বলতে তিনি বোঝাতে চান ব্যক্তিক আর সামগ্রিক অনুভবের এবং আত্মগত ভাব আর দৃষ্টিগত গ্রহণীয়তার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ক্রম।

সেই ক্রমে নবগীত রচয়িতা ব্যক্তিত্বকে একটি প্রতীকের রূপে ব্যক্ত করেন এবং এই ব্যক্তিত্ববোধ দ্বারাই তিনি ক্রমশ নিজস্ব চরিতার্থতা খুঁজে পান।

নবগীতে প্রেম প্রীতি ভাবনার বিশিষ্ট স্থান থাকবে।

পরিসঞ্চয় অর্থাৎ গীতের মধ্যে গীতিধর্মী বহুপ্রকার গুণের সঞ্চয় হবে।

কিন্তু পাঠকমনে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ জাগে যে এই পঞ্চতত্ত্ব কি নবগীত সম্বন্ধেই প্রযোজ্য যা ইতিপূর্বের গীতে পাওয়া যেতো না বা বৃহত্তরভাবে কবিতায় পাওয়া যায় না? অর্থাৎ লক্ষণ হিসেবে এই পঞ্চতত্ত্ব পাঠককে কোন বিশেষত্বের সন্ধান দেয় না মাত্র শেষ তত্ত্বটি ছাড়া।

শ্রীশম্ভুনাথ সিংহ নবগীত: ইতিহাস-পরিক্রমা' নামক প্রবন্ধে নবগীতের প্রকৃতি বিচার করতে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর মতে গীত রচনার পরম্পরাগত পদ্ধতি এবং ভাবকে অতিক্রম করে নবীন পদ্ধতি এবং ভাব যখনই গীতে অভিব্যক্তি লাভ করবে নবগীত হবে। আবার সব গীতে যেমন নবগীতেও তেমনই গেয়তা এক অবশ্যম্ভাবী সর্ত।

শ্রীরবীন্দ্র ভ্রমর—'নবগীত : বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব' নিবন্ধে নবগীতের জন্মলগ্নে স্রষ্টার মনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালীন দেশের এবং সামাজিক পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রভাব আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, নবগীতের জন্যে সংক্ষিপ্ততা সারল্য শিল্পগত মৌলিকতা, নিজস্ব ভাবনার সঙ্গে সার্বজনিক দায়িত্ব বোধের সংযোগ ইত্যাদি আবশ্যক। নবগীতে, লোকভাষা, লোকসংগীতের সুর, লোকসঙ্গীতের ছন্দ ইত্যাদির প্রয়োগও তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেছেন।

শ্রীগিরিজাকুমার মাথুরের আলোচনাদিতেও নবগীতের সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা আছে। তাঁর মতে, নবগীত জীবন থেকে উৎপন্ন তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানসিক প্রতিক্রিয়া বা দীর্ঘ রচনার মত বিস্মৃত বর্ণনায় না গিয়ে অনুভূতিকেই খণ্ড রূপে ব্যক্ত করে। একে অনুভূতির সারখণ্ড বলা চলেই এ ভাবানুভূতির কারণকে বিশ্লেষণ করে না, তার মূলানিহিত সত্যকেই উদ্ঘাটন করে। অর্থাৎ বস্তুর প্রতি কবির অ্যাপ্রোচই গীতে প্রকাশিত হবে, বস্তু বর্ণনা সেখানে থাকবে অনুপস্থিত। কবিতা বা গীত দুই—এই বস্তুবর্ণনা ক্রমশ কমে আসছে। কবির সংবেদনার অভিব্যক্তিই কবিতারও বিষয়বস্তু হয়ে উঠছে। কবি সংবেদনার মাধ্যমেই যেটুকু সম্ভব পাঠকের বস্তুবোধ হতে থাকে। শ্রীমাথুরের মতানুসারে তাই নয়ী কবিতা বা নবগীত দুটি বিরোধী শাখা আদপেই নয়। তিনি গীতেও ছন্দমুক্ত রচনার সাফল্য স্বীকার করেন। ছন্দোবন্ধ হওয়া গীতের জন্যে সর্বদা আবশ্যিক নয় তার মতো গীতে ছন্দ ভাষার মনোহারিতা ইত্যাদির প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান জীবনের কঠোরতা যে গীতেও প্রভাব ফেলবে, তার সম্বন্ধেও তিনি সচেতন।

আবার শ্রীসকলদীপ সিংহ শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহের মতে গীতে বর্তমান জীবনের বাস্তব ছবি প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব এবং নবগীতেও তার ব্যতিক্রম নয়। এই অভিমতের উত্তরে নবগীত প্রবক্তাদের উত্তর আমরা আগের আলোচনা করেছি।

মতামত যেমনই হোক না কেন, আধুনিক কাব্যধারার একটি শাখা হিসাবে নবগীতে আধুনিক বোধের অভিব্যক্তির অনিবার্যতা সম্বন্ধে কারুর দ্বিমত নেই। সুতরাং একটি মত যে প্রচলিত আছে, নয়ী কবিতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নবগীতের জন্ম, তা অনেকে স্বীকার করেন না। এ দুটির মধ্যে কোন তত্ত্বগত গভীর অসামঞ্জস্য নেই। সময়ের পরিবর্তিত মূল্যবোধের প্রকাশক হিসেবে এ গীতের এক পরিবর্তিত প্রকাশমাত্র। গীত বা নবগীত, এর মধ্যে সাংগীতিক গুণ থাকা চাইই। এ নয়ী কবিতার নবতর অভিব্যক্তি হোক বা না হোক কাব্যসত্তার একটি নতুন বিকাশ একে বলা চলতে পারে।

নবগীতের বাহ্যরূপ বা আকৃতির বিষয়ে কোন বিশেষত্ব এখনো নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করা যায় না। ভাষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু নবীন প্রয়োগ হচ্ছে। কেউ কেউ উর্দুবহুল হিন্দী ব্যবহার করছেন, কেউ বা লোকভাষার বিস্তৃত প্রয়োগ করছেন। কখনো কখনো গীতের রূপকে এমন নমনীয় করা হচ্ছে যে কবিতা এবং গীতের পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে না। অর্থাৎ নবগীতের রূপ অথবা আকৃতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছেই।

নবগীতিকার কবিরা ইতিহাসবদ্ধ এই গীতকে শিল্প অভিব্যক্তির প্রবাহে নতুন সংযোজন বলে স্বীকৃতি দেন। এঁরা প্রয়োগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গীত রচনা করেছেন আবার আঞ্চলিক তত্ত্বেরও সমাবেশ গীতে করেছেন। প্রখ্যাত, প্রতিষ্ঠিত নবগীতকারদের নাম মোটামুটি : ধর্মবীর ভারতী, ঠাকুরপ্রসাদ সিংহ, গিরিজাকুমার মাথুর, রবীন্দ্র ভ্রমর, রামনরেশ পাঠক, কেদারনাথ সিংহ, রাজেন্দ্রকিশোর রাজেন্দ্র সিংহ, উমাকান্ত মালবীয়, ওম প্রভাকর ইত্যাদি।

এঁরা ছাড়া আরো কিছু কবি গীতকার আছেন যাঁরা গীতরচনা করেন যদিও এঁদের কারো কারো রচনার প্রকৃতি গীতি রচনা প্রকৃতি থেকে অনেকটাই ভিন্ন। অপেক্ষাকৃত নতুন এঁদের মধ্যে আছেন: নঈম শ্যামনন্দনের ঘোষ, চন্দ্র দেব, দেবেন্দ্রকুমার, রমেশ রঞ্জক মাহেশ্বর তিওয়ারী নরেশ সক্সেনা চন্দ্রভূষণ ইত্যাদি।

নবগীতের ক্ষেত্রে সাময়িক এবং একক কবির গীত-সংকলন দুরকম সংগ্রহই দেখা যায়। সাময়িক সংগ্রহ হিসেবে ১৯৫৮ রাজেন্দ্র সিংহ সংকলিত গীতাঙ্গিনী ১৯৬৪তে ওম প্রভাকর সম্পাদিত কবিতা সংকলন ১৯৬৯-এ চন্দ্রদেব সিংহ সংকলিত পাঁচজোড় বাঁশুরী এবং লক্ষ্মীকান্ত সরল সংকলিত তিন খণ্ডে উত্তরতে নবগীতিকার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তিগত সংকলন হিসেবে বংশী ঔর মাদল (১৯৫৮) ঠাকুর প্রসাদ সিংহ মেহেন্দী ঔর মহাবর (১৯৬৩) উমাকান্ত মালবীয় রবীন্দ্র ভ্রমর-কে গীত (১৯৬৯) রবীন্দ্র ভ্রমর গীত বিহগ উতরা (১৯৬৯) রমেশ রঞ্জক পদ্মপর্ণিত (১৯৭৩) ওম প্রভাকর উল্লেখযোগ্য।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড

প্রথম টেস্ট ক্রিকেট

অকল্যান্ডে ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যান্ড এক ইনিংসে ও ৮৩ রানে জিতে গেছে।

প্রথম দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৩টে উইকেট পড়ে ৩১৯ রান উঠেছিল। দলের অধিনায়ক মাইক ডেনেস পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন। দলের ৩৬ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়লে ডেনেস খেলতে নামেন এবং ১৪৯ রান করে অপরাজিত থেকে যান। ৩য় উইকেটের জুটিতে জন এডরিচ (৬৪ রান) এবং ডেনেস দলের ১১৭ রান এবং অসমাপ্ত ৪র্থ উইকেটের জুটিতে, কিথ ফ্লেচার (৭৬ অপরাজিত) এবং ডেনেস দলের ১৬৬ রান সংগ্রহ করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা আগে ইংল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসের ৫৯৩ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ইংল্যান্ডের কিথ ফ্লেচার সাতঘণ্টা ব্যাট করে তাঁর ২১৬ রানে ২৯টা বাউন্ডারী মারেন। এই ২১৬ রানই টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় তাঁর সর্বোচ্চ রান। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ডেনেস এবং ফ্লেচার ২৬৬ রান তুলে নতুন রেকর্ড করেন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৪র্থ উইকেট জুটিতে ইংল্যান্ডের পক্ষে পূর্বের রেকর্ড রান ছিল ১৬৬ (কেন ব্যারিংটন এবং কলিন কাউড্রে, অকল্যান্ড ১৯৬৩)। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ৩১ রান তুলেছিল।

তৃতীয় দিনে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৮৫ (৫ উইকেটে)— ফলো-অন থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও নিউজিল্যান্ডের আরও ১০৯ রানের দরকার ছিল। জন পার্কার ১২১ রান এবং কেন ওয়াডসওয়ার্থ ৪৯ রান করে অপরাজিত ছিলেন। ২য় উইকেটের জুটিতে মরিসন (৫৮ রান) এবং পার্কার ১১৬ রান এবং অসমাপ্ত ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ওয়াডস-ওয়ার্থ (৪৯ নট আউট) এবং পার্কার (১২১ নট আউট) ১৯২ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

চতুর্থ দিনে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩২৬ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ফলো-অন করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় নিউজিল্যান্ড শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়—৯টা উইকেট খুইয়ে ১৬১ রান করেছিল। নিউজিল্যান্ডের একমাত্র জন মরিসন ইংল্যান্ডের বোলিং উপেক্ষা করে ৫৮ রান করেছিলেন।

শেষ পঞ্চম দিনে ১৮৪ রানের মাথায় নিউজিল্যান্ডের ফাস্ট বোলার চ্যাটফিল্ড ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার পিটার লেভারের বল খেলতে গিয়ে মাথায় সাংঘাতিক আঘাত পান এবং শেষ পর্যন্ত খেলা থেকে অবসর নেন। ফলে ১৮৪ রানের মাথায় নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় এবং ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ৮৩ রানে জিতে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড : ৫৯৩ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। এডরিচ ৬৪ ডেনেস ১৮১, ফ্লেচার ২১৬ এবং গ্রেগ ৫১ রান। হেডলি ১০২ রানে ২ এবং কংডন ১১৫ রানে ২ উইকেট)

নিউজিল্যান্ড : ৩২৬ রান (মরিসন ৫৮, পার্কার ১২১ এবং ওয়াডসওয়ার্থ ৫৮ রান। গ্রেগ ৯৮ রানে ৫ এবং আণ্ডারউড ৩৮ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৮৪ রান (মরিসন ৫৮ এবং জি আর হাওয়ার্থ নট আউট ৫১ রান। গ্রেগ ৫১ রানে ৫ আণ্ডারউড ৪৭ রানে ২ এবং লেভার ৩৭ রানে ৭ উইকেট)

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা

রঞ্জি ট্রফি জাতীয় ক্রিকেট প্রতি-যোগিতার চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলাই
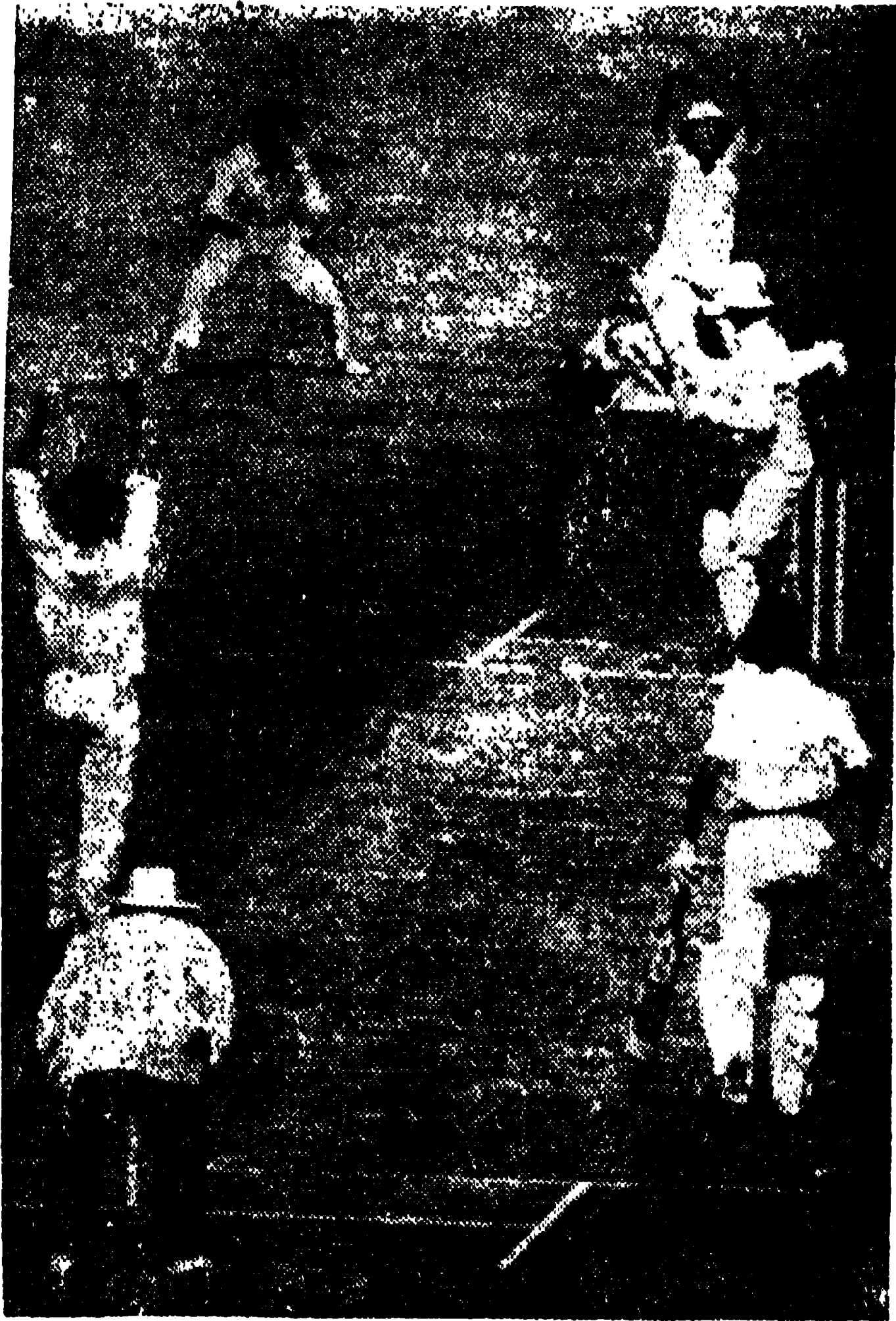
বাংলা বনাম কর্নাটকের রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম দিনে কর্নাটকের বিজয়কুমার বাংলার সুব্রত গুহের বলে ক্যাচ তুলে সম্বরণ ব্যানার্জির হাতে ধরা পড়েছেন। কর্নাটকের রান তখন ছিল মাত্র ১২।

দেশের বিভিন্ন স্থানে একই দিনে (ফেব্রুয়ারী ২৮) আরম্ভ হয়। এই চারটি খেলার মধ্যে বাংলা বনাম কর্ণাটকের খেলাটি বরাবর চতুর্থ দিন পর্যন্ত গড়িয়েছিল। বাকী তিনটি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায় তৃতীয় দিনেই। কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার ফলাফল দাঁড়ায় : গত বছরের রঞ্জি ট্রফি জয়ী কর্ণাটক প্রথম ইনিংসে বেশী রান করার দেলতে বাংলাকে, বোম্বাই এক ইনিংস ও ২৮ রানে বিহারকে হায়দরাবাদ দশ উইকেটে হরিয়ানাকে এবং দিল্লী তিন উইকেটে রাজস্থানকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে। সেমিফাইনালে বোম্বাই খেলবে হায়দরাবাদের সঙ্গে এবং কর্ণাটক খেলবে দিল্লীর সঙ্গে।

বাংলা বনাম কর্ণাটক

ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে বাংলা বনাম কর্ণাটকের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় কর্ণাটক তাদের প্রথম ইনিংসে ৯৪ রান বেশী করার সুবাদে বাংলাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে। গত বছরের রঞ্জি এবং ইরানী ট্রফি বিজয়ী কর্ণাটক দল হিসাবে খুবই শক্তিশালী। তাদের পক্ষে খেলেছিলেন এই চারজন খ্যাতনামা টেস্ট খেলোয়াড়—বিশ্বনাথ প্রসন্ন চন্দ্রশেখর এবং ব্রিজেশ প্যাটেল। তবুও বাংলা সহজে হাল ছাড়ে নি—কর্ণাটকের প্রথম ইনিংসের ৪৯২ রানের উত্তরে বাংলা তাদের প্রথম ইনিংসে ৩৯৮ রান করেছিল। বাংলার পক্ষে পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন অম্বর রায়। তিনি শেষ পর্যন্ত ১৫৪ রান করে অপরাজিত থেকে যান।

প্রথম দিনে কর্ণাটক প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ২৮৪ রান করেছিল। বাংলার আলগা বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের জন্যেই কর্ণাটকের খেলোয়াড়রা যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন। বিশ্বনাথ ৮১ ব্রিজেশ প্যাটেল ৭৫ এবং সঞ্জয় দেশাই ৫১ রান করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে কর্ণাটকের প্রথম ইনিংস ৪৯২ রানের মাথায় শেষ হয়। তারা এই দিন শেষ পাঁচ উইকেটে পূর্ব দিনের ২৮৪ রানের সঙ্গে ২০৮ রান যোগ করেছিল। সুধাকর রাও ৭৭ লক্ষ্মীনারায়ণ ৭১ এবং জয়প্রকাশ ৯০ রান করে আউট হন। দ্বিতীয় দিনের বাকী ২৫ মিনিটের খেলায় বাংলা কোন উইকেট না খুইয়ে ২৬ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে বাংলার প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৭৫ (৬ উইকেটে)। অম্বর রায় ৯৬ রান করে নট আউট থাকেন।

শেষ চতুর্থ দিনে বাংলার প্রথম ইনিংস ৩৯৮ রানের মাথায় শেষ হয়। অম্বর রায় ১৫৪ রান করে নট আউট থেকে যান। তিনি ৪২৭ মিনিট দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে তাঁর নট আউট ১৫৪ রানে ১৯টা বাউন্ডারী করেছিলেন। কর্ণাটকের প্রথম ইনিংসের পর্বতপ্রমাণ ৪৯২ রানের বিপক্ষে ৭ম উইকেটের জুটিতে অম্বর ও তপনজ্যোতি ৭২ রান এবং ৮ম উইকেটের জুটিতে অম্বর ও অলোক ৮৩ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। কর্ণাটক ৯৪ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং চার উইকেট খুইয়ে ১৩১ রান সংগ্রহ করেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

কর্ণাটক : ৪৯২ রান (সঞ্জয় দেশাই ৫১, বিশ্বনাথ ৮১, ব্রিজেশ প্যাটেল ৭৫ সুধাকর রাও ৭৭ লক্ষ্মীনারায়ণ ৭১ জয়প্রকাশ ৯০ রান। সুব্রত গুহ ১১৫ রানে ৪ এবং সমর চক্রবর্তী ১০০ রানে ৪ উইকেট)।
ও ১৩১ রান (৪ উইকেটে। সঞ্জয় দেশাই নট আউট ৫১ এবং কিরমানী ২৬ রান। টি জে ব্যানার্জি ৯ রানে ২ এবং দিলীপ দোশী ৩০ রানে ২ উইকেট)।

বাংলা : ৩৯৮ রান (অম্বর রায় নট আউট ১৫৪, গোপাল বসু ৫২, রাজু মুখার্জি ৩৫ এবং অলোক ভট্টাচার্য ৪১ রান। চন্দ্রশেখর ১৪৭ রানে ৪ এবং প্রসন্ন ১৩ রানে ৩ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দল

দুর্গাপুরে শ্রীরূপা বসুর নেতৃত্বে পূর্বাঞ্চল দল ৭ উইকেটে ভারত সফরকারী অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দলকে পরাজিত করে। এখানে উল্লেখ্য এই খেলাটি ছিল তাদের ভারত সফরের শেষ খেলা এবং প্রথম পরাজয়। ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দলের খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : জয় ৩ (আঞ্চলিক খেলায়), ড্র ৩ (টেস্ট খেলায়) এবং হার ১ (পূর্বাঞ্চলের বিপক্ষে)। একদিনের আঞ্চলিক খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে দক্ষিণাঞ্চল ১০ উইকেটে উত্তরাঞ্চল এবং ১৮ রানে মধ্যাঞ্চলকে পরাজিত করেছিল।

পূর্বাঞ্চলের দলনেত্রী শ্রীরূপা বসু টসে জিতে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে দেন। সীমিত ৪০ ওভারের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেট খুইয়ে ৮৮ রান করেছিল। রুনা বসুর বোলিংয়ের জন্যেই অস্ট্রেলিয়া বেশী রান তুলতে পারে নি। রুনা বসু ২৬ রানে ৫টা উইকেট পান। এরপর পূর্বাঞ্চল ২৮-১ ওভারের খেলায় ৩ উইকেটে ৮৯ রান তুলে ৭ উইকেটে জিতে যায়। উভয় দলের পক্ষে পূর্বাঞ্চলের কেয়া রায় সর্বোচ্চ রান (৬১) করেছিলেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৮৮ রান (৮ উইকেটে। বারবারা হাইড ৩০ রান। রুনা বসু ২৬ রানে ৫ উইকেট)।
পূর্বাঞ্চল : ৮৯ রান (৩ উইকেটে। কেয়া রায় ৬১ রান। মার্টিন ১৮ রানে ২ উইকেট)।

ডেভিস কাপ

১৯৭৫ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ৩—০ খেলায় নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে মূল প্রতিযোগিতার ইউরোপীয় জোনের বি গ্রুপ বিজয়ী দেশের সঙ্গে খেলার যোগ্যতা লাভ করেছে।

বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা

কুয়ালালামপুরে ১লা মার্চ মারডেকা স্টেডিয়ামে এক জাঁকজমক পরিবেশে মালয়েশিয়ার রাজা তৃতীয় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেছেন। এবারের প্রতিযোগিতায় যে ১২টি দেশ যোগদান করেছে তারা দুটি গ্রুপে সমান দু ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। তারপর প্রতি গ্রুপের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশ মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে খেলবে। সেমি-ফাইনালে এ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান খেলবে বি গ্রুপের রানার্স-আপ দলের সঙ্গে এবং বি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান খেলবে এ গ্রুপের রানার্স-আপ দলের সঙ্গে। কুয়ালালামপুরের মারডেকা স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলাসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খেলাও হবে। কুয়ালালামপুরের বাইরে পেনাং ইপো এবং সেরেমবান শহরেও খেলার আসর বসবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বারটি দেশের মধ্যে ভারত পাকিস্তান পশ্চিম জার্মানী এবং হল্যান্ড—এই চারটি দেশকে শক্তিশালী দল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের দৃঢ় ধারণা এই চারটি দেশের যে-কোন একটি দেশ এবারের চ্যাম্পিয়ান হবে। ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে হল্যান্ডের বিপক্ষে ভারত ২—০ গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত টাই-ব্রেকারে ২—৩ গোলে হল্যান্ডের কাছে হেরে রানার্স-আপ হয়েছিল। ১৯৭২ সালের মিউনিক অলিম্পিক হকি ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী চ্যাম্পিয়ান এবং পাকিস্তান রানার্স-আপ খেতাব জয় করেছিল। পশ্চিম জার্মানী কিন্তু এবারের ইউরোপীয় হকি প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান [illegible] পারে নি, স্পেন চ্যাম্পিয়ান [illegible] যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার হকি খেলার মান [illegible] উন্নত হয়েছে। সম্প্রতি পাকিস্তান সফরে অস্ট্রেলিয়া তিনটি টেস্ট খেলায় [illegible] মাত্র একটিতে হেরেছে, [illegible] খেলা ড্র যায়।

কুয়ালালামপুরের এই বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় হল্যান্ডের ১নং গ্রুপে এবং ভারতের ২নং গ্রুপে খেলা পড়েছে। হল্যান্ডকে শক্তিশালী পাকিস্তান এবং এবারের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ান স্পেনের সঙ্গে লড়তে হবে। অন্যদিকে ২নং গ্রুপে ভারতের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ১৯৭২ সালের অলিম্পিক হকি চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানী।

[illegible]

গ্রুপ এ : [illegible] চ্যাম্পিয়ান) [illegible], [illegible] [illegible]; নিউজিল্যান্ড এবং [illegible]।

গ্রুপ বি : ভারত (গতবারের রানার্স-আপ), পশ্চিম জার্মানী (১৯৭২ সালের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান), অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, আর্জেন্টিনা এবং ঘানা।

দেশবিদেশের খেলা

পাঁচ পদকী

গত দু বছরে আন্তর্জাতিক মহিলা জিমন্যাস্টিকসের পুরনো ছবির আমূল রদবদল ঘটেছে বলা যায়। রুশ নন্দনদের অভিনব জয়গতি অব্যাহত থাকলেও প্রায় এক যুগের কাছাকাছি রুশ প্রমীলাদের শীর্ষস্থানটি বেহাত হয়ে যায় চেক তরুণী চাসলাভস্কার আবির্ভাবে। চাসলাভস্কা একাই একশো। স্বকীয় ক্রীড়াকীর্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে দীর্ঘকাল চেকোশ্লোভাকিয়াকে বিশ্ব মহিলা জিমন্যাস্টিকসের আসরে পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

জিমন্যাস্টিকসের রাণী চেক তরুণী ভেরা চাসলাভস্কা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে জিমন্যাস্টিকস থেকে বিদায় নিলে একদিকে অপ্রতিহত চেক প্রাধান্যের অবসান ঘটে ও অন্যদিকে শক্তিশালী দেশগুলোর মধ্যে শূন্য শীর্ষাসন দখলের লড়াই রীতিমত জমে ওঠে।

তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুখোমুখি হয়েছিল জাপান ও রাশিয়া। রুশ মহিলা জিমন্যাস্টদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় লারিসা লাতিনিনার। যিনি এককালে বিশ্ব জিমন্যাস্টিকের আসরে অনেক কৃতিত্বের অধিকারিণী হয়ে আজ সোভিয়েত রাশিয়ার জাতীয় দলের প্রশিক্ষক। লারিসার ঐতিহ্যকে সহজাত নৈপুণ্যে স্বেচ্ছায় বহন করে চলেছেন রাশিয়ার নবতম সংযোজন লুডমিলা তুরিশেচভা।

এরিখা জুকুন্ড বিভিন্ন দেশী বিদেশী প্রতিযোগিতায় পুরোধাভিনী হলেও পূর্ব জার্মানীর আর এক মেয়ে কারিন জানজ স্বল্প সময়ের আবির্ভাবে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। তিনি বেশ কয়েকটি বড় বড় আন্তর্জাতিক আসরে বিশ্বশ্রেষ্ঠ রুশ জিমন্যাস্ট লুডমিলা তুরিশেচভার সংগে সমান তালে পাল্লা দিয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। স্বদেশীয় এরিখা জুকুন্ডকেও পেছনে পড়তে হয়েছে কারিন জানজের নাটকীয় অভ্যুদয়ের কাছে।
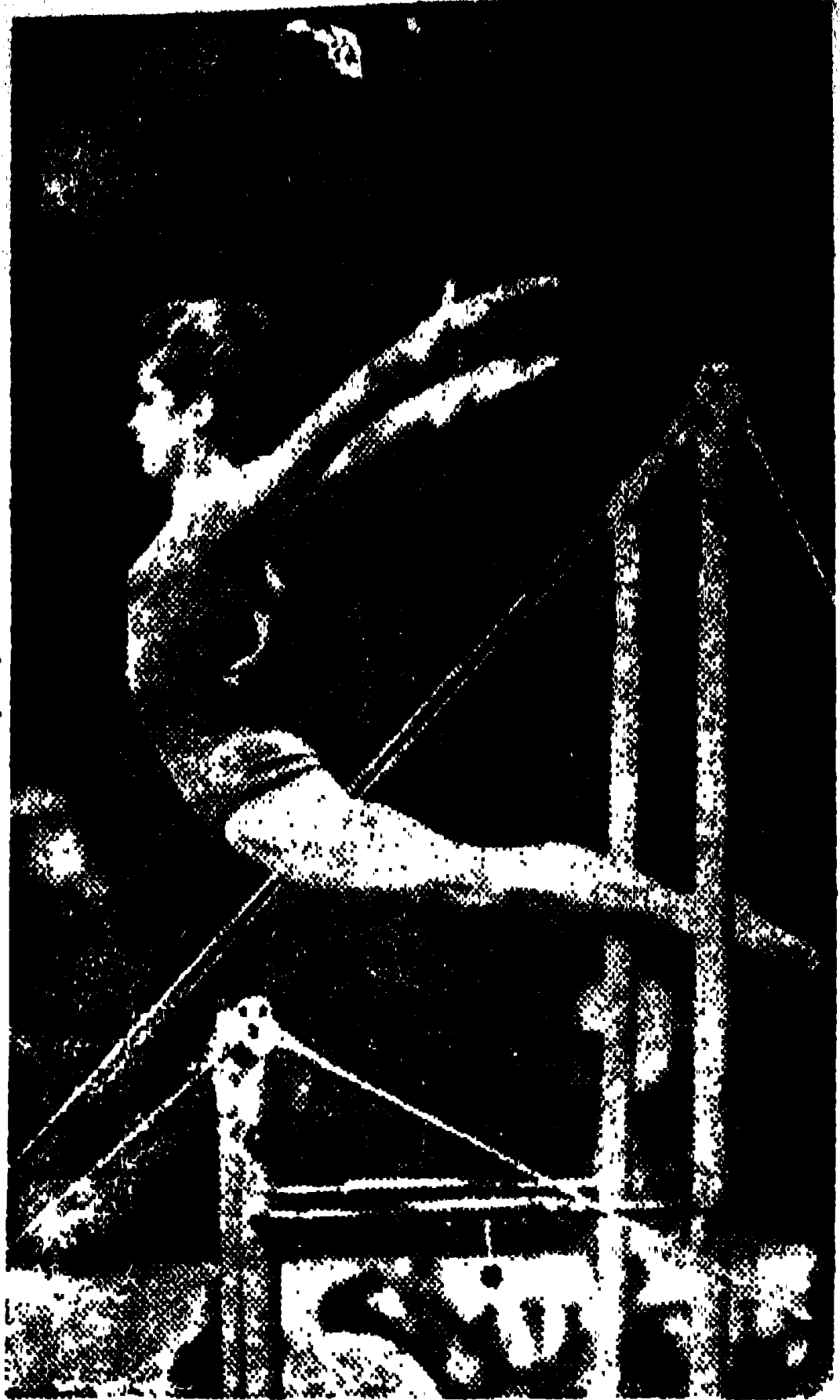
মিউনিখ অলিম্পিকে লড়াই জমে তুঙ্গে উঠেছিল শূন্য আসন দখলের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। সর্বোচ্চ পয়েন্ট সংগ্রহ করে রুশ তরুণীরা দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করলেও তাদের পদে পদে এগোতে হয়েছে পূর্ব জার্মানীর মেয়েদের সুদৃঢ় বেষ্টনী ভেদ করে। উভয় দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুস্পষ্ট আভাস মেলে দলগত ও ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপের খতিয়ান থেকে। দলগত চ্যাম্পিয়নশিপের ক্ষেত্রে রাশিয়া মোট ৩৮০·৫০ পয়েন্ট সংগ্রহের সঙ্গে প্রথম ও পূর্ব জার্মানী ৩৭৬·৫৫ পয়েন্ট অর্জনের সুবাদে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপের পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপ :—

প্রথম লুডমিলা তুরিশেচভা (রাশিয়া) ৭৭·০২৫ পয়েন্ট দ্বিতীয় কারিন জানজ (পূর্বজার্মানী) ৭৬·৮৭৫ পয়েন্ট তৃতীয় তামারা লাজাকোভিচ (রাশিয়া) ৭৬·৮৫০ পয়েন্ট চতুর্থ এরিখা জুকুন্ড (পূর্ব-জার্মানী) ৭৬·৪৫০ পয়েন্ট পঞ্চম লাজুবভ বুবড়া (রাশিয়া) ৭৫·৭৭৫ পয়েন্ট।

মিউনিখ অলিম্পিকে তুরিশেচভাকে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করতে হয়েছে কারিন জানজের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতার বেড়াজাল অতিক্রম করে। কারিন জানজ হর্সভল্ট ও আনইভেন বার উভয় ইভেন্টে যথাক্রমে ১৯·৫২৫ পয়েন্ট ও ১৯·৬৭৫ পয়েন্ট লাভ করে স্বর্ণপদক জয় করেন। বিমস খেলায় ১৮·৯৭৫ পয়েন্ট অর্জন করে তৃতীয় স্থান দখল করে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। আর ফ্লোর একসারসাইজে ১৯·৪০০ পয়েন্ট পেয়ে চতুর্থ স্থানাধিকারী। দুটি স্বর্ণ ও একটি ব্রোঞ্জ ছাড়াও আরও দুটি রৌপ্য পদক গলায় ঝোলান ব্যক্তিগত ও দলগত চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় হওয়ার সুবাদে।

সর্বোচ্চ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপের আখ্যায় ভূষিতা হলেও লুডমিলা তুরিশেচভা কোন ইভেন্টে স্বর্ণ সঞ্চয়ের সেরা কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হননি মিউনিখ অলিম্পিকে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে পাঁচপদকী কারিন জানজ অনন্য। হর্সভল্ট ও আনইভেন-বারে বিজয়ী হয়ে দুটি স্বর্ণপদকের অধিকারিণী। ১৯৭০ সালের বিশ্ব জিমন্যাস্টিকের আসরেও আন ইভেনবারে কারিনজানজ স্বর্ণ ও হর্সভল্টে রৌপ্য জয় করেছিলেন।

কারিন জানজ-এর এখন বয়স বাইশ। আরও উৎকর্ষতা লাভের জন্য এখনও সময় পেরিয়ে যায় নি। প্রশিক্ষক জোয়াকিম হেরিটজের অনেক আশা কারিন জানজকে ঘিরে। কারিন জানজ নিজেও কম আশাবাদী নন। অনুশীলনে আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ। বিনয়ী। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রী ব্যক্তিগত জীবনে হাসিখুশী। সহজ এবং সরল। সতত জিমন্যাস্টিকসের ভেতরই খুঁজে পেতে চায় নিজেকে।

প্রশান্ত দাঁ

[illegible] ব্রাউন এবং কে উইলকিনসন

এখনো উত্তেজনাভরা তিনটি দিন • • • •

খেলার জগতে মেয়ে

প্রথমদিকে ফলোঅনের আশংকা, শেষদিকে জয়ের আশায় বিপুল উত্তেজনা আর মাঝখানে রাণ-মুগয়ার চমকপ্রদ কলা-কৌশল—রমণীয় ইডেন উদ্যানে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের তিনদিনব্যাপী শেষ টেস্ট ম্যাচের এই হল সার সংক্ষেপ।

ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে ২২ ২৩ ২৪ ইডেনে অনুষ্ঠিত এই টেস্ট ম্যাচ নানা কারণে মনে রাখবার মত। ভারতের মেয়েরা জাতীয় পর্যায়ে ক্রিকেট খেলছে খুব বেশী-দিন [illegible] বছর তিনেক হবে। এর মধ্যে [illegible] অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নেমেছে বহু বছর যাবৎ।

ইডেনে অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে মোটা রাণ তুলে নিয়ে (পাঁচ উইঃ ৩০১ ডিক্লেঃ) ভারতের মেয়েদের বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল। প্রথম ইনিংসে প্রারম্ভিক অবস্থা এমনি দাঁড়ায় যে ভারত বুঝি ফলোঅনে নামতে বাধ্য হবে। কিন্তু তা হয়নি। বাংলার শ্রীরূপা বসুর অধি-নেত্রীত্বে ক্রিকেটে নবাগতা হলেও ভারতের মেয়েরা শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সংগে সমানে লড়েছে। শুধু তাই নয় গোটা খেলায় অনিশ্চয়তার জন্য এই খেলার শেষদিকে ভারতের মেয়েরা তো প্রায় জয়লাভের দোড়-গোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। মাত্র বার রাণের অভাবে আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষে ভারত মহিলা ক্রিকেট এক ঐতিহাসিক নজীর সৃষ্টির সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হল। অবশ্য খেলার শেষদিকের এই প্রবল উত্তেজনাকর গতিবিধির জন্য প্রশংসা করতে হয় অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়িকা সিসিলিয়া উইলসনের। উইলসন ক্রিকেটের ভাষায় যাকে বলে স্পোর্টিং ডিক্লেয়ারেশন করে খেলাটিকে আকর্ষণীয় পর্যায়ে তুলে দেয়। ওরা দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নেমে তিন উইকেটে ৭২ রাণ তোলার পর উইলসন হাল ছেড়ে দিয়ে ভারতকে জয়ের জন্য ১১৮ রাণ তুলতে ৯১০ মিনিট ব্যাট করার সুযোগ দেয়। ভারতের মেয়েরাও সেই চ্যালেঞ্জ তুলে নিয়ে দৃঢ়সংকল্প হয়ে দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নামে।

অস্ট্রেলিয়া দলে ব্যাটিংয়ে সব থেকে নজর কেড়েছে ক্যাথালিন গারলিক আর জিনেট স্মিথ। গারলিক ক্রিকেটের প্রকরণগত মাপে সিদ্ধহস্ত। প্রথম ইনিংসে রাণ করে ১৫০ দ্বিতীয় ইনিংসে ৫১—দুবারই নট আউট থেকে যায়। আর জিনেটও কম যায় না বরং মারের হাত জিনেটেরই বেশী চোস্ত ও ব্যক্তিগত ৬১ রাণ করার পর ক্যাথির সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির ফলে রাণ আউট না হলে ভারতের সীমিত বোলিং শক্তির পক্ষে ওকে আউট করা হয়ত সম্ভবই হত না। রাণ আউট না হলে জিনেটও সেঞ্চুরী করত হয়ত।

ভারতের বোলিং শক্তি খুব প্রবল ছিল না। তারই মধ্যে পেস বোলার মৃণ্ময়ী বসু একটানা ৩৮ ওভার বল দিয়ে এবং প্রতি-পক্ষের ৩০১ রাণ ওঠা সত্ত্বেও ১২ ওভার মেডেন নিয়ে ৬৮ রাণের বিনিময়ে দুটি উইকেট দখল করে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। অন্য-দিকে শান্তা রঙ্গাস্বামী বিশেষ কিছুই করতে পারেনি। ছোট্ট মেয়ে মৃণ্ময়ীকে তার স্ট্যামিনার জন্য বাহাদুরী দিতেই হয়। মৃণ্ময়ীর বল ব্যাটসম্যানদের বারবার ধোঁকায় ফেলেছে।

যাই হোক ব্যাট করতে নেমে ভারতের মেয়েরা দ্বিতীয় দিনে সাতটি উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রাণ তুলতে পারায় ফলোঅনের আশংকা কাটিয়ে ওঠে দলের বিপর্যয়ের মুখে শোভা পন্ডিত (৪২) শিরিন কিয়াস (২১) ও শান্তা রঙ্গাস্বামী বেশ বিচার বিবেচনা করে বলের মোকাবিলা করে তিনজনের মধ্যে শোভা পন্ডিত ইডেনের পনের হাজার দর্শকের মনোরঞ্জন করতে পেরেছে। শোভার লড়িয়ে মেজাজের ব্যাটিংয়ের তারিফ করেছে সবাই যেমন তারিফ করেছে আগন্তুক দলের ক্যাথি ও জিনেটের ব্যাটিংয়ের। শেষদিকের সপ্তম উইকেটের জুটি শিরিন কিয়াস ও ডায়না এডুলজি প্রতিপক্ষের বলে বলে রাণ নিতে থাকলে বিপক্ষের মেয়েরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। ডায়না হরিণীর মত বারবার ছোটার

প্রথম সেঞ্চুরীকারী কেথলিন গারলিক এবং সুজান চ্যাপম্যান

তোলে ৭৩ রাণ। শার্লিন যখন আউট হল ভারতের তখন তিন উইকেটে ১৩৫। শান্তা রাণ আউট হবার পর ডায়না এডুলজিও (২৩) বিদায় নেওয়ায় ভারতের জয়ের আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। মাঠে তখনও প্রবল উত্তেজনা। নির্ধারণ শেষ কুড়ি ওভারের আর তিন ওভার বাকী, রাণ বাকী ২৫ খানি। শিরিন ও উজ্জলা কি পারবে ঐ রাণ তুলতে? এই প্রশ্নই সবার মনে। এ সময় অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা মাঠে যা ফিল্ডিং করেছে তা অনবদ্য ওদেশের ছেলেদের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর মাত্র ১২ রাণ বা তিনটি বাউন্ডারী বাকী থাকতেই তৃতীয় তথা শেষ টেস্টের ওপর যবনিকা নেমে এল। ফলে প্রথমবারের টেস্ট পর্যায়ে ভারত জয়ী হতে—রাবার দখল করতে পারল না। পুণে আর দিল্লী দু জায়গায়ই প্রথম দুটি টেস্ট অমীমাংসিত ছিল।

তবে ব্যাটিং বোলিং বা ফিল্ডিংয়ে ভারতের মেয়েরাও যে আন্তর্জাতিক আসরের মানে উঠতে পারে তা আমাদের প্রমীলারা প্রমাণ করেছে।

কেবল প্রশ্ন থেকে যায় নেত্রী শ্রীরূপা ইডেনের অমন অনুকূল উইকেটে টস জিতে কেন বিপক্ষকে প্রথমে ব্যাট করতে সুযোগ দিল? দ্বিতীয়তঃ মেয়েরা জোরে বল মারতে এত দ্বিধা করে কেন? একমাত্র শিরিন ছাড়া কেউই মারের সময় বাহু ও

মাঝে একবার ভুলের জালে পা দিয়ে রাণ আউট হয়ে যায়। ওর রান তখন 'আনলাকি ১৩'. দলের বিপদ কেটে গিয়ে হয়েছিল: ১৬০।৭। দিনের শেষে ভারতের রাণ ওঠে নয় উইকেটে ১৭৫। তৃতীয় দিন সকালে আট মিনিটে আর একটি রান নো বল থেকে যোগ হবার পর ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৭৬ রাণে। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসেও ক্যাথলিন গারলিক ঝাঁঝালো ব্যাটিং করে ৫১ রাণ সংগ্রহ করার পর তিন উইকেটে ৭২ রাণে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এরপরই ইডেনের সবুজে নাটক জমে ওঠে। ভারতীয় দলের ফুটফুটে মেয়ে ফৌজি খালিজি চমকপ্রদ দ্রুততার সঙ্গে রাণ তুলতে থাকে। ব্যক্তিগত ৪৫ রাণ তুলে ও রান আউট হয়ে যাওয়ায় সকলে হায় হায় করে। অন্যদিকে শোভা পণ্ডিতও তার সঙ্গে সার্থক সহযোগিতা করে ব্যক্তিগত ২৩ রাণ তোলে। টেস্ট ম্যাচের উত্তেজনায় মাঠ তখন জমজমাট। এরপর মনে রাখার মত ব্যাট করে শান্তা রঙ্গাস্বামী (৩৫)। শান্তা আর খালিজি ৫৬ মিনিটে ৫০ রাণ সংগ্রহ করে আমাদের মনে জয়ের আশা জাগিয়ে তোলে। ১০০ মিনিটে এই জুটি

সুজান চ্যাপম্যান এবং অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক সিসিল উইলসন।
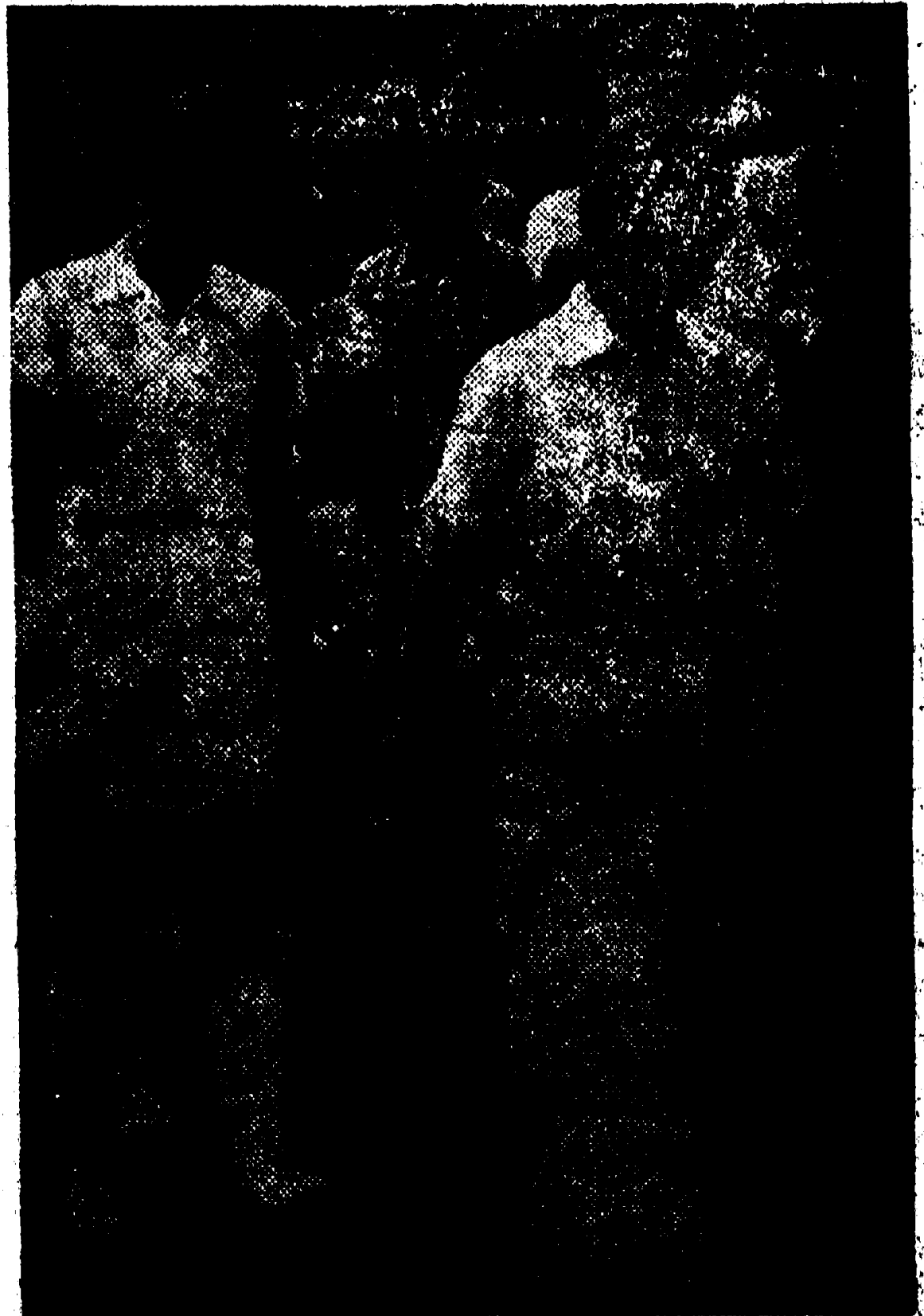
অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক সিসিলিয়া উইলসন ও ফাস্ট বোলার ডেব্রা মার্টিন

পায়ের ব্যবহার করছিল না কেন? তৃতীয়ত সর্বভারতীয় ক্রিকেটে পরপর দু'বার বিজয়ী বাংলা দলের তিন তিনজন স্বীকৃত বোলার ব্যাটসম্যান ও উইকেটকীপার শোপামুদ্রা ভট্টাচার্য ইলা রায়চৌধুরী ও অফস্পিন বোলার বনশ্রী দাসকে কেন টেস্ট দলে নেওয়া হল না? ন্যাটা বোলার শর্মিলা চক্রবর্তীর ওপর থেকে দণ্ডাজ্ঞা যখন তোলাই হল তখন তা তৃতীয় টেস্টের আগে হল না কেন?

সব মিলিয়ে বলা যায় অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা অভিজ্ঞ এবং তুলনায় অধিক শক্তিশালী হলেও ভারতের মেয়েরা প্রথম আবির্ভাবে কিছু কমতি যায়নি দিল্লীতে দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে মাত্র তিন রাণের জন্য জয়লাভে বঞ্চিত করা ভারতের প্রমীলাদলের পক্ষে কম কৃতিত্ব নয়। প্রমীলা ক্রিকেট সম্ভাবনাপূর্ণ।

অজয়

ক্যারলিন ম্যাথীউ

ভারতীয় দলের উইকেট কিপার এবং ওপেনিং ব্যাটসম্যান ফৌজি খালিলি

রঙিনী আলোয়

এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের জগতে বেশ একটা প্রাণবন্ত ব্যাপার ছিল। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে হাসি মশকরা চলত, ভাবের আদান-প্রদান হত। এখন যন্ত্রনির্ভর জীবনে, বোধহয়—সম্পর্কের আন্তরিকতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, উল্টে কেমন ধারা। যান্ত্রিকতাই জাঁকিয়ে বসছে। এতে হাসি কমে যাচ্ছে, হাসির ঘটনাও কমে যাচ্ছে। অথচ যে জাতের সেন্স অব হিউমার কম, সে-জাত অল্পায়ু-ই হয়। প্রাণখোলা হাসি আসলে মানুষের সুস্থতারই লক্ষণ। আগে ট্রামে বাসে ট্রেনে যত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মানুষ হাসত, কত মজার মজার সহযাত্রী পাওয়া যেত। অথচ ইদানিং লক্ষ্য করুন, যে-কোন একটা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাতাহাতি মারামারি হয়ে যাচ্ছে। আর ভয়ঙ্কর রুক্ষ এবং বেপরোয়া সহযাত্রীদের সঙ্গে আপনাকে প্রতিদিন যাতায়াত করতে হয়!

শুটিংতে ঢুকলে আগের মত আর মনেই হয় না যে একটা মজার কিছু ব্যাপার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। চারিদিকে বিষণ্ণ মুখ, ক্লান্ত ভঙ্গী, চারিদিকে অবক্ষয় সকলকে যেন তাড়া করে ফিরছে। তখন ভীষণ খারাপ লাগে। বেশীর ভাগ মানুষ গম্ভীর কণ্ঠে, নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে, আলোচনা করছে। মায় ক্যান্টিনের ন্যাতা গোলা চা গিলে নিছক পরিহাসের ভঙ্গীতেও একটা কথা বলছে না। কেন বলছে না? বললে কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হত?

এই ব্যাপারটাকে আপনারা কিভাবে নেবেন, সঠিক জানি না। আমাদের চারপাশে হাসি-খুশী মানুষগুলি এত কমে যাচ্ছে যে কি বলব। চোখের সামনে বাঘের মত ক্যামেরা, হাজার হাজার ওয়াটের জোরাল আলো, শরীরে জ্বালা ধরে যাবার দাখিল, ফ্লোরের প্রচণ্ড গরম—এসবই উপেক্ষা করা যায় এবং স্বচ্ছন্দেই যদি দমকা ঝড়ের মত একটা হাসি মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এবং সেই হাসির মসৃণ মেজাজ যদি অনেকক্ষণ ধরে প্রত্যেকের তাপিত হৃদয়ে অনুরণিত হতে থাকে। বলুন তো ভাল হয়! মাঝখানে কয়েক সংখ্যা বায়োস্কোপিক লিখতে না পারার অন্যতম কারণ ছিল এটাই, বিশ্বাস হবে কিনা জানি না। যাঁরা আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন আমি বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে মানুষকে হাসির খোরাক জুগিয়ে আসছি। আমি নিজে হাসতে চাই, সেই সঙ্গে এটাও চাই—সবাই প্রাণ খুলে হাসুক।

প্রাত্যহিক জীবনে বহু সমস্যাকে আমাদের এখন কিছুদিন হয়ত এইভাবেই মোকাবিলা করতে হবে। এছাড়া আর উপায় কি!

ইউরোপ ভ্রমণকালে এক ভদ্রলোকের মুখে একবার একটা গল্প শুনেছিলাম? ভদ্রলোক প্যারিসের এক নামজাদা রেস্তরাঁয় ঢুকে দেখলেন সেখানে আর একটা চেয়ারও খালি নেই। মায় মেঝের ওপরও কিছু লোক বসে আছে। এবং সবাই হো হো করে হাসছে। অদূরে একটা প্লাটফর্মের ওপর মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে আছেন। গম্ভীর মুখ। তিনি মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে একটা নম্বর হাঁকছেন আর রেস্তরাঁশুদ্ধ লোক হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

কি ব্যাপার? আমাদের এই ভদ্রলোকের তো চক্ষুস্থির। একজন খেঁকুড়ে মত দেখতে লোক নম্বর হাঁকছে এতে হাসির ব্যাপারটা কোথায়?

তিনি কৌতূহল চাপতে না পেরে একজনকে সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন—হ্যাঁ মশায়, ব্যাপারটা কি বলুন তো?

সে লোকটি বলল—এটা একটা জোকস্ সেশান চলছে।

—অ। তা ওই ভদ্রলোক তো কোন জোকস্ বলছেন বলে মনে হচ্ছে না, উনি তো নম্বর হাঁকছেন—

এবার লোকটি মুচকি হেসে বলল—ওটাই তো জোকস। ওই যে ভদ্রলোককে দেখছেন না উনি আমাদের এখানকার একজন নামকরা কমেডিয়ান। বিগত পঁচিশ বছর ধরে আমাদের হাসিয়ে আসছেন। ইদানিং ওঁর বয়স হয়েছে বলে সম্প্রতি উনি রিটায়ার করেছেন। কিন্তু রিটায়ার করলেই তো আর আমরা ছাড়ছি না: আমরাও ধরে এনেছি। উনি বলছেন—বাবা নতুন কোন জোকস্ আর তৈরী করতে পারছি না। আমরা চলেছি, পাব্লিক কোই পরোয়া নেহি আপনি আপনার পুরোনো-গুলোই চালিয়ে যান। আসলে ওঁর তৈরী সমস্ত জোকস্-ই আমাদের মুখস্থ। ফলে উনি যাইহোক নম্বর হাঁকছেন আমরা তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলছি উনি এবার আমাদের কোন্ জোকস্‌টা দিলেন। লোকে বেদম হাসছেও।

আমাদের এখানকার নামকরা কমেডিয়ান এখন মোটামুটি সেই লেভেলেই পৌঁছে গেছেন। ধরুন জহর রায়, ভদ্রলোক বিগত প্রায় পঁচিশ বছর মানুষকে হাসিয়ে আসছেন, ওঁর হাসির উৎসও যেন অফুরন্ত। সেদিন টেকনিসিয়ানে ওঁকে বলতে শুনলাম, আমি বাইরে রোদা, ভেতরে দারোগা। খুব খাঁটি কথা। মনে মনে যেন একটা ফল্গুধারা বয়ে যাচ্ছে। জহর রায়-দের একটা জেনারেশন যাচ্ছে; পরে এঁদের কে বা কারা রিপ্লেস করবেন, দেখতেও পাচ্ছি না। বুঝতেও পারছি না। তবে এটা ঠিক, কোন ভ্যাকুয়াম কোথাও থাকতে পারে না। থাকা সম্ভবও নয়। তাই কেউ না কেউ ঠিকই ওঁদের জায়গা নিয়ে নেবেন।

জহর রায় আর অজিত চাটুজ্যে, পরস্পরে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওঁরা একবার খানবাদে গেছেন জলসায় লোক হাসাতে। রাত্রে লোকজন হাসিয়ে ওঁরা স্টেশনে এলেন ভোরের ট্রেনটা ধরবেন বলে।

গভীর রাত—চারিদিকে ফাকজ্যোৎস্না যেন ফিনিক দিচ্ছে। ট্রেনের তখন অনেক দেরী, তাই ওঁরা সিগারেট ধরিয়ে নির্জন প্লাটফর্মে পায়চারী করতে শুরু করলেন।

করতে করতে হঠাৎ অজিত চাটুজ্যে দেখলেন প্লাটফর্মের সামনের বেঞ্চিতে একটি লোক অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে। আহা তার নাক ডাকার কি বহর,—কখনও তোড়ি কখনও মালকোষ কখনও বা বসন্তবাহার।

অজিত চাটুজ্যের মৃদু মন্তব্য—আহা—

জহর রায়—যেন বিসমিল্লা—

আবার দুজনের পায়চারী আরম্ভ হল। আর সঙ্গে চলতে থাকল সেই উৎকৃষ্ট নাসিক-সঙ্গীত। অজিত চাটুজ্যে কিছুক্ষণ পায়চারী করে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, জহর, এবার মিএ্যা-কি-মল্লার?

—উহুঁ, ঘরানা দেখে মালুম হচ্ছে এটা বাগেশ্রী।

—অঃ।

আবার কিছুক্ষণ চলাফেরা করার পর অজিত চাটুজ্যে বললেন, জহর, লোকটার টাকটা লক্ষ্য করেছ?

—করেছি বৈকি, জ্যোৎস্নায় আলোয় চকচক করছে, বেশ জমকালো সাইজের টাক্—

—হুম..., চাঁটি দিলে কেমন হয়?

—খুউব ভাল হয়। একখানা আস্ত রাগিণী হয়—গম্ভীরভাবে বললেন জহর রায়।

—দেবে?

—দিতে পারি, কিন্তু মাল্লু?

—কিতনা?

—শত্‌তো।

অর্থাৎ একশো টাকা বাজী ফেললে জহর রায় লোকটির টাকে বেশ জমিয়ে

হার্মোনিয়াম / সোনালী গুপ্ত ও ভীষ্ম গুহঠাকুরতা

[illegible]রেটের আগুনের ছ্যাঁকা দিতে পারেন। অজিত চাটুজ্যে ধাঁ করে রাজী হয়ে গেলেন।

—ডান্!

—ডান! বলে জহর রায় নিজের মুখের জ্বলন্ত সিগ্রেটটি ফুক ফুক করে টানতে টানতে হঠাৎ কষে এমন বেদম একটা টান দিলেন যে সেটি সাক্ষাৎ যেন একটি অগ্নি-গোলক হয়ে গেল। তারপর 'মাঃ' বলে সেটি আমূলে বসিয়ে দিলেন লোকটির ব্রহ্মতালুতে আরে বাপরে বাপ, তারপর চোখের সামনে যেন নগদ একখানা ব্যাটেল অফ দিয়েন বিয়েন ফু হয়ে গেল।

ঘুমন্ত টাকওয়ালা লোকটি আচমকা ওই [illegible] একখানা গিটকিরির জন্যে প্রস্তুত ছিল না। থাকার কথাও নয়। তাই টাকে আগুনের পরশমণি পেয়ে তুরন্ত সে যা একখানা লাফ দিল, যেটা জহর রায়ের মতে, ও-ধরনের লম্ফ এক অলিম্পিকেই নাকি কচিৎ-কখনো দেখা যায়। হাত তিরিশেক লাফ্যে উঠে লোকটি সবে মাটিতে পড়েছে এবং সেই সঙ্গে একখণ্ড ভিং কাঁপানো আওয়াজ ছেড়েছে, জহর রায় তৎক্ষণাৎ তার হাত মুলে চেপে ধরে কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন—তুহারকো পঁচাশ, হামারকো পঁচাশ, চিন্নাও মৎ—অর্থাৎ অজিত ডাহা হেরেছ, এখন পেমেন্ট করলেই তোমার ফিফটি, আমার ফিফটি, হার্ড ক্যাশ, সো [illegible]ণ্ট ওরি মাইণ্ডিয়ার....

এখন এহেন পরিস্থিতি ভূ-ভারতে এক [illegible]র রায় ছাড়া আর কারো ট্যাকেল করার ক্ষমতা আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। নাহলে সেদিনই হয়ত ধানবাদের প্রেস করেস-পণ্ডেণ্টরা বেশ স্বচ্ছন্দেই একটা মার্ডার স্টোরি ও'দের নিজের নিজের কাগজে লিখে পাঠাতে পারতেন।

হঠাৎ অনুপকুমারের কথা এসে পড়ল। চমৎকার মজার মানুষ। আজীবনকাল অবিবা-হিত থেকে পার্টিকুলার কোন মেয়েটিকে যে অনুপদা টাইট দিল তা এখনও পর্যন্ত আমরা বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে টাইট যে দিয়েছে এটা বুঝতে কিন্তু আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। ভেতরে মানুষটি অসাধারণ রোমান্টিক বন্ধু-বৎসল (স্বভাবতই বান্ধবী) অথচ বাইরে তার কোন প্রকাশই নেই। আর যাই হোক এখন চারিদিকে যা দেখছি অনুপকুমারের চরিত্রহনন করার উপায় নেই ত্রিসীমানায় মহিলা নেই যে। হায়! বায়োস্কোপের মানুষদের নিয়ে স্ক্যাণ্ডাল লিখে বাজার তৈরী করার জন্যে ইদানিং যেসব কাগজ পয়দা হয়েছে অনুপকুমারের মূল্য তাদের কাছে খুবই কম। চুলোয় যাক স্ক্যাণ্ডাল কাগজ আর ইয়োলো জার্নালিজম আমি হাসির প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

শ্যামল মিত্রের একটা ছবির আউটডোর শুটিং করতে আমরা গেছি ভারত-পাকিস্তান (এখন বাংলাদেশ) সীমান্ত বরাবর কোন একটি শহরে। শহরের কাছে মস্তবড় স্রোতস্বিনী একটি নদী। আমাদের বেশীর-ভাগ শুটিং ওই নদীর ওপর নৌকায়।

অনুপদা ছবির নায়ক। আশ্চর্য লোক মশাই কোন মেলাভাঙা সেই মাঝে-মধ্যে এক-আধটা সিগ্রেট তাও ফিলটার্ড ব্যাণ্ড। লোকে-শানে আমাদের দলে অনেকে আর্টিস্টও আছেন। মাধবী তরুণকুমার বিকাশ রায় জ্ঞানেশ মুখার্জি জ্ঞান ব্যানার্জি। শহরের সীমানায় একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানে ক্যাম্প তৈরী করা হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশজনের একটা ইউনিট দুবেলা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সে যেন একটা এলাহি ব্যাপার।

আর্টিস্টদের দেখবার জন্যে ক্যাম্পে রোজ স্বভাবতই ভীষন ভীড় হয় কিন্তু সারাদিন শুটিং করে ক্লান্ত আর্টিস্টরা আর ঘরের বাইরে আসতে উৎসাহ পান না ফলে জনতাকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়।

দ্বিতীয় না তৃতীয় দিন সেটা আমার স্মরণ নেই ভাল করে—ভোরবেলা আমরা নদীর ঘাটে পৌঁছে লঞ্চে চড়ে শহর ছাড়িয়ে বেশ কয়েক মাইল দূরে গিয়ে তবে শট নেওয়া হবে কিন্তু সারেঙ বললে—লঞ্চ যাবে না—

—কেন?

সারেঙ ভয়ে ভয়ে বলল—গেলে আমায় পিটবে।

শ্যামল মিত্তির তো অবাক।—কেন পিটবে কেন? আমি নগদ পয়সা দিয়ে লঞ্চ ভাড়া করে শুটিং করছি—কারা পিটবে?

সারেং ভয়ে ভয়ে যাদের কথা বলল, নিমেষে বোঝা গেল এরা সবাই লোক্যাল ট্যালেণ্টস। ওদের দাবী এই ঘাটে লঞ্চ দাঁড় করিয়ে রেখে প্রত্যেকদিন শুটিং করতে হবে যাতে ওরা দু নয়ন ভরে আমাদের কীর্তি-কলাপ সব দেখতে পায় এবং ঝামেলা করবার সুযোগ পায়।

শ্যামল মিত্তির সব শুনে মাথায় হাত দিলেন। একজন তাঁকে পরামর্শ দিলেন আরে ধুস্, এর জন্যে এত ভাবনা কিসের? টুক করে এস-পিকে খবরটা দিলেই সব মস্তান ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

অনুপকুমার হেসে বললেন—ব্যস তাহলে আজই এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। এর মধ্যে পুলিশ ঢোকালেই সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে কিন্তু—অনুপকুমার হুঁশিয়ার করে দিলেন—ও কম্মোটি ভুলেও কেউ করো না। এমনি ভাল মুখে বুঝিয়ে বাজিয়ে কাজ তুলে নিতে হবে।

আমরা ও'কে সমর্থন করলাম। উনি যথার্থ কথাই বলেছেন। আউটডোর শুটিং-এ 'মব' ট্যাকেল করাটাই হচ্ছে বড় কথা। ছবির বাজেট অনেকাংশে এর ওপরই নির্ভর করে।

শ্যামল মিত্তির আর দ্বিরুক্তি না করে স্থানীয় মস্তানদের যারা পাণ্ডা তাদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় বসলেন।

ওরা বলল—গুরু গান শোনাতে হবে—

শ্যামল মিত্তির অমায়িক হেসে—নিশ্চয় শোনাব। তবে সেসব তো এখন নয় পরে—

ওরা জানতে চাইল—আজ সন্ধ্যায়?

না না আজ কি করে হবে? আজ তো রাত্রে আমি [illegible] ফিরে যাচ্ছি। হবে যে

কোন একদিন। সাত আটদিন ধরে আমার রাঁধার কাজ তো হবেই এখানে—

ওরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। স্পষ্ট করে প্রতিশ্রুতি পেতে চায়। অনুপকুমার ওদের বুঝিয়ে বললেন ভাই শ্যামল যখন কথা দিয়েছে তখন গান একদিন ও নিশ্চয় তোমাদের গেয়ে শোনাবে। এখন আমাদের অনুমতি দাও আমরা কাজ শুরু করি—

ওরা তখন একটু তফাতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কিসব আলোচনা করল। তারপর ফিরে এসে বললে ঠিক আছে আপনারা শুটিং আরম্ভ করুন আমরা লঞ্চ ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি—

শ্যামল মিত্তির বললেন—দেখ ভাই তোমাদের ওপর ভরসা করে এত টাকা পয়সা খরচ করে এত আর্টিস্ট নিয়ে তোমাদের এখানে শুটিং করতে এসেছি এখন তোমরা যদি কো-অপারেট না করো তাহলে ধনে-প্রাণে মারা পড়ব—

ওদের একজন মুখপাত্র কতকটা হেবো মস্তানের মত দেখতে—এগিয়ে এসে হেঁড়ে গলায় রাজকীয় ঘোষণা করল—দেখি কোন শালা আপনাদের ইয়ে করে মেরে শালার ভবলা খিচে দেব না—বলেই হাতের গুলি ফুলিয়ে দেখাল তার নজরটা পাড়ার মেয়েদের দিকেই বেশী। স্পষ্ট দেখলাম স্থানীয় কলেজের চার-পাঁচটি মেয়ে ওকে প্যাটপ্যাট মুখ ভ্যাংচাল। তাতে হেবোর বয়েই গেছে।

আর একটি মস্তান শ্যামল মিত্তিরের সামনে হঠাৎ এক চক্কর নেচে নিয়ে বললে—গুরু তোমার 'গানে ভুবন ভরিয়ে দেব' শুনে মাইরি বলছি আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল শেষে বদ্যি ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে খেপা রোগ সেরেছে তুমি মাইরি ওই গানটা আমাদের গেয়ে শোনাবে, কথা দাও গুরু কথা দাও—

শ্যামল মিত্তিরের মুখটা তখন রীতিমত একটা স্টাডি। হাসবেন না কাঁদবেন সম্ভবতঃ স্থির করতে পারছিলেন না। শেষে হেবো মস্তান হেঁড়ে গলায় বললে—এই পোরতোস শালা ইদিকে আয়। আগে সুটিং পরে গান যা-বে রাস্তা গার্ড দে গে। লঞ্চ ঘাটে যেন একটা লোক আমাদের পারমিশন ছাড়া গলতে না পারে—

পরিতোষ তখন রুদ্ধ কণ্ঠে জানতে চাইল—আর তুই বুঝি এখানে দাঁড়িয়ে রেলা

করবি? সেটা হচ্ছে না চাঁদু আমরা ট্রাফিক কন্ট্রোল করব আর উনি এখানে পাহারা করবেন হুঃ হা-হা—

এইরকম একটা অকৃত্রিম অভ্যর্থনার মাধ্যমে তো আমাদের বায়োস্কোপের কাজ শুরু হল। লঞ্চের সারেঙ্গ ওঁদের মৌখিক সম্মতি নিয়ে তবে সিটি বাজালেন।

মাঝ নদীতে আমাদের কাজ। সেদিন অনুপকুমার আর জ্ঞানেশ মুখার্জিকে নিয়ে আমাদের চিত্রগ্রহণ। মাঝি সাজলেন জ্ঞানেশ আর অনুপকুমার খেয়ার যাত্রী। খেয়ার মাঝি গান গাইছে আপনমনে মাঝপথে দেখা গেল অনুপকুমারও সেই গানে গলা মেলাচ্ছেন। মাঝি দুঃখু করে গাইছে যে আর কতদিন এরকম পারাপার করব। ঈশ্বর তোমার কোন বিচার নেই আমার এই হাড়ভাঙ্গা মেহনতের কোন পুরস্কারই আমি পাই না। আর অনুপকুমার প্রত্যুত্তরে গাইছেন যে তুমি নিজেকে সাধারণ মানুষ ভেব না তোমার অনুগ্রহে এপারের মানুষ নিত্য ওপারে যাচ্ছে আসলে নদীর দু কূলকে তুমি যেন ঠিক মালার মত গেঁথে রেখেছ তোমার এই অবদান কেউ কখনও ভুলবে না—ইত্যাদি কত কথা।

হেনকালে ফট ফট; পেছনে বিকট শব্দ শুনে আমাদের লঞ্চের গতি নিমেষে রুদ্ধ হল। সারেঙ্গ সাহেবের ভাবগতিক দেখে মনে হল নিশ্চিত কেলেঙ্কারী কিছু হয়েছে।

দেখতে দেখতে একটা স্পীডবোট তীর-বেগে এসে বোঁ করে ঘুরে গিয়ে আমাদের লঞ্চকে ভীষণ ডজ করতে আরম্ভ করে দিল সেই সঙ্গে তীব্র হুটিং-এর শব্দ। আমরা সবাই তো থতমত।

সারেঙ্গ সাহেবের চক্ষুস্থির। স্খলিত কণ্ঠে উচ্চারণ করল—খেয়েছে মিলিটারী—

—মিলিটারী! তার মানে? অনুপকুমারের প্রশ্ন।

সারেঙ্গ সাহেব তার লুঙ্গি সামলাতে সামলাতে বললে ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না হঠাৎ মিলিটারীর লঞ্চ ধাওয়া করে এল কেন? আপনারা কেউ কোন মালপত্তর স্মাগলিং করছেন না তো?

—স্মাগলিং! বিস্ময়ে আমাদের সবার তো চোয়াল ঝুলে যাবার দাখিল—এর মধ্যে আবার স্মাগলিং ফাগলিং-এর প্রশ্ন আসে কি করে? এাঁ?

সারেঙ্গ বিচলিত কণ্ঠে বললে—তা নাহলে তো ওঁরা পেছনে পড়বে না—

ততক্ষণে আমাদের লঞ্চের সঙ্গে মিলিটারী [illegible] বোট সেঁটে গেছে। কয়েকজন সৈনিক রাইফেল উঁচিয়ে লাটাপাট আমাদের লঞ্চে [illegible] সঙ্গে এক ঝাঁক হুঙ্কার। সবার [illegible] একজন ক্যাপ্টেন। সর্দারজী। হাতে রিভলবার। নেমেই বললে—ব্যাটা [illegible] কো বোলাও—

সারেঙ্গ সাহেব সাক্ষাৎ যমের [illegible] হয়ে হাত [illegible] সর্দারজীর সামনে দাঁড়াল—হুজুর।

ক্যাপ্টেনের প্রশ্ন—যাচ্ছ কোথায়?

—[illegible]?

—বাড়ি এদিক পানে চলেছ কোথায় [illegible]

—আজ্ঞে যেমন কোথাও না।

—গান-বাজনা শুনেছিলাম তোমার লঞ্চে মাইফেল-টাইফেল হচ্ছে নাকি? এসব লোক-জনই বা কারা?

সারেঙ্গ সাহেব ঢোক গিলে বললে—হুজুর এঁরারা সব বায়োস্কোপের লোক ছবি তুলছেন আমরা ভাড়া খাটছি।

ক্যাপ্টেন তাকে এক পিলে চমকানো ধমক দিয়ে বললে—আর একটু হলে তো সব সমেত পাকিস্থানের জেলে যেতে বসেছিলে—জল বাইতে বাইতে কদ্দুর পর্যন্ত এসে পড়েছ—সে-খেয়াল আছে?

বলতেই সারেঙ্গ সাহেব ফ্যাল ফ্যাল করে একবার চতুর্দিক তাকিয়ে নিল[illegible] আই বাপ।

ক্যাপ্টেন বলল—আর মাত্র দু-কিলো-মিটার এগিয়ে গেলে সব্বোনাশের মাথায় বাড়ি পড়ত। বায়োস্কোপের লোকজন সমেত তোমরা যেতে পাকিস্থানের [illegible] আর আমার যেত চাকরী। উঃ ভাগ্যিস গান-বাজনা শুনতে পেয়েছিলাম। আজ একটা ইন্টারন্যাশনাল কেলেঙ্কারী হতে বসেছিল তার কি? আমি তোমাকে অ্যারেস্ট করলাম—

বলতেই দুজন হোৎকা মতন সোলজার বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে সারেঙ্গ সাহেবকে ধরে ফেলল—চল বক্তেমিজ—

সারেঙ্গ সাহেব নিমেষে জ্যাক—ছেড়ে দাও ক্যাপ্টেন সাহেব এই আমি নাকে-কানে মলা খাচ্ছি। আর জীবনে এ-রকম ভুল করব না এযাত্রা ছেড়ে দাও দাদা—

আর ক্যাপ্টেন তাকে কিছুতেই ছাড়বে না।—ব্যাটা আমাকে কোর্ট মার্শাল করবার ধান্দায় ছিল—ওকে ছাড়ব? কভি নেহি, আভি হম উসকো কোর্টমার্শালমে ভ্যাজেঙ্গে—

শ্যামল মিত্তির অনুপকুমার থেকে শুরু করে সবাই ক্যাপ্টেন সাহেবকে সম্মানে কিছুক্ষণ তদ্বির করলেন—ছেড়ে দিন ভাই নাকে কানে মলা তো খাচ্ছেই আর মার্শাল করে কি লাভ। ছেড়ে দিন—

সর্দারজী এবার যেন একটু নরম হলেন।—ঠিক আছে দিচ্ছি ছেড়ে কিন্তু সাবধান, ভবিষ্যতে আর কখনও যেন এমনটা না হয়—

ক্যাপ্টেন সাহেব সকলের সঙ্গে হ্যাণ্ড-শেক করে চলে গেলেন। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এবার ফেরার পালা। ততক্ষণে রোদ পড়ে গিয়েছে। ইচ্ছে থাকলেও আর শুটিং করার উপায় নেই। মিলিটারীর (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) সঙ্গে কচকচিতে ঘণ্টা দুয়েক অপব্যয় হয়ে গেছে সবার মেজাজই খারাপ। অনেকে বললে—[illegible] চান করে নেওয়া যাক—

সারেঙ্গ সাহেব [illegible] বললে—না না ও কম্মো করবেন না [illegible] মরবে। মিলিটারীর খপ্পর থেকে ছাড়া পেলাম কিন্তু আপনারা কেউ কুমীরের পেটে গেলে এবার খুনের দায়ে পুলিশ আমারে ধরবে—

[illegible]

রাজশ্রী বসু

কিছুক্ষণ

রাজশ্রী বসু পরিচয়ের প্রথম দিনই ঘণ্টাখানেক আড্ডার পর বলেছিলেন—'যে-কোনোদিন যে-কোনো সময়ে আপনি আসতে পারেন।' ও'র বাড়ীতে ফোন নেই। 'আগে থেকে তো আর জানাতে পারবেন না।' এই কথায় সায় দিয়েছিলেন ও'র বড়দা কাম সেক্রেটারী অর্থাৎ পৃথ্বীরাজবাবু।

সেইমত বহুদিন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি ও'র কথা। হুটহাট করে বাড়ীতে হাজির হয়েছি। কোনোদিন রাজশ্রীর দেখা পেয়েছি। কোনোদিন পাইনি। যেদিন পাইনি সেদিন দাদা বা মাকে পেয়েছি দরজার গোড়ায়। কষ্ট করে আর ওপরে উঠতে হয়নি আমাকে। কি ব্যাপার, কি বৃত্তান্ত জেনে নিয়ে 'আচ্ছা ও এলে বলে দেব' ইত্যাদি কথা শুনিয়েছেন।

'কিছুক্ষণের জন্য আড্ডা মারতে যাব এমন নয়, ক'দিন থেকেই ভাবছিলাম রাজশ্রীর সঙ্গে একবার দেখা করার দরকার। বাংলা ছবির নায়িকার অভাব কিছুটা মেটাচ্ছে তো মেয়েটি। 'শর্মিলা' রিলিজ হয়েছে। এ ছবিতেও ও'র অভিনয় বেশ ভালো। কনগ্রাট করতেই যাব ভাবছিলাম।

আর যেই ভাবা সেই অ্যাকশন শুরু। শনিবারের বারবেলায় সোজা সতীশ মুখার্জি রোডের শ'রতাল্লিশ নম্বর বাড়ীর সামনে হাজির সশরীরে। হয়তো জানেন ও'দের দরজায় যাবার মুখে একটা কানাগলির মতো আছে। আর সেই কানাগলির মুখেই [illegible] মত দেখা হোল রাজশ্রীর [illegible]-কাম-সেক্রেটারী পৃথ্বীরাজবাবুর সঙ্গে।

আমাকে দেখেই উনি হেসে উঠলেন। বললেন—'কি ব্যাপার? এই অসময়ে?'

আমার সোজা জবাব—এই এমনি আর কি। [illegible] আছে [illegible] উনি [illegible] কয়েক মুহূর্ত সময় [illegible]—[illegible] আছে। কি...ন্তু এখন তো...

কথা শেষ করতে না দিয়েই বললাম—'বেশীক্ষণ লাগবে না, একটা কথা [illegible] চলে যাব।' দেখা [illegible] ব্যাপার [illegible] জানতে চাইলেন তিনি। বললাম—'না [illegible] [illegible] করে যাই।

তবুও পৃথ্বীরাজবাবু কেন বুঝলাম না একটু দ্বিধাগ্রস্ত। উনি বিব্রত বোধ করছেন বুঝতে পারছি। তাই আর ও'র সামনে না দাঁড়িয়ে পা চালালাম দরজার দিকে। চলতে চলতে বললাম—'দেখি না উনি কি বলেন?'

আমার ঘরের দিকে এগোতে দেখে পৃথ্বীরাজবাবু হেঁকে সম্ভবত রাজশ্রীকেই বললেন—'নির্মলবাবু যাচ্ছেন, তাড়াতাড়ি কথা বলে নে।'

তাড়াতাড়ি কথা সেরে নেওয়া বা সময়াভাবের ব্যাপারটা আমার অবশ্য অজানা ছিল না। পরের বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারী) পৃথ্বীরাজবাবুর বিয়ে। তাই বাড়ীতে স্বাভাবিকভাবেই একটু ব্যস্ততা ছিল। সময় নষ্ট করতে চাইছিলেন না আর কি!

যাইহোক সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে কলিং বেল টেপবার আগেই কানে এলো 'ওপরের ঘরে যান আসছি আমি।'

কোথা থেকে শব্দটা এলো বুঝতে পারিনি। তবে রাজশ্রীই যে বলেছে সেটা নিশ্চিত।

ওপরের বসার ঘরের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি কয়েক মাসে। সোফার কভারগুলো শুধু বদলেছে। বই রাখার টেবিলটা মাঝখান থেকে সরে পেছনে চলে গেছে। শুনেছিলাম এঁরা 'অমৃত' রাখেন। কপি খুঁজলাম, পেলাম। চুপচাপ বসে পাতা ওলটাতে লাগলাম। একটু পরে দেখলাম সামনের দেয়ালে কাগজে লেখা একটা ইংরেজী কবিতার কয়েকটা লাইন। বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায়—

একদিন যখন নির্বান্ধব আমি
বসেছিলাম একা ভারাক্রান্ত মনে,
একটা অদৃশ্য স্বর বলে গেল
'জেগে ওঠো সময় আরও
খারাপ হতে পারে।
জেগে উঠে দেখি সময়টা
সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে।

এই কবিতা রাজশ্রী বসুর ঘর আলো করে কেন আছে বুঝলাম না। 'প্রান্তরেখা'র সাফল্যের পর ছ/সাতখানি ছবি এখন হাতে। প্রায় প্রতিদিনই লেগে আছে আউটডোর অথবা ইনডোরের কাজ। মেয়ে হিসেবেও ও'র মত জলি মেয়ে বোধহয় খুব কমই আছে।

পরিচয়ের দেয়ালটুকু খসাতে পারলেই একবারে অন্য মূর্তিতে দেখা যাবে রাজশ্রীকে। কি প্রাণখোলা হাসিখুশী মেয়ে। এককথায় বললে বলতে হয় ডিয়ার বন্ধু হবার যোগ্য পাত্রী সে। স্টুডিও ফ্লোরে দেখেছি (অবশ্যই কাজের পর) জমিয়ে আড্ডা মারতে। সামনে দিয়ে হয়তো কোনো বেশ ভারী নিতম্বিনী কেউ যাচ্ছে। সংগী পুরুষদের মন্তব্য ছাপিয়ে হয়ত সে-ই বলে উঠল—'দেখছিস পেছনখানা শুয়ে পড়বি নাকি?' অনেকেই একথা শুনে 'থ'।

এহেন মেয়ের ঘরে এই বিষাদের কবিতা। বেমানান। আবার ভাবলাম 'কার মনে কি লুকিয়ে আছে কে বলতে পারে।'

আমার চিন্তাকে আর বেশীদূর এগোতে দিতে পারলাম না। রাজশ্রী বসু গালে লেবু ঘষতে ঘষতে এসে হাজির। মুখের হাসিটুকু অবশ্যই ফেলে আসেননি। পরনে স্লিপিং গাউন। গালে ছোট্ট একটি টোল ফেলে বললে—'এই চান করতে যাচ্ছিলাম।'

এবার আমার বিব্রত হবার পালা। বললাম—'ঠিক আছে আপনি চান করেই আসুন।' রাজশ্রী নারাজ। আমার পাশের সোফায় ততক্ষণে পায়ের ওপর পা তুলে বসে পড়েছে। 'ঠিক আছে, তাতে কি—পরেই না হয় চান করব। এখনতো আড্ডা মারি।' বুঝলাম এখন মুডে আছে রাজশ্রী।

আড্ডার সুযোগ পেলে সে একপায়ে খাড়া। অথচ পর্দায় দেখেছেন তো—কি ইনট্রোভার্ট মেয়ে। ভাবাই যায় না এই সেই রাজশ্রী। জানতাম বম্বের আউটডোর থেকে কাল সন্ধ্যেবেলা ফিরেছেন কেমন কাজ-টাজ হোল জানতে চাইবার আগেই বললো—'কাজ হয়েছে খারাপ না, বেশ ভালোই। তবে কাল আসার সময় ফ্লাইট যা গণ্ডগোল করেছে না এখনও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। কাল কিরকম ঝড়জল হয়েছে জানেন তো! ঐ আবহাওয়ায় আমাদের প্লেন প্রায় তিনঘণ্টা চক্কোর মেরেছে আকাশে দমদমে ল্যাণ্ড করতে পারছিল না কিছুতেই।'

চোখে মুখে বুঝতে পারছি ভয়ের ছাপ বেশ স্পষ্ট। গত রাত্রের স্মৃতি এখনও ইচ্ছে করেও ভুলতে পারছে না সে—'কলকাতায় আসার কিছুক্ষণ আগেই এয়ার হোস্টেস যখন বলল 'ফাসেন ইওর বেল্ট' তখনই আমার অবস্থা কাহিল। মা বুঝতে পারেননি ব্যাপারটা। আমি তাড়াতাড়ি মার বেল্টটা লাগিয়ে দিয়ে আমারটাও লাগিয়ে নিয়ে

বসে আছি প্রায় কাঁপছি। মাকে অবশ্য কিছু বুঝতে দিইনি।' পালসের বিট তখন বোধহয় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল।

ভয়ের জ্বর ছেড়েছিল ল্যাণ্ড করার পর। লাউঞ্জের কাছে আসতে দাদা-ভাইকে দেখে তবে স্বস্তি।

বম্বেতে রাজশ্রী এই প্রথম যাওয়া। তাই শুটিং এর পর সময় পেলে ওখানের বাসিন্দা এক দাদা—বৌদির সঙ্গে খুব ঘুরেছে।

—'কোনো ফিল্ম পার্টিতে যানটানিনি?'

প্রশ্নটা শুনেই সে বলল—পার্টিফার্টি আমার ভাল্লাগে না।' বুঝতে পারলাম না—এইরকম উচ্ছল প্রাণখোলা আড্ডাবাজ মেয়ের কেন পার্টি ভালো লাগে না। তাছাড়া ওর নাকি স্টারদের দেখার তেমন কোনো ইচ্ছে নেই। হয়তো বা নিজেই স্টার বলে।

'পার্টিতে না গেলেও শান্তাক্রুজ এয়ার পোর্টে শাম্মী কাপুরের ছেলে, প্রেম [illegible] কিশোরকুমারের ছেলে অমিতকে দেখেছি।' আলাপ অবশ্য সে করেনি। বেচে আলাপ করার ইচ্ছে রাজশ্রীর কোনদিনই [illegible]ই।

বম্বেতে রাজশ্রী গিয়েছিল মায়ক রণজিৎ [illegible]কের সঙ্গে 'অপরাজিতা' ছবির আউটডোরের কাজে। মেইন কাজ ছিল অবশ্য [illegible]টা গানের সঙ্গে কিছু রোমান্টিক সিনের [illegible]কচারাইজেশান। রণজিৎ মল্লিকের লজ্জার [illegible] ইণ্ডাস্ট্রির সবাই জানে। সেটা মনে [illegible] বলেই বললাম—'রণজিৎবাবু কেমন [illegible]-অপারেট করেছিলেন?' উত্তরে বেশ চোখ [illegible] করে রাজশ্রী বলল—দারুণ করেছে। [illegible] সিনের যা সাজেশান ও দিয়েছে—আমি [illegible]কই পারিনি ওর মত লাজুক ছেলের [illegible] এরকম রোমান্টিক সেন্সও আছে।'

অনেকেই বলছেন লজ্জা ভাবটা নাকি আস্তে আস্তে রণজিতের কেটে যাচ্ছে। কেটে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। পর্দায় যখন তখন প্রেমিক-বাদশা-ফকির সাজতে হবে. তার ওপর আবার ন্যাকা-ন্যাকা প্রেমও করতে হবে সুতরাং লজ্জার মাথা না খেয়ে উপায় আছে! রোমান্টিক সিনে সবচাইতে বেশী কো-অপারেটিভ কে জানতে চাওয়ায় রাজশ্রী দ্বিধাহীনভাবে বললো—'টিটো—আই মিন। দীপঙ্কর দে। ওঁর সঙ্গে আমার অভিনয়ে দারুন অ্যাডজাস্টমেন্ট। 'মোহন-বাগানের মেয়ে'তে যা রোমান্টিক সিন করেছি দেখবেন!'

সত্যিই, প্রেমের সিন করতে গিয়ে আড়ষ্ট থাকলে বা প্রতিপক্ষ যদি ঠিকমত সাড়া না দেয় (অন্ততপক্ষে অভিনয়ের সময়টুকুতো বটেই) তা হলে কাজ করে আরাম পাওয়া যায় না। অভিনয়ও বাজে হয়। একথা সব শিল্পীরাই বলেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পারস্পরিক কো-অপারেশনটা বিশেষ দু-একটা জুটির যেমন থাকে সবার সঙ্গে তেমন হয় না। এটা বুঝি ঐ অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার। রাজশ্রীর সঙ্গে দীপঙ্কর দের সেটা হয়তো আছে।

শুটিং-অভিনয়-প্রেমের পর্ব ছেড়ে [illegible]র জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা তুলতে রাজশ্রী বলল—আত্মীয়ের কাজ (দোদাদ বৌভাত আরকি) মিটছে শনিবার। আপনি রোববার সকালে আসুন। শুটিং আছে কিনা জানি না, দাদার কাছে ডায়রীটা রয়েছে। কাজ না থাকলে কিছুক্ষণ গল্পই না হয় করা যাবে। কি আছে [illegible]!

আমার কোন [illegible] কারণ নেই। উঠি উঠি ভাবছি। অথচ কথার শেষ তখনও হয়নি। কোন কাগজে ওকে নিয়ে কিভাবে লেখা হচ্ছে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার স্রোত ঘুরছিল অন্যদিকে। ঘড়ির কাঁটা তখন কয়েক পাক ঘুরে গেছে। আড্ডাও থামেনি। গায়ের স্লিপিং গাউন আরও ভালো করে জড়িয়ে মৌজ করে বসেছে রাজশ্রী।

ইতিমধ্যে সিঁড়িতে শব্দ তুলতে তুলতে দাদা এসে হাজির। 'কিরে এখনো চান করিস নি'—রাজশ্রীকে বলেই আমার দিকে চোখ ফেরালেন দাদা-কাম-সেক্রেটারী পৃথ্বীরাজ-বাবু। 'এই হোল আর কি!' বলে আমি উঠতে যাচ্ছি এমনি সময় রাজশ্রী বলল, 'দাদা, আগামী রোববার কি আমার কাজ আছে? নির্মলবাবু আসবেন বলছিলেন।

তখনও [illegible] কোনোটাই তার মাথায় [illegible]তে পারছি। উত্তর দিতে হবে তাই দিচ্ছেন এমনি ভাব করে বললেন—হ্যাঁ শুভ সংবাদ-এর [illegible] আউটডোর আছে।' বললাম—'কোথায় বলতে পারেন?' আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে পৃথ্বীরাজবাবু বললেন—'আপনি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে জগন্নাথ চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করুন না। উনিই সব ডিটেলস বলতে পারবেন, [illegible]টেলও হতে পারে তো।' এবার রাজশ্রীকে একটু [illegible] সুরেই বললেন—যা তাড়াতাড়ি চান করে নে। ভদ্রলোককে এই কথাটা বলার জন্য এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছিস। কি যে করিস!' শেষের কথা-গুলোয় সেই [illegible]। রাজশ্রী [illegible] বলতে পেরে নিজের গায়েই [illegible]। [illegible] বলল—শুটিং কবে কি আছে, আমি জানি নাকি? তোমার কাছেই তো ডায়রী!' আর কোনো কথা নয়। [illegible] আজ।' দাদা আমার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত নীচে নেমে এলেন। আমি একবারে নীচে থেকে [illegible] শুনলাম [illegible]—'আবার আসবেন।'

[illegible]

তপন সিংহ পরিচালিত

রাজা

মহুয়া রায়চৌধুরী
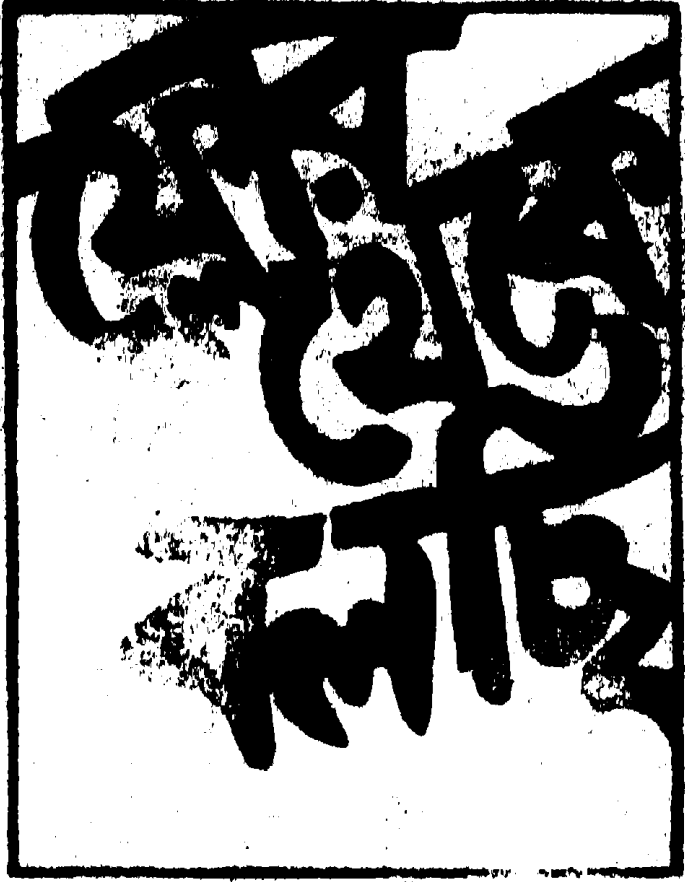
ফ্লোরের মধ্যে দারুণ হট্টগোল। মরে গেলাম। ডুবে গেলাম। থার্ড ক্লাশ ওয়েটিং-রুম। হুড়মুড় করে একদলের আগমন। এরা হচ্ছেন গিয়ে শুটিং পার্টি। পরিস্থিতি দেখে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে তো বিস্মিত হবেনই আমরা শুটিং দর্শনার্থী-রাও যুগপৎ বিস্মিত। মুখে চোখে সকলেরই প্রশ্নবোধক চিহ্ন 'কি হয়েছে মশায়' থাকতে পারে। কিন্তু হারাধনবাবু হঠাৎ মৃদু হাসি হাসলেন। ব্যাপারটা তাঁর জানা আছে। ওরা বাড়ি পাচ্ছেন না। 'আপ-নারা বাড়ি পাচ্ছেন না এই তো।' বেশ ভাল কথা। ভাল কথা! একটা অপরিচিত জায়গায় এসে বাড়ি না পাওয়া কোনক্রমেই ভাল কথা নয়। যদি একটা ভাল ব্যবস্থা হয়। হবে নাকি? রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জি সহ আরো কয়েকজন পাঁড় কি মরি হলেন। হারাধনবাবু কাগজ চাইলেন। কলম চাইলেন। ফটাফট কাগজ ও কলম সাপ্লাই করা হল। কিন্তু টাকাটা? সে হবে-খন। না না তা কি করে হয়। টাকাটাই তো সবচেয়ে বড় কথা—কথাটা সম্পূর্ণ করতে পারলেন না চিন্ময়। ততক্ষণে চোখ তুলে তাকিয়েছেন হারাধনবাবু। ভাবটা তাঁর এমন আমি যখন ব্যবস্থা করছি, দায়িত্বটা আমার। আবার মুখের ওপর কথা হচ্ছে। সামলে নিলেন রবি ঘোষ। হারাধনবাবু অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে লিখে দিলেন। কাগজের টুকরো পকেটস্থ করতে করতে রবি-চিন্ময় পরি-কল্পনায় ফাঁদ পাতলেন। যথারীতি পা দিলেন জাঁদরেল এস এন চ্যাটার্জি—এই মেক-আপ-এ হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে বসে মুচকী হাসছিলেন গীতা দে। রবি-চিন্ময় জুটি এমন হাতক্রম চিত্র পরিচালক প্রকাশ লাহিড়ী এবং আলোকচিত্রশিল্পী অবনীশ রায়। সঙ্গে তিন চার দিনের একটি ইউনিট। এই ইউনিট এখনই শুটিং শুরু করতে চান। কি ভাবে? ঐ জাঁদরেল ভদ্র-লোকের গোঁফের একটা ক্লোজ-আপ দিয়ে শুভসূচনা হতে পারে। উত্তম প্রস্তাব। গোঁফের ছবি তোলা হবে। সম্মত হলেন মিঃ চ্যাটার্জি। সংগে সংগে চিত্র পরিচালক শট ডিভিশন ভেবে ফেললেন। শিল্পীকে দৃশ্যটা বিস্তারিত করা দরকার। করলেন এইভাবে : একটা ভিখিরি যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। কাট। বাস যাচ্ছে ট্রাম যাচ্ছে। কাট। সিম্বলিক—ফেলিনির সাড়ে আট। কাট।

এত কাটাকাটি কিসের?

ওসব কিসসু না। ফিল্ম। ফিল্ম কাটাকাটি হয়।

দেখতে দেখতে শুটিংয়ের মধ্যে শুটিং শুরু হয়ে গেল। অর্থাৎ ফাটাফাটি কাণ্ড। যা ইচ্ছে তাই। কখনো এই অ্যাঙ্গেল থেকে, কখনো ঐ অ্যাঙ্গেল থেকে শটের পর শট টেকিং আর কাট। ওদের গলা ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত মূল পরিচালক স্বদেশ সরকারের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি করল। কাট।

কেটে পড়ার জো আছে। জানতে হবে। আপনাদের জানাতে হবে 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' এই ছবির নাম। ছবির নাম যখন কোন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে এল তখন কি সাংঘাতিক ব্যাপার। সাংঘাতিক কোন ঘটনা নয়। কিম্বা অ্যাডভেঞ্চারও নয়। এই বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে হুলস্থূল ব্যাপার। এর সাক্ষী কাহিনীর নায়ক অতীশ রায়। যখন সে তার দাদামশায়ের নির্দেশ মত পাহাড়গড়ের বাড়িটির দখল নিতে গিয়ে-ছিল। বাড়ির দখল নিতে গিয়ে দেখল সেখানে প্রমীলা রাজ্যের এক সুন্দরী ও তার পিসিমা বহাল তবিয়তে বসবাস করছেন। অতীশ একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কি বলতে পারে সে। কিই বা করতে পারে। সামনে দাঁড়িয়ে অ্যাটম বোমার চেয়ে ভয়ংকর সুন্দরী। প্রথম দর্শনেই অতীশ রায় হাড়ে হাড়ে বুঝে গেল। অনুভূতিটা তীব্র হল। মানে মানে কেটে পড়া অনেক ভাল। কেটে পড়লে বাড়ি সত্যি সত্যি জবরদখল না হয়ে যায়। মনের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্বের সংঘাত চলল। অতীশ রায় মহামুস্কিলে পড়ল। সে এগিয়েও যেতে পারছে না আবার পিছিয়েও আসতে পারছে না।

বুদ্ধিমান অতীশ অবশেষে গোলমাল কাটিয়ে উঠতে পারল। ফলে প্রমীলা ও তার পিসিমার সংগে সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল। বলতে গেলে ওরা যেন অতীশের পরিবারভুক্ত। বাইরে থেকে এই পরিবেশ দেখলে এটাই ভাবা স্বাভাবিক। এরপর কাহিনীর গতি কখনো বাঁয়ে, কখনো ডাইনে যাচ্ছে। নানান ঘাত-প্রতিঘাতের পর এক নাটকীয় পর্বে এসে উপস্থিত হল। সেই পর্বে অতীশের আক্কেল গুড়ুম হবার দাখিল। ভাগ্যিস পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল অকৃত্রিম বন্ধু অরুণ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে এসে পড়লেন প্রমীলার সাহেবীভাবাপন্ন বাবা জাঁদরেল এস এন চ্যাটার্জি। মাঝখানে আরেক কাণ্ড—ঐ শুটিং পার্টি। মধ্যমণি মল্লিকা সেন। অতীশ রায় আর প্রমীলার মাঝখানে মল্লিকা সেন চন্দ্রমল্লিকা হয়ে ফুটতে পারল কিনা সেটা বলা যাচ্ছে না। এই পর্যন্ত এসে কাহিনী বড় লজ্জা পাচ্ছে। সবই যদি বলে দেওয়া হয় তাহলে রাগারাগি হবে। কাটাকাটি থেকে ফাটাফাটি এখন আবার রাগারাগি। থাক, তবে থাক।

তবে এইটুকু মনে রাখবেন এ কাহিনী গভীর গভীরতর কিছু বলতে চায় না। সে-রকম প্রিটেনশানও নেই। এ কাহিনী হাসির কলতানে মুখর করে রাখতে চায় কিছুক্ষণ।
পরিচালক স্বদেশ সরকার, অজয় করের সুযোগ্য সহকারী প্রথম স্বাধীন প্রয়াস 'শাস্তি'। উচ্চমানের শিল্প কর্মের নিদর্শন এই ছবি স্বদেশ সরকারকে খ্যাত করেছে সন্দেহ নেই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। ছবিটি বকস অফিসের আনুকূল্য পায় নি। অতএব যা স্বাভাবিক তাই হয়েছে—পরিচালক সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকদের কথা ভেবে গতানুগতিক পথে হাঁটতে শুরু করেন। পরপর দুটি ছবিতে সাফল্য—'জীবন সৈকতে' 'হারায়ে খুঁজি'। এটি তাঁর চতুর্থ প্রয়াস। মাঝখানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জীবন যে রকম' চলচ্চিত্রায়িত করছিলেন রঞ্জিত মল্লিক ওয়াহিদা রেহমান বসন্ত চৌধুরী অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে কাস্ট করে। ছবিটি মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। আবার শুরু হবে শুনছি। কথাপ্রসংগে জিগ্যেস করতে শ্রীসরকার আমাকে জানালেন, 'আশা করছি আবার শুরু করতে পারব। ওয়াহিদা রেহমান ডেটস দিয়েছেন। হয়তো মার্চ মাসেই শুটিং হতে পারে।

এদিকে হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ ছবির শুটিং শেষ হয়ে এসেছে। গত ডিসেম্বর মাসের শেষ থেকে জানুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত একটানা শুটিং করেছেন আউটডোরে। লোকেশন ছিল শিমুলতলা। এখানেই ছবির অনেকটা অংশ চিত্রায়িত হয়েছে। এছাড়া কলকাতারও আশে পাশে কিছু শুটিং হয়েছে। বর্তমানে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে শুটিং চলছে। এই প্রস্থ শেষ হলে অবশিষ্ট থাকবে মাত্র কয়েক দিন।

এ ছবির অভিনয় অংশে : দীপঙ্কর দে। প্রমীলা : সন্ধ্যা রায়। মল্লিকা সেন : আরতি ভট্টাচার্য। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন : ছায়া দেবী, অনুপকুমার, কালীপদ চক্রবর্তী, ধীরাজ দাস ডি ডি নাথ এ কে চৌধুরী, কে পি নাথ, রতন ব্যানার্জি বীরেন চ্যাটার্জি যোগেশ সাধু প্রভৃতি। চিত্রগ্রহণ ও শিল্প নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও গৌর পোদ্দার। রূপসজ্জাকর : ভীম নস্কর। প্রধান সহকারী পরিচালক : অমিয় সান্যাল। গান এ ছবির অন্যতম সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। তরুণ সুরকার মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর এটি দ্বিতীয় ছবি। প্রথম ছবি 'আলো আঁধারে'। প্রথম ছবিতেই তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ ছবিতেও তার কিছু ব্যতিক্রম হবে না। ছ খানা গান রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছে। গানগুলি গেয়েছেন : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্রাবন্তী মজুমদার, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরতি মুখোপাধ্যায় এবং কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাহিনীকার : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্যকার : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় : স্বদেশ সরকার। নির্মীয়মাণ ত্রিমূর্তি শিল্পম নিবেদিত এ ছবি প্রযোজনা করছেন কে পি নাথ।

স্টুডিও সংবাদদাতা

জীবন মরণের প্রান্তে
সমিত ভঞ্জ

স্টুডিও সংবাদ

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর স্কোরিং-এ পরিচালক দীনেন গুপ্ত তাঁর নতুন ছবি নিশিমৃগয়া-র শুভ সূচনা করলেন। শুভ সূচনা হল সঙ্গীত গ্রহণের মাধ্যমে। সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে দুখানি গান রেকর্ড করা হল। কণ্ঠ দিলেন : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কাহিনী অবলম্বনে এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন : কুণাল মুখোপাধ্যায়। নায়িকা : সুচিত্রা সেন। নায়ক : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বহুদিন পর অর্থাৎ 'সাত পাকে বাঁধা'-র পর এই জুটির নতুন ছবি। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে থাকছেন : বসন্ত চৌধুরী উৎপল দত্ত দিলীপ মুখোপাধ্যায় কাজল গুপ্ত প্রভৃতি। বলা বাহুল্য চিত্রগ্রহণ করবেন পরিচালক স্বয়ং। শিল্প নির্দেশক : সূর্য চট্টোপাধ্যায়।

পরিচালক শচীন অধিকারী সম্প্রতি ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে 'দুই বোন' ছবির শেষ পর্যায়ের দৃশ্য গ্রহণ করলেন। দুই বোনের ভূমিকায় রূপদান করলেন : সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় এবং বিদ্যা রাও। শৈলেশ দের কাহিনীর ভিত্তিতে নির্মীয়মান এ ছবির নায়ক নবাগত প্রণব বসু। চিত্র গ্রহণ করছেন নিমাই রায়। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন : মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে 'তাসের দেশ' নির্মিত হচ্ছে শ্যামল গুহর পরিচালনায়। সেদিন এক প্রস্থ শুটিং হয়ে গেল। শিল্পীদের মধ্যে অংশ নিলেন : প্রতুল গুহ, রীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী চট্টোপাধ্যায়, মালা মুখোপাধ্যায় গৌরী ঘোষ এবং শ্যামল গুহ। এছাড়া এ ছবিতে রাজপুত্রের ভূমিকায় রূপদান করছেন সন্তু মুখোপাধ্যায়। সদাগরপুত্র : উজ্জ্বল সেনগুপ্ত। ছবিটি নির্মিত হচ্ছে কলারে। এর কস্টিউম ডিজাইনিং এবং সেট ইরেকটিং-এর বিশেষ বিশেষ কাজগুলি করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী নিতাই ঘোষ। ফিল্ম ফাইনান্স কর্পোরেশনের আর্থিক সহায়তায় নির্মীয়মান এ ছবির শিল্পনির্দেশক বম্বের সুধেন্দু রায়। সম্পাদকও বম্বের—অমিত বসু। চিত্রগ্রহণ করছেন স্বনামখ্যাত রামানন্দ সেনগুপ্ত।

পরিচালক তপন সিংহ 'হারমোনিয়াম'-এর শুটিং দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। শুটিং হচ্ছে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এ। স্বরচিত কাহিনী চিত্রনাট্য এবং সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন শ্রীসিংহ। বলা বাহুল্য এ ছবিতে গানের বিশেষ ভূমিকা আছে। অনেকগুলি গান থাকছে। রেকর্ডিং পর্বও প্রায় সমাপ্ত। বিরাট ভূমিকালিপিতে আছেন : সমিত ভঞ্জ, আরতি ভট্টাচার্য স্বরূপ দত্ত ভীম গুহ-ঠাকুরতা সোনালী গুপ্ত কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, ছায়া দেবী, সন্তু মুখোপাধ্যায়, দিলীপ বসু শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরুন্ধতী দেবী। চিত্রগ্রহণ করছেন : বিমল মুখোপাধ্যায়। সম্পাদনা করবেন : সুবোধ রায়।

পরিচালক অগ্রদূত দাশগুপ্ত বম্বেতে 'অপরাজিতা' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শেষ করে ফিরেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন বম্বের রাস্তাঘাটে এবং কয়েকটি বাড়িতে শুটিং করা হয়েছে। কোনো অসুবিধা হয়নি। শিল্পীদের মধ্যে অংশ নিয়েছেন নায়ক রঞ্জিত মল্লিক এবং নায়িকা রাজশ্রী বসু। ছবির শুটিং অবশিষ্ট আছে আর মাত্র কয়েকদিন।

স্টুডিও সংবাদদাতা

ফিরোজ খাঁর কি খবর? 'ধর্মাত্মা' ছবিতে যে কারণে সে হেমাকে নিল সেই উদ্দেশ্য ক সফল হয়েছে? বলা যায় না সঠিক কিছু। হেমা ভয়ানক ধড়িবাজ। সে ফিরোজের সঙ্গে কয়েকদিন খুব মেলামেশা করেছিল। ফলে ছবিটা হাতছাড়া হয়ে যায় নি। অন্যদিকে হেমার মতো এক নম্বরী নায়িকাকে ফিরোজও হাতছাড়া করতে চায় নি। কিছু না হোক ছবির পয়সা তো ঘরে আসবে। সেই আশায় দিন গুনেছেন ফিরোজ। কেন না হেমা তার ঘরে আসে নি। আসবে ছবির পয়সা। তার জন্য হেমা জান লড়িয়ে অভিনয় করেছেন। ধর্মাত্মা হচ্ছে মারিয়া পুজোর বিখ্যাত রচনা গডফাদার-এর হিন্দি রূপকরণ। বিদেশী ছবির হিন্দি হলে যা হয়। গল্পের গরু যথারীতি গাছে উঠেছে। আর বিস্তারিত করা কি ঠিক হবে। ফিরোজ বেচারা নিরাশ হবে—আপনারা ছবিটা দেখুন।

আমীর গরীব ছবির অসামান্য সাফল্যের পর প্রযোজক-পরিচালক মোহনকুমার নতুন ছবি শুরু করলেন এম কে ফিল্মসের ব্যানারে। এবারেও শ্রীকুমার দেবআনন্দ-হেমা মালিনী কাস্টিং-এ ছবি করার চেষ্টায় ছিলেন। শেষমুহূর্তে ভূমিকালিপি পরিবর্তন করা হল। দেব-আনন্দ-এর স্থানে এলেন শশীকাপুর। অতএব শশী-হেমা কাস্টিং। এছাড়া দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে থাকছেন অশোককুমার ও প্রেম চোপড়া। ছবির সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।

দিওয়ার
শশী কাপুর / নীতু সিং

সুচিত্রা সেন কি আবার হিন্দি ছবির জগতে ফিরে আসছেন? বম্বেতে এখন অনেকের মুখেই এ প্রশ্ন। এর উত্তর দিতে পারেন প্রযোজকরা। বহুদিন পরে সুচিত্রা সেনকে কলকাতা থেকে এনেছেন জে ওম প্রকাশ বিখ্যাত প্রযোজক। তাঁর প্রযোজনায় গুলজারের পরিচালনায় নির্মিত হয়েছে আঁধি। মানে ঝড়। সত্যি কথা বলতে কি সুচিত্রা সেনের বম্বেতে হিন্দি ছবিতে আগমন ঝড়েরই সৃষ্টি করেছে। এই ঝড়ে অনেক তাবড় তাবড় নায়িকারই উড়ে যাবার সম্ভাবনা। তাহলে শ্রীমতী সেনের পরবর্তী ছবি কি? কয়েকজন পরিচালক যোগাযোগ করছেন সাইন করাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু শ্রীমতী সেন চটপট কিছু করতে চান না। তিনি স্ক্রীপ্ট শুনে গল্প শুনে পরিচালক দেখে তবেই অফার অ্যাকসেপ্ট করবেন। একটি অসমর্থিত সংবাদ এই যে সুচিত্রা সেন-রাজেশ খান্না কাস্টিং-এ একটি ছবি করার তোড়জোড় করছেন একজন বিখ্যাত পরিচালক। কে তিনি? ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায়? অসিত সেন?

বিগত উনিশশো চুয়াত্তর দেব আনন্দের কাছে আনন্দ বেদনার বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলো। তিনি এই বছরে অনেকগুলি ছবিতে কাজ করেছেন। প্রায় প্রত্যেকটাতেই সফল হয়েছেন। কিন্তু নিজে যে প্রোডাকশন করেছেন—ইশক ইশক ইশক—ভীষনভাবে ফ্লপ করেছে। ক্ষতির পরিমাণ ষাট লক্ষ টাকা। প্রসঙ্গত দেব বলেছেন : নেভার মাইণ্ড দিস ইজ নট মাই লাস্ট পিকচার।

অভিজিত

সুলেহ : জীতেন্দ্র / হেমা মালিনী

নাট্যরথী অমর দত্ত—৩
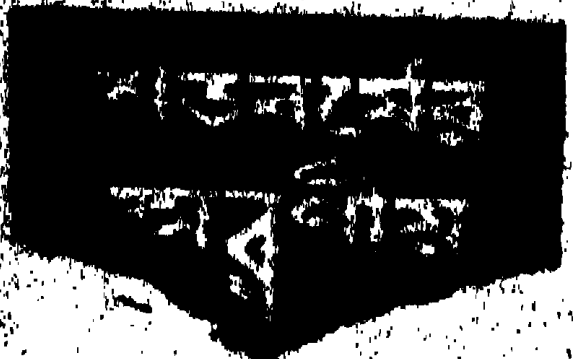
১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারী 'প্রেমের পাথার'-এর সঙ্গে শেকসপীয়রের 'কমেডি অফ এরর্স'-এর অনুসরণে রচিত 'কোনটা কে?' মঞ্চস্থ হলো। নতুন করে অমরেন্দ্রনাথ উজ্জীবিত হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। গিরিশচন্দ্রের 'সংসার' মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি চলছিল। চুণীলাল দেব-ও এসে যোগ দিলেন ক্লাসিকে। ১৮ ফেব্রুয়ারী মঞ্চস্থ হলো প্রেমের পাথার ও সংসার।

৪ মার্চ, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হলো অমরেন্দ্রনাথ রচিত শিবরাত্রি। এই সংগে হারানিধিও অভিনীত হয়।

২ এপ্রিল, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের রবিবার অমরেন্দ্রনাথের স্বত্বাধিকারীত্বে এমারেল্ড থিয়েটারে ক্লাসিক থিয়েটারের শেষ রজনীতে অভিনীত হলো হরিরাজ সোনার স্বপন শ্রীকৃষ্ণ। তাছাড়া হীরালাল সেন কর্তৃক প্রদর্শিত হয় চলচ্চিত্র।

অমরেন্দ্রনাথ ৩ এপ্রিল বিদায় নিলেন এমারেল্ড থিয়েটার থেকে তার নিজের হাতে গড়া ক্লাসিক থিয়েটারের সমস্ত স্বত্ব ছেড়ে দিয়ে।

ভগ্ন মন। ভগ্ন স্বাস্থ্য। আর্থিক দিক থেকে বিপর্যস্ত অমরেন্দ্রনাথ মনে করলেন আর থিয়েটারের ছায়া মাড়াবেন না। কিন্তু কিছুদিন বাদেই নতুন করে অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব সংবাদ নাট্যামোদীদের সচকিত করে তুলল।

গ্র্যান্ড থিয়েটার নাম নিয়ে ৯১, হ্যারিসন রোডস্থিত কর্জন রঙ্গমঞ্চে অমরেন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ প্রস্তুতি শুরু হলো।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বাংলা শনিবার ১৬ বৈশাখ ১৩১২) মনোমোহন গোস্বামীর পৃথ্বীরাজ আর অমর দত্ত রচিত ধ্রুব গ্র্যান্ড থিয়েটার-এর প্রযোজনায় কর্জন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হলো। অভিনয়ে ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ—পৃথ্বীরাজ। চুণীলাল দেব—জয়চাঁদ। নাট্যকার মনমোহন গোস্বামী—বোধমল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু—জয়পতি। নিখিলকৃষ্ণ দেব — বক্তিয়ার খিলিজি। কুসুমকুমারী—সংযুক্তা। হরিসুন্দরী (ব্লাকী)—যমুনা। তিনকড়ি দাসী—বিমলা প্রভৃতি। পৃথ্বীরাজের মধ্য দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ নিজেকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

২৯ জুলাই মঞ্চস্থ হলো অতুলকৃষ্ণ মিত্রের বাপ্পারাও। নামভূমিকায় ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। বাপ্পারাও আশানুরূপ জনপ্রিয়তার্জনে ব্যর্থ হলো। ১৬ অক্টোবর বঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ অভিনীত হলো।

এদিকে এমারেল্ড থিয়েটারে ধর্মদাস সুর মহাশয়ের নেতৃত্বে ক্লাসিক নাট্যামোদিদের অভিবাদন জানালো। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে তার নিজের হাতে গড়া ক্লাসিক পূর্ব সুনাম ফিরিয়ে আনতে পারলো না। ক্লাসিকের পক্ষ থেকে অমরেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করা হলো ক্লাসিকে যোগদানের জন্য। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। মাসিক ৫০০ টাকা মাইনেতে অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিকে যোগদান করলেন।

চুণীলাল দেব গ্র্যান্ড থিয়েটার পরিচালনা করতে লাগলেন।

অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিকের বেতনভুক্ত শিল্পী হিসেবে ২১ অকটোবর পৃথ্বীরাজ নাটকের নামভূমিকায় অভিবাদন জানান।

৪ নভেম্বর সুরেন্দ্রনাথ বসু রচিত দেশাত্মবোধক নকসা 'হলো কি'-তে অমরেন্দ্রনাথ মিঃ নেলার চরিত্রে অভিনয় করেন। ২৩ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হলো অমরেন্দ্রনাথ রচিত 'প্রণয় না বিষ'। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রণয় পরিণাম উপন্যাস থেকে আখ্যানভাগ গৃহীত। রমা পাগলার চরিত্রে অমরেন্দ্রনাথ ভিন্নধর্মী অভিনয়-কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রিন্স অব ওয়েলসরূপে কলকাতায় আগমন উপলক্ষে 'এস যুবরাজ' মঞ্চস্থ হলো ৩০ ডিসেম্বর। ২৭ জানুয়ারী, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা অভিনীত হয়। নামভূমিকায় থাকেন অমরেন্দ্রনাথ আর করিমচাচা চরিত্রে অভিনয় করেন হরিভূষণ ভট্টাচার্য। মিনার্ভা থিয়েটারেও ২৭ জানুয়ারী সিরাজদ্দৌলার অভিনয় হয়। করিমচাচা—গিরিশচন্দ্র। অর্ধেন্দুশেখর—মিঃ ড্রেক আর সিরাজদ্দৌলা চরিত্রে থাকেন দানীবাবু। দানীবাবুকে ম্লান করা কারোর পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

অমরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। মনও ছিল বিক্ষিপ্ত। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ক্লাসিক থেকে বিদায় নিলেন তিনি। কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে নিউ ক্লাসিক নাম দিয়ে আবার কর্জন মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের নাট্যরূপ কুন্দ নিয়ে। ৪ আগস্ট: ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কর্জন মঞ্চে কুন্দ অভিনীত হলো। নগেন্দ্রনাথ-অমরেন্দ্র কুন্দ-হরিসুন্দরী আর সূর্যমুখী চরিত্রে ছিলেন কুসুমকুমারী। 'কুন্দ' সুনাম অর্জন করলেও অমরেন্দ্রনাথ ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য বেশীদিন অভিনয় করতে পারলেন না। তিনি কাশী, মধুপুর বৈদ্যনাথ পুরী প্রভৃতি স্থানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গমন করেন। এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় বন্ধেতে গিয়ে একটা চাকরীও যোগাড় করেছিলেন কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের পক্ষে সে চাকরীতে বহাল থাকা সম্ভব হয় না।

ইতিমধ্যে স্টার থিয়েটারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। স্টার থিয়েটারের অনুরোধে অমর দত্ত কুসুমকুমারী-সহ ১৮ মে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারে যোগদান করলেন। ১৯ মে 'সরলা' নাটকে বিধুভূষণ চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করলেন অমরেন্দ্রনাথ। স্টারে কিছুদিন অভিনয় করে অমরবাবু মিনার্ভায় যোগদান করে ২১ জুলাই ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলা নাটকে সিরাজ চরিত্রে অভিবাদন জানান।

গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা পরিত্যাগ করে কোহিনুরে যোগদান করলে অমরেন্দ্রনাথের নাম ম্যানেজার রূপে বিজ্ঞাপিত হয়। তখন কোহিনুর আর মিনার্ভায় প্রচন্ড প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ২৫ জানুয়ারী মিনার্ভায় অমরেন্দ্রনাথের শেষ অভিনয়। অভিনয় না করলেও ম্যানেজার হিসেবে অমরেন্দ্রনাথের নাম বিজ্ঞাপিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথ পুনরায় স্টার থিয়েটারে যোগদান করেন এবং ২৬ এপ্রিল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রশেখরে প্রতাপ রূপে নাট্যামোদীদের অভিবাদন জানান। এখানে পুরোন নাটক ছাড়া যৎকিঞ্চিৎ কামিনী ও কাঞ্চন, জীবন সন্ধ্যা কেয়া মজাদার ইন্দির। কর্মফল কুসুমে কীট আশাকুহকিনী রজনী কনে বদল দশচক্র রাণীভবানী, বেহুলা প্রভৃতি আরো বহু নাটক অভিনয় করবার পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২২ জানুয়ারী অমরেন্দ্রনাথের সংগে স্টার থিয়েটারের সমস্ত সম্পর্ক ছেদ হয়।

স্টার পরিত্যাগ করে অমরেন্দ্রনাথ নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে বেঙ্গল থিয়েটারের তদানীন্তন মালিক অনাথ দেব মহাশয়কে নানা ভাবে বুঝিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারকে পুনরুজ্জীবিত করান। বলতে গেলে নতুন করে নির্মিত হলো বেঙ্গল থিয়েটার। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নাম নিয়ে বেঙ্গল মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করলেন অমরেন্দ্রনাথ। ২৭ জুন ১৯১১ খৃষ্টাব্দে জীবনে মরণে ও আহামরি নাটক মঞ্চস্থ হলো। আহা মরির অভিনয় ২৪ জুনের পর বন্ধ করে দেওয়া হয় পুলিশী নিষেধাজ্ঞায় বেজায় রগড় রজনী মেঘনাদ বধ বাজীরাও প্রভৃতি নাটক জনপ্রিয়তার সংগে গ্রেট ন্যাশনাল মঞ্চে অভিনীত হয়। বুধবার ৮ নভেম্বর, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সুশীলাবালার বেনিফিট নাইট উপলক্ষে বলিদান ও বিল্বমঙ্গল অভিনীত হয়। গ্রেট ন্যাশনালে বলিদান ও বিল্বমঙ্গলে যথাক্রমে করুণাময় আর বিল্বমঙ্গল চরিত্রেই অমরেন্দ্রনাথের শেষ আত্মপ্রকাশ।

কালীশ মুখোপাধ্যায়

আঁধি :: সুচিত্রা সেন : সঞ্জীবকুমার

আঁধি

প্রযোজনা : ফিল্মযুগ প্রাঃ লিমিটেড

কাহিনী, অভিনয় ও আঙ্গিকে বিশিষ্ট ছবি হিসাবে বিবেচিত হবে

শহরের মেয়র এবং বিশিষ্ট নেতা ও রাজনীতিবিদ পি কে বোসের একমাত্র কন্যা আরতি। মিস্টার বোস চেয়েছিলেন মেয়েকে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত করবেন। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর আদরের কন্যা আরতি শহরের এক হোটেলের সহকারী ম্যানেজার জে-কে-কে মনেপ্রাণে ভালবাসে। আচমকা এক ঘটনার মধ্যে দিয়ে ওরা খুব নিকটে আসে, তারপর শুরু হয় ঘনিষ্ঠতা এবং পরে পিতার অজ্ঞাতে বিয়ে। বিয়ের পর যথারীতি এক কন্যাসন্তানের জনক হোলেন জে কে। কিন্তু আরতি 'মা হবার পরেও নিজেকে সংসারের মধ্যে বেঁধে না রেখে রাজনৈতিক ব্যাপারে বাবাকে সাহায্য করবার জন্যে ঘন ঘন বাপের বাড়ী যায়। আর বাড়ীতে একমাত্র কন্যাসন্তানের দেখাশোনা করে পাড়া-প্রতিবেশী। তাই নিয়ে প্রথমে ভুল বোঝাবুঝি, তারপর শুরু হোল স্বামী-স্ত্রীতে সংঘাত। আরতি স্বামী ও কন্যাকে ছেড়ে বাধ্য হয়ে বাবার কাছে চলে এলো তার সঙ্গে দেশসেবার জন্যে।

ঘটনাচক্রে একবার ভোট সংগ্রহ করবার ব্যাপারে শহরের আশিয়ানা হোটেলে আশ্রয় নেয় আরতি ও তার দলের লোকেরা। এখানেও চন্দ্রসেন ও অন্যান্য দলগুলি সেই হোটেলের ম্যানেজার (জে কে) ও আরতিকে নিয়ে রসালো কাহিনী শুরু করে দেয়। তখন বাধ্য হয়ে চন্দ্রসেনের এক বক্তৃতা সভায় গিয়ে আরতি জে কে-কে নিজের স্বামী হিসাবে পরিচয় দেয়। ভোটেও আরতি চন্দ্রসেনকে হারিয়ে দেয়। এবং তার পর সে স্বামীর ঘর করতে চাইলেও দেশসেবার ও জনসাধারণের উন্নতিবিধানের জন্যে আবার তাকে ফিরে যেতে হয় রাজনীতিতে।

কাহিনীকার 'কমলেশ্বর' ('ফিরতি' খ্যাত) কাহিনীর মধ্যে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর জীবনের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে সন্নিবেশিত করেছেন। সেদিক থেকে লেখক অন্যান্য গতানুগতিক হিন্দী ছবির চেয়ে নতুন কিছু দেবার চেষ্টা করেছেন। চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনায় গুলজার হিন্দী ছবিতে নব্যবাস্তবতা ও বলিষ্ঠ পরিচালন ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে ছবির শেষদিকের দৃশ্যগুলির মন্থরতা এড়াবার জন্যে ছবির বেশ কিছু অংশ বাদ দিতে পারতেন।

অভিনয়ে—আরতির জীবনের বিভিন্ন দিক (তরুণীরূপে, বধূরূপে এবং মহিলা রাজনীতিবিদ ও দেশসেবিকার ভূমিকায়) শ্রীমতী সুচিত্রা সেন মরমী অভিনয় করেছেন। জে কে'র ভূমিকায় সঞ্জীবকুমারের অভিনয়ও চরিত্রানুগ। অন্যান্য ভূমিকায় এ কে হাঙ্গল, ওমপ্রকাশ, ওমশিবপুরী রেহমান মনমোহন ও বেবী শিল্পি অপূর্ব অভিনয় করেছেন। কলাকৌশলের কাজ এবং আলোকচিত্রগ্রহণের কাজ খুবই উচ্চাঙ্গের। সুরসংযোজনায় আর ডি বর্মনের কাজ প্রশংসনীয়।

-চিত্রদূত

নাট্যমঞ্চ

ভূতের বেগার নাটকের দৃশ্য

রূপান্তরীর ভূতের বেগার
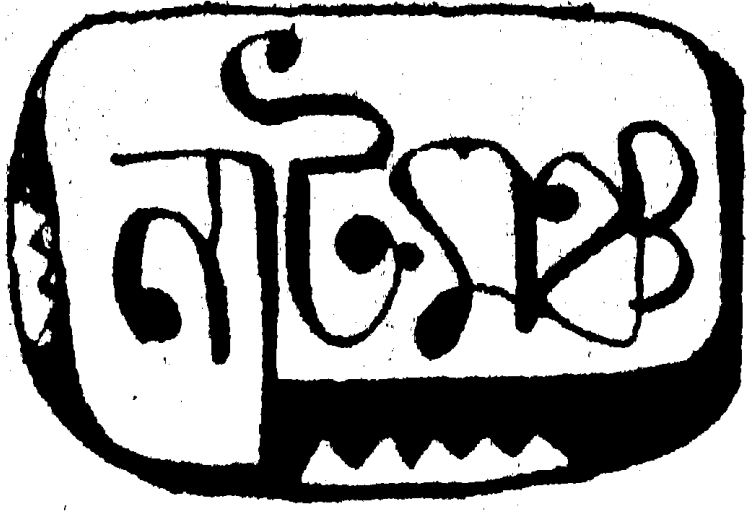
ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'ভূতের বেগার যখন লেখা হয় তখন এ দেশে বৃটিশ রাজত্ব প্রখর সূর্যের মত প্রতাপান্বিত। তাই স্বভাবতই ভাবতে অবাক লাগে এমন একটা নাটক কি করে তখন লেখা হয়েছিল এবং তা অভিনীত হয়েছিল।

'ভূতের বেগার' আপাতে ব্যঙ্গ নাটক হলেও, এর অন্তরালের তীব্র কষাঘাতটুকু স্পষ্ট।

সেকালে, অর্থাৎ মহামান্য বৃটিশ সরকার যখন ভারতের ভাগ্যবিধাতারূপে পাকাপোক্ত হয়ে বসেছেন এদেশে, তখন একজাতের কর্তাভজার সৃষ্টি হয় অনিবার্য ভাবেই। অর্থাৎ তাদের হাতের ক্রীড়নক পরিণত হয় নিজেদের স্বার্থপূরণের অভিলাসে। ফলে সৃষ্টি হোল এদেশে 'বাবু' শ্রেণী। এরা কালক্রমে একসময় ধ্যান ধারণায় ইংরেজ হবারও স্বপ্ন দেখেছিল। যার জের আজও এদেশে বিদ্যমান।

এই বাবু জাতির কৃপায়ই একদা এদেশের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রূপান্তর আসে। ফলে এক রকমের বিকৃতি আমাদের সুস্থ চেতনাকে গ্রাস করে ফেলে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ এই শ্রেণীর পরগাছা বাবুজাতিকে তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কষাঘাত করবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর 'ভূতের বেগার' নাটকের মাধ্যমে।

তবে মূল নাটকের কিছু কিছু সংস্কার করেছেন এ যুগের নাট্যকার জোছন দস্তিদার। যাকে তিনি বলেছেন 'বিকৃতি।' (এ নাটকের পরিচালকও তিনিই।) কৈফিয়ৎ স্বরূপ তিনি বলেছেন, 'ধৃষ্টতার সহিত তাহার সৃষ্টির উপর আমরা কলমের খোঁচা লাগাই নাই। তাহার নাটকের মূল সুর বজায় রাখিয়া তাঁহার লিখিত অনুচ্চারিত স্থানগুলিকে সোচ্চারিত করিয়াছি মাত্র।

......'ভূতের বেগার' বাবুজাতির মুকুর। যুগের গতিতে মুকুরের পারা স্থানে স্থানে খসিয়া গিয়াছিল, আমরা তাহাতেও কিছু কিছু পারা সংযোগ করিয়া বাবুজাতির প্রতিনিধি হইয়া বাবুজাতির সম্মুখে মেলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিলাম মাত্র।

বৃটিশ এদেশে আসার পর সাহেবী আদব কায়দার সঙ্গে আর একটি জিনিষ আমরা তাদের কাছে পেয়েছি। সেটা হোল ব্যবসা বুদ্ধি। যে ব্যবসা বুদ্ধি আদৌ ভারতীয় মেজাজের নয়, অর্থাৎ বেনের ব্যবসা নয়। সাহেবী কায়দার ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। এবং যে ব্যবসা সম্পূর্ণতই দোয়াত কলম, কাগজ, ফাইল, টেবিল চেয়ার এবং সই ভিত্তিক।

নাটকের নায়ক আনন্দ ব্যানার্জীও খোদ ইংরেজ সাহেব মিঃ বাউয়েলের কৃপা ও অনুপ্রেরণায় সেই রকমের ব্যবসা করেছিল। এবং ব্যবসা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করল স্বপ্ন দেখার। স্ত্রীকে সে বোঝাল এবার সে একাধারে বড়লোক এবং জাতে উঠবে। এ জাতে ওঠা তাদের পারিবারিক বনেদীয়ানা নয়, সাহেবের কাছাকাছি থাকার যোগ্যতা।

ফলে নায়ক আনন্দও একদিন পৈত্রিক পোষাক ছেড়ে প্যান্ট কোটের বাবু হোল, ইংরিজি বিদ্যা রপ্ত করার জন্য সচেষ্ট হোল, ছেলে মেয়েকে ইংরিজ শেখাবার জন্য সেকালের বিদ্যা দিগ্‌গজ, মাস্টার রেখে দিল। এমন কি স্ত্রীকেও ইংরেজ সমাজে মেলামেশার সুবিধার জন্য ইংরিজি শেখাতে ও ইংরেজ ললনাদের মত গাউন পরা শেখাতে লাগল।

কিন্তু আনন্দ ব্যানার্জী ইংরিজি ঢঙে ব্যবসা এবং ইংরেজ-ই হতে চেয়েছিল, জাত ব্যবসায়ী ধুরন্ধর ইংরেজের কূট চাল সে ধরতেও পারেনি, আয়ত্তও করতে পারেনি। ফলে অনেককে সর্বস্বান্ত করে একসময় নিজেকেও ডুবতে হোল। ততক্ষণে তার এবং তার স্ত্রীর যা কিছু ছিল সবই চলে গেছে সাহেবের অদৃশ্য হাতে।

'ভূতের বেগার' নাটকের মূল গল্পের ছক এটাই।

নাটকের শুরু চারণ দলের গানের দিয়ে। অনেকটা পালা গানের অগ্রদূতেরা যেভাবে পালা গানের প্রস্তাবনা করে শুরুতে, অনেকটা সেই ঢঙে। ঘটনায় পরিবর্তনের প্রস্তাবনা এদের মুখে ব্যক্ত

মঞ্চে পরিবেশন করা হয়েছে। নাটকে এই সঙ্গীতগুলি বড় ভাল লেগেছে। গায়ক দল (সংগীত দেবাশীষ দাশগুপ্ত, গেয়েছেন সত্যব্রত দাশগুপ্ত, প্রণবসাধন কর, গৌতম ব্যানার্জী, শ্যামল সেনগুপ্ত ও প্রণিধা চক্রবর্তী) গেয়েছেনও সুন্দর।

অভিনয়ে প্রথমেই যিনি দর্শকদের বিস্মিত করেছেন তিনি আনন্দের স্ত্রীরূপী চন্দ্রা দস্তিদার। যেমন উনি বাঙ্গালী ঘরের বৌয়ের রূপে, তেমনি গাউন পরে মেম হবার চেষ্টায়—সেই সঙ্গে তাঁর অনবদ্য অভিনয়।

এর পরেই নাম করা যায় আনন্দ জামাইরূপী জোছন দস্তিদার ও পিসের নাট্যাভিনেতা পার্থ মিত্রকে। জোছনবাবু দুই ভূমিকায়। (খাঁটি বনেদী বাঙ্গালী ও সাহেবী পোষাকে) মর্যাদা সম্পন্ন এবং আশ্চর্য স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন।

সরকারের ভূমিকায় কুমারেশ মুখার্জী কোন কোন দৃশ্যে চমৎকার। তবে তিনি অতি নাটকীয়তার ঝোঁক আর একটু সামলে নিলে চরিত্রটি আরও হৃদয়গ্রাহী হোত।

প্রশান্ত ঘোষের মিঃ বাউয়েল এবং সুজিত ঘোষের খুড়ো ভাল। নিতাইয়ের স্ত্রীর ভূমিকায় মণিকা চক্রবর্তী অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ এবং সুন্দর। সমীর লাহিড়ীর চাকরও স্বচ্ছন্দ।

অন্যান্য ভূমিকায় মদন দেব, কমল রায়, শিখা রায় ইত্যাদি স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন।

আনন্দের কন্যা পাটনীর ভূমিকায় ছোট মেয়ে খেয়ালী দস্তিদার এবং পুত্ররূপী নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালো লেগেছে। একটি ছোট্ট ভূমিকায় ক্ষিতীন দাস সুন্দর। শ্যামল সেনগুপ্তের মঞ্চ পরিকল্পনায় নূতনত্ব আছে। একই স্টেজের ওপর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য উপস্থাপনার পরিকল্পনা তার মুন্সিয়ানারই পরিচায়ক।

যাত্রাপালায় ব্রেখট নাটক

শৌখিন যাত্রার আসরে ব্রেখটের সর্বপ্রথম পদার্পণ ঘটলো গত ৯ ফেব্রুয়ারী জ্ঞানভারতী হলে সান্ধ্য নাট্য সংঘের প্রযোজনায়। বের্টোল্ট ব্রেখটের একটি জনপ্রিয় নাটক অবলম্বনে রচিত সুধাংশু দাশগুপ্তের 'বহুবল্লভা' আসরস্থ হয় প্রদীপ ঘোষের নির্দেশনায়। দলগত অভিনয়ে সমৃদ্ধ এই যাত্রাভিনয়ে বিশিষ্ট মাত্রা সংযোজন করেছেন নাট্যনির্দেশক। আর সেই সঙ্গে সুরবৈচিত্রের বন্যায় আসর মেতে ওঠে পরেশ ধরের সুরসংযোজনার কৃতিত্বে।

সৃজনের 'মা'

অসহনীয় যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ সমাজের বুক থেকে শোষণ বঞ্চনা নির্যাতন চিরবিদায় দিয়ে আগামী দিনগুলোকে সুন্দর করে গড়ে তোলার সঠিক নিশানা দিয়েছেন ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর বিশ্বখ্যাত 'মা' উপন্যাসে। অদৃশ্য পরিকল্পনামত আজ যখন সুগভীর এক জঘন্য উদ্দেশ্য নিয়ে যৌনতা, নগ্নতা ও ব্যাভিচারিতা সমাজ-জীবনকে অভিশাপ ভারাক্রান্ত করে তুলছে তখন তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম প্রতিবাদ হোল 'মা'। সৃজন নাট্যগোষ্ঠী গত এপ্রিল রূপনায় নাটকটি মঞ্চস্থ করছেন। নাট্যরূপ দিয়েছেন বিষ্ণু চক্রবর্তী। রাসায়নিক প্রযোজনাকে আঙ্গিকের মাধ্যমে আরও সাফল্যমণ্ডিত করতে সংগীত ও আলোক পরিচালনায় আছেন যথাক্রমে হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং তাপস সেন, নির্দেশনায় জ্যোতিপ্রকাশ। অভিনয় শুরু সাড়ে ছটায়।

থিয়েটার সেন্টারের (কলকাতা) নাট্যোৎসব

থিয়েটার সেন্টারের বিংশতিতম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৪ই মার্চ থেকে সপ্তাহব্যাপী এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই উৎসবে বিভিন্ন দিনে অথচ সংযুক্তা, সেদিন দুজনে, পরাজিত নায়ক প্রহসন (ঊনবিংশ শতাব্দীর), কেঁচো খুড়তে সাপ, ষোড়শী ও ক্ষুধিত পাষাণ মঞ্চস্থ হবে। একাডেমী মঞ্চে।

নাট্য সমালোচক

বিবিধ সংবাদ

প্রেমাবতার শ্রীনিতাই চাঁদের স্মরণে যুগান্তর পত্রিকা ভবনে উৎসব : ১০ ফাল্গুন সন্ধ্যায় শুভ অধিবাস অনুষ্ঠিত হয় এবং ১১ ফাল্গুন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিতে নিত্যানন্দ জন্মতিথি উপলক্ষে দিবামঙ্গল হরিনাম সংকীর্তন হয়। সন্ধ্যায় বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠানে ভক্তি গীতি পরিবেশন করেন মনোজ মিত্র, নিবেদিতা নাথ, জয়া দাশ, ভোম্বল দাস পরিতোষ দাশগুপ্ত আশীষ গুপ্ত, অজিতকুমার সাহা এবং খোল সংগতে অসিতকান্তি ঘোষ।

ধর্মীয় ও বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীপাদ গোবিন্দগোপাল গোস্বামী ভাগবতশাস্ত্রী। প্রধান অতিথি নরেন্দ্রনাথ পাল। ১২ ফাল্গুন মাঘী পূর্ণিমা কলিযুগোৎপত্তি উপলক্ষে বিশ্ব শান্তি কামনায় শ্রীচণ্ডী পাঠ পূজা হোম অনুষ্ঠিত হয়।

এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ইরমা ভক্তিমতী শ্রীমতি দীপা ঘোষ এবং প্রধান উদ্যোক্তা বাবু সোনা।

স্বদেশী ছবি
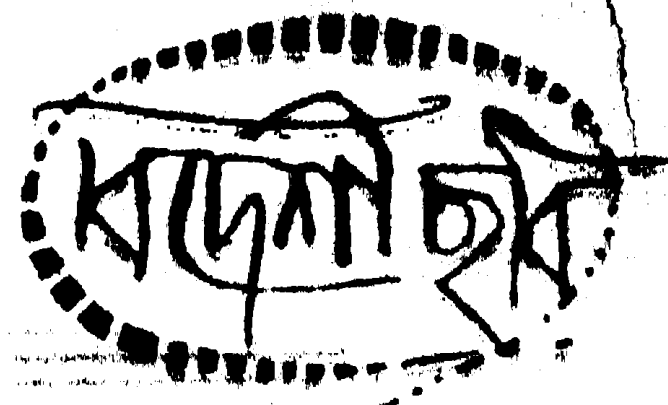
জার্মান ছবির খবর

বিখ্যাত জার্মান চিত্রপরিচালক আলেকজেন্ডার ক্লুজের সর্বশেষ ছবির আগের ছবির নাম গিলেজেন-হিতসারবেত এনার স্ক্যালাভিন। ফ্রাঙ্কফুর্টের পটভূমিতে তোলা হলেও তার গণ্ডী সীমাবদ্ধ ছিল কিছু উঁচুতলার জীবনযাপন ইত্যাদি এবং শহরের স্থানীয় উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে।

কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক ছবি (ঐ শহরের পটভূমিতেই তোলা) ব্যাপকতার দিক থেকে অনেক আকর্ষণীয়। এই ছবিতে যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তরকালের মোট ৩০ বছরের সময়সীমার মধ্যে ঐ শহরের যে পরিবর্তন ঘটেছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তার একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এতে তাই পুলিশ থেকে ঐ শহরের প্রেমিক প্রেমিকা কার্নিভ্যালের আনন্দ এবং উত্তেজনাপূর্ণ পটভূমি, গায়ক-গায়িকা ধর্মঘট মেকানিক্যাল শোভেল অপারেটার অর্থাৎ শ্রমিক শ্রমিকদের ওপর পীড়ন, ডেলিগেট প্রফেসার ও শিল্পপতিদের জীবনের নানা দিক এবং কর্মজীবন ইত্যাদি রয়েছে।

এ ছাড়াও জনজীবনের নানা দিক এ ছবিতে স্থান পেয়েছে। ভাল এবং মন্দ। যেমন এ ছবিতেই এমন একটি মেয়ের কথা আছে, যে পুরুষদের প্ররোচিত করে, মুগ্ধ করে বিছানা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং পরে তাদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ছে। অথচ ঐ মেয়েকেই পথে অন্য রূপে দেখা যায়।

পূর্ব জার্মানীর একটি মেয়ে গুপ্তচর সুস্থ জীবনের আশায় তার পেশা ছেড়ে ফ্রাঙ্কফুর্টে এলো। কিন্তু সেখানে সে তার নিজস্ব স্বত্তাটিকেই হারিয়ে বসল।

এমনি নানা চরিত্র ও মানসিকতা ভীড় করেছে এ ছবিতে যারা ফ্রাঙ্কফুর্টকে অবলম্বন করে বেঁচে আছে বা বেঁচে থাকতে চায়।

সর্বমোট ১০টি দিনের ফ্রাঙ্কফুর্টকে ধরে রাখা হয়েছে এই ছবিতে। ছবিটি ৯০

মিনটের। এই জলজীবনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে এই শহরের করুণ জীবনের দিক কাব্য-মণ্ডিত এবং পরিবেশ ও তথ্যাভিত্তিক শহরের অন্যদিকও ছবিতে স্থান পেয়েছে। তবে সবের পেছনেই একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ যেন সর্বদা কাজ করেছে।

একটা বিখ্যাত শহরকে কেন্দ্র করে এমন ছবি করা দূরদর্শিতা এবং দুঃসাহসের সন্দেহ নেই। যাতে খুঁটিনাটিভাবে ধরা পড়েছে একটা আন্তর্জাতিক শহরের বৈচিত্র্য তার জীবনধারণ, তার বিপরীত দিক সব জড়িয়ে যে নিজেই একটা স্বতন্ত্র সত্তার কাজ করেছে।

•

ইদানিং জার্মান সাহিত্য থেকে যৌনতা এবং হিংস্রতা (ভায়োলেন্স) যেন ক্রমশই বিদায় নিতে দেখা যাচ্ছে। একালের লেখকরা যেন সেই প্রবণতাকে কাটিয়ে ক্রমশ সুস্থ জীবনের বাস্তব জীবনের ওপর গল্প উপন্যাস লেখার দিকে ঝুঁকেছে।

এবং এর প্রতিচ্ছবি অনিবার্যভাবেই ছায়াছবির ওপরও পড়ছে। নারী, তার যৌনাচার নগ্নদেহ ইত্যাদি নিয়ে সাহিত্যের মত চলচ্চিত্রেও যে প্রচণ্ডতার ঢেউ এক সময় প্রবল হয়ে উঠেছিল হালে তা অনেকটা স্তিমিত। এবং পূর্বেকার ঐসব ছবি ও সাহিত্যসৃষ্টির বিরুদ্ধে রীতিমত জোরালো আন্দোলন ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে। জার্মান যেন আবার তার পুরনো ফর্মে অর্থাৎ গম্ভীরতার দিকে ফিরে যাচ্ছে।

এতে একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে, সাধারণ মানুষ বেশীদিন উত্তেজনা বা উৎক্ষিপ্ততার বশবর্তী হয়ে থাকে না।

এ ব্যাপারে সরকারও পেছিয়ে নেই। তাঁরাও এখন শক্ত হাতে এ সবের মোকাবিলা করছেন এবং এ ব্যাপারে সরেজমিন তদন্ত এবং সংশোধনের জন্য তাঁরা একটা উপদেষ্টা মণ্ডলী দ্বারা সমালোচনা বোর্ডও তৈরী করেছেন।

সিটিজেন কেন

পুরনো ছবি যে এখনও আমাদের কাছে ভালো লাগে সম্প্রতি তার প্রমাণ পেলাম ইউ এস আই এস অডিটোরিয়ামে অরসন ওয়েলসের 'সিটিজেন কেন' ছবিটি দেখে।

উইলিয়ম কেনের নাটকীয় এবং ঘাত-প্রতিঘাতে সমৃদ্ধ এই জীবনভিত্তিক ছবি দেখতে বসে কোথা দিয়ে যে প্রায় দুটো ঘণ্টা কেটে যায় তা টেরই পাওয়া যায় না।

ছবির কাহিনী ফ্ল্যাশব্যাকে বলা হয়েছে।

অরসন ওয়েলসের অসাধারণ অভিনয় এ ছবির প্রধান সম্পদ। এখানে ওয়েলস এবং 'কেন'কে কোন সময়েই পৃথক করে চিন্তা করা সম্ভব হয়নি।

এ ছবির প্রযোজক এবং পরিচালকও স্বয়ং অরসন ওয়েলস।

পাঃ রঃ চ

জলসা

সি এল টির স্মরণীয় পুতুলনাচ : সি এল টির পুতুল নাচ চিরকালই জনপ্রিয়। আর এ জনপ্রিয়তার ব্যাপ্তি আজ ভারত-ব্যাপী। সম্প্রতি রৌরকেল্লায় উৎকল মেসি নারী কোম্পানীর এবং হায়দরাবাদে জহর বাসভবনের আমন্ত্রণে এঁরা পরিবেশন করেছিলেন 'আলাদিন' পুতুলনাটক। এই দুটি জায়গায় এবং তমলুকেও এঁরা সকল শ্রেণীর শ্রোতার উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন পেয়েছেন। তমলুকেও এঁদের পুতুলনাটক উচ্চ প্রশংসিত হয়।

সি এল টির উদ্যোগেই ভারতে সর্ব-প্রথম পুতুলনাচের আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা হয় গত ষাটের দশকে। সেই থেকে এ নিয়ে তাঁরা অবিরাম পরীক্ষানিরীক্ষায় রত থেকে ভারতের এই প্রাচীন শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে ইয়ুথ প্যাপেট থিয়েটারের উদ্যোগও উল্লেখযোগ্য। এঁদের নূতন প্রযোজনা 'মুগলী'—প্রস্তুতির পথে। এ বছরই মঞ্চস্থ হবে সি এল টির রজত-জয়ন্তী উৎসবে।

মূর্ত অতীত :

গত সপ্তাহে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে অরোবাহারের একটি অনুষ্ঠানে বহুদিন বাদে শোনা গেলো কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বীণ। রাগ দরবারী কানাড়া ও পাহাড়ী ঝিঁঝিট ধ্রুপদী ঐতিহ্য-মণ্ডিত এই যন্ত্রটি প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে। দক্ষিণ ভারতের শিল্পীরা এবং দিল্লীতেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পী এই যন্ত্র বাজিয়ে থাকেন। তাও বেশীর ভাগ বিচিত্র বীণ। পশ্চিম বাংলায় এ যন্ত্র শোনাই যায় না।

সেদিন কুমার সাহেবের বীণে এক হারিয়ে যাওয়া যুগের সাধনা ও বেদনা যেন মুহূর্তের জন্য মূর্ত হয়ে উঠেছিলো। মনে পড়ছিলো জাঁকজমক ভরা রাজদরবার শিল্পীদের শিল্পকৃতিতে মুগ্ধ হয়ে রাজারা যখন সিংহাসন থেকে নেমে এসে নিজের গলার মুক্তামালা গুণীর গলায় পরিয়ে দিলেন।

বিরাট যন্ত্রহাতে বাদনরত বীরেন্দ্র-কিশোরকে যেন স্বপ্নজগতের বাসিন্দা বলে মনে হচ্ছিলো। আর আন্দোলিত গান্ধার রেখাব ধৈবতের অনুরণন যেন রূঢ় কঠোর জগতের অন্তরালের কোনো জগতের রুদ্ধ-বেদনার স্পন্দন। মনে হোলো যতদিন কুমার সাহেবদের মত গুণী মানুষ আছেন মরে মরেও বেঁচে থাকবে রবাব বীণ, সুরবাহার? তারপর? এসব মর্যাদাগম্ভীর যন্ত্রের ভাষা কি স্তব্ধ হয়ে যাবে? এখনকার তরুণ শিল্পীগোষ্ঠি কেন এঁদের কাছে শিক্ষা নিচ্ছেন না? সেতার সরোদ আজ এত জনপ্রিয় অথচ তাদের আদি উৎস অবহেলিত।

আসর সুরু হয় বীরেন্দ্রকিশোরের শিষ্য জগন্নাথ মুখার্জির কণ্ঠসংগীত দিয়ে। ইমন রাগের খেয়াল ও ভক্তিমূলক গান দিয়ে ইনি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

সংগীত শিল্পীর জন্মোৎসব : রাগ-সংগীতে তরুণ শিল্পীদের মধ্যে সুভাষ চাকলাদার একটি বিশিষ্ট নাম। সংগীত সাধনার সঙ্গে সঙ্গে ইনি সংগীত শিক্ষকতার দায়িত্বও যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে আসছেন। উত্তর শহরতলীর রাগচক্র সংগীতায়ন তাঁরই প্রতিষ্ঠান। এই রাগচক্র সংগীত সম্মেলনের প্রাক রজত জয়ন্তী বৎসরের পটভূমিকায় গত সপ্তাহে বেলঘরিয়ার শান্তিভিলায় শ্রীচাকলাদারের জন্মোৎসব পালন করেন তাঁরই শিষ্য-শিষ্যারা।

আলোচনাসভায় শিল্পীর সংগীত-জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করেন সংগীতবিদ ডাঃ বিমল রায় সংগীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল সংগীতজ্ঞ অরুণ ভট্টাচার্য অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, শিল্পী ও সংগীতের পৃষ্ঠ-পোষক কালিদাস সান্যাল। শিল্পীকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন ডাঃ রমা চৌধুরী স্বামী প্রজ্ঞানন্দ বীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী এবং গুণীমহলের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কিশোর শিল্পী স্বর্ণেন্দু চট্টো-পাধ্যায়ের খেয়াল দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু হয়। ইনি রাগচক্রের ছাত্র। ইমন রাগের খেয়ালে এবং ঠুংরীতে শিক্ষা ও রেওয়াজের স্বাক্ষর ছিলো।।

বিমল মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত সেতারে শোনা গেলো বেহাগ ও ধুন। দুটিতেই তাঁর মননশীলতা সু-অনুভূত। কণ্ঠ-সংগীতের অনুষ্ঠানে ভি জি যোগের বেহালাসংগতে যোগ যোগকোষ ও দেশরাগ গেয়ে শোনা রবি কিচলু ও বিজয় কিচলু। এ অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। কালি-দাস সান্যাল গীত দরবারী কানাড়ায় শিল্পীর অনাড়ম্বর এবং বাহুল্যবর্জিত গায়কীর মধ্যে অনেক ঘরানার চকিত আভাস বেশ কয়েকটি সরস মুহূর্তের সৃষ্টি করেছিলো। ঠুংরীটিও বেশ মেজাজী। সেতারে জনাব আখতার আলি খাঁর ভৈরবী সারা-রাতের অনুষ্ঠানকে মধুর পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে দিয়েছে। সকল অনুষ্ঠানে তবলা ও সারেংগীতে সুযোগ্য সহায়তা করেন ওস্তাদ শওকৎ আলি খান, চণ্ডীদাস সরকার এবং কানাই মিশ্র।

চিত্রাঙ্গদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১৪ বর্ষ

অমৃত

৪৬ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 28th March, 1975 শুক্রবার ১৪ই চৈত্র, ১৩৮১

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয়

সর্বোদয় ও জয়প্রকাশ

বিহার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সর্বসেবা সংঘে যে ভাঙন দেখা দিয়েছে তা অপ্রত্যাশিত নয়। সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ এবং তাঁর অনুগামী কর্মীরা সর্বসেবা সংঘ থেকে পদত্যাগ করে এই আন্দোলন চালাবার স্বপক্ষেই মত দিয়েছেন। সংঘের কার্য নির্বাহক কমিটিতে জয়প্রকাশপন্থীরাই ছিলেন মেজরিটি, ২৪ জনের মধ্যে ২০ জন। ইচ্ছা করলে তাঁরা পদত্যাগ না করে সংখ্যালঘুদেরই পদত্যাগ ঘটাতে পারতেন। কিন্তু তা না করে বিহার আন্দোলনের পক্ষপাতীরা সর্বসেবা সংঘকে বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করলেন এবং নিজেদের বিচার অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতাও অর্জন করলেন। পদত্যাগকারীরা সংঘের সদস্য হিসেবে আপাতত থাকছেন। কিন্তু কার্যত সর্বসেবা সংঘে এবং সর্বোদয় আন্দোলনে একটা মতভেদ ঘটে গেল যা ভবিষ্যতে উভয় পক্ষের সমবিচার ছাড়া জোড়া লাগানো সহজ কাজ হবে না। বিহারে প্রথম যখন সরকার-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় এবং জয়প্রকাশ তাঁর নেতৃত্ব দেন তখনই বিনোবাজীর সঙ্গে তাঁর মতভেদ দেখা দিয়েছিল। স্থির হয় যে, সর্বোদয়ের নাম না নিয়ে কর্মীরা ব্যক্তিগতভাবে জনগণের স্বার্থরক্ষার এই আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু বিহার আন্দোলন এখন নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে এবং জয়প্রকাশজী নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। সর্বোদয় কর্মীরা এই নির্বাচনের প্রশ্নেই দ্বিধা-বিভক্ত। সর্বোদয় কর্মীরা নির্বাচনী রাজনীতিতে যেতে পারেন না, এই হল বিনোবাজীর মত। সর্বোদয়ের কাজ হল সামগ্রিক উন্নতি এবং তার জন্য স্থিতাবস্থার অবসান ঘটানো। বিনোবাজী মনে করেন বিহার আন্দোলনের লক্ষ্য হল খারাপ সরকারের পরিবর্তে ভাল সরকার গঠন। কিন্তু সর্বোদয়ীরা মনে করেন এই কাঠামোর মধ্যে কতটুকু ভাল সরকার গঠন সম্ভব?

সর্বোদয় সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বা রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। তারা সর্বসম্মতি বা কনসেনশাসে বিশ্বাসী। সর্বসেবা সংঘে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না। সকলে ঐকমত্য হলেই তার সিদ্ধান্ত পাকা, নইলে নয়। তাই যত ভাল সরকারই হোক তারা তো সংখ্যাগরিষ্ঠের মত নিয়ে চলবে, সর্বসম্মতিতে নয়। তা সত্ত্বেও বিহার আন্দোলনে বিনোবাজী সর্বোদয় কর্মীদের সর্বসেবা সংঘ থেকে ছুটি নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে যোগ দেবার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লি অভিযানের পর এবং জনসংঘ সম্মেলনে জয়প্রকাশজীর ভাষণ দেবার পর সর্বোদয় কর্মীদের মনে প্রশ্ন দেখা দেয় এই আন্দোলন বাস্তবিকই দলহীন গণতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছুবে কিনা। জয়প্রকাশজী মনে করেন তা সম্ভব। সর্বোদয় আন্দোলন যে উদ্দেশ্যে শুরু করা হয়েছে তার সঙ্গে ভোটাভুটির রাজনীতির যোগ নেই। অথচ জয়প্রকাশজীর আন্দোলন সেদিকেই যাচ্ছে। তিনি যদি মনে করেন দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের অবসান ঘটানো বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন সর্বোদয়ীর কর্তব্য তাহলে সে-মত প্রকাশের অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ যেভাবে দেশের প্রশাসনের বিচার করেন বা [illegible] পাল্টাবার কথা ভাবেন, সর্বোদয়ীরা কি সেভাবে ভাবেন? দলহীন গণতন্ত্র [illegible] লক্ষ্য তাঁরা নিশ্চয়ই বিভিন্ন বিরোধী দলের সাহায্য নিয়ে আন্দোলনে নামতে দ্বিধা করবেন। কারণ, রাজনৈতিক দলগুলোর মত ও পথের পার্থক্য আছে। তারা [illegible]সাকে সাময়িক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করলেও তাকে আদর্শ হিসাবে স্বীকার করে কিনা এ সম্পর্কেও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

জয়প্রকাশজী আশা করেন যে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও নেতৃত্বের ফলে এই আন্দোলনকে সংযত রেখে সঠিক পথে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। কিন্তু সর্বোদয়ের আদর্শ সত্যি সত্যিই রক্ষা করা যাবে কিনা তা বাস্তবিকই সন্দেহের বিষয়। রাজনৈতিক প্রশ্ন আলোচনায় সর্বসেবা সংঘে যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে তা থেকেই অনুমান করা যায় রাজনীতির পথ কত জটিল ও দুর্গম। ভোটাভুটির রাজনীতি সে-কারণেই সর্বোদয়ীরা বর্জন করতে চেয়েছিলেন। জয়প্রকাশজীর মুশকিল এই যে, তিনি অতীতে পার্টি-রাজনীতি করেছেন। সুতরাং শাসক পার্টির কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি আবার সেই রাজনীতিরই আকর্ষণে আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। অথচ হৃদয়বান ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে তিনি সর্বোদয়ের প্রতি আনুগত্যও বিসর্জন দিতে পারেন না। তাই তিনি সাধারণ লোকসেবক হিসেবে তাদের সঙ্গে থাকেন এবং অন্যদিকে বৃহত্তর জন-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। লক্ষ্য করার, তিনি সত্য, অহিংসা ও আত্মসংযমের সর্বোদয়ী নীতিকে এই আন্দোলনে কিভাবে তিনি কাজে লাগান। অথবা আবার সুযোগসন্ধানী রাজনীতিকরা জয়প্রকাশকে সামনে রেখে নির্বাচনে তাঁদের সুবিধা কিভাবে আদায় করে নেন।

পারগমন

লীলা মজুমদার

দুস্তর পথ পেরিয়ে ছেঁড়া ময়লা চোঙা-পেন্টেলুন পরা সাতজন যখন বন্ধ ফটকের সামনে গিয়ে পৌঁছল ততক্ষণে ওদের জ্বালা-যন্ত্রণাগুলো নিজেদের অজান্তেই সব মিলিয়ে গেছে। চারদিকে চেয়ে দেখে ওদের চক্ষুস্থির। যেদিকে তাকায় নীল নীল ধোঁয়া ধোঁয়া; মুখে-চোখে শীতল বাতাস লাগছে; তাতে কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ আর সামনে বিশাল বন্ধ ফটক।

ফটকটা সোনালী রঙের। ফেলা তাতে আঙুল ঘষে বলল, 'আলমানি রঙের বদলে পেতলের রং দিয়েছে, যাতে সহজে মরচে না ধরে।' ফেলা একবার একটানা তিন মাস বিল্ডিং কোম্পানীতে কাজ করেছিল, তাই ওর কথা বাকিরা সবাই মেনে নিল। ফেলু বলল, এর চাইতে কত বড় বড় ফটকে আলমানি রং দিয়েছি। তখন আমাদের বাড়িতে রোজ দু বেলা রান্না হত।' তাই শুনে সবাই হি-হি করে হাসতে লাগল, ফেলার যত লম্বা-চওড়া কথা। দু বেলা কারো বাড়িতে রান্না হয় নাকি, নাকি কেউ দু-বেলা রান্না খাবার খায়! এক সেই ভোটাভুটির সময়। কি ভালো সময়ই না গিছল তখন, মাইরি! দুই বিরোধী পক্ষের তয়ে কি খাটনিই না খেটেছিল সবাই, আর সে কি খাওয়া! একদিন পোনা মাছ পর্যন্ত— থাক না সেসব কথা, এখন ভাবলে শুধু মন কেমন করে। শেষ পর্যন্ত অত ঢাকঢোল পিটিয়ে, অত ঠ্যাঙা-ঠেঙি, গায়েব-গুমের পরে, কোন পক্ষ যে জিতেছিল, সেটা ওরা আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারে নি। আগেও যেমন চারদিকে শুধু নেই-নেই ছিল, এখনো তাই। তবু একসঙ্গে দুই বিরোধী দলের হয়ে সমানে খেটেছিল ওরা।

দরজাটা হঠাৎ খুলে যাওয়াতে এইখানে ওদের চিন্তায় ছেদ পড়ল। খোলে নি ঠিক, একটা পাল্লা একটুখানি ফাঁক করে রবীন্দ্রনাথ মুখ বের করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাও তোমরা?' অবিশ্যি সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ নয়, যদিও ছবিতে যেমন দেখা ঠিক তেমনি সাদা লম্বা চুল, ফরসা রং, উঁচু নাক আর তেমনি জাব্বা জোব্বা গায়ে। তবে হাতে একটা মস্ত চাবি আর গলা বেজায় বসে যাওয়া মতো, ভোটাভুটির সময় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওদের গলা যেমন হয়েছিল। তাছাড়া

রবীন্দ্রনাথ নাকি স্বর্গে গেছেন, অন্ততঃ তাই শুনেছিল ওরা; চিনত না তো তাঁকে, কাজেই সঠিক জানবে কোত্থেকে। চেতলার মন্টুদা অবিশ্যি সেটা বিশ্বাস করে না; বলে, মরেই যদি যাবেন তো অপ্রকাশিত রচনা-গুলো লিখছেটা কে? আর স্বর্গ? ছো। ছো! চাঁদে গেল মানুষরা, স্বর্গ-টর্গ তো কোথাও দেখল না। এক যদি—। এই মনে করে বুড়ো লোকটির দিকে ওরা চোখ ফেরাল।

সন্দেহের সঙ্গে ফটকের দিকে আবার তাকাতেই জোব্বা পরা লোকটি নরম গলায় পিলুকে বললেন, 'তোমার নাম কি?' মনে হল ঐ একটু বিশ্রাম পেয়ে কিঞ্চিৎ খুশিই হয়েছেন, লোকটাকে খুব ক্লান্ত মনে হল। স্রেফ কিছু না করে করে পিলুরাও যেমন বেজায় ক্লান্ত। পিলু নাম বলল, 'পিলেশ্বর'। শুনে লোকটি অবাক! 'পিলেশ্বর আবার একটা নাম হল নাকি? ঠাকুরের নাম কি?'

পিলু বলল, 'আমরা ঠাকুর-টাকুরে বিশ্বাস করি না।' 'আহা পিতার নাম কি?' 'আমার পিতা টিতা নেই—তাছাড়া সব ঠাকুরকে কি আর অবিশ্বাস করি। মা কালীকে তো আর অবিশ্বাস করি না। লোকটির বোধহয় কৌতূহল হল, বললেন, 'ওনাকেই বা বাদ কেন?' 'কি জানি, চেপে ধরেন যদি। আবার কেন? দেন না তো কিছু কোনো দিন।' 'পিতার নাম বললে না? বললাম তো নেই। কি মুস্কিল, ছিল তো একদিন। 'না মশাই, ছিলও না কোনো দিনও, এক যদি আমি জম্মাবার অনেক আগে মরে গিয়ে থাকে। ছিল বলে কখনো শুনিও নি।' 'মা আছে তো?' 'মা? কি যে বলেন! এরপর বলবেন ঘরবাড়িও ছিল। না মশাই, কিছুই ছিল না, ফুটপাতে মানুষ।' কি যেন একটু ভাবল পিলু। তবে একটা ছোট ভাই ছিল। তার নাম ছিল নালু, সারা-ক্ষণ খালি খাই-খাই করত। রোগা টিং-টিঙে কুচকুচে কালো, কি বিশ্রী দেখতে কি বলব। সারাক্ষণ আমার গলা জড়িয়ে ঝুলে থাকত। ভারি জ্বালাত। পেট আর ভরত না। সেবার ক্যান্টিনে খিচুড়ি খেতে নিয়ে গেলাম। পাশেই বসালাম। ও মা! আমাকে পর্যন্ত খিচুড়ি দিয়ে বলে কিনা আর নেই! বাকিদের ঠেলে-ঠুলে উঠিয়ে দিল। তা নালু কিছুতেই যাবে না। ওদের আঁচড়াতে কামড়াতে লেগে গেল। শেষটা কলাপাতা শুদ্ধ খিচুড়ি পকেটে ভরে আমি উঠে পড়ে আর নালুকে খুঁজে পাইনে। বিকেলে হাসপাতালে গিয়ে দেখি মরে রয়েছে।' একবার নাক টেনে পিলু বলল 'আর কেউ কোনো দিনও ছিল না আমার। পোড়াই নি ওকে, অমনি ফেলে রেখে চলে এসেছিলাম, কে পোড়াল তাও জানি না। নাকি সবাইকে একসঙ্গে মাটিই দিল। রাতে আমরা দলেবলে গিয়ে সরকারি আপিসের সব জানলার কাচ ভেঙে দিয়েছিলাম।'

জোব্বা-পরা লোকটির মুখটা কেমন গম্ভীর মনে হচ্ছিল। জোব্বার ভিতর থেকে একটা লম্বা তালিকা বের করে বললেন, 'ঠিক আছে, আর বলতে হবে না। তোমাদের সকলের নাম আছে এই ফর্দে। সবাই ভিতরে আসতে পার।' পিলেশ্বর, জটেশ্বর, ফেলারাম, পটো জঞ্জাল, আলি আর স্টিফেন।

বাকিদের যা বুদ্ধি, অমনি পিলপিল করে সব ঢুকতে যাচ্ছিল হয়তো ভেবেছিল ভেতরে গেলেই শালপাতা পেতে দেবে। ভাগ্যিস ফেলা ওদের আটকাল। অমনি গেলেই হল আর কি! কে কবে কোন ভালো জায়গায় তোদের গায়ে পড়ে ডেকে নিয়ে গেছে তাই বল? এই যে স্টিফেন, বলে তুই নাকি মিশন স্কুলে তিন বছর পড়েছিলি, তুই পর্যন্ত যদি লোকের কথা বিশ্বাস করবি তো আর কি [illegible]া! দেখুন, বুড়ো-মানুষ, আপনার [illegible]জের নামটা তো কই বললেন না?'

'আমার নাম পিতর, আমি স্বর্গের দরজা পাহারা দিই। সকলের নাম মিলিয়ে নিয়ে, তবে ঢুকতে দিই।' স্টিফেন অবাক হয়ে বলল, এরা কেউ কিশ্চান নয়, এদের কেন ঢুকতে দেওয়া হবে? আমি মাথায় জল ঢেলে কিশ্চান হয়েছি, অবিশ্যি ফাদাররা পরে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তবু আমার কথা আলাদা।

কাষ্ঠ হেসে পিতর বললেন, ঐ হল, তুমিও যা ওরাও তাই, এখানে সবাই এক। দাঁড়াও একটু পরখ করে নিই; তোমরাই না দেওয়ালীর রাতে কুড়িজন লোককে জ্বলন্ত প্যান্ডেলের তলা থেকে টেনে বের করতে গিয়ে নিজেরা পুড়ে-ঝুড়ে একাকার হয়েছিলে? তাহলেই হল সবাই ঢুকে পড়। এখানে হিন্দু খৃশ্চান মুসলমান ইত্যাদি সাতশো নামে কোন তফাৎ নেই। এসো।'

ওরা তবু বাইরে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়তে লাগল। স্বর্গ বললেই স্বর্গ হল? স্বর্গে আছেটা কি? দুবেলা হাঁড়ি চড়ে? সবাই চাকরি পায়? ভোটাভুটি হয়?'

পিতর হাসলেন, 'না, বাছারা এখানে ওসব পার্থিব জ্বালা-যন্ত্রণার বালাই নেই। সবাই দুধ আর মধু খায়; কাউকে খাটতে হয় না, অনন্তকাল আরামে বসে থাকে, কোনো দলাদলি নেই, সকলে একজনের সেবা করে চিরদিন সুখে থাকে। এসো তোমরা, তোমাদের অভ্যর্থনার জন্য বাজনা বাজছে শুনতে পাচ্ছ না?'

বাজনার দু-একটা কলি কানে যেতেই ওরা কানে হাত দিয়ে সাত হাত পেছিয়ে গেল। ওসবে আমরা ভুলছি না, বাবাঠাকুর। যেখান থেকে এসেছি, সেখানে দেখে এসেছি, হাঁড়ি না চড়ার কত সুখ। অত দুধ আর মধু দেখাবেন না বলছি। এক সায়েব আমা-দির কালো কালো চকোলেট দিয়েছিল না! খালিপেটে খেয়ে বমি করে মরি। আর বলে কিনা চিরকাল বসে কাটাতে হবে। কেন, আমরা আঠারো কুড়ি বছর ধরে বসে আছি না, তার কি জ্বালা জানি না আমরা? দুর, দুর, স্বর্গ না ছাই!'

পিতর তালিকা গুটিয়ে অমায়িকভাবে বললেন 'এখানে কোনোক্রমে সেঁদোবার জন্য পৃথিবীর লোক কি না করে! আর তোমাদের কিনা পছন্দ হল না। জান, এখানকার পথ-ঘাট সোনা দিয়ে বাঁধানো?'

শুনে ওরা শিউরে উঠে বলল, অত সোনা রাখা বেআইনী তাও জানেন না? আমাদের পুলিশে খবর পেলে ধরে নেবে। খেতে দেবে না, চাকরি দেবে না, আবার বলে কিনা পথঘাট সোনা দিয়ে বাঁধানো?'

পিতর বললেন, তাহলে অন্য ফটকে গিয়ে দেখতে পার কোনো সুবিধা হয় কি না। সেখানে সব উল্টো রকম শুনে ওরা হাতে চাঁদ পেল।

তা এতক্ষণ বলতে হয়। চল, চল, অন্য ফটকে চল!

পিতর নিশ্চিন্তভাবে দোর বন্ধ করে দিলেন। জঞ্জাল একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, অত ভালো কাপড়-চোপড় পরে যারা, তারা কখনো আমাদের মতো লোকদের চাকরি দেয়? অন্য ফটকটা কদ্দুর কে জানে। মাইরি ভাই, পোড়ার জ্বলুনিগুলো আর কিন্তু টের পাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত সেরেই গেল বোধ হয়।"

আলি বলল, লোকগুলো বেঁচে গিছল তা হলে! একটা ছোট মেয়েকে তুলে এনেছিলাম। মা-টা বোধ হয় পুড়েই গেল না কি—মেয়েটার জন্য দুঃখ হয়।"

স্টিফেন বলল, 'যা যা বড়লোকদের জন্য অত দুঃখু কিসের র‍্যা? ওর বড়লোক মাসিপিসি ওকে পালবে। দুবেলা পেট ভরে খেয়ে সুখে থাকবে। সুখী হবার জন্য ওর স্বর্গে যাবার দরকার করবে না।"

জঞ্জাল বলল, যা বলেছিস! দুবেলা খাব, এই ছেঁড়া পেন্টেলুনটা বদলাব, বিষ্টি হলে একটা ছাদের তলায় মাথা গুঁজব। ব্যস! আবার কি চাই! আমি বলি কি দলবল ডেকে ঘেরাও করে স্বর্গটাকে তুলে নেওয়া যাক। —ই কি! এই নাকি উল্টো ফটক?"

উল্টো ফটক হাঁ করে খোলা, তাতে কবাট নেই। দরজায় কোনো পাহারাও নেই। মনে হল যার ইচ্ছে ঢুকে পড়লেই হল। মন্দ নয় জায়গাটা, গাছপালাগুলো যেমন খুসি বেড়েছে। এক জায়গায় কয়েকটা লোক বসে তাস পিটছে। জটার বড় সন্দেহ বাতিক—ওদের মধ্যে কার-ই বা নয়?—লোককে বিশ্বাস করলে সব ছাল ছাড়িয়ে নেবে না? ঐ তো সেবার চাকরি [illegible]বে বলে অমন ভালো কাপড় চোপড় পরা কালো সায়েবটা ওদের দিয়ে ভেড়ির বাঁধ কাটাল, মাছ সব আঘাটায় উঠল। তারপর চাকরি তো দূরের কথা, একটা পয়সা দিল না। নাকি সবাই বে-আইনী কাজ করেছে, পুলিশকে যে সায়েব বলে দিচ্ছে না সেটা ওরা নিতান্ত দয়ালু বলে। দুত্তোর! দয়ার নিকুচি করেছে। মনে আছে মায়ের সঙ্গে যখন থাকত, তখন মা কেবলি বলত নাকি মুনিববাড়ির লোকরা ভারি দয়ালু, হেনা দেয় তেনা দেয়। তারপর পুজোর সময় মুনিবদের দেওয়া লাল জামা গায়ে দিয়ে ফেলনা আর জঞ্জাল তাদের বাড়ি উদয় হতেই সে কি হাসাহাসি টিটকিরি। 'হ্যাঁরে, তোদের বাবার নাম কি আমড়া-কুড়?' ইত্যাদি। দয়া-টয়াতে ওর দরকার নেই। মা মেরে চলে এসেছিল দুজনে। তবে ঠিক মা মেরেও নয়। আসবার সময় [illegible] ঝ্যাজানো ছিল, পুরুত

আসার অপেক্ষায়, সেখান থেকে গোছা-গোছা লুচি সন্দেশ তুলে নিয়ে পালিয়ে গেছল। এখনো ভাবলে হাসি পায়। মা ফিরে এসে ঠ্যাঙগার বাড়ি মেরেছিল।" ঠাকুরকে. তোদের নোংরা ছোঁয়া খাওয়াবি, এতবড় আস্পর্দা তোদের!"

জঞ্জাল তেড়িয়া হয়ে উঠেছিল, বেশ করব, এ'টো খাওয়াব! থুতু দিইনি সেই ঢের!" তবে এটা সত্যি যে যদি মা-কালী হত, তবে অত তেজ দেখাবার সাহস হত না। কি হিংস্র দেখতে রে বাবা! গলায় কাদের মুণ্ডু ঝুলিয়েছে কে জানে। কির-পাণটা থেকে দরদর করে রক্ত ঝরে! একবার যদি ধরে তো আর ছাড়াছাড়ি নয়! পালিয়ে বাঁচা ছাড়া উপায় নেই। সেই ইস্তক পালিয়েই বেড়াচ্ছে জঞ্জাল! খেতে পরতে পায় না, অথচ বাঁচবার কি ইচ্ছা! তাই দেখে নিজেই অবাক হয়।

গজু মিয়ার দলে ঢুকেছিল। গজুর চর বলেছিল : কিছু না, জঞ্জাল কুড়িয়ে আনবি, বুঝলি জঞ্জাল তার বদলে দুবেলা খেতে পাবি, একটা গাড়ি-বারান্দার নিচে শুয়ে থাকবি, রোজ নগদ পাঁচশটা পয়সা পাবি—মন্দ কি, কি বলিস রে রাবিশ?" লেখাপড়া জানত না জঞ্জাল, কিন্তু রাবিশ কথাটার মানে বুঝতে পেরেছিল। তবু বলেছিল, 'যদি ফেলনাকেও দুবেলা খেতে দাও তো খাটতে রাজি আছি।" লোকটার কি হাসি! না হে, রাবিশ, ড্রেণ-নর্দমা সব পুষতে গেলে আমাদের চলবে কি করে?"

জঞ্জাল তাকে এমনি পিটেছিল যে পুলিশের ভয়ে এক মাস গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে-ছিল। এক বেলাও কেউ পেট ভরে খেতে দেয়নি। নিজেরাই খেতে পায় না তো দেবে কোত্থেকে।

তাস খেলোয়াড়দের জঞ্জাল জিজ্ঞাসা করল, এখানে কি মা-কালী থাকেন?" লোকগুলো তো অবাক! ওদের দিকে তাকিয়ে যে-যার নিজের পয়সাকড়ি সরিয়ে বলল, মা-কালী, বাবা-শিব কারো সাধ্য আছে এ-ফটকের কাছে মুখ দেখায়? এ-সব হল গিয়ে মন্দ জায়গা। কি চাও তোমরা? ঘুরে দেখ না, এখানে যে যা খুসি তাই করে। আমাদের খেলা মাটি কর না। আজ পর্যন্ত কোনো ঠাকুর-দেবতর মুখ দেখিনি, ব্যস! যাও।"

ততক্ষণে চারপাশে এক দল লোক জড়ো হয়ে গেছিল। তাদের দিকে ফিরতেই তারা বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ এ জায়গা ভালো নয় আমরা সবাই মন্দ লোক, জুয়াড়ে, নেশাখোর ধাপ্পাবাজ, যার যা খুসি করি। তবে তাতে কারো ক্ষতি হয় না, আমাদেরো কোনো লাভ হয় না।' লাভ হয় না শুনে ওরা বড় মুষড়ে পড়ল। পেট ভরে খেতে দেয় তো?" তাতে হা-হা হো-হো হাসি। খাওয়া? কোনো ভয় নেই, এখানে খিদেই পায় না তো খাবারে কি দরকার!" ওরা দু-পা পেছিয়ে [illegible] তবে কি খিদে মেটাবার সুখটুকুও পাবে না?

পটোর খুব বুদ্ধি। দেয়ালে লেখা [illegible] দেখে দেখে লিখতে পড়তে শিখে গেছিল। শেষটা কত স্লোগান ও নিজেও বানিয়ে লিখেছে, কিছু পয়সাও পেয়েছে। সে বলে বসল, শিব কালী নেই তো যে আছে তার সঙ্গেই দেখা করব। আমাদের চাকরির দরকার। আর হন্যে হয়ে ঘুরতে ভালো লাগে না।"

একটা লোক বলল, দেখা করব, আবার কি! তাকে দেখাই যায় না।' এ্যাঁ, বলে কি লোকটা কি গরম, না গায়েব! নাকি ও-সব কিছুই না, তবে কেউ তাকে দেখেনি কোনো দিন।

তবে কি অ-দর্শন হয়ে এই সব চালাচ্ছে? আশ্চর্য কথা। একজন বলল,

পরের সংখ্যায় গল্প লিখবেন
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

'আশ্চর্য কিছুই না; চালাবার আবার আছেটা কি! যে যেমন ইচ্ছা করছে আর তার যা ফল তাই পাচ্ছে। তবে থাকাটাও কিছু আশ্চর্য নয়, নইলে নিয়মগুলো বানাল কে? তবে কিন্তু দেখিনি কেউ। বললাম না আমরা খারাপ লোক।' পটো বলল, 'বরং ও ফটকটাই ছিল ভালো; পরিষ্কার ছিম-ছাম, ফুলের গন্ধ, বাজনাবাদ্য দূরে সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি!"

ওরা বলল, চেয়ে দেখ, চাঁদ, ভালো করে চেয়ে দেখ তারপর বাজে কথা বল।"

ওরা চেয়ে দেখে বাস্তবিকই এ-ও যে সেই একই জায়গা। ওটা ছিল সামনের দিক; এটা হল গিয়ে পিছনের দিক। ওদিক দিয়ে দেখেছিল সদর আর এটা হয়তো অন্দরে যাবার পথ। তা হলে সেই অদর্শন লোকটা গেল কোথায় যে বলে কয়ে একটা সুরাহা করে নেবে?

বাচ্চু হেসে পিলে বলল চিরকাল জানি আমাদের তরানো ঠাকুর-দেবতার কম্ম নয়। এখন তাঁরা নিজেরাই আছেন কি না, তার জন্য বসে না থেকে, চল আরেকবার সেই পুরনো জায়গাতেই চেষ্টা দেওয়া যাক! লোকরা বোধহয় নিজেরাই যে যার ঠাকুর গড়ে। চল্ তো দেখাই যাক, কি করা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা ফিরে চলল। সাতটা কিম্ভূত কিমাকার মূর্তি। ছেঁড়াখোঁড়া জামা পেন্টেলুন পরণে—কেই বা ধুতি পরে আজকাল, আর পরলেও ওদের দিচ্ছেই বা কে? —পায়ে সাত তালি দেওয়া চপ্পল, রুক্ষ আ-ছাঁটা চুল দাড়ি, গায়ে ঘামের গন্ধ—আঃ ঘামের গন্ধটা কিন্তু বেড়ে ভাই, তা তোরা যাই বলিস'—আড় চোখে দূরে দেখবার চেষ্টা। সেই সমুদ্রটা যেখানে নীল দিগন্তের সঙ্গে নীল আকাশের তফাৎ নেই, সেটা আবার কেমন সরে সরে কেবলি এগিয়ে যাচ্ছে!

হাসপাতালের যে ওয়ার্ডে কালী-পুজো প্যান্ডেল দুর্ঘটনার সাত দুঃসাহসিক বাহাদুর নোংরা জামা গায়ে দশদিন অসাড় হয়ে পড়েছিল, সেখানকার ডাক্তার নার্সরা হঠাৎ চমকে দেখেন তারা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠছে!

এই বাংলার খবর

খুন, অবরোধ

শিবরাত্রিতে কলকাতার অদূরে নিমতায় দুই যুবকের খুন হওয়ার খবরে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দেয়। ঐ দুই যুবক খুন হন সমাজবিরোধীদের গুলিতে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, শিবরাত্রির উৎসবের সময় এক যুবকের মাতলামিকে কেন্দ্র করে গোলযোগ শুরু হয়। তার মাতলামির ফলে মহিলারা বিরক্তি প্রকাশ করলে রবি ঘোষ নামে একজন যুবক তাকে বাধা দেয়। মাতাল ছেলেটি পাইপ গান বার করলে রবি সেটি কেড়ে নেয়। পরে মাতাল ছেলেটি ফিরে আসে সদলবলে এবং সশস্ত্র হয়। তারপর গুলি করে রবি আর রবির ভাইকে খুন করে।

এই খুনের ঘটনার দুদিন পরে বিধানসভায় এই প্রসঙ্গ ওঠে। নিমতা এলাকা থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য তপন চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য থেকে জানা যায় গত এক বছরে ঐ অঞ্চলে ন' জন খুন হয়েছে। প্রতিবেশী এলাকার সদস্যোরাও ঐ অঞ্চলে এই ধরনের খুনখারাবির ঘটনার নিন্দে করে অবস্থার প্রতিকার দাবি করেন। রবি ও তার ভাইয়ের খুনের পর ছ'-সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু তপনবাবুর অভিযোগ, আসল অপরাধীদের তখনও ধরা হয় নি।

এদিকে কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট এলাকায় কয়েকদিন ধরে কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যে-সংঘর্ষ চলছিল তা নিয়ে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে মার্চের তের তারিখের মাঝরাতে। শরিকী সংঘর্ষ বেড়ে চলার ফলে পুলিশ ৫৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। তার প্রতিবাদে একটি গোষ্ঠীর অনুগামীরা পরদিন সকাল থেকে ঐ এলাকায় রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। রাস্তায়-রাস্তায় অবরোধ তৈরি করা হয়। কলকাতায় যানবাহনের এবং পথঘাটের যা অবস্থা তাতে এক জায়গায় রাস্তা বন্ধ হলে গোটা শহরের রাস্তায় বিভ্রাট দেখা দিতে বিশেষ দেরি হয় না। এর ফলে শহরের মানুষ, বিশেষ করে অফিসযাত্রীরা এবং ছাত্রছাত্রীরা রীতিমতো অসুবিধেয় পড়েন। সকালের দিকে উত্তর ও মধ্য কলকাতার নানা এলাকায় ঘণ্টা পাঁচেক গাড়িঘোড়া চলতে পারেনি। পুলিশ রাস্তার অবরোধ সরাতে গেলে বিক্ষোভকারীরা বাধা দেয় এবং পাইপ গান, সোডার বোতল, ইটপাটকেল নিয়ে পুলিশের ওপর চড়াও হয়। পুলিশ ১৮ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে, পরে ১১ রাউণ্ড গুলিও চালায়। তবে এই গুলিতে কেউ আহত হন নি। মুখ্যমন্ত্রী ঐ দিনই বিধানসভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন এই ধরনের পথ অবরোধ সরকার ভবিষ্যতে আর কখনোই বরদাস্ত করবেন না।

অন্য সংঘর্ষ

কংগ্রেসী তরুণদের দুই গোষ্ঠী যখন রাস্তায় নেমে নিজেদের বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করছিলেন তখন কংগ্রেসের আর এক সংঘর্ষও প্রকাশ্যভাবেই শুরু হয়ে যায়। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা বিজয়সিং নাহার সেদিন মন্তব্য করেন, কংগ্রেস এবং সংগঠন কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শের দিক দিয়ে কোনো তফাৎ নেই। বিভিন্ন জেলায় সফরের সময় কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর এই ধারণাই হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মতো সংগঠন কংগ্রেসের নেতা হলেন মনেপ্রাণে কংগ্রেসী, গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাসী। কংগ্রেসের মধ্যে এখন অনেক সি পি আই-পন্থীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ঐ অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে পারলে প্রফুল্লবাবু এক দিন কংগ্রেসে ফিরে আসতেও পারেন। এদিকে প্রফুল্লবাবুও কংগ্রেসের মধ্যে সি পি আই বিরোধীদের বিভিন্ন প্রয়াসের কথা উল্লেখ করে বলেন তাঁদের এই প্রয়াস যদি সফল হয় তবে তাঁর কংগ্রেসে ফিরে যাওয়ায় কোনো বাধা থাকবে না।

কিন্তু দিল্লি থেকে ফিরে দমদম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলেন, প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কংগ্রেস আর সংগঠন কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শের ব্যাপারে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অন্তত পশ্চিমবাংলায় দুই কংগ্রেসের মিলনের কোনো সম্ভাবনা নেই। এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্র এক সাংবাদিক বৈঠকে বিজয়বাবুর বিরুদ্ধে দল-বিরোধী কাজকর্মের অভিযোগ আনেন। তিনি বিজয়বাবুর এইসব কাজকর্মের কথা দিল্লিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে জানিয়েছেন। বিজয়বাবুর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা তা ঠিক করবেন এ আই সি সি। কিন্তু ১৪ মার্চ এক সাংবাদিক বৈঠকে বিজয়বাবু তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলেন, দুই কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শের দিক দিয়ে যে কোনো তফাৎ নেই তা দুই দলের গঠনতন্ত্র থেকে স্পষ্ট। তিনি দুটি দলের গঠনতন্ত্র থেকে কিছু কিছু অংশ পাঠ করেও শোনান। বিজয়বাবু বলেন, অরুণবাবু বেশিদিন কংগ্রেসে আসেন নি। সিদ্ধার্থবাবুও এদিক ওদিক ঘুরে কংগ্রেসে এসেছেন। তাঁরা হয়ত কংগ্রেসের আদর্শ সম্পর্কে বেশি কিছু জানেন। কিন্তু আমি কংগ্রেসকে ভাঙার জন্যে কিছু করি নি, যা কিছু করেছি কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্যেই করেছি।

বাম জোটে ভাঙন

পশ্চিমবাংলার বামপন্থী জোটে ভাঙন ধরেছে। নয় বাম থেকে এক বাম, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার বেরিয়ে এসেছে। ফলে বাম জোটে এখন রইল বাকি আট। নয় বামের মধ্যে সাম্প্রতিক মতবিরোধের শুরু সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ প্রভৃতি দলের সঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্যে মিলিত আন্দোলন করা নিয়ে। ইতিমধ্যে সি পি এম নেতা জ্যোতি বসু এবং বামপন্থীদের আরো কয়েকজন নেতা সংগঠন কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে বার কয়েক আলোচনা করেছেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত সভায় একই মঞ্চ থেকে বক্তৃতা করেন প্রফুল্লবাবু, জ্যোতিবাবু এবং জনসঙ্ঘের হরিপদ ভারতী। এস ইউ সির আপত্তি এইসবের বিরুদ্ধে। দলের পক্ষ থেকে বাম জোটের বিশেষ করে সি পি এমের এইসব কাজকর্মের তীব্র নিন্দে করে প্রচার চালানো হতে থাকে। নয় বামের শেষ সভায় অপর আট দলের মুখপাত্রেরা বলেন, জোটের অপর শরিকদের এইভাবে নিন্দে মোটেই সহ্য করা যায় না। এস ইউ সি-কে এই ধরনের প্রচার বন্ধ করতে হবে। কিন্তু ঐ বৈঠকে এস ইউ সি-র প্রতিনিধি বলেন, কোনো বিষয়ে মতবিরোধ থাকলে তা প্রকাশের অধিকার তাঁদের অবশ্যই আছে।

পরদিন এক বিবৃতিতে এস ইউ সি নেতা নীহার মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, সি পি এম রাজনৈতিক সমালোচনার অধিকার কেড়ে নিতে চায়। কোনো দলই এই অবস্থা মেনে নিতে পারে না। এস ইউ সি এখন থেকে পৃথক পথে চলবে। এই ব্যাপারে সি পি এম বা অন্য কোনো দলের সঙ্গে আপসের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এদিকে আট বাম ঠিক করেছে, খাদ্য সমস্যা, জিনিসপত্রের চড়া দাম, বেকার সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে নানা দাবি নিয়ে আসছে মে মাস থেকে তারা আন্দোলন শুরু করবে। ব্লক থেকে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়ে শেষ হবে বাংলা বন্ধের মধ্যে দিয়ে।

শিল্পের প্রসার

সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিসভার আমলে এই বাংলায় শিল্প প্রসারের একটা ছবি পাওয়া গেল বিধানসভায় শিল্পমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষের বিবৃতি থেকে। গত তিন বছরে শিল্পোন্নয়নে লগ্নীর মোট পরিমাণ দুই হাজার কোটি টাকা। ১১৪টি নতুন প্রকল্পে কাজ চলছে। '৭৫-৭৬ সালে আরো ৮৬টি প্রকল্প চালু হওয়ার কথা আছে। এর মধ্যে ৫০টিতে কাজ শুরু হতে পারছে না বিদ্যুৎ পাওয়া যায় নি বলে। ২৮০টি প্রকল্প চালু করার জন্যে কাজ শুরু হয়ে গেছে। যৌথ উদ্যোগের একটি কারখানায় ইতিমধ্যেই টেলিভিসন সেট তৈরি শুরু হয়েছে। টায়ার টিউব স্কুটার এবং সিমেন্টের তিনটি কারখানার কাজ অগ্রসর হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যে হিন্দুস্থান ল্যাটেকসের একটি কারখানা (ফরাক্কায়) এবং লো-টেম্পারেচার কার্বনাইজেশন প্ল্যান্ট (ডানকুনিতে) স্থাপন করতে রাজি হয়েছেন। যৌথ উদ্যোগে উত্তরবঙ্গে স্থাপিত হবে সিগারেট, ঘড়ি, নিউজপ্রিন্ট ইত্যাদি কারখানা। এ ছাড়া বেসরকারি উদ্যোগেও নানা প্রকল্প চালু হবে।

তরুণবাবু বলেন, আমরা শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে এই রাজ্যে বিরাট একটা কিছু করতে পেরেছি, এমন দাবি করব না। কিন্তু যেটুকু করতে পেরেছি তা সম্ভব হয়েছে এই রাজ্যের উন্নয়নে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আগ্রহ থাকার জন্যেই। বেসরকারি পুঁজির সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য : এইসব ব্যাপারে নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব দিল্লির। তাঁর দপ্তরের কাজ হলো রাজ্যে শিল্পের প্রসারের ব্যবস্থা করা। লাখ লাখ মানুষের চাকরির ব্যবস্থা করাই সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন। শিল্প সরকারি বা বেসরকারি সেই প্রশ্ন সবচেয়ে বড় নয়।

পৌর নির্বাচন

পৌরমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই রাজ্যে বিভিন্ন পৌরসভার নির্বাচন এই বছরেই অনুষ্ঠিত হবে। কলকাতা সহ মোট পৌরসভার সংখ্যা ৯০টি। কয়েকটি পৌরসভা এলাকায় নির্বাচন কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ হয়ে গেছে সেখানে আগামী বর্ষার আগেই নির্বাচন হবে। পৌর নির্বাচন ত্বরান্বিত করার জন্যে সম্প্রতি বঙ্গীয় পৌর আইন সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে দুই মাস আগে নোটিশ দিয়েই নির্বাচন করা যাবে। বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকা তৈরি থাকলে পৌরসভা নির্বাচনের জন্যে পৃথক ভোটার তালিকা প্রকাশের দরকার হবে না। এদিকে কলকাতাসহ বিভিন্ন পৌরসভার কাঠামো ঢেলে সাজানোর জন্যে বঙ্গীয় পৌর আইন এবং কলকাতা পৌর আইন সংশোধনের উদ্যোগ চলছে। নতুন পৌর কাঠামো সংক্রান্ত প্রস্তাব এখন মন্ত্রিসভার একটি সাব-কমিটির বিবেচনাধীন রয়েছে। ঐ প্রস্তাবে পৌরসভার কর নির্ধারণ, কর আদায়, জঞ্জাল সাফাই প্রভৃতি বিভাগের আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে।

১৭।৩।৭৫ দেবদত্ত
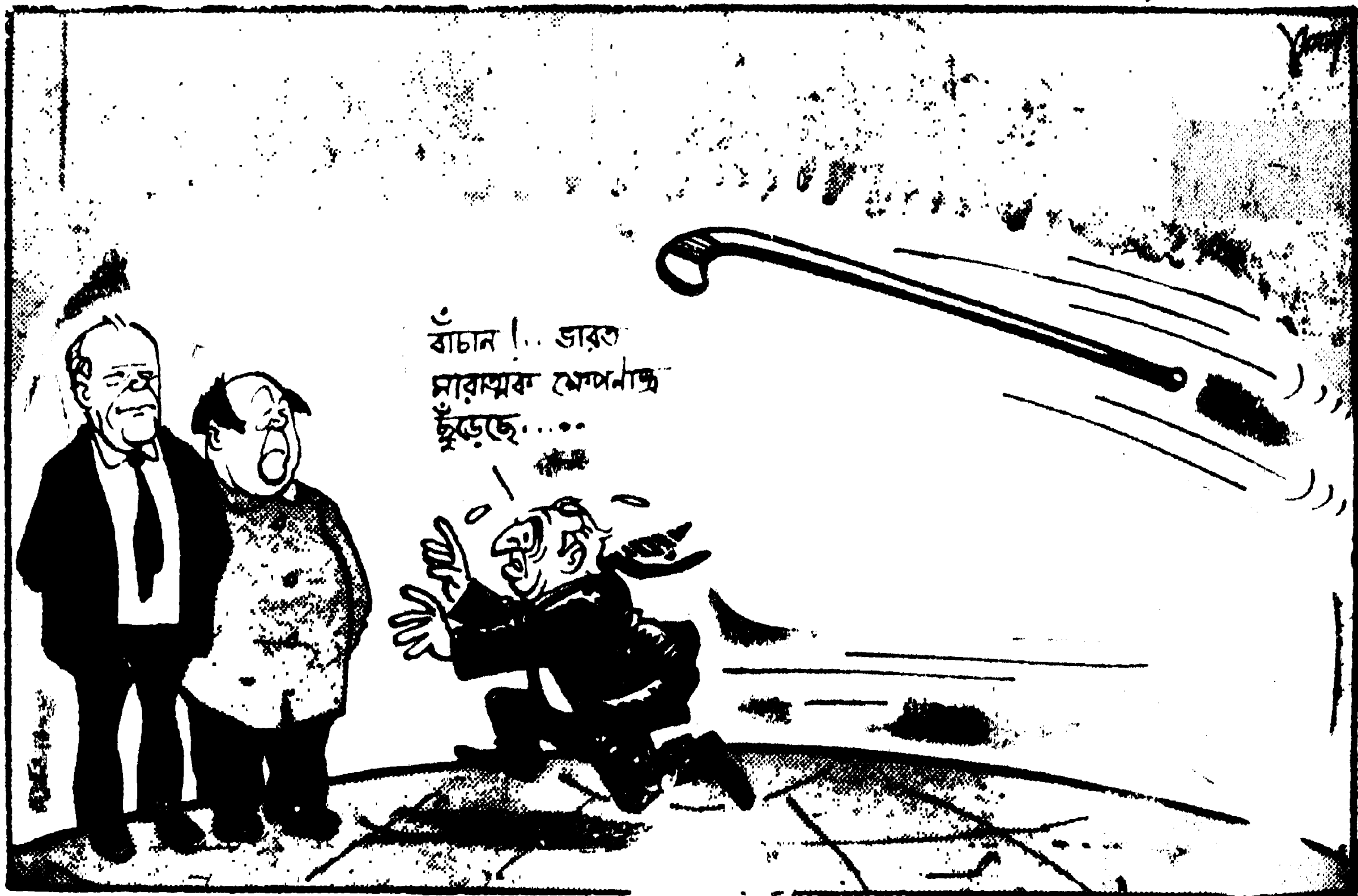
পটভূমি

রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন প্রবাহ

রাজ্যের রাজনীতি নতুন খাতে বইছে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের অন্দরে প্রবীণে-প্রবীণে নবীনে-নবীনে, ছাত্রে-ছাত্রে আবার কোন্দল অন্যভাবে উপস্থিত। প্রবীণ নেতা বিজয়সিং নাহারকে এবার একাংশ দলীয় শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে আসামী হিসাবে ধরেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অরুণবাবু বিজয়বাবুর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ এনেছেন। প্রকাশ সিদ্ধার্থবাবুরও এতে সম্মতি আছে। সি পি আই ঘেঁষা অংশ বিজয়বাবুকে জয়প্রকাশ আন্দোলনের সমর্থক বলে বর্ণনা করছেন। অপরদিক থেকে বিজয়বাবু অরুণবাবুর বিরুদ্ধেও গুরুত্বের কতগুলো অভিযোগ এনেছেন, অভিযোগ এনেছেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রতিকারের দাবীতে তিনি সোচ্চার। বিজয়বাবুর এই সোচ্চার সংগঠনের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বহুদিন ধরেই পছন্দ করছেন না।

বিজয়বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সংগঠন কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে শাসক কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনতে চান। সংগঠন ও প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করার জন্য জেলায় জেলায় তাঁর সাম্প্রতিক সফরে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ক্ষুব্ধ।

পরিষদীয় দলে বিজয়বাবুর সমর্থক নগণ্য; যাঁরাও পাশে আছেন তাঁরা মুখ খুলতে বা প্রকাশ্যে সমর্থন জানাতে ভয় পান। কিন্তু জেলায় জেলায় বহু কর্মী ও নেতার তিনি সমর্থন পেয়েছেন বলে তিনি দাবী করেছেন। কারণ কংগ্রেসের সংগঠনে তিনি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নেতা হলেও তাঁকে এখনও অনেকে পছন্দ করেন। দুর্ভাগ্য, কংগ্রেস ভাঙ্গা ও নতুন কংগ্রেসের জন্মলগ্নে এই রাজ্যে যিনি প্রদেশ কংগ্রেসের কর্ণধার ছিলেন সেই বিজয়সিং নাহারকে বর্তমানের রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্রের হাতে নাজেহাল হতে হচ্ছে। এটা দুঃখের হলেও খুব নতুন ব্যাপার নয়। একদিন ক্ষমতাসীন বিজয়বাবুর হাতে অজয়বাবুকেও নাজেহাল হতে হয়েছিল। তেমনি সেই বিজয়বাবুকেও রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে সরে আসতে হয়েছিল যুব-ছাত্রদের চাপে। যাঁরা বিজয়বাবুকে সেদিন নাজেহাল করেছিলেন, যাঁদের অঙ্গুলি হেলনে সেদিন তিনি কংগ্রেস অফিস ছেড়ে চলে এসেছিলেন, তাঁরা এখনও কংগ্রেসের কলকাঠি নাড়ছেন। অবশ্য যুব ও ছাত্রদের সেই অংশের রাগ আজও বিজয়বাবুর ওপর আছে কিনা জানি না। তবে কংগ্রেসকে যাঁরা ভালবাসেন এমন বহু প্রবীণ বিজয়বাবুর বক্তব্য একেবারে ফেলে দিতে পারছেন না। কারণ খাই খাই গোষ্ঠীর কবল থেকে কংগ্রেসকে বাঁচান আজ প্রথম কর্তব্য।

*

কংগ্রেসের ভেতরে সি পি আই ঘেঁষা গোষ্ঠী বনাম সি পি আই বিরোধী গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব বিজয়বাবু ও সিদ্ধার্থবাবুর সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটিয়েছে।

বিজয়বাবু সম্প্রতি অরুণবাবুর অভিযোগের উত্তরে বলেছিলেন যে, বিহারের সংগঠন কংগ্রেস নেতা রামসুভগ সিং, তারকেশ্বরী সিংহকে ফিরিয়ে সেনকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনার কোন পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় কোন দোষ নেই; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনার কোন কথা বলাই কি মারাত্মক অপরাধ?

এর জবাব অরুণবাবুরা এখনও দেননি। কিন্তু কংগ্রেস পরিষদ দল প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে ফিরিয়ে আনা হবে না। তাঁকে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দিলে কি শাস্তি হবে? তা অবশ্য প্রস্তাবে কিছু বলা হয়নি।

বিজয়বাবু নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির সদস্য। কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে সহজে শাস্তিবিধান সম্ভব নয়। নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটিই শাস্তিবিধান করতে পারেন। কাজেই বিজয়বাবু প্রসঙ্গ আর বেশী দূর অগ্রসর হবে না [illegible] মনে হচ্ছে। কারণ দিল্লী এ-ব্যাপারে কিছু করতে তৎপর নয়।

কিন্তু প্রফুল্লবাবুকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না প্রস্তাব পাশ করে রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব পরোক্ষে শ্রীসেনকে সি পি এম-এর হাতেই তুলে দিলেন। জে পি আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে তিনি ইতিমধ্যেই সি পি এম-এর সঙ্গে এই রাজ্যে কাজ করতে শুরু করেছেন। জ্যোতিবাবুও পার্টিকে বুঝিয়ে প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে আঁতাতে আসছেন। কারণ, লোকসভা নির্বাচনে সি পি এম প্রফুল্ল সেন ও জয়প্রকাশকে পশ্চিমবঙ্গে ও কেরলে পেতে চায়।

*

দুর্ভাগ্য, কংগ্রেসের যুব ও ছাত্র কোন্দল মারপিট এখনও কমছে না। যুক্ত বৈঠক বহুবার হয়েছে, আরও হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল মনের মিল কখনই হবে কী? ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টা চললে ঐক্য কখনই হবে না। তবে যুব ও ছাত্র নেতৃত্বের অনুগামী অংশের কিছু পালা বদল চলছে। যুব ও ছাত্রদের সংযত, শৃংখলাপরায়ণ আদর্শবাদী হিসাবে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ সার্থকভাবে দেওয়া হলেই ঐক্য ও সংহতি আসবে। অন্যথায় গোষ্ঠী-ঝগড়া চলবেই।

চাণক্য

দেশে বিদেশে

দাউদের ভারত সফর

একটা লক্ষণীয় যোগাযোগ। ভুট্টো যে নয়াদিল্লিতে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন সেই সংবাদটা নয়াদিল্লির সরকারি মহল থেকে সমর্থিত হয় ১০ মার্চ তারিখে। সেই দিনই রাওয়ালপিন্ডিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন আর রেডিও পাকিস্তান থেকে তাঁর বক্তব্য ফলাওভাবে প্রচার করা হচ্ছিল। আবার ঐ দিনই ভারত সফরের উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লি এসে পৌঁছলেন আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ দাউদ এবং নয়াদিল্লির বিমান বন্দরে প্রথমেই তাঁকে সম্বর্ধনা করার জন্য যাঁরা এগিয়ে গেলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা। শুধু তাই নয়, প্রেসিডেন্ট দাউদ যে কয়দিন ভারতে ছিলেন সে কয়দিন ভারত সরকারের তরফ থেকে তাঁর দেখাশুনো করার জন্য যাঁকে তাঁর সঙ্গে রাখা হয়েছিল তিনিও আর একজন কাশ্মীরী নেতা—মহম্মদ শফি কুরেশি। কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে পাকিস্তান যখন নতুন করে মাতামাতি আরম্ভ করতে যাচ্ছে তখন পাকিস্তান তার নিজের দেশের পাঠান ও বালুচদের প্রতি কি ব্যবহার করছে সেকথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আফগান নেতা দিল্লিতে এসে হাজির হলেন এবং বিশেষ করে শেখ আবদুল্লা ও কুরেশীর মত কাশ্মীরী নেতাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে দহরম-মহরম করলেন, এটা নিশ্চয়ই ভুট্টো সাহেবের মনঃপুত হয়নি। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে নি। পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়ে হাজার হাজার বালুচ যে এখন আফগানিস্তানের আশ্রয় নিচ্ছে এবং পাখতুনদের উপর নির্যাতন চালিয়ে, আওয়ামী পার্টির ওয়ালি খাঁ ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করে ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে পাকিস্তানই যে আফগানিস্তানের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষিয়ে তুলছে সেকথাটা আফগান নেতা শুধু ভারতেই নয়, বাংলাদেশেও বলে গেছেন। তিনি খোলাখুলিভাবেই এই মতও প্রকাশ করে গেছেন যে, উপমহাদেশে অশান্তি বজায় রাখার জন্য একমাত্র পাকিস্তানই দায়ী।

করুণানিধির হুমকী

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি এই বলে হুমকি দিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি তাঁদের মনোভাব না বদলান তাহলে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায় করার জন্য শান্তিপূর্ণ ও সংবিধান-সম্মত সংগ্রামের পথ ছেড়ে 'অন্য পথ' গ্রহণ করা হতে পারে।

জাতীয় পতাকা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সার্কুলারের সুযোগ গ্রহণ করে তামিলনাড়ু সরকার রাজ্যের একটি পৃথক পতাকা চালু করার চেষ্টা করছেন। সেই প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের দাবিটা আবার জোরালোভাবে তুলে ধরছেন।

রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের প্রতীক হিসাবে পৃথক পতাকা ব্যবহার করার দাবি তামিলনাড়ুর ডি এম কে সরকার বেশ কিছুকাল যাবতই জানিয়ে আসছেন। জাতয় পতাকার তিন রং ও দক্ষিণ ভারতের গোপুরমের ছবি দেওয়া একটি রাজ্য পতাকার নকসাও দীর্ঘদিন যাবৎ তৈরি করা আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি হননি। কিছুকাল আগে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে প্রশ্নটি আলোচিত হয়। তখন অন্য কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমনকি অকংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরাও ডি এম কে সরকারের প্রস্তাবে সায় দেননি। ডি এম কে যুক্তি দিয়েছিল যে, রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের যেখানে আলাদা পতাকা ব্যবহার করতে দেওয়া হয়, সেখানে রাজ্যগুলির নিজস্ব পতাকা থাকতে দোষ কি। কেন্দ্রীয় সরকার এই যুক্তি অংশত মেনে নিয়ে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের পৃথক পতাকার ব্যবহার তুলে দিয়েছেন, কিন্তু রাজ্যের নিজস্ব পতাকার দাবি মেনে নেননি। কাশ্মীর হচ্ছে এ-বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম। কাশ্মীরের জন্য আলাদা সংবিধান আছে বলে সেখানে আলাদা পতাকাও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

শেখ আবদুল্লার সঙ্গে নয়াদিল্লির সমঝোতা হওয়ার পর থেকেই করুণানিধি কাশ্মীরের অনুরূপ স্বায়ত্তশাসনের দাবি নতুন করে তুলে আসছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সার্কুলার তাঁকে সুযোগ জুটিয়ে দিল। তিনি মাদ্রাজে ইনস্পেকটর জেনারেল অব পুলিশের অফিসের উপর রাজ্যের প্রতীকসম্বলিত পতাকা উড়িয়ে দিলেন। আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সার্কুলারে জাতীয় পতাকার ব্যবহার সম্পর্কিত প্রচলিত বিধি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছিল যে, সরকারি ভবনগুলির মধ্যে শুধু সচিবালয়, আদালত, আইনসভা জেলা সদর পৌর সংস্থা ইত্যাদিতে সারা বছর জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে হবে অন্যান্য সরকারি ভবনে শুধু স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলিতে জাতীয় পতাকা তুলতে হবে।

কেন্দ্রীয় সার্কুলারের ভুল ব্যাখ্যা করে এভাবে রাজ্যের পৃথক পতাকা চালু করার চেষ্টার বিরুদ্ধে তামিলনাড়ু বিধানসভা ও বিধান পরিষদে কংগ্রেস ও সি পি আই সদস্যরা আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁদের ঐ আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ুর ডি এম কে সরকারকে ক্রমাগত অপদস্থ করে চলেছেন। তামিলনাড়ু সরকার তাঁদের সচিবালয়কে সুন্দর করে সাজাতে চাইলেও দিল্লির অনুমতি নিতে হয়। সেচিবালয় গৃহটি একটি পুরান সৌধ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের রক্ষণাবেক্ষণে আছে।) তাঞ্জাভুরের মন্দিরে রাজা রাজ চোলের একটি মূর্তি স্থাপন করতে চেয়ে তামিলনাড়ু সরকার কেন্দ্রের অনুমতি পান নি,. অথচ সেখানে একটি বরাহ মূর্তি সংস্কার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। করুণানিধি প্রশ্ন করেছেন মহাবলীপুরমের পুরাকীর্তি কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ববিদদের অধীনে থাকবে কেন। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী নায়ককে যেভাবে সরে যেতে হল সেই ঘটনাটিকে করুণানিধি রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের ব্যবহারের একটি নমুনা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, কেন্দ্র মহারাষ্ট্রের প্রতি যেসব অবিচার করেছেন সেসব বিষয় উল্লেখ করে পুস্তিকা প্রকাশ করার দশ দিনের মধ্যে নায়ককে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যেতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে মাদ্রাজে একটি বিবৃতি দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তামিলনাড়ু বা অন্য কোন রাজ্যের পৃথক নিজস্ব পতাকা ব্যবহার করার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হবে না।

১৬-৩-৭৫ পুণ্ডরীক

সহকর্মীর লোকান্তর

আমাদের সকলের প্রিয়জন শ্রীসমর রায় গত ১৩ মার্চ অফিস আসবার সময় এক আকস্মিক ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তিনি অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং মধুর স্বভাবের জন্য সকলের প্রিয় ছিলেন।

রোজনামচা

ফাদার দ্যতিয়েন

তিন হাজার টাকা যার মাসিক আয় সে কি ইচ্ছে করলে পুনর্বিবাহ করতে পারে না? পারে। ওসমান গনি কিন্তু আর করবে না নিকা করার ওর ইচ্ছে নেই।

ওর বৌটির নাম ছিল মমতাজ। মমতাজ ইন্তেকাল করেনি (ইন্তেকাল মানে মৃত্যু) চলে গিয়েছে সরে পড়েছে—ওসমানের দিন-দুনিয়াকে অন্ধকার করে ওসমানকে সে ছয় বছরের অবিমিশ্র আনন্দ দিয়েছিল: সকালে নিজেই ওকে অফিসে ড্রাইভ করে নিয়ে যেত আর বারোটা বাজতে না বাজতে নিজেই রোজ টিফিন নিয়ে আসত...হায়দারকে বরং সওয়াল করুন ছোকরাটা আপনাকে বলবে জানালার এক ভাংগা কাচের সুযোগ নিয়ে কেমন করে সে দেখেছে (একদিন নয় একাধিকবার) ভাত সালন মেখে হাঁ কর বলে সাহেবের মুখে বিবিজান গ্রাসের পর গ্রাস তুলে দিচ্ছে... না সন্ধ্যায় সে আর যেত না ওসমানের জন্য ইন্তেজার করত গরম চা টাটকা হালুয়া আর অনেক আদর-যত্ন নিয়ে। যুগল মূর্তিকে দেখে প্রতিবেশীরা বলত: 'এত পেয়ার দেখে হিংসে হয়...হা হা আল্লা ওদের আওলাদ দেননি কেন?...

বিচ্ছেদান্ত গল্পটা শুনলাম ওসমানেরই মুখে। প্রথম থেকে বলি শুনুন:

মমতাজ আসিফ নামে ওর এক ফুফুতো ভাইকে ভালোবাসত। উভয়ের আব্বার মত ছিল দাদারাও উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন 'তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিয়ে দাও সাদি দেখে আমরা চলে যাই'...আমাদের মতামতের খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ না করে আব্বারা তাই কুলো-ডালা সাজানোর কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। নিয়মটা এই: বিয়ের কিছু দিন আগে ছেলের আব্বা কুলো মাথায় করে মেয়ের আব্বার কাছে পান-পোস্ত আনতে এক কুলো পাঠাবেন: তাতে থাকবে সোহাগ-পুরা (নানা রকম নকশা সমেত) চুন্নি ওড়না আর বাসন্তী রঙের শাড়ি দুটো সোনালি রাখি একটা [illegible] ফিতে দু গজ সুপারি [illegible] মেহেদি বাটি [illegible] (হলুদের [illegible] ডালা

মেয়ের আব্বা পাঠাবেন এক ডালা তাতে থাকবে সোহাগ-পুরো বিয়ের পাগড়ি আতর একটা রুপালি রাখি একটা সাদা মালা...কিন্তু ওসব বলে কি লাভ?...কুলোটা পাঠানো হল না।

কুলো পাঠানোর পূর্ব দিবসে নমাজ সেরে মমতাজের আম্মা সাজেদা ঘোষণা করে বসলেন পরিকল্পিত সাদিতে তাঁর মত নেই। আসিফের বংশ নাকি ভালো নয়: ওর দাদীর হয়েছিল শ্বেতী ফুফুর হয়েছিল মৃগীরোগ বড় জেঠা ভুগেছিল যক্ষ্মায়। সাজেদার অমতের প্রকৃত কারণ কিন্তু তা নয় সাজেদার অমতের প্রকৃত কারণ স্বয়ং ওসমান...সদ্য বিলাত ফেরত ওসমান গনি—আর তার রোজগার: ওসমানের বেতন আসিফের মাইনের পাঁচ গুণ।

তোষামোদে খোশামোদে কোনো ফল হচ্ছে না দেখে তিরস্কারে ভর্ৎসনায় কোনো ফল হবে না জেনে মমতাজের আব্বা—আর চাচারা—হার মানলেন।

আর মমতাজ?...মমতাজের ব্যবহার কেউ বুঝল না। প্রথম দিন অবশ্য ভেউ ভেউ করে কান্নাকাটি করে মেয়েটি দড়ি-কলসীর কথা তুলেছিল হু-হু করে ফুঁপিয়ে আমরণ নিরম্বু অনশন করবে বলে শাসিয়েছিল। তার সংকল্প কিন্তু দিনে দিনে ঢিলে হতে শুরু করল। তাকে ঘিরে বাড়িতে যে অশান্তির সৃষ্টি হবে তা সে চাচ্ছিল না মাকে দুঃখ দিয়ে সে যে সুখী হবে না কথাটা তাকে বোঝানো হল বুঝলও সে। মেয়েটি বোধ হয় আসিফকে সত্যকার প্রেমে কোনোদিনই ভালোবাসেনি শুধু ভালো-বাসতে ভালোবাসত। কুলোটা পাঠানো হল—ওসমানদের বাড়িতে।

প্রকৃত প্রেম যে কাকে বলে মমতাজ তা বুঝতে শিখল ওসমানের সাহচর্যে। ওসমান পরস্পরের ভালোবাসাকে সতেজ রাখত নিত্য নতুন আবিষ্কারে। মমতাজ ফুল ভালো-বাসে? পরাগে ওর [illegible] অ্যালার্জি সত্ত্বেও ওসমান [illegible] আনে টবে [illegible] গাছ। মমতাজ ফিল্ম দেখতে পছন্দ করে? ঘরকুনো ওসমান প্রতিটি রোববারে বৌকে নিয়ে যায় সিনেমায়...এই ধরনের নিষ্কাম কর্ম কিন্তু সংক্রামক: অল্পদিনের মধ্যে মমতাজের মা এসে দেখেন বেগুনভাজা পাঁকাল মাছের ঝোল প্রভৃতি যে সব রান্না হাজার বকুনি খেয়েও শিশুকাল থেকে মেয়েটি খেতে চাইত না সেই সব অন্নব্যঞ্জন আজ নিজের হাতেই সে রাঁধে—আর দিব্যি খায়—ওসমানের ফেভারিট্ ডিশ্ বলে। ছুটি এলে ঝগড়া হয়: মমতাজ সমুদ্রপিয়াসী বলে ওসমান চায় কক্সবাজারে যেতে আর এদিকে ওসমানকে পাহাড়প্রিয় জেনে মমতাজ বলে: রাঙ্গামাটি যাওয়া যাক!

ওই বছরে কিন্তু কোথাও আর যাওয়া হল না: সম্পূর্ণ ছুটিটা ওসমানের—আর মমতাজের—কাটল ঢাকার সদর হাসপাতালে। অদ্ভুত এক অসুখ ওসমানের: চোখে ক্যানসার জাতীয় এক ট্যুমার...দীর্ঘদিনের চিকিৎসা চলল বিদেশী ওষুধ—আর বিদেশী ডাক্তার—করাচী থেকে আমদানি হল। ওসমানকে মমতাজ এক মিনিটও ছাড়ল না: ওর ক্যাবিনেই মাটিতে মাদুর পেতে সে ঘুমোত। না ঘুমোত না অতন্দ্র নয়নে রাত কাটাত। মেয়েটির ফেকাসে চেহারা আর কোলা চোখ দেখে বুড়ো ডাক্তার হাফিজুল্লা আদর করে জিগ্যেস করতেন 'এ ক্যাবিনে কার অসুখ?

ওসমান একদিন বলেছিল 'একবার বাড়ি ঘুরে এলে হয় না? তোমার একটু বিশ্রাম দরকার...তীব্রবেগে উত্তর এসেছিল: আর যাই বল না কেন হাত জোড় করে বলি ওসমান। অমন কথা আর মুখে এনো না লাগে!' রোগীটি কৈফিয়তের সুরে বলেছিল 'তোমার গাছগুলো যে শুকিয়ে যাবে...

'আমার গাছ?...চুলোয় যাক আমার গাছ! এ দুনিয়ায় আমার আর কিছু নেই—তুমি ছাড়া মমতাজের হঠাৎ দুঃখ হল যে নগদ টাকায় তার কোনো অভাব নেই। কত আনন্দের সঙ্গে সে তার যাবতীয় গয়না বিক্রি [illegible] করে হাসপাতালের বিল মেটাত।

ইতিমধ্যে তার মাথায় এক আশ্চর্য বুদ্ধি খেলেছে বাড়ি গিয়ে গয়নার বাকস থেকে সে তার সবচেয়ে দামী হার পাঁচ ভরির এক স্বর্ণহার—বের করে আঞ্জুমনের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে বলল 'ওর সদ্ব্যবহার করুন—দরিদ্র রোগীদের খিদমতে।' বিবাহিত জীবনে এই প্রথম মমতাজ স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো কাজ করে ফেলল। আল্লার কাছে সে প্রার্থনা করল তার উদার ব্যবহারের বিনিময়ে তিনি যেন ওসমানের প্রতি মেহেরবানি-পূর্ণ দৃষ্টিপাত করেন।

দু মাসের মধ্যে দেশী-বিদেশী চিকিৎসকদের স্তম্ভিত করে ওসমান আরোগ্য লাভ করল : রক্তাদি পরীক্ষা করে বোঝা গেল রোগের জীবাণু নিশ্চিহ্ন। আল্লাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে মমতাজ অর্ধ শুষ্ক ফুলের গাছে পানি দিতে শুরু করল।

...ওসমান আসলে পুরোপুরি সেরে ওঠে নি ওর সেই অসুখের এক অভাবিত পরিনাম ও বয়ে চলেছে : ওর সব আছে পৌরুষ নেই। অতিরিক্ত শীর্ষাসন করলে নাকি যা হয় কোন ওষুধের কোন প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ওসমান আজ পুংশক্তিহীন।

মমতাজ ঘাবড়ে গেল না...ঘাবড়ে গেল না বাক্যে ভঙ্গিতে ঘাবড়ে গেল মনে মনে। গোটা ব্যাপারটা ঠাটার ছলে উড়িয়ে দিয়ে সে বলল 'প্রেমকলাটা তাহলে আমাদের প্রথম থেকেই নতুন করে শিখতে হবে...।' তারপর বেহেস্ত সাহিত্যের এক পুস্তক থেকে ওসমানকে শেখাতে লাগল পদ্মিনী চিত্রাণী শঙ্খিণী হস্তিণী নারীভেদ। ওষ্ঠাধরে অতিকষ্টে এক স্মিতহাসি এঁকে ওসমান বলল 'আরও আছে : মর্দামুখী বাঁদরামুখী পেঁচামুখী হাড়িমুখী কুকুরচোখী ফুলো পাছা কাকঠেংগী......

খেলাটা আর কতদিন টিকবে, বলুন? মমতাজ আর কতদিন লুকোতে পারবে তার আশঙ্কা? কতদিন চাপা রাখতে পারবে দুর্বহ রহস্যটা? তার মা যে আজকাল—যেন নিষ্ঠুর উপহাসে—সময়ে অসময়ে পাড়েন তার নানী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

মমতাজ আশা ছাড়ল না একদিন ছোট্ট পুঁটলি বেঁধে নিয়ে সে রওনা হল। মা প্লেনের ভাড়া সে সঙ্গে নিল না আর পাঁচজন মিস্কিন মুসাফিরের মতো ট্রেনে চেপেই সে আজমীরে তীর্থ করতে গেল। মাজার শরিফে পুরো এক সপ্তাহে নফল নমাজ পড়ে নফল রোজা করে সে ধর্ণা দিল শেষদিন তার বিয়ের দুটি কঙ্কন মানত করে রেখে গেল। আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা পেল সে স্বামীকে সারাতে পারল-না।

একদিন ওসমান বৌ যাতে মাতৃত্বের আনন্দ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না হয় সেজন্য অনাথাশ্রমের এক বাচ্চাকে পোষ্য করার প্রস্তাব করল। মেয়েটি বাঘিনীর মতো গর্জন করে বলে উঠল যে বাচ্চা তোমার বাচ্চা নয় সে বাচ্চাকে আমি চাই না...' পরে একটু শান্ত হয়ে অভিমান-ভরা কন্ঠে সে বলল 'আমাকে তুমি সন্তান দেবে বলে নয় নিজেকেই দেবে বলে তোমাকে আমি বিয়ে করেছি ওসমান।'

দিন গেল মাস গেল কাটল তিন বছর। প্রতিবেশীদের চোখে ধুলো দিয়ে আর নিজেকেও প্রতারণা করে অতিরিক্ত আদর-যত্নের মধ্য দিয়ে স্বামীর কাছে—আর নিজের কাছেও—মমতাজ তার প্রণয়ের অকৃত্রিমতার প্রমাণ স্তূপীকৃত করতে লাগল ওসমান বাড়ি ফিরলেই শশব্যস্ত হয়ে সে ওর কোট আর টাই খুলে দিত জুতো ছাড়িয়ে দিত চটি পরিয়ে দিত...। মুখে কিছু না বললেও ওসমান মনে মনে প্রশ্ন করত : ফুলদানিতে ফাটল না ধরলে এত সাবধানে ফুলদানি নাড়ে চাড়ে কে? দাম্পত্য যন্ত্রাবলী চলছিল মসৃণ গতিতে আর তবু একেক সময় ওসমানের অন্তঃকর্ণে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল অদৃশ্য কোন এক চাকাতে কিসের যেন কড়কড়ে আওয়াজ...

একদিন মোরগ ডাকল অ্যালার্ম বাজল চারদিকের মসজিদ থেকে ঢেউয়ের মতো ভোরের আজান সহরতলী ছেয়ে ফেলল. মমতাজ তবু উঠল না। বলল শরীর ভালো নেই ওসমান তার জন্য যেন না ভাবে নিশ্চিন্তে অফিসে যাক। বৌয়ের কাছে থেকে নিজের হাতে তার শুশ্রূষা করার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও ওসমান বুঝল মমতাজ তা চায় না অনন্যোপায় হয়ে শাশুড়ীকে ফোন করে ডেকে আনিয়ে ও রওনা হল। গাড়িতে উঠতেই মমতাজের আসনে ড্রাইভারকে দেখে ওর সারা দেহ কেঁপে উঠল অনির্বচনীয় আশঙ্কায়। অফিস থেকে কতবার ফোন করতে চেষ্টা করল ওসমান মমতাজের ফোন সর্বদাই এনগেজড।

সন্ধ্যায় ফিরে ওসমান দেখল মমতাজ বাড়ি নেই তার আলমারিগুলোও শূন্য। চাকর বলল ডাক্তার এসেছিলেন বলেছিলেন : মানসিক রোগ অবিচ্ছিন্ন বিশ্রামের প্রয়োজন। বিবিসাহেবের আম্মা নাকি সাহেবকে বলতে হুকুম দিয়েছেন সাহেবের পক্ষে কিছুদিনের জন্য না যাওয়া ভালো ফোন না করাও ভালো তিনি রোজই খবর পাঠাবেন।

মমতাজের আম্মা কোনোদিনই খবর পাঠান নি আর মমতাজও ফোন পর্যন্ত করল না। একদিন তাঁদের বাড়ির এক মৌলবীর মধ্যস্থতায় তাঁরা ওসমানকে তালাক দিতে অনুরোধ করেছিলেন। ওসমান বলেছিল এতদিন এত সুখ আমাকে যে দিয়েছে তালাক কি তার প্রকৃত পুরস্কার? মমতাজ নিজ থেকেই ডাইভোর্সের আয়োজন করল সরকারী বন্দোবস্তে।

মিসিং লিঙ্কের খোঁজে জিগ্যেস করলাম : শাশুড়ীর প্ররোচনায় ওসমান কোনো উত্তর না দিয়ে বলল : তার স্মরণে আমি রোজ টবে বসানো গাছগুলোতে জল দিই সন্ধ্যায় এসে তার ছবির অ্যালবাম দেখি রাতে দেখি তার স্বপ্ন...সিনেমায় যাওয়া বন্ধ করেছি। এক বছর হয়েছে আজ আমি তাকে হারিয়েছি। শুনেছি শীগগিরই নাকি নতুন বিয়ে করে সে বিলেত যাচ্ছে। ভাবছি গাড়িটা পাঠাব নিকার উপহার।

(ক্রমশঃ)

গোয়েন্দা ধাঁধা

ভাঙা দেউলের খুনী প্রতিমা ॥ মিস্ মার্পল ॥ আগাথা ক্রিস্টি

ভাঙা দেউলের খুনী প্রতিমা। মিস মার্পল। আগাথা ক্রিস্টি

ক্লাবের নাম টুইসডে নাইট ক্লাব। উদ্দেশ্য --রহস্য গল্প বলা এবং তার সমাধান করা। সেদিন গল্প বলছেন পাদ্রী পেনডার।

ডার্টমুর জায়গাটা রহস্যময়, ভয়ংকর অথচ সত্যিই দর্শনীয়। ডার্টমুরের প্রান্তে বেশ খানিকটা জায়গা জমি কিনলেন স্যার রিচার্ড হেডন। প্রাসাদের পাশেই প্রস্তর-যুগের সারি সারি গুহা, দিগন্তবিস্তৃত জলাভূমি এবং জঙ্গলাকীর্ণ পর্বতশ্রেণী।

এই বাড়ীতেই একদিন একটা পার্টি দিলেন স্যার রিচার্ড। অনেকেই এলেন সেখানে—অভ্যাগতদের মধ্যে রইল মিস ডায়না --ডাকসাইটে সুন্দরী।

সবাইকে নিয়ে স্যার রিচার্ড গেলেন প্রস্তরযুগের গুহা অঞ্চলে। নিওলিথিক কুঁড়ে দেখিয়ে বললেন—এ-জায়গার নাম সাইলেন্ট গ্রোভ।

সাইলেন্টই বটে। থমথম করছে চারি-দিক। নির্জন, নিস্তব্ধ। এবড়োখেবড়ো পাহাড় ন্যাড়া ন্যাংটা। আর কিছু নেই।

অদূরে অনেকগুলো গাছ মাথা ঠোকা-ঠুকি করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকদিনের মরা গাছ—নতুন করে পুঁতে রাখা হয়েছে শুধু মাঝের দেউলটাকে ঘিরে রাখার জন্যে।

ভাঙা দেউল। ফোনিসিয়ানদের ডাকিনী মন্দির। মন্দিরে পাথরের প্রতিমা। মনে হয় যেন জীবন্ত। মাথায় জোড়া শিং।

গা শিরশির করে উঠল অভ্যাগতদের। মেয়েরা ভয় পেল। পুরুষরাও স্বীকার করলে—জায়গাটা আভিশপ্ত। যেন একটা অশুভ শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে এখানকার বাতাসে। পরিবেশ মোটেই সুবিধের নয়।

মিস ডায়না কিন্তু লাফিয়ে উঠে বললে—তাই কি হয়? আসুন আজ চাঁদনী রাতে সবাই মিলে নাচগান করি— দেবীপ্রতিমার সামনে।

রোমাঞ্চিত হল সবাই। রাজীও হল।

প্রাসাদের হলঘরে খাওয়ার টেবিলে সব শেষে হাজির হল মিস ডায়না। এসে দেখলো তার মন জোগাতে প্রত্যেকেই অদ্ভুত সাজে সেজে এসেছে। স্যার রিচার্ড প্রস্তরযুগের গুহাবাসী সেজেছেন—তাঁর খুড়তুতো ভাই জংলী সর্দারের ছদ্মবেশ নিয়েছেন। লেডী ম্যানারিং সেজেছেন হাসপাতালের নার্স—তাঁর মেয়ে হয়েছেন হারেমের বাঁদী ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফুর্তিতে নেচে উঠে মিস ডায়না বললে --চলুন বেড়িয়ে আসা যাক।

বাইরে চাঁদের আলো। মায়াময় পরি-বেশ। অভ্যাগতরা সকলেই ফুর্তি উচ্ছল। হঠাৎ দেখা গেল মিস ডায়না নেই।

শুতে গেল নাকি? বললেন স্যার রিচার্ড।

না না। মন্দিরের দিকে যেতে দেখেছি বললে ভায়োলেট ম্যানারিং।

এত রাতে মন্দিরের দিকে? ভুরু কুঁচকোলেন স্যার রিচার্ড। মতলবটা বোঝা যাচ্ছে না তো। ডাইনী সাজবে নাকি?

মন্দিরের দিকে রওনা হলেন সবাই। দূর থেকেই দেখা গেল ভয়াবহ সেই দৃশ্য।

মন্দিরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে অপার্থিব একটি মূর্তি। সারা দেহ চকচকে বস্তুতে আচ্ছাদিত। মাথায় এক জোড়া সিং।

প্রতিমা কি জাগ্রত হয়েছে?

ডায়না! ডায়না! তীক্ষ্ণস্বরে বলল ভায়োলেট।

মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ভায়োলেট ঠিকই চিনেছে। ডায়নাই বটে। ভীষণা দেবীর মতই চন্দ্রাকরণে দাঁড়িয়ে অকম্পিত দেহে—

ডায়না! চমকে উঠলেন স্যার রিচার্ড। অন্য রকম মনে হচ্ছে না?

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে এক হাত শূন্যে তুলল ভয় করী।

বলল—আমি এ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কাছে এস না। আমার হাতে মৃত্যু।

সর্বনাশ। হেসে উঠে বললেন স্যার রিচার্ড। কি ছেলেখেলা জুড়েছো ডায়না। বলেই পা বাড়ালেন সামনে।

এগিয়ো না এগোলেই মরবে।

হাঃ হাঃ হাঃ! খুব ভয় দেখাচ্ছো দেখছি।

বারণ করছি আর এগিও না। আমার হাতে মৃত্যু।

ছুটে গেলেন স্যার রিচার্ড।

সহসা শূন্যে উত্থিত হাতটা নামিয়ে আনল মিস ডায়না—সঙ্গে সঙ্গে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন স্যার রিচার্ড।

আর নড়লেন না।

দৌড়ে গেল তাঁর খুড়তুতো ভাই ইলিয়ট হেডন। হাঁটু গেড়ে বসে চিৎ করে শোয়ালো দাদাকে।

পরক্ষণেই দাঁড়িয়ে উঠে বললে—ডাক্তার ডাকুন। দাদা মারা গেছেন,

স্যার রিচার্ডের বুকে ছুরি মারার চিহ্ন ...রক্ত...কিন্তু ছুরি নেই কোথাও।

পুলিশ এল। মাথা নেড়ে বললে অসম্ভব! অশুভ প্রেতাত্মা এসে ছুরি মেরে গেল।

তাই কি হয়?

সমস্ত রাত কারো ঘুম হল না। স্যার রিচার্ডকে সত্যি সত্যিই মরতে দেখে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ডায়না। ডাক্তার তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে—পুলিশ তাকে জেরা না করা পর্যন্ত কোনো কথা বলতে রাজী নয়।

সব চেয়ে আশ্চর্য ছুরিটা কোথায়? অভ্যাগতদের মধ্যে কেউ বললে ডায়নার হাতে সত্যিই যেন কি চকচক করে উঠেছিল। কেউ বললে চোখের ভুল। সত্যিই ডায়নার হাতে কিছু দেখা যায় নি—ক্ষত স্থানেও নয়।

ছুরিটা খুঁজে বার করার জন্যেই ইলিয়ট হেডন ফের গিয়েছিল মন্দিরচত্বরে। ভোর-রাতেও তাকে ফিরতে না দেখে টনক নড়ল প্রত্যেকের। পাদ্রী সাহেবের ওপর ভার পড়ল তাকে খুঁজে আনার।

একজন সঙ্গী নিয়ে পাদ্রী গেলেন অকুস্থলে। স্যার রিচার্ডের লাশ আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঠিক সেই জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়ে আরও একটা দেহ।

ইলিয়ট হেডন। তখনও নিঃশ্বেস পড়ছে। কাঁধে বিঁধে আছে একটা ছুরি।

জ্ঞান ফেরার পর ইলিয়ট যা বলল তা সত্যিই রোমাঞ্চকর। মন্দিরের সামনে পৌঁছোনোর পর থেকেই কেন জানি তার মনে হচ্ছিল কে যেন তাকে প্যাট প্যাট করে দেখছে গাছের আড়াল থেকে।

আচমকা কিসের আঘাত লাগল রগের ওপর। মাথা টলে পড়ে যাওয়ার সময়ে একটা ছুরি উড়ে এসে গেঁথে গেল কাঁধে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

গল্প শেষ হল। ক্লাবের কেউ বললে ডায়নাই খুনী। অপরজন বললে—দূর! ডায়না স্যার রিচার্ডের কাছেই আসে নি। দূর থেকে ছুঁড়ে মেরেছে? বেশ বেশ ছুরিটা কি হাওয়ায় গলে মিলিয়ে গেল? অন্য এক সদস্য বললে—গাছের আড়ালেই কেউ লুকিয়ে ছিল। ইলিয়ট নিজেও তা টের পেয়েছে। বুকে ছুরি নিয়ে পড়ে যাওয়ার সময়ে হাতের টানে ছুরি টেনে নিয়ে নিশ্চয় দূরে ফেলে দিয়েছিলেন স্যার রিচার্ড। সেই ছুরি দিয়েই হত্যাকারী খতম করতে চেয়েছে তাঁর খুড়তুতো ভাইকে।

মিস মার্পল বললেন—তোমাদের মাথা আর মুন্ডু।

আর কি বললেন বলুন তো?

অদ্রীশ বর্ধন

(গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান ৫২ পৃষ্ঠায়)

উপন্যাস

সেই সব মানুষ

পুজোর পর গ্রাম একটু নিস্তরঙ্গ হলেও একদিন আবার জমজমাট হয়। সহর থেকে বাকসকল এসে রকমারি ছবি দেখায়। আর তাই দেখার জন্যে গ্রামে হুড়োহুড়ি। এই সময় গ্রামে ঠাকুর মশায়েরও পদধূলি পড়ে। চার-পাঁচ মাস পরে আসা। ব্রাহ্মণ বিদায়ের তোলা খাজনা আদায় করতে আসেন তিনি।

ক্ষেতে ধান পাকতে লেগেছে। কাটাও শুরু হয়ে গেছে। লক্ষ্মীঠাকরুণ বিল ছেড়ে গৃহস্থের উঠানে গুটি গুটি আসন নিচ্ছেন। আঁটির গায়ে সোঁদা সোঁদা মিষ্টি গন্ধ। দেখতে দেখতে সব ধান পেকে গেল। তেপান্তরের বিলে সবুজের একটা গোছাও নেই কোন দিকে। চতুর্দিকে সোনা। যতদূর নজর চলে, দেখা যায় পাকা ধানের সোনা ঢেলে দিয়েছে যেন প্রকৃতি। সেই সঙ্গে হিমের আমেজ।

ভবনাথের উঠোনে ধান উঠে গেছে। তাই ছেলেদের বায়না নতুন চালের ফ্যানসা ভাত খাবে। কিন্তু পুজো না দিয়ে নবান্ন না করে খাবার নিয়ম নেই। একদিন তাই পুরুত ডেকে পুজো আচ্চাও হয়ে গেল। ভাটিয়াল চালের মিষ্টি ফ্যানসা ভাত গরম গরম পাতে পড়তেই বাচ্চাদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। দেবুবুড়িও তাদের মাঝখানে বসেছেন। একবার এর গালে একবার ওর গালে ভাত তুলে দিচ্ছেন। যেন উৎসব লেগে গেছে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রোয়াকের উপর রোদ পিঠ করে বসে সবাই বড়ি দিচ্ছে। দেব ঠাকুরুনও এসে বসলেন। হাঁ-হাঁ করে ওঠেন তিনি ঃ কী হচ্ছে ছোটবউ, এক্ষুনি কেন? আরও ফেনাও, না ফেনালে বড়ি মুচমুচে হয় না।

তরঙ্গিনী হেসে বলেন, ফাঁপা বড়িতে তেলের খরচা কত। তেলের-ভাঁড় তেলের-বোতল এমনি তো আছড়ে আছড়ে ভাঙেন, আর ফাঁপা বড়ির তেল জোগাতে বটঠাকুর ঠিক লাঠি ঠেঙা নিয়ে মেরে বসবেন।

টুকটুকি এসে পড়েছে, বড়ি সে-ও দেবে। এদিকে হাত বাড়ায়, ওটা থাবা দিয়ে ধরে। তরঙ্গিনী আরও এলাকাড়ি দেন ঃ বটেই তো, বাড়ীর মেয়ে হয়ে সে-ই বা কেন বাদ থাকবে। একটুখানি কাই নিয়ে বাচ্চার হাতে দিলেন ঃ যাও, ঐ পিঁড়ি-খানার উপর বড়ি দাওগে তুমি। টুকটুকির বড়ি সকলের চেয়ে ভাল হবে দেখো।

কিন্তু ভবী ভোলে না। আলাদা পিঁড়ি সে নেবে না—সকলের মধ্যে একসঙ্গে বড়ি দেবে। বড়ি দেবার নামে লেপটে নয়-ছয় করে দিচ্ছে। অলকা টেনে সরিয়ে নিতে গেল তো কেঁদে পা-দাপিয়ে অনর্থ করে।

তরঙ্গিনী বললেন, বাড়ীর মধ্যে একজন এই হয়েছেন—আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে সকলে তোমরা মাথায় তুলেছ।

পুঁটিকে বললেন, ওঠ তুই পুঁটি, বড়ি দিতে হবে না। নিয়ে যা ওকে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে আন[illegible]

জোর করে পুঁটি বাচ্চাকে কোলে তুলে নিল। টুকটুকি নিদারুণ চেঁচাচ্ছে। পুঁটি মিছামিছি আঙুল দেখাচ্ছে ঃ জামগাছে কেমন ঐ ন্যাজঝোলা পাখি, দেখ। 'আয়রে পাখি ন্যাজঝোলা, টুকিকে নিয়ে করোসে খেলা।' ছড়া বকছে আর স্নেহে নাচাচ্ছে।

এক স্ত্রীলোক এসে দর্শন দিল। শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়ে আধেক-দেহ জড়ানো বিড়-বিড় করে আপন মনে কি সব বকছে। কারো পানে তাকায় না, কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে না, নিজেরই ঘরবড়ী যেন। কাটারিখানা প্রায়ই চালের বাতায় গোঁজা থাকে—ঘাড় কাত করে সেখানটা সে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। তরঙ্গিনী দেখতে পেয়ে ঘরের মধ্য থেকে কাটারী ছুঁড়ে দিলেন। হাসি-হাসি মুখে বলেন, যাক, গুণমণির মতি হল। গামড়াগুলো শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে আছে, রান্না করে সুখ হবে আজকে।

পোয়ালগাদার আড়ালে স্তূপীকৃত নারকেলের গামড়া, গুণমণি তল্লায় তল্লায় কুড়িয়ে ঐখানে জড় করে রেখেছে। এক-একটা টেনে কাটারী দিয়ে চিরছে, মুখে অবিশ্রান্ত গালি। যত পরিশ্রান্ত হবে গালির জোর তত বাড়বে। যখন কাজ করবে না, তখন বিড় বিড় করে গালি।

মাথায় ছিট আছে। তা সত্ত্বেও কাজকর্ম ভারী পরিষ্কার। গাঁয়ের সব বাড়ীতে গুণের আদর-খাতির সেইজন্য। ডাকাডাকি করে আনা যাবে না, মর্জি মতন হঠাৎ এসে পড়ে। এসেই কাজে লাগবে, বলে দিতে হবে না। বললেও সেই জিনিস যে করবে মানে নেই। বঁটি পেতে হয়ত বসে গেল, নারকেল পাতা চেঁচিয়ে ঝাঁটার শলা বের করছে। অথবা চিঁড়ের ধান ভিজান আছে—ধানের কলসী কাঁখে নিয়ে গুণো ঢেঁকিশালে চলল। চিঁড়ে কুটবে, অতএব অন্য কেউ তাড়াতাড়ি যাও এলে দেবার জন্য। চিঁড়ের পাড় দেওয়া বড় কষ্টের কাজ, দুজনের একসঙ্গে দুখানা পা লাগে। কিন্তু গুণমণির লিকলিকে দেহ হলে কি হয়, একলাই সে পুরো কলসী ধানের চিঁড়ে নামিয়ে দেবে। তবে শালির বন্যা বইয়ে দেবে সেই সময়টা কোন অলক্ষ্য শত্রুর উদ্দেশে।

কাঁধে চাদর ফেলে ছাতা ও লাঠি হাতে ভবনাথ হন হন করে বিল মুখো চললেন। কালীময় পিছনে। জোয়ান যাবো ছেলে বুড়ো বাপের সঙ্গে হেঁটে পারে না। এক-গোয়াল গরুর মধ্যে তিনটে গাই এখন দুধাল। দোওয়ার সময় হয়ে গেছে, খোঁয়াড়ে আটকানো ক্ষুধার্ত নধর বাছুর হাম্বা-হাম্বা করছে। রমণী দাসী দু বেলা গাই দুয়ে দিয়ে যায়। বড্ড দেরী করল আজ। এসে পড়তে উমাসুন্দরী রে-রে করে উঠলেন ঃ বলি আক্কেলটা কি রমণী? বাছুর মেরে ফেলে গোবধের দায়ে ফেলবি নাকি। আমার বড় বউমারও দিব্যি নাটে হাত চলে। বিকাল থেকে আর তোর আসতে হবে না, বড়-বউমা যেটুকু পারে তাতেই হবে।

অপরাধী রমণী দাসী ছুটোছুটি করে খোয়াড়ের বাছুর খুলে দেয়। মিন-মিন করে দেরীর কৈফিয়ত দিচ্ছে। ধান কাটার সময় ধান কিছু কিছু ঝরে পড়ে। ঝরা-ধান অনেকে ক্ষেতে ক্ষেতে কুড়িয়ে বেড়ায়, কপালে থাকলে এক পালি দেড় পালি হওয়াও বিচিত্র নয়। সেই কর্মে গিয়ে আজকে রমণী দাসীর—

বলে পা তুলে দেখাই কেমন করে ঠাকরুণ। ডান পায়ের তলা শামুকে কেটে অর হয়েছে। রক্ত থামেই না মোটে, কি করি—

কিন্তু দুধে যে বিভ্রাট। বাঁধি-গাইটি ঠিক আছে, তারা যেমন দেয় তেমনি দিল। পুণোর কি হয়েছে—ঘটির কানা অবধি দুধে ভরে যায়, আজকে তলার দিকে একটুখানি, পৌয়াটাক হবে বড়জোর। নুলেবাছুরে পিইয়ে খেয়েছে, তা-ও নয়—বাছুর ঠিকমত আটকানো ছিল, বড়গিন্নি নিজে [illegible]

ঢুকিয়েছিলেন, সকাল থেকে কতবার দেখে এসেছেন।

রমণী দাসী প্রণিধান করে বলল, বুঝেছি, দাঁড়াস সাপের কম্ম বাঁট কানা করে গেছে। হচ্ছে এই রকম আজকাল। নুটে গুনীন আসুক—সে ছাড়া হবে না।

দাঁড়াস সাপ ভারী চতুর। মাঠে গরু বাঁধা, গরুতে ঘাস খাচ্ছে, দাঁড়াস গড়াতে গড়াতে এসে পিছনের দুই পায়ে জড়িয়ে যায় দড়ি দিয়ে পা বেঁধে ফেলার মতন। গরুর আর চাঁট মারার উপায় রইল না। সাপ তারপরে মাথা তুলে বাঁটে মুখ লাগিয়ে টেনে টেনে মজা করে দুধ খেতে লাগল। খেয়ে চলে যায়। এমন টানা টেনে গেছে দুধ আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই বাঁটে। বাঁট কানা করা বলে একে। ঝাড়ফুঁকের ওস্তাদ নুটোর শরণ না নিয়ে তখন উপায় থাকে না।

রমণী বলে গুনীন এসে জল পড়ে দেবে। ফ্যানের সঙ্গে জলপড়া খাইয়ে দিলে বাঁটে ফের দুধ আসবে। মোড়লপাড়ার যদুর গাইয়ের ঠিক এই হয়েছিল।

বুধিকে আশফল তলায় বেঁধে শিশুবর বুধি পুঁটিকে নিয়ে মাঠে চলল। গাইয়ের পিছনে পিছনে বাছুর। ধান কেটে-নেওয়া দেদার মাঠ। খুঁটো পুঁতে পুঁতে সকাল-বেলা সেখানে অন্যগুলোকে বেঁধে এসেছে। দুধাল এই তিনটে কেবল বাড়ী ছিল। গোয়াল খালি এবার, বড়গিন্নি গোয়াল বাড়াতে ঢুকলেন। খালি গোয়াল বলা অবশ্য ঠিক নয়, ঘোড়ারা আছে। কমলের ঘোড়া, গুণতিতে দশটা-বারোটা হবে। ঘোড়া বের করে কমল বোধনতলায় রাখল।

গোয়ালে গরুর সঙ্গে ঘোড়া মিশাল—একটি-দুটি নয় ডজনের কাছাকাছি। তা বলে ঘাবড়াবার কিছু নেই। ঘোড়ারা নির্জীব—খেজুর-ডেগোর দু-হাত আড়াই হাত মাপের এক এক খণ্ড। ডেগোর মাথার দিকটা চওড়া, এবং বাঁকাও বটে—কাটারী দিয়ে সামান্য সুচাল করে নিলেই ঘোড়ার মুখের আদল এসে যায়। এক জোড়া কলার ছোটার এক মাথা ঘোড়ার মুখের সঙ্গে, আর মাথা পিছন দিকে বাঁধা। দুই কাঁধের উপর দিয়ে দুই ছোটা তুলে দিলেই ঘোড়ায় চড়া হয়ে গেল। ঘোড়ার আর সওয়ারে সেঁটে রইল—পড়ে যাবার বিপদ নেই। আস্তাবলের ঘোড়া আপাতত বোধনতলায় এসে রইল—ঘাস নেই ওখানটা, ভুঁইচাঁপার ঝাড়। খায় তো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঐ ভুঁইচাঁপা ফুলই খেয়ে নিক।

বেলা হয়ে গেছে। দোওয়া দুধ বাটি-খানেক অলকা-বউ তাড়াতাড়ি বলক দিয়ে নিল। এই বারে সবচেয়ে যা কঠিন কাজ—দুধ খাওয়ানো টুকটুকিকে। আস্ত একখানি কুরুক্ষেত্রের ব্যাপার। আসন পিঁড়ি হয়ে কোলের উপর মেয়েকে শুইয়ে ফেলেছে। তার পর জোরজার করে পিতলের ঝিনুকে গলার ভিতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে—ফেলার কায়দা না পেয়ে বিচ্ছু মেয়ে গ্যাড়-গ্যাড় করে আওয়াজ তোলে গলার ভিতরে। কিছুতেই গিলবে না তো নাক চেপে ধরতে হয়। নিশ্বাস নেবার জন্য তখন হাঁ করে, দুধ ঢুকে যায় অমনি।

দুধ খাইয়ে অলকা আঁচলে মেয়ের মুখ পরিপাটি করে মুছে পুঁটির কোলে তুলে দিল। পুঁটি বলে, চলো টুকি, পাড়া বেড়িয়ে আসি আমরা। কাচপোকা ধরে টিপ কেটে কেটে রেখেছে—ঘরে নিয়ে বড় একটা টিপ এঁটে দিল টুকির কপালে। পুঁটে বলছে টিপ বড় না হলে নজরে আসবে না। রুপোর নিমফলটা খোলা ছিল, কোমর বেড় দিয়ে পরিয়ে দিল সেটা। পায়ে আলতা পরাল। এক ফোঁটা মেয়ে কতই যেন বোঝে, সারাক্ষণ চুপ করে আছে। সাজসজ্জা সমাপন করে মেয়ে নিয়ে পুঁটি পাড়ায় বেরুল।

বাড়িতে কাকে এসে ঠোকর না দেয়। নিমি পাহারায় আছে। রোয়াকে চাটকোল পেতে কাঁথার ডালা নিয়ে বসেছে—কাঁথা সেলাই ও বাড়ির পাহারা এক সঙ্গে হচ্ছে। সেলাই করতে করতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়, আঙুলে সূঁচও বেঁধে কখনো-সখনো। দুই বোনের এই বাড়ীর উপরেই এক রাত্রে বিয়ে হয়েছিল—গরবিনী বড়ি ড্যাং-ড্যাং করে চলে গেল, তার নামে সকলে আজও নিশ্বাস ফেলে। আর পোড়া নিমির মরণ নেই—বাপের বাড়ী দাসীবৃত্তি চেড়ী-বৃত্তির জন্য বেঁচেবর্তে রয়েছে। আজ না হোক, মা-বাপের অন্তে হবে ঠিক সেই জিনিস—বিনোর মতন হয়ে থাকতে হবে। এই সমস্ত ভাবে নিমি—ভেবে ভেবে খাপাটে হয়ে যাচ্ছে, একটুখানি ছুঁয়ে কথা বলার জো নেই। হাতের চুড়ি-খাড়ু কথায় কথায় ভেঙে ফেলে বলে, বিনোদিদি আমিও তাই। পাতের মাছ বিড়ালের মুখে ছুঁড়ে দেয়। ব্যাধিও ঢুকেছে—মাঝে মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মৃগী রোগের লক্ষণ মিলে যায়। গিরিশ সেন হেন বৈদ্য পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে দেখে গেছেন। দেখে-শুনে তেমন গা করলেন না। বললেন, গোঁসাইগঞ্জে পাঠিয়ে দাও, অষুধপত্তোর যত কিছু সেখানে। গিরিশ কবিরাজের রোগনির্ণয়ে কখনো ভুল হয় না। কিন্তু জামাই দুলালচন্দ্রের ঐ দশা—কেটে কুচি কুচি করে ফেললেও নিমি শ্বশুরবাড়ী মুখো হবে না।

একজোড়া কাঁথা সেলাই করছে সে—টুকটুকিকে দেবে। বউদির কোলের প্রথম সন্তান—গয়না জামা জুতো খেলনা, কত জনে কত কি দিচ্ছে। দামের জিনিস নিমলা কোথায় পাবে—ছেঁড়া কাপড় জোগাড় করে তার উপরে নানা রংয়ের সুতোয় কল্কা

ফল পাখি গাছ ঘোড়া মানুষ ইত্যাদি তুলছে। শিল্পকাজে নিমির জুড়ি নেই—কাঁথা সেলাই দাঁড়িয়ে পড়ে দেখতে হয়, পলক ফেলতে মনে থাকে না। লেখাও তুলবে, কয়লা দিয়ে কাপড়ের উপর ছকে নিয়েছে ঃ আদরের ঠাকুরাণীকে অভাগিনী পিশিমার উপহার। দেখে অলকা রাগ করেঃ কক্ষনো না। অভাগিনী মুছে দাও ও আমি লিখতে দেবো না। তোমার জিনিস সকলের সেরা। কাঁথায় আমি মেয়ে শোয়াবো না, পাট করে তুলে রেখে দেবো। মেয়ে বড় হয়ে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাবে, সকলকে দেখাবে ঃ পিসিমা আমায় এ জিনিষ দিয়েছিল।

বোতলের নারকেল তেল গলানোর জন্য রোয়াকে রেখেছে। • চুল খুলে দিয়ে অলকা খানিকটা তেল থাবড়ে চুলের উপর দিল। চানে যাবে, চান করে এসে হেঁসেলে ঢুকবে।

তরঙ্গিনী বললেন, মেঘের মতন ঘন এক পিট চুল তোমার বড়বউমা। কিন্তু বিধাতা দিলেই তো হল না, পাটসাট করে রাখতে হয়। সাজগোজের বয়স তোমাদের তো তোমার সে সব কিছু নেই, উদাসিনী যোগিনীর মতন বেড়াও। চুল ছাড়িয়ে তেল মাখিয়ে দিচ্ছি—ছটফট কর না, ঠাণ্ডা হয়ে বসো।

কবলে পড়ে গিয়ে বড়বউর ঠাণ্ডা হয়ে না বসে উপায় কি। চুল জটা-জটা হয়ে গেছে, তার ভিতর দিয়ে তরঙ্গিনী তৈলাক্ত আঙ্গুল চালাচ্ছেন। টেনে টান পড়ে আঃ আঃ করছে সে, আর যন্ত্রণায় হাসছে। বলে, কাঁচা চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে ছোটমা।

নিষ্ঠুর তরঙ্গিনী বললেন, যাক। যত্ন করবে না তো কি দরকার চুল রেখে। চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাথায় টাক করে দেবো। এয়োস্ত্রীর মাথায় ক্ষুর ঠেকান যায় না, নয়ত নন্দ পরামাণিককে দিয়ে মাথা ন্যাড়া করে দিতাম।

বলে হেসে পড়লেন তিনি।

কাঁখে ভরা-কলসি ভিজে-কাপড়ে সপ-সপ করতে করতে বিনো পুকুরঘাট থেকে ফিরল। এঁরা চানে যাচ্ছেন, তারই তোড়-জোড় হচ্ছে—একলা সে ইতিমধ্যে কখন গিয়ে পড়েছিল, সেরেসুরে ফিরে এলো।

রান্নাঘরের দাওয়ায় কলসি নামিয়ে বিনো গামছায় মাথা মুছছে। তরংগিনী বললেন, পাথরের গেলাসে রস রেখেছি। পেঁপে কলা মুগের অংকুর বাতাসা আছে। খেয়ে নে আগে। আমরা চান করতে চললাম। ততক্ষণ তুই লাউটা কুটে রাখিস। বেশ জির-জিরে করে কুটবি, ঘণ্ট রাঁধব।

যা ভাবা গিয়েছিল—বিনো বলল, রাঁধব তো আমি।

তাই বই কি! কাল একাদশীর কাঠ—কাঠ উপোস গেছে—সাত তাড়াতাড়ি নেয়ে-ধুয়ে এসে উনি এখন উনুনের ধারে চললেন। আমরা যেন কেউ নেই, হাতে যেন কুড়িকুষ্ঠ আমাদের—

বিনো বলে, একদিনের উপোসে মানুষ মরে না। তা-ও জলপানের তো গন্ধমাদন গুছিয়ে রেখেছ।

তরংগিনী অধীর কণ্ঠে বললেন, ওসব জানিনে। কথার অবাধ্য হবি তো—আমি বলে যাচ্ছি বিনো, ফিরে এসে তোর এ-কলসিসুদ্ধ জল উনুনে উপুড় করব। বুঝবি তখন।

বিনো কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, নিত্যি-দিন তোমার একটা করে অজুহাত ছোট-খুড়িমা—

তরংগিনী কিঞ্চিৎ করুণার্দ্র হয়ে বললেন, আচ্ছা, রাতে রাঁধবি আজ তোরা—তুই আর নিমি দুজনে। নিমিটাও প্যান-প্যান করে। কথা হয়ে রইল, বাস। এখন গোলমাল করতে যাবিনে।

একই রান্নাঘরের এদিকটা আঁশ হেঁসেল, ওদিকটা নিরামিষ। আঁশে-নিরামিষে কদাপি না ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। খুব সামাস্যঃ মুক্ত-কেশী মাঝেমধ্যে আসেন—এ বাবদে বড় কঠিন পাত্র তিনি। আঁশের ছোঁয়া লাগলে নিরামিষ হেঁসেলের উনুন পর্যন্ত দুষে যাবে, ঐ উনুনের রান্না ইহজন্মে তিনি মুখে তুলবেন না। আর ঐ যে সেদিনকার মেয়ে বিনো—নিমির চেয়ে সামান্য পাঁচটা সাতটা বছরের বড়—মুস্তো ঠাকরুনের উপর দিয়ে যায় সে। তিলেক অনাচারে রেগে কেঁদে অনর্থ করবে। তরংগিনী নিজে তাই নিরামিষ হেঁসেলে থাকেন, আঁশ দিকটায় বড় বউ অলকা।

(ক্রমশঃ)

কবিতা

বোঝা গেল না ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ঐ তো চৈত্র, ঐ আমার বয়স হারানো মাস।
ধুলো, ক্লিষ্ট পাতা, ঝরা পরাগের উত্তরফাল্গুনী,
আমার তো পায়ে না তাকিয়ে হাঁটার অভ্যাস
তাই নিজের চিহ্নও চোখে পড়ে না; কেন যে আমি
মেঘের প্রথায় উঠে ফিরতে পারি না নদীটিতে! শুনি
অনেকেই নাকি পারে!
যেমন অরণ্যরাত্রে খুনী
বাঘ তার হিংসাকে খোঁজে, আমি তেমনই নৃশংস
খুঁজেলাম একটি ক্ষুধা, তীব্র মুখর শরীরের নীরব মানুষী অংশ:
হাতে পেলেই তাকে ছুঁড়ে মারি আকাশে, সে
মৃত্যু শিখে নক্ষত্রদীপনে হাসে,
তাকে শুশ্রূষার মতো নিসর্গের পাশে
নামিয়ে আনলেই বন্দকণ্ঠে যায় শোনা
ওকি এলো ও কি এলো না, বোঝা গেল না।

সত্যি কি যায় নি বোঝা? দ্যাখো
প্রতিটি অধীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েও আর
উৎসে ফিরছে না, হয়তো আমি অধিকার
করতে পারতাম পাহাড়, অথচ একা
খর্ব টিলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি জীবনের
গ্রহণ বর্জনহীন দীন সূর্যাস্তের!
বয়স বাড়ছে হে পৃথিবী আমি তো প্রায় প্রবাসী
হয়ে এলাম: এখন
কার না ধুলোয় শুতে সাধ হয় অভিমানী শিশুর মতন।

চলো, উঠে দাঁড়াও সোজা হয়ে ॥ অজয় সেন

ক্রমশঃ তারা দৌড় শুরু করে, বিচিত্র শস্যক্ষেত্রের ভিতরে
পড়ে যায় ব্যবহৃত কাগজ, প্রয়োজনীয় চিঠি
তাদের গোপন জায়গা থেকে
স্বভাবক্ষিপ্র অন্য মানুষেরা হেঁটে আসে কুড়োনোর জন্যে
রঙীন জীবনের লোভে—
ঠিক এভাবেই হয়তো কবিতা লিখতে পারি, লিখতে পারি সেইসব
মানুষদের অদ্ভুত কান্ডকারখানা।

এক সন্ধেবেলা অন্ধকার ঘরের কোণে জ্বলে ওঠে শাদা মোমবাতি,
মাথার আনাচে কানাচে ঘুরপাক খায় অসহ্য ধ্বনি,
একরাশ শব্দের সংসারে "মানুষ, মানুষ" চেঁচিয়েছি এতকাল—অথচ
কি দিয়েছে ঐ মানুষেরা আমাকে?
মুঠোভর্তি বিষণ্ণ শব্দ ও তাদের নিকোনো চরিত্তির—যা আমাকে
সেই মানবসকলের বিপক্ষে দাঁড় করায় আজ।

এই আমি, দার্দান্ত, বেপরোয়া, যে আমি আমার কাছেও
নত হইনি কোনদিন
অথচ অদ্ভুত এক আগন্তুকের কাছে খুলে রাখছি
আমার সমস্ত আবরণ
তার পায়ের কাছে রেখে দিচ্ছি আমার অহং আর চশমা
ঐ নিঃশব্দপ্রিয় আগন্তুক এ সময় পথ দেখায় আমাকে—বলে—
"চলো, উঠে দাঁড়াও সোজা হয়ে"।

ঐ কাগজের মুখ ॥

সুমিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কাালেন্ডারটা সরিয়ে নাও
ঘড়িটা উল্টে রাখ
চেয়ারটা পশ্চিমে ঘোরাও
পর্দাটা ছিঁড়ে ফেল।
টেবিলের ঐ ছবি সরিয়ে ফেল ওখান থেকে,
ইচ্ছে হলে কাউকে উপহারও দিতে পার।
নাম সই যখন আছে, তখন ওটা নিতে
অনেকেই হাত বাড়াবে।
আমারও খুব লোভ ছিল,
ওর চোখের মধ্যে সাঁতরে বেড়াবার
ওখানে তো অনেক জল
রোদ পড়লে চকচক করে
তখন দেখতে সত্যিই সুন্দর লাগে।
তোমরা ভাবো ও হলো মনীষীর মেধার রঙ।
যাক যা ভাল বুঝবে তাই ভাববে।
তবু নীল নাকি ওর খুব প্রিয়
তাই সারাদিন আমি আকাশ দেখি না
শুধু পাখিরা যখন নীড়মুখো
সমুদ্র পেরিয়ে উড়ে যাই
ওর আলিঙ্গনে ডুবতে।
ঘড়ি দেখলে কান্না পায়।
ক্যালেন্ডার দেখলে জ্বলন্ত যন্ত্রণায় পুড়তে থাকি
মুখ দেখবো কার?
ও তো কাগজের মুখ।

সমাজ বিবর্তনের একটি অধ্যায়

হেমচন্দ্র ঘোষ

কায়স্থ জাতির উৎপত্তি নিয়ে অনেক বাক-বিতন্ডা আছে। ব্রাহ্ম পাদাংশ থেকে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি এ মত এক পক্ষের। আবার কারো মতে কায়স্থরা ক্ষত্রিয়াচার-সম্পন্ন চিত্রগুপ্তের বংশজ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। আপাতত সেই বিসংবাদে আমরা যাচ্ছি না।

মধ্যএশিয়া থেকে এদেশে এসে আর্যরা তাদের সাধনা ও কৃষ্টি স্থানীয় জনগণের মধ্যে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা শুরু করে। এটাকে বলা হয় বৈদিক যুগ। বৈদিক যুগের শক্ত খুঁটি নড়িয়ে দেয় বৌদ্ধধর্মের লোকায়ত সহজ কর্মসূচী। বৌদ্ধধর্মের সংগঠন দক্ষতা ও প্রশাসন সহযোগিতা জনচিত্তে যে অনুপ্রেরণা এনে দেয় তার তুলনা বিরল। বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম এখনও ভারতের এক পুণ্যতীর্থ, অশোকের রাজত্ব কালে ভারতে বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হলেও বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর থেকেই বৌদ্ধধর্মের উজ্জ্বলতা ম্লান হতে থাকে। দ্বিধাবিভক্ত ধর্ম পতনের মুখে এগিয়ে চলে। মানুষ ফিরে আসে বৈদিক ধর্মে। যাগযজ্ঞের পুনঃ প্রতিষ্ঠা গিরিরাজের ক্রোড় থেকে সারা ভারতে নতুন ক্ষেত্র গড়ে তুলল। উত্তর ভারতে যে ধর্মের অভ্যুত্থান সেই উত্তর ভারতের বৌদ্ধধর্মের হল চিরঅবলুপ্তি। বাংলাদেশে তখনও বৌদ্ধধর্মের ছোঁয়াচ ছিল। উত্তর ভারতের রাজশক্তি বাংলাদেশে চিরআধিপত্য বিস্তার করে। সেই রাজশক্তি ধ্বংস করেন শূর বংশের প্রতাপশালী রাজা আদিশূর। তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের চিরবিশ্বাসী। যাগযজ্ঞের বৈদিক অনুষ্ঠান দেশের নৈতিক ক্রমোন্নতি সফল করার উদ্দেশ্যে আদিশূর কান্যকুব্জ (কনৌজ) থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনেন। তাদের সাহচর্যের জন্য পাঁচজন কায়স্থকে এদেশে আনেন আদিশূর। পাঁচজন কায়স্থ কেন এলেন একথা চিন্তা করলে এটাই মনে হয় কান্যকুব্জ থেকে অতিদূরে থাকতে হবে এবং রাজশক্তির সাফল্যের সংশয়তা চিন্তা করে ব্রাহ্মণ কায়স্থ পাঁচজনকে সঙ্গে নিলেন। ভৃত্য বলে নয় ধর্মকর্মে সহযোগী বা সহকর্মীর প্রয়োজন পড়ে। এই পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গদেশে কায়স্থ সমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। আদিশূর বেশী দিন রাজত্ব করতে সক্ষম হন নি। উত্তর ভারত বাংলাদেশে আবার হানা দিল—শূর বংশের পতন সুনিশ্চিত হল। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আর দেশে ফিরলেন না। বাংলাদেশেই রয়ে গেলেন। এঁরাই হলেন উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের জনক। যশোর খুলনার ইতিহাসে সতীশবাবু বলেছেন রাঢ় কথা আড়ের অপভ্রংশ। গঙ্গার পশ্চিম আড় অর্থাৎ পাড়ে রাঢ়দেশ। আদিশূরের কায়স্থরা রাঢ়দেশের উত্তরাংশে বসতি স্থাপন করলে তারা উত্তররাঢ়ী কায়স্থ বলে পরিচিত হল। শূর বংশের পতনের বহু পরে শশাঙ্ক হলেন বাংলার রাজা। অতিপরাক্রান্ত শশাঙ্ক উত্তর ভারতের রাজশক্তি দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। বাংলাদেশ নিষ্কন্টক হল। তখনকার দিনে মানুষের ধর্মপ্রবণতা ছিল অতি প্রবল। সনাতন ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠায় শশাঙ্ক উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। সারা ভারতে কান্যকুব্জ তখন জ্ঞান-গরিমায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল—যশোবর্মন রাজা—ভবভূতি তাঁর সভাকবি। যশোবর্মন শশাঙ্কের বিশেষ বন্ধু। পাঁচজন সহচর পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাংলাদেশে আনা হল। শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ বর্তমান মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে—তৎকালীন বাংলার উত্থান-পতনের পটভূমি। পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ তাঁদের বংশবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বেশীদিন একত্রে রাজধানীতে অবস্থান করা সম্ভব হয় নি। রাঢ়দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁরা বসতি স্থাপন করেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণের গোত্র নিয়ে কায়স্থ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৌদ্ধ যুগের অবসান ঘটলে বৈদিক ধর্মের সংঘাতে অথবা উৎপীড়নে যারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা আবার হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে কায়স্থদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এরা সামাজিক মর্যাদা পেলেন বটে, কিন্তু শশাঙ্কের আনিত ও আশ্রিত পঞ্চ কায়স্থদের সমকক্ষ হতে পারেন নি কিম্বা তাদের মত সম্মানের অধিকারী হতে পারেন নি। সেকালীন ঋষির গোত্রে ঘোষ, গৌতমে বসু, বিশ্বামিত্রে মিত্র, ভরদ্বাজে দত্ত ও গুহরা হলেন কাশ্যপ গোত্র পরিচিত। তখনকার দিনে সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা অত্যন্ত কঠোর ছিল। পঞ্চজন ব্রাহ্মণরাও রাঢ় দেশে রইলেন এবং তাদের বেদজ্ঞ সন্তানরা নবাগত কায়স্থদের মধ্যে আধিপত্য স্থাপন করে তাদের গোত্রে দীক্ষা দিলেন। গোত্রে বংশলতা নির্ধারণ করার অসুবিধে নেই। ব্রাহ্মণরা যেমন যাগযজ্ঞ নিয়ে ব্যস্ত কায়স্থরা অসিজীবী ছিলেন ও তাদের মসিজীবী বৃত্তি বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার আদর্শে তারা গৌরবান্বিত হন। দেশ জয়দীপে যদুনন্দন চিরবিখ্যাত হয়ে আছেন। এই অসিজীবী বৃত্তি পরবর্তী কালে বহু কায়স্থদের রাঢ় দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল।

শশাঙ্কের পর প্রায় তিনশ বছর কায়স্থ সমাজের কোন কর্ম প্রচেষ্টার কথা জানা যায় নি। এটাই কায়স্থ সমাজের অন্ধকার যুগ। শুধুমাত্র এইটুকু জানা যায় যে শশাঙ্ক বাসকী গোত্রের রামনাথ নামে এক শক্তিশালী ব্যক্তিকে দেগঙ্গার রাজা করে পাঠান। এই রামনাথের পরবর্তী বংশধররা রাজা মানসিংহের অনুগ্রহে প্রতাপের পতনের পর চোদ্দটি পরগণার অধিকার নিয়ে বরিশালের রায়ের কাটিতে বসতি স্থাপন করেন। এই সময়ে তারা পূর্বের গোত্র বদল করে বাসকী গোত্র গ্রহণ করেন। সুন্দরবনের উত্থান-পতন গঙ্গার বুকে নতুন নতুন দ্বীপের উৎপত্তি দেশ ও সমাজকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য হলেও বর্তমানে তার উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। বৈষ্ণব কবিরা বলেছেন—রাজার যে রাজ্যপাট যেন নাটুয়ার নাট: এই ছিল এই নাই। এগার শতকে বাংলার এই দশা ঘটে। শশাঙ্কের পর ছোট-বড় রাজ্যের উত্থান-পতনের পর বাংলাদেশে স্থায়ী রাজ্যের অধিপতি রাজা বিজয় সেন। বল্লাল সেন তাঁর কীর্তিমান পুত্র। কায়স্থদের মধ্যে সেন পদবী এখনও বর্তমান আছে। বল্লাল সেন বৈদ্য না কায়স্থ সে কথা উল্লেখের এখানে কোন প্রয়োজন নেই। রাজা যে বংশে জন্মান না কেন তার কুলের শ্রেষ্ঠত্ব সকলকে মেনে নিতেই হতো। বল্লাল সেনের রাজত্ব বিরাট-বিশাল। সুশাসনের প্রয়োজনে তিনি পাঁচ ভাগে ভাগ করলেন তাঁর রাজ্য—রাঢ় বরেন্দ্র বাগড়ী বঙ্গ ও মিথিলা। নবদ্বীপ গৌড় রামপাল হলো রাজ বসতি। বল্লাল নবদ্বীপকে বেশী পছন্দ করতেন। কল্লোলিনী গঙ্গা তাঁর ছিল বিশেষ আকর্ষণ। গঙ্গার বিক্ষুব্ধ বুকে চঞ্চল নৃত্যের মনোরম দৃশ্য বল্লালকে অভিভূত

করে ফেলতো। রাজকার্যের মধ্যে অবসর-বিনোদনে বল্লালের এই ছিল নৈমিত্তিক ব্যবস্থা। সেদিন বল্লাল গঙ্গার কূলে—একাকী। সূর্য তখনও গঙ্গার বুকটা রাঙিয়ে রেখেছে। বল্লাল দেখলেন—এক তরুণী তরণী বেয়ে তাঁর দিকেই আসছে। ক্রমে তরণী নিকটে এলো—তার বাহিকা এক নারী—উদ্ভিন্নযৌবনা — পড়ন্ত সূর্যের রক্তাভ আলোকছটায় উদ্ভাসিত তার ঋজু দেহলতা। বল্লাল মেয়েটির দিকে তাকালেন অপলক নেত্রে। ভুলে গেলেন তাঁর বিবাহের অতিক্রান্ত বয়ঃসীমা—তরুণীর উন্মুক্ত বক্ষের সম্মোহন শক্তি তাঁকে অভিভূত করে ফেললো—গঙ্গার সঙ্গে শান্তনুর পরিণয় সমুজ্জ্বল হয়ে বল্লালের চোখে ফুটে উঠলো।

—তুমি রাজরানী হতে চাও?

টোল-খাওয়া সুন্দর গোলাপী মুখে একটু হাসি ফুটে উঠলো—কেন হব না। কিন্তু আমার জন্ম যে নীচ কুলে। আমি জেলের মেয়ে।

রাজা ভাবলেন—কুল! ওটা তো মানুষের সৃষ্টি। নীচ বা উঁচু কুলের মাপকাঠি হতে পারে না।

রাজা মেয়েটিকে নিয়ে প্রাসাদে এলেন। অন্তঃপুরে প্রতিবাদের প্রবল ঝড় উঠলো—নবদ্বীপের পন্ডিতরা বিক্ষুব্ধ—রাজপুত্র লক্ষ্মণ সেন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলেন।

ব্রাহ্মণরা রাজার নিকট অসামাজিক বিবাহের কৈফিয়ৎ চাইলো। ক্রুদ্ধ রাজা তাদের বিতাড়িত করলেন। বললেন—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। কুলের মর্যাদা বিবেচিত হবে কৃষ্টির ভিত্তিতে—বল্লালের এই অনুজ্ঞা রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হলো। সবাই নিশ্চুপ, রাজ-অনুগ্রহে মর্যাদা—মর্যাদাই তো কুলের গৌরব। রাজার বিরুদ্ধে সকল প্রতিবাদ স্তব্ধ হয়ে গেল। ধীবর-রানী মহাখুসী। রানীর পরামর্শে যে এতখানি সুফল হবে বল্লাল তা ভেবে উঠতে পারেন নি। ধীবর-কন্যা বিবাহ বল্লালের হলো সমাজ সংস্কারের মূল নীতি। নবদ্বীপে হবে সর্বজাতির সমাবেশ। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য বৈশ্য আমন্ত্রণ করা হল। কারো মতে এই সম্মেলন বল্লালের আর্থিক সংকট মোচনের এক অভিনব পন্থা। এটা ঠিক সমর্থনযোগ্য নয়। তখনকার দিনের ব্রাহ্মণ কায়স্থদের আর্থিক সঙ্গতির স্বল্পতা একরূপ নিশ্চিত ছিল। বৈশ্যরা অর্থশালী। বল্লালের যদি অর্থ গ্রহণের মতলব থাকতো, তাহলে বৈশ্য সম্প্রদায়কে তিনি অর্থের বিনিময়ে সমাজে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। সুবর্ণবণিক গন্ধবণিক প্রভৃতি সম্প্রদায় তখনকার দিনে অজস্র ধনসম্পদের অধিকারী ছিলেন। কৃষ্টিই বিবেচিত হয়েছিল। আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নয়টি গুণের অধিকারীকে কৌলীন্য দেওয়া হল। কায়স্থদের মধ্যে ঘোষ বোস মিত্তির ও গুহ ক্রমিক শ্রেষ্ঠতায় কুলীন হলেন। কান্যকুব্জ থেকে আগত দত্তরা দুর্বিনীত বলে বিবেচিত হন। তাঁরা কৌলীন্য পেলেন না। তাঁরা অন্তর্দাহে আত্মহারা হয়ে পড়লেন কিন্তু কিছু করার নেই। নিষ্ফল আক্রোশে কুলীনদের হেয় করার উদ্দেশ্যে দত্তরা এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করলেন। তাঁরা দেশময় রটিয়ে দিলেন—

—'দত্ত কারো ভৃত্য নয় শুন মহাশয়,
সঙ্গে মাত্র আসিয়াছি এই পরিচয়।'

কুলীন কায়স্থরা তার উত্তর দিলেন—

'ঘোষ বোস মিত্তির কুলের অধিকারী
অভিমানে বালির দত্ত যায় গড়াগড়ি।'

দত্তরা পরবর্তী কালে কায়স্থ সমাজের অনুগ্রহ লাভ করেছিল। জীবনদর্শনে মানসিক উৎকর্ষ ও কৃষ্টির মান বৃদ্ধির উন্নতিকল্পে অকুলীন ঘরের মেয়েদের কুলীনের বাড়ী এনে তাদের সামাজিক শিক্ষার পথ নির্ধারণ করে দিলেন। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কিন্তু অকুলীন কন্যা বিবাহ করার নির্দেশ পেলেন না। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বেলায় বল্লালের অনুশাসন-বাক্য—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি অকেজো হয়ে রইলো। যারা অকুলীন তারা মৌলিক। তারা কায়স্থ সমাজে মূলীভূত ব্যক্তি। বল্লাল সমাজে তাঁদের স্থান দিয়ে গেছেন। দত্তরা কুলীন হতে পারেননি বটে কিন্তু তাঁরা মৌলিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।

সেকালে যৌথ পরিবার ছিল বাংলার এক বৈশিষ্ট্য। যিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ, তিনি পরিবারের কর্তা। কর্তার নির্দেশ অমান্য করার শক্তি কারো ছিল না—কর্তার ভ্রূকুটি সন্ত্রাস সৃষ্টি করতো। গণতান্ত্রিক যুগে হিটলারী ব্যবস্থা অচল। তখনকার দিনের সেই যৌথ পরিবার এখন নেই। বল্লালের কুলীন মৌলিক ব্যবস্থা সমাজের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে পারেনি বরং সামাজিক জীবন দুরপনেয় কালিমা লিপ্ত করে তুলেছিল। কুলীন মাত্র চার ঘর। বাহাত্তর ঘরের সৃষ্টি ও তাদের কন্যাদের জন্যে কুলীন ছেলে কেমন করে পাওয়া সম্ভব হবে? সমাজ-পদ্ধতি রক্ষে করবার জন্যে মৌলিক মেয়েদের বুড়ো কুলীন বরের গলায় মালা দিতে হতো। বুড়ো কুলীন বর ছাঁদনা তলায় কনের কচি মুখ দেখে বেশ কিছু খুসী হতো নিশ্চয় কিন্তু বর দেখে কনের অবস্থা কি হত? কুলীনের ছেলের বহু-বিবাহের কুফলে এসব মেয়েদের জীবনে ডেকে আনত সামাজিক গ্লানি।

উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজদের মধ্যে বিয়ের প্রচলন ছিল না। সামাজিক বিপ্লব ঘটানো খুব সহজ কথা নয়। পিতৃ-পিতামহের অনুষ্ঠিত পথ রক্ষণশীল দেশে এক কঠিন শৃঙ্খল। চিন্তাশীল শিশিরকুমার সমাজ-কল্যাণে পিতৃপুরুষের পথে এক বিরাট বিপ্লব আনেন হৃদয়বত্তার পূর্ণ বিশ্বাসে। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ সম্প্রদায়ের এক সুপাত্রের সঙ্গে শিশিরকুমার নিজের বোনের বিবাহ দেন। উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীর মধ্যে এই বিবাহই প্রথম অনুষ্ঠান। মাতৃভক্ত শিশিরকুমার বিয়েতে মায়ের সম্মতি নিলেন কিন্তু মেয়েটি কি সংস্কারমুক্ত ছিল? শিশিরকুমারের সম্ভাব্য মতবাদ কি? মানুষ্য জাতির ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করার কিম্বা সমালোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে মনীষীদের মতে বাঙ্গালী এক সংমিশ্রণ জাতি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের বহির্ভূত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন জাতির আগমন ও আক্রমণ তাদের সঙ্গে সহ-অবস্থান বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রে বুদ্ধি-মত্তার ক্রমবিকাশ সহজভাবে সম্ভব হয়েছিল। নদীর দুটি শাখার পুনর্মিলনে স্রোতের প্রখরতা বৃদ্ধি পায়। উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীর মিলন কায়স্থ সমাজকে সর্বগরিষ্ঠতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার সমুজ্জ্বল সম্ভাবনা শিশিরকুমারের এই চিন্তাধারা
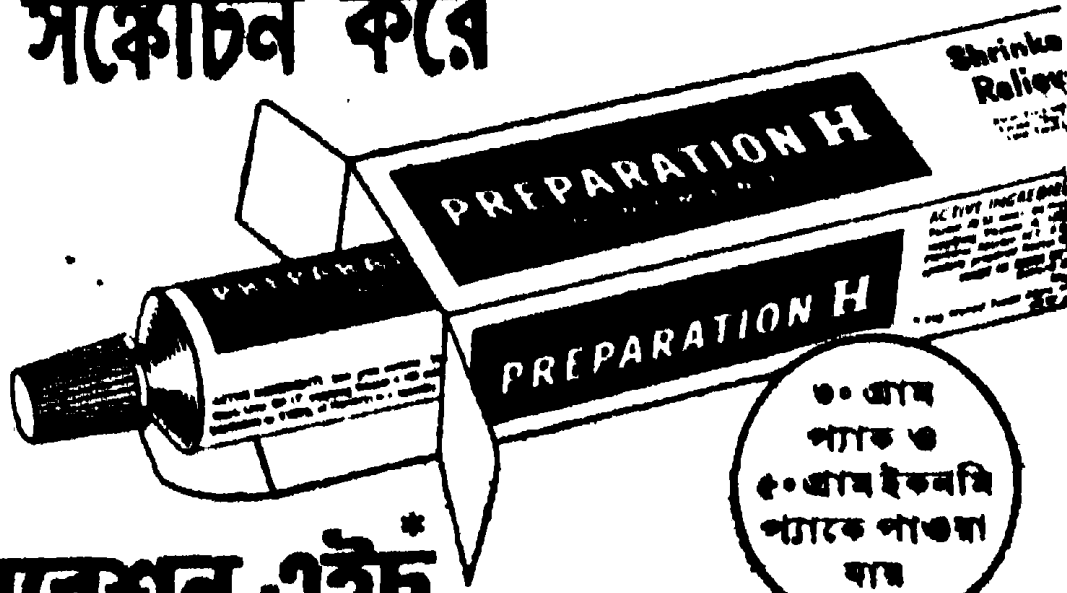
উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ পাত্রের সংগে নিজের ভগ্নীর বিবাহে প্রণোদিত করেছিল।

শিশিরকুমারের আর একটি সম্ভাব্য চিন্তাধারার কথা মনে আসে। জাতির অগ্রসর মনোবৃত্তি অজ্ঞতার অন্ধকারে মানুষকে পঙ্গু করে দেয়। উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীর মধ্যে আদানপ্রদানের স্বিগ্ধতা কল্যাণকর সমাজ গঠনের সহায়ক হবে। শিশিরকুমারের চিন্তাধারার আংশিক সাফল্য অস্বীকার করা যায় না। রাঢ়দের সংগে পূর্ব-বঙ্গের বঙ্গজ কায়স্থদের কোন আদানপ্রদান সংমিশ্রণ ছিল না।" নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গ রাঢ় দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই ছিল। পূর্ব বাংলায় মুসলমান অভ্যুদয় তাদের শাসন-কেন্দ্র হিন্দুদের সাহচর্যে অর্থনীতির কাঠামো গড়ে উঠেছিল। পূর্ববংগীয়দের রাঢ় দেশে না আসার এই ছিল প্রধান কারণ। পূর্ববঙ্গ সচ্ছলতার দেশ। মুসলমান শাসনে উভয় জাতির এক আন্তরিক ঔদার্য উভয়-জাতির ধর্মকর্মে প্রতিফলিত হত। ওরংজীবের পৌত্র আজিম হিন্দুদের বসন্তোৎসবে যোগ দিতেন। ওরংজীব গোঁড়া মুসলমান। তাঁর কানে কথাটা উঠলো। তিনি আজিমকে ভর্ৎসনা করলেন। শাসক শ্রেণীর সদ্ব্যবহার হিন্দুদের পূর্ববংগ ত্যাগ না করার অপর কারণে বংগজ কায়স্থরা পূর্ব-বংগে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসবাস করতে থাকে।

১৬৯৫ সালে রাঢ় দেশের এক অবিস্মরণীয় বিপ্লব তথাকার কায়স্থ সমাজকে বিচূর্ণ করে দেয়। রাজা কিষণ রায় তখন বর্ধমানের অধিপতি। শোভা সিং তার অধিনস্থ এক ক্ষুদ্র জমিদার। রাজার সংগে শোভা সিং-এর বিরোধ বাধলো। তখন মোঘল সাম্রাজ্য কায়েম হলেও আফগানরা স্থানে স্থানে বেশ শক্তি-শালী ছিল। উড়িষ্যার আফগান প্রধান রহিম খাঁ শোভা সিং-এর আমন্ত্রণে রাঢ় দেশ আক্রমণ করে। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর যশোর-ধূমঘাটের পরিবর্তে কসবা-যশোর (বর্তমান যশোর) মুঘল অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র রাঢ় দেশ যশোর ফৌজদারের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। রহিম খাঁ ও শোভা সিং-এর বীভৎস অত্যাচারে গংগার পশ্চিম কূল পর্যন্ত বিধ্বস্ত হতে থাকে। কায়স্থরা সাধারণতঃ অসিজীবী। তাদের ওপর নির্দেশ হল বিদ্রোহী সেনা-বাহিনী যোগ দিয়ে পূর্ণ গরিষ্ঠতা সম্ভব করতে হবে অন্যথায় জীবন নিয়ে কোন কায়স্থ আর রাঢ় দেশে থাকতে পারবে না। খণ্ড যুদ্ধে বর্ধমানের রাজা নিহত হলেন। তাঁর পুত্র জগৎ রায় পালিয়ে গেলেন। রাজার ধন সম্পত্তি শোভা সিং দখল করল। রাজ পরিবারে সকলে বন্দী হয়ে রইলেন। রাজকুমারী অপসরা সুন্দরী। শোভাসিং-এর লালসা-নিষ্ঠুর বিক্রমে রাজকুমারীর ওপর ধর্ষণের প্রচেষ্টা তার জীবন হানির কারণ হল। সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজকুমারীর নিভৃত কক্ষে শোভাসিং-এর অনুপ্রবেশ রাজ-কুমারীকে চঞ্চলা করে তুললো। বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকানো তীক্ষ্ণধার ছুরিকা রাজকুমারী শোভা সিং-এর হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ করে দিল।

রাজকুমারীও আত্মঘাতিনী হলেন। শোভা-সিং-এর মৃত্যুতে রহিম খাঁ হলো বিদ্রোহী দলনেতা। তার অমানুষিক অত্যাচারে দলে দলে মানুষ রাঢ় দেশ ত্যাগ করতে সুরু করে। এব্রাহিম খাঁ তখন ঢাকার নবাব—অপদার্থ শাসনকর্তা বিদ্রোহ দমন করার জন্যে যশোরের ফৌজদার নূর আল্লার ওপর আদেশ দিল। রাঢ় দেশ তখন যশোর ফৌজদারের কর্তৃত্বাধীন। নূর আল্লা নামে ফৌজদার। তার কাজ ছিল ব্যবসা করে অর্থ সঞ্চয় করা। সামরিক শৌর্য-বীর্য তার একটুও ছিল না। নূর আল্লা রাঢ় দেশে এলো বটে কিন্তু রহিম খাঁর বিরাট সৈন্য সমাবেশে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রাত্রের অন্ধকারে যশোরে ফিরে এলো। কায়স্থদের একটা বড় অংশ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দেশে রয়ে গেল। যারা বিদ্রোহীদের সাফল্যে সংশয়ান্বিত ছিলেন তাদের মধ্যে সন্ত্রস্ত রাঢ় দেশের অধিবাসীরা গঙ্গা পার হয়ে মোগল আশ্রয়ে নিরাপদ হবেন এই আশায় দেশ ছেড়ে চলে এলেন। রাঢ়বাসীদের দুর্দশার সীমা রইলো না। উচ্চ গণ্ডীর লোকের দুর্দশায় অভিভূত হয়ে পড়লেন।

এই সময়ে গঙ্গার উপকূলে বহু গণ্ড-গ্রাম বা শহরের সৃষ্টি হল। এটাই হাবলি শহর পরগণা। অনেকে গঙ্গার উপকূলে থাকা নিরাপদ নয় বিবেচনা করে যশোরের ফৌজ-দারে কাছে থাকা স্থির করেন। ভৈরব, কপোতাক্ষ, চিত্রা প্রভৃতি নদীর উপকূলে বসতি স্থাপিত হল। এই সব নদীর কূলে
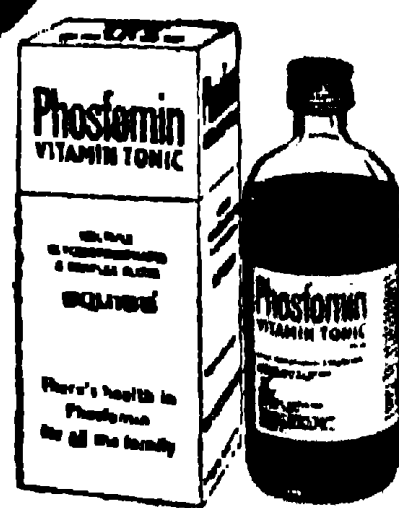
যাঁরা বসতি করলেন তাঁরা অধিকাংশই দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজভুক্ত। কাকচক্ষু কপোতাক্ষের কূলে যেসব কায়স্থ বসতি স্থাপন করেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই উত্তরকালে বংশগৌরবে সুবিখ্যাত হয়ে আছেন। কপোতাক্ষ তীরে পলুয়া মাগুরা গ্রাম। এই গ্রামে রাঢ় দেশের বালি থেকে আগত ঘোষ বংশ দেশমাতৃকার সেবাধর্মে জগতে সুপরিচিত হয়ে আছেন। শিশির-কুমার যশোরের উকিল হরিনারায়ণ ও মাতা অমৃতময়ীর তৃতীয় সন্তান অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। নিজের জীবন বিপন্ন করে দেশের শত্রু নীলকর সাহেবদের উপদ্রব থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করেন—দেশ থেকে নীলের চাষ উৎখাত হয়। পত্রিকার আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা ভারত তথা পৃথিবীর সাংবাদিক জগতে পত্রিকার সুদৃঢ় আসন একমাত্র তুষারবাবুর ঐকান্তিক চেষ্টা, দেশপ্রীতি ও মানবতার পূর্ণ আদর্শে সম্ভবপর হয়েছে। শ্রীতরুণকান্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ণ মন্ত্রী, প্রফুল্লকান্তি রাষ্ট্র-মন্ত্রী—এঁরা এই বংশের কৃতী সন্তান। অনেকের ধারণা এই ঘোষ বংশ বর্গীর হাঙ্গামার সময় যশোরে বসতি করেন কিন্তু গড়ে প্রতি পুরুষের পরমায়ু পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত মোটামুটি তিনশ' বছর হয়। বাংলাদেশে বর্গীয় হাঙ্গামা হয় ১৭৪০-৪১ সালে। ঐ সময় থেকে তিনশ' বছর যোগ দিলে ইংরেজের আমল এসে পড়ে, কাজেই ঘোষ পরিবার বর্গীর হাঙ্গামার পর যশোরে এসেছিলেন এটা ঠিক নয়। কপোতাক্ষের উভয় কূলে প্রতিষ্ঠাবান কায়স্থ পরিবারের বসতি এই সময়ে স্থাপিত হয়। ষোলখাদা, বল্লা, বিদ্যানন্দকাটী সাগরদাঁড়ি প্রভৃতি কায়স্থ-প্রধান গ্রামগুলি পরস্পর সামাজিক বন্ধনে সংযুক্ত হল। সাগরদাঁড়ি সাহিত্য জগতে অতি সুপরিচিত গ্রাম—মাইকেল মধুসূদনের জন্মভূমি। বিদ্যানন্দ-গ্রাম বহু কৃতী পুরুষের জন্মস্থান। হাই-কোর্টের জজ স্যার চারুচন্দ্র ঘোষের পিতা স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ এই গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি আলিপুর জজকোর্টের সরকারী উকিল ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী স্বর্গতঃ ডাঃ জীবনরতন ধর তাঁর অনুজ সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ নীলরতন ধর ঘোষ বংশের এ্যাটম এনার্জি বোর্ডের জিওলজিক্যাল শাখার ডিরেকটর ডঃ প্রকৃতি-কুমার ঘোষ ও অধুনা বিলাতে গবেষণারত ডঃ নীতীশচন্দ্র ঘোষ এঁদের সকলের পিতৃ-ভূমি ষোলখাদা গ্রামে। নেবুতলা মিত্র বংশের পারিবারিক ইতিহাস উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে পূর্ণ। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর মিত্র ও আইনসভার ডেপুটি স্পীকার নেতাজীর সহকর্মী স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রখ্যাত যোদ্ধা শ্রীহরিদাস মিত্র এই গ্রামের সন্তান। ইতিবৃত্ত লেখক শ্রীপ্রফুল্ল-কুমার মিত্র মহাশয় বর্গীর হাঙ্গামার যে তারিখ দিয়াছেন সেটা সঠিক নয়। বঙ্গাধিপ প্রতাপের বিরুদ্ধে মানসিং-এর অভিযান ও পরবর্তীকালে কুশারীর মাঠে বঙ্গসৈন্যের পরাজয় স্বাধীনতাসংগ্রামের সকল আশা নির্মূল করে দিল। প্রতাপের অধিকৃত সমুদয় ভূভাগ মোগল কর্তৃত্বাধীনে এলো ও কর্মস্থল হল বর্তমান যশোর শহরে। খুলনার তখন কোন অস্তিত্ব ছিল না। এ-নামের সঙ্গে কারো তখন কোন পরিচয় হয়নি। রাঢ় দেশ হতে বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থরা তখনকার দিনের যশোর ভূভাগে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সমগ্র যশোর জেলা দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের কুলীন ও বংশজদের বিরাট ঘাঁটি হল। কৃষ্টি, প্রতিভা, প্রতিষ্ঠা যশোরের বৈশিষ্ট্য। বিশ্ববরেণ্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথের পিতৃভূমি যশোরের দক্ষিণডিহী গ্রামে। প্রতাপের বিরুদ্ধে মানসিং-এর অভিযান—প্রতাপের আংশিক বশ্যতার স্বীকৃতি যশোর অধিপতির কয়েকজন নগণ্য কর্মচারী প্রভুর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ বিরাট জমিদারীর পত্তন করে। কৃষ্ণনগরের ভবানন্দ ও খড়িয়ার লক্ষ্মীকান্ত নিজ নিজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান নদীয়া জেলা তখন যশোরের একটা অংশ। রাঢ় দেশ থেকে বহু কায়স্থ রাষ্ট্রবিপ্লবে সন্ত্রস্ত হয়ে যশোরের এই অংশে বসতি করেন। হাঁসখালির বিশ্বাসরাও এই সময়ের লোক। নবাবের আস্থাভাজন ব্যক্তি তাই তাদের বিশ্বাস উপাধি। শিশিরবাবুর স্ত্রী কুমুদিনী এই বংশের মেয়ে। নীলদর্পণের সমাজচিত্র দীনবন্ধু মিত্রকে বাংলাভাষার জীবনকাল পর্যন্ত তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। ষোড়শ শতাব্দীর অন্তঃকাল। বঙ্গেশ্বর দাউদ শাহ দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করলেন। মোগল-পাঠানে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠলো। দাউদের বিশ্বস্ত কর্মচারী শ্রীহরি ও বসন্ত রায়কে সমুদয় ধনরত্ন অর্পণ

করলেন—যুদ্ধ জয় হলে যেরং দেবার নির্দেশ দিলেন। সুন্দরবনের যমুনা ইছা-মতীর উত্তাল তরঙ্গে অতি দুর্গম স্থানটি শ্রীহরি অতি উপযুক্ত বিবেচনা করেন। নগর গঠনের কাজ শুরু হয়।

পূর্ববঙ্গ থেকে তাদের বহু আত্মীয়স্বজন নতুন শহর যশোরে এলে শহর জমজমাট হয়ে ওঠে। এরা সব বঙ্গজ কায়স্থ—টাকী সমাজের অন্তর্ভুক্ত। স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই সমাজের লোক ছিলেন। নবাবী আমলে পার্সী রাজভাষা। পার্সী জানলে নবাব সরকারে চাকরী মিলতো। টোলে চলত পণ্ডিতদের তর্ক-বিতর্ক। পার্সী জানা ব্রাহ্মণ জাতে কুলে অপাংক্তেয় হতেন। ব্রাহ্মণদের নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্মই ছিল জীবনের আদর্শ। কায়স্থ সমাজ পার্সী ভাষা গ্রহণ করল নবাব দরবারে নবাব সরকারে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হন। ১৬৯০ সাল। এর আগেই ডাচ ফরাসী ইংরেজ এসে গেছে—তাদের উদ্দেশ্য বাংলার ধনরত্ন লুঠ করে নিজের দেশকে সমৃদ্ধশালী করা। সপ্তগ্রাম ছিল বাণিজ্যের রাজকীয় কেন্দ্র। গ্রেমক ইটালিয়ান। এই বাণিজ্য কেন্দ্রকে বলতেন

'Ganges Regia' Asiatic Researches কলকাতার মত সপ্তগ্রাম তখনকার দিনে ছিল বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্র। ডাচ ফরাসী এদের সঙ্গে সংযোগ রেখে কায়স্থ সমাজের এক বিরাট অংশ হাওড়া হুগলীর সন্নিকটের গ্রামগুলি ভরে তুলল। ইংরেজের ঠাঁই এখানে ছিল না। বাণিজ্য করা তাদের গৌণ উদ্দেশ্য মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশের রাজনীতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ। নবাব দরবারে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালেও তাদের ওপর কেউ সন্তুষ্ট ছিল না। গঙ্গার পশ্চিম পাড় হতে ইংরেজ তাই বিদায় নিল। জব চার্ণক তখন পাটনার ফ্যাক্টারীর অধিনায়ক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যেটুকু ব্যবসা ছিল তাতে কর্মচারীদের মাইনা মেটান যেত না। চার্ণক জায়গা খুঁজতে বেরুলো। সপ্তগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনও ছিল। গঙ্গার পূর্বকুল বর্তমান কলকাতা চার্ণকের হল পছন্দমত স্থান। জলা-জঙ্গলে ভরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি কুঁড়ে ঘর—তার বাসিন্দা ধীবরকুল। বাদা জঙ্গলে বাঘ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। হাঙর কুমীর ভরা গঙ্গার কোলে তারা রোদ পোয়াতে ডাঙ্গায় আসে। চার্ণক এখনে বসতি করল। এখানকার নিমতলা ঘাট ওটাই সুতানটীর ঘাট। গরমের দিনে চার্ণক তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়ে বৈঠকখানায় বেচাকেনা শুরু করে দিল। বিরাট অশ্বথ তলায় মাঝে মাঝে বাজারের বৈঠক বসত—জায়গাটাকে এখনও বৈঠকখানা বলে। জঙ্গল পরিস্কার করা শুরু হল—জলা ভরাট করাও চলল। গোল পাতার ঘরে কলকাতার ইংরেজদের প্রথম বসতি। বুদ্ধিমান চার্ণক নরম মাটিতে ফসল করার পদ্ধতি জানত। এই জলা জঙ্গলে কেউ এল না। এঁড়েদার এক অতিসুন্দরী অল্প বয়েসের বউকে সতী করতে শ্মশানে এনেছে। চার্ণক তাকে ধরে আনল কলকাতায়। ঐ বউটাকে চার্ণক বিয়ে করে সংসার পাতল কলকাতায়। ধীরে ধীরে কলকাতা গড়ে উঠছে। দিল্লীর দরবার থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কতকটা সুযোগ সুবিধে নিয়ে সারা বাংলায় ফলাও করে ব্যবসা শুরু করে দিল। কোম্পানীর কর্মচারীরাও ব্যবসা করার অনুমতি পেল কিন্তু তাদের অর্থের সম্বল ছিল না। দেশীয় লোকদের মুচ্ছুদ্দী বানিয়ে তাদের ঘাড় ভেঙ্গে ব্যবসার টাকা সংগ্রহ করে ইংরেজ কর্মচারীরা নানা রকম ব্যবসার সংস্থা গঠন করল। দেখতে দেখতে কলকাতা জাঁকিয়ে উঠল। ব্যবসার ধান্ধায় বহু লোক এসে পড়ল কলকাতায়—তাদেরও গোলপাতার ঘর। সুতানটি গোবিন্দপুর ও কালিঘাট এই তিনখানি গ্রামের সংযুক্ত নাম কলকাতা। বাগবাজার হতে দক্ষিণ কালিঘাট ও গঙ্গার কোল হতে সার্কুলার রোড পর্যন্ত আট মাইল দৈর্ঘ্য ও তিন মাইল প্রস্থের শহর।

চৌরঙ্গীর কোল থেকে পশ্চিমে গঙ্গা পর্যন্ত ইংরেজদের বড় বড় বাড়ী গড়ে উঠল—পার্ক এভিনিউ রোপওয়ে হোটেল নাচ-গানের ব্যবস্থায় শহর জমকে উঠল। তখনকার দিনের ইংরেজরা ধার্মিক না হলেও ধর্মের ধ্বজা—গীর্জেয় গিয়ে উপাসনায় উপস্থিত হত। কলকাতার এই অংশটাকে বলা হত হোয়াইট টাউন—নেটিভরা এখানে বাস করার অনুমতি পায় নি। মুচ্ছুদ্দীরা যাদের পয়সায় সাহেবরা ব্যবসা করে ধনবান হয়ে উঠল সেই সব মুচ্ছুদ্দীদের সন্ধ্যার আগেই হোয়াইট টাউন থেকে চলে আসতে হত। কলকাতার বাকী অংশটুকু ছিল নেটিভ টাউন। ১৭১৭ সালে দিল্লীর বাদশা ফরোক শাহ ইংরেজদের কিছু জমি দিলেন—কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকা। কিন্তু ইংরেজরা ফরোক শাহের নির্দেশমত জমিদারদের নিকট হতে ঐ শহরগুলি নিতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

(ক্রমশঃ)
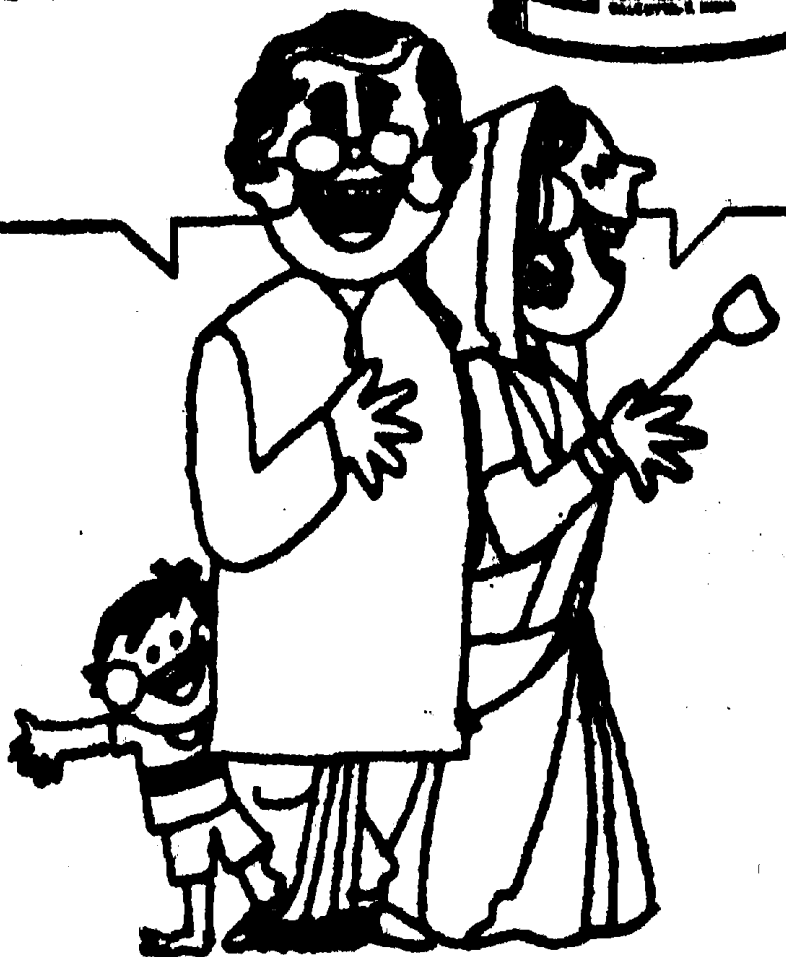
সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সারা বাংলা গল্প প্রতিযোগিতা

'অঙ্গীকার' পত্রিকাগোষ্ঠীর পরিচালনায় সারা বাংলা ছোটগল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোতে চলেছে। যোগাযোগের শেষ তারিখ ৩১শে মার্চ। যোগাযোগের ঠিকানা : সুভাষ বালিয়াল, গ্রাম ও পোঃ সোনারপুর, ২৪-পরগণা।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগারের পরিচালনায় সম্প্রতি চতুর্থ বার্ষিক নিখিল বঙ্গ বিতর্ক প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হোল। বিতর্কের বিষয় ছিল সভার মতে দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি প্রতিরোধে জনসাধারণের ভূমিকা বিশেষভাবে পালিত হয় নি। বিচারক-মণ্ডলীতে ছিলেন অশোক ঘোষ, সলিল রায়, অজিত মজুমদার, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করেন বিজয়লক্ষ্মী বর্মা, তপতী বসু ও রূপরতন দাশগুপ্ত।

পরলোকে মনোরম গুহঠাকুরতা

বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক মনোরম গুহ-ঠাকুরতা সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। শিশু সাহিত্যে তাঁর দক্ষতা যৌবনের প্রারম্ভেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং বাংলা সাহিত্যমহলে তাঁর পরিচিতি ঘটে। দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা শহরে অবস্থানকালে আশুতোষ লাইব্রেরীর ও প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। রবিনহুড, বনেজঙ্গলে, দেশবিদেশের লেখা, স্বামী বিবেকানন্দ, রিপভ্যান উইনকল প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে।

শিশু মেলা

তিনদিনব্যাপী এক শিক্ষামূলক শিশু-মেলা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হোল বালিগঞ্জ সরোজনলিনী প্রাকটিশিং স্কুলে। প্রায় ষাটটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই মেলায় অংশ নেয়। মেলার উদ্বোধন করেন শ্রীমতী আরতি দত্ত ও সভানেত্রী ছিলেন ডাঃ রমা চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমতী পারুল সেনগুপ্ত। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় এই মেলার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন।

পঞ্চকোটে মধুসূদন জন্মোৎসব

পুরুলিয়া জেলার পঞ্চকোট রাজ কাশীপুরে শ্রীমধুসূদন দত্তের ১৫১তম জন্মবার্ষিকী সম্প্রতি একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিপালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅশোক চৌধুরী। বাংলা সাহিত্যে শ্রীমধুসূদনের অসাধারণ অবদানের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন শ্রীবিমলকান্তি ভট্টাচার্য। কবিতা ও সঙ্গীত পরিবেশনে অংশ নেন কমল চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখী চট্টোপাধ্যায় ও পঞ্চকোট রাজ হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকটি এই উপলক্ষে অভিনীত হয়।

পরলোকে কবি যতীন্দ্র ভট্টাচার্য

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য সম্প্রতি কলকাতায় ৮৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

'শর্মিষ্ঠা' এখন সাগরপারে

শ্রীমধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের পাণ্ডুলিপি এখন চলে এসেছে আমেরিকায়। জানা গেছে জনৈক মার্কিন নাগরিক এদেশে সাহিত্যের গবেষণা করতে এসে মাত্র ৩০ হাজার টাকায় 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের পাণ্ডুলিপি কিনে নিয়ে গেছেন। এব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হয়েছে।

বাঙালী সমিতির অধিবেশন

২৮ ফেব্রুয়ারী বিহার রাজ্য বাঙ্গালী সমিতির ১৭তম বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয়। সমিতির প্রতিনিধি ও সদস্যদের উদ্দেশ্যে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষ বলেন সম্মেলনের উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন আছে। তিনি বলেন এই সম্মেলন কেবলমাত্র বাঙ্গালীদেরই নয় অন্যান্য সংখ্যালঘু শ্রেণীর অভাব অভিযোগও প্রকাশ্যে তুলে ধরতে সচেষ্ট।

সম্মেলনের প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীঘোষ বলেন আমাদের সংবিধান সংখ্যালঘুদের কতকগুলি অধিকার দিয়েছে। অতীতে যাঁরা ক্ষমতাসীন ছিলেন তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়ে এই অধিকার বোধকে জোরদার করেছিলেন।

শ্রীঘোষ আশা প্রকাশ করেন যে মাঝে মাঝে এই ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠান করে সংবাদপত্রে প্রচারের সাহায্য নিয়ে এবং যেখানেই সম্ভব সেখানেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করে যদি পরিস্থিতি যথাযথভাবে বোঝানো যায় তাহলে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সফল হয়ে উঠবে।

সম্মেলনে সারা রাজ্য থেকে চার শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দেন।

শ্রীঘোষ সম্মেলনে ছোট সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের একটি প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। উদ্যোক্তাদের এই ধরনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে শ্রীঘোষ প্রস্তাব দেন প্রদর্শনীটি কিছুদিন ধরে চলুক। সম্ভব হলে আবার যেন এ জাতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

শ্রীঘোষকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দেন পাটনা কমার্স কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ গুরুচরণ সামন্ত।

পরে সম্মেলনে ভাষণ দানকালে শ্রীঘোষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বিহার নাগরিক পরিষদের সভাপতি শ্রীরামলক্ষ্মণ সিং যাদব বলেন বিহারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে বাংগালীদের দান না থাকলে এক বিরাট ফাঁক থেকে যেত। বিহারের উন্নয়নে বাংগালীরা অংশ গ্রহণ করছেন না বলে যে অভিযোগ করা হয় তার প্রতিবাদ করে তিনি বলেন বাংগালীদের দান না থাকলে বিহারের বর্তমান অগ্রগতি সম্ভব হত না।

সভাপতির ভাষণে শ্রীবি মুখোপাধ্যায় বলেন সংখ্যালঘু ভাষাভাষী হিসাবে বাংগালীদের কয়েকটি বিশেষ সমস্যা আছে।

হিন্দীতে সঞ্চয়িতার অনুবাদক শ্রীহংসরাজ তেওয়ারী দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সকলকে এক হয়ে কাজ করতে আহ্বান জানান।

পরে সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বিহারের উন্নয়নে বাংগালীদের আন্তরিকভাবে কাজ করতে অনুরোধ জানান হয়। ঐ সংগে তাঁদের দাবী আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করার আহ্বানও জানান হয়।

সম্মেলনে প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডঃ শরদিন্দুমোহন ঘোষাল।

সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচীতে ভারতের সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের অধিকার সম্পর্কে এক আলোচনাচক্র। এতে অংশ গ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু।

উপগুপ্ত

নতুন বই
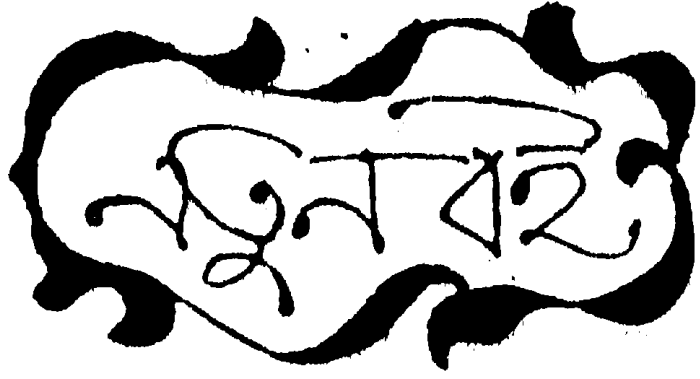
বাঙালী জীবনে বিবাহ : শঙ্কর সেনগুপ্ত ৩ আবদুল হামিদ (ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান) স্ট্রীট কলিকাতা-১ ১৯৭৪। মূল্য ৩০ টাকা।

বাঙালীর সংস্কার মুক্তির জন্য কিছু সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান দরকার। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সমাজাচার এবং বিবাহের প্রথা ও পদ্ধতির যৌক্তিকতা ও সার্থকতা বিচারও দরকার। বিশেষ করে প্রাক-বিবাহ ও বিবাহোত্তর যৌন-জীবনের রীতিনীতি সম্পর্কিত তথ্য জানা দরকার যা প্রায়শই সাধারণ আলোচনার অন্তর্গত হয় না। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বাঙালী জীবনের ঊষাকাল থেকে অত্যাধুনিক যুগ অবধি সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকল্পের মূল তাৎপর্য দ্বিধাহীন চিত্তে এবং ঋজুরেখ ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন নয়টি পর্বে। প্রত্যেকটি পর্ব তথ্যচয়নের নৈপুণ্যে ও মনোজ্ঞ বিশ্লেষণে অনবদ্য হয়েছে। আলোচনা কালে লেখক কোন বিশেষ মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেননি কিন্তু বিভিন্ন মতবাদের সমালোচনা করেছেন। অবশ্য এরূপ আলোচনায় দোষ-গুণ দুই-ই থাকা স্বাভাবিক তবে বর্তমান গ্রন্থে গুণই বেশী কোনো মতবাদ পক্ষপাত-দুষ্ট নয়। এটা নিশ্চয়ই গুণ।

বৈদিক যুগ থেকে উত্তর বৈদিক যুগের বাঙালীর ধ্যান-ধারণা এবং কর্মকাণ্ডের যে বিস্ময়কর অগ্রগতি দেখি তার পিছনে আছে এক বৃহৎ ঘটনা। অর্থাৎ অনার্যদের সংগে আর্যদের সাক্ষাৎ ও সমন্বয়। সমন্বয়ের প্রক্রিয়ায় একদিকে আর্যরা যেমন অনার্যদের থেকে গ্রহণ করেছে কিন্তু তেমনি নিজেদের বৈশিষ্ট্যও কিছু কিছু হারিয়েছেন। এই সমন্বয়ের প্রক্রিয়ায় কিভাবে বাঙালী একটি বিশিষ্ট জাতি হিসাবে গড়ে উঠেছে কিভাবে সে তার সমাজ ও পরিবার সংগঠনকে একটি বিশিষ্ট কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে পেরেছে তার সুন্দর সরস তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছেন লেখক সমাজ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। কৌতূহলী পাঠক সাধারণের জন্য তথ্যভিত্তিক সুরচিত এই গ্রন্থটি ছিল প্রতীক্ষিত।

গ্রন্থের সূচীপত্রের উপর চোখ বুলালে বাঙালীর সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের যে সামগ্রিক রেখালেখ্য দেখি তা আলোচ্য বিষয়ের উপর ভাল দখল না থাকলে বর্তমান অবয়বে প্রকাশ করা যেত না।

শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত অধ্যায় পরিকল্পনায় ও তথ্যবিন্যাসে তৃপ্তিকর মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। বহু তথ্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে উত্থাপিত করেছেন আবার বহু বিষয় বিশ্লেষণ ও বিচারের মারফৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। 'বাংলার মুখ' যিনি দেখেছেন তাঁর রচিত গ্রন্থ যে এরূপভাবে বাঙালীর অন্তরজীবন নিমজ্জিত হবে তা বলাই বাহুল্য এ গ্রন্থের সর্বত্রই আছে লেখকের পরিশ্রমী ও পরিণত বুদ্ধির প্রকাশ আছে নিষ্ঠার স্বাক্ষর।

আলোচ্য গ্রন্থে প্রথম পর্বে বাংলা ও বাঙালীর বর্ণনা, বিবাহ প্রথার উৎপত্তি ও বিকাশ। দেশে দেশেও বাঙালী জীবনে বিবাহের একটি ছক পাই। পরবর্তী পর্বে জাতি বর্ণ ও শ্রেণী পরিচয় প্রসংগে লেখক ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ নবশাখ সাহা শুড়ি নবশূদ্র কৈবর্ত মাহিষ্য হাড়ি বাগ্দী বাউরী চন্ডাল উগ্র ক্ষত্রিয় ব্যগ্র ক্ষত্রিয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় যুগী নাপিত প্রভৃতি ও বৌদ্ধ বৈষ্ণব মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম প্রভৃতির শ্রেণী বিন্যাস মর্যাদাবোধ ও ছোট-বড়োর ভেদাভেদের কথা তুলে ধরেছেন সামাজিক পটভূমিকা বিশ্লেষণান্তে। তৃতীয় পর্বটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এখানে বর্ণ বিভাগ ও সমাজ শৃংখলা নিম্ন ধর্মীয়দের মর্যাদাবোধ বা কৌলিন্য কুলজী গ্রন্থমালা ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ কুলজী সমীকরণ ও মেল বন্ধন ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ নবশাখ আদি জাতিসমূহের শাখা গোত্র প্রবরাদি বিষয়ক আলোচনা বাঙালীর পদবী বিষয়ক আলোচনা পঞ্জিকার শাসন লগ্ন দিন শুদ্ধাশুদ্ধ কালাদি নির্ণয় যোটক-বিচার এবং বিবাহ ব্যাপারে যাবতীয় নির্দেশ ও আদেশ সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এই আলোচনা থেকে শুধু এটাই জানতে পারি না যে কিভাবে হিন্দু বাঙালী পঞ্জিকা ও কৌলিন্য দ্বারা শাসিত এটাও জানতে পারি যে কিভাবে পঞ্জিকা ও মর্যাদাবোধ দ্বারা বাঙালী মুসলমানের বিবাহাদি কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যেও যে কিভাবে জাতিভেদ প্রথা প্রবল তাও আলোচ্য গ্রন্থে অনুল্লেখিত থাকেনি। সমাজ সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক বাঙালী মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ ব্রাহ্মণসমাজীদের উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন বলেই এ গ্রন্থের সমাজ-ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

পঞ্চম থেকে অষ্টম পর্ব অবধি লেখক যথাক্রমে হিন্দু বিবাহ বৌদ্ধ বিবাহ মুসল-

মানী বিবাহ খৃস্টান ও ব্রাহ্মসমাজী বিবাহ এবং আদিবাসী ও অন্যান্যদের বিবাহ তথা সাঁওতাল মুণ্ডা মাহালী লোধা শবর খেড়িয়া ওঁরাও বাউরী রাজবংশী কোচ লেপচা রাভা টোটো ও কুর্মী মাহাতোদের বিবাহের আচার-আচরণ ও বিবাহের বিধি পদ্ধতির বিবরণ পেশ করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন কিভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে পাত্র-পাত্রীর বয়স বিবাহের প্রকার ভেদ পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন রেজেস্ট্রী বিবাহ কালী-ঘাট বিবাহ প্রেমজ-বিবাহ কণ্ঠীবদল বিবাহ বিবাহ-বিচ্ছেদ নারীর উত্তরাধিকার ও অধিকার অ-বিবাহিত যুবক-যুবতীদের সমস্যা আচার আচরণ ও মন্ত্র স্ত্রী-পুরুষের অধিকার পর্দা তালাক পতিসেবা মনমালিন্য শয্যা-আচরণ দাম্পত্যকলহ এবং প্রেম-ভালবাসা দাম্পত্য-সুখ পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত এমন সব আলোচনা স্থান পেয়েছে যা তত্ত্ব ও তথ্যের আকর হিসাবে পরিগণিত হবে এবং পাঠক সাধারণের অভিনন্দন পাবে।

এযাবৎ কোন একখানি বাংলা গ্রন্থে সমগ্র বাঙালীর বিবাহের তথ্য সহ ঈদৃশ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। এই গ্রন্থ একদিকে যেমন বিবাহের উপহারে একটি সার্থক চয়ন তেমনি এটি প্রত্যেকটি শিক্ষিত সংস্কৃত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বাঙালীর অবশ্য পঠিতব্য। এ গ্রন্থ রচনা করে শ্রীশংকর সেনগুপ্ত পুনরায় স্বাদেশিকতার ও জাতি-প্রেমের যে পরিচয় দিলেন তার জন্য তিনি দীর্ঘদিন বাঙালী মনে অটুট থাকবেন বলে মনে করি।

ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র

সেই উন্মোচন : রমেন আচার্য। বই ঘর, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। চার টাকা।

পশ্চিমবাংলার তরুণ কবি রমেন আচার্যের প্রথম বইটি বার করেছেন বাংলা-দেশের প্রকাশক। তরুণ কবিদের কবিতার প্রতি তাদের অনুরাগের পরিচয় রয়েছে বইটির শোভন মুদ্রণে ও প্রচ্ছদ পারিপাট্যে। রমেন আচার্য পরিচ্ছন্ন কবিতা লেখেন। নিজের অনুভূতিকে আধুনিক শব্দের কারুকার্যে তা উপস্থিত করতে পারেন কুশলীর মতো। কবিতায় তিনি বুদ্ধিবাদী শব্দপ্রয়োগে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য পান। তাঁর কবিতায় নাগরিক ছিমছাম ভাবটিও বেশ সুন্দর ফুটে ওঠে। খুব মৌলিক হবার চেষ্টা যে তাঁর খুব বেশি তা নয়। তবে কোথাও অক্ষম অনুকরণও নেই। আধুনিক কবিতার মেজাজ তিনি আয়ত্ত করেছেন এবং সব কটি কবিতায় তিনি দক্ষতার সঙ্গেই তা প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি একটু বেশি সপ্রতিভ : লাগসই কথা বলার জন্য যেন সব সময়েই প্রস্তুত। তার চেয়ে আত্মমগ্ন নির্লিপ্ততাও কি কবিতার কাছে কম লোভনীয়? 'বড় অনটন তাই সঞ্চিত নিশ্বাস ভেঙে ভেঙে হাত খরচ চালানো।' —একটু বেশি সাজানো বৈকি। তার চেয়ে 'ফুলের মালায় সাপ। বেদনা এনেছো কেউ ভুল করে ভালোবাসা ভেবে।' এইসব পংক্তি কবির হৃদয়কে অনাবৃত করে চেনায়।

সংকলিতা (কাব্য সংকলন)। সম্পাদক—কাশীনাথ ঘোষ। সন্দীপন প্রকাশনী, চাঁপদানী বৈদ্যবাটী হুগলী। ছ টাকা।

একটি বড় আকারের আধুনিক কবিতার সংকলন গ্রন্থ হল কাশীনাথ ঘোষ সংকলিত 'সংকলিতা' নামের গ্রন্থটি। গ্রন্থের প্রথম কবিতা স্বর্গত তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তার পর থেকেই যে সব কবি স্থান পেয়েছেন তাঁরা হলেন অন্নদাশংকর রায় প্রেমেন্দ্র মিত্র দক্ষিণারঞ্জন বসু শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। কিন্তু সংকলনটির প্রথম থেকে বহু নামী কবির কবিতা স্থান পেলেও গোটা সংকলনের কৃতিত্বের কোন পরিচয় পেলাম না। বহু অপরিচিত, সদ্য পরিচিত কবির কবিতা এতে স্থান পেয়েছে। অপাঠ্য বহু কবিতা থাকায় গ্রন্থটি বিরক্তি সৃষ্টি করে। কবিতাগুলি কি-ভাবে সাজানো হয়েছে? শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পর স্বর্গত বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দের কবিতা স্থান পায় কেন? রত্নেশ্বর হাজরা, অভিজিৎ ঘোষ ইত্যাদির পর মণীন্দ্র রায় কেন? ছাপা খুবই খারাপ, অজস্র ছাপার ভুল। কোন আধুনিক কাব্য সংকলন গ্রন্থ এভাবে হয় না করা উচিত নয়।

এখন এই রকম (গল্প সংকলন) : সমীরকান্তি বিশ্বাস। অধুনা সাহিত্য হালিশহর ২৪-পরগণা। চার টাকা।

মোট তেরোটি ছোট ছোট গল্প নিয়ে লেখক শ্রীসমীরকান্তি বিশ্বাস তাঁর 'এখন এই রকম' গল্প সংকলনটি আমাদের উপহার দিয়েছেন। গল্পগুলিতে লেখককে চেনা যায়। আত্মকেন্দ্রিক ভাব ও ভাবনা এবং আত্ম-অনুগত ভাষা শব্দ ও প্রতীক প্রয়োগ করে লেখক গল্পের ভাষায় আধুনিকতাকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। ছোট গল্প যে আত্ম-কথন অনেকাংশে গীতিকবিতার মত স্বগতভাষণ লেখকের ছোট ছোট গল্পগুলি তা প্রমাণ করে। মানুষ মুখোশ ও মুখিমর; আয়নায়; দুঃখী; অপেক্ষা; সত্তর দশকের কড়চা গল্পগুলি বুদ্ধিমান পাঠকদের রস-বোধ তৃপ্ত করতে সহায়ক।

পুরুষের প্রতি নারী (কাব্য সংকলন)। বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়, পোঃ পুরুলিয়া; জেলা—পুরুলিয়া। ছ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

লেখিকা বীণা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কবিতার পাঠকদের কাছে পরিচিত নাম। বিভিন্ন বিখ্যাত কাব্য সংকলনে আলোচ্য কবির কবিতা স্থান পেয়েছে।

দীপন (উৎসব সংখ্যা) : সম্পাদক—শ্রীরতি-রঞ্জন দত্ত। কারেন্ট বুক শপ ৫৭/সি কলেজ স্ট্রীট কলকাতা-১২। চল্লিশ পয়সা।

বিশেষ বুলেটিন হিসেবে 'দীপন' পত্রিকার উৎসব সংখ্যাটি সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে। এতে বিজয়া দশমী উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাণী ঠাকুর অনুকূল-চন্দ্রের একটি দীর্ঘ কবিতা যেমন আছে তেমনি ঠাকুর সম্পর্কিত ও অন্যান্য শিক্ষা ও ধর্মমূলক বিষয় নিয়ে রচনা লিখেছেন পদ্মশ্রী কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজাপদ দাস অধ্যাপক গৌতম চক্রবর্তী প্রদীপ দাস। পত্রিকাটি ধর্ম ও শিক্ষামূলক।

চিঠিপত্র

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ চাহিদা ও সরবরাহ

স্বল্পমেয়াদী হলেও গত কয়েকদিনের লোড শেডিং বা কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে ঘটনা কলকাতার বিদ্যুৎ চাহিদা ও সরবরাহ সম্পর্কে আবার কয়েকটা মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেছে। গত চার পাঁচ মাস ধরে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ও বন্টনকারী সংস্থাগুলির সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত উদ্যোগে অবস্থার সন্তোষজনক উন্নতি হয়েছিলো সন্দেহ নেই। বর্তমানের ঘটনাগুলো দুর্ঘটনা হলেও দুঃখ ও উদ্বেগজনক। বিশেষত দুর্গাপুরে যখন অপ্রত্যাশিতভাবে ঘন ঘন এ রকমটি ঘটছে। আগামী কয়েক বছরে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমাদের কতটা উদ্যোগী হতে হবে এটা তারই ইঙ্গিতবাহী।

প্রথমতঃ ধরা যাক চাহিদার দিকটা। পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত চাহিদা কত এবং কিভাবে তা বাড়তে পারে সে সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। অবশ্য প্রকৃত চাহিদা ব বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা যথেষ্ট দুরূহ। যথা অনেক শিল্পপতি হয়ত বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থার উন্নতি ঘটলে তবেই শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হতে পারেন কিংবা সরবরাহ বাড়লে অনেকে হয়ত স্টোভ বা উনুনের বদলে হীটার ব্যবহার করবেন। এ ধরণের চাহিদার প্রকৃত পরিমাণ আগে থেকে ঠিক করা কষ্টসাধ্য। সাম্প্রতিক বিদ্যুতের প্রায় ৭০% ব্যবহৃত হয় কলকাতা, দুর্গাপুর ও তার আশেপাশের শিল্পাঞ্চলগুলিতে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের যা হিসাব দেখছি তাতে আগামী কয়েক বছরে এইসব অঞ্চলেই শিল্প স্থাপনের হার বেশী হবে। জেলাগুলিতে কিছু ক্ষুদ্র শিল্প বা মিনি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হলেও বৃদ্ধির সিংহভাগ যাবে এতদিনের ব্যবহারকারীদের কাছেই। সম্প্রতি সিদ্ধার্থবাবু বঙ্গীয় বণিকসভায় যে প্রায় ১১৬টি চলু বা পরিকল্পিত উদ্যোগের কথা বলেছেন যেগুলি বিদ্যুতের অভাবে সম্প্রসারিত হতে বা উৎপাদন চালু করতে পারছে না তার অধিকাংশই কলকাতার আশে পাশে। কারণ, জেলাগুলিতে বা দুর্গাপুরের কাছাকাছি যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বা ডি পি এল ও ডি ভি সি-র সেখানে গত কয়েক মাস বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রায় অব্যাহত রয়েছে। বর্মণ কমিশন কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা বলতে গিয়ে এদিকটা তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ বাংলার বিদ্যুৎ চাহিদার কথা বলতে গেলে স্বভাবতই এবং যুক্তিযুক্তভাবেই কলকাতার কথাটাই প্রধান বলে মনে হয়। কলকাতার বর্তমান পূর্ণ চাহিদা (অর্থাৎ যদি ব্যবহারের কোনো বিধিনিষেধ না থাকে) দৈনিক গড়ে ৫৫০—৫৯০ মেগাওয়াট। গত কয়েক বছরে (১৯৬৮—১৯৭২ যখন লোড শেডিং শুরু হয়) চাহিদা বৃদ্ধির হার ৬—৮%। অবশ্য ১৯৭২-৭৩ সালে বিদ্যুতের ব্যবহার (২৮৯৬ মিঃ ইউনিট) ১৯৭১-৭২-এর তুলনায় (২৭০৪ মিঃ ইউনিট) বাড়ে মাত্র ৩%। যদি বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ের দিকটাও ধরি তাহলেও বৃদ্ধির হার শতকরা ১০ এর বেশী নয়। কারণ (১) গত কয়েক বছরে এর বেশী বৃদ্ধি কখনও হয় নি। (২) গত কয়েক বছরে শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার (চাহিদার) শতকরা ৮-৬ এবং কৃষিক্ষেত্রে শতকরা ১০—১২ এবং কলকাতায় কৃষির জন্য কোন বিদ্যুৎ লাগেই না প্রায়। তাহলে শতকরা ১০ বৃদ্ধির হার হলে ৭৮।৭৯ নাগাদ চাহিদা দাঁড়াবে প্রায় ৮৫৫ মেগাওয়াট। শতকরা ১২ হলে ৯৪৩ মেগাওয়াট অর্থাৎ পাঁচ বছর বাদে কলকাতায় প্রায় ৯০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। সি ই এস সি সম্প্রতি বলছেন যে চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে ৭৫০ মেগাওয়াট। কিন্তু কিছুদিন হল বিদ্যুৎ পর্ষদ হিসেব করেছিলেন এটি দাঁড়াবে প্রায় ১০২০ মেগাওয়াটে। পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ৯০০ মেগাওয়াট সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করাই বিধেয়। তাছাড়া 'অধিকন্তু ন দোষায়'। হিসেবগুলো অবশ্য মেগাওয়াটে না দিয়ে ইউনিটে দিলে ভাল হয়। কারণ বিভিন্ন সংস্থা এক কিলোওয়াট স্থাপিত ক্ষমতা থেকে বিভিন্ন পরিমাণ বিদ্যুৎ পেয়ে থাকেন। যথা দুর্গাপুরে ২৮৬০ সি ই এস সি ৩৭২০ প্রভৃতি। (১ কিলোয়াট ইউনিট বছরে শতকরা ১০০ কার্যকারিতায় ৮৭২০ ইউনিট উৎপন্ন করতে পারে)। সি ই এস সি জানাচ্ছেন যে ৭৮।৭৯ নাগাদ তাঁরা ৪৫০ মেগাওয়াট মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারেন। নতুন যে সব ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা তাঁরা নিয়েছেন তার ফলে এবং সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে এটিকে সুসাধ্য বলে মনে হতে পারে। হয়তো পুরনো ইউনিটগুলিকে ঠিক মত মেরামত করতে পারলে আরও বেশী বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। তাহলে বাইরে থেকে সরবরাহ প্রয়োজন ৪৫০ মেগাওয়াটের মতো। ডি ভি সি ডি পি এল ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গড়ে দৈনিক প্রায় ২০০—২১০ মেগাওয়াট মতন সরবরাহ করেন কলকাতায়। আগামী কয়েক বছরে ডি ভি সিতে প্রায় ৪৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা স্থাপন করা হবে। তা থেকে প্রায় ৩৩০ মেগাওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে ক্ষমতা স্থাপিত হবে [illegible] ৫৫০ মেগাওয়াট (সাঁওতালডিহি ৩ [illegible] ১২০ মেঃ ওয়াট; ব্যাণ্ডেল ২০০ মেঃ ওয়াট)। ডি পি এল-এর ৬ষ্ঠ ইউনিট সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আর যন্ত্রপাতির যা অবস্থা তাতে হয়তো এ থেকে সরবরাহ আরও কমে যেতে পারে। কিন্তু তা হলেও বাকী দুটি থেকে বাড়তি বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে কমপক্ষে ৬০০ মেগাওয়াট। (যেহেতু সব ইউনিটগুলিকেই এক সঙ্গে চালানো যাবে না।) তার থেকে বাড়তি মাত্র ২৫০ (বা শতকরা ৪০) মেঃ ওয়াট কলকাতায় সরবরাহ করতে হবে। বাকীটা অন্যত্র চাহিদা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট। আর তা যদি নাও হয় ১৯৮০ নাগাদ সাঁওতালডিহির ৪র্থ ইউনিটে কোলাঘাটের প্রথম ইউনিট ও ফরাক্কার ইউনিট থেকে আরও প্রায় ৫২০ মেঃ ওয়াট বাড়তি ক্ষমতা পাওয়া যাবে। কিছুদিন আগেও ডি ভি সির মোট সরবরাহের শতকরা ৫৪ পেতাম আমরা! বর্তমানে এটি কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় শতকরা ২৯ বা তার কমে। আর তাছাড়া আগামী কয়েক বছরে বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশে যা ক্ষমতা স্থাপন করা হবে তার পরিপ্রেক্ষিতে ডি ভি সি এই বাড়তি বিদ্যুৎটুকু দিতে পারবেন আশা করা যায়। যেমন সালানপুরে রেল তার নিজের বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং টিসকো তার নিজের কেন্দ্র খুলেবে। কোল মাইনস অথরিটিরও নিজেদের কাজে (captive use) লাগানোর জন্য ঝরিয়ার কাছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র খোলবার পরিকল্পনা নিয়েছেন। যদিও ডি ভি সির উৎসাহব্যঞ্জক কাজের (গত কয়েক মাসে এটি তার ক্ষমতা ব্যবহারের হার বাড়িয়েছে প্রায় শতকরা ৭০) ফলে এটি শেষ পর্যন্ত হবে কিনা বলা শক্ত।

তাহলে এখন এখন দুটি কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। (১) বর্তমান কেন্দ্রগুলো থেকে যাতে আরও বেশী (অথচ প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখে—যা অবহেলা করলে আখেরে ভুগতে হবে) বিদ্যুৎ পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা। যেমন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ব্যাণ্ডেল কেন্দ্র গড়ে তার ক্ষমতার শতকরা ৫২—৫৪ কাজে লাগাতে পেরেছে। সি ই এস সিও জানিয়েছেন যে, শ্রমিক অসন্তোষ না থাকলে তাঁরা বর্তমানের ২২০ মেগাওয়াটের জায়গায় দৈনিক প্রায় ২৫০ মেঃ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারেন। (২) উপযুক্ত পরিবহণ বা Transmission এর ব্যবস্থা। গত কয়েক বছরে মোট বিনিয়োগের মাত্র শতকরা ১৯ নিযুক্ত হয়েছে এই ক্ষেত্রে। ফলে বাড়তি বিদ্যুৎ থাকা সত্ত্বেও কলকাতায় সরবরাহ করা যাচ্ছে না। শুধু তাই নয় ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে এখনকার ১৩২ কিলোভোল্ট অ্যাম্পিয়ার-এর চেয়ে বেশী শক্তিসম্পন্ন লাইন বসানো যায় কিনা তাও ভাবতে হবে। সম্প্রতি ডি ভি সি-র ভগত সাহেব বলেছেন ব্যাণ্ডেল-হাওড়া লাইন বসানো হলে অকটোবর-নভেম্বর নাগাদ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হয়ত অনেকটা শিথিল করা যেতে পারে। এর থেকেই এর গুরুত্ব অনুমান করা যেতে পারে।

সন্দেহ নেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের সমস্যা কেবলমাত্র 'paper capacity creation' বা 'Cold Statistics' -এর নয়। উপযুক্ত কয়লা শ্রমশান্তি প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি সব আছে। তবুও আমাদের দক্ষ কুশলী কর্মীরা যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে যে-কোন দায়িত্ব পালনে সক্ষম তা তো দেখেছি। আর আগামী পাঁচ বছরে যে অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করব তার পরিপ্রেক্ষিতে কাজের দুঃসাধ্যতা নিশ্চয়ই কমবে। সুপরিকল্পিতভাবে ও সুসমন্বয়ের মাধ্যমে অনেক অসুবিধে দূর করা যেতে পারে। যেমন এপ্রিল—মে মাসেও দৈনিক গড়ে সরবরাহ ছিল ৪২০—২৫ মেঃ ওয়াট। অথচ তখন গড় উৎপাদন ক্ষতি ছিল ১৫ কোটি টাকা মাসে। উপযুক্ত ও সুপরিকল্পিত চেষ্টার ফলে অক্টো-নভেম্বর নাগাদ এটি কমে দাঁড়ায় মাসে ৮০ লক্ষ টাকায়। সমাধান অবশ্যই করা সম্ভব বিদ্যুৎ সরবরাহ সমস্যার, আর এটুকু না করতে পারলে চিরকাল অনুন্নতির অন্ধকারেই থাকতে হবে যে আমাদের।

দেবাদিত্য চক্রবর্তী।
পদার্থ-বিদ্যা বিভাগ।
আই-টি-আই
খড়গপুর

টুসু গানে সমাজমন ও প্রেম চেতনা প্রসঙ্গে

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী অমৃত-এ শান্তি সিংহের টুসু গানে সমাজমন ও প্রেমচেতনা প্রবন্ধটি পড়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। শান্তিবাবু পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। শস্যোৎসব টুসু-গানে কিভাবে সমাজমন ক্রিয়াশীল তা তিনি তথ্যসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে নতুন আলোকে বিচার করেছেন। এজন্য তিনি সকলের কাছে ধন্যবাদার্হ।

পুষ্পরাণী মাহাতো
প্রধান শিক্ষিকা
কেন্দা আদিবাসী বালিকা বিদ্যালয়
পুরুলিয়া

(২)

গত ৮ই ফাল্গুনে ১৪ বর্ষ ৪১ সংখ্যা অমৃতে শান্তি সিংহ লিখিত টুসু গানে সমাজমন ও প্রেমচেতনা প্রবন্ধটির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। হুগলী জেলা ধনিয়াখালী থানার যেখানে এই টুসু উৎসবের প্রাধান্য অস্বীকার করা যায় না। সেইখানকার বাসিন্দা হয়ে এই টুসু উৎসব সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি বা দেখেছি তারই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বক্তব্য রাখছি। যে প্রসঙ্গটি এ প্রবন্ধে দেখলাম না তা হল—

লেখক লিখেছেন টুসু মূলত মেয়েদেরই পরব। কিন্তু টুসু উৎসবে পুরুষেরা বিশেষভাবে ছেলেরা ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে। মেয়েদের গানের সঙ্গে পুরুষেরা হারমোনিয়াম ঢাক ঢোল করতাল এবং মাদলও ব্যবহার করে। কারণ উৎসবটি মূলত নিম্নশ্রেণী বা সম্প্রদায় অর্থাৎ কুমী ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই ব্যাপকভাবে পালিত হয়।

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন সারা রাত্রি-ব্যাপী তিন থেকে বেজল বার পুজা করা হয়। লেখক লিখেছেন, টুসু হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক। কিন্তু শুধু তা নয়, লক্ষ্মীদেবী টুসুকে কন্যারূপে আবাহন করা হয়, পরে গানের মধ্য দিয়ে মাতার আসনে টুসুকে বসানো হয়। বাঙ্গালীর ঘরে মাতা ও কন্যার মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে দেবী টুসুও সেই-রূপেই এই মানুষদের কাছে। কারণ টুসু গানেই প্রকাশিত। যেমন—'আম গাছে আন বকুল দেখে/টুসু গেল কোলকাতা/আম পেকে আম ফুরিয়ে গেল/তাও তো টুসু এলো না। আবার ছোট্ট মেয়ে টুসুকে উদ্দেশ করে গাওয়া হয়—চল টুসু চল খেলতে যাবো/রাণীগঞ্জের বটতলা/ফিরবার বেলা দেখিয়ে আনবো/কয়লা খাদের জল তোলা। দেশের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় তাদের গানও। তাই মূল্যবৃদ্ধিও স্থান পায় ওদের গানে—টুসু তোম ধনে/কি দিয়ে পুজিব এই দুর্দিনে/খাদ্যাভাবে সবাই ভাবে/তোমার কথা নাই মনে।' লেখক সমাজমন ও প্রেমচেতনার কথা বললেও টুসু গানের মধ্য দিয়ে এই অশিক্ষিত মানুষদের ভিতরে কি করে পৌরাণিক কথা শোনানো হয় বা শেখানো হয় তা উল্লেখ করলেন না। একটি উদাহরণের সাহায্যে তা বোঝান যেতে পারে। যেমন অশোকবনে পাতের কুঁড়ে/সীতা পাশা খেলেছে/যোগীর বেশে রাবণ এসে/সীতা হরে নিয়েছে/সীতার অন্বেষণে/সোনার লঙ্কা পোড়াল হনুমান। অথবা—রাম না কিরে বনে যাবি/হাতে নেরে ধনুর্বাণ/চৌদ্দ বছর বনে থাকিব। চেয়ে দেখরে মায়ের প্রাণ। টুসু ভাসানু উৎসবের দিন দলীয় ঝগড়ায় গানে যে সামাজিক চিত্র ফুটে ওঠে তা কবিগানেরই লড়াই অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। টুসু গানের ভিতর দিয়েই এরা পায় জাগরণের মন্ত্র। বিমূর্ত করে তোলে প্রেম-বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছাকে মনের মত করে।

অনেকেরই মতে টুসু গান প্রাক্ আর্য সভ্যতার দান। কেউ কেউ বলেন মঙ্গলকাব্যের সময়ও এর সূচনা হয়নি। এই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ জানে বা বলে এবং গবেষকদেরও ধারণা টুসু হল মোগল আমলে নিম্নশ্রেণী বা সম্প্রদায়ের এক সুন্দরী নারী বা কন্যা যার উপর অত্যাচার করেছিল বাদশাহী সৈন্যরা। তাকে কেন্দ্র করেই নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা গড়ে তুলেছে এই অপূর্ব সংগীতাবলী। কিন্তু এই সংগীতধারাকে

রক্ষা করার দায়িত্ব কি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির নয়? এ গান তাদেরই গান যারা আছে মাটির কাছাকাছি।

চঞ্চল সিংহরায়
রোহিন্না, হুগলী।

বঞ্চিত গীতিকারের পক্ষে

গত ৭-২-৭৫ তারিখে জনৈক গীতিকারের লেখা 'আকাশবাণীর বঞ্চিত গীতিকার' শীর্ষক চিঠিখানিতে বেতার কর্তৃপক্ষের চরম ঔদাসীন্য ও অবহেলার যে সুস্পষ্ট পরিচয় বিশদভাবে পরিস্ফুট হয়েছে জানি না আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের সুপ্ত বিবেককে তা কতটুকু জাগ্রত করতে সক্ষম হবে।

আমি নিজেও একজন আকাশবাণীর অনুমোদিত গীতিকার। আমার অভিজ্ঞতাও উক্ত বিষয়ে পত্রলেখকের অনুরূপ। ১৯৭৩ সালে ১৪ই জুন তারিখে আমি কলকাতা বেতার কেন্দ্রের অধিকর্তার সঙ্গে গীতিকারদের রয়্যালটি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ পাই। উক্ত আলোচনার অংশবিশেষ কিছুদিন পর দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গীতিকারদের রয়্যালটির ব্যাপারে কেন্দ্রাধিকর্তা যে তাঁর প্রতিশ্রুতিমত কাজ করতে পেরেছেন তার প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেল। হঠাৎ রেডিও থেকে একটি অবাক-করা মণি অর্ডার আমার নামে আসে (৩১-১-৭৫) যাতে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ পর্যন্ত রয়্যালটি পাঠানো হলো বলে উল্লেখ থাকে। আশ্চর্যের কথা ১৯৭৩ সালের পূর্ববর্তী বছরগুলির রয়্যালটির কোন হিসাব উক্ত কুপনে উল্লেখ ছিল না। অমৃত-তে প্রকাশিত আকাশবাণীর বঞ্চিত গীতিকার চিঠিটি দেখার পর গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ তারিখে কেন্দ্রাধিকর্তার সঙ্গে দেখা করি এবং বেতারের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে রয়্যালটি প্রসঙ্গে আলোচনার সুযোগ হয়। আলোচনা করে বুঝলাম যে রয়্যালটির বিষয়টি রীতিমত গোলমেলে ও ধোঁয়াটে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ গীতিকার বন্ধুর কাছে শুনলাম যে তাঁদেরও অবস্থা একই রকম। এঁদের মধ্যে একজন গত ১৯৬৫ সাল থেকে আকাশবাণীর গীতিকার তালিকাভুক্ত। সঙ্গীত শিক্ষার আসরেও এর অনেক গান প্রচারিত হয়েছে অথচ গত ১০ (দশ) বছরের মধ্যে ইনি একটি পয়সাও পাননি। প্রসঙ্গত আরো একটি মজার কথা বেতার দপ্তর থেকে শুনে এলাম যে সঙ্গীত-শিক্ষার আসরে প্রচারিত কোন গীতিকারের গানের জন্য নাকি কোন রয়্যালটি দেওয়ার ব্যবস্থা হয় না। অথচ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত চুক্তিপত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলা হয়েছে।

অমৃত ৭-২-৭৫ তারিখে প্রকাশিত পত্রটির জন্য অজ্ঞাত গীতিকার বন্ধুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই অমৃত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে।

অরুণ সেন
কলি-৪।

রান্না করে দেখুন

৩৯ সংখ্যা অমৃত সাপ্তাহিকে শ্রীযুক্তা সাধনা মুখোপাধ্যায় কাঁচকলার দধিবড়া রান্না করে দেখতে বলেছেন। কাঁচকলার দধিবড়া করা যায়, কিন্তু তা খাওয়া যায় না। কারণ কাঁচকলার বড়ার মধ্যে দই ঢুকে সেটা কখনই নরম হয় না। দধিবড়া মুখে দিলে তার যে একটা বিশেষ স্বাদ পাওয়া যায় সেটা কাঁচ কলার বড়াতে কখনই পাওয়া সম্ভব নয়। কাঁচ কলা বেটে বড়া করলে সেটা বেশ শক্ত হয়। কাজেই দই-এর মধ্যে ফেললেও সেটা কখনই নরম হয় না।

আর একটি বিষয় লিখছি। গত সপ্তাহে বোধহয় শ্রীযুক্তা মুখোপাধ্যায় পেয়ারার জেলি ও জ্যাম-এর বিষয় লিখেছেন, দুটোতে তো কোন তফাৎ দেখছি না। একটাতে শুধু পেয়ারার দানা ফেলে সেদ্ধ করতে বলেছেন, আর একটাতে দানাসুদ্ধ সেদ্ধ করতে বলেছেন। আর লাল রং দিতে বলেছেন। পেয়ারা সেদ্ধ জল চিনি দিয়ে জাল দিলেই লাল রং হয়। পরে লেবুর রস বা সাইট্রিক এসিড দিলে জমে গিয়ে রংটা আরও লাল হয়ে যায়। সুতরাং আলাদা রং দিয়ে জেলি কখনও করিনি। আশা করি এ সমালোচনার জন্য শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় কিছু মনে করবেন না। তিনি রান্না করে দেখতে অনেক জিনিসই লেখেন কিন্তু আমাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারে ইচ্ছা থাকলেও যে সব রান্না করে দেখার সুযোগ হয় না। পড়তে ভালই লাগে।

বাণী রায়
কলিকাতা-৮৪

আশাপূর্ণা দেবীর গল্প

অমৃত' পত্রিকার গত ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৫ (১৭ মাঘ, ১৩৮১) সংখ্যায় শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর 'অথচ অবনীশ খারাপ ছিল না।' গল্পটি নিঃসন্দেহে একটি সুন্দর ছোট গল্প। গল্পটি পড়া শেষ করার পরও তার করুণ সুরটি আমাদের মনের তন্ত্রীতে অনুরণিত হতে থাকে। অবনীশের অসহায়তার ছবি আমাদের মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। ভদ্র ও শিক্ষিত অবনীশের মত আমাদেরও অনেক সময় এই রকম নির্জলা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়।

আশা করব এ রকম সুন্দর গল্প 'অমৃত' সম্পাদক মহাশয় আমাদের আরও উপহার দেবেন।

সুবিমল ভাদুড়ী
কলকাতা—৪১

বর্তমান লেখকগণের প্রতি আবেদন

গত ১৩৭৮ সাল থেকে প্রকাশিত প্রতি বছরের 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী' মারফৎ আমি বর্তমান সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রকাশ করে আসছি। এবারে আমি স্বতন্ত্রভাবে বিস্তারিত তথ্য স্বাক্ষর ও ছবিসহ জীবিত সাহিত্যিকদের পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। তথ্যগুলি যাতে নির্ভুল হয় তার জন্য একটি ছাপানো ফর্ম সাহিত্যিকদের পাঠিয়ে থাকি এবং তাঁরা সেটি আমাকে পূরণ করে পাঠান। এ পর্যন্ত প্রায় এক-হাজার ফর্ম আমি পেয়েছি। কিন্তু আমার ধারণা এখনো অনেকের সম্বন্ধে তথ্য আমি যোগাড় করতে পারিনি। অথচ এই জাতীয় ব্যয়বহুল গ্রন্থ একবার প্রকাশের পর পুনঃ প্রকাশে দেরী হতে পারে ও অসম্পূর্ণ তথ্যাদি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। তাই বর্তমান লেখকদের সমাজের প্রতি আমার আবেদন, যাঁরা এখনো আমাদের ফর্ম পূরণ করে পাঠান নি তাঁরা যেন অবিলম্বে আমার ঠিকানায় চিঠি দিয়ে ফর্ম চেয়ে পাঠান ও বৈশাখ মাসের মধ্যে তা পূরণ করে পাঠান। পাঠ্য পুস্তক ছাড়া সমস্ত ধরনের বাংলায় গ্রন্থরচয়িতার ও অন্যান্য ভাষায় রচিত গ্রন্থের বাঙালী লেখকও আমাদের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

আশা করি বর্তমান লেখকসমাজ এ জাতীয় একটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আমাকে তথ্য পাঠিয়ে সাহায্য করবেন।

অশোক কুণ্ডু
সম্পাদক—সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী
পোঃ কানপুর হাওড়া
পঃ বঙ্গ

আর্থিক প্রসঙ্গ
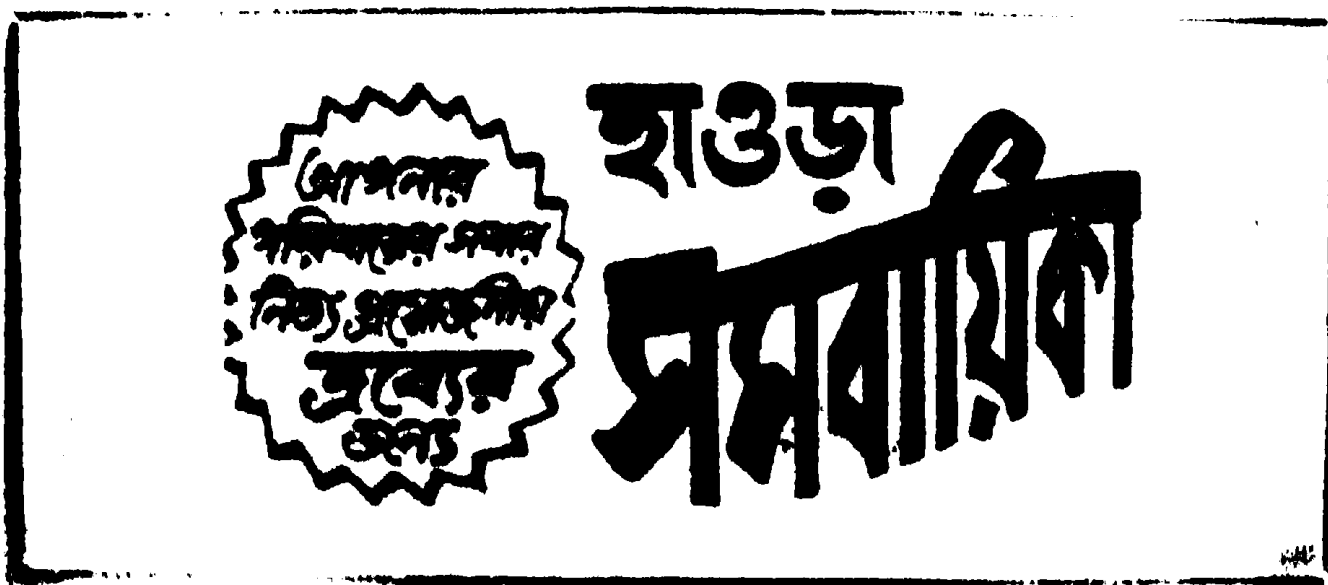
পশ্চিমবঙ্গের বাজেট বিচার

—কিরে গণশা, তুই বড় বেঁচে গেলি—লা।

ডাকনাম গণশা হলেও সম্বোধিত ব্যক্তিটি দেখলাম বেশ জ্ঞানবান। কারণ, উত্তর এল : কালকের দিনটা যাক, তারপর বলিস।

ঘটনাটি কলকাতার এক কাঁচা বাজারের এবং সংলাপ হল দুজন সবজি-বিক্রেতার মধ্যে। দুজনই আমার চেনা, তবে কারও নাম তখন পর্যন্ত জানতাম না। সাধারণত আমি সন্ধ্যার পর বাড়ী ফেরবার মুখে বাজারটা সেরে নিই। উদ্দেশ্য : সকালের ভিড় ও অপেক্ষাকৃত মহার্ঘতা উভয়কেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া। তা ছাড়া রাত্রে বাজারটা সেরে রাখলে আশ্রমপীড়ার অন্যতম কারণও দূরীভূত হয়।

রাত্রে অনেকদিন বাজারে ঢুকে জ্ঞানবান গণেশবাবুকে ঠিক তুরীয় বা মত্ত না হলেও খানিকটা বেসামাল অবস্থায় দেখেছি। তবে তাতে যে তাঁর ব্যবসায়ী-চরিত্রের কোন রকম হানি ঘটেছিল বলে মনে হয়নি।

গণশার দোকানের পাশেই অপর ব্যক্তিটির পসড়াসম্ভার। ব্যক্তিটির মুখে সর্বদাই একটি আধপোড়া বিড়ি। নিশ্চয়ই এক সময় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল, কিন্তু সব সময় নির্বাপিত অগ্নিই দেখেছি।

ধূম্রসেবী, না দারুপায়ী—কে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন জানি না। তবে আমি যখন এসে পৌঁছুলাম তখন সবেমাত্র রেডিওতে বাজেটের সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। সুতরাং আলোচনা হচ্ছিল নতুন কেন্দ্রীয় করভার নিয়ে।

আধপোড়া বিড়ির মালিকেরই পার্শ্ববর্তী পসারীকে উদ্দেশ্য করে উক্তি : কিরে গণশা, তুই বড় বেঁচে গেলি—লা।—অর্থাৎ মদের ওপর করভার বাড়ল না, কিন্তু মারা পড়ল বিড়ি—অর্ধদগ্ধ অবস্থায় যা বক্তার একরকম অংগীভূত।

গণেশবাবুর উত্তর ছিল : কালকের দিনটা যাক, তারপর বলিস। ধূম্রপায়ীর ধারণা না থাকলেও গণেশবাবু সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন যে মদের ওপর কর ধার্যের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের—কেন্দ্রীয় সরকারের নয়। তাই তিনি বলেছিলেন কালকের দিনটা যাক...। কালকের দিনটা মানে ১লা মার্চ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট পেশের ধার্য দিন।

১লা মার্চ রাত্রেই শুনলাম মদের ওপর কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। সুতরাং গণেশবাবুর আশংকাই ঠিক—সেও বাঁচল না। কিন্তু বেঁচে গেল অহিফেন-গঞ্জিকা-সেবীরা। এইসব মৌতাতের ওপরও উৎপাদন-শুল্ক ধার্যের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের। এদের বলা হয় নিষিদ্ধকরণ উৎপাদন-শুল্ক —প্রহিবিটিড একসাইজেস। উদ্দেশ্য : কর ধার্যের ফলে দাম বৃদ্ধির দরুন এদের ভোগ বা কনজামসান হ্রাস পায়। এ বছর কিন্তু এই রাজস্ব বহির্ভূত উদ্দেশ্য নিয়ে কোহল পানীয়ের ওপর কর বৃদ্ধি করা হয় নি, কর বৃদ্ধি করা হয়েছে সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। মনে হয়, নীতিটিকে অহিফেন-গঞ্জিকার ক্ষেত্রে প্রসারিত করলে রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেত। তবে হয়ত করব্যবস্থায় গতিশীলতারও কিছুটা হানি ঘটত। কারণ, এই-সব মৌতাত সাধারণত দরিদ্র শ্রেণীর ভোগ-পরিধির আওতায় পড়ে।

মোট করবৃদ্ধি :

আগামী বছরের জন্যে পশ্চিমবঙ্গের বাজেট করবৃদ্ধির মাধ্যমে ১২ কোটি টাকার

মত অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উত্তরপ্রদেশের বাজেট অনুমিত ২০ কোটি টাকার ঘাটতি মেটাবার জন্যে কোন করবৃদ্ধি বা নতুন কোন কর ধার্যের প্রস্তাব করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে কৃষি আয়কর পর্যন্ত। আর প্রস্তাবিত নতুন কর ধার্যের মধ্যে আছে বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকার ওপর কর। এই ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ সমর্থনীয়। সরকারী আয়-ব্যয় শাস্ত্র বা পাবলিক ফিনান্স আজ বিবিধ উদ্দেশ্যসাধক। অন্যতম উদ্দেশ্য হল আর্থিক বৈষম্যের সংকোচন। কর-ব্যবস্থাকে বিস্তৃত-তর করার দাবিও আজ সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁ বহুতলবিশিষ্ট অট্টালিকা ইত্যাদির ওপর কর যে কাম্য গতিরই নির্দেশ করে তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে। কৃষি আয়করের বেলায় বলা যায়, রাজ কমিটি প্রভৃতির সুপারিশ অনুসারেই কাজ করা হয়েছে। অপর দিকে যে পেন্সিল-ড্রয়িং-ইনস্ট্রুমেণ্ট বকস প্রভৃতির বিক্রয় কর থেকেও অব্যাহতির ছাত্রদের কিছুটা সুবিধা হবে তাও তর্কাতীত। কিন্তু পুস্তক-পত্রিকার জন্যে ব্যবহৃত প্যাকিং-এর জিনিসপত্রকে যে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তার নীট ফল কিছুই অনুভব করা যাবে না, কারণ কেন্দ্রীয় বাজেটে ঐসব দ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয়েছে। তবে দাম হয়ত আরও বাড়ত, তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নতুন করের ব্যাপারে বলা যায়, তামিল নাড়ুর মত বৃত্তির ওপর কর ধার্য করলে কি রকম হত? মহারাষ্ট্র সরকার যদি আমাদের দেখে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁর ওপর কর বসাতে পারে তবে আমরাও হয়ত তামিলনাড়ুর ঐ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারতাম। অর্থাৎ, প্রথমটা বিরোধিতার সম্মুখীন হলেও কর-ব্যবস্থাটা আরও একটু উৎপাদনশীল করে তোলা সম্ভব হত।

শিল্পায়নে সহায়তা :

এই সূত্র থেকে সংগৃহীত অর্থ শিল্পায়নে, বেকার-সমস্যার মোকাবিলা নগরাঞ্চলের উন্নয়নে—নানাভাবে ব্যয় করা যেত।

এই দিকে অবশ্য বেশ কিছুটা করা হয়েছে। যেমন, বিক্রয়করের অব্যাহতির সীমা ১০ হাজার টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং নতুন প্রতিষ্ঠানদের বেলায় প্রথম বিক্রী থেকে ৩ বছর কোন বিক্রয় কর দিতে হবে না। মালদহ ও মুর্শিদাবাদ সিল্কের উৎপাদকদের এই করের ব্যাপারে আরও কিছুটা সুবিধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা অর্থমন্ত্রী অভিহিত দ্বৈত সমস্যার—দারিদ্র্য ও বেকারত্বের —কতদূর মোকাবিলা করা সম্ভব হবে জানি না।

উদ্বৃত্ত বাজেট :

১৩ বছরের মধ্যে বাজেটে প্রথম উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে, যদিও উদ্বৃত্তের পরিমাণ অতি সামান্য—মাত্র ২৭ লক্ষ টাকা। ১৩শ কোটি টাকার মোট বাজেটে ২৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের অনুমান অর্থনীতির ভাষায় প্রান্তিক বলে অভিহিত হতে বাধ্য, তবুও কিন্তু এ নিয়ে বিশেষ হৈ-চৈ করা হয়েছে। কারণ এদেশে উদ্বৃত্ত বাজেটের দৃষ্টান্ত আজকাল বড় একটা মেলে না। এবছর কেন্দ্রীয় বাজেট, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বাজেট—সবই ঘাটতি বাজেট। তবে ঐসব ক্ষেত্রে ঘাটতি বাজেটই রাখা হয়েছে, আর পশ্চিমবঙ্গে উদ্বৃত্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে ১২ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত কর-রাজস্বের ব্যবস্থা করে। আগেই বলেছি, উত্তরপ্রদেশের বাজেটে ২০ কোটি টাকার ঘাটতি সত্ত্বেও কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয় নি।

নতুন কর ধার্যের ব্যবস্থা না করেও বিরাট উদ্বৃত্তের ব্যবস্থা করে এ বছর কাজ চালানো যেত যদি অবশ্য ১৩০ কোটি টাকার মত বকেয়া কেন্দ্রীয় ঋণ শোধের ব্যবস্থা না করা হত। বলা যেতে পারে, পরিশোধ্য ঋণের ব্যবস্থা ত করতেই হবে। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যই তা করেন নি, এবং অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে এইভাবে জমা ঋণ শেষ পর্যন্ত অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে মকুফ করা হয়। অন্যান্য রাজ্য এই সুবিধের আশায় বসে আছে বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষেও এই পথ অবলম্বন করলে ক্ষতি ছিল কি?

প্রত্যেকটি সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর লোকসান হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন যে এইভাবে করদাতার স্কন্ধে সরকারী উদ্যোগাধীন সংস্থাসমূহের ভার কতদিন এবং কতদূর রাখা যেতে পারে? নিয়োগ-সংস্থানের দিক দিয়ে এর প্রয়োজন হলে বাছাই-এর প্রশ্ন ওঠে। পর্যটক-নিবাসের কোনগুলো রাখা হবে আর কোনগুলো বন্ধ করা হবে—সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের দিন কি আসে নি?

উপসংহার :

অর্থমন্ত্রীর হাতে ভার ছিল বাজেট-প্রণয়নের। সে ব্যাপারে তিনি অনেক পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। আর কেরামতি দেখিয়েছেন কর-সংগ্রহের ব্যাপারে। সংগ্রহ ব্যবস্থায় তার ফাঁক পূরণের প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবুও কিন্তু তিনি বাজেটকে গতিশীল সমাজ-ব্যবস্থার উপযোগী করে তুলতে পারেন নি—দারিদ্র্য ও বেকারত্বকে দুই প্রধান দুশমন বলে বর্ণনা করলেও তাদের প্রতিরোধ করার কোন নতুন পন্থার সন্ধান বা জোরালো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নি। নিরাময় নয়, কিছুটা উপশমই তাঁর লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয়।

৭-৩-৭৫ **শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়**

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই কথাটি তিনি আরো প্রাঞ্জল ভাষায় আমাকে বলেছিলেন ৪-২-৪৩ তারিখে—যেদিন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে অনেকক্ষণ কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম নানা নেপথ্য-শক্তি ও ধ্যানপদ্ধতি সম্বন্ধে। আমার AMONG THE GREAT -এ কথালাপের বিবৃতি দিয়েছি। তা থেকে এখানে অল্প একটু অনুবাদ দিই গুরুদেবের বক্তব্য পরিস্ফুট করতে। তিনি বলেছিলেন ঃ

"যখন আমি কিছু বলি বা লিখি তখন আমি শুধু চাই আমার উপলব্ধি বা দৃষ্টি-ভঙ্গিকে প্রকাশ করতে—বলি না আমার কথা সবাইকে মেনে নিতে হবে। এত বৎসর ধরে আমার পরিচয় পাওয়ার পরেও কি তুমি মনে করতে পারো যে আমি আমার জীবন-দর্শন আর সবাইকে বরণ করতে বাধ্য করব? আমি কোনো দিনই সর্বেশ (dictator) হতে চাই নি, বা বলি না সকলের মতামতই আমার মতামতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই —যেমন আমি বলি না যে, সকলেই আমার অনুচর হয়ে আমার যোগে দীক্ষিত হোক।"

অথচ একদিকে তিনি ছিলেন যেমন নির্বিবাদী, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল অন্যদিকে ছিলেন তেমনি হিমালয়ের মতন অটল অচল, দ্রষ্টা ঋষি—একান্তী, অকুতোভয়। দেশের জন্যে প্রাণদান তাঁর কাছে কোনোদিনই কঠিন মনে হয় নি। যখন তিনি আলিপুর জেলে ছিলেন তখন অনেকেই তো ভেবেছিলেন যে তাঁর প্রাণদণ্ড হবেই হবে। কিন্তু তিনি ছিলেন বিনিঃশঙ্ক, নিত্যধ্যানমগ্ন—অনেক সময়ে এমন কি নাওয়া খাওয়াও ভুলে যেতেন তন্ময় সমাধিতে। সাধে কি কবিগুরু সে দুর্দিনে তাঁকে নমস্কার করেছিলেন এই বলে

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থযাত্রীর সংগীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভর বাণী,
উদার মৃত্যুর!

গুরুদেবের এক সতীর্থ শিষ্য বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দামানে বারো বৎসর কাটিয়ে ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন ঃ 'ভাই, কোনো মহৎ আদর্শের জন্য এককথায় প্রাণকে বলিদান দেওয়া কঠিন মানি। কিন্তু সে আদর্শের জন্যে একান্তী হয়ে বাঁচা ঢের বেশি কঠিন। আবেগ, উচ্ছ্বাস, উন্মাদনার ঝোঁকে হাজার হাজার সৈন্য বা শহীদই প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সমস্ত মনের প্রাণের শক্তি সামর্থ্যকে কোনো মহৎ আরাধনার জন্যে একমুখী করতে পারেন কজন, বলবে আমাকে?—মাত্র দু'চারজন বিরল মহাপুরুষ। শ্রীঅরবিন্দ এই থাকের ক্ষণজন্মা—তাঁকে অনুসরণ করা তো দূরের কথা—চিনতে পারাও সম্ভব নয় চোখের ঠুলি না খসলে।'

আমি উপেন্দ্রনাথের কথাগুলি নিজের ভাষায়ই সাজিয়ে বললাম কিন্তু তাই বলে তাঁকে দিয়ে বলিয়ে নিইনি যা তিনি বলতে চাননি। শ্রীঅরবিন্দের দিব্য বিকাশের অপূর্ব দৃশ্য দেখে আমার নিজেরও অনেক সময়েই মনে হয়েছে যে, তাঁর যথার্থ তর্পণ হতে পারে না এ বস্তুতান্ত্রিক, বুদ্ধিবাদী, বৈজ্ঞানিক যুগে যার ভিত্ত ইন্দ্রিয়লব্ধ তথা বুদ্ধি-সমর্থিত উপরভাসা প্রত্যয়ের পরিসংখ্যানী এজাহার — Statistics : তার জন্যে চাই (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়) আন্তর দিব্যদৃষ্টি যে বলে (দ্বিজেন্দ্রলালের একটি অপরূপ বাউলের ভাষায়)

এতদিন তো ঢেউয়ে ভেসে
দিলি সাঁতার উপর দেশে
ডুব দিয়ে আজ চাই দেখা চাই—
কতখানি গভীর জল।

এ-দৃষ্টি স্বভাববিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের জীবনের রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিল কীভাবে তার কিছু পরিচয় দিতে তাঁর একটি প্রখ্যাত পত্রের উদ্ধৃতি দিই। স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন আমাকে একদা লিখেছিলেন—তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের জন্যে একটি প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করতে চান বিলেতে, তাতে শ্রীঅরবিন্দের নিবন্ধ চাই-ই চাই।

শ্রীঅরবিন্দ এ-হেন সুগম্ভীর প্রস্তাবকে আমলই দিলেন না। লিখলেন আমাকে ঃ

"Philosophy ! Let me tell you in confidence that I never, never, never was a philosopher—although I have written philosophy which is another story altogether. I knew precious little about philosophy before I did the Yoga and came to Pondichery — I was a poet and a politician not a philosopher ! How I managed to do it and why? First, because Paul Richare proposed to me to cooperate in a philosophical review—and as my theory was that a Yogi ought to be able to turn his hand to any thing I could not very well refuse : and then he had to go to the war and left me in the lurch with sixty-four pages a month of philosophy all to write by my lonely self. Secondly, because I had only to write down in the terms of the intellect all that I had observed and come to know in practising Yoga daily and the philosophy was there, automatically. But that is not being a philosopher !

I don't know how to excuse myself to Radhakrishnan—for I can't say all that to him. Perhaps you can find a formula for me ? Perhaps : "so occupied. not a moment for any other work, can't undertake because he might not be able to carry out his promise". What do you say ?"

(ভাবার্থ ঃ দর্শন? তোমাকে চুপি চুপি বলছি শোনো—আমি কস্মিনকালেও দার্শনিক ছিলাম না, ছিলাম না, ছিলাম না—যদিও আমি দার্শনিক তত্ত্বকথা লিখেছি। আমি পণ্ডিচেরি আসার ও যোগসাধনা সুরু করার আগে দর্শন সম্বন্ধে খুব কমই জানতাম। আমি ছিলাম কবি ও রাজনৈতিক

—দার্শনিক না। তবে কেমন করে দর্শনরাজ্যে প্রবেশ করলাম? বলি প্রথমে হল কি, পল রিশার এক দার্শনিক মাসিক প্রকাশ করার প্রস্তাব করল, আর যেহেতু আমি বলতাম যোগী সব কিছুই করতে পারে, সেহেতু না বলতে বাধল। তারপরে সে আমাকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়ে চলে গেল যুদ্ধে—ফলে আমাকে একাই লিখতে হল প্রতি মাসে চৌষট্টি পাতা দার্শনিক তত্ত্বকথা। দ্বিতীয়তঃ আমি শুধু বুদ্ধির পরিভাষায় লিখে চললাম যা আমি দিনের পর দিন যোগে উপলব্ধি করেছি। কাজেই সেখানে স্বতঃই হল দর্শনের অভ্যুদয়। কিন্তু এ-কীর্তিকে দার্শনিক কীর্তি নাম দেওয়া যায় না।

কিন্তু এসব কথা তো রাধাকৃষ্ণনকে বলা চলে না। ভেবে বার করো উপায়। ধরো, যদি বলা যায়—আমি মহাব্যস্ত, হয়ত তার নিয়ে কথার খেলাপ হয়ে যেতে পারে। কী বলো?)

উত্তরে আমি লিখেছিলাম তাঁকে ঘোর আপত্তি করে যে, তিনি নিজেকে ফিলসফার উপাধি দিতে চান না এ অন্যায়। কারণ—লিখেছিলাম আমি—এ-যুগে যে তাঁর মতন প্রতিভাধর দার্শনিক আর জন্মায় নি একথা বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না। আমার এ-আপত্তির উত্তরে তিনি কিছু লিখেছিলেন কি না মনে করতে পারছি না, তবে মনে আছে আমি লিখেছিলাম যে, আপনি নিজেকে রাজনৈতিক (politician) না বলে বিপ্লবী বললে আমরা সবাই সানন্দে সায় দিতে পারতাম।

তবে তিনি যে শুধু কবি নন, মহাকবি, এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে মতভেদ ছিল না। পরে যখন তাঁর 'সাবিত্রী' প্রকাশিত হয় তখন এ-সম্বন্ধে আরো বহু কাব্যরসিক সায় দিয়ে তাঁর কবিপ্রতিভার জয়ধ্বনি করেছিলেন। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ছাত্রদের এক উৎসাহী সভায় সাবিত্রী সম্বন্ধে ভাষণ দিতে আহূত হয়ে বলেছিলাম : 'আজকের দিনে শ্রীঅরবিন্দ সাধারণতঃ মহাবিপ্লবী মহাদার্শনিক ও মহাযোগী বলেই প্রখ্যাত, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে লোকে মানবেই মানবে যে তিনি মহাকবিও বটে—যেহেতু সাবিত্রী আসলে শুধু মহাকাব্যই নয়, এপিকবর্গীয় কাব্য।'

কিন্তু সে যাক, কিছুদিন পরে স্যর রাধাকৃষ্ণন আমাকে আবার ধরলেন। তখন আমি বেশ একটু ক্ষুব্ধ হয়েই লিখলাম গুরুদেবকে : গুরু: কিন্তু বেচারা আমাদের কেন বিষণ্ণ করছেন অকারণ? আমরা চাই ও-দেশেও আপনার নামডাক হোক। তাই আমি বলবই বলব যে, স্যর রাধাকৃষ্ণন ঠিকই বলছেন—আপনার লেখা উচিত। আমি তাঁকে লিখেছি একথা যে তাঁর অনুরোধ মাদৃশ বহু সুবোধের সুধরিক্তরই সায় আছে।'

কিন্তু গুরুদেব হিমালয়ের মতন অটল! লিখলেন :

"Dilip,

As to Radhakrishnan, I do not care whether he is right or wrong in his eagerness to get the contribution from me. But the first fact is that it is quite impossible for me to write philosophy to order. If something comes to me of itself, I can write, if I have time........ And the second fact is that I do not care a button about having my name in any blessed place. I was never ardent about fame even in my political days; I preferred to remain behind the curtain, push people without their knowing it and get things done. It was the confounded British Government that spoiled my game by prosecuting me and forcing me to be publicly known as a "leader". Then again I don't believe in advertisement except for books, and in propaganda except for politics and patent medicines. But for serious work it is poison. It means either a stunt or a boom, and stunts and booms exhaust the thing they carry on their crests and leave it lifeless and broken, high and dry on the shores of nowhere—or it means a movement. A movement in the case of a work like mine means the founding of a school or a sect or some other damned nonsense. It means that hundreds or thousands of useless people join in and corrupt the work or reduce it to a pompous farce from which the Truth that was coming down recedes into secrecy and silence. It is what has happened to the "religions" and is the reason of their failure. If I tolerated a little writing about myself, it is only to have a sufficient counter-weight in that amorphous chaos, the public mind, to balance the hostility that is always aroused by the presence of a new dynamic Truth in this world of ignorance. But the utility ends there and too much advertisement would defeat the object. I am perfectly "rational", I assure you, in my methods and I do not proceed merely on my personal dis... of fame. If and in so far as publicity serves the Truth, I am quite ready to tolerate it, but I do not find publicity for its own sake desirable (2-10-34).

(ভাবার্থ : রাধাকৃষ্ণনের অনুরোধ যৌক্তিক না অযৌক্তিক এ-প্রশ্ন অবান্তর। প্রথম কথা হচ্ছে, কারুর উপরোধে তত্ত্বকথা লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব।...দ্বিতীয় কথা, আমার নাম কোথাও হল বা না হল এ নিয়ে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। এমন কি বিপ্লবী যুগেও আমি কোনোদিনই যশমান চাই নি। আমি পর্দার আড়ালে থেকে একে ওকে তাকে এগিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিলাম। এই অর্বাচীন বৃটিশ-রাজন্যরাই আমার ফন্দি ধরে ফেলে আমাকে গ্রেপ্তার করে নেতা হতে বাধ্য করল। অপিচ বিজ্ঞাপনের ধুমধামে আমার আস্থা নেই, না প্রপাগান্ডায়—কেবল রাজনীতিতে বা পেটেন্ট দাওয়াইয়ে ছাড়া। সত্যিকারের কাজে বিজ্ঞাপন প্রপাগান্ডার ক্রিয়া বিষের মতন। এর পরিণাম হয় একটা প্যাঁচ বা হট্টরোল যার ফল হয় নিষ্প্রাণ ছন্নাকার—কিম্বা কোনো দল-গড়া। হাজার হাজার বাজে হুজুগেরা এসে হাজির হয়—যার ফলে আন্দোলনটা হয়ে দাঁড়ায় এক জাঁকালো প্রহসন। সঙ্গে সঙ্গে যে-সত্য প্রকাশ হচ্ছিল সে পিছিয়ে গিয়ে নিশ্চুপ হয়ে যায়। চিরকাল এইই হয়ে এসেছে নানা ধর্মের দাপাদাপিতে—অর্থাৎ নিষ্ফলতা। আমার সম্বন্ধে একটু আধটু প্রচার আমি সয়ে থাকি শুধু তথাকথিত গণমনের নামে যে-অনামী গণ্ডগোল ফুলে ওঠে তার উল্টো দিকে একটু ভার চাপিয়ে গণমনের বিরোধিতা বাতিল করতে। অজ্ঞানের এ বিশ্বমঞ্চে প্রতি জীবন্ত সত্যের অভ্যুদয়েই এই ব্যাপক অবোধ বিরোধিতা জেগে ওঠে)

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানীর জগৎ !

আমাদের মতো গরীব দেশেও প্রতি বছর গোটাকতক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন বেশ ঘটা করেই হয়ে থাকে, বিশেষ করে শীতকালে। গত শীতেও বেশ বড়ো মাপের ও প্রচুর প্রচার সহ একটি হয়েছে দিল্লীতে (আন্তর্জাতিক শারীরবিজ্ঞান কংগ্রেস), আরেকটি কলকাতার বরানগরে (আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান কংগ্রেস)। উপরন্তু ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন তো আছেই। আর সীমিত পরিসরের বৈজ্ঞানিক সম্মেলন তো অনবরত হয়ে চলেছে। দেখেশুনে দুজন বিজ্ঞানী প্রশ্ন তুলেছেন, প্রচুর খরচসাপেক্ষ সমস্ত বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের প্রকৃতই কি কোনো সার্থকতা আছে? নাকি, এগুলো অর্থহীন বাহানুষ্ঠানে পর্যবসিত? গত সংখ্যার বিজ্ঞানের কথায় বিষয়টি তোলা গিয়েছিল মাত্র, এবারে দুই বিজ্ঞানীর বক্তব্য কিছুটা বিস্তারিতভাবে উপস্থিত করতে চাই।

প্রথমে ডঃ এস এস রাও-র কথা শোনা যাক। অবসর নেবার আগে ইনি ছিলেন বোম্বাই হফকিন ইনস্টিটিউটের ইমিউনোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ। কর্মজীবনে প্রচুর আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে, বৈজ্ঞানিক সম্মেলনগুলিতে উপস্থাপিত অধিকাংশ নিবন্ধের মান নিচু। এবং তার ফলে সম্মেলনে বসে থাকাটাই একটা ক্লান্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। দূরদৃষ্টিসম্পন্নরা তাই সাধারণত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও চায়ের আসর ছাড়া অন্য কিছুতে থাকেন না।

গরীব দেশগুলিতে বিজ্ঞানের উন্নতি নিয়ে যাঁরা ভাবিত এবং তার পরিচালনার সংগে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাঁরা মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে থাকেন। সেখানে অনেক কিছু প্রকাশ পায় বটে কিন্তু শেষপর্যন্ত কাজের কাজ কিছু হয় না। কারণ, দুই সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ে সম্মেলনে উপস্থাপিত বিষয়গুলি নিয়ে অগ্রসর হবার লক্ষণ সামান্যই চোখে পড়ে। অথচ একই ধরনের ব্যক্তিরা সম্মেলনগুলিতে যোগ দিয়ে থাকেন।

বিজ্ঞানের উন্নতি নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রথম অনুষ্ঠিত হয় সম্ভবত ইজরাইলের রেহোভোৎ-এ। এশিয়া ও আফ্রিকার বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রনেতারা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। উন্নতিশীল দেশগুলিতে বিজ্ঞান যে কত কাজের হতে পারে সে-সম্পর্কে সম্মেলনে অনেক আশার কথা শোনানো হয়েছিল। সম্মেলনের পরে অনেক খরচ করে একটি বই প্রকাশিত হয় যাতে সম্মেলনের আলোচনা প্রবন্ধ ইত্যাদি সংকলিত ছিল।

কিন্তু এই সম্মেলন ও সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত বইয়ের উল্লেখ মাত্র শোনা গেল না ১৯৬২ সালে 'সেন্টো' কর্তৃক সংগঠিত লাহোর সম্মেলনে। শেষোক্ত সম্মেলনের বিষয় ছিল পাকিস্তান ইরান ও তুরস্কে প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতিসাধনের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োগ।

এবং এই দুটি সম্মেলনের কোনোটিই উল্লিখিত হল না ১৯৬৩ সালে অনুষ্ঠিত জেনিভা সম্মেলনে। শেষোক্ত সম্মেলনের বিষয় ছিল অপেক্ষাকৃত কম উন্নত এলাকাগুলির কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ। সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ছিয়ানব্বইটি দেশের প্রতিনিধি-দল এবং সম্মেলনে উপস্থিত করা হয়েছিল দুই হাজার পেপার। আর সমস্ত কিছু একত্রিত করে সম্মেলনের পরে আটখণ্ডের বিরাট বই প্রকাশিত হয়েছিল।

জাতিসংঘের উদ্যোগে আয়োজিত এই বিপুলমর্যাদাসম্পন্ন সম্মেলনও কিন্তু অনুল্লেখিত থেকে গেল ১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার ও উন্নতির জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ক নয়াদিল্লীর আলোচনা-সভায় (সংক্ষেপে 'কাউস্ট')। এই আলোচনা-সভার উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং জওহরলাল নেহরু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (১৯৪৭ সালে) ভারতীয় বিজ্ঞান-কর্মী সমিতি।

১৯৬৭ সালে ওয়াশিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভার বিজ্ঞান ও নভশ্চারণবিদ্যা বিষয়ক কমিটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা গোষ্ঠীর সামনে সাক্ষ্য দিতে এলেন নরওয়ে নেদারল্যান্ডস, জাপান, ব্রেজিল ও ভারতের বিজ্ঞানীরা। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল শুধু শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদের। ভারত থেকে এসেছিলেন বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (সি এস আই আর) অধিকর্তা হুসেন জহীর, যিনি ছিলেন ১৯৬৬ সালের 'কাউস্ট' আলোচনা-সভার উদ্যোক্তা। এমনি ধরনের সীমাবদ্ধ একটি সম্মেলন হয়ে গিয়েছে নয়াদিল্লীতেও ১৯৬৭ সালে, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বানে ও উপস্থিতিতে।

১৯৬৮ সালে য়ুনেস্কোর (জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় 'কাস্টেশিয়া' নামে খ্যাত এশিয়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সম্পর্কিত একটি বৃহৎ সম্মেলন। ভারতের পক্ষ থেকে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন বিজ্ঞান-পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। অন্যান্য দেশ থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও তাই। সম্ভবত এই কারণেই সম্মেলনে শুধু কতকগুলো মামুলি প্রস্তাব পাশ হয়েছিল।

পঞ্চম সম্মেলনের স্থান পুনরায় রেহোভোৎ, ১৯৬৯ সালে। এবারে আলোচনার বিষয়, উন্নতিশীল দেশগুলিতে শিক্ষা-ব্যবস্থার সংগে বিজ্ঞানের সম্পর্ক। বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল আফ্রিকার ওপরে। এশিয়ার দেশগুলি নিয়েও আলোচনা উঠেছিল কিন্তু সেটা তুলনামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য। এই সম্মেলনে আফ্রিকার বাইশজন শিক্ষামন্ত্রীকে ডেকে এনে পশ্চিমী বিজ্ঞানীরা উপদেশ দিয়েছিলেন কিভাবে তাঁরা স্ব-স্ব দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নতুন করে গড়ে তুলতে পারেন। অথচ এই পশ্চিমী বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই ছিলেন আফ্রিকা সম্পর্কে অজ্ঞ, তাঁরা কোনোকালে আফ্রিকায় যাননি। সম্মেলনের শেষে যথারীতি প্রচণ্ড চড়া দামে সম্মেলনের আলোচনা সম্বলিত বই প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭০ সালে সি এস আই আর-এর উদ্যোগে নয়াদিল্লীতে পুনরায় একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের বিষয়, সত্তরের দশকের প্রযুক্তিবিদ্যা। সভায় গৃহীত ছটি প্রস্তাবের একটি ছিল প্রাযুক্তিক নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্পর্কে এবং প্রস্তাবটি তুলেছিলেন সি এস আই আর এর অধিকর্তা ডঃ আত্মারাম। ১৯৭১ সালে ওয়াশিংটনের হিলটন হোটেলে এশীয় বিদ্যাচর্চা সমিতির সভায় এশিয়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চলে। আশ্চর্যের বিষয়, এই একই প্রশ্ন নিয়ে ১৯৬০ সালে রেহোভোৎ-এ যে-ভাষায় ও যেভাবে আলোচনা চলেছিল এখানে হুবহু তার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

•

ডঃ রবার্ট অ্যান্ডারসন যে-প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তার নাম 'গরীব দেশগুলিতে বিজ্ঞানবিষয়ক সম্মেলন কি অর্থহীন অপব্যয়?' জবাবে বলেছিলেন, অবশ্যই তাই। এবং এই জবাবের সমর্থনে অকাট্য তথ্য উপস্থিত করেছিলেন।

ডঃ অ্যান্ডারসনের বক্তব্য এই রকম :

এক দেশের বিজ্ঞানীর রাজনৈতিক মতামত অপর দেশের বিজ্ঞানী নাও মানতে পারেন। রাজনীতিকরা কিন্তু দুই দেশের বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক সম্পর্কের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রায়শই সন্দিহান। এমন কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে বিজ্ঞানের উন্নতি বিষয়ক সম্মেলন বৈজ্ঞানিক সম্পর্ককে উন্নত করে এবং তার ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে সন্দেহ কমে।

কথাটা শুনতে খুব ভালো কিন্তু বাস্তব অবস্থার দিকে তাকালে বিশ্বাস করা শক্ত। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৯৬৬ সালের রকফেলার সম্মেলনে আবদুস সালাম যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে ছিল ত্রিয়েস্ত এর আন্তর্জাতিক তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যা কেন্দ্রের কাজ সম্পর্কে প্রচুর প্রশংসা, কিন্তু ছিল না এই কথাটি যে সালাম হচ্ছে পাকিস্তান

বিজ্ঞানের কথা
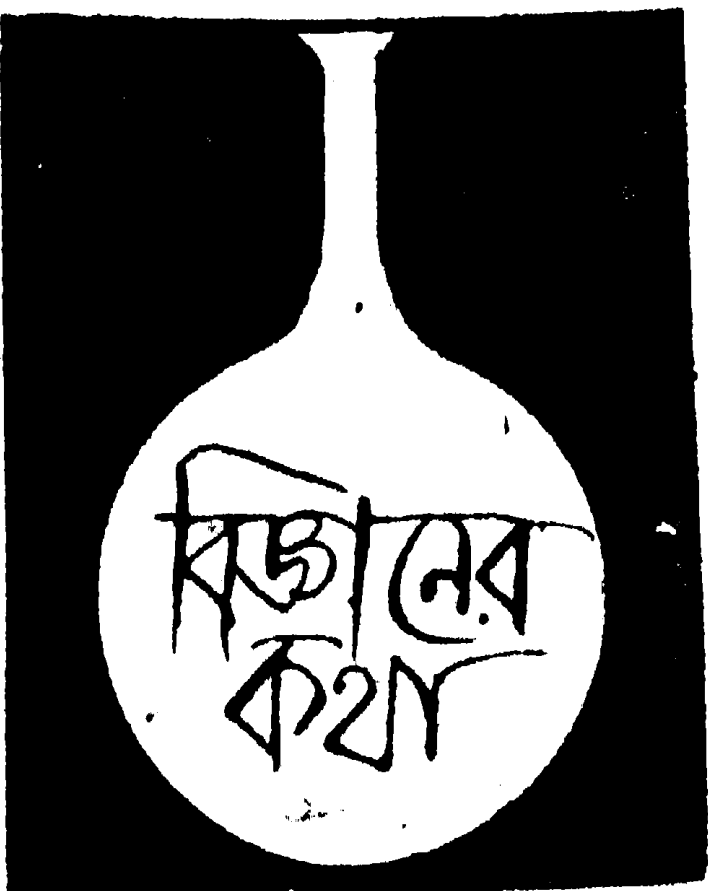
ও ভারতের বহু বিজ্ঞানীর মধ্যে বন্ধুত্বের উৎস। অবস্থা দেখে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিজ্ঞান-উপদেষ্টা ডোনাল্ড হরনিগ বলেছিলেন, 'ব্যাপারটা খুবই দুঃখের যে এই দুটি দেশের মধ্যে এতগুলো সাধারণ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সহযোগিতা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে, কিছুতেই সরাসরি পরস্পরের সঙ্গে নয়।' পাকিস্তান ও ভারতের প্রবীণতম বিজ্ঞানীরা এই বিবৃতি শোনেন বটে কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। পরের বছর (১৯৬৭) ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় লো এনার্জি পদার্থবিদ্যার আন্তর্জাতিক আলোচনা-সভা। সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিতে আসেন দূরে দূরে দেশের বিজ্ঞানীরা, কিন্তু মাত্র ২৯০ কিলোমিটার দূরে অতি কাছের যে কলকাতা সেখান থেকে কেউ নয়। অথচ ১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে কি পদার্থবিদ্যার শিক্ষণে কি গবেষণায় সম্পর্ক ছিল অতি গভীর। দুই শহরের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীরা পরস্পরকে খুব ভালোভাবে চিনতেন এবং পূর্ববাংলার কিছু বিজ্ঞানী ভারতে এসে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। যে-সময়ে ঢাকায় এই লো এনার্জি পদার্থবিদ্যা বিষয়ক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তখন কলকাতায় এই একই বিষয়ে গবেষণা ও অধ্যয়নরত বিজ্ঞানীর সংখ্যা বড়ো কম ছিল না। তবুও ১৯৬৬ সালের 'কাউন্ট' ও রকফেলার সম্মেলনে সহযোগিতা বিষয়ক অনেক আশাব্যঞ্জক কথা শোনা যাবার পরেও ১৯৬৭ সালে এই দুটি শহরের মধ্যে কোনো যোগাযোগ হতে পারে নি। এবং পরমাশ্চর্যের বিষয়, ১৯৬৮ সালের 'কাস্টেশিয়া' সম্মেলনে সেই একই শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীরা ও রাজনীতিকরা একই ভাষায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের সকল স্তরে সহযোগিতা গড়ে তোলার আবেদন জানান।

একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে সম্মেলন মাত্র উল্লিখিত কয়েকটিই হয়েছে। কিন্তু যেখানে যেভাবেই হয়ে থাকুক না কেন, তার চেহারা মোটামুটি একই ধরনের। সমাবেশে উপস্থিত থাকেন বিজ্ঞানীরা, পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা, বিজ্ঞান-বিষয়ক সংবাদদাতারা ও রাজনীতিকরা। পালা করে অনুষ্ঠিত হয় প্লেনারি অধিবেশন, সামাজিক উৎসব, সর্বাদিক বাঁচিয়ে-চলা বিতর্ক ইত্যাদি। সম্মেলনের যে মহৎ উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়—দারিদ্র্য দূরীকরণ—কখনো-সখনো তারও পরোক্ষ উল্লেখ যে ঘটে না তা নয়। তবে দরিদ্র দেশের প্রতিনিধিরা ধনী দেশের প্রতিনিধিদের প্রতাপের সামনে একটু যেন মিইয়ে থাকেন—কেননা সম্মেলন প্রতাপের তারতম্যে কখনো সমতা আনে না, বরং তাকে আরো প্রকট করে তোলে। তবে তাতে কিছু আটকায় না। অবারিত দেখাসাক্ষাৎ ও গল্পগুজব চলতে পারে, তৎসহ অবাধ ককটেল এবং অবশ্যই প্রচুর বক্তৃতা : নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে গ্রহণ করার অপেক্ষা শুধু তাহলেই গরীব দেশগুলির কপাল খুলে যাবে।

কপাল যে একেবারে খোলেনি তা অবশ্য নয়। দরিদ্র দেশগুলির মানুষের অবস্থায় কিছুটা যে উন্নতি হয়েছে তাও বিজ্ঞানের কল্যাণেই। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। সম্মেলনে এই বিষয়টি নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না। বারে বারে শুধু গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলা হয় যে গবেষণাকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে হবে জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে। আর অত্যন্ত সহজেই ধরে নেওয়া হয় যে গরীব দেশগুলির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পক্ষে বাধাস্বরূপ। ভবিষ্যৎ কিভাবে পরিকল্পিত হতে পারে তাই নিয়েও সম্মেলনে মতভেদ থেকে যায় এবং তা থেকে নেতৃত্বের সমস্যা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়ে থাকে।

*

সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারে দায়িত্ব ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সক্রিয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সম্মেলনে এসে যাঁরা জোরালো দাবি তোলেন যে 'বিজ্ঞানকে সাহায্য করার জন্য' শক্তিশালী নেতৃত্ব চাই, তাঁদের একটা কথা মনে রাখা দরকার। গরীব দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যদিও রাষ্ট্রের সহায়তার ওপরে অনেকখানি নির্ভরশীল, কিন্তু জওহরলাল নেহরুর মতো বিজ্ঞানমনস্ক রাষ্ট্রনেতাও বিদেশী সহযোগিতার ওপরে নির্ভরশীলতার সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি কিংবা ঝুঁকি নেবার আশংকার মীমাংসা করতে পারেন নি। সমস্যার সমাধানের জন্য আরও চাই বিজ্ঞান-এর প্রতিষ্ঠানগুলিতে উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি এবং এ-কাজে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের উৎসাহদান, যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে হাত লাগিয়ে অবিশ্বাস ও অনাস্থার আবহাওয়া দূর করতে সমর্থ।

গরীব দেশগুলিতে বিজ্ঞানের বিপ্লব বলতে তিনটি জিনিস বোঝায় : বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে কায়েমী স্বার্থ ও সুবিধা ভোগ করার অবস্থার অবসান, নতুন নতুন ধ্যানধারণা ও কৃৎকৌশল প্রবর্তন, সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আরও বেশি ব্যবহার।

*

এই সম্মেলনগুলিতে তাঁদেরও উপস্থিতি চাই যাঁরা বৈদেশিক সহায়তা ও পরামর্শের উপযোগিতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে থাকেন, এমনকি যেসব অনুমান থেকে বৈদেশিক সহায়তা ও পরামর্শকে গ্রাহ্য করা হয় তা নিয়েও। একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, বাইরের উপদেষ্টারা হতাশা নিয়েই আসেন। কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ তাঁদের কাজের অবস্থার দরুণ যে হতাশায় ভোগেন তার বেলা কী করা যায়? সম্মেলনগুলিতে উল্লেখ করা হয় যে, বিজ্ঞানের কোনো নীতি নেই, জনসংখ্যার মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটছে স্বাস্থ্যব্যবস্থা যথাযথ নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয় না। শুধু উল্লেখমাত্র করে সম্মেলনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

বিজ্ঞানের উন্নতি বিষয়ক এইসব সম্মেলন অন্তর্গত ক্ষেত্রের কাঠামোটিকেও প্রকাশ করে থাকে। প্রকাশ করে শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে, বিভিন্ন আকাদেমির মধ্যে ও রাজনীতিকদের মধ্যে একটা চুক্তির অবস্থা—গরীব দেশগুলির বৈজ্ঞানিক মহলের প্রয়োজন হিসেবে যে-বিষয়গুলো ধরে নেওয়া হয় তৎসম্পর্কিত চুক্তি। প্রকাশ করে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের প্রসার ঘটার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সামাজিক প্রকৃতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের নীতির রাজনৈতিক দিক। রাষ্ট্রনীতি ও বিজ্ঞানের মধ্যে এইসব সম্পর্ক দেখতে পাওয়াটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু মুশকিল বাধে যখন আমরা তার সত্যিকারের প্রকৃতি অনুধাবনে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হই। এইসব সম্মেলনকে অন্য একভাবেও দেখা চলে—অ্যাকাডেমিক প্রকাশনার অংশ হিসেবে, অ্যাকাডেমিক উপনিবেশবাদের অংশ হিসেবে।

বাধ্য হয়েই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, এই সমস্ত সম্মেলনকে সমন্বিত করার কোনো ইচ্ছা বা প্রয়াস কোথাও নেই, যদিও সম্মেলনের উদ্যোক্তারা একই আন্তর্জাতিক বৃত্তে ঘনিষ্ঠভাবে চলাফেরা করে থাকেন। আর এই সমন্বয় না থাকার ফলে সম্মেলনগুলির সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। আর একই চক্র সম্মেলন থেকে সম্মেলনে চলাফেরা থাকে—আরও ব্যাপক অংশকে সম্মেলনে টেনে আনার কোনো প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। অথচ এই মানুষদের ওপরেই সমন্বয় ও রূপায়ণের দায়িত্ব ন্যস্ত। সমালোচনার জবাবে অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে যে সম্মেলনের জন্য যে খরচ হয় সেটা গরীব দেশের প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। এখানে দুটি কথা বলার আছে। প্রয়োজন কিছুটা পূরণ হতে পারে যদি সম্মেলনগুলিতে বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁদের কাছে সম্মেলন হয়ে ওঠে নিজেদের কাজ ব্যাখ্যা করার একটা সুযোগ। ব্যাখ্যা করা হয় তাঁদের কাছে যাঁরা এই উন্নতি সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক। কিন্তু সম্মেলনের শেষে কোনো পক্ষেরই কোনো দায় থাকে না। প্রস্তাবগুলো কিভাবে সমন্বিত করলে গরীব দেশগুলো উপকৃত হয় তা দিয়ে কারও কোনো উদ্যোগ নেই। মোট কথা সম্মেলনে যাঁরা যোগ দেন তাঁরা কদাচই গরীব দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন। তাঁরা যোগ দেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে গরীব দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োগ করার ব্যাপারে কতকগুলো ভুল ধারণা নিয়ে। সম্মেলনের পরে যে-সব বিপুল-কলেবর বই প্রকাশিত হয় সেগুলো লাইব্রেরির তাকে বোঝাস্বরূপ হয়ে ওঠে। সচরাচর সে-সব বই কেউ পড়েন না, পড়ার প্রয়োজন বোধ করেন না।

অয়স্কান্ত

অঙ্গনা

নলিনীদির সঙ্গে কিছুক্ষণ

নলিনীদির (নলিনী দাশ) সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন 'আমাদের গ্রাহকেরা মায়ের (পুণ্যলতা চক্রবর্তী) অপ্রকাশিত গল্প ছাপাবার জন্য ঘন ঘন অনুরোধ করছেন।' 'সন্দেশ'-এর কার্যালয়-এ বসে আমাদের দুজনের কথা হচ্ছিল। তিনি আরও বললেন। পাঠক মনে করছেন তাঁদের একজন আপনজন, বন্ধু কোথায় হারিয়ে গেল। আমরাও ভাবছি এমন একজনকে হারিয়ে ফেললাম যিনি শুধু আমাদের জন্মদাত্রীই ছিলেন না, দেশের মেয়েদের নানা শিক্ষাদীক্ষা দেবার জন্যও তাঁর ভাবনা ছিল কত। সাহিত্যের জগতে পুণ্যলতা চক্রবর্তী একটি উজ্জ্বল নাম।

পুণ্যলতা চক্রবর্তী ১৮৯০ সালে ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামের এক বিশিষ্ট, বিদগ্ধ ও গুণী কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়ের নাম সর্বজনবিদিত। উত্তরাধিকারসূত্রে সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে আরও বিশেষ কতগুলি ক্ষমতা নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। পুণ্যলতারা ছিলেন তিন বোন তিন ভাই। দিদি সুখলতা রায় আর দাদা সুকুমার রায়ের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বাংলা শিশুসাহিত্যে তাঁরা অমর হয়ে থাকবেন। পুণ্যলতার পরের দু' ভাই সুবিনয় আর সুবিমল। তাঁদের মাঝে এক বোন শান্তিলতা—তিনি অল্প বয়সেই মারা যান।

'ছেলেবেলার দিনগুলি' বইটিতে পুণ্যলতা চক্রবর্তী বর্ণনা করেছেন আনন্দোজ্জ্বল বাল্যকালের দিনগুলির কথা—কিভাবে উপেন্দ্রকিশোর মুখে মুখে এক্জিবিশন, চিড়িয়াখানা এবং নানা দেশবিদেশের কাহিনী গল্পচ্ছলে তাঁদের বলতেন।

আঠারো বছর বয়সে পুণ্যলতার বিয়ে হয়। সংসারজীবনে প্রবেশ করে তিনি স্বামী শ্রীঅরুণনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিহারে চলে যান। সে সময় অরুণনাথ বিহারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এরপর তিনি স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। যেখানে গিয়েছেন সেখানেই পুণ্যলতাকে ঘিরে মেয়েরা গল্পশোনা, পড়াশুনা, কাঁথা সেলাই থেকে শুরু করে বিভিন্ন হাতের কাজ শেখার জন্য জড়ো হতেন।

কথায় কথায় নলিনীদি বললেন, আমরা তখন বেশ ছোট—দুর্ভিক্ষের চাঁদা জোগাড়ের জন্য 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটকটি সবাই মিলে করবো। অথচ বিহারের মত শহরে বই পাওয়া এক দুষ্কর ব্যাপার। মা তাড়াতাড়ি বইটি মুখস্ত করে আমাদের নাটকটি মঞ্চস্থ করিয়ে দিলেন। অদ্ভুত স্মরণশক্তি ছিল মায়ের। মায়ের কাছেই আমাদরে ছোটবেলায় বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয়। আমরা অনেক বড় হয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছি।'

গল্পলেখার প্রসঙ্গ উঠলে নলিনীদি বললেন 'নাতিরা ছোটবেলায় গল্প শোনায় বায়না ধরতো। সেজন্য মা বলতেন, 'আমি যখন থাকবো না আমার এই লেখাগুলি নাতিরা পড়বে।' হঠাৎ সত্যজিৎ রায় মেজ-পিসির এই লেখাগুলি আবিষ্কার করে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপতে দেন। 'একাল যখন শুরু হল' যুগান্তরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'ছোট্ট ছোট্ট গল্প' বইটি কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়। 'সাদির ম্যাজিক'এর অনেক কাহিনী নানা সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

পুণ্যলতার শিল্পজ্ঞান ও শিল্পদক্ষতার কথা উঠতে বললেন, 'মা নিজের মন থেকে নানা ডিজাইন করে ও সেই ডিজাইনে রং মেলাতেন। মেঝেতে পাতার স্যাপে নকশা না এঁকে একবারেই ডিজাইন করেছিলেন। টেবিল ক্লথ, পর্দার ডিজাইনে অভিনবত্ব আনাই মায়ের লক্ষ্য ছিল। এসব শিল্পজ্ঞান ও রুচিবোধ তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই তিনি মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন। তিনি ছোটবেলায় এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যে শিক্ষা জিনিসটি আমাদের কাছে কখনও নীরস বা কষ্টকর মনে হয়নি। অদ্ভুত গল্প বলার ক্ষমতা ছিল মায়ের।'

উপেন্দ্রকিশোর রায়ের শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ হয়ে পুণ্যলতা নিজেদের সন্তানদেরও সেভাবে বড় করে তুলেছেন। দুই গুণী মেয়ে কল্যাণী কার্লেকার ও নলিনী দাশ ও তাঁদের ছেলেমেয়েদের রেখে ১৯৭৪ সালের ২১ নভেম্বর ৮৫ বৎসর বয়সে পুণ্যলতা চক্রবর্তী পরলোক গমন করেন।

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

সংবাদ

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস সংসদ দলের কর্ম সমিতিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সভানেত্রীত্বে সংসদে শীঘ্রই একটি বিল আনার প্রস্তাব করা হয়। এতে নারী পুরুষের কাজের বেতনের মধ্যে বৈষম্য দূর করা হবে। হিন্দু বিবাহ আইন, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ও মুসলিম ব্যক্তিগত আইন সংশোধনের আইনও এতে উত্থাপিত হবে।

সমাজসেবিকা শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী

বিখ্যাত সমাজসেবিকা, প্রাক্তন এম-পি শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী ৬৬ বৎসর বয়সে ৮ মার্চ শেষ রাতে তাঁর কলকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করেন। শ্রীমতী পালচৌধুরী ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হতেই দেশের কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তিনি দেশের কাজ করার জন্য কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। দেশের ও দশের মঙ্গল করাই ছিল তাঁর ব্রত। ১৯২৪ সালে নদীয়ার জমিদার পালচৌধুরী বংশের শ্রীঅমিয় পালচৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সংসার জীবনের সঙ্গেও তাঁর দেশসেবার মহান ব্রত অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৯৫৮ সালে নদীয়া থেকে এক উপনির্বাচনে তিনি লোকসভার সদস্যারূপে সর্বপ্রথম নির্বাচিত হন। লোকসভার প্রতিনিধি হিসেবে তিনি হাঙ্গেরি, চীন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, পশ্চিম জারমানি, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি জাপানে পরমাণু অস্ত্র বিরোধী সম্মেলনে যোগদান করার জন্য গিয়েছিলেন। চীনদেশ থেকে তিনি সমাজসেবিকা হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন।

রাজনীতি ছাড়া বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক কাজের সঙ্গে তিনি গভীরভাবে জড়িয়ে ছিলেন। দেশের শিশু, নারী, অসুস্থ ও পীড়িতের উন্নতির জন্য সবসময় কর্মে লিপ্ত ছিলেন। এছাড়া বিদেশের নানা স্থান পরিভ্রমণ করে সেসব দেশের লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেছেন। ভারতীয় কেশচর্চা বা বিন্যাসের ওপরেও তাঁর নজর ছিল। তিনি ইন্ডিয়ান হেয়ার স্টাইলস-এর বাংলায় অনুবাদ করে নানারং নামে বই লিখেছেন। শ্রীমতী পালচৌধুরীর পরলোক গমনে দেশবাসীর সম্মুখে এক বিশিষ্ট সমাজসেবিকার আসনটি শূন্য হয়ে গেল।

ইকেবানা প্রদর্শনী

জাপানের ঐতিহ্যবাহী পুষ্পবিন্যাস প্রসাধনী ইকেবানা আজ দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কলকাতার সৌন্দর্যরসিক দর্শক ও মানুষের কাছেও ইকেবানার আকর্ষণ আজ কম নয়। বছরে বেশ কয়েকটা প্রদর্শনীও হয় কলকাতায়। সম্প্রতি ইউসিস অডিটোরিয়ামে একটি ছোট অথচ মনোহারী ইকেবানার প্রদর্শনী হয়ে গেল। বাঁঝি বছরের প্রথম প্রদর্শনী এইটেই। আয়োজক ওয়াফু-কাই সেন্টার অফ ইকেবানা, যার মধ্যমণি হচ্ছেন কাকেকু— নমিতা ভট্টাচার্য।

প্রদর্শনীর মাঝখানে রাখা গাছের গুঁড়ি, ঘেঁটু ও জবা ফুল দিয়ে তৈরী বসন্তের কণ্ঠস্বর সহজেই সকলের চোখ কেড়ে নেয়। ছাত্রীদের সাজানো কিছু গুচ্ছও দর্শনীয়। দীপা চ্যাটার্জির জানচ্যানেটের ফ্যাওয়ারে বিমূর্ত চিত্রকলার ছাপ সুন্দর। শুধুমাত্র গাঁদা ফুল, আর গাছের ডাল দিয়ে সাজানো এই গুচ্ছ অপূর্ব। কেতকী চ্যাটার্জির রিচুয়াল ফেমসয়েও আগুনের ছোঁয়া আছে মনে হয়। অন্যান্য স্তবকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মীনা বসুর ওয়ার্স সামার রিজ সুমিলা সেনের অ্যাডভেন্ট অফ স্প্রিং, মীরা চনচনিয়ার ফ্লাওয়ার অফ অটাম নলিনী সোমানের সিম্ফনি সাউ ইন্দ্রানী মুখার্জির গ্রেস। প্রতিটি স্তবকের মধ্যেই পুষ্প নির্বাচন রং ও বিন্যাসের সুন্দর মিলন ঘটেছে বলা যায়। দুদিনের এই প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন আমেরিকান কনসাল জেনারেল মিঃ হলব্রুক ব্রাডাল।

অঞ্জলি চৌধুরী

রান্না করে দেখুন

কয়েকটি স্বাদু পদ

এমন কিছু কিছু নিরামিষ স্বাদু পদ আছে যেগুলি রুটি বা ভাত দুটির সঙ্গেই খাওয়া চলে। রান্না করতে হয়তো খাটুনি একটু বেশী পড়বে কিন্তু রান্নার পর এদের স্বাদের বৈচিত্র্য এবং প্রিয়জনের হাসিমুখ এইসব খাটুনির আধিক্যের কথা ভুলিয়ে দেবে। এর মধ্যে এমন কয়েকটি পদও আছে যেগুলি রাঁধতে বেশী পরিশ্রম হয় না—ভোজকার রান্নার রকমফের হিসেবে এগুলি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। কয়েকটি পদ জলখাবার হিসেবেও খাওয়া যায় যেমন দইবড়া, পাউরুটির উপমা, সাবুর খিচুড়ি ইত্যাদি।

এঁচোড়ের মোগলাই কোপ্তা :

উপকরণ : ১ কেজি এঁচোড়, এক টুকরো আদা দুটি কাঁচা লঙ্কা বেসন ১ চা চামচ গরম মশলা ৫ কোয়া রসুন ১ চা চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো তিনটি পেঁয়াজ ধনে ও জিরে গুঁড়ো ১ চা চামচ করে কিসমিস ধনে পাতা কুচোনো ২টি টোম্যাটো নুন ও হলুদ তেল বা ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। এঁচোড় টুকরো টুকরো করে কেটে সেদ্ধ করে নিন। সেদ্ধ হয়ে গেলে শিলে বেটে নিন। ২। একটু ঘিয়ে খানিকটা কুচোনো পেঁয়াজ কিসমিস ও কাঁচা লঙ্কা ভেজে নিন। ৩। পেষা এঁচোড়ে খানিকটা বেসন মিশিয়ে গুলির আকারে গড়ে নিন এবং ভেতরে একটুখানি করে ভাজা পেঁয়াজ কিসমিস ও লঙ্কার পুর দিন। ৪। গুলিগুলো ছাঁকা তেলে বা ঘিয়ে ভেজে রাখুন। সমস্ত মশলা বেটে নিন। ৬। ঘিয়ে তেজপাতা দিয়ে এবং সমস্ত বাটা মশলা দিয়ে ভাজুন। নুন হলুদ ও টোম্যাটোর টুকরো ছেড়ে দিন। মশলা ভাল করে ভাজা হয়ে গেলে জল দিন। ৭। জল ফুটতে থাকলে গুলি বা কোপ্তাগুলো দিয়ে একটু ফুটিয়ে নামিয়ে নিন এবং গরম মশলা ও ধনেপাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

পাঞ্জাবী কাড়ি :

উপকরণ : কাঁড়ির জন্যে ৩ কাপ টক দই। ১ কাপ বেসন এক টুকরো আদা ১ চা চামচ গরম মশলা আধ চা চামচ হলুদ ১ চা চামচ জিরে গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ পাতা কুচোনো ১ টেবিল চামচ ঘি একটু হিং।

কাঁড়ির বড়ার জন্যে :

উপকরণ : ১ কাপ বেসন ২টি বড় পেঁয়াজ ২টি কাঁচা লঙ্কা ১ চা চামচ আমচুর আধ চা চামচ ধনে গুঁড়ো তেল।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। ১ কাপ বেসন কুচোনো পেঁয়াজ ও লঙ্কা আমচুর এবং ধনের গুঁড়ো দিয়ে খুব ভাল করে ফেঁটিয়ে নিন ও ছোট ছোট গোল বড়া ভেজে রাখুন। ২। কাঁড়ির জন্যে ১ কাপ বেসন দই ও হলুদ দিয়ে ভাল করে ফেঁটিয়ে নিন। ৩। ঘি গরম করে তাতে কুচোনো আদা ও আস্ত জিরে এবং হিং ফোড়ন দিন। ওই ঘিয়ে দইয়ের মিশ্রন ছেড়ে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কম আঁচে ফোটান। ৪। নুন ও ভাজা বড়াগুলো দিয়ে পাঁচ মিনিট ফোটান। ৫। নামিয়ে গরম মশলা ও ধনে পাতা দিয়ে গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ফুল ফ্যাওয়ার ইন্ সস্ :

উপকরণ : একটি বড় ফুলকপি ২৫০ গ্রাম টোম্যাটো ২৫০ গ্রাম পেঁয়াজ এক টুকরো আদা আধ পেয়ালা কুচোনো ধনে পাতা আধ চা চামচ গরম মশলা (গুঁড়ানো) আধ চা চামচ গুঁড়ো হলুদ, ১ টেবিল চামচ ময়দা বা কর্ণফ্লাওয়ার, আধ কাপ কুরুনিতে কোরা চীজ, ২ টেবিল চামচ ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। গরম জলে নুন দিয়ে আস্ত ফুলকপি ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। ২। ধুয়ে নিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না নরম হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অল্প জলে সেদ্ধ করুন। ৩। পেঁয়াজ ও আদা কুচিয়ে ঘিয়ে ভেজে নিন। টোম্যাটোর টুকরো হলুদ দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট নাড়াচাড়া করুন। ৪। ময়দা বাদামী করে ভেজে নিন। এক কাপ জল দিন। ৫। আগেকার ভাজা মশলা ও আরও এক কাপ জল দিয়ে পাঁচ মিনিট ফোটান। লংকার গুঁড়ো ও গরম মশলা গুঁড়ো দিন। ৬। একটা বড় আকারের পাত্রে সসটা ঢালুন এবং পরিবেশনের ঠিক আগেই আস্ত ফুলকপি এর মধ্যে দিয়ে পাঁচ মিনিট রাখুন। দু পিঠেই উল্টে-পাল্টে সস মাখিয়ে নিন। পরিবেশনের সময় ধনে পাতা ছড়িয়ে দেবেন।

সীতাফল কী সাগ (অর্থাৎ কুমড়োর তরকারি) :

উপকরণ : পাকা কুমড়ো এক কেজি, একটু হিং, দুটি শুকনো লংকা দুই চা-চামচ আমচুর ফোড়নের জন্যে মেথি দুই চা-চামচ চিনি বা এক টুকরো গুড় নুন হলুদ ও তেল।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। কুমড়ো খোসা ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে কাটুন। ২। তেলে হিং ও লংকা ফোড়ন দিন। ৩। কুমড়ো নুন ও হলুদ দিয়ে নাড়াচাড়া করুন এবং একটু জল দিয়ে ঢেকে দিন। ৪। সেদ্ধ হয়ে এলে আমচুর ও গুড় দিন এবং নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিন। এই তরকারি রুটির সঙ্গে খেতে চমৎকার।

মটর আলুর কাড়ি :

উপকরণ : ৫০০ গ্রাম ছাড়ানো মটর শুটি, ২৫০ গ্রাম আলু ২৫০ গ্রাম টক দই এক চা চামচ গরম মশলা একটু হিং দুইটি তেজ পাতা লংকার গুঁড়ো এক চা চামচ তেল।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। মটর শুটি শিলে মিহি করে বেটে নিন এবং গরম মশলা ও লংকার গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। ২। কড়াইয়ে তেল দিয়ে তাতে হিং ও তেজপাতা ফোড়ন দিন। ৩। পেষা মটরশুটি ভাল করে ভাজতে থাকুন। ৪। চার টুকরো করে কাটা আলু এবং নুন ও হলুদ দিয়ে দিন ও আবার একটু ভাজুন। ৫। দই ফেঁটিয়ে দিয়ে দিন। আলু সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে নিন।

সাবুর চপ :

উপকরণ : আধ কেজি আলু, এক কাপ সাবুদানা চারটি কাঁচা লংকা আধ কাপ গুঁড়ো করা চিনেবাদাম একটি লেবু ধনে-পাতা কুচনো নুন।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। সাবুদানা ২০ মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখুন। ২। আলু সেদ্ধ করে চটকে নিন। কাঁচা লংকা ও ধনে পাতা কুচিয়ে রাখুন। ৩। আলু সাবুদানা লংকা ও ধনে পাতা চিনেবাদাম লেবুর রস ও নুন একসঙ্গে চটকে নিয়ে ছোট ছোট চপের আকারে গড়ে নিন। ৪। ছাঁকা তেলে বা ঘিয়ে ভেজে চাটনি সহযোগে পরিবেশন করুন।

দহিবড়া :

উপকরণ : ২৫০ গ্রাম খোসা ছাড়ানো কলাইয়ের ডাল এক টুকরো আদা কাঁচা লংকা মৌরী হিং টক দই ২৫০ গ্রাম কিসমিস ভাজবার জন্যে তেল।

প্রস্তুত প্রণালী : ১। কলাইয়ের ডাল আগের রাত থেকে ভিজিয়ে রাখতে হবে। ২। পরদিন শিলে ভাল করে পিষে নিয়ে খুব ভাল করে ফেঁটিয়ে নিতে হবে। ফেঁটানো ডাল বাটা জলে দিয়ে দেখতে হবে ভাসছে কিনা—ডাল বাটা জলে ভাসলে বুঝতে হবে ফেঁটানো ঠিক হয়েছে। ৩। একটু আদা মৌরী ও হিং পিষে নিয়ে ওই ডাল বাটায় মিশিয়ে ফেঁটিয়ে নিতে হবে। ৪। এক টুকরো পাতলা সাদা কাপড় একটু জলে ভিজিয়ে নিয়ে দু ভাঁজ করতে হবে। মিশ্রণটি ভাঁজের মধ্যে রেখে এবং কাপড়ের ওপরে একটি চুড়ি রেখে চ্যাপ্টা অথচ গোলাকার করে নিতে হবে। ৫। মিশ্রণের গোলকটির মাঝখানে আদা ও কাঁচা লংকা কুচি ও একটি করে কিসমিস ভরে দিতে হবে। ৬। একটা বাটিতে গরম জলে নুন দিয়ে রাখতে হবে। ৭। তেল গরম করে চ্যাপ্টা গোল বড়া তৈরী করে করে লাল করে ভাজতে হবে। এবং তেল থেকে বার করে নিয়েই গরম জলে ফেলতে হবে। ৮। এই ভাবে সব বড়া ভাজা হয়ে যাওয়ার একটু পরে বড়াগুলো টিপে টিপে জল বার করে একটি এনামেলের বা স্টেনলেস স্টীলের থালায় সাজিয়ে রাখুন। ৯। পরিবেশনের ১০ মিনিট আগে নুন দিয়ে টক দই ফেঁটিয়ে ওই থালার ওপর ঢেলে দিন। ১০। প্রত্যেকের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন প্লেটে দুটি করে দই বড়া সাজিয়ে রেখে ছুরি দিয়ে প্রত্যেকটি চার টুকরো করে কেটে নিন এবং তার ওপর তেঁতুলের চাটনি ও নুন লংকা ও জিরে ভাজার গুঁড়ো ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

সাধনা মুখোপাধ্যায়

রূপসীর খাদ্য

গরম বেশ পড়ছে। সমস্যাও বাড়ছে—খাওয়ার, পোষাকের, আর সেই সংগে রূপ চর্চার। বাজার থেকে ধীরে ধীরে তরি-তরকারি, শাকসব্জ সব উঠে যাচ্ছে ও যাবে। বাইরের আবহাওয়ার সংগে সামঞ্জস্য রেখে খেতে হবে, পরতে হবে, সাজতে হবে। আবার সেই সংগে মনেও রাখতে হবে যে, গ্রীষ্মকালে শরীরের পক্ষে, ত্বকের পক্ষে, সৌন্দর্য রক্ষার পক্ষে কোন কোন জিনিস সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও ভাল। সাধারণ কতকগুলি ভুল ধারণার ফলে, আমাদের বহু ক্ষতি হয়েছে এবং হয়ে থাকে। সেই ধারণাগুলি বদলানই সবচেয়ে আগে দরকার। গ্রীষ্মকালে কিছুটা গরমের জন্য, আবার কিছুটা ঠিক মতন খাওয়ার জিনিস না পাওয়ার জন্য আমরা অনেকেই কম খেয়ে কিম্বা না খেয়ে থাকি। বা কেবলমাত্র এক গেলাস সরবত কিম্বা খুব সামান্য কিছু খাই। কিন্তু এটা খুব ভুল। বাইরের তাপ বেশী থাকাতে আমাদের শরীরের তাপও যথেষ্ট হয়। পেট খালি থাকলে ভেতরে গরম হয় এবং তাতে পেটের গোলমাল অনিবার্য। পেটের গোলমালের মধ্যে পেট খারাপ বা আমাশা গরমকালের বিশেষ ব্যাধি। আর এই দুই ব্যাধিতে মুখের ওপর যে কালি পড়ে তা চেহারা খারাপ করার পক্ষে যথেষ্ট। পেট ভর্তি রাখা বা ঠাণ্ডা রাখাটাই সবচেয়ে আগে প্রয়োজন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের মোটামুটি একটা খাওয়ার তালিকা থাকা দরকার। সেই তালিকার কিছু হেরফের লোকবিশেষে করা যেতে পারে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গেলাস পাতিলেবুর জল, মোটা রোগা সবাই খেতে পারেন। শুধু মোটারা জল একটু গরম করে খেলে বেশী ভাল হয়। তারপর যাদের চা খাওয়ার অভ্যেস আছে তাঁরা চা খেতে পারেন। কিন্তু চায়ের ব্যাপারেও একটু বলার আছে। চায়ের পাতলা লিকারে লেবু ও সামান্য চিনি দিয়ে খেলে ভাল। ওটা খেয়ে তারপর একটু বেলায় অর্থাৎ সকালের জলখাবার হিসাবে একটা কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করা ভাল। সাধারণতঃ আজকাল মেয়ে-পুরুষ সকলেই কাজে যান। সেই সব ক্ষেত্রে সকালের জলখাবার [illegible] করে নিলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে [illegible] এবং শরীর রক্ষা [illegible]

বেশীর ভাগ চাকুরিয়া সকালে রুটি মাখন ডিম বা লুচি ভাজা ইত্যাদি দিয়ে জলযোগ সেরে আবার ভাত-মাছ খেয়ে অফিসে যান। কিম্বা যে মহিলারা বাড়ীতে থাকেন, তাঁরা ন'টা নাগাদ জলখাবার সেরে আবার একটা-দেড়টার সময় ভাত তরকারি মাছ সহযোগে দুপুরের পর্ব সারেন। আমার এই লেখা যাঁরা নিয়মিত পড়েন, ধরে নেওয়া যায় তাঁরা সকলেই রূপ ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন। সুতরাং তাঁদের জন্যই আমার মেনু দিচ্ছি। আমার মনে হয় বিদেশীদের অনেক অনুকরণ আমরা করি ঠিকই, কিন্তু ভাল কয়েকটা অনুকরণও করা দরকার। সকালে চায়ের পর সাধারণতঃ ওরা খুব পেটভরা ব্রেকফাস্ট করে কাজে যান, তারপর দুপুরে কিছু খেয়ে নেন। সেটা সাধারণতঃ ফলের রস, সামান্য মাংস, রুটি-টোস্ট-স্যালাড জাতীয় হয়ে থাকে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও যেখানে ভেজাল খাওয়া বেশী সেখানে ঠিক এই রকম না হলেও কিছুটা করা যায়। যাঁরা খুব মোটা থেকে রোগা হতে চান, তাঁরা এবং অন্যেরাও লেবু-চায়ের পর একটা পাকা বেল ভেঙে চামচ দিয়ে কেটে কেটে খেতে পারেন। এতে পেট পরিস্কার থাকে ও রং উজ্জ্বল হয়। এটা আমরা জানি যে, পেট পরিস্কার থাকলে ত্বক মসৃণ থাকবেই। এগুলি খুব সাধারণ ও খুব সহজ, কিন্তু আমরা ভেবে করি না। সকালে এবারে আসল খাওয়ার কথায় আসা যাক। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে একটু নরম ঠাণ্ডা না খেলে শরীর মসৃণ ও ঠাণ্ডা থাকে না। যাঁরা খুব মোটা, ভাত একেবারে বর্জন করতে চান, তাঁদের তালিকা আগে দিচ্ছি।

একবাটি পাতলা ডালের জল—তাতে লেবুর রস শশা কুচি টমেটো কুচি (যদি পাওয়া যায়) ও একটু নুন দিয়ে খাওয়া। তার সংগে থাকবে একটি মুরগীর ডিম সেদ্ধ, একটি পাকা কলা, দুটি পাঁউরুটি টোস্ট কিম্বা মুড়ি ডালে ভিজিয়ে খাওয়া চলতে পারে। তার সংগে সবশেষে এককাপ গরম দুধ সর তুলে কিম্বা ছানা। ছানার জলটা কিন্তু দুপুরের দিকে কিম্বা বিকেলের দিকে খেয়ে নেওয়া চলতে পারে।

আর যাঁরা রোগা বা সাধারণ চেহারার তাঁরা এ-সবের সংগে রুটি বা মুড়ি না খেয়ে দুপুরে সামান্য ভাতের সংগে পাতলা করে মাছের ঝোল খাবেন। ভাত শরীরকে কিন্তু একটু সরস রাখে। তাছাড়া কমনীয়তাও আনে। গ্রীষ্মকালে খুব মোটা হলেও সপ্তাহে অন্তত একদিন খুব কম করেও একটু ভাত ও পাতলা মশলা ছাড়া ঝোল খেতে পারেন। দুপুরের দিকে ডাবের জলের রস, কোন ফল, ছানা, টক দই-এ শশা-কুচি, পেঁয়াজ-কুচি, টমেটো-কুচি নুন গোলমরিচ ইত্যাদি দিয়ে খেলে পেটের পক্ষে ও ত্বকের পক্ষে খুবই ফলদায়ক।

বিকেলে কিছু না খাওয়াই ভাল। যদি খাওয়ার প্রয়োজন বোধ হয়, তাহলে খোলায় ভাজা চিঁড়ে মুড়ি ইত্যাদি খাওয়া চলে। ছোলা সেদ্ধ করে নুন গোলমরিচ কাঁচা পেঁয়াজ ইত্যাদি দিয়ে চায়ের সংগে একটু খাওয়া চলে। শশা শাঁকআলু পাকা পেঁপে ইত্যাদি ফল বিকেলের জলযোগ করলে ভালই। তবে এখন কাঁচা আমের সময়। আম খাওয়া ভাল। কিন্তু পাকা আম খুব বেশী খেলে মেদবহুল শরীরের পক্ষে ভাল নয়।

কলা কাঁচা বা পাকা—দুই-ই খাওয়া ভাল। কাঁচা কলায় আয়রণ যথেষ্ট আছে। সেটা শরীরের পক্ষে রক্তের পক্ষে ভাল। কাঁচকলা সেদ্ধ করে চটকে নিয়ে তাতে একটু নুন গোলমরিচ, টমেটো-কুচি, কড়াইশুঁটি সেদ্ধ (শীতকালে) বা আদা কুচি পেঁপে সেদ্ধ ইত্যাদি মিশিয়ে তাতে একটু সস-সহযোগে রাত্রের খাওয়ার সংগে চলতে পারে। পাঁউরুটি টোস্ট বা আটার রুটি দিয়ে এই সেদ্ধ রাত্রের খাদ্যের সংগে খাওয়া যায়। সব্জি যা গ্রীষ্মকালে পাওয়া সম্ভব সেগুলি কাঁচা লংকা ও কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে খাওয়া যায়। ডাল পাতলা করে নুন লেবুর রস দিয়ে ও সঙ্গে মাছ বা মাংস সেদ্ধ। এটা মনে রাখা উচিত যে, খাদ্য-তালিকা থেকে ঘি তেল বর্জন করা বিশেষ দরকারী। এছাড়া দই (টক) বা সর-ছাড়া দুধ কিম্বা হরলিকস সবশেষে খেয়ে নেওয়া দরকার।

আমাদের একটা রীতি আছে যে, রাত্রের খাওয়া সাধারণতঃ আমরা দশ সাড়ে দশটায় খাই। এটা কিন্তু শরীরের পক্ষে ভাল না। রাত্রের খাওয়া সন্ধ্যা ৮টার মধ্যে শেষ করে শোয়ার আগে দুধ বা হরলিকস জাতীয় কিছু খেয়ে শুলে ভাল। আর রাত্রের খাওয়া ও শোয়ার আগে মুখ-হাত ধোয়া ও শেষে প্রসাধন সেরে ফেলা ভাল। অবশ্য নিমন্ত্রণ থাকলে বা কোথাও যেতে হলে আলাদা। তাহলেই দেখুন খাদ্যে পুষ্টি ও সেই সংগে স্বাদ—দুটোই বজায় রেখে খেলে শরীর ও সৌন্দর্য দুটোই ঠিক থাকে।

তবে এর মধ্যে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, যদি কারোর ত্বকে বা শরীরের কোন বিশেষ অসুস্থতা বা রোগ থাকে—যাতে বিশেষ ধরনের কোন ফল বা লেবু বা ছানা ইত্যাদি খাওয়া চলে না—সেই ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু সেটা ডাক্তারের সংগে আলোচনা করে খাবেন।

বরবর্ণিনী

উপন্যাস

শেষবিচার

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বঙ্কিম দত্ত যা চান রঞ্জু তা নয়। তার চিন্তার জগৎ পরিবেশ সবই স্বতন্ত্র। আর যুঁইদি এসে যেন ষোল বছরের রঞ্জুর মানসিক জগৎকে পর্যন্ত আমূল পাল্টে দিয়েছে। বিবাহিতা যুঁইদি যেন তাকে কাঁচপোকার মত আকর্ষণ করছে। বঙ্কিমবাবুর মত কি অমিয়ই হতে পেরেছে? শুধু একটা ভয় তার বাবার মতই। তার বন্ধু রুদ্রেন্দু গরীব এবং বিপ্লবী মেজাজের বলে তাকে সেও এড়িয়ে চলতে চায় ভয় করে। সেই রুদ্রেন্দুর সঙ্গে হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল অমিয়র। প্রথমটা সে খুব বিব্রত হলেও পরে সামলে নিল এবং বেশ ঠাট্টার মেজাজেই ঠুকে ঠুকে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। যেন একটা মজার লোকের সঙ্গে কথা বলছে সে।

সেই দৃশ্যটা হঠাৎ রঞ্জুও দেখে ফেলল দূর থেকে। বাবার পাশে এক ঝাঁক টিয়ের মত টুটুলদের দলটা। সবাই আজ শাড়ি পরেছে। বাবাকে দেখাচ্ছে যেন একটা বুড়ো ভালুক। তার পাশে বাবার বন্ধু রুদ্রেন্দুকে মনে হচ্ছে ক্ষীণ রোগা তাড়া খাওয়া শেয়াল। বাবার পাশে গোপাও আছে। তার সঙ্গে গোপার একটা নীরব সম্পর্ক আছে। যেটা কেউ জানে না। কাল রঞ্জু যুঁইদির সঙ্গে কেষ্টনগর চলে যাবে বেশ কিছুদিনের জন্যে। সেই খবরটা ওকে দেবার জন্যে ভেতরে ভেতরে চঞ্চলতা অনুভব করে রঞ্জু। রঞ্জুও সুযোগ পেল ডাঁটে যখন গানের আসর বসিয়ে ছিলেন বাবা। রঞ্জু তখন তার পড়ার ঘরে যুঁইদির সামনে বসে কেষ্টনগরে যাবার জন্যে গোছগাছ করছিল। তার মধ্যেই সে ফাঁক বুঝে কথাটা বলে ফেলল বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে।

—বাইশ—

নিজেকে একটা টিকটিকির মতন মনে হচ্ছিল রঞ্জুর। যেন সে সব কিছু দেখছে, সবাইকে দেখছে, অথচ তাকে কেউ দেখছে না। দেখতে পাচ্ছে না।

নিঃশব্দে দেওয়াল ধরে হাঁটছে সে। এই বারান্দা থেকে সেই বারান্দায় যাচ্ছে। তার পায়ের শব্দ নেই। টিপে টিপে হাঁটছে।

যুঁইদি শুয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত জলপাই রঙের ঢাউস সুটকেসটা ভাল করে আর গুছোনই হল না। থাক গে, কাল সকালে যা হয় হবে— ভাল লাগছে না আর। অর্থাৎ যুঁই নিজেও বাকসটা গুছোল না। রঞ্জুকেও কাজটা শেষ করতে দিল না। আধখেঁচড়া হয়ে রইল।

তাতে অবশ্য রঞ্জুর দুঃখ নেই। সুটকেস গুছোনটা বড় কথা নয়। বরং যুঁইদি যে এখন আরাম করে শুয়েছে যেমন মুহুর্মুহু হাই ভাঙতে আরম্ভ করেছিল শেষ দিকটায়। কালো চোখ সোনালী হয় হয়ে পরে যেমন রক্তজবার মতন টকটকে কলঙ্কের চেহারা ধরল। এক একবার বোজা চোখ মেলে রঞ্জুকে দেখছিল, আর রঞ্জুর হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠেছিল। তার মনে হচ্ছিল মানুষটা আর নিজের মধ্যে নেই। বোধ বুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেছে।

বুঝি একটা রক্তারক্তির পেশায় তাকে পেয়ে বসবে এখনি। যদি চেয়ার থেকে ছিটকে লাফিয়ে যুঁইদি বিছানায় রঞ্জুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?

তাই তো, মানুষের চোখ রক্তবর্ণ হয়ে গেছে দেখলে কতসব সর্বনাশের কথাই মনে হয়। অসংখ্য আ-ডাক কু-ডাক ডাকে মনে।

একদিন রঞ্জুর বাবার জ্বর হয়। চোখ দুটো এমন লাল হয়ে গিয়েছিল বাবার। মা খাটের পাশে একটা টাব বসিয়ে জল ঢেলে বাবার মাথা ধুইয়ে দেয়। রঞ্জু তখন পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছে। বেশ কিছুক্ষণ জল ঢালার পর বাবাকে মা জিজ্ঞেস করেন আর জল ঢালব কি? বাবা কিন্তু কথার জবাব দিল না। এইবার মাথাটা একদিকে কাত করে মার মুখটা দেখল। ওঃ রঞ্জুর মনে আছে সেই রক্তবর্ণ চোখে বাবা যখন মাকে হঠাৎ দেখছে রঞ্জুর হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে গলার কাছে চলে আসে। কেমন একটা ত্রাস নিয়ে মার হাত ধরে খাটের পাশ থেকে টেনে সরিয়ে আনতে গেল সে। মা চমকে উঠল। কি হচ্ছে! বাবা চমকে উঠল না। ঠোঁট ফাঁক করে একটু শুধু হাসল। রঞ্জু তক্ষুনি তার হাতটা গুটিয়ে নেয়। এমন লজ্জা পেল সে। —কি হল খোকন! মা তাকে জিজ্ঞেস করে। লাল চোখ নিয়ে বাবা ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। —আমাকে কিছু বলবি তুই। মা ফের প্রশ্ন করে।

কি আর উত্তর দিত সে। রঞ্জু এত লজ্জা পেয়েছিল সেদিন। সেখানে তার দাঁড়াবার। মা ভেবেছিল রঞ্জু বুঝি কিছু বলতে গিয়ে এভাবে তাঁর হাত ধরে টানল।

কিন্তু রঞ্জু কি করে মুখ ফুটে মাকে তার ভিতরের কথাটা বলত।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একা বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কথাটা অনেকক্ষণ সে চিন্তা করেছিল। এত খারাপ লাগছিল মা তার! নিজেকে যা-তা করে গালাগাল করতে ইচ্ছে করছিল। ছি ছি ছি! এমন দিল-খোলা সরল সাদাসিধে মানুষ বাবা। আর সে কিনা ভাবল—বাবা রক্তবর্ণ চক্ষু মেলে মাকে যখন দেখছিল—বাবা বুঝি তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে বসে মার ঘাড়টা মটকে দিত।

প্রায় আট দশ বছর আগের ঘটনা। খুবই ছেলেমানুষ ছিল রঞ্জু। তাই বাবাকে দিয়ে সেদিন এমন যাচ্ছেতাই একটা আতঙ্কের ভাবনা তার মনে জেগেছিল। এখন অবশ্য মনে পড়লে সে হাসে!

একটু আগে যুঁইদির রক্ত-ছোপানো চোখ দেখে হঠাৎ আজ আবার একটা ত্রাস, তাকে এভাবে আক্রমণ করল। ঘাড় মটকে দেওয়া নয়। যদি তাকে বিছানায় জড়িয়ে ধরে যুঁই! জানালাগুলি খোলা দরজাটা হাঁ-খোলা। বাড়ির সবাই জেগে। ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। এই অবস্থায়—

ত্রাসটার মধ্যে একটা সুখের চাপা উত্তেজনা ছিল, রোমাঞ্চও খুব ছিল। আবার কাঁপড়ে পড়া ভাবটাও কম ছিল না। কে জানে যুঁইদি সত্যি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলছে কিনা। বলা যায় কি।

ভেবে রঞ্জু তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে পড়ে। —তুমি শুয়ে পড়, তুমি আর বসে

থাকতে পারছ না। ফিসফিসিয়ে বলেছিল সে।

—তাই দাও। কাতর গলায় যুঁই বলেছিল আমায় শুইয়ে দাও লক্ষ্মীটি। আর একটুও জেগে থাকতে পারছি না।

—সুটকেশটা গুছোনো হল না তোমার।

—যাক গে কাল সকালে যা হবার হবে। আর ভাল লাগছে না। শিগগির আলো নিভিয়ে দাও।

—হুঁ, দিচ্ছি।

বিছানা পাতাই ছিল। চট করে দোরটা ভেজিয়ে দিল রঞ্জু। তারপর যুঁইদির হাত ধরে আস্তে টেনে তুলে তাকে খাটে শুইয়ে দিল। আঃ, যুঁই একটা আরামের নিঃশ্বাস ছাড়ল। রঞ্জু তখনই আলো নেবায় না। এখনও যে সে এ-ঘরে আছে এই অবস্থায় শুধু অন্ধকার করা যায়! বাড়ির সবাই ভাববে কি! অন্ধকার বাথরুমে ঢুকে রঞ্জুর চোখ মুখ শুইয়ে দেওয়া আলাদা জিনিস। এটা শোবার ঘর।

আলোর জন্য যুঁই আর তাকাচ্ছিল না। রঞ্জুর ভাল লাগল। ওর ভয় কর চোখ দুটো আর তাকে দেখাতে হচ্ছে না। দুটো গোলাপী পাপড়ির নিচে চোখের বেসামাল রক্ত ঢাকা পড়েছে।

কিন্তু যুঁইয়ের সবটা শরীরই গোলাপী না। খানিকটা খানিকটা বাদামী। যেখানে রোদ বেশি লাগে সেখানটা বাদামী। রঞ্জু চিন্তা করল। এবং যেখানে একেবারেই কোনোদিন রোদ লাগে না? শরীরের সেসব টুকরো টুকরো লুকোনো অংশ গোলাপী না হয়ে স্রেফ দুধ-সাদা হবে অনুমান করতে রঞ্জুর একটুও কষ্ট হল না। যুঁইদির শরীরের ওপর ঝুঁকে মশারীটা খাটিয়ে দেয় সে।

টুবলির গায়ের রং ঠিক গোলাপী বলা যায় না। কাঁচা মাংসের রং। টুবলির শরীরে রক্তের পরিমাণ অনেক বেশি। ওফ, টুবলির যখন ঘুম পায় আর তার দু চোখ লাল হতে থাকে সেই লাল একসময় কী ভয়ংকর হয় ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয় রঞ্জুর।

যদি গোলাপী বলতে চাও, আসল গোলাপী রঙ, যা দেখলে চোখ জুড়োয়, —কেবল চোখ জুড়োয় নয়—বুকের মধ্যে গোলাপের মতন একটা মিষ্টি ঘুমেভরা গন্ধ জাগে তবে ফ্লেমিংগোর দিকে তাকাও— কিছুক্ষণ আগে ভজন গেয়ে এ বাড়ীর সবাইকে যে মাত করে দিয়ে গেল।

মশারী খাটিয়ে রঞ্জু আলো নিভিয়ে দিল। যুঁইদি এখন সাত হাত ঘুমের নীচে তলিয়ে গেছে। ফুরুৎ ফুরুৎ নাক ডাকছে। খুব অল্প শব্দ। এই জন্য খারাপ লাগে না। ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে করে দোরটা ভেজিয়ে রঞ্জু বারান্দায় দাঁড়াল। এক গলা শিউলির গন্ধ নিয়ে বাড়ীটা মাতাল হয়ে আছে। যেন সব ঘুমিয়ে পড়েছে। অথচ প্যাসেজের আলোটা জ্বলছে।

রঞ্জু হাঁটছে। তার পায়ের শব্দ হয় না। সব কিছু সে দেখছে। যেন তাকে কেউ দেখছে না। যে জন্য এই মাত্র নিজেকে টিকটিকি ভাবতে তার মোটামুটি খারাপ লাগল না।

অবাক হল সে বাবার শোবার ঘরের দরজায় পৌঁছে। পাল্লা দুটো অল্প ভেজান। বাবা নেই। বাবা তা হলে কোথায়। মা-কেও দেখছে না তো। তবে কি খালি ঘরে আলো জ্বলছে! অম্বুজা-নিলয়ের ইতিহাসে এমন আর ঘটে নি। ঘরে লোক নেই, আলো জ্বলছে। কেউ হাঁটাচলা করছে না প্যাসেজে আলো জ্বলছে। বুড়ো তবে কোথায়।— হৈ-চৈ চেঁচামেচি নেই কেন আজ।

পুবের বারান্দা ছেড়ে দক্ষিণের বারান্দায় এসে রঞ্জু আরও বেশী অবাক হল। বঙ্কিম দত্তর ঘর হাঁ-খোলা হয়ে পড়ে আছে। কর্তা নেই ঘরে। এখানেও মিছিমিছি আলো জ্বলছে। তাজ্জব কাণ্ড।

তা হলে বাপ বেটা এখনও নীচে। রঞ্জু অনুমান করল। খাওয়ার আগে একতলার বারান্দায় কি নিয়ে যেন খুব কথা-বার্তা হচ্ছিল ওদের। খেয়েদেয়ে আবার বুঝি দুজন নীচে নেমে গেছে জরুরী আলোচনা সারতে। কি নিয়ে আলোচনা?

তারপর রঞ্জুর মনে পড়ল টুটুনে এখনও যুঁইদির কাছে শুতে যাচ্ছে না! টুটুন গিয়ে ও ঘরের দরজা বন্ধ করবে। রঞ্জু শুধু পাল্লা দুটো ভেজিয়ে রেখে এসেছে। আর সে যাচ্ছে এখন টুটুনের ছোট্ট মেয়েলী গন্ধেভরা ঘরটায় শুতে।

কিন্তু কারো যেন শোয়াটোয়ার গরজ নেই আজ। কেবল যুঁইদি ঘুমিয়ে পড়েছে। কাল রঞ্জু ওর সংগে কেষ্টনগর পাড়ি দিচ্ছে।

কয়েক পা এগোবার পর রঞ্জু থমকে দাঁড়ায়। এখানেও আলো জ্বলছে। দরজার পাল্লা দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। টুটুনের ছোট্ট খাটের ওপর মা বসে আছে। টুটুন দাঁড়িয়ে। যেন ঘাড় গুঁজে নখ খুঁটছে।

এদেরও কি জরুরী আলোচনা? ব্যাপারটা কি! ভিতরে ঢুকতে গিয়ে রঞ্জু কাঠ হয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল। মা-র কপালের রগ দপদপ করছে। মা-র মুখের রঙটা কেমন তামাটে তামাটে দেখাচ্ছে। তিতিবিরক্ত হয়ে হয়ে মহিলার এই দশা হয়েছে। টুটুনটা দরজার দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে। যে জন্য ওর মুখটা দেখছে না রঞ্জু। মুখ না দেখে সে অনুমান করছে নীচের দিকে থুতনি রেখে টুটুন হাতের নখ খুঁটছে। না কি কিছু নালিশ করছে মা-র কাছে। কারো নামে কিছু লাগাচ্ছে? এই এক দোষ মেয়ের। ভেতরটা ভয়ানক কুটিল। বাইরে থেকে বুঝবে কার সাধ্য। ভারী নিরীহ পুতুল পুতুল চেহারা যেন ভাজা মাছটাও উল্টে খেতে জানে না অথচ কত অন্ধকার মনে। কার নামে লাগাবে? রঞ্জুর? যুঁইদিকে নিয়ে? ভাল. মনে মনে রঞ্জু হাসল। সেই রাস্তা যুঁই একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। ওকে নিয়ে আমাকে নিয়ে তুমিও খুকি মুখ খুলতে পারছ না, মা-ও কিছু বলতে পারছে না। মা-কে কত দাম দিয়ে শাড়ী কিনে দিয়েছে। এক কাঁড়ি টাকা ফেলে তোমাকে বাহারের ফ্রক কিনে দিল। বাবার রোজগার নেই। কিপটে বুড়ো বঙ্কিম দত্তর পেনসনের পয়সায় এই জীবনে এত ভাল ছিটের ফ্রক পরেছ কোনদিন? আর এই যে দু দিন ধরে রঞ্জুকে দিয়ে যুঁইদি গাদা গাদা কসমেটিকস কেনাচ্ছে, তার থেকে এটা-ওটা তোমাদের দুজনকেও কি বিলিয়ে দিচ্ছে না। আজ সকালে যুঁইদির দেওয়া পীয়র্স সোপ মেখে মুখখানাকে ফুলের মতন ফরসা করে ও যুঁইদির দেওয়া টকটক লাল রীবন জড়িয়ে হর্স-টেল বেণী বেঁধে বন্ধুদের নিয়ে বাবার সংগে পাখি দেখতে বেরিয়েছিলে না! কত বছর পরে মা-র মুখে গলায় আজ পাউডারের ছোপ দেখা যাচ্ছে। তা-ও যুঁইদির দেওয়া। ভবানীপুর যাবার আগে মা সে ডিবে উপুড় করে বেশ খানিকটা ঢেলেছিল বোঝা যায়। কাজেই যুঁইদিকে জড়িয়ে আমাকে নিয়ে তোমরা ফিসফাস করবে না জানা কথা। তা হলে এতটা রাত অবধি ওই একটা ঘরে আমাদের দুজনকে একলা ছেড়ে দিয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে না। এর মধ্যে অন্তত দশবার রঞ্জুর ডাক পড়ত—এই শুতে আয় শুতে আয়, ওঘরে তো আজ শুবি না তুই, তোর অন্য জায়গা। যুঁইকে বিশ্রাম করতে দে। ওর ঘুম পেয়েছে।

তবে? তা হলে!

রঞ্জু ঠিক বুঝতে পারছিল না। কাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। বাধ্য হয়ে আর একটু
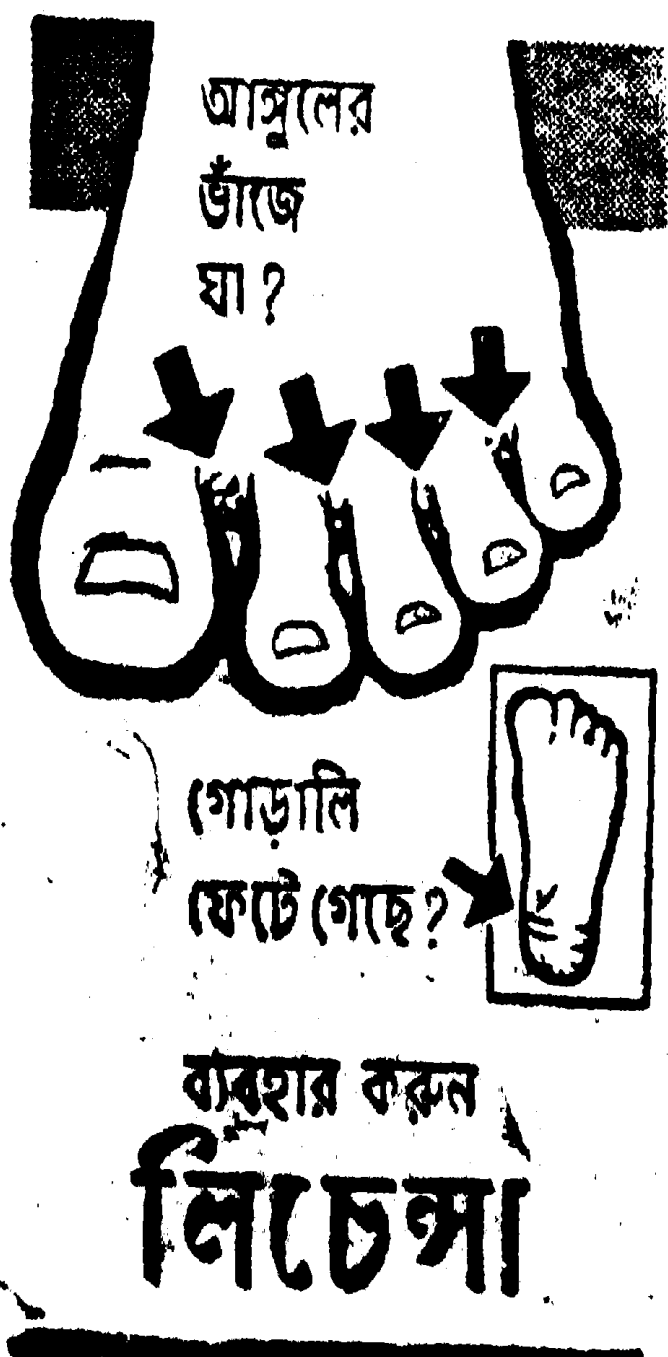
বেশী টিকটিকি হয়ে গেল সে। আর একটু বেশী সামনের দিকে ঝুঁকে দরজার একটা পাল্লার সঙ্গে শরীরটা লেপটে রাখল, যাতে একটা মানুষ এখানে দাঁড়িয়ে আছে বোঝা না যায়। তারপর চোখ দুটোকে দু পাল্লার মাঝখানের ফাঁকটুকুর কাছাকাছি একটা জায়গায় জাগিয়ে রেখে শ্বাস বন্ধ করে থাকল।

—হুঁ, তারপর, তারপর কোথায় গেল দুজনে? মার গলা।

—একটা ভীষণ বড় গাছ, সেই গাছটার আড়ালে চলে গেল। টুটুন বলল, ওটা যে কি গাছ আমি চিনতে পারি নি মা।

—গাছ চিনতে তোমাকে কে বলছে বোকা মেয়ে। যে-কথা বলছি তার উত্তর দাও। ভুরু কপাল কুঁচকে মা টুটুনকে ধমক লাগায়। বটানিক্যাল গার্ডেনে কি গাছের অভাব। হাজারটা গাছ হাজারটা নাম। জিজ্ঞেস করছি ওখানে গেল কেন ওরা, মোটা গাছের আড়লে কি করছিল দুটিতে।

টুটুন কি ঘাড় গুঁজে আবার নখ খুঁটছে। রঞ্জু নিজের মনে হাসল। এবার সে নিশ্চিন্ত। তার নামে খুঁইদির নামে নালিশ হচ্ছে না। বটানিকস-এর কোন ব্যাপার। পাখি দেখতে গিয়ে কিছু হয়েছে। একটা সাংঘাতিক বড় গাছের আড়ালে চলে গেছে দুজন। কারা দুজন? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ সেখানে। গুঁড়ি মোটা শাল সেগুন বট অশ্বত্থ নিম সুঁদরি জারুল তেঁতুল। গাছের কি শেষ আছে। আকাশ অন্ধকার করে জটলা করে এক একটা জায়গায় গাছেরা দাঁড়িয়ে। একবার যদি কেউ সে সব গাছের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাকে খুঁজে বার করা মুস্কিল। এই সেদিনও রঞ্জুরা ঘুরে-ফিরে সবটা বাগান দেখে এসেছে। না, একটিও মেয়ে ছিল না তাদের দলে। পার্থ শোভন এই নিয়ে সারা দিন আফসোস করল। পরে মন খারাপ করে পেন-নাইফ দিয়ে এক একটা গাছের গুঁড়িতে শুধু নিজেদের নাম খোদাই করে সন্ধ্যেবেলা তাদের ফিরে আসতে হল। নামগুলি কেমন ন্যাংটো ন্যাংটো দেখাচ্ছিল। এখানে তো তবু ওদের একজন পুরুষ সাক্ষী ছিল। বাবা। হুঁ। তারপর! নালিশটা শুনতে রঞ্জু কান খাড়া করল।

—কতক্ষণ ছিল ওরা গাছের আড়ালে? মা তাড়া লাগায়। টুটুন আবার চুপ। যেন একটা কথা ওর মুখ থেকে বেরোয় তো তিনটে কথা ঢোকের সঙ্গে পিছলে পেটের ভিতর ঢুকে পড়ছে। কতক্ষণ ছিল? মা-র মুখের তামাটে রঙ প্রায় কালো হয়ে যাচ্ছিল।

—দশ পনেরো মিনিট। আন্দাজ করে টুটুন বলল।

—কি করছিল ওরা ওখানে? মা-র গলা ক্রমশ ধারালো হচ্ছিল।

—আমরা ঠিক বলতে পারব না। যেন মার চোখের দিকে তাকাতে ভয়। টুটুন আবার থুতনিটা নামায়।

—তোরা বাকী মেয়েরা কোথায় ছিলি ঐ সময়টায়? মা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে।

—একটা বকুল গাছের নীচে ঘাসের ওপর বসে।

—বকুল গাছের নীচে ঘাসের ওপর বসে। মা চোখের সামনে বকুল গাছ ও বকুলের ছায়ায় বড় বড় ঘাস দেখছিল। আর সেই সঙ্গে কটমট করে নিজের মেয়েকে দেখছিল। হঠাৎ মা-র গলা থেকে হুম একটা শব্দ বেরোল। দেওয়ালের র‍্যাকেটে এলোমেলো করে রাখা টুটুনের একটা জামা ঝুলছিল। হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে ভাজ করে মা সেটা আবার র‍্যাকেটে তুলে রাখল। —বেশ তো। যেন ইচ্ছে করে গলার স্বরটা এবার খানিকটা ভোঁতা করে নিয়ে মা বলল, গাছের আড়ালে ছিল ওরা। গুঁড়ি মোটা গাছ। এধারে ঘাসের ওপর বসে থেকে তোরা কিছুই দেখছিলি না। ভাল কথা। দশ পনেরো মিনিট পরে যখন দুটিতে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তখন তোরা জিজ্ঞেস করলি না কিছু ওদের?

টুটুন আবার ঘাড় গুঁজল। বা গুঁজতে যাবে—খপ করে মা ওর মাথাটা ধরে ফেলে ঝাঁকুনি লাগাল।

—এই, এদিকে আমার দিকে তাকিয়ে কথার উত্তর দে। তোরা কেউ কি জিজ্ঞেস করেছিলি ওরা কি করছিল ওখানে?

—হুঁ। টুটুন থুতনি নাড়ল।

—কে জিজ্ঞেস করেছিল। তুই?

—গৌরী।

—কাকে জিজ্ঞেস করেছিল গৌরী? তোর বাবাকে!

—না, গোপাকে। হুস করে টুটুন বলে ফেলল।

ভাল রে ভাল। রঞ্জু পা বদল করে দাঁড়াল। যদিও তার পায়ে-হাতে বড় বড় মশা কামড় বসাচ্ছিল, গ্রাহ্য করল না সে। মশা মারার সময় না এটা। বা মশার কামড় খেয়ে এখান থেকে সরে যাবার মতন অবস্থাও না। মনে মনে সে বলল। দারুণ ইন্টারেস্টিং খবর শুনেছি। বাবাকে নিয়ে ফ্লেমিংগোকে নিয়ে কেস। কানটান গরম হয়ে যাবার কথা। কিন্তু আমি তোমার মতন বোকা না টুটুনমণি। বা চট করে মা-র মতন আমার মাথাও গরম হয় না। সবটা তো আগে শোনা যাক। তারপর বিচার করা যাবে।

—হুঁ, কি বলছিল গোপা? মা-র মুখের চামড়া তামাটে থেকে কালো, হতে হতে এবার ঝপ করে ফ্যাকাশে হলুদ রঙ ধরেছে। কি করছিল ওরা মোটা গাছটার আড়ালে এতটা সময়?

—হরিয়াল পাখি দেখছিল। কাঁপা কাঁপা গলায় টুটুন বলল,— গোপা শব্দ করছিল না। বাবা আমাদের বোঝাল, গোপা আজও হরিয়াল চিনল না। ওকে সুন্দর পাখিটা দেখিয়ে আনলাম।

—সুন্দর পাখিটা দেখিয়ে আনলাম! যেন বাবাকেই একটা বড় করে ভেংচি কাটল মা, এমন চোখ মুখ করে টুটুনকে দেখল। তোরা বাকী মেয়েরা সবাই হরিয়াল চিনতিস?

—হুঁ। টুটুন ঘাড় কাত করল।

মা-র গলায় আবার হুম শব্দটা শোনা গেল। দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে একটু যেন কি ভাবল। তারপর মেয়ের দিকে তাকাল।

—আলাদা করে ওই মেয়েকে ডেকে নিয়ে আর কি পাখি দেখিয়েছে ও?

—আর পাখি দেখায় নি। কি এক জাতের ক্যাকটাস দেখিয়েছে।

—পাখি ছেড়ে হঠাৎ ক্যাকটাস কেন! রঞ্জু দেখল মা-র চোখের মণি মার্বেলের মতন গোল হয়ে উঠেছে। যেন শ্বাস ফেলছিল না। —তোরা তখন কোথায়?

—একটা শিমুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে।

—ক্যাকটাস দেখার ছুতো করে ওরা দুজনে এবার কতটা দূরে গেল?

—অনেকটা। খানিকটা এগিয়ে একটা ঝাঁকড়া মাথা জলপাই গাছের পেছনে ফণী মনসার জঙ্গল। সেই জঙ্গল পার হয়ে গোপাকে নিয়ে বাবা আর একটা বড় ঝোপের কাছে চলে গেল।

—কী সাংঘাতিক কথা! বড় ঝোপের কাছে চলে গেল না কি ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। রঞ্জু দেখল মা যেন বটানিকস-এর সেই ঝোপঝাড়ের কাছে ছুটে গেছে। যেন সাপের মতন চকচকে চোখ করে ফণা
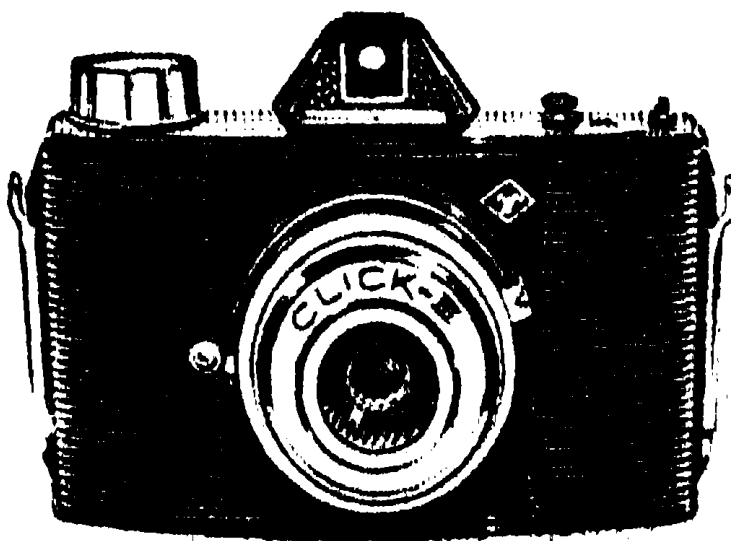
…গিয়ে গোপাকে ও বাবাকে খুঁজছে। এভাবে কিছুক্ষণ ঘরের দেওয়ালটা দেখল মা। পরে টুটুনের দিকে তাকাল। —অ্যাঁ, তোরা বলছিস কি, ফণীমনসাও তো এক ধরনের ক্যাকটাস। আবার কোন ক্যাকটাস দেখাতে একলা করে এত বড় মেয়েকে নিয়ে তোর বাবা জঙ্গলে ঢুকল।

এবার রঞ্জু পরিষ্কার দেখতে পেল—টুটুন—বাবার আদরের টুনটুনি মোটেই হাতের নখ খুঁটছে না, যেন এর পর কি বলতে হবে ঘাড় গুঁজে তাই ভাবছে। ওফ, বাবার বিরুদ্ধে কেমন লাগানই না লাগাচ্ছে পুতুল পুতুল চেহারার ওই ভালমানুষ খুকি। এত বিষ তোমার মনে! রঞ্জুর ইচ্ছে করছিল ঘরে ঢুকে ঠাস করে ওর দু গালে দুটো চড় বসিয়ে দেয়।

মা হাঁসফাঁস করছে। তা তো করবেই। সরল মনে বাবা কি করতে গিয়ে কি করেছে আর সেটাই যাচ্ছেতাই কালার দিয়ে পাজী মেয়েটা বাড়ী এসে মা-র কাছে লাগাচ্ছে।

—কতক্ষণ ছিল ওরা ওই জঙ্গলের মধ্যে?

—বারো চোদ্দ মিনিট। আমার ঘড়ি নেই। রুমি ওর হাতঘড়ি দেখছিল।

—ইস, কাকে আমি এসব কথা বলি—কাকে আমি বোঝাই কেমন এক অপদার্থ পুরুষ আমার স্বামী। মা ঠোঁট কামড়ায়। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে দেওয়ালের একটা ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকে। টুটুনের এক সখী উপহার দিয়েছিল। যশোদা দুলাল ননী চুরি করে খায়। ছবিটা দেখা শেষ করে মা টুটুনের দিকে ঘাড় ফেরায়। ওরা কিছু বলল না? গৌরী রুমি কুমি-ঝুমি চামেলী! আলাদা করে কাঁকুলিয়া রোডের ওই মেয়েকে পাখি দেখাচ্ছিল ক্যাকটাস দেখাচ্ছিল আমাদের ঘরের বুড়ো হাতি।

বাবার ওপর বেশী চটে গেলে মা ওই শব্দ দুটো ব্যবহার করে। রঞ্জু শব্দ না করে হাসে।

—মুখ ফুটে কিছু বলে নি। টুটুন মা-কে বোঝাল। তবে গোপার হাত ধরে বাবা যখন জঙ্গলটা থেকে বেরিয়ে আসছিল আমি ঠিক দেখলাম গৌরীর পিঠে রুমি চুপটি করে একটা চিমটি কাটছে।

—কাটবেই চিমটি। এই নিয়ে ওরা মুখেও অনেক কিছু বলাবলি করবে। বড় বড় মেয়ে। ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কেউ কিছু সারতে পারে?

রঞ্জু দেখল বড় বড় দুটো শ্বাস ছেড়ে টুটুনের ছোট টেবিলের ওপর রাখা ঢাকনা-দেওয়া রঙিন কাচের গ্লাসটা তুলে মা ঢকঢক করে এতটা জল খেয়ে নিল। থুতনির কাছে পেঁপের বীচির মতন দু-তিন ফোঁটা জল লেগে থেকে চিকচিক করে। আঁচল দিয়ে মুখটা মোছারও যেন সময় থাকে না মা-র। রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে মহিলা। —অ্যাঁ! আর ওই মেয়েই বা কেমন, ভেংচি কেটে মা বলল, তোদের সব কটা বান্ধবীকে ফেলে রেখে একলা তোর বাবার সঙ্গে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে হরিয়াল পাখি আর ক্যাকটাস দেখতে লজ্জা করছিল না ওর। বেরিয়ে এসে তোদের কী বলছিল ও শুনি!

—কিসসু না। আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছিল।

—পেটে পেটে শয়তানি ওই মেয়ের। এখন আমি বুঝি। বাড়িতে আসে। দেখে মনে হয় যেন সাত চড়ে রা বেরোবে না।

—আমারও একদম ভাল লাগে না গোপাটাকে। পুঁচকে টুনি টুটুনরাণী কেমন করে মা-র বুকের আগুনটা আরও বেশি করে জেবলে দেয় তাজ্জব হয়ে রঞ্জু কান পেতে শোনে। বুঝলে মা—এখন আর মা-র চোখের দিকে তাকাতে টুটুনমণির লজ্জা নেই। হাত নেড়ে বলে, এখানে এলেই কেমন যেন একটু বেশি আহ্লাদেপনা করে ওই মেয়ে। যেন দাদুর ও বাবার আদর খাওয়ার মতন ভাল জিনিস এই জগতে আর কিছু নেই। বিচ্ছিরি!

—আমি বুঝি, আমি সব বুঝি। মা এবার চোখ বুজে উত্তর করে। এ-বাড়ির পুরুষদের আমার চিনতে বাকি নেই। শ্মশানের দিকে চলছে এক একজন। তবু রসের আর শেষ নেই। বাড়িতে পা দিয়েই কত বড় গানের আসর দেখলাম আজ।

বলতে বলতে মা হাতের মুঠো শক্ত করে ফেলল। তারপর এক সময় চোখের পাতা খুলে হাতটা শূন্যে ছড়িয়ে দিল।

—আমার ইচ্ছে আছে একদিন ওপাড়ায় যাবার। মাথা ঝাঁকিয়ে মা বলল, কাঁকুলিয়া রোড আমি চিনি। মিসেস গাঙ্গুলীর মেয়ে না তোদের এই গোপা! আমি ঠিক বলব,—মেয়েকে একটু শাসনটাশন করুন, এত বেশি বাড়ি থেকে বেরোতে দেন কেন—

বলতে বলতে মা—রঞ্জু দেখল, আবার চুপ করে গেছে। আবার যেন নিজের মনে কিছু ভাবে। তারপর বড় করে একটা শ্বাস ফেলে।

—উঁহুঃ, বলে কিছু লাভ নেই। এবার মা বিড়বিড় করতে থাকে।—আছে কোনো কোনো মা এমন। মেয়েকে শাসন করুন শুনলে উল্টে রাগারাগি করে—খুব অভিমান টভিমান আরম্ভ হয় তখন। যেন আমাদের বলতে যাওয়াটাই একটা অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়।

—কিসসু বলো না তুমি গোপার মা-কে—কেন তুমি ওবাড়ি যাবে! তোমার বলার কী দায়। যা খুশি করুক ওর মেয়ে। একটু থেমে থেকে এবাড়ির কুচুটে মেয়েটা মা-কে বোঝায়—ঝোপ থেকে বেরিয়ে বাবা আমাদের কি বলছিল জান?

—কি বলছিল?

—গোপার গানের গলা সবচেয়ে ভাল। ওর মতন ভজন তোমরা কেউ গাইতে পার না। তাই একটু স্পেশ্যাল করে ওকে একটা চমৎকার ক্যাকটাস দেখিয়ে আনলাম।

—অ্যাঁ, স্পেশ্যাল করে! এর উত্তরে তোরা কি বললি শুনি?

—আমাদের কিছু বলার সময় দিলে নাকি বাবা। দেখতে সাদাসিধে বোমভোলা মানুষ হলে হবে কি—বাবা কিছু কম চালাক নয়—তক্ষুনি আবার রুমির দিকে গোপার দিকে চেয়ে হেসে বললে বাবা—ঠিক আছে। আজ খুব একটা বেলা নেই। এখনি সন্ধ্যে হয়ে যাবে। আর একদিন। তোমাদের সবাইকে কেবল ওই একটা ক্যাকটাস নয়—একসঙ্গে আরো ক' জাতের ক্যাকটাস দেখাব। দেখবে কতরকম ক্যাকটাস আমাদের এই বোটানিক্যালের গার্ডেনে এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে।

টুটুন চুপ। —মা একটা গরম নিশ্বাস ছাড়ল।

—আবার কবে যাওয়া হবে সেখানে শুনি?

—সেটা অবিশ্যি এখনো ঠিক হয়নি। আসতে আসতে বাবা বলছিল, তার আগে গভর্ণমেণ্ট হর্টিকালচারেল গার্ডেনে আমাদের নিয়ে গিয়ে চন্দ্রমল্লিকা প্রদর্শনীটা দেখিয়ে আনবে। এই ডিসেম্বরেই সেটা আরম্ভ হচ্ছে।

—খবরদার! রঞ্জু দেখল কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মা-র চোখ মুখ খড়োর মতন ধারাল হয়ে উঠেছে। হাত নেড়ে মা বলছে, ওই দলের সঙ্গে আর একদিনও আমি তোমাকে বেরোতে দেব না। দরকার নেই আমার পাখি দেখে ক্যাকটাস হর্টিকালচারেল গার্ডেনের প্রদর্শনী দেখে। ইস্কুলটি ছাড়া কাল থেকে তুমি আর এক পা ঘর থেকে নড়তে পারবে না।

আ কী মজা! রঞ্জুর লাফাতে ইচ্ছে করছিল। বাবার নামে নালিশ করে কেমন একখানা ঢাউস বালিশ মা-র কাছে উপহার পেলে এবার দ্যাখো টুটুনমণি। বাড়ি থেকে বেরোনো তোমার বন্ধ হয়ে গেল। বগল বাজিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল রঞ্জুর।

(ক্রমশঃ)

বিয়োগ

গিরিধারী কুন্ডু

একি, অশোক! ওর পাশে বসে বছর চৌদ্দর ছেলেটা—এই যা কে? সুসিত না!

মুখ পেছনে করে ওই দূরে, দেয়ালের কাছে তাকাতে গিয়ে চোখ চমকায়। অবাক হয় সুরমা। ছ্যাঁত করে ওঠে বুক। অশোক, সুসিত এখানে আসবে, একথা ও শোনে নি। সুরমাকে যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, সে-ই আবার এদেরকে ডাক দিয়েছে? আগে থেকে জানতে পারলে, শরীর খারাপ লাগছে, অসুবিধে রয়েছে এ জাতীয় কিছু বলে আসা বন্ধ করা যেত। এখন? এখন কি উঠে পড়বে সে? তা কি করে সম্ভব! পেছনে ঠাসাঠাসি অবস্থা। বেরোবার দরজা পর্যন্ত মানুষের ঠাসা চাপে ভীষণভাবে বুজে গেছে!

অনেককে আসতে বলেছেন মিস্টার চক্রবর্তী। বছর ঘুরলেই মেয়ের জন্মদিন পালন করেন ঘটা করে। পয়সাওয়ালা লোক—এমন দশ-বিশ হাজার হঠাৎ ফুরিয়ে গেলে কিছু এসে যায় না। জুয়েলারী, কাপড়ের প্রকান্ড দোকান, চা-বাগান, সিনেমা হাউস—সব ব্যবসাতে জড়িয়ে রেখেছেন নিজেকে। নোটের বাড়তি তাড়া আগাম দিয়ে বিশিষ্ট গায়ক-গায়িকাকে ডেকে এনে গান শোনেন নিজে, আর অন পাঁচজনের তোয়াজ রাখতে তাদেরকে ডেকে গান শোনান। সেই সঙ্গে মেলা মেশার বিরাট এক বন্দোবস্ত। অর্থাৎ মেলা মেশার ধরন—যত ইচ্ছে গ্লাস গ্লাস পানীয় ঢালার পর্ব চলছে কোণের মুখোমুখি চেয়ারে বসা মানুষদের। পানীয় নিয়ে অস্থির ভাবে নাড়ানাড়ি চলে আর গ্লাসে গ্লাস ঠোকায় জলতরঙ্গ বাজল যেন। কিছুক্ষণে আনন্দ-ফুর্তির খাসা উদ্যোগ। যাকে ব মিলামিশি হই-চই করা। ওই এক আন পুরুষদের।

এবার নিয়ে সুরমা তিনবার গান শোনাতে এল। অশোক, সুসিত—ওরাও এখানে গান গাইবে? গেলবার দুজনের একজনও আসে নি। এই প্রথম দেখল। অশোকের নাম-ডাক সুরমার চেয়ে বেশি। এলাহাবাদে থাকে। গানের কলেজ খুলেছে ওখানে। ওই নিয়ে মেতে থাকে চব্বিশ ঘণ্টা। আর এখন তখন ছেলে সুসিতকে নিয়ে আজ বোম্বাই কাল দিল্লী কলকাতায় পরশু ঝটিকা সফর করে গান গাইবার জন্যে।

কি করবে সুরমা? উঠে পড়বে? চলে গেলে মিস্টার চক্রবর্তী কি ভাববে। সুরমার এখনকার স্বামী, যে হৃদয় জুড়ে রয়েছে ওর তার সংগে চক্রবর্তীর মেলামেশা খুব গভীর যে!

অশোক উঠে দাঁড়াল। দেয়ালের খানিক দূরে গিয়ে চেয়ার ঘুরিয়ে বসল। একজনের সংগে নিচু গলায় কথা বলছে কানের কাছে মুখ রেখে।

বারবার পেছনে তাকিয়ে ঘাড় ধরে গেছে মনে হল। কখন সুরমার আঁচল পড়ে গেছল নিচে, খেয়াল করে নি। হাত কাত রেখে তুলে নিল কোলের ওপর।

পরার কাপড়টা সবুজে সবুজ দেখতে। ব্লাউজের রংও তা-ই সবুজ। হাতা কাটা। সিল্কের। উজ্জ্বল আলো পড়তে ঝলমল করছে। এদিকে ফিনফিনে পাতলা কাপড়ের নিচ ফেটে দেখা যাচ্ছে—পেটের সামনাদিকে মেদের মোটা ভাঁজ। সংখ্যায় অনেকই। মেদ জমেছে দু-বুকেও।

বয়স হয়েছে সুরমার। এই বত্রিশ-পয়ত্রিশের মত। গলা ঘেঁষে মুক্তোমালা। কানেও মুক্তো। বাঁ হাতের আঙ্গুলে আংটি একটা। সাদা কুট্টি হীরা পাথরের হবে হয়ত। ওপর থেকে জোর আলো নেমে এসেছে, বারবার তাই আলো লেগে ঝিলিক মারছে।

পিঠ ঢেকে রাখা চাদরটা খদ্দরের। ছাড়াছাড়িভাবে চুমকি বসানো। হালকা বেগুনি, নীল, হলুদ সুতোয় সোজা দাগ টেনে সুন্দর কাজ করা। দু হাতে দু গাছা সোনার চুড়ি। ডান হাতে বাড়তি শুধু লাল ডায়ালের চৌকো ঘড়ি।

মুখ ঘুরিয়ে খাড়া চোখে আবার অশোককে দেখে। মুখ শুকনো রেখে বসে। আগের থেকে অনেক রোগা হয়ে গেছে। সময়ে খায় না মনে হয়। পুরনো অভ্যেস ঠিক রেখেছে। চোখ লাল ডগডগে, মদ গিলে কি আর আসে নি? এ ছাড়া কি মানায়। মেজাজ আসবে না যে বাবুর। যখন গলায় ঢালে, এক আধটুকুতে গলা ভেজে না। ঢক ঢক করে বোতলের শেষ ফোঁটা জিভের ডগায় চেটে তবে শান্তি।

অশোক ওর দিকে সোজা তাকিয়ে। খুব কাছ থেকে এক মনে চেয়ে আছে। এরকমই স্বভাব। একবার তাকালে, চোখের পাতা বুজে আসে না সহজে। কত বকেছে এভাবে না তাকাবার জন্যে। অভিযোগ অভিমান সব কিছু ও স্বাভাবিক প্রবণতা বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। সেদিন—

ওরকমভাবে তাকিও না। অসভ্য কোথাকার।

প্রশ্ন অশোকের গলার স্বরে।

তাকাব না কেন? আমার ইচ্ছে যখন খুশি, যত খুশি তাকাব।

তবু আপত্তি তোলে সুরমা।

তাকাবার সময় এটা নয়। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা বন্ধ করো। কেউ দেখে ফেললে কি ভাববে?

অশোকের পালটা প্রশ্ন আবার,

কে দেখবে? দেখার আগেই তার চোখ দুটো গুলী করে উড়িয়ে দেব না।

হয়েছে, অনেক বকবক করেছ। এবার চুপ থাকো। কোথায় যাবে বলেছিলে, সেখানে সটান রওনা হও।

এক পা-ও বাড়াচ্ছি না, যতক্ষণ না তোমাকে দু চোখ ভরিয়ে দেখে নিচ্ছি।

আরে, রাতটা পড়ে রয়েছে। তখন যত-খুশি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখো।

রাত হতে ঢের দেরি। তার ওপর তোমার ত আবার রাত বারটার আগে ঘরে ফেরা হয় না।

যাও, দুষ্টু কোথাকার।

বলতে বলতে অশোকের রোগা শরীর সুরমা ধাক্কা দেয় আস্তে-ই।

তুমি ধাক্কা দিলে!

লাগবে না ত জানি। এ মারে কিছু হবে না।

তুমি বার করে দিচ্ছ? আমি চললাম।

শাড়ি ভাঁজ করে এক ঝাপটা দিতে দিতে বলে ওঠে সে-ও।

আমি তাহলে বেঁচে যাই।

লাফ দিয়ে উঠে পড়ে চেয়ার থেকে। আর এক টুকরো অভিমান নিয়ে গানের স্কুলের দিকে সোজা হাঁটতে লাগে। অশোক এমনই। গানের স্কুল বলতে ওর প্রাণ। যত রাজ্যের গানে অস্থির ছেলে-মেয়েরা ভিড়ে যেত কাছে। দরদ দিয়ে গান শিখিয়েছে।

শুধু গান শিখিয়ে সাংসারিক টুকি-টাকি প্রতিশ্রুতি টিকিয়ে রাখা কোন মতেই ওর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। একে তাকে অনেক বলতে সিনেমায় অভিনয় করার সুযোগ জুটে গেল। গানও গেয়েছিল নিজের গলায়। সে-ছবিটা তুলে ধরল অশোককে। ফিরিয়ে দিল ভাগ্য।

সারাক্ষণ সুটিং নিয়ে দৌড়ঝাঁপ, রাত ছাড়া খবর নেওয়া হত না। অশোক জানত সুরমার উগ্র রূপ আছে। কথা বলার ভঙ্গিমা যে কোন নায়িকার থেকে কম্‌তি নয়। গানের গলা ওরও চমৎকার।

স্টুডিওতে একদিন গেছে, সেটের কাজে আটকে ছিল অশোক। সুরমার একা-মন উশখুশ করে উঠল। নিজে থেকে এক-জনের সঙ্গে গা ঘেঁষে আলাপ জমিয়ে দিল। ভদ্রলোক নতুন অভিনেত্রী খুঁজছেন।

সুরমার সব কিছু—দেহের বিভিন্ন অংশের ভূগোল, সহজভাবে কথা বলা, উজ্জ্বল বড় বড় চোখ কাছে টানে। নায়িকা সাজাতে মনে ধরে যায়।

সুরমা অশোকের কানে পৌঁছিয়ে দিল কথাটা। আপত্তি থাকতে পারে না। এটা খুব স্বাভাবিক কথা, একজনের আয়ে সংসার এখন সচল থাকে না। তাছাড়া জোর আলাদা হলেও এক সংগে স্টুডিওতে যাওয়া যাবে, ফেরাও হবে দুজনে।

বেশ চলছিল এলোমেলো দিনগুলো। দিন-রাত্তির বাইরে যখন তখন যেতে হয়। সুরমাকেও।

হঠাৎ চিন্তা কেটে গেল। সমবেত অতি-থির ধারাবাহিক কথা বলাবলি ক্রমশ কমে আসছিল।

সুরমার চোখে পড়ে—মিস্টার চক্রবর্তী গিলে করা-পাঞ্জাবীর হাতা পেছনে সরিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে। ভারী গলায় গড়গড় করে বলতে থাকে।

ডিয়ার লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন—

অশোকের গান দিয়ে আজকের শুভ সন্ধ্যার অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। অশোক আমার বিশেষ বন্ধু। সব কাজ ফেলে দিয়ে কথা রাখতে ছুটে এসেছে গান শোনাতে। শুধু আমাকেই নয় আমার প্রিয় বন্ধুদেরও। সেই সংগে আরেকটা খুশির খবর হল—অশোকের ছেলে সুসিতও এসছে। আপনা-দের ভাল লাগবে নিশ্চই। তাছাড়া সুরমা রায় অন্যান্য বছরের মত গান শোনাতে এসছে। আগে অশোকের গান শুনুন। তার-পর অন্য সবার।

কথার শেষে একটানা হাততালি বেজে ওঠে।

কাছে এলেন মিস্টার চক্রবর্তী। ঘাড় ছোট করে সুরমার মুখের কাছে মুখ রেখে বললে:

মিসেস রায়, আপনি কিছু মনে কর-বেন না। ওদের বাপ-বেটাকে ছেড়ে দিয়ে আপনাকে বসাবো, বলতে গেলে আপনি আমার ঘরের। আমার যাবতীয় আবদার রাখবেন জেনেই ওদেরকে আগেভাগে ছেড়ে দিচ্ছি।

অশোক সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দুর্ঘটনার মত ওর শরীর দিয়ে সুরমার কাঁধে ধাক্কা লাগে একটুখানি।

সুরমা মুখের দিকে চোখ রেখে বলে ওঠে, সরি।

অশোকের কান স্বরাহত হয়। সে-ও মুখ ফিরিয়ে একটু হাসি হাসি মুখ করে বলে—

তুমি! কি, ভাল আছ?

হ্যাঁ। তুমি?

অশোক সামান্য ঘাড় দুলিয়ে সামনে, সাদা চাদরের উঁচু বেদি মত জায়গায় এসে পা ভাঁজ করে বসল। পকেট থেকে এক-গোছা কাগজের ভাঁজ ভেঙে মেলে ধরে। সংগে সংগে হারমোনিয়মের রীডগুলো অস্থির হয়ে উঠল হঠাৎ-ই।

সেদিকে চোখ নেই। কেমন যেন আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সুরমার মন। বোঝা যাচ্ছে গান শোনায় মন নেই। ভাবছে, অশোক আর ওর নিগূঢ় সম্পর্কটা।

সম্বন্ধ খোঁজা হচ্ছিল। একে তাকে বলে রেখেছে সুরমার বাবা-মা। যার কথা বলে, মনে ধরে না সুরমার। দিনকে দিন পিছিয়ে যায় তারিখ।

বি-এ পড়ছিল। সবাই ভেবে-চিন্তে ঠিক করল, পড়াটা তাহলে শেষ করুক আগে।

কলেজে যায়, আসে। বেশ দিন কাটছিল। সমুদ্রের মত সকাল পড়ে থাকে সামনে, ভাল লাগে না। ছেলে বন্ধুদের সঙ্গ পেতে চায় সুরমার মন। ত্রিদিব, অশোক সুরমা চৈতী অরুন্ধতী এই পাঁচে মিলে নিভেজাল এক গ্রুপ তৈরি করল। ক্লাস না থাকলে সাংগুভ্যালিতে আড্ডা বসত ওদের।

ছাত্র ধর্মঘটের দরুন কলেজ ছুটি হয়ে গেছে, পাঁচজন হই-হই করে বেরিয়ে পড়ে। এদিক-সেদিক ঘুরতে ঘুরতে ফাঁকা এক রেস্তোরায় বসল সব সময় কাটাতে। ওই দিন-ই ওরা খুব বেশি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল।

সুরমা প্রথম নির্জনতা ভাঙে।

একটার পর একটা খাওয়া হয়ে যাচ্ছে আজ।

চৈতী আর সুরমার দিকে তাকিয়ে ত্রিদিব বলে।

ওরা দুজন কি খাইয়েছে? এবার চায়ের মধ্যে কোন কন্ট্রিবিউট করবে ত।

সুরমা—

আরে, খাওয়ালেই খাওয়ালাম। আমাদেরটা পরে বরং হবে। জমা থাক। ভাল। এতক্ষণে অশোকের মুখ খোলে—

সে ত হবে-ই। বিরাট ভবিষ্যত পড়ে আছে সবাইকার। একদিন না একদিন নিজেদের বিয়ে বৌয়ের সাধ ছেলে-মেয়ের অন্নপ্রাশন ইত্যাদি ইত্যাদি অবশ্যই হবে।

ওর কথায় সবাই এক হয়ে হাসে।

সুরমা—

অনেক বাজে কথা হয়েছে এবার থামো তুমি।

অশোক দোকানের ছেলেটাকে ডেকে বলে—

এই, কত করে চা এখানে?

তিরিশ পয়সায় এক কাপ।

কলেজ ক্যান্টিনে দশ পয়সা চা বললে চোখ আঁতকে ওঠে! পয়সা-পরে দেব বলে কেটে পড়ে। তিরিশ পয়সা? তা হোক এখানে এখন তিরিশ পয়সার এক কাপ চা নিয়ে ঘন্টা দু-তিন সময় উতরে দিতে পারলে, মন্দ কি!

ত্রিদিব হাসতে হাসতে বলে—

এই যে পাঁচজন একসংগে আছি হাসছি পরের দিন মন কষাকষি হয়ে যেতে পারে।

সুরমা ওর কথার উত্তর দিল—

হতে পারে। মন কষাকষি হওয়াটাই স্বাভাবিক। না হলে সেটা ভাববার বিষয় হবে।

চৈতি চায়ের চিনি নাড়াতে পেয়ালায় শব্দ বাজল। চোখ নিচু করতে প্রায় আঁতকে ওঠার গলায় বলে—

আঁ! চায়ের রংটা এত কালো কেন?

সুরমা সায় দেয়—

হ্যাঁ তাই ত!

চৈতি—

দুধ কম কেন?

অরুন্ধতী যে ছেলেটা চায়ের কাপ রেখে গেছে ওকে ডেকে বলে—

গায়ের রং পরিষ্কার চায়ের রং কালো? যা যা একটু একটু দুধ ঢেলে নিয়ে আয়।

পাঁচের বন্ধুত্ব বেশিদিন টিকল না। চৈতি চুপিচুপি ত্রিদিবের মন গেঁথে ফেলল। পুজোর ছুটি কাটাতে দেশে গেল অরুন্ধতী। সুরমা-অশোক আলাদা হয়ে পড়ল। একা বোধ করে সুরমা। মনে মনে বিরক্ত হয়ে পড়ে। তাই অশোককে আকর্ষিত করার জন্যে সব-সময় আজকাল সাজে।

সুরমা সেদিন অশোককে ছুটির পর থাকতে বলে পাঠালো ক্যান্টিনের বয়কে দিয়ে। এতদিন পর হঠাৎ সুরমা বলেছে অশোক তাই কলেজ গেটের সামনে পা দুটো গুণ চিহ্নের মত রেখে দাঁড়িয়ে। চোখ ফেলে রেখেছে কখন আসে। সুরমা ঠিক-ই এল অনেক দেরিতে।

পরিচিত সেই রেস্তোরায় গিয়ে চেয়ারে কোমর রেখে সোজাসুজি ও বলা শুরু করল।

অশোক, বাড়ির সব আমার বিয়ে দেবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। এখন একটা কিছু ঝটপট বাতলে দাও।

এ ত উত্তম কথা। তোমার কাছে খাওয়া পাওনা আছে। এবার তাহলে পাওনাটা মিটে যাবে।

দূর, যত বাজে বকছ তুমি। আমার বিয়ে ছাড়া কি আর তোমাকে খাওয়াতে পারি না!

আরে বিয়েটা কি খারাপ? বয়েস কি তোমার কম হয়েছে শুকুমণি?

প্রতিবাদ জানাবার বদলে সুরমা বলে।

বাড়িতে একদণ্ড বসে থাকলে কানের কাছে ঘ্যানোর-ঘ্যানোর শুরু করবে মা, ঠাকুমা। কি রে সুরমা তোর এ ছেলে পছন্দ হয়, বল না? এই চিন্তা করে করে আমার মাথার বারটা বেজে যাবে একদিন। বয়সের কথা বলছ—আমার বিয়ের সময় হয়ে থাকলে তোমারও বিয়ের বয়স হয়েছে দাদাবাবু!

অশোক নির্মল হাসি হাসে।

অনেকের বয়স হয়েছে। কিন্তু আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ঘটকালি করবে কে? বাপ গন, আর একমাত্র পুত্র তাই স্কলারশিপ নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়ছে। আপত্তি না থাকলে অনায়াসে আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি। এ বিষয়ে তোমার এতটুকু চিন্তা থাকতে পারে না আশা করি।

সামান্য এ ঠাট্টার কথা কানে আসতে কুড়ি বছরকার শরীরে রীতিমত কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

সুরমা মজে ছিল, শুনিয়ে দেয়—

যা! তোমাকে বিয়ে করতে যাবে কে? সুন্দর গলা আছে। গান গাইতে পার। এছাড়া আর কি অ্যাকটিভিটিস আছে? তোমাকে বিয়ে করলে নির্ঘাত দু বেলা পেট খালি থাকবে আমার। কবে কোন ফাংশনে গান গাইবেন বাবু তবেই ঘরে উনুন জ্বলবে!

অনেক কথা একজন আরেকজনকে নিভৃতে শোনায়। চোখের ধরাধরি শুরু হয়। উচ্ছ্বাস সেই সঙ্গে উথলে পড়ে!

বিল মিটাতে বাক্স ধরে সুরমা। অশোক হাত থামিয়ে দেয়। কোন আপত্তি শোনে না। চাপ দেয় একটু। তবু ইচ্ছে থাকলেও কিছুতে হাতের মুঠো শক্ত হয় না। [illegible] ধরিয়ে কাঁপে অশোকের হাত। স[illegible]

ওই হাতের স্পর্শটুকু রোমাঞ্চিত করল কুমারী দেহের বিভিন্ন অংশের ভূগোল। এক ক্লাসে পড়ে, সময় সময় এমনিতে কত গা ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে যায়, হাতে হাত লাগে। এমন হয়নি কোনদিন! দৈহিক যে উত্তাপ অশোক শরীরের ভেতর ছড়িয়ে দিল তা যেন কাল হয়ে দাঁড়ায়। মনে বেশ দাগ কেটেছিল। সারা রাত তাই কষ্ট দেয় অশোকের মুখটা। রাত ভোরেই অশোক অশোক বলে মন অস্থির! সাংঘাতিক সব রঙীন অনুভূতি মনের ভেতর তরতরিয়ে খেলে গেল।

বাড়ি নিয়ে এল একদিন অশোককে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে ওর মাকে চিনলেন সুরমার মা। এক জায়গায় দেশের বাড়ি ছিল দু মায়ের। স্বভাবতই তাই ঘরে-বাইরে স্বাভাবিক আনাগোনা, অবাধ মেলামেশা, কাছের ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়ে।

অনেক কথা একজন আরেকজনকে শোনায়। উচ্ছ্বাস সেই সঙ্গে উথলে পড়ে।

সুরমার চেহারায় উন্মাদনা আছে। সত্যি সত্যি ঝাহার এনে দেয় মনে। একদিন তাই অশোক খোলামেলা জায়গায় বেড়াতে বেড়াতে বিয়ের কথা পাড়ে। সে-ও রাজী।

একদিন খুব হই-চই-এর ভেতর বিয়ে হল ওদের। দিনের চাকা বেশ ঘুরছিল। কিন্তু একটা ঝড় ঠিকই এগিয়ে এল। সে ঝড় সব ভেঙেচুরে দিতে চাইল যেন!

একের পর এক প্রক্ষিপ্ত ঘটনার ভিড়। সেই পরিচালকের সঙ্গে মাখামাখি ভাব ছাড়াতে চেয়েছিল অশোক। তাতে কোন ফল হয় না।

নিজের কণ্ঠ অনেক সময় চেপে রাখে অশোক। কারণ রয়েছে, সুরমার শরীরে যে জন্ম নিচ্ছে ওর ভবিষ্যত!

সেদিন রাত অনেক, এই দশটার মত, ফোন পেয়ে ঝটপট শাড়ি পাল্টে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অমনি মনকে বিষিয়ে তোলে।

অশোকের গমগমে গলার স্বর প্রকাশ পায়—

কোথায় যাওয়া হবে এত রাত্রে?

কথাগুলো সুরমার পা থামিয়ে দেয়। তবু ও বেরিয়ে গেল ঠিক-ই। ফিরল রাত বারটা বাজিয়ে।

শাশুড়ি, অশোকের মা ঘুমোয় নি। জেগে জেগে বই পড়ছিল! দরজায় শব্দ পড়াতে অশোককে ডাকে দরজা খুলে দেবার জন্যে।

সুরমা ভেতরে ঢুকে আসে। ঝাঁঝ ঝাঁঝা গলায় বলে—

আরো কিছুক্ষণ বাইরে থাকতে পারতে।

জিজ্ঞাসার সুরে সে-ও বলে—

তুমি যখন রাত করে ফের? তখন আমি মুখ খুলি না, এটাও তোমার মনে রাখা উচিত ছিল।

হিল তোলা জুতো দিয়ে সিঁড়ির ধাপে খটাস খটাস শব্দ তুলে সুরমা ওপরে চলে গেল।

ভাঙা গলায় অনুযোগের সুরে মা বলে—

এই আমাদের লক্ষ্মী বউমার কথা! কি বউ আনলি, নিজের খেয়াল-খুশি মত চলতে ফিরতে চায়। একবার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করে না। আমাকে মানুষ বলে-ই মনে করে না বুঝি? বউমা এখনকার মেয়ে হতে পারে, কিন্তু আমরা সেই সেকেলেরই। আর পাঁচজনের সঙ্গে এক পাড়ায় থাকি। তারা কি ভাবে? কি বলাবলি করে তা ত কানে যায় না তোদের! আমার হয়েছে যত জ্বালা!

একটু থেমে নিয়ে ফের বলতে থাকে—

এরকমভাবে চললে, হয় আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব, নয়ত বউমাকে অন্য কোথাও—

কথা শেষ হয় না। ঝুল বারান্দার ওপর থেকে সুরমার মুখ ঝুঁকে পড়ে, বলে—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি আপনার ছেলে নিয়ে এ বাড়িতেই থাকুন। আমিও আমার ছেলে নিয়ে চলে যাব।

অশোক এখনকার ছেলে হলেও ভীষণ সেন্টিমেন্টাল।

ঘরে তিন বছরের বাচ্চাটা যে একা থাকে, সে কথা মনে থাকে কতক্ষণ! আবার বলা হচ্ছে—ছেলে নিয়ে চলে যাব।

বনিবনা হয় না। প্রতি মুহূর্তেই কথা কাটাকাটি লাগে সামান্য কিছু নিয়ে। একটা অগ্নির অবস্থা অশোকের বাড়িতে। কারণ একটাই। শুতে-উঠতে-বসতে দুশ্চিন্তা দুজনেরই। বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে দু মন থেকে।

এর মধ্যে আবার আরেক বিপদ। ক'দিনের অসুখে অশোকের মা সংসারের সব দায়দায়িত্ব ছেড়েছুড়ে চলে গেল। তাই এর পরের দিনগুলো খুব সুখের হল না।

চোখের সামনেই অল্পবয়সী এক গায়কের হাত ধরাধরি করে মার্কেটিং সারতে বেরিয়ে গেল একদিন। এতে অশোকের মন ভীষণ বিরক্ত হয়। সব সময় সচেতন থাকে সে এখন। তবু সব কিছুতে এলোমেলো করার দিকে সুরমার ঝোঁক বেশি।

মেজাজ বিগড়ে গেল ওর। এভাবে আর কদ্দিন চলতে পারে। দুজন দুজনের থেকে দূরে সরে থাকার কথা তুলল। ঝামেলা দেখা দিল তিন বছরের ছেলে সুসিতকে নিয়ে।

অশোক বলল—

না, ও আমার কাছেই থাকবে।

সুরমার তাতে যথেষ্ট আপত্তি।

তা হবে কেন? আমি ওকে পেটে ধরেছি, ও আমার সঙ্গেই থাকবে।

আদালত কিন্তু সুরমার মাতৃত্বকে হারিয়ে দিল। কারণ অশোক ত, সরাসরি বিচারককে সুসিতের প্রতি অবহেলার কথা বলেছে।

সুরমা হেরে গেল। অশোকের জীবন থেকে সরে দাঁড়ায় নিঃশব্দে একদিন।

চিন্তা থেমে দাঁড়াল। অশোকের গান শেষ। হাততালি পড়ছে ঘনঘন। সুরমা শুনতেই পেল না গান। মন অন্যদিকে ছিল। কি করবে, ওর গান অন্য সবাইকে আনন্দ দিয়েছে, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

একজন শ্রোতা নেশার মাত্রা জানাতে অশোকের গান আওড়াতে থাকে।

বা। অশোক বেশ গাইল—মুছে যাওয়া দিনগুলো আমারে ....

এ কি, অশোক? অশোক উঠে পড়েছে আসর থেকে, সুসিতের শরীরের পেছনটা দেখতে পেল। আর চুপ হয়ে স্থির বসে থাকতে পারে না। সুরমা উঠে দাঁড়ায়। মিস্টার চক্রবর্তী এগিয়ে এসে বলে—

একি, আপনি কোথায় চললেন? এখুনি আপনার গান গাইবার পালা যে সুরমাদেবী।

একটু আসছি।

বাইরে সন্ধ্যা ঘন হয়ে নেমেছে।

অশোক গাড়িতে উঠে বসে। বাঁ-হাত পেছনে রেখে দরজা খুলে দেয়। সুসিত চটপট ভেতরে ঢুকে গিয়ে জানলার কাচ নাবাতে থাকে।

গাড়ির রাক্ষুসে চোখ—হেড লাইটের আলো সামনের ধোঁয়াশার ভেতর ছড়িয়ে পড়ে। গাড়ি স্টার্ট দেবার জন্যে চাবি ঘোরায় অশোক। সুরমা দৌড়তে দৌড়তে এসে পড়েছে। দাঁড়িয়ে না থেকে, কোমরে গুঁজে রাখা ছোট রুমাল টেনে বার করে। আর তারপরেই সুসিতের দু-চোখ, সারা মুখে বুলিয়ে নিজের চোখের সামনে চেপে ধরে রাখে। অমনি নিজের চোখ থেকেই অসময়ের মত ছটফটিয়ে বৃষ্টি।

এদিকে লাল ফিয়াট গাড়িটা গা ঝাঁকিয়ে মাটি কাঁপিয়ে দ্রুত সামনের দিকে এগোয়। গাড়ির পেছনের নিষেধের মত লাল আলো সেই ধোঁয়া রং অন্ধকারের ভেতর নিভে নিভে অল্পক্ষণ জ্বলেই মিলিয়ে গেল।

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

মিস মার্পল বললেন—তোমাদের মাথা আর মুণ্ডু। মেয়েছেলে দেখলে সব ব্যাটাছেলেই কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে ছোটে। স্যার রিচার্ডও ডায়নার রূপে পাগল হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন সামনে—নিশ্চয় হোঁচট খেয়েছিলেন গাছের শেকড়ে। মাথা ঠুকে বেহুঁশ হয়ে যেতেই সবার আগে একজনই গিয়েছিল তাঁর কাছে—খুড়তুতো ভাই ইলিয়ট। তার পরণে জংলী সর্দারের পোশাক। তার মানে কোমরে গোটা চার পাঁচ ছুরি থাকা আশ্চর্য নয়। ঝোঁকের মাথায় চট করে খুন করে ফেলে দাদাকে—সম্পত্তির লোভে উপাধির লোভে ডায়নার লোভে। বুকে ছুরি বিঁধিয়েই লুকিয়ে ফেলে বেল্টের মধ্যে। পরে নিজের কাঁধেই ছুরি মেরে সাধু সাজতে চেয়েছিল: প্রেমের আগুনে পুরুষ-পোকারা পুড়ে মরে এইভাবেই।

খেলাধুলা

দর্শক

বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা

কুয়ালালামপুরের মারডেকা স্টেডিয়ামে তৃতীয় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারত ২—১ গোলে পাকিস্তানকে হারিয়ে বিশ্ব হকি কাপ জয়ী হয়েছে। ভারত বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার প্রথম বছরে (১৯৭১) ৩য় স্থান এবং দ্বিতীয় বছরে (১৯৭৩) দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিল। বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় এশিয়ার দুটি দেশকে নিয়ে ফাইনাল খেলা এই প্রথম হল। ১৯৭১ সালের ফাইনালে খেলেছিল পাকিস্তান ও স্পেন এবং ১৯৭৩ সালের ফাইনালে হল্যান্ড ও ভারত। এবারের বিশ্ব কাপ হকির সেমি-ফাইনালে চারটি দেশের মধ্যে এশিয়ারই ছিল তিনটি দেশ—ভারত, পাকিস্তান এবং মালয়েশিয়া। দীর্ঘ দিন পর আন্তর্জাতিক হকি খেলার আসরে ভারত তার হৃতগৌরব ফিরে পেল। ভারতের শেষ অলিম্পিক হকি খেতাব জয় ১৯৬৪ সালে এবং শেষ এশিয়ান গেমসের হকি খেতাব জয় ১৯৬৬ সালে।

ফাইনাল খেলার প্রথমার্ধের ১৮ মিনিটের মাথায় পাকিস্তানের লেফট আউট সফদার আব্বাসের কাছ থেকে বল পেয়ে লেফট ইন মহম্মদ সয়িদ প্রথম গোল করে দলকে ১—০ গোলে এগিয়ে দেন। খুবই অতর্কিতে গোলটি হয়। অনেকের মতে আব্বাস অফসাইডে থেকে বলটি ধরে সয়িদকে দিয়েছিলেন। এর আগে খেলার ১৩ মিনিটের মাথায় পাকিস্তানের অতি নির্ভরশীল খেলোয়াড় শমীউল্লা একটা বল ধরতে গিয়ে আহত হন এবং খেলা থেকে বিদায় নেন। তাঁর শূন্যস্থানে খেলতে নামেন সফদার আব্বাস। খেলার ২৯ মিনিটের মাথায় পাকিস্তানের গোল-লাইন থেকে মুনাব্বর জামান একটা বল প্রতিরোধ করে একটি অবধারিত গোল রক্ষা করেন। বিরতির সময় পাকিস্তান ১-০ গোলে এগিয়েছিল।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলার সূচনা থেকে ভারত জোর আক্রমণ চালিয়ে খেলতে থাকে। খেলার ১০ মিনিটের মাথায় ভারতের লেফট ব্যাক সুরজিৎ সিং পেনাল্টি কর্ণার থেকে গোল শোধ করেন (১—১)। এর পাঁচ মিনিট পর অশোককুমার চমৎকার ফ্লিকে ভারতের জয়সূচক গোলটি দেন। সমস্ত খেলায় পেনাল্টি কর্ণার পায় ভারত ৬টি, অপরদিকে পাকিস্তান মাত্র একটি।

ফাইনালে দুই দলই প্রাণপণ করে খেলেছিল। তবে পাকিস্তান তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেনি। পাকিস্তানের কোচ এবং ম্যানেজার আনোয়ার আমেদ খাঁ স্বীকার করেন ভারত ভাল খেলে জিতেছে।

ভারতের এই বিশ্ব হকি কাপ জয় উপলক্ষে সারা দেশে আনন্দ এবং অভিনন্দনের বন্যা বয়ে চলেছে। বিহার বিধানসভায় বিশ্ব হকি কাপ বিজয়ী ভারতীয় হকি দলকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে সরকারীভাবে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী সংগত কারণেই সব থেকে বেশী গর্বিত এবং আনন্দিত। তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পাঞ্জাব রাজ্য সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ভারতীয় হকি দলের দুমাসের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প বসেছিল। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন 'প্রতিটি খেলোয়াড়ের বাপ-মার হাতে পাঁচ হাজার করে টাকা দেওয়া হবে।'

ইউরোপীয় প্রাধান্য খর্ব

ভারতের এই বিশ্ব হকি কাপ জয়ের ফলে আন্তর্জাতিক হকি খেলার আসরে ইউরোপীয় প্রাধান্য লুপ্ত হল। ১৯৭২ সালে পশ্চিম জার্মানী অলিম্পিক হকি খেতাব এবং ১৯৭৩ সালে হল্যান্ড বিশ্ব হকি কাপ জয়ের সূত্রে আন্তর্জাতিক হকি খেলার আসরে ইউরোপীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।

ফাইনালের পথে

ভারত : লীগ পর্যায়ের খেলায় ইংল্যান্ডকে ২—১ ঘানাকে ৭—০ এবং পশ্চিম জার্মানীকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের খেলা ১—১ গোলে ড্র ছিল। আর্জেন্টিনার কাছে ভারত ১—২ গোলে হেরেছিল। মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে ভারত ৩—২ গোলে মালয়েশিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

পাকিস্তান : লীগ পর্যায়ের খেলায় পাকিস্তান অপরাজিত ছিল। তারা মালয়েশিয়াকে ২—১ গোলে, স্পেনকে

অজিত পাল সিং
অধিনায়ক—ভারত

সুরজিৎ সিং
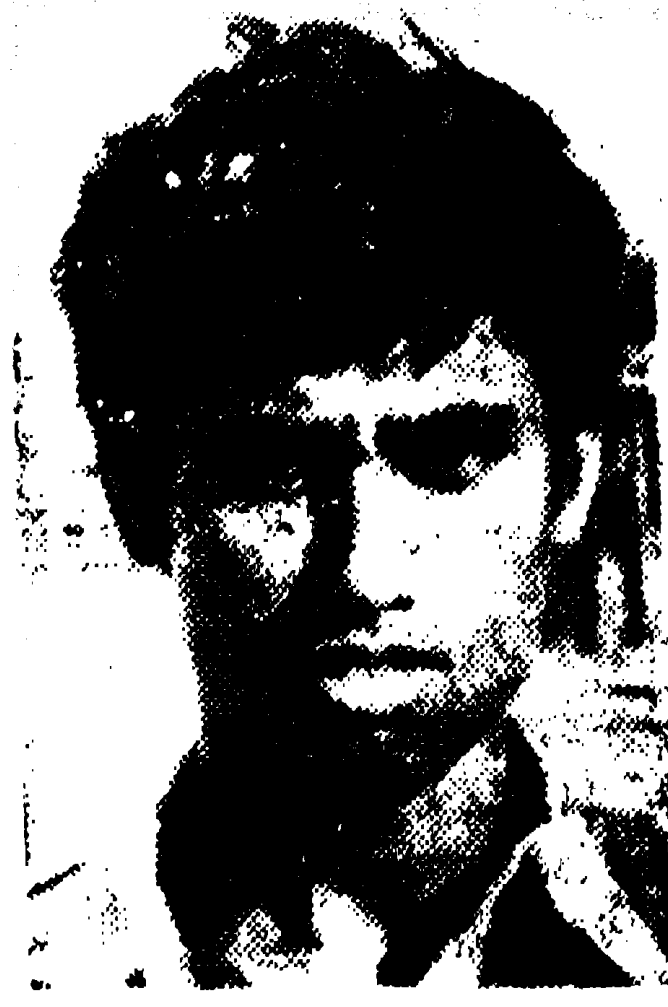
অশোককুমার

৫—০ গোলে এবং নিউজিল্যাণ্ডকে ২—০ গোলে পরাজিত করে। তাদের খেলা পোল্যাণ্ডের সঙ্গে ২—২ গোলে এবং হল্যাণ্ডের সঙ্গে ৩—৩ গোলে ড্র হয়েছিল। মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে পাকিস্তান ৫—১ গোলে পশ্চিম জার্মানীকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

লীগ পর্যায়ের খেলায় পাকিস্তান অপরাজিত ছিল—পাঁচটা খেলায় জয় ৩ এবং ড্র ২। মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে তারা ১৯৭২ সালের অলিম্পিক হকি চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানীকে শোচনীয়ভাবে ৫—১ গোলে হারিয়ে স্বপক্ষে দ্বিতীয়বার বিশ্ব কাপ জয়ের সম্ভাবনা অনেক উজ্জ্বল করেছিল। সেমি-ফাইনাল খেলার পর পুরো দু'দিন জিরিয়ে নিয়ে পাকিস্তান খেলতে নামে। অপরদিকে ফাইনালে ভারত খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে খেলতে নেমেছিল—উপর্যুপরি দু'দিন সেমি-ফাইনাল খেলার পরই ফাইনাল খেলা, মাঝে একদিনও বিশ্রাম পায়নি। নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেরই কাছে পাকিস্তান ছিল বিশ্ব হকি কাপ জয়ের পক্ষে একান্ত নির্ভরযোগ্য দল। ফাইনালে কিন্তু পাকিস্তান তাদের সুনাম বজায় রেখে খেলতে পারেনি। অপরদিকে ভারত আশাতিরিক্ত ভাল খেলেছিল। উত্তেজনা এবং উৎকর্ষতার দিক থেকে খেলাটি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

যোগ্যতার ক্রমপর্যায় তালিকা

তৃতীয় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বারটি দেশের খেলার ফলাফলের ভিত্তিতে এইভাবে যোগ্যতার ক্রমপর্যায় তালিকাটি তৈরি হয়েছে : ১ম ভারত, ২য় পাকিস্তান, ৩য় পশ্চিম জার্মানী ৪র্থ মালয়েশিয়া, ৫ম অস্ট্রেলিয়া, ৬ষ্ঠ ইংল্যাণ্ড, ৭ম নিউজিল্যাণ্ড, ৮ম স্পেন, ৯ম হল্যাণ্ড ১০ম পোল্যাণ্ড, ১১শ আর্জেন্টিনা এবং ১২শ ঘানা।

বিশ্ব হকি কাপ

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

১৯৭১ (বার্সিলোনা) : ১ম পাকিস্তান, ২য় স্পেন, ৩য় ভারত।

১৯৭৩ (আমস্টারডাম) : ১ম হল্যাণ্ড ২য় ভারত, ৩য় পশ্চিম জার্মানী এবং ৪র্থ পাকিস্তান।

১৯৭৫ (কুয়ালালামপুর) : ১ম ভারত, ২য় পাকিস্তান, ৩য় পশ্চিম জার্মানী এবং ৪র্থ মালয়েশিয়া।

ভারত বনাম পাকিস্তান

অলিম্পিক গেমস এশিয়ান গেমস এবং বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা—এই তিনটি আন্তর্জাতিক বড় আসরে ভারত এবং পাকিস্তান এপর্যন্ত ১৩ বার পরস্পরের সঙ্গে হকি ম্যাচ খেলেছে। এই তেরটি খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ভারতের জয় ৫, পাকিস্তানের জয় ৭ এবং খেলা ড্র ১।

অলিম্পিক গেমস

১৯৫৬ (ফাইনাল) : ভারত ১ : পাকিস্তান ০; ১৯৬০ (ফাইনাল) : পাকিস্তান ১ : ভারত ০; ১৯৬৪ (ফাইনাল) : ভারত ১ : পাকিস্তান ০; ১৯৬৮ : পাকিস্তান ১ : ভারত ০; ১৯৭২ (সেমি-ফাইনাল) : পাকিস্তান ২ : ভারত ০।

এশিয়ান গেমস

১৯৫৮ : ভারত ০ : পাকিস্তান ০; ১৯৬২ (ফাইনাল) : পাকিস্তান ২ : ভারত ০; ১৯৬৬ (ফাইনাল) : ভারত ১ : পাকিস্তান ০; ১৯৭০ (ফাইনাল) : পাকিস্তান ১ : ভারত ০ এবং ১৯৭৪ (ফাইনাল) : পাকিস্তান ১ ও ২ : ভারত ১ ও ০।

বিশ্ব হকি কাপ

১৯৭১ (সেমি-ফাইনাল) : পাকিস্তান ২ : ভারত ১; ১৯৭৩ (সেমি-ফাইনাল) : ভারত ১ : পাকিস্তান ০ এবং ১৯৭৫ (ফাইনাল) ভারত ২ : পাকিস্তান ১।

রঞ্জি ট্রফি

সেমি-ফাইনাল খেলা

হায়দরাবাদের লালবাহাদুর স্টেডিয়ামে বোম্বাই প্রথম ইনিংসে ১৭৭ রান বেশী করার সুবাদে হায়দরাবাদকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বোম্বাই : ৫০০ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। রামনাথ পার্কার ১৯৭, এ ভি মানকাদ ১৪২, অজিত পাই ৬৩ এবং পি ট্যাণ্ডন অপরাজিত ৫০ রান। জ্যোতিপ্রসাদ ৯৭ রানে ৪ উইকেট)।

ও ১৫৬ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কারসন ঘাবড়ি ৫০ নট-আউট)

হায়দরাবাদ : ৩২৩ রান (নরসিং রাও ৭৫ অপরাজিত এবং আব্বাস আলি বেগ ৫২ রান। সিভালকার ১০৫ রানে ৪ এবং ট্যাণ্ডন ১০৮ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৪৯ রান (৭ উইকেটে। আবিদ আলি ৭৭ রান)

গতবারের রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী কর্ণাটক ৭ উইকেটে দিল্লীকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দিল্লী : ২২০ রান (সুন্দরম ৬৭ এবং গিন্দওয়ানী ৫৪ রান। চন্দ্রশেখর ৭৩ রানে ৬ এবং প্রসন্ন ৬৯ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৭১ রান (এম অমরনাথ ৬০ রান। প্রসন্ন ৫৪ রানে ৫ এবং চন্দ্রশেখর ৬৫ রানে ৪ উইকেট)

কর্ণাটক : ৩০০ রান (বিজয়কুমার ৭২, ব্রিজেস প্যাটেল ৫৬ এবং সুধাকর রাও ৫৪ রান। বেদী ৯৭ রানে ৭ উইকেট)

ও ৯৫ রান (৩ উইকেটে)

রোভার্স কাপ

রোভার্স কাপের দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে গোয়ার ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব ১—০ গোলে গত বছরের রানার্স-আপ বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত করেছে। ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব রোভার্স কাপের ফাইনালে প্রথম খেলেই কাপ জয়ী হল। গত বছরের রোভার্স কাপ জয়ী ইস্টবেঙ্গল এ-বছরের খেলায় অংশ গ্রহণ করেনি।

পরলোকে নেভিল কার্ডাস

বিশ্ব বিশ্রুত ক্রিকেট এবং সঙ্গীত সমালোচক স্যার নেভিল কার্ডাস তাঁর ৮৫ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। তিনি হৃদরোগে সামান্য আক্রান্ত হয়ে লণ্ডনের এক হাসপাতালে যান এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৮৮৯ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের এক অতি দরিদ্র বস্তি পরিবারে তাঁর জন্ম। এক দূর আত্মীয়ের কাছে তিনি প্রতিপালিত হন। বাল্যকালে স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা লাভের তিনি সুযোগ পাননি। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তিনি সঙ্গীত এবং ক্রিকেট খেলার সমালোচক হিসাবে বিশ্ব খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ক্রিকেট এবং সঙ্গীত বিষয়ে তিনি বেশ কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন।

১৯৬৭ সালে তাঁকে সরকারী স্যার উপাধিতে সম্মানিত করা হয়।

নিখিল ভারত কাবাডি প্রতিযোগিতা

রবীন্দ্র কাননে আয়োজিত নিখিল ভারত আমন্ত্রণমূলক কাবাডি প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগের ফাইনালে ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন ৬—৪ পয়েন্টে হায়দরাবাদকে পরাজিত করে। মেয়েদের ফাইনালে মহারাণী ২৭—১৩ পয়েন্টে ক্যালকাটা খো-খো এবং হা-ডু-ডু ক্লাবকে পরাজিত করে।

মাঠের নায়ক

তপনজ্যোতি ব্যানার্জি

জীবনে কখনো কখনো এমন ঘটনা ঘটে, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। ঐ ঘটনাস্রোতে জীবন নদীর গতিপথ যায় পাল্টে, পাল্টে যায় জীবনদর্শন। টি জে'র ক্ষেত্রেও এমনতর ঘটনা কিছুটা নাটকীয়ভাবেই ঘটে গিয়েছিল।

গোটা পশ্চিম বাংলার ক্রিকেট রসিক মহলে টি জে আজ আর অপরিচিত নন। টি জে তপনজ্যোতি ব্যানার্জি।

যে কথা বলছিলাম। অপ্রত্যাশিত ঘটনার কথা। জীবনের মোড় নেওয়ার কথা। ১৯৬৫ সালে টি জে গেছেন পাটনায় আঞ্চলিক আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট খেলতে। খেলার মাঝখানে একদিন বিশ্ব-বিদ্যালয় ভবনে দেখলেন বাবার ছবি। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দলের গ্রুপ ফটোর মাঝখানে বসে আছেন তাঁর বাবা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। দলনায়ক রবীন্দ্র-নাথ। ফটো দেখে তপন উৎসাহে, উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলেন সেদিন। অজ্ঞাতেই যেন প্রতিজ্ঞা করলেন তপনজ্যোতি ওরফে বা সংক্ষেপে টি জে—বড়ো তাঁকে হতেই হবে।

বলা বাহুল্য টি জে-র প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হতে চলেছে কারণ ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে তিনি আজ পশ্চিমবঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত। অথচ টি জে যে ক্রিকেট খেলোয়াড় হবেন একথা তিনি কি নিজেও ভেবেছিলেন? ইস্টার্ন রেলের সিনিয়ার ট্রান্সপোর্ট অফিসার (সেফ্‌টি) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও প্রকৃতি দেবীর একমাত্র পুত্র হাওড়া গোলমোহর এলাকায় রেল কোয়ার্টার্সে থাকার সূত্রে সঙ্গ পেয়েছিলেন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বন্ধুদের। হকির হাতে-খড়ি ওঁদের কাছেই। জীবনে ক্রিকেট এলো পরে, অনেক অনেকদিন পরে।

কিন্তু ক্রিকেট পরে এসেও, ঐ ক্রিকেটই টি জের জীবনের 'প্রথম প্রণয়'। হকি ঘরোয়া সিনিয়ার ডিভিসনে মোহনবাগানে

খেলেছেন। এখনও গ্রীয়ার স্পোর্টিংয়ের জামা গায়ে দিয়ে খেলেন বটে তবে তা নেহাৎই সময় কাটাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে যাই হোক, টি জে ক্রিকেটের অনেক আগে হকিতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার আসরে (১৯৬৪)। স্মৃতির অ্যালবামে সে সব ছবি টি জে-র থরে থরে সাজানো আছে। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে তাঁর জন্ম মামাবাড়ী কানপুরে (উত্তর-প্রদেশ)। পৈতৃক ভিটে হুগলীর গুপ্তি-পাড়ায় আছে বটে তবে ও'রা ঐ গুপ্তি-পাড়ায় কোনদিন যান নি। লেখাপড়া গোড়ায় ব্যাণ্ডেল রেলওয়ে হাইস্কুলে, তারপর বর্ধমান টাউন স্কুলে, সালকিয়া স্কুলে এবং কলকাতার হেয়ার স্কুলে। অর্থাৎ বাবার বদলির যখন যেখানে পোস্টিং, সেখানেই পড়াশুনা। হেয়ার স্কুল থেকে ফাইনাল পাশ করার পরই (১৯৬০) প্রকৃতপক্ষে টি জে-র ক্রিকেটে হাতেখড়ি। সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গবাসী এবং আশুতোষ কলেজে পড়ার ফাঁকে সৌভাগ্যবশত যোগাযোগ হোল সার্বজনীন ভিমুপেদার (অনিল সেন) সঙ্গে। তিনি লাগিয়ে দিলেন নেতাজী সুভাষ ইনষ্টিটিউটে। সন ১৯৬৩-৬৪ ইনস্টি-টিউট সি এ বি জুনিয়ার ডিভিসন প্রতিযোগী। ৬৪—৬৫ সালে খেললেন মিলন সমিতির হয়ে। পরবর্তী পর্বে অর্থাৎ ৬৬-৬৭ সাল থেকে কালীঘাটে সুনীল দাশগুপ্তের ছত্রছায়ায়। ১৯৬৬ সাল তপনজ্যোতির জীবনে নূতন দিগন্তের সন্ধান আনলো। খেললেন রণজি ট্রফিতে। নবাগত তপনজ্যোতির হাত ধরে এক সঙ্গে দলে এলেন সুব্রত গুহ, সুপ্রকাশ সোম, রুসি জিজিবয় আর গণপতি বসু। এই প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতির জন্য টি জে প্রখ্যাত তারা ব্যানার্জি এবং এস রায় ওরফে বাতুদার প্রতি কৃতজ্ঞ। বোলার টি জে বোলিং কলাকৌশলের প্রথম পাঠ পেয়েছিলেন শ্রীতারা ব্যানার্জির কাছ থেকে। ইনসুইং, আউটসুইং লেগকাটার বল কিভাবে দিতে হয় তা শিখিয়েছিলেন শ্রীতারা ব্যানার্জি এবং বাতুদা। ১৯৬৬ সালে কটকে জীবনের প্রথম রণজি ট্রফির আঞ্চলিক খেলায় দু ইনিংস মিলিয়ে উইকেট পেয়েছিলেন সাতটি। ১৯৬৬-৬৭ মরশুমে দলীপ ট্রফিও খেললেন টি জে, কিন্তু উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে (স্থান দিল্লী) বুক ফুলিয়ে বলার মত তেমন কিছু ঘটাতে পারেন নি।

টি জে-র সঙ্গে কথা হচ্ছিল ওঁদের ড্রয়িংরুমে বসে বসে। হঠাৎ দপ্ করে সব আলো নিবলো। লোড শেডিং। ঐ ঘুরঘুটি অন্ধকারের মধ্যে মোমের আলো জ্বালিয়ে স্টেট ব্যাঙ্কের ডিম্যাণ্ড ড্রাফট বিভাগের তরুণ অফিসার টি জে বললেন : '১৯৬৬ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত রণজি ট্রফির আসরে দলের পনেরজনের মধ্যে আমাকে রাখা হয়েছে। ৬৫-৬৬ সালে আসামের আটটি (৫+৩), ৬৭—৬৮ সালে ছটি (৫+১) উইকেট পেয়েছি। ১৯৭৪-৭৫-এ মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইডেন উদ্যানে সাতটি উইকেট (৪+৩) পেয়েছি আমি। এবার বিহারের বিরুদ্ধে পেয়েছি দুটি উইকেট। রান ৪০। ইডেনে সদ্য সমাপ্ত রণজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে কর্ণাটকের তিনটি (১+২) উইকেট আমার। প্রথম ইনিংসে রান ছিল আমার ২২। দ্বিতীয় ইনিংসে অষ্টম উইকেট জুটিতে অম্বর রায় এবং আমি ৭৪ রান দিয়েছি বাংলাকে। স্কোর বোর্ডের দিকে তাকিয়ে তখন আমরা অনেকে জয়ের ক্ষীণ আশাও করেছিলাম, কিন্তু বরাত খারাপ ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা আমাদের সফল হোল না, হেরে গেলাম তপনজ্যোতি ওখানেই থেমে গেলেন। চোখে মুখে দেখলাম চাপা অভিমান। অভিমান অযৌক্তিক নয় মোটেই। যে ছে... ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে জামসেদপু... হোমি মোদী ক্রিকেটে সেঞ্চুরী করলো (১... অপরাজিত), দীপঙ্করের (৮১ অপরাজি... সঙ্গে জুটি বেঁধে দলের রান নিয়ে গে... ৭ উইকেটে ১৬৫ থেকে ৩৫০-এ, ম... জিতলো, সর্বোপরি সুঁটে ব্যানার্জির ... লোকের নজর কাড়লো, সে ১৯৭৪ সা... বাংলা দল থেকে বাদ পড়লো কে... অপরাধে?

কথা থামতেই ঘরে বাইরে আ... জ্বলে উঠলো। লোড শেডিং শেষ। টি জে... স্ত্রী মোমের আলোটা নিভিয়ে দিলে... তপনের জীবনে এবার হয়তো অন্ধকা... পালা শেষ। এখন শুধু তপনের ন... সূর্যের তপস্যা।

বিপুল বন্দ্যোপাধ...

দেশবিদেশের খেলা

চূড়ান্ত লড়াইয়ের অপেক্ষায়

সারা বিশ্বে দাবা অনুরাগীদের মধ্যে উত্তেজনা আবার চরমে উঠেছে আনাতোলি কারপভের বিজয়কে কেন্দ্র করে। স্মরণ করা যেতে পারে ইতিপূর্বে ফিশার স্পাসকির লড়াইকে ঘিরেও উত্তেজনার উত্তাপে সারা পৃথিবী উষ্ণ হয়ে উঠেছিল।

এবারের দাবা যুদ্ধে সেই দুই দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। তবে মার্কিন খেলোয়াড় ববি ফিশারের বিরুদ্ধে আসন্ন বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার ফাইনালে স্পাসকির পরিবর্তে মুখোমুখি হবেন রুশ নন্দন আনাতোলি কারপভ। তেইশ বছরের সোভিয়েত গ্র্যাণ্ড মাষ্টার আনাতোলি কারপভ আগের খেলাগুলিতে যথাক্রমে লেভ পোলুগেভেস্কিকে ৩—০ গেমে, প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান বরিস স্পাসকিকে ৪—১ গেমে এবং সেমিফাইনালে স্বদেশীয় খ্যাত ভিকটর করচনোইকে ৩—২ গেমে হারিয়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

প্রাক্ ফাইনাল পর্বের খেলায় আনাতোলি তার জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলেন। খেলেছেনও অতি সহজ ভঙ্গীতে। সময় সময় এমন তাচ্ছিল্যভরে চাল দিচ্ছিলেন যে মনেই হচ্ছিল না তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলছেন। কুড়িটি চালের পর পাকা দাবাড়ু কারপভের শাণিত চালের কাছে পদে পদে প্রতিহত হয়ে অবশেষে করচনোই মরিয়া হয়ে চালের মারপ্যাঁচে পরাজয়কে এড়াবার বৃথা চেষ্টা করেন। ফলে শেষের দিকে উচ্চমানের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। আনাতোলির নিজের কথায় বলি—করচনোই সৃজনশীল খেলার গতিকে গতানুগতিক চালে আবদ্ধ রেখে কিস্তিমাৎ করতে চেয়েছিলেন। কখনওবা খেলা অমীমাংসিত রেখে আবার কখনওবা আমার স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তার ক্রীড়া পদ্ধতির মধ্যে তেমন কোন

াগের সৃজনশীলতার আভাস আমি
ই নি।

আনাতোলি কারপভের জন্ম ১৯৫১
লের ২৩ মে রাশিয়ার ছোট্ট শহর জ্লাট-
উস্টে। দাবা খেলার সঙ্গে পরিচয় হয় মাত্র
চ বছর বয়সে। তীক্ষ্ন মেধাসম্পন্ন এই
লার প্রতি নিবিড় অনুরাগ জন্মায়।
লার সংগী বাবা। বাবা কাজ থেকে ফেরার
গেই আনাতোলি বোর্ড সাজিয়ে বসে
কে গভীর উৎকণ্ঠায়। আসতে দেরী
লে একক অনুশীলন করে। স্বল্পকালের
ধ্যই দাবার ক্রীড়া কৌশল গভীর
নুসন্ধিৎসার সঙ্গে রপ্ত করে। স্কুলে
বা চ্যাম্পিয়ান হন। এবং মাত্র এগার বছর
সে 'গ্রাণ্ড মাস্টার' প্রতিযোগিতার
তযোগী হয়।

ছাত্রাবস্থাতে আনাতোলির হাতে
নাচক্রে একটি দাবার বই এসে পড়ে।
ক আনাতোলি পরম উৎসাহে বইটি
ড়েন। এবং ধীরে ধীরে ঐ সিরিজের সব
টি বই কেনেন। বইগুলি জোস রাউল
পারানকার লেখা। এই বইটি দাবার
নিক ও ক্রীড়াশৈলী সম্পর্কে অভিজ্ঞ
নাতোলিকে নতুন আলোর সন্ধান দেয়।
ম রুশ দাবা চ্যাম্পিয়ান বটভিনিকের
খার দ্বারাও আনাতোলির অনুসন্ধিৎসা
গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়। বিশেষতঃ
ভিনিকের ক্রীড়া আঙ্গিকের ব্যাখ্যা
নাতোলির মনে নতুন ছায়া সঞ্চারিত
। এবং তিনি বটভিনিকের স্কুলে ভর্তি
। প্রাক্তন গ্র্যান্ড মাস্টার বটভিনিক এই
শোরের দাবা দক্ষতায় মোহিত হন এবং
র গৃহে অবাধ গতায়াতের ছাড়পত্র দেন।
ভাবান ছাত্র গুরুর দেওয়া কাজ
ন্তরিকতার সঙ্গে করতেন এবং তার
র্শিত পথে চলতেন। বটভিনিক ও
পারানকা উভয়েরই প্রচণ্ড প্রভাব আনা-
তোলির দাবার দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীতে
তফলিত ও প্রভাবিত।

দাবাড়ু আনাতোলির জীবনপঞ্জীর বেশ
কটি পাতা সোনালী আখরে লেখা।
৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুইডেনের
হোমে অনুষ্ঠিত দশম জুনিয়ার বিশ্ব
প্রতিযোগিতায় জয়লাভ বিশেষ
খযোগ্য।

আ্যাতোলি কারপভ

এই বিজয়ের অব্যবহিত পরেই উনিশ
বছরের ছেলে ভেনেজুয়েলার কারাকাসে
আয়োজিত দাবা প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর
কনিষ্ঠতম গ্র্যাণ্ড মাস্টার হিসেবে বিজয়ী
হন। তাছাড়া আনাতোলি প্রাক্তন বিশ্ব
চ্যাম্পিয়ান রুশ দাবাড়ু মিখাইল টাইলকে
সোজাসুজি পরাস্ত করেন। এছাড়া দাবার
রাজা রবার্ট জয়েরনার, পূর্ব জার্মানীর
উলফগ্যাং আলেমান যুগোশ্লাভাকিয়ার
গিলোরিক ও ডেনমার্কের বেন্ট লারসেন
প্রমুখ খ্যাতিমানদের দাবাযুদ্ধে স্বচ্ছন্দে
হটিয়ে দেন। ১৯৭২ সালের এক প্রতি-
যোগিতায় প্রখ্যাত স্বদেশীয় স্পাসকিকেও
হার স্বীকার করতে হয়েছে আনাতোলির
হাতে। ১৯৭৩ সালে পৃথিবীর সেরা
দাবাড়ুরূপে আনাতোলি ওসকার পুরস্কার
লাভের গৌরব অর্জন করেন।

সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দ্রুত সিদ্ধান্ত
গ্রহণের ক্ষমতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সতত সচল
মন, গতিশীল শান্ত মেজাজ, লোহের মত
শক্ত স্নায়ু আনাতোলির দাবা সাফল্যের মূল
উৎস।

আনাতোলি কারপভের সমগ্র জীবন কিন্তু দাবার ছকে হারিয়ে যায় নি। একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে কারপভের নামডাক কিছু কম নয়। তুলার এক মাধ্যমিক স্কুল
থেকে গ্রাজুয়েট হন। কলেজের চৌকাঠ
পেরিয়ে লেলিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি
হন। কৃতী মেধাবী ছাত্র হিসেবে বিশ্ব-
বিদ্যালয় থেকে সোনার পদক পেয়ে কৃতিত্ব
প্রদর্শন করেন।

শহরের ছেলে আনাতোলি প্রকৃতি-
প্রেমিক বলে গ্রামের হাতছানিকে উপেক্ষা
করতে পারেন না। সময় পেলেই ঝোলা
কাঁধে বেরিয়ে পড়েন গ্রামের পথে।
আনাতোলি বলেন—অধিকাংশ সময়ে
নিরুদ্দিষ্টের মত লক্ষ্যহীন পথ পরিক্রমা
আমার প্রাত্যহিক জীবনের প্রধান অংগ।
চাকচিক্যময় শহর জীবন মাঝে মাঝে আমার
কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। তখন আমি ঘুরে
বেড়াই মস্কোর গ্রামে গ্রামে খোলা বাতাসে
মুক্ত আকাশের নীচে সবুজ প্রান্তরে।

ফিশার কারপভের মধ্যে আসন্ন বিশ্ব
দাবা চ্যাম্পিয়ানশিপের লড়াইকে ঘিরে
বিভিন্ন মহল আলোচনায় মুখর হয়ে
উঠেছে। সবাইকার একই প্রশ্ন—কে
জিতবে? চলতি বছরের পয়লা জুন তারিখে
খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে। উভয় প্রতি-
যোগীকেই তাদের খেলার পছন্দমত স্থান
নির্ণয় করে কর্তৃপক্ষকে জানাতে
অনুরোধ করা হয়েছে। যদিও ইতিমধ্যেই
ম্যানিলা, মেকসিকো, ফিলিপাইনস, মিলান
প্রভৃতি দেশসমূহ স্বেচ্ছায় তাদের দেশে
বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার দায়িত্বভার নেবার
ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। এসম্পর্কে অবশ্য
কোন স্থির সিদ্ধান্ত এখনও গ্রহণ করা
হয় নি।

ববি ফিশারের জয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা
সন্দিহান। কেননা গত দু'বছর তাকে কোন
দাবা আসরে দেখা যায় নি। ফিশার অবশ্য
এই মন্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন তিনি
পুরোদমে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং
তার জয় সম্পর্কে তিনি প্রায় নিশ্চিত।
অপরদিকে কারপভ বলেছেন—ফিশারের
বিরুদ্ধে আমি জিতবই এমন কথা নিশ্চিত
করে বলতে পারি না, তবে যথেষ্ট আশা
রাখি। কারপভ এখন সেই আশা নিয়ে
ফিশারের অপেক্ষায় দিন গুনছেন।

প্রশান্ত দাঁ

রেকর্ড সৃষ্টিকারিণী

সুটার রীতা সিংহ

—গুলী বন্দুকের আওয়াজ শুনলেই আমার খুব ভয় হত। অথচ সেই আমিই এবছর চন্ডীগড়ে বিংশতিতম জাতীয় রাইফেল সুটিং-এর আসরে ·২২ স্ট্যান্ডার্ড প্রোন পজিশনে মেয়েদের বিভাগে নতুন জাতীয় রেকর্ড করেছি। কথাটা মনে হলে এখনও আমার বেশ আশ্চর্য লাগে। কথাগুলি বলছিলেন বেলগাছিয়া রাজবাড়ীর বধূ শ্রীমতী রীতা সিংহ।

এবছর জানুয়ারীতে চন্ডীগড়ে জাতীয় রাইফেল সুটিং প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী সিংহ পশ্চিমবাংলার পক্ষে যোগ দিয়ে নিজ বিভাগে ৬০০-র মধ্যে ৫৭৯ পয়েন্ট অর্জনের সূত্রে ১৯৭২-এ দিল্লীতে শ্রীমতী গীতা রায়ের অর্জিত ৫৭৩ পয়েন্টের রেকর্ড ম্লান করে নতুন নজীর গড়েন।

—কি করে এটা সম্ভব হল?

—শ্বশুরবাড়ীর একান্ত উৎসাহে। সেন্ট-মার্গারেট স্কুলের ছাত্রী হিসাবে একটু-আধটু স্পোর্টসে যোগ দিতাম। তারপর বেথুন থেকে কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পাশ করি। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ীতে এসে দেখলাম আমার স্বামী শ্রীদেবাশীষ সিংহ বাড়ীর সংলগ্ন উত্তর কলকাতা রাইফেল সংস্থার সদস্যরূপে ১৯৬৫ সাল থেকে নিয়মিত জাতীয় সুটিংয়ে যোগ দেন। আমার শ্বশুরমহাশয়ই এই ক্লাবের সভাপতি। এখানে ওলিম্পিক খ্যাত সুটার হরিচরণ সাউই আমাকে সুটিং শিখতে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি প্রায়ই বলতেন বৌমা সুটিং অভ্যাস করলে খুব ভাল হবে। আর আমার স্বামী স্বয়ং নিজের রাইফেল আমার হাতে তুলে দিয়ে হাতে-খড়ি দিয়েছেন। এঁদের চেষ্টাতেই আমার বন্দুকের ভয় ভেঙে যায়। শ্রীসাউকে উনিও গুরুর মত শ্রদ্ধা করেন। স্বামী আর শ্বশুরমহাশয়ের উৎসাহ না পেলে আমাদের মত বাঙ্গালী পরিবারের বধূর পক্ষে এভাবে সুটিং শেখা সম্ভবই হত না। যাই হোক স্বামীর সঙ্গে সুটিং রেঞ্জে গিয়ে ওঁর দেখে দেখেই রাইফেল চালানর কলাকৌশল অভ্যাস করতে থাকি। মনে ভয় থাকলেও কেবলই ভাবতুম ছেলেরা যখন পারে আমিই বা কেন পারব না?

—প্রথম [illegible] নামলেন?

[illegible] নিয়ায় [illegible] ৭১-এ সেটা [illegible] পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়ানশিপের আসর। জানেন, আমি মাত্র ১০ দিন অনুশীলন করেই ঐ আসরে নেমে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি। প্রথম হন বহু অভিজ্ঞা গীতা রায়। এই আসরে পুরুষ বিভাগে আমার স্বামীর সংগ্রহ থেকে আমি দু পয়েন্ট বেশী পাই (৫৬১ পয়েন্ট)। এতেই আমার একাগ্রতা খুব বেড়ে যায়।

এই সাফল্যের ফলে ১৯৭২-এ সপ্তদশ জাতীয় সুটিং-এর আসরে শ্রীমতী রীতা পশ্চিম বাংলার দলে স্থান পান এবং দিল্লীর নিকলসন রেঞ্জে ·২২ বোর ফ্রি রাইফেল প্রোন পজিসন ও স্ট্যান্ডার্ড রাইফেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন। এরপরের বছরই লক্ষ্ণৌর ক্যান্টনমেন্ট রেঞ্জে প্রোন পজিশনে ৬০০-র মধ্যে ৫৬৯ সংগ্রহ করে চ্যাম্পিয়ন হয়ে জর্জ ভিণ্ট ও ভান্নাট্রফি লাভ করে বাংলার এই গৃহবধূর জয়ধ্বনিতে সেদিন লক্ষ্ণৌর আকাশ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ১৯৭৪-এ আবার দিল্লীতে। এবারের জাতীয় আসরেও ভান্না ট্রফি শ্রীমতী সিংহের হাতে রইল কিন্তু তখনও নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়ার স্বপ্ন সফল হয়নি। সেবার ফ্রি রাইফেলে (প্রোন) জাতীয় চ্যাম্পিয়ানের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রীমতী সিংহ মনোরম এই এন সরকার স্মৃতি ট্রফিটি লাভ করেন। এই সময় তিনি ছমাসের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রতিযোগিতার আসরে।

১৯৭৩-এ লক্ষ্ণৌ-এ স্বামী-স্ত্রী একই সময়ে গুলী ছোঁড়ার ডাক পড়ায় শ্রীমতী সিংহকে অন্যের রাইফেল নিয়ে নামতে হয়

খেলার জগতে মেয়ে

জাতীয় রেকর্ড করার জন্য আমি মনে অনেকদিন ধরেই বাসনা করে চলেছি। ং-এ সাফল্যের জন্য অনেক পদক ও পেয়েছি। কিন্তু আমার সাফল্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিয়েছেন আমার শ্বশুর ায়। তিনি আমার জয়ে আনন্দিত হয়ে ট ঘড়ি উপহার দেন।

লেগাছিয়ার রাজবাড়ীর দোতলায় বসবার শ্রীমতী রীতা ও তাঁর স্বামী শ্রীদেবাশীষ হর সংগে সুটিংয়ের বিষয়ে আলোচনা চ করতেই জানতে পারলাম মহারাষ্ট্র রাট বা দক্ষিণ ভারতের সুটাররা তাঁদের ং সংস্থা ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ভাবে সাহায্য পান। স্ট্যান্ডার্ড সুটাররা ল্যে গুলী পান, তাছাড়া সুটিংয়ের নিক সাজ-সরঞ্জামও তাঁরা সহজে সংগ্রহ পারেন। সেনাদল বি-এস-এফ বা াহিনীর সুটাররা নিয়মিত অনুশীলনের ঢালাওভাবে প্রতিযোগিতার মানের ই পান। অন্যদিকে আমরা একটা কোপও পাই না। অনুশীলনের গুলী চ করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এই াগ শ্রীসিংহ মেজর অরুণ চক্রবর্তী জিত সাধু খাঁ ও শ্রীমিহির সেনের নাম দভাবে উল্লেখ করলেন। শ্রীসেন সুটারদের ভাবে সাহায্য করেন বলে তিনি লেন। শ্রীমতী সিংহও বললেন আমাদের রও যদি এদিকে একটু সহযোগিতার দেন তাহলে এই পশ্চিম বাংলাতেও ক ভাল ভাল সুটার তৈরী হতে পারে। । কথায় শ্রীসিংহ জানালেন শ্রীমতীর ল্যে তিনি খুবই আনন্দিত। সম্প্রতি ী রীতাকে তিনি একটি ভাল রাইফেল দিয়েছেন।

—জাতীয় রেকর্ড করার পর আপনার রকম মনে হয়?

—দারুণ আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু প্রথমে জাতীয় রেকর্ড বলে বুঝিনি। কেউই ানি। ট্রিবিউনের এক ক্রীড়া সাংবাদিকই দের প্রথম বললেন এটা জাতীয় রেকর্ড । তারপর ট্রফি নেবার সময় জাতীয় ত বেজে উঠল। তখন যে কি আনন্দ ার কি বলব। আমার স্বপ্ন এতদিনে হল।

সম্ভ্রান্ত প্রাচীন ঐতিহ্যময় পরিবারের ও বধূর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শ্রীমতী রীতা উত্তর কলকাতার প্রাচীন বসু বংশের কন্যা রায়বাহাদুর এন সি বসুর নাতনী শ্রীসনৎকুমার বসু ওঁর বাবা। দাদা টেবল টেনিস খেলোয়াড় ছোট ভাই ও ছোট বোন আছে। বাড়ীতে এককালে ইস্ট ক্লাব নামে খেলাধূলার সংগঠন ছিল। বাড়ীতে সব কাজেই মায়ের উৎসাহ ছিল সর্বাধিক।

—সুটিং এখন কেমন লাগে? আর একটা কথা—ভাল সুটার হতে গেলে কি কি করতে হয়?

—প্রথম প্রশ্নের উত্তর খুব সোজা শ্বশুরবাড়ীর সবাই যখন সুটিংয়ের সংগে যুক্ত তখন আমার ভাল লাগা স্বাভাবিক উপরন্তু এই রকম সাফল্যের পর। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি—সুটিং সম্পূর্ণরূপে সাধনার ব্যাপার। মনে কোনভাবে উদ্বেগ উচ্ছ্বাস বা হতাশার লেশমাত্র থাকলে সুটিংয়ে সফল হওয়া যায় না। সেই যে মহাভারতে আছে দ্রোণাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন বললেন—আমি শুকপাখীর কেবল চোখটি দেখছি? আমার মনে হয় সুটিংয়ে এই মনোভাবই সঠিক। কেবলমাত্র লক্ষ্যবিন্দুটি দেখতে হবে। সে সময় কোন চিন্তা-ভাবনা মনে থাকা চলবে না। মন হবে একেবারে নিস্পৃহ নির্লিপ্ত। আমি ঠিক এই রকম মন নিয়ে সুটিং করার সাধনা করি। এবার যখন জাতীয় আসরে যাই তখন আমার শাশুড়ীমাতার দেহে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা হচ্ছে। চন্ডীগড়ে ট্রাঙ্ককলে সে খবর পেলাম প্রতিযোগিতার দিন সকালবেলা। ভাবুন কি রকম উদ্বেগ আশংকা মনে জন্মেছিল। কিন্তু আসরে নামবার সময় মনকে একেবারে শূন্য করে নিতে হল। ১৯৭৩-এ লক্ষ্ণৌ-এ জাতীয় আসরে যাই তখন চার মাস অন্তসত্ত্বা, কিন্তু মন দৃঢ় করে চলে গেছি প্রোন পজিশনে ৫৬৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ট্রফি জয় করেছি। এসবই সম্ভব হয়েছে প্রথমত শ্বশুরবাড়ীর অকুণ্ঠ সমর্থন স্বামীর সাহচর্য শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা আর দ্বিতীয় সাফল্য লাভের জন্য নিষ্ঠার সংগে প্রাপ্য সুযোগের সদ্ব্যবহার। জাতীয় রেকর্ড ভাঙ্গার গভীর আগ্রহ মনে মনে ছিল। এখন আরও উন্নতি করার আকাংক্ষা রয়েছে - আকাঙ্ক্ষা রয়েছে সুটিংয়ে আন্তর্জাতিক মানের সমকক্ষ হবার।

—প্রতিযোগিতায় নামার আগে কতদিন নিয়মিত অনুশীলন করেন?

—কমপক্ষে দু সপ্তাহ। কিন্তু তাতে ঠিক হয় না। অথচ আমাদের হাত-পা বাঁধা। উপযুক্ত পরিমাণে গুলি সংগ্রহ করা কিরকম ব্যয়সাধ্য তাত আগেই শুনেছেন। উন্নত ধরনের অনুশীলনের জন্য গুজরাট বা মহারাষ্ট্রের সুটাররা রাজ্য সরকারের আনুকূল্যে বিদেশে পর্যন্ত যাবার ব্যবস্থা করতে পারে বিদেশী রাইফেল গুলী পায়। আমার বিশ্বাস বছরে অন্তত চার মাস ভালভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করতে পারলে আমরা বিশ্বমানে পৌছোতে পারব।

পাইকপাড়ার কুমার জগদীশচন্দ্র সিংহের একমাত্র পুত্রবধূ শ্রীমতী রীতা এক কন্যার জননী ও আদর্শ গৃহিণীও বটেন। ঘরে ছবি আঁকা ও বাটিকের কাজ করেন অবসর সময়ে (অবসর সামান্যই পান)। আর আকাশবাণী কলকাতার সংগীতের আসরেও নিয়মিত শিল্পী। প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের এই পরিবারে ঐতিহ্যের সংগে মিশেছে আধুনিক উদারচেতনা উগ্রতা নয় শান্ত সপ্রতিভতা। এই পরিবারের বধূর পক্ষে জাতীয় আসরে সাফল্যের স্মারক জয় সম্ভব হয়েছে। শ্রীমতী রীতা মহিলা ক্রিকেট সংস্থার গভর্নিং বডিরও সদস্য। আন্তর্জাতিক টেবল টেনিসেও সংগঠনার কাজে এঁর ডাক পড়েছিল কিন্তু সেই সময়েই ওঁকে চন্ডীগড়ে যেতে হয় জাতীয় সুটিংয়ে যোগ দিতে। বললেন—আমার এখন সব খেলাই ভাল লাগে।

সামনের সেপ্টেম্বরে (?) কুয়ালালামপুরে এশীয় সুটিংয়ের আসর বসবে। এই প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধি বাছাইয়ের যোগ্যতার মান ধরা হয়েছে জাতীয় সুটিংয়ে ৫৭৫-এর বেশী পয়েন্ট। চন্ডীগড়ে শ্রীমতী সিংহের সংগ্রহ ৫৭১ পয়েন্ট। সুতরাং আশা করা যায় এই আসরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ পেয়ে শ্রীমতী রীতা সাফল্যের আরও একধাপ উপরে উঠে যাবেন এবং ভারতীয় সুটারদের নতুন সম্মান এনে দেবেন।

অময়

রঙ্গনী আলোয়
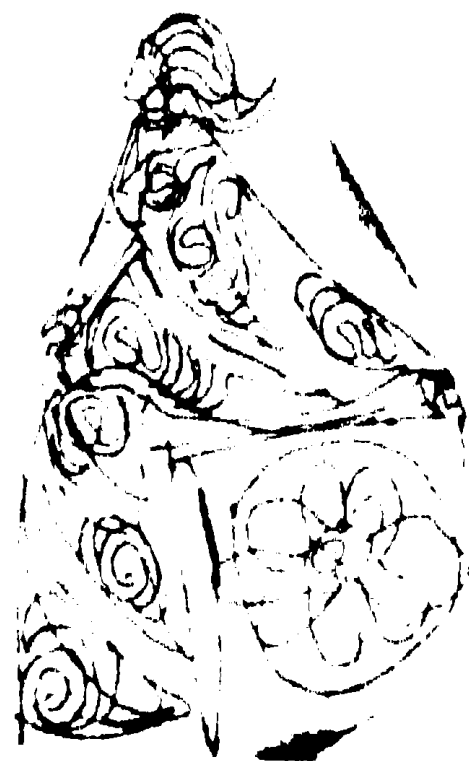
তাহলে আরও কিছুক্ষণ লণ্ডটা জ্বলেই থাকুক কারণ পিনাকী মুখার্জির এই ঘটনাটা পরে হয়ত বিস্মরণ হতে পারি, সুতরাং টাটকা-টাটকা বলে ফেলতে চাই।

পানুদা মহাশ্বেতা ছবির আউটডোরে শুটিং করতে গেছে সেই বসিরহাটের দিকে না কোথায় যেন। সঙ্গে আর্টিস্ট আর টেকনিশিয়ান মিলিয়ে তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন মানুষ সেই অনুপাতে লটবহর। সেখানে নাগাড়ে কদিন শুটিং চলবে, তাই কলকাতা থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন ছবির বিভিন্ন রিকুইজিশানের মধ্যে ছিল একটা কাক—

—কাক? ছবির প্রোডাকশন ম্যানেজারের বিস্মিত প্রশ্ন।

—হ্যা কাক। কা-কা কাগ। শুনতে পেয়েছেন? ওটা আমার চাই পানুদার হুংকার একটা শটে লাগবে, মনে থাকে যেন—

—আর?

—আর ইয়ে লাগবে একজন সাদা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাহেব একজন, তাকেও লোকেশানে নিয়ে যাবেন—

বলে পানুদা বেরিয়ে গেলেন।

এখন এই পানুদার ক্যারেক্টার-না বুঝলে এই গল্প বোঝা যাবে না। পানুদা এমনিতে মানুষ দারুণ ভাল, সককালের সঙ্গে ভীষণ মাইডিয়ার, কিন্তু কাজের সময় একেবারে ভিন্ন মানুষ। পান থেকে চুন খসলে আর রক্ষে নেই। ভীষণ মেথোডিক্যাল, ফাঁকি-জুকির কোন ব্যাপারই নেই ওঁর চরিত্রে। ফলে ওঁর সঙ্গে কাজ করা অনেকের ক্ষেত্রেই অসম্ভব সে কিবা শিল্পী আর কি বা টেকনিশিয়ান। পানুদা যখন ছবির শুটিং করতে নামে তখন স্রেফ উন্মাদের মত কাজ করে যায়, অন্য কোন দিকে তখন তাঁর আর নজর থাকে না। আর এই সময় কেউ যদি সামান্য একটু ভুল-ভ্রান্তি করে বসে তো তার আর সেদিন রক্ষা নেই, পানুদা এমন করে তাকে দেয় যে তাহ সে আর বলা যাবে না। ধরুন না আমি, আমিই কতদিন যে পানুদার ধাতানি খেয়েছি তার আর লেখাজোকা নেই। প্রথম প্রথম আমার খুবেই রাগ হতো কিন্তু পরে যখন দেখলাম মানুষটাই ওই রকম, তত হাম্বিতম্বি করার পরমুহূর্তেই আবার গালে জল তখন আর কি! পানুদা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে আর সারা [illegible] সেটা হচ্ছে সে হয়ত মনে [illegible] ফিকফিক করে

হাসছে। অথচ হাসিটা যে সব সময় পানুদার নজর এড়িয়ে যায়—তা-নয়, সেক্ষেত্রে পানুদার সরব এবং হতাশ মন্তব্য—ছোঁড়াটা একেবারে নির্লজ্জ, বেহায়া। এত অপমানেও দেখ ওর কিছু হচ্ছে না—

আর সহকারী প্রোডাকশন ম্যানেজার শৈলেন সেটা ভাল করেই জানত। তাই পানুদার অমন বিদঘুটে রিকুইজিশন শুনে ওর মনে আতঙ্ক হল—এইরে, এখন শালা কাগ কোথায় পাই? অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নিয়ে কোন চিন্তা নেই, ফিরিংগী পাড়ায় গিয়ে একজনকে ধরে নিলেই চলবে, কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট কাগ?

সব শুনে একজন শৈলেনকে আশ্বস্ত করল—তুই ওর জন্যে চিন্তা করিসনে, ও ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে—

—কি করে? আকাশের কাগ তুই ধরবি কি করে শুনি?

—আর ধুস! তুই পাণ্ডেকে ডেকে একটা কাগের অর্ডার দিয়ে দে, ও ঠিক জোগাড় করে দেবে। পাণ্ডের অসাধ্য কোন কাজ নেই।

অতএব সেই ভাল। শৈলেন পাণ্ডেকে খুঁজে পেতে বলল—পাণ্ডে একটা কাগ সাপ্লাই দিতে পারবে?

—জ্যান্ত?

—হ্যাঁ, ধর দাঁড়-কাগ, এই রকম বড় একটা সাইজের—

—পেয়ে যাবেন তবে খর্চাটা এট্টু বেশী পড়বে। কাগ তো, এট্টু হ্যাপা আছে—পাণ্ডে নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল—টাকা পনের লাগবে।

—ভ্যাট—শুনে শৈলেন ক্ষেপে অস্থির—গোটা পাঁচেক দেব, যদি পার তো কাল সকালে মালটা পৌঁছে দিয়ে যেও, আমরা বিকেলে আউটডোরে বেরিয়ে যাব। আর একটা সাহেব লাগবে—

পাণ্ডে এক মিনিট চুপ করে থেকে বলল—কাগের রেটটা আর এট্টু বিবেচনা করে দেবেন স্যার নইলে দুধে হাত পড়ে যাবে...। ঠিক আছে সকালে পৌঁছে দেব—

সবাই জানে পাণ্ডের কথার বড় নড়নড় হয় না।

পরদিন সককালে বাস্তবিক একটা দাঁড়-কাগ নিয়ে এসে হাজির। বলল—উঃ, শালা ঠুকরে ঠুকরে আমার তেইশটা বাজিয়ে দিয়েছে, বললে তো আপনারা বিশ্বাস করেন না। গোটা সাতেক টাকা দিয়ে দেবেন স্যার।

শৈলেন কাগটাকে দুপায়ে দড়ি বেঁধে চিৎ করে ফেলে রাখল এবং অস্ফুটে মন্তব্য করল—বাপরে, পানুদার যত্তোসব বিটকেল রিকুইজিশনা! শোন পাণ্ডে, সাহেবকে [illegible] তুমি কাল রাত্রে লোকেশানে পৌঁছে [illegible] আসবে এবং সেদিনই বিকেলে ফেরৎ [illegible] আসবে, পানুবাবুর হুকুম।

বলে শৈলেন তাকে লোকেশানের ঠিকা[illegible] ইত্যাদি বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে দিল। পা[illegible] দাঁত দেখিয়ে চলে গেল।

প্রথম দিনই লোকেশানে এক ক্যা[illegible] কাণ্ড। এখন হয়েছে কি, একটা দৃশ্য [illegible] রৌদ্রে বসে বসে মামা তেল মাখবে, মাখ[illegible] দেবে ভাগ্নে। জহর রায় মামা আর ভা[illegible] হচ্ছে সুখেন দাস। রিকুইজিশান অনুয়া[illegible] প্রোডাকশানের একজন এক বাটি সরষে [illegible] লোকেশানে এনে দিয়েছিল সেই কোন [illegible] সকালে, কেউ খেয়ালও করেনি, বরং [illegible] একপাশে চড়া রোদের মধ্যে বাটিটি প[illegible] পড়ে গরমাগরম হচ্ছিল। এখন সেই [illegible] মাখার দৃশ্য করবার জন্যে পানুদা [illegible] প্রস্তুত তখন সূর্যদেব মধ্য গগনে। [illegible]

শটের কম্পোজিশান হল।

জহর রায় খালি গায়ে বসে, [illegible] ভাগ্নে এসে তাঁকে আহ্লাদের সঙ্গে [illegible] মাখিয়ে দিচ্ছে, শরীর মর্দন করে [illegible] আরামে মাতুল উঃ আঃ শব্দ করতে ক[illegible] কিছু কিছু ভাষণ দিচ্ছেন।

শুটিং জোনের মধ্যে শিল্পীরা [illegible] বসে যেতেই পানুদা হুংকার দিল [illegible] তেল?

তখন একজনের স্মরণ হলো—[illegible] তেলের বাটি যে বলে দেওয়া হয়ে[illegible] এনেছে তো?

শৈলেন তাকে আশ্বস্ত করে ব[illegible] আনা হয়েছে বাপু আনা হয়েছে, ওই [illegible] বারান্দায় পড়ে আছে। সুনীল এনে দে[illegible] বাটি-টা।

সুনীল দৌড়ে গিয়ে বাটিটা এনে [illegible] মধ্যে বসিয়ে দিয়ে চলে এল, কেমন [illegible] কিন্তে কিন্তে মুখে। শৈলেনকে সে কিছু [illegible] বার উদ্যোগ করছিল এমন সময় [illegible] হেঁকে বলল—আই শৈলেন কাগ [illegible] তো? এর পরই কিন্তু কাগের শট। [illegible] থাকে যেন।

শুনে শৈলেন দৌড়লো সেই [illegible] আনতে।

স্বচক্ষে কাগ দেখে পানুদা নি[illegible] জোর গুড। দাঁড়া আগে এই স্নানের [illegible] টা নিই, তারপর তোরটা নেব।

শৈলেন ভাবল শটের এখনও তো বেশ দেরী আছে তাহলে এট্টা কাজ করা যাক কাগটার পায়ে লম্বা একটা দড়ি বেঁধে এটাকে আপাততঃ ছেড়ে দেওয়া যাক, ব্যাটা এট্টু চরে বেড়াক—বলে মস্ত লম্বা এক কাতার দড়ি পায়ে বেঁধে কাগটাকে উড়িয়ে দিল শৈলেন। একটা প্রান্ত ধরে রাখল হাতে। কাগ্‌টা ছাড়া পেয়ে হুস করে উড়ে বসলো একটা উঁচু গাছের মগ্‌ডালে। পালাবার উপায় নেই, পায়ে কষে দড়ি বাঁধা। শৈলেন টেনেটুনে দেখল—নাঃ ঠিক আছে।

ওদিকে শট হচ্ছে। মণিটারের সময় সুখেন তেল মাখাবার ফল্‌স্‌ অ্যাকশান করল, জহর রায় তেড়ে ডায়লাগ দিলেন, ব্যস, মণিটার ও, কে, এবার টেকিং, পানুদা বলল—তাহলে জহরদা শট-টা নিয়ে নিই—

—নাও ভাই তাড়াতাড়ি নও। এই তেল মেখে শটের পর আবার পুকুরে নাইতে যেতে হবে। সুখেন, এট্টু ভাল করে মাখিয়ে দিস্‌ বাবা—

সুখেন আশ্বস্ত করল—ঠিক আছে জহরদা ও আমি ফাসকেলাশ করে মাখিয়ে দেব। তারপর চলুন দুজনে মিলে স্নান করতে যাব। এই শট্‌টার জন্যে আমি আজ সকালে স্নানই করিনি—

শুরু হল টেকিং। ক্যামেরা-সাউন্ড চালু হতেই পানুদা হেঁকে বলল—অ্যাকশান—

দাঁত বের করে আহ্লাদিত ভাগ্নে এসে তেলের বাটি তুলে নিল হাতে, তুলেই সে চমকে উঠল, আরিপবাপ, এ-যে আগুন হয়ে আছে বাটি, কিন্তু তখন আর উপায় নেই, ক্যামেরার পেছন থেকে পানুদা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এখন শট কেটে দিলে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড বেঁধে যাবে, ধেত্তেরি, মামার কি ভেবে ভাগ্নে ডবল দাঁত বের করে এগিয়ে গেল। মামা পিঠ এগিয়ে দিয়ে বসে আছে—দেরে, তেলটা মাখিয়ে দে—তার ভাব খানা,ভাগ্নে আর কি, হাতের চেটোয় পো-টাক তেল মানে চড়া রোদ্দুরেরর তাপে যেটা ইতিমধ্যেই টগবগে গরম হয়ে উঠেছে—তেল নিয়ে চোখ বুজে মামার পিঠে বসিয়ে দিল সাপ্টে—

মাত্র এক লহমার বিরতি তারপরই মাতুল তীব্র আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠে—পানুদা দেখল জহরদা 'মরে গেলাম মরে গেলাম' করতে করতে শটের বাইরে আসার উপক্রম করছে পানুদা বোঁ করে ধরে জহরদাকে ঠেলে দিল শটের মধ্যে, ভাগ্নে ততক্ষণে হাসি মুখে আর এক খামচা তেল তুলে নিয়েছে হাতে—মামাকে মর্দন করার অভি-প্রায়, জহর রায়ের প্রাণ যায় আর কি, এক-দিকে ডিরেকটর তাকে বেরুতে দিচ্ছে না অন্যদিকে ন্যাকা ভাগ্নে তাকে ওই তেল মাখাবার জন্যে হন্যে হয়ে আছে, এই রকম একটি পরিস্থিতিতে কেমন গতিকে উনি শট্‌টা উৎরে দিলেন, বাপ!

শটের পর 'আনো বার্নল, আনো এটা আনো সেটা' ধ্বনিতে বেশ কিছুক্ষণ মুখর হয়ে রইল লোকেশান। জহর রায় কাতর কণ্ঠে বললেন—পানু পিঠে ফোস্কা ফেলে দিলে শেষ পর্যন্ত, তোমার ভাই জবাব নেই—পানুদা ভীষণ চিন্তিত, তেল গরম হবার জন্যে যারা দায়ী তাদের খুব একচোট নিল, তারপর আবার যে-কে-সেই।

নেক্সট শট্‌—কাগ্‌!

হল্লা শুনে শৈলেন স্লাইট নার্ভাস বোধ করছিল, এবার সে উৎসাহের সঙ্গে বলল—পানুদা, কাগ্‌ রেডি আছে, আপনি শট্‌ নিতে পারেন।

ক্যামেরা বসে গেল—কাগ্‌ শটের মধ্যে কিসব যেন করবে। ক্যামেরাম্যানকে পানুদা সব ভালভাবে বুঝিয়ে দিল—এক টেকেই ও-কে করা চাই কিন্তু একটাই কাগ্‌ উড়ে বেরিয়ে গেলে আর দ্বিতীয়বার হবে না মশাই। ক্যামেরাম্যান বিজয় ঘোষ শান্তশিষ্ট মানুষ। বললেন ঠিক আছে তাই হবে পানুবাবু।

শৈলেন ঘন ঘন গাছের মগডাল দেখছে, হাতের দড়ি জাব্দা, কাগ বাবাজীর আজ পালাবার পথ নেই, এখন হুকুম করলে এক হ্যাঁচকা টানে কাগকে মাটিতে নামিয়ে এনে শটের মধ্যে ছেড়ে দিলেই শৈলেনের দায়িত্ব খালাস।

—শৈলেন, কাগ আছে তো?

—আছে পানুদা।

—বেশ। ধরে রাখ। বলা মাত্তর যোগান দিবি কিন্তু। কেমন?

—আচ্ছা পানুদা।

ওদিকে হয়েছে কি, ধূর্ত কাগ বাবাজী কখন যে তলে তলে ঠুকরে তার পায়ের বাঁধন ছিন্ন করে ফেলেছে, শৈলেন তা বুঝতেই পারেনি। তার হাতে দড়ি, সে মহা-নন্দে আছে যে কাগ যথাস্থানেই, চিন্তার কোন কারণ নেই। ওদিকে সে ব্যাটা তো পগার পার।

কিছুক্ষণ পর পানুদার হুঙ্কার।—শৈলেন?

—দাদা।

—কাগ!

—আনছি! বলেই দড়িতে হ্যাঁচকা টান। শুধু দড়িটাই খসে এল। কাগ কোথায়?

ব্যস, শৈলেনের রক্ত যেন স্রেফ হিম-ক্রিম। সত্যনাশ। খচরাটা পালিয়েছে। এখন শৈলেন কোথায় পলায়ন করে? পানুদা তো আজ রক্ষে দেবে না। বলা যায় না, রাগের চোটে হাত-ফাত না চালিয়ে দেয়। এট্টু আগে সরষের তেল নিয়ে একটা লঙ্কাকাণ্ড হয়ে গেছে। এখন উপায় শৈলেনের মন বলল, যদি বাঁচতে চাস তো সটান গাছে উঠে গা-ঢাকা দে। নইলে তোকে প্যাঁদাবে। শৈলেন অতএব আর দেরী না করে ধাঁ করে গাছে উঠে ঘন ডালের আড়ালে ভ্যোম হয়ে বসে পড়ল।

—শৈলেন, অ্যাই শৈলেন, কাগটা নিয়ে আয়—

—কিরে, কানে শুনতে পাচ্ছিস না নাকি? শৈলেন—

তক্ষুনি একজন দৌড়ে গেল শৈলেনের খোঁজে। অদূরে একটা বড় আম্র বৃক্ষের তলায় সে ছিল, তাজ্জব কাণ্ড, গেল কোথায়?

সেখান থেকেই সে চেঁচিয়ে বলল—ও পানুবাবু, শৈলেন যে হাওয়া!

—অ্যাঁ? হাওয়া মানে? কাগ কোথায়?

শৈলেন মগডাল থেকে এবার আর্তনাদ করল—কাগ-ও হাওয়া!

তারপর সে এক কুরুক্ষেত্তর। পানুদা গাছের তলায় এসে—অ্যাই নেমে আয়, আজ তোর একদিন কি আমারই একদিন...একটা

[illegible] : কল্যাণী মন্ডল ও রূপা চৌধুরী

এই ছিল মনে : যূঁই, পদ্মা দেবী

জাগ রাখতে দিলাম আর উনি অনুগ্রহ করে লেটিকে ছেড়ে দিলেন? নাম, নেমে আয় ওই—

শৈলেন সভয়ে আরও দূড়াল ওপরে—পানুদা বিশ্বাস করুন, ব্যাটা পায়ের দড়ি কেটে পালিয়ে গেছে, আমি দড়ি টেনে দেখি সে নেই, এবারের মত মার্জনা করে দিন দাদা, কথা দিচ্ছি আর কোনদিন আমার হাত থেকে জাগ পালাতে পারবে না দাদা এখন আমাকে নামতে অনুমতি দিন দাদা ভীষণ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে এখানে, টিকতে পারা যাচ্ছে না পানুদা।

ঘোড়া?...

হ্যাঁ, মনে পড়ে যাচ্ছে 'রাজদ্রোহী' ছবির কথা। নীরেন (বেণু) লাহিড়ী ছিলেন সে-ছবির পরিচালক। ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে রাজদ্রোহীর শুটিং হচ্ছিল, তখন আমারও কি-যেন একটা ছবির কাজ চলছিল ওই স্টুডিওতে। একদিন স্টুডিওর চাতালে বসে আমরা আড্ডা মারছি, হঠাৎ দেখি বুবু গাঙ্গুলী নেংচে নেংচে আসছে। জয়ন্ত বলল, কী ব্যাপার, বুবুর হলো কী?

একজন হেসে বলল—নিশ্চয় কোথাও হুজ্জত করতে গিয়েছিল, ধরে ঠেঙিয়ে দিয়েছে।

বুবু উঃ, একটা ক্যারেকটার, এমন ডাঁহা গুলবাজ মানুষ কদাচিৎ চোখে পড়ে। তবে বিশেষ ক্ষতিকারক নয়, ঝেড়ে দিল একখানা, লাগল তো ভাল আর না লাগল তো বয়েই গেল। ফিল্মে আসা অব্দি একজন নামজাদা অভিনেতার শ্যালক বলে পরিচয় দিয়ে আসছে। অথচ তার ফলে যে ও খুব সুযোগ-সুবিধা কখনও পেয়েছে—জানা নেই। বরং, কিছু কিছু জায়গায় উল্টো ফলই হয়েছে। তবুও বুবু অমুকের শ্যালক—এই পরিচয় দিতে ভুল করে না।

জয়ন্ত বলল—কি বুবু পায়ে কি হলো?

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে বুবু বলল—যা হবার তাই হয়েছে। আমরা রাঁচী আউট-ডোরে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে এই হয়েছে।

পরে সব জানা গেল। রাজদ্রোহী ছবিতে কিছু অ্যাকশন ছিল—ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছোটছুটি দৌড়দৌড়ি। বেণুদা কলকাতার ঘোড়া ভাড়া করে এনে সেই সব দৃশ্য গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কলকাতার ঘোড়ার সাধ্য কি ওই সব রোমহর্ষক দৃশ্যের শট দেয়? স্বভাবতই ট্রায়াল শো দেখে কেউ খুশী হননি। তখন স্থির হয়েছিল, পরবর্তী রাঁচী আউটডোরে মিলিটারী ঘোড়ার সাহায্যে ওই সব দৃশ্য গ্রহণ করা হবে। ঘোড়-সওয়ারদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং উত্তমকুমার, কমল মিত্র এবং অন্যান্যরা। বুবু-ও একজন ঘোড়-সওয়ার।

বেণুদা একদিন জানতে চেয়েছিলেন—কিহে বুবু, ঘোড়ার ব্যাপারে তোমার এলার্জি নেই তো?

ব্যস, বুবুর সেকি লেকচার।—বেণুদ ঘোড়া দিয়েই তো, আমার দিনের শুরু এব শেষ। ঘোড়া চিনতে চিনতে আমার একখান বাড়ি গেছে যাক। তবুও আমি চিনে যা আমাকে আবিষ্কার করতেই হবে যে কো ঘোড়া বিহেভিয়ার আর কোন ঘোড়া আম ফ্রেন্ড। আমায় ঠাট্টা করতে পারেন কি মাই হর্স ইজ অলওয়েজ মাই হর্স—

বলতে বলতে সহসা বুবুর চোখ ছলছ করে উঠল। তারপর কিঞ্চিৎ আত্মসম্বর করে বলল—হঠাৎ ঘোড়ার কথা কেন দাদা

বেণুদা স্বভাবসুলভ হেসে বললেন—বাবারে তুমি দেখছি ঘোড়ার ব্যাপারে খু স্পর্শকাতর। যাই হোক, ঘোড়ায় চড়া জান? জানলে একটা ভাল পার্ট তোমায় দিতে পারতাম।

পার্টের কথা শুনে বুবু এক লাফে—বিলক্ষণ জানি, ওই ঘোড়া চড়তে গিয়েই তো ইয়ে হ'ল আর কি, মানে ল্যান্ড-স্লাইড। আগে নিজে চড়তাম, এখন অন্যকে চড়াই—এই যা ডিফারেন্স।

কমল মিত্তির সম্ভবতঃ অত নাড়া কা জানতেন না যে তাঁকে রাঁচী আউটডোরে অত ঘন ঘন ঘোড়া মানে মিলিটারী ঘোড়ায় চড়তে হবে। লোকেশানে পৌঁছে তাঁর কেমন যেন সন্দেহ হলো। ইউনিটের সবাই কথায় কথায় ঘোড়ার কথা উল্লেখ করছে, কি-ভাবে চালাবে তার পাঁয়তারা কষছে দেখে কমল মিত্তির স্লাইট দমে গেলেন। শুধু বুবু গাঙ্গুলীরই যা উৎসাহ। যেন কতদিন পরে একটা প্রকৃত সুযোগের সম্মুখীন হয়েছে সে!

কমল মিত্তিরকে বলল—দাদা, একেবারে মিলিটারি ঘোড়া, চড়বেন যখন তখন বুঝবেন, স্রেফ তুলো যেমন বাতাসে উড়ে যায়—তেমনি করে উড়িয়ে নিয়ে যাবে—

—তোরা চড়ছিস নাকি?

—আলবৎ। সেইজন্যেই তো এখানে আসা। রাঁচীর মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট থেকে দু' ডজন ট্রেন্ড হর্স আনা হচ্ছে। উত্তম-কুমার, আপনি, আমি সর্বদাই চড়ব।

কমল মিত্তির বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বেণু লাহিড়ীর সুযোগ্য সহকারী মানু সেনকে ডেকে জিগ্যেস করলেন—কিহে মানু, বুবু যা বলছে সব সত্যি নাকি? আমি কিন্তু একবার চড়ব, দ্বিতীয়বার নয়, হাজার অনুরোধ করলেও নয়—

মানু সেন বললেন—বুবুর কথা ছাড়ুন তো কমলদা...

কমল মিত্তির তখনকার মত থামলেন বটে কিন্তু মনে তাঁর ভয় ঢুকে গেল। কলকাতার ঘোড়াগুলো মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু রাঁচীর মিলিটারী ঘোড়া? সেগুলো কি-রকম বিহেভ করবে কে জানে!

(চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

ফ্লোর থেকে বলছি

গনগনে রোদ্দুরের দুপুরে টেকনি-
ান্স স্টুডিওর ফ্লোরে সেদিন হয়তো
হাসের কোন একটি কালোরাত। এক
কার থেকে আরেক অন্ধকারে। অথচ
টং জোনের মধ্যে আলোর বন্যা। হাজার
ার কিলোওয়াট জ্বলছে। জ্বলছে সারি
। ঝাড়লন্ঠন। তিনদিকে কারুকাজ করা
য়াল। একদিক উন্মুক্ত। দেওয়ালের দিকে
ময় চোখ ফেরানো যায় না। বড় বড়
না। মেঝের ওপর লাল গালিচা পাতা।
ওপরেও অনেক নকসা করা। মধ্যমণি
বসে আছেন চিন্তামণি। তাঁর গানের
। মুগ্ধ অতিথিরা বসে আছেন ছড়িয়ে-
য়ে। বিশেষ অতিথি নীলধ্বজ। তিনি
ট তাকিয়ার ওপর হেলান দিয়ে চিন্তা-
। মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর
চিন্তার সারা শরীরটাই ঘুরে ঘুরে
ছিল। অপরূপা চিন্তামণিকে কে বলে
। তুচ্ছ মেয়েমানুষ। অসামান্য তাঁর
। তাঁর গলায় সুরের যাদু। তানপুরায়
রাখতেই যেন আকাশ-বাতাস আন্দোলিত
পাখীরা সব কলতানে মুখর হল।
ামণির সুরের মূর্ছনায় কোথায় যেন
। ব্যথা—উপস্থিত সবাইকে ছুঁয়ে
। যাচ্ছিল। ব্যথার কথার রেশ ছুটে
ল দূরে, অনেক দূরে। বোধ করি
দুগলের কাছে এসেও পৌঁছেছিল :

ারও মন রয়েছে,
র যে মধু ভরা
মধু চাইবে এসে
নি না কোন্ ভ্রমরা
ব সে ভালবেসে ফোটাবে মনের মুকুল...

ন্তামণির এই গানের সুরে সুরে পথ
র এসে পড়ে বিল্বমঙ্গল। চিন্তা-
ভালবেসে মনের মুকুল ফোটাতেই
আগমন। কিন্তু এই ভরা দুপুরবেলায়
গলের রূপকার সমিত ভঞ্জ স্টুডিও
কো-অপারেটিভ থেকে এখানে চলে
ন স্রেফ গ্যাজাতে। তোমরা কিরকম
করছ দেখতে এলাম। কাজ করছ না
দিচ্ছ? সমিত অনেক ... ...
ণ এইভাবে। শট-এর ফাঁকে ফাঁকে,
র নানাবিধ গল্প। আমার সঙ্গে কথা
াবর্তী ছবি নিয়ে। এখন বলতে গেলে

প্রতিদিনই শুটিং করতে হচ্ছে। শনিবার, রবিবারেও ছুটি নেই। আজ হারমোনিয়ামের শুটিং চলছে। তপন সিংহের ছবি হারমোনিয়াম। 'এ ছবিতে সমিত একটা নতুন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করছে।—'আপনজন'-এর মত তপনবাবুর ছবিতে আবার ওরা একত্র হয়েছেন। তবে এখানে রাইভাল নয়। স্বরূপ, মাস্তানের ভূমিকায়। সমিত সাদাসিধে গ্রামের ছেলে। একদা সে তার এক পাতানো মাসীর সঙ্গে বেড়াতে এসে এক পল্লীতে রয়ে গেছে। বারবণিতাদের বাস এখানে। শ্যামা নামে একটি মেয়েকে রতনের ভারী পছন্দ। শ্যামা ভাল গান করে সেটা রতনের আরও ভালো লাগে। তাই সে, বলা নেই, কওয়া নেই, একটা হারমোনিয়াম কিনে এনেছিল। এইভাবেই গল্পের বিস্তার। মাসী এবং শ্যামার মধ্যে রতন বেশ সুখেই থাকে।

আপাততঃ সুখে থাকতে পারছে না। ফ্লোরের মধ্যে বড্ড গরম লাগছে। মার্চ মাসেই যা গরম পড়েছে। এর ঠ্যালাতেই অস্থির কাণ্ড। সমিত দরদর করে ঘামছিলেন। একটু পরেই আবার গিয়ে শুটিং করতে হবে। ফ্লোরের মধ্যে বসে থাকা। তাই মুক্তবায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে সমিত এই মুহূর্তে ফ্লোরের বাইরে আসছেন।

এদিকে শুটিং জোনের মধ্যে ... চলছে। ক্যামেরার পজিশন দ্রুত পরিবর্তন করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে অড-অ্যাঙ্গেল থেকে শট টেক করা হচ্ছে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী। চিন্তামণির রূপসজ্জায় সোমা দে এবারে মেক-আপ রিটাচ করছেন। কারণ যা গরম পড়েছে। ক্লোজ-আপ কম্পোজিশন। সোমা, সেই একইভাবে। তানপুরায় হাত রেখে প্লে-ব্যাকের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন। একটা রিহার্সাল দেখা হল। ফাইন। অতএব শটটা টেক করা যেতে পারে। প্রধান সহকারী অমিতাভ, মিঠু সহ (আরেকজন সহকারী) স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। চিত্রশিল্পী দীপক দাশ 'অল লাইটস' উচ্চা-

...' : ...তি ভট্টাচার্য, স্বরূপ দত্ত ... : অমৃত

রুপ করে ক্যামেরা চালু করে দিলেন। দৃশ্যটা হুবহু ধরে রাখা হল।

এইবার আসুন গল্পে। এখানেই আসছে বিল্বমঙ্গল। চিন্তামণির রূপে গুণে আর গানে পাগল বিল্ব তার জীবনের সবটুকু সঞ্চয় উজাড় করে দিতে চাইল।

আত্মোপলব্ধির পর চিন্তামণি বলে : আমার জন্যে। এই একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষ-এর জন্য।

বিল্বমঙ্গল : অমন করে বোল না। তোমার রূপ—

চিন্তামণি : রূপ। তুমি তো অনেক লেখাপড়া শিখেছ। তুমি জান না রূপ দুদিনের...তাছাড়া তুমি বোঝ না? আমি নটী। সারাক্ষণ তুমি ঘরে থাকলে অন্য লোকজন আসবে কি করে? আমার রুজি রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে না? তোমার তো পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই। ...আমি কি উপবাস করে মরবো? তোমার মিনতি করে বলছি তুমি যাও। আর এস না।

বিল্বমঙ্গল : আসব না? আমি যে তোমাকে ভালবাসি।

চিন্তামণি : ভালবাসি ভালবাসি। তোমার এমন পাগলকরা ভালবাসা আমার মত সামান্য নারীকে দিয়ে কেন নিজেকে এত ছোট করছ?

বিল্বমঙ্গল : ছোট করছি?

চিন্তামণি : হ্যাঁ শোননি? তোমাকে সবাই লম্পট, বেশ্যাসক্ত বলে। চুপ করে আছো কেন? যাও চলে যাও। তোমার কি লজ্জা নেই?

বিল্বমঙ্গল : বেশ আমি চলে যাচ্ছি চিন্তামণি। কিন্তু আমার যে কেউ নেই। কোথায় যাবো?

চিন্তামণি : কেউ কারো আপন নয়। যিনি সবচেয়ে বেশী আপন তাঁরই স্মরণ নাও।

বিল্বমঙ্গল : কে সে?

চিন্তামণি : ভাল করে তাকিয়ে দেখ—যাঁর চেয়ে আপন কেউ নেই। যিনি অসহায়ের সহায়। ...রূপ...এ রূপের কোন তুলনা আছে নাকি?

আপাতত, এইটুকুই জানাবেন। বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি--প্রচলিত প্রেম-কাহিনী। বাণী চিত্র মন্দিরের ব্যানারে 'বিল্বমঙ্গল' নামে এই ছবির স্বরচিত চিত্রনাট্যে পরিচালনা করছেন গোবিন্দ রায়। এক কালের বিখ্যাত প্রযোজক এবং পরিচালকও বটে। বহুদিন বিরতির পর তিনি ছবি করছেন। প্রবীণ এই কুশলী একদল নবীন কুশলীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছেন, এটা একটা দেখার মত বিষয়। এই পর্যায়ের শুটিং নিয়ে ছবির অনেকখানি অংশ সুসম্পন্ন হল। আগামী পর্যায়ে বহির্দৃশ্য গ্রহণ। এই পর্যায়ের শুটিংএ শিল্পীদের মধ্যে অংশ নিলেন : সমিত ভঞ্জ, সোমা দে, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, নীনা মুখার্জি এবং গীতা দে। সুর-সংযোজনা করছেন প্রবীণ সুরকার অনিল বাগচি। গান এ ছবির অন্যতম সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। এই পর্যায়ে প্রণব রায়ের লেখা আরতি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া উপরিলিখিত গানটি পিকচারাইজ করা হল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই ছবির পরিবেশন ভার নিয়েছেন সাহা ফিল্মস।

স্টুডিও সংবাদ

ছায়া : আরতি ভট্টাচার্য

এই সপ্তাহে কলকাতার স্টুডিওর সবচেয়ে বড় খবর সত্যজিৎ রায় তাঁর নতুন ছবির শুটিং শুরু করেছেন। অন্তর্দৃশ্য-গ্রহণ করছেন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। শংকর-এর রচনা থেকে স্বরচিত চিত্রনাট্য-পরিচালনা করছেন শ্রীরায়। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন নবাগত প্রদীপ মুখার্জি দীপংকর দে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, আরতি ভট্টাচার্য পদ্মা দেবী রবি ঘোষ এবং উৎপল দত্ত। এই পর্যায়ে নায়কের বাড়ির সেট পড়েছে। একটানা সতেরো-আঠারো দিনের সিডিউল। চিত্রগ্রহণ করছেন : সৌমেন্দু রায়। সম্পাদনা করছেন : দুলাল দত্ত।

স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এ পরিচালক তপন সিংহ 'হারমোনিয়াম' ছবির শুটিং দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এই পর্যায়ে বারবণিতার ঘরের সেট পড়েছে। শিল্পীদের মধ্যে অংশ নিচ্ছেন : ছায়া দেবী, আরতি ভট্টাচার্য, সমিত ভঞ্জ ও স্বরূপ দত্ত। চিত্রগ্রহণ করছেন : বিমল মুখোপাধ্যায়। স্বরচিত কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন শ্রীসিংহ স্বয়ং। অনেকগুলি গান রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছে। এবং পিকচারাইজও।

এই সপ্তাহ থেকেই ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে দয়াশংকর সুলতানিয়ার কলার হিন্দি ছবি 'কিতনে পাস কিতনে দূর'-এর অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ করার কথা ছিল। অনিবার্য কোন কারণে সেটা হয়নি। আসছে সপ্তাহ থেকে এই পরিকল্পিত পর্যায় শুরু হবে। এই পর্বে বম্বে থেকে অশোককুমার ও প্রাণ আসছেন শুটিং করতে। ছবির দুটি বিশেষ চরিত্র রূপায়িত করবেন—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল। ছবির গল্প দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের কাজ শেষ হয়েছে। এখানে অংশ নিয়েছেন : সমিত ভঞ্জ, হিনা কৌসর, অনুপকুমার, রবি ঘোষ চিন্ময় রায় এবং সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ করছেন : সত্য রায়। শিল্প-নির্দেশক : বিজয় বসু।

পরিচালক পীযূষ বসু ... শুটিং শেষ করেছেন। ' সন্ন্যাসী ... শুটিংও শেষ করে এনেছেন। শুরু ... নতুন ছবি, তার পরিকল্পনা চলছে। ... কয়েকটি ছবি হতে পারে। এই ম... কি শুরু করবেন প্রশ্ন করা হলে মহলের উত্তর : 'যার যেথা ঘর'। ... মুখোপাধ্যায়ের গল্প। এ ছবির দুটি পুরুষ চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ... দিলীপ রায়ের থাকার কথা। নায়িকা অপর্ণা সেন?

স্টুডিও সংবাদ

নির্দোষ

একটি গতানুগতিক উপভোগ্য ছবি।

প্রযোজনাঃ নব সম্যাপ্তি প্রডাকশন্স

জেলা জজ দ্বারকাপ্রসাদ-এর ছেলে রবি এবং গ্রামের জমিদারের মেয়ে রূপো পরস্পরের সঙ্গে বিবাহের ব্যাপারে ছেলেবেলা থেকেই অঙ্গীকারবদ্ধ। রবি ওঁর পিতার মতোই আইন অধ্যয়ন করে যখন শিক্ষিত হয়ে বাড়ী ফিরে এল, তখন আর সেই অশিক্ষিত গ্রাম্য তরুণী রূপোকে বিবাহ করতে রাজী হোল না। তখন দ্বারকাপ্রসাদ রবিকে বললেন—গ্রামে গিয়ে যদি সে বোঝে, রূপো তার মনের মতো পাত্রী নয়, তাহলে সে এই বাগদান নাকচ করে তার পছন্দমতো মেয়েকে বিবাহ করতে পারে।

গ্রামে গিয়ে রবি রূপোকে দেখেই চমকে উঠলো, কারণ তার পরিধানে তখন ছেলেদের পোষাক। ওঁর বাবা সেই গ্রামের জমিদার, ছেলেবেলা থেকেই ওঁকে সেইভাবে মানুষ করেছেন। এজন্যে আইনজ্ঞ রবি রূপোকে একেবারে মন থেকে মুছে ফেলে দিতে পারলো না।

রূপো তার বন্ধু তিলো ও তার ভাই শঙ্করের সঙ্গে শহরে গিয়ে, সেখানকার লোকেদের সঙ্গে মিশতে চাইলে, বাবা ওঁকে মেয়েদের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করবার জন্যে উপদেশ দিলেন। রূপোর বাবারও ইচ্ছা ছিল শহরে পৌঁছে, ধুমধামের মধ্যে দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেন। কিন্তু আচমকা বর্ষা এসে সমস্তই ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেল। গ্রামের বন্যাতে রূপোর মা ডুবে গেলেন এবং পিতাও মারা গেলেন। এসময় কোন সহৃদয় ব্যক্তি রূপোর সাহায্যের জন্যে এল না। কয়েকজন কুচক্রী ও অসৎ ব্যক্তি এসে রূপোকে বোঝালো—শহরে ওঁর আত্মীয়ের কাছে তারা পৌঁছে দেবে, এই অছিলায় তাকে পতিতালয়ে নিয়ে যেতে চাইলো ওরা, কিন্তু রূপো ওদের উচিত শিক্ষা দিল। এদের হাত থেকে রেহাই পেলেও, অপর চার কুচক্রী ওঁর উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। বাল্যবন্ধু তিলো ওঁকে সেবার বাঁচায়। কিন্তু রবি রূপোর প্রতি পাশবিক অত্যাচারের কথা বিশ্বাস করলো না। রবির মা রূপোকে ঘরে তুলতে রাজী হলেন না, কারণ তখন সে অন্তঃসত্ত্বা। রূপো ওখান থেকে বেরিয়ে কুচক্রীদের হত্যা করে তার প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়। রবি তার ভুল বুঝে রূপোকে বিবাহ করতে রাজী হোল অবশেষে।

কাহিনী ও পরিচালনা গতানুগতিক। ইতিপূর্বে পরিচালক এস এম সাগর ওজাতীয় ক্রাইম ছবি পরিচালনা করেছেন। এ-ছবির সম্পদ হোল অভিনয় আঙ্গিক ও সুর সংযোজনা। অভিনয়ে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় বিনোদ মেহরা ও যোগিতাবালীর কাজ মন্দ নয়। অন্যান্য চরিত্রে—সুজিতকুমার, পদ্মা খান্না, ইফতেকার, নাজনীন, কুলজিৎ, মোহন চটী, মুমতাজ বেগম ও ললিতা কুমারী চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। আলোকচিত্রগ্রহণে দারা ইঞ্জিনিয়ার এবং সম্পাদনায় পি এস সারগলের কাজ উচ্চাঙ্গের। সঙ্গীতে লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল উপভোগ্য সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন।

চিত্রদূত

কিছুক্ষণ

ঝুমুর গাঙ্গুলী

সেকি প্রচন্ড জোরে হাসি! বাইশ বছরের যৌবন ছলকে ছলকে উঠছিল যেন হাসির মধ্যে কিন্তু সেই সঙ্গে রিনরিন করে বাজছিল চাপা কৌতূহল। হাসি আর থামে না কিছুতেই। অবশ্য হাসবার মতই ঘটনা বটে। ডিরেক্টর-প্রোডিউসার-ক্যামেরাম্যানের সামনে দিল্লীর চোস্ত এক আপ-টু-ডেট মেয়েকে যদি কনে সাজার মত পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে সে হাসবে না তো করবে কি! যৌবন কাঁপানো হাসি যখন থামল তখন ডিরেক্টার সুনীল বাঁড়ুজ্জে সবাইকে চমকে দিয়ে বলে উঠলেন—'এ হাসি তো বসনের নয়, ঠাকুরঝিকেই মানাবে ভালো।'

আর এই কথাতেই ফাইনাল হয়ে গেল। দিল্লীর তুখোড় মেয়ে ঝুমুর গাঙ্গুলী হয়ে গেল 'কবি'-র ঠাকুরঝি। তারাশঙ্করের ঠাকুরঝি! প্রায় অতর্কিতেই জীবনের পথটা গেল পাল্টে। দিল্লী ইউনিভার্সিটির এম-এ ঝুমুরকে আসতে হোল কলকাতায়। পাল্টে গেল আরও অনেক কিছু।

যে মেয়ে এই বাইশটা বছর ধরে মিনি-ম্যাক্সি-শালোয়ার-কামিজে সাজাতো শরীরটাকে তাকে যদি হঠাৎ এগার-বারো হাত শাড়ীতে প্যাঁচ কষতে হয় বুঝুন ব্যাপারখানা।' 'বীরভূমের লোকেশনে স্যুটিং-এর সময় কতবার যে শাড়ীতে জড়িয়ে হুরদার পড়েছি তার ঠিক নেই।' বলেই আবার সেই যৌবন ছড়ানো হাসি ছড়ালেন ঘরটায়।

ঝুমুরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় দিল্লীতেই। ও'দের ডিফেন্স কলোনীর বাড়ীতে যেদিনই আড্ডা বসেছে শেষ হতে রাত্তিরের কয়েক প্রহর যে কেটে গেছে বুঝতেই পারিনি। ও'র মা-বাবা দুজনেই ভয়ানক মানুষ ভালোবাসেন। কলকাতার লোক পেলে তো ছাড়তেই চান না। আর সেই আড্ডার মধ্যমণি হয়ে ঝুমুর ইংরেজী-বাংলা হিন্দীর চচ্চড়ি ভাষায় তাঁর প্রথম অভিনয়ের অভিজ্ঞতা, ব্যবসা-ভাই বিল্টুর সঙ্গে ছোটখাট খুনসুটির কথা বলে গেছে। বম্বের গাঙ্গুলী ফ্যামিলি (অশোককুমারদের ফ্যামিলি আর কি!) সুবোধ মুখার্জিরা নাকি ও'দের খুব নিকট সম্পর্কেরই আত্মীয় রাজকাপুর দিল্লী গেলে ও'র বাবার সঙ্গে দেখা না করে যান না ইত্যাদি আরও হাজারো গল্পের সঙ্গে কখন যে সদ্য পরিচিত ঝুমুরকে অতি-পরিচিত মনে হয়ে উঠেছে বলতে পারব না। কথা দিয়েছিলাম কলকাতায় এলে দেখা করব। তাই যেদিনই শুনেছি যাত্রিকের 'সোনা বন্ধ ক্যাবারে' ছবিতে কাজের জন্য ঝুমুর এসেছে কলকাতায় ফোন করেছি ছায়া দেবীর বাড়ীতে। (কলকাতায় ঝুমুরের ঠিকানা এইটাই)

আর যথারীতি যথাসময়ে হাজির হতেই হাতে একখানা পত্রিকা নিয়ে ঢুকলেন ঝুমুর। হাসি ছিল মুখে। তবে এবারে নিঃশব্দ হাসি। পরণে ম্যাক্সি। এই দু মাসে চেহারার কোনো পরিবর্তন নজরে পড়লো না। চোখে আলতো করে লাগানো কাজল। কোনো মেক-আপ নই। এসেই বললেন 'দিল্লী থেকে এসে

আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। আসলে আপনার কার্ডটাই আমি আনতে ভুলে গেছি কিছু মনে করেন নি তো!' হাসির ঢেউ তুলে কোনো ফিল্ম অ্যাকট্রেস এইভাবে কথা বললে কি আর কিছু মনে করা যায়! যায় না বুঝি। তাই একটু বিরক্ত হয়েই বললাম—'না না তা কেন?'

বসলেন সামনের চেয়ারে। হাতের বই হাতেই রইল। দিল্লীতে তোলা নিজের কিছু ছবি দেখালেন। বাড়ীর খবর জানতে চাইলাম। 'এই তো কদিন আগে বাবা এসেছিলেন কলকাতায়! দু-তিন দিন ছিলেন। আবার আসবেন হয়তো!'

—কলকাতা কেমন লাগছে?

: মন্দ কি ভালোই। তবে মাঝে মাঝে মা-বাবা ভাই-এর জন্য মনটা কেমন যেন করে।

তাই প্রতিদিন দিল্লী থেকে ফোন আসে ঝুমুরের মা-বাবাও একমাত্র মেয়েকে ছেড়ে বোধ হয় ওখানে স্থির থাকতে পারছেন না। রোজই বাড়ীর কারো-না-কারো সঙ্গে কথা হয়। বেশীক্ষণ কথা বলতে পারেন না বলে মনটা আরও খারাপ হয়ে যায় অনেক সময়।

কি আর করা যাবে! কলকাতায় অবশ্য ঝুমুর এখনও থাকবেন কিছুদিন। 'স্নো ফক্স ক্যাবারে' শেষ করে তবে যাবেন। 'এইজন্যেই জানেন আমার বম্বে যাওয়া হচ্ছে না—বলেই একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লেন যেন। রাজকাপুর-সুবোধ মুখার্জি-কিশোরকুমার আরও অনেকেই নাকি 'ঝুমার'কে (ওখানে ওঁকে এইভাবেই ডাকেন সকলে) অফার দিয়েছেন বম্বে যাবার জন্য। কিন্তু যেতে পারছেন না।

কেন?

যাবটা কি করে বলুন? বম্বেতে আমার সঙ্গে থাকবে কে? এখানে তো তবু ছায়াপিসিকে পাচ্ছি! ওখানে কাকে পাব? বাবা বিজনেস নিয়ে ব্যস্ত। মা সংসার নিয়ে—একটু অনুযোগের সুরও বাজল যেন গলায়। বললাম—কেন আপনার ভাই বিল্টু রয়েছে তো?

—ওর কথা আর বলবেন না। এই তো কমাস আগে ফরিদাবাদে ও ফ্যাকটরি করেছে। আমার সংগে যাবে কি করে?

সত্যিই বিমর্ষ হবার মতই ঘটনা বটে। বম্বেতে ছবিতে কাজের জন্য সারা ভারতের সব মেয়েরা যখন হুটোপাটি করছে কি-না-করছে অনেকে! আর সেখানে কাজের অফার পেয়েও কাজ করতে না পারাটা দুঃখজনক ঘটনা তো বটেই।

যাই হোক বম্বে যখন আর যাওয়া হচ্ছে না বম্বের কথা বাদ দিই। চলে আসি কলকাতাতেই। কবির ঠাকুরাবা এখন 'স্নো ফক্স ক্যাবারে'র একটি মেয়ে। বারো হাত শাড়ীর প্যাঁচ-পোঁচ এখন ঝুমুরের হাতের মুঠোয়। চাই কি কাপড় দিয়ে আরও বেশী শরীরটাকে খোলাতে পারে সে। আর ককটেল-পার্টি ইত্যাদিতে তার অভিজ্ঞতা বলার দরকার হয় না।

এহেন ঝুমুরকে যাত্রিকের দিলীপ মুখার্জি যখন টেকনিসিয়ানের এক নম্বর ফ্লোরে বলেছিলেন—'দেখো এই সিনে তোমাকে ড্রাংকার্ড মানে মাতালের অভিনয় করতে হবে। কথাটা শুনে শুধু তার যৌবন নয় ফ্লোর কাঁপিয়ে হেসে উঠেছিল ঝুমুর। 'ড্রাংকার্ড হতে হবে আমাকে ভাবতেই পারছি না। লোককে ড্রিংক করতে দেখেছি ড্রাঙ্কার্ড হতে দেখেছি। আমাদের বাড়ীতেই এমন বহু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আমি নিজে তো কখনো ড্রাঙ্কার্ড হইনি। তাই দিলীপ-বাবুকে আমি বললাম—আই নো হাউ টু ড্রিঙ্ক বাট অই ডোন্ট নো হাউ টু গেট ড্রাঙ্ক। দিলীপবাবু সেজন্য তাকে ছেড়ে দেননি। ছবির ভাইটাল সিন। ঝুমুর করেওছে কাজ। কেমন করলেন জিজ্ঞেস করাতে বললেন—'জানি না কি করেছি, হাত-পা ছুঁড়ে মাতাল হতে গিয়ে আমার প্রচন্ড হাসি পাচ্ছিল। উত্তমবাবু আমায় যখন ধরেছেন তখন আর প্রায় হাসি সামলাতে পারছিলাম না। যাই হোক কোনমতে ম্যানেজ। আর শটটা টেকিং-এর পর প্রাণ খুলে হেসে নিয়েছি।'

ও আরও জানাল এ ছবি করেই হয়তো সে কলকাতা ছাড়তে পারবে না! ইতিমধ্যে উৎপলবাবুর নাটকের গ্রুপে ঝুমুর রিহার্সাল শুরু করে দিয়েছে। পরের নাটকেই একটা ভালো রোল করছে। 'তাহলে তো আর কলকাতা ছাড়তেই পারবেন না আপনি। ভালোই হোল। একে বাংলা ছবিতে তো নায়িকার প্রচন্ড অভাব। আপনি থাকুন তবুও একটা নতুন মুখ পাওয়া যাবে।'

কথাটা বোধহয় মনে লাগল ঝুমুরের। কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে চাইলেন না। মিষ্টি হাসি ঝুলিয়ে বললেন—'মন্দ হয় না কিন্তু বাবা-মাকে ছেড়ে তো আর থাকতে পারবো না!'

ইতিমধ্যে নীচ থেকে ছায়া দেবী উঠে এসেছেন। সম্ভবত যাত্রিকের প্রোডাকসন অ্যাসিস্টেন্ট প্রদীপবাবুও এসে গেছেন। আগামীকাল আবার শুটিং আছে। তাই

সময় জানিয়ে গেলেন তিনি। কখন ঝোঁক থাকতে হবে বলে গেলেন। আর প্রদীপবাবুকে সামনে পেয়ে ছায়া দেবী বেশ মিষ্টি মিষ্টি করে বললেন—'আচ্ছা ভাই তোমাদের নগরদর্পণে ছবিতে ছায়া দেবী কি কাজ করেছেন? অমনি ভদ্রলোকের তো কাঁচুমাচু অবস্থা। কেন কেন কেন, কেন বলছেন একথা দিদি।

—তোমাদের বড় বড় ব্যানারে তো ভদ্রমহিলার নামটা দেখতে পাচ্ছিলাম না তাই।

আমরা দুজন তখন ভয়ানক রেলিশ করছি প্রদীপবাবুর অবস্থাটা। ঝুমুরও এই ফাঁকে বলে দিলেন—'দেখবেন আমার নামটাও যেন এইরকম বাদ না চলে যায়।' ভদ্রলোক চুপ। ইতিমধ্যে আড্ডার লিডিং পার্টটা ঝুমুরের কাছ থেকে চলে গেল ছায়াদেবীর মুখে। ছবি - শুটিং - আউটডোর - ইন্ডাস্ট্রির অব্যবস্থা ইত্যাদি থেকে আলোচনা গড়িয়ে যখন আবার ঝুমুরের মুখে ফিরল সংলাপ তখন সে বলল—ফিল্মে আসব কোনদিন ভাবিই নি। পাকা বিজনেস কেরিয়ার নেব ভেবেছিলাম। তোমাদের ইন্ডাস্ট্রির এইসব পার্সোন্যাল পলিটিক্সে কে মাথা গলাতে আসতো?

আঁ! বিজনেস, পার্সোন্যাল পলিটিক্স!! ব্যাপারটা কি! খোলসা করতে হয় তাহলে! চেপে ধরবার আগেই ও বলল—বাবাকে জানাইনি। আমি আর ভাই চামড়ার ওপর প্রিন্টিং-এর বিজনেস শুরু করেছিলাম একসময়। আমি ডিজাইন করে দিতাম। ম্যাড্রাস থেকে প্রিন্ট হয়ে আসত সব। জানেন, বেশ লাভও হচ্ছিল। ফরেনে এই সব জিনিসের বেশ চাহিদা। কিন্তু ব্যাঙ্ক লোনে কি একটা গন্ডগোল হওয়ায় বন্ধ করে দিতে হোল বিজনেস।'

—এটা তো গেল বিজনেসের ব্যাপার। পার্সোন্যাল পলিটিক্স কি বলছিলেন যেন।

কথার জবাব দিতে চাইছিলেন না প্রথমটায়। কি হবে এসব কথা বলে—এগুলো তো আপনারা জানেনই—ইত্যাদি বলে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন ব্যাপারটা। এড়াতে অবশ্য শেষ অব্দি পারেন নি।

স্নো ফক্সের হিরোইন মিঠু মুখার্জীর নাকি ও'র সম্পর্কে খুব অ্যালার্জি আছে। ব্যাপারটা কতখানি সত্যি জানি না, তবে ঝুমুর বললেন—ও'র সুটিংয়ে আমি আর কোনদিন যাব না। একটা স্যাড ইনসিডেন্ট নাকি হয়েছিল কিছুদিন আগে, (মাফ করবেন ঘটনাটা বলতে পারলুম না।) সেই থেকেই এই কোল্ড ওয়ার চলছে দুজনার। অথচ 'কবি'তে একসঙ্গে দুজনেই কাজ করেছেন! বসন আর ঠাকুরঝিকে তো কাজ করতেই হবে। ঝুমুর বললেন—'আমার সঙ্গে তো কোনো কিছু হয়নি ও'র, ভয়ানক বন্ধুই ছিলাম দুজনে। কি যে হোল বুঝতে পারছি না।' আমিও পারিনি। হয়তো তৃতীয় কোনো হাত আছে!

তবে ঝুমুর স্পোর্টিং চরিত্রের মেয়ে। এসব ব্যাপারে মাথাই ঘামান না। প্রয়োজনটা কি আর?

কলকাতা ছেড়ে দিল্লী গিয়ে তো শুরু করবেন পড়াশুনো। ইচ্ছে আছে ইণ্ডিয়ান ক্লাসিকাল মিউজিকে ডকটরেট করার। এখানে বসে প্রিপারেশনও চলছে!

এসব আলোচনা করতে গিয়ে কেমন যেন মেঘলা হয়ে এলো ঘরটায়। কফির কাপ ভর্তিই রয়ে গেছে। কফি ঠাণ্ডা। আর ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে দশটা।

নির্মল ধর

শতবর্ষের স্মরণীয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অমরেন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশনাল পরিত্যাগ করে স্টার থিয়েটারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। অমরেন্দ্রনাথের অনুরোধ এবং পরামর্শেই অনাথবাবু বহু অর্থব্যয়ে থিয়েটার গৃহটিকে নতুন করে নির্মাণ করেন। তাই অমরবাবুর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে তার বিরুদ্ধে আইনগত পন্থা গ্রহণেও অগ্রসর হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তা থেকে বিরত হন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১১ নভেম্বর থেকে অমরেন্দ্রনাথ স্টার থিয়েটারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। অমরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় স্টারের প্রথম নাটক সংসঙ্গ। পরবর্তী নাটকগুলির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা (১৫ নভেম্বর) নরেন সরকারের জীবনসংগ্রাম (২৩ ডিসেম্বর), নরমেধ যজ্ঞ, খাসদখল, বলিদান প্রভৃতি নাটক অভিনয়ের পর অমরেন্দ্রনাথ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য প্রায় মাসখানেক বম্বে ও সিমলা প্রভৃতি স্থান ঘুরে আসেন। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে ১৩ জুলাই ১৯১২ খৃষ্টাব্দে খাসদখল ও রাজা ও রানীতে মোহিত ও বিক্রমদেব এবং কুমারসেন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৭ আগস্ট মঞ্চস্থ হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পরপারে। বিশ্বেশ্বর চরিত্রে অমরেন্দ্রনাথ অভিনয় করেন। ১৬ নভেম্বর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আনন্দবিদায় মঞ্চস্থ হবার পর অমরেন্দ্রনাথ বর্মায় যান। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে কালপরিণয়ে মণীন্দ্র চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৯ মার্চ মনমোহন গোস্বামীর ধর্মবিজয় নাটকে কালাচাঁদ, ৩ মে স্বরচিত কিসমিস রঙ্গনাট্যে স্কুল সুপারিন্টেন্ডেন্ট চরিত্রে অভিনয় করেন।

মঙ্গলবার ১৩ মে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী হেমনলিনী দেবী পরলোকগমন করেন। স্ত্রীবিয়োগে অমরেন্দ্রনাথ উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়লেও, নতুন শক্তিতে অভিনয়ে আত্মনিয়োগ করেন। স্ত্রীবিয়োগের পর ২৪ মে মাধবীকঙ্কনে নরেন্দ্রনাথ চরিত্রে অভিনয় করেন। এবং বেশীর ভাগ পুরোন নাটকের প্রধানাংশে অভিনয় করে স্টার থিয়েটারকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যান।

স্ত্রীবিয়োগের পর অমরেন্দ্রনাথের মানসিক অস্থিরতা খুবই বৃদ্ধি পায়, তাছাড়া স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়ে তাই প্রায়ই কলকাতার বাইরে গিয়ে কাটিয়ে আসতেন।

২৪ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়পতাকা। অমরেন্দ্রনাথ প্রিয়লাল রায় চরিত্রে অভিনয় করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন গীতি-নাট্য মায়াপুরী মঞ্চস্থ হবার পর আবার স্টার থিয়েটারে পুরোন নাটকই অভিনীত হতে দেখা যায়। বলাই বাহুল্য অমরেন্দ্রনাথ প্রধানাংশেই অংশ গ্রহণ করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৩০ মে মঞ্চস্থ হয় অমরেন্দ্রনাথের নতুন গীতিনাট্য 'বড় ভালবাসি'। ১৩ জুন রবীন্দ্রনাথের শাস্তি অবলম্বনে রচিত অভিমানিনী মঞ্চস্থ হয়। ১৫ আগস্ট অভিনীত হয় মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অহল্যাবাঈ। ৩১ অকটোবর রবীন্দ্রনাথের দিদি অবলম্বনে তার নাট্যরূপ। ৫ ডিসেম্বর ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষত্রবীর এবং ২৬ ডিসেম্বর অমরেন্দ্রনাথ রচিত অভিনেত্রীর রূপ স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারী অমরেন্দ্রনাথ রচিত প্রেমের জেপলিন এবং রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলোয়ারী মঞ্চস্থ হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারী মঞ্চস্থ হয় ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাইন অফ দি ক্রস'।

১৭ জুলাই কল্যাণী এবং ২১ আগ[illegible] মঞ্চস্থ হলো রাজা চন্দ্রধ্বজ। ১৮ সে[illegible] ব্রত উদ্‌যাপন, ৯ অকটোবর রত্নমঞ্জরী, [illegible] ৭ ডিসেম্বর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হলো ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সওদাগর নাটক। সওদাগর নাটকে কুলীরকের চরিত্রই অমর দত্ত অভিনীত শেষ চরিত্র।

১২ ডিসেম্বর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথ সর্বশেষ আত্মপ্রকাশ করেন স্টার রংগমঞ্চে সওদাগর নাটকের কুলীরক চরিত্রে। বাংলা ২১ পৌষ বৃহস্পতিবার, ১৩২২, ইংরেজী ৬ জানুয়ারী ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রাত ৪টা ১০ মিনিটে অমরেন্দ্রনাথ হাতিবাগানের গৃহে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন উপস্থিত ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা মনীষী হীরেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বনামধন্য ব্যক্তি। হীরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন কবি সুধীন্দ্রনাথ। মধ্যম পুত্র হরীন্দ্রনাথ অমর দত্তের জীবনীকার।

কালীশ মুখোপাধ্যায়

নাট্যমঞ্চ
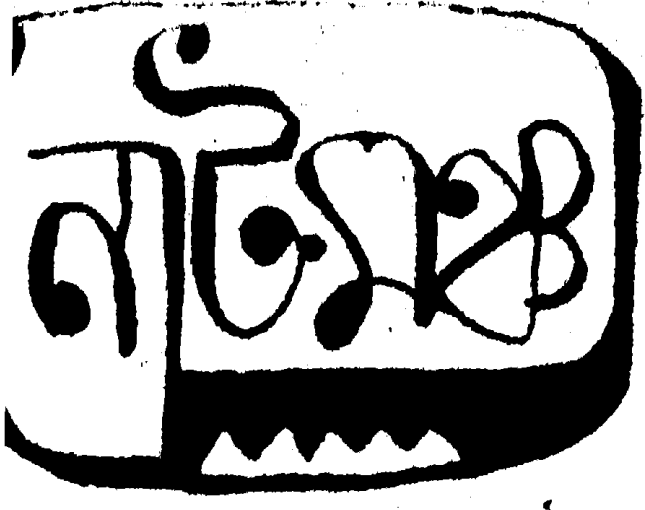
চেতনার ভাল মানুষের পালা

ষাণ্ডল। নাট্যজগতে একই নাটকের
াধিক বঙ্গানুবাদ হলেও একাধিক
াজনা খুব বেশী হয়েছে বলে
াদের জানা নেই। সেদিক থেকে
র্টোল্ট ব্রেখটের (অন্য মতে ব্রেশট্)
ার গুডে মেনশ্ ফন সেৎজুয়ানের
ঙলায় রূপান্তরণ নিঃসন্দেহে ব্যতি-
।

এর সাম্প্রতিক প্রয়োজক প্রখ্যাত
তনা নাট্যগোষ্ঠী। এবারকার রূপান্তর
রারোপ ও প্রয়োগ অরুণ মুখোপাধ্যায়
।

পৃথিবীতে এখন ভালোমানুষের বড়
ভাব। যারা আছেন তাদের সবারই প্রায়
খে মুখোস আঁটা। পৃথিবী রসাতল-
মী। অথচ এই পাঁক থেকে মর্ত্যলোককে
দ্ধার না করলে বোধকরি সৃষ্টিই বৃথা
য়ে যাবে এবং কালক্রমে পৃথিবী লয়প্রাপ্ত
বে। তাই স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্যাপারটার
রেজমিন তদন্ত এবং মানুষের এই অসৎ
বৃত্তির দিকে ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহের মূল
ারণ অনুসন্ধানের জন্য তিনজন দেবতাকে
। পাঠালেন।

তাঁরা দেবতা হয়ে এলেও বস্তুত
অসহায় অবস্থার মধ্যেই পড়লেন। হাটায়
পথশ্রান্তি থাকবার স্থানাভাব এবং ক্ষুধায়
কাতরতা যেন মর্ত্যবাসীর জীবনযাপন-
কেও হার মানায়। তাদের সঙ্গে প্রথমে
দেখা হল একজন ভিস্তিওলার সঙ্গে।
যার ব্যবসা টিনে করে পয়সার বিনিময়ে
লোকের বাড়ি জল দেওয়া। দেবতারা ভাবল
এই লোক যথার্থ অর্থে ভালোমানুষের
প্রতীক। কিন্তু দেখা গেল সেও চতুর। সেই
চতুরতা মানুষকে ফাঁকি দেবার।

তবু তার দৌলতেই দেবতারা রাত্রি
যাপনের জন্য এমন একজনের আশ্রয়
পেলেন যে জাতে বারবণিতা। তবু তার
সেবা, যত্ন ও সারল্যে মুগ্ধ হয়ে দেবতারা
তাকে আশীর্বাদ স্বরূপ এমন একটি
জিনিস দিলেন যার বিনিময়ে মেয়েটি সৎ
ভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখল।

সেই মূল্যবান দ্রব্যটির বিনিময়ে মেয়েটি
তার দেহোপজীবিনীর ব্যবসা ছেড়ে একটা
ফুলের দোকান করল। কিন্তু রাত
পোহাতে না পোহাতেই দেখা গেল টের
পেয়ে অর্দ্ধ চেনা, অচেনা দুঃস্থ অভাব
গ্রস্তের ভীড় শুরু হয়ে গেল তার ঠিকা-
নায়। কালক্রমে দেখা গেল তাদের আধিপত্য
আর আদিখ্যেতার ঠ্যালায় সে বিপর্যস্ত।
শেষ পর্যন্ত সে সেই পরিবেশ থেকে
নিজেকে কাটিয়ে তুলবার জন্য ছলনার
আশ্রয় নিল। সে পুরুষের বেশ ধারণ
করল। এবং পুরুষের ঋজুতা দিয়ে সেই
সব অকর্মণ্য, স্বেচ্ছা-অলস, স্বার্থপর,
সুবিধাবাদী মানুষকে শ্রমের বিনিময়ে
জীবন ধারণের আওতায় টেনে আনল।

কিন্তু বাদ সাধল শেষ পর্যন্ত তার
নারীত্ব। সৎ পরোপকারী, সরল নারী
থাকার সময় সে একটি চতুর আত্মসুখ
সর্বস্ব পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে
বিশ্বাস করে তার কাছে (যে পরে কার্য-
কারণে তারই কারখানার ম্যানেজার পদে
পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিল) ভালোবাসার
অভিনয় বুঝতে না পেরে দেহদান করেছিল
এবং মাতৃত্বের অধিকারী হয়েছিল। কালে
সেটাই তার কাল হোল।

শেষ পর্যন্ত একদিন সে তার স্বরূপে
ফিরে এসে দেবতাদের কাছে তার বিচার
চাইল।

এই আপাতে ভালোমানুষদের স্রোতেই
আজ পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ (অর্থাৎ
সেই সব সুবিধাবাদীরা) গা ভাসিয়ে
দিয়েছে। এর মধ্যে থেকে সত্যিকারের
ভালোমানুষদের আলাদা করে চিহ্নিত করা
খুবই দুরূহ ব্যাপার।

পৃথিবীর সব মানুষই সাধারণভাবে
সৎ, ভালোমানুষ। পরিবেশ এবং শ্রম
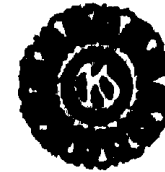
বিমুখতাই তাদের জীবনে ভালোমানুষ হয়ে থাকার সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক, নাট্যকার হয়তো এই কথাটাই নাটকে বলতে চেয়েছেন। আমরাও বিশ্বাস করি পৃথিবীতে মানুষগুলি কম বেশী ভালো-মন্দ মিশিয়েই বিরাজমান। যতটুকু ব্যতিক্রম তা শুধু পরিবেশের জন্য। সেখানে আমরা স্বার্থের ক্রীড়নক বা ক্রীতদাস।

এরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই আমরা ব্রেখটের নাটক 'ভালোমানুষের পালা'য়।

সমস্ত নাটকটিই রূপকের আঙ্গিকে (মানুষগুলি এবং পরিবেশ অবশ্যই বাস্তব ভিত্তিক) পরিবেশন করেছেন 'চেতনা' নাট্যগোষ্ঠী।

এই নাটকের যিনি মূল কেন্দ্র সেই প্রথম জীবনে বারবণিতা এবং পরে সৎ-ভাবে বেঁচে থাকার বাসনায় রূপান্তরিত চরিত্র নয়নতারার ভূমিকায় ছবি তালুকদার যতক্ষণ তিনি নারী থেকেছেন আবেগে সহৃদয়তায় ও সলাজতায় সত্যি ভাল অভিনয় করেছেন। কোন কোন দৃশ্যে অপূর্বও। কিন্তু সেই অনুপাতে পুরুষ চরিত্রের বলিষ্ঠতা বা আপাত কাঠিন্যভাব তাঁর অভিনয়ে ফুটে ওঠেনি। কণ্ঠস্বর পরিবর্তনও সতেজ নয়।

ভিস্তিওয়ালা হলধরের ভূমিকায় নির্মল চক্রবর্তী ও অনিল সেনের ভূমিকায় সমর বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অনুপাতে ম্লান। বরং সেদিক থেকে বাবু-রূপী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বোনপোর ভূমিকায় পল্লব-কেতন চক্রবর্তী অপূর্ব।

রূপ মুখোপাধ্যায়ের বিক্রম হালদার সহজ। অলোক দত্তর পুরোহিতও ভাল।

দেবতাদের রূপসজ্জায় নতুনত্ব আছে। অভিনয়ও মোটামুটি স্বাভাবিক।

এ নাটকে আর একজন অভিনেত্রীকে মাঝে মাঝে অতি অভিনয়ের ঝোঁক থাকলেও ভাল লেগেছে। তিনি উমা পিসি রূপী মঞ্জু ব্রহ্মচারী। অন্য দুটি মহিলা চরিত্রে কুমকুম দাস ও অনিতা দত্ত মোটামুটি স্বচ্ছন্দ।

'ভালো মানুষের পালা'র দৃশ্য

সেই অনুপাতে তাদের কাছাকাছির পুরুষ চরিত্রগুলি যেন সখের দারিদ্র্য নিয়ে অভিনয়ের বিলাস করছেন বলে মনে হয়েছে। ছুতোর (সমীর মুখোপাধ্যায়) অবশ্য ব্যতিক্রম ও অপূর্ব।

গানের সুরে অনেক প্রচলিত গানের ছোঁয়া থাকা সত্ত্বেও গানগুলি মোটামুটি সুগীত। গানের কথা আরো একটু সমৃদ্ধ করবার বোধহয় অবকাশ ছিল। হিমাংশু বিশ্বাসের আবহসংগীত এফেকটিভ।

তবে টোটাল টিমওয়ার্ক বলতে আমরা যা বুঝি, পরিচালকের সেদিকে আরো কিছুটা সতর্ক দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

কারণ 'চেতনা'র 'মারীচ সংবাদ' এবং 'স্পার্টাকাস' নাটক দুটিতে শুনেছি যে স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বচ্ছন্দ গতি থাকার দরুণ দর্শকদের সপ্রশংস বাহবা কুড়িয়েছে তার বোধহয় কিছু অভাব রয়ে গেছে এ নাটকে। এইদিকে দৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয়। কারণ ব্রেখটের এই নাটকেরই আর এক নাট্যরূপ (অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত) বর্তমানে অন্য এক মঞ্চে নিয়মিত প্রদর্শিত হচ্ছে। তাই অনিবার্যভাবেই একটা তুলনামূলক সমালোচনা দর্শকদের মধ্যে হতেই পারে।

তবে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ এবং তাঁর যোগ্যতার খ্যাতিও বোধ করি সবার কাছেই স্বীকৃত। অতএব তাঁর কাছে ভালো নাটক পাবো এটাই ধরে নেয়া যায়। তবু বলবো চেতনার ভালো মানুষের পালা ও সেই তুলনায় উৎকৃষ্ট। দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও নীহার ভট্টাচার্যের (মূল জার্মান থেকে অনুবাদ) সংলাপ ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের বিস্মিত করেছে।

তাপস সেনের আলোক পরিকল্পনা তাঁর সুনাম রেখেছে। সুবিমল রায়ের মঞ্চ পরিকল্পনায় নতুনত্ব আছে।

নাট্যসমালোচক

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে প্রণতি ভট্টাচার্য

প্রখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী প্রণতি ভট্টাচার্য ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৪৫ বৎসর। বাল্যশিক্ষা ঢাকার শ্রীনগরে। ১৪ বছরে শ্রীসুভাষচন্দ্র ঘোষের সংগে প্রথমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধা হন পরে বরিশাল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। একমাত্র পুত্র শ্রীমান মুকুল ঘোষের বয়স যখন বছর দুই তখনই প্রথম রাধা ফিল্ম স্টুডিওর সংগে চুক্তিবদ্ধা হন এবং পরে স্বর্গতঃ বিমল রায় 'তথাপি' চিত্রের নায়িকারূপে নির্বাচন করেন। তথাপি স্বর্গতঃ রায় পরিচালনা করলেও পরিচালক হিসেবে মনোজ ভট্টাচার্যের নাম প্রচারিত হয়। তার পর থেকে ১৯৬৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২৫ খানা ছবিতে প্রণতি দেবী অভিনয় করেন। এর মধ্যে হিন্দীও ছিল। সর্বশেষ ছবি 'পাড়ি'। বম্বেতে প্রণতি দেবীর প্রথম হিন্দী ছবি পরিচয়। সম্পদ হানাবাড়ী রাত্রির তপস্যা পাত্রী চাই কপালকুণ্ডলা বিষবৃক্ষ কবি চন্দ্রাবতী মালঞ্চ ফুলওয়ারী শুভলগ্ন মধ্য রাতের তারা ভোর হয়ে এলো —প্রণতি দেবী অভিনীত চিত্রগুলির মধ্যে

করা যেতে পারে। প্রখ্যাত অভিনেতা ভট্টাচার্যের সংগে দ্বিতীয়বার পরিণয়-আবদ্ধা হন। প্রায় ১০ বছর অভিনয়-জগতের বাইরে ছিলেন। প্রণীতি দেবী স্বীয় নয় প্রতিভায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে-ন

কিউরিও লেক (পোল্যান্ড)

গত ১০ ফেব্রুয়ারী কলকাতার পোলিশ কনস্যুলেট ভারতের পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের প্রতিযোগী বিভাগে প্রদর্শিত পোলিশ ছবি 'কিউরিও লেক'এর একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্র সদনে।

মার্থা হায়ার সেকেন্ডারী ক্লাশের ছাত্রী ও অন্যান্য সহপাঠীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওর মনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ব্যক্তিগত জীবনে সে সুখী নয়। ওর দুঃখে সমবেদনা জানাবার মতো কেউই নেই। তিন বছর আগে মার্থা বাবাকে হারিয়েছে। মাও আবার নতুন করে ঘরণী হতে চলেছে এমন একজনের, যাঁকে (মিশেল) মার্থা নিজের বলে ভাবতে পারে তারই বাবাকে ওর মা বিবাহ করছে। ওর মার এই আচমকা ভালবাসার বিয়েকে সুনজরে দেখতে পারছে না মার্থা। এর ফলে নিজেও সুখী হতে পারছে না—মার সুখী জীবন ওকে যেন আরো পীড়ন করছে। মিশেলকে ও মনে মনে ভালবাসে সেটা প্রকাশ করতে না পেরে সে তার এক বন্ধুর প্রতি সাময়িক-ভাবে আকৃষ্ট হয়। এর ফলে মার্থাকে ভুল বোঝে মিশেল। ও তখন স্লিপিং পিল খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যেন সে তার মা সৎ পিতা ও মিশেলকে শিক্ষা দিয়ে যায় সুখী জীবন কীভাবে গড়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে।

পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের ছবিতে এ-জাতীয় কাহিনী নতুন নয়। সেদিক থেকে কাহিনীটি গতানুগতিক ও দুর্বল। এমনকী হলিউডের ছবির প্রতি কাহিনীকারের আক-র্ষণও সহজে অনুমেয়। কিন্তু অভিনয় ও আংগিকে কিউরিও লেক একটি বিশিষ্ট ছবি। মা ও মেয়ের চরিত্র চিত্রণে আংগিকে ক্যামেরা প্ল্যানিং মন্তাজ এডিটিং কাটিং ও মিক্সিং-এ পরিচালক জনবাতোরী এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়েছেন।

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

রেখা এখন ধীরে ধীরে দেব আন-ন্দের মনে যাতে রেখাপাত করা যায়, তার চেষ্টায় আছেন। দেব সাহেব নায়িকা বদল করেন পোষাক বদলের মতন। মানে যখন তখন। এটা মোটেই ভাল লাগেনি জিনি বেবী আর জাহিদার। জিনি বেবী, জিনত আমন, দেব আনন্দের হরে রাম...ছবিতেই লাইম-লাইটে এসেছেন। এর জন্য তিনি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। মাঝে মাঝে বলে থাকেন দেব সাহেব আমার ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। ইতিমধ্যে জিনিকে অনেক ছবিতে কাজ দিয়েছেন দেব। সেটাও কৃত-জ্ঞতার সংগে স্মরণ করে জিনি। তবুও কোথায় যেন একটা কিন্তু রয়ে গেছে। এত করেও লোকটা আজ ও'র কাছে অপ্রিয় হন। কেন সেটা বোঝা যাবে দেব সাহেবের পরবর্তী প্রোডাকশনে। আবার হেমা মালিনী এসেছেন। ছবির নাম : জানেমন। এ ছবিতেও স্থির ছিল জিনি বেবী নায়িকা হবেন। ইশক ইশক যেভাবে চিৎপটাং হল, তাই দেখে দেব সাহেব ঠিক সাহস পেলেন না। পরপর ছবিতে জিনি, অরুচি ধরে যেতে পারে নিজের এবং দর্শকদের—এইসব সাতপাঁচ ভেবে জিনি অকস্মাৎ বাদ। তার আগে জাহিদা বরবাদ। এই নায়িকাকে নিয়ে দেব খুব আশা করে-ছিলেন। অন্য কেউ জানতে পারেন নি, দেব সাহেব জানতে পেরেছিলেন জাহিদার মধ্যে বড় অভিনেত্রী হবার প্রবল সম্ভাবনা। কিন্তু দুখানি ছবিতে কাজ করার পর বিদায় নিলেন। স্বেচ্ছায়? মোটেই না। দেব সাহেবের বোধকায় জহুরৎ ফুরিয়ে গেল। এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা দুই নায়িকা রেখাকে দেখা হলেই উপদেশ দিচ্ছে। না ভাই দেব সাহেবের খপ্পরে পড়ো না ভুল করেও। তাহলে লাইফ হেল হয়ে যাবে। রেখা এসবে কান দিচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে দেবও বেশ ঝুঁকছেন রেখার দিকে। কি একটা ছবিতে বর্তমানে দেবের বিপরীত নায়িকা রেখা। শুটিংএর ফাঁকে ফাঁকে দেবের মেক-আপ রুমে রেখাকে তার আত্মাসহ দেখা যাচ্ছে। কবে রেখাকে একা দেখা যাবে এই প্রশ্ন অনেকেরই। প্রশ্নো-ত্তরের ধার ধারে না রেখা। সে জোর গলায় বলে : যার সংগে খুশী মেলামেশা করে। যার মেক-আপ রুমে খুশী যাব। যাকে ভালো লাগে তার সংগে প্রেম করব। ...কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। রেখা এখন স্ট্রেট-কাট এ-রকম কথাবার্তা বলছে। আই মিন বুলি ছাড়ছে। এই বুলেবুলির বুলি শোনার জন্য অবশ্য চামচার অভাব নেই।

কথায় কথায় যখন চামচাদের কথা উঠল তখন বলতেই হয় বম্বের এখন সবচেয়ে বড় চামচারা হাতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। নায়ক-নায়িকাদের থেকে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি কিছু কম নয়। তাঁরা দরকার হলে স্ক্রিপ্ট চেঞ্জ করাতে পারেন। নায়ক পরিবর্তন করাতে পারেন। নায়িকার রোল ছোট করে দিতে পারেন। এখন আবার ছবি প্রডিউস করার কাজে নেমেছেন এইসব হাতারা। শত্রুর সেক্রেটারী কাম ফ্রেন্ড ছবি করতে চলেছেন। অমিতাভ জয়ার সেক্রেটারী যুগ্ম-ভাবে ছবি করেছেন অভিমান। আবার কর-ছেন ওদের নিয়ে। রাজেশের পূর্বতন সেক্রেটারী পরের ধনে পোদ্দারি করে ছবি করে ফেলেছেন। রাজেশের অনেক টাকা নিয়ে কেটে পড়ে এক ছবি নির্মাণ করেন। সেটা অবশ্য ধোপে টেঁকে নি। আগে একটু রেখেঢেকে হত। এখন তো বলে কয়ে নায়ক-নায়িকাদের নামভাবে কায়দা করে তাদের সেক্রেটারী গুরুকে হাতারা নিয়মিত ছবি করছেন।...

বম্বেতে কমেডিয়ানদের বাজারও খুব খারাপ।। এঁরাও বোধকরি একটা অভি-শপ্ত রাজ্যে বসবাস করছেন। জনিওয়াকার নামটি আজ বিস্মৃতপ্রায়। রাজেন্দ্রনাথ, ভগবান, মোহন চোটি, দিলীপ দত্ত, জনি হুইস্কির নামও কদাচিৎ শোনা যায়। মেহ-মুদও এই দলে পড়েছেন। একমাত্র আস-রাণীর বাজারই সরগমে। এছাড়া কেস্ট মুখার্জিও মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছেন। অত-এব তাবড় তাবড় কমেডিয়ানদের হাতে কাজ না থাকার ফলে অনেকে প্রযোজক হয়েছেন। মেহমুদ, পরিচালকও।

অভিজিৎ

জলসা

পার্ক সার্কাস মিউজিক কনফারেন্স

সম্প্রতি কলামন্দিরে মঞ্চস্থ তিন দিন-ব্যাপী অনুষ্ঠানে (এর মধ্যে একটি সারা-রাত্রির অনুষ্ঠানও ছিলো) পার্ক সার্কাস মিউজিক কনফারেন্সের উদ্যোক্তারা তাদের পরিবেশনার উচ্চমান বজায় রেখেছেন। সংঘ-সচিব শ্রীসতীন সেন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে জানান যে উচ্চাংগ সংগীতকে সকল শ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলবার সংকল্পে এ'রা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছেন বলেই টিকিটের হার বৃদ্ধি করেননি।

কন্ঠসংগীতের আসরের প্রধান তিন আকর্ষণের মধ্যে তিনটি বিভিন্ন দিনের আকর্ষণ ছিলেন যথাক্রমে সুনন্দা পট্টনায়ক (গোয়ালিয়র ঘরানা; পণ্ডিত যশরাজ (মেওয়ারী ঘরানা) ও শরাফৎ খাঁ (আগ্রা ঘরানা)। আপনাপন গায়নশৈলীর বৈশিষ্ট্যে পরিবেশিত এ'দের অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মন ভরে দিয়েছে। সরস্বতীর মত কঠিন রাগকে সংবেদনশীল অন্তরের দাক্ষিণ্যে সুনন্দা এক নিমেষেই যেন সংগীত রসিকের অন্তরঙ্গ মহলে পৌঁছে দিলেন। দাপট ও মাধুর্যের অপরূপ সম্মেলনে তুলনাবিহীন কন্ঠ তানের বৈচিত্র্য ত্রি-সপ্তকের সুরালুতার সবার ওপর সুর ও শ্রুতির মায়াময় রেশ সারা প্রেক্ষাগৃহকে যেন স্তব্ধ করে রেখেছিলো। তারাণার ত্রিবট ও পার্শী বোলের সংগে অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত লয়ের মুহূর্তেও সুরের শুদ্ধতা সেতার সরোদের ঝালাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষ অনুরোধে শ্রীমতী পট্টনায়ক দুটি ভজন গেয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। দ্বিতীয় ভজনটি 'যোগী মত যা' যে গানের আবেদন ওংকারনাথের পর তিনিই অনাহত রেখেছেন এর প্রতিটি সম্মেলনে এ গান না গেয়ে তাঁর ছাড়ান নেই।

পণ্ডিত যশরাজের কন্ঠের পরিসর সীমিত—তানের বহুধা বিস্তৃতিও হয়ত নেই। কিন্তু সুবিন্যস্ত পরিবেশনার শিল্প-কৃতিতে তাঁর গোরখ কল্যাণ খাম্বাজ বাহার ও আড়ানার প্রতিটি মুহূর্তে আমরা যেন আস্বাদ করেছি। আমীর খাঁর বিস্তারের ঢং বড়ে গোলাম আলি খাঁর তানশৈলীর সংগে মিলিত তাঁর নিজস্ব সংগীতভাবনা শ্রোতাদের মনে একটা অনুপনের আবেদনের ছাপ রেখে যায়।

সরাফৎ হোসেন খাঁর প্রধান সম্পদ তাঁর কন্ঠের ভরাট গাম্ভীর্য। এই গাম্ভীর্যের ছোঁয়াতেই জমে উঠেছিলো তাঁর রামকেলী। কড়ি মধ্যমের শ্রুতির ছোঁয়াও সুন্দর। তবে আলাপের সঙ্গে মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি-মূলক একঘেঁয়েমো এসে যায়। তানের সংগে আগ্রা ঘরানার বৈশিষ্ট্য সযত্নে রক্ষিত।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে জয়ন্তী বাগচী অনেক আশ্বাস দিয়েছেন।

সকলমানের যন্ত্রীরাই তাঁদের আপনাপন মানে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহির ভৈরবের আলাপ অনেক-দিন মনে থাকবে। বিলম্বিত ও দ্রুত গতে ধ্রুপদী ও কলাবন্তীর গাম্ভীর্য ও সুক্ষ্ম কারুকৃতির বৈচিত্রে ভাববিস্তারের বিভিন্ন পর্যায় খুবই চমকপ্রদ।

সরোদে সকলকে চমকে দিয়েছেন আশীষ খাঁ। মালকোষের আলাপে-দৃপ্ত স্বরবিন্যাস যেমন শুদ্ধ ও গম্ভীর তেমনই মধুর নট-ভৈরবের ধ্যান আকৃতি। ভাস্কর বসু সরোদে আর এক উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি।

মণিলাল নাগ তাঁর ক্রমপরিণত সুংগীত ভাবনার সুস্পষ্ট ছাপ রেখেছেন পুরিয়া কল্যাণের আলাপ গত বিস্তার ও তানে।

বিরজু মহারাজ

বিমল মুখোপাধ্যায়ের সেতারে শোনা গেল ইমন।

সারা সংগীত উৎসবে মুকুটমণির ম[illegible] জ্বলজ্বল করেছে—বিরজু মহারাজের কত্থক নৃত্য। বয়স তাঁর নৃত্যলাবণ্য ও ভা[illegible] লালিত্যের ওপর এতটুকুও ছায়াপাত কর[illegible] পারেনি। নৃত্যের গতি চাঞ্চল্য ভাবনায় [illegible] চমক বিভোলতা এমন এক আশ্চর্য অ[illegible] রচনা করে যা বিরজু মহারাজের মত শিল্পী পক্ষেই সম্ভব। অবশ্য পণ্ডিত কিষণ ম[illegible] রাজের তবলা সংগত শিল্পীকে তাঁর স[illegible] ধর্মী নৃত্যে উদ্দীপ্ত করেছে।

সারেংগী ছিলো না কোনো অনুষ্ঠে[illegible] সোহনলালের কুশলী হাতের হার্মোনিয়ম অভাবের অনেকটা ক্ষতিপূরণ ঘটিয়েছে[illegible] তবলা সংগতে ছিলেন কেরামৎ খাঁ স[illegible] শঙ্কর ঘোষ, স্বপন চৌধুরী—সকলেই তাঁ[illegible] নিজের জায়গায় সগৌরবে অধিষ্ঠিত।

কাজী অনিরুদ্ধ স্মরণে

হাওয়াই এবং কাজী অনিরুদ্ধ একাডে[illegible] যুগ্ম উদ্যোগে গত ২২ ফেব্রুয়ারী সক[illegible] বঙ্গনায় কাজী অনিরুদ্ধর মৃত্যু বার্ষি[illegible] উদযাপিত হোলো। অনুষ্ঠানে সভাপ[illegible] করেন সুজিত নাথ। গান ও ভাষণে [illegible] শিল্পীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক[illegible] সর্বশ্রী আঙ্গুরবালা দেবী ভি বালসারা [illegible] অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় বিমান ঘোষ ম[illegible] দাস রজত নন্দী প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় প্র[illegible] ঘোষ ও অভিজিৎ নাথ। কিশোর সে[illegible] পরিচালনায় সমবেত গীটার বাদনে অ[illegible] গ্রহণ করেন কাজী অনিরুদ্ধ প্রতি[illegible] হাওয়াই সংস্থার ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

চিত্রাঙ্গদা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১৪ বর্ষ

অমৃত

৪৮ সংখ্যা

ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য

Friday, 11th April, 1975

শুক্রবার ২৮ চৈত্র, ১৩৮১

সূচীপত্র

একখড়গ গণ্ডার তৃণভোজী বলিষ্ঠ এই বন্যপ্রাণী
এক সময় পৃথিবীতে হাজার হাজার পাওয়া যেত।
কিন্তু এখন মাত্র তিনটি দেশে পাওয়া যায়।
তাই যে দেশে এই গণ্ডার বাঁচিয়ে রাখতে
পেরেছে সে দেশ এ নিয়ে গর্বিত।

আমাদের পশ্চিম বাংলাও সেই গর্বের অংশীদার।

বনের পশু-পাখীদের বাঁচিয়ে রাখার কাজে
সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

বন অধিকরণ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপরিমল চৌধুরী

সম্পাদকীয়

বন্যপ্রাণী ও আমরা

বন্যেরা বনে সুন্দর—বাংলা সাহিত্যের এই বিখ্যাত উক্তিতে বন্যপ্রাণীর প্রতি লেখকের মমতা ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বহু প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে। মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরেও বিদায় নিতে হয়েছে অনেক প্রাণীকে। একথা আজ বিশ্বাস করা শক্ত যে এক সময়ে আমাদের সুন্দরবনে গণ্ডার ছিল প্রচুর। মানুষ তাদের বিনাশ করেছে নিজের লোভে। ভয় থেকে যতটা নয় নিজের স্বার্থ এবং নিছক হত্যার আনন্দের কারণে বহু প্রাণী বিনষ্ট হয়েছে মানুষের হাতে।

সিংহ তো আমাদের দেশে প্রায় নিঃশেষিত। গির অরণ্যে সিংহকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে অনেক যত্ন করে। হিংস্র কিন্তু অতীব সুন্দর জন্তু বাঘকে তো শিকারীরা মেরে শেষ করেই ফেলেছে। অবশিষ্ট যা আছে তাকে এখন সংরক্ষণের চেষ্টা হচ্ছে। তৈরি হয়েছে অভয় অরণ্য। বাঘ, গণ্ডার, হাতীকে রক্ষা করার জন্য চলছে প্রয়াস। সভ্য মানুষ যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পশুদের না বাঁচায় তাহলে তাদের বংশ নির্মূল হতে খুব বেশি সময় লাগবে না। সে কারণেই এখন সব দেশেই চলছে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের আন্দোলন, ভারতবর্ষেও।

বন কেটে বসতি স্থাপনের জন্য এমনিতেই বন্যপ্রাণীর চরে বেড়াবার জায়গা হয়ে আসছে সীমিত। মানুষ যদি এখন সযত্ন মমতায় এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে বন্যপ্রাণী রক্ষায় এগিয়ে না আসে তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। প্রকৃতি সমস্ত জীব জগতের মধ্যে ভারসাম্যের পক্ষপাতী। মানুষের পাশাপাশি তাই বন্যপ্রাণীদেরও স্থান আছে প্রকৃতিতে। যেহেতু মানুষই সমস্ত জীবজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই বন্যপ্রাণীদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রক্ষা করার দায়িত্বও তাকেই নিতে হবে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের নানাদিক নিয়ে আলোচনার জন্য তাই এই বিশেষ সংখ্যার আয়োজন। বন্যপ্রাণীদের বিষয়ে আমরা জানব এবং তার জায়গায় তাকে থাকতে দেব, এটাই সভ্য মানুষেরসাম্প্রতিক চেতনা। অমৃত-র এই বিশেষ সংখ্যার রচনাবলী সেই চেতনা থেকেই সৃষ্ট।

বৃক্ষ বন্দনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
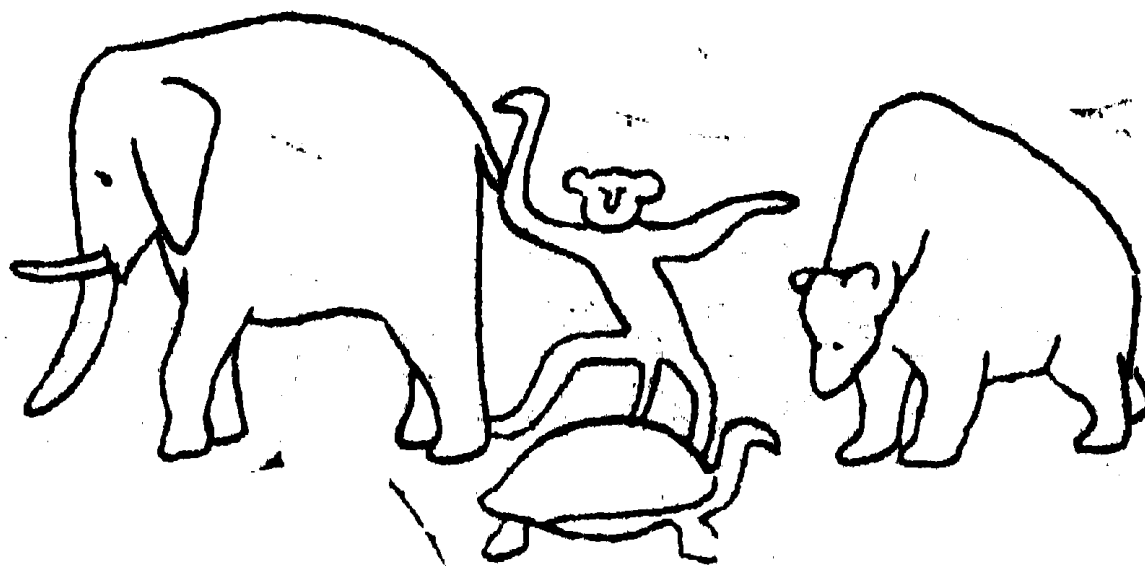
অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদি প্রাণ—
ঊর্ধ্ব শীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।।... ...

মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,

সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে;
সন্তরি সমুদ্র-ঊর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়;
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যানলিপি লিখি দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ; চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা।।... .

ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী

শত শত শতাব্দীর দিন ধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎ-জয়ী, দিলে তারে পরম সম্মান,
হয়েছে যে দেবতার প্রতিস্পর্ধী—সে অগ্নিচ্ছটায়
প্রদীপ্ত তাহার শক্তি বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায়
ভেদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্ন বাধা। তব প্রাণে প্রাণবান,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান,
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে মানব তারি দূত হয়ে,
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য লয়ে
শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী।।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কে

জওহরলাল নেহরু

'বন্যপ্রাণী' ? সেভাবেই আমরা জঙ্গলের আশ্চর্য সব পশু এবং সুন্দর যে সব পাখি আমাদের জীবনকে উজ্জ্বলতর করে তোলে তাদের বিষয় বলে থাকি। মাঝে মাঝে আমার ভাবতে ইচ্ছে হয়, এইসব জন্তু এবং পাখিরা মানুষের সম্বন্ধে কি ভাবে এবং যদি তাদের ক্ষমতায় কুলতো তাহলে মানুষের সম্বন্ধে তারা কি বলত। সন্দেহ হয়, তাদের বর্ণনা মানুষের পক্ষে খুব প্রশংসার হয়তো হোত না। আমাদের সংস্কৃতি এবং সভ্যতা সত্ত্বেও মানুষ এখনও অনেক দিক থেকে কেবল যে বন্য আছে তাই নয়, এইসব তথাকথিত বন্য জন্তুদের চাইতে বেশী বিপজ্জনকও রয়ে গেছে।

প্রকৃতিকে বলা হয় নখর দন্তে রক্তাক্ত এবং অরণ্য বিপদসঙ্কুল। যারা সবল তারা দুর্বলকে শিকার করে, এবং দুর্বলেরা নিজেদের বাঁচাবার জন্যে নানারকমের কৌশল ও আচরণের আশ্রয় নেয়। কিন্তু অরণ্যের এই পদ্ধতি দেখা দিয়েছে প্রধানত খাদ্যসংগ্রহের জন্যে। মানুষ মানুষকে খায় না, মানুষ মানুষকে খুন করে অন্য কারণে। এমন কি যখন দেহে মারে না তখন সে আত্মায় মারে। ভালমন্দের এক অদ্ভূত মিশ্রণ হলাম আমরা। আমাদের মধ্যে মিশে আছে সভ্যতার সঙ্গে বর্বরতা, দেবত্বের সঙ্গে ঘৃণ্যতা। কথা বলি আমরা একরকম এবং কাজ করি আমরা অন্যরকম। মহৎ সব আদর্শকে শূন্যে আন্দোলিত করে বহু শ্লোগান দিই আমরা, কিন্তু ব্যবহারের দ্বারা সেগুলিকে মিথ্যা করে দিই। আমরা শান্তির কথা বলি, কিন্তু যেভাবে তা বলি তা অনেক সময়েই হয়ে ওঠে আক্রমণাত্মক ও জঙ্গী।

পৃথিবীর অন্য দেশে যত না হোক, সম্ভবত ভারতে নীতি এবং কর্মে এই রকম পার্থক্য রয়ে গেছে। নীতিগতভাবে আর কোন দেশেই ভারতের মত জীবনকে এত মূল্যবান মনে করা হয় না, এমন কি অনেক মানুষ নগণ্যতম এবং ক্ষতিকর প্রাণীকেও মারতে দ্বিধান্বিত। কিন্তু বাস্তবে জীবজগৎকে আমরা অবজ্ঞা করি।

অন্য অনেক দেশে এমনকি শিশুরাও জন্তু জানোয়ার ও পাখির বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করে থাকে। সেসব দেশে প্রাণীজগতের বিষয়ে অগুন্তি বই আছে, এবং লোকেরা কোনো কোনো দুষ্প্রাপ্য পাখি দেখতে যথেষ্ট কষ্টস্বীকার করে ভ্রমণে বেরোয়। অজস্র 'বার্ড ওয়াচার সমিতি' গঠিত হয় সেসব দেশে, পাখিগুলোকে হত্যা করার জন্যে নয়, তাদের দেখতে এবং তাদের আচার আচরণ লক্ষ্য করতে। আমাদের দেশের ক'জন লোক অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত পাখিদের নামগুলি পর্যন্ত জানে? পাখি আর জীবজন্তু সম্বন্ধে আমাদের দেশে বইয়ের সংখ্যাই কত কম।

ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দিকে এই যে এখন নতুন আগ্রহ দেখা দিয়েছে আমি তাকে স্বাগত জানাই। এটা অবশ্য আমি বলতে পারি না যে, সেইসব বন্যপ্রাণীকে সংরক্ষণ করা আমাদের উচিত হবে যারা লোকালয়ের পক্ষে বিপজ্জনক কিংবা যারা আমাদের শস্য নষ্ট করে। কিন্তু এইসব আশ্চর্য প্রাণী এবং পাখিদের যদি আমরা দেখতে না পাই কিংবা তাদের নিয়ে যদি খানিকটা সময় কাটাতে না পারি তাহলে আমাদের জীবন সম্ভবত খুবই একঘেয়ে এবং বিবর্ণ হয়ে যাবে। কাজেই আমাদের উচিত হবে বন্যপ্রাণীদের মধ্যে সামান্য যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাদের সংরক্ষণের জন্যে যতো বেশী সম্ভব অভয়ারণ্য স্থাপনের দিকে উৎসাহ দেওয়া। নানাদিক থেকেই আমাদের অরণ্যগুলি আমাদের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। সেগুলিকে সংরক্ষণ করা দরকার। এখন যা অবস্থা তাতে দেখা যাচ্ছে আমরা বড়ো বেশি ধ্বংস করে ফেলেছি আমাদের অরণ্যগুলিকে। এটা অবিশ্যি সত্যি, জনসংখ্যা যত বেশি বাড়তে থাকছে তত বেশি খাদ্য উৎপাদন দরকারী হয়ে পড়ছে। কিন্তু সেটা করা উচিত আরও বেশি করে নিবিড় চাষের ভেতর দিয়ে, অরণ্যগুলিকে ধ্বংস করে নয়, কেননা সেগুলিও আমাদের জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত জরুরী।

......বন্দুক দিয়ে শিকার করার চাইতে ক্যামেরা দিয়ে (বন্যপ্রাণী ও পাখিদের) ছবি তোলা অনেক বেশি উত্তেজনাকর এবং কঠিন। আমি চাই আমাদের দেশের অনেক অনেক দুঃসাহসী রোমাঞ্চপ্রিয় যুবক বন্দুক নামিয়ে রেখে হাতে ক্যামেরা তুলে নিক। আমাদের বনজঙ্গলের যেটুকু অবশিষ্ট আছে আমাদের উচিত সেগুলিকে রক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে সংরক্ষণ করা উচিত অরণ্যচারী প্রাণীগুলিকেও। (অনূদিত)

আরণ্যক থেকে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিস্তব্ধ দুপুরে দূরে মহালিখারূপের পাহাড় ও জঙ্গল অপূর্ব রহস্যময় দেখাইত। কতবার ভাবিয়াছি একবার গিয়া পাহাড়টা ঘুরিয়া দেখিয়া আসিব কিন্তু সময় হইয়া উঠে নাই। শুনিতাম মহালিখারূপের পাহাড় দুর্গম বনাকীর্ণ শঙ্খচূড় সাপের আড্ডা বনমোরগ দুষ্প্রাপ্য বন্য চন্দ্রমল্লিকা বড় বড় ভাল্লুকঝোড়ে ভর্তি। পাহাড়ের উপরে জল নাই বলিয়া বিশেষত ভীষণ শঙ্খচূড় সাপের ভয়ে এ অঞ্চলের কাঠুরিয়ারাও কখনও ওখানে যায় না।

দিকচক্রবালে দীর্ঘ নীল রেখার মত পরিদৃশ্যমান এই পাহাড় ও বন দুপুরে বিকালে সন্ধ্যায় কত স্বপ্ন আনে মনে। একে তো এদিকের সারা অঞ্চলটাই আজকাল আমার কাছে পরীর দেশ বলিয়া মনে হয় এর জ্যোৎস্না, এর বন-বনানী, এর নির্জনতা এর নীরব রহস্য এর সৌন্দর্য এর মানুষজন পাখীর ডাক বন্য ফুলশোভা—সবই মনে হয় অদ্ভুত মনে এমন এক গভীর শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয় জীবনে যাহা কোথাও কখনও পাই নাই। তার উপরে বেশী করিয়া অদ্ভুত লাগে ওই মহালিখারূপের শৈলমালা ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা: কি রূপলোক যে ইহারা ফুটাইয়া তোলে দুপুরে বৈকালে জ্যোৎস্না রাত্রে—কি উদাস চিন্তার সৃষ্টি করে মনে!

একদিন পাহাড় দেখিব বলিয়া বাহির হইলাম। ন' মাইল ঘোড়ায় গিয়া দুই দিকের দুই শৈলশ্রেণীর মাঝের পথ ধরিয়া চলি। দুই দিকের শৈলসানু বনে ভরা পথের ধারে দুই দিকের বিচিত্র ঘন বনঝোপের মধ্য দিয়া সুঁড়িপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে কখনও উঁচু-নীচু মাঝে মাঝে ছোট ছোট পার্বত্য ঝরণা উপলাস্তৃত পথে বহিয়া চলিয়াছে বন্য চন্দ্রমল্লিকা ফুটিতে দেখি নাই কারণ তখন শরৎকাল চন্দ্রমল্লিকা ফুটিবার সময়ও নয় কিন্তু কি অজস্র বন্য শেফালিবৃক্ষ বনের সর্বত্র ফুলের খই ছড়াইয়া রাখিয়াছে বৃক্ষতলে শিলাখণ্ডে ঝরণার উপলাকীর্ণ তীরে। আরও কত কি বিচিত্র বন্য পুষ্প ফুটিয়াছে বর্ষাশেষে পুষ্পিত সপ্তপর্ণের বন, অর্জুন ও পিয়াল নানাজাতীয় লতা ও আর্কিডের ফুলে বহু প্রকার পুষ্পের সুগন্ধ একত্র মিলিত হইয়া মৌমাছিদের মত মানুষকেও নেশায় মাতাল করিয়া তুলিতেছে।

এতদিন এখানে আছি এ সৌন্দর্যভূমি আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল। মহালিখারূপের জঙ্গল ও পাহাড়কে দূর হইতে ভয় করিয়া আসিয়াছি বাঘ আছে সাপ আছে ভালুকের নাকি লেখাজোখা নেই—এ পর্যন্ত তো একটা ভালুকঝোড় কোথাও দেখিলাম না। লোকে যতটা বাড়াইয়া বলে ততটা নয়।

ক্রমে পথটার দুধারে বন ঘনাইয়া পথটাকে যেন দুদিক হইতে চাপিয়া ধরিল। বড় বড় গাছের ডালপালা পথের উপর চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করিল। ঘন-সন্নিবিষ্ট কালো কালো গাছের গুঁড়ি তাদের তলায় কেবলই নানাজাতীয় ফার্ণ কোথাও বড় গাছেরই চারা। সামনে চাহিয়া দেখিলাম পথটা উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে বন আরও ক্রমায়মান সামনে একটা উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া তাহার অনাবৃত শিখরদেশের অল্প নীচেই যেসব বন্যপাদপ এত নীচু হইতে সেগুলি দেখাইতেছে যেন ছোট ছোট শেওড়া গাছের ঝোপ। অপূর্ব গম্ভীর শোভা এই জায়গাটায়। পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপরে অনেক দূর উঠিলাম আবার পথটা নামিয়া গড়াইয়া গিয়াছে, কিছুদূরে নামিয়া আসিয়া একটা পিয়াল তলায় ঘোড়া বাঁধিয়া শিলাখণ্ডে বসিলাম—উদ্দেশ্য শ্রান্ত অশ্বকে কিছুক্ষণ বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া।

সেই উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া হঠাৎ কখন বামদিকে গিয়া পড়িয়াছে পার্বত্য অঞ্চলের এই মজার ব্যাপার কতবার লক্ষ্য করিয়াছি কোথা দিয়া কোনটা ঘুরিয়া গিয়া আধ রশি পথের ব্যবধানে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্যের সৃষ্টি করে, এই যাহাকে ভাবিতেছি খাড়া উত্তরে অবস্থিত হঠাৎ দু-কদম যাইতে না যাইতে সেটা কখন দেখি পশ্চিমে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কাছেই বনের মধ্যে কোথায় একটা ঝরণার কলমর্মর সেই শৈলমালা বেষ্টিত বনানীর গভীর নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আমার চারিধারেই উঁচু উঁচু শৈলচূড়া তাদের মাথায় শরতের নীল আকাশ। কতকাল হইতে এই বন পাহাড় এই এক রকমই আছে। সুদূর অতীতের আর্যেরা খাইবার গিরিবর্ত্ম পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন এই বন তখনও এই রকমই ছিল; বুদ্ধদেব নব বিবাহিতা তরুণী পত্নীকে ছাড়িয়া যে রাত্রে গোপনে গৃহত্যাগ করেন সেই অতীত রাত্রিতে এই গিরিচূড়া গভীর রাত্রির চন্দ্রালোকে আজকালের মতই হাসিত; তমসা
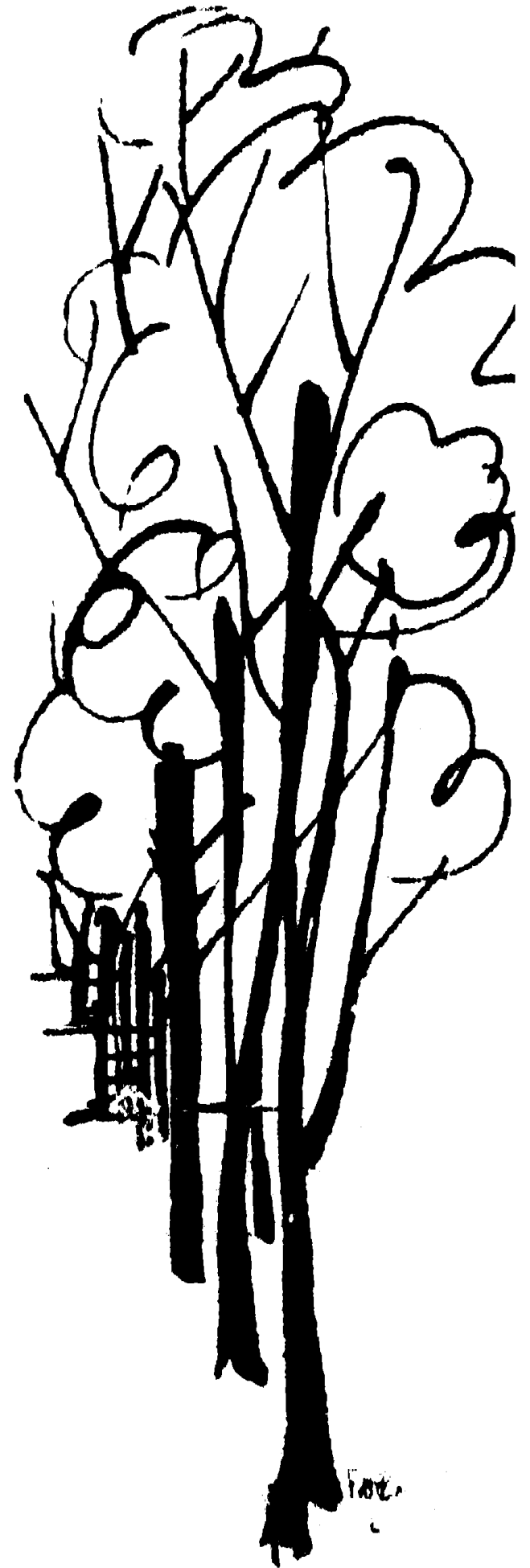
তীরের পর্ণকুটীরে কবি বাল্মীকি একমনে রামায়ণ লিখিতে লিখিতে কবে চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়াছিলেন সূর্য অস্তাচলাবলম্বী তমসার কালো জলে রক্তমেঘস্তূপের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে আশ্রমমৃগ আশ্রমে ফিরিয়াছে সেদিনটিতেও পশ্চিম দিগন্তের শেষ রাঙ্গা আলোয় মহালিখারূপের শৈলচূড়া ঠিক এমনি অনুরঞ্জিত হইয়াছিল আজ আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে যেমন হইয়া আসিতেছে। সেই কতকাল আগে সেদিন চন্দ্রগুপ্ত প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন; গ্রীক রাজ হেলিওডোরাস গরুড়-ধ্বজ স্তম্ভ নির্মাণ করেন; রাজকন্যা সংযুক্তা যেদিন স্বয়ংবর সভায় পৃথীরাজের মূর্তির গলায় মাল্যদান করেন; সামুগড়ের যুদ্ধে হারিয়া হতভাগ্য দারা যে রাত্রে আগ্রা হইতে গোপনে দিল্লী পলাইলেন চৈতন্যদেব যেদিন শ্রীবাসের ঘরে সংকীর্তন করেন যেদিনটিতে পলাশীর যুদ্ধ হইল—মহালিখারূপে ঐ শৈলচূড়া এই বনানী ঠিক এমনি ছিল। তখন কাহারা বাস করিত এই সব জঙ্গলে? জঙ্গলের অনতিদূরে একটা গ্রামে দেখিয়া আসিয়াছিলাম কয়েকখানি মাত্র খড়ের ঘর আছে মহুয়াবীজ ভাঙ্গিয়া তৈল বাহির করিবার জন্য দু-খণ্ড কাঠের তৈরী একটা ঢেঁকির মত কি আছে আর এক বৃদ্ধকে দেখিয়াছিলাম তাহার বয়স আশী-নব্বুই হইবে শণের-নুড়ি চুল গায়ে খড়ি উড়িতেছে রৌদ্রে বসিয়া বোধ করি মাথার উকুন বাছিতেছিল— ভারতচন্দ্রের জরতী-বেশধারিণী অন্নপূর্ণার মত। এখানে বসিয়া সেই বুড়িটার কথা মনে পড়িল—এ অঞ্চলের বন্য সভ্যতার প্রতীক ওই প্রাচীন বৃদ্ধা—পূর্বপুরুষেরা এই বন-জঙ্গলে বহু সহস্র বছর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে। যীশুখৃষ্ট যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন সেদিনও উহারা মহুয়াবীজ ভাঙ্গিয়া যেরূপ তৈল বাহির করিত আজ সকালেও সেইরূপ করিয়াছে। হাজার হাজার বছর নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে অতীতের ঘন কুজ্ঝটিকায় উহারা আজও সাতনলি ও আঠাকাঠি দিয়া সেইরূপই পাখী শিকার করিতেছে ঈশ্বর সম্বন্ধে জগৎ সম্বন্ধে উহাদের চিন্তাধারা বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই। ঐ বুড়ির দৈনন্দিন চিন্তাধারা কি, জানিবার জন্য আমি আমার এক বছরের উপার্জন দিতে প্রস্তুত আছি।

বুঝি না কেন এক এক জাতির মধ্যে সভ্যতার কি বীজ লুককায়িত থাকে তাহারা যতদিন যায় তত উন্নতি করে—আবার অন্য জাতি হাজার বছর ধরিয়াও সেই একস্থানে স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া থাকে কেন? বর্বর আর্যজাতি চার-পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে বেদ উপনিষদ পুরাণ কাব্য জ্যোতির্বিদ্যা জ্যামিতি চরক-শ্রুত লিখিল দেশ জয় করিল সাম্রাজ্য পত্তন করিল ভেনাস দ্য মিলোর মূর্তি পার্থেনন তাজমহল কোলো ক্যাথিড্রাল গড়িল দরবারী কানাড়া ও সিকথ সিমফোনির সৃষ্টি করিল—এরোপ্লেন জাহাজ রেলগাড়ী বেতার বিদ্যুৎ আবিষ্কার করিল—অথচ পাপুয়া নিউগিনি অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা আমাদের দেশের ওই মুণ্ডা কোল নাগা কুকিগণ যেখানে সেখানেই কেন রহিয়াছে এই পাঁচ হাজার বছর?

অতীত কোন দিনে এই যেখানে বসিয়া আছি এখানে ছিল মহাসমুদ্র—প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের এই বালুময় তীরে এখন যাহা বিরাট পর্বতে পরিণত হইয়াছে। এই ঘন অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিলাম।

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা
তত্র সরিতাম।

এই বালু-প্রস্তরের শৈলচূড়ায় সেই বিস্মৃত অতীতের মহাসমুদ্র বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে—অতি স্পষ্ট সে চিহ্ন—ভূতত্ত্ববিদের চোখে ধরা পড়ে। মানুষ তখন ছিল না এ ধরণের গাছপালাও ছিল না যে ধরণের গাছপালা জীবজন্তু ছিল, পাথরের বুকে তারা তাদের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে যে কোনো মিউজিয়ামে গেলে দেখা যায়।

বৈকালের রোদ রাঙ্গা হইয়া আসিয়াছে মহালিখারূপ পাহাড়ের মাথায়। শেফালি বনের গন্ধভরা বাতাসে হেমন্তের হিমের ঈষৎ আমেজ আর এখানে বিলম্ব করা উচিত হইবে না সম্মুখে কৃষ্ণা একাদশীর অন্ধকার রাত্রি বনমধ্যে কোথায় একদল শিয়াল ডাকিয়া উঠিল। ভালুক বা বাঘ পথ না আটকায়।

ফিরিবার পথে একদিন প্রথম বন্য ময়ূর দেখিলাম বনান্তস্থলীতে শিলাখণ্ডের উপর। একজোড়া ছিল আমার ঘোড়া দেখিয়া ভয় পাইয়া ময়ূরটা উড়িয়া গেল। তাহার সঙ্গিনী কিন্তু নড়িল না। বাঘের ভয়ে আমার তখন দেখিবার অবকাশ ছিল না তবু একবার সেটার সামনে থমকিয়া দাঁড়াইলাম। বন্য ময়ূর কখনও দেখি নাই লোকে বলিত এ অঞ্চলে ময়ূর আছে আমি বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু বেশীক্ষণ বিলম্ব করিতে ভরসা হইল না! কি জানি মহালিখারূপের বাঘের গুজবটাও যদি এ রকম সত্য হইয়া যায়।

বন্য মহিষ

প্রাচীন ভারতে বন্যপ্রাণী

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

বর্তমানে বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে আমাদের যে উৎসাহ তা দেখে হয়তো মনে হতে পারে যে বন্যপ্রাণী সম্পর্কে এই জাগ্রৎ চেতনা একান্তভাবেই আধুনিক। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ক বহু আইন হাল আমলে চালু হয়েছে। জওহরলাল নেহেরু বন্যপ্রাণী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিতভাবে যে সব কথা বলেছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, বন্যপ্রাণী না থাকলে মানুষের জীবন হবে একঘেঁয়ে ও বিবর্ণ। বন ও বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে আধুনিককালে যে সব গ্রন্থাদি লেখা হয়েছে সেগুলিতে বৈজ্ঞানিক বিচারের ভিতর দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, পরিবেশের সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য ও দৈনন্দিন জীবনে নানাভাবে বন্যপ্রাণীর দান কী অপরিসীম। বছরখানেক আগে সারা ভারতে প্রযোজ্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন কার্যকরী করা হয়েছে। সুতরাং এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বন্যপ্রাণীকে বোধহয় আমরা আধুনিককালেই ভালোবাসতে শিখেছি। কিন্তু একথা তারা ঠিক নয়। প্রাচীন ভারতে বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীণভাবে চিন্তা করা হতো ও প্রবীণদের চিন্তাধারা আমাদের চিন্তাধারার চাইতে অনেক বেশি মৌলিক ও আত্মিক ছিল। আমাদের বর্তমান বিচার প্রয়োজনভিত্তিক, কিন্তু প্রাচীনেরা বিশ্ব বোধের পরিপ্রেক্ষিতে বন, বন্যপ্রাণী, মানুষ ও সমাজকে দেখেছিলেন।

ইংরেজিতে ফরেস্ট কথাটি এসেছে ফরিস থেকে যার অর্থ বাহির। অর্থাৎ বনকে সমাজের প্রত্যন্ত প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে বন ছিল তপোবন বা অরণ্য। আত্মাকে জানার সত্যকে জানার জন্য যে অনলস তপস্যা তার প্রাণকেন্দ্র ছিল বন। অরণি মানে যজ্ঞ কাষ্ঠ। তপোবন ছিল তপস্যা ও যজ্ঞের কেন্দ্রভূমি। তাছাড়া তখন জীবনের চারটি আশ্রমের মধ্যে তিনটি আশ্রমের ভিত্তিভূমি ছিল বন। শুধু গার্হস্থ্য জীবনের জন্য ছিল গ্রাম নগর ইত্যাদি। আর এই গার্হস্থ্য জীবন ও তপোবন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। শ্রেষ্ঠপুরুষ রাজাকেও তপোবনের ঋষির কাছে অবনত মস্তকে যেতে হতো উপদেশ গ্রহণ করার জন্য। সুতরাং প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বন্যপ্রাণী চেতনা ছিল একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। এই দৃষ্টিভঙ্গি চরম সত্যকে খণ্ডভাবে না দেখে অখণ্ডভাবে দেখতে শেখাত এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে

হাতী
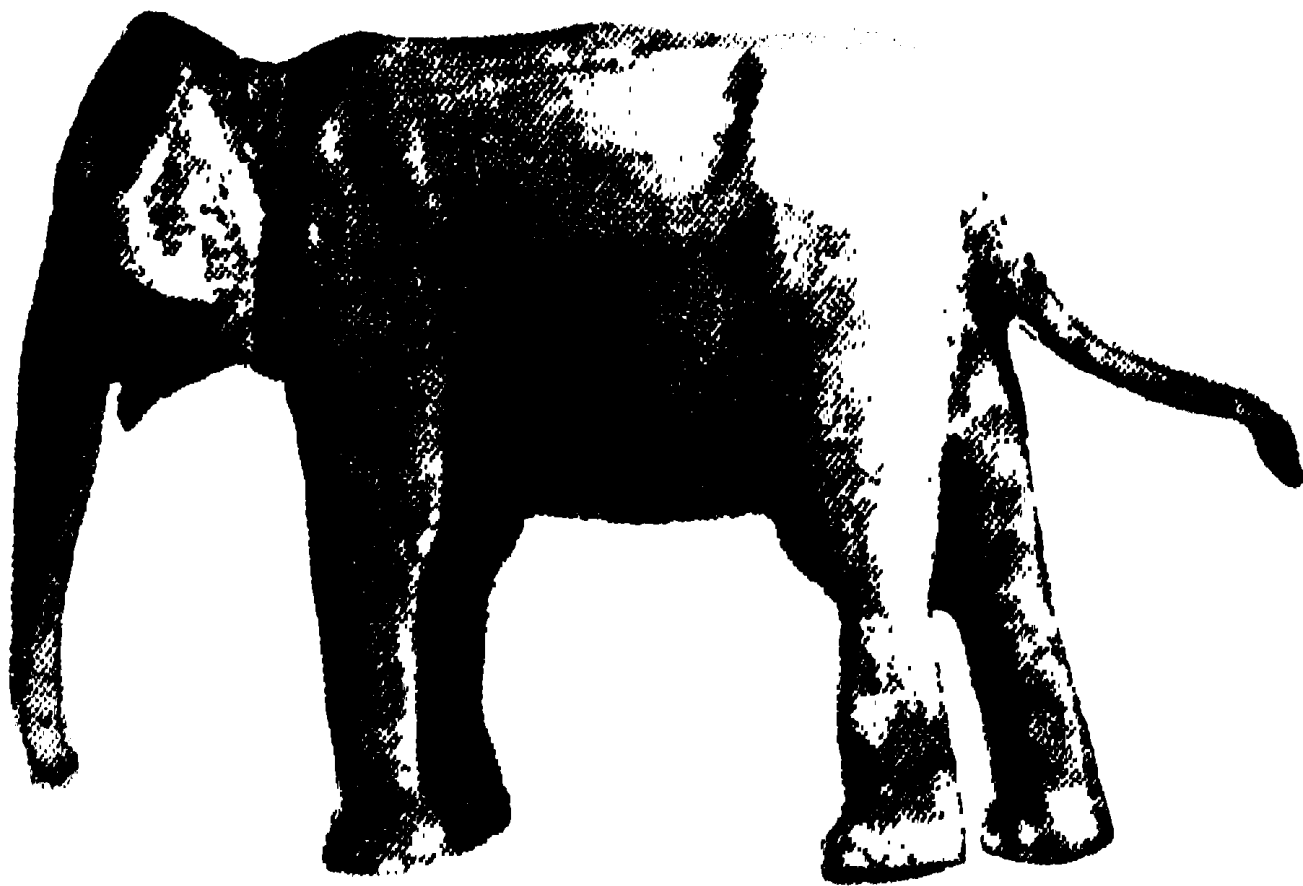
গাছপালা, পশুপাখি ও মানুষ একটি নিবিড় ও নিগূঢ় আত্মিক প্রত্যয়ের বন্ধনে সংযুক্ত ছিল। প্রাচীন ঋষিরা তাই উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পেরেছেন যে যে-দেবতা অগ্নিতে ও জলে যিনি বিশ্বভুবনে সমাবিষ্ট এবং যিনি ঔষধিতে ও বনস্পতিতে সেই দেবতাকে নমস্কার। তপোবনের ঋষিদের সাধনা ছিল বিচিত্রের পটভূমিকায়, বিরাটের নাড়ীর স্পন্দনে, জীবনের অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতার মধ্যে সেই পরম প্রাণের সন্ধান—যার থেকে সব কিছুর সৃষ্টি, সব কিছুর বিকাশ : যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।

আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বে দশাবতার কল্পনায় দেখি প্রথমে শৈবাল ও জলজ প্রাণী মাছ তারপর কাদাটে জলে কূর্ম। তারপর শক্ত মাটিতে বরাহ এবং গাছপালায় পৃথিবী যখন অরণ্যসংকুল তখন এল সিংহ ও অন্যান্য জন্তু ও সবশেষে মানুষ। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে সৃষ্টিতে বন্যপ্রাণী থেকে সুরু করে মানুষ একই শক্তির বিকাশ। প্রাচীনেরা এই আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বন্যপ্রাণীকে দেখতেন। বন্যপ্রাণী ও মানুষ ছিল তাঁদের কাছে সহযাত্রী। তাঁদের জীবনের তিনভাগই কেটে যেত বনের মধ্যে বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে। সুতরাং আমাদের চাইতে তাঁদের বন্যপ্রাণী চেতনা ছিল আরো গভীর, আরো নিকট এবং আরো অকৃত্রিম। প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাদিতে এই মনোভাবের অজস্র সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে। বাল্মীকি রামায়ণের সেই শ্লোকটি তো সর্বজন পরিচিত 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ অগমঃ শাশ্বতী সমাঃ। যৎক্রৌঞ্চ মিথুনদেকমবধীঃ কাম মোহিতম্'। ক্রৌঞ্চমিথুনকে তাদের মিলন মুহূর্তে বধ করা এমন একটি দুষ্কর্ম যা বিশ্বনীতির প্রতিকূল। তাই সমগ্র বিশ্ব শোকাভিভূত। বিশ্বচেতনার যে শোকসঞ্জাত বিক্ষোভ তারই উপরে ফুটে উঠল কবি হৃদয়ের শ্লোক শতদলটি। সমগ্র রামায়ণ এই শতদলটির পাপড়ি উন্মোচন। কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে দেখি রাজাকে কাতর মিনতি জানিয়ে তরুণ তাপস বলছে ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোইয়মস্মিন। মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশা বিবাগ্নিঃ'। মনে এ মৃগ দেহে মেরো না শর। আগুন দেবে কে হে ফুলের পরে' (রবীন্দ্রনাথ)।
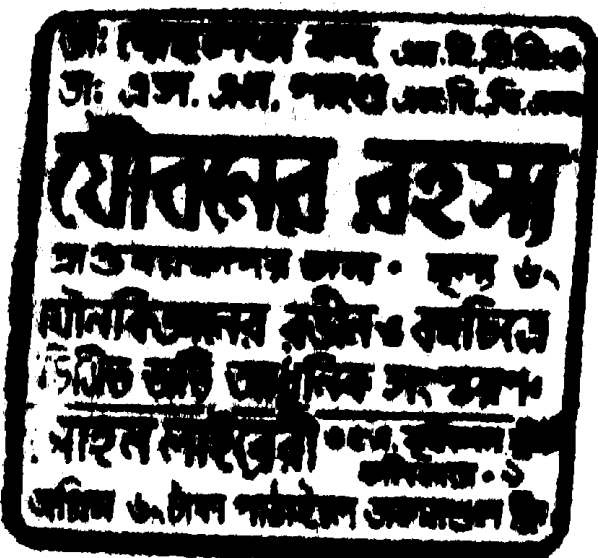
পশুপাখির সঙ্গে, তরুলতার সঙ্গে মানুষের যে যোগ তার চূড়ান্ত নিদর্শন পাই কালিদাসের এই নাটকটিতে। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সেই করুণ শাশ্বত দৃশ্যটি মনে মনে ভাবা যাক। শকুন্তলা কণ্বমুনির আশ্রম থেকে বিদায় নিচ্ছে দেখে সমগ্র অরণ্য প্রকৃতি বিমর্ষ ও কাতর। মৃগরা আহার পরিত্যাগ করেছে। ময়ূর নৃত্য থেকে বিরত। পিছন থেকে শকুন্তলার কাপড় ধরে টানছে একটি মৃগ শিশু। এটি তার পালিত হরিণ শিশু, কারণ প্রসবের পরই তার হরিণী-মা মারা গিয়েছিল শকুন্তলাই মাতৃস্নেহে তাকে পালন করেছে। তার কুশক্ষত মুখে ইঙ্গুদির তেল দিয়েছে। শকুন্তলা আরো একটি হরিণীর সংবাদ নিচ্ছে। এটি আসন্নপ্রসবা। তাও কণ্বকে কাতরভাবে জানাচ্ছে নির্বিঘ্নে প্রসবের খবর তাকে যেন জানানো হয়। তাতে কণ্বও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই নাটকে যে দুটি আশ্রমের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ কণ্বমুনির আশ্রম ও মরীচি মুনির আশ্রম, তাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তপোবন' শীর্ষক প্রবন্ধে বলছেন : '......একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর একটি স্বর্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা ঋষিকন্যারা পুলকিত হয়ে উঠেছেন। মাতৃহীন মৃগশিশুকে তাঁরা নীবারমুষ্টি দিয়ে পালন করছেন কুশসূচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইঙ্গুদ তৈল্য মাখিয়ে শুশ্রূষা করেছেন এই তপোবনটি দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রেমকে সারল্য সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে। আর সন্ধ্যা মেঘের মতো কিম্পুরুষ পর্বত যে হেমকূট সেখানে সুরাসুর গুরু মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করছেন। লতাজালজড়িত যে হেমকূট পক্ষিনীড়খচিত অরণ্যজটামন্ডল বহন করে' যোগাসনে অচল শিবের মতো সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন যেখানে কেশর ধরে সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যখন দুরন্ত তপস্বী বালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশুর সেই দুঃখ ঋষিপত্নীর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে—সেই তপোবন শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদ দুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।'

এখন হয়তো প্রশ্ন উঠবে যে প্রাচীন ভারতে বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে যদি এতোই মমতা ছিল তবে

সে যুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ কেন ছিল, কেনইবা রাজাদের জন্য মৃগয়ার বন্দোবস্ত ছিল এবং কেন অতিথিকে বলা হতো গোঘ্ন। একথা অবশ্য ঠিক যে, রাজা, রাজপুরুষ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে মৃগয় উপলক্ষ্যে পশুহত্যা চালু ছিল যজ্ঞে পশুবধ শাস্ত্রসম্মত ছিল। প্রাচীন ভারতে গোহত্যা করা হতো কিনা এবং গোঘ্ন শব্দের প্রকৃত অর্থ কী, তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। যদিও মৃগয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে চালু ছিল, এ বন্দোবস্ত কিন্তু ঢালাও বা অবারিত ছিল না। তপোবনে ও অভয়াশ্রমে মৃগয়া ছিল নিষিদ্ধ। সব ঋতুতে সব রকম পশু মৃগয়া স্থলে হনন করা চলতো না। মৃগয়া করতে গিয়ে দশরথের যে বিপদ হয়েছিল তা আমরা সকলেই জানি। অন্ধমুনির পুত্রকে হস্তীভ্রমে শরবিদ্ধ করার জন্য তাঁকে প্রত্যবায়ের ভাগী হতে হয়েছিল। পাখিকে হত্যা করার জন্য যিনি ব্যাধকে অভিশাপ দিয়েছিলেন তিনি দশরথের প্রতি অন্ধমুনির অভিশাপের ভিতর দিয়ে এই কথাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে, প্রকৃতি মায়ের কাছে বন্যপ্রাণী তেমনি আদরের যেমন মাতা পিতার কাছে পুত্র।

অশ্বমেধ যজ্ঞ হতো কালে ভদ্রে এবং সে যজ্ঞে একটিমাত্র পশুকে বলি দেওয়া হতো। অন্য যজ্ঞে পশুবধ সম্বন্ধে ভিন্নমতের অবকাশ আছে। আর্যদের কাছে অহিংসা ছিল পরম ধর্ম। তাই যজ্ঞ ছিল অধ্বর, অর্থাৎ অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং প্রাচীন শাস্ত্রের অনুশাসন, 'অজৈঃ যজ্ঞেষু যষ্টব্যম্'-এর অর্থ এই যে শস্যের দ্বারা যজ্ঞ করবে। অজৈঃ শব্দের অর্থ শস্যের দ্বারা ছাগলের দ্বারা নয়। মাংস বলতে প্রাচীনেরা বুঝতো সব চাইতে যা সুখাদ্য, পশু বা পাখির মাংস নয়। আর যে গো ছিল তাঁদের কাছে গোমাতা তাকে তাঁরা অতিথি সৎকারের জন্য বধ করতেন, এও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। গোঘ্ন শব্দের অর্থে যে পদব্রজে পৃথিবী পরিক্রমা করেছে, যার জন্য গোবধ করা হয়েছে, সে নয়।

প্রাচীন ভারতে বন্যপ্রাণী প্রীতির পরিচয় আমরা অন্যভাবেও পাই। সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ যেসব শীলমোহর পাওয়া গেছে সেগুলির কোনো কোনোটাতে ষাঁড়, গন্ডার, হাতি ও বাঘের প্রতিকৃতি আছে। আর্যসভ্যতার উন্মেষের ভিতর দিয়ে পশুপ্রীতির পরিচয় সম্যকভাবেই পাওয়া যায়। অথর্ব বেদে এমন সব মন্ত্র আছে যেগুলিতে যে-ভূমিতে আমরা বাস করি তার সঙ্গে কৃষি ও যে সমস্ত পশু আমাদের উপকারী তাদের নিবিড় সম্বন্ধ বারবার বলা হয়েছে। একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, 'হে পৃথিবী আমাদের সেই সুগন্ধ ও শক্তি অজস্রভাবে দাও যা নর-নারীর মধ্যেও আছে। হস্তী ও অশ্বের মধ্যেও আছে, অন্যান্য পশু ও যোদ্ধাদের মধ্যেও আছে।' আর একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, 'মা ধরিত্রী পক্ষপাতশূন্য। তিনি ভালো ও মন্দকে নির্বিশেষে আশ্রয় দেন। তিনি বন্য বরাহেরও খোঁজ রাখেন আবার বন্য শূকরের প্রতিও তাঁর সজাগ দৃষ্টি।'

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অন্যান্য নানা বিষয়ের মতো বন্যপ্রাণী ও পশু সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা আছে। বনজ সম্পদ যিনি সংগ্রহ করতেন তাঁর নাম ছিল কুপাধ্যক্ষ। ইংরেজি coupe শব্দের সঙ্গে 'কুপ'-এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কুপাধ্যক্ষ সংগ্রহ করতেন সাপের বিষ, পশুচর্ম, হাড়, দাঁত ইত্যাদি। এই গ্রন্থে শূনাধ্যক্ষ নামে আধিকারিকের কথা আছে। তাঁর কাজ ছিল অভয়াশ্রম ও তপোবনে যেসব বন্যপ্রাণী থাকতো বা যেসব প্রাণী সংরক্ষিত শ্রেণীভুক্ত ছিল তাদের হত্যা আটকানো বা অন্য উপায়ে তাদের প্রতি সহিংস ব্যবহার যারা করতো তাদের শাস্তিবিধান করা। সংরক্ষিত শ্রেণীর বন্যপ্রাণীর তালিকা ছিল দীর্ঘ। এছাড়া এ-গ্রন্থের অন্যান্য অধ্যায়ে গো, অশ্ব ও হস্তী সংরক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। গোরুর কল্যাণ যিনি দেখতেন তাঁকে বলা হতো গো-অধ্যক্ষ, ঘোড়ার কল্যাণ যিনি দেখতেন, তাঁকে বলা হতো অশ্ব্যাধ্যক্ষ এবং হাতির কল্যাণ যিনি দেখতেন তাঁকে বলা হতো হস্ত্যাধ্যক্ষ। প্রাচীন মন্ত্রে ও সাহিত্যে দেখি পশুপ্রীতির আত্মিক দিক আর অর্থশাস্ত্রে পরিচয় পাই এই প্রীতির ব্যবহারিক দিকের।

আমরা আশা করব যে প্রাচীন ভারতের এই মহান আদর্শ বর্তমান যুগেও অব্যাহত থাকবে এবং প্রাচীনদের বন্যপ্রাণী প্রীতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরা বলতে পারব, 'মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ', আমাদের পশুসমূহের শ্রীবৃদ্ধি হোক। আমাদের নিজেদের কল্যাণে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করলেই চলবে না, বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে যা প্রকৃত আত্মিকবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বসৃষ্টিতে বন্যপ্রাণীর সঙ্গে মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রমাণ করতে হবে প্রীতি ও প্রসন্নতার মধ্য দিয়ে জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য।

বংশী মান্না

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সংখ্যা

ভারতের অধিকাংশ মানুষের কাছে কৃষিজাত পণ্যের অভাব শিল্পজাত উৎপাদনের মূল্যবৃদ্ধি ও অভাব, যানবাহনের অভাব এই সব জিনিসই সমস্যা বলে মনে হয়। বন্যপ্রাণীর অভাবও যে একটা সমস্যা এটা আমাদের অনেকেরই ধারণার বাইরে। অথচ বাস্তব বিচারে দেখা গেছে যে, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণও এখন এদেশের অন্যতম জরুরী সমস্যা এবং যত তাড়াতাড়ি এ সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে ততই দেশের মঙ্গল হবে।

অনেকে প্রশ্ন করেন যে, সমস্যাটা ঠিক কি। আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে স্বাভাবিক পরিবেশে যত জীব-জন্তু সেই আদিকাল থেকে যুগ যুগ ধরে পাওয়া যেত এখন সেই সব জীবজন্তুর সংখ্যা খুব কমে গেছে। এতো কমে গেছে যে সেটাই এখন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুব বেশী দিন নয় মাত্র তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেও আমাদের দেশে বন্যপ্রাণী যত ছিল তার তুলনায় এখন বন্যপ্রাণী ভয়নক রকম কম। কেবল বাঘের সংখ্যাই ধরা যাক, তখন ভারতবর্ষের বনে-জঙ্গলে বাঘ ছিল প্রায় চল্লিশ হাজারের মতো। এখন সেই বাঘের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র দু' হাজার। ঠিক এমনিভাবে কমেছে হাতী, গণ্ডার, হরিণ পাখী-টাখী ইত্যাদি সব রকমেরই জীবজন্তু। সিংহতো ভারত থেকে প্রায় অবলুপ্ত হতে চলেছে, কমতে কমতে ইতিমধ্যেই একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গেছে চিতা সুন্দরবনের বুনো-মোষ, গণ্ডার এমনি কত সব প্রাণী। যদি এখনই কোনো সঠিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে ভারতের সমস্ত রকমের বন্যপ্রাণীই কমতে কমতে একদিন অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

বোঝা গেল যে বন্যপ্রাণী কমেছে, কিন্তু এদের বাঁচিয়ে রেখে আমাদের লাভ কি হবে? এদের বাঁচাতে গেলে যে টাকাপয়সা খরচ হবে সেটা অনায়াসে চাষবাসের কাজে লাগানো যেতে পারে। যখন এদেশের মানুষের খাবার জোগানোই একটা সমস্যা তখন আবার বন্যপ্রাণীদের বাঁচানোর দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়া কেন? এই সব প্রশ্নের জবাবে খুব কম কথায় বলা যায় যে আমাদের কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো দরকার নিশ্চয়ই, তবে সেই সঙ্গে আমাদেরই স্বার্থে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণও দরকার। এই প্রয়োজন কেন তা বুঝিয়ে বলার জন্যে এটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার, এখানে আমরা সেই চেষ্টাই করব।

ভারতের বন্যপ্রাণী সম্পদ চিরকালই (এখনও) ভারতবাসীদের গর্ব। কারণ এমন অমূল্য প্রাণী পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম বন্যপ্রাণীগুলি যেমন বাঘ সিংহ, বুনোমোষ, হাতী, গণ্ডার, হরিণ, ময়ূর এই সব প্রাণী স্মরণাতীত কাল থেকে যুগ যুগ ধরে এদেশের প্রাকৃতিক বনে-জঙ্গলে দেখা গেছে। একই দেশের বনে বাঘ ও সিংহ—এটা পৃথিবীর আর কোনো দেশেই নেই। তাছাড়া বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে এশিয়ার গর্ব এই বাঘ প্রাণীটির বেঁচে থাকার মত উপযুক্ত বন এই ভারত ছাড়া এখন আর কোনো দেশেই নেই। কাজেই বন্যপ্রাণী সম্পদ নিয়ে গর্ব করতে হলে কিছু কিছু দায়িত্বপালনও আমাদের কর্তব্য—সেটা হল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ।

বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষণ অর্থাৎ বাঁচিয়ে রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে না পারলে কি অবস্থা হবে তার একটা বাস্তব প্রমাণ আমাদের হাতের কাছেই আছে। শ'খানেক বছর আগে সুন্দরবনে এক খড়্গ গণ্ডার ও বুনো মোষ প্রচুর পাওয়া যেত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখায় প্রমাণ আছে যে, তাঁর বাল্যকালে সুন্দরবনের স্থানীয় অধিবাসীরা তখন ওখানকার বনের গণ্ডার মেরে তার মাংস শহরে বিক্রি করতে আসত। বর্তমান লেখকের মাতামহ তাঁর জীবদ্দশায় উত্তর মেদিনীপুরের বনাঞ্চলে গোটাদশেক চিতাবাঘ ও প্রচুর হরিণ মেরেছিলেন বলে লোকে বড় শিকারী বলে তাঁকে খুব খাতির করত। সেই খাতির আরো পাঁচজনকে শিকারে প্রেরণা দিয়েছিল। ফলে এখন সুন্দরবনের গণ্ডার, বুনোমোষ এবং মেদিনীপুরের বনের চিতাবাঘ, হরিণ ভালুক সবই চিরদিনের মতো নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এই ভাবেই বন্যপ্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়েছে। তবে বন্যপ্রাণীদের বাসস্থান বন-জঙ্গল কমে যাওয়াও বন্যপ্রাণী কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হ'ল বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি। বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রাণীজগৎ একটা অদৃশ্য ভারসাম্যের সূত্রে বাঁধা আছে যাকে বলে ব্যালান্স অফ নেচার। এক দলের প্রাণী হয়ত অন্য দলের খাদ্য। মানুষ যদি কোনো জাতের প্রাণীর সংখ্যা বেহিসাবীর মতো জোর করে কমিয়ে দেয় তাহলে সেই ভারসাম্যের সূত্র নষ্ট হয়, জীব-জগতে নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়। যার ফলে হয়ত শেষ পর্যন্ত মানুষেরই ক্ষতি হয়। কয়েক বছর আগে মধ্যপ্রদেশে বাঘ মারার ঢালাও অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অনুমতি পেয়ে

পশ্চিমবঙ্গের অভয়ারণ্য

অভয়ারণ্যের নাম এবং আয়তন	কোন জেলায় অবস্থিত	নিকটতম রেল স্টেশন বা বাস স্টপের নাম	অভয়ারণ্যের উল্লেখযোগ্য পশুপক্ষী ইত্যাদি	অভয়ারণ্য পরিদর্শনের প্রকৃষ্ট সময়।
১। সিঞ্চল (৩১·৫৫ বর্গ কিঃ মিঃ)	দার্জিলিং	ঘুম রেল স্টেশন এবং বাস স্টপ।	গোরাল, কাকরহরিণ ভাল্লুক (হিমালয়ের) . , সেরো ও বিভিন্ন জাতের পাখী।	এপ্রিল [illegible] অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ।
২। মহানন্দী (১২৭·২২ বর্গ কিঃ মিঃ)	ঐ	শুকনা রেল স্টেশন এবং বাস স্টপ।	বাঘ হাতী গৌর কাকর হরিণ সম্বর বরাহ হরিণ চিতল ?) বুনো শুয়র ও বিভিন্ন জাতের পাখী যেমন জংলী মুরগী তিলে ঘুঘু কণ্ঠী ঘুঘু হরিয়াল ধনেশ ইত্যাদি। ইহা ছাড়া কয়েকটি উল্লুকও ছাড়া হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার মাছও দেখা যায়।	নভেম্বর হইতে এপ্রিল।
৩। গরুমারা (৮·৬২ বর্গ কিঃ মিঃ)	জলপাইগুড়ি	চালসা অথবা লাটাগুড়ি রেল স্টেশন এবং বড়দিঘী বাসস্টপ।	একশৃঙ্গী গণ্ডার হাতী বাঘ চিতাবাঘ গৌর সম্বর কাকর হরিণ বরাহ হরিণ বুনো শূয়র ময়ূর জংলী মুরগী ও বিভিন্ন জাতের পাখী।	জুলাই হইতে ডিসেম্বর।
৪। জলদাপাড়া (১৩·২৪ বর্গ কিঃ মিঃ)	ঐ	মাদারিহাট এবং হাসিমারা রেল স্টেশন এবং বাস স্টপ।	ঐ	ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল।
৫। চাপড়ামারি (৮·৮১ বর্গ কিঃ মিঃ)	ঐ	চালসা রেল স্টেশন এবং বাস স্টপ।	হাতী বাঘ চিতাবাঘ গৌর সম্বর কাকরহরিণ বরাহ-হরিণ এবং বিভিন্ন জাতের পাখী যেমন ময়ূর জংলী মুরগী লাল টিটিভ ইত্যাদি।	অকটোবর হইতে এপ্রিল।
৬। লোথিয়ান আইল্যান্ড (৩৮ বর্গ কিঃ মিঃ)	২৪-পরগণা	ডায়মণ্ডহারবার রেল স্টেশন এবং বাস স্টপ অথবা নামখানা এবং রায়দিঘী বাস স্টপ।	চিতল ভোঁদড় শৃগাল বুনো শূয়র কুমীর শুশুক এবং নানা প্রকারের জলচারী পাখী যথা বক ওয়াক বক শামুখ-খোল শঙ্খচিল ডাহুক লাল টিটিভ বালুবাটান হরিয়াল কণ্ঠী ঘুঘু কাস্তেচরা মাছরাঙ্গা পানকৌড়ি ইত্যাদি।	ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী।
৭। হ্যালিডে আইল্যান্ড (৫·৯৬ বর্গ কিঃ মিঃ)	ঐ	ঐ	ঐ এবং বাঘ।	ঐ
৮। সজনেখালি (৩৬২·৩৯ বর্গ কিঃ মিঃ)	ঐ	পোর্ট ক্যানিং রেল স্টেশন এবং বাস স্টপ।	ঐ এবং লোহা সারস ও গগনবেড় (পেলিক্যান)	জুলাই হইতে ডিসেম্বর।

শিকারীরা পাগলের মতো বাঘ শিকারে মেতে উঠল অসংখ্য বাঘ মারা পড়ল, কয়েকটা জঙ্গলে বাঘ একেবারে নির্মূল হয়ে গেল। ফলে পরের বছর সেই জঙ্গলগুলোতে হরিণ খুব বেড়ে গেল আর পালে পালে হরিণ গিয়ে আশে-পাশের খেতের ফসল খেয়ে ফেলতে লাগল। চাষীরা খেত থেকে আর ফসল তুলতেই পারল না। মানুষ স্বেচ্ছায় বাঘ মারার ফলে শেষ পর্যন্ত মানুষেরই বিপদ হলো। তাই সেখানে তখন আবার আইন করে বাঘ মারা বন্ধ করা হয়। আর ফসল তুলতেই পারল না। মানুষ ক্ষতিকারক হরিণগুলোকে মারার ব্যবস্থা করা হল—এইভাবে বনের সব হরিণগুলো মেরে ফেলা হল। তখন হয়ত সেই বনাঞ্চলে বুনো লতাপাতা, ঘাস, আগাছা ইত্যাদি যেগুলো হরিণের খাদ্য ছিল সেগুলো এতো বেড়ে যাবে যে বনের বড় বড় গাছ, যা থেকে দামী কাঠ পাওয়া যায় সেগুলোর ক্ষতি হবে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সেই মানুষেরই ক্ষতি। নির্বিচারে বন্যপ্রাণী মেরে ফেলার ফলে প্রকৃতির ভারসাম্যের সূত্র নষ্ট হয়ে এইভাবে শেষ পর্যন্ত মানুষেরই ক্ষতি হয়—এ ক্ষতি এড়াবার জন্যেই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দরকার। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা রাশিয়া আফ্রিকা বা পৃথিবীর এই সব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এমনি নানা ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। ফলে, ওই সব দেশে এখন কড়া আইন করে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমাদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় আহৃত সম্পদ হয়ত আমরা ইচ্ছেমত খরচ-নষ্ট করতে পারি। কিন্তু দেশের বন্যপ্রাণী সম্পদ তো কারুর ব্যক্তিগত অর্জিত সম্পদ নয়, এগুলো আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে। সুতরাং এ সম্পদকে নষ্ট করা বা নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়, বরং আমাদের উচিত এই সম্পদ ঠিকমত সংরক্ষণ করে বাঁচিয়ে রেখে আমাদের উত্তরপুরুষদের হাতে তুলে দেওয়া। এটাই হবে একজন যোগ্য ভারতীয় নাগরিকের কাজ।

প্রাণীবিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা গবেষণার জন্যেও বন্যপ্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার। ধরা যাক আজ কোনো গবেষক পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত দৌড়বাজ-প্রাণী চিতা সম্বন্ধে এদেশে বসে গবেষণা করতে চান। তাহলে তাঁকে নিরাশ হতে হবে। কারণ, চিতা এদেশ থেকে নির্মূল হয়ে গেছে। অথচ শোনা যায় যে সম্রাট আকবর তাঁর শিকারের সঙ্গী হিসাবে বহু সহস্র চিতা পুষতেন।

বন্যপ্রাণী দেশের বিদেশী মুদ্রার আয় বাড়ায়। আজকাল বিদেশে চিড়িয়াখানায় ভারতের বন্যপ্রাণী বেশ ভালো দামে বিক্রি হয়, যেমন একটা বড়-সড় গণ্ডারের দাম

সময় সময় এক লাখ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যায় তেমনি একটা হাতী পঁচিশ হাজার টাকা রয়্যাল বেঙ্গল বাঘের বাচ্চার দামও হাজার পনেরো ইত্যাদি। ময়ূর, ময়না, টিয়া কাকাতুয়া, মুনিয়া ইত্যাদি পাখীরও বেশ ভাল দাম পাওয়া যায় বিদেশের বাজারে। তাছাড়া দেশে বনপ্রাণী থাকলে সেগুলো দেখতে দলে দলে বিদেশী ভ্রমণকারী আসেন— বিশেষতঃ অভয়ারণ্যগুলোতে। এভাবেও বহু বিদেশী মুদ্রা আসে, হোটেল, যানবাহন ইত্যাদিরও আয় বাড়ে। কেবল বিদেশী ভ্রমণকারীই নয় আজকাল দেশের মানুষেরাও খুব বেড়াতে বেরোচ্ছেন। বেড়ানোর জায়গা হিসাবে সবাই বনাঞ্চলই বেশী পছন্দ করেন। কারণ শহরের কৃত্রিম পরিবেশে একটানা বাস করলে মানুষ দেহে-মনে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মানুষের জীবনে যেমন কাজের প্রয়োজন তেমনি বিশ্রামেরও প্রয়োজন আছে, সেই বিশ্রামের জন্যে মানুষ চায় প্রকৃতির উদার পরিবেশ—বনাঞ্চল। আর বনে যদি বাঘ ভালুক, হরিণ এ-সব না থাকে তাহলে সে বন মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে না। বনপ্রাণীদের প্রত্যক্ষ উপযোগিতা এমনি আরো অনেক আছে।

বন্যপ্রাণী আবার আমাদের অনেক উপকার করে পরোক্ষভাবে। প্রাচীনকাল থেকে বনের পশু-পাখী ভারতের কবি, লেখক, ভাস্কর চিত্রকর ইত্যাদি শিল্পীকে সৃষ্টি-প্রেরণা দিয়ে এসেছে। আমাদের আদিকবি বাল্মীকির কবি-প্রতিভা স্ফুরিত হয়েছিল এক বন্য পক্ষী ক্রৌঞ্চীর দুঃখকাতর আর্তরব শুনে। সাঁচী কোনারক, খাজুরাহো, মহাবলিপুরম ইত্যাদি জায়গার অপূর্ব ভাস্কর্যে বিধৃত রয়েছে সমসাময়িক বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে শিল্পীদের নিবিড় পরিচয়ের কথা। বৌদ্ধজাতক কাহিনীতে, প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-নাটকেও সেই একই পরিচয়ের কথা, যে পরিচয় শিল্পীকে নূতন নূতন শিল্পসৃষ্টিতে প্রেরণা দিয়েছিল।

অবশ্য, সংরক্ষণ মানে এ যেন কেউ মনে না করেন যে এতে দেশের বন-জঙ্গলের প্রত্যেকটি প্রাণীকেই অবধ্য বলে ঘোষণা করার কথা বলা হয়েছে। ঠিকমত বৈজ্ঞানিক প্রথায় বনপ্রাণী সংরক্ষণ করা হলে দেখা যাবে যে দেশের বনপ্রাণী বেড়ে চলেছে এবং তখন অঞ্চল বিশেষে কোনো কোনো প্রাণী শিকার করার অনুমতিও দেওয়া যাবে—সেটাও সংরক্ষণের নীতিরই অঙ্গ। আসল কথা হল সঠিক নিয়ন্ত্রণ এবং সে কাজে দেশবাসীর সচেতনতা ও সক্রিয় সহযোগিতা। এটার প্রয়োজনীয়তা ভারতের অধিকাংশ মানুষ যতদিন পর্যন্ত বুঝতে না পারছেন, ততদিন বনপ্রাণী সংরক্ষণ সার্থক হয়ে উঠতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গের মৃগ উদ্যান

মৃগ উদ্যানের নাম	কোন জেলায় অবস্থিত	নিকটতম রেল ষ্টেশন ও বাস ষ্টপের নাম	মৃগ উদ্যানের আয়তন	হরিণের সংখ্যা এবং অন্যান্য পাখী যা সচরাচর দেখা যায়	পরিদর্শনের প্রকৃষ্ট সময়
পারমাদন	২৪-পরগণা	বনগাঁ রেল ষ্টেশন নল-ডুগারি বাস ষ্টপ (বনগাঁ-দত্তফুলিয়া পাকা সড়কের উপর)।	৬৪·৭৫ হেক্টর	চিতল (৪৮টি)। ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রকারের পাখী যথা—শামুকখোল শঙ্খচিল ডাহুক পানকৌড়ি লাল টিটিভ বালুকাটান হরিয়াল কণ্ঠীঘুঘু তিলেঘুঘু টিয়া ফলটুসি মাছরাঙা নীলকণ্ঠ বসন্ত বৌরী সোনালী কাঠঠোকরা ইত্যাদি।	সারা বৎসর কিন্তু বর্ষাকালে যাতায়াতের একটু অসুবিধা আছে।
বেথুয়াডহরি	নদীয়া	বেথুয়াডহরি রেল ষ্টেশন এবং বাস ষ্টপ (কৃষ্ণনগর-বহরমপুর জাতীয় সড়কের উপর)।	৫৪·৬০ হেক্টর	চিতল (৩৩টি) কাকর হরিণ (৪টি) সম্বর (৬টি)। ইহা ছাড়া নানা জাতের পাখী যথা—হরিয়াল তিলেঘুঘু কণ্ঠীঘুঘু টিয়া ফুলটুসি নীলকণ্ঠ মাছরাঙা বসন্তবৌরী বেনেবৌ দোয়েল বুলবুল সাতভাই ইত্যাদি।	সারা বৎসর।
বল্লভপুর	বীরভূম	বোলপুর রেল ষ্টেশন এবং শান্তিনিকেতন বাস ষ্টপ।	১৪১·৬৪ হেক্টর	চিতল (২৫টি) কৃষ্ণসার (৪৫টি)। ইহা ছাড়া নানা প্রকারের পাখী যথা—ফুলটুসি টিয়া লম্বপুচ্ছ জলপিপি বেনেবৌ ফজল গৌরী গৈরিকদামা দোয়েল শ্যামা বুলবুল ফটিকজল গাংশালিক সাতভাই বা ছাতারে দুধরাজ ফিঙ্গে হরিয়াল কণ্ঠীঘুঘু তিলেঘুঘু চোখ গেল পাপিয়া মোহনচূড় নীলকণ্ঠী ইত্যাদি।	ঐ

১৯৭২ সালের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনের ৪৪(২) ধারা অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যবসায়ীর দ্বারা ঘোষিত বন-জন্তু ও বন্যজন্তু থেকে তৈয়ারী দ্রব্যাদির তালিকা।

সিডিউল

(ক) জীবন্ত জন্তু	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য (টাকা)
(১) চিতা বিড়াল	২	
(২) লাল পান্ডা	৬	
(৩) নেকড়ে বাঘ	২	
(৪) কৃষ্ণসার	৩	
(৫) ময়ূর	১	
(৬) বড় বাজ, বড় সাহিন ছোট সাহিন তুরমতি	৩১	
(৭) মারলিন	১৪	
(৮) বাজ	১	
মোট	৬০	১৫,১৭০

(খ) ট্রোফি	সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য (টাকা)
(১) বাঘের চামড়া ইত্যাদি	৩৭	
(২) চিতা বাঘের চামড়া ইত্যাদি	১৪২	
(৩) লাল পান্ডার চামড়া	২	
(৪) কুমীরের চামড়া ইত্যাদি	১২	
(৫) সোনা বিড়াল	৩	
(৬) লিংকস	১	
(৭) মেছো বিড়াল	২	
(৮) বিবিধ	৪৩৯	
মোট	৭১৮	১,৩১৬৫০

(গ) নিম্নলিখিত বন্য জন্তুর চামড়া থেকে তৈয়ারী দ্রব্যাদির তালিকা

জন্তুর নাম	লেডিস হাতব্যাগ	সিগারেট কেস ইত্যাদি	বেল্ট	মাথার টুপি	গলাবন্ধ	কোট	চটিজুতা	বিবিধ	মোট	আনুমানিক মূল্য
(১) কুমীর	৫৬৯	৬৬১	৩৮০	—	—	—	—	৮	১৬১৮	
(২) বাঘ	২০	৬৭	৪০	—	—	—	—	—	১২৭	
(৩) চিতাবাঘ	২৫	৮৯	৩৬	১৫	২	৬	৩০	৬	২০৯	
(৪) লিংকস	—	—	—	—	—	৪	—	২	৬	
মোট	৬১৪	৮১৭	৪৫৬	১৫	২	১০	৩০	১৬	১৯৬০	১৮৮২

নন-সিডিউল

(ক) জীবন্ত জন্তু ... . ১৪৩৯৮৩ সংখ্যা
(খ) সাপ গোসাপ বিভিন্ন জন্তুর চামড়া ইত্যাদি ৪৪৫৮৫৪৪ সংখ্যা

১৯৭২ সালের বন্য প্রাণী আইনের ৪৪(১) (এ) ধারা অনুযায়ী ১৯৭৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের দেয় অনুমতিপত্র।

	সংখ্যা
(১) ধৃত বন্যজন্তু	৬৪
(২) বন্যজন্তু হইতে তৈয়ারী দ্রব্যাদি	৩২
(৩) ট্রোফি	৭২
(৪) টেক্সিডারমি	৪
(৫) ধৃত বন্যজন্তুর ক্ষুদ্র ব্যবসাদার	১১
মোট	১৮৩

চিতা
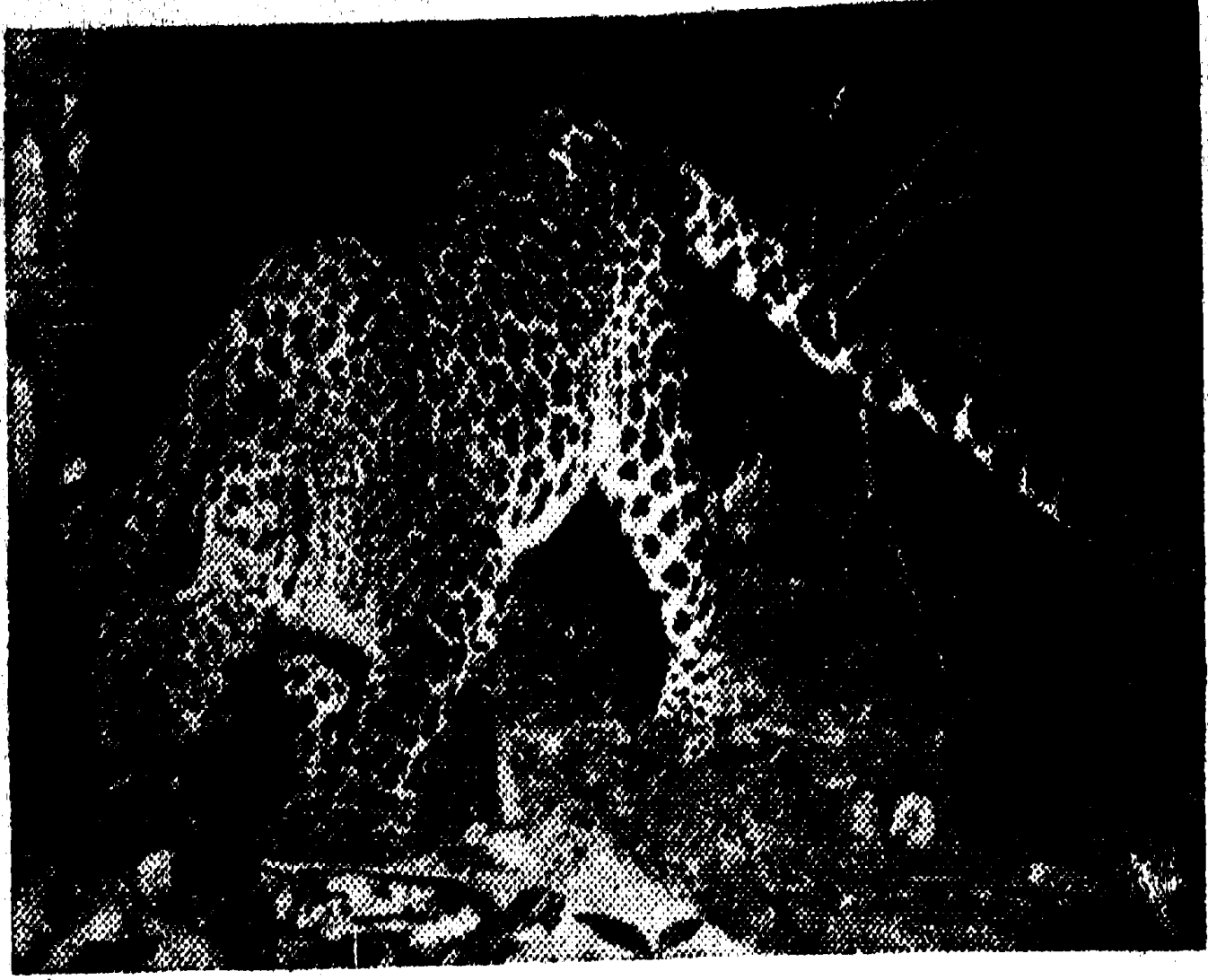
মানুষের ভয়ে ও অভয়ে বন্যপ্রাণী

অমল দাশগুপ্ত

এই পৃথিবীতে মানুষ আসার আগেও প্রাণী ছিল, নানা যুগে নানা রকমের। সব প্রাণীই গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত টিকে আছে তাও নয়। এক-একটা যুগের প্রাণী গাটাকতক ফসিলে নিজেদের অস্তিত্বের কিছু চিহ্ন রেখে পৃথিবী থেকে একেবারে লুপ্ত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও কম নয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত, সবাই জানেন ডাইনোসর। বাইশ কোটি বছর আগে থেকে প্রায় পনেরো কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে ডাইনোসরদের আধিপত্য ছিল। তাদের চেহারাও ছিল অতি প্রকাণ্ড। যেমন, ডিপ্লোডোকাস—লম্বায় ২৭ মিটার, ওজনে ৩০ টন। যেমন টাইরানোসরাস—লম্বায় ১৬ মিটার, উচ্চতায় ৬ মিটার, ওজনে ১০ টন। তাদের চলাফেরায় পৃথিবীর মাটি কাঁপত। তা সত্ত্বেও স্তন্যপায়ীদের যুগে এসে দেখা যাচ্ছে, এই অতিকায় সরীসৃপদের আর কোনো অস্তিত্বই নেই—আধিপত্য করছে তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্তন্যপায়ীরা। আবার স্তন্যপায়ীদের মধ্যেও প্রাণের সমস্ত ধারা পুর্বাপর টিকে আছে তাও নয়। পরিবেশের সঙ্গে যারা মানিয়ে নিতে পারেনি তারা অবলুপ্ত (যেমন ম্যামথ)। অবশ্যই তাদের জায়গা জুড়ে বসেছে অন্যরা, যারা জয়ী। এমনিভাবে রঙ বদলেছে, আদল বদলেছে কিন্তু জলে-জংগলে-বাতাসে প্রাণের সমারোহ কখনো মুছে যায়নি।

তারপরে পৃথিবীতে এল মানুষ যে-মানুষ জীব হিসেবে অতি নিরস্ত্র ও অসহায়—তার গায়ে হাতির মতো জোর নেই, ভালুকের মতো পশম নেই, খরগোশের মতো ছোটার ক্ষমতা নেই, পাখির মতো ডানা নেই, শকুনের মতো ধারালো চোখ নেই, বাঘের মতো থাবা নেই—তবুও অন্য এক জোরে জোরদার হয়ে এই মানুষই জীবজগতে আধিপত্য কায়েম করে বসল। কিসের জোর? হাতিয়ারের জোর। মানুষ কিসে বড়ো? এককথায় হাতিয়ারের জোরে।

এই হাতিয়ারের জোরেই মানুষ এমন পশুও শিকার করতে পারত যার শরীরের বল প্রচণ্ড শরীরের অস্ত্রসজ্জা মারাত্মক। লক্ষ লক্ষ বছর মানুষ নিজেকে টিকিয়ে রেখেছিল শুধু শিকার ও সংগ্রহের ওপরে নির্ভর করে।

মানুষ পশুপালন করতে শিখেছে, এই মাত্র সেদিন—সময়ের হিসেবে আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে। তার পোষা জীব সবার আগে ছিল কুকুর, তারপরে গোরু ঘোড়া ভেড়া ছাগল ইত্যাদি। তবুও পোষ-না-মানা জীব থেকে গেল বহু। তারা হয়ে থাকল বন্য, ইংরেজিতে ওয়াইলড। বলা বাহুল্য, বনের প্রাণী মাত্রই বন্য, এবং বন্যরা বনেই সুন্দর, আর এই বন্যপ্রাণীরাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

খানিকটা প্রাণধারণের তাগিদে, খানিকটা দেমাকে, খানিকটা লোভে শিকারের সুযোগ হাতছাড়া করা মানুষের স্বভাবে নেই। আর প্রাণ ধারণের তাগিদটা প্রধান হলে তো কথাই নেই, তখন হন্যে হয়ে শিকার খুঁজে বেড়াতে হয়। তাতে অবশ্য কিছুদূর পর্যন্ত ক্ষতি হবার আশংকা ছিল না, প্রাণ ধারণের তাগিদে এক জন্তুও তো অপর জন্তুকে শিকার করে থাকে প্রকৃতিজগতের নিয়মই তাই। এই নিয়মরক্ষার জন্য কিন্তু গোটা প্রাণিজগতের ভারসাম্যটি টলে ওঠে না। সেখানে সংখ্যার দিক থেকে এমন একটা মিল থাকার ব্যাপার আছে যে সম্ভাব্য সমস্ত হননের পরেও ক্ষতি এমন মাত্রায় পৌঁছতে পারে না যার ফলে বংশলোপ হওয়া সম্ভব; বরং উল্টোটাই ঘটে—সংখ্যাধিক্য হয়ে বেসামাল চাপ সৃষ্টি হবার অবস্থা ঘটে না। বনের হরিণ বনে, বনের বাঘ বনে, একে অপরের শিকার, তবুও দুই-ই থেকে যায়। আসলে দুই-ই যে থাকে তার শর্তটাই এই। পরিবেশ যদি ঠিক থাকে,, প্রকৃতিজগতে আচমকা যদি অদলবদল ঘটে না যায় তাহলে বন্যরা একে অপরের শিকার হবার পরেও টিকে থাকেই। কিন্তু এই অবস্থা বরাবর বজায় থাকেনি। কতকগুলো কারণে ভারসাম্য টলে উঠেছে, কোনো কোনো বন্যপ্রাণী লুপ্ত, কোনো কোনো বন্যপ্রাণী লুপ্ত হবার মুখে। অতএব

দূরদৃষ্টিসম্পন্নরা সামাল সামাল রব তুলেছেন।

রবটা যদিও অতি-সম্প্রতিকালের, কারণগুলো কিন্তু ঘটতে শুরু করেছে দু-হাজার বছর আগে থেকে। তখন থেকেই মানুষ অতিমাত্রায় সংহারক শিকারী, বন্যপ্রাণীদেরও যে টিকে থাকার অধিকার আছে তা যেন মানতেই রাজী নয়। ভাবখানা এই যে ওরা বেঁচে থেকে তার কী কাজে লাগছে অতএব নিপাত যাক। সভ্য মানুষের এই খৃষ্টীয় যুগেই বহু প্রজাতির প্রাণীর নিপাতে যাওয়ার পথ অবিরাম একটানা খোলসা করে যাওয়া হয়েছে। আর ব্যাপারটা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে ১৮০০ সালের পর থেকে। এখন খুব কম করে হিসেব করলেও অন্তত হাজারটা প্রজাতির ও উপ-প্রজাতির অস্তিত্ব মারাত্মক রকমের বিপন্ন। এবং আগামী দু-তিন দশকের মধ্যে অনিবার্যভাবেই বেশ কিছুসংখ্যক বিপন্ন প্রজাতির জীব বিলুপ্ত হতে চলেছে। মানুষের লোভ দুর্দমনীয়, বন্যপ্রাণীর প্রতি নিষ্করুণ হওয়াতেই তার স্বার্থসিদ্ধি অতএব বন্যপ্রাণীর সংহার ও নিধন বন্ধ হবে এমন আশা করার কোনো কারণ নেই।

প্রকৃতিজগতে সংহার ও নিধনের কি কিছু কমতি আছে? কারণ তো অনেক—আছে খাদ্যাভাব আছে মাংসাশী জন্তু আছে রোগ, আছে প্রাকৃতিক দুর্বিপাক। প্রত্যেকটি কারণের জন্য বহু প্রাণীকে প্রাণ দিতে হয় হচ্ছে। তবুও যে-কথা আগে বলেছি, এতগুলো প্রাকৃতিক কারণ একসঙ্গে হবার পরেও একটা ভারসাম্য বজায় থাকত, থেকে এসেছে। যতো জীব জন্মাতে পারে আর যতো জীবকে মরতে হয়—দুয়ের মধ্যে পাওয়া যায় বেশ একটা মিল থাকার ব্যাপার। যাকে বলা হয় প্রকৃতির ভারসাম্য। সংহারক মূর্তি নিয়ে মানুষের আবির্ভাব ঘটার আগে পর্যন্ত তাই বন্যপ্রাণী লোপ পাবার মতো অবস্থা তৈরি হতে পারেনি।

বন্যপ্রাণীরা যে শুধু মানুষের হাতে নিহত হবার জন্য নয়, নিজস্ব অধিকারে তাদেরও যে টিকে থাকার অধিকার আছে, এবং বন্যরা বনে প্রকৃতই সুন্দর—এই উপলব্ধি নিয়ে কিছু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবিত হয়েছিলেন এই শতকের গোড়ার দিকে। তার ফলও কিছু পাওয়া গিয়েছে। কোথাও কোথাও বাধা-নিষেধ আরোপ করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যখন-খুশি যেমন-খুশি শিকার ও কোথাও-বা গোটা এলাকায় শিকার, নিষিদ্ধ করা হয়েছে ফাঁদ পেতে বন্যপ্রাণী ধরা বা বন্যপ্রাণীর চামড়া বা পালক নিয়ে ব্যবসা করা, ও এমনি আরো কিছু ব্যাপার। কিন্তু সমস্যা ইতিমধ্যেই এত বিরাট ও ব্যাপক যে তুলনায় অবলম্বিত ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়ায়। তদুপরি বন্যপ্রাণীর ব্যাপারে বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই দেশের গভর্নমেন্ট নির্বিকার দেশের জনসাধারণ উদাসীন। ফলে সমস্যার সমাধানের দিকে খুব একটা অগ্রসর হওয়া গিয়েছে তা যেমন নয়, অগ্রসর হওয়া যাবে তার লক্ষণও তেমন নয়। কিছুসংখ্যক প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর আগ্রহ ও অনুভব থাকতে পারে, কিন্তু সমস্যার সমাধানের জন্য চাই জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে গভর্নমেণ্ট ও জনসাধারণের মিলিত তৎপরতা। তা নেই, কদাচ হবে কিনা সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

অথচ ক্ষতি হয়ে গিয়েছে অনেকখানি। ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তই দেওয়া যেতে পারে। আফ্রিকাকে বলা যেতে পারত বন্যপ্রাণীর বিরাট এক আড়ৎ। কিন্তু তা থাকে না, দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়ররা আসার পর থেকেই নিষ্ঠুর সংহারকার্য শুরু হয়ে যায়। কৃষ্ণসার মৃগ ও জেব্রার দল যে আফ্রিকার জংগলে ছড়াছড়ি ছিল, অবিশ্বাস্য রকমের কম সময়ের মধ্যে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল। মাত্র কয়েকটা বছর, দেশের ভিতরে ঢুকতে বুয়ররা যতোটুকু সময় নিল, তারই মধ্যে লক্ষ লক্ষ মৃগ ও জেব্রা এদের হাতে প্রাণ হারাল। তারপর আফ্রিকার আরও উত্তরে ইউরোপীয়দের দখল যতোই কায়েম হতে থাকে ততোই বেড়ে চলে সাদা-চামড়ার শিকারীদের নৃশংস তান্ডব। হাতির দাঁতের জন্য ও অন্য নানা লোভে আফ্রিকার বন্যপ্রাণীর অতি-সমারোহপূর্ণ সমাবেশকে অল্প সময়েই মধ্যে তারা প্রায় শেষ করে আনে। সরকার থেকেও এই শিকারীদের ঢালাও অনুমতি দেওয়া হয় যাতে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য এক-একটি গোটা এলাকা থেকে সকল বন্যপ্রাণী ঝাড়েবংশে শেষ হতে পারে। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন এতই দ্রুত ছিল যে সেই বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে বন্যপ্রাণীর নিধনকার্যে স্থানীয় অধিবাসী-দেরও যোগ দিতে বিলম্ব ঘটে না। তুলনীয় এমনি আর এক হত্যাকান্ডের নজীর আছে উত্তর আমেরিকায়, গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যার ফলে লুপ্ত হয়েছে বিপুলসংখ্যক বাইসন।

এশিয়ায় বন্যপ্রাণীর সংহারকান্ড শুরু হয়েছিল আরো অনেক পরে, আফ্রিকায় ও উত্তর আমেরিকায় প্রধান প্রধান বন্যপ্রাণীর দল শেষ হয়ে যাবার পরে। ঔপনিবেশিক যুগে দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ এলাকায় শাসন করত ইউরোপীয় জাতিরা কিংবা স্থানীয় রাজারা। বলা বাহুল্য, এই ইউরোপীয়রা ও স্থানীয় রাজারাও প্রচুর শিকার করত। কিন্তু যতোই তারা শিকার করুক সেটা সংগঠিত হত্যাকান্ডের রূপ নিতে পারে নি যেমন নিয়েছিল কৃষ্ণসার জেব্রা বাইসনের বেলায় আফ্রিকায় ও উত্তর আমেরিকায়। এখানে বলা দরকার যে এশিয়ার বন্যপ্রাণী ছিল টুকরো টুকরো অংশে ছড়ানো-ছিটনো, আফ্রিকার মতো ব্যাপক এলাকা জুড়ে একটানা নয়। আফ্রিকায় যে-হারে হত্যাকান্ড হয়েছিল তেমনি হলে এশিয়ার বন্যপ্রাণীও টিকে থাকতে পারত না। তবে এশিয়ার বেলায় বন্যপ্রাণীদের অনেকখানি বাঁচিয়েছিল তাদের বাসস্থানের প্রকৃতিও। আফ্রিকার ও উত্তর আমেরিকায় বন্যপ্রাণীদের আবাস ছিল উন্মুক্ত সমতলে, কিন্তু এশিয়ায় ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিরাট ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হয়ে যায়, বহু এলাকায় শুরু হয় অস্থিরতা ও লড়াইয়ের

যুগ। সর্বপ্রকারের ব্যাপক ধ্বংসকান্ড চলতে থাকে বর্মায়, মালয়ে, ইন্দোচীনের নতুন দেশগুলিতে ও ইন্দোনেশিয়ায়। এখনো চলছে। তার মধ্যে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে বন্যপ্রাণী। তুলনায় ভারতে কিন্তু অস্থিরতা ছিল না। যে-ধরনের যুদ্ধ ও অরাজকতার দরুন দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলিতে বন্যপ্রাণী লুপ্ত হচ্ছিল, ভারতে সেটি ঘটেনি। কিন্তু ভারতের অন্য যে-ব্যাপারটি ঘটেছে তা আরও মারাত্মক। ভারতে বিরাট বিরাট উন্নয়নমূলক পরিকল্পের রূপায়ণ ও জনবসতির বিপুল বিস্তারের ফলে বনজঙ্গল প্রায় লোপাট হয়ে এসেছে বলা চলে। সঙ্গে সঙ্গে বন্যপ্রাণীরও প্রায় লোপ পাবার মতো অবস্থা। বিশেষজ্ঞদের মতে যেখানে দেশের মোট এলাকার শতকরা ৩৩ ভাগ হওয়া উচিত বনজঙ্গল সেখানে ভারতে আছে মাত্র ২৩ ভাগ—পশ্চিমবঙ্গে তার চেয়েও কম, মাত্র ১৩ ভাগ। এ কারণে, পঁচিশ বছর আগেও ভারতে বন্যপ্রাণীর যে সমারোহ ছিল, এখন তার অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র কোনোক্রমে টিমটিম করছে। এবং যে হারে ভারতের জনসংখ্যা বাড়ছে ও জনবসতির প্রসার ঘটছে, এমনি চললে অচিরেই গোটা দেশের সমস্ত বনজঙ্গল একেবারে সাফ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তখন বন্যপ্রাণীর বিপুল সমারোহের এই দেশে বন্যপ্রাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে (হয়তো) মাত্র গোটাকতক অভয়ারণ্য ছাড়া আর কোথাও নয়।

•

ভারতে বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশি বিপন্ন করেছে বড়ো বড়ো নদী উপত্যকা প্রকল্প। বাঁধ ও জলাধার তৈরি হবার ফলে এককালের বহু বিখ্যাত বন্যপ্রাণীর এলাকা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। তদুপরি আরো বৃহৎ বৃহৎ এলাকা জুড়ে চাষ ও জনবসতির পত্তন হয়েছে, পশ্চিম ও পূর্ব থেকে শরণার্থীরা এসে জঙ্গল সাফ করে ঘরবাড়ি তুলেছে ও এমনি আরো নানা উন্নয়নমূলক কাণ্ড-কারখানার দরুন ভারতের বহু জঙ্গল ও সেই সঙ্গে তৎস্থানীয় বন্যপ্রাণী সম্পূর্ণ লুপ্ত। রাষ্ট্রের উদ্যোগে ও সমর্থনে সম্পাদিত এই সমস্ত কান্ডকারখানা দেশের উন্নয়নের পক্ষে বৃহৎ বৃহৎ পদক্ষেপ হিসেবেই অভিনন্দিত হয়ে থাকে। তার দরুন বন্যপ্রাণী যে লোপ পাচ্ছে, দু-একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী ছাড়া সেজন্য আক্ষেপ করার কেউ নেই। কারও মুখে এমন কথা শোনা যায় না যে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা করার সময়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়টিও চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত ছিল, হতে পারত, এবং হলে পরে ভারতের বন্যপ্রাণীর জগতে এমন অল্প সময়ের মধ্যে এমন একটা বিপর্যয়কর ধ্বংসকান্ড সাধিত হত না।

একটি বাঁধ বা জলাধার যখন তৈরি হয় তখনকার সাধারণ ছবিটি কি রকম? হাজার হাজার লোক সহসা এমন এক এলাকায় এসে হাজির হয় যেখানে আগে কোনো জনবসতি ছিল না। তারপরে অল্প সময়ের মধ্যেই আশেপাশের গোটা এলাকা কাঠ ও জ্বালানীর প্রয়োজনে নিষ্পাদক হয়ে যায়, বন্যপ্রাণীরা হয় আশ্রয়চ্যুত ও শিকারীদের শিকার। বাঁধ ও জলাধারের কর্মীরা তাদের খাদ্যের প্রয়োজনেও বহুদূর পর্যন্ত একটা অতি ব্যাপক এলাকা জুড়ে নির্বিচারে বন্যপ্রাণী হত্যা করতে থাকে। বাঁধ বা জলাধারটি তৈরি হতে সাধারণত কয়েক বছর সময় লাগে, নির্মাণকার্য শেষ হলে দেশের উন্নয়নের পক্ষে মস্ত একটি কাজ সম্পন্ন হয় ঠিকই কিন্তু সেখানকার বন্যপ্রাণীদের চিরকালের মতো হারাতে হয়—সেখানে বন্যপ্রাণী ফিরে আসার মতো অবস্থা কদাচ থাকে না।

অন্ধ্রপ্রদেশে যেখানে তুঙ্গভদ্রা বাঁধ তৈরি হয়েছে সেখানে এক সময়ে দলে দলে কৃষ্ণসার ঘুরে বেড়াত। বাঁধের কাজ শুরু হতেই শুরু হয়ে গেল ব্যাপক কৃষ্ণসার হত্যা। স্থানীয় বাজারে ডাঁই করে কৃষ্ণসারের মাংস বিক্রি হতে লাগল। দূরদৃষ্টি, সচেতনতা ও চেষ্টা থাকলে বাঁধের কাজ চালিয়েও কৃষ্ণসারদের একাংশ বাঁচানো যেত। কিন্তু তার কোনোটাই ছিল না, ফলে বাঁধের কাজ যখন শেষ হয়েছে তখন শুধু কৃষ্ণসার নয় বন্যপ্রাণীর ছিটেফোঁটাও গোটা এলাকায় অবশিষ্ট থাকে নি।

এমনি অবস্থা হয়েছে ও হতে চলেছে আরো বহু নদীর বাঁধ নির্মাণে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বন্যপ্রাণীর টিকে থাকার দিক থেকে, এককথায়, ভয়াবহ। সারা রাজ্য থেকে জঙ্গল ও জলাভূমি লোপ পাচ্ছে, সেইসঙ্গে বন্যপ্রাণীও। এই রাজ্যে জনবসতি এমনিতেই যথেষ্ট বেশি তার ওপরে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী এসে আশ্রয় নিয়েছে। এই বাড়তি মানুষের চাপ পড়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে। উন্নয়নমূলক কাজের অঙ্গ হিসেবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন রেলপথ রাস্তা ও বিমানবন্দর, স্থাপিত হয়েছে প্রকান্ড প্রকান্ড সামরিক শিবির—তার ফলে বন্যপ্রাণীর আশ্রয় হওয়ার মতো জঙ্গল আর বিশেষ থাকছে না। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে নেপাল সিকিম ভুটান থেকে যে-সব বন্যপ্রাণী উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে চলে আসত তারাও আর আসতে পারে না যদি-বা আসে তো জনবসতির ওপরেই তাদের হানা দিতে হয় ও তখন তারা গুন্ডা নামে আখ্যাত হয়ে শিকারীদের শিকার হয়। আরেক বিপদ হয়েছে চা-বাগানের দেশীয় মালিকরা, ইংরেজ প্ল্যান্টাররা চলে যাবার পরে যারা তৎস্থানে অধিষ্ঠিত। আনতাবড়ি শিকার করে চলাটা এদের কাছে চিত্ত-বিনোদন, জীপ হাঁকিয়ে হেডলাইটের আলোয় বেপরোয়া বেহিসেবী ও বেসামাল গুলি চালাতে চালাতে বাচ্চা-ধাড়ী নির্বিশেষে হত্যাকান্ড সম্পন্ন করার নাম এদের কাছে শিকার। কোথাও কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকার দরুন ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলির কয়েক লক্ষ কর্মীও চোরা-শিকারে রীতিমতো রপ্ত, আদিবাসীরাও তাদের তীরধনুক নিয়ে বড়ো কম যায় না। সব মিলিয়ে উত্তরবাংলা থেকে বন্যপ্রাণী লোপ পাবার মুখে।

রাজ্যের মধ্যবর্তী এলাকায় শরণার্থীদের চাপ সবচেয়ে বেশি, ফলে এই এলাকায় বনজঙ্গল বা ঝোপঝাড় বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই এবং বন্যপ্রাণীও প্রায় সম্পূর্ণভাবেই লুপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণে থাকার কথা বিশ্বের এক অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় অরণ্য—সুন্দরবন। হুগলির মোহানা থেকে নোয়াখালি পর্যন্ত বিস্তৃত এই অরণ্যের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ দেশ-ভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গের এলাকায় পড়েছিল (আয়তনে ১৬২৯-৪ বর্গমাইল)। কিন্তু বন কেটে কেটে বসত হতে হতে এবং বনবিভাগীয় অন্য নানা তৎপরতার ফলে সুন্দরবন যেমন ছোট হয়ে আসছে তেমনি তার বনত্বও খোয়া যেতে বসেছে। ফলে এমনকি সুন্দরবনের অতিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারও গোনা-

গুনীত যে কটি অবশিষ্ট আছে তাই নিয়ে বন্য অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো বন্য-প্রাণীর একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা এই রাজ্যে নতুন নয়। যেমন, অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের একশৃঙ্গ গণ্ডার। যেমন বুনোমহিষ। এই দুটি প্রাণীর কোনোটিই পশ্চিমবঙ্গে আর নেই, শেষোক্ত প্রাণীটি আরো অনেক আগেই সারা ভারত থেকে লুপ্ত। বৃহৎ একশৃঙ্গ গণ্ডার এখনো অবশ্য কোনোক্রমে উত্তরবাংলার কয়েকটি সীমিত এলাকায় ধুকপুক করছে।

উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়িত করার ফলে অরণ্য ও উদ্ভিজ্জের এলাকা লোপ পায়, এ তো দেখাই যাচ্ছে। অরণ্য ও উদ্ভিজ্জের সঙ্গে সঙ্গে বন্যপ্রাণীও লোপ পায়। আমাদের দেশে কোনো প্রকল্প রচনার সময়েই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচিত হয় না। বছরে একবার বন্যপ্রাণী সপ্তাহ অবশ্য ঘটা করেই উদযাপিত হয়। অরণ্য মন্ত্রী বেতারে ভাষণ দেন এবং বন্যপ্রাণীকে গুলী করে হত্যা না করার জন্য আবেদন জানান। তারপরের বছরের অন্য সময়ে অন্য মন্ত্রীদের বেতার-ভাষণে অরণ্য ও বন্যপ্রাণীর লোপ পাওয়াটাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের জয়লাভের নিদর্শন হিসেবে প্রচারিত হয়ে থাকে।

জলাভূমি থেকে নিকেশ করা বা জলাভূমি ভরাট করাটাও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। কলকাতার কাছে লবণহ্রদ এলাকায় এমনি একটি কাণ্ড ঘটেছে। কিন্তু একবারও ভাবা হয় নি এই লবণহ্রদের এলাকা যে বিভিন্ন জাতের ২৪৮ রকমের স্থানীয় ও যাযাবর পাখি ও ২২ রকমের নানা জাতের স্তন্যপায়ী জীবের আশ্রয় ছিল তাদের দশা কী হবে। জলাভূমির দক্ষিণদিকে ৪০ বর্গমাইল এলাকা এখনো অবশ্য উন্নয়নের কবলে পড়ে নি, এবং পাখিরা সেখানেই অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। আর শুধু তো স্থানীয় পাখিরা নয়, শীতকালে উত্তর থেকে যে হাজার হাজার পাখি আলিপুরের চিড়িয়াখানায় হাজির হয় তারা রাতটুকু কাটাতে আসে এই লবণহ্রদে—এদের সকলের এতকালের এই আশ্রয় এবার বোধহয় শেষ হয়ে গেল। একদল পক্ষীপ্রেমিক চেষ্টা করছেন বটে লবণহ্রদের যেটুকু এখনো অবশিষ্ট আছে সেখানে একটি পক্ষী-আলয় গড়ে তুলতে, সবিস্তারে প্রস্তাবও রেখেছেন, কিন্তু কতদূর কী হবে বলা শক্ত।

তবে সরকারের দিক থেকে কিছুই করা হয় নি বা হচ্ছে না এমন কথা বলা সত্যের অপলাপ হবে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যখন বৃহৎ বৃহৎ নদী-পরিকল্পনা এবং জলবিদ্যুৎ ও সেচ পরিকল্পনা রচিত হচ্ছিল তখনই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কথাও মাঝে মাঝে শোনা যেতে থাকে। যথারীতি কতকগুলো বোর্ড ও কমিটি গঠিত হয়, পরে স্থাপিত হয় কেন্দ্রীয় বন্যপ্রাণী বোর্ড—এখন যার নাম ভারতীয় বন্যপ্রাণী বোর্ড। কয়েকটি রাজ্যেও এমনিধারা বোর্ড গঠিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভায় ও কেন্দ্রীয় লোকসভায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন গৃহীত হয়েছে। তার আগে থেকেই সারা দেশ জুড়ে গোটা পঞ্চাশেক অভয়ারণ্য গড়ে তোলার কথা হয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আটটি অভয়ারণ্য, একটি টাইগার পার্ক ও তিনটি মৃগদাব।

তবে এই সমস্ত অভয়ারণ্য সম্পর্কে একটি কথা বলার আছে। বৃহৎ একটি এলাকা জুড়ে থাকা বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক আস্তানা লোপ পাবার পরে ক্ষুদ্র একটি পরিসরে অভয়ারণ্য স্থাপন করলে সদিচ্ছার পরিচয় দেওয়া হয় বটে কিন্তু বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রকৃত ব্যবস্থা করা হয় না।

যেমন, পশ্চিমবঙ্গেরই দুটি অভয়ারণ্য—গোরুমারা ও চাপড়ামারি। দুটিই উত্তরবঙ্গে। গোরুমারার আয়তন ৩-৩ বর্গমাইল। সরকারী বিবরণ অনুযায়ী এই অভয়ারণ্যে আছে হাতি, গণ্ডার, গউড়, বাঘ সম্বর কাকর হরিণ বরা হরিণ ও বুনোশুয়োর, এমনকি বুনোমহিষ পর্যন্ত (বুনোমহিষ থাকতেই পারে না, গোটা রাজ্যে একটিও নেই)। চাপড়ামারির আয়তন ৩-৪ বর্গমাইল, সরকারী বিবরণ অনুযায়ী এখানে গোরুমারার সবকটি বন্যপ্রাণীর থাকার কথা। এখন এতগুলো বন্যপ্রাণীকে যদি এতটুকু এক-একটি এলাকায় পোরা হয়েই থাকে তাহলে পরিণতিটা কী দাঁড়াবে? যেসব বন্যপ্রাণীর নাম করা হয়েছে তারা কেউই সামান্য নয়, স্বাভাবিক আস্তানায় থাকলে বিরাট এলাকা জুড়ে চক্কর দিয়ে থাকে—তারা এভাবে আবদ্ধ হয়ে থাকবে কেন? অভয়ারণ্য ঘিরে রয়েছে চা-বাগান ও লোকালয় বন্যপ্রাণীগুলো সেখানে গিয়ে হাজির হবে এবং অনিবার্যভাবেই নিহত হবে। সম্ভবত এই দুটি অভয়ারণ্যে বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব শুধু কাগজেকলমে, বাস্তবে নয়। এমনকি এই দুটি অভয়ারণ্যের চেয়ে আয়তনে আরো বড়ো জলদাপাড়া অভয়ারণ্য সম্পর্কেও একাধিক পর্যটক লিখেছেন যে সারাদিন বনবাদাড় চুঁড়ে একটিও গণ্ডার বা বাঘের সাক্ষাৎ তারা পান নি—শুধু হরিণ আর ময়ূর দেখেই ফিরে এসেছেন।

এই এলাকায় যে সীমাহীন অজ্ঞতার সঙ্গে যে অপরিণামদর্শী ধ্বংসকার্য সাধিত হয়েছে তার মর্মন্তুদ বিবরণ দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন বনপাল এ সি গুপ্ত, জার্নাল অব দ্য বেঙ্গল ন্যাচারাল হিস্টরি সোসাইটি এপ্রিল ১৯৫৮ সংখ্যায় প্রকাশিত (বালকৃষ্ণ শেষাদ্রীর দ্য টোয়াইলাইট অব ইণ্ডিয়ান্স ওয়াইল্ড লাইফ পুস্তকে উদ্ধৃত):

'জলঢাকা নদীর পশ্চিমে ভুটান সীমান্ত থেকে দক্ষিণের দিকে লম্বা জিভের মতো যে অরণ্য চলে গিয়েছে তার নাম তন্তু রিজার্ভ আর এই তন্তুর দক্ষিণার্ধে (নিম্ন তন্তু) গোরুমারা অবস্থিত। গোরুমারার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত গিয়ে মিশেছে হিমালয়ের পাদদেশে কুমানি অরণ্যের সঙ্গে। কুমানি অরণ্যে নক্সাল খোলার বাম তীরে ১নং রঙ্গো ব্লকে রয়েছে একটি সল্ট-লিক (যেখানে জন্তুজানোয়ারেরা লবণের জন্য হাজির হয়)। অতীত থেকে পুরুষানুক্রমে এই সল্ট-লিক হয়ে আছে বহুসংখ্যক তৃণভোজী জন্তুর মিলন-স্থান—তারা আসে পার্শ্ববর্তী ভুটান, কালিম্পং-এর পাহাড়-তলি অরণ্য ও তন্তু অরণ্যের দূরে দূরে অংশ থেকে। এখানে অন্য কোনো সল্ট-লিক নেই যা এই সমস্ত অরণ্যের জন্তুদের

প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত এই সলট-লিক-এর কৌলিন্যে হাত পড়ে নি—গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে নানাদিক থেকে জন্তুজানোয়ারের চলাচলের অনেকগুলো পদশব্দ-মুখর পথ এসে মিশেছিল এই সলট-লিক-এ। বন্য জন্তুজানোয়ারের বিপুল এক সমাবেশ ঘটত এখানে, সলট-লিক-এর কিনারে দেখা যেত হাতি গউড় সম্বর চিতল ও অন্যান্য প্রাণী। প্রায় ত্রিশ বছর আগে আমি এ-অঞ্চলে কাজ করতাম সরকারী বনপাল হিসেবে. আমার মনে আছে সলট-লিকের ধারেকাছে যেতেও আমার তখন ভয় করত। যুদ্ধ, দেখা গেল, অনেক কিছুই ওলোটপালোট করে দিতে পারে, যেসব জিনিস ওলোটপালোট করে দিল তার মধ্যে একটি হচ্ছে বনাপ্রাণী সংরক্ষা। অরণ্য ও বন্যপ্রাণী পরিচালনা করার যেসব মূলনীতি আছে সেগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হল, অরণ্যের সর্বাধিক প্রবেশসাধ্য এলাকাগুলোয় চূড়ান্ত শোষণকার্য চলতে লাগল আর বড়ো বড়ো এলাকাকে সাফ করে ফেলা হল শ্রমিক-বাহিনীর ডেরা স্থাপন করবার জন্য। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হবার পরেও কয়েক বছর ধরে এই বেহিসেবী কার্যকলাপ বেপরোয়া চলেছে। বর্তমান বিষয়ের (অর্থাৎ গোরুমারা অভয়ারণ্যে) প্রসঙ্গে বলতে পারা যায়। চতুষ্পার্শ্বের বহু মাইলব্যাপী এলাকার বন্যপ্রাণীর কাছে নকশাল খোলার সলট-লিকের যে গুরুত্ব ছিল তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হল, জন্তুজানোয়ারের চলাচলের পথ বরাবর কুমানি ব্লকের ব্যাপক অংশ নিষ্পাদপ করা হল, সলট-লিকের বেশ কাছেই অনেকখানি এলাকায় জংগল একেবারে সাফ করে ফেলা হল, সেখানে গড়ে তোলা হল একটি অরণ্যের গ্রাম। এবং পরিশেষে, সলট-লিকের অবস্থান যে ব্লক্যো ব্লকে, সেটিকে ভেষজ উদ্ভিদ চাষ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হল বাণিজ্য ও শিল্প অধিকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীনে। ভাবতে অবাক লাগে যে কালিম্পং অরণ্যের পরিচালনার জন্য যে কার্যকরী পরিকল্পনা ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে রচনা করা হয়েছিল যাতে ছিল কুমানি ব্লকের সাফাই-নিষ্পাদপী-করণের ব্যবস্থাও সেখানে সলট-লিকে যাবার করিডর হিসেবে জন্তুজানোয়ারের চলাচলের স্থায়ী পথ বরাবর অরণ্যের ফাটল বজায় রাখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। প্রকৃতির সঙ্গে কারবার করতে গিয়ে মানুষ অনেক সময়েই এমন সব কাজ করে বসে যার পরিণতি হয় দূরপ্রসারী, এবং একবার যে ক্ষতি হয়ে যায় তার সংশোধন পরে দুরূহ হতে পারে। উপরে যে-সব তথ্যের উল্লেখ করা হল তা থেকে বোঝা যাবে, কয়েক বছর ধরে যে-সব কাজ করা হয়েছে তার মূলে না ছিল নির্ভরযোগ্য স্থানিক জ্ঞান না প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান।'

এই লেখাতে তিনি আরও বলেছেন,

'যদিও প্রায় কুড়ি বছর আগে এই এলাকাকে অভয়ারণ্য করে তোলা হয়েছে, কিন্তু বন্যপ্রাণীর পরিচালনা বলতে বর্তমানে যা বোঝায় সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে এমন কিছুই কখনো করা হয়নি—না এখানে না এর উত্তরে অবস্থিত তন্দু অরণ্যের অন্য অভয়ারণ্যে (চাপড়ামারী)। কাজ বলতে মাত্র এটুকুই হয়েছে যে এই এলাকায় বন্দুক চালনা নিষিদ্ধ আর কয়েকজনের ছোট একটা দল রক্ষাকার্যে নিযুক্ত, যে-দলের কারোরই বিশেষ জ্ঞান বা বিশেষ প্রশিক্ষণ নেই। বলা বাহুল্য, চোরা-শিকারীর বন্দুকচালনার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারেনি বরং বাইরের অরণ্যের চেয়ে অভয়ারণ্যের জন্তুজানোয়ারের দিকেই তার মনোযোগটা বেশি করে পড়ে।'

আমাদের দেশে বন্যপ্রাণী কেন লোপ পেয়েছে লোপ পেতে চলেছে, তার কারণগুলো এই উদ্ধৃতিতে অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে উপস্থিত। মোটামুটি এই হচ্ছে সাধারণ অবস্থা। একমাত্র সুন্দরবন ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোথাও স্বাভাবিক অরণ্য বিশেষ কিছু নেই। ফলে একমাত্র সুন্দরবন ছাড়া অন্য কোথাও স্বাভাবিক বিচরণশীল বন্যপ্রাণীও বিশেষ নেই। আছে শুধু গোটাকতক অভয়ারণ্য। সেখানে কতখানি অভয় আর বন্যপ্রাণীর পরিপোষক কতখানি অরণ্য তা ঘোরতর সন্দেহের বিষয় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে সুন্দরবনও ক্রমক্ষীয়মান। সব মিলিয়ে এমন দিনও আসতে পারে যখন আর এ-বিষয়ে অবহিত হয়েও কোনো লাভ নেই যে কাগজপত্তর সব ঠিক আছে বটে কিন্তু আসল তোতারই প্রাণ নেই।

•

অতঃপর লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীদের একটি তালিকা দিয়েই এই লেখা শেষ হতে পারে। কিন্তু তার আগে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের অভয়ারণ্যগুলি সম্পর্কে কিছু বিবরণ জানিয়ে রাখলে অতি-উৎসাহীরা হয়তো লাভবান হতে পারেন। কারণ এখনো হয়তো কোনো কোনো অভয়ারণ্যে এমন কোনো কোনো রক্তমাংসের চেহারা দেখা যেতে পারে যা কিছুকালের মধ্যেই মিউজিয়মের খোপে খড়গাদা মূর্তি হয়ে উঠতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে অভয়ারণ্য আটটি— উত্তরবঙ্গে পাঁচটি ও সুন্দরবনে তিনটি। উত্তরবঙ্গের পাঁচটির মধ্যে তিনটি জলপাইগুড়ি জেলায় ও দুটি দার্জিলিং জেলায়।

জলপাইগুড়ি জেলার তিনটি অভয়ারণ্যই সমতলভূমিতে— জলদাপাড়া, গোরুমারা ও চাপড়ামারী। শীলতোর্ষা নদীর তীরে জলদাপাড়ায় রয়েছে বিখ্যাত বৃহৎ একশৃঙ্গ গণ্ডার তাছাড়া অন্যান্য বন্যপ্রাণীর মধ্যে গউড়, বাঘ, হাতি সম্বর বারাসিঙ্গা চিতল কাকর হরিণ বরা হরিণ শুয়োর বা মিথুন। গোরুমারা ও চাপড়ামারীর অভয়ারণ্য সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে বৃহৎ একশৃঙ্গ গণ্ডার সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আছে আসামের কাজিরাঙ্গায় (৪০০) আরো কয়েকটি (১২৫) আসামের মানস, সোনাইরুপা লাওখোওয়া এবং ইত্যাদি অভয়ারণ্যে পশ্চিমবঙ্গে আছে ৫৫টি। সব মিলিয়ে ভারতের বৃহৎ একশৃঙ্গ গণ্ডারের সংখ্যা সম্ভবত ৭৪৫।

দার্জিলিং জেলার দুটি অভয়ারণ্য হচ্ছে মহানন্দা ও সিঞ্চল। প্রথমটি তিন হাজার ফুট উঁচুতে সুকনা থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত সেখানে হরিণ বাঘ হাতি ও ময়ূরে দেখা যেতে পারে। দ্বিতীয়টি দার্জিলিং-এর কাছেই আট হাজার ফুট টাইগার হিলে. সেখানে বন্যপ্রাণী বলতে আছে ভালুক জংলী ছাগল ও হরিণ।

সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্য—সজনেখালি, হ্যালিডে দ্বীপ ও লোথিয়ান দ্বীপ।

সজনেখালি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো অভয়ারণ্য আয়তনে ৩৬২-৪২ কিলোমিটার (১৪০ বর্গমাইল)। এটির খ্যাতি পাখির আশ্রয়স্থল হিসেবে। গত বছর এখানে প্রায় কুড়ি প্রকারের চল্লিশ হাজার পাখির আগমন ঘটেছিল। সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় শামুকখোল, প্রায় একুশ হাজার তাছাড়া বক, পানকৌড়ি দাঁড়কাক তিতি হাটিমাটিম ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ছোট অভয়ারণ্য হ্যালিডে দ্বীপ (৫-৯৬ কিলোমিটার ব ২-৯৩ বর্গমাইল)। বন্যপ্রাণী বলতে গোটা কতক বাঘ বুনো শুয়োর ও চিতল লোথিয়ান দ্বীপের আয়তন ১৫ বর্গমাইল সেখানেও প্রায় একই ধরনের বন্যপ্রাণী।
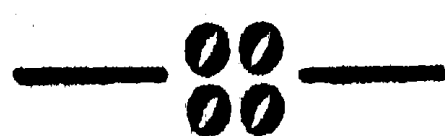
পশ্চিমবঙ্গে মৃগ-উদ্যান আছে তিনটি— শান্তিনিকেতনের বল্লভপুরে, নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরিতে ও ২৪ পরগণার পাড়মাদনে।

তাছাড়া ভারতের নবম ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপিত হতে চলেছে সুন্দরবনে। এই প্রকল্পের সদর দপ্তর গোসাবায় এবং দেড় বছরে তিন লক্ষ টাকা খরচ করার পরেও কাজ বিশেষ হয়নি। এমনকি সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা কত সেই সংখ্যাটিও এখনো পর্যন্ত অনির্ণীত—কারও মতে প্রায় ২০০০ কারও মতে ১০৮।

*

লুপ্ত বন্যপ্রাণীর মধ্যে সবার আগে উল্লেখ্য নাম চিতা। প্রকাশিত বিবরণ অনুসারে, সম্ভবত ভারতের মাটিতে শেষ বন্য চিতা দেখা গিয়েছে ১৯৫২ সালের ২৮-২৯ মার্চের রাত্রিতে, দক্ষিণ ভারতের চন্দ্রগিরির কাছে একটি রাস্তায়। অথচ এক সময়ে সারা ভারত জুড়ে এই বন্যপ্রাণীটি ছড়ানো ছিল— বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত, উত্তরে বালুচিস্তান হয়ে পারস্য, তারপরে সিরিয়া তারপরে আফ্রিকা। রাজস্থান ও মধ্যভারত থেকে চিতা অদৃশ্য হয়ে যায় এই শতকের শুরুতে উত্তর ভারত থেকে ১৯২০ সাল নাগাদ। কিন্তু গত শতকের শেষদিকেও ভারতের কোনো কোনো অংশে প্রচুর চিতা ছিল। উত্তর ভারতের পরে বুন্দেলখণ্ড ও মহাদেও হিলস থেকে চিতা অদৃশ্য হয় ১৯৩৫ সাল নাগাদ উত্তর দাক্ষিণাত্য থেকে ১৯৪০ সাল নাগাদ। ১৯২০ সালের পরে সম্ভবত অল্প কয়েকটিই বন্য চিতা বেঁচেছিল, যতোদূর ধারণা করা যায় দাক্ষিণাত্যের দিকে। কিন্তু তুঙ্গভদ্রা বাঁধ নির্মিত হবার সময়ে শেষ চিতাও লোপ পেয়েছে। জনবসতির চাপে ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের দাপটে এমন বিপুলবিস্তৃত একটি বন্যপ্রাণীর এমনভাবে লুপ্ত হয়ে যাবার এ এক নির্মম দৃষ্টান্ত।

সিংহ হচ্ছে অপর এক বন্যপ্রাণী যার বিস্তার একসময়ে এশিয়ার বেশ ভালোই ছিল— এশিয়া মাইনর ও আরব থেকে পারস্য হয়ে ভারত পর্যন্ত। এখন গুজরাটের গির অরণ্যে অল্প কয়েকটিতে মাত্র এসে ঠেকেছে। যতোদূর ধারণা করা যায়, বন্যপ্রাণী হিসেবে সিংহ অদৃশ্য হয়েছে বিহারে ১৮১৪ সালে কচ্ছে ১৮৩০ সালে, দিল্লীতে ১৮৩৪ সালে, বাহাওয়ালপুরে ১৮৪২ সালে, বিন্ধ্য ও বুন্দেলখণ্ডে ১৮৬৫ সালে মধ্যভারত ও রাজস্থানে ১৮৭০ সালে, পশ্চিম আরাবল্লীতে ১৮৮০ সালে। ১৮৮০ থেকে নতুন শতক শুরু হবার সময়ে গির অরণ্যে সিংহের সংখ্যা ছিল গোটা বারো। তারপরে অবশ্য সিংহ শিকার বন্ধ হয়েছে এবং গির অরণ্যে সিংহের সংখ্যা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৬৮ সালে ছিল ১৬২টি।

লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় প্রাণীর একটি তালিকা এবারে উপস্থিত করা যেতে পারে (ব্র্যাকেটে ইংরাজি নাম) :

স্তন্যপায়ী : বিন্টুরং (ভালুক-বিড়াল (বিন্টুরং) কৃষ্ণসার (ব্ল্যাক বাক)। থামিন (ব্রাউ-অ্যান্টলার্ড ডীয়ার বা থামিন)। কারাকাল (শিয়াগোস) (ক্যারাকাল) চিতা (চিতা) চিত্রিত চিতাবাঘ (আর্মচিতা) (ক্লাউডেড লেপার্ড)। সিন্ধুগাভী (সিন্ধু ধেনী (ডুগংগ)। মেছো বিড়াল (ফিশিং ক্যাট)। সোনা বিড়াল (গোল্ডেন ক্যাট)। সোনালী হনুমান (গোলডেন ল্যাঙ্গুর)। বন্য শশক (হিসপিড হেয়ার)। উল্লুক (হুলক)। সিংহ (ইন্ডিয়ান লায়ন)। জংলী গাধা (বুনো গাধা) (ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড অ্যাস)। নেকড়ে (ইন্ডিয়ান উল্ফ)। হাঙ্গাল (কাশ্মির স্ট্যাগ)। চিতাবিড়াল (বনবিড়াল) (লেপার্ড ক্যাট)। পান্ডা, লাল পান্ডা (লেসার বা স্বল্প পান্ডা)। কেশরী বানর (কালবানর) (লায়ন-টেইল্ড ম্যাকাক)। ছোট লজ্জাবতী বানর (লোরিস)। লিংকস (লোমশকর্ণ) (লিংক্স)। গন্ধ গকুল (মালাবারী) (মালাবার সিভেট)। দোসাল (চিত্রিত বিড়াল) (মার্বল্ড ক্যাট)। মারখর (মারখর)। কস্তুরী মৃগ (মাস্ক ডীয়ার)। নয়ান (ওভিস অ্যামন বা নিয়ান)। চাঁড়িমুখো বিড়াল (প্যালাসের বনবিড়াল) (প্যালাস'স ক্যাট)। বনরুই (প্যাঙ্গোলিন)। বামন বরাহ (বরাহক) (পিগ্‌মি হগ্)। ভারতীয় একশৃঙ্গ গণ্ডার (রাইনোসেরাস)। নীমালি বিড়াল (রাস্টি স্পটেড ক্যাট)। বড় লজ্জাবতী বানর (স্লো লোরিস)। তুষার চিতাবাঘ (স্নো লেপার্ড)। চিত্রিত লিনসাং (স্পটেড লিন্‌সাং) বারাসিঙ্গা (সোয়াম্প ডীয়ার)। মিশমি টাকিন বা মিশমি টাকিন)। তিব্বতী চিনকারা (টাইবেটান গ্যাজেল)। তিব্বতী জংলীগাধা, তিব্বতী ঘোরকর (টাইবেটান ওয়াইল্ড এ্যাস) বাঘ (টাইগার)। খরিয়াল (সাপু) (উরিয়াল বা শাপু)। বুনো মোষ (ওয়াইল্ড বাফেলো)। চিতাবাঘ (লেপার্ড বা প্যানথার)। নীলগিরি হনুমান (নীলগিরি ল্যাঙ্গুর)। নীলগিরি থর (নীলগিরি থর) (উভচর ও সরীসৃপ : কুমির (ক্রোকোডাইল)। মেছো কুমির। সোনা কুমির। ঘড়িয়াল (ঘড়িয়াল) (পাখি) বাজ (বাজা)। চির (চিয়ার ফেজেন্ট)। লুকনা (গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড)। রাজধনেশ (গ্রেট ইন্ডিয়ান হর্ন্‌বিল)। জার্ডনের নুকার (জার্ডন'স কোর্সার)। দেড়েল শকুন (ল্যামারগাইয়ার) বড় বাজ (লার্জ ফ্যালকন) বড় সাহিন ছোট সাহিন। তুরমতি। পাহাড়ী বটের (মাউন্টেইন কোয়েইল) নারকুন্ডি ধনেশ (নারকোন্ডাম হর্ন্‌বিল) কোলঙ্গা (নিকোবার মেগাপোড) ময়ূর (পীফাউল)। গোলাপিশির (পিংকহেডেড ডাক্) হীরালাল স্লেটারের মোনাল (সক্লেটারস মোনাল) তুর্শী, সাইবেরীয় সাদা সারস (সাইবেরিয়ান হোয়াইট ক্রেন) ঘাস্তলাল (ট্রাগোপান ফেজেন্টস) শ্বেতোদর সিন্ধু ঈগল (হোয়াইটবেলীড সী ইগল) মুশাকান ফেজেন্ট (হোয়াইট-ইয়ারড্ ফেজেন্ট) শ্বেতপক্ষ বুনোহাঁস (হোয়াইট-উইংগ্‌ড উড ডাক) ('সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকার বন্য প্রাণী সংখ্যা ১৯৭৩ থেকে এই তালিকা সংগৃহীত)

লক্ষ্য করবার বিষয় বাঘও এই তালিকা অন্তর্ভুক্ত। বাঘ লুপ্ত নয়, লুপ্তপ্রায়ও নয়, বলা যেতে পারে বিরল। এখন থেকে যদি বিশেষ সংরক্ষার ব্যবস্থা করা না হয় তাহলে চিতার মতো বাঘও লুপ্ত হতে পারে। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অনেক প্রাণী সম্পর্কেই এই কথা।

বন্যপ্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এখনো সময় আছে। বন্যপ্রাণী আর অরণ্য যদি না থাকে তাহলে সে এক অতি দীনহীন অবস্থা।

বাংলার পাখিরালয়

মহম্মদ সফিউল্লা

পশ্চিমবঙ্গে পাখিরালয় বলতে বোঝায় সুন্দরবনের পীরখালি ব্লকের সজনেখালি। এই পাখিরালয়টি স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে। ষাটের দশকে এখানে প্রথম পাখি আসা পরিলক্ষিত হয়। সজনেখালিকে অভয়ারণ্য বলে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া হয় ১৯৬০ সালের ৭ মে।

পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও এত বেশী সংখ্যক জলচারীদের দেখা যায় না। সারা বছর ওরা ওখানে থাকে না। ওরা দলে দলে এসে বাসা বাঁধে বর্ষাকালে—প্রজনন ঋতুতে। সংখ্যায় কয়েক হাজার। প্রায় ২৮—৩০ প্রজাতির এদেশীয় পাখি সেখানে নীড় রচনা করে। লোহার জং, ছোট ও বড় কোচে বগলা, ছোট ও বড় পানকৌড়ি, ক্যাস্পেন, মানিক জোড়, শামুকখোল, মদনটাক প্রভৃতি হরেকজাতের হরেক রকমের পাখি। বর্ষায় মেঘ-মেদুর দুপুরে সবুজ বনানীর শীর্ষে শীর্ষে অজস্র শামুকখোলের বাসা দেখা যায়। সে ভারি চোখ জুড়ানো দৃশ্য। সজনেখালির গরান কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে কাঠের পাটাতনে উঠলে আপনি মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না। অজস্র শামুকখোল বাইন, গরান, কেওড়ার সবুজ ডাল ভেঙে মুখে করে উড়ে এসে নীড় রচনা করছে। কতক পাখি কাঁচা বাসায় ডিমে তা দিচ্ছে। সংখ্যায় শামুকখোলই বেশী। অন্যান্য পাখি সংখ্যায় কম, মাঝে মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হেথা-হোথা বাসা বানায়। বেশীরভাগ গাছই নীচু এবং ঝাঁপড়া। একই গাছের বিভিন্ন ডালে কয়েকটা করে বাসা। বাসার আকার চুপড়ির মত, ডালপালা দিয়ে তৈরী। ডিমের রং সাদা ফিকে গোলাপী বা হাল্কা নীল। আকার অনেকটা হাঁস ও মুরগীর ডিমের মতই। শামুকখোল বড়ই উদাসীন তার ডিম ও বাচ্চাদের সম্বন্ধে। কত ডিম যে নীচে পড়ে যায় কত যে কাকে নিয়ে পালায় কত বাচ্চা যে চিল কাকের পেটে যায় তার ইয়ত্তা নেই। সেদিকে শামুকখোলের ভ্রূক্ষেপ নেই— নির্বিকারভাবে ওরা ডিমে তা দিয়ে যায়। ওদের শত্রু সুন্দরবনের তারকেল বা সোনা গো-সাপ। ওরা গাছ বেয়ে উঠে বহু ডিম খেয়ে নষ্ট করে। শলোয় ভরা প্যাচপেচে কাদায় নামলে অজস্র ভাঙা ডিম ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যাবে।

জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ থাকায় অভয়ারণ্যটি নিরাপদও বটে। পক্ষীশাবকদের নরম মাংসের লোভে বড়মামা হামেশাই আশ-পাশে ঘুরেঘুরে করে বা হেতাল বনে ওৎ পেতে বসে থাকে। সুযোগ পেলে তাজা মানুষেরও ঘাড় মটকায়।

সজনেখালি অভয়ারণ্যটি স্থানীয় অধিবাসীরা পাখিরালয় বলে থাকেন। নামটি সংগত এবং শ্রুতিমধুর ও স্পষ্ট।

কয়েক বছর পূর্বে হুগলি জেলার ঝাউ-তলার মোড় পেরিয়ে যাওয়ার সময় শাহমাণি-তলায় একটা পুকুরে অজস্র হাঁস দেখেছিলাম। কৌতূহলী হয়ে পুকুর ধারে যেতেই গ্রামের লোক হাঁ হাঁ করে তেড়ে এলেন— অবশ্য সংগত কারণেই। হাতে আমাদের আগ্নেয়াস্ত্র না থাকলেও আমাদের অতি আগ্রহ তাঁদের মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল।

পুকুরটির পাড়ে পীরের আস্তানা। মাজার সংলগ্ন মজা পুকুরের পাট শ্যাওলা ঝাঁজি হিঞ্চে, কলমি ও টোপা পানার দামের মধ্যে অজস্র সরাল নীল-পাখা হাঁস বা জিরিয়া হাঁস। সরালগুলো বড় চঞ্চল আর ছটফটে। সারাক্ষণ মুখে ওদের পিঁক পিঁক ডাক লেগেই আছে, তাই ওদের আর এক নাম শিস দেওয়া হাঁস। কয়েকটা যাযাবর দিগ-হাঁস পুকুরের মাঝ বরাবর ভেসে বেড়াচ্ছিল। কিছু নাকতা হাঁস ও গুগরাল অপর পাড়ে জলের কিনারে দেখা গেল।

তখন সারা ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উপযোগী কোন একটা আইন প্রচলিত ছিল না। তথাপি স্থানীয় অধিবাসীদের চেষ্টায় ও যত্নে ঐ জলাশয়টি জলচারীদের নিরাপদ আশ্রয় ছিল। স্থানীয় গ্রামবাসীদের আগ্রহ ও মমতার অকুণ্ঠ প্রশংসা না করে পারিনি।

দুঃখের বিষয় শিকারীর বন্দুকের নল থেকে রেহাই পেলেও ব্যবসায়ীর লালসার হাত থেকে পাখিগুলিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পুকুরের পশ্চিমদিকে কয়েকটা গভীর বালিখাদ থেকে বালি তোলার কাজ তখন চলছিল। পাম্পের ভটভটানি সহ্য করেও পাখিগুলি ওখানে টিকেছিল। কিন্তু যেদিন বালিখাদের অতল গহ্বরে পুকুরটি তলিয়ে গেল সেদিন দিশেহারা হাঁসের দল কতই বা মারা পড়ল কতক ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।

ছোটখাট পাখির আশ্রয়স্থল পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রামেই দেখা যাবে। হুগলি জেলার একটা ছোট গ্রাম আউষবালি। গ্রামের ভিতরে বিশাল বিশাল বট অশ্বত্থ ও কাঠ বাদাম গাছের ঘন জটলা। ঐসব গাছের ডালে অজস্র বাকচা বংশানুক্রমে বসবাস করছে। গ্রামবাসীরা আজও যত্ন করে ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করে চলেছেন। আসন্ন সন্ধ্যায় নিশাচর ঐসব ওয়াক বক যখন ডাকতে ডাকতে আহার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে তখন অতি বড় বেরসিকের তা ভাল লাগবে।

বাংলায় এমন জলাশয় বহু আছে যেখানে শীতের মরশুমে নানা জাতের যাযাবর ও দেশী-বিদেশী হাঁসের এবং অন্যান্য জলচর পাখিদের দেখা যায়। শীতকালটা ঐসব জলাশয়ে কাটিয়ে ওরা আবার যে যার দেশে ফিরে যায়।

যাযাবর জলচরদের মধ্যে ডুবুরি লালশির হাঁস (স্ত্রী) এবং এদের পুরুষ হাঁস বাংলায় যাদের ভুমার হাঁস বলে তারা ভূতি হাঁস গুলোবশর দিগহাঁস লালশির বাসুনিয়া হাঁস শান্তমুখি হাঁস বড় ও ছোট রাঙ্গা মুড়ি

হাঁস চিলহা হাঁস প্রভৃতিদের নির্জন জলাশয়ে দেখা যায়।

রাজহংসদের মধ্যে তিন ধারিয়া হাঁস এবং কালিদাসের কাব্যের বিখ্যাত কদম্ব রাজহংস বাংলায় যাকে জলহংস বলে তাদের দেখা যায়। শোয়ান বা মরাল বাংলায় কেন ভারত-বর্ষেও দুষ্প্রাপ্য।

দেশী হাঁস যেমন নাকতা, সরাল, বড় সরাল গুগরাল বালি হাঁস প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গা থেকে উভয় বাংলায় জলাশয়ে উড়ে আসে। খালবিলে বা নির্জন দীঘির ইঁদুরকানি পানা, হিঞ্চে ও কলমিলতার ঘাসের মধ্যে ওদের আহার অন্বেষণে ব্যস্ত দেখা যায়।

যাযাবর অন্যান্য জলচারীদের মধ্যে শ্বেত বক বা কৃষ্ণ বক এদেশে দেখা গেলেও এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা নয়।

এদেশীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সাদা কাক সংস্কৃতে যাকে কঙ্ক বলে তারা লাল কাক কোঁচ বক খুন্তে বক মদনটাক মোনাজংঘা, শামুকখোল মানিকজোড় লোহারজং প্রভৃতিই প্রধান।

বাংলায় সাধারণত সোআন গুস ম্যার গ্যানস্যার ডাক টীল এসবকেই হাঁস বলা হয়। ইংরাজীতে ওদের ভিন্ন ভিন্ন নাম বিভিন্ন অর্থ-দ্যোতক। বনফুল তার ডানায় এবং শ্রীশচীন্দ্র-নাথ মিত্র তাঁর বাংলার শিকার প্রাণী গ্রন্থে ওদের যে নামকরণ করেছেন তা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। ওরা সোয়ানকে মরাল গুস-কে রাজহংস ম্যারগ্যানস্যারকে বিচিত্র হংস, ডাক এবং টীলকে শুধু হংস বলার পক্ষ-পাতী। এই নামগুলি বাংলায় চালু হওয়া উচিত। শুধু ম্যারগ্যানস্যারকে বিচিত্র হংস না বলে চিত্রিত হংস বললেই বোধ হয় ভাল শোনায়।

গগনবেড় ঃ ফটো ঃ সমরজিৎ

ঐসব দেশী-বিদেশী হাঁসের দল ও অন্যান্য জলচর পাখি সুদূর সুমেরু অঞ্চল ইউরোপ উত্তর এশিয়া সাইবেরিয়া চীন তুর্কিস্থান পারস্য কাশ্মীর লাদাক তিব্বত প্রভৃতি স্থান থেকে হাজার হাজার মাইল নির্ভুলভাবে আকাশপথে পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল ও উভয় বাংলার বিলে বাঁওড়ে ভীড় জমায়। শীতকালটা এদেশে কাটিয়ে ওরা যে যার দেশে ফিরে যায়। ঐসব জলাশয়গুলিকে একটু সংরক্ষিত করলে এবং ওদের যাতায়াতের পথ নিষ্কণ্টক হলে বহু বিহঙ্গালয় গড়ে উঠতে পারে।

কলকাতার চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কোথাও এত অধিক সংখ্যক হাঁসের দেখা পাওয়া যায় না। চিড়িয়াখানার লেকের পাখির উপনিবেশটিও স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে। লেকের আদি বাসিন্দা একদল কোঁচ বক। ওদের হটিয়ে জায়গা দখল করে নিশাচর ওয়াক বকের দল। তারপর আসে পানকৌড়ি ও তার জাতভাই গয়ার পাখি। ওরা আবার ওয়াক বকের কিছুটা জায়গা দখল করে নেয়। এখন ওদের মধ্যে এক অলিখিত চুক্তি অনুযায়ী যে যার আস্তানায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। পানকৌড়ি ও গয়ার লেকের দ্বীপগুলোয় স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে। বাকচা দম্পতি তাদের কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে লেকের ধারে বট অশ্বথ, রবার কাটা মেহদি গাছে ঘরকন্না করছে।

চিড়িয়াখানায় পাখির উপনিবেশও তাদের গতিবিধি তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন ওখানকার তৎকালীন স্বনামধন্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাবু রামব্রহ্ম সান্যাল।

লেকের জলে কয়েক হাজার অতিথি [illegible] দিগহাঁস নাকতা গুগরাল নীল [illegible]খা হাঁস এবং বালিহাঁসদের শীতকালে [দে]খা যায়। দলে ভারি সরালের দল। দিগ [হাঁ]স সংখ্যায় কম, নাকতা আরও কম। [শ]েষের দিকে কয়েক হাজার যাযাবর নীল-[ডানা] হাঁস (Garganey Teal) আসে। ওরা [illegible] [illegible] সুমেরু ইউরোপ ও সাইবেরিয়ার

সরাল

ফটকা

হরিয়াল

রাজ ধনেশ

তুষারাচ্ছাদিত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মাইল আকাশপথে পাড়ি দিয়ে লেকের জলে আসে। শীতকালটা এই লেকের জলে কাটিয়ে ওরা আবার ফিরে যায়। কাজেই চিড়িয়াখানার জলাশয়টি স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে আর এক বিহঙ্গালয়। সম্প্রতি এটির রক্ষণাবেক্ষণে চিড়িয়াখানা পরিচালন কর্মীটি তৎপর হয়েছেন।

পশ্চিম বাংলায় পর্যটন দপ্তরের সহায়তায় কয়েকটি ভাল পাখিরালায় গড়ে উঠতে পারে। নদীমাতৃক বাংলায় জলাশয়ের অভাব নেই—অভাব উদ্যমের এবং সরকারী তৎপরতার। হুগলি হাওড়া মেদিনীপুর চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি বাংলার প্রত্যেকটি জেলাতেই পাখিরালয় গড়ে তোলা যায়।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনটি সম্প্রতি সারা ভারতবর্ষে চালু হয়েছে। আইনটির প্রয়োগ এই রাজ্যে গত ১৯৭৩ সালের মে মাসে সুরু হয়েছে। এর ফলে নির্বিচারে পাখি শিকার বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। ক্ষেত্র প্রস্তুত স্থানও প্রচুর চাই শুধু সুষ্ঠ পরিকল্পনা এবং বন ও পর্যটন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগ। ছোট রাজ্য হরিয়াণার সুলতানপুরে যদি চমৎকার বার্ড স্যাংচুয়ারী গড়ে উঠতে পারে, এই রাজ্যেই বা কেন গড়া যাবে না? পশ্চিম বাংলায় বা হরিয়ানার কাল তিতিরের (black Patridge) র মত বাংলার কেন নিজস্ব পাখিকে রাষ্ট্রীয় পাখি bird) (State র মর্যাদা কেন দেওয়া হবে না? পশ্চিমবঙ্গের জনগণের বিহঙ্গপ্রেমিক বলে খ্যাতি আছে। কিছু দৃষ্টান্ত আমরা দিয়েছি, পরিশেষে আর একটা উদাহরণ দেবো।

দেখা গেছে যেখানেই একটু সংরক্ষণের চেষ্টা করা গেছে, সেখানেই সে প্রয়াস সফল হয়েছে। এই রাজ্যে তিনটি মৃগদাবে প্রচুর পাখি আসে। বল্লভপুরের কৃষ্ণসার মৃগদাবে দেশী বিদেশী হাঁসের সমাগম হয়। পাড়মাদন ও বেথুয়াডহরির মৃগদাবে ও অন্যান্য দেশী বিদেশী যাযাবর পাখি দেখা যায়।

আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি হুগলি জেলার পোলবা-দাদপুর ব্লকের রাজহাটির ময়ূরের উপনিবেশটি সম্বন্ধে কিছু না বলি। কয়েক দশক ধরে ময়ূরের দল রাজহাটির উত্তরপাড়ায় নীলমণি চক্রবর্তীর পড়ো ভিটেয় আশ্রয় নিয়েছে। ভাঙ্গাচোরা দালানের কুঠরিতে কয়েক যুগ ধরে ময়ূরগুলি বাস করছে; আশপাশের বাঁশবন ও সিমুল গাছও ওদের আশ্রয়স্থল। গ্রামবাসীদের হিসাব অনুযায়ী ওখানে প্রায় ৫০-৬০টি ময়ূর আছে। বিহঙ্গপ্রেমিক গ্রামবাসী কঠোরভাবে জাতীয় পাখিকে সংরক্ষণ করে আসছেন। স্থানীয় অঞ্চল পঞ্চায়েতের সচীব আক্ষেপ করে জানালেন যে চোরাগুপ্তা শিকারে দুচারটে ময়ূর প্রায়ই মারা পড়ে। তিনি সরকারী উদ্যোগে সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করার দাবী জানান। জাতীয় পাখির এই কদর নিঃসন্দেহে তাঁদের বিহঙ্গপ্রীতিরই নিদর্শন।

ময়ূরের বসবাস শুধু রাজহাটি অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মাইলখানেক এলাকার মধ্যে ওদের চলাফেরা। উত্তরে সরস্বতী নদীর কিনার পর্যন্ত ওদের বিচরণভূমি। তবে ওদের কেকাধ্বনি সাঁঝ সকালে দেবানন্দপুরের আমবাগানে, পটুস ঝোপে বা আসামলতার জঙ্গলে শোনা যায়। কখনো সখনো সরস্বতী নদীর ধারে ভাদ্রের মেঘলা দুপুরে পেখম মেলে ওদের সঙ্গিনীর মনোহরণ করতে দেখা যায়।

পশ্চিম বাংলায় সম্ভাবনাময় বার্ড স্যাংচুয়ারী গড়ার প্রচেষ্টা সরকারীভাবে হওয়া উচিত। পর্যটন দফতর ও বনবিভাগের যৌথ উদ্যোগে কয়েকটি পাখির অভয়ারণ্য গড়ে তুললে পর্যটনশিল্পের যেমন উন্নতি হবে, বৈদেশিক মুদ্রারও আমদানী বাড়বে। বাদার নোনামাটির অরণ্যে কি রাঢ় অঞ্চলের গৈরিক মাটিতে কি ডুয়ার্স ও তরাই এর বনভূমিতে সব জায়গাতেই এই ধরনের পাখিরালয় গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। একটু উদ্যোগী হয়ে আমরা কি সে সুযোগ গ্রহণ করবো না? বাংলার বিহঙ্গপ্রেমিকদের সে আকাঙ্ক্ষা কবে পূরণ হবে?

বউকথাকও

শালিক

বাংলার লুপ্তপ্রায় পাখি

অজয় হোম
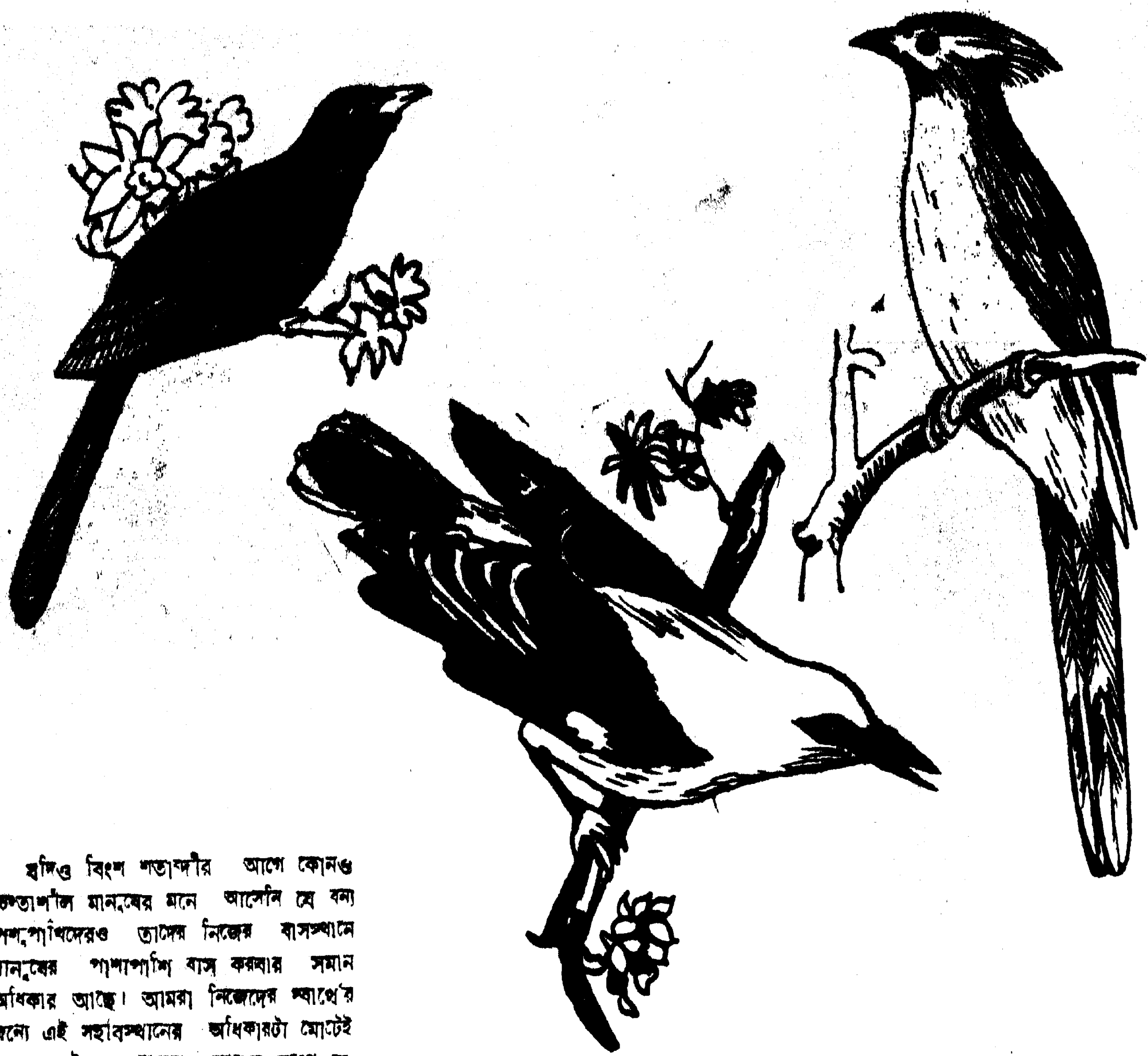
যদিও বিংশ শতাব্দীর আগে কোনও চিন্তাশীল মানুষের মনে আসেনি যে বন্য পশুপাখিদেরও তাদের নিজের বাসস্থানে মানুষের পাশাপাশি বাস করবার সমান অধিকার আছে। আমরা নিজেদের স্বার্থের জন্যে এই সহাবস্থানের অধিকারটা মোটেই মানতে চাই না। আমরা তাদের সংগে যে যথেচ্ছাচার ব্যবহার করতে পারি না এই জ্ঞানটুকু অর্জন করার নিতান্ত প্রয়োজন। ভারত সরকার বর্তমানে স্বল্পমাত্রায় সচেতন হয়ে কিছু বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করছেন বটে কিন্তু তার সংগে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা না থাকলে পশুপক্ষী সংরক্ষণ অসম্ভব।

যথেচ্ছাচার বলতে শুধু অযথা বন্দুক দেগে বা বিষপ্রয়োগে হত্যার কথা বলছি না বলছি বাঁধ ও নানাবিধ প্রকল্পের কথাও। সেখানেও চিন্তা করা হচ্ছে না সেখানকার বন্যপ্রাণীদের অবস্থার কথা। এই সব প্রকল্পের স্থান নির্বাচন করা উচিত জীব-বৃত্তান্তবিদ এবং পরিবেশ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁদের বিশেষ জ্ঞান আছে তাঁদের সংগে পরামর্শ করে। সেই সংগে সাধারণ মানুষকেও পশুপাখি সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয় করতে হবে না হলে সেইসব প্রাণীদের আমরা চিরকালের মতো হারাব। ইতিমধ্যে বহু পাখির চিহ্নমাত্র নেই আমাদের এই পশ্চিমবাংলায়।

কলকাতার উপকণ্ঠে ছিল প্রকৃতির সৃষ্টি জলার পাখির দিগন্তব্যাপী এক অপূর্ব আবাসস্থল ও বিচরণভূমি। স্থানীয় পাখি ছাড়াও কত সহস্র সহস্র পাখি প্রতি বছর পরিযায়ী হয়ে যে আসত তার আর ইয়ত্তা নেই। আসতে শুরু করত অকটোবরের শেষে। শেষ পাখির দল যেত মার্চের শেষে। ওটা কিন্তু অভয়ারণ্য বা সাংচুয়ারি ছিল না তাই হাজার হাজার পাখি মারা পড়ত পাখি শিকারীদের হাতে নানাভাবে। তবু তারা আসত সুদূর উত্তর মেরু স্ক্যান্ডি-নেভিয়ায় শুরু করে বৈকাল হ্রদের তীর থেকে। আসতে তাদের হতোই। তাদের উপ-যোগী এমন আবাসস্থল পশ্চিমবংগে আর তো বিশেষ ধারে কাছে ছিল না এক সুন্দরবনের খাল-বিল নদী ছাড়া। পাখিদের এই আবাসস্থলের নাম ছিল—বাদা লবণহ্রদ বা সল্টলেক।

এই বাদা বা লবণহ্রদ আমায় আকর্ষণ করত অদ্ভুতভাবে। শরতের শুরু থেকে গ্রীষ্মের আগে পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতাম পিকনিক করতাম শিকার করতাম। শিকার করলেও কোনোদিনই প্রয়োজনের অতিরিক্ত হত্যা করিনি। আটটির বেশী গুলি কখনও সংগে নিইনি। সূর্য ওঠার আগে যেতাম ফিরতাম কখনও বেলা একটা দুটোয় কখনওবা সন্ধ্যের পর। পরিযায়ী হয়ে আসা অতিথি পাখির দল থেকে স্থানীয় পাখির আচার-ব্যবহার সব লক্ষ্য করতাম। অপূর্ব পরিবেশে অপূর্ব সম্পদে ভরা ছিল এই বাদা। প্রায় বাইশ বছর পরে এই বাদায় ঘুরেছি।

তারপর একদিন শুনলাম এই বাদা আর রাখা হবে না কলকাতার জনসংখ্যাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। শুরু হয়ে গেল গংগা থেকে পলিমাটি এনে ভরাট করার কাজ।

কখনও কেউ জানল না এইসব পাখিরা কোথায় যাবে। তাদেরও তো থাকবার সমান অধিকার আছে। অন্তত আধখানা ছেড়ে দিলেও তারা থাকতে পারত বেশ। মহাকরণে তদানীন্তন শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদনও করেছিলাম কিন্তু তা হয়েছিল অরণ্যে রোদন।

বড়ো শেষে আরম্ভ করেছিলাম হর্মোন-গ্রন্থির স্ফীতির কমাবাড়ার উপর পরিযায়ী চওয়ার কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে কিনা তা নির্ণয় করা। এক বছরেই সেই কাজ শেষ হয়ে গেল সেইসব লুন্দুরের অতিথি পাখিদের আর পেলাম না। আমার সেই কাজ অসমাপ্ত হয়েই রয়ে গেল।

এখন কিছু পশ্চিমবাংলার পাখির পরিচয় দেব যারা লুপ্তপ্রায় পর্যায়ে পৌঁছেছে। একটি দুটি তো লুপ্ত বলেই মনে করি কারণ তারপর থেকে সেই পাখি-দের আর দেখিনি আর কেউ দেখেছে কিনা জানি নে।
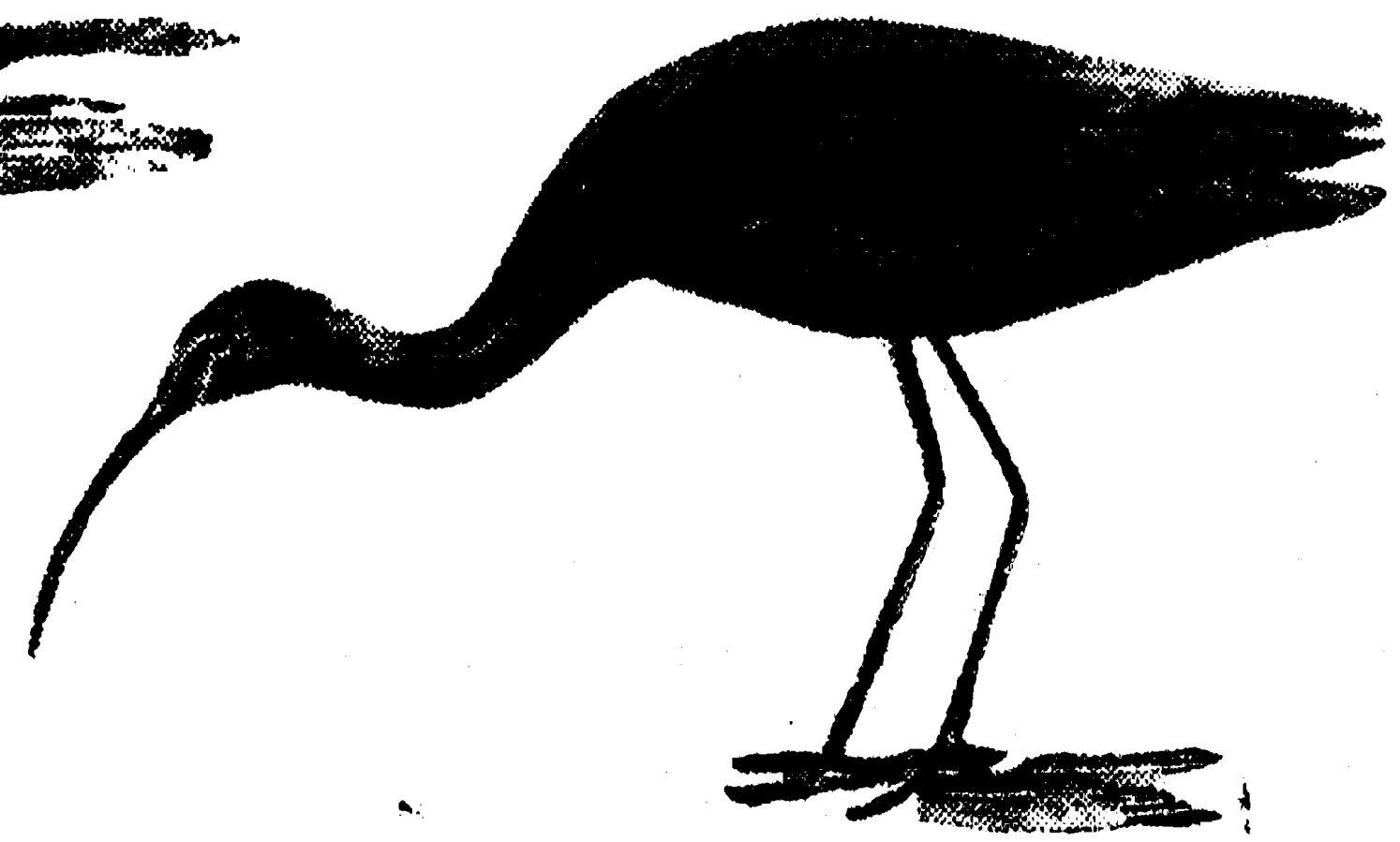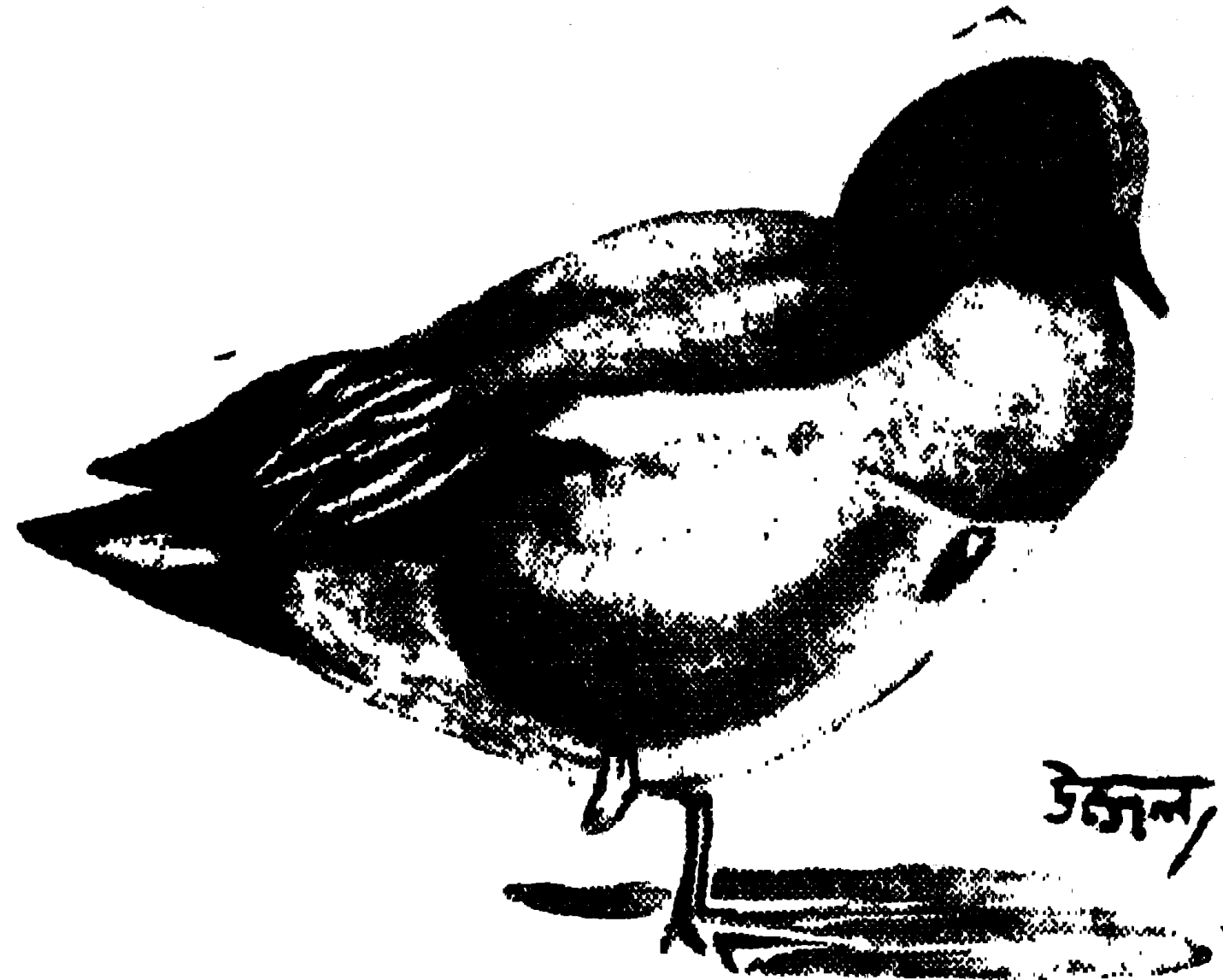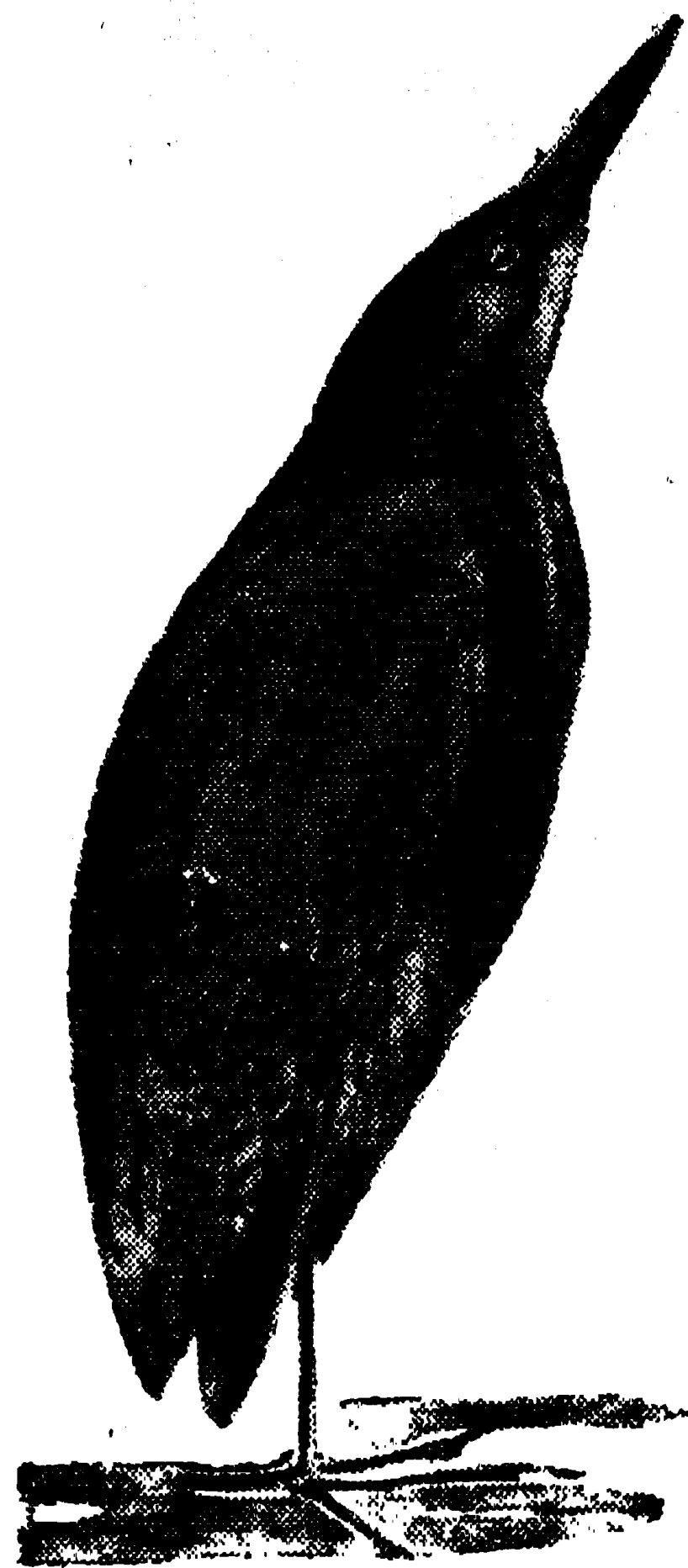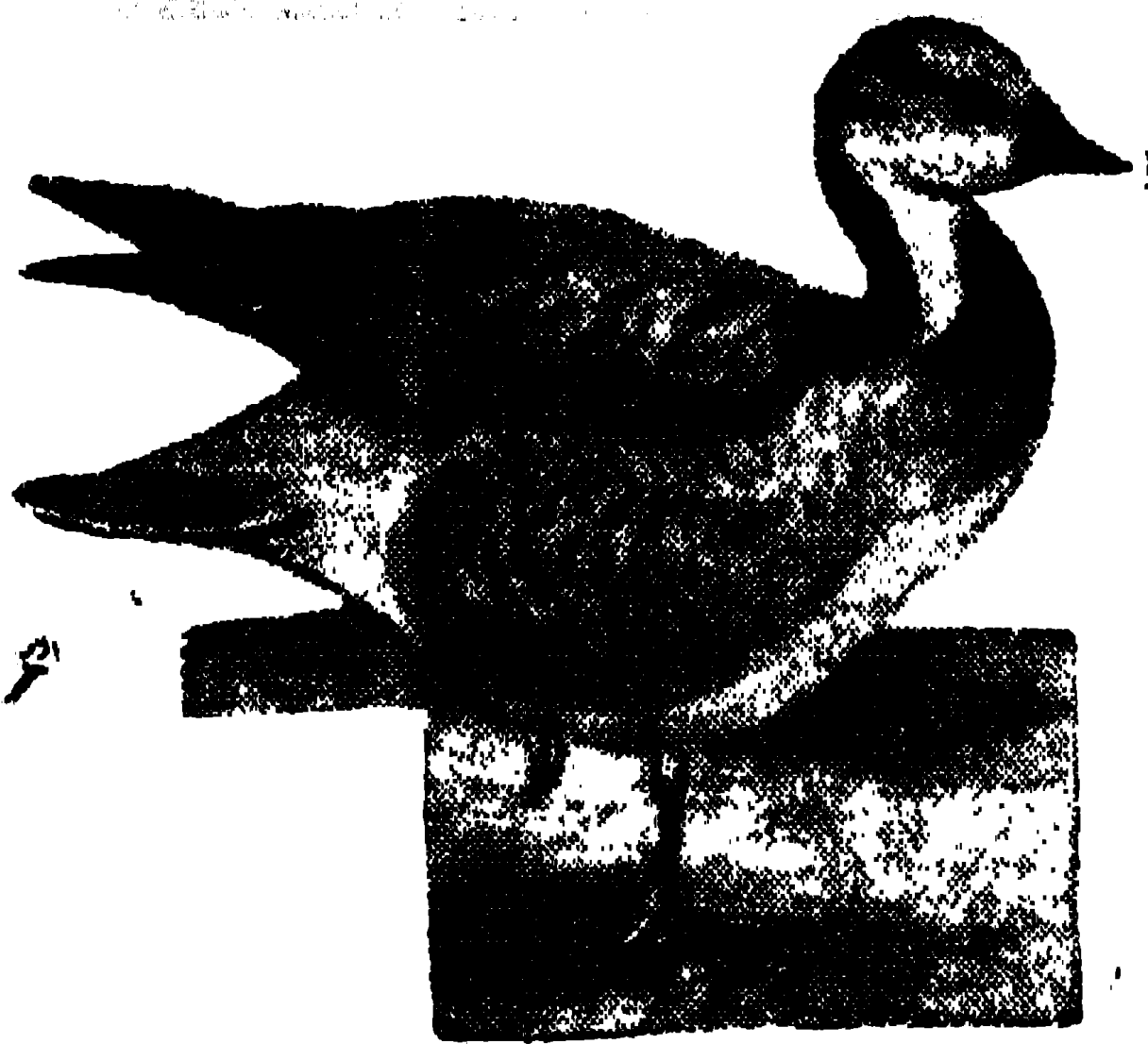
গগনভেড়

গগনভেড়কে কোথাও কোথাও গগন-বেড়ও বলে। মোটাসোটা হাঁসের চেয়েও বড়ো পাখি। লম্বায় ৭২ ইঞ্চি। লম্বার অনুপাতে উচ্চতা কম। হাঁসের মতো পা। চারটি আঙুলই জাল দিয়ে সংযুক্ত। সাদা পালক কেবল বাইরের পালকগুলি কালো। এই কালো পালক দেখে অন্য প্রজাতি থেকে যে এরা আলাদা তা বোঝা সহজ। পা ও পায়ের পাতা গাঢ় ধূসর অন্যান্য প্রজাতির কিন্তু গোলাপী। ডানার তলা ময়লাটে সাদা। চঞ্চু খুব লম্বা এবং নিচের চঞ্চুর তলায় গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একটা বড়ো থলি। চঞ্চুর থলি মাছ ধরে রাখবার জন্যে। থলি ভরে উঠলে অবসরমতো গিলে খায় এবং ছানাদের খাওয়ায়। লেজ ছোটো, আগার দিক গোলাকার। পাখা চওড়া কিন্তু খুব বড়ো নয়। গলা লম্বা সবটাই পালকে ঢাকা। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। বাচ্চাদের উপরটা বাদামী-ধূসর তলা সাদা থলি ধূসরাভ।

বাসস্থান—দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এশিয়া মাইনর ইরান উত্তর চীন মঙ্গোলিয়া। শীতে পরিযায়ী হয় উত্তর আফ্রিকা বেলুচিস্থান সিন্ধু বাংলাদেশে ভারতে পাঞ্জাব কচ্ছ সৌরাষ্ট্র গুজরাট উত্তরপ্রদেশ বিহার ওড়িশা পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে।

আর একটি গগনভেড় লম্বায় ৬০ ইঞ্চি। চঞ্চু লম্বায় প্রায় ১৩ ইঞ্চি লেজ ৭ ইঞ্চি ডানা ২২ ইঞ্চি চঞ্চুর রং মাংসের মতো এবং তার প্রত্যেক পাশে এক সারি নীলাভ কালো বিন্দু।

বাসস্থান—সমগ্র ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ এবং সিংহল। বাসা বানায় সিংহলে মাদ্রাজের তিরুনেলভেলি ও চিংগলেপুট জেলায় অন্ধ্রে গোদাবরী জেলায় এবং আসামে কাজিরাংগা অভয়ারণ্যে।

এই দুই প্রজাতির পাখিকে পশ্চিমবঙ্গে খুবই দেখা যেত। ১৯৩৭—৩৮ সালে বাদায় ও সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখেছি। বাংলাদেশের অন্তর্গত খুলনা জেলার সুন্দরবন অংশে দেখেছি খুব বেশি। আমাদের সজনেখালিতেও দেখেছি। অনুকূল পরিবেশের অভাবে আর দেখা যায় না বলেই মনে হয়।

কখনও দেখেছি একা কখনও যুগলে আবার সময় সময় অল্পবিস্তর দল বেঁধে বিচরণ করতে। জলে বা ডাঙায় চলাফেরা দেখতে বিশেষ সুন্দর না হলেও আকাশে ওড়ার সময় এদের হালকা ও ললিত উৎপতনভঙ্গি সত্যিই বড়ো সুন্দর। বাতাসের সঙ্গে ডানার সংঘর্ষণে একরকমের শ্রুতিমধুর শব্দ শোনা যায়। মাছ এদের প্রধান খাদ্য। মাঝে মাঝে কিছু ব্যাঙ এবং সরীসৃপও খায়। মাছ ধরার পদ্ধতি খুব সুন্দর। জলে ডুবে মাছ ধরে না। ডানা দিয়ে তাড়িয়ে মাছকে অগভীর জলে নিয়ে গিয়ে চঞ্চুর সাহায্যে ধরে গলাধঃকরণ করে। এসময় চঞ্চু হাঁ-করে নিচের চঞ্চুর থলিটিতে মেড়ো জালের কাজ করায়। দল বেঁধে থাকলে অর্ধচন্দ্রাকারে সারি বেঁধে ডানা নাড়িয়ে তাড়াতে তাড়াতে গভীর জল থেকে মাছকে অগভীর জলে নিয়ে যায়। স্বভাবত নীরব কেবল সাঁতার কাটবার সময় মাঝে মাঝে গলা দিয়ে একরকমের গম্ভীর শব্দ করে।

গগনভেড়ের মাংস আহারযোগ্য, চর্বি বাতের ওষুধরূপে ব্যবহার হয়।

কাঁক

সংস্কৃতে কংক। বাংলায় কাঁক, সাদা কাঁক অঞ্জন। লম্বায় প্রায় ৩১ ইঞ্চি চঞ্চু ৫ ইঞ্চি ডানা প্রায় ১৮ ইঞ্চি। মাথা গলা বুক ও পেটের মধ্যাংশ এবং লেজের নিচের ছোটো পালক-গুলি সাদা। মাথা বুক ও পেটের দু পাশ কালো গলায় কালো ডোরা এবং টিকিগুচ্ছ ঝুঁটিটি কালো। দেহের বাকি অংশ মোটের উপর হালকা ধূসর। কনীনিকা ও চঞ্চু হলদে পা হলদেটে-বাদামী। স্ত্রীপাখি প্রায় একই রকম দেখতে কেবল আকারে ছোট ঝুঁটিও ছোট।

বাসস্থান—মধ্যপ্রাচ্য পাকিস্তান ব্রহ্মদেশ থাইল্যাণ্ড ইন্দোচীন মালয়েশিয়া পূর্ব সাইবেরিয়া পূর্ব চীন জাপান ফরমোসা এবং হাইনান বাংলাদেশ এবং সমগ্র ভারতে।

সাদা কাঁক সাধারণত একা অথবা যুগলে বিচরণ করে। প্রজননকালেও দলবদ্ধ হতে দেখা যায় না। এসময়ে একই জায়গায় বিভিন্ন জাতীয় বক পানকৌড়ি ইত্যাদি পাখির সঙ্গে কয়েক জোড়া সাদা কাঁক দেখা গেলেও তাদের পাশাপাশি বাসা বাঁধতে দেখি না। এদের বাসা পরস্পরের কাছ থেকে বেশ দূরে দূরে থাকে। বিশ্রামের সময় গাছের উপর কোনো নেড়া ডালে গলা ও চঞ্চু সোজা শূন্যে মুখ করে নিস্পন্দে বসে থাকাটাই এদের স্বভাব। তখন বড়ো মজার দেখায়।

সাদা কাঁককে বাদায় প্রচুর দেখা যেত। ভরাট হবার সময় থেকেই এদের দেখতে পাই কম। বর্তমানে এদের পশ্চিমবঙ্গে অন্যত্র কম দেখতে পাই।

বরং অপর প্রজাতি—লাল কাঁক পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। তাও কমে আসছে পরিবেশ না থাকাতে। লম্বায় প্রায় সাড়ে ৩ ফুট চঞ্চু সওয়া পাঁচ ইঞ্চি ডানা সাড়ে ১৫ ইঞ্চি। মাথার দুদিকে কতকটা জায়গা পালকহীন। মাথায় টিকি। এই টিকি বা ঝুঁটি সরু ও লম্বা। মাথার শিখা ও পেট কালো ডানা [illegible] ও পিঠ ধূসর; দেহের বাকি অংশ [illegible] উপর রক্তকপিশ। কনীনিকা ও চঞ্চু হলদে মাথার নগ্নস্থান হলদেটে-সবুজ পা রক্তাভ পিঙ্গল।

লাল কাঁক

ঘন শরবনে বা তার আশেপাশে থাকতে বেশি পছন্দ করে। কখনও কখনও গাছের উপরও বসে থাকে। অসম্ভব কৌতূহলী; শরবনের মধ্যে অথবা গাছের ডালে বসে থাকার সময় লম্বা গলা বাড়িয়ে চারিদিক দেখে। গাছপালার মধ্যে এদের দেহ লুকানো আর লম্বা গলাটি যখন দৃষ্টিপথে পড়ে তখন হঠাৎ সাপ বলে মনে হয়। একবার তো বাদায় শরবনের মধ্যে ওভাবে গলা বাড়াতে দেখে ভয়ই পেয়েছিলাম।

সব কাঁকেরই খাদ্য মাছ ব্যাঙ কীট-পতঙ্গ নেংটি ইঁদুর ইত্যাদি। সুবিধে পেলে ছোট ছোট পাখি ধরতে মোটেও দ্বিধা করে না

বাচ্চাদের বড়সড় করে গড়ে তুলুন ইনক্রিমিন* দিয়ে

ছেলেবেলার দিন—
হেসে খেলে ঠিকমত বেড়ে
ওঠার দিন। এই সময়ে ওকে
ইনক্রিমিন সিরাপ নিশ্চয়ই
দেবেন। তারপর দেখবেন ওর
খাওয়ার আগ্রহ! খাওয়া নিয়ে জ্বালাতন
তো দূরের কথা, খিদে বেড়ে গিয়ে যেমন
খুশি হয়ে খাবে তেমনি চটপট বেড়ে উঠবে!
ইনক্রিমিন উপকারী ভিটামিন আর আয়রনে
ভরপুর তো বটেই, তার চেয়ে বড় কথা—
এতে যে বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড,
লাইসিন আছে—তা আপনার বাচ্চাকে
আহারের পুরো পুষ্টি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

ইনক্রিমিন* টনিক

ড্রপস্ — ২ মাস থেকে ২ বছরের বাচ্চাদের জন্যে
সিরাপ — ১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের বাচ্চাদের জন্যে

বাড়তি আহারকে বাড়তি বৃদ্ধিতে পরিণত করে

ডাক্তারের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম (Lederle) সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি বিভাগ
*আমেরিকার সায়নামিড কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

Sista's INC-362 1/75-Ben

এবং ধরলে সরাসরি গলার মধ্যে চালান করে দেয়। ওড়ার সময় কর্কশ একটা আওয়াজ দেয়। উড়তে উড়তেও মাঝে মাঝে এই ডাক ছাড়ে।

খৈরি

খৈরিকে কোথাও কোথাও লাল বক খয়েরী বক বলে।

লম্বায় ১৫ ইঞ্চি। কোঁচ বক অপেক্ষা আকারে ছোট রোগাটে এবং জ্ঞাতিভাই। ঝাঁকড়া ঝুঁটি সমেত মাথা কপিশ-বাদামী ডানার পালক কপিশ। চিবুক গলা সাদাটে তার উপর লম্বা লম্বা টান নেমে এসেছে বুকের উপর দিয়ে। বুকের দু পাশে ডানার পালক কালো এবং হালকা কপিশের ছোপ। বাকি তলার পালক মলিন কপিশ। ডানার তলা হালকা কপিশ তার উপর গোলাপী আভা। কনীনিকা হলদে কমলা বা গোলাপী লাল। চঞ্চু সবজেটে-হলদে বা হালকা কমলা-হলুদ। পা সবজেটে হলদে।

বাসস্থান—পাকিস্তান ব্রহ্মদেশ থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া ফিলিপাইন সানডা ও সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জ; চীনদেশে মাঞ্চুরিয়া থেকে হাই-নান রাইয়ুকিয়ু দ্বীপপুঞ্জ। ভারতের সর্বত্র বাংলাদেশ সিংহল আন্দামান নিকোবর ও মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জে। সর্বত্রই নির্ভর করে জলার অবস্থার উপর।

খৈরি একা একাই বিচরণ করে। দিনের বেলা বিশেষত মেঘলা দিনে এক নলখাগড়ার ঝোপ থেকে আর এক ঝোপে যেতে দেখা যায় বেশি। মাছ ব্যাঙ কবচী ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গ অসম্ভব খেতে পারে। সাধারণত চুপচাপ থাকে। বসন্তকালে ডাক দেয় কোক-কোক - এক - এক - এক - এক - গুক - গুক-গুক।

বাদা বা অন্যান্য জলায় আগে খুব দেখা যেত। এখন পশ্চিমবঙ্গে আর বিশেষ দেখা যায় না। গত তিন বছরে একটি দেখেছি।

কাচিরা তোরা

কাচিরা তোরা অন্যান্য সাদা দোচরা বা কালো দোচরা অপেক্ষা দেখতে অনেক সুন্দর।

কাচিরা তোরা লম্বায় ২৫ ইঞ্চি। মুখের কতকটা জায়গা ছাড়া বাকি মাথা পালকে ঢাকা। মাথা চিবুক রক্তনীল ও সবুজ আভাযুক্ত। পিঠের উপর দিক বাদামী নিম্নাংশ ও পিছন দিক রক্তনীলাভ পিঙ্গল। সবই ধাতব দ্যুতিপূর্ণ। ডানার মাঝখান বেগুনী ও অন্যান্য অংশ সবুজ। লেজ সবুজ ও বেগুনী দ্যুতিযুক্ত কালো। প্রজননকালে মাথা ঘাড় ও কাঁধের রঙে কিছু তারতম্য দেখা যায়। জঙ্ঘা পিঙ্গল সীসেপিঙ্গল চঞ্চু লম্বায় প্রায় সাড়ে ৫ ইঞ্চি ডানা ১০-১১ ইঞ্চি লেজ প্রায় ৪ ইঞ্চি। পা ও লম্বা সরু আঙুল কাঁসাভাপিঙ্গল। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

বাসস্থান—দক্ষিণ ইউরোপ ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল মধ্যপ্রাচ্য বেলুচিস্তান তুর্কিস্তান আফগানিস্তান পাকিস্তান বাংলাদেশ ব্রহ্মদেশ আফ্রিকা মাদাগাসকার ও দক্ষিণ আমেরিকা। ভারতে উত্তরপ্রদেশ নেপাল গাঙ্গেয় উপত্যকা মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান কচ্ছ গুজরাট ওড়িশা পশ্চিমবঙ্গ আসাম ও মণিপুরে।

কাচিরা তোরাকে দেখা যায় বড়ো ঝিলে জলাভূমিতে এবং নদীর চরে। বেশ কয়েক বছর আমার দৃষ্টিপথে পড়ছে না। সম্ভাব্য জায়গায় দূরেও দেখতে পাচ্ছি নে। অথচ আগে কত দেখেছি। সাধারণত এরা দলে থাকে। এক-একটা বড়ো দল প্রায় ৪০-৫০-এর হয়। পেট পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে বিচরণ করে। কখনও কখনও মাথাও ডুবিয়ে দেয়। ঝাঁকে ওড়ার সময় ইংরেজি 'ভি' আকারে ওড়ে। গাছের উপর রাত্রিবাস। প্রজননকালে পুরুষ প্রায় ভেড়ার মতো এক ডাক দিতে থাকে কখনও বা কাকের মতো গলার ভিতর আওয়াজ করে।

রাজ হাঁস

রাজ হাঁসকে কোথাও বা কদুহাঁস, জোড়াশির রাজহাঁস বলে।

লম্বায় প্রায় ৩০ ইঞ্চি। সাদা মাথার উপর এক চোখ থেকে অপর চোখ পর্যন্ত একটি চওড়া কালো ডোরা ঠিক সেরকম আর একটি অল্প ছোট ডোরা প্রথম ডোরার নিচে ঘাড়ের উপর। ঘাড়ের পাশে একটি সাদা রেখা তার পিছনের অন্যান্য অংশ পিঙ্গল। গলার সামনে ধূসরাভ পিঙ্গল বুক ধূসর বুকের দুপাশ পিঙ্গল তলার বাকি পালক সাদা। ডানার মাঝের কয়েকটা পালক গাঢ় পিঙ্গল বাকি সমস্ত পিঠ মোটের উপর ধূসর। কনীনিকা পিঙ্গল চঞ্চু হলদে নাক ও চঞ্চুর অগ্রভাগ কালো। পা গাঢ় হলুদ।

বাসস্থান—লাডাক মধ্য এশিয়ার তিয়েন-শান থেকে কোকনর। শীতে পরিযায়ী হয় পাকিস্তান কাশ্মীর পাঞ্জাব রাজস্থান নেপাল তরাই সমেত গাঙ্গেয় উপত্যকা আসাম বাংলাদেশ ওড়িশা পশ্চিমবঙ্গে।

খাদ্য—সর্বভুক। শস্য কচি আগাছা ধানের ডগা গেঁড়িগুগলি ইত্যাদি কবচী জলজ কীট সরীসৃপ প্রভৃতি। শোনা যায় শকুনদের সঙ্গে মিলে মরা পচা মাংসও নাকি খায়।

একসময় বাদায় ও অন্যান্য জলাভূমিতে ছোট দলে দেখা যেত। ১৯৪০ সালের পর আর দেখিনি। শেষ দেখেছি গঙ্গার তীরে মণিহারীঘাটে আসাম যাবার পথে। ওড়িশার চিল্কা হ্রদে ও বৈতরণী নদীর মোহনাতেও দেখেছি। ডাকে জোরে নাকিসুরে আ-ংগ আ-ংগ।

দিগ হাঁস

দিগ হাঁসকে কোথাও শোলণা বা বড়ো দিঘর বলে।

লম্বায় ২২ থেকে ২৯ ইঞ্চি। চেহারা লম্বা ছাঁদের। পুরুষ পাখির মাথা পিঙ্গল ও অল্পাধিকতর উজ্জ্বল বেগুনী আভাযুক্ত; গলার দুদিকে একটা সাদা রেখা কানের কাছ থেকে ক্রমে চওড়া হয়ে বুকের সাদার সঙ্গে মিশেছে; পিঠ মোটের উপর ধূসর সাদা ও কালো রঙের ঢেউ খেলানো রেখা। ডানার কয়েকটা জায়গা মলিন ... সবুজ বাকি মোটের উপর পিঙ্গল ধূসর। ডানা লম্বা ও সূঁচাল শেষ পর্বের প্রথম বড়ো পালকটি সবচেয়ে বড়ো। লেজের মাঝের কয়েকটি পালক কালো দু পাশের বাকি পালক ধূসরাভ পিঙ্গল। লেজের নিচের ছোট পালকগুলি কালো তার পাশে দেহের দুদিকে অল্পমাত্রায় হলুদ চিহ্ন। লেজের বড়ো পালক সাধারণত ১৬টা তার মাঝের দুটি পালক সরু সূঁচাল এবং অন্যান্য পালক অপেক্ষা অনেক লম্বা। চঞ্চুর মূলদেশ কতকটা উঁচু সর্বত্র প্রায় সমানভাবে চওড়া কনীনিকা গাঢ় পিঙ্গল চঞ্চু ও পা সীসে রঙের। ওড়বার সময় লম্বা ছাঁদের আকৃতি সাদা বুক ও গলা কালো তলপেট লেজের সরু ও লম্বা পালক দুটো দেখে সহজেই দিগ হাঁসকে চেনা যায়।

বাসস্থান—ইউরোপ এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশ। শীতে পরিযায়ী হয়

গয়ার
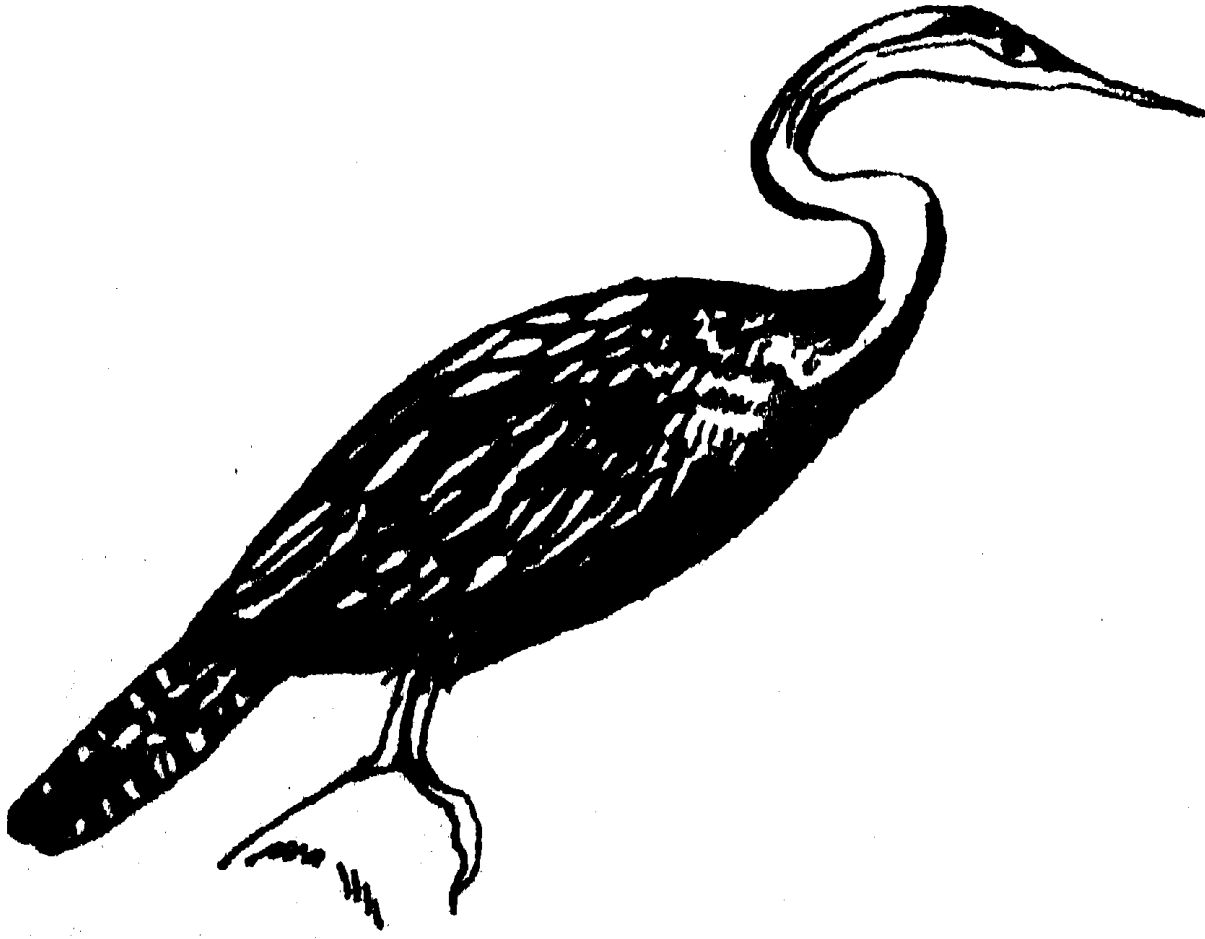
উত্তরে আফ্রিকা নীল নদের তীরবর্তী স্থান-সমূহ ইথিওপিয়া পারস্য উপসাগর পাকিস্তান সমগ্র ভারত বাংলাদেশ সিংহল ব্রহ্মদেশ সিয়াম ও দক্ষিণ চীনে।

খাদ্য—প্রধানত সবজি যথা—ঘাস আগাছার কচি ডগা জলজগাছের বীজ ধান। কিছুটা কবচী জলজ কীটপতঙ্গ ও তাদের ...ক।

দিগ হাঁসকে বাদায় দেখা যেত নভেম্বর থেকে মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। একটু বড়ো জলাশয় হলেই দিগ হাঁসরা আড্ডা ...ড়ে। খানিকটা খোলা ও চওড়া জলাশয় ...ছন্দ বিশেষত যার ধারে ধারে যথেষ্ট ...লখাগড়া প্রভৃতি আগাছা এবং ভিতরে বেশ ...চ্ছ, ভাসমান ঘাসের বা জলজগুল্মাদির ...পড়া থাকে। সকাল-সন্ধ্যায় এরূপ জলা-...য়ের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যেতে দেখা ...য়। এক-একটি ঝাঁক ২০-২৫ থেকে ...াধিকের হয়। ওড়ে ইংরেজি ভি-র আকারে ...িংবা অল্পবিস্তর সরলরেখায় ঘন সারি ...ঁধে। খুব সতর্ক। দিনের বেলায় সাধারণত ...লের ধার থেকে অনেক দূরে মাঝ বরাবর ...চরণ করে। একবার বিরক্ত হলে সেই আশ্রয় ...ড়ে বেশ দূরে অন্য কোনো জলাশয়ে আশ্রয় ...য়। সেজন্যে এদের শিকার করতে রীতি-...তো বেগ পেতে হয়। খেতে সুস্বাদু। ...দায় এদের প্রচুর দেখা যেত। এখন খুব ...ল্প দেখতে পাই। জলাশয় প্রায় শেষ ...য় আসছে মানুষের চাহিদা বাড়ায়। ...তরাং দিগ হাঁসের দেখা পাওয়া হয়েছে ...র।

পাইং হাঁস

পাইং হাঁসকে হিন্দীতে বলে ভুখার ...।

লম্বায় ২০ ইঞ্চি। পুরুষ পাখির গায়ের মাটামাটি পিঙ্গল পেট সাদা তলপেট ...লেজের তলার ছোট পালকগুলি কালো। ...র কয়েকটা জায়গা উজ্জ্বল কালো ও প্রায় সমস্ত দেহে আধখানা চাঁদের আকারে সাদা রেখা আঁকা। স্ত্রীপাখির রঙে কিছু তফাৎ আছে। প্রধান প্রভেদ এদের অর্ধচন্দ্রাকার রেখাগুলি হলদে বা হলদেটে লাল। পুরুষপাখির চঞ্চু কালচে-পিঙ্গল নিচের ওষ্ঠের রং কতকটা হলদে: স্ত্রীপাখির চঞ্চু সর্বত্র হলদেটে। চঞ্চু লম্বায় প্রায় মাথার সমান প্রায় সর্বত্র সমানভাবে চওড়া আগার দিকে অল্প সরু ওষ্ঠলতিকা বাইরে বেরনো ও অত্যন্ত কোমল। লেজের বড়ো পালক ১৬টা। উভয়ের পা, হলদে এবং নখর কালো।

বাসস্থান—ইউরোপ এশিয়া এবং পশ্চিম উত্তরে আমেরিকা। বাসা বাঁধে আইসল্যাণ্ড থেকে কামচাটকা দক্ষিণে ইংল্যান্ড হল্যান্ড জার্মান মধ্য রাশিয়া কাসপিয়ান সেইস্তান ট্রান্সবৈকালিয়া। পরিযায়ী হয় উত্তর আফ্রিকা ইথিওপিয়া দক্ষিণ চীন পাকিস্তান নেপাল ভারতের সর্বত্র বাংলাদেশে। দক্ষিণ ভারতে দেখা যায় খুব কম।

খাদ্য—প্রধানত বীজ ছোট আগাছার ডগা জলজ উদ্ভিদ ধান। মাঝে মাঝে পোকা-মাকড় গেঁড়ি-গুগলি ইত্যাদি।

সাধারণত নভেম্বরের প্রথম থেকে ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্যন্ত সর্বত্র অনুকূল খালে বিলে এদের দেখা যায়। এদেশে আসবার পর প্রথম দু মাস মুখ্যত ধান খায়। এসময় এদের মাংস অতি সুস্বাদু। অন্য সময় আঁশটে গন্ধ থাকে। মাংস গরম জলে ধুয়ে নিলে এই আঁশটে গন্ধটাও কম যায়। সাধারণত ১০ থেকে ৩০শের দলে থাকে। চলে ফিরে খাদ্য গ্রহণ করে। জলাশয়ের নিকটবর্তী ধানখেতই এদের পছন্দ। অল্প জলে পিছন উলটে কাদার মধ্যেও খাদ্য খোঁজে। কখনওবা জলের মধ্যে ডুব দিয়ে। আহত হয়ে ধরা পড়বার উপক্রম হলে দেখেছি ডুব সাঁতার দেবার ক্ষমতা অদ্ভুত। পুরুষের ডাক আস্তে ভাঙা গলায় 'উই' তারপরেই জোরে শিস। হংসীর ডাক অন্যান্য হাঁসের প্যাঁকের চেয়ে মৃদু।

পাইং হাঁসকে আজকাল পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ দেখা যায় না। একসময় প্রচুর দেখা যেত।

ছোটো লালশির

ছোটো লালশির লম্বায় ১৯ ইঞ্চি। পুরুষপাখির কপাল ও তার আশেপাশে কতকটা জায়গা হলদেটে। মাথার অব-শিষ্টাংশ ও গলা মলিন বাদামী। ডানার কিছুটা সূচিক্কণ সবুজ তার দু দিক কালো, বাকি কিছুটা জায়গায় সাদার ভাব পরিস্ফুট। পিঠ মোটের উপর ধূসর এবং জায়গা বিশেষে সাদা অথবা কালচে-পিঙ্গল রেখা। বুকের উপর দিক ও পাশের কিছুটা লাল বাকি তলা সাদা লেজের তলার ছোটো পালকগুলি কালো। কালচে-নীল চঞ্চু লম্বায় সওয়া ইঞ্চি, মাথা থেকে ছোটো প্রায় সমান চওড়া কেবল গোড়াটা অল্প সরু। গোড়ার কাছে নখের মতো উপাঙ্গটি চঞ্চুর আয়-তনের অনুপাতে বড়ো, চঞ্চুর ডগা কালো। লেজ ছোটো কীলকাকার এবং বড়ো পালক ১৪টা। কনীনিকা পিঙ্গল। পা সীসের উপর সবুজাভ, নখর কালচে।

বাসস্থান —মেরুপ্রান্ত, আইসল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড থেকে কামচাটকা। শীতে পরিযায়ী হয় ব্রিটেন থেকে দক্ষিণে নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চল, ইথিওপিয়া এশিয়া দক্ষিণ চীন, জাপান পাকিস্তান ভারতের সর্বত্র এবং বাংলাদেশে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা-

দেশে, আসামে, মণিপুরে এবং ওড়িশায় চিল্কা হ্রদে প্রতিবছর আসে না। যখন আসে তখন প্রচুর। যেমন বাদায় দেখলাম ১৯৪১ সালে তারপর ১৯৪৫এ। মাঝের চার বছর একদম আসে নি। ১৯৫০ সালের পর আর দেখিনি।

খাদ্য—প্রধানত শাকসবজি, নানাবিধ বীজ, জলজ উদ্ভিদ ধান। মাঝে মাঝে জল-কীট ও তাদের শূকে, গেঁড়িগুগলি ইত্যাদি।

দলবদ্ধ হয়েই ছোটো লালশির বাস করে। কখনওবা খুব বড়ো ঝাঁকে। সমগোত্রীয় অন্যান্য হাঁস বারা জলের মধ্যে ডুবসাঁতার দিতে পারে না তাদের মতোই ঝিলের ধারে বা ধানক্ষেতের ভিতর চরে বেড়ায়। বিপদাশঙ্কায় জল থেকে উড়ে ওঠে বেশ দ্রুত ভাবে বেলে সরাল বা বিগরি হাঁসেদের মতো অত তাড়াতাড়ি নয়। কিন্তু মুহূর্তে পার হয়ে যায় বন্দুকের সীমানার বাইরে। হাঁস-শিকারীদের কাছে এর মাংস খুব প্রিয়। ডাকে সুমিষ্ট বাঁশির সুরে হুই-উ...। ওড়ার সময় যেমন ডাকে, তেমনি ডাকে মাটিতে বিচরণ বা জলে সন্তরণ কালেও।

শাকনাল

১৯৩৭ সালের ১০ই অকটোবর রবিবার। মানিকতলার মোড় থেকে সবটা পথ হেঁটেই রাত সাড়ে চারটের সময় পৌঁছেছি বেঙ্গল কেমিক্যালের গেট পেরিয়ে খালের খেয়াঘাটের পারানির ঘরে। ওখানে সভ্যসমাজের বসন ছেড়ে নীল বনাতের থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট, মাথায় গামছা, গামছার ভিতর আটটি গুলি ১ থেকে ৪ নম্বর গলায় বাইনোকুলার। সঙ্গীর কাঁধে দোনলা বন্দুক হাতে ঝোলা, হাফপ্যান্টের পকেটে আমার নোটবই। এ বছরের বাদা অভিযানের প্রথম দিন।

খাল পার হয়ে চলেছি। আলোর আভাস পুব দিগন্তে তখনও দেখা যায় নি। সন্তর্পণে চলতে হচ্ছে। ভিজে পথ, অত্যন্ত পিছল। ভারসাম্য হারালেই হয় এপাশের না হয় ওপাশের জলে পড়তে হবে। সেটা মোটেই সুখকর হবে না।

কেষ্টপুরের খালের দিকে পৌঁচেছি। রোদ উঠছে। পরিষ্কার আকাশ। শরতের অমল মহিমা। ...একটা খালের চারপাশ প্রায় বারো চোদ্দ হাত ঘন নলখাগড়ার জঙ্গল। তার ওপাশে কোরার কোক-কোক ডাক শুনেছি। জলে নেমে আস্তে আস্তে নলখাগড়ার দাম সরিয়ে সরিয়ে উন্মুক্ত জলাশয়ের কিনারায় পৌঁছলাম। কোরারা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, ডোমকুর বা দশ্যুরিরা জলে ভেসে বেড়াচ্ছে নিঃশব্দে ডুবুরি, ডুবডুবি বা পানডুবির দল জলে ডুবছে থেকে থেকে, ফতফত করে জল ছুঁয়ে ডানা নেড়ে চলছে, উড়ছে। বাঁদিকে এক লাইনে গোটা চারেক কোরাকে পেয়ে গুলি ছুঁড়ব বলে তাক করছি হঠাৎ একটু দূরে ওদের পিছন থেকে নলখাগড়ার দাম থেকে বেরিয়ে এল একটা হাঁস। মাথাটা উজ্জ্বল গোলাপী। চমকে গেলাম। ঠিক দেখছি তো? বড়ো রাঙামুড়ি বা হেরো হাঁস নয় তো? কিন্তু হেরো হাঁসকে তো গভীর জলে উন্মুক্ত খোলা জায়গায় জলের মাঝখানে দেখা যায়। সবে সকাল হয়েছে বলেই কি পাড়ের কাছে নলখাগড়ার ঝোপের ধারে? হাঁসটা জঙ্গলে ঢুকে গেল। আমি খুব সন্তর্পণে ফিরে এলাম। মুখে আঙুল দিয়ে সঙ্গীকে কথা বলতে বারণ করে বন্দুক রেখে তার কাছ থেকে দূরবীণ নিয়ে আবার সন্তর্পণে ফিরে গেলাম। হাঁসটা আবার এসেছে ঝোপ থেকে জলের কিনারায়। দূরবীণে দেখলাম—মাথা ঘাড় চঞ্চু উজ্জ্বল গোলাপী। লম্বায় ২৩-২৪ ইঞ্চি হবে। চঞ্চু লম্বায় খুব বড়ো মাথার চেয়েও বড়ো। গলা কালো পিঙ্গল, চঞ্চুর প্রান্ত নীলাভ। বাকি দেহ উজ্জ্বল গাঢ় পিঙ্গল, জায়গায় জায়গায় তিলক কাটা। ডানার কিনারায় চওড়া সাদা ডানার মাঝে কতকটা জায়গা উজ্জ্বল হলুদ।

নাঃ! কোনো সন্দেহই নেই। কেতাবি বিদ্যায় আর আবদ্ধ নেই। চোখের উপর দেখছি এক মহা মূল্যবান পাখি। ১০ই অকটোবর ১৯৩৭ সালের তারিখটা লাল অক্ষরের দিন।...দূরবীণটা রেখে বন্দুকটা আনতে ফিরে গেলাম। যদি মারতে পারি তবে ধর্মতলায় এডোয়ার্ডের দোকান থেকে স্টাফ করে রেখে দেব।

বন্দুকটা সঙ্গীর হাত থেকে নিলাম দূরবীণটা দিয়ে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না, উৎসুক হয়ে চোখ নাচিয়ে বারবার জিজ্ঞেস করছে কী? মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকতে বলে আবার ফিরে গেলাম। আমার যাওয়া আসায় কোরারা আমার উপস্থিতি বুঝে ফেলেছে। তারা ঝটপট উড়ে নলখাগড়ার বনে ঢুকে পড়ছে, ডোমকুররাও জলের উপর দিয়ে উড়ে বন্দুকের পাল্লার বাইরে যাচ্ছে, ডুবুরিরা উড়ে চলেছে। নলখাগড়ার বন থেকে উড়ল চারটে হাঁস। ...উত্তেজিত হয়ে বন্দুকের দুটো ঘোড়াই টিপে দিলাম।...জলাতে গেলে আমার মাথার উপর দূরবীর ভাগ করে উড়ে চলে গেল তারা। আমার সঙ্গীও তখন দেখল ... পাখিদের। সে জানে না কী হাঁস। ... বড়ো সুন্দর হাঁস। জিজ্ঞেস করে এত ... পরিবারী হয়ে কি করে এল?

নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে আফশোস হয় কেন নিঃসন্দেহ হতে গেলাম। প্রথম বারেই গুলি করলে নির্ঘাত পেতাম ওটাকে ... প্রমাণ করতে পারতাম ওই পাখি কলকাতার পাশেই ছিল বা এসেছিল। প্রমাণ ছাড়া ... দেখার কোনো মূল্যই নেই।

হাঁসের নাম—শাকনাল, লালশির ... হিন্দী—ডুমার, ডামরার।

বাসস্থান—বর্তমানে খুব সম্ভব লুপ্ত। শেষ দেখেছেন যা রেকর্ড ... আছে, সি এম ইংগলিস ১৯৩৫ সালের ... মাসে বিহারের দ্বারভাঙ্গায়। মনে ... আসামের বাসিন্দা। খুব বেশি দেখা ... নওগাঁ জেলায়, মণিপুর বিহার ও ... ও পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু শীতে দেখা ... লাখনো, পাঞ্জাবের আম্বালা জেলার রূপার ... দিল্লী মধ্যপ্রদেশে মহো মহারাষ্ট্রে আমেদনগর, অন্ধের নেলোর এবং মাদ্রাজের পুলিকাট হ্রদে। ভারতের বাইরে ... পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও জলপাইগুড়ি জেলায় এক সময় প্রচুর দেখা যেত।

খুব বেশি পরিচয় শাকনালের পাওয়া যায় না। এরা লাজুক ও আত্মগোপন... ৬ থেকে ৮ এর দলে বাস ক... যখন প্র... কাল নয়। ৩০-৪০এর ... দেখা ... প্রজননকাল জুন-জুলাই ... স। আমি দেখেছিলাম হয়তো ... দুটি যা নলখাগড়ার বনে আত্মগোপন করে মালদহের এক প্রবীণ শিকারীর শুনেছি, তিনি অনেক শাকনাল ... তাঁর মতে সব জাতীয় হাঁসের মধ্যে ... নালের মাংস শ্রেষ্ঠ। হয়তো সে আজ লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায়।

বাদায় আর একটি হাঁস এইরক... বেশে দেখেছিলাম ২৮শে অকটোবর ... সালে তা হল বড়ো ভূতি হাঁস। এ... লুপ্ত। কয়েকটি লুপ্তপ্রায় ... নাম বলে এই নিবন্ধ শেষ করব। ... ও বাংলাদেশের বড়ো বড়ো নদীর ... এক সময় দেখা যেত—কানঠুটি ... অঞ্চলে শীতের শুরুতে গহপালি... উদ্ভব যার থেকে যে রাজহাঁস চ... বামুনিয়া হাঁস? ঝালি হাঁস।

এদের কি আর দেখতে পাব ন... জন্যে কি পরিবেশ তৈরি করা ... অসম্ভব?

টাঁড়বারো / বুদ্ধদেব গুহ

াকিত রাতে গভীর বনের মধ্যে
ম কাশ আর দুধুলি ফুলফোটা
একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে নীল গাই-এর
র কাটতে বা চিতল হরিণের
াড়ে যেতে দেখতে দেখতে বারে-
হয়েছে 'টাঁড়বারোর' মত কোনো
অস্তিত্ব সত্যিই যদি আমাদের
ন-পাহাড়ে থাকত তবে বোধহয়
দ হত।

ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'
কথা প্রথম পড়বার পর ভারত-
ন-পাহাড়ের যে অঞ্চলেই গেছি,
বুনো শিকারীদের সঙ্গেই দেখা
ত্যেককেই টাঁড়বারোর সম্বন্ধে
অথবা টাঁড়বারোর সমগোত্রীয়
পুরুষ সম্বন্ধে। জবাবে যা
দিনের আলোর মত স্পষ্ট নয়।

গহন ঘন অন্ধকারের রাতে যেসব
যায়, তা বোধ হয় কখনোই
লোর মত স্পষ্ট হয় না।

হোক. লেখাপড়া জানা বিজ্ঞান-
কোনো লোক হয়ত টাঁড়বারোর
বশ্বাস করবেন না। কিন্তু তবুও
বারোরা থাকলে এ দেশের বিচিত্র
ন্য পশু-পাখী, হয়ত বন-ও বা
।

রো থাকলে বন্য মোষরা নরত
রোর মত অন্য কেউ থাকলে
চৌশিংগা, মাউস-ডিয়ার, কালো-
লা-তিতির, বাঘ ইত্যাদি ইত্যাদি
কমে যেত না দেশ থেকে।
দত জমির পরিমাণও এমন
তা না।

রক্ষণ ইত্যাদি গুরুগম্ভীর বিষয়
ক তথ্য-টথ্য দিয়ে অনেক ভারী
ব্যবহার করে যাঁরা প্রবন্ধ
রেন তাঁদের মত পাণ্ডিত্য ও
মার নেই তা প্রথমেই সবিনয়ে
রাছি। কিন্তু লিখতে যখন হলই,
-জংগলে ঘুরে বেড়িয়ে নিজের
কু দেখেছি ও নিজের ক্ষুদ্র ও
শিখিতে যতটুকু বুঝেছি তত-
মার মত করে আমারই মত
নের যাঁরা পাঠক-পাঠিকা তাঁদের
দন করি। তাঁরা যদি এ লেখা
ক্রমশঃ-ক্ষয়গ্রস্ত বনসম্পদ ও
ক্রমবর্ধমান সমস্যা সম্বন্ধে কিছু
হলেই যথেষ্ট পুরস্কৃত হব।

বহু দিন আগে এমার্সনের একটা
কবিতা পড়েছিলাম :

......"But these young scholars,
who invade our hills
Bold as the Engineer who feels
the wood,
Love not the flower they pluck
and know it not
And all their botany is Latin
names......"

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, বন-জংগল ও
পশু-পাখী সংরক্ষণের চেষ্টার মূলে তাদের
প্রতি মমত্ববোধ; তাঁদের ভালোবাসা। এ
ভালবাসা যেমন শুধু বই পড়ে জন্মায় না,
মানে পুরোপুরি জন্মাতে পারে না, তেমন
সারাজীবন বনে-জংগলে ঘুরে বেড়ালেই
আপনা থেকে তা গজিয়ে ওঠে না।
সারাজীবন বনে-জংগলে কাটানো অনেক
বন-বিভাগের অফিসার, বন-জংগলের
ঠিকাদার এবং বুনো লোককে আমি দেখেছি
যাঁরা মনে-প্রাণে বন-জংগলের সব কিছুকে
ঘৃণা করেন, ভয় করেন; আর কিছু লোক
আছেন Arm-chair-conservators
ব্যালিস্টিকস্ ও ট্যাক্সোনমিক্স-এর উপর
শহুরে বিশেষজ্ঞদের মতন, জীবনে বনে
কখনো পা না দিয়েই তাঁরা বন-জংগল ও
বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে এমন ওয়াকিবহাল হয়ে
ওঠেন যে তাঁদের কাছে কথা বলার দুঃসাহস
আমার মত অর্বাচীনের আদৌ হয় না।

বন-জংগলের ও বন্য পশুপক্ষী ইত্যাদির
ক্ষয় এবং বনাচ্ছাদিত অঞ্চলের ক্রম-
বিলুপ্তিকে প্রধানত নিম্নলিখিত কারণের
জন্য দায়ী করা যেতে পারে।

১। জ্যামিতিক ক্রমান্বয়ে বর্ধমান লোক-
সংখ্যার চাপে চাষের জমির জন্যে বনভূমির
উপর নিরন্তর হস্তক্ষেপ।

২। দেশের লোকের সাধারণ দারিদ্র্য
এবং বন ও গ্রামাঞ্চলের চরম দারিদ্র্য।

৩। মূঢ়তা ইত্যাদি দোষ। আমাদের
শিক্ষিতরাও এ দোষে দুষ্ট।

৪। যে হারে বন ও বনসম্পদ ক্ষয়
হয়েছে সেই হারের তুলনায় অনেক কম
হারে বৃক্ষ ও বনরোপণ।

৫। সরকারী আমলা, বে-সরকারী জন-
সাধারণ ও ব্যবসায়ীদের অসাধুতা ও দায়িত্ব-
জ্ঞানহীনতা।

৬। বুনো ও অশিক্ষিত শিকারীদের
এবং শহুরে শিক্ষিত শিকারীদের অবাধে
চোরা-শিকার এবং অতি-শিকার,

৭। চোরা কাঠ ও চোরা-শিকার বন্ধ
করার ব্যাপারে সরকারী নিশ্চেষ্টতা।

২। সমস্ত পর্যায়ে লাল ফিতের
দৌরাত্ম্য এবং দরদ ও কর্তব্যজ্ঞানের অভাব।

কিছুদিন আগে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও
জাপানের বন-জংগল দেখার সুযোগ হয়ে-
ছিল। সেখানের বন-জংগলের যেভাবে
রক্ষণাবেক্ষণ হয়, সেভাবে পশু-পাখীর যত্ন
নেওয়া হয় সেই সমস্ত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া
ও পরিবেশের সংগে আমাদের দেশের
পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও পরিবেশের তুলনা হয়
না। হয় না, কারণ ওদের দেশের অবস্থা
আর আমাদের দেশের অবস্থা এক নয়।

কানাডাতে বিনানুমতিতে একটি গাছ
কাটলে দশ বছর জেল হয়। এদেশে আপ-
নার যদি পয়সা অথবা রাজনৈতিক খুঁটির
জোর থাকে, তাহলে দশটা মানুষকে কেটে
ফেললেও আপনার কিছুমাত্র না-ও হতে
পারে।

তফাৎটা এইখানে। অন্যান্য দেশের
লোকরা শিক্ষিত ও স্বচ্ছল। মানে, একটা
ন্যূনতম শিক্ষা ও ন্যূনতম আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য
তাদের প্রধান অংশের আছে।

আমাদের দেশের প্রায় সর্বত্র—বোধ হয়
একমাত্র সুন্দরবনের কিছু অংশ ছাড়া—বনের

মধ্যে মধ্যে গ্রাম ও লোকবসতি আছে। এবং স্বাভাবিক কারণে, সমস্ত বনভূমির উপরে লোকালয়ের চাপ ক্রমাগত বনকে হটিয়ে দিচ্ছে। যে কোনো বনে দু বছর পরে গেলেই চোখে পড়ে কতখানি জায়গায় বন কাটা হয়েছে—আবাদ করা হয়েছে, ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছে। গভীর বনের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ে কিছুদিন পরে পরে গেলে।

এখানে দারিদ্র্য, বনাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে এত চরম যে আমার চোখে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষদের এ-সব ব্যাপারে মূঢ়তার কোনো দোষ চোখে পড়ে না। শীতে যাদের গরম জামা তো দূরস্থান, রাতে শোওয়ার সময় একটি কম্বলও জোটে না, যারা ঘরের মধ্যে আগুন জেলে সেই আগুনের পাশে একবার বুক দিয়ে একবার পিঠ দিয়ে সারারাত শুয়ে থাকে—চৈত্র-বোশেখ মাসে যাদের গায়ের [illegible] খাওয়া চামড়া সাপের খোলসের মতো এক পরত উঠে যায়, তারা আইন অমান্য করে রাতের একটু উষ্ণতার জন্যে যদি বনের কাঠ কাটেই, তবে দোষ দেওয়া যায় না।

যারা খেতে পায় না, আফিং-এর গুঁড়ো জলে [illegible] করে, বুনো ফলমূল কুড়িয়ে খেয়ে বাঁচে থাকে, ভাত যাদের কাছে স্বপ্ন, মাংস সুখ-কল্পনা: তারা যদি তীর-ধনুক [illegible] কি বিষ দিয়ে জানোয়ার ও পাখি মেরে তা খায়, তবে তাদের দোষ দেওয়া যায় না।

বন, বনের পশু-পাখিকে ভালোবেসে, যাঁরা শহরে মিটিং ডেকে, সেই মিটিং-এর বিবরণী সংবাদপত্রে ছাপিয়ে আত্মশ্লাঘা বোধ করেন আমি তাঁদের চেয়েও হয়তো বেশী ছাড়া কম ভালোবাসি না জঙ্গলকে। তবুও, যেহেতু আমি মানুষকেও ভালোবাসি—আমার মনে হয়, যে-দেশে মানুষ এখনও জীবজন্তুর পর্যায়ের জীবন যাপন করে, সেদেশে মানুষের চেয়েও বেশী প্রাধান্য জীবজন্তুকে দেওয়া যায় না। দেওয়া সম্ভবও নয়।

কিন্তু এই চরম—দরিদ্র গণ্ডগ্রাম ও গভীর বনাঞ্চলের ভারতীয়রা যে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেয় সেটা ক্ষমা করা যায়, ক্ষমা করা যায় না আপাত শিক্ষিত সরকারী ও বে-সরকারী লোকেদের অর্থলিপ্সুতা ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। যে গাছ কাটার নয়, সে গাছ কাটা হয়, যে জঙ্গলে পারমিট নিয়ে বহু দূরে থেকে আসা নিয়মানুগ শিকারীকে সবরকম অসহযোগিতা ও যন্ত্রণার মধ্যে ফেলা হয়, সেই জঙ্গলেই অনেক সময় কে জানে হয়তো আমলাদের সহযোগিতাতেই অভয়ারণ্যের মধ্যে শিকার হয়। যত গাছ প্রতিবছরে এ-দেশে বন-জঙ্গল থেকে কাটা হয়, তার এক-তৃতীয়াংশ বে-আইনীভাবে।

তবে বন বিভাগের আমলাদের মধ্যে এমন এমন লোকও দেখেছি যে তাদের পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করে। অন্যান্য দেশের কর্মীদের তুলনায় এঁদের কত বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধার মধ্যে এ-দেশে কাজ করতে হয়, তবু এঁদের কর্তব্যপরায়ণতা ও দরদের সঙ্গে কাজ, এবং এঁদের মধ্যে কারো কারো বন-জঙ্গল ও পশুপাখি সম্বন্ধে যা মমতা প্রত্যক্ষ করেছি, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য।

এক ধরনের শিকারী আছেন, যাঁরা তাঁদের হাত ভালো বলেই, সেই ভালো হাতের গর্হিত গর্বে গরবী হয়ে একদিনে দুশো-তিনশো পাখি মারেন। এক হাঁকোয়ায় দশ-বারোটা জানোয়ার মেরে দেন। আমার জানা কিছু ভারতবিখ্যাত শিকারী আছেন, যাঁরা ট্র্যাপ ও স্কিট শুটিং-এ দারুণ ভালো। ভালো বলেই তাঁরা এক-এক দিনের ছুটোয় শিকারে এই কয়েক বছর আগেও মুরগী, তিতির হরিয়াল, কালা-তিতির মিলিয়ে একদিনে শতাধিক পাখি মেরেছেন। পাখি ডানা মেললে—এবং তাঁদের বন্দুকের পাল্লার মধ্যে সে থাকলে, তার আর প্রাণ নিয়ে ফেরার কোনো উপায় নেই। একফালি ঝাঁটি জঙ্গলে একশো মুরগী তিতির জন্মাতে ও বড় হতে হয়তো পাঁচ বছর লাগে, কিন্তু তারা নিঃশেষিত হয়ে যায় আধ ঘন্টার মধ্যে।

এ-ব্যাপারে যারা আমাদের উপর প্রভুত্ব করেছিল, যারা এই দেশকে শোষণ করেছিল, তাদের কাছে কিন্তু আমাদের অনেক কিছু শেখার ছিল। দুঃখের বিষয় এইটুকুই যে তাদের ভালোটুকুকে সযত্নে ত্যাগ করে আমরা খারাপটুকুকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছি। তারা বিদেশী হয়েও অত্যাচারীর ভূমিকা নিয়েও, এ-দেশের আইন-শৃঙ্খলা, মানুষ-বন-ও-বনের জন্তু জানোয়ার সম্বন্ধে যে দায়িত্বজ্ঞান ও মমত্ববোধ নিয়ে তাদের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিল—তা নিঃসন্দেহে অনুধাবনযোগ্য।

দেশ স্বাধীন হবার পর পরই বিদেশীদের দিয়ে বাঘ মারিয়ে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের হিড়িক পড়ে গেল। বলতে গেলে, কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসাহেই। বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডারে ঘাটতি হওয়ায়, বাঘ মারিয়ে বিদেশী মুদ্রা রোজগারের বুদ্ধি জোগাতে কেন্দ্রীয় আমলাদের উর্বর মস্তিষ্কে একটুও দ্বিধা হল না। সেইসব সংস্থার বেশীর ভাগই রাজা-মহারাজা বা রাজা-মহারাজার বশংবদ শিকারের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কিছু লোকের দ্বারা চালিত ছিল। আমাদের দেশের বাঘের সংখ্যা হ্রাসে রাজা-মহারাজাদের ভূমিকা কম ছিল না। রাজপরিবারের ছেলে-মেয়েরা আট বছর বয়সেই বাঘ মারতেন—না মারলে তাঁদের ইজ্জৎ থাকত না। বহুদিন থেকে মোষ বেঁধে বেঁধে বাঘকে প্রায় বেঁধে রাখার অবস্থায় এনে ফেলে ছেলে কি মেয়েকে মাচার উপর বসিয়ে মনোগ্রামকরা বহুমূল্য ডাবল-ব্যারেল রাইফেল হাতে তুলে দিয়ে বাঘ মারানো হত। এ-দেশের বেশীর ভাগ রাজা-মহারাজারা তাঁদের প্রজাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করতেন, বাঘদের সঙ্গেও তার চেয়ে ভালো ব্যবহার করতেন না।

স্বাধীনতার পর পর বিদেশী অর্জনের জন্যে অসংখ্য বাঘ মারানো বিদেশীদের দিয়ে ভারতের বিভিন্ন শতশত বাঘের ও লেপার্ডের চামড়া হল, রপ্তানি হল সেই একই কারণে। জানা এমন অনেক শিকারী ছিল বিহারে, উড়িষ্যায় ও বাংলায় যাদের পেশা ছিল বাঘ, চিতা ও অন্যান্য মেরে তাদের চামড়া ব্যবসায়ীদের বিক্রি করা। যে-কোনো বড় হোটেলের আর্কেডের দোকানে এই বাঘ লেপার্ডের চামড়া পাওয়া যেত জন্যে।

বছরের পর বছর এ ব্যবসা তখন কারোরই নজরে পড়ল না। পত্রের সম্পাদকীয় শিরোনামায় কিছু লোক বারবার চিঠি লিখে এ ব্যাপা কারী দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা —কিন্তু সরকারের হাতে কত শত পূর্ণ গঠনধর্মী কাজ থাকে—সেই ফেলে এ ব্যাপারে নজর দেওয়ার স না কারোর।

বাঘ যখন প্রায় নিঃশেষিত তখন টনক নড়ল সরকারের—গে রব উঠল।

এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ আনুকূল্যে [illegible]রের পালামৌ পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে বাঘ প্রক হয়েছে। পাঁচ বছর জঙ্গলে শিকা কাটা বন্ধ লোকজনের যাতা পালামৌতে গিয়ে দেখলাম। ব অনেক সড়ক খুঁটি-গেড়ে ও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুন্দ প্রকল্পের কথা ত আমেরিকান অ এখানে বাঘ-ঘুম-পাড়াতে এসে কথা বিভিন্ন সংবাদপত্রের দৌল সকলেই পড়েছেন। যে মান এবং দাগী (?) বাঘটি নিয়ে আলোচনা চলল— তাকে (?) করে নিয়ে গিয়ে অন্য-জঙ্গলে তাকে বাঁচাবার জন্যে বিস্তর সময় ব্যয় করে তাকে অন খাওয়ানো হলো—এসব আপ জানেন। ঐ সব বিবরণ আমার কেবলই মনে হয়েছে আমেরিকান ভদ্রলোক পেলেন সে টাকা এই হাস্যাস্পদ লক্ষ্য জন্যে খরচ করা হল সেই অঞ্চলে একটা ছোটখাট হা যেত—যে হাসপাতালে প্রতি সাপের হাতে সুন্দরবনের মৌলে-জেলেদের প্রাণ যায় লোকের সময়মত চিকিৎসা

সৌভাগ্যক্রমে পালামৌ বিভাগের জঙ্গল
ম্বন্ধে ও সুন্দরবনের জঙ্গল সম্বন্ধে
মার মোটামুটি ধারণা আছে। এই দুই
ঙ্গলে যে বাঘ-প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তা
নঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। এতে বাঘের বংশ
ছু বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই। যদিও এই
পুল অর্থব্যয়ে ভারত সরকার এদেশের
নব বংশের জন্মহারের কিছু হ্রাস ঘটাতে
রলে দেশের উপকারটা আরো স্পষ্ট হত
ং স্থায়ীও হত।

বাঘ-প্রকল্প সম্বন্ধে—এ দু জায়গারই
মার কিছু বিনীত বক্তব্য আছে। পালামৌর
গলের মধ্যে মধ্যে হাজার হাজার গ্রাম
ছ। যে সব গ্রামে বুভুক্ষু কিছু সরল
ক বাস করে। তাদের মধ্যে বেশীর
গরই জোত-জমি বলতে কিছুই নেই।
ং পালামৌর বনে-জঙ্গলে আবাদ করা
কি কঠিন তা যাঁরা নিজের চোখে
খেছেন তাঁরাই জানেন। সুন্দরবনের
ারে বসতি বলতে তেমন না থাকলেও
-পাশের বাদা অঞ্চল থেকে প্রতি বছর
মৌলে বাউলে ও জেলে ছোট্ট-বড়
কা নিয়ে সুন্দরবনের গভীরে ঢোকে।
বিভাগ আর তাদের সংখ্যাতত্ত্ব যাই
ন না কেন সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা কমে
ও প্রতি বছর বহুসংখ্যক লোক
র হাতে এখনও প্রাণ হারায়। প্রাণ
না সত্ত্বেও তারা প্রতি বছরই সুন্দরবনে
—কারণ না এলে তারা না খেয়ে
। কোলকাতার লোকেরা যেমন মেনে
ছেন যে কোলকাতায় ট্রাম-বাসে
াত করলে যে কোনো দিন দুর্ঘটনা
পারে এবং ঘটেও, তেমন ওঁরাও
নিয়েছেন যে সুন্দরবনে মাছ ধরতে,
াড়তে, কি কাঠ কাটতে গেলে বাঘের
লোককে যেতেই হবে প্রতি

ামার বক্তব্যটা এই লোকদেরই সম্বন্ধে।
মৌর ও সুন্দরবনের। বাঘ-প্রকল্প
ীন যেহেতু জঙ্গলে সবরকম কাজ
থাকবে পালামৌ জেলার জঙ্গল-
" গরীব লোকেরা (যারা নানারকম
কাঠের ঠিকাদারের কাছে কাজ করে—
সময় থেকে বর্ষারম্ভ পর্যন্ত যা
র করবে সেই রোজগারে
কোনোক্রমে বাঁচে) তখন কি
তাদের অন্তর্বর্তীকালীন ভরণ-
র কোনো বন্দোবস্ত বাঘ-প্রকল্পে
কি না আমার জানা নেই। এইটুকুই
। যদি এদের এই পাঁচ বছর রক্ষণা-
না করা হয় তাহলে দেখা যাবে পাঁচ
ত পালামৌ-এ বাঘ বেড়েছে হয়ত
—কিন্তু অনাহারে মানুষ মরেছে
। সুন্দরবনেও তথৈবচ হবে হয়ত।

সম্বন্ধে বন বিভাগের মুখপাত্ররা কি
ানতে পেলে আনন্দিত হওয়া যাবে।

যদি এ ব্যাপারটার দিকে ইতিমধ্যেই নজর
দেওয়া হয়ে থাকে—তাহলে খুবই আনন্দের
কথা। যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে
অবিলম্বে দেওয়া উচিত।

বন সংরক্ষণ ও বন্য পশু সংরক্ষণ
বিষয়ে এত কথা বলার আছে যে তা নিয়ে
পুরো একটি বই সহজেই লেখা যেতে পারে।
কিন্তু এ পরিসরে সব কথা বলা সম্ভব নয়।

কোনো রাজ্যের বন বিভাগের সঙ্গেই
আমার বিরোধ নেই বিরোধ করতে চাইও না
কারণ তার কর্মীরা আমার আত্মীয়। যে
আত্মার কাছে থাকে সেই আত্মীয়। তাঁদের
কাজ বনকে ভালোবাসা বনের পশুকে পাখিকে
ফুলকে লতাকে ভালোবাসা। সেটা আমার
কাজ না হলেও সেটা আমার নেশা অপ্রতি-
রোধ্য; প্রচণ্ড নেশা। ইচ্ছে হয় আমাদের
সব রাজ্যের বন বিভাগে একাধিক কর্মচারী
থাকুন যাঁরা বিভূতিভূষণের 'আরণ্যকে'র
যুগলপ্রসাদের মতো বন বনের পশু-পাখি ও
গাছ-গাছালিকে ভালোবাসবেন।

আপনাদের সকলেরই হয়ত যুগল-
প্রসাদের কথা মনে আছে যে সরস্বতীকুণ্ডে
নানা জায়গা থেকে বুনো ফুল-লতা সংগ্রহ
করে এনে লাগাতো লোকে যাকে পাগল
বলত, যে লোকটা সম্পূর্ণ বিনাস্বার্থে
একটা বিস্তৃত বনভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধি
করিবার জন্য নিজের সময় ও পয়সা ব্যয়
করিতেছে যে বনে তাহার নিজের স্বত্ব-স্বত্ব
কিছুই নাই—কি অদ্ভুত লোকটা।' বানো-
য়ারীলাল মুহুরী যার সম্বন্ধে বিভূতি-
ভূষণকে বলেছিল—'তার নানা বাতিক হুজুর
এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো এক বাতিক।
কিছু করে না বিয়েসাদি করেছে সংসার দেখে
না বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় অথচ সাধু-
সন্নিসীও নয়, ঐ এক ধরনের মানুষ।'

বন সংরক্ষণের সমস্যাটা আজকে অনেক
অনেক যুগলপ্রসাদকে খুঁজে বের করার
সমস্যা। এই সমাধানই এই বিশেষ সমস্যার
একমাত্র ও গভীর সমাধান। পাতা-ভরানো
ছবি-ছাপানো কোনো জ্বালাময়ী বক্তৃতাতে
এ সমস্যার সমাধান হবে না।

বিশ্বনাথ বসু

জাতীয় পশু বাঘ

শেষ পর্যন্ত চন্দ্রপুরা গ্রামে অঘোষিত কার্ফু জারি হয়েছিল। কোন সরকারী নির্দেশে নয়। কিংবা কোন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বা রাজনৈতিক হামলাবাজির কারণেও নয়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে গৌহাটি থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরের এই এলাকার বাসিন্দাদের আর ঘরের বার হতে সাহসে কুলোতো না। কারণ? কারণ একটি ডোরা-কাটা বাঘিনীর দৌরাত্ম্য। শেষ পর্যন্ত সেই বাঘিনীকে ফাঁদে বন্দী করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তার পূর্বে সে একনাগাড়ে পাঁচ-ছ মাস ধরে মানুষ ও গরু মোষের ওপর হামলা চালিয়ে সন্ত্রাস্ত গ্রামবাসীদেরও গৃহবন্দী করে রেখেছিল।

শুধুই কি গৃহবন্দী—বিশেষ কারণে ডোরাকাটাদের উৎপাতে কোথাও কখনও বা শত শত লোক নিহত হয়েছে অরণ্যাঞ্চলের গ্রামের পর গ্রামের ভীতবিহ্বল অধিবাসীরা উদ্বাস্তু হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে সে ঘটনাবলী বিবৃত আছে জিম করবেট প্রমুখ প্রখ্যাত শিকারীদের শিকার কাহিনীতে। তবুও সেই জিম করবেটের মতো ব্যাঘ্র-বিশারদরা বাঘকে বলেছেন—'জেন্টলম্যান অফ দ্য ফরেস্ট'। আমিও বলি অমিত বিক্রম ও শৌর্যের অধিকারী হয়েও এরা অরণ্যের অতি অমায়িক রাসভারী ভদ্রলোক। আনন্দের কথা এ হেন বন্যপশুটি আজ আপন যোগ্যতায় 'জাতীয় পশু'রূপে সরকারী স্বীকৃতি অর্জন করেছে। তাই পাঠক মহলে এর আবির্ভাব ও আদি বাসস্থলের ইতি-হাস জানার কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক।

বাঘ ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দা নয়। গবেষণালব্ধ বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে যে তথ্য আজ পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায়—ভিনদেশীয় এই বন্যপশুটির যাযাবর জীবনের সর্বশেষ গন্তব্যসীমা হয়ত এই ভারতবর্ষ পর্যন্তই। দীর্ঘ ও বক্রদন্ত বিশিষ্ট অতিকায় প্রাচীন বাঘের বাসভূমির ভৌগোলিক অবস্থান সবটা না হলেও প্রধানত এশিয়া মহাদেশের বেশিরভাগ অংশে ও তৎসংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত ছিল।

অতিকায় ব্যাঘ্র অধ্যুষিত এশিয়া মহা-দেশের উত্তরাঞ্চল অনুকূল আবহাওয়ার দরুন একসময় ঘন জঙ্গলে আবৃত ছিল। সেখানে বাঘের খাদ্যোপযোগী ছোট বড় বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য তৃণভোজী বন্য-প্রাণীও বিচরণ করতো। কালক্রমে সেই অঞ্চলের আবহাওয়ার গুরুতর পরিবর্তন ঘটে এবং তুষার যুগের ক্রমবর্ধমান বরফ-পাতের ফলে তৃণভোজী বন্যপ্রাণীরা অদৃশ্য হয়—অথবা বেঁচে থাকার তাগিদে নতুন আবাসস্থলের খোঁজে স্থান ত্যাগ করে। এদিকে বাঘও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাধ্য হয়ে পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয় সমসাময়িককালে বাঘের বসবাসের পশ্চি[illegible]মুখী বি[illegible] আরারাত ও ককেসাস [illegible]তমালার [illegible] বাধা পায় এবং সেখান [illegible]কে দিক প[illegible] বর্তন করে কাস্পিয়ান [illegible]রের উপ[illegible] বর্তী অরণ্যাঞ্চল ধরে [illegible] পারস্যের [illegible] দিয়ে তুরস্ক ও আফ[illegible]স্থানে গিয়ে [illegible] আবির্ভাব ঘটে।

এই স্থানে উল্লেখ্য যে প্রখ্যাত গ[illegible] মিঃ ব্ল্যানফোর্ডের মতে আফগানিস্থা[illegible] বেলুচিস্থানে বাঘের অস্তিত্বের কোন [illegible] নেই যেমন নেই এলবার্জ পর্বত[illegible] দক্ষিণাংশ-সংলগ্ন পারস্যে (দি [illegible] ন্যাচারাল হিস্টরী গ্রন্থের ৩৭৫ দ্রষ্টব্য)। আফগানিস্থান সম্বন্ধে মিঃ ডি স্পেট্রোস অবশ্য ভিন্নমত পোষণ (টাইগার্স গ্রন্থের ৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বাঘের দেশ দেশান্তরের বংশান[illegible] দীর্ঘ পরিক্রমার যে চিত্র আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে ধরা পড়ে[illegible] বলা বাহুল্য অতি কৌতূহলো[illegible] আর্কটিক বলয়ের সন্নিকটবর্তী [illegible] বেরিয়া দ্বীপপুঞ্জে একসঙ্গে বাঘ [illegible] অতিকায় পূর্বপুরুষের যে [illegible] দেহাবশেষের নিদর্শন আবিষ্কৃত হ[illegible] পূর্বোক্ত কৌতূহলকে আরও বাড়ি[illegible] এবং পরবর্তীকালে চীন উত্তর [illegible] জাভা ও ভারতের আবিষ্কা[illegible]

আলোচ্য বিষয়ে অধিকতর আলোকপাত করে।

যা হোক—তুরস্ক থেকে মধ্য এশিয়ার দীর্ঘ বিস্তৃত বিশাল ভূভাগ ও দক্ষিণ সাইবেরিয়ার অরণ্যপথ অনুসরণ করে বাঘ মঙ্গোলিয়ায় এসে হাজির হয়। তারপর তাদের একদল গিয়ে অনুপ্রবেশ করে পূর্বদিকে মাঞ্চুরিয়ার বনাঞ্চলে। অন্যদল দক্ষিণে পাড়ি জমায় চীন কোরিয়া বার্মা শ্যাম ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে। সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপপুঞ্জেও তাদের পরিক্রমায় বাদ পড়েনি। যদিও বোর্নিও দ্বীপকে বাঘ কি জানি কেন এড়িয়ে গেছে।

বাঘের শিলীভূত দেহাবশেষগুলি পর্যালোচনা করলে তাদের যাযাবরী পদপরিক্রমার একটি অঞ্চলভিত্তিক ধারাবাহিক সংযোগসূত্র আবিষ্কার করা যায় যা থেকে প্রমাণিত হয় যে ব্রহ্মদেশ হয়ে আসামের ভেতর দিয়ে অনুপ্রবেশ করে বাঘ শেষ পর্যন্ত অবিভক্ত ভারতের সমগ্র বনাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও সিংহলে বাঘের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। এ থেকে অনুমান করা যায় যে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সিংহলের ভৌগোলিক ভূমি সংযোগ সমুদ্রের জলস্রোতে ছিন্ন হয়ে যাবার পরবর্তী সময়ে হয়ত ভারতে বাঘের উপস্থিতি ঘটেছিল যার ফলে স্থলচারী এই পশুটির পক্ষে সমুদ্রবেষ্টিত সিংহলে প্রবেশ সম্ভব হয় নি। স্বাভাবিক খাদ্য ও জঙ্গলাকীর্ণ উপযুক্ত আশ্রয়স্থলের অভাবেই হয়ত তিব্বতের উন্মুক্ত উচ্চ অধিত্যকা অঞ্চলেও বাঘের উপস্থিতি ঘটেনি।

শিলীভূত ব্যাঘ্রকঙ্কাল যা আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তার যথাযথ বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার ফলাফলে ব্যাঘ্রকুলের বাধ্যতামূলক যাযাবরী জীবনের গন্তব্যপথের মোটামুটিভাবে কিছুটা হদিস পাওয়া যায়। এবং তা থেকে তার দক্ষিণ-পূর্বমুখী এশিয়া অভিযানের শেষ অধ্যায়ে মালয় বর্মা ও ভারত প্রবেশের একটি তথ্যাসিদ্ধ ধারাবাহিক ভৌগোলিক মানচিত্রেরও প্রমাণ মেলে।

কিন্তু বাঘ ভারতভূমিতে অনুপ্রবেশের জন্য অন্য দিক ছেড়ে বর্মার ভেতর দিয়ে আসামের পথ বেছে নিল কেন? বাঘ প্রকৃতিগতভাবেই একটু আয়েসী ও লাজুক তথা আড়ালপ্রিয় প্রাণী। তাই হয়ত আসামের সহজসাধ্য বনপথের নিরাপদ পদযাত্রা সে পছন্দ করেছিল এবং সে পথের আবহাওয়াও তার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল ও আরামদায়ক ছিল। অন্যদিকে সম্পূর্ণ বিপরীত কারণেই বাঘ উক্ত উদ্দেশ্যে তার দক্ষিণমুখী অগ্রগমনের পথে সোজা উত্তরের সিংকিয়াং মরুভূমি তিব্বতের উন্মুক্ত প্রান্তর ও দীর্ঘ বিস্তৃত সুউচ্চ হিমালয় পর্বতকে সভয়ে এড়িয়ে গিয়েছিল—যেখানে ঠিক অনুরূপ কারণেই সে এড়িয়ে গিয়েছিল উত্তর-পশ্চিম দিককার হিন্দুকুশ পর্বতমালা তথা পারস্য ও বেলুচিস্থানের বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তর।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ব্যাঘ্র অধ্যুষিত বহুধাবিস্তৃত অঞ্চলাদি তথা তার অন্তর্দেশীয় সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার মানচিত্রের সতর্ক পর্যালোচনায় একথাটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বাঘ কেবলমাত্র ট্রপিকাল আবহাওয়া মন্ডলের প্রাণী বলে বহুল প্রচারিত যে ধারণাটা আছে তা ঠিক নয়।

ভারতবর্ষে বাঘ তার ভবঘুরে আরণ্যক জীবনের শেষ আগন্তুক হলেও স্থানীয় সামাজিক লোকাচার ধ্যান-ধারণা সংস্কার ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে সে জড়িত যে যুক্তিসংগত কারণেই এদেশের জন মানসে সে আজ এক বিশেষ প্রতীকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সিংহলে বাঘের অনুপস্থিতিতে এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে উত্তর ও মধ্য ভারতের বনাঞ্চলে তাদের বসবাস সুসংহত করার বহুকাল পরে ব্যাঘ্রকুল সম্ভবত ধীরে ধীরে দক্ষিণ ভারতে অনুপ্রবেশ সুরু করেছিল। এটা এই কারণেই মনে আসে যে দক্ষিণ ভারতে বাঘের উপস্থিতির বহু পূর্ব থেকেই পাক-প্রণালীর উভয় দিকে বিভিন্ন জাতি ও প্রজাতির অসংখ্য বন্য-প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু ছিল না শুধু বর্তমান ভারতের ডোরাকাটা এই জাতীয় পশুটি।

বলা বাহুল্য বাঘের সাইজ বিশেষ করে দৈর্ঘ্যের বিষয়টি একটি বহু-বিতর্কিত প্রশ্ন। পৃথিবীর প্রখ্যাত শিকারীগণ কর্তৃক এ বিষয়ে বহু তথ্যের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে পার্থক্যও প্রচুর। অনেক তথ্য অবিশ্বাস্যও মনে হয়। অবশ্য দৈর্ঘ্যের মাপ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে মাপবার পদ্ধতির ওপর। নিহত বাঘের ক্ষেত্রে মাপবার পদ্ধতি তিন রকমের: (১) দেহটিকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে থুতনি ও লেজ টান টান করে রেখে নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত সরল রেখায় মাপা (২) নাকের ডগা থেকে কপাল ও পিঠের উপর দিয়ে লেজের ডগা পর্যন্ত দৈহিক বকতা বরাবর মাপা—শিকারীরা সাধারণত এই পদ্ধতিতেই মাপেন এবং (৩) চামড়া ছাড়ানোর পর তা টেনে বিস্তৃত করে নাক থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত সরল রেখায় মাপা। এই পদ্ধতিতে প্রকৃত মাপের চেয়ে অনেক বেশী মাপ ওঠে।

রয়্যাল ন্যাচার্যাল হিস্টরী গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যে বাঘের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ১২ ফুট থেকে ১২ ফুট ২ ইঞ্চি পর্যন্ত উল্লিখিত আছে। রাওল্যান্ড ওয়ার্ড প্রণীত 'রেকর্ডস অব বিগ গেম' গ্রন্থে সর্বোচ্চ মাপ ১২ ফুট ৪ ইঞ্চি পর্যন্ত দেখানো আছে। ১৮৭১ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত কুচবিহারের তৎকালীন মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের শিকার রেকর্ডে নিহত বাঘের সর্বোচ্চ মাপ পাওয়া যায় ১০ ফুট ৫ ইঞ্চি। আসামের গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া ১৯৩৯ সালের ১৯শে এপ্রিল তারিখে দরং জেলায় একটি বাঘ শিকার করেন যার মাপ ছিল ১০ ফুট ৬ ইঞ্চি। দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত এই সব তথ্য ছাড়াও বিশাল আকৃতির বাঘের আরো ব[illegible] বর্ণনা অন্যত্র পাওয়া যায়।

প্রাথমিকভাবে পায়ের গড়ন অনুযা[illegible] দুই জাতীয় বড় বাঘের হদিস মেলে[illegible] যথা (১) প্রশস্ত পায়ের চৈনিক-সাইবে[illegible] ও (২) সরু পায়ের জাভা জাতীয়। শি[illegible] ভূত কংকালাদি পরীক্ষায় প্রমাণিত হ[illegible] যে কালক্রমে বাঘ আন্তর্দেশীয় পরিক্র[illegible] যত দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়েছে তত [illegible] মূল আকৃতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। [illegible] অনুমিত হয় যে বাঘ তার বর্তমান আ[illegible] পেয়েছে সুদূর অতীতে প্রায় পাঁচ লক্ষ [illegible] পূর্বে। যদিও একমাত্র মঙ্গোলিয়া ছ[illegible] অঞ্চল ভেদে তাদের আকৃতি গায়ের রং [illegible] ডোরার মধ্যে অতি সামান্য পার্থক্যই [illegible] পড়ে। মঙ্গোলীয় ও মাঞ্চুরীয় বা[illegible] আকৃতি অস্বাভাবিক রকমের বড় যদিও গায়ের রং হালকা ও ডোরার সংখ্যাও কম[illegible] ভারতীয় বাঘের আকৃতি মালয় দেশের বাঘে[illegible] চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় এবং উত্তরে এশী[illegible] জাতের চেয়ে সামান্য ছোট। কিন্তু মাঞ্চুরী[illegible] ও বালী দেশের বাঘের মধ্যে তুলনামূলকভাবে আকৃতিগত বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। বলা বাহুল্য মহাদেশীয় মূল ভূখণ্ডের বাঘ [illegible] তৎসংলগ্ন দ্বীপাঞ্চলের বাঘের এই লক্ষণী[illegible] আকৃতিগত পার্থক্যের সঠিক কারণ আজও নির্ণীত হয়নি।

এইরূপ তথ্য পাওয়া যায় যে এক সম[illegible] ১২ ফুট ও তদূর্ধ্ব বাঘের অস্তিত্ব মাঞ্চু[illegible] রিয়ায় প্রচুর ছিল। রুশীয় শিকারীরা নি[illegible] মিতভাবে বেছে বেছে এইসব বাঘ শিকা[illegible] করতেন। কিন্তু একথাও জানা যায় [illegible] মাঞ্চুরিয়ার অনেক বাঘ বৃহৎ আকৃতি[illegible] ভারতীয় বাঘের চেয়ে কোন দিক দিয়েই ব[illegible] ছিল না। এ থেকে এই ধারণা করা যায় [illegible] ভারতীয় ঐসব বড় বাঘ হয়ত বা সা[illegible] বেরিয়ার লুপ্ত বড় বাঘের বং[illegible] বর্তমা[illegible] ব্লাডিভোস্টক শহর যেখা[illegible] অবস্থিত [illegible] অঞ্চলে নাকি একসময়ে মঙ্গোলীয় সম্রাটে[illegible] দ্বারা পরিচালিত বিশাল পশু-উদ্যান ছি[illegible] এই উদ্যানে নির্বাচিত প্রজননের মাধ্য[illegible] বড় বাঘের বিপুল বংশবৃদ্ধি ঘটে। কাল[illegible] ঐ উদ্যান উঠে গেলে বন্দী বাঘেরা ছা[illegible] পেয়ে উত্তরে সাখালিন দ্বীপ ও দক্ষি[illegible] কোরিয়ার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই অব[illegible] তাদের অনেকগুলি শিকারীদের হাতে নি[illegible] হয়। কিন্তু এ-ও অনুমিত হয় যে অব[illegible] বড় জাতের বাঘের সঙ্গে স্থানীয় বা[illegible] ব্যাপক সংমিশ্রণ ঘটেছিল। এবং এই স[illegible] সমর্থিত হয় সে যুগের ব্লাডিভোস্টক ইয়াংকোভস্কি অঞ্চলের অধিকাংশ বি[illegible] রুশ শিকারীদের উক্তিতে। তাঁদের অভিজ্ঞ[illegible] এও জানা যায় যে ঐ সময় ঐ এলাকায় [illegible] এ বড় দুই জাতের বাঘেরই অস্তিত্ব ছি[illegible]

আবাস ও আবহাওয়ার তারতম্যে ব[illegible] রং ও আকৃতিতে যে পার্থক্য আ[illegible] বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উদাহরণস্ব[illegible] হিমালয়ের পাদদেশ সংলগ্ন বনাঞ্চলে নেপাল ভুটান ও দীর্ঘ বিস্তৃত তরা[illegible] বাঘ আকৃতিতে দক্ষিণবঙ্গের বাঘের

কৃত বড়। সুন্দরবনের বাঘের নাম-
কলেও এরা কিন্তু দৈহিক গড়নে
য় নয়। শুলেয়ভরা ঠাসা ঝোপঝাড়ের
ঙ্গলের বাসিন্দা বলেই হয়ত এরা
নুচ কম্বাটে গড়নের। যদিও শক্তি-
পেশীবহুল দেহের অধিকারী এরা
একরোখা চতুর ও কষ্টসহিষ্ণু

মুল আবহাওয়া ও উদ্ভিজ্জাদির প্রত্যক্ষ
আছে বন্য পশু-পাখীর গায়ের রং ও
র ওপর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়
তার পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থেকে

নয়। শুধু তাই নয় বাধ্য হলে পূর্ব
ধ তার নতুন আবাসস্থলের অসুবিধা-
রিস্থিতির মধ্যে নিজেকে নিবিড়ভাবে
নিতে পারে সুন্দরবনই তার প্রকৃষ্ট

তিক প্রভাবে গায়ের রঙের কিছুটা
ঘটলেও সে রং সাদা বা কালো
কিন্তু ঐ একই কারণে নয়।
ক রঙের এই রূপান্তর নিশ্চিতই
জ্ঞানিক প্রতিক্রিয়াজনিত। কিন্তু আজ
যতটা তথ্য পাওয়া গেছে তাতে
হয় যে প্রধানত রেওয়া এস্টেট তথা
মধ্যপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন জেলা-
অরণ্যাঞ্চল হচ্ছে সাদা বাঘের
স্থল। যদিও ভারতের আরো বিভিন্ন
ও যে সাদা বাঘের অস্তিত্ব ছিল
থাও অতীতে পাওয়া গেছে। জানা
ংরেজী ১৮২০ সালে ভারত থেকে
জীবিত সাদা বাঘ ইংলন্ডে নিয়ে গিয়ে
রণকে দেখানো হয়েছিল। এই
তৃতীয় দশকে মেজর ডি রবিনসন
ক বিদেশী ভদ্রলোক পুণায় পূর্ণ-
একটি সাদা বাঘ পেয়েছিলেন। সম
কালে তৃতীয় একটি সাদা বাঘের
ছিল কর্নেল এইচ এইচ গডউইন
নামক এক ভদ্রলোকের কাছে।

৫১ সালে মধ্যপ্রদেশে রেওয়ার
একটি বাঘিনীকে একটি সাদাসহ
বাচ্চা নিয়ে ঘুরতে দেখা যায়। জঙ্গলে
সাদাটিকে ধরা হয়। অন্য দুটি
নিহত হয়। কিন্তু সাদা বাচ্চাটি এক
পালিয়ে গেলেও আবার ধরা পড়ে এবং
মহারাজার গ্রীষ্মকালীন- প্রাসাদে
কে। নামকরণ করা হয় তার 'মোহন'।
ল জাতীয় সাদা বাঘের বংশবৃদ্ধি
উদ্দেশ্যে উঠতি বয়সের মোহনের
নানসই বয়সের স্বাভাবিক রঙের
কিশোরী বাঘিনীকে রাখা হয়। বন্দী
তাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ
বং ১৯৫৫ সালে মোহনের ঔরসে
সঙ্গিনীর গর্ভে স্বাভাবিক রঙের
বাচ্চা হয়। ১৯৫৮ সালে ঐ মোহনের
বই পূর্বোক্ত ঔরসজাত এক কন্যা
হয় এবং চারটি সম্পূর্ণ সাদা
চ্চা প্রসব করে। দু বছর পর ঐ
ড়ির মিলনে দুটি সম্পূর্ণ সাদা স্ত্রী-
একটি স্বাভাবিক রঙের পুরুষ-শিশু

এবং ১৯৬২ সালে সম্পূর্ণ সাদা একটি
পুরুষ ও একটি স্ত্রী ব্যাঘ্র শিশুর জন্ম হয়।

উপরোক্ত ঘটনার পর শ্বেত ব্যাঘ্রের
বংশবৃদ্ধির দিকে ভারত সরকারের দৃষ্টি
আকৃষ্ট হয় এবং রেওয়ার মহারাজার সঙ্গে
একটি চুক্তির ভিত্তিতে প্রথমে দিল্লী ও পরে
কলকাতার চিড়িয়াখানায় মোহনের ঔরসজাত
বাঘ বাঘিনীদের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে
আন্তর্বংশীয় প্রজনন প্রকল্প চালু হয়।
বলা বাহুল্য সাদা বাঘের বংশবৃদ্ধি সংক্রান্ত
সেই প্রকল্পের সাফল্যের কথা আজ সর্বজন-
বিদিত ঘটনা।

কিন্তু কুচকুচে কালো রঙের বাঘের
অস্তিত্বের ঘটনা বিরল হলেও একেবারে
অবাস্তব নয়। বোধহয় ঊনবিংশ শতাব্দীর
শেষার্ধে মিঃ সি টি বাকল্যান্ড নামক এক
ভদ্রলোক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যে ভারতের
উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী চট্টগ্রাম জেলার এক
স্থানে সম্পূর্ণ কালো রঙের একটি মৃত
বাঘের কথা জানা যায়। ওয়াকিবহাল মহলের
খবরে প্রকাশ ব্রহ্মদেশেও ঐ সময় কালো
বাঘের অস্তিত্ব ছিল। আরো ছিল চীনদেশের
দক্ষিণাঞ্চলে 'ব্ল্যাক ডেভিল' নামে পরিচিত,
নীল রঙের বাঘ। কাজেই দেখা যাচ্ছে
প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে বাঘেরও একটি
লক্ষ্যণীয় ভূমিকা আছে।

এশিয়া মহাদেশের দীর্ঘ বিস্তৃত অরণ্যা-
ঞ্চলে প্রকৃতির মুক্ত অংগনে এই বিশিষ্ট
ও বিচিত্র প্রাণীটির যে বিপুল সমাবেশ
ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে তার
ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যায়। গত শতাব্দীতেও
রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের পূব থেকে পশ্চিম
বরাবর বিশাল ও দুর্গম বনভূমির সর্বত্র
অসংখ্য বাঘের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু রাষ্ট্র ও
সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষের
বেপরোয়া হস্তক্ষেপের ফলে বর্তমানে
বাঘের উল্লিখিত আদি বাসভূমির কয়েকটি
মাত্র বিক্ষিপ্ত অঞ্চলেই তারা কোনরকমে
টিকে আছে যার সংখ্যা পঞ্চাশ ষাটটির বেশী
নয়। একমাত্র মাঞ্চুরিয়া সীমান্ত সংলগ্ন
উসরী অঞ্চল ছাড়া অন্য স্থান থেকে তাদের
অস্তিত্ব ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে। আশার
কথা যে সোভিয়েট সরকার বর্তমানে অতি
কঠোর আইন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাদির মাধ্যমে ঐ
কয়টি বাঘকে সযত্নে সংরক্ষণ করে তাদের
সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করছেন। একমাত্র
পশুশালার প্রয়োজনে ছাড়া সেখানে বাঘের
বাচ্চা পর্যন্ত ধরা আজ নিষিদ্ধ হয়েছে।

কৌতূহলজনক খবর হচ্ছে বিগত দশকে
ককেশাস ছাড়িয়ে ইরান সংলগ্ন আজার-
বাইজান ও আর্মেনিয়ার গভীর অরণ্যের
অভ্যন্তরে পর্যন্ত কয়েকবার বাঘের অস্তিত্ব
চোখে পড়েছে। ১৯৫৬ সালে তাদের একটি
ফাঁদে ধরাও পড়ে। কিন্তু নানাবিধ কারণে
তাদের সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে এখন মাত্র
দশ বারোটিতে এসে ঠেকেছে এবং
কাস্পিয়ান সাগরে দক্ষিণ-পূর্ববর্তী কোণে
ইরানের জঙ্গলে তারা আজ বিলুপ্তির
অপেক্ষায়।

জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপপুঞ্জের জঙ্গলে
একসময় অগুনতি বাঘ ঘুরে বেড়াতো।
১৮৯১ সালে সুমাত্রার একজন ওলন্দাজ ব্যব-
সায়ীর রিপোর্টে জানা যায় যে ঐ বছর বন-
পথে চলাচলকারী কফি-বাগিচার কুলিদের
ওপর ক্রমাগত এমনই প্রচণ্ড বাঘের আক্রমণ
ঘটেছিল যে তাদের পঞ্চাশজনেরও বেশী
লোক নিহত হয়; যার ফলে কফি
রপ্তানীও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বলা বাহুল্য নানাবিধ বাস্তব কারণে
উত্তর-পূর্ব এশিয়ার মাঞ্চুরিয়া কোরিয়া এবং
চীন দেশের ম্যাকিয়েন তীরভূমির প্রত্যন্ত
দেশের বাঘের বসতিও দ্রুত সঙ্কুচিত হয়ে আজ
কয়েকটি বিক্ষিপ্ত এলাকায় এসে ঠেকেছে।
দক্ষিণ কোরিয়ায় বাঘ যে আজ নিঃশেষিত-
প্রায় একথা সেখানকার সবাই জানে। লাওস
ও ভিয়েৎনামের জঙ্গলে এখন কদাচিৎ বাঘের
দেখা মেলে। প্রাণীবিদদের ধারণা ইন্দো-
নেশিয়ার বাঘও হয়ত অদূর ভবিষ্যতে শেষ
হয়ে যাবে। ব্রহ্মদেশের পরিস্থিতি জানা না
গেলেও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বলা যায় সংরক্ষণ
আন্দোলন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি জোরদার
করতে পারলে বর্তমান পরিস্থিতির পরি-
বর্তন ঘটিয়ে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা থেকে এদেশে
বাঘের অস্তিত্ব রক্ষা করা হয়ত বা সম্ভব
হবে। তবে হয়ত—কিন্তু অবস্থা অতীতে
কি ছিল বর্তমানে কি কেনই বা এমনটি
হোল এবং সংরক্ষণমূলক কি কি ব্যবস্থা
গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে জনসাধারণেরও
পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার।

মনে হয় ৫০০০ খৃষ্ট পূর্বের সম-
সাময়িককালে আসামের পথে বাঘের অনু-
প্রবেশ ঘটেছিল। শুধু প্রাক-বৃটিশ যুগ বা
মুসলমান শাসনকালে নয়—তারও আগে
সুদূর অতীত থেকে ভারতে বাঘের উপ-
স্থিতির তথ্যাসিদ্ধ প্রমাণ আছে। যা হোক,
আর্য শাস্ত্রগ্রন্থ 'ঋগ্বেদে' কিন্তু বাঘের
অস্তিত্বের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।
আর্য সাহিত্য গ্রন্থ অথর্ব বেদেই প্রথম
বাঘের উল্লেখ দেখা যায়। ৪৭০ খৃঃ পূর্বে
বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি বিশেষ অধ্যায়েও এর
উল্লেখ আছে।

'ইন্ডিয়া ইজ দি হোম অব মডার্ন
টাইগার্স'—এইরূপ একটি বহুল প্রচারিত
কথা শোনা যায়। যদিও তার যথাযথ ঐতি-
হাসিক স্বীকৃতি নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও
প্রাচীন ভারতের বনাচ্ছাদিত ভূমিভাগের
বিশালতা ও বহুধা বিস্তৃতির বিচারে বাঘের
তৎকালীন প্রাচুর্য অনুমান করা কঠিন নয়।
সে যুগের জনসংখ্যা কৃষি ও জনবসতির
স্বল্পতা—অপরদিকে ছোট বড় বহু শ্রেণীর
তৃণভোজী অসংখ্য শিকার প্রাণী-অধ্যুষিত
বনের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে বাঘের তৎ-
কালীন সংখ্যা সংক্রান্ত সর্বাধুনিক ধ্যান-
ধারণা যে অযৌক্তিক একথাও বলা চলে না।

অতীতে বাঘ তথা বন্যপ্রাণী বিষয়ক
নির্ভরযোগ্য কোন সমীক্ষা না থাকলেও
বৃটিশযুগে সে বিষয়ে কতী শিকারী পর্যটক
তত্তাত্ত্বিক জরীপ কর্মী ও বিজ্ঞানীদের
চাক্ষুষ অভিজ্ঞতালব্ধ যে তথ্য পাওয়া

যায় তাতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সমসাময়িককালে ভারতের বনাঞ্চল অপর্যাপ্ত বন্যপ্রাণী সম্পদে ভরা ছিল। কিন্তু যন্ত্র-যুগের আবির্ভাব ও আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কার সেই সম্পদের সামনে অভিশাপরূপে দেখা দেয়। অবিচ্ছেদ্য দীর্ঘ বিস্তৃত যে বনাঞ্চল একসময় বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বিচরণভূমি ছিল রাস্তাঘাট তৈরী রেলপথের প্রতিষ্ঠা ও যানবাহনের প্রবর্তনে সেই বন-ভূমির নির্জনতা বিঘ্নিত হয় এবং বিব্রত ও আতঙ্কিত বন্যপ্রাণী ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যেতে থাকে।

বৃটিশ আধিপত্য পাকাপোক্তভাবে বিস্তৃত হবার পর সামরিক ও প্রশাসনিক অফিসারদের মধ্যে দেখা দেয় প্রতিযোগিতা-মূলক শিকার প্রবণতা। বিদেশী শাসকদেরই অনুমোদিত ও অনুগ্রহভাজন বিপুল ধন-দৌলত ও বৈষয়িক প্রতিপত্তির অধিকারী দেশীয় রাজা মহারাজা নবাব বাদশা জায়-গীরদার জমিদার প্রভৃতির মধ্যেও বয়স ও বিলাস বহুল খানদানী নেশা ও সখের সঙ্গে সঙ্গে বনেদী মৃগয়াপ্রীতিরও বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এর পাশাপাশি আরো ঘটতে থাকে শিল্পোন্নতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত অপরিহার্য সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বন কেটে কলকারখানা কৃষি ও বসতি অঞ্চলের সম্প্রসারণ। যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে বন-হারা বন্যপ্রাণীর ব্যাপক বিপর্যয়।

এই বিপর্যয়ে সর্বাধিক ক্ষতি হয়েছে বাঘের বংশে। কেন? কারণ—সিংহ ও বাঘ শিকার প্রাচীনকাল থেকেই অসীম শৌর্য ও কৃতিত্বের নিদর্শনরূপে ভারতীয় সমাজে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে।

সিংহ একদা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল। তার ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণও আছে—যদিও সিংহ বাঘের মতন বিপুল সংখ্যায় ছিল না কখনও। ছিল না তার প্রধান কারণ হচ্ছে ভারতে তুলনামূলক-ভাবে সিংহের বাসোপযোগী বনাঞ্চলের স্বল্পতা। কিন্তু শিকার প্রাণী হিসেবে শিকারীদের কাছে বাঘের ন্যায় সিংহের আকর্ষণও কম ছিল না। তাই সংখ্যাল্পতার কারণে অনেকান্তের মুখে তাদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে আরো কমে গিয়ে বর্তমানে মাত্র দুই শোতে এসে ঠেকেছে।

কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে বাঘের সংখ্যা অতি দ্রুত ও উদ্বেগজনকভাবেই কমে গিয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী মহলের এইরূপ একটি আন্দাজ ছিল যে ১৯৫০ সাল নাগাদ ভারতে বাঘের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ হাজারের মত। ১৯৬১ সালে সব রাজ্যের বন-দপ্তরগুলি যে আভাস দেয় তার ভিত্তিতে সারা দেশে সর্বসাকুল্যে বাঘের সংখ্যা ধরা হয় কম-বেশী আড়াই হাজার। বলা বাহুল্য উপরোক্ত কোন গণনাই পর্যাপ্ত ও যথাযথভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ভিত্তিক ছিল না। [illegible]

কাদার জংগল সুন্দরবন এবং কাজিরাঙ্গা ও জলদাপাড়ার ন্যায় উঁচু ও গভীর ঘাসবনের বাসিন্দা বাঘদের ধরা সম্ভব হয়নি। হয়নি তার কারণ ঐ ধরনের জংগলে বাঘের হদিস পাওয়া এবং তার উপযোগী পর্যবেক্ষণ অভিযান সংগঠিত ও কার্যকরী করা কঠিন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে খণ্ডিত এই দেশে বাঘের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। প্রথম থেকে এর কারণ খুঁজলে দেখা যাবে যে এর মাধ্যমে ব্যবসায়িক অর্থাগমের লোভ মগজে ঢুকবার অনেক আগে থেকেই বনের ব্যাপক বিনাশ ও সৌখীন শিকারীদের বেপরোয়া বন্দুকবাজী বন্যপ্রাণীকে বিশেষ করে বাঘ ও চিতাবাঘের বংশকে নির্বংশ করার দিকে বিপজ্জনকভাবে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। এটা কোনরূপ অমূলক রটনা বা উদ্দেশ্যমূলক কল্পনাও নয়। বন কেটে শিল্প কৃষি ও বসতির পত্তন ও তার ক্রম-সম্প্রসারণের সত্যতা কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এটা সর্বজন-বিদিত ঘটনা। এবং এই ঘটনার ফলাফলে বিশেষ করে, বনহারা কোণঠাসা বাঘ সৌখীন শিকারীদের হাতে যে কি পরিমাণে ধ্বংস হয়েছে তার অসংখ্য উদাহরণের মধ্য থেকে মাত্র দু-একটি পাঠক মহলের অবগতির জন্য এখানে উল্লেখ করছি।

বিহারের অধুনালুপ্ত কোন একটি দেশীয় রাজ্যের প্রাক্তন নৃপতি (বর্তমানে লোকসভার সদস্য) স্বীয় শৌর্য ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্য সারা জীবনে নাকি হাজার দুই-এর মত বাঘ ও চিতাবাঘ শিকার করেছেন। ছোট বড় দেশীয় রাজাগুলির নৃপতিবর্গের অধিকাংশই অনুরূপে আরণ্যক সখের অনুরাগী এবং লক্ষ্যণীয়ভাবে কম বেশী শিকার কৃতিত্বেরও অধিকারী।

হিমালয়ের নিভৃত বুকে অবস্থিত ভারত সীমান্ত সংলগ্ন বন ও বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ নেপাল ও ভুটান রাষ্ট্রদ্বয় এক সময় অপরিসীম ব্যাঘ্র ভাণ্ডারের অধিকারী ছিল। ভুটানের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা ও আইনানুগ অধিকারে একমাত্র রাজাই জঙ্গলে শিকার করতে পারেন! ঐ আইন অমান্যের শাস্তি অতি কঠোর ও নির্মম। তাই ভুটানের বনে বাঘের সংখ্যা নাকি এখনও নেহাৎ কম নয়—যদিও সেখানে চোরা-শিকারীদের সাহস বেশ বেড়েছে ও বন্য-জন্তুও যথেষ্ট মারা পড়ছে শুনছি।

এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে নেপালে বাঘের সংখ্যা কি পরিমাণ ছিল নেপালের ভূতপূর্ব মহারাজা স্বর্গত যুধা সমশের জং বাহাদুর রানার শিকার তালিকায় আংশিক উদ্ধৃতি দিলেই বোঝা যাবে।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে মহারাজার একদিনের সর্বোচ্চ শিকার রেকর্ড হচ্ছে—বাঘ ৭টি গণ্ডার ৫টি এবং ভালুক ৩টি।

৬৮ দিনের এক অভিযানের শি[illegible] বাঘ ১২০টি গণ্ডার ৩৮টি চিতাবাঘ [illegible] ভালুক ১৫টি কুমীর ১১টি।

২১ দিনের এক অভিযানে—বাঘ [illegible] গণ্ডার ৭৪টি চিতাবাঘ ২টি।

সমসাময়িককালে উপরোক্তগুলি স[illegible] পর ছোট বড় সাতটি শীতকালীন [illegible] যানের মোট শিকার রেকর্ড—বাঘ [illegible] গণ্ডার ৫৩টি চিতাবাঘ ১৫টি [illegible] ২২টি কুমীর ২০টি।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট [illegible] যায় নেপাল অরণ্য একসময় কি [illegible] বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু শিকারে [illegible] দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু বন্য প্রাণী যৎসামান্যই [illegible] প্রাণে বেঁচে আছে সেখানকার রাপতী [illegible] দক্ষিণ তীর [illegible] রয়াল চি[illegible] ন্যাশনাল পার্কের নিরাপদ আশ্রয়ে [illegible] বাঘ? এই পার্কের উত্তর-পূর্ব কোণ [illegible] চেয়ে ঘন ৩৫ বর্গমাইলের মত [illegible] নামক বনাঞ্চলে মাত্র দশ এগারোটি [illegible] চলাচলের আভাস পাওয়া গেছে। [illegible] এলাকায় ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ [illegible] তাঁদের বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প চাল[illegible] এবং এই এলাকায়ই সুন্দরবনের [illegible] খ্যাত নায়ক ডঃ সিডেনস্টিকার [illegible] চিতাবাঘের ওপর তাঁর ঘুম[illegible] ওষুধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যা[illegible]

বন্যপ্রাণী নিধন কার্যক্রমে [illegible] শরিক হয়েছে অর্থলোভী বেনিয়া [illegible] সেই সংগে সৌখীন শিকারীদের [illegible] উপরোক্তরূপে ধ্বংস যজ্ঞের শেষ [illegible] তাতে পূর্ণাহুতি দিয়েছে কালোবা[illegible] দুর্নীতিপরায়ণ বন্য-প্রাণী ব্যবসায়ী [illegible] পৃষ্ঠপোষিত চোরা শিকারীরা। [illegible] বাঘ শিকার এবং বাঘের চামড়া [illegible] রপ্তানি নিষিদ্ধ হবার পরও [illegible] আদেশকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখিয়ে [illegible] সাত বছরের মধ্যে শত শত বাঘ [illegible] চামড়া গোপন পথে বিদেশে পা[illegible] গিয়েছে।

এ দেশের কালোবাজারে যে [illegible] চামড়াটির দাম চার পাঁচ হাজা[illegible] বিদেশের বাজারে তার দাম [illegible] পনেরো হাজার টাকা। নিখুঁত [illegible] সর্বোচ্চ দাম মেলে। তাই বাঘ [illegible] আগ্নেয়াস্ত্রের স্থান নিয়েছে [illegible] গন্ধবিহীন বিষ ইঁদুর মারা [illegible] অরণ্য পল্লীর অধিবাসীদের দারিদ্র্যে [illegible] নিয়ে দু একশত টাকা বকশি[illegible] দেখিয়ে তাদের মধ্য থেকে দা[illegible] করা হয় বাঘ। কিনা জঙ্গল [illegible] দ্বারা নিহত অর্ধভুক্ত জানোয়ার [illegible] বিষপ্রয়োগ করে বাঘ মারে ও [illegible] গোপনে ব্যবসায়ীর ঘরে পৌঁছে [illegible]

বাঘের বিলুপ্তিমুখী অ[illegible] বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে [illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের ভারতীয় [illegible] উপদেষ্টা পর্ষদ অনেক বছর [illegible] [illegible] বাঘ [illegible]

উপদেশ দেন। ১৯৬৯ সালে আন্ত-তিক প্রকৃতি-সংরক্ষণ সংস্থা অর্থাৎ ই ইউ সি এন-এর দিল্লী অধিবেশনে টি সর্বসম্মত প্রস্তাবে ব্যাপক গবেষণার ামে প্রকৃত পরিস্থিতি না জানা পর্যন্ত শিকার বন্ধ রাখার সুপারিশ করা হয়। সুপারিশ গ্রহণ করে ভারতীয় বন্যপ্রাণী দ সমস্ত রাজ্যগুলিকে অন্তত পাঁচ রের জন্য বাঘ শিকার নিষিদ্ধ করতে লন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও স্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ব্যক্তিগত-ব সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের অবহিত ত বলেন—যার ফলে ১৯৭০ সাল থেকে তের সর্বত্র বাঘ শিকার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়।

এরপর ১৯৭২ সালে সুরু হয় সারা ব্যাপী ব্যাঘ্র গণনা। ফলাফলে রাজ্য-ভিত্তিক সংখ্যা মেলে নিম্নোক্তরূপে—

অন্ধ্রপ্রদেশ—৩৫ অরুণাচল—৬৯ আসাম ১৪৭ বিহার—৮৫ গুজরাট—৮ কেরালা— মণিপুর—১ মধ্যপ্রদেশ—৪৫৭ মেঘালয় ২ মহারাষ্ট্র—৭৪ মহীশূর—১০২ নাগা-ড—৮০ উড়িষ্যা—১৪২ রাজস্থান—৭৪ মিলনাড়ু—৩৩ ত্রিপুরা—৭ উত্তরপ্রদেশ—২ পশ্চিমবঙ্গ—৭৩। মোট—১৮২৭।

উল্লেখযোগ্য গোয়া হরিয়ানা ও মিজো-ম বাঘের অস্তিত্ব মেলেনি।

এখানে পশ্চিমবঙ্গের ফরেস্ট ডিভিশন ভিত্তিক বাঘের সংখ্যার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক ব না—

উত্তরবঙ্গের বকসা—১৭ জলপাইগুড়ি—কুচবিহার—৭ বৈকুণ্ঠপুর—৭ কার্শিয়াং—কালিম্পং—২ এবং দক্ষিণবঙ্গের সুন্দর-—২৫। মোট ৭৩। এই ক্ষেত্রে মনে রাখা ার দুর্গমতার দরুন সুন্দরবনের মাত্র পঞ্চমাংশ এলাকায় ১৯৭২ সালে ার কর্তৃক বাঘ গণনা সম্ভব হয়েছিল সংখ্যা পাওয়া গিয়েছিল ২৫টি। কিন্তু অঞ্চলের তৎকালীন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার শ্রীএ বি চৌধুরী ও তাঁর সহকারী অফিসার শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী নিজেদের উদ্যোগে কয়েক বছরের কষ্টসাধ্য চেষ্টায় সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা পেয়েছিলেন ১১২ থেকে ১১৫।

সর্বভারতীয় পর্যায়ে ব্যাঘ্র বংশের এই দুরবস্থা কেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আগেই করেছি।

উপরোক্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে বাঘের বংশ যাতে নির্বংশ হয়ে না যায় তার জন্য ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের আর্থিক সহযোগিতায় ভারত সরকার সারা দেশে কয়েকটি টাইগার রিজার্ভ বা ব্যাঘ্র-অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠার মনস্থ করে এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য একটি পর্যবেক্ষক দল নিযুক্ত করেন। ঐ পর্যবেক্ষক দল নিম্নোক্ত ৮টি স্থান টাইগার রিজার্ভ প্রতিষ্ঠার উপযোগী বলে জানান—

স্থান	প্রস্তাবিত এলাকা	বাঘের সংখ্যা
মানাস (আসাম)	২৯০০ বর্গ কিঃ মিঃ	৪০
পালামৌ (বিহার)	১৫০০ কিঃ মিঃ	৩৭
সিমলিপাল (উড়িষ্যা)	৩০০	(অনির্দিষ্ট: আলোচ্য সময়ে সংখ্যা পাওয়া যায়নি।
করবেট ন্যাশনাল পার্ক (উত্তরপ্রদেশ)	৩৬০ কিঃ মিঃ	৫০
রনথম্বোর (রাজস্থান)	৩০০ কিঃ মিঃ	১৪
কানহা (মধ্যপ্রদেশ)	১৩৮০ কিঃ মিঃ	৪২
মেলঘাট (মহারাষ্ট্র)	৯০০ কিঃ মিঃ	৪২
বন্দীপুর (মহীশূর)	২৬৪ কিঃ মিঃ	১৮

দুর্ভাগ্যবশত প্রথমাবস্থায় উপরোক্ত তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য কোন টাইগার রিজার্ভ নির্দিষ্ট ছিল না। ছিল না তার কারণ এ রাজ্যের তৎকালীন সর্বোচ্চ বন-বিভাগীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কোন উদ্যোগ নেননি। এমন কি আগ্রহ প্রকাশও পর্যন্ত করেননি। করেননি একথা সত্যই। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পর্যবেক্ষক দলের রিপোর্ট সম্বলিত ভারতীয় বন্য-প্রাণী পর্ষদ কর্তৃক প্রজেক্ট টাইগার নামক পুস্তকটি তন্নতন্ন করে খুঁজেও পঃ বঙ্গ বন-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের অনুরূপ কোন উদ্যোগ আগ্রহ বা প্রস্তাবের বিন্দুমাত্র চিহ্ন আমি পাইনি।

এই পরিস্থিতিতে ভারতের আদি ও সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যাঘ্র-অরণ্য সুন্দরবনে একটি টাইগার রিজার্ভ অনুমোদনের জন্য আমাদের সংস্থা পূর্বভারত বন্যপ্রাণী সংরক্ষন সমিতির পক্ষ থেকে ভারতীয় বন্য-প্রাণী পর্ষদের চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ করণ সিংকে সরাসরি একটি জরুরী অনুরোধপত্র পাঠাই। উল্লেখযোগ্য যে ডঃ করণ সিং অতি তৎপরতার সঙ্গে গুরুত্ব-সহকারে প্রস্তাবটি বিবেচনা করেন—যার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই সুন্দরবন ভারতের নবম টাইগার রিজার্ভ হিসেবে ঘোষিত হয়।

বলা বাহুল্য সুন্দরবনের মত নদী-বহুল জলকাদা শুলোয় ভরা দুর্গম বন পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। তাছাড়া বাঘের সংখ্যার বিচারে ভারতের অন্য যে কোন একক ফরেস্ট ডিভিশনের চেয়ে সুন্দর-বন ডিভিশনে বাঘ বেশী। এই বাঘ রক্ষা করতে পারলে সুন্দরবন তার নিজস্ব তাৎপর্যে সারা পৃথিবীর প্রকৃতি-প্রেমী পর্যটক গবেষক বিজ্ঞানী ও অভিযাত্রীদের আকৃষ্ট করবে ও পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মর্যাদা বাড়বে। এই মহারণ্যের উদ্ভিদ ও ব্যাঘ্রসহ গোটা প্রাণীজগতকে সংরক্ষণের কাজ সেই কারণেই আজ এত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী।

জাতীয় পশু বাঘ বাঁচানো ও তার সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হবে কিনা এটি একটি সর্বজনীন প্রশ্নরূপে আজ দেখা দিয়েছে। উত্তরে বলবো জনসাধারণের সচেতনতা বাড়িয়ে সর্বস্তরের সরকারী ও বে-সরকারী মহলের নিষ্ঠাভরা যৌথ উদ্যোগকে সংগঠিত ও সম্প্রসারিত করে আলোচ্য সমস্যার সফল সমাধান করা নিশ্চয়ই সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

বিরলপ্রাণী সংরক্ষণে পশু উদ্যানের ভূমিকা

রামকৃষ্ণ লহিড়ী

সারা পৃথিবীতেই আজ মানুষের সব থেকে বড় সমস্যা খাদ্যের এবং আশ্রয়ের। এই সমস্যা সৃষ্টির মূলে আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাবার জন্যে আমরা সকলেই একমত। কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের নজর দিতে হবে, প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে ফসলের যে ঘাটতি দেখা দেয়—তা থেকে কিছুটা অন্ততঃ রেহাই কিভাবে পাওয়া যায় এবং ফসলের উৎপাদন কি উপায়ে বাড়ান যায়। ফসল হয় মাটীতে, কিন্তু তার পরিমাণ নির্ভর করে আকাশের সহৃদয়তার উপর। আসলে ফসল ফলানোর উপযোগী আবহাওয়া বেশী রকম নির্ভরশীল অরণ্যসম্পদের উপর।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে বনাঞ্চল কমে গিয়ে পত্তন হচ্ছে সহরের আর গ্রামের। জনসংখ্যার হার কমার সঙ্গে সঙ্গেই নজর দিতে হবে বনাঞ্চল বৃদ্ধির দিকে।

বনাঞ্চল, বন্য পশুপাখীর জীবনের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এদের আশ্রয় বন আবার এরাই বনকে বাঁচিয়ে রাখে হিংস্রতা দিয়ে, নিজেদের দেহনিঃসৃত পদার্থ দিয়ে, মূলে ফলে বনের বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

সিংহ

কিন্তু আজকের মানুষ হাতিয়ারের জোরে হয়ে দাঁড়িয়েছে পশুর থেকেও হিংস্র মজা করে পশুমারা, বনাপশু ও তার দেহের অংশ নিয়ে ব্যবসা করা ইত্যাদি না [illegible] এবং সেই সঙ্গে নিজের আব[illegible]ম ও চাষের জমির এলাকা বাড়ানোর তাগিদে মানুষ আজ নিজেই নিজের লোভের ও দৌরাত্ম্যের শিকার হয়ে পড়েছে। আজকের মানুষকে মাথা খাটিয়ে ধৈর্য ও প্রচেষ্টার সঙ্গে সন্তর্পণে তার অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তাকে আজ নিজের প্রয়োজনের তাগিদে নজর দিতে হবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দিকে। আমাদের অবহেলায় বহু প্রাণী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কত গুলি প্রাণী এখন নিশ্চিহ্ন হবার পথে। সবার আগে এখন আমাদের ভাবতে হবে এদের কথা। আর একটুও সময় হাতে নেই। বন্যপ্রাণীদের প্রথমেই আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। এক হল যেসব প্রাণীর কথা আমরা খুবই শুনি অথচ তারা কেউই আজ আর পৃথিবীর কোথাও নেই। যেমন—ডো ডো পাখী, একশৃঙ্গবিশিষ্ট সুন্দরবনের ছোটজাতের গন্ডার ইত্যাদি

গণ্ডার

দ্বিতীয় যে সব প্রাণী আজ নিশ্চিত বিলুপ্তির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে যেমন বাঘ, কাশ্মীর হরিণ, আরবীয় ওরিকস, জায়েন্ট অতিকায় পান্ডা ভারতীয় সিংহ, গ্যালাপেগস দ্বীপের অতিকায় কচ্ছপ। তৃতীয়তঃ অদূরদর্শী এ মানুষ জাতটার সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করে যারা আজও কোন রকমে নিজেদের মোটের ওপর একটা সংখ্যা বজায় রেখেছে।

যেসব প্রাণী সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন শত আলোচনায়ও আর তাদের একটিকেও ফিরিয়ে আনা যাবে না। তবুও তাদের আলোচনা এই জন্য দরকার যে, কেন তারা নিশ্চিহ্ন হল, মানুষের কোন অবহেলা তার মূলে, সময়মত কি করতে পারলে তাদের বাঁচান যেত তার অনুশীলনের জন্য। সেই অনুশীলন থেকেই সারা পৃথিবীব্যাপী সভ্যমানুষের নজর পড়েছে আজ একটু চেষ্টা করলেই যাদের আমরা বাঁচাতে পারি তাদের দিকে। এদেরই আমরা নাম দিয়েছি বিরল প্রাণী। পৃথিবী জুড়ে বহু জাতের পশুপাখীর সংখ্যা এতই কমে গিয়েছে যে তাদের বনাঞ্চলে বাঁচিয়ে রাখা দুরূহ ব্যাপার। বিগত পয়লা মে, ১৯৭৩ সনে যে ভারতীয় বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন পশ্চিমবঙ্গে বলবৎ হয়েছে তার প্রথম তালিকায় এবং দ্বিতীয় তালিকার দ্বিতীয় খণ্ডে ৪৪টি স্তন্যপায়ী প্রাণী, ২৩টি পাখী ও তিনটি সরিসৃপ বিরল পর্যায়ভুক্ত বলে চিহ্নিত হয়েছে। স্তন্যপায়ীর মধ্যে বাঘ ভারতীয় সিংহ কৃষ্ণসার কস্তুরী-মৃগ বামন বরাহ কাশ্মীর হরিণ হাল্লুল উল্লুক থাকিন বুনোমোষ ইত্যাদি পাখীদের মধ্যে ময়ূর রাজধনেশ দেড়েল শকুন তুরমতি পাহাড়ী বটের মতিলাল শ্বেতপক্ষ বুনো হাঁস গোলাবসার ইত্যাদি এবং সরিসৃপের মধ্যে মেছো কুমীর নোনা কুমীর ও ঘড়িয়াল উল্লেখযোগ্য। এদের সকলেরই জীবন মুক্ত পরিবেশে বিপন্ন।

এই বিরল প্রাণী সংরক্ষণের কতকগুলি উপায় পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আছে পশু-উদ্যান, জাতীয় পশু উদ্যান মৃগদাব ও বন্য-প্রাণী খামার। এ ছাড়াও অভয়ারণ্য ও পশু-হনন সম্পর্কিত বিধিনিষেধেরও বড় ভূমিকা এ ব্যাপরে রয়েছে। এখানে আমরা আলোচনা করব পশুউদ্যান বা সমগোষ্ঠীর সমষ্টিগত-ভাবে পশু উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা নিয়ে।

এইসব সংস্থায় প্রথমত বিরল প্রাণীদের আচার ব্যবহার বাধি প্রজননের অনুকূল অবস্থা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। যে সব কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ সাম-ঞ্জস্য রক্ষা করে তারা আর নিজেদের বাঁচাতে পারছে না সেগুলো লক্ষ্য করা এবং সে সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় এবং আবার তাদের স্বাভাবিক পরিবেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশে বহুজাতের বন্যপ্রাণীর জীবন নানা কারণে বিপন্ন হয়েছিল কিন্তু আজও তারা অবলুপ্ত হতে পারেনি তার একমাত্র কারণ এইসব সংস্থার মাধ্যমে তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে বাঁচানর মত অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ও যথাযথ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। আমেরিকার বাইসন, কোয়ালা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। অনেক জাতের বন্যপ্রাণী আজও আছে যা প্রাকৃতিক পরি-বেশে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে কিন্তু আবদ্ধ অবস্থায় আজও বিদ্যমান যেমন ইউ-রোপের বাইসন ওয়াইল্ড হর্স বারবারি লায়ন ইত্যাদি।

জাতীয় পশু উদ্যান ও অন্যান্য পশু-সংরক্ষণ কেন্দ্র পশুশালা বা পশুউদ্যানের কাছে থেকে বিশেষভাবে সাহায্য পায়। বিরল প্রাণীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এইসব স্থানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বন্যপ্রাণী বিশেষ করে বিরল প্রাণী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য এই পশুশালার মাধ্যমেই আহরণ করার প্রকৃষ্ট উপায় আর এই বিশেষ জ্ঞানই বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে। এ ব্যাপারে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে যেমন—

চীন দেশের পিয়ার ডেভিড হরিণ। তার আদি বনভূমিতে শাল রাজত্বকালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আবে আরমন্দে ডেভিড ১৮৬৫ সালে পিকিং-এর কাছে

রাজকীয় মৃগদাবে এদের দেখতে পান! ১৯২১ সালে চীনদেশে এই রাজকীয় উদ্যানের শেষ জীবিত দলটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ ভাগে কয়েকটি এই জাতের হরিণ ইউরোপে পাঠান হয়েছিল। ডিউক অব বেডফোর্ড তার ১৬টি হরিণকে বেডফোর্ডশায়ারের উবার্ন পার্কে রেখেছিলেন। এই উবার্ন পার্কের দলটি ১৯২২ সালে ৬৪টিতে দাঁড়ায় এবং বেডফোর্ডের ডিউক বিভিন্ন পশুউদ্যানে তা বিতরণ করেন এবং ১৯৬৩ সালে ইউরোপে এই জাতের হরিণের সংখ্যা চারশর বেশীতে দাঁড়ায়। এই জাতের হরিণকে ১৯৬৪ সালে লণ্ডনের চিড়িয়াখানা থেকে চীনদেশে ফেরত পাঠান হয়। এখন পিকিং-এর চিড়িয়াখানায় তা রয়েছে এবং বংশবৃদ্ধিও করছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত আরবদেশের অরিকস যা এক সময় সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে পশ্চিমে সিনাই, উত্তরে সিরিয়ার মরুঅঞ্চল এবং পূর্বে ইরাক পর্যন্ত বিচরণ করত। কিন্তু ১৯৬৯ সালে তাদের সংখ্যা দুশর নীচে নেমে যায়। আই ইউ সি এন ও ফাউনা প্রিজারভেশন সোসাইটি ১৯৬২ সাল থেকে অপারেশন অরিকস প্রকল্প স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সাহায্যে চালু করেছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী বন্য অরিকস ধরে তাদের আবদ্ধ অবস্থায় পালন করে একটি জু-ব্যাংক গঠন করা। মোট ৪৭টি অরিকস ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এরিজোনাতে ১৬টি, ক্যালিফোর্নিয়ায় ৭টি, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের শামিতে ২৩টি, কোয়ায়েতে ১টি এবং আরও কয়েকটি রিয়াদ ও তাইজ পশুশালায় পালন করা হয়। এই প্রকল্পের কাজ পরিকল্পনা মতই এগিয়ে চলেছে। উদ্দেশ্য আবদ্ধ অবস্থায় এদের সংখ্যা বাড়ান এবং উত্তরকালে জাতীয় পশু উদ্যান ও অভয়ারণ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা।

হাওয়াই দ্বীপের ইল মিনেকে নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচান আরও চমকপ্রদ কাহিনী। এটা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র আবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে। নিনে বিরল পর্যায়ভুক্ত হাঁস। এখন কেবল হাওয়াইতেই পাওয়া যায় কিন্তু আগে জলেই এবং দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপেও পাওয়া যেত। ১৯৪৭ সালে এদের সংখ্যা পঞ্চাশেরও নীচে ছিল। ১৯৫৭ সালে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল একশরও কিছু বেশী আবদ্ধ অবস্থায়। এক-তৃতীয়াংশ বৃটেনে ছিল। পিটার স্কট ১৯৫২ সালে স্লিমব্রিজে এদের বাঁচানর জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেন। ১৯৫৮ সালে এই জাতের হাঁসের এক জোড়া যুক্তরাষ্ট্রে ডাঃ ভিলন রিপ্লেকে পাঠান হয়। তিনি ১৯৬৫ সালের ভেতরে তা ২৫টিতে বাড়িয়ে তোলেন। ১৯৫৫ সালে পোহাকুলাও অঞ্চলে ২৮টি নিনেকে দেখা যায়। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে এই জাতের হাঁসের বংশ বৃদ্ধি এবং তার আদি বাসস্থানে নিনে প্রকল্প চালু করা হয়। ২০ বর্গমাইল বিস্তৃত হালিয়াকালার সুপ্ত আগ্নেয়গিরির এলাকায় ৯৩টি স্লিমব্রিজের ওয়াইল্ড ফাউল ট্রাস্ট থেকে, ২৬টি হাওয়াই-এর নিনে প্রকল্প থেকে এবং ৭টি ডাঃ রিপ্লের কাছ থেকে নিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। একটি সাম্প্রতিক গণনায় হালিয়াকালার এলাকাতে ৫০০টি নিনে দেখা গিয়েছে। যে পাখী নিশ্চিত অবলুপ্তির পথে চলেছিল আজ তা তার বাসভূমিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত।

আমরা সকলেই জানি হাতীর দাঁত ব্যবসায়ীদের কাছে একটি অতি লোভনীয় বস্তু। বহু প্রাচীনকাল থেকেই হাতীর দাঁত সংগ্রহকারীরা আফ্রিকার অরণ্যাঞ্চলে, সব থেকে বড় এবং শক্তিশালী দাঁতাল হাতীগুলোকেই আগে হনন করেছে। আমরা জানি যে, বড় বড় এবং উচ্চগুণসম্পন্ন দাঁত একমাত্র বিশাল এবং শক্তিশালী হাতীর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু বেছে বেছে বহুকাল ধরে এদেরই হনন করার ফল দাঁড়িয়েছে—হাতীর পরবর্তী পুরুষ, পুরুষাক্রমে ক্রমশই ক্ষীণবল এবং ক্ষুদ্রাকার হয়ে এসেছে।

অথচ এই ব্যবসায়ের চিন্তাটাই পশুহননের পথে না গিয়ে যদি যেত সংরক্ষণের কোনও উপায়ের দিকে ব্যবসায়ী লাভের ক্ষেত্রে তারও যে মূল্য খুব কম হত তা নয়।

পৃথিবীর সব জাতেরই কুমীর আজ বিপন্ন। থাইল্যাণ্ডের যে লোকটির নাম উ যাই ইয়ং প্যাপাকর্ণ খুবই সাধারণ অবস্থার মানুষ মাত্র কয়েক বছর আগে তার নজর পড়লো কুমীরের দিকে। উ যাই এর খামারের নাম সামুথ প্রাকন কুমীর খামার চাওফিয়া নদীর মুখে উ যাই এর নিজের মালিকাধীনে পরিচালিত। এই খামারের আজ বিশ্বজোড়া নাম। এখানে কুমীর ছাড়া অন্য কিছু রাখা হয় না। এক দিনের বাচ্চা থেকে ৫০ বছরের বয়স পর্যন্ত সব বয়সের এবং সব জাতের যথা মিঠেজল বা নোনাজল কুমীর, থাইল্যাণ্ডের তিন জাতের কুমীর দক্ষিণ আমেরিকা কাইমন আফ্রিকার নীল নদের কুমীর ঘড়িয়াল ইত্যাদি সযত্নে আবদ্ধ অবস্থায় পালিত হচ্ছে। উ যাই মিঠেজল এবং নোনাজলের কুমীরের বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

১৯৫০ সালে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই খামারের গোড়াপত্তন কিন্তু আজ এটা থাইল্যাণ্ডে পর্যটকদের বিরাট আকর্ষণের বস্তু। এই খামারটি বিশ্বের অন্যতম বিরল কুমীর প্রজনন কেন্দ্র। উ যাই এক বছরে তিন হাজার পাঁচশরও বেশী বাচ্চা কুমীর ডিম থেকে ফুটিয়েছেন। এখন তার খামারে কুমীরের সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশী এবং তার আয়ও বহু লক্ষ টাকা। থাইল্যাণ্ডের এই কুমীর উদ্যানে আবদ্ধ অবস্থায় কুমীর পালন ও তার বংশবৃদ্ধি এবং বিরল পর্যায়ভুক্ত কুমীরদের সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংরক্ষণের উপযোগীতা ছাড়াও আর্থিক দিক দিয়ে এটা একটা মহামূল্যবান সম্পদ। সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে ভারতে যে তিন জাতের কুমীর আছে তাদের জীবনও আজ বিপন্ন। ভারত সরকার কয়েকটি রাজ্যে থাইল্যাণ্ডের খামারের অনুরূপ কুমীর প্রকল্প হাতে নিচ্ছেন। সুখের বিষয় এই প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গেও চালু করা হবে। দেখা যাচ্ছে প্রাণী সংরক্ষণ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও একটি সহায়ক পন্থা।

বিগত কয়েক দশক ধরে দেশ বিদেশে বহু বিরল পর্যায়ভুক্ত প্রাণীদের পশু উদ্যান বা বন্যপ্রাণী খামারের মাধ্যমে নিশ্চিত অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচান হয়েছে এমন কি এই সব পশু উদ্যানে সযত্নে রক্ষা করা হচ্ছে এমন অনেক প্রাণী যা আজ বন্য প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। পশু উদ্যান বা বন্যপ্রাণী খামার সংরক্ষণের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইতিমধ্যেই নিয়েছে। আশা করা যায় খুব শিঘ্রই আমাদের দেশেও এই সব সংস্থার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে আর তার মাধ্যমে আমাদের দেশে বিরল পর্যায়ভুক্ত প্রাণীদের নিশ্চিত ধ্বংস রোধ করে বনাঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারা যাবে।

শকুন

বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নিরূপণে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ভূমিকা

কল্যান চক্রবর্তী

বন্যপ্রাণী গবেষণায় পরিসংখ্যান বিজ্ঞান যে এক অপরিহার্য অঙ্গ তা আজ সকলেই বিনা দ্বিধায় স্বীকার করেন। আর পরিসংখ্যানভিত্তিক বন্যপ্রাণী গবেষণার প্রাথমিক ও আবশ্যিক উপাদান হোল বন্যপ্রাণী সংখ্যার বিজ্ঞানসম্মত নির্‌পণ। বন্যপ্রাণীর সংখ্যা সঠিকভাবে নির্‌পিত না হোলে কিন্তু বন্যপ্রাণী গবেষণাক্ষেত্র অতি শোচনীয়ভাবে অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নির্‌পণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন : (১) যে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নির্‌পণ করা হচ্ছে তার সম্পর্কে সম্যক ব্যবহারিক জ্ঞান (২) উক্ত বন্যপ্রাণীর সংখ্যাতাত্ত্বিক অসাদৃশ্য (৩) বন্যপ্রাণীর আগমন-নির্গমনের ক্ষমতা, আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, সংজনন ক্ষমতা ও আপেক্ষিক নশ্বরতাসূচক। তাই স্বাভাবিক কারণেই এক এক প্রকার বন্যপ্রাণীর জন্যে এক-একটি বিশেষ পদ্ধতিই বিজ্ঞানসম্মত। তবে যে কোন বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নির্‌পণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দুটি মৌলিক অনুমান করা হোয়ে থাকে :

(১) বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নির্‌পণের জন্য উপাত্ত সংগ্রহের সময় উক্ত প্রাণীর নশ্বরতা ও পুনরুদ্ধার অতি সামান্য অথবা ঐ সম্পর্কীয় অনুমিত উপাত্ত নির্‌পণ দুটি বিষয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে সংশোধিত হয়েছে। বন্যপ্রাণীর নির্গমণ ও আগমনকে যথাক্রমে প্রাণীসংখ্যার নশ্বরতা ও পুনরুদ্ধার হিসেবে ধরা হয়।

(২) বন্যপ্রাণী সমষ্টির অন্তর্গত প্রতিটি প্রাণীর সংখ্যা নির্‌পণের ক্ষেত্রে এক অভিন্ন (বা জ্ঞাত) সম্ভাবনা থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নির্‌পণ পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ কোন বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নির্‌পণের জীবন্ত ফাঁদ পদ্ধতিতে বন্যপ্রাণীর ফাঁদ ভীরুতা বা ফাঁদ আসক্তি বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নির্‌পণের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অন্তরায়। সংখ্যা নির্‌পণের ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণীর সমষ্টির সঙ্গে মিশ্রণ লক্ষ্যহীন হওয়া দরকার। বয়স, স্ত্রী-পুরুষ প্রভেদ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে বন্যপ্রাণীর উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে দলবদ্ধ না থাকা বিজ্ঞানভিত্তিক সংখ্যা নির্‌পণে আর একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান।
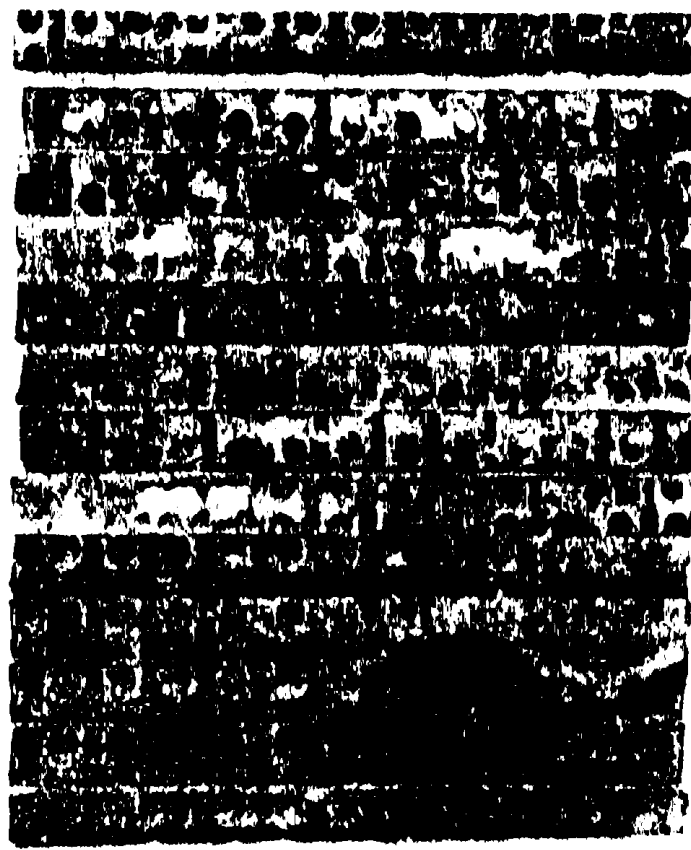
'সংখ্যা গণনা' শব্দটি স্ত্রী পুরুষ প্রভেদ ও বয়স ইত্যাদি বিষয়ে কোন একটি প্রদত্ত ক্ষেত্রের সংখ্যাই সূচিত করে। বন্যপ্রাণী সংখ্যা নির্‌পণের ক্ষেত্রে প্রকৃত গণনা প্রায়শঃই অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাই সংখ্যা নির্‌পণের ক্ষেত্রে 'নমুনা সমীক্ষা'র সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এরূপ গণনায় একটি আপেক্ষিক সুবিধা এই যে, এরূপ নমুনা সমীক্ষাভিত্তিক রাশির সংখ্যাতাত্ত্বিক ভ্রমশূন্যতা নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও 'নমুনা সমীক্ষা' পূর্ণ সমীক্ষা অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। যে কোন সংখ্যা নির্‌পণের পূর্বে তাই একটি আবশ্যিক কর্তব্য হোল ঐরূপ সংখ্যা নির্‌পণের আপেক্ষিক ভ্রমশূন্যতা ও অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ। বন্যপ্রাণী সংখ্যা নির্‌পণের ক্ষেত্রে একটি অধিকতর জটিল উপাদান হোল বন্যপ্রাণী সমষ্টির নির্ধারণক্ষম ভগ্নাংশ নির্‌পণ। ভিন্ন ভিন্ন জাতি-প্রজাতির পাখীর সংখ্যা নির্‌পণের ক্ষেত্রে এরূপ নির্ধারণক্ষম ভগ্নাংশ নির্‌পণের প্রয়োজন হয়। যেমন, 'ফেজ্যান্ট' বা 'ঘুঘুর' কেবলমাত্র আহ্বানসূচক স্বর থেকে যদি সংখ্যা নির্‌পণের চেষ্টা করা হয়ে থাকে তবে ঐ প্রজাতির পাখীদের শব্দ না করার ভগ্নাংশটি সম্পর্কে অজানা হলে সঠিক সংখ্যা নির্‌পণ সম্ভব হয় না।

বাইসন

কাঠবেড়াল

লালপাণ্ডা

বন্যপ্রাণীর সমষ্টিগত পঠনপাঠনে প্রচুর শ্রম ও সময় ব্যবহার করা হয় মূলতঃ দুটি বিষয়ে। একটি হল ঐ বিষয়ের উপাত্ত সংগ্রহে ও সংগৃহীত উপাত্তের বিস্তারিত করণে। কিন্তু এ সকল পদ্ধতির মূল ও অন্তর্নিহিত অনুমান সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ বা পঠন-পাঠনের এখনও যথেষ্ট অবকাশ আছে। একটা মৌলিক অনুমানের দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটার আর একটু পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যেমন ধরা হয়ে থাকে যে অজানা অনুপাতটি জানা অনুপাতের সমান। ধরা যাক কোন একটি পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা সম্ভব হল যে একটি মোরগ প্রতি ঘন্টায় ১৫ বার করে ডাকে। তারপরে বন্যপ্রাণী সংখ্যা নিরূপণের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কোন এক বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে শোনা গেল যে এক ঘন্টায় ৪৫টি মোরগ ডাকার আওয়াজ। অতঃপর যদি মোরগের সংখ্যা ৩ (তিন)টিতে নির্ধারণ করা হয় তবে আমরা নিঃশব্দে একটি অনুমান করলাম যে পূর্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে উদ্ভূত 'জানা' অনুপাতটি পরের 'অজানা' পরিবেশের অনুপাতের সমান। তাই যে জীববিজ্ঞানী বন্যপ্রাণী সম্পর্কে গবেষণায় ব্রতী আছেন তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে এই সকল অনুমানের পরিসংখ্যান-ভিত্তিক যথার্থতা নির্ধারণ।

জীববিজ্ঞানী ভাইস (১৯৫২) সমষ্টি-গতভাবে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নিরূপণের পদ্ধতিগত দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কেণ্ডেই (১৯৪৪) বিভিন্ন প্রজাতির পাখীর সংখ্যা নিরূপণের উপরে গবেষণা করেছেন। বিজ্ঞানী রিকার (১৯৫৮) মাছের সমষ্টিগত গবেষণার পদ্ধতির উপরে আলোকপাত করেছেন। বিজ্ঞানীদ্বয় ডর্ণ (১৯৫৪) ও ডেভিস (১৯৫৬) বন্যপ্রাণী সংখ্যা নিরূপণের গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান যুগিয়েছেন। বন্যপ্রাণী সংখ্যা নিরূপণের পদ্ধতিকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :— (১) প্রকৃত সমষ্টি গণনা (২) নমুনা সমীক্ষা ও (৩) কোন সূচক গণনা।

(১) প্রকৃত সমষ্টি গণনা ঃ

সমষ্টি নির্ণয়ের এটি একটি স্বাভাবিক পদ্ধতি। কিন্তু বিশেষ অবস্থা ব্যতিরেকে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এরূপ পদ্ধতি ব্যবহারের কতকগুলি অসুবিধা আছে, যেমন (১) অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা খরচ অনেক বেশী (২) একসঙ্গে অনেক গণনাকারীর প্রয়োজন হয় (৩) পদ্ধতির স্বাভাবিক কারণেই দ্রুত সম্পাদন সম্ভব নয় (৪) এই পদ্ধতিটির পরিসংখ্যান ভিত্তিক ভ্রমশূন্যতা নির্ধারণ প্রায়শঃই সম্ভব হয় না।

তবে এ পদ্ধতিটির কিছু কিছু সুবিধাও আছে ঃ (১) পদ্ধতির ব্যবহার সহজতর (২) পদ্ধতি সাধারণ গণনাকারীর পক্ষে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। (৩) কোনও বিশেষ স্থানের পক্ষে এ পদ্ধতির ব্যবহারও সহজসাধ্য।

যে কোন সমষ্টি গণনা পদ্ধতিতে যেখানে সরাসরি গণনা হয়ে থাকে সেখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল যে এরূপ সরাসরি গণনাকার্য যথেষ্ট সমান অবস্থার মধ্যে করা প্রয়োজন যাতে একের সঙ্গে অপরের তুলনা-মূলক বিচার সম্ভব। এই সকল সমান অবস্থাদির নির্বাচনও পরিসংখ্যান ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবে এরূপ নির্বাচনের মাপকাঠি হিসেবে দেখা দরকার যে কোন অবস্থা থেকে উদ্ভূত রাশির গড় অন্যটি অপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ রূপে বেশী না হয়। এ ব্যাপারে পরিসংখ্যানের কতক-গুলি পরীক্ষিত উপাত্তের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

(২) ও (৩) ঃ নমুনা সমীক্ষা ও সূচক গণনা ঃ

নমুনা সমীক্ষা পরিসংখ্যানের এক যুগান্তকারী পরীক্ষিত সত্য। এ পদ্ধতির ব্যবহার বন্যপ্রাণী গণনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে কেবলমাত্র বন্যপ্রাণীর সরাসরি গণনা করা ব্যতিরেকে কোন বিশেষ চিহ্নেরও নমুনা সমীক্ষা স্বাভাবিকভাবেই করা হয়ে থাকে। সুন্দরবনের বাঘের ক্ষেত্রে এরূপ পদচিহ্নের নমুনা সমীক্ষা এক
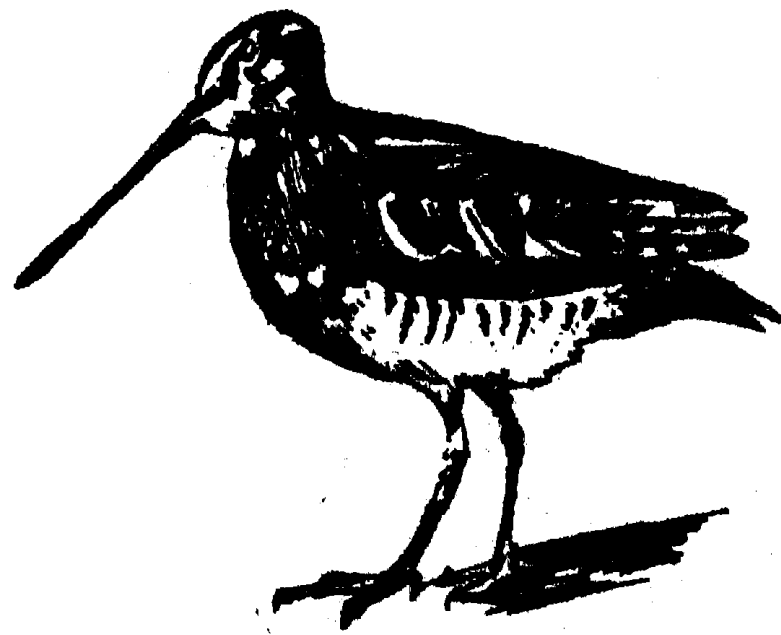
খঞ্জন

সারস

কাদাখোচা

পানকৌড়ি

বিশেষ ও উপযুক্ত পদ্ধতি বলা যায়। কারণ সুন্দরবনের বাঘ চোখে দেখার সম্ভাবনা এত কম যে এর উপারে ভিত্তি করে কোন সংখ্যা নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব। তাই পদাচিহ্নের নমুনা সমীক্ষার উপরে নির্ভর করাই পরিসংখ্যানসম্মত।

বন্যপ্রাণী গণনার নমুনাভিত্তিক পদ্ধতিতে কিংয়ের পদ্ধতির ব্যবহার হয়ে থাকে : এ পদ্ধতির ব্যবহার অবশ্য কোন সরু লম্বা ফালির ক্ষেত্রে করা হয়। এ পদ্ধতিতে একটি পূর্ব নির্ধারিত সরল রেখা গণনাকারী অতিক্রম করে এবং সে সরল রেখার দু দিকে যত বন্যপ্রাণী দেখা যায় সেটা গণনাকারী লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর বন্যপ্রাণীর ঐ উল্লিখিত ফালি থেকে দ্রুত ধাবিত হওয়ার দূরত্ব নির্ধারণ করা হয়। তখন উক্ত দ্রষ্টব্যস্থানের বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নিম্নলিখিত গাণিতিক সমীকরণ থেকে নির্ণয় করা হয় :

পি— এ এন
―――――
২ ডি এল

যেখানে পি—বন্যপ্রাণীর সংখ্যা

এ— দ্রষ্টব্য ক্ষেত্রের মোট ক্ষেত্রফল।
এন—ধাবিত বন্যপ্রাণীর সংখ্যা।

ডি—বন্যপ্রাণীর ধাবন করার দূরত্বের গড়।

এল—উল্লেখ্য সরলরেখার দৈর্ঘ্য।

জীব বিজ্ঞানী ডেভিস (১৯৪২) বন্যপ্রাণী গণনার এক পরিসংখ্যান ভিত্তিক পদ্ধতি নির্ণয় করেছেন। সেটা নিম্নে দেওয়া হোল। কোন জানা রাস্তায় যেতে যেতে যতগুলো বন্যপ্রাণী দেখা গেল সেটা লিপিবদ্ধ করা হল। অতঃপর সেই জানা রাস্তায় একটা বিশেষ সময়ে পুনঃ পুনঃ যাওয়ার পর তার গড় ও স্বাভাবিক বিচ্যুতি করা হল। অতঃপর বিবর্তনের সহগ নির্ধারণ করা হল প্রতিটি প্রজাপতি ও স্থানকে ভিত্তি করে ও অতঃপর তুলনা করা হল কোন জানা বন্যপ্রাণী সমষ্টির বিবর্তনের সহগ নির্ধারণের সঙ্গে। যদি অজানা সহগ উক্ত নির্ধারিত সহগের বেশী হয় তবে সেই প্রজাপতিকে বাদ দেওয়া হয় বন্যপ্রাণী গণনা থেকে কারণ সেটা অতিমাত্রায় ত্রুটিপূর্ণ সংখ্যা দেবে। এ পদ্ধতিতে বস্তুগত ভিত্তিতে কোন প্রজাতিকে বন্যপ্রাণী গণনা থেকে বাদ দেওয়া বা যোগ করা সম্ভব।

জীব বিজ্ঞানী হাওয়েল (১৯৫১) ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির সংযোজন করে একটি পদ্ধতি নির্ণয় করেন। এ পদ্ধতিতে বন্যপ্রাণীর সংস্পষ্টতার একটি গাণিতিক অনুমান নির্ণয় করা হোয়েছে।

মাছ ধরার পরিমাণ থেকে মাছের সমষ্টিগত পরিমাণ নির্ণয় করা যেতে পারে। প্রাণী বিজ্ঞানী জিপিনের (১৯৫৬) পদ্ধতি অনুসারে যদি সি-১ ও সি-২ দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের মাছ ধরার পরিমাণ হয় একই জলাশয়ের তবে মাছের সমষ্টিগত পরিমাণ নিম্নলিখিত সমীকরণের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয় :

এন—সি২ যেখানে এন মাছের
সি১ সি২ সমষ্টিগত পরিমাণ।

হাড়গিলা

কানঠুঁটি

এ পদ্ধতির ভ্রমশূন্যতা সম্বন্ধে মন্তব্য করার প্রথমেই বলা যায় যে এ পদ্ধতিতে প্রথম বারের মাছ ধরার পরিমাণ (অর্থাৎ সি ১) যদি দ্বিতীয় বারের মাছ ধরা পরিমাণের (অর্থাৎ সি২) সমান বা অপেক্ষাকৃত কম হয় তবে এ সমীকরণ ব্যবহার করা অসম্ভব হয়ে যায়। তাই এ পদ্ধতি ব্যবহারে একটি পূর্ব প্রয়োজন হল যে উল্লেখ মাছ ও জলাশয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা।

আনুপাতিক পরিবর্তনের উপারে ভিত্তি করেও বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। যেমন কোন বিশেষ স্থানে হরিণের গমনাগমনের সংখ্যা হোল : ডবল্যু ১ অতঃপর ধরা যাক সে স্থান থেকে হরিণ অপসারণ করা হোল, তার সংখ্যা : এন এবং অতঃপর যে স্থানের হরিণের গমনাগমনের সংখ্যা নির্ণয় করা হল, ধরা যাক সেটি : ডবল্যু২ এখন যদি অপসারণ করার পূর্বে হরিণের সংখ্যা যদি এন১ ও পরে এন২ হয় তবে সমীকরণটি জীব বিজ্ঞানীদের মতে এ ভাবে করা যায় :

ডবল্যু ১—ডবল্যু ২
―――――
এন

ডবল্যু ১—ডবল্যু ২
―――――
এন ১—এন ২

উপরি উক্ত সমীকরণের সাহায্যেও বন প্রাণী সংখ্যা নিরূপণ সম্ভব।

বন্যপ্রাণী গণনা সম্পর্কে স্থান, কাল বাসস্থান ভিত্তিক আরও মৌলিক গবেষণার অবকাশ আছে সেখানে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানী নিতে হবে মুখ্য ভূমিকা। সে সব নতুন নব পদ্ধতি মানব সভ্যতার ইতিহাসকে যে নব যুগের সন্ধান এনে দেবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষনের প্রয়োজনে

জগদীশেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য / নির্মল সরকার

নাগাসাকি ও হিরোসিমাতে পরমাণু বোমা ব্যবহার করার কথা চিন্তা করলে মনে হয়, আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা থাকলেও অনেক দিক দিয়েই আমরা যে শুধু বন্য থেকে গিয়েছি, তা নয়, যে কোন তথাকথিত বন্যপশুর চাইতে এখনও মানুষ বেশী বিপদজ্জনক জীব হয়ে রয়েছে। আমাদের বনজঙ্গলের চমৎকার প্রাণীগুলিকে এবং সুন্দর সুন্দর যে পাখীরা আমাদের জীবনকে মধুর করে তোলে তাদের তো আমরা বন্যোজীব বলেই উল্লেখ করি। ভাবতে গেলে অবাক লাগে যে, এই পশুপাখীরা মানুষের বিষয়ে কি মনে করে, আর সাধ্য থাকলে তারা মানুষকে যে কী বলে বর্ণনা করতো, তাদের সে বর্ণনা মানুষের পক্ষে খুব প্রশংসাসূচক হোত কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

গত পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে সারা ভারতবর্ষে শিকারযোগ্য বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে: এমনকি স্থান বিশেষে কোন কোন প্রাণী একেবারে লোপ পেয়েছে। এই পশ্চিমবঙ্গের কথাই যদি ধরা যায়, তাহলে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, অবিভক্ত বাংলার সুন্দরবনে একশৃঙ্গ গণ্ডার ও বন্য মহিষ প্রচুর পরিমাণে দেখা যেত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন এদের কোন অস্তিত্বই নেই। আরও শোনা যায়, পঁচিশ-তিরিশ বৎসর আগে মালদহ জেলায় নীলগাই, পশ্চিমবঙ্গে কৃষ্ণসার ও উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে ডাহরপাখী (ফ্লোরিকান) যথেষ্ট দেখা যেত কিন্তু আজ এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।

অরণ্য জীবন সর্বদাই সংকট-সংকুল। সেখানে প্রবলেরা দুর্বলদের শিকার করে, আর দুর্বলেরা নিজেদের বাঁচাবার জন্য নানান ফন্দি আর ছদ্মবেশ উদ্ভাবন করে নেয়। কিন্তু অরণ্যের এই চিরাচরিত প্রথার উৎপত্তি হয়েছে প্রধানত খাদ্য সংগ্রহের তাগিদে। মৃগয়া ও খাদ্যের জন্য এবং মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য কতক পরিমাণে বন্যপ্রাণীর হত্যা প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু হিংস্র পশুদেরও অবাধ হত্যা ও তার শেষ ফল বংশলোপ কোন মতেই সমর্থন করা যেতে পারে না। বন্যপ্রাণীর সংখ্যা কমতে থাকলে এর পরিণাম যে কি হবে তা গভীরভাবে চিন্তা করার দিন এসেছে। আপাতদৃষ্টিতে অকল্যাণকর ও অবাঞ্ছিত মনে হলেও জগতে প্রত্যেক প্রাণীরই একটা না একটা সার্থকতা আছে। এবং প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট নিয়মে যে যার কর্তব্য যথাযথ সম্পাদন করে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা রক্ষা করছে। স্মরণাতীত কাল থেকে নির্বিচারে হত্যা করে করে ভারতের বন্যপ্রাণীদের একে একে নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তির মুখে টেনে নিয়ে এসেছি আমরা। দুশিংওলা গণ্ডার, শিকারী চিতা ইত্যাদি অনেক জীবই আধুনিক কালের মধ্যেই ভারত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

চিন্তা করা যাক ভবিষ্যতের কথা। ২০০০ খৃস্টাব্দের কথাটা ভেবে দেখুন। শুধু শেয়াল, ইঁদুর, শকুনি, চিল শঙ্খচিল কাক আর চড়াই পাখীর মত এমন সব বুনো জীবই তখন অবশিষ্ট থাকবে। যারা ঘন মনুষ্য বসতিপূর্ণ লোকালয়ের মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। নয়নাভি-

নেকড়ে

বজ্রকীট

ভালুক

জন্য বাঘ গর্বস্ফীত ময়ূর এবং বনাঞ্চলের ভূস্বামি অঞ্চলের অন্যসব অপরূপ অধিবাসীরা যদি লুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে মানুষের জীবন শুধু নিরানন্দই না হয়ে যাবে। এ সবই হতে পারে এবং অতি অবশ্যই হবে—যদি না সময় থাকতে এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। এ সমস্যা শুধু ভারতবর্ষেরই নয়, সারা পৃথিবীর সমস্যা। তারই জন্য পাশ্চাত্যদেশে ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের জন্য বন্যপ্রাণী এবং জনহীন স্থানগুলি বাঁচিয়ে রাখার জন্য সযত্নে পরিকল্পনা হচ্ছে। তারই জন্য পাশ্চাত্য-দেশে একটি বিশ্ব বন্যপ্রাণী ভান্ডার প্রবর্তিত হয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কীয় প্রাচীনতম লিপিবদ্ধ বিধানের দাবী ভারতবর্ষই করতে পারে, কারণ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে অশোকস্তম্ভে খোদিত সম্রাট অশোকের একটি ঘোষণায় এরূপ একটি বিধানের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ ঘোষণায় বহু চতুষ্পদ পশু, পক্ষী, মৎস্য ইত্যাদি হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নির্দিষ্ট কয়েক পর্যায়ের পশু পাখী, মৎস্য প্রভৃতির জন্য স্থানে স্থানে নিরাপদ বা অভয়ারণ্যের প্রতিষ্ঠা ও সুনাধক্ষ্য নামে বিশেষ কর্ম-চারীর তত্ত্বাবধানে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। সংরক্ষণের নিয়মভঙ্গে শাস্তিরও ব্যবস্থা ছিল। পুরাকালে ধর্মভাবের জন্য ভারতবর্ষে যে সকল স্থানে শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল তার মধ্যে এমন কতকগুলি স্থান আছে (হরিদ্বার) যেখানে আজ পর্যন্ত কোন প্রাণী এমনকি মাছ পর্যন্ত হত্যা করতে দেওয়া হয় না। অন্যান্য স্থানে কঠিন আইন থাকা সত্ত্বেও গোপন শিকার করা সম্ভব হলেও, এই সকল পুণ্যস্থানে জন-মত এত প্রবল যে সেখানে কোন প্রাণী হত্যা করা সম্ভব নয়।

যদি ৩০০ খৃস্টপূর্বাব্দে এবং ২৪২ খৃস্টপূর্বাব্দের মত দূর অতীতকালের ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব-পূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে তাহলে বর্তমানকালে সে বিষয়টি নিশ্চয় প্রথম শ্রেণীর অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য বলে স্বীকৃত হবে। আগেকার দিনে প্রথাই ছিল কেষ্টবিষ্টু লোকেরা যেমন বড়লাট সাহেব—সত্যিকার একটা বড় বাঘ মারবেনই। বৃটিশ রাজত্বেও দ্রুতক্ষীয়মাণ অরণ্যজীবকুলকে রক্ষার একটা চেষ্টা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু মানুষের সংসারে অবিরাম ও ভয়াবহ বৃদ্ধির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলো না সেই প্রচেষ্টা।

দুঃখের বিষয় এই যে, এত সুবিবেচিত ও কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও একমাত্র সর-কারী সংরক্ষিত বনগুলিতে অল্পবিস্তর বিধি-নিষেধ বলবৎ সম্ভব হলেও এ-দেশে অন্য সর্বত্র বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় বর্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। এর প্রধান কারণ এই যে, সরকারী বনের বাইরে এই আইনগুলি কার্যকরী নয়। এছাড়া নিম্নলিখিত কারণগুলিও বিশেষ বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে অনেক চর্মসংস্কারক কারখানা স্থাপিত হয়েছে, ফলে সকল প্রকার চর্মের চাহিদাও বেড়ে গেছে।

২। আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা ও ধ্বংসকারীর শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাস্তাঘাটেরও বিশেষ উন্নতি হয়েছে। ফলে চোরাশিকারীদের উৎপাত বেড়েছে।

৩। সরকারী সংরক্ষিত বনের এবং বাইরে খণ্ডজঙ্গলের অত্যধিক সংকোচন হয়েছে, ফলে বন্যপ্রাণীর পর্যাপ্ত আশ্রয়ের অভাব ঘটেছে।

৪। ক্রমবর্ধমান সহরের চাহিদা মেটানোর জন্য যাযাবর পক্ষীর সংখ্যা কমে গেছে।

৫। বনজসম্পদের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় সেই বিশেষ চাহিদা মেটানোর জন্য বনসংকোচন ঘটে।

৬। সরকারী বনভূমির সৃজন ও রক্ষার সঙ্গে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিশেষ সর-কারী কর্মচারীর অভাব, ফলে অ[illegible] শিকারের নিবারণার্থে উপযুক্ত কার্য[illegible] কর্মচারীর সংখ্যা কম।

এই সকল অবস্থা উন্নতির পরিপ[illegible] এবং বন্যপ্রাণীদের জীবনে বিপর্যয় [illegible] আনতে পারে, ফলে বন্যপ্রাণী ক্রমে [illegible] নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। তাতে [illegible] দেশের অকল্যাণই হবে। বৃটিশ রাজত্ব[illegible] প্রধানত বড় আর ছোট শিকারের জন্তু যাতে ফুরিয়ে না যায়, তা ঠিক রা[illegible] জন্য বিভিন্ন প্রদেশে তাদের রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই একই উদ্দেশ্যে অনেক দেশীয় রাজ্যের রাজারা ১৯৩৫ সালের সংরক্ষণের আরো বেশী ব্যবস্থা করে-ছিলেন। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ এই সৎ কাজের অনেকটাই নষ্ট করে ফেলল। তারাই এখন মালিক এই কথাটা হঠা[illegible] উপলব্ধি করেও তারা প্রায়ই বনেজঙ্গলে গিয়ে যা পেত তাই হত্যা করত। এই অবস্থা যাতে চলতে না পারে ১৯৫২ সালে প্রথ[illegible] ভারতীয় ইন্সপেক্টর জেনারেল অ[illegible] ফরেস্টস হিসাবে শ্রী এম ডি চতুর্বেদ[illegible] সর্বপ্রথম বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ব্যাপার[illegible] প্রবর্তন করেন এবং একটি ভারতীয় বন্য-প্রাণী পর্ষদ গঠন করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই প্রচেষ্টা খুব কার্যকরী হয় না। এই সব কারণেই ভারত সরকারের [illegible] ১৯৭২ সনে একটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করেন। পশ্চিম বাংলায় ঐ আইন ১৯৭৩ সালে চালু করা হয়। অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বন্যপ্রাণী শিকার ব্যবসা ও রপ্তানী যাতে না ঘটতে পারে তারই জন্য এই আইন চালু করা হয়েছে। এই আইনে পশু ও পাখীর প্রয়োজনীয় ভিত্তিতে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সাধারণের অবগতির জন্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের পাঁচটি তপশীলভুক্ত পশুপক্ষীর বাংলা নাম [illegible] হল যেসব পশুপাখীর বাংলা নাম [illegible] পাওয়া যায় না তাদের আঞ্চলিক নামে বা ইংরেজী নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

বন্যপশুপক্ষী সংরক্ষণে জনগণের ভূমিকা

সুনীতিপ্রসন্ন মল্লিক

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্য
শ্যামলাং মাতরম্

বঙ্কিমচন্দ্রের উপরোক্ত উক্তি কেবলমাত্র
ামবঙ্গেই নয়—সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে
জ্য। কেন না ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান
। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বন্য পশুপক্ষী
পতঙ্গের কৃষির ক্ষেত্রে এক বিরাট
কা আছে। কারণ গাছগাছড়া প্রভৃতি
ক্ষয় রোধ করে বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ করে
র জল ধরে ও উপরের দিকে রাখে
াদি। আর এই গাছগাছড়া নিয়ন্ত্রিত
পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ। সর্বোপরি বন্য
পক্ষী প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখে।
রাং বন্য পশুপক্ষী মনুষ্য সমাজের খুবই
াজনীয় যদিও আমাদের অনেকের ধারণা
এরা আমাদের ক্ষতি ছাড়া আর কোনও
জ লাগে না। প্রাণীজগতে আমাদের
ই-এর খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ—এমনকি
ভূত গাছগাছড়াও এর আওতায় পড়ে।
খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ প্রাকৃতিক ভারসাম্য
ায় রাখতে অনেক সাহায্য করে। তাই
াবসমাজ ও প্রাণীজগতে এক নিবিড়
ন্ধ আছে এবং এর যে কোনও একটিকে
ড়া কোনও সৃষ্টি গড়ে উঠতে পারে না।
তরাং আমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই
পশুপক্ষী সংরক্ষণ করা আমাদের
তক দায়িত্ব।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ ও
ৌন্দর্য সারা বিশ্বের এক অপূর্ব বিস্ময়—
ই তো দিগ্বিজয়ী সম্রাট বলেছিলেন 'কি
চিত্র এই দেশ'। এই প্রাকৃতিক সম্পদ ও
ৌন্দর্য পৃথিবীতে অতুলনীয়—তাই প্রাচ্য
পশ্চাত্য জগতের বণিক সম্প্রদায় ও
র্যটকরা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য
তি বৎসর ভারতবর্ষে আসে ও এর থেকে
ামাদের অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়।

আমাদের বন ও বনজ সম্পদ ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যতম। আমাদের অবহেলায় এই মূল্যবান বনজ সম্পদ বিশেষ করে পশুপক্ষী আমরা হারাতে চলেছি। এখনও সচেতন না হলে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো চিরদিনের জন্য আমরা এই মূল্যবান জাতীয়সম্পদ হারাবো। সুতরাং এই ক্ষয়িষ্ণু জাতীয়সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব জনগণের। যদিও ভারত সরকার এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন তবুও জনগণের সহায়তা ছাড়া এই গুরু দায়িত্ব বহন করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি সরকারের এককভাবে এই দুর্লভ সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হতো তাহলে বন্য পশুপক্ষীর সংখ্যা এত কমতো না। এমন কি নিম্নবর্ণিত আইনগুলি চালু থাকা সত্ত্বেও আমাদের জাতীয়সম্পদ আমরা ঠিকভাবে রক্ষা করতে পারিনি যথা:—

১। ভারতীয় বন আইন—১৯২৭

২। হস্তী সংরক্ষণ আইন—১৯৩২

৩। গণ্ডার সংরক্ষণ আইন—১৯৩২

৪। বন্য পশুপক্ষী সংরক্ষণ আইন—১৯১২

৫। পশ্চিমবঙ্গ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন—১৯৫৯

কারণ এই ৫ নং আইনটি ছাড়া অন্য আইনগুলি কেবলমাত্র বন এলাকাতেই সীমিত ছিল ও বনের বাইরে এর কোনও প্রয়োগ ছিল না। এমনকি সরকারী কর্মচারীরাও বন এলাকার বাইরে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন না। সেজন্য চোরা-শিকারী ও চোরাকারবারী এই ছিদ্রপথের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে দেশের মূল্যবান পশু-পাখী শিকার করতেন—তাদের নিজেদের সাময়িক কৌতূহল ও লাভের জন্য। তাছাড়া উপরোক্ত আইনগুলি ত্রুটিপূর্ণ ছিল—যার জন্য কর্মচারীরাও কঠোরতার সঙ্গে এই আইন ব্যবহার করতে পারতেন না। সেজন্য আমাদের চলতি আইনগুলি অযোগ্য প্রমাণিত হয়।

কিন্তু ১৯৩৫ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্মেলনে বন্যপ্রাণী রক্ষণাবেক্ষণের বিষয় আলোচনা করে ঠিক হয় যে চলতি আইন-গুলির বদলে আর একটি অধিক ক্ষমতাযুক্ত আইন বাংলাদেশে প্রচলন করা হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভায় 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন—১৯৫৯' নামে একটি আইন অনুমোদিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নানা অজুহাতে এই আইন আমাদের দেশে অর্থাৎ কিনা পশ্চিম-বঙ্গে কখনও চালু করা হয়নি। সুতরাং দেখা যায় যে 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন—১৯৫৯' (৫ নং তালিকাভুক্ত) অংকুরেই বিনাশ হয়।

এসব কারণের জন্য আমাদের দেশের জনসাধারণ একটি সবল ও সরল এবং কঠোর আইন প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং সরকারকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। তাই ভারত সরকার ভারতীয় সংবিধানের ২৪৯ ও ২৫০ ধারার বলে ১৯৭২ সালে আমাদের লোকসভায় 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন' নামে একটি আইন অনু-মোদন করেন। এখনও ভারতের অনেক রাজ্যে এই আইন প্রচলন হয়নি যার ফলে আমাদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই জনসাধারণের অবগতির জন্য 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন—১৯৭৪'-এর প্রয়োজনীয়তা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ

ডোরাকাটা হায়না

সজারু
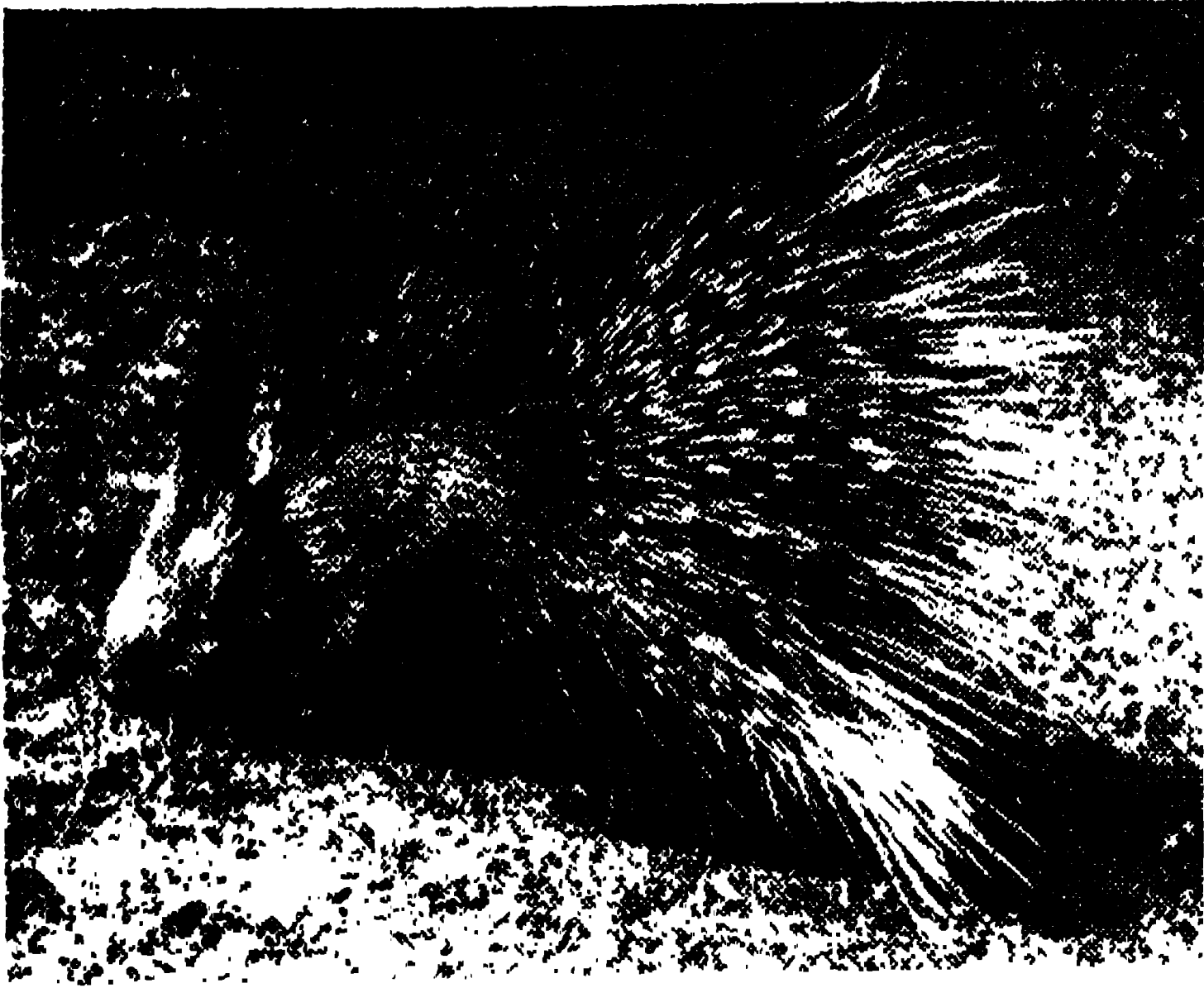
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৭৩ সালের ১লা মে 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন—১৯৭২' সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত করা হয়। এই আইন অন্যান্য প্রচলিত আইনের মতো কেবলমাত্র বনেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি বনের বাইরে গ্রামে গঞ্জে শহরে এমন কি বন্দরেও প্রযোজ্য। তাছাড়া এই আইনে এমন কয়েকটি ধারা আছে যাতে বন্য পশুপক্ষী শিকার জীবিত বা মৃত পশু-পাখীর ব্যবসা এমন কি মৃত পশুপাখীর অংশ বিশেষের কেনা বেচাও এই আইনের আওতায় পড়বে ও এই আইনে নিয়ন্ত্রিত হবে। সুতরাং এতদিন যে বাধা ছিল—এই আইন চালু হওয়াতে সে বাধা দূর হল।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে পশু ও পাখীকে দুষ্প্রাপ্যতা ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

১ নং তালিকা বা তপশীল—বাঘ-গন্ডার সিংহ কুমীর রাজ ধনেশ ময়ূর ইত্যাদি নিষিদ্ধ প্রাণী অর্থাৎ এদের শিকার ধরা ব্যবসা জীবিত বা মৃত সব সময়ের জন্য বন্ধ।

২ নং তালিকা বা তপশীল—ভারতীয় বাইসন বা গউর হাতী গোসাপ বন্য কুকুর চিতাবাঘ ইত্যাদি বিশেষ প্রাণী অর্থাৎ এদের শিকার ধরা ব্যবসা অনুমোদিত হবে তবে তার জন্য নির্ধারিত সংস্থা বা অফিস থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে।

৩নং তালিকা বা তপশীল—শুকর হরিণ (চিতল সম্বর কাককর) ভাল্লুক হায়না ইত্যাদি বড় শিকার অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কর্ম-চারীর অনুমতি নিয়ে এর শিকার বা ব্যবসা বাণিজ্য করা যাবে।

৪ নং তালিকা বা তপশীল—খরগোস ভোঁদড় লাল খ্যাক শিয়াল নানাজাতের ও রকমের পাখী ইত্যাদি 'ছোট শিকার' অর্থাৎ এর ব্যবসা ও শিকার অনুমোদিত, তবে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে।

৫ নং তালিকা বা তপশীল—কাক-শিয়াল বাদুড় ইঁদুর ইত্যাদি ক্ষতিকারক পশুপাখী ও তা শিকারের জন্য কোনও অনুমতির প্রয়োজন নেই।

তাছাড়া তপশীল বহির্ভূত পশুপাখীকে তালিকাভুক্ত করা ও তপশীলভুক্ত পশুপাখীকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া এবং এক তালিকা থেকে অন্য তালিকাভুক্ত করার ব্যবস্থাও এই আইনে আছে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় অনেক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে যারা এই আইন সুষ্ঠুভাবে চালু করার দায়িত্ব নেবেন তাঁদের অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যার ফলে তাঁরা বনের বাইরে গ্রামে গঞ্জে শহরে এমনকি বন্দরেও পশুপাখীর লেনদেন শিকার ও কারবার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজন মত বন্ধ করতে পারবেন। অতএব এখন হয়তো আমাদের মূল্যবান ও [illegible] পশুপাখীর অবাধ শিকার ও হত্যার থেকে রক্ষা করা যাবে।

এই আইনের বলে রাজ্য সরকার [illegible] উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করার ক্ষমতা রা[illegible] এই পর্ষদ রাজ্য সরকারকে অভ[illegible] জাতীয় পশু উদ্যান মৃগদাব ইত্যাদি [illegible] করার ছাড়পত্র বা অনুমতি দেওয়ার পশুপাখীর তালিকা সংশোধন করার [illegible] সরকারকে পরামর্শ দেবেন।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের বলে [illegible] প্রাপ্ত কর্মচারীরা (দ্বিতীয় খণ্ড [illegible] ২ ৩ ও ৪ নং তপশীলভুক্ত পশু[illegible] লেনদেন শিকার বা ব্যবসা ও এদের [illegible] বিশেষের তৈরী জিনিসপত্রের ব্যবসা অনুমতি দিতে পারেন—তবে এর নির্দিষ্ট কর (রাজস্ব বা [illegible] জমা দিয়ে নির্দিষ্ট সরকারী অফিস থে[illegible] ছাড়পত্র নিতে হবে। এবং প্রতি বৎসর এ[illegible] নতুন করতে হবে। বিনা ছাড়পত্রে কো[illegible] কাজ করলে তা দণ্ডনীয় হবে এবং দণ্[illegible] আগের আগের আইনের চেয়ে কঠোর [illegible] বেশী অর্থাৎ কিনা দুই বৎসর পর্যন্ত [illegible] বা ২০০০ টাকা জরিমানা কিংবা উভ[illegible] একত্রে হতে পারে কিন্তু ১ নং তালিকা প্রাণীর ক্ষেত্রে ৬ বৎসর পর্যন্ত জেল [illegible] পারে। ৫ নং তালিকাভুক্ত প্রাণীর [illegible] কোনও ছাড়পত্রের প্রয়োজন নেই কিন্তু [illegible] জন্য নির্দিষ্ট কর বা রাজস্ব দিতে [illegible] এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১ নং তপশী[illegible] পশুপাখীর শিকার লেনদেন ইত্যাদি [illegible] সময়ের জন্য বন্ধ তবে বিশেষ [illegible] ক্ষেত্রে ও প্রয়োজনবোধে মুখ্য—বন্য[illegible] সংরক্ষক এটা অনুমোদন করতে পারেন

এই আইনে ভারত সরকার ১ [illegible] তালিকাভুক্ত প্রাণীর বিষয়ে নিয়ম প্রণ[illegible] ক্ষমতা রাখেন। এর লেনদেনের সময় [illegible] ছাড়পত্র নিতে হবে। আইনে সে [illegible] ব্যাছে। আর এক রাজ্য থেকে অন্য [illegible] নেওয়ার সময় ভারত সরকা[illegible] অনু[illegible] প্রয়োজন।

মানুষখেকো বাঘ অত্যাচারী পশু [illegible] ইত্যাদি মারার অনুমতি মুখ্য বন [illegible]

কুমীর

ক্ষক দিতে পারেন। তিনি অভয়ারণ্য য়াখানা গবেষণা ইত্যাদির জন্য ১ নং শীলভুক্ত পশুপাখী জীবিত অথবা মৃত । অনুমতি দিতে পারেন। এই আইনে ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আত্ম-র জন্য যদি কেউ ১ নং তপশীলের পাখী শিকার করেন তা দণ্ডনীয় হবে কিন্তু মৃত জন্তুটি সরকারের সম্পত্তি গণ্য হবে।

নির্ধারিত ফি দিয়ে ২ ৩ ও ৪ নং শীলের পশুপাখীর শিকারের ব্যবস্থা আইনে আছে কিন্তু শিকারের নিয়ম-েন না মানলে শিকারীর ছাড়পত্র বাতিল ।। ছাড়পত্রের ফি ছাড়া পশুপাখীর ও নির্ধারিত রাজস্ব জমা দিতে হবে। নে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের দেশে ং পশ্চিমবঙ্গে শিকার এখন বন্ধ যেহেতু পাখীর সংখ্যা এখনও কম। তাছাড়া বান মহাবীরের' ২৫০০তম নির্বাণ াৎসবের জন্য ১২ নভেম্বর ১৯৭৫ ন্ত সব রকম শিকার বন্ধ। ১ নং ও নং তালিকার দ্বিতীয় অংশের তালিকা-সকল পশুপাখী জীবিত বা মৃত ফি) রাখবার জন্য প্রত্যেককেই মালিকানা াণপত্র নিতে হবে—আইনে সে ব্যবস্থাও া হয়েছে। তবে চিড়িয়াখানা ও যাদুঘরের ন্ধে এই আইন শিথিল করা হয়েছে। রও উল্লেখযোগ্য যে এই তালিকার ন্তর্ভুক্ত সকল প্রাণীর (জীবিত বা মৃত) দেশে রপ্তানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ।

এই আইনে সব পশুপাখী তাদের অংশ । অংশ বিশেষের তৈরী বস্তু বনজ-সম্পদ সাবে গণ্য। সুতরাং বনের বাইরেও এর নদেন ও ব্যবসা এই আইনের দ্বারা য়ন্ত্রিত হবে। ব্যবসায়ীরা যে এতদিন না ছাড়পত্রে ব্যবসা করতেন এবার তাঁদেরও ংশ্লিষ্ট অফিস থেকে নির্ধারিত ফি দিয়ে াইসেন্স নিতে হবে ও তাঁদের দোকানের াম রেজিস্ট্রি করতে হবে। যাঁরা বন্য শুপাখীর চর্ম সংরক্ষণের কাজ করেন তাঁদেরও লাইসেন্স নিতে হবে। এতে পশু-পাখীর অবাধ লেনদেন নিয়ন্ত্রিত হবে। বিনা লাইসেন্সে পশুপাখীর কেনাবেচা বা লেনদেন দণ্ডনীয় বলে গণ্য হবে। এতদিন যে সব আইন চালু ছিল তাতে দোষীর দোষ প্রমাণের দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত ছিল কিন্তু এই আইনের আওতায় নির্দোষিতা প্রমাণের দায়িত্ব অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর দেওয়া হয়েছে। সকল প্রকার বনজ সম্পদের বিশেষত পশুপাখীর মালিকানা স্বত্ব ও প্রমাণের দায়িত্ব মালিকের উপর ন্যস্ত হওয়ায় এই সমস্ত অপরাধ অনেক কম হবে বলে মনে হয়।

এই আইনে সকল প্রকার অপরাধের শাস্তি অনেক কঠোর ও বেশী করা হয়েছে. এমনকি এই আইনে ২০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা দুই বৎসর পর্যন্ত কারাবাস অথবা উভয় দণ্ডই এক সাথে দেওয়ার ক্ষমতা বিচারককে দেওয়া হয়েছে এবং এই আইনের কঠোরতা আগেকার চালু আইনের তুলনায় অনেক গুণ বেশী।

এই আইনের দ্বারা সরকারকে প্রয়োজন-বোধে বন্যপ্রাণী রক্ষার জন্য যে কোনও অঞ্চলকে জাতীয় পশু উদ্যান, অভয়ারণ্য ইত্যাদি ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এই আইনে বৎসরের যে কোনও সময় যে কোনও পশুপাখীর শিকার বা ধরার নিয়ন্ত্রণ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর উপর দেওয়া হয়েছে।

অভয়ারণ্যের দশ কিলোমিটার গণ্ডীর মধ্যে যারা বাস করবেন তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্র থাকলে সেই সব আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য পশু-পাখী সংরক্ষকের অফিস থেকে নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে ছাড়পত্র নিতে হবে। যদিও তাঁরা জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আগেই সেই সব আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য লাইসেন্স নিয়েছেন।

যারা অভয়ারণ্যের কাছে থাকেন বা ছাড়পত্র নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে যাওয়া-আসা করেন তাঁদেরও বন্য পশুপাখী রক্ষা করার দায়িত্ব আছে এবং তা যথাযথভাবে পালন না করলে শাস্তির ব্যবস্থা এ আইনে আছে। আমরা আশা করি এ আইন সুষ্ঠু-ভাবে চালু হলে চোরাকারবার ও চোরা শিকার অনেকাংশে কমে যাবে এবং আমাদের এই ক্ষয়িষ্ণু জাতীয়সম্পদ সম্পূর্ণরূপে বিলোপের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে পূর্বেকার আইনের থেকে এই আইন অর্থাৎ বনপ্রাণী সংরক্ষণ—১৯৭২ আইন অনেক সবল কঠোর এবং ত্রুটিহীন। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে সরকার যত কঠোর আইনই চালু করুক না কেন এককভাবে সরকারের পক্ষে আমাদের দেশের এই মূল্যবান ও দুর্লভ জাতীয়সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব যথোচিতভাবে পালন করা সম্ভব নয়। সেজন্য চাই জনগণের সমর্থন ও সাহায্য। সুতরাং জনসাধারণেরও উচিত এগিয়ে এসে সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে এই গুরু দায়িত্ব ভার বহন করা। কেন না বন্যপ্রাণী আমাদেরই কল্যাণ সাধন করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে একে অপরকে ছাড়া বাঁচতে পারে না—সুতরাং বন্যপ্রাণীর উচ্ছেদে আমাদেরও লোপ পাওয়ার সামিল হবে।

অতএব জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্ম-চারী যাদের উপর এই আইন রূপায়িত করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে—তাঁদের কাজ হবে জনসাধারণকে এই আইনের উদ্দেশ্য সহজ সরল ভাষায় বোঝানো যাতে ভারতের জনগণ সরকারের পাশে এসে দাঁড়ান এবং এই দায়িত্ব পালন করেন। কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় কোন কাজ হবে না—এটা আমাদের সকলের বোঝা উচিত। এ বিষয়ে এখনও সচেতন না হলে এ আইনও পূর্বেকার আইনগুলির মত অচল হয়ে যাবে। সেজন্য আমি আমাদের দেশের জনগণের সাহায্য কামনা করে এই আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

বাঘের প্রেম ও বাৎসল্য

শেরজঙ্গ

বাঘের পূর্বরাগ রীতিমত একটা হট্টগোলের ব্যাপার, গৃহপালিত বেড়ালদের 'প্রেমালাপ' থেকে ভিন্ন নয়—তবে বাঘের বেলায় সেটা আরো একশো-গুণ স্নায়ু-বিদারী। যেন একটা বিসদৃশ কর্কশ কনসার্ট—তার মধ্যে আছে চড়া গাঁক-গাঁক, বিশ্রী ক্যাঁশ-ক্যাঁশ কখনো-সখনো গর্জন, চেরা গলায় চিৎকার, দীর্ঘ একটানা আর্তনাদ। সব মিলিয়ে সে এক বিকট জগাখিচুড়ি। বাঘ কিন্তু চালিয়েই যায়, সারা রাত রাতের পর রাত, প্রায় সপ্তাহভোর। জীব হিসেবে বাঘ অতি সতর্ক গা ঢাকা দিয়ে থাকা তার মজ্জাগত, কিন্তু এই উন্মত্ত প্রেমে দুই-ই চাপা পড়ে মনে হয়।

কাণ্ডটা ঘটতে শুরু করে যখন বাঘিনীর সময় হয়। এই সাড়া-জাগানো অবস্থা বাঘিনী ঘোষণা করে ভরাট গলায় গর্জন

ড়ে। আর যতোই তার অধৈর্য বাড়তে
ক ততোই তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
র্নের পর্দা চড়ায়—ঘণ্টায় ঘণ্টায়, দিনে
ন। এই সময়ে তার গা থেকে নিঃসৃত
অদ্ভুত একটা কস্তুরিকা গন্ধ যা এক
তাহেরও বেশি সময় বজায় থাকে। এই
য়ের মধ্যে আশেপাশের এলাকা থেকে
রুষ-বাঘ সাড়া জাগিয়ে ডাক ছাড়বেই
ঢ়বে। তখন সেই অরণ্যে শুরু হয়ে যায়
ক-পরিণয়কালীন অতি-চিত্তাকর্ষক দ্বৈত-
নের উৎসব।

অল্প সময়ের মধ্যেই এই দ্বৈততান
রিবর্তিত হয় দ্বন্দ্বযুদ্ধে। বেধড়ক ব্যব-
র করা হয় দন্ত ও নখর, রণ-হুঙ্কারে
াকাশ দীর্ণ হয়, আর প্রতিদ্বন্দ্বীদের
ক্তে মল্লভূমির মাটি ভিজে যায়। ঈপ্সিত
। পুরস্কারের জন্য এত কিছু সেই দয়িতা
রো দৃশ্যটি অবলোকন করে—যতোক্ষণ
। একটা ফয়সালা হয়, যতোক্ষণ-না বিজয়ী
ার একাধিপত্য কায়েম করতে পারে।
বিশেষ কৌতূহলের বিষয়, প্রতিদ্বন্দ্বীদের
াধ্যে এই যুদ্ধ যদিও চূড়ান্ত নির্মম রূপ
নয়ে থাকে কিন্তু কদাচ মৃত্যুতে তার শেষ
য়। যে-মুহূর্তে প্রতিদ্বন্দ্বী মাটিতে পিঠ
দয়ে চিৎপটাং হয়ে থাবাদুটো অসাড়ভাবে
আকাশের দিকে তুলে দিয়ে পরাজয় মেনে
নেয় তাকে আর পীড়া না দিয়ে ছেড়ে
দেওয়া হয়। গোষ্ঠীর মধ্যে আচরণের এই
সভ্য রীতি সকল বন্যপ্রাণী মেনে চলে—
কি মাংসাশী, কি তৃণভোজী। বন্য জগতে
কদাচিৎ কোনো সওয়াল মর্মান্তিক পরি-
সমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়—
পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে তার নিজেরই
প্রজাতির অন্য একজন খুন করেছে এমন
ঘটনা না-থাকার মতো।)

'বাতিল করার লড়াই' চলতে পারে তিন-
চার দিন ধরে, সেটা শেষ হলে শুরু হয়
আসল প্রেম। এই মার্জারীয় সংস্করণের
প্রেম হয়ে ওঠে একটা সর্বগ্রাসী ব্যাপার
ভরাট উদ্দীপনাপূর্ণ ও বেপরোয়া—কোন্দল
কোনোক্রমেই নয়। প্রণয়ী তার মধ্যে আম-
দানী করে কিছু আগেকার দ্বন্দ্বযুদ্ধের
সমুদয় ব্যাপারগুলো, আর তারপরে প্রকৃতই
যখন সম্পূরণের সময় আসে তা প্রকৃতই
হয়ে ওঠে এক রাজকীয় রণ। শুরু হয়
হিস-হিস ঘড়-ঘড় আওয়াজের একটা সোর-
গোল তুলে, তারপরে বিকট গাঁক-গাঁক ও
গর্জন। মাঝেমধ্যে খেলা বিলাপ, লাফা-

হরিণ

লাফি, ছুটোছুটি—তার মধ্যে দিয়ে একটু
একটু করে অগ্রসর হওয়া এবং সমাপ্তিতে
বেসামাল ঘুষোঘুষি কামড়াকামড়ি, ঘড়ঘড়
ও মিয়াও-মিয়াও। কোনটা কখন তা নির্ভর
করে—বাঘিনী বিরক্ত না গদগদ সেই
মেজাজের ওপরে।

প্রেমের পর্বগুলো অনেকটা এই রকম :
বিজয়ী পুরুষটি ক্রমে গা-সওয়া হয়ে
এলে বাঘিনী করে কি, বাঘের লম্বা শক্ত
গোঁপে নিজের গোঁপ ঠেকিয়ে দেয়। আর
জবাবে যদি শোনে যে, বাঘ নরম সুরে ঘড়-
ঘড় করছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই সে রাশ
কিছুটা আলগা করে নিজেকে ছেড়ে দেয়।
কিছুক্ষণ পরেই মাটিতে পিঠ দিয়ে চিৎ-
পটাং হয়ে থাবাদুটো শূন্যে আন্দোলিত
করতে থাকে—অনেকটা সেই পরাজিত প্রতি-
দ্বন্দ্বীর মতো। পুরুষ বাঘ তখন অটল
অনড় ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বাঘিনীর দিকে
তাকিয়ে আছে। বাঘিনী বারেবারে মিয়াও-
মিয়াও ডাক ছাড়ে, তারপরে পায়ে ভর দিয়ে
উঠে দাঁড়ায় পিঠটা উঁচিয়ে ধরে। বজ্রের
মতো গর্জন তুলে বাঘ তখন বাঘিনীর
ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁত দিয়ে বাঘিনীর
ঘাড় কামড়ে ধরে, তারপরে চড়াও হয়। এই
'প্রেমের দৃশ্যের' স্থায়িত্ব ১৫ থেকে ২০
সেকেন্ড, দৃশ্যটি প্রতিদিন বহু ডজন বার
ফিরে ফিরে ঘটে। অনুষ্ঠানটি চলে ৫ থেকে
৭ দিন পর্যন্ত।

দুই 'প্রেমের দৃশ্যের' মধ্যবর্তী সময়ে
ছেড়ে-দেওয়া রণ আবার শুরু করা হয়
অরণ্য আবার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে
থাকে গর্জনে ও হুংকারে। তারপরে, শেষ-
পর্যন্ত যখন মঞ্চে যবনিকা-পতন ধ্বনিত
হয়—বা, আরো সঠিক ভাষায় বলতে হলে—
গর্জিত হয় অভিনেতৃরা বেরিয়ে আসে
নেতিয়ে-পড়া শীর্ণ চেহারা নিয়ে, তাদের
সারা মুখে গভীর কাটাছেঁড়া ও দগদগে ঘা,
সারা গা রক্তমাখা।

বাঘের বাচ্চা

ভারতে বিশেষ একটা বাছাই-করা সময়ে
বাঘের বাচ্চা হয়ে থাকে তেমন মনে হয় না।
বাঘিনীর সময় হওয়ার চক্র সারা বছর ধরেই
৪৫ থেকে ৫৫ দিনের পর ব্যবধানে ঘটে
যেতে পারে। একমাত্র যখন বাঘিনীর সঙ্গে
তার বাচ্চারা থাকে (দু-বছরেরও বেশি সময়
বাচ্চারা মায়ের সঙ্গে থাকে) তখন তার সময়-
হওয়ার ব্যাপারটি সাধারণত বন্ধ থাকে।
কিন্তু কোনো দুর্ঘটনায় যদি তার বাচ্চা-
গুলো মারা যায় অমনি তার সময়-হওয়ার
ব্যাপারটি আবার ঘটতে শুরু করে আবার
সে গর্ভধারণ করার জন্য তৈরী হয় এবং
পাঁচ মাসের মধ্যে নতুন একপাল বাচ্চা প্রসব
করে বসে।

চার বছর বয়স থেকে বাঘিনী সঙ্গম
শুরু করে, পাঁচ বছর বয়স থেকে বাঘ।
শেষদিন পর্যন্ত তাদের বাচ্চা হয়ে চলে।
গর্ভধারণের কাল ১০০ থেকে ১১০ দিন
পর্যন্ত, কিন্তু স্তন্যদানের কাল এখনো
পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায়নি—বিশেষ
করে বন্য অবস্থায়।

যদিও সারা বছর ধরেই বাঘের সঙ্গম
চলতে পারে তবে উত্তর ভারতে সম্ভবত
তার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে ডিসেম্বর
থেকে ফেব্রুয়ারি। ফলে বাচ্চারা সাধারণত
জন্মায় মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে তখন
আর চূড়ান্ত আবহাওয়ার কষ্টের মধ্যে
তাদের পড়তে হয় না। সাতটি বাচ্চা এক-
সঙ্গে হওয়ার ঘটনা একেবারেই বিরল, সাধা-
রণত তিনটি থেকে চারটি পর্যন্ত হয়ে
থাকে। নানা কারণে অধিকাংশ বাচ্চা একে-
বারে শিশু অবস্থাতেই মারা যায়। সবচেয়ে
বেশি মারা যায় সাধারণত ব্যাধিতে তার-
পরেই ফুসফুস ও অন্ত্রের গোলযোগে।
মাংসাশীরা সাধারণত মা হিসেবে সুবিধের
হয় না মায়ের অবহেলার জন্য বহু বাচ্চাকে
প্রাণ দিতে হয়। অন্য ব্যাপারও আছে,
বাচ্চাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য একা ও অর-
ক্ষিত ফেলে রেখে মাকে বাধ্য হয়ে শিকারে
বেরোতে হয় আর তার অনুপস্থিতির
সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে। হয়তো তারা পায়ে পায়ে
ছিটকে পড়ে ও ধ্বংস হয়; হয়তো
তারা ক্ষুধায় ও ঠাণ্ডায় মারা পড়ে; হয়তো

জন্তুদের খেয়ে ফেলে অন্য মাংসাশী জন্তু—যেমন হায়েনা শেয়াল এমনকি পুরুষ বাঘ পর্যন্ত। মোট ফল এই দাঁড়ায় যে, প্রাথমিক শৈশবের ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে বেঁচে থাকে মাত্র হিসেবমতো ৫০ শতাংশ। আর এটাই হচ্ছে কারণ যে অরণ্যের মধ্যে মায়ের সংগে সাধারণত দেখা যায় একটি বা দুটি বাচ্চা—দুটি কম, একটিই বেশি।

বাচ্চারা জন্মায় কোনো একটা ঘন আড়ালে গুহার মধ্যে উদগত পাথরের নিচে কিম্বা অনুরূপ কোনো বিচ্ছিন্ন স্থানে। প্রসূতি-আলয়টি সবসময়েই হয় অতি গোপন ভিতরটা অন্ধকার, আর এমন একটা জায়গা যা সহজেই রক্ষা করা সম্ভব। জন্মের সময়ে বাচ্চারা অন্ধ থাকে আর ৯ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত এই অন্ধত্ব থেকে যায়। এমনকি চোখ ফোটার পরেও আরো প্রায় দু-সপ্তাহ কাল তারা চোখের দৃষ্টি ঠিকমতো নিবদ্ধ করতে পারে না। উপরন্তু আলোর দিকে তাকাতে কষ্ট হয় এবং চোখের মণির 'বোধ-নীল' তাদের দৃষ্টিকে ক্ষীণ করে। ফলে এই পর্বে তারা হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অসহায়, নিজের থেকে নড়াচড়া করতে পারে না অন্ধকার কোণে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে থাকে।

সম্ভবত এটা প্রকৃতিরই একটা উপায়, যাতে নিরাপত্তার খাতিরে তাদের আবদ্ধ ও লুক্কায়িত রাখা যায়। এই উদ্দেশ্যকে আরও পরিপূরণ করে মা নিজে—ঘন ঘন সে বাচ্চাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যায় আর প্রতিবার সরাবার আগে নতুন জায়গা সতর্কতার সংগে বাছাই করে—যাতে বাচ্চারা সেখানে পুরোপুরি লুকনো থাকতে পারে। বাচ্চা সরাবার পদ্ধতি গৃহপালিত বেড়ালের মতো— বাচ্চার ঘাড়ের কাছে আলগা চামড়া দাঁতে কামড়ে ধরে মা একটি একটি করে বাচ্চা সরিয়ে নিয়ে যায়। প্রথম কয়েকটা দিন মা সবসময়েই বাচ্চাদের সংগে থাকে. তারপরে ক্ষুধার জ্বালায় বাধ্য হয়ে তাকে খাদ্যের সন্ধানে বেরোতে হয়। বাচ্চাদের এমনভাবে শেখানো হয় (কিংবা হয়তো এটা তারা স্বভাব বশেই করে থাকে) যে মায়ের অনুপস্থিতির সময়ে বাচ্চারা তাদের লুকনো জায়গায় চুপটি করে পড়ে থাকে। মা বাচ্চাদের কতদিন দুধ দেয় আমরা জানি না; কিন্তু পুরোপুরি মাই ছাড়বার আগেই দেখা যায় মায়ের আনা হাড় থেকে তারা মাংসের কুচি চেটে চেটে তুলে নিতে শুরু করেছে। এই হচ্ছে মাংস খাওয়ায় তাদের হাতেখড়ি এবং জন্মের পরে বেশ তাড়াতাড়িই এটা হয়ে যায়। পরে মা তাদের খাওয়ায় পুরোটাই মাংস। এই মাংস প্রথমে সে শিকারের গা থেকে বড়ো একটা দলায় নিজ গলাধঃকরণ করে, তারপরে বাচ্চাদের কাছে ফিরে এসে উগরে বার করে দেয়। এইভাবে খাওয়ানো বাচ্চাদের পক্ষে আরো নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর। প্রথমত বাইরে বেরোতে হচ্ছে না বলে তাদের বিপদের মধ্যে পড়তে হচ্ছে না, দ্বিতীয়ত মাংসের দলাটি উগরে দেবার আগে মায়ের পাকস্থলীতে পাচকরসে জারিত হচ্ছে এবং যতোই শক্ত হোক না কেন তার ফলে সহজে পাচ্য হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ

শিকার করা ও গোপনে অনুসরণ করার শিকার ধরার ব্যাপারটা খুবই জটিল প্রসূতি আলয়েই এই জটিল ব্যাপারে প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যায়। বাচ্চারা গুঁড়ি মেরে একে অপরের দিকে এগিয়ে আসে ও একে অপরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আড়ালে লুকোয় একে অপরকে আক্রমণ করে— এমনকি মাকেও। মায়ের লেজ নিয়ে বাচ্চাদের খেলা করাটা এমনিতে মনে হতে পারে অর্থহীন আসলে এটাও কিন্তু সম্মুখীন হওয়া ও আক্রমণ করার দক্ষতা-অর্জনে একটা অনুশীলন। দ্রুত সঞ্চারমান লেজের ডগাটিকে তারা ধাওয়া করে, ঝাঁ করে সরিয়ে নেওয়া মাত্রই লেজের ডগাটির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটাকে আঁকড়ে ধরে ও ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এটা করতে গিয়ে স্বভাবগত অনুশীলন করে যে- কাজ তাদের করতে তার কলাকৌশল। বড়ো হয়ে বেড়াবার মতো গায়ে এলেই মা তাদের 'বাইরের' নিয়ে যায়। মাঠের কলাকৌশল-এর বিষয়গুলোতে প্রশিক্ষণদানের প্রথম দিন কাটার পরে মা তাদের সামনে বিকলাঙ্গ জন্তু হাজির করে এবং মেরে ফেলার জন্য তাদের ওসকায়। জন্তুটাকে আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে তারা একশেষ করে, জন্তুটার সঙ্গে লড়াই যায় এবং আরো বেশি তাগদ দিয়ে জন্য মায়ের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে শেষ পর্যন্ত অবশ্য মাই এগিয়ে আ জন্তুটাকে মারতে খানিকটা সাহায্য ক

দেখতে দেখতে বাচ্চারা আকা গায়ের জোরে বড়ো হয়ে ওঠে আর অল্প সময়ের মধ্যে যে অবাক হতে হ একমাস বয়স হলেই তারা মায়ের সংগে বেরোতে শুরু করে, যদিও গোড়ার নিজেদের পায়ে খাড়া হয়ে চলার তখনো তাদের হয়নি। তারপরে তার বড়ো হয়, পরিবারের শিকারের বাড়তে থাকে এবং প্রতিটি 'শিকার জন্তুর' কাছাকাছি এলাকায় দিন কয়েক জন্য থাকতেও শুরু করে দেয়। ক্রমে বাচ্চারা শিকারকর্মে আরও বেশি বেশি অংশ নিতে থাকে এবং অপরের সাহায্য ছাড়াই শিকার মারতে পারে। কিন্তু দু—তিন বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত তারা পুরোপুরি স্বাধীন হয় না—দুরে নয়, বরং বাচ্চারা এই বয়সে পৌঁছুলে তারা নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে সক্ষম) পরিবার ভেঙ্গে পড়ে, মা চলে যায় নতুন আরেক বাচ্চা পেটে ধরবার জন্য। (প্রকাশিতব্য একটি ইংরাজী পুস্তকের পান্ডুলিপি থেকে লেখাটি নেওয়া হয়েছে।)

কলপ গড়িয়ে ছড়িয়ে যায়না

TRU-TONE gel

ASK FOR FREE RUBBER GLOVES

Permanent Hair Dye
BLACK

নতুন ট্রু-টোন জেল

লে সমানভাবে কলপ
লাগানোর সবচেয়ে
নির্ঝঞ্ঝাট উপায়,
কারণ ট্রু-টোন জেল
জেলির মত ঘন।

এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন—
জে.কে. হেলীন কার্টিস,
বোম্বাই ৪০০০০৮

াই আর ডেভেলপার মেশানোর পর ট্রু-টোন জেল গাঢ় হয়ে
ায় বলে চুল থেকে গড়িয়ে পড়েনা....আর একেবারে চুলের গোড়া
র্যন্ত পৌঁছে যায় বলে চুলের রঙ স্বাভাবিক লাগে। চুলের যত্নের
ব্যাপারে অগ্রণী মার্কিন কোম্পানী হেলীন কার্টিস-এর
অভিজ্ঞ কারিগরীর সাহায্যে তৈরী।

* ট্রু-টোন কলপ একেবারে তরলও পাওয়া যায়

বিনামূল্যে
রবারের গ্লাভস
এই বিশেষ উপহার
স্টক ফুরোনো পর্যন্ত
পাওয়া যাবে।
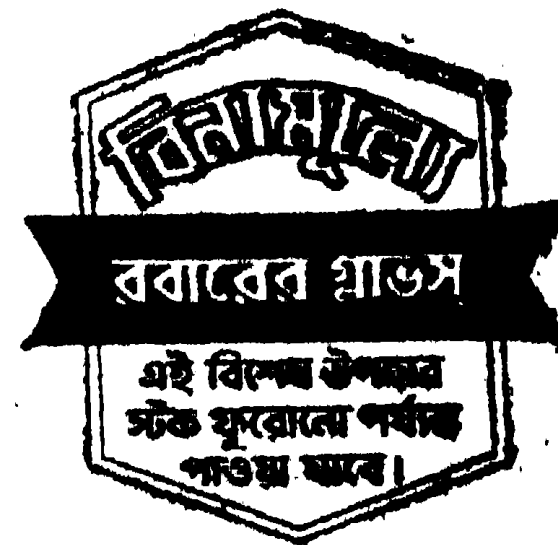
ট্রু-টোন জেল-এও হেয়ার কণ্ডিশনার মেশানো রয়েছে!

পূর্ব ভারতের পরিবেশক: জি. এথারটন এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible]/30 JKH-[illegible]

খেলাধূলা

দর্শক

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

বাঙ্গালোরে ২১তম জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল এগারটি বিভাগেরই ফাইনালে খেলে দশটি খেতাব জয়ের সূত্রে উপর্যুপরি ১৯ বার দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এবারের আসরে সার্ভিসেস দল ৫১ পয়েন্টে প্রথম স্থান, রেলদল ২২ পয়েন্টে দ্বিতীয় স্থান এবং অন্ধ্র ১০ পয়েন্টে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। এগারটি খেতাবের মধ্যে একমাত্র লাইট হেভিওয়েট বিভাগের খেতাবটি পেয়েছেন রেলদলের গোপকুমার, সেনাদলের মেজর সিং-কে হারিয়ে।

সার্ভিসেস দলের পক্ষে ১০টি খেতাব জয়ী হয়েছেন : দিলবাহাদুর (লাইট ফ্লাই) সার্কারাম সত্তার (ফ্লাই) চন্দ্রনারায়ণ (ব্যান্টম), এস কে রাই (ফেদার), বর্কাশস সিং (ওয়েল্টার) মণিকুমার রাই (লাইট মিডল), ভগবান সিং (মিডল) এবং মহম্মদ আসলাম (হেভি)।

নক-আউট ক্রিকেট

সি এ বি পরিচালিত সিনিয়ার বিভাগের নক-আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৩১ রানে কালীঘাটকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে।

প্রথম দিনে স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ২০২ রান সংগ্রহ করেছিল। কে পামানী ৯টি বাউন্ডারী-সহ ৭৪ রান করে আউট হন।

দ্বিতীয় দিনে স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রথম ইনিংস ২২৩ রানের মাথায় শেষ হয়। এবং খেলার বাকি সময়ে কালীঘাট প্রথম ইনিংসের ৮টা উইকেট খুইয়ে ১৭৫ রান সংগ্রহ করেছিল। কালীঘাট তাদের ৮৬ রান তুলতেই ৭টা উইকেট হারিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ৮ম উইকেটের জুটিতে রণবীর সেন (৪৬ রান) এবং তপনজ্যোতি ব্যানার্জি দলের অতি মূল্যবান ৮৫ রান যোগ করে দলের পতন রোধ করেন।

তৃতীয় দিনে কালীঘাটের প্রথম ইনিংস ১৯২ রানের মাথায় শেষ হলে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৩১ রানে জিতে যায়। স্পোর্টিং ইউনিয়নের দিলীপ দোসী এই খেলায় ৬৩ রানে ৭টা উইকেট পান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ২২৩ রান (পামানি ৭৪ রান। রবি ব্যানার্জি ৪৯ রানে ৫ এবং দীপঙ্কর সরকার ৩৭ রানে ৩ উইকেট।)

কালীঘাট : ১৯২ রান (রণবীর সেন ৪৬ এবং তপনজ্যোতি ব্যানার্জি ৪২ রান। দিলীপ দোসী ৬৩ রানে ৭ উইকেট)

১৯৭৪ সালের সুলিভ্যান পুরস্কার বিজয়ী আমেরিকার রিক হোলহাটার। ইনি ৮৮০ গজ এবং ১,০০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড করেন। প্রতি বছর ভোট মারফৎ আমেরিকার অ্যাথলেটকেই এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

রাজ্য তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় রাজ্য তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে দ্রোনাচারী ক্লাব। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন পুরুষ বিভাগে দাশনগরের চন্দ্রকান্ত দাস এবং মেয়েদের বিভাগে ভারতী চক্রবর্তী (অর্জুন আর্চারী)।

চন্দ্রকান্ত দাস পুরুষদের ৭০ মিটার এবং ৫০ মিটার অনুষ্ঠানে জাতীয় রেকর্ড ভাঙেন। তিনি ৭০ মিটারে ২২৮ পয়েন্ট এবং ৫০ মিটারে ১৯৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিলেন।

রাজ্য রোয়িং প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রোয়িং প্রতিযোগিতায় ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব ৩৯ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। লেক ক্লাব এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব সিনিয়র ফোরস, সিনিয়র পেয়ার্স এবং সিনিয়র স্কালস বিভাগে স্বর্ণপদক জয়ী হয়। তাছাড়া রৌপ্যপদক পায় জুনিয়র পেয়া এবং জুনিয়র স্কালসে।

বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ

ক্লিভল্যাণ্ডে বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধের হে ওয়েট বিভাগের চ্যাম্পিয়ান মহম্মদ আ নিউজার্সি'র চেক ওয়েপনারকে টেকনিক নক আউটে হারিয়ে তাঁর বিশ্ব খে কোনক্রমে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়ে শেষ ১৫শ রাউণ্ডের অন্তিম লগ্নে ও পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়। ৯ম রাউ ওয়েপনারের এক প্রচণ্ড ঘুষিতে মহ আলী মুহূর্তের জন্যে ভূতলশায়ী হ ছিলেন। মহম্মদ আলী তাঁর ৪৮টি লড়া এই নিয়ে মাত্র চারবার ভূতলশায়ী হ এর আগে সনি ব্যাংকস হেনরী কুপার। জো ফ্রেজার তাঁকে ভূতলশায়ী করেছিলে

অকসফোর্ড-কেম্ব্রিজ বোট রে

ঐতিহাসিক অকসফোর্ড বনাম কে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বোট কেম্ব্রিজ ১৯ মিনিট ২৭ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে অকসফোর্ডকে পরা করেছে। এই নিয়ে কেম্ব্রিজ ৬৮ বার হল। অকসফোর্ড জিতেছে ৫২ বার। একবার ১৮৭৭ সালে বোট রেস ড্র ছিল।

অভিনন্দন গ্রহণ করুন

মেসার্স বেঙ্গল রেপ্‌টাইল এক্সপোর্টিং কোম্পানী (১৯৫৮) প্রাঃ লিঃ—কলিকাতা

,, লতিথসন্স অ্যাণ্ড কোম্পানী—কলিকাতা

,, পি. প্যাগ্‌নন্‌ অ্যাণ্ড কোম্পানী-কলিকাতা

,, সৈয়দ আবদুল আহাদ অ্যাণ্ড কোম্পানী কলিকাতা

,, মাসুদ আলম অ্যাণ্ড কোম্পানী—কলিকাতা

,, শাহ্‌ ফার অ্যাণ্ড রেপটাইল এক্সপোর্টিং কোঃ প্রাঃ লিঃ—কলিকাতা

,, ইষ্টার্ণ রেপ্‌টাইল এক্সপোর্টিং কোঃ কলিকাতা

,, আবদুল গফুর অ্যাণ্ড সন্স—কলিকাতা

,, র‍্যানেটস্‌ ইষ্টার্ণ এক্সপোর্টস—কলিকাতা

,, লেদারওয়ার অ্যাণ্ড এলায়েড্‌ এজেন্সী কলিকাতা

,, স্কীন এজেন্সী—কলিকাতা

,, এ. জি. ট্যানারী—কলিকাতা

,, সিজন ট্রেডিং কোম্পানী—কলিকাতা

,, রোটাস্‌গড় এক্সপোর্ট কর্পোরেশন-কলিকাতা

নাট্যমঞ্চ
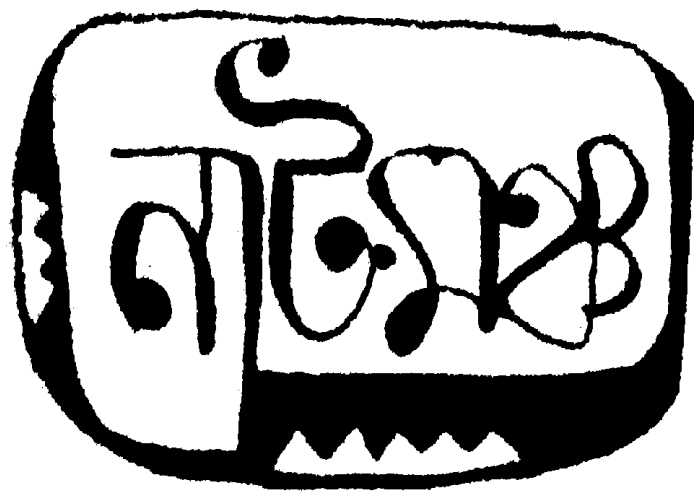
নাট্যায়নের

'হা হা স্বদেশ'

আজকের থিয়েটার গ্রুপগুলি শুধুমাত্র দর্শককে আনন্দ দেবার জন্যেই নাটক করে না, তাদের নাটক আজ দর্শকদের ভাবায়ও। একথা বোধহয় আর বলার অবকাশ রাখে না। যে কোন আধুনিক নাটক দেখলেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

যে কারণে একদিকে যেমন এইসব নাটক দেখার দর্শক ক্রমশ বাড়ছে তেমনি নব নাট্য আন্দোলনের ঢেউ সোচ্চার হয়ে উঠছে। কি বক্তব্যে, কি ফর্ম বা আঙ্গিকে আজকের নাট্য ভাবনা নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছে তাদের নাটকে। সত্য অর্থে তাই এদের 'প্রচেষ্টা' বলাই বোধহয় সঙ্গত।

'হা হা স্বদেশ' প্রথম আকর্ষণ করে তার নামকরণের বৈচিত্র্যে। এটা অত্যন্ত আধুনিক নামকরণ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সঙ্কোচের সংগেই জানাই এর বক্তব্য ভাবনায় চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও বিচ্ছিন্নভাবে তার উপস্থাপনার জন্যে ঠিক ততটা আকর্ষণ করেনি।

সংশোধন

৩৬ পৃষ্ঠার উপরের বাঁদিকের পাখিটি কোকিল। ডান দিকের পাখির নাম শাহী-বুলবুল। মাঝের পাখিটি হলদে পাখি নামে পরিচিত।

তার একটা বড় কারণ সম্ভবত ফ্ল্যাশব্যাকের প্রয়োগ নাটকে অত্যন্ত বেশী করা হয়েছে বলে। যার জন্য সমস্ত বক্তব্য সহ নাট্যরস দানা বাঁধতে পারেনি।

অথচ নাটকের কোথাও তেমন কোন ত্রুটি নেই যার ফলস্বরূপ নাটকটি দর্শক-গ্রাহ্য হবে না।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে। সেটা হোল নাটকের শ্লথগতি। যে ত্রুটিটাও নাটককে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যাঘাতের সৃষ্টি করেছে।

মনে হয় ফ্ল্যাশব্যাক এবং শ্লথগতি—এই দুই দিকে আরও একটু সচেতনভাবে দৃষ্টি দিলে 'হা হা স্বদেশ' একটি স্মরণীয় নাট্য-সৃষ্টি হয়ে থাকবে। বলাই বাহুল্য নাট্যকার ও নির্দেশকের কাছে (অনিল দে) এটা শুধু মাত্রই সবিনয় পরামর্শ।

তবে এই আপাত দুর্বলতাটুকু কিন্তু অভিনয় দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছেন অভিনেতারা।

আর যে কথা গভীরভাবে বলা হয়েছে এ নাটকে সেই যুগ-যন্ত্রণা, যুবসমাজের অনিশ্চিত ভবিষ্যত, শিক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শ চ্যুতি যুবশক্তির অবক্ষয়—যার বেশীর ভাগ দাঁড়িয়ে আছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর ওপর—যেটা একদিকে যেমন এ যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং যে কথা উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা এ সমাজের নেই। তবু এই জাতীয় নাটকের অবশ্যই প্রয়োজন আছে আমাদের জীবনে। কারণ এরাই মরচে পড়া সমাজ ব্যবস্থায় ঘা দিয়ে স্থবির হ[illegible] পড়া মধ্যবিত্ত মানুষগুলির ঘুম ভাঙাবে।

অভিনয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা য[illegible] অনিল দে এবং সুশান্ত ভট্টাচার্যের না[illegible] অন্যান্য ভূমিকায় লোকনাথ রায় [illegible]দ্র মজুম-দার অসীম মুখার্জি রথীন [illegible]র্য সনৎ দে শেখর সেন[illegible] সু[illegible] ঘোষ দেবব্রত [illegible]র্য [illegible] গীতেশ চক্রবর্তী চরিত্রা[illegible] তবে এঁদে[illegible] মধ্যে দু একজনের অভিনয়ে কিঞ্চিৎ জড়[illegible] লক্ষ্য করা গেছে। যেটা এমন নাটকের প[illegible] আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। একমাত্র স্ত্রী ভূমিক[illegible] কাজল চৌধুরী সুন্দর। কয়েকটি সুন্দ[illegible] মুহূর্ত তিনি দর্শকদের উপহার দিয়েছেন।

সংগীতের সুর যোজনায় বেশ একা[illegible] নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রয়োগে[illegible] তারতম্যে সেটা যেন মনকে আচ্ছন্ন করে [illegible] (সংগীতঃ দেবাশিস দাশগুপ্ত)।

চি[illegible] সরকারের আলোর কাজ ভাল।

নাটকের সংলাপ স্থানবিশেষে খু[illegible] আকর্ষক। এতে নাট্যকারের বক্তব্য প্রকা[illegible] মত ভাষার ওপর দখলেরই পরিচায়ক। ত[illegible] প্রয়োগে পরিমিতিবোধ সম্পর্কেও তি[illegible] সচেতন সেটা বোঝা যায়। তবু মনে হ[illegible] ক্ষেত্র বিশেষে সংলাপকে আরও একটু ছাঁ[illegible] কাট করলে বোধহয় নাটকের গতিশীলত[illegible] পক্ষে সেটা সহায়ক হয়।

'হা হা স্বদেশ' ভাল নাটক ভাবা[illegible] নাটক বলেই কিন্তু এত কথা বলা।

নটপীঠ-এর দুটি নাটক

নটপীঠ নাট্যসংস্থার দুটি নাটক 'ছা[illegible] পত্র' (নাটক ও নির্দেশনা মানবব্রত মু[illegible] পাধ্যায়) এবং 'বিনিময়ে কিছু' সম্প্র[illegible] বয়েজ ওন লাইব্রেরী হলে অভিনীত হ[illegible]

ছাড়পত্র নাটকে কিছুকাল আ[illegible] বাংলাদেশে যে খুনের রাজত্ব চলেছিল [illegible] সেই সংগে জমিদার জোতদারদের যে অত্যা[illegible] সংঘটিত হতে দেখা গেছে তার একটা অ[illegible] দেখানো হয়েছে। এ জাতীয় নাটক একা[illegible] অভিনীত হলেও এঁদের নিষ্ঠা এবং প্র[illegible] ভাল লেগেছে।

।ভিনয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় (যমরাজ, ।র ইত্যাদি) মানবব্রত মুখোপাধ্যায়ের ও ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক অভিনয় মনে রাখবার প্রদীপ বসুর চিত্রগুপ্ত, নায়েব ইত্যাদি । সেই অনুপাতে পরিমলের ভূমিকায় মুখোপাধ্যায় কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ মনে ।

থম যমদূত সোনাগোপাল সাউকে সুন্দর মানিয়েছে এবং তিনি অভিনয়ও ন ভাল। দীপক ভৌমিকের দুটি ই সুঅভিনীত।

ন্যান্য ভূমিকায় জহর বিশ্বাস শংকর পুলক বিশ্বাস যথাযথ। নাটকে মাত্র স্ত্রীভূমিকা। শিপ্রা ঘোষ তাতে ।

বদ নাটক সম্বন্ধে দু-একটি কথা আছে। সেটা নাটকের বাঁধুনি ত। এদিকে আর একটু লক্ষ্য রাখলে টকে নটপীঠ গোষ্ঠী সুনাম অর্জন ন।

।দিক থেকে 'বিনিময়ে কিছু' অনেক ম্ধ। অভিনয়ও স্বচ্ছন্দ। বিশেষ করে টি দৃশ্য এবং চরিত্র যেন মনে দাগ যায়।

।ভিনয়ে প্রথমেই নাম করা যায় মানব- খোপাধ্যায়ের। তাঁর অভিনয়ে একটা ফূর্ত ভাব আগাগোড়াই লক্ষ্য করা গেছে। ন্যান্য ভূমিকায় সমীর কর প্রদীপ বসু ভৌমিক অসীম রায় চৌধুরী জয়ব্রত পাধ্যায় শুভেন্দু মাইতি মিহির সেন- দীপক বসু ইত্যাদি স্বচ্ছন্দ অভিনয় ন।

ূপসজ্জা (শুভেন্দু মাইতি) উভয় ই সুন্দর। সংগীতের প্রয়োগ স্থান- ম নাটকের দৃশ্য রচনায় সহায়ক ।

ল্লরীর 'উৎসন্ন'

যখানে এ যুগের যুবকরা নানা বিভ্রান্তি এবং হীনমন্যতায় ভুগছে ন কখনো কখনো বিদ্যুৎ ঝলক দেখলে লাগে বই কি।

বেশ্যাই সেটা সংখ্যায় কম। কিন্তু এ ছেলেদের মধ্যেও সামাজিক সচেতনতা সেই সংগে আদর্শবাদও যে আজও তার প্রমাণও আমরা পাই বই কি। সেটা কম বেশী জীবনের সব ক্ষেত্রেই। কথাটা আমার মনে হয়েছিল নতুন নাট্য বল্লরীর 'উৎসন্ন' নাটক দেখতে বসে।

এই নাটকের অভিনেতারা সবাই কলেজের যাদের চোখে এখনও উজ্জ্বল ভবি- স্বপ্ন আঁকা। যাদের চেতনায় বাদের দ্যুতো।

উৎসন্ন' এ কালের নাটক। কিছুটা রঞ্জিত হলেও চরিত্রগুলি মোটামুটি দের চেনা। যাদের মধ্যে একাধারে ক আদর্শবাদী লম্পট অত্যাচারী থেকে ণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব ঘটেছে। তাই যায় আজকের সমাজের (অবশ্যই যায় মানুষগুলি তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা অনিচ্ছা দারিদ্র্য সুকুমার বৃত্তি উদভ্রান্তি কামনা বাসনা শৃঙ্খলা রক্ষার নামে অত্যাচারীতে রূপান্তরিত) একটা সমস্যা এবং ভাববার মত কথা এ নাটকে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। (নাটক নির্দেশনা ও মানব এবং অন্য একটি চরিত্রে ভক্তি সাহা)।

নাটকের শুরু চারণদলের গান দিয়ে। যেখানে অভিনীত সব কটি চরিত্রই উপস্থিত। এই অংশের সংযোজন সুন্দর। কিন্তু সেই অনুপাতে গানের কণ্ঠস্বর সোচ্চার নয়।

অভিনয়ে প্রথমেই যাঁদের নাম করা যায় তাঁরা হলেন অনিমেষ (রবীন দাস) মানব (ভক্তি সাহা) এবং কেলো (বিশ্বনাথ ভট্টা- চার্য)। প্রথম দুজন অভিনেতা অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হবার আন্তরিক চেষ্টায় ত্রুটি রাখেন নি। কিন্তু বিস্মিত করেছেন শেষোক্ত শিল্পী (কেলো)। প্রথম থেকেই ইনি তাঁর চরিত্রটিতে বলিষ্ঠতা আরোপের চেষ্টা করে গেছেন। একটু আবেগ বেশী থাকলেও কোন কোন দৃশ্যে সত্যি সুন্দর অভিনয় করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্বপ্নের দৃশ্যটি উল্লেখ্য। ঘুমের মধ্যে তার মানসিক যন্ত্রণার প্রকাশ এবং তার পাশাপাশি একটা অসহায়তার আকৃতি তিনি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন।

অনিমেষের রূপকার আগাগোড়া সংযত এবং মর্যাদাসম্পন্ন অভিনয় করেছেন।

মানবের চরিত্রকার কোন কোন অভি- ব্যক্তিতে দর্শককে বিস্মিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটা জিজ্ঞাস্য আছে—শেষ দৃশ্যে মানব জেলখানা থেকে পালাতে চেষ্টা করল কেন। এতো একরকমের পিছিয়ে যাওয়া।

জোকার (শেখর দাস) স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন। কিন্তু তার অভিনয়ের ঝোঁকের দরুন দর্শককে তিনি খুব বেশী আকর্ষণ করতে পারেন নি। আর চরিত্রটাও যেন সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়।

গগন (বরুণ পাইন) অতিশয়োক্তি সত্ত্বেও দরদ দিয়ে অভিনয় করেছেন। শ্যামল (স্বপন দাস) ও শম্ভুর (অসীম চক্রবর্তী) অভিনয়ে এখনও জড়তা রয়ে গেছে। ইন্সপেক্টর (অলক সুর) সম্পর্কেও ঐ কথাই বলা যায়। সেদিক থেকে সহ-ইন্সপেক্টর (গৌর সিনহা) কিন্তু সুন্দর। অরুণ লাহা তপন সরকার ও সুব্রত দত্তগুপ্ত চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু নারী চরিত্রাভিনেত্রী দুজনেই আমাদের বিস্মিত করেছেন। স্বপ্না সরকারের সরলা দুটি দৃশ্যে ছেলের মৃত্যু সংবাদ শুনে ও তার আগের একটি দৃশ্যে অত্যন্ত দরদ দিয়ে অভিনয় করেছেন। ঐ দৃশ্যে তাঁর অভিনয় মনকে স্পর্শ করে। তবে ভাষা প্রয়োগে একটু তারতম্য রয়ে গেছে।

আর স্বপ্না ব্যানার্জির মালতী আমাকে অবাক করেছে তার অত্যন্ত সহজ ও স্বাচ্ছন্দ অভিনয়ে। তেমনি এর এক্সপ্রেশন। চেষ্টা করলে এবং একটু সযত্ন হলে ভবিষ্যতে ইনি খ্যাতনামা অভিনেত্রী হতে পারবেন। কোন কোন দৃশ্যে তাঁর পাশে তাঁর আদর্শবাদী প্রেমিককে বেশ নিষ্প্রভ মনে হয়েছে। সাজসজ্জা ভাল। আলো ও শব্দ প্রক্ষেপণ (প্রশান্ত চক্রবর্তী) সম্পর্কে আর সচেতনতার অবকাশ আছে। আবহ (নারায়ণ ঘোষাল গৌরচন্দ্র সিনহা ও ঘোষাল) সুরের দিক থেকে ভাল। পরিবেশনায় আরো কিছুটা নজর উচিত বলে মনে হয়েছে।

সব মিলে সমগ্র নাটকটি অবশ্যই দর্শক সাধারণকে ভাবনায় উদ্বুদ্ধ সমর্থ হবে। তবে নাটকটি আর ছোট এবং গতিশীল করলে ভালো।

তবু বোলবো বল্লরীর 'উৎসব' বলিষ্ঠ প্রয়াস তাতে কোন সন্দেহ মতবাদ যাই থাক না কেন।

নাট্যসমা

জলসা

ভানু সিংহের পদাবলী, মণিপুরী নৃত্যে

উপান্তে অবস্থিত হলেও নিরীহ মণিপুরবাসীকে অনেক বিরোধী শক্তি বৈরী এবং যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়েছে, তাদের প্রাণের বস্তু শিল্পকলা বার বার বিধ্বস্ত হয়েছে। তাই বিধর্মী শাসকের নির্মম কোপ-দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে আত্মসংগোপনে অন্তরের নিভৃতলোকে ধ্যানের মতই সঞ্চিত রেখেছিলেন শিল্পপ্রাণ মণিপুরবাসী। ক্রমে ক্রমে এতবড় শিল্প লোকচক্ষুর অন্তরালেই নির্বাসিত হতে বসেছিলো। এ বিড়ম্বনার হাত থেকে এতবড় শিল্পকে বাঁচালেন স্বয়ং কবিগুরু। তিনিই এমন ভাবনিবিড় সমৃদ্ধ শিল্পকে বিশ্বের বিদ স্বসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ক প্রতি তাঁদের সেই শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা নৃত্যের দীপারতি হয়ে জ্বলে উ 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে? দর্শনা ও কলাবতী দেবী পরিকল্পিত ও বিপিন সিং পরিচালিত নৃত্য ও স এই মর্মগ্রাহী রূপসৃষ্টি একটি র সকালকে মনোরম করে তুলেছিলো এ অফ্ ফাইন্ আর্টস প্রেক্ষাগৃহে। তর বেশক সৌমেন চট্টোপাধ্যায় এব ধন্যবাদার্হ।

ভানুসিংহের পদাবলীর গানগু ভরা আবেগে গেয়েছেন মঞ্জরী লাল। প্রকাশের প্রশস্ত অবকাশের তিনি প্র দক্ষতায় ভরে দিয়েছেন।
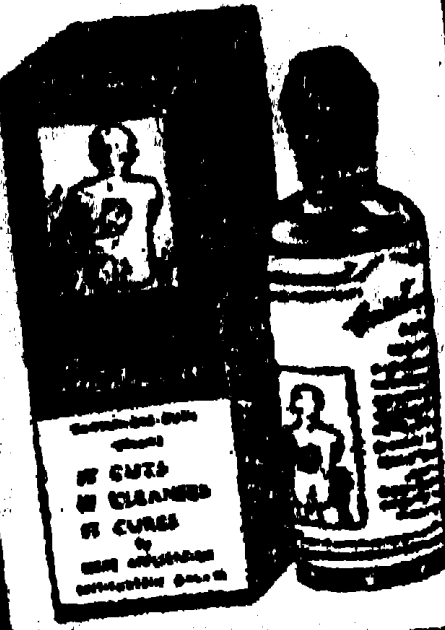
ভানুসিংহের নৃত্যরূপটি অবি শ্রীরাধার অভিসার প্রতীক্ষা ব্যর্থতা ও প্রিয়মিলনের প্রতিটি অনুভূতির রঞ্জনা জাভেরীর রাধিকারূপে মূর্ত। চরণ শ্রীকৃষ্ণের চপলতার [illegible] রা প্রেমের ছবি হয়ে উঠেছেন দর্শনা। অন্যান্য শিল্পীরা ভাবের এই নন্দ তাঁদের ললিতনৃত্যে পত্রপুষ্পশোভিত ছেন।

অন্যান্য নৃত্যের সবকটিই উ কিন্তু মৃদঙ্গচালনে—দেহলীন মৃদঙ্গে দুই করাঘাতের তালে তালে লাস্যদ ক্ষেপ, দেহভঙ্গির মনোহরলীলা—সং নৃত্যের তালে তালে শিল্পীর আ চিত্র যেন উদ্ভাসিত।

মৃদঙ্গ বাদনের মনোহর ভঙ্গি কলাবতী ও শান্তি দেবী অজন্তার উঠেছেন।

চিত্রা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।